সব খন্ড
একত্রে
বেহেশ্তী
জেওর

১ম ভলিউম

২য় ভলিউম

৩য় ভলিউম

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে ফকীহ্ বানাইয়া দেন।

বঙ্গানুবাদ

বেহেশ্‌তী জেওর

১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

[প্রথম ভলিউম]

লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

আরয

হাম্‌দ ও ছালাতের পর বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট অধীনের বিনীত আরয এই যে, মুজাদ্দেদে যমান, কুত্‌বে দাওরান, পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রহ্‌মতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় সম্পূর্ণ জীবনটি ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন কিতাব ১০/১২ জিল্‌দেরও আছে। কিন্তু এইসব কিতাবের কপি রাইট তিনি রাখেন নাই বা কোন একখানি কিতাব হইতে বিনিময় স্বরূপ একটি পয়সাও তিনি উপার্জন করেন নাই। শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দ্বীন ইসলামের খেদমতে ও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত কিতাবের মধ্যে ১১ জিল্‌দে সমাপ্ত বেহেশ্‌তী জেওর একখানা বিশেষ যরূরী কিতাব। সমগ্র পাক-ভারতের কোন ঘর বোধ হয় বেহেশ্‌তী জেওর হইতে খালি নাই এবং এমন মুসলমান হয়ত খুব বিরল, যে বেহেশ্‌তী জেওরের নাম শুনে নাই। বেহেশ্‌তী জেওর আসলে লেখা হইয়াছিল শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য; কিন্তু কিতাবখানা এত সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও এত ব্যাপক হইয়াছে যে, পুরুষেরা এমন কি আলেমগণও এই কিতাবখানা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা পাইতেছেন।

বহুদিন যাবৎ এই আহ্‌কারের ইচ্ছা ছিল যে, কিতাবখানার মর্ম বাংলা ভাষায় লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলিম ভাই-ভগ্নীদিগের ইহ-পরকালের উপকারের পথ করিয়া দেই এবং নিজের জন্যও আখেরাতের নাজাতের কিছু উছীলা করি; কিন্তু কিতাব অনেক বড়, নিজের স্বাস্থ্য ও শরীর অতি খারাপ, শক্তিহীন; তাই এত বড় বিরাট কাজ অতি শীঘ্র ভাগ্যে জুটিয়া উঠে নাই। এখন আল্লাহ্‌ পাকের মেহেরবানীতে মুসলিম সমাজের খেদমতে ইহা পেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। মক্কা শরীফের হাতীমে বসিয়া এবং মদীনা শরীফের রওযায়ে-আক্বদাসে বসিয়াও কিছু লিখিয়াছি। 'আল্লাহ্‌ পাক এই কিতাবখানা কবূল করুন এই আমার দো'আ এবং আশা করি, প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণও দো'আ করিতে ভুলিবেন না। এই পুস্তকে আমার বা আমার ওয়ারিশানের কোন স্বত্ব নাই ও থাকিবে না।

মূল কিতাবে প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গেই উহার দলীল এবং হাওয়ালা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উর্দু বেহেশ্‌তী জেওর কিতাব সব জায়গায়ই পাওয়া যায় এবং উর্দু ভাষাও প্রায় লোকেই বুঝে, এই কারণে আমি দলীল বা হাওয়ালার উল্লেখ করি নাই। যদি আবশ্যক বোধ হয়, পরবর্তী সংস্করণে দলীল ও হাওয়ালা দেওয়া হইবে। আমি একেবারে শব্দে শব্দে অনুবাদ করি নাই, খোলাছা মতলব লইয়া মূল কথাটি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছি। দুই একটি মাসআলা আমাদের দেশে গায়ের যরূরী মনে করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং কিছু মাসআলা যরূরত মনে করিয়া অন্য কিতাব হইতে সংযোজিত করিয়াছি। তা'ছাড়া বেহেশ্‌তী গওহরের সমস্ত মাসআলা বেহেশ্‌তী জেওরের মধ্যেই বিভিন্ন খণ্ডে ঢুকাইয়া দিয়াছি। কাহারও সন্দেহ হইতে পারে বিধায় বিষয়টি জানাইয়া দিলাম।

আরযগুযার
শামসুল হক
৩১/৭/৮৬ হিজরী

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম খণ্ড	
কতিপয় সত্য ঘটনা	১১
আক্বীদার কথা	২০
শির্ক ও কুফ্র	২৭
বেদ্'আত—কুপ্রথা	২৯
কতিপয় বড় বড় গুনাহ্	৩০
গুনাহ্র কারণে পার্থিব ক্ষতি, নেক কাজে পার্থিব লাভ	৩১
ওযূর মাসায়েল	৩২
ওযূ নষ্ট হইবার কারণ	৩৭
মা'যূরের মাসায়েল	৪০
গোছলের বয়ান	৪২
ওযূ ও গোছলের পানি	৪৫
কূপের মাসআলা	৪৮
ঝুটার মাসায়েল	৫০
তায়াম্মুমের মাসায়েল	৫১
মোজার উপর মছ্হে	৫৭
শরমের মাসায়েল	৫৯
গোছলের মাসায়েল	৬০
বে-গোছল অবস্থার হুকুম, বে-ওযূ অবস্থার মাসায়েল	৬৪
আহ্কামে শরা'র শ্রেণীবিভাগ	৬৫
পানি ব্যবহারের হুকুম	৬৭
পাক-নাপাকের আরও কতিপয় মাসআলা	৬৯
এল্ম শিক্ষার ফযীলত	৭৩
ওযূ-গোছলের ফযীলত	৭৭
ওযূর সময় পড়িবার দো'আ	৭৮
দ্বিতীয় খণ্ড	
নাজাছাত হইতে পাক হইবার মাসায়েল	৮১
এস্তেঞ্জার মাসায়েল	৮৫
নামায	৮৮
নামাযের ওয়াক্ত	৮৯
আযান	৯৩
আযান ও এক্কামত	৯৫
আযান ও এক্কামতের সুন্নত ও মোস্তাহাব	৯৭
বিভিন্ন মাসআলা	৯৯
নামাযের আহ্কাম বা শর্ত	১০০
ক্বেবলার মাসায়েল	১০৪
ফরয নামায পড়িবার নিয়ম	১০৯

বিষয় | পৃষ্ঠা

সজ্‌দা করিবার নিয়ম ১১০
নামাযের ফরয, নামাযের ওয়াজিব ১১৩
নামাযের কতিপয় সুন্নত ১১৭
কেরাআতের মাসায়েল ১১৮
ফরয নামাযের বিভিন্ন মাসায়েল ১১৯
পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নামাযের পার্থক্য ১২১
নামায টুটিবার কারণ ১২২
নামাযের মাক্‌রূহ এবং নিষিদ্ধ কাজ ১২৪
জমা'আতের কথা, জমা'আতের ফযীলত ও তাকীদ ১২৭
জমা'আত সম্বন্ধে ইমামগণের ফতওয়া,
জমা'আত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ ১৩২
জমা'আত তরক করার ওযর ১৩৩
জমা'আতের হেকমত ও উপকারিতা ১৩৪
জমা'আত ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ,
এক্‌তেদা ছহীহ্ হওয়ার শর্ত ১৩৫
জমা'আতের বিভিন্ন মাসায়েল ১৪০
ইমাম ও মুক্তাদী সম্পর্কে মাসায়েল ১৪১
কাতারের মাসায়েল ১৪৩
জমা'আতের নামাযের অন্যান্য মাসায়েল ১৪৪
জমা'আতে শামিল হওয়া ১৪৭
যে যে কারণে নামায ফাসেদ হয় ১৪৯
আরম্ভ নামায ছাড়িয়া দেওয়া যায় ১৫১
নামাযে ওযূ টুটিয়া গেলে ১৫২
বেৎর' নামায ১৫৪
সুন্নত নামায ১৫৬
তাহিয়্যাতুল ওযূ, এশ্‌রাকের নামায, চাশ্‌ত নামায ১৫৭
আউয়াবীন নামায, তাহাজ্জুদ নামায, ছালাতুত্ তসবীহ ১৫৮
নফল নামাযের আহ্‌কাম ১৫৯
নামাযের ফরয, ওয়াজিব-এর মাসআলা ১৬০
নামাযের কতিপয় সুন্নত ১৬১
তাহিয়্যাতুল মসজিদ ১৬২
এস্তেখারার নামায ১৬৩
ছালাতুত্ তওবা ১৬৪
ছালাতুল হাজাত, সফরে নফল নামায,
মৃত্যুকালীন নামায ১৬৫
তারাবীহ্‌র নামায ১৬৬
কুছুফ ও খুছুফ নামায ১৬৮
এস্তেস্কার নামায, ক্বাযা নামায ১৬৯
ছহো সজ্‌দা ১৭২
তেলাওয়াতের সজ্‌দা ১৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
পীড়িত অবস্থায় নামায	১৮১
মুসাফিরের নামায	১৮৩
ভয়কালীন নামায	১৮৯
জুমু'আর নামায	১৯১
জুমু'আর দিনের ফযীলত	১৯২
জুমু'আর দিনের আদব	১৯৫
জুমু'আর নামাযের ফযীলত এবং তাকীদ	১৯৬
জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ	১৯৮
জুমু'আর নামায ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ	১৯৯
খুৎবার মাসায়েল	২০০
হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খুৎবা	২০১
হযরতের খুৎবায় কতিপয় উপদেশ	২০২
জুমু'আর নামাযের মাসায়েল	২০৪
ঈদের নামায	২০৫
ক্বাবা শরীফের ঘরে নামায	২০৮
মৃত্যুর বয়ান	২০৯
মাইয়্যেতের গোছল	২১০
কাফন	২১৩
শিশুর কাফন	২১৪
জানাযার নামায	২১৬
দাফন	২২২
শহীদের আহ্কাম	২২৭
জানাযা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মাসআলা	২২৯
মসজিদ সম্বন্ধীয় কতিপয় মাসআলা	২৩১
আরও কতিপয় বিভিন্ন মাসআলা	২৩৩
হায়েয ও এস্তেহাযা	২৩৪
হায়েযের আহ্কাম	২৩৭
এস্তেহাযার হুকুম, নেফাস	২৩৯
নেফাস ও হায়েয ইত্যাদির আহ্কাম	২৪০
নাপাক জিনিস পাক করিবার উপায়	২৪১
নামাযের বয়ান, যৌবন কাল আরম্ভ বা বালেগ হওয়া, নামাযের ফযীলত	২৪২

তৃতীয় খণ্ড

রোযা	২৫২
রমযান শরীফের রোযা	২৫৩
ইয়াওমুশ্শক (সন্দেহের দিন), চাঁদ দেখা	২৫৪
ক্বাযা রোযা	২৫৫
মান্নতের রোযা	২৫৬
নফল রোযা	২৫৭
যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় বা হয় না	২৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাফ্‌ফারা	২৬২
সেহ্‌রী ও ইফ্‌তার	২৬৩
যে সব কারণে রোযা রাখিয়াও ভাঙ্গা যায়, যে কারণে রোযা না রাখা জায়েয	২৬৫
ফিদ্‌ইয়া	২৬৭
এ'তেকাফ	২৬৯
এ'তেকাফ সম্বন্ধে একটি মাসআলা	২৭২
এ'তেকাফের ফযীলত, ফেৎরা	২৭৩
রোযার ফযীলত	২৭৬
ইফ্‌তারের দো'আ	২৭৯
শবে-ক্বদরের ফযীলত	২৮০
তারাবীহ্‌ নামাযের ফযীলত	২৮১
দুই ঈদের রাতের ফযীলত, আশুরার রোযা, রজবের রোযা, শবে-বরাত	২৮২
যাকাত	২৮৩
যাকাত আদায় করিবার নিয়ম	২৮৮
জমিনে উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত	২৯০
যাকাতের মাছ্‌রাফ	২৯২
কোরবানী, কোরবানী করিবার নিয়ম	২৯৫
আক্বীক্বা	৩০০
দান-খয়রাতের ফযীলত	৩০১
হজ্জ	৩০৩
মদীনা শরীফ যিয়ারত	৩০৬
নযর বা মান্নত	৩০৭
কসম খাওয়া	৩১০
কসমের কাফ্‌ফারা	৩১২
বাড়ীঘরে না যাওয়ার কসম	৩১৩
পানাহার সম্বন্ধে কসম	৩১৪
কথা না বলার কসম, ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে কসম	৩১৫
রোযা-নামাযের কসম, কাপড় বিছানা ইত্যাদির কসম	৩১৬
কাফের বা মোর্‌তাদ হওয়া	৩১৭
যবাহ্‌	৩১৮
হালাল-হারামের বয়ান	৩১৯
নেশা পান	৩২০
সোনা বা রূপার পাত্র, পোশাক ও পর্দা	৩২১
পর্দা সম্বন্ধে আয়াত ও হাদীস	৩২৪
বিবিধ মাসায়েল	৩২৯
পতিত জিনিস পাওয়ার বয়ান	৩৩২
ওয়াক্‌ফ	৩৩৩
রাজনীতি	৩৩৪

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রঃ)

বংশ পরিচয়ঃ

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের মুজাফ্‌ফর নগর জিলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শহর থানাভবনে ফারূকী বংশের চারিটি গোত্রের লোক বসবাস করিতেন। তন্মধ্যে খতীব গোত্রই ছিল অন্যতম। থানাভবনে সুলতান শিহাবুদ্দীন ফর্‌রূখ-শাহ্ কাবুলী ছিলেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভীর ঊর্ধ্বতন পুরুষ। থানাভবনে এই বংশে বিশিষ্ট বুযুর্গ ও ওলীয়ে কামেলগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং হযরত থানভীর পিতৃকুল হইল ফারূকী। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী, শায়খ জালালুদ্দীন থানেশ্বরী, শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর প্রমুখ খ্যাতনামা বুযুর্গগণ এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হযরত মাওলানা থানভী (রঃ)-এর পিতা জনাব মুন্সি আবদুল হক ছাহেব ছিলেন একজন প্রভাবশালী বিত্তবান লোক। তিনি খ্যাতনামা দানশীল ব্যক্তি এবং ফার্সী ভাষায় একজন উচ্চস্তরের পণ্ডিতও ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি একজন বিচক্ষণ, দূরদর্শী এবং উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন।

তাঁহার মাতৃকুল ছিল 'আলাভী' অর্থাৎ, হযরত আলীর বংশধর। হযরত মাওলানা থানভীর জননী ছিলেন একজন দ্বীনদার এবং আল্লাহ্‌র ওলী। উচ্চস্তরের বুযুর্গ ও ওলীয়ে কামেল পীরজী ইমদাদ আলী ছাহেব ছিলেন তাঁহার মাতুল। তাঁহার মাতামহ (নানা) মীর নজাবত আলী ছাহেব ছিলেন ফার্সী ভাষায় সুপন্ডিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবন্ধকার। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল তাঁহার একটি বিশেষ গুণ। তিনি মাওলানা শাহ্ নেয়ায আহ্‌মদ বেরলভীর জনৈক বিশিষ্ট খলীফার মুরীদ ছিলেন। খ্যাতনামা বুযুর্গ হাফেয মোর্তজা ছাহেবের সহিতও তাঁহার আধ্যাত্মিক যোগ-সম্পর্ক ছিল বলিয়া তিনি বেলায়তের দরজায় পৌঁছেন। এমন উচ্চ মর্যাদাশীল পার্থিব ঐশ্বর্যে ধনবান, সাথে সাথে ধর্মপরায়ণতার সহিত নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল, এমন একটি সম্ভ্রান্ত ও প্রখ্যাত বংশে হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, জামেয়ে শরীঅত, বেদ্‌আত ও রসুমাৎ এর মূল উৎপাটনকারী শাহ্ ছুফী হাজী হাফেয হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থান্‌ভী চিশ্‌তী হানাফী জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা ছিলেন দূরদর্শী, দৃঢ়চেতা, সূক্ষ্মদর্শী, স্বাবলম্বী, সত্যপ্রিয়, খোদাভীরু, ন্যায়পরায়ণ প্রভৃতি মানবীয় গুণে গুণান্বিত। এই মহৎ গুণাবলী তিনি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) হইতে পৈতৃকসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। আর মা'রেফাত বা আধ্যাত্মিকরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করেন মাতৃকুল অর্থাৎ, হযরত আলী (রাঃ) হইতে।

জন্ম বৃত্তান্তঃ

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভীর জন্ম বৃত্তান্ত অলৌকিক ঘটনার সহিত জড়িত। তাঁহার পিতার কোন পুত্র সন্তানই জীবিত থাকিত না। তদুপরি তিনি এক দূরারোগ্য চর্মরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসকদের পরামর্শে এমন এক ঔষধ সেবন করেন যাহাতে তাঁহার প্রজনন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যায়। ইহাতে হাকীমুল উম্মতের মাতামহী নেহায়েত বিচলিত

হইয়া পড়েন। একদা তিনি হাফেয গোলাম মোর্তজা ছাহেব পানিপতীর খেদমতে এ বিষয়টি আরয করেন। হাফেয ছাহেব ছিলেন মজ্যূব। তিনি বলিলেনঃ "ওমর ও আলীর টানাটানিতেই পুত্র-সন্তানগুলি মারা যায়। এবার পুত্র-সন্তান জন্মিলে হযরত আলীর সোপর্দ করিয়া দিও। ইন্‌শাআল্লাহ্ জীবিত থাকিবে।" তাঁহার এই হেঁয়ালী কেহই বুঝিতে পারিলেন না। পূর্ণ কথার সারমর্ম একমাত্র মাওলানার বুদ্ধিমতী জননীই বুঝিলেন আর তিনি বলিলেন, হাফেয ছাহেবের কথার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, ছেলেদের পিতৃকুল ফারূকী, আর আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর। এযাবৎ পুত্র-সন্তানদের নাম রাখা হইতেছিল পিতার নামানুকরণে, অর্থাৎ হক্ শব্দ যোগে রাখা হইয়াছিল। যেমন আবদুল হক, ফজলে হক ইত্যাদি। এবার পুত্র-সন্তান জন্মিলে মাতৃকুল অনুযায়ী নাম রাখিতে—অর্থাৎ আমার ঊর্ধ্বতন আদিপুরুষ হযরত আলী (রাঃ)-এর নামের সহিত মিল রাখিয়া নামানুকরণ এর কথা বলিতেছেন। ইহা শুনিয়া হাফেয সাহেব সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, বাহ্‌বা! মেয়েটি বড়ই বুদ্ধিমতী বলিয়া মনে হয়। আমার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল। ইহার গর্ভে দুইটি ছেলে হইবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ উভয়ই বাঁচিয়া থাকিবে এবং ভাগ্যবান হইবে। একজনের নাম রাখিবে আশ্‌রাফ আলী, অপরজনের নাম রাখিবে আকবর আলী। একজন হইবে আমার অনুসারী, সে হইবে আলেম ও হাফেয। অপরজন হইবে দুনিয়াদার। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। আল্লাহ্ পাক এক বুযুর্গের দ্বারা হযরত থানভী মাতৃ-গর্ভে আসার পূর্বে অর্থাৎ আলমে আরওয়াহে থাকাকালীন তাঁহার নাম রাখাইয়া দিলেন। আল্লাহ্ পাকের কত বড় মেহেরবানী! কত বড় সৌভাগ্যের কথা!

জন্ম ঃ

হিজরী ১২৮০ সনের ৫ই রবিউস্‌সানী বুধবার ছোব্‌হে ছাদেকের সময় হাকীমুল উম্মত জন্মগ্রহণ করেন। হাফেয গোলাম মোর্তজা সাহেবের নির্দেশক্রমে নবজাতের নাম রাখা হইল "আশ্‌রাফ আলী।" তাঁহার জন্মের ১৪ মাস পরে তাঁহার ছোট ভাই আকবর আলীর জন্ম হয়। থানাভবনের অধিবাসী বলিয়া তাঁহাকে থানভী বলিয়া অবিহিত করা হয়।

বাল্যকাল ঃ

মাওলানার পাঁচ বৎসর বয়সকালে তাঁহার পুণ্যশীলা স্নেহময়ী জননী পরলোক গমন করেন; সুতরাং শিশুকালেই দুই ভাই মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু পিতা জননীর ন্যায় স্নেহমমতায় উভয় শিশুর লালন-পালন ও তা'লীম তরবীয়তের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি উভয়কেই খুব স্নেহ করিতেন। স্বহস্তে গোসল করাইতেন, স্বহস্তে খাওয়াইতেন। পিতার অত্যধিক আদর যত্নের কারণে শিশুরা মায়ের বিচ্ছেদ-বেদনার কথা কখনও অনুভব করিতেই পারে নাই।

শৈশব হইতেই হযরত হাকীমুল উম্মতের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার ছিল পাক-পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তিনি কখনও বাহিরের ছেলেদের সহিত খেলাধুলা করিতেন না। ছোট ভাই আকবর আলীকে নিয়া নিজ বাড়ীর সীমার মধ্যে খেলাধুলা করিতেন। খেলাধুলার সময় ধুলাবালি গায়ে বা কাপড়ে লাগিতে দিতেন না। সময়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়া উভয় ভ্রাতা আনন্দ উপভোগ করিতেন। হযরত মাওলানা বাল্যকালে নেহায়েত শান্ত ও সুশীল ছিলেন। তাঁহার সু-মধুর ব্যবহারে বিধর্মীরাও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিত।

সাধারণতঃ ছেলেরা মসজিদে বা উৎসব উপলক্ষে শিরনী-মিঠাই ইত্যাদি পাইবার সুযোগ গ্রহণ করে। হযরত মাওলানার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী পিতা ইহা আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি বরং

॥ তিন ॥

বাজার হইতে মিঠাই আনিয়া দুই পুত্রের হাতে দিয়া বলিতেন, মিঠাইয়ের জন্য মসজিদে যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা। হযরত হাকীমুল উম্মতের মেধাশক্তিও ছিল অসাধারণ। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিনের পাঠ সহজেই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। কাজেই পিতা বা ওস্তাদগণ কেহই তাঁহাকে তিরস্কার বা র্ভৎসনা করার সুযোগ পাইতেন না ; বরং ওস্তাদগণ তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন।

তিনি ধর্মকর্মে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। এজন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিত। কেহই তাঁহার কাজের প্রতিবাদ করিত না। এমনকি অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করিত না।

দেওয়ালী পূজার সময় মীরাটের ছাউনী বাজারের রাস্তার দুই ধারে সারি বাঁধিয়া অসংখ্য প্রদীপ জ্বালান হইত। তাঁহারা দুই ভাই রূমালের সাহায্যে বাতাস দিয়া একাধারে সকল প্রদীপ নিভাইয়া দিতেন। এজন্য কেহই তাঁহাদের কিছু বলিত না; এমনকি হিন্দুরাও কিছু বলিত না।

তিনি খেলার মধ্যে নামাযের অভিনয় করিতেন। সমপাঠীদের জুতাগুলিকে কেব্‌লা মুখে সারি করিয়া সাজাইতেন এবং একটি জুতা সারির সম্মুখে স্থাপন করিয়া সঙ্গীদেরকে বলিতেন, দেখ দেখ, জুতাও জামাতে নামায পড়ে। এই বলিয়া বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেন। ইহাতে বুঝা যায়, জামাতে নামায পড়ার প্রতি তাঁহার অন্তরে কত আকর্ষণ ও ভালবাসা ছিল। তিনি খেলাধুলায় অযথা সময় নষ্ট করিতেন না, বরং দো'আ দুরূদ পড়িতে থাকিতেন।

তাঁহার বয়স যখন ১২/১৩ বৎসর, তখন তিনি শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। গভীর রাত্রে একাকী নামায পড়িতে দেখিয়া তাঁহার চাচীআম্মা বলিতেন, তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সময় তোমার এখনও হয় নাই, বড় হইলে পড়িবে। ইহাতে কোন ফল হইল না ; বরং তিনি রীতিমত তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে রহিলেন। চাচীআম্মা নিরুপায় হইয়া তাহাজ্জুদ নামাযে মশগুল থাকাকালীন তাঁহাকে পাহারা দিতেন। কারণ, ছেলে মানুষ গভীর রাত্রে একাকি ভঁয় পাইতে পারে।

ছোটবেলা হইতেই তিনি ওয়ায বা বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সময় সময় সওদা আনিবার জন্য তাঁহাকে বাজারে যাইতে হইত। পথিমধ্যে কোন মসজিদ দেখিতে পাইলে উহাতে ঢুকিয়া পড়িতেন এবং মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবার ন্যায় কিছু পড়িতেন, অথবা কিছু ওয়ায নছীহত করিতেন। এরূপে তিনি ছোট বেলায়ই ওয়াযের ক্ষমতা অর্জন করিতে সক্ষম হন। ফলে তিনি উত্তরকালে বিখ্যাত ওয়ায়েয বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরত হাকীমুল উম্মত যখন সবেমাত্র মক্তবের ছাত্র তখন কুত্‌বুল আকতাব হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ছাহেবের খাছ খলীফা হযরত শায়খ মুহাম্মদ মুহাদ্দেস (ইনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর পীর-ভাই) বলিতেন, এই বালক উত্তরকালে আমার স্থলাভিষিক্ত হইবে। হযরত হাকীমুল উম্মত বাল্যকালে যখন গৃহের বাহিরে যাইতেন, তখন আকাশের মেঘমালা তাঁহাকে ছায়া দিত। আল্লাহ্‌র ওলী এবং যথার্থ অর্থে "নায়েবে রসূল" হওয়ার ইহাই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

একটি স্বপ্ন ঃ

হযরত হাকীমুল উম্মত বাল্যকালে একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন, স্বপ্নে আমি দেখিলাম, আমি মীরাটের যে বাড়ীতে থাকিতাম উহাতে উঠিবার দুইটি সিঁড়ি ছিল, একটি বড় ও একটি ছোট। "আমি দেখিলাম, বড় সিঁড়িটির একটি পিঞ্জিরায় দুইটি সুন্দর কবুতর। অতঃপর যেন চারি দিক সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাইয়া গেল। তখন কবুতর দুইটি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল ঃ আমাদের পিঞ্জিরাটিকে আলোকিত করিয়া দিন। উত্তরে আমি বলিলাম, তোমরা নিজেরাই

॥ চার ॥

আলোকিত করিয়া লও। তখন কবুতরদ্বয় নিজেদের ঠোঁট পিঞ্জিরার সহিত ঘর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে খাঁচাটি এক উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া গেল।"

কিছুদিন পর এই স্বপ্নের কথা তিনি তাঁহার মামা ওয়াজেদ আলী সাহেবের নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি ইহার তা'বীর এই করিলেন যে, কবুতর দুইটির একটি হইল 'রূহ' অপরটি 'নফ্স'। মোজাহাদা বা সাধ্য-সাধনার মাধ্যমে তাহাদিগকে নূরানী করিতে আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু তোমার কথায় তাহারা নিজেরাই নিজেদেরকে নূরানী করিয়া লইল। ইহাতে বুঝা যায়—রিয়াযত ও মোজাহাদা ব্যতিরেকেই আল্লাহ্ পাক তোমার রূহ্ ও নফ্সকে উজ্জ্বল করিয়া দিবেন। কালে এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

শৈশব হইতেই তিনি ছিলেন নাযুক তবিয়তের। তিনি কাহারো নগ্ন পেট দেখিতে পারিতেন না। অনাবৃত পেট দেখামাত্র তাঁহার বমি হইয়া যাইত। যে গৃহে কোন প্রকার তীব্র সুগন্ধ থাকিত তথায় তিনি ঘুমাইতে পারিতেন না আর দুর্গন্ধের তো কোন কথাই নাই। কোন জিনিস এলোমেলো দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথা ব্যাথা আরম্ভ হইয়া যাইত।

শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

হযরত মাওলানা থানভী (রঃ) কোরআন মজীদ ও প্রাথমিক উর্দু, ফার্সী কিতাব মীরাটে শিক্ষা লাভ করেন। পরে থানাভবন আসিয়া তদীয় মাতুল ওয়াজেদ আলী সাহেবের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর আরবীতে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ১২৯৫ হিজরীতে বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান "দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসায়" গমন করেন। মাত্র পাঁচ বৎসরেই দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ১৯ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে এল্‌মে হাদীস, এল্‌মে তফ্সীর, আরবী সাহিত্য, অলংকার শাস্ত্র, সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র, সৌরবিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র, ইসলামী আইন শাস্ত্র, নৈতিকচরিত্রবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান, মূলনীতি শাস্ত্র, প্রকৃতিবিজ্ঞান উদ্ভিদ ও প্রাণীবিজ্ঞান, ইতিহাস ও যুক্তিবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি বাইশটি বিষয়ের জটিল কিতাবসমূহ অতি কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি "জের ও বম" নামে একটি মূল্যবান ফার্সী কাব্য রচনা করেন।

দেওবন্দে দুইটি স্বপ্ন ঃ

১। একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, 'একটি কূপ হইতে রৌপ্য স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে ধাবিত হইতেছে'।

২। আর একবার তিনি দেখেন জনৈক বুযুর্গ ও কোন এক দেশের গভর্ণর, এই দুই ব্যক্তি তাঁহাকে দুইখানা পত্র লেখেন। উভয় পত্রেই লেখা ছিল যে, আমরা আপনাকে মর্যাদা প্রদান করিলাম।" ঐ পত্রের একটিতে হযরত নবী করীম (দঃ)-এর নামের মোহর অঙ্কিত ছিল। উহার লেখাগুলি বেশ স্পষ্ট ও সুন্দর ছিল। অপর পত্রের মোহরের ছাপ অস্পষ্ট থাকায় পড়া যাইতেছিল না। হযরত মাওলানা এই উভয় স্বপ্ন দেওবন্দের প্রধান অধ্যক্ষ ও পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছাহেবের নিকট ব্যক্ত করেন। প্রথম স্বপ্নের তা'বীরে মাওলানা বলিলেন, দুনিয়ার ধন-দৌলত তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে, অথচ তুমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিবে না। দ্বিতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলিলেনঃ ইন্‌শাআল্লাহ্ দ্বীন ও দুনিয়ায় তোমার যথেষ্ট মান-সম্মান হইবে। এ সময় উক্ত ওস্তাদ ছাহেব তাঁহার দ্বারা ফত্ওয়া লিখাইতেন। ওস্তাদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি ওস্তাদের যথেষ্ট খেদমত করিতেন। ফলে তিনি ছাত্র

॥ পাঁচ ॥

জীবনে "আশ্‌রাফুত্তালাবা" এবং কর্ম-জীবনে "আশ্‌রাফুল ওলামা" নামে খ্যাতি লাভ করেন। যেমনটি নাম তেমনি কাম।

দারুল উলুমের অধ্যয়ন শেষে কৃতী ছাত্রদের যথারীতি পাগড়ী পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বৎসর কুত্‌বে আ'লম হযরত মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গোহী ছাহেব (রঃ) স্বীয় পবিত্র হস্তে হযরত মাওলানা থানভীর মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দিলেন। এ সময় মাদ্রাসার ওস্তাদদের নিকট তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা শুনিয়া হযরত গঙ্গোহী ছাহেব তাঁহাকে কতিপয় কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন। হযরত মাওলানা ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। এই প্রকার দুর্বোধ্য প্রশ্নের সঠিক উত্তর শুনিয়া হযরত গঙ্গোহী ছাহেব মুগ্ধ হন এবং তাঁহার জন্য দো'আ করেন। ফলে তিনি শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন জগৎবরেণ্য আলেম হিসাবে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়েন।

অধ্যাপনা ঃ

পাঠ্য জীবন শেষে ১৩০১ হিজরীতে কানপুর ফয়েযে 'আম মাদ্রাসায় মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেন। হাদীস, তফ্‌সীর ও উচ্চস্তরের কিতাবসমূহ কৃতিত্বের সহিত পড়াইতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ায নছীহতের মাধ্যমেও জনগণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন। এদিকে মধুর কণ্ঠস্বর গুরুগম্ভীর সম্বোধন, মার্জিত ভাষা ও অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গী, অপর দিকে কোরআন হাদীসের সরল ব্যাখ্যা, মা'রেফাত ও তাছাউফের সূক্ষ্ম বিষয়ের সহজ সমাধান; মোটকথা, ওয়াযের মাহ্‌ফিলে অফুরন্ত ভান্ডার হইতে অভাবনীয় মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য বিকশিত হইতে থাকিত। ফলে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইত। তাঁহার ভাষণ সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত।

জনসমাজে হযরত মাওলানার জনপ্রিয়তা দেখিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের মধ্যে আর্থিক স্বার্থ লাভের বাসনা জাগরিত হয়। তাঁহারা তাঁহার ওয়ায মাহ্‌ফিলে মাদ্রাসার জন্য চাঁদা আদায় করার কথা হযরত মাওলানার নিকট ব্যক্ত করিলেন। হযরত মাওলানা এই উপায়ে চাঁদা সংগ্রহ করা এল্‌মী মর্যাদার খেলাফ ও না-জায়েয মনে করিতেন। তাই তিনি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের আবেদন রক্ষায় অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে কর্তৃপক্ষের মধ্যে পরস্পর নানাপ্রকার কানাঘুষা আরম্ভ হইল। এ কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি মাদ্রাসার কার্যে ইস্তিফা দেন এবং সরাসরি বাড়ী চলিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। এল্‌মে দ্বীন ও দর্শন শাস্ত্রে এমন বিজ্ঞ ব্যক্তি দুর্লভ ভাবিয়া জনাব আবদুর রহ্‌মান খান ও জনাব কেফায়াত উল্লাহ্‌ সাহেবদ্বয় মাসিক ২৫টাকা বেতনে টপকাপুরে অপর একটি মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। এল্‌মে দ্বীনের খাতিরে হযরত মাওলানা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হন। টপকাপুর জামে মসজিদের নামানুসারে মাদ্রাসার নাম রাখিলেন জামেউল উলুম। আজও কানপুরে এই মাদ্রাসা বিদ্যমান আছে এবং তাঁহার স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।

তিনি একাধারে চৌদ্দ বৎসর জামেউল উলুমে এল্‌মে দ্বীন শিক্ষাদানে মশ্‌গূল থাকেন। অতঃপর ১৩১৫ হিজরীর ছফর মাসে স্বীয় মুর্শিদ শায়লুল আরব ও আ'জম কুত্‌বে আ'লম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্‌ মোহাজেরে মক্কী ছাহেবের অনুমতিক্রমে কানপুরের সংস্রব ত্যাগ করিয়া থানাভবনে আসিয়া উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করেন।

॥ ছয় ॥

বুযুর্গগণের খেদমতে মাওলানা থানভী ঃ

আল্লাহ্‌র ওলীগণের প্রতি হযরত হাকীমুল উম্মতের ভক্তি ও মহব্বত ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি বলিতেন, আল্লাহ্‌র ওলীদের নামের বরকতে রূহ্ সজীব এবং অন্তরে নূর পয়দা হয়। তিনি প্রায়ই বলিতেন, তরীকতের পথে আমি রিয়াযত ও মোজাহাদা করি নাই। আল্লাহ্ পাক যাহাকিছু দান করিয়াছেন সমস্তই শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ও বুযুর্গানে দ্বীনের আন্তরিক দো'আ ও তাওয়াজ্জুর বরকতে পাইয়াছি।

যে মজযুব হাফেয গোলাম মোর্‌তাজার দো'আয় হযরত মাওলানার ইহজগতে আবির্ভাব হয় এবং তাঁহার নামকরণ, "আশ্‌রাফ আলী" করেন, তিনি হযরত মাওলানাকে অত্যধিক স্নেহ করি-তেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার অন্তরে খোদাপ্রেম বদ্ধমূল হওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ বটে।

যখন দেওবন্দে হযরত মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গোহী কুদ্দিসা সির্‌রুহু ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার পবিত্র নূরানী চেহারা দর্শনমাত্র তাঁহার হাতে বায়'আত হওয়ার প্রবল আকাঙক্ষা হযরত মাওলানা থানভীর অন্তরে জাগরিত হয়; কিন্তু ছাত্র জীবনে মুরীদ হওয়া সমীচীন নহে বলিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই। ১২৯৯ হিজরীতে হজরত মাওলানা গঙ্গোহী ছাহেব (রঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমনকালে মাওলানা থানভী কুত্‌বুল আক্‌তাব হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কী ছাহেবের খেদমতে পত্রযোগে আবেদন করিলেন, তাঁহাকে বায়'আত করিবার জন্য যেন গঙ্গোহী ছাহেবকে বলিয়া দেন। যথাসময় পত্রের উত্তর আসিল। পত্রে লিখা ছিল—হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) স্বয়ং তাঁহাকে মুরীদ করিয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর।

হযরত হাজী ছাহেব যখন মক্কায় হিজরত করেন, তখন হযরত থানভী (রঃ) ভূমিষ্ঠই হন নাই। অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গেলে স্থানকালের যাবতীয় পর্দা অপসারিত হইয়া যায়। আ'রেফ বিল্লাহ্ হযরত হাজী ছাহেব পবিত্র মক্কায় থাকিয়াই থানাভবনের এই মহামণিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি হযরত মাওলানার পাঠ্যজীবনে তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন, যখন তুমি হজ্জ করিতে আসিবে, তখন তোমার বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়া আসিও।

১৩০১ হিজরী শাওয়াল মাস। হাকীমুল উম্মত কানপুর জামেউল উলুম মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করিতেছেন। তাঁহার পিতা পবিত্র হজ্জ ক্রিয়া পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্নেহের পুত্র হাকীমুল উম্মতও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। যথাসময়ে পিতা-পুত্র পবিত্র মক্কাভূমিতে হযরত হাজী ছাহেবের খেদমতে উপনীত হইলেন; ইহাই হইল তাঁহার সহিত হযরত মাওলানার প্রথম সাক্ষাৎকার। হাজী সাহেব হযরত মাওলানার দর্শন লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং হাতে হাতে তাঁহার বায়'আত করিলেন। তখন তাঁহার পিতাকেও বায়'আত করিলেন। পিতা-পুত্র উভয়ে এক মুর্শিদের হাতে বায়'আত হইলেন। হজ্জের পর হযরত হাজী ছাহেব, হাকীমুল উম্মতকে ছয় মাস তাঁহার খেদমতে অবস্থান করিতে বলিলেন; কিন্তু পিতার মন স্নেহের পুত্রকে একা দূরদেশে রাখিয়া যাইতে চাহিল না। অগত্যা হযরত হাজী ছাহেব বলিলেন, পিতার তাবেদারী অগ্রগণ্য, এখন যাও, আগামীতে দেখা যাইবে।

হজ্জ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কানপুরে অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা, তবলীগ, ফত্‌ওয়া প্রদান ইত্যাদি কার্যে পুনরায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এদিকে মুর্শিদের সহিত পত্র বিনিময় হইতে লাগিল। তিনি প্রায় সহস্রাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ সাত ॥

১৩০৭ হিজরী হইতে হযরত মাওলানার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পার্থিব সংস্রব অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তাঁহার মন ধাবিত হইল। হযরত হাজী ছাহেবের খেদমতে মাদ্রাসার সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। উত্তর আসিল, আল্লাহ্‌র বন্দাদেরকে দ্বীনের ফয়েয পৌঁছান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়। শ্রদ্ধেয় মুর্শিদের পরামর্শ শিরোধার্য। তাই এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা প্রদানের কাজ চালু রাখিলেন। এইভাবে তিনটি বৎসর অতীত হওয়ার পর হিজরী ১৩১০ সালে হযরত মাওলানার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও মনকে আর প্রবোধ দিতে পারিলেন না। আর মুর্শিদ বলিয়াছিলেন, "মিয়া আশ্‌রাফ আলী, ছয় মাস আমার নিকট থাক"। মুর্শিদের সেই আহ্বান তৎক্ষণাৎ হযরত মাওলানার অন্তরে দাগ কাটিয়া গিয়াছিল। ঐ একই কথা বার বার তাঁহার অন্তরে তোলপাড় করিতে লাগিল। কি অদম্য আকর্ষণ! অবশেষে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর মক্কা শরীফে গমনের অনুমতিপত্র আসিল। স্নেহের মুরীদ প্রাণপ্রিয় মুর্শিদের খেদমতে পৌঁছিয়া স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং মুর্শিদের পদতলে নিজের সত্তা বিলীন করিয়া দিলেন। মুর্শিদও আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই পীর ও মুরীদ একই রং ধারণ করিলেন। হযরত হাজী ছাহেব নিঃসংকোচে ফরমাইতেন, মিয়া আশরাফ! তুমি তো সম্পূর্ণ আমার তরীকার উপর। হযরত মাওলানার কোন লিখা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে বলিতেন, আরে তুমি তো আমারই মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছ।

হযরত হাজী ছাহেবের খেদমতে মা'রেফত সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জানিতে চহিলে তিনি হযরত মাওলানার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেন, একে জিজ্ঞাসা কর, সে ইহা ভালরূপে বুঝিয়াছে। ইহার কারণ, মুর্শিদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মুরীদের আধ্যাত্মিক উন্নতি পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিয়াছে। ছয় মাসের মাত্র এক সপ্তাহ বাকী থাকিতে হযরত মাওলানা হাজী সাহেবের খেদমত হইতে বিদায়ের অনুমতি চাহিলেন তখন হযরত হাজী ছাহেব তাঁহাকে খাছ করিয়া দুইটি অছিয়ত করিলেন ১। মিয়া আশ্‌রাফ আলী! হিন্দুস্তানে গিয়া তুমি একটি বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হইবে, তখন ত্বরা করিও না। ২। কানপুর হইতে মন উঠিয়া গেলে অন্য কোথাও সম্পর্ক স্থাপন করিও না; আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া থানাভবনেই অবস্থান করিও। হিজরী ১৩১১ সনে প্রিয় জন্মভূমি থানাভবনের আহ্বান হযরত মাওলানাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। অবশেষে শ্রদ্ধেয় মুর্শিদের ওছিয়ত ও আধ্যাত্মিক সম্পদসহ থানাভবনে আসিয়া হাযির হইলেন।

হযরত হাজী ছাহেব কেব্‌লা হযরত মাওলানাকে এত অধিক স্নেহ করিতেন যে, কেহ মাওলানার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে নাতি বলিয়া পরিচয় দিতেন। অত্যধিক স্নেহবশতঃ তিনি তাঁহাকে 'মিয়া আশ্‌রাফ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একবার মুর্শিদে আ'লা প্রিয়তম শিষ্যকে স্বীয় খাছ কুতুবখানা দিতে চাহিয়াছিলেন। হযরত মাওলানা আরয করিলেন, এই সব কিতাব তো আধ্যাত্মিকতার খোলস মাত্র, অনুগ্রহ করিয়া ইহার পরিবর্তে আমার সীনায় কিছু দান করুন। প্রিয়তম শিষ্যের এমন গভীর তত্ত্বপূর্ণ আব্‌দার শুনিয়া মুর্শিদ বলিলেন, হাঁ, সত্য বটে, কিতাবে আর কী আছে? সবই তো সীনায় রহিয়াছে। মুর্শিদের আন্তরিক দো'আয় মাওলানার অন্তঃকরণ এল্‌মে মা'রেফাতে ভরপুর হইয়া গেল। বিদায় গ্রহণকালে হযরত হাজী ছাহেব মুরাক্বাবা করিয়া বলিলেন, আশ্চর্য! ইহার সম্মান কাসেম ও রশীদকে অতিক্রম করিয়া গেল। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

॥ আট ॥

মুর্শিদের খেদমত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হযরত মাওলানা দেশে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। হযরত হাজী ছাহেব হাজীদের মারফৎ বলিতেন, "আমার মিহিন মৌলভীকে সালাম বলিও।" এই মিহিন শব্দে হযরত মাওলানার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতারূপ গুণাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। পীর ও মুরীদের কী অপূর্ব সম্পর্ক, কী মায়া, কী ভক্তি!

হযরত মাওলানা দেশে ফিরিবার সময় কানপুরে বখ্‌শী নযীর হাসান ছাহেব স্বপ্নে দেখিলেন, হযরত মাওলানা জাহাজ হইতে অবতরণ করিতেছেন, আর সারা হিন্দুস্তান তাঁহার দেহের নূরে নূরানী হইয়া উঠিয়াছে। কালে এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল।

দেশে আসিয়া পুনরায় তিনি জামেউল উলুমে অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে মা'রেফাতের আলো বিচ্ছুরিত হইল। এক কথায় মাদ্রাসা যিক্‌র-আয্‌কারের খানকায় পরিণত হইল। বহু অমুসলিমও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল। চৌদ্দ বৎসর অধ্যাপনার পর হিজরী ১৩১৫ সালে কানপুর হইতে থানাভবনে আসিয়া খানকায়ে এমদাদিয়ার আবাদে মশ্‌গূল হইলেন। হযরত মাওলানার থানাভবনে আগমনের সংবাদে হযরত হাজী ছাহেব নেহায়ত খুশী হইয়া লিখিলেনঃ 'আপনার থানাভবন যাওয়া অতি উত্তম হইয়াছে। আশা করি, আপনার দ্বারা বহু লোকের যাহেরী-বাতেনী উপকার হইবে এবং আপনি আমাদের মাদ্রাসা ও মসজিদ পুনঃ আবাদ করিবেন। আপনার জন্য দো'আ করিতেছি।' —মকতুবাত

তিনি পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় থানাভবনে আসিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বিরাট কর্ম সম্পাদন করাইলেন। পাক-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দলে দলে বহু আলেম-ওলামা, অর্ধ শিক্ষিত; সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার দরবার হইতে ফয়েয হাসেল করিবার জন্য সমবেত হইত এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী তাহা লাভ করিত। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভীর ফয়েয ও বরকত ছিল বিভিন্নমুখী ও সুদূরপ্রসারী। সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তাহা প্রকাশ করা সুদুরপরাহত। তাঁহার মধ্যে যে সব গুণাবলী বিদ্যমান ছিল, তাহা কয়েকজনে মিলিতভাবে অর্জন করাও সম্ভব নহে। তিনি একাধারে ছিলেন কোরআন পাকের অনুবাদক ও কোরআনের ব্যাখ্যাকার, মুহাদ্দিস, ফকীহ্, এবং একজন লেখক। তিনি প্রায় এক সহস্র কিতাব রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক কিতাব বহু ভলিউমবিশিষ্ট তাঁহার রচিত প্রায় কিতাবই তাছাওউফে ভরপুর। তফসীরকার হিসাবে তিনি জগৎবিখ্যাত। তাঁহার কৃত তফসীর "তফ্‌সীরে বয়ানুল কোরআন" অদ্বিতীয়। ওয়ায়েয হিসাবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁহার তথ্যপূর্ণ বিভিন্নমুখী ওয়াযসমূহ ওয়াযের সময় সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হইত এবং পত্র-পত্রিকায়ও মুদ্রিত হইত। পরে এইগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলী ও ওয়াযসমূহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত কোন কিতাবের স্বত্ব সংরক্ষিত নহে। যে কেহ ছাপিতে পারে। কী অপূর্ব স্বার্থ ত্যাগ! বাংলা ভাষায়ও তাঁহার রচিত অসংখ্য কিতাব মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে। এল্‌মে দ্বীনের ওস্তাদ হিসাবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। অসংখ্য আলেমে হক্কানী তাঁহার হাতে গড়া। এতদ্ভিন্ন তিনি ছিলেন হক্কানী পীর ও মুর্শিদে কামেল।

তাছাওউফের দিক দিয়া তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদে মিল্লাত বা যুগপ্রবর্তক। এক কথায় তিনি ছিলেন মুজতাহিদ—যুগসংস্কারক। অনেক ছুফী, পীর এল্‌মে তাছাওউফকে বিকৃত করিয়া

তুলিয়াছিল। তিনি এই বিকৃত তাছাওউফকে ত্রুটিযুক্ত বশতঃ জগৎবাসীর সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহারই সূক্ষ্ম ব্যবস্থা ও চিকিৎসা দ্বারা তাছাওউফের ভ্রান্ত পদ্ধতির সংস্কার সাধিত হইয়াছে। বহু যোগ্য মুরীদকে খেরক্কায়ে খেলাফত দান করিয়াছেন। তাঁহার খলীফাগণের লক্ষ লক্ষ মুরীদ শুধু পাক-ভারতেই নহে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। (হায়াতে আশ্‌রাফ, সীরাতে আশ্‌রাফ দ্রঃ)

চির বিদায়ঃ

১৯শে জুলাই ১৯৪৩ ইং সোমবার দিবাগত রাত্রে এশার নামাযের পর তিনি ইহ্‌ধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল বিরাশী বৎসর তিন মাস এগার দিন। এন্তেকালের দুই দিন পূর্বে পাঞ্জাবের এক মসজিদের ঈমাম (সৈয়দ আনোয়ার শাহ্ কাশমীরীর শাগরিদ) স্বপ্নে দেখেন, আকাশপ্রান্তে ধীরে ধীরে লিখা হইতেছে ○ قد كسر جناح الاسلام (ইসলামের বাহু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।)

কারামতঃ

১। এক ব্যক্তি হাকীমুল উম্মতের জন্য আখের গুড় হাদিয়া স্বরূপ আনিল, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। পরে জানা গেল যে, ঐ গুড় ছিল যাকাতের।

২। কেহ হযরত হাকীমুল উম্মতের খেদমতে এছলাহের জন্য আসিলে তিনি তাহার গোপন রোগ ধরিতে পারিতেন এবং ঐ হিসাবে তাহার এছলাহ্ করিতেন। তাঁহার নিকট কোন রোগ গোপন রাখার উপায় ছিল না।

৩। তাঁহার কোন ভক্ত রোগারোগ্যের জন্য দো'আ চাহিয়া পত্র লিখিলে লেখার সঙ্গে সঙ্গে নিরাময় হইয়া যাইত।

৪। তাঁহার জনৈক খলীফা বলেন, একদা আলীগড়ের শিল্প-প্রদর্শনীতে দোকান খুলিয়াছিলাম। মাগরিবের পর প্রদর্শনীর কোন এক ষ্টলে আগুন লাগে। আমি একাকী আমার মালপত্র সরাইতে সক্ষম হইতেছিলাম না। আকস্মাৎ দেখিলাম, হযরত হাকীমুল উম্মত আমার কাজে সাহায্য করিতেছেন। তাই আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। পরে জানিলাম, হযরত তখন থানাভবনেই অবস্থান করিতেছিলেন।

৫। একবার তিনি লায়ালপুর ষ্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষায় ছিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার চাকরকে ষ্টেশনের বাতি জ্বালাইয়া হযরতের কামরায় দিতে আদেশ করিলেন। হযরত আল্লাহ্ পাকের দরবারে পরের হক নষ্ট করা হইতে বাঁচিবার দো'আ করিলেন। মাষ্টারের মন মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি চাকরকে তাহার নিজস্ব বাতি জ্বালাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

৬। কানপুরে কলিমুল্লাহ্ নামে এক ব্যক্তির হামেশা অসুখ লাগিয়া থাকিত। আরবী 'কিল্‌ম' (অর্থ জখম) হইতে এই কলিমুল্লাহ্ নামের উৎপত্তি বলিয়া হযরত তাঁহার নাম রাখিয়া দিলেন ছলিমুল্লাহ্। অতঃপর ঐব্যক্তির কোন অসুখ হইত না।

৭। একবার হযরত থানভী (রঃ) কানপুরে বাশমণ্ডীতে ওয়ায করিতেছিলেন। হঠাৎ ঝড় আসিল। হযরত তাঁহার শাহাদাত অঙ্গুলীতে ফুক দিয়া ঘুরাইলেন। তৎক্ষণাৎ ঝড়ের মোড় ঘুরিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। ওয়াযের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল।

॥ দশ ॥

৮। মাওলানা হাকীম আবদুল হক বলেন, যে-ব্যক্তি হযরতের দরবারে খাঁটি নিয়তে বসিত তাহার দিল আপনা হইতে পরিষ্কার হইয়া যাইত এবং দ্রুত আখেরাতের দিকে মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িত।

একটি স্বপ্ন ঃ

৯। একবার হযরত মাওলানা যাফর আহ্‌মদ ওসমানী সাহেব স্বপ্নে দেখিলেন, মদীনা শরীফের এক বুযুর্গ তফ্‌সীরে বয়ানুল কোরআনের তা'রীফ করিতে করিতে বলিলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার বলিতেছেন, অমুক আয়াতের তফ্‌সীর বয়ানুল কোরআনে এইভাবে লিখা আছে। হযরত ওসমানী সাহেব বলেন, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে আমি হযরত (দঃ)-এর এই উক্তি নিজ কানে শুনিয়াছি। স্বপ্নে আমার ইহাও অনুভূত হইল যে, নবী করীমের দরবারে "বয়ানুল কোরআন" এরূপ মকবুল হওয়ার কারণ, হযরত মাওলানার পরিপূর্ণ এখলাছ।

বেহেশ্‌তী জেওর

প্রথম খণ্ড

কতিপয় সত্য ঘটনা

১ দানের সুফল

হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'একদা এক ব্যক্তি কোন এক গভীর জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেছিল। হঠাৎ সে এক মেঘখণ্ড হইতে এক গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইল, অমুকের বাগিচায় পানি দাও। এই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড মেঘ বাগিচার উপর আসিয়া পৌঁছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতে বাগান প্লাবিত হইয়া গেল। পানির স্রোত একটি নালা দিয়া বহিয়া চলিল। ঐ লোকটি পানির স্রোত অনুসরণ করিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া দেখিল, একটি লোক কোদাল দ্বারা ক্ষেতের আইল বাঁধিয়া ঐ পানি তাহার বাগিচায় আটকাইতেছে। লোকটি বাগিচাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই আপনার নাম কি? বাগিচাওয়ালা সেই নামই বলিল—যাহা সে মেঘের মধ্য হইতে শুনিয়াছিল। অতঃপর বাগিচাওয়ালা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই! আপনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?' লোকটি বলিল, যে মেঘের এই পানি উহার মধ্য হইতে একটি আওয়াজ শুনিয়াছি, আপনার নাম লইয়া বলিয়াছেঃ 'অমুকের বাগিচায় পানি দাও।' আচ্ছা, আপনি বলুন তো, আপনি কি আমল করেন? আপনি কি করিয়া আল্লাহ্‌র এত পেয়ারা হইলেন? বাগিচাওয়ালা বলিল, 'ইহা তো বলার কথা নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের কাজ বলা ভাল নহে। শুধু আপনার অনুরোধ রক্ষার্থে বলিতেছি—এই বাগিচায় যাহাকিছু ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করি, এক ভাগ নিজের বাল-বাচ্চাসহ ভোগ করি, আর এক ভাগ বাগিচার উন্নতিকল্পে ব্যয় করি।

উপদেশঃ আল্লাহ্ পাকের কী রহ্‌মত! যে খাঁটীভাবে আল্লাহ্‌র ফরমাঁবরদারী করে, তাহার যাবতীয় কার্য আল্লাহ্ গায়েব হইতে সাহায্য করিয়া এমন সুন্দররূপে সমাধা করিয়া দেন যে, সে জানিতেও পারে না। উপরোক্ত ঘটনাটি ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সত্যই বলা হইয়াছে যে, যে আল্লাহ্‌র হয় আল্লাহ্‌ও তাহার হইয়া যান।

২ না-শোক্‌রীর পরিণাম

বোখারী শরীফের হাদীসে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী ইস্‌রায়ীল গোত্রে তিনজন লোক ছিল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। তন্মধ্যে একজন ছিল কুষ্ঠ

রোগাক্রান্ত, দ্বিতীয় জন মাথায় টাক পড়া, তৃতীয় জন অন্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা এই তিনজনকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি একজন ফেরেশ্‌তা পাঠাইলেন। ফেরেশ্‌তা প্রথমে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত লোকটির নিকট গিয়া বলিলেন, তুমি কি চাও? লোকটি উত্তর করিলঃ আমি আল্লাহ্‌র কাছে এই চাই যে, আমার এই কুৎসিত ব্যাধি নিরাময় হউক, আমার দেহের চর্ম নূতন রূপ ধারণ করিয়া সুন্দর হউক—যেন আমি লোক সমাজে যাইতে পারি, লোকে আমাকে ঘৃণা না করে। আমি যেন এই বালা হইতে মুক্তি পাই। ফেরেশ্‌তা তাহার শরীরে হাত বুলাইয়া দো'আ করিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাহার রোগ নিরাময় হইয়া গেল। সর্বশরীর নূতন রূপ ধারণ করিল। তারপর আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পাইতে চাও? লোকটি বলিল, আমি উট পাইলে সন্তুষ্ট হই। ফেরেশ্‌তা তাহাকে একটি গর্ভবতী উট্‌নী আনিয়া দিলেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে বরকতের জন্য দো'আ করিলেন।

অতঃপর ফেরেশ্‌তা টাকপড়া লোকটির নিকট গিয়া বলিলেন, তুমি কোন্ জিনিস পছন্দ কর? লোকটি বলিল, আমার মাথার ব্যাধি নিরাময় হউক, যে কারণে লোক আমাকে ঘৃণা করে। আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ভাল হইয়া গেল। নূতন চুল গজাইয়া নূতন রূপ ধারণ করিল। এখন ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ প্রকারের মাল তুমি পাইতে চাও? সে বলিল, আল্লাহ্ যদি আমাকে একটি গরু দান করেন, তবে আমি খুব সন্তুষ্ট হই। ফেরেশ্‌তা একটি গর্ভবতী গাভী আনিয়া দিলেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করিলেন।

অনন্তর ফেরেশ্‌তা অন্ধ লোকটির নিকট গমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাও? লোকটি বলিলঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার চোখ দুইটির দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিন, যেন আমি আল্লাহ্‌র দুনিয়া দেখিতে পাই। ইহাই আমার আরজু। আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশ্‌তা তাহার চোখের উপর হাত বুলাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ ভাল হইয়া গেল। সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। অতঃপর ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বল তো, কোন্ চিজ তুমি পছন্দ কর? অন্ধ বলিল, আল্লাহ্ যদি আমাকে একটি বকরী দান করেন, আমি খুব খুশী হইব। ফেরেশ্‌তা তৎক্ষণাৎ একটি গাভীন বকরী আনিয়া তাহাকে দিলেন এবং বরকতের দো'আ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই এই তিন জনের উট, গরু এবং বকরীতে মাঠ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা প্রত্যেকে এক একজন বিরাট ধনী। অনতিকাল পরে সেই ফেরেশ্‌তা প্রথম ছুরতে পুনরায় সেই উটওয়ালার (কুষ্ঠ রোগীর) নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি বিদেশে (ছফরে) অসিয়া বড়ই অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার বাহক জন্তুটিও মারা গিয়াছে। আমার পথ-খরচও ফুরাইয়া গিয়াছে। আপনি যদি মেহেরবানী করিয়া কিছু সাহায্য না করেন, তবে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। এক আল্লাহ্ ছাড়া আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়। যে আল্লাহ্ আপনাকে সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুশ্রী চেহারা দান করিয়াছেন তাঁহার নামে আমি আপনার নিকট একটি উট প্রার্থনা করিতেছি। আমাকে একটি উট দান করুন। আমি উহাতে আরোহণ করিয়া কোন প্রকারে বাড়ী যাইতে পারিব। লোকটি বলিল, হতভাগা কোথাকার! এখান হইতে দূর হও, আমার নিজেরই কত প্রয়োজন রহিয়াছে? তোমাকে দিবার মত কিছুই নাই। ফেরেশ্‌তা বলিলেন, আমি তোমাকে চিনি বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলে না? লোকে কি এই রোগের কারণে তোমাকে তুচ্ছ ও ঘৃণা করিত না? তুমি কি গরীব ও নিঃস্ব ছিলে না? তৎপর আল্লাহ্ পাক কি তোমাকে এই

ধন-সম্পদ দান করেন নাই? লোকটি বলিল, বাঃ বাঃ! কি মজার কথা বলিতেছ? আমরা বাপ-দাদার কাল হইতেই বড় লোক। এই সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে আমরা ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। ফেরেশ্‌তা বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সেইরূপ করিয়া দিন যেরূপ তুমি পূর্বে ছিলে। কিছুকালের মধ্যে লোকটি সর্বস্বান্ত হইয়া পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ফেরেশ্‌তা দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ, টাকপড়া লোকটির নিকট গমন করিলেন। লোকটির এমন সুন্দর ও সুঠাম চেহারা! মাথায় কুচকুচে কাল চুল, যেন তাহার কোন রোগই ছিল না। ফেরেশ্‌তা তাহার নিকট একটি গাভী চাহিলেন। কিন্তু সেও উটওয়ালার ন্যায়ই "না" সূচক শব্দে জবাব দিল। ফেরেশ্‌তাও তাহাকে বদদো'আ দিয়া বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যুক হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমার সেই পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া দেন। ফেরেশ্‌তার দো'আ ব্যর্থ হইবার নহে। তাহার মাথায় টাক পড়া শুরু হইল, সমস্ত ধন-সম্পদ লয় পাইল।

তারপর ফেরেশ্‌তা পূর্বাকৃতিতে সেই অন্ধ ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া বলিলেন, বাবা আমি মুসাফির! বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার টাকা-পয়সা কিছুই নাই। আপনি সহানুভূতি ও সাহায্য না করিলে আমার কোন উপায় দেখিতেছি না। যে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এক বিরাট সম্পত্তির মালিক করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নামে আমাকে একটি বকরী দান করুন—যেন কোন প্রকারে অভাব পূরণ করিয়া বাড়ী যাইতে পারি। লোকটি বলিল, নিশ্চয়ই। আমি অন্ধ, দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিলাম। আমি আমার অতীতের কথা মোটেই ভুলি নাই। আল্লাহ্ তা'আলা শুধু নিজ রহ্‌মতে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই সব ধন-সম্পদ যাহাকিছু দেখিতেছেন সবই আল্লাহ্ তা'আলার, আমার কিছুই নহে। তিনিই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দান করিয়াছেন। আপনার যে কয়টির প্রয়োজন আপনার ইচ্ছামত আপনি লইয়া যান। যদি ইচ্ছা হয় আমার পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততির জন্য কিছু রাখিয়াও যাইতে পারেন। আল্লাহ্‌র কছম, আপনি সবগুলি লইয়া গেলেও আমি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইব না। কারণ, এসব আল্লাহ্‌র দান।

ফেরেশ্‌তা বলিলেন, বাবা, এসব তোমার থাকুক। আমার কিছুর প্রয়োজন নাই, তোমাদের তিন জনের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ছিল; তাহা হইয়া গিয়াছে, তাহারা দুইজন পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট ও নারায হইয়াছেন। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

উপদেশঃ হে মানুষ! চিন্তা কর! প্রথমোক্ত দুইজন আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোক্‌র করে নাই বলিয়া দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই তাহাদের বিনষ্ট হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা কতই না শোচনীয় হইয়াছে! কারণ, আল্লাহ্ তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শোক্‌র করিয়াছে বলিয়া দুনিয়া ও আখেরাত সবই বহাল রহিয়াছে, ধন-সম্পদ কিছুই নষ্ট হয় নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা 'দিয়া ধন বুঝে মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ।' সাধারণতঃ মানুষ বড় হইলে অতীতের কথা ভুলিয়া যায়। এ ধরনের লোককে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। প্রকৃত মানুষ তাহারা—যাহারা অতীতের দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র গোযারী করে।

৩ বখিলীর পরিণাম

একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সাল্‌মার গৃহে কিছু হাদিয়ার গোশ্‌ত আসিয়াছিল। আমাদের হযরত (দঃ) গোশ্‌ত খাইতে ভালবাসিতেন। তাই পতিভক্তা উম্মে সাল্‌মা গোশ্‌তটুকু

হযরতের জন্য তুলিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে এক ভিক্ষুক গৃহদ্বারে আসিয়া হাঁক ছাড়িল—"আল্লাহ্‌র নামে খয়রাত দিন, আল্লাহ্ বরকত দিবেন।" গৃহমধ্যে হইতে জবাব আসিল, "বাবা, মাফ কর, আল্লাহ্ তোমাকেও বরকত দান করুক।" ইহার অর্থ হইল—তোমাকে দিবার মত বাড়ীতে কিছুই নাই। এই জবাব শুনিয়া ভিক্ষুক চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর হযরত (দঃ) গৃহে ফিরিয়া বিবি উম্মে সালামাকে বলিলেন, 'খাবার কিছু আছে কি?' হযরত উম্মে সালামা "জি-হাঁ" বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ গোশ্‌ত আনিতে গেলেন। কিন্তু পাত্রের দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কারণ, উহাতে গোশ্‌তের নাম গন্ধও নাই। আছে মাত্র এক টুক্‌রা পাথর। তিনি সব কথা আঁ-হযরতের নিকট খুলিয়া বলিলেন। জবাবে আঁ-হযরত বলিলেন, বেশ হইয়াছে। তোমার পাষাণ হৃদয় ভিক্ষুককে বঞ্চিত করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলাও গোশ্‌তকে পাথরে পরিণত করিয়া তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

উপদেশঃ যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুককে দান না করিয়া শুধু নিজের উদর পূর্ণ করে, সে যেন পাথর উদরে পুরিল। এইরূপ করিতে করিতে শেষে তাহার হৃদয়ও পাষাণের মত হইয়া যায়। কিন্তু দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ পরিণাম সকলকে চর্মচক্ষে দেখান না।

৪ মিথ্যা, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপের শাস্তি

হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, প্রত্যহ ফজরের নামায শেষে ছাহাবীদের দিকে মুখ করিয়া বসিতেন এবং কেহ কোন খাব (স্বপ্ন) দেখিয়াছে কি না, বা কাহারও কোন কথা বলিবার আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন। কোন কথা জানিতে চাহিলে হুযূর (দঃ) তাহাকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করিতেন।

অভ্যাস মত এক দিন হযরত (দঃ) বলিলেন, কাহারও কিছু বলিবার আছে কি না? কেহ কিছু না বলায় তিনি নিজেই বলিলেন, আজ রাত্রে আমি অতি সুন্দর ও বিস্ময়কর একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। (নবীদের খাব এবং ওহী সম্পূর্ণ সত্য হইয়া থাকে। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।) দেখিলাম, দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া আমাকে হাতে ধরিয়া এক পবিত্র স্থানের দিকে লইয়া চলিল। কিয়দ্দূর গমনের পর দেখিলাম, (১) একজন লোক বসিয়া আছে, আর একজন লোক তাহার নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দণ্ডায়মান লোকটির হাতে একটি জম্বুরা রহিয়াছে। সে ঐ জম্বুরা দ্বারা উপবিষ্ট লোকটির মস্তক চিরিতেছে। একবার মুখের এক দিক দিয়া ঐ জম্বুরা ঢুকাইয়া দিয়া মাথার পিছন পর্যন্ত কাটিয়া ফেলে। আবার অন্য দিক দিয়াও এইরূপ করে। এক দিক কাটিয়া যখন অন্য দিক কাটিতে যায়, তখন প্রথম দিক পুনরায় জোড়া লাগিয়া ভাল হইয়া যায়। আবার ঐরূপভাবে কাটে আবার জোড়া লাগে। আমি এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধুগণ! ব্যাপার কি? সঙ্গীদ্বয় বলিলেন, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে চলিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, (২) এক জন লোক শুইয়া আছে, আর একজন লোক একখানা ভারী পাথর হাতে করিয়া তাহার নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দাঁড়ান লোকটি ঐ পাথরের আঘাতে শোয়া লোকটির মাথা চুরচুর করিয়া দিতেছে। পাথরটি এত জোরে নিক্ষেপ করে যে, মস্তকটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বহুদূরে গিয়া নিক্ষিপ্ত হয়। লোকটি নিক্ষিপ্ত পাথরটি কুড়াইয়া আনিবার পূর্বেই বহুধা বিভক্ত মস্তক জোড়া লাগিয়া পূর্বের ন্যায় হইয়া যায়। সে ঐ পাথর কুড়াইয়া আনিয়া আবার মাথায় আঘাত করে এবং মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এইভাবে সে পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে।

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া আমি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি ব্যাপার খুলিয়া বলুন। তাঁহারা কোন জবাব না দিয়া শুধু বলিলেন, আগে চলুন। আমরা আগে চলিলাম, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি প্রকাণ্ড গর্ত দেখিতে পাইলাম। গর্তটির মুখ সরু, কিন্তু অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত গভীর এবং প্রশস্ত—যেন একটি তন্দুর, উহার ভিতরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে আর বহু সংখ্যক নর-নারী উহাতে দগ্ধীভূত হইতেছে। আগুনের তেজ এত অধিক যে, যেন আগুনের ঢেউ খেলিতেছে। ঢেউয়ের সঙ্গে যখন আগুন উচ্চ হইয়া উঠে, তখন লোকগুলি উথলিয়া গর্তের দ্বারেদেশে পৌঁছিয়া গর্ত হইতে বাহির হইবার উপক্রম হইয়া যায়। আবার যখন আগুন নীচে নামিয়া যায়, তখন লোকগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া যায়। আমি ভীত হইয়া সঙ্গীগণকে বলিলাম, বন্ধুগণ! এবার বলুন এই ব্যাপার কি? কোন জবাব না দিয়াই তাঁহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা একটি রক্তের নদী দেখিতে পাইলাম। তীরে একটি লোক দাঁড়ান আছে, ইহার নিকট স্তূপীকৃত কতকগুলি প্রস্তর রহিয়াছে। নদীর মধ্যে একটি লোক হাবুডুবু খাইয়া অতি কষ্টে কূলের দিকে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। তীরের নিকটবর্তী হইতেই তীরস্থ লোকটি তাহার মুখে এত জোরে পাথর নিক্ষেপ করে যে, সে আবার নদীর মাঝখানে চলিয়া যায়। এভাবে যখনই সে তীরের দিকে আসিতে চেষ্টা করে, তখনই তীরস্থ লোকটি পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দেয়। এমন নির্মম ব্যবহার দর্শনে ভয়ে আমি স্তম্ভিত হইয়া সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধুগণ! বলুন একি ব্যাপার? তাঁহারা কোন জবাব দিলেন না; বলিলেন, আগে চলুন। আমরা আগে চলিলাম, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি সুন্দর শ্যামল উদ্যান দেখিতে পাইলাম। উদ্যানের মধ্যভাগে একটি অতি উচ্চ বৃক্ষ। উহার নিম্নে একজন বৃদ্ধলোক বসা আছে। বৃদ্ধের পার্শ্বদেশে অনেক বালক-বালিকা। বৃক্ষটির অপর পার্শ্বে আরও একজন লোক বসা অছে। তাহার সম্মুখে আগুন জ্বলিতেছে। ঐ লোকটি আগুনের মাত্রা আরও প্রবলভাবে বৃদ্ধি করিতেছে। সঙ্গীদ্বয় আমাকে বৃক্ষে আরোহণ করাইতে লাগিলেন। বৃক্ষটির মাঝামাঝি গিয়া দেখিলাম, এক সুদৃশ্য অট্টালিকা। এমন সুন্দর ও মনোরম অট্টালিকা ইহার পূর্বে কখনও আমি দেখি নাই। অট্টালিকার ভিতরে পুরুষ-স্ত্রী, বালক-বালিকা সকল শ্রেণীর লোক রহিয়াছে। অট্টালিকা হইতে বাহিরে আসিয়া সঙ্গীদ্বয় আমাকে আরও উপরে লইয়া গেলেন। তথায় অপর একটি উত্তম অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম, উহার ভিতরে দেখিলাম শুধু বৃদ্ধ ও যুবক।

আমি সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, আপনারা আমাকে নানাস্থান ভ্রমণ করাইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনিলেন। এখন বলুন দেখি, ঐসব কি ব্যাপার দেখিলাম?

সঙ্গীদ্বয় বলিলেন—

১। প্রথম যে লোকটির মস্তক ছেদন করা হইতেছে দেখিয়াছেন, সে লোকটির মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল। সে যে মিথ্যা বলিত তাহা দুনিয়াময় মশহুর হইয়া যাইত।

২। দ্বিতীয় নম্বর যে লোকটির মস্তক প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইতেছিল, সে দুনিয়ায় আলেম ছিল। কোরআন হাদীস শিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তদনুযায়ী নিজেও আমল করে নাই, অন্যকেও শিক্ষা দেয় নাই, যাহাতে এল্‌মে দ্বীন প্রচার হইতে পারিত। রাত্রে শুইয়া আরামে কাটাইত। আ'লমে বরযখে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশ না হওয়া পর্যন্ত তাহার এইরূপ আযাব হইতে থাকিবে।

৩। তৃতীয় নম্বরে আপনি যাহাদের আগুনের তন্দুরের ভিতরে দেখিয়াছেন, তাহারা দুনিয়ায় ছিল ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের এইরূপ আযাব হইতে থাকিবে।

৪। চতুর্থ নম্বরে আপনি যে লোকটিকে রক্তের নদীতে হাবুডুবু খাইতে দেখিয়াছেন, সে ঘুষ, সুদ খাইয়া, চুরি করিয়া, এতীমের ও বিধবার মাল আত্মসাৎ করিয়া লোকের রক্ত শোষণ করিয়াছিল। কিয়ামত পর্যন্ত তাহার এইরূপ আযাব হইতে থাকিবে।

৫। (১) তৎপর বৃক্ষের নীচে যে বৃদ্ধ লোকটিকে দেখিয়াছেন, তিনি হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)। ছেলেপেলেগুলি মুসলমান নাবালেক ছেলেমেয়ে। আর (২) যিনি অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছিলেন তিনি দোযখের দারোগা মালেক ফিরিশ্‌তা। বৃক্ষের উপর (৩) প্রথম যে অট্টালিকাটি দেখিয়াছেন উহা সাধারণ ঈমানদারদের বেহেশ্‌তের বাড়ীঘর। তৎপর (৪) দ্বিতীয় যে অট্টালিকাটি দেখিয়াছেন, উহা ঐ শহীদানের অট্টালিকা, যাহারা দুনিয়াতে দ্বীন ইসলামের জন্য শহীদ হইয়াছেন। আমি জিব্‌রায়ীল ফেরেশ্‌তা এবং আমার সঙ্গের লোকটি মীকাঈল ফিরিশ্‌তা। [ইহার পর জিব্‌রায়ীল (আঃ) হযরত (দঃ)-কে বলিলেন] আপনি এখন উপরের দিকে দৃকপাত করুন। আমি উপরের দিকে তাকাইয়া এক খণ্ড সাদা মেঘের মত দেখিলাম। জিব্‌রায়ীল (আঃ) বলিলেন, উহা আপনার অট্টালিকা। বলিলাম, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আমার অট্টালিকায় চলিয়া যাই। জিব্‌রায়ীল (আঃ) বলিলেনঃ এখনও সময় হয় নাই, এখনও দুনিয়ায় আপনার হায়াত বাকী আছে। দুনিয়ার জীবন শেষ হইলে পর তথায় যাইবেন।

উপদেশঃ এই হাদীস হইতে কয়েকটি বিষয়ের অবস্থা বুঝাইতেছে। প্রথমতঃ মিথ্যার কি ভয়াবহ সাজা। দ্বিতীয়তঃ বে-আমল আলেমের পরিণতি। তৃতীয়তঃ, যিনার প্রতিফল ও চতুর্থতঃ, সুদখোরের ভীষণ আযাব। আল্লাহ্‌ সকল মুসলমানকে এই সকল কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। আমীন!

নিম্নে ছয়টি আদর্শ ঘটনা

১ ঈমানের মজবুতী

হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে দুরাচার পাপী নমরূদ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। তবুও তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁহার তরীক্বা ত্যাগ করেন নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জন্য অগ্নিকুণ্ডকে ফুলের বাগিচায় পরিণত করিয়া দিলেন।

হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম সম্রাট ফেরআউন এবং কাফিরদের নির্মম অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া নিজকে নিজে লোহিত সাগরে নিক্ষেপ করিলেন তবুও তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁহার তরীক্বা পরিত্যাগ করেন নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা গভীর সমুদ্রে শুষ্ক রাস্তা সৃষ্টি করিয়া দিলেন।

হযরত আইয়ুব (আঃ) অত্যন্ত কুৎসিৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সুদীর্ঘ আঠার বৎসরকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। দেশবাসীর নিকট ঘৃণিত ও অবহেলিত হইয়া রহিলেন। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সর্বস্ব হারাইয়া নিঃস্ব হইলেন। তথাপি তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁহার তরীক্বা হইতে বিমুখ হন নাই। তাঁহার সঙ্গে শুধু তদীয় সতী-সাধ্বী পত্নী বিবি রহীমা স্বামী সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া রহিলেন। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন দেশবাসী সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তিনি ছবর করিয়া রহিলেন। ধৈর্যশীলতার দরুন আল্লাহ্ পাক তাঁহার ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্য সমস্তই ফিরাইয়া দিলেন।

হযরত সোলায়মান আলাইহিস্‌সালাম অগাধ ধনরাশি এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তাঁহার তরীক্বা বিস্মৃত হন নাই। আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়া দেন নাই। সময়কে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া ন্যায়-নীতির সহিত সুচারুরূপে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন এবং যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র এবাদৎ-বন্দেগী করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেন নাই।

২ প্রতিজ্ঞা পালন

নুবুওত প্রাপ্তির পূর্বে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসা করিতেন। একদা কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিয়া গেল, আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি টাকা আনিয়া দিতেছি। এই বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল, তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিল না। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত ওয়াদায় আবদ্ধ হওয়ার কারণে ঐ স্থানে তিন দিন লোকটির অপেক্ষায় রহিলেন। চতুর্থ দিবসে লোকটি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু হুযূর (দঃ) তাহার প্রতি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন না। শুধু এতটুকু বলিলেন, ওয়াদায় আবদ্ধ, তাই তিন দিন যাবৎ আপনার অপেক্ষায় বসিয়া আছি।

৩ নাচ গান ও রং তামাশায় মন না দেওয়া

বাল্যকালে আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য বালকদের সঙ্গে বকরী চরাইতেন। রাখালেরা পালাক্রমে নাচ, বাদ্য ও রং তামাশা দেখার জন্য

শহরে গমন করিত। যে দিন আমাদের হযরতের পালা ছিল সে দিন তিনি (শহরে আসিয়া) মনে মনে ভাবিলেন, নাচ-বাদ্য ও রং তামাশা দেখিয়া নিদ্রা, স্বাস্থ্য ও সময় নষ্ট করা কি লাভ? তিনি আরামে নিদ্রা গেলেন। নাচ-বাদ্য ও রং তামাশায় যোগদান করিলেন না।

৪ সমাজ সেবা

নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত (দঃ) যখন যুবক ছিলেন, তখন তিনি একটি যুবক সমিতি গঠন করেন। সমিতির কর্মসূচী ছিল এই—

(ক) অসহায়, অনাথ, এতীম ও বিধবার সাহায্য করা।

(খ) বিদেশী মেহ্‌মানের সেবা করা।

(গ) বিদেশী পথচারী ও দুর্বলের উপর অত্যাচার অবিচার হইতে না দেওয়া।

(ঘ) কর্মহীনদের কর্মের সংস্থান করিয়া জীবিকার উপায় করিয়া দেওয়া।

(ঙ) আসমানী বালা-মুছীবতে মনুষ্য সমাজ বিপদগ্রস্ত হইলে চাঁদা ইত্যাদির দ্বারা সমাজকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে চেষ্টা করা।

৫ আমানতে খেয়ানত করা

কাফিরগণ যখন আমাদের নূর নবীর উপর অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়নে তৎপর, এমন কি শত্রুগণ যখন তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন সতরজন বিশিষ্ট পাহ্‌লোয়ান তরবারি হস্তে তাঁহার গৃহ পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আল্লাহ্‌র অপার মহিমা! ঐ রাত্রেই আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হইল—মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিতে। তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে বিলম্ব করিলেন না, করিতেও পারেন না। কাফিরদের অনেক টাকা-পয়সা তাঁহার নিকট আমানত ছিল। তিনি বালক আলীকে বলিলেন, প্রিয় বৎস! এই রাত্রে আমার বিছানায় শুইয়া থাকিবে। প্রাতে যাহার যে আমানত আছে, তাহা তাহাকে দিয়া দিবে। পারিবে তো? হযরত আলী নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, আল্লাহ্ চাহেন ত পারিব।

হযরত আলী আঁ-হযরতের বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। এদিকে হযরত (দঃ) শত্রুর বেড়াজাল ভেদ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাহারা বিন্দুমাত্রও টের পাইল না। প্রত্যুষে কাফির দল গৃহে প্রবেশ করিল। তাহারা চাদরাবৃত আলীকে হযরত (দঃ) মনে করিয়া কেহ বলিল, এক কোপেই শেষ করিয়া ফেল। কেহ বাধা দিয়া বলিল, না না, নিদ্রাবস্থায় হত্যা করা কাপুরুষতার পরিচায়ক। এরূপ বলাবলি করিতে করিতে একজন চাদর টান দিয়া" দেখিল, এ তো তাহাদের শিকার (হযরত) মুহাম্মদ (দঃ) নয়, এ যে আলী শুইয়া আছে! তাহারা বিস্মিত হইল। হযরত আলী দেখাইলেন, গচ্ছিত দ্রব্যসমূহ ফেরত দিবার জন্য, আমানতের হেফাযতের জন্য তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। ইহাকেই বলে আমানতদারী, ইহারই নাম বিশ্বস্ততা।

৬ রিপু দমন ও সংযম অভ্যাস

হযরত ইউসুফ (আঃ) তখনও নবী হন নাই। যৌবনের উদ্দাম সময়। তিনি অবস্থান করেন মিসরের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে। যদিও যালেমেরা তাঁহাকে গোলাম বলিয়া বিক্রয় করিয়াছিল, তথাপি মন্ত্রী এবং তাহার বেগম ছাহেবা তাঁহাকে অত্যধিক স্নেহ ও আদর করেন। বেগম ছাহেবার

নাম যোলায়খা। তিনি ছিলেন অনুপমা সুন্দরী। হযরত ইউসুফের অতুলনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া যোলায়খা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। একদিন গৃহের দরজা জানালা তালাবদ্ধ করিয়া যোলায়খা ইউসুফকে তাঁহার খাছ কামরায় আহ্বান করিলেন। ভীষণ অগ্নি পরীক্ষা! যোলায়খা ইউসুফকে তাঁহার সহিত প্রেম করিবার জন্য ফুসলাইতে লাগিলেন। ইউসুফ (আঃ) মহা সংকটে পড়িলেন। দরজা তালাবদ্ধ, পালাবার কোন উপায় নাই। তিনি প্রমাদ গণিলেন। এই অসহায় অবস্থায় পড়িয়া তিনি খোদার দরবারে বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি খাঁটি দেলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়, আল্লাহ্‌ তাহাকে আশ্রয় দেন। যদিও গৃহদ্বার তালাবদ্ধ, তথাপি ভাবিলেন, আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব ততদূর চেষ্টা আমাকে করিতেই হইবে। তিনি হঠাৎ দরজার দিকে দৌড়াইয়া গেলেন। দরজার নিকট উপস্থিত হইলে আল্লাহ্‌র অসীম কৃপা ও কুদরতে একে একে সাতটি দরজার তালা আপনাআপনি খুলিয়া গেল। যোলায়খাও তাঁহার পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া পিছন দিক হইতে ইউসুফ (আঃ)-এর জামার আঁচল ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিলেন, ফলে জামার আঁচল ছিড়িয়া গেল এবং যোলায়খার অপচেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইউসুফ (আঃ) নিস্তার পাইলেন এবং চরিত্রকে পবিত্র রাখিতে সক্ষম হইলেন। যোলায়খার ষড়যন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ (আঃ)-কে সাত বৎসরের জন্য কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। ইউসুফ (আঃ) হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র শোক্‌র করিয়া বলিতে লাগিলেন, করুণাময় খোদা! চরিত্র অপবিত্র করার চেয়ে কারাগারে আবদ্ধ থাকা শত গুণে শ্রেয়ঃ।

যোলায়খার মনোবাসনা পূর্ণ করিলে ইউসুফ (আঃ) কতই না আরামে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু ইউসুফ (আঃ) যৌন-লালসার ফাঁদে পড়িলেন না, কারাগারের কষ্টকে অকাতরে গ্রহণ করিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ভয়ে আপন নির্মল চরিত্রকে কলুষিত করেন নাই। তিনি বিশ্বে যে সংযমের আদর্শ রাখিঁয়া গিয়াছেন তাহা অনুধাবন ও অনুসরণযোগ্য। এই ঘটনার বিবরণ কোরআনে পাকেও উল্লেখ রহিয়াছে। ইতিহাসেও তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে এবং থাকিবে।

—অনুবাদক

আক্বীদার[১] কথা

১। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য দৃশ্য-অদৃশ্য যাহাকিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, প্রথমে তাহা কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা পরে এসকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

২। আল্লাহ্ এক, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী বা মোহ্‌তাজ[২] নহেন, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই, তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই, তাঁহার স্ত্রী নাই, তাঁহার মোকাবেল[৩] কেহ নাই।

৩। তিনি অনাদি এবং অনন্ত, সকলের পূর্ব হইতে আছেন, তাঁহার শেষ নাই।

৪। কোন কিছুই তাঁহার অনুরূপ হইতে পারে না। তিনি সর্বাপেক্ষা বড় এবং সকল হইতে পৃথক!

৫। তিনি জীবিত আছেন। সর্ববিষয়ের উপর তাঁহার ক্ষমতা রহিয়াছে। সৃষ্টজগতে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। তিনি সবকিছুই দেখেন, সবকিছুই শুনেন। তিনি কথা বলেন; কিন্তু তাঁহার কথা আমাদের কথার ন্যায় নহে। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই তিনি করেন, কেহই তাহাতে কোনরূপ বাধা দিতে পারে না।

একমাত্র তিনিই এবাদতের যোগ্য; অর্থাৎ, অন্য কাহারও বন্দেগী করা যাইতে পারে না। তাঁহার কোনই শরীক নাই। তিনি মানুষের উপর বড়ই মেহেরবান। তিনি বাদশাহ্। তাঁহার মধ্যে কোনই আয়েব বা দোষ-ত্রুটি নাই। তিনি সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি ও আয়েব-শেকায়েৎ হইতে একেবারে পবিত্র। তিনি মানুষঁকে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনিই প্রকৃত সম্মানী। তিনিই প্রকৃত বড়। তিনি সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে কেহই সৃষ্টি করে নাই। তিনিই মানুষের গুনাহ্ মা'ফ করেন। তিনি জবরদস্ত ও পরাক্রমশালী, বড়ই দাতা। তিনিই সকলকে রুজি দেন এবং আহার দান করেন। তিনিই যাহার জন্য ইচ্ছা করেন রুজি কম করিয়া দেন, আবার যাহার জন্য ইচ্ছা করেন রুজি বৃদ্ধি করিয়া দেন, তিনি আপন ইচ্ছানুযায়ী কাহাকেও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন, আবার কাহারও মান-মর্যাদা হ্রাস করিয়া দেন। মান-সম্মান হ্রাস-বৃদ্ধির অধিকারী তিনিই; অবমাননা, অসম্মান করার মালিকও তিনিই। তিনি বড়ই ন্যায় বিচারক। তিনি বড়ই ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু। যে তাঁহার সামান্য এবাদতও করে, তিনি তাহার বড়ই ক্বদর করেন অর্থাৎ সওয়াব দেন। তিনি দো'আ কবূল করেন। তাঁহার ভাণ্ডার অফুরন্ত।

তাঁহার আধিপত্য সকলের উপর; তাঁহার উপর কাহারও আধিপত্য নাই। তাঁহার হুকুম সকলেই মানিতে বাধ্য; তাঁহার উপর কাহারও হুকুম চলে না। তিনি যাহাকিছু করেন সকল কাজেই হিক্‌মত

টিকা

১ কোন বিষয় মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে আক্বীদা বলে। শরীঅত যে বিষয়কে যেমন বাতাইয়াছে তাহা ঠিক তেমনই, এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। বিন্দুমাত্রও শক-শোবাহ (সন্দেহ) করা যাইতে পারে না, ইহারই নাম আক্বীদা।

২ অর্থাৎ, তাঁহার কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রয়োজন হয় না।

৩ অর্থাৎ, তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই যে তাঁহার মোকাবেলা করিতে পারে।

থাকে, (তাঁহার কোন কাজই হিক্‌মত ছাড়া হয় না। তাঁহার সব কাজই ভাল। তাঁহার কোন কাজে দোষের লেশমাত্রও থাকে না।) তিনি সকলের চেষ্টাকে ফলবতী করেন। তাঁহার সাহায্যেই সকলকে পয়দা করিবেন। তিনিই জীবনদাতা এবং তিনিই মৃত্যুদাতা। ছিফৎ (গুণাবলী) এবং নিদর্শন দ্বারা সকলেই তাঁহাকে জানে; কিন্তু তাঁহার যাতের বারিকী বা সূক্ষ্মতত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারে না। তিনি গুণাহ্‌গারের তওবা[১] কবূল করিয়া থাকেন। যাহারা শাস্তির যোগ্য তাহাদিগকে শাস্তি দেন। তিনিই হেদায়ত করেন, অর্থাৎ যাহারা সৎপথে আছে তাহাদিগকে তিনিই সৎপথে রাখেন। দুনিয়াতে যাহাকিছু ঘটে, সমস্ত তাঁহারই হুকুমে এবং তাঁহারই কুদরতে ঘটিয়া থাকে। তাঁহার কুদরত এবং হুকুম ব্যতীত একটি বিন্দুও নড়িতে পারে না। তাঁহার নিদ্রাও নাই, তন্দ্রাও নাই। নিখিল বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহার একটুও কষ্ট বা ক্লান্তি বোধ হয় না। (তিনিই সমস্ত কিছু রক্ষা করিতেছেন।) ফলকথা, তাঁহার মধ্যে যাবতীয় সৎ ও মহৎ গুণ আছে এবং দোষ-ত্রুটির নামগন্ধও তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি হইতে অতি পবিত্র।

৬। তাঁহার যাবতীয় গুণ অনাদিকাল হইতে আছে এবং চিরকালই থাকিবে। তাঁহার কোন গুণই বিলোপ বা কম হইতে পারে না।

৭। জ্বিন ও মানব ইত্যাদি সৃষ্টবস্তুর গুণাবলী হইতে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র[২] কিন্তু কোরআন ও হাদীসের কোন কোন স্থানে—যাহা আমাদের মধ্যে আছে তাহা আল্লাহ্‌রও আছে বলিয়া উল্লেখ আছে (যেমন, বলা হইয়াছে—আল্লাহ্‌র হাত) তথায় এই রকম ঈমান রাখা দরকার যে, ইহার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ই জানেন। আমরা বেশী বাড়াবাড়ি না করিয়া এই ঈমান এবং এক্বীন রাখিব যে, ইহার অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট যাহাই হউক না কেন, তাহাই ঠিক এবং সত্য, তাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে। এইরূপ ধারণা রাখাই ভাল। তবে কোন বড় মুহাক্বেক্ব আলেম এরূপ শব্দের কোন সুসঙ্গত অর্থ বলিলে তাহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ বলা সকলের কাজ নহে। যাহারা আল্লাহ্‌র খাছ বান্দা তাঁহারাই বলিতে পারেন; তাহাও শুধু তাঁহারই বুদ্ধি মত; নতুবা আসল এক্বীনী অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এইরূপ শব্দ বা কথা যাহা বুঝে আসে না, সেইগুলিকে 'মুতাশাবেহাত' বলা হয়।

৮। সমগ্র দুনিয়ার ভালমন্দ যাহাকিছু হউক না কেন, সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলা উহা হওয়ার পূর্বেই আদিকাল হইতে অবগত আছেন। তিনি যাহা যে-রূপ জানেন তাহা সেইরূপই পয়দা করেন

টিকা

১ ঘটনাক্রমে কোন গুনাহ্ হইয়া গেলে আল্লাহ্‌র সামনে নেহায়ত লজ্জিত ও শরমিন্দা হইয়া মা'ফ চাওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, আর কখনও আমি এরূপ কাজ করিব না, ইহাকেই 'তওবা' বলে।

২ আল্লাহ্ স্রষ্টা। আল্লাহ্ ব্যতীত দৃশ্য-অদৃশ্য যতকিছু আছে, যথা আসমান, জমীন ফিরিশ্‌তা জ্বিন, মানব, চন্দ্র, সূর্য, 'আর্‌শ, কুরসী, লওহ্ ও ক্বলম ইত্যদি সমস্তই আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পদার্থ। সমস্তই সাকার, সীমাবদ্ধ, ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাহারও তুলনা হইতে পারে না বা আল্লাহ্‌র অনুরূপ কিছুই নাই। কোরআন ও হাদীসের কোন কোন স্থানে অনুরূপ শব্দ যাহা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কেহ আল্লাহ্‌কে অনুরূপ মনে করিবে না। আল্লাহ্ ইহা হইতে বহু বহু ঊর্ধ্বে। মানবের বুদ্ধি বিবেকও আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং মানবের বুদ্ধি-বিবেকের সীমা দ্বারা আল্লাহ্ সীমাবদ্ধ নহেন। আল্লাহ্ অসীম, নিরাকার, নিরঞ্জন, অনাদি, অনন্ত ও তাঁহার দেখা, শুনা, কথাবলা, হাসা, তাঁহার হাত, পা, মুখ, চোখ ইত্যাদি তিনি যেমন মহান এবং পবিত্র তাঁহার এই সমস্ত গুণও তদ্রূপ মহান এবং পবিত্র।

ইহাকেই 'তক্‌দীর' বলে। আর মন্দ জিনিস পয়দা করার মধ্যে অনেক হিক্‌মত নিহিত আছে। ইহা সকলে বুঝিতে পারে না।

৯। মানবকে আল্লাহ্ তা'আলা বুদ্ধি অর্থাৎ ভালমন্দ বিবেচনা শক্তি এবং (ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া নিজ) ইচ্ছা (ও ক্ষমতায় কাজ করিবার শক্তি) দান করিয়াছেন। এই শক্তি দ্বারাই মানুষ সৎ, বা অসৎ, সওয়াব বা গুনাহ্ নিজ ক্ষমতায় করে; (কিন্তু কোনকিছু পয়দা করিবার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয় নাই।) গুনাহ্‌র কাজে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন এবং নেক কাজে সন্তুষ্ট হন।

১০। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাহাদের শক্তির বাহিরে কোন কাজ করিবার আদেশ করেন নাই।

১১। আল্লাহ্ তা'আলার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব নহে। তিনি যাহাকিছু মেহেরবানী করিয়া করেন, সমস্তই শুধু তাঁহার কৃপা এবং অনুগ্রহ মাত্র। (কিছু বান্দাদের নেক্ কাজে যে সমস্ত সওয়াব নিজেই মেহেরবানী করিয়া দিতে চাহেন তাহা নিশ্চয়ই দিবেন, যেন তাহা ওয়াজিবেরই মত।)

১২। বহুসংখ্যক পয়গম্বর মানব এবং জ্বিন জাতিকে সৎপথ দেখাইবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন; (আমাদিগকে তাহা বলা হয় নাই।) তাঁহাদের সত্যতার প্রমাণ (জনসাধারণকে) দেখাইবার জন্য তাঁহাদের দ্বারা এমন কতিপয় আশ্চর্য ও বিস্ময়কর কঠিন কঠিন কাজ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তাহা অন্য লোক করিতে পারে না। এই ধরনের কাজকে মো'জেযা বলে।

পয়গম্বরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ ছিলেন আমাদের হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম)। অন্যান্য সব পয়গম্বর এই দুইজনের মধ্যবর্তী সময়ে অতীত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন পয়গম্বরের নাম অনেক মশ্‌হূর; যেমন— হযরত নূহ্ (আঃ), হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইয়াকূব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারূন (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইল্‌ইয়াস (আঃ), হযরত আল ইয়াছা'আ (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত লুৎ (আঃ), হযরত ইদ্রীস (আঃ), হযরত যুলকিফ্‌ল (আঃ), হযরত ছালেহ্ (আঃ), হযরত হূদ (আঃ), হযরত শো'আইব (আঃ)।

১৩। পয়গম্বরদের মোট সংখ্যা কত তাহা আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও বলিয়া দেন নাই। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা যত পয়গম্বর পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের জানা থাকুক বা না থাকুক সকলের উপরেই আমাদের ঈমান রাখিতে হইবে। অর্থাৎ, সকলকেই সত্য ও খাঁটি বলিয়া মান্য করিতে হইবে। যাঁহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই পয়গম্বর, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

১৪। পয়গম্বরদের মধ্যে কাহারও মর্তবা কাহারও চেয়ে অধিক। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মর্তবা আমাদের হুযূর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর। তাঁহার পর আর কোন নূতন পয়গম্বর কিয়ামত পর্যন্ত আসিবে না, আসিতে পারে না। কেন না কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্ট হইবে, সকলের জন্যই তিনি পয়গম্বর।

১৫। আমাদের পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় এক রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা শরীফ হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং তথা হইতে সাত আসমানের উপর এবং তথা হইতে যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার মর্যী হইয়াছিল সে পর্যন্ত উঠাইয়া আবার মক্কা শরীফে পৌঁছাইয়া দিয়ছিলেন; ইহাকে 'মে'রাজ' শরীফ বলে।

১৬। আল্লাহ্ তা'আলা কিছুসংখ্যক জীব নূর দ্বারা পয়দা করিয়া তাহাদিগকে আমাদের চর্ম চক্ষুর আড়ালে রাখিয়াছেন। তাহাদিগকে 'ফিরিশ্‌তা' বলে। অনেক কাজ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে। তাঁহারা কখনও আল্লাহ্‌র হুকুমের খেলাফ কোন কাজ করেন না। যে কাজে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন সে কাজেই লিপ্ত আছেন। এই সমস্ত ফিরিশ্‌তার মধ্যে চারিজন ফিরিশ্‌তা অনেক মশ্‌হূরঃ (১) হযরত জিব্‌রায়ীল (আঃ), (২) হযরত মীকায়ীল (আঃ), (৩) হযরত ইসরাফীল (আঃ), (৪) হযরত ইযরায়ীল (আঃ)। আল্লাহ্ তা'আলা আরও কিছুসংখ্যক জীব অগ্নি দ্বারা পয়দা করিয়াছেন, তাহাদিগকেও আমরা দেখিতে পাই না। ইহাদিগকে 'জ্বিন' বলা হয়। ইহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ, নেক্‌কার, বদ্‌কার সব রকমই আছে। ইহাদের ছেলেমেয়েও জন্মে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মশ্‌হূর দুষ্ট বদমাআ'শ হইল—ইবলীস।

১৭। মুসলমান যখন অনেক এবাদত বন্দেগী করে, গুনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকে, অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত রাখে না এবং পয়গম্বর ছাহেবের পূর্ণ তাবে'দারী করে, তখন সে আল্লাহ্‌র দোস্ত এবং খাছ পিয়ারা বান্দায় পরিণত হয়। এইরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র "ওলী" বলে। আল্লাহ্‌র ওলীদের দ্বারা সময় সময় এ রকম কাজ হইয়া থাকে, যাহা সাধারণ লোক দ্বারা হইতে পারে না, এই রকম কাজকে 'কারামত' বলে।

১৮। ওলী যত বড়ই হউক না কেন, কিন্তু নবীর সমান হইতে পারে না।

১৯। যত বড় ওলীই হউক না কেন, কিন্তু যে পর্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি ঠিক থাকে সে পর্যন্ত শরীঅতের পাবন্দী করা তাঁহার উপর ফরয। নামায, রোযা ইত্যাদি কোন এবাদতই তাহার জন্য মা'ফ হইতে পারে না। যে সকল কাজ শরীঅতে হারাম বলিয়া নির্ধারিত আছে তাহাও তাঁহার জন্য কখনও হালাল হইতে পারে না।

২০। শরীঅতের খেলাফ করিয়া কিছুতেই খোদার দোস্ত (ওলী) হওয়া যায় না।[১] এইরূপ 'খেলাফে শরআ' (শরীঅত বিরোধী) লোক দ্বারা যদি কোন অদ্ভুদ ও অলৌকিক কাজ সম্পন্ন হইতে থাকে, তবে তাহা হয় যাদু, না হয় শয়তানের ধোঁকাবাজী। অতএব, এইরূপ লোককে কিছুতেই বুযুর্গ মনে করা উচিত নহে।

২১। আল্লাহ্‌র ওলীগণ কোন কোন ভেদের কথা স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় জানিতে পারেন, ইহাকে 'কাশ্‌ফ, বা এলহাম' বলে। যদি তাহা শরীঅত সম্মত হয়, তবে তাহা গ্রহণযোগ্য অন্যথায় গ্রহণযোগ্য নহে।

২২। আল্লাহ্ এবং রসূল কোরআন, হাদীসে দ্বীন (ধর্ম) সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই বলিয়া দিয়াছেন। এখন দ্বীন সম্পর্কে কোন নূতন কথা আবিষ্কার করা বৈধ নহে। এইরূপ (দ্বীন সম্বন্ধীয়) নূতন কথা আবিষ্কারকে 'বেদ্‌আত' বলে; ইহা বড়ই গুনাহ্।

টিকা

১ অনেক সময় জিন তাবে' করিয়া বা নফ্‌সের তাছার্‌রোফের দ্বারা অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করা হয়, ইহাতে বুযুর্গী কিছুই নাই।

২৩। পয়গম্বরগণ যাহাতে নিজ নিজ উম্মতদিগকে ধর্মের কথা শিক্ষা দিতে পারেন, সেই জন্য তাঁহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা ছোট বড় অনেকগুলি আসমানী কিতাব জিব্‌রায়ীল (আঃ) মা'রেফত নাযিল করিয়াছেন। তন্মধ্যে চারিখানা কিতাব অতি মশ্‌হূর— (১) তৌরাত— হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর (২) যাবূর— হযরত দাঊদ (আঃ)-এর উপর, (৩) ইঞ্জীল— হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর এবং (৪) কোরআন শরীফ—আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হইয়াছে। কোরআন শরীফই শেষ আসমানী কিতাব। কোরআনের পর আর কোন কিতাব আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নাযিল হইবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কোরআন শরীফের হুকুমই চলিতে থাকিবে। অন্যান্য কিতাবগুলি গোমরাহ্ লোকেরা অনেক কিছু পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু কোরআন শরীফের হিফাযতের ভার স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই লইয়াছেন। অতএব, ইহাকে কেহই পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

২৪। আমাদের পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সমস্ত মুসলমান দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে 'ছাহাবী' বলা হয়। ছাহাবীদের অনেক বুযুর্গীর কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই মহব্বত এবং ভক্তি রাখা আবশ্যক। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর কলহ-বিবাদ যদি কিছু শোনা যায় তাহা ভুল-ত্রুটিবশতঃ হইয়াছে মনে করিতে হইবে; (কারণ, মানব মাত্রেরই ভুল-ত্রুটি হইয়া থাকে।) সুতরাং তাঁহাদের কাহাকেও নিন্দা করা যায় না। ছাহাবীদের মধ্যে চরিজন ছাহাবী সবচেয় বড়। হযরত আবুবক্‌র ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু পয়গম্বর ছাহেবের পর তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে দ্বীন ইসলাম রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন, তাই তাঁহাকে প্রথম খলীফা বলা হয়। সমস্ত উম্মতে-মুহাম্মদীর তিনিই শীর্ষস্থানীয়। তারপর হযরত 'ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু দ্বিতীয় খলীফা হন। তারপর হযরত 'ওস্‌মান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তৃতীয় খলীফা হন, পরে হযরত 'আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু চতুর্থ খলীফা হইয়াছিলেন।

২৫। ছাহাবীদের মর্তবা এত উচ্চস্থানীয় যে, বড় হইতে বড় ওলীও ছোট হইতে ছোট ছাহাবীর সমতুল্য হইতে পারে না।

২৬। পয়গম্বর ছাহেবের সকল পুত্র-কন্যা এবং বিবি ছাহেবাগণের প্রতিও সম্মান ও ভক্তি করা আমাদের কর্তব্য। সন্তানের মধ্যে হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার মর্তবা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং বিবি ছাহেবানদের মধ্যে হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা ও হযরত 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হার মর্তবা সবচেয়ে বেশী।

২৭। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল যাহাকিছু বলিয়াছেন, সকল বিষয়কেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা এবং মানিয়া লওয়া ব্যতীত ঈমান ঠিক হইতে পারে না। কোন একটি কথায়ও সন্দেহ পোষণ করিলে বা মিথ্যা বলিয়া মনে করিলে বা কিছু দোষ-ত্রুটি ধরিলে বা কোন একটি কথা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিলে মানুষ বে-ঈমান হইয়া যায়।

২৮। কোরআন হাদীসের স্পষ্ট অর্থ অমান্য করিয়া নিজের মত পোষণের জন্য ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অন্য অর্থ গ্রহণ বদ্-দ্বীনির কথা।

২৯। গুনাহ্‌কে হালাল জানিলে ঈমান থাকে না।

৩০। গুনাহ্ যত বড়ই হউক না কেন, যে পর্যন্ত উহা গুনাহ্ এবং অন্যায় বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিবে, সে পর্যন্ত ঈমান একেবারে নষ্ট হইবে না, অবশ্য ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িবে।

৩১। যাহাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার (আযাবের) ভয় কিংবা (রহ্মতের) আশা নাই— সে কাফির।

৩২। যে কাহারো কাছে গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করে এবং তাহাতে বিশ্বাস করে, সে কাফির।

৩৩। গায়েবের কথা এক আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কেহই অবগত নহে। হাঁ, পয়গম্বর ছাহেবান ওহী মারফত, ওলীআল্লাহ্গণ কাশ্ফ্ ও এল্হাম মারফত এবং সাধারণ লোক লক্ষণ দ্বারা যে, কোন কোন কথা জানিতে পারেন তাহা গয়েব নহে।

৩৪। কাহাকেও নির্দিষ্ট করিয়া "কাফির" কিংবা এইরূপ বলা যে, নির্দিষ্টভাবে 'অমুকের উপর খোদার লা'নত হউক' তাহা অতি বড় গুণাহ্। তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, অত্যাচারীদের উপর খোদার লা'নত হউক। কিন্তু যাহাকে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূল কাফির বলিয়াছেন, তাহাকে (নির্দিষ্টভাবে) কাফির বলা যাইতে পারে। (যথা—ফির'আউন, বা অন্য যাহাকে তাঁহারা লা'নত করিয়াছেন তাহার উপর লা'নত করা।)

৩৫। মানবের মৃত্যুর পর (যদি কবর দেওয়া হয়, তবে কবর দেওয়ার পর আর যদি কবর দেওয়া না হয়, তবে যে অবস্থায়ই থাকুক সে অবস্থাতেই তখন) তাহার নিকট মুন্কার এবং নকীর নামক দুইজন ফিরিশ্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করেনঃ 'তোমার মা'বুদ কে? তোমার দ্বীন (ধর্ম) কি? এবং হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইনি কে? যদি মুর্দা ঈমানদার হয়, তবে তো ঠিক ঠিক জওয়াব দেয় অতঃপর খোদার পক্ষ হইতে তাহার জন্য সকল প্রকার আরামের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। বেহেশ্তের দিকে ছিদ্রপথ করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে সুশীতল বায়ু এবং নির্মল সুগন্ধ প্রবেশ করিতে থাকে, আর সে পরম সুখের নিদ্রায় ঘুমাইতে থাকে। আর মৃত ব্যক্তি ঈমানদার না হইলে, সে সকল প্রশ্নের জওয়াবেই বলেঃ আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানি না।' অনন্তর তাহাকে কঠিন আযাব দেওয়া হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এই কঠিন আযাব ভোগ করিতে থাকিবে। আর কোন বন্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে এইরূপ পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি দিয়া থাকেন; কিন্তু এই সকল ব্যাপার মৃত ব্যক্তিই জানিতে পারে, আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক কিছু দেখিতে পায়, আমরা জাগ্রত অবস্থায় তাহার নিকটে থাকিয়াও তাহা দেখিতে পাই না।

৩৬। মৃত ব্যক্তিকে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তাহার আসল ও স্থায়ী বাসস্থান দেখান হয়। যে বেহেশ্তী হইবে তাহাকে বেহেশ্ত দেখাইয়া তাহার আনন্দ বর্ধন করা হয়, দোযখীকে দোযখ দেখাইয়া তাহার কষ্ট এবং অনুতাপ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

৩৭। মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ বা কিছু দান খয়রাত করিয়া উহার সওয়াব তাহাকে বখ্শিয়া দিলে তাহা সে পায় এবং উহাতে তাহার বড়ই উপকার হয়।

৩৮। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূল কিয়ামতের যে সমস্ত 'আলামত বর্ণনা করিয়াছেন উহার সবগুলি নিশ্চয় ঘটিবে। ইমাম মাহ্দী (আঃ) আগমন করিবেন এবং অতি ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজত্ব করিবেন। কানা দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে এবং দুনিয়ার মধ্যে বড় ফেৎনা ফাসাদ করিবে। হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে হত্যা করিবেন। ইয়াজুজ মা'জুজ (এক জাতি) সমস্ত দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িবে এবং সব তছ্নছ করিয়া ফেলিবে; অবশেষে খোদার গযবে ধ্বংস হইবে। এক অদ্ভুত জীব মাটি ভেদ করিয়া বাহির হইবে এবং মানুষের সহিত কথা বলিবে। সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে, (এবং পশ্চিম দিকেই অস্ত যাইবে।) কোরআন

মজীদ উঠিয়া যাইবে এবং অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত মুসলমান প্রাণ ত্যাগ করিবে। শুধু কাফিরই কাফির থাকিয়া যাইবে। (তাহাদের উপর কিয়ামত কায়েম হইবে।) এই রকম আরও অনেক 'আলামত আছে।

৩৯। যখন সমস্ত 'আলামত প্রকাশ হইয়া যাইবে, তখন হইতে কিয়ামতের আয়োজন শুরু হইবে। হযরত ইস্‌রাফীল (আঃ) সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। (এই সিঙ্গা শিং-এর আকারের প্রকাণ্ড' এক রকম জিনিস) সিঙ্গায় ফুঁক দিলে আসমান জমিন সমস্ত ফাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইবে, যাবতীয় সৃষ্ট জীন মরিয়া যাইবে। আর যাহারা পূর্বে মারা গিয়াছিল তাহাদের রূহ্ বেহুশ হইয়া যাইবে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিবেন সে নিজের অবস্থায়ই থাকিবে। এই অবস্থায়ই দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইবে।

৪০। আবার যখন আল্লাহ্ তা'আলা সে সমস্ত আলম পুনর্বার সৃষ্টির ইচ্ছা করিবেন, তখন দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে এবং সমস্ত আলম জীবিত হইয়া উঠিবে। সমস্ত মৃত লোক জীবিত হইয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্র হইবে এবং তথাকার অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সুপারিশ করাইবার জন্য পয়গম্বরদের কাছে যাইবে, কিন্তু সকলেই অক্ষমতা প্রকাশ করিবেন। পরিশেষে আমাদের পয়গম্বর ছাহেব আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি লইয়া সুপারিশ করিবেন। নেকী-বদি পরিমাপের পাল্লা (মীযান) স্থাপন করা হইবে। ভাল-মন্দ সমস্ত কর্মের পরিমাণ ঠিক করা হইবে এবং তাহার হিসাব হইবে। কেহ কেহ বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবে। নেক্‌কারদের আ'মলনামা তাঁহাদের ডান হাতে এবং গুনাহ্‌গারদের আ'মলনামা তাহাদের বাম হাতে দেওয়া হইবে। আমাদের পয়গম্বর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার (নেক) উম্মতকে হাওযে কাওছারের পানি পান করাইবেন। সেই পানি দুধ হইতেও সমধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু। সকলকে পুলছিরাত পার হইতে হইবে। নেককারগণ সহজে উহা পার হইয়া বেহেশ্‌তে পৌঁছিবেন, আর পাপীরা উহার উপর হইতে দোযখের মধ্যে পড়িয়া যাইবে।

৪১। দোযখ এখনও বর্তমান আছে। তাহাতে সাপ, বিচ্ছু এবং আরও অনেক কঠিন কঠিন আযাবের ব্যবস্থা আছে। যাহাদের মধ্যে একটুকুও ঈমান থাকিবে, যতই গুনাহ্‌গার হউক না কেন, তাহারা নিজ নিজ গুনাহ্‌র পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর নবীগণের এবং বুযুর্গদের সুপারিশে নাজাত পাইয়া বেহেশ্‌তে যাইবে। আর যাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ঈমান নাই অর্থাৎ, যাহারা কাফির ও মুশ্‌রিক, তাহারা চিরকাল দোযখের আযাবে নিমজ্জিত থাকিবে, তাহাদের মৃত্যুও হইবে না।

৪২। বেহেশ্‌তও এখন বিদ্যামান আছে। সেখানে অসংখ্য প্রকারের সুখ-শান্তি এবং আমোদ-প্রমোদের উপকরণ মৌজুদ রহিয়াছে। যাঁহারা বেহেশ্‌তী হইবেন কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা কোন রকম চিন্তা-ভাবনা তাঁহাদের থাকিবে না। সেখানে তাঁহারা চিরকাল অবস্থান করিবেন। তাঁহাদিগকে কখনও তথা হইতে বহিষ্কার করা হইবে না; আর তাহাদের মৃত্যুও হইবে না।

৪৩। ছোট হইতে ছোট গুনাহ্‌র কারণেও আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিতে পারেন, আবার বড় হইতে বড় গুনাহ্‌ও তিনি মাত্রও শাস্তি না দিয়া মেহেরবানী করিয়া নিজ রহ্‌মতে মা'ফ করিয়া দিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলার সব কিছুরই ক্ষমতা আছে।

৪৪। শির্‌ক এবং কুফরির গুনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও মা'ফ করিবেন না; তদ্ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা মা'ফ করিয়া দিবেন। তাঁহার কোন কাজে কেহ বাধা দিতে পারে না।

৪৫। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রসূল যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া বেহেশ্তী বলিয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমরা সুনিশ্চিতভাবে বেহেশ্তী হওয়া সাব্যস্ত করিতে পারি না। তবে নেক আলামত দেখিয়া (অর্থাৎ, আমল আখ্লাক ভাল হইলে) ভাল ধারণা এবং আল্লাহ্র রহ্মতের আশা করা কর্তব্য।

৪৬। বেহেশ্তে আরামের জন্য অসংখ্য নেয়ামত এবং অপার আনন্দের অগণিত সামগ্রী মওজুদ আছে। সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে অধিক আনন্দদায়ক নেয়ামত হইবে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ। বেহেশ্তীদের ভাগ্যে এই নেয়ামত জুটিবে। এই নেয়ামতের তুলনায় অন্যান্য নেয়ামত কিছুই নয় বলিয়া মনে হইবে।

৪৭। জাগ্রত অবস্থায় চর্ম-চক্ষে এই দুনিয়ায় কেহই আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখে নাই, দেখিতে পারেও না। (অবশ্য বেহেশ্তীরা বেহেশ্তে দেখিতে পাইবে)।

৪৮। সারা জীবন যে যে-রূপই হউক না কেন, কিন্তু খাতেমা (অন্তিমকাল) হিসাবেই ভালমন্দের বিচার হইবে। যাহার খাতেমা ভাল হইবে সে-ই ভাল এবং সে পুরস্কারও পাইবে ভাল, আর যাহার খাতেমা মন্দ হইবে (অর্থাৎ, বে-ঈমান হইয়া মরিবে) সে-ই মন্দ এবং তাহাকে ফলও ভোগ করিতে হইবে মন্দ।

৪৯। সারা জীবনের মধ্যে মানুষ যখনই তওবা[১] করুক বা ঈমান আনুক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা কবূল করেন, কিন্তু মৃত্যুকালে যখন প্রাণ বাহির হইতে থাকে এবং আযাবের ফেরেশ্তাকে নজরে দেখিতে পায়, তখন অবশ্য তওবাও কবূল হয় না এবং ঈমানও কবূল হয় না।

ঈমান এবং আক্বায়েদের পর কিছু খারাব আক্বীদা ও খারাব প্রথা এবং কিছুসংখ্যক বড় বড় গুনাহ্ যাহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং যাহার কারণে ঈমানে নোক্ছান আসিয়া পড়ে তাহা বর্ণনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি, যেন জনগণ সে-সব হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহার মধ্যে কোনটি ত একেবারেই কুফর ও শিরক্মূলক, কোনটি প্রায়ই কুফর ও শিরক্মূলক, কোনটি বেদ্আত এবং গোমরাহী, আর কোনটি শুধু গুনাহ্। মোটকথা, ইহার সবগুলি হইতেই বাঁচিয়া থাকা একান্ত আবশ্যক। আবার যখন এইগুলির বর্ণনা শেষ হইবে, তখন গুনাহ্ করিলে দুনিয়াতেই যে-সব ক্ষতি হয় এবং নেক কাজ করিলে দুনিয়াতেই যে-সব লাভ হয় তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে। কারণ, মানুষ সাধারণতঃ দুনিয়ার লাভ-লোকসানের দিকেই বেশী লক্ষ্য করিয়া থাকে, তাই হয়ত কেহ এই ধারণায়ও কোন নেক কাজ করিতে পারে বা কোন গুনাহ্ হইতে দূরে থাকিতে পারে।

শির্ক ও কুফ্র

কুফ্র পছন্দ করা, কুফরী কোন কাজ বা কথাকে ভাল মনে করা[২] অন্য কাহারও দ্বারা কুফ্রমূলক কোন কাজ করান বা কুফ্রমূলক কোন কথা বলান, কোন কারণবশতঃ নিজের

টিকা

১ গুনাহ্ পরিত্যাগ করত অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়াকে তওবা বলে এবং কুফ্র ও শির্ক পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র ইস্লাম ধর্মের এবং আল্লাহ্র পয়গম্বরকে মানিবার অঙ্গীকার করাকে 'ঈমান' বলে।

২ আজকাল কোন কোন ধর্মজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারী যুবক হিন্দু ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মের প্রশংসা করিয়া ইসলামের নিন্দা করিয়া থাকে। ইহাতে ঈমান থাকে না।

মুসলমান হওয়ার উপর আক্ষেপ করা যে, হায়! যদি মুসলমান না হইতাম, তবে এই রকম উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম বা এই রকম সম্মান পাইতাম ইত্যাদি (নাঊযু বিল্লাহে মিন যালিক)। সন্তান বা অন্য কোন প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে এই রকম কথা বলাঃ 'খোদা তা'আলা মারিবার জন্য সংসারে আর কাহাকেও পায় নাই; বাছ, ইহাকেই পাইয়াছিল, ইহার জীবনটা লওয়াই খোদা তা'আলার মকছুদ ছিল, আল্লাহ্ তা'আলার এই রকম করা ভাল হয় নাই, বা উচিত ছিল না, এই রকম যুল্‌ম কেহ করে না ইত্যাদি; (আরও অনেক বেহুদা কথা যাহা সাধারণতঃ মূর্খেরা শোকে বিহ্বল হইয়া বলিয়া থাকে।)

খোদা বা রসূলের কোন হুকুমকে মন্দ জানা বা তাহাতে কোন প্রকার দোষ বাহির করা। কোন নবী বা ফিরিশ্‌তার উপর কোনরূপ দোষারোপ করা। কোন নবী বা ফিরিশ্‌তাকে ঘৃণা বা তুচ্ছ মনে করা। কোন পীর বা বুযুর্গ সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখা যে, নিশ্চয় তিনি সব সময় আমাদের সকল অবস্থা জানেন। গণক কিংবা যাহার উপর জ্বিনের আছর হইয়াছে, তাহার নিকট গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করা বা হাত ইত্যাদি দেখাইয়া ভাগ্য নির্ণয় করান এবং তাহাতে বিশ্বাস করা। কোন বুযুর্গের কালাম হইতে ফাল বাহির করিয়া উহাকে দৃঢ় সত্য মনে করা। কোন পীর বা অন্য কাহাকেও দূর হইতে ডাকিয়া মনে করা যে, তিনি আমার ডাক শুনিয়াছেন। কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য কাহাকেও লাভ-লোকসানের অধিকারী মনে করা। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট নিজের মকছুদ, টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি, রুযি-রোযগার, সন্তান ইত্যাদি চাওয়া। (কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য) কাহাকেও সেজ্‌দা করা, কাহারও নামে রোযা রাখা বা কাহারও নামে গরু ইত্যাদি কোন জানোয়ার ছাড়িয়া দেওয়া বা দরগাহে মান্নত মানা। কোন কবর বা দরগাহ্ বা পীর-বুযুর্গের ঘরের তওয়াফ করা (অর্থাৎ, চতুর্দিকে ঘোরা।) খোদা রসূলের হুকুমের উপর অন্য কাহারও হুকুমকে বা কোন দেশ-রেওয়াজ বা সামাজিক প্রথাকে (বা নিজের কোন পুরাতন অভ্যাসকে বা বাপ-দাদার কালের কোন দস্তুরকে) পছন্দ বা অবলম্বন করা। কাহারও সামনে সম্মানের জন্য (সালাম ইত্যাদি করিবার সময়) মাথা নোয়ান বা কাহারও সামনে মূর্তির মত খাড়া থাকা। কাহারও নামে কোন জানোয়ার যবাহ্ করা। উপরি দৃষ্টি বা জ্বিনের আছর ছাড়াইবার জন্য তাহাদের ভেট (নযরানা) দেওয়া, ছাগল বা কোন জানোয়ার যবাহ্ করা, কাহারও দোহাই দেওয়া। কা'বা শরীফের মত অন্য কোন জায়গার আদর তা'যীম করা। কাহারও নামে ছেলে-মেয়েদের নাক-কান ছিদ্র করা ও বালি, বোলাক ইত্যাদি পরান। কাহারও নামে বাজুতে পয়সা বা গলায় সূতা বাঁধা। নব বরের মাথায় সহরা অর্থাৎ ফুলের মালা বাঁধা, ইহা হিন্দুদের রস্‌ম। টিকি রাখা (কাহারও নামে চুল রাখা), কাহারও নামে ফকীর বানান। আলী বখ্‌শ, হোসাইন বখ্‌শ, আবদুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখা। (এরূপ এক কড়ি, বদন, পবন, গমন ইত্যাদি নাম রাখা) কোন প্রাণীর নাম কোন বুযুর্গের নাম অনুযায়ী রাখিয়া তাহার তা'যীম করা। পৃথিবীতে যাহাকিছু হয়, নক্ষত্রের তাছীরে হয় বলিয়া মনে করা। ভাল বা মন্দ দিন তারিখ জিজ্ঞাসা করা। লক্ষণ ধরা জিজ্ঞাসা করা। লক্ষণ ধরা[১] কোন মাস বা তারিখকে মন্‌হুছ (খারাব) মনে করা। কোন বুযুর্গের নাম ওযীফার মত জপা। এইরূপ বলা, যদি খোদা রসূল চায়, তবে এই কাজ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ, খোদার সঙ্গে রসূলকেও শামেল

টিকা

১ যেমন প্রথা আছে যে, হাত খুজলাইলে হাতে টাকা আসিবে। হাঁচি দিলে কার্য সিদ্ধি হইবে না। ডান চোখ লাফাইলে ভাল হইবে, বাম চোখ লাফাইলে বলে, বিপদ আসিবে।

করা। কাহারও নামের বা মাথার কসম খাওয়া। ছবি রাখা বিশেষতঃ বুযুর্গের ছবি বরকতের জন্য রাখা এবং উহার তা'যীম করা।

বেদ্‌আৎ—কুপ্রথা

(কোন বুযুর্গের) দরগায় ধুমধামের সহিত মেলা বা ওরস করা, বাতি জ্বালান, মেয়েলোকের তথায় যাওয়া, চাদর দেওয়া, কবর পাকা করা, কোন বুযুর্গকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁহার কবরকে অতিরিক্ত তা'যীম করা, কবর বা তা'যিয়া চুম্বন করা, কবরের মাটি শরীরে মাখা, তা'যীমের জন্য কবরের চারিদিকে তওয়াফ (ঘোরা) করা, কবর সেজ্‌দা করা, কবরের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়া, মিঠাই ইত্যাদি দরগাহে মানা বা দেওয়া, তা'যিয়া নিশান ইত্যাদি রাখা, উহার উপর হালুয়া বাতাশা প্রভৃতি রাখা, উহাকে সালাম করা। কোন জিনিসকে অচ্ছ্যুৎ মনে করা। মোহাররম মাসে পান না খাওয়া, মেহেন্দি, মিসি না লাগান, (নিরামিষ খাওয়া) স্বামীর কাছে না যাওয়া, লাল কাপড় না পরা ইত্যাদি। বিবি ফাতেমার নামে ফাতেহার উদ্দেশ্যে মাটির বরতনে খানা রাখাকে ছেহ্‌নক বলে, উহা হইতে পুরুষদিগকে খাইতে না দেওয়া। প্রকাশ থাকে যে, ইহা মেয়েদের জন্যও জায়েয নাই।

কেহ মারা গেলে তিজা, চল্লিশা জরুরী মনে করিয়া করা (অর্থাৎ, ৩ দিনের দিন বা ৪০ দিনের দিন মোল্লা মুন্সী বা যাহারা দাফন করিতে আসে, জরুরী মনে করিয়া তাহাদিগকে খাওয়ান বা বদনামীর ভয়ে ধুমধামের সহিত যেয়াফত করা।) প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহকে দূষণীয় মনে করা। বিবাহের সময়, খাৎনার সময়, বিস্‌মিল্লাহ্‌র সবক দেওয়ার সময়, কেহ মারা গেলে অসাধ্য সত্ত্বেও খান্দানী রসূমসমূহ বজায় রাখা (সামজিক প্রথাগুলি ঠিক রাখা)। বিশেষতঃ টাকা করয করিয়া নাচ, রং-তামাশা প্রভৃতি করান। হিন্দুদের কোন পূজা বা তেহার হুলি, দেওয়ালী—ইত্যাদিতে যোগদান করা। "আস্‌সালামু আলাইকুম" না বলিয়া তাহার পরিবর্তে আদাব (নমস্কার, প্রণিপাত ইত্যাদি) বলা বা কেবল হাত উঠাইয়া মাথা ঝুঁকান।[১] দেওর, ভাশুর, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, চাচাত ভাই, ননদের স্বামী বা ধর্ম-ভাই, ধর্ম-বাপ প্রভৃতির বা অন্য কোন না-মহরম[২] আত্মীয়ের সহিত দেখা দেওয়া। গান বাদ্য শোনা, নাচ দেখা বা তাহাদের গান-বাদ্যে বা নাচে সন্তুষ্ট হইয়া বখ্‌শিশ দেওয়া। নিজের বংশের গৌরব করা বা কোন বুযুর্গের খান্দানের হওয়া বা বুযুর্গের কাছে শুধু মুরীদ হওয়াকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করা। কাহারও বংশের মধ্যে দোষ থাকিলে তাহা বাহির করিয়া নিন্দা করা। কোন জায়েয পেশাকে অপমানজনক মনে করা (যেমন, মাছ বিক্রি করা, মজুরী করা, জুতা সেলাই করা ইত্যাদি।) কাহারও অতিরিক্ত প্রশংসা করা। বিবাহ-শাদীতে বেহুদা খরচ করা এবং অন্যান্য যে-সব বেহুদা কাজ আছে তাহা করা। (যেমন পণ লওয়া, খরচ বাবদ লওয়া, ঘাট-সেলামী, আগবাড়ানী, আন্দর সেলামী, হাত

টিকা

১ যে সমস্ত কুসংস্কার হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানদের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে এরকম আরও অনেক কুসংস্কার মূর্খতাবশতঃ সমাজে ঢুকিয়াছে—যে দিন ধান বুনে সে দিন খৈ ভাজে না, যে হাঁড়িতে করিয়া তিল বুনে সে হাঁড়ি বাড়ীতে আনিলে মাটিতে রাখে না, কলাগাছ লাগাইবার সময় উপরের দিকে দেখে না, নারিকেল, সুপারী, পানগাছ লাগায় না ইত্যাদি।

২ শরীঅত মত যাহাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয তাহাদিগকে 'না-মহরম' বলে।

ধোয়ানী, চিনি-মুখী প্রভৃতি বেহুদা আদায় করা;) সুন্নত তরীকা ছাড়িয়া এতদ্দেশে যে-সব প্রথা প্রচলিত আছে তাহা পালন করা। নওশাকে শরীঅতের খেলাফ পোশাক পরান। বরের হাতে কাঙ্গন বাঁধা, মাথায় ছহ্‌রা বাঁধা।

বরের মেহেন্দী লাগান, আতশবাজী ফুটান ইত্যাদি কাজে অনর্থক টাকা অপব্যয় করা। বরকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া তাহার সামনে না-মহরম মেয়েলোকের আসা, এইরূপ পরপুরুষের সামনে মুখ দেখান বা অন্যান্য খেশ আত্মীয়দের আনিয়া বৌ দেখান আরও গর্হিত কর্ম। বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি দিয়া দুল্‌হাকে দেখা। বয়স্কা শালীদের সামনে আসা এবং হাসি-ঠাট্টা করা, চৌথী খোলান, যে ঘরে বর ও কনে শয়ন করে সেই ঘরের আশেপাশে থাকিয়া তাহাদের কথাবার্তা শোনা বা উঁকি দিয়া দেখা এবং যদি কোন কথা জানিতে পারে, তবে অন্যকে জানাইয়া দেওয়া। লজ্জায় নামায পর্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া। বড় মানুষী দেখাইবার জন্য মহর বেশী নির্ধারণ করা। শোকে-দুঃখে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করা বা বুক চাপড়াইয়া বিলাপ করা। মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলা। যে-সব কাপড় মৃতের গায়ে লাগিয়াছে সে-সব নাপাক না হইলেও ধোয়া জরুরী মনে করা। যে-গৃহে লোক মারা গিয়াছে সে-গৃহে বৎসর খানেক বা কিছু কম-বেশী দিন না যাওয়া বা কোন খুশীর কাজ (যেমন, বিবাহ ইত্যাদি) না করা। নির্দিষ্ট তারিখে আবার শোককে তাজা করা। অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা করা।

সাদাসিদা লেবাস-পোশাককে ঘৃণা করা। ঘরে জীব-জন্তুর ছবি লাগান, সোনা রূপার পানদান, সুরমাদান, বাসন, পেয়ালা ব্যবহার করা। শরীর দেখা যায় এইরূপ পাতলা কাপড় পরিধান করা। বাজনাদার জেওর পরিধান করা। পুরুষদের সভায় মেয়েদের যাওয়া বিশেষতঃ তাযিয়া, ওরস বা মেলা দেখিতে যাওয়া। স্ত্রীলোকদের এরূপ পোশাক পরা যাহাতে পুরুষের মত দেখা যায় এবং পুরুষদেরও এমন পোশাক পরা যাহাতে স্ত্রীলোকের মত দেখায়। শরীরে গুদানী দেওয়া[১] বিদেশে যাইবার সময় বা বিদেশ হইতে আসিয়া কোন না-মহরমের সঙ্গে মো'আনাকা করা। সন্তান জীবিত থাকার জন্য তাহার নাক কান ছিদ্র করা। পুত্র সন্তানকে বালা, ঘুগরা ইত্যাদি জেওর পরান বা রেশমী কাপড় পরান। ছেলেপেলেকে ঘুম পাড়ানোর জন্য আফিং বা নিশাদার জিনিস খাওয়ান। রোগের জন্য বাঘের বা হারাম জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়ান। এই রকম আরও অনেক বিষয় আছে, কোনটি শিরক ও কুফ্‌রমূলক, আর কোনটি বেদ্‌আত ও হারাম। চিন্তা করিলে বা কোন দ্বীনদার আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে বেশী জানা যাইবে। নমুনা স্বরূপ এতটুকু বর্ণনা করিলাম।

কতিপয় বড় বড় গুনাহ্‌

খোদার সঙ্গে অপর কাহাকেও শরীক করা। অনর্থক খুন করা (মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা বা বান মারিয়া যে কাহাকেও মারা হয় তাহাতেও খুন করার গুনাহ্‌ হইবে। বন্ধ্যা রমণীর এমন টোট্‌কা করা যে, অমুকের সন্তান মরিয়া যাইবে এবং তাহার সন্তান পয়দা হইবে। ইহাও খুনের শামিল। মা-বাপকে কষ্ট দেওয়া। যিনা (ব্যভিচার) করা। এতীমের মাল খাওয়া; যেমন অনেক স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া বসে এবং নাবালেগ ছেলেমেয়েদের অংশে যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করে। মেয়েদের অংশ (হক) না দেওয়া, সামান্য কারণেই কোন স্ত্রীলোকের উপর যিনার

টিকা

১ শরীরে কোন জীবের ছবি বা নাম অঙ্কন করা।

তোহ্মত (দোষারোপ) দেওয়া। কাহারও উপর যুল্ম করা। অসাক্ষাতে কাহারও শেকায়েত করা। আল্লাহ্র রহ্মত হইতে নিরাশ হইয়া যাওয়া। ওয়াদা করিয়া তাহা পুরা না করা, আমানতে খেয়ানত করা। খোদা তা'আলার কোন ফরয, যেমন—নামায, রোযা, যাকাৎ, হজ্জ ইত্যাদি ছাড়িয়া দেওয়া। কোরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া, মিথ্যা কথা বলা, বিশেষতঃ মিথ্যা কসম খাওয়া। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও কসম খাওয়া বা এই রকম কসম খাওয়া যে, মরণকালে যেন কলেমা নছীব না হয়, বা ঈমানের সাথে মউত না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও সেজ্দা করা। বিনা ওযরে নামায কাযা করা। কোন মুসলমানকে বেঈমান কাফের বা খোদার দুশমন বলা বা এই রকম বলা যে, তাহার উপর খোদার লা'নত হউক, খোদার গযব পড়ুক। কাহারও নিন্দাবাদ, গীবৎ শেকায়েত শোনা, চুরি করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, ধান-চাউলের দর বাড়িলে মনে মনে খুশী হওয়া, দাম ঠিক করিয়া আবার পরে কম নেওয়া (যেমন সাধারণতঃ নামের জন্য বড় লোকেরা গরীব লোকদের সঙ্গে করিয়া থাকে।) না-মহ্রমের কাছে নির্জনে একাকী বসা। জুয়া খেলা। কাফেরদের মধ্যে প্রচলিত রেওয়াজ পছন্দ করা। খাবার কোন জিনিসকে মন্দ বলা। নাচ দেখা। গান-বাদ্য শোনা। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নছীহত না করা। হাসি-তামশা করিয়া কাহাকেও লজ্জা এবং অপমানিত করা। পরের দোষ দেখা ইত্যাদি কবীরা (বড়) গুনাহ্।

গুনাহ্র কারণে পার্থিব ক্ষতি

গুনাহ্র কারণে এল্ম হইতে মাহ্রূম থাকিতে হয়। রুজিতে বরকত হয় না, এবাদতে মন বসে না, নেক লোকের সংসর্গ ভালবাসে না। অনেক সময় কাজে নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন আসিয়া দাঁড়ায়, অন্তর পরিষ্কার থাকে না ময়লা পড়িয়া যায়, মনের সাহস কমিয়া যায়, এমন কি, অনেক সময় মনের দুর্বলতা হেতু শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। (মনে স্ফূর্তি থাকে না)। নেককাজ ও এবাদত বন্দেগী হইতে মাহ্রূম থাকে। আয়ু কমিয়া যায়। তওবা করার তওফীক হয় না। গুনাহ্ করিতে করিতে শেষে গুনাহ্র কাজের প্রতি ঘৃণার ভাব থাকে না, (বরং ভাল বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এরূপ হওয়া বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা); আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হয়। একজনের গুনাহ্র দরুন অন্যান্য লোক, এমন কি, অন্যান্য জীব-জন্তুরও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়। পরে তাহাদের বদদো'আ ও লা'নতে (অভিশাপে) পড়িতে হয়। জ্ঞান বুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ হইতে তাহার প্রতি লা'নত হইতে থাকে। ফিরিশ্তাগণের দো'আ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। দেশে শস্য-ফসলাদির উৎপন্ন কম হয়। লজ্জা-শরম কম হইয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা যে কত বড় এবং ক্ষমতাশালী সে খেয়াল তাহার অন্তরে থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। নানারূপ বিপদ-আপদ বালামুছীবতে জড়াইয়া পড়ে। শয়তান তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে। দেল পেরেশান থাকে। মৃত্যুকালে মুখ দিয়া কলেমা বাহির হয় না। খোদার রহ্মত হইতে নিরাশ হইয়া যায়। পরিশেষে বিনা তওবায় মারা যায়।

নেক কাজে পার্থিব লাভ

সর্বদা নেক কাজে মশগুল থাকিলে রিযিক বৃদ্ধি হয়, সকল কাজে বর্কত হইয়া থাকে। মনের অশান্তি ও কষ্ট দূর হয়, মনের আশা সহজে পুরা হয়, জীবনে শান্তি লাভ হয়, রীতিমত বৃষ্টিপাত

হয়, সকল প্রকার বালা-মুছীবত, বিপদ-আপদ দূর হয়, আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবান এবং সহায় হন। তাহার হৃদয় মজবুত রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাকে আদেশ করেন। মান মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, সকলে তাহাকে ভালবাসে। কোরআন শরীফ তাহার রোগ আরোগ্যের উছীলা হয়, টাকা-পয়সার দিক দিয়া কোনরূপ ক্ষতি হইলে তাহা অপেক্ষা আরও ভাল জিনিস পাওয়া যায়। দিন দিন আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত তাহার জন্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ধন-দৌলত বৃদ্ধি পায়, মনে শান্তি বজায় থাকে, তাহার উছীলায় পরবর্তী বংশধরদের অনেক উপকার হয়। জীবিত অবস্থায়, স্বপ্নে বা অন্য কোন অবস্থায় গায়েবী বশারত (খোশ্‌খবরী) পায়। মৃত্যুর সময় ফেরেশ্‌তা খোশ্‌খবরী শোনায় এবং ধন্যবাদ দেয়। আয়ু বৃদ্ধি হয়, দরিদ্রতা এবং অনাহারজনিত দুঃখ-কষ্ট দূর হয়, অল্প জিনিসে বেশী বরকত হয়, আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ দূর হয়।

হে খোদা! নিজ রহমতে আমাদের যাবতীয় গোনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখুন এবং আপনার সন্তুষ্টির পথে সকলকে চলিবার তওফীক দান করুন।

ওযূর মাসায়েল

ওযূর তরতীবঃ

(ওযূ আরম্ভকালে প্রথমে মনকে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করিবে। চিন্তা করিয়া স্থির করিবে যে, কেন ওযূ করিতেছ যেমন হয়ত নামায পড়িবার জন্য ওযূ করিবে, তখন চিন্তা করিবে, নামায পড়া হইল আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়া। আল্লাহ্‌র দরবার পাক, সে দরবারে বিনা ওযূতে যাওয়া যায় না। তাই আমি নামায পড়িবার জন্য অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হইবার নিমিত্ত ওযূ করিতেছি। এইরূপে যদি কোরআন শরীফ পড়িবার জন্য ওযূ কর, তখন একাগ্র মনে চিন্তা করিবে যে, আমি আল্লাহ্‌র পাক কালাম কোরআন শরীফ পড়িবার জন্য ওযূ করিতেছি।)

১। **মাসআলাঃ** কেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় বসিবে—যেন ওযূর পানির ছিঁটা নিজের উপর আসিতে না পারে। —মুনিয়া

২। **মাসআলাঃ** বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া ওযূ শুরু করিবে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

৩। **মাসআলাঃ** সর্বপ্রথমে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুইবে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

৪, ৫, ৬। **মাসআলাঃ** তারপর তিনবার কুল্লি করিবে এবং মিসওয়াক করিবে, যদি মিস্‌ওয়াক না থাকে, তবে মোটা কাপড় বা হাতের আঙ্গুল বা অন্য কিছু দ্বারা দাঁতগুলিকে বেশ পরিষ্কার করিবে। যদি রোযা না হয়, তবে গরগরা করিয়া ভালরূপে সমস্ত মুখগহ্বরে পানি পৌঁছাইবে। রোযা অবস্থায় গরগরা করিবে না। কেননা, হয়ত কিছু পানি হল্‌কুমের মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে। —আলমগীরী

৭। **মাসআলাঃ** তারপর তিনবার নাকে পানি দিবে। বাম হাত দিয়া নাক ছাফ করিবে। রোযা অবস্থায় নাকের ভিতরে নরম অংশের উপর পানি পৌঁছাইবে না[১]। —মুঃ, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া

৮। **মাসআলাঃ** তারপর তিনবার মাথার চুলের গোড়া হইতে থুত্‌নি পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হইতে অন্য কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত মুখ ভাল করিয়া উভয় হাত দিয়া ডলিয়া মলিয়া

টিকা

১ বাম হাতের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নাকের ভিতর পরিষ্কার করিবে।

ধুইবে—যেন সব জায়গায় পানি পৌঁছে। উভয় ভ্রূর নীচেও খেয়াল করিয়া পানি পৌঁছাইবে যেন কোন স্থান শুক্‌না না থাকে। —মারাকিউল ফালাহ

৯। মাসআলাঃ অতঃপর ডান হাতের কনুইসহ ভাল করিয়া তিন বার ধুইবে। তারপর বাম হাতও ঐরূপে কনুইসহ ধুইবে। এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া খেলাল করিবে। হাতের আংটি, চুড়ি ইত্যাদি নাড়িয়া চাড়িয়া ভালমতে পানি পৌঁছাইবে যেন একটি পশমও শুষ্ক না থাকে। —কবীরী

১০। মাসআলাঃ তারপর সমস্ত মাথা একবার মছহে করিবে। শাহাদাত আঙ্গুল দিয়া কানের ভিতর দিক এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়া বাহিরের দিক মছহে করিবে এবং হাতের আঙ্গুলের পিঠের দিক দিয়া ঘাড় মছহে করিবে, কিন্তু গলা মছহে করিবে না। কেননা গলা মছহে করা ভাল নহে; বরং নিষেধ আছে। কান মছহে করিবার জন্য নূতন পানি লইবার প্রয়োজন নাই, মাথা মছহে করার জন্য ভিজান হাত দ্বারাই মছহে করিবে। —কবীরী, মুনিয়া

১১। মাসআলাঃ তারপর তিনবার টাখ্‌না (ছোট গিরা) সহ উভয় পা ধুইবে। প্রথমে ডান পা এবং পরে বাম পা ভাল করিয়া ডলিয়া মলিয়া ধুইবে। পায়ের তলা এবং গোড়ালির দিকে খুব খেয়াল রাখিবে, যেন কোন অংশ শুক্‌না থাকিয়া না যায়। বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী নীচের দিক হইতে প্রবেশ করাইয়া পায়ের অঙ্গুলীগুলি খেলাল করিবে। ডান পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী হইতে শুরু করিয়া বাম পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলীতে গিয়া শেষ করিবে। এই হইল ওযূ করিবার নিয়ম।

১২। মাসআলাঃ কিন্তু এই সমস্ত কাজের মধ্যে কতিপয় কাজ এমন আছে, যাহা ছুটিয়া গেলে বা তাহার কিছু বাকী থাকিলে ওযূ আদৌ হয় না; পূর্বে যেমন বে-ওযূ ছিল এখনও সেই রকম বে-ওযূই রহিল। এই রকম কাজগুলিকে "ফরয" বলে। আর কতিপয় কাজ এমন আছে, যাহা ছুটিয়া গেলে ওযূ হইয়া যায় বটে, কিন্তু করিলে সওয়াব মিলে, তাহা করার জন্য তাকীদও আছ। এমন কি, যদি কেহ অধিকাংশ সময়ে ছাড়িয়া দেয়, তবে সে গোনাহ্‌গার হয়। এই সব কাজকে "সুন্নত" বলে। আর যে-সব কাজ করিলে সওয়াব মিলে, অন্যথায় গোনাহ্ হয় না এবং তৎপ্রতি শরীঅতের কোনও তাকীদ নাই, এইরূপ কাজগুলিকে "মোস্তাহাব" বলে।

—কবীরী, রদ্দুল মোহ্‌তার

১৩। মাসআলাঃ ওযূর ফরযঃ ওযূর ফরয শুধু চারিটি কাজ—১। সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া ২। কনুইসহ এক একবার উভয় হাত ধোয়া ৩। মাথার চারি ভাগের এক ভাগ একবার মছ্‌হে করা ৪। টাখ্‌নাসহ উভয় পা একবার ধোয়া। ইহার মধ্যে যদি একটি কাজও ছুটিয়া যায় বা চুল পরিমাণ জায়গাও শুক্‌না থাকে, তবে ওযূ হইবে না। —মাজমাউল আনহার

১৪। মাসআলাঃ ওযূর সুন্নতঃ ওযূর সুন্নত দশটি। ১। বিসমিল্লাহ্ বলিয়া আরম্ভ করা। ২। কব্জীসহ দুই হাত তিন তিনবার ধোয়া ৩। কুল্লি করা ৪। নাকে পানি দেওয়া ৫। মেসওয়াক করা ৬। সমস্ত মাথা একবার মছ্‌হে করা ৭। প্রত্যেক অঙ্গকে তিন তিনবার করিয়া ধোয়া ৮। কান মছ্‌হে করা। ৯-১০। হাত ও পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা। এই সুন্নত এবং ফরযগুলি ব্যতীত অন্য যে কাজগুলি আছে তাহা মোস্তাহাব। —মারাকিউল ফালাহ্

১৫। মাসআলাঃ যে চারিটি অঙ্গ ধোয়া ফরয সেইগুলি ধোয়া হইয়া গেলে ওযূ হইয়া যাইবে। ইচ্ছা করিয়া ধুইয়া থাকুক বা অনিচ্ছায় ধুইয়া থাকুকু, নিয়ত করিয়া থাকুক বা না করিয়া থাকুক। যেমন, গোছলের সময় ওযূ না করিয়া সমস্ত শরীরে পানি ঢালিয়া দিল বা পুকুরের মধ্যে

পড়িয়া গেল বা বৃষ্টিতে ভিজিল, ইহাতে যদি এই চারিটি অঙ্গ পূর্ণরূপে ধোয়া হইয়া যায়, তবে ওযূ হইয়া যাইবে, কিন্তু নিয়ত না থাকার দরুন ওযূর সওয়াব পাইবে না। —মুন্‌ইয়াহ

১৬। মাসআলাঃ উপরে লিখিত তর্‌তীব অনুযায়ী ওযূ করাই সুন্নত। কিন্তু যদি কেহ উহার ব্যতিক্রম করে, যেমন, প্রথমে পা ধুইল, তারপর মাথা মছহে করিল তারপর হাত বা অন্য কোন অঙ্গ আগে পরে ধুইল, তবুও ওযূ শুদ্ধ হইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে। ইহাতে গোনাহ্ হওয়ারও আশঙ্কা আছে; অর্থাৎ, যদি এই রকম উল্টা ওযূ করার অভ্যাস করে, তবে গোনাহ্ হইবে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

১৭। মাসআলাঃ এইরূপ যদি বাম পা বা বাম হাত আগে ধোয়, তবুও ওযূ হইয়া যাইবে, কিন্তু মোস্তাহাবের খেলাফ হইবে। —মারাকী

১৮। মাসআলাঃ এক অঙ্গ ধুইয়া অন্য অঙ্গ ধুইতে এত দেরী করিবে না যে, প্রথম অঙ্গ শুকাইয়া যায়। এরূপ দেরী করিলে অবশ্য ওযূ হইয়া যাইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে। —আলমগীরী

১৯। মাসআলাঃ প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার সময় হাত দিয়া ঘষিয়া মাজিয়া ধোয়াও সুন্নত, যেন কোন জায়গা শুক্‌না না থাকে (শীতকালে মলিয়া ধোয়ার বেশী আবশ্যক; কেননা, তখন শুকনা থাকিয়া যাইবার বেশী আশঙ্কা।) —মারাকী

২০। মাসআলাঃ নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই ওযূ করিয়া নামাযের আয়োজন করা এবং নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল এবং মোস্তাহাব। —মারাকী

২১। মাসআলাঃ একান্ত ওযর না হইলে নিজের হাতেই ওযূ করিবে, অন্যের দ্বারা পানি ঢালাইবে না। ওযূর সময় অনাবশ্যক দুন্‌ইয়াবী কথা বলিবে না; বরং প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার সময় বিসমিল্লাহ্ এবং কলেমা পড়িবে। পানি যতই বেশী থাকুক না কেন, এমন কি নদীতে ওযূ করিলেও জরুরতের বেশী পানি খরচ করিবে না; অবশ্য এত কমও খরচ করিবে না যে, অঙ্গগুলি ভালমত ধুইতে কষ্ট হয়। কোন অঙ্গ তিনবারের বেশীও ধুইবে না। মুখ ধুইবার সময় পানি বেশী জোরে মুখে মারিবে না, ফুঁক মারিয়া পানি উড়াইবে না, মুখ এবং চোখ অতি জোরের সহিত বন্ধ করিবে না। কেননা, এইসব কাজ মাকরূহ্ এবং নিষেধ। যদি মুখ এবং চোখ এরকম জোরে বন্ধ করিয়া রাখা হয় যাহাতে চোখের পলক বা ঠোঁটের কিছু অংশ ধোয়া হইল না, বা চোখের কোণায় পানি পৌঁছাইল না, তবে ওযূই হইবে না। —কবীরী

২২। মাসআলাঃ আংটি, চুড়ি, বালা যদি এরকম ঢিলা হয় যে, সহজেই উহার নীচে পানি পৌঁছিতে পারে, তবুও সেগুলি নাড়াইয়া ভালরূপে খেয়াল করিয়া উহার নীচে পানি পৌঁছান মোস্তাহাব। আর যদি ঢিলা না হয় এবং পানি না পৌঁছিবার আশঙ্কা থাকে, তবে সেগুলিকে ভালরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া নীচে পানি পৌঁছান ওয়াজিব। নাকের নথ চুন্নিরও এই হুকুম যে, যদি ছিদ্র ঢিলা হয়, তবে নাড়িয়া পানি পৌঁছান মোস্তাহাব; আর যদি ছিদ্র আঁটা হয়, তবে মুখ ধুইবার সময় নথ, বালি ভালরূপে ঘুরাইয়া পানি পৌঁছান ওয়াজিব।

—কবীরী

২৩। মাসআলাঃ নখের ভিতরে আটা জমিয়া (অথবা কোন স্থানে চুন ইত্যাদি) শুকাইয়া থাকিলে ওযূর সময় যদি তাহার নীচে পানি না যায়, তবে ওযূ হইবে না, যখন মনে আসে এবং আটা দেখে, তখন আটা (ও চুন ইত্যাদি) ছাড়াইয়া তথায় পানি ঢালিয়া দিবে (সম্পূর্ণ ওযূ

দোহ্রাইবে না)। পানি ঢালার পূর্বে নামায পড়িয়া থাকিলে সেই নামায দোহ্রাইয়া পড়িতে হইবে। —গুন্ইয়া পৃঃ ৪৬

২৪। মাসআলা ঃ কপালে ও মাথায় আফ্শান (এবং নখে নখ-পালিশ) ব্যবহার করিলে তাহার আটা উঠাইয়া ধুইতে হইবে, নতুবা ওযূ বা গোসল কিছুই হইবে না।

২৫। মাসআলা ঃ ওযূ শেষে একবার সূরা-ক্বদর এবং এই দো'আ পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর, তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত কর, রোজ হাশরে যাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না। —কবীরী

২৬। মাসআলা ঃ ওযূ করার পর দুই রাকা'আত 'তাহিয়্যাতুল ওযূ' নামায পড়া ভাল। হাদীস শরীফে ইহার অনেক ফযীলত বর্ণিত আছে। —কবীরী

২৭। মাসআলা ঃ এক ওয়াক্তের নামাযের জন্য ওযূ করিয়াছে, সে ওযূ এখনও টুটে নাই, ইতিমধ্যে অন্য নামাযের ওয়াক্ত হইল, এখন সেই ওযূ দিয়াই এই নামায পড়িতে পারে। কিন্তু নূতন ওযূ করিলে সওয়াব অনেক বেশী পাইবে।

২৮। মাসআলা ঃএকবার ওযূ করিয়াছে এখনও সেই ওযূ টুটে নাই, অন্য এবাদতও সেই ওযূর দ্বারা করে নাই, এখন পুনঃ ওযূ করা মাকরূহ্ এবং নিষেধ। সুতরাং গোসলের সময় ওযূ করিয়া থাকিলে সেই ওযূর দ্বারাই নামায পড়িবে; সে ওযূ না টুটা পর্যন্ত পুনঃ ওযূ করিবে না। যদি দুই রাকা'আত নামাযও ঐ ওযূর দ্বারা পড়িয়া থাকে, তবে আবার ওযূ করিলে কোন ক্ষতি নাই; বরং ওযূ করিলে বেশী সওয়াব পাইবে। —মারাকী

২৯। মাসআলা ঃ হাত পা কাটিয়া গিয়াছে এবং সেখানে ঔষধ লাগাইয়াছে ঔষধ ছাড়াইয়া ওযূ করিলে ক্ষতি হয়। এখন যদি সেই ঔষধ না ছাড়াইয়া শুধু উপর দিয়া পানি ঢালিয়া লয়, তবুও ওযূ হইয়া যাইবে। —ছগীরী

৩০। মাসআলা ঃ ওযূ করিবার সময় হয়ত পায়ের গোড়ালি বা অন্য কোন জায়গায় পানি পৌঁছে নাই, ওযূ করিবার পর নযর পড়িয়াছে; এখন সেই জায়গা শুধু হাতে ডলিয়া দিলে ওযূ হইবে না, পানি ঢালিয়া দিতে হইবে।

৩১। মাসআলা ঃ শরীরে ফোঁড়া বা অন্য কোন রোগ এই রকম আছে যে, পানি লাগিলে ক্ষতি হয়, তবে যেখানে পানি লাগিলে ক্ষতি হয়, সেখানে পানি না লাগাইয়া শুধু ভিজা হাত দিয়া মুছিয়া লইতে পারে (এইরূপ মুছিয়া লওয়াকে 'মছ্হে' বলে)। আর যদি শুধু মুছিয়া লইলেও ক্ষতি হয়, তবে সে জায়গাটুকু একেবারে ছাড়িয়াও দিতে পারে। —মারাকী

৩২। মাসআলা ঃ যখমের পট্টি খুলিয়া যখমের উপরও মছ্হে করিলে যদি ক্ষতি হয়, বা পট্টি খুলিতে খুব কষ্ট হয়, তবে পট্টির উপরও মছ্হে করা চলে। এমন অবস্থা না হইলে পট্টির উপর মছ্হে করা দুরুস্ত হইবে না। (যদিও ধোয়া না হয়।) —শরহে বেকায়া-১

৩৩। মাসআলা ঃ সম্পূর্ণ পট্টির নীচে যদি যখম না থাকে, তবে যদি পট্টি খুলিয়া যখমের জায়গা ছাড়িয়া অন্য জায়গা ধুইতে পারে, তবে ধুইতে হইবে। আর যদি পট্টি খুলিতে না

পারা যায়, তবে যখমের জায়গায় এবং যে জায়গায় যখম নাই সে জায়গাও মছ্‌হে করিয়া লইবে। —কবীরী

৩৪। মাসআলাঃ হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে বাঁশের চটা দিয়া যে তেকাঠিয়া বাঁধে তাহার হুকুমও পট্টিরই মত যতদিন তেকাঠি খুলিতে না পারে, তেকাঠির উপরই মছ্‌হে করিয়া লইবে এবং সিঙ্গার উপর পট্টিরও এই হুকুম, যদি যখমের উপর মছ্‌হে করিতে না পারে, তবে পট্টি খুলিয়া কাপড়ের ব্যাণ্ডিজের উপর মছ্‌হে করিবে। আর যদি খুলিবার ও বাঁধিবার লোক না পাওয়া যায়, তবে পট্টির উপরই মছ্‌হে করিবে। —কবীরী

৩৫। মাসআলাঃ মছ্‌হে করিতে হইলে সমস্ত পট্টির উপর মছ্‌হে করা ভাল, কিন্তু অর্ধেকের বেশীর ভাগ মছ্‌হে করিলেও ওযূ হইয়া যাইবে। আর যদি সমান অর্ধেক বা কম অর্ধেক করে, তবে ওযূ আদৌ হইবে না। —গুনইয়া

৩৬। মাসআলাঃ হঠাৎ পট্টি পড়িয়া গেল, এখনও যখম ভাল হয় নাই, তবে পট্টিই বাঁধিয়া লইবে, আর পূর্বের মছ্‌হে বাকী থাকিবে। আবার মছ্‌হে করিতে হইবে না। যদি যখম ভাল হইয়া থাকে আর পট্টি বাঁধার দরকার না থাকে, তবে মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে, নূতন ওযূ না করিয়া শুধু ঐ স্থানটুকু ধুইয়াও নামায পড়িতে পারে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

১-১১ নং (বেহেশ্‌তী গওহর হইতে)

১। মাসআলাঃ পুরুষগণ ওযূর সময় তিনবার মুখমণ্ডল ধোয়ার পর দাড়ি খেলাল করিবে। অর্থাৎ, ভিজা হাতের আঙ্গুল দাড়ির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাড়ি ভিজাইবে। তিনবারের বেশী খেলাল করিবে না। —দোর্‌রে মুখতার

২। মাসআলাঃ ওযূর সময় দাড়ি এবং কানের মধ্যবর্তী স্থানটুকু ধোয়া ফরয, সেখানে দাড়ি থাকুক বা না থাকুক । —শরহে তানবীরুল আবছার

৩। মাসআলাঃ ওযূর মধ্যে থুতনী ধৌত করা ফরয, যদিও তাহার উপর দাড়ি না থাকুক বা দাড়ি থাকুক। —শরহে তানবীরুল আবছার

৪। মাসআলাঃ মুখ বন্ধ করিলে ঠোঁটের যে অংশ স্বভাবিকভাবে বাহিরে দেখা যায়, তাহাও ওযূর মধ্যে ধোয়া ফরয। —শামী

৫। মাসআলাঃ দাড়ি, মোচ বা ভ্রূ ঘন হওয়ার দরুন ভিতরকার চামড়া দেখা না গেলে, উহার নীচের চামড়া ধোয়া ফরয নহে; বরং ঐ দাড়িকেই চামড়ার পরিবর্তে ধরিতে হইবে এবং দাড়ির উপর দিয়া পানি বহাইয়া দিলেই ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

৬। মাসআলাঃ দাড়ি, মোচ ও ভ্রূ যদি এত হালকা হয় যে, নীচের চামড়া দেখা যায়, তবে মুখমণ্ডলের সীমার মধ্যে দাড়ি ধোয়াই ফরয্ উহার বাহিরের দাড়ি ধোয়া ফরয নহে।

৭। মাসআলাঃ যদি কাহারও মলদ্বারের ভিতরের অংশ দ্বার হইতে বাহির হইয়া আসে (ইহা এক প্রকার রোগ বিশেষ), তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —শামী। চাই সে অংশ পুনরায় নিজে নিজেই ভিতরে প্রবেশ করুক কিংবা হাত বা কাপড়ের সাহায্যে ভিতরে প্রবেশ করান হউক।

৮। মাসআলাঃ যদি বিনা উত্তেজনায় (যেমন ভারী কোন বোঝা উঠাইলে বা উপর হইতে নীচে পড়িয়া গেলে তাহাতে) মনি বাহির হয়, এমতাবস্থায় গোসল ফরয হইবে না বটে, কিন্তু ওযূ টুটিয়া যাইবে। —কাযীখান

৯। **মাসআলা ঃ** (বেহুশ বা পাগল হইলে ওযূ টুটিয়া যাইবে, কিন্তু) যদি মস্তিষ্ক সামান্য পরিমাণে বিকৃত হয় এবং তাহাতে বেহুশ বা পাগল না হয়, তবে ওযূ টুটিবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে তন্দ্রা অবস্থায় উচ্চ হাসিলে ওযূ যাইবে না।

১১। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামায ও তেলাওয়াতের সজ্‌দার সময় উচ্চ হাস্য করিলে বালেগ ব্যক্তিরও ওযূ নষ্ট হইবে না, না-বালেগ ব্যক্তিরও না।—মুনিয়া

ওযূ নষ্ট হইবার কারণ

১। **মাসআলা ঃ** মলমূত্র বাহির হইলে এবং পায়খানার রাস্তা দিয়া বাতাস বাহির হইলে ওযূ টুটিয়া যায়, আর যদি পেশাবের রাস্তা দিয়া কখনও বাতাস বাহির হয়, যেমন কোন কোন রোগের কারণে বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে ওযূ টুটে না। আর যদি কোন পোকা বা পাথর বাহির হয় (তা চাই পায়খানার রাস্তা দিয়া বাহির হউক বা পেশাবের রাস্তা দিয়া) তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —কবীরী

২। **মাসআলা ঃ** যখম বা কান হইতে পোকা বাহির হইলে ওযূ টুটে না। যখম হইতে কিছু গোশ্‌ত কাটিয়া পড়িয়া গেলে রক্ত বাহির না হইলে, তাহাতে ওযূ টুটে না।

৩। **মাসআলা ঃ**সিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করিলে, বা নাক দিয়া রক্ত আসিলে, কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থান বা কোন ফোঁড়া-বাঘি হইতে রক্ত পুঁজ বাহির হইলে ওযূ টুটিয়া যাইবে, কিন্তু রক্ত যদি যখমের মধ্যেই থাকে, নির্গত স্থান হইতে বহিয়া না যায়,তবে ওযূ টুটিবে না। সুতরাং যদি হাতে সূচ বিদ্ধ হইয়া রক্ত বাহির হয় এবং এদিক ওদিক বহিয়া না যায়, তবে ওযূ যাইবে না। কিন্তু যদি এক বিন্দুও এদিক ওদিক গড়াইয়া যায়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —গুনইয়া

৪। **মাসআলা ঃ** নাক ছাফ করিবার সময় যদি জমাট বাঁধা রক্ত বাহির হয় তবে তাহাতে ওযূ যাইবে না। কেননা, পাতলা তরল রক্ত বাহির হইয়া বহিয়া গেলে ওযূ টুটিয়া যায়। সুতরাং যদি নাকে আঙ্গুল দিলে তাহাতে রক্তের দাগ দেখা যায়, কিন্তু সে রক্ত বাহিয়া না আসে, তবে তাহাতে ওযূ নষ্ট হইবে না। —গুনইয়া

৫। **মাসআলা ঃ** চোখে কোন দানা ছিল, তাহা ভাংগিয়া গিয়া পানি বাহিয়া গিয়াছে, কিন্তু চোখের ভিতরেই রহিয়াছে, বাহিরে আসে নাই, তাহাতে ওযূ যাইবে না; কিন্তু বাহিরে আসিয়া থাকিলে ওযূ টুটিয়া যাইবে। এরূপ যদি কানের মধ্যে কোন দানা থাকে আর পুঁজ বা রক্ত বাহির হয়, তবে দেখিতে হইবে যে, রক্ত বা পুঁজ যদি গোসলের সময় যে-পর্যন্ত ধোয়া ফরয সে পর্যন্ত না আসিয়া থাকে, তবে ওযূ যায় নাই, আর যদি সে পর্যন্ত আসিয়া থাকে, তবে ওযূ টুটিয়া গিয়াছে। —গুনইয়া

৬। **মাসআলা** ফোঁড়া বা ফোস্কার উপরের চামড়া উঠাইয়া ফেলিলে যদি ভিতরে রক্ত বা পুঁজ দেখা যায় কিন্তু বাহিয়া বাহিরে না আসে, তবে ওযূ যায় না, বাহিরে বাহিয়া আসিলে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —গুনইয়া

৭। **মাসআলা ঃ** ফোঁড়া ইত্যাদির যখম খুব গভীর হইলেও যে-পর্যন্ত রক্ত বা পুঁজ মুখের বাহিরে না আসে সে পর্যন্ত ওযূ যায় না।

৮। **মাসআলা ঃ** ফোঁড়া বা বাঘির রক্ত নিজে বাহির হয় নাই, যদি টিপিয়া বাহির করা হইয়া থাকে এবং যখমের বাহিরে বাহিয়া যায়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে।

৯। মাসআলাঃ কাহারও যখম হইতে একটু একটু করিয়া রক্ত বাহির হইতেছে আর সে তাহার উপর মাটি ছড়াইয়া দিতেছে বা কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিতেছে যাহাতে রক্ত বাহিয়া এদিকে ওদিকে না যাইতে পারে, তবে এখন তাহার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, যদি সে না মুছিত, তবে রক্ত বাহিয়া যখমের মুখ হইতে ছড়াইয়া পড়িত কি না যদি ছড়াইয়া পড়িত বলিয়া বোধ হয়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে, যদি এরকম বিশ্বাস হয় যে, না মুছিলেও রক্ত এত কম ছিল যে, এদিকে ওদিকে ছড়াইত না, তবে ওযূ যাইবে না। —কবীরী

১০। মাসআলাঃ থুথুর সঙ্গে রক্ত দেখা গেলে যদি উহা নেহায়েত কম হয় বর্ণ সাদা বা হলদে রঙ্গের মত হয়, তবে ওযূ যাইবে না; আর যদি রক্ত বেশী হয় এবং লাল রঙ্গের মতন হয়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —কবীরী

১১। মাসআলাঃ দাঁত দ্বারা কোন জিনিস চিবাইতে সেই জিনিসের উপর রক্তের দাগ দেখা গেল, কিন্তু থুথুর সঙ্গে আদৌ রক্তের রং দেখা গেল না ইহাতে ওযূ যাইবে না।

১২। মাসআলাঃ জোঁক লাগাইলে যদি উহা এত পরিমাণ রক্ত পান করিয়া থাকে যে, জোঁকটাকে কাটিয়া ফেলিলে রক্ত বাহিয়া পড়িবে, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। যদি সামান্য মাত্রায় পান করিয়া থাকে, তবে ওযূ যাইবে না। মশা, মাছি বা ছারপোকায় যে রক্ত পান করিয়া থাকে, তাহাতে ওযূ যায় না। —গুনইয়া

১৩। মাসআলাঃ যদি কানের মধ্যে বেদনা অনুভব হয় এবং পানি বাহির হয়, যদিও কোন ফোঁড়া ফুঁসি অনুভব না হয়, তবুও এরকম পানি নাপাক, উহা কানের ছিদ্রের বাহিরে এমন জায়গা পর্যন্ত আসিলে ওযূ নষ্ট হইবে যাহা ওযূর মধ্যে ধোয়া ফরয। যদি নাভিস্থান হইতে পানি বাহির হয় এবং বেদনাও অনুভব হয়, তবে তাহাতে ওযূ নষ্ট হইবে কিংবা যদি চক্ষু হইতে পানি বাহির হয় এবং বেদনাও হয়, তবে তাহাতে ওযূ নষ্ট হইবে, অন্যথায় শুধু চোখ দিয়া পানি বাহির হইলে ওযূ যাইবে না। —শরহে তানবীর-১

১৪। মাসআলাঃ স্তন হইতে পানি বাহির হইলে যদি বেদনা অনুভব হয়, তবে পানি নাপাক এবং ওযূ যাইবে, আর যদি বেদনা অনুভব না হয়, তবে সে পানি নাপাক নয় এবং ওযূও যাইবে না। —গুইনয়া

১৫। মাসআলাঃ বমিতে ভাত পানি বা পিত্ত বাহির হইলে যদি মুখ ভরিয়া আসিয়া থাকে, তবে ওযূ যাইবে। মুখ ভরিয়া না আসিলে ওযূ টুটিবে না, (মুখ ভরিয়া আসার অর্থ, মুখের মধ্যে সামলাইয়া রাখা কষ্টকর হইয়া পড়ে এই পরিমাণ) মুখ ভরিয়া কফ বমি করিলে ওযূ যাইবে না। বমিতে প্রবহমান তরল রক্ত বাহির হইলে ওযূ টুটিয়া যাইবে, তাহা মুখ ভরিয়া আসুক বা কম আসুক জমাট রক্ত মুখ ভরিয়া বাহির হইলে ওযূ নষ্ট হইবে, অন্যথায় ওযূ যাইবে না।

—কবীরী

১৬। মাসআলাঃ অল্প অল্প করিয়া বমি হইলে যদি সমস্ত বমি একত্র করিলে এত পরিমাণ হয় যে, সেই সব একবারে হইলে মুখ ভরিয়া যাইত, তবে যদি একবারের উদ্বেগে সেই সব বমি হইয়া থাকে, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। আর যদি প্রথমবারের উদ্বেগ সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়া বমন ভাব দূর হইয়া আবার উদ্বেগের সহিত সামান্য বমি হয় এবং দ্বিতীয় বারের উদ্বেগ থামিয়া গেলে তৃতীয় বার আবার নূতন উদ্বেগ হইয়া সামান্য বমি হইয়া থাকে, তবে এই সব যোগ করা হইবে না এবং ওযূও যাইবে না।

১৭। মাসআলা ঃ শুইয়া শুইয়া সামান্য কিছু ঘুমাইলেও ওযূ টুটিয়া যাইবে, আর যদি কোন বেড়া বা দেওয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়া বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া থাকে, তবে যদি নিদ্রা এত গাঢ় হইয়া থাকে যে, ঐ বেড়া বা দেওয়াল সেখানে না থাকিলে ঘুমের ঝোঁকে পড়িয়া যাইত, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে। নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় ঘুমাইলে ওযূ যায় না, (কিন্তু কোন রোকন নিদ্রিতাবস্থায় আদায় করিলে তাহা দোহ্‌রাইতে হইবে) সজ্‌দা অবস্থায় (বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের) ঘুম আসিলে ওযূ টুটিয়া যাইবে। —রদ্দুল মোহ্‌তার

১৮। মাসআলা ঃ নামাযের বাহিরে কোন বেড়া বা দেওয়ালে হেলান না দিয়া চুতড় দৃঢ়ভাবে চাপিয়া বসিয়া ঘুমাইলে তাহাতে ওযূ যাইবে না। —কবীরী

১৯। মাসআলা ঃ বসিয়া বসিয়া ঘুমের এমন তন্দ্রা আসিয়াছে যে, পড়িয়া গিয়াছে, তবে যদি পড়িবা মাত্রই সজাগ হইয়া থাকে, তবে ওযূ যাইবে না। আর যদি কিছুমাত্রও বিলম্বে জাগিয়া থাকে, তবে ওযূ যাইবে। আর যদি শুধু বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে থাকে, না পড়ে তবে ওযূ যাইবে না। —শামী

২০। মাসআলা ঃ সামান্য সময়ের জন্যও বেহুশ বা পাগল হইয়া গেলে ওযূ যাইবে। যদি তামাক ইত্যাদি কোন নেশার জিনিস খাইয়া এরকম অবস্থা হইয়া থাকে যে, ভালমতে হাঁটিতে পারে না, পা এদিক ওদিক চলিয়া যায়, তবে তাহাতেও ওযূ যাইবে। —দুর্‌রুল মোখ্‌তার

২১। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে এরকমভাবে হাসিলে, যাহাতে নিজেও শব্দ শুনিতে পায় এবং পার্শ্বস্থ লোকেও শব্দ শুনিতে পায় অর্থাৎ, হা হা (খল খল) করিয়া হাসিলে ওযূও যাইবে এবং নামাযও টুটিয়া যাইবে। আর যদি এরকমভাবে হাসে যাহাতে নিজেও আওয়ায শুনিয়া থাকে এবং অতি নিকটে যদি কেহ থাকে সেও শুনিতে পায় কিন্তু পার্শ্বস্থ লোকেরা সাধারণতঃ শুনিতে না পায়, তবে তাহাতে শুধু নামায টুটিবে ওযূ টুটিবে না। আর যদি হাসিতে আওয়ায মাত্রও না হইয়া থাকে, শুধু ঠোঁট ফাঁক হইয়া দাঁত বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহাতে ওযূও যাইবে না, নামাযও যাইবে না। নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে খল খল করিয়া হাসিলেও তাহার ওযূ যাইবে না। ঐরূপ তেলাওয়াতের সজ্‌দার মধ্যে কোন বালেগ ছেলে বা মেয়ে খল খল করিয়া হাসিলেও তাহার ওযূ যাইবে না ; তবে ঐ সজ্‌দা ও নামায আদায় হইবে না, পুনরায় আদায় করিতে হইবে। —মুনিয়া

২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ নম্বর মাসআলা ৫৯ , পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৬। মাসআলা ঃ ওযূর পর নখ কাটাইলে বা যখমের উপরের মরা চামড়া খুটিয়া ফেলিলে তাহাতে ওযূর কোন ব্যাঘাত হয় না—ওযূ দোহ্‌রাইতে হইবে না বা শুধু সেই জায়গাটুকু ধোয়ারও কোন হুকুম নাই। —শরহে তান্‌বীর

২৭। মাসআলা ঃ ওযূ করিয়া অন্য কাহারও ছতরে নযর পড়িলে বা নিজের ছতর খুলিয়া গেলে তাহাতে ওযূ যায় না। হাঁ, ঠেকা না হইলে অন্যের ছতর দেখা বা নিজের ছতর খোলা গোনাহ্‌র কাজ। ঐরূপে (অবরুদ্ধ গোসলখানায়) কাপড় খুলিয়া গোসল করিয়া ঐ কাপড় খোলা অবস্থায়ই যদি ওযূ করিয়া থাকে, তবে তাহাতেই ওযূ হইয়া যাইবে; পুনরায় ওযূ করিতে হইবে না। —কবীরী

২৮। মাসআলা ঃ যে জিনিস শরীর হইতে বাহির হইলে ওযূ টুটিয়া যায়, সে জিনিস নাপাক, আর যে জিনিস বাহির হইলে ওযূ যায় না, সে জিনিস নাপাক নহে। অতএব, যদি সামান্য এক

বিন্দু রক্ত বাহির হইয়া থাকে আর যখমের মুখ হইতে ছড়াইয়া না যায়, বা সামান্য কিছু বমি হইয়া থাকে আর তাহাতে ভাত, পানি, পিত্ত বা জমাট রক্ত বাহির হইয়া থাকে, তবে ঐ রক্ত এবং বমি নাপাক নহে। সুতরাং উহা কাপড়ে বা শরীরে লাগিলে তাহা ধোয়া ওয়াজিব নহে। আর যদি মুখ ভরিয়া বমি হইয়া থাকে বা রক্ত যখমের মুখ হইতে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে, তবে তাহা নাপাক এবং উহা ধোয়া ওয়াজিব। যদি এই পরিমাণে বমি করিয়া গ্লাস, পেয়ালা বা বদনায় মুখ লাগাইয়া কুল্লি করিবার জন্য পানি লইয়া থাকে, তবে ঐ পাত্রগুলিও নাপাক হইয়া যাইবে। অতএব, সতর্ক হওয়া চাই। হাতে করিয়া পানি লইয়া কুল্লি করাই নিরাপদ।—শামী

২৯। মাসআলাঃ শিশু ছেলে যে দুধ উদ্‌গীরণ করে তাহারও এই হুকুম, যদি মুখ ভরিয়া না আসিয়া থাকে, তবে নাপাক নহে। কিন্তু মুখ ভরিয়া আসিয়া থাকিলে উহা নাপাক।

—দুররে মুখতার

৩০। মাসআলাঃ ওযূর কথা বেশ স্মরণ আছে, কিন্তু তারপর ওযূ টুটিয়াছে কি না তাহা স্মরণ নাই; তবে শুধু এতটুকু সন্দেহে ওযূ যাইবে না। পূর্বের ওযূই আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। ঐ ওযূ দিয়া নামায পড়িলে নামায হইয়া যাইবে, তবে সন্দেহ স্থলে পুনরায় ওযূ করাই ভাল।

—দুররে মুখতার

৩১। মাসআলাঃ ওযূর সময় সন্দেহ হইল যে, অমুক জায়গা ধোয়া হইল কি না এমতাবস্থায় ঐ জায়গা ধুইয়া লইবে। ওযূর শেষে এইরূপ সন্দেহ হইলে কোন পরওয়া করিতে নাই। কিন্তু অমুক জায়গা ধোয়া হয় নাই বলিয়া নিশ্চিত বিশ্বাস হইলে সেই জায়গা ধুইয়া লইবে। —শামী

৩২। মাসআলাঃ বে-ওযূতে কোরআন শরীফ ছোঁয়া জায়েয নহে। অবশ্য যদি পৃথক কোন কাপড় দিয়া ধরে তবে জায়েয আছে। কিন্তু নিজের পরিহিত কাপড় বা কোর্তার আঁচল দিয়া ধরা জায়েয নহে। যদি মুখস্থ পড়ে, তবে বে-ওযূতেও জায়েয আছে, আর যদি কোরআন শরীফ সামনে খোলা থাকে, উহাতে হাত না লাগায়, তবে দেখিয়া পড়াও জায়েয আছে। এইরূপে যে সব তা'বীযে বা তশ্‌তরিতে কোরআন শরীফের আয়াত লেখা থাকে তাহাও বে-ওযূতে ছোঁয়া জায়েয নহে। এই মাসআলা খুব ভালভাবে মনে রাখিবে। —দুররে মুখতার

মা'যূরের মাসায়েল

১। মাসআলাঃ যাহার নাক বা অন্য কোন যখম হইতে অনবরত রক্ত বহিতে থাকে বা অনর্গল পেশাবের ফোঁটা আসিতে থাকে, এমন কি নামাযের সম্পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সময়ও বিরাম হয় না যাহাতে শুধু ফরয অঙ্গগুলি ধুইয়া ওযূর সহিত সংক্ষেপে ফরয নামায আদায় করিয়া লইতে পারে, এইরূপ ব্যক্তিকে মা'যূর বলে। মা'যূরের হুকুম এই যে, প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে তাজা ওযূ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। যে পর্যন্ত ঐ ওয়াক্ত থাকিবে সে পর্যন্ত তাহার ওযূ থাকিবে; (ওযরজনিত রক্ত বা পেশাব বাহির হওয়ার কারণে তাহার ওযূ যাইবে না।) কিন্তু যে রোগের কারণে মা'যূর হইয়াছে, তাহা ছাড়া ওযূ টুটার অন্য কোন কারণ পাওয়া গেলে অবশ্য ওযূ টুটিয়া যাইবে এবং আবার ওযূ করিতে হইবে। যেমন, কাহারও নাক দিয়া অনবরত রক্ত বাহির হইতে থাকে, একেবারেই বন্ধ হয় না, সে যোহরের সময় ওযূ করিল তবে যে পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকিবে সে পর্যন্ত ঐ নাকের রক্তের কারণে তাহার ওযূ টুটিবে না; কিন্তু যদি পেশাব-পায়খানা করিয়া থাকে, বা সূঁচ বিদ্ধ হইয়া রক্ত বাহির হইয়া থাকে, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে

এবং পুনরায় ওযূ করিতে হইবে। যখন যোহরের ওয়াক্ত অতীত হইয়া আছরের ওয়াক্ত আসিবে, তখন আবার ওযূ করিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে তাজা ওযূ করিতে হইবে এবং এই ওযূর দ্বারা ফরয, নফল সব নামায পড়িতে পারিবে। —শরহে তান্‌বীর

২। **মাসআলা ঃ** মা'যূর ব্যক্তি ফজরের সময় ওযূ করিয়াছে সূর্যোদয় হইলে সেই ওযূ দিয়া আর নামায পড়িতে পারিবে না, আবার ওযূ করিতে হইবে। যদি সূর্যোদয়ের পর ওযূ করিয়া থাকে, তবে সে ওযূ দিয়া যোহরের নামায পাড়িতে পারে, নূতন ওযূ করিতে হইবে না। কিন্তু আছরের ওয়াক্ত আসিলে নূতন ওযূ করিতে হইবে। যদি অন্য কোন কারণে ওযূ টুটিয়া থাকে, তবে পৃথক কথা। —শরহে বেদায়া

৩। **মাসআলা ঃ** কাহারও একটি যখম ছিল তাহা হইতে সব সময় রক্ত বাহির হইত; কিন্তু ওযূ করিবার পর আর একটা যখম হইয়া আরও রক্ত বাহির হইতে লাগিল, তখন তাহার ওযূ টুটিয়া গিয়াছে, আবার ওযূ করিতে হইবে। —শরহে তান্‌বীর

৪। **মাসআলা ঃ** মা'যূরের হুকুম পাইবার জন্য শর্ত এই যে, একটা ওয়াক্ত সম্পূর্ণ এমনভাবে গুযারিয়া যাইবে, যেন অবিরাম রক্ত বাহির হইতে থাকে, এতটুকু সময়ের জন্যও বন্ধ হয় না যে, শুধু ঐ ওয়াক্তের ফরয নামাযটা ওযূর সহিত পড়িয়া লইতে পারে। যদি সম্পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সময় মিলে যে ওযূর সহিত ঐ ওয়াক্তের ফরয নামায পড়িয়া লইতে পারে, তবে আর তাহাকে মা'যূর বলা যাইবে না। মা'যূরের জন্য যে হুকুম আর যে মা'ফ আছে, তাহাও সে পাইবে না; কিন্তু এক ওয়াক্ত সম্পূর্ণ এরূপভাবে গুযারিয়া গেল যে, পবিত্রতার সহিত নামায পড়ার সুযোগ পায় নাই, তখন সে মা'যূর হইল! এখন তাহাকে প্রত্যেক ওয়াক্তে নূতন ওযূ করিতে হইবে। তারপর যখন দ্বিতীয় ওয়াক্ত আসিবে, তখন সম্পূর্ণ ওয়াক্তের রক্ত বাহির হওয়া শর্ত নয়; বরং যদি পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে একবারও রক্ত আসে আর সব সময় ভাল থাকে, তবুও সে মা'যূরেরই হুকুম পাইবে। যদি এক ওয়াক্ত সম্পূর্ণ এরকম গুযারিয়া যায় যে, রক্ত একবারও বাহির হয় নাই, তখন আর সে মা'যূর থাকিবে না। যতবার রক্ত বাহির হইবে, ততবারই ওযূ টুটিয়া যাইবে। (মাসআলাটা কিছু কঠিন, ভালমতে বুঝিয়া রাখিবে!)

—শরহে তান্‌বীর

৫। **মাসআলা ঃ** যোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হইলে পর যদি কাহারও রক্ত বাহির হইতে শুরু হয়, তবে তাহার যোহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত (অর্থাৎ, যখন এতটুকু সময় থাকে যে, ফরয ওযূর অঙ্গগুলি ধুইয়া শুধু ফরয চারি রাকা'আত নামায আদায় করিতে পারে, তখন পর্যন্ত) অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তবে ত ভালই, নতুবা ওযূ করিয়া নামায পড়িয়া লইবে, (কিন্তু মা'যুরের হুকুম পাইবে না।) তারপর আবার আছরের সময়ও যদি সম্পূর্ণ ওয়াক্ত এই রকমভাবেই রক্ত বাহির হইতে থাকে যে, নামায পড়িবার জন্য বিরাম পাওয়া যায় না, তবে এখন আছরের ওয়াক্ত গুযারিয়া যাওয়ার পর তাহার উপর মা'যূরের হুকুম লাগান হইবে। যদি আছরের ওয়াক্ত কিছু থাকিতে রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে, তবে আর সে মা'যূর হইবে না। যে সব নামায এই ওয়াক্তের মধ্যে পড়িয়াছে তাহা দুরুস্ত হয় নাই; সুতরাং দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। (আছরের ওয়াক্তেও মাক্‌রূহ ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তবে ত ভালই, নতুবা ওযূ করিয়া নামায মাক্‌রূহ্‌ ওয়াক্তের আগেই পড়িয়া লইবে; কিন্তু (মাক্‌রূহ) ওয়াক্ত থাকিতে থাকিতে রক্ত বন্ধ হইয়া গেলে ঐ নামায আবার পড়িতে হইবে।) —রঃ মোহ্‌তার

৬। **মাসআলা ঃ** উপরোক্ত নিয়মানুসারে যাহার উপর মা'যূরের হুকুম লাগান হইয়াছে এরকম একজন লোক পেশাব-পায়খানা ইত্যাদির কারণে ওযূ করিয়াছিল, ওযূ করিবার সময় রক্ত (অর্থাৎ, যে কারণে সে মা'যূরের হুকুম পাইয়াছে তাহা) বন্ধ ছিল, ওযূ শেষ করার পর রক্ত বাহির হইতে শুরু হইয়াছে, এখন এই রক্ত বাহির হওয়ার কারণে তাহার ওযূ টুটিয়া যাইবে; কিন্তু বিশেষ করিয়া ঐ রক্ত বাহির হওয়ার কারণে যে ওযূ করিবে, সে ওযূ অবশ্য আবার রক্ত বাহির হওয়ার কারণে টুটিবে না। —আলমগীরী

৭। **মাসআলা ঃ** যদি এই রক্ত ইত্যাদি (অর্থাৎ, যাহার কারণে মা'যূরের হুকুম লাগান হইয়াছে তাহা) কাপড়ে লাগে এবং এরূপ মনে হয় যে, নামায শেষ করিবার পূর্বে আবার লাগিয়া যাইবে, তবে ঐ রক্ত ধোয়া ওয়াজিব নয়। আর যদি মনে হয় যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে রক্ত লাগিবে না; পাক কাপড়েই নামায শেষ করিতে পারিবে, তবে ধুইয়া লওয়া ওয়াজিব, রক্ত এক দেরহাম[১] পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইলে উহা না ধুইলে নামায হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

গোছলের বয়ান

১। **মাসআলা ঃ** (গোছল করিবার পূর্বে প্রথম মনে মনে নিয়ত করিবে অর্থাৎ, চিন্তা করিবে যে, "আমি পাক হইবার উদ্দেশ্যে গোছল করিতেছি!") তারপর প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুইবে, তারপর এস্তেঞ্জার জায়গা ধুইবে। হাতে এবং এস্তেঞ্জার জায়গায় নাজাছাত থাকুক বা না থাকুক, এই জায়গা প্রথমে ধুইবে। তারপর শরীরের কোথাও নাজাছাত লাগিয়া থাকিলে তাহা ধুইবে, তারপর ওযূ করিবে। যদি কোন চৌকি বা পাথরের উপর গোছল করে (যাহাতে পরে আর পা ধোয়ার দরকার হইবে না,) তবে ওযূ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাও ধুইয়া লইবে, আর যদি এমন জায়গায় গোছল করে যে, পায়ে কাদা লাগিয়া যাইবে এবং পরে আবার ধুইতে হইবে, তবে পূর্ণ অযূ করিবে কিন্তু পা ধুইবে না। তৎপর তিনবার মাথায় পানি ঢালিবে, তারপর তিনবার ডান কাঁধে পানি ঢালিবে, তারপর তিনবার বাম কাঁধে পানি ঢালিবে। পানি এমনভাবে ঢালিবে যাহাতে সমস্ত শরীর ধুইয়া যায়। তারপর পাক জায়গায় সরিয়া গিয়া পা ধুইয়া লইবে, আর যদি ওযূর সঙ্গে পা ধুইয়া থাকে, তবে আবার ধোয়ার দরকার নাই। —শরহে তান্‌বীর

২। **মাসআলা ঃ** পানি ঢালিবার পূর্বে সমস্ত শরীর ভালমতে ভিজা হাত দ্বারা মুছিয়া দিবে, তারপর পানি ঢালিবে। এইরূপ করিলে সহজে সমস্ত জায়গায় পানি পৌঁছিয়া যাইবে, কোথাও শুকনা থাকবি না। —মুনইয়া

৩। **মাসআলা ঃ** উপরে গোছলের যে নিয়ম বলা হইয়াছে ইহাই সুন্নত মোতাবেক গোছল। কিন্তু ইহার মধ্যে কয়েকটি কাজ এমন আছে যাহা না হইলে গোছলই হয় না; যেমন নাপাক তেমন নাপাকই থাকিবে, সেগুলিকে 'ফরয' বলে। আর কতকগুলি কাজ এমন আছে যাহা করিলে সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু না করিলে গোছল হইয়া যায়, এইগুলিকে 'সুন্নত' বলে। গোছলের মধ্যে ফরয মাত্র তিনটি; যথা—(১) এমনভাবে কুল্লি করা যাহাতে সমস্ত মুখে পানি পৌঁছিয়া যায়। (২) নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছান; (৩) সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছান। —হেদায়া

টিকা

১ হাতের তালুকে সম্পূর্ণ খুলিয়া পানি রাখিলে যে পরিমাণ স্থানে পানি থাকে উহাকে এক 'দেরহাম'-এর পরিমাণ বলে।

৪। মাসআলা ঃ গোছলের সময় কেব্‌লার দিকে মুখ করিবে না। পানি বেহুদা খরচ করিবে না, আবার এত কমও খরচ করিবে না যে, গোছলও ভালমতে হয় না। গোছল এমন জায়গায় করিবে যেন অন্য কেহ দেখিতে না পায়। গোছল করিবার সময় কথা বলিবে না। গোছল শেষ হইলে কাপড় দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলিয়া (মেয়েলোক) অতি সত্বর শরীর ঢাকিয়া লইবে। এমন কি, যদি গোছলের ওযূ করিবার সময় পা না ধুইয়া থাকে, তবে গোছলের জায়গা হইতে সরিয়া আগে শরীর ঢাকিয়া লইবে পরে উভয় পা ধুইবে। —মারাকী

৫। মাসআলা ঃ কাহারও দেখিবার সম্ভাবনা নাই এ-রকম জায়গায় উলঙ্গ হইয়া গোছল করাও জায়েয আছে বসিয়া হোক অথবা দাঁড়াইয়া, গোছলখানার ছাদ থাকুক বা না থাকুক; কিন্তু (এরকম দরকার পড়িলে) বসিয়া গোছল করাই বেহ্‌তর (উত্তম)। কেননা, বসিয়া গোছল করাতে পর্দা বেশী হয়; নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত স্ত্রীলোকের জন্যও অপর স্ত্রীলোকের সামনে খোলা জায়েয নহে। সাধারণতঃ মেয়েলোকেরা এদিকে লক্ষ্য রাখে না। তাহারা ভাবে যে, আওরতের সামনে আওরতের আর কি পর্দা, কিন্তু ইহা মস্ত বড় ভুল এবং নির্লজ্জতার কথা। —মারাকী

৬। মাসআলা ঃ গোছল করিবার নিয়ত করুক বা না করুক, সমস্ত শরীরে পানি বহিয়া গেলে এবং কুল্লি করিয়া লইলে, আর নাকে পানি দিলে গোছল হইয়া যাইবে। এরূপ শরীর ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশ্যে বৃষ্টিতে যদি দাঁড়ায় বা হঠাৎ পুকুর ইত্যাদিতে পড়িয়া যায় আর সমস্ত শরীর ভিজিয়া যায়, কুল্লিও করিয়া লয় এবং নাকেও পানি দিয়া লয়, তবে গোছল হইয়া যাইবে। গোছল করিবার সময় কলেমা পড়া বা কলেমা পড়িয়া পানিতে ফুঁক দিয়া লওয়ারও কোন দরকার নাই; কলেমা পড়ুক বা না পড়ুক গোছল হইয়া যাইবে, বরং গোছল করিবার সময় কলেমা বা অন্য কোন দো'আ না পড়াই ভাল। —মুন্‌ইয়া

৭। মাসআলা ঃ সমস্ত শরীরের একটা পশম পরিমাণ শুক্‌না থাকিলেও গোছল হইবে না। এইরূপে যদি কুল্লি করিতে বা নাকে পানি দিতে ভুলিয়া গিয়া থাকে, তবেও গোছল হইবে না। (যেমন নাপাক ছিল তেমনই থাকিবে, নামায ইত্যাদি কিছুই হইবে না। —মুন্‌ইয়া

৮। মাসআলা ঃ গোছল শেষে মনে পড়িল যে, অমুক জায়গাটা শুকনা রহিয়া গিয়াছে, এমতাবস্থায় আবার সম্পূর্ণ গোছল দোহ্‌রাইবার দরকার নাই, শুধু সেই জায়গাটুকু ধুইয়া লইলেই হইবে; কিন্তু শুধু ভিজা হাত ফিরাইয়া দিলে হইবে না, কিছু পানি লইয়া ধুইয়া ফেলিবে। আর যদি কুল্লি করিতে ভুলিয়া গিয়া থাকে, তবে এখন শুধু কুল্লি করিবে; আর যদি নাকে পানি দেওয়া ভুলিয়া থাকে, এখন শুধু নাকে পানি দিবে। ফলকথা, যেটুকু বাকী রহিয়াছে শুধু সেইটুকু ধুইলেই চলিবে; সম্পূর্ণ গোছল দোহ্‌রাইতে হইবে না। —মুন্‌ইয়া

৯। মাসআলা ঃ রোগের দরুন মাথায় পানি দিলে যদি ক্ষতি হয়, তবে মাথা ব্যতীত সমস্ত শরীর ধুইয়া লইলেও গোছল হইয়া যাইবে। সুস্থ হওয়ার পর মাথা ধুইলে চলিবে। সম্পূর্ণ গোছল দোহ্‌রাইতে হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

১০। মাসআলা ঃ গোছলের মাসায়েল দ্রষ্টব্য।

১১। মাসআলা ঃ যদি মেয়েলোকের মাথার চুল বেণী পাকান না হয়, তবে সমস্ত চুল এবং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছান ফরয। যদি একটি চুল বা একটি চুলের গোড়াও শুকনা থাকে, তবে গোছল হইবে না। যদি চুল বেণী পাকান হয়, তবে সমস্ত চুল না ভিজাইলেও চলিবে। অবশ্য চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছান ফরয। একটি চুলের গোড়াও শুক্‌না থাকিলে চলিবে না।

যদি বেণী না খুলিয়া সমস্ত চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছান সম্ভব না হয়, তবে বেণী খুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং সমস্ত চুলও ভিজাইতে হইবে। (পুরুষের বেণী থাকিলে তাহার বেণী খুলিয়া সমস্ত চুল ভিজাইতে হইবে।)[১] —মুন্‌ইয়া

১২। মাসআলাঃ নথ, আংটি বালি, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি ভালমতে নাড়িয়া ছিদ্রের ভিতরে পানি প্রবেশ করাইয়া দিবে, আর যদি বালি ইত্যাদি না-ও থাকে, তবুও সতর্কতার সহিত ছিদ্রগুলির মধ্যে পানি পৌঁছাইয়া দিবে। কেননা, অসর্কতাহেতু কোনও স্থান শুক্‌না থাকিলে গোছল হইবে না। যদি আংটি ইত্যাদি খুব ঢিলা হয় যাহাতে অনায়াসে পানি পৌঁছিতে পারে, তবে নাড়িয়া চাড়িয়া পানি দেওয়া ওয়াজেব নহে; বরং মোস্তাহাব। —মুন্‌ইয়া

১৩। মাসআলাঃ নখের মধ্যে (বা অন্য কোথাও) কিছু আটা, চুন ইত্যাদি লাগিয়া শুকাইয়া থাকার কারণে উহাতে পানি না পৌঁছিলে গোছল হইবে না। স্মরণ হইলে এবং দেখা মাত্র উহা বাহির করিয়া কিছু পানি দ্বারা ঐ জায়গাটুকু ভিজাইয়া দিবে। আর এই ভিজাইবার পূর্বে যদি কোন নামায পড়িয়া থাকে, তবে তাহা দোহ্‌রাইতে হইবে। —শামী

১৪। মাসআলাঃ হাত বা পা ফাটিয়া যাওয়ায় যেখানে (আমের আঠা,) মোম, তৈল, বা অন্য কোন ঔষধ ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে সেখানে ঔষধের উপর দিয়া পানি বহাইয়া দিলেই গোছল দুরুস্ত হইবে। —মুন্‌ইয়া

১৫। মাসআলাঃ কান এবং নাভিতেও খুব খেয়াল করিয়া পানি পৌঁছাইবে, কারণ উহাতে পানি না পৌঁছিলে গোছল হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

১৬। মাসআলাঃ গোছল করিবার সময় কেহ কুল্লি করে নাই, কিন্তু মুখ ভরিয়া পানি খাইয়াছে এবং সমস্ত মুখে পানি লাগিয়াছে, তবে তাহার গোছল হইয়া যাইবে। কেননা, সমস্ত মুখের মধ্যে পানি পৌঁছান মকছুদ, চাই কুল্লি করুক বা না করুক। কিন্তু যদি এমনভাবে পানি পান করে যে, সমস্ত মুখে পানি লাগে নাই, তবে অবশ্য কুল্লি করিতে হইবে, এরূপ পানি পানে কুল্লির কাজ হইবে না। —মুন্‌ইয়া

১৭। মাসআলাঃ চুলে বা হাতে-পায়ে এমনভাবে তৈল লাগান আছে যে, শরীরে পানি ভালরূপে দাঁড়াইতে পারে না, তবে তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। শরীরের সব জায়গায় ও মাথায় পানি ঢালিয়া দিলে গোছল হইয়া যাইবে।

১৮। মাসআলাঃ সুপারি বা অন্য কিছু দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়া থাকিলে খেলাল দিয়া তাহা বাহির করিয়া ফেলিবে, কেননা, উহার কারণে যদি দাঁতের গোড়ায় পানি না পৌঁছে, তবে গোছল হইবে না। —মুন্‌ইয়া

১৯। মাসআলাঃ মাথায় যদি আফ্‌শান লাগাইয়া থাকে, বা চুলে এমন আঠা লাগিয়াছে যে চুল ভালরূপে ভিজে না, তবে তাহা ছাড়াইয়া ফেলিয়া, চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছাইবে; শুধু উপরে পানি বহাইলে গোছল হইবে না। —মুন্‌ইয়া

২০। মাসআলাঃ দাঁতে যদি মিসি জমাইয়া থাকে তাহা ছাড়াইয়া ফেলিয়া কুল্লি করিবে, নতুবা গোছল হইবে না। —মুন্‌ইয়া

টিকা

১ এখানে বেণী বলিতে আটা, গাম ইত্যাদি দ্বারা 'চুল বাঁধানোই' বুঝানো হইয়াছে। এইরূপ বাঁধানো চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাইলে আর অগ্রভাগ ভিজাইতে হয় না।

২১। মাসআলা ঃ চোখের পিচুটি যদি এমনভাবে জমিয়া গিয়া থাকে যে, তাহা উঠাইয়া না ফেলিলে নীচে পানি পৌঁছিবে না, তবে উহা উঠাইয়া ফেলিয়া নীচ পর্যন্ত পানি পৌঁছাইতে হইবে। নচেৎ ওযূ-গোছল কিছুই শুদ্ধ হইবে না। —মুন্‌ইয়া

গোছল ফরয হইবার কারণসমূহ পরে লিখা হইয়াছে।

ওযূ ও গোছলের পানি

১। মাসআলা ঃ বৃষ্টির পানি, নদীর পানি, খাল-বিলের পানি, ঝর্ণার পানি, সমুদ্রের পানি, পাতকূয়া বা পাকা কূয়ার পানি, পুকুরের পানি এই সমস্ত পানির দ্বারাই ওযূ গোছল দুরুস্ত আছে, তাহা মিঠা পানি হউক বা লোনা পানি হউক। —দুররুল মুখতার

২। মাসআলা ঃ কোন ফল, গাছ বা পাতা নিংড়াইয়া রস বাহির করিলে তাহা দ্বারা ওযূ করা দুরুস্ত নহে। এইরূপে তরমুজের পানি বা আখের (বা খেজুরের) রস ইত্যাদি দ্বারাও ওযূ গোছল দুরুস্ত নহে। —শরহে তান্‌বীর

৩। মাসআলা ঃ যে পানির সঙ্গে কোন জিনিস মিশ্রিত হওয়ায় বা কোন জিনিস পাক করায় এমন হইয়াছে, এখন আর লোকে তাহাকে পানি বলে না উহার অন্য নাম হইয়া গিয়াছে, এইরূপ পানি দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত নহে। যেমন, শরবত, শিরা, শোরবা (শুরাজোশ), সির্‌কা, গোলাপ-জল, আরকে গাওজবান ইত্যাদি দ্বারা ওযূ দুরুস্ত নহে। —শরহে তান্‌বীর

৪। মাসআলা ঃ যে পানির মধ্যে কোন পাক জিনিস পড়ায় তাহার রং, মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐ জিনিস ঐ পানিতে পাকান হয় নাই, আর পানির তরলতা দূর হইয়া গাঢ়ও হইয়া যায় নাই, যেমন—বর্ষাকালে নদীর পানির সঙ্গে বালু মিশ্রিত থাকে, বা পানির মধ্যে জাফ্‌রান পড়িয়া সামান্য কিছু রং হইয়া গিয়াছে, বা সাবান বা এইরূপ অন্য কোন জিনিস পড়িয়াছে, তবে এসব পানি দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে। —দুর্‌রে মোখ্‌তার

৫। মাসআলা ঃ যদি কোন জিনিস পানিতে দিয়া সিদ্ধ করায় পানির রং বা মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইয়া থাকে, তবে সে পানির দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে না। যদি এরকম কোন জিনিস সিদ্ধ করিয়া থাকে যে, তাহার দ্বারা ময়লা পরিষ্কার হয় আর সে জিনিস সিদ্ধ করার কারণে পানি গাঢ়ও হয় নাই, তবে সে পানির দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত আছে। যেমন, মুর্দাকে গোছল দিবার জন্য পানিতে কুল পাতা সিদ্ধ করা হইয়া থাকে, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি পাতা এত বেশী দেয় যে, পানি গাঢ় হইয়া যায়, তবে ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে না। —মুন্‌ইয়া

৬। মাসআলা ঃ কাপড় রঙ্গাইবার জন্য জাফ্‌রান বা অন্য কোন রং গোলা হইলে তাহার দ্বারা ওযূ জায়েয হইবে না। —মুন্‌ইয়া

৭। মাসআলা ঃ পানিতে দুধ পড়িলে যদি দুধের রং পরিষ্কার দেখা যায়, তবে তাহার দ্বারা ওযূ দুরুস্ত হইবে না; আর যদি এত অল্প পড়িয়া থাকে যে, দুধের রং দেখা যায় না, তবে দুরুস্ত হইবে। —মুন্‌ইয়া

৮। মাসআলা ঃ মাঠের মধ্যে সামান্য কিছু পানি পাওয়া গেল, তবে যে পর্যন্ত একীন না হয় যে, এই পানি নাপাক, সেই পর্যন্ত ঐ পানির দ্বারাই ওযূ করিতে হইবে। "হয়ত নাপাক হইতে পারে" শুধু এই সন্দেহের উপর যদি তাইয়াম্মুম করিয়া নামায পড়ে তবে নামায হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

৯। **মাসআলা ঃ** কূপ ইত্যাদিতে গাছের পাতা পড়িয়া পানিতে বদ-বু হইয়া গিয়াছে বা রং ও মজা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, তবুও যে পর্যন্ত পানির তরলতা বাকী থাকিবে উহা দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে। —শরহে তান্‌বীর

১০। **মাসআলা ঃ** যে পানির মধ্যে নাজাছাত পড়িয়াছে সেই নাজাছাত বেশী হউক বা কম হউক ঐ পানির দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে না। কিন্তু যদি স্রোতের পানি হয়, তবে যে পর্যন্ত নাজাছাতের কারণে পানির রং, মজা বা গন্ধ পরিবর্তন না হইবে সে পর্যন্ত ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে। আর যদি নাজাছাতের কারণে রং মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে স্রোতের পানিও নাপাক হইয়া যাইবে; সে পানির দ্বারা ওযূ-গোছল দুরুস্ত হইবে না। ঘাস, লতা পাতা যে পানিতে ভাসাইয়া লইয়া যায় সে পানিকে স্রোতের পানি বলে, স্রোতের বেগ যতই কম হউক না কেন। —শরহে বেদায়া

১১। **মাসআলা ঃ** বড় হাউয বা অন্ততঃ পক্ষে ১০ হাত চওড়া ১০ হাত লম্বা এবং গভীর এত যে, চুল্লু (কোষ) ভরিয়া পানি উঠাইতে মাটি দেখা যায় না। (পুষ্করিণীর পানি স্রোতের পানির ন্যায়।) এইরকম হাউযকে 'দাহ্‌দরদাহ্‌' বলে। এমন হাউযে যদি এ-রকম নাজাছাত পড়ে, যাহা পড়ার পরে আর দেখা যায় না, যেমন প্রস্রাব, রক্ত, শরাব ইত্যাদি, তবে উহার সব দিকেই ওযূ করিতে পারিবে। আর যদি এ রকম নাজাছাত পড়ে যাহা দেখা যায়, যেমন মৃত কুকুর, তবে যে দিকে ঐ নাজাছাত আছে সে দিক ছাড়া আর সব দিকে ওযূ করিতে পারিবে। হাঁ, যদি এই রকম হাউযেও এত বেশী পরিমাণে নাজাছাত পড়ে যে, পানির রং, মজা বা গন্ধ পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে দাহ্‌দরদাহ্‌ হাউযও নাপাক হইয়া যাইবে। —মুন্‌ইয়া

১২। **মাসআলা ঃ** যদি হাউয ২০ হাত লম্বা এবং ৫ হাত চওড়া বা ২৫ হাত লম্বা এবং ৪ হাত চওড়া হয়, তবে এ রকম হাউযও দাহ্‌দরদাহ্‌ হাউযেরই মত। —শরহে তান্‌বীর (অর্থাৎ ১০০ বর্গ হাত)

১৩। **মাসআলা ঃ** ছাদের উপর নাজাছাত ছিল, বৃষ্টি হইয়া পরনালা (চুঙ্গী) দিয়া পানি আসিতেছে, যদি অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশী ছাদ নাপাক থাকে, তবে ঐ পানি নাপাক হইবে; আর যদি অর্ধেকের কম ছাদ নাপাক থাকে, তবে পানি পাক থাকিবে। কিন্তু যদি নাজাছাত পরনালার কাছেই হয় আর এত বেশী নাজাছাত যে, সব পানিই নাজাছাত মিলিয়া আছে, তবে সে পানি নাপাক হইবে। (ইহাতে বুঝা যায় যে, ছনের বা টিনের চাল হইতে যে পানি আসে তাহা সাধারণতঃ পাক হয়।) —মুন্‌ইয়া

১৪। **মাসআলা ঃ** ধীরে প্রবাহিত স্রোতের পানিতে তাড়াতাড়ি ওযূ করিবে না তাহাতে ধোয়া পানি আবার আসিতে পারে। —মুন্‌ইয়া।

১৫। **মালআলা ঃ** দাহ্‌দরদাহ্‌ হাউযে (বা পুষ্করিণীতে) যে জায়গায় ধোয়া পানি পড়িয়াছে তথা হইতেই পুনরায় পানি লইলে ওযূ দুরুস্ত হইবে। —মুন্‌ইয়া

১৬। **মাসআলা ঃ** কোন কাফের বা কোন শিশু পানিতে হাত দিলে পানি নাপাক হয় না। কিন্তু যদি জানা যায় যে, হাতে নাজাছাত ছিল, তবে অবশ্য পানি নাপাক হইয়া যাইবে। কিন্তু ছোট শিশুর কোন কাজে বিশ্বাস নাই। অতএব, অন্য পানি পাইলে তাহার হাত দেওয়া পানি দিয়া ওযূ না করা ভাল। —মুন্‌ইয়া

১৭। মাসআলাঃ মশা, মাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, বিচ্ছু ইত্যাদি যে-সব প্রাণীর মধ্যে প্রবহমান রক্ত নাই সে-সব প্রাণী পানিতে মরিয়া থাকিলে বা বাহির হইতে মরিয়া পানিতে পড়িলে তাহাতে পানি নাপাক হয় না। —হেদায়া

১৮। মাসআলাঃ যে-সব প্রাণী পানিতেই পয়দা হয় এবং পানিতেই থাকে সে-সব প্রাণী পানিতে মরিলে তাহাতে পানি নাপাক হয় না; যেমন—মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদি। এইরূপ পানি ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থের মধ্যে উহারা মরিলে তাহাও নাপাক হয় না; যেমন, সিরকা, শিরা, দুধ ইত্যাদি। ব্যাঙ শুক্‌নার হউক বা পানির হউক উভয়েরই একই হুকুম, অর্থাৎ—যেমন পানির ব্যাঙ মরিলে পানি নাপাক হয় না, সেইরূপ শুক্‌নার ব্যাঙ মরিলেও পানি নাপাক হয় না। কিন্তু যদি শুকনার কোন প্রকার ব্যাঙের মধ্যে প্রবহমান রক্ত আছে বলিয়া জানা যায়, তবে তাহা মরিলে পানি নাপাক হইয়া যাইবে। শুক্‌নার ব্যাঙ এবং পানির ব্যাঙ চিনিবার উপায় এই যে, পানির ব্যাঙের পায়ের অঙ্গুলিগুলি জোড়া (হাঁসের পায়ের মত) আর শুক্‌নার ব্যাঙের অঙ্গুলিগুলি পৃথক পৃথক হয়। —শরহে তান্‌বীর

১৯। মাসআলাঃ যে সব জন্তু পানিতে পয়দা হয় না, কিন্তু পানিতে বাস করে, সে সব জন্তু পানিতে মরিলে বা বাহিরে মরিয়া পানিতে পড়িলে পানি নাপাক হইয়া যায়; যেমন, হাঁস, পানিকড়ি ইত্যাদি। —শরহে তান্‌বীর

২০। মাসআলাঃ ব্যাঙ কচ্ছপ পানিতে মরিয়া যদি পঁচিয়া গলিয়াও যায়, তবুও পানি পাক থাকিবে। তবে এরকম পানি পান করা, বা উহা দ্বারা ভাত তরকারী পাকান দুরুস্ত নহে, কিন্তু ওযূ-গোছল করা দুরুস্ত আছে। —শরহে তান্‌বীর

২১। মাসআলাঃ রৌদ্রে থাকিয়া যে পানি গরম হইয়া যায়, তাহার ব্যবহারে শরীরে সাদা সাদা দাগ (শ্বেতকুষ্ঠ) হইয়া যাওয়ার আশংকা আছে। অতএব, উহা দ্বারা ওযূ-গোছল করা উচিত নহে। —শামী

২২। মাসআলাঃ মৃত গরু, ছাগল ইত্যাদি জানোয়ারের চামড়া লবণ দিয়া রৌদ্রে শুকাইলে বা কোন দাওয়া-দারুর দ্বারা এমনভাবে পানি শুকাইয়া ফেলিলে যাহাতে ঘরে থাকিলে খারাপ না হয়, (দেবাগত বা ট্যানারীর পর) উহা পাক হইয়া যায়, উহার উপর নামায পড়া যাইতে পারে। মশক ইত্যাদি বানাইয়া তাহাতে পানি রাখা যাইতে পারে। শূকরের চামড়া কিছুতেই পাক হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্য সব জন্তুর চামড়াই পাক হয়, কিন্তু মানুষের চামড়া দ্বারা কোন কাজ করা ভারী গুনাহ্। —হেদায়া

২৩। মাসআলাঃ কুকুর, বিড়াল, বানর, বাঘ ইত্যাদি যে সকল জন্তুর চামড়া দেবাগত করিলে পাক হয় সেই সব জন্তু যদি বিসমিল্লাহ্ পড়িয়া যবাহ করা হয়, তবে তাহার চামড়া দেবাগত ছাড়াও পাক হইবে; কিন্তু গোশ্‌ত পাক হইবে না। উহা খাওয়াও দুরুস্ত হইবে না। —হেদায়া

২৪। মাসআলাঃ শূকর ব্যতীত অন্যান্য মৃত জন্তুর পশম, শিং, হাড় এবং দাঁত পাক। ইহারা পানিতে পড়িলে পানি নষ্ট হয় না; কিন্তু যদি হাড় বা দাঁতে কিছু চর্বি বা গোশ্‌ত লাগা থাকে তাহা নাপাক, তাহা পানিতে পড়িলে পানি নাপাক হইবে। —হেদায়া

২৫। মাসআলাঃ মানুষের হাড় এবং চুল পাক; কিন্তু এসব দ্বারা কোন কাজ করা জায়েয নহে। উহা তা'যীমের সহিত দাফন করিয়া দেওয়া উচিত।

কূপের মাসআলা

১। **মাসআলাঃ** (১০০ বর্গ হাতের চেয়ে ছোট) কূপে কোন নাপাক জিনিস পড়িলে কূপ নাপাক হইয়া যায়, বেশী পড়ুক আর কমই পড়ুক উহার পানি সম্পূর্ণ বাহির করিয়া ফেলিলে উহা পাক হইয়া যায়। যখন সমস্ত পানি বাহির হইয়া যাইবে, তখন কূপের ভিতরের চারি দেওয়াল ইত্যাদি আর ধোয়ার দরকার করে না, শুধু পানি বাহির করিয়া ফেলিলে সব পাক হইয়া যাইবে। যে বাল্‌তি, ডুল্‌চি বা দড়ির দ্বারা পানি বাহির করা হয় তাহাও ধোয়ার দরকার নাই। পানি বাহির হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সব পাক হইয়া যায়। সমস্ত পানি বাহির করার অর্থ এই যে, এত পরিমাণ পানি উঠাইবে যে, কূপের পানি কম হইয়া যায় এবং এখন আর বাল্‌তি অর্ধেকও ভরে না তখনই বুঝিবে সব পানি উঠান হইয়াছে। —হেদায়া

২। **মাসআলাঃ** কবুতর বা চড়ুইর মল কূপে পড়িলে পানি নাপাক হইবে না। মুরগীর বা হাঁসের মল পড়িলে নাপাক হইবে। তখন সমস্ত পানি বাহির করা ওয়াজিব হইবে। —মুন্‌ইয়া

৩। **মাসআলাঃ** কূপে কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল প্রস্রাব করিলে বা অন্য কোন নাজাছাত পড়িলে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। —মুন্‌ইয়া

৪। **মাসআলাঃ** কূপে মানুষ, কুকুর, বকরী বা এই শ্রেণীর অন্য কোন জন্তু পড়িয়া মরিয়া গেলে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে; আর যদি বাহিরে মরিয়া ভিতরে পড়ে তাহাতেও এই একই হুকুম। —হেদায়া

৫। **মাসআলাঃ** কোন জন্তু ছোট হউক বা বড় হউক কূপে পড়িয়া মরিয়া ফুলিয়া পচিয়া গেলে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। অতএব, যদি ইঁদুর বা চড়ুই পাখীও পড়িয়া মরিয়া ফাটিয়া বা ফুলিয়া যায়, তবে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। —হেদায়া

৬। **মাসআলাঃ** ইঁদুর, চড়ুই পাখী বা এই শ্রেণীর অন্য কোন প্রাণী যদি কূপে পড়িয়া শুধু মরিয়া যায়, কিন্তু ফাটেও নাই, ফুলেও নাই, তবে প্রথমে মৃত প্রাণীটি বাহির করিয়া ফেলিবে, তৎপর ২০ বাল্‌তি পানি বাহির করা ওয়াজিব। এবং ৩০ বালতি বাহির করা বেশী ভাল। মৃত প্রাণীকে বাহির না করিয়া পানি বাহির করার কোনই সার্থকতা নাই। যদি মৃত প্রাণীকে বাহির করার পূর্বে পানি বাহির করিতে শুরু করিয়া থাকে, তবে তাহার হিসাব ঐ মৃত প্রাণী বাহির করার পর হইতে ধরিতে হইবে; উহা বাহির করার পূর্বে যত বাল্‌তি বাহির করা হইয়াছে তাহা হিসাবে ধরা হইবে না। —হেদায়া

৭। **মাসআলাঃ** বড় গিরগিট (কাক্‌লাস) যাহার মধ্যে প্রবহমান রক্ত থাকে, তাহা কূপে পড়িয়া মরিয়া গেলে যদি ফুলিয়া ফাটিয়া না থাকে, তবে ২০ বাল্‌তি পানি বাহির করিতে হইবে, কিন্তু ৩০ বাল্‌তি বাহির করা বেশী ভাল। আর যে সব গিরগিটের (টিকটিকির) মধ্যে প্রবহমান রক্ত নাই তাহা মরিলে পানি নাপাক হয় না। —হেদায়া

৮। **মাসআলাঃ** কবুতর, মুরগী, বিড়াল বা এই ধরনের অন্য কোন জন্তু কূপে পড়িয়া মরিয়া যদি ফুলিয়া না থাকে, তবে ৪০ বাল্‌তি পানি বাহির করা ওয়াজিব, ৬০ বাল্‌তি বাহির করা বেশী ভাল। —হেদায়া

৯। **মাসআলা ঃ** যে কূপে যে বাল্‌তি বা ডুলচি ব্যবহার করা হয় সেই কূপের জন্য সেই বালতিরই হিসাব ধরা হইবে! আর যদি অনেক বড় বাল্‌তির দ্বারা পানি বাহির করা হয়, তবে নিত্যকার ব্যবহৃত বাল্‌তির পরিমাণে হিসাব করিয়া লইবে। যেমন, হয়ত ৩০ বাল্‌তি পানি বাহির করিতে হইবে; আর যে বাল্‌তি দ্বারা বাহির করিতেছে তাহাতে এই কূপের বাল্‌তির ২ বাল্‌তি পানি ধরে, তবে ঐ বড় বাল্‌তির ১৫ বাল্‌তি বাহির করিলেই চলিবে। আর যদি ৪ বাল্‌তি পানি ধরে, তবে ৪ বাল্‌তি ধরিতে হইবে। মোটকথা, যত বাল্‌তি পানি ধরিবে তত বাল্‌তি হিসাব করিতে হইবে এবং সেই পরিমাণ পানি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। (কূপ বলিতে কাঁচা এবং পাকা উভয়ই বুঝায়।) —হেদায়া

১০। **মাসআলা ঃ** যদি কূপ এমন হয় যে, সব সময়ই নিম্ন হইতে বেগে পানি উঠিতে থাকে, কিছুতেই পানি শেষ করা যায় না, তবে অনুমান করিয়া যে পরিমাণ পানি প্রথমে ছিল সে পরিমাণ বাহির করিতে হইবে।

● পানি অনুমান করিবার কয়েকটি ছুরত আছে; একটি এই যে, যেমন, পাঁচ হাত পানি আছে, তবে একদমে ১০০ বাল্‌তি পানি বাহির করিয়া দেখিবে যে, কত কম হইয়াছে। যদি এক হাত কম হইয়া থাকে, তবে এই হিসাবে পাঁচ হাত পানি বাহির করিতে ৫০০ বাল্‌তি পানি বাহির করিতে হইবে। দ্বিতীয় ছুরত এই যে, যাহারা পানির সঠিক অনুমান করিতে পারে সেই রকম দুইজন পরহেযগার মুসলমানের দ্বারা অনুমান করাইবে। তাহারা যত বাল্‌তি বলে তত বাল্‌তি বাহির করিয়া ফেলিবে। এই উভয় ছুরতের কোনটিই পারা না গেলে ৩০০ বাল্‌তি বাহির করাইয়া দিবে। —হেদায়া

১১। **মাসআলা ঃ** কূপে মৃত ইঁদুর বা অন্য কিছু মৃত দেখা গেল, উহা পতিত হওয়ার সময় জানা নাই; কিন্তু ফুলেও নাই, ফাটেও নাই। এমতাবস্থায় যাহারা ঐ কূপের পানির দ্বারা ওযূ করিয়া নামায পড়িয়াছে তাহাদের দেখার সময় হইতে এক দিন এক রাতের নামায দোহ্‌রাইতে হইবে। আর এক দিন এক রাতের মধ্যে যে সব কাপড় চোপড় ধোয়া হইয়াছে সে সব পুনরায় ধুইতে হইবে। —হেদায়া

আর যদি মরিয়া বা ফুলিয়া ফাটিয়া থাকে, তবে তিন দিন তিন রাতের নামায দোহ্‌রাইতে হইবে। কিন্তু যাহারা ঐ পানির দ্বারা ওযূ করে নাই তাহাদের অবশ্য দোহ্‌রাইতে হইবে না। এই ব্যবস্থাই বেশী উত্তম! (ইহা ইমাম আযম ছাহেবের মত।) কিন্তু কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, নাপাকী দেখার সময় হইতেই কূপ নাপাক ধরিতে হইবে, তাহার পূর্বের নামায ও ওযূ সব দুরুস্ত হইয়া গিয়াছে। যদি কেহ এই শেষোক্ত মাসআলা অনুযায়ী আমল করে, তবে তাহাও দুরুস্ত হইবে। —হেদায়া, মুনইয়া, দুররুল মুখতার

১২। **মাসআলা ঃ** কাহারও গোছলের হাজত হইয়াছে। সে বাল্‌তি উঠাইবার জন্য কূপের ভিতর নামিয়াছে, কিন্তু তাহার শরীরে বা কাপড়ে কোন নাপাকী লাগে নাই; তবে তাহাতে কূপ নাপাক হইবে না। এমন কি যদি কোন কাফের কূপে নামে আর তাহার শরীরে বা কাপড়ে কোন নাপাকী না থাকে, তবে কূপ নাপাক হইবে না। আর যদি শরীরে বা কাপড়ে কোন নাপাকী লাগিয়া থাকে, তবে কূপ নাপাক হইয়া যাইবে, সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। আর নাপাকী সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে, শুধু সন্দেহের কারণে কূপ নাপাক হইবে না, এই সন্দেহ অবস্থায় ২০/৩০ বাল্‌তি পানি বাহির করিয়া ফেলা ভাল। —রদ্দুল মোহ্‌তার

১৩। মাসআলা ঃ বকরী বা ইঁদুর কূপের মধ্যে পড়িয়া জীবিতই বাহির হইয়া আসিয়াছে, তবে পানি পাক আছে, পানি বাহির করিতে হইবে না। —দুর্‌রে মুখতার

১৪। মাসআলা ঃ বিড়াল ইঁদুর ধরিয়া যখম করায় রক্ত বাহির হইতেছে এবং বিড়ালের দাঁত হইতে ছুটিয়া গিয়া রক্তসহ কূপে পড়িয়া গিয়াছে, এমতাবস্থায় সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। —শামী

১৫। মাসআলা ঃ ইঁদুর নাপাক ড্রেন হইতে বাহির হইয়া শরীরের নাপাকীসহ কূপে পড়িয়া গিয়াছে, তবে মরুক বা না মরুক ঐ পানি বাহির করিতে হইবে। —শামী

১৬। মাসআলা ঃ ইঁদুরের লেজ কাটিয়া কূপে পড়িলে সমস্ত পানি বাহির করিতে হইবে। রক্তবিশিষ্ট গিরগিটের লেজ পড়িলেও এই হুকুম। —রদ্দুল মোহ্‌তার

১৭। মাসআলা ঃ যে জিনিস পড়ায় কূপ নাপাক হইয়াছে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা বাহির করা যায় না, তবে উহা যদি এরকম জিনিস হয় যে, নিজে তো পাক কিন্তু অন্য নাপাক জিনিস লাগিয়া গিয়াছিল যেমন, নাপাক কাপড়, নাপাক বল, নাপাক জুতা, এমতাবস্থায় শুধু সমস্ত পানি বাহির করিয়া ফেলিলেই কূপ পাক হইয়া যাইবে। আর যদি সে জিনিস নিজেই নাপাক হয় যেমন—কোন মৃত জন্তু ইঁদুর ইত্যাদি, তবে যে পর্যন্ত এই এক্বীন না হইবে যে, ঐ জিনিস পচিয়া গলিয়া সম্পূর্ণ মাটি হইয়া গিয়াছে, সে পর্যন্ত ঐ কূপ পাক হইতে পারে না। যখন এই এক্বীন হইবে, তখন সমস্ত পানি বাহির করিয়া ফেলিলে অবশ্য কূপ পাক হইয়া যাইবে। —ফাতাওয়ায় হিন্দিয়া

১৮। মাসআলা ঃ যে পরিমাণ পানি বাহির করিবার হুকুম তাহা এক বারে বাহির করুক, বা অল্প অল্প করিয়া কয়েক বারে বাহির করুক সব অবস্থাই (হুকুমের পরিমাণ পানি বাহির করা হইলে) কূপ পাক হইয়া যাইবে। —রদ্দুল মোহ্‌তার

ঝুটার মাসায়েল

[খাদ্য বা পানীয় বস্তু মুখে লাগাইয়া ত্যাগ করিলে তাহাকে ঝুটা বলে]

১। মাসআলা ঃ বেদ্বীনই হউক, ঋতুমতীই হউক, আর নাপাকই হউক, নেফাছওয়ালীই হউক—সব রকমের মানুষের ঝুটা পাক। এইরূপে ইহাদের ঘামও পাক। কিন্তু হাতে বা মুখে কোন নাপাকী থাকিলে অবশ্য ঝুটা নাপাক হইয়া যাইবে। —হেদায়া, আলমগীরী

২। মাসআলা ঃ কুকুরের ঝুটা নাপাক। কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তাহা নাপাক হইয়া যায়। তাহা মাটির পাত্র হউক, কিংবা তামা কাঁসার পাত্র হউক সবই তিনবার ধুইলে পাক হইয়া যায় কিন্তু সাতবার ধোয়া ভাল। আর একবার মাটির দ্বারা মাজিয়া ফেলিলে আরও বেশী ভাল, যেন খুব পরিষ্কার হইয়া যায়। —হেদায়া

৩। মাসআলা ঃ শূকরের ঝুটাও নাপাক। এইরূপে বাঘ, চিতাবাঘ, বানর, শৃগাল ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর ঝুটাও নাপাক। —হেদায়া

৪। মাসআলা ঃ বিড়ালের ঝুটা পাক বটে, কিন্তু মাক্‌রূহ্‌। তবে অন্য পানি থাকিতে বিড়ালের ঝুটা পানির দ্বারা ওযূ করিবে না। অবশ্য যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে ঐ পানির দ্বারাই ওযূ করিবে। —বেদায়া

৫। **মাসআলা ঃ** যে দুধ বা তরকারী ইত্যাদির মধ্যে বিড়াল মুখ দিয়াছে, যদি উহার মালিক অবস্থাপন্ন হয়, তবে তাহা খাইবে না। যদি গরীব হয়, তবে খাওয়াতে কোন গুনাহ্ নাই। এরকম লোকের জন্য তা মাকরূহ্ নহে। —হেদায়া

৬। **মাসআলা ঃ** বিড়াল ইঁদুর ধরিয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া কোন হাড়িতে মুখ দিলে তাহা নাপাক হইয়া যাইবে; আর যদি কিছুক্ষণ দেরী করিয়া নিজের মুখ চাটিয়া চুষিয়া মুখ দিয়া থাকে, তবে নাপাক হইবে না; তবে তখন উপরের মাসআলার মত মাক্রূহ হইবে। —শঃ বেকায়া

৭। **মাসআলা ঃ** যে মুরগী খোলা থাকে, এদিকে, ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নাপাক জিনিস খায়, উহার ঝুটা মাকরূহ্, যে মুরগীকে বন্ধ করিয়া রাখা হয় তাহার ঝুটা পাক, মাকরূহ্ নহে। —হেদায়া

৮। **মাসআলা ঃ** যে সকল পাখী শিকার করিয়া খায়, যেমন—শিক্‌রা বাজ ইত্যাদি, তাহাদের ঝুটা মাকরূহ্, কিন্তু যদি ঘরের পোষা হয় এবং মরা না খায়, ঠোঁটেও কোন রকম নাপাকী থাকার সন্দেহ না থাকে, তবে তাহার ঝুটা পাক। —হেদায়া

৯। **মাসআলা ঃ** হালাল পশু যেমন— ভেড়া, বকরী, ভেড়ী, গরু, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি এবং হালাল পাখী, যেমন—ময়না, তোতা, ঘুঘু, চড়ুই ইত্যাদির ঝুটা পাক; এইরূপ ঘোড়ার ঝুটাও পাক। —আলমগীরী

১০। **মাসআলা ঃ** যে সব প্রাণী ঘরে থাকে, যেমন— সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর টিক্‌টিকি, এসবের ঝুটা মাকরূহ্। —হেদায়া

১১। **মাসআলা ঃ** ইঁদুর যদি রুটির কিছু অংশ খাইয়া থাকে, সেই দিক দিয়া কিছু ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট অংশ খাইবে। —রদ্দুল মোহ্‌তার

১২। **মাসআলা ঃ** গাধা এবং খচ্চরের ঝুটা পাক বটে, কিন্তু ওযূ হওয়া না হওয়ার মধ্যে সন্দেহ আছে। অতএব, যদি কোথাও গাধা বা খচ্চরের ঝুটা-পানি ব্যতীত অন্য পানি না মিলে, তবে ঐ পানির দ্বারা ওযূ করিতে হইবে এবং তায়াম্মুমও করিবে। প্রথমে ওযূ করুক কিংবা প্রথমে তায়াম্মুম করুক উভয় দিক সমান। —হেদায়া

১৩। **মাসআলা ঃ** যে সব জানোয়ারের ঝুটা নাপাক তাহার ঘামও নাপাক। যাহাদের ঝুটা পাক তাহাদের ঘামও পাক। আর যাহাদের ঝুটা মাকরূহ্ তাহাদের ঘামও মাকরূহ্। গাধা এবং খচ্চরের ঘাম পাক, যদি উহা কাপড়ে লাগে, তবে ধোয়া ওয়াজিব নহে, কিন্তু ধুইয়া ফেলা ভাল। —দুঃ মুঃ

১৪। **মাসআলা ঃ** কেহ হয়ত বিড়াল পোষে, এখন বিড়াল কাছে আসিয়া বসে এবং ঐ ব্যক্তির হাত পা চাটে, তবে যেখানে যেখানে চাটিয়াছে বা তাহার লোয়াব লাগিয়াছে সে সব জায়গা ধুইয়া ফেলিবে, যদি না ধোয়, তবে মাকরূহ্ এবং অন্যায় হইবে। —মুন্‌ইয়া, আলমগীরী

১৫। **মাসআলা ঃ** (নিজের স্বামী ছাড়া) অপর পুরুষের ঝুটা-খাদ্য ও পানি আওরতের জন্য খাওয়া মাকরূহ, যদি জানে যে, অমুকের ঝুটা। আর যদি না জানিয়া খায়, তবে মাকরূহ্ নহে। (এইরূপে নিজের স্ত্রী ছাড়া বেগানা আওরতের ঝুটা পুরুষের জন্যও মাকরূহ্।)

তায়াম্মুমের মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** কেহ হয়ত এমন ময়দানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, কোথাও পানি আছে বলিয়া সে মাত্রও জানে না এবং কোন লোকও পায় না যে, জিজ্ঞাসা করে, তবে এমন সময় তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে। আর যদি কোন লোক পায় আর সে বলিয়া দেয় যে, শরয়ী এক

মাইলের মধ্যে পানি আছে এবং মনেও বলে যে, সে সত্য বলিয়াছে, অথবা কোন লোক তো পাওয়া যায় নাই, কিন্তু কোন লক্ষণে সে নিজেই বুঝিতে পারিল যে, শর্‌য়ী এক মাইলের মধ্যেই কোথায়ও নিশ্চয়ই পানি আছে, তবে এমত অবস্থায় সে পানি এতদূর তালাশ করিতে যাইবে, যাহাতে তাহার নিজের ও সাথীদের কোনরূপ কষ্ট না হয়। তালাশ না করিয়া তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে না। (আর যদি সাথীদের কোন রকম কষ্ট হয়, তবে তালাশ করা ওয়াজিব নহে।) আর যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, শর্‌য়ী এক মাইলের মধ্যেই পানি আছে, তবে (সাথীদের কষ্ট হইলেও) সেখানে যাইয়া পানি আনা ওয়াজিব। ইংরেজী এক মাইল এবং এক মাইলের এক অষ্টমাংশ মিলিয়া শর্‌য়ী এক মাইল হয়। —মুন্‌ইয়া

২। **মাসআলা ঃ** পানির খবর (-ও) পাওয়া গেল, কিন্তু শর্‌য়ী মাইল হইতে দূরে, তবে সেখান হইতে পানি আনিয়া ওযূ করা ওয়াজিব নহে; বরং তায়াম্মুম করা জায়েয।

৩। **মাসআলা ঃ** কেহ বসতি হইতে এক মাইল দূরে আছে। এক মাইলের কমে কোথাও পানি পায় না, তাহার জন্যও তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে, সে মোসাফির হউক বা না হউক। কারণ, সামান্য কত দূর যাইবার জন্য বসতি হইতে বাহির হইয়াছে মাত্র।

৪। **মাসআলা ঃ** রাস্তায় কূপ আছে, কিন্তু কূপ হইতে পানি তুলিবার জন্য সঙ্গে কিছু নাই, কোথাও চাহিয়াও পাওয়া গেল না; এমতাবস্থায় তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** পানি আছে, কিন্তু এত অল্প যে, একবার হাত, মুখ ও উভয় পা ধোয়া যায়, তবে তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে না; এক এক বার ঐ সব অঙ্গ ধুইবে এবং মাথা মছ্‌হে করিবে। কুল্লি ইত্যাদি ওযূর সুন্নতগুলি ছাড়িয়া দিবে; আর যদি এত পরিমাণও না হয়, তবে অবশ্য তায়াম্মুম করিবে।

৬। **মাসআলা ঃ** রোগের কারণে পানি ক্ষতি করিলে, অর্থাৎ, পানি দ্বারা ওযূ বা গোছল করিলে হয় রোগ বৃদ্ধি পাইবে, না হয় আরোগ্য লাভে বিলম্ব হইবে, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে। তবে যদি ঠাণ্ডা পানি ক্ষতি করে কিন্তু গরম পানি ক্ষতি না করে, তবে গরম পানি দিয়া ওযূ-গোসল ওয়াজিব। গরম পানি পাওয়া সম্ভব না হইলে তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি পানি নিকটে থাকে অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে জানা থাকে যে, শর্‌য়ী এক মাইলের ভিতর পানি আছে, তবে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না। তথা হইতে পানি আনিয়া ওযূ করা ওয়াজিব। লোক-লজ্জার খাতিরে বা পর্দা করার জন্য পানি আনিতে না গিয়া তায়াম্মুম করিয়া লওয়া দুরুস্ত নহে, শরীঅতের হুকুম ছুটিয়া যায়, এমন পর্দা না-জায়েয এবং হারাম; বরং বোরকা পরিয়া বা চাদর দ্বারা সমস্ত শরীর ঢাকিয়া পানি আনিয়া ওযূ করা ওয়াজিব। কিন্তু লোকের সামনে বসিয়া ওযূ করিবে না, মুখ হাতও খোলা জায়েয হইবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** যে-পর্যন্ত পানি দ্বারা ওযূ করা না যায় সে পর্যন্ত তায়াম্মুমই করিতে থাকিবে, যত দিনই অতীত হউক না কেন, কোনরূপ ওয়াছওয়াছা বা সন্দেহ করিবে না। ওযূ এবং গোসল দ্বারা যেরূপ পাক হওয়া যায়, তদ্রূপ তায়াম্মুম দ্বারাও পাক হওয়া যায়। এরূপ মনে করিবে না যে, তায়াম্মুমে ভালমত পাক হয় না।

৯। **মাসআলা ঃ** যদি পানি বিক্রি হয় এবং ক্রয় করার মূল্য না থাকে, তবে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে। যদি মূল্য থাকে, আর পথের আবশ্যক খরচেরও অভাব না পড়ে, তবে পানি কিনিয়া ওযূ করা ওয়াজিব হইবে, তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি এত বেশী মূল্য চায় যে, এত

মূল্যে কেহই খরিদ করে না, তবে তায়াম্মুম করা জায়েয আছে, পানি খরিদ করা ওয়াজিব নহে। যদি কেরায়া ইত্যাদি পথ-খরচের অতিরিক্ত অর্থ না থাকে, তবুও কেনা ওয়াজিব নহে, তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** শীতের দরুন যদি বরফ জমে এবং গোসল করিলে প্রাণ নাশ বা রোগ বৃদ্ধির পূর্ণ আশংকা থাকে এবং শরীর গরম করিবার জন্য লেপ ইত্যাদি কোন প্রকার গরম বস্ত্র না থাকে, তবে এরূপ কঠিন ওযরের সময় তায়াম্মুম করা দুরুস্ত হইবে।

১১। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও অর্ধেকের চেয়ে বেশী শরীরে যখম থাকে বা বসন্ত বাহির হয়, তবে তাহার জন্য গোসল ওয়াজিব নহে, তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** কেহ ময়দানে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িয়াছে অথচ পানি নিকটেই ছিল, কিন্তু সে আদৌ জানিতে পারে নাই, তবে তাহার তায়াম্মুম এবং নামায উভয় দুরুস্ত হইয়াছে, এখন আর নামায দোহ্‌রাইতে হইবে না।

১৩। **মাসআলা ঃ** সফরে যদি অন্য কাহারও কাছে পানি থাকে, তবে নিজে চিন্তা করিয়া দেখিবে, যদি বিশ্বাস হয় যে, চাহিলে দিতে পারে, তবে না চাহিয়া তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না। আর যদি চাহিলে দিবে না বলিয়া মনে হয় তবে না চাহিয়াও তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়া দুরুস্ত; কিন্তু এই ছুরতে নামাযের পর চাহিলে যদি পানি দেয়, তবে নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে।

১৪। **মাসআলা ঃ** কৌটায় (বা টিনে) বন্ধ যমযমের পানি সঙ্গে থাকিলে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না, কৌটা বা টিন খুলিয়া ঐ পানি দ্বারা ওযূ এবং গোছল করা ওয়াজিব।

১৫। **মাসআলা ঃ** সঙ্গে পানি আছে, কিন্তু রাস্তা এমন ধরনের যে, কোথায়ও পানির আশা নাই, পানির অভাবে (নিজের বা সঙ্গের বাহন জন্তুর) প্রাণ নাশের বা কষ্ট পাওয়ার আশংকা আছে, এমন অবস্থায় ওযূ করিবে না, তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

১৬। **মাসআলা ঃ** গোছলে ক্ষতি করে কিন্তু ওযূতে ক্ষতি করে না, তবে গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবে। কিন্তু গোছলের তায়াম্মুমের পরে যখন ওযূ টুটিবে, তখন ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম জায়েয হইবে না, ওযূই করিবে। যদি গোছলের তায়াম্মুমের আগে ওযূ টুটিবারও কোন কারণ হইয়া থাকে, তারপর গোছলের তায়াম্মুম করিয়া থাকে, তবে এই তায়াম্মুমই গোছল এবং ওযূর পরিবর্তে যথেষ্ট হইবে।

১৭। **মাসআলা ঃ তায়াম্মুম করিবার নিয়ম ঃ** (প্রথমে দেলে ঠিক করিবে অর্থাৎ নিয়ত করিবে যে, আমি পাক হইবার জন্য বা নামায পড়িবার জন্য তায়াম্মুম করিতেছি। এইরূপ নিয়ত করিয়া তারপর) উভয় হাত পাক মাটিতে মাড়িয়া সমস্ত মুখে হাত ফিরাইয়া দিবে। তারপর আবার উভয় হাত মাটিতে মাড়িয়া উভয় হাতের কনুই সমেত ফিরাইয়া দিবে। চুড়ি ও বালার ভিতর খুব ভাল করিয়া হাত ফিরাইবে। সাবধান, এক বিন্দু জায়গাও যেন বাকী না থাকে; তাহা হইলে তায়াম্মুম হইবে না। আংটি খুলিয়া রাখিয়া তায়াম্মুম করিবে, যেন কোন জায়গা বাকী না থাকে। হাতের আঙ্গুলের মধ্যে খেলাল করিবে, এই দুইটি কাজ করিলেই তায়াম্মুম হইয়া গেল।

১৮। **মাসআলা ঃ** মাটির উপর হাত মাড়িয়া হাত ঝাড়িয়া লইবে যেন চোখে মুখে মাটি লাগিয়া কুৎসিৎ না হয়।

১৯। **মাসআলা ঃ** (জমিন ছাড়া) মাটি জাতীয় অন্যান্য জিনিসের উপরও তায়াম্মুম করা দুরুস্ত আছে; যেমন, মাটি, বালু, পাথর, বিলাতী মাটি, পাথরে চুন, হরিতাল, সুরমা, গেরুমাটি ইত্যাদি।

মাটি জাতীয় জিনিস না হইলে উহার উপর তায়াম্মুম জায়েয নহে; যেমন—সোনা, রূপা, রাং, গেহু, কাঠ, কাপড় এবং অন্যান্য শস্য ইত্যাদি। কিন্তু যদি এই সব জিনিসের উপর মাটি জমিয়া থাকে, তবে অবশ্য মাটির কারণে ইহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

২০। মাসআলা ঃ যে জিনিস আগুনে দিলে জ্বলেও না, গলেও না তাহা মাটি জাতীয়। তাহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে। যে জিনিস জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায় বা গলিয়া যায় তাহার উপর দুরুস্ত নহে। ছাইয়ের উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত নহে।

২১। মাসআলা ঃ তামার পাত্র, বালিশ বা গদী ইত্যাদির উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত নহে। যদি এই সব জিনিসের উপর এত ধুলা জমে যে, হাত মারিলে বেশ ধুলা উড়ে এবং হাতে কিছু ধুলা ভালভাবে লাগিয়া যায়, তবে অবশ্য তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে। আর যদি হাত মারিলে সামান্য কিছু ধুলা উড়ে, তবে তাহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত নহে। পানিপূর্ণ থাকুক বা খালি থাকুক, মাটির কলস বা লোটা বদনার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে, কিন্তু যদি মাটির পাত্রের উপর রং বা বার্নিস করা হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না।

২২। মাসআলা ঃ পাথরের উপর যদি ধুলা মাত্রও না থাকে, তবুও উহার উপর তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে; বরং যদি পানি দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া উহার উপর তায়াম্মুম করে, ধুলা থাকুক বা না থাকুক তবুও তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে। হাতে ধুলা লাগা জরুরী নহে। ধুলা থাকুক বা না থাকুক, পাকা ইটের উপরও তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে।

২৩। মাসআলা ঃ কাদা দ্বারা তায়াম্মুম করা দুরুস্ত আছে বটে; কিন্তু ভাল নহে। যদি কোন স্থানে কাদা ব্যতীত অন্য কোন জিনিস না পাওয়া যায়, তবে কাপড়ে কাদা মাখাইয়া দিবে, যখন শুকাইয়া যাইবে, তখন উহা দ্বারা তায়াম্মুম করিবে। কিন্তু যদি নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া যাইতে থাকে, তবে কাদা হইলেও উহা দ্বারা সেই সময় তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে; নামায কিছুতেই ক্বাযা হইতে দিবে না।

২৪। মাসআলা ঃ মাটিতে পেশাব জাতীয় কোন নাজাছত পড়িয়াছিল, কিন্তু রৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে এবং দুর্গন্ধও চলিয়া গিয়াছে, সে মাটি পাক হইয়া গিয়াছে। উহার উপর নামায দুরুস্ত হইবে; কিন্তু সেই মাটি দিয়া তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না। এই হুকুম হইল যদি জানা থাকে যে, পেশাব পড়িয়াছিল অন্যথায় সন্দেহ করিবে না।

২৫। মাসআলা ঃ ওযূর পরিবর্তে যেমন তায়াম্মুম জায়েয সেইরূপ গোছলের পরিবর্তে ওযর বশতঃ তায়াম্মুম জায়েয হয়। যে স্ত্রীলোক হায়েয বা নেফাছ হইতে পাক হয় আর ওযরবশতঃ গোছল করিতে না পারে, তাহার জন্যও তায়াম্মুম দুরুস্ত আছে। ওযূর তায়াম্মুম এবং গোছলের তায়াম্মুম একই রকম; ইহাতে কোন পার্থক্য নাই।

২৬। মাসআলা ঃ কেহ কাহাকেও শিক্ষা দিবার জন্য তায়াম্মুম করিল, কিন্তু নিজের তায়াম্মুমের এরাদা নাই, শুধু তাহাকে শিক্ষা দেওয়াই মকছুদ, ইহাতে তায়াম্মুম হইবে না। কেননা, তায়াম্মুম দুরুস্ত হওয়ার জন্য মনে মনে তায়াম্মুমের নিয়ত করা আবশ্যক। নিয়ত না করিলে তায়াম্মুম হয় না। যেহেতু নিজের তায়াম্মুমের নিয়ত করা হয় নাই, উদ্দেশ্য ছিল অন্যকে শিখান, কাজেই তাহার তায়াম্মুম হয় নাই।

২৭। **মাসআলা ঃ** আমি পাক হইবার জন্য বা নামায পড়িবার জন্য তায়াম্মুম করিতেছি শুধু এতটুকু অন্তরে রাখিলেই তায়াম্মুম হইয়া যাইবে; 'গোছলের তায়াম্মুম করিতেছি' বা 'ওযূর তায়াম্মুম করিতেছি' এত বলার দরকার নাই।

২৮। **মাসআলা ঃ** যদি কোরআন শরীফ ধরিবার জন্য কেহ তায়াম্মুম করিয়া থাকে, তবে সে তায়াম্মুমে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না। এক ওয়াক্ত নামাযের তায়াম্মুম দ্বারা অন্য ওয়াক্তের নামাযও পড়া জায়েয এবং কোরআন শরীফ ধরাও জায়েয।

২৯। **মাসআলা ঃ** একই তায়াম্মুমে ফরয গোছল ও ওযূ উভয়ের কাজ হয়; পৃথক পৃথক তায়াম্মুম করিতে হয় না।

৩০। **মাসআলা ঃ** কেহ (পূর্বোক্ত) নিয়মানুসারে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবার পর পানি পাইয়াছে এবং নামাযের ওয়াক্ত তখনও বাকী আছে, তবুও ঐ নামায আর দোহ্‌রাইতে হইবে না। ঐ তায়াম্মুমেই নামায দুরুস্ত হইয়াছে।

৩১। **মাসআলা ঃ** পানি শরয়ী এক মাইল হইতে দূরে নয়; কিন্তু নামাযের সময় অল্প, পানি আনিতে গেলে সময় চলিয়া যাইবে, তবুও তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না, পানি আনিয়া ওযূ করিয়া কাযা পড়িবে।

৩২। **মাসআলা ঃ** পানি থাকিতে কোরআন শরীফ ধরিবার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয নহে।

৩৩। **মাসআলা ঃ** সামনে যাইয়া পানি পাওয়ার আশা আছে, তবে আউয়াল ওয়াক্তে নামায না পড়িয়া মোস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত পানির এন্তেজার করা ভাল; কিন্তু এন্তেজার করিতে করিতে মাকরূহ ওয়াক্ত যেন না আসিয়া পড়ে; আর যদি আউয়াল ওয়াক্তেও পড়িয়া নেয়, তবুও দুরুস্ত আছে।

৩৪। **মাসআলা ঃ** পানি নিকটেই আছে, পানি আনিতে নামিলে যদি গাড়ী ছাড়িয়া দিবার আশংকা হয়, তবে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে; তদ্রূপ পানির নিকট সাপ, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর ভয়ে পানি না আনা গেলে তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

৩৫। **মাসআলা ঃ** মাল-পত্রের সঙ্গে পানি ছিল কিন্তু মনে নাই; তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়ার পর পানির কথা মনে হইল, এখন নামায দোহরাইয়া পড়া ওয়াজিব নহে।

৩৬। **মাসআলা ঃ** যে সব কারণে ওযূ টুটে তাহাতে তায়াম্মুমও টুটে, তাছাড়া পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম টুটিয়া যায়। এইরূপে হয়ত তায়াম্মুম করিয়া সামনে চলিল, চলিতে চলিতে যখন শরয়ী এক মাইল হইতে কম দূরে পানি পাওয়া গেল, তখন তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে।

৩৭। **মাসআলা ঃ** তায়াম্মুম যদি ওযূর পরিবর্তে করিয়া থাকে, তবে ওযূর পরিমাণ পানি হইলে (অর্থাৎ, এতটুকু পানি পাইলে যাহাতে শুধু ওযূর ফরযগুলি আদায় হইতে পারে) ঐ তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে; আর যদি গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিয়া থাকে, তবে গোছলের পরিমাণ পানি পাইলে (অর্থাৎ, এতটুকু পানি পাইলে যাহাতে শুধু গোছলের ফরযগুলি আদায় হইতে পারে) এই তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে। যদি এই পরিমাণ অপেক্ষা কম পানি পাওয়া যায়, তবে তাহাতে তায়াম্মুম টুটিবে না।

৩৮। **মাসআলা ঃ** রাস্তায় পানি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সে আদৌ জানিতে পারে নাই যে, এখানে পানি আছে, তবে তাহার তায়াম্মুম টুটিবে না। এইরূপে পথে পানি পাওয়া যায়, দেখাও যায়, জানাও যায় কিন্তু রেলগাড়ী হইতে নামা যায় না; তাহাতে তায়াম্মুম টুটিবে না।

৩৯। **মাসআলাঃ** যে রোগের কারণে তায়াম্মুম করিয়াছিল যখন সে রোগ আরোগ্য হইবে অর্থাৎ, ওযূ-গোছলে ক্ষতি করিবে না; তখন তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে এবং ওযূ-গোছল করা ওয়াজিব হইবে।

৪০। **মাসআলাঃ** পানি না পাইয়া তায়াম্মুম করিয়াছিল, পরে এমন বিমার হইয়া পড়িয়াছে যে, পানি ব্যবহার করিতে পারে না, এখন পানি পাওয়া গেলে পূর্বের তায়াম্মুম টুটিয়া যাইবে, নূতন তায়াম্মুম করিতে হইবে।

৪১। **মাসআলাঃ** গোছলের হাজত হওয়ায় গোছল করিয়াছে, সামান্য একটু জায়গা শুক্‌না রহিয়া গিয়াছে, এমন সময় পানি শেষ হইয়া গিয়াছে; পানি আর পাওয়া যায় না, তবে সে পাক হয় নাই, এখন গোছলের তায়াম্মুম করিতে হইবে, পরে যখন পানি পাইবে, তখন ঐ শুক্‌না জায়গাটুকু ধুইয়া লইলেই চলিবে, সমস্ত শরীর ধুইতে হইবে না।

৪২। **মাসআলাঃ** যদি এমন সময় পানি পায় যে, ওযূও টুটিয়া গিয়াছে, তবে আগে ঐ শুক্‌না জায়গা ধুইবে, আর ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবে, যদি পানি এত অল্প হয় যে, ওযূ করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ শুক্‌না জায়গা সম্পূর্ণরূপে ঐ পানিতে ধোয়া যাইবে না, তবে সে পানির দ্বারা ওযূ করিবে এবং ঐ শুক্‌না জায়গার জন্য তায়াম্মুম করিবে। হাঁ, যদি এই গোছলের তায়াম্মুম পূর্বেই করিয়া থাকে, তবে অবশ্য নূতন তায়াম্মুম করার দরকার নাই; পূর্বের তায়াম্মুমই বাকী আছে।

৪৩। **মাসআলাঃ** কাহারও হয়ত কাপড় বা শরীর নাপাক আছে, আর ওযূও নাই, কিন্তু পানি আছে অল্প, তবে ঐ পানির দ্বারা কাপড় এবং শরীর পাক করিবে, আর ওযূর জন্য তায়াম্মুম করিবে।

৪৪। **মাসআলাঃ** অন্য কোথাও পানি নাই, একটি কূপে পানি আছে কিন্তু পানি বাহির করিবার কোন উপায় নাই; এমনকি, এমন কোন কাপড়ও নাই যে, তাহা ভিজাইয়া নিংড়াইয়া তদ্দ্বারা কাজ চালাইতে পারে, এরূপ অবস্থায় তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে।

৪৫। **মাসআলাঃ** যে ওযরে তায়াম্মুম করিয়াছে তাহা যদি মানুষের পক্ষ হইতে হয়, যেমন, যদি জেলখানায় পানি না দেয় বা বলে যে, 'যদি তুই ওযূ করিস্ তবে তোকে হত্যা করিব' এই অবস্থায় তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে, কিন্তু পরে যখন ঐ ওযর চলিয়া যাইবে, তখন ঐ সমস্ত নামায পুনরায় পড়িতে হইবে; আর যদি ওযর খোদার তরফ হইতে হয়, তবে নামায দোহ্‌রাইতে হইবে না।

৪৬। **মাসআলাঃ** একই স্থানের মাটিতে বা একই ঢিলায় যদি কয়েকজন তায়াম্মুম করে, তাহা দুরুস্ত আছে।

৪৭। **মাসআলাঃ** ওযূর জন্য পানি কিংবা তায়াম্মুমের জন্য মাটিও না পায় যেমন, কেহ রেলগাড়ীতে বা জেলখানায় পানিও পায় না, পাক মাটিও পায় না, সে বিনা ওযূতে এবং বিনা তায়াম্মুমেই নামায পড়িবে, তবুও ওয়াক্তের নামায ছাড়িবে না; কিন্তু পরে যখন পানি পাইবে, তখন ওযূ করিয়া ঐ নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িবে।

৪৮। **মাসআলাঃ** মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত পানি পাওয়ার আশা থাকিলে পানির জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম; যেমন, মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত কূপের পানি বাহির করার জন্য ডোল রশি পাওয়ার আশা থাকিলে অথবা রেলগাড়ী মোস্তাহাব ওয়াক্তের মধ্যে এমন

ষ্টেশনে পৌঁছিবে যেখানে পানি পাওয়ার আশা আছে, এইরূপ অবস্থায় মোস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরী করিয়া নামায পড়া উত্তম।

৪৯। মাসআলা ঃ রেলগাড়ীতে পানি না পাওয়ার দরুন তায়াম্মুম করিল, পরে গাড়ী চলিবার সময় পানি দেখিল তাহাতে তায়াম্মুম টুটিবে না, কারণ সেই পানি পাওয়ার শক্তি তাহার নাই, যেহেতু চল্‌তি গাড়ী হইতে নামা সম্ভব নহে।

মোজার উপর মছ্‌হে

১। মাসআলা ঃ ওযূ করিয়া যদি চামড়ার মোজা পরার পরে ওযূ টুটিয়া যায়, তবে আবার ওযূ করিবার সময় মোজার উপর মছ্‌হে করিয়া লওয়া দুরুস্ত। যদি মোজা খুলিয়া ফেলিয়া পা ধুইয়া নেয়, তবে সবচেয়ে ভাল।

২। মাসআলা ঃ চামড়ার মোজা যদি এত ছোট হয় যে, টাখ্‌না (ছোট গিরা) ঢাকা যায় না, তবে সে মোজার উপর মছ্‌হে করা দুরুস্ত হইবে না। এইরূপ যদি বিনা ওযূতে চামড়ার মোজাই পরিয়া থাকে, তবে তাহার উপর মছ্‌হে করা দুরুস্ত হইবে না ; মোজা খুলিয়া পা ধুইতে হইবে।

৩। মাসআলা ঃ শরয়ী সফর হালাতে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে ; আর সফর ব্যতীত (যেমন, বাড়ী থাকিয়া) এক দিন এক রাত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে। আর যেই ওযূ করিয়া মোজা পরিয়াছে সেই ওযূর পর প্রথমে যখন ওযূ টুটিবে সেই সময় হইতে এক দিন এক রাত বা তিন দিন তিন রাতের হিসাব ধরা হইবে। যে সময় মোজা পরিয়াছে সে সময় হইতে হিসাব ধরা হইবে না। যেমন, হয়ত কেহ যোহরের সময় ওযূ করিয়া মোজা পরিল, তারপর সূর্যাস্তের সময় ওযূ টুটিল, তবে পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারে, আর সফরের অবস্থায় তৃতীয় দিনের সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে ; যখন সূর্য ডুবিয়া যাইবে, তখন আর মছ্‌হে করিতে পারিবে না।

৪। মাসআলা ঃ গোছলের হাজত হইলে মোজা খুলিয়া ফেলিতে হইবে ; গোছলের সঙ্গে মোজার উপর মছ্‌হে করা চলিবে না।

৫। মাসআলা ঃ পায়ের পিঠে মোজার উপর মছ্‌হে করিবে, পায়ের তলায় মছ্‌হে করিবে না।

৬। মাসআলা ঃ মোজার উপর মছ্‌হে করিবার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি পানিতে ভিজাইয়া পায়ের পাতার অগ্রভাগে রাখিবে যেন সম্পূর্ণ মোজার উপর আঙ্গুলগুলির চাপ পড়ে। অতঃপর হাতের পাতা শূন্য রাখিয়া ক্রমশঃ আঙ্গুলগুলি টানিয়া পায়ের টাখ্‌নার দিকে আনিবে। আর যদি হাতের পাতাসহ মোজার উপরে রাখিয়া টানিয়া আনে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে।

৭। মাসআলা ঃ যদি কেহ উল্টা মছ্‌হে করে অর্থাৎ, টাখ্‌নার দিক হইতে টানিয়া পায়ের আঙ্গুলের দিকে আনে তবুও মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে, কিন্তু এরূপ করা মোস্তাহাবের খেলাফ। যদি লম্বাভাবে মছ্‌হে না করিয়া মোজার চওড়া দিকে মছ্‌হে করে, তবুও মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে ; কিন্তু মোস্তাহাবের খেলাফ হইবে।

৮। মাসআলা ঃ যদি শুধু মোজার তলার দিকে বা গোড়ালীর দিকে মছ্‌হে করে, তবে দুরুস্ত হইবে না।

৯। মাসআলা ঃ আঙ্গুলগুলি সম্পূর্ণ না লাগাইয়া যদি কেবল আঙ্গুলের মাথা লাগাইয়া উপরের দিকে টানিয়া আনে, মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে না। কিন্তু যদি আঙ্গুল হইতে অনবরত পানি

ঝরিতে থাকে এমন কি, ঐ পানি বহিয়া তিন আঙ্গুল পরিমাণ মোজায় লাগিয়া যায়, তবে অবশ্য মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে।

১০। মাসআলাঃ মছ্‌হের মোস্তাহাব হইল হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিক দিয়া মছ্‌হে করিবে। আঙ্গুলের পিঠ দিয়া মছহে করাও দুরুস্ত আছে।

১১। মাসআলাঃ কেহ হয়ত মোজার উপর মছ্‌হে করিল না, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে বা শিশিরের মধ্যে হাটায় মোজা ভিজিয়া গেল, তবে ইহাতেই মছ্‌হে হইয়া যাইবে।

১২। মাসআলাঃ হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ স্থান প্রত্যেক মোজার উপর মছ্‌হে করা ফরয; ইহার কম মছ্‌হে করিলে দুরুস্ত হইবে না।

১৩। মাসআলাঃ যে যে কারণে ওযূ টুটিয়া যায়, তাহাতে মছ্‌হেও টুটিয়া যায়। অতএব, উপরোক্ত মুদ্দতের মধ্যে ওযূর সঙ্গে সঙ্গে মছ্‌হে করিবে। মোজা খুলিলেও মছ্‌হে টুটিয়া যায়; সুতরাং যদি কাহারও ওযূ টুটিয়া না থাকে, কেবল মোজা খুলিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে, তখন শুধু উভয় পা ধুইয়া লইবে, আবার পুরা ওযূ করিতে হইবে না।

১৪। মাসআলাঃ যদি একটি মোজা খুলিয়া থাকে, তবুও মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে; এখন অপরটিও খুলিয়া উভয় পা ধোয়া ওয়াজিব হইবে।

১৫। মাসআলাঃ মছ্‌হের মুদ্দত পুরা হইয়া গেলেও মছ্‌হে টুটিয়া যায়। সুতরাং যদি ওযূ না টুটিয়া থাকে, আর মছ্‌হের মুদ্দত শেষ হইয়া যায়, তবে মোজা খুলিয়া শুধু পা দুইখানি ধুইয়া লইবে; পুরা ওযূ করিতে হইবে না। আর যদি ওযূ টুটিয়া যাইয়া থাকে, তবে মোজা খুলিয়া সম্পূর্ণ ওযূ করিবে।

১৬। মাসআলাঃ মোজার উপর মছ্‌হে করার পর কোথাও পানির মধ্যে পা পড়িয়া গিয়াছে, ঢিলা থাকার কারণে মোজার ভিতরে পানি ঢুকিয়া সম্পূর্ণ পা বা পায়ের অর্ধেকের বেশী ভিজিয়া গিয়াছে, এ রকম অবস্থা হইলেও মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে, উভয় পায়ের মোজা খুলিয়া ভালরূপে পা ধুইতে হইবে।

১৭। মাসআলাঃ মোজা এত ছিঁড়িয়া গিয়াছে যে, হাঁটিবার সময় পায়ের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ খুলিয়া যায়, এমতাবস্থায় মোজার উপর মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে না। আর যদি উহা অপেক্ষা কম খোলে তবে মছ্‌হে দুরুস্ত আছে।

১৮। মাসআলাঃ মোজার সেলাই খুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পা দেখা যায় না, মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে। যদি হাঁটিবার সময় তিন আঙ্গুল পরিমাণ পা দেখা যায়, কিন্তু দাঁড়ান থাকিলে পা দেখা যায় না, তবে মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে না।

১৯। মাসআলাঃ একটা মোজা এতটুকু ছেঁড়া যে, ইহাতে দুই আঙ্গুল পরিমাণ পা দেখা যায়, আর অপরটির এক আঙ্গুল পরিমাণ দেখা যায়, তবে মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে। একটা মোজারই কয়েক জায়গা ছেঁড়া, কিন্তু সব মিলাইয়া তিন আঙ্গুল পরিমাণ হয়, তবে মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে না। যদি সব ছেঁড়া মিলাইয়াও তিন আঙ্গুল পরিমাণ না হয়, তবে মছ্‌হে দুরুস্ত হইবে।

২০। মাসআলাঃ কেহ বাড়ীতে মছ্‌হে করা শুরু করিয়াছে, কিন্তু এক দিন এক রাত পুরা হওয়ার পূর্বেই সফরে গিয়াছে; তবে এখন সে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে। আর যদি সফর শুরু করার পূর্বেই এক দিন এক রাত গুযারিয়া থাকে, তবে মুদ্দত পুরা হইয়া গিয়াছে, এখন আর মছ্‌হে করিতে পারিবে না। পা ধুইয়া আবার মোজা পরিতে হইবে।

২১। **মাসআলাঃ** কেহ সফরে থাকাকালে মছ্‌হে করা শুরু করিয়াছিল, এখন বাড়ী আসিয়া যদি এক দিন একরাত হইয়া যায়, তবে মোজা খুলিয়া ফেলিবে, আর মছ্‌হে করিতে পারিবে না। যদি এক দিন এক রাতও না হইয়া থাকে, তবে এক দিন এক রাত পর্যন্ত মছ্‌হে করিতে পারিবে, ইহার বেশী পারিবে না।

২২। **মাসআলাঃ** কাপড়ের মোজার উপর যদি চামড়ার মোজা পরিয়া থাকে, তবুও মছ্‌হে জায়েয হইবে।

২৩। **মাসআলাঃ** কাপড়ের মোজার উপর মছ্‌হে করা জায়েয নহে, কিন্তু যদি কাপড়ের মোজার উপর চামড়া লাগাইয়া লয় বা অন্ততঃ পুরুষের জুতার পরিমাণ চামড়া লাগাইয়া লয়, অথবা যদি কাপড়ের মোজা এমন শক্ত ও মোটা হয় যে, বাঁধা ছাড়াই পায়ে দাঁড়াইয়া থাকে এবং পায়ে দিয়া তিন চারি মাইল পথ হাঁটা যাইতে পারে এই সব ছুরতে কাপড়ের মোজার উপর মছ্‌হে করা দুরুস্ত হইবে।

২৪। **মাসআলাঃ** বোরকা এবং হাত-মোজার উপর মছ্‌হে করা জায়েয নহে।

২৫। **মাসআলাঃ** বুটজুতা যদি পাক হয় এবং ফিতা দ্বারা খুব আঁটিয়া বাঁধা হয় যাহাতে টাখ্‌না পর্যন্ত পা ঢাকা থাকে তবে যেমন চামড়ার মোজার উপর মছ্‌হে করা জায়েয আছে তদ্রূপ বুটজুতার উপরও মছ্‌হে করা জায়েয আছে।

২৬। **মাসআলাঃ** যাহার উপর গোছল ফরয হইয়াছে, তাহার পক্ষে চামড়ার মোজার উপর মছ্‌হে করা জায়েয নহে।

২৭। **মাসআলাঃ** মা'যূর যদি মছ্‌হে করে, তবে ওয়াক্ত গুযারিয়া গেলে যেমন তাহার ওযূ টুটিয়া যাইবে তদ্রূপ তাহার মছ্‌হে টুটিয়া যাইবে। ওযূ করিবার সময় তাহার মোজা খুলিয়া পাও ধুইতে হইবে। কিন্তু যদি ওযূ করিবার সময় এবং মোজা পরিবার সময় কোন ওযর না থাকে, তবে অন্যান্য সুস্থ লোকের ন্যায় সেও মছ্‌হে করিতে পারিবে।

২৮। **মাসআলাঃ** যদি কোন প্রকারে চামড়ার মোজার মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়া পায়ের অধিকাংশ স্থান ধোয়া হইয়া থাকে, তবে তাহার মছ্‌হে করা চলিবে না, মোজা খুলিয়া পা ধুইতে হইবে।

শরমের মাসায়েল

যে সব কারণে ওযূ টুটিয়া যায়ঃ

২২। **মাসআলাঃ** স্বামীর হাত লাগার দরুন বা স্বামীর চিন্তা করায় যদি সামনের রাস্তা দিয়া এক প্রকার পানির মত বাহির হয়—যাহাকে মযী বলে—তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে।

২৩। **মাসআলাঃ** রোগের (প্রদর বা প্রমেহ রোগের) কারণে সামনের রাস্তা দিয়া এক প্রকার বিজলা পানির মত বাহির হয়, ইহাতে ওযূ টুটিয়া যায়।

২৪। **মাসআলাঃ** পেশাব বা মযীর ফোঁটা ছিদ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনও যে চামড়া উপরে থাকে তাহার ভিতরে আছে, তবু ওযূ টুটিয়া যাইবে; কেননা, ওযূ টুটিবার জন্য উপরের চামড়া হইতে বাহিরে আসা যরূরী নহে।

২৫। **মাসআলাঃ** স্বামীর পেশাবের জায়গা স্ত্রীর পেশাবের জায়গার সঙ্গে মিলিত হইলেই (কিছু বাহির হউক বা না হউক) ওযূ টুটিয়া যায় (যদি উভয়ের মধ্যে কাপড় চোপড় কিছু আড়

না থাকে)। এমনিভাবে যদি দু'জন স্ত্রীলোক স্ব স্ব যোনিদার একত্রিত করে, তবুও ওযূ টুটিয়া যাইবে, কিছু নির্গত হউক বা না হউক। কিন্তু উহা অতিশয় গুনাহ্ এবং অন্যায় কাজ।

গোছলের মাসায়েল

১০। মাসআলা ঃ গোছলের সময় পেশাবের জায়গার উপরের চামড়ার ভিতর পানি পৌঁছান ফরয। যদি পানি না পৌঁছে, তবে গোছল হইবে না।

যে সব কারণে গোছল ওয়াজিব হয় ঃ

১। মাসআলা ঃ নিদ্রিত অবস্থায় হউক বা জাগ্রত অবস্থায় হউক যৌবনের জোশের সঙ্গে যদি মনী বাহির হয়, তবে গোছল ওয়াজিব হয়। স্বামীর হাত লাগার কারণে বাহির হউক বা শুধু চিন্তা করার কারণে বা অন্য কোন কারণেই হউক না কেন, জোশের সঙ্গে মনী বাহির হইলেই গোছল ওয়াজিব হইবে।

২। মাসআলা ঃ ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল, কাপড়ে ও শরীরে লাসা ও মনী লাগিয়া রহিয়াছে, তবে কোন বদখাব দেখিয়া থাকুক বা না থাকুক গোছল করিতে হইবে।

জওয়ানির জোশের সময় প্রথমে যে পানি বাহির হয় এবং যাহা বাহির হইলে জোশ কমে না বরং আরও বাড়ে তাহাকে 'মযী' বলে। আর খুব স্ফূর্তি এবং মযা লাগিয়া অতঃপর যে পানি বাহির হয় তাহাকে 'মনী' বলে। মযী ও মনীর পার্থক্য বুঝার ইহাই উপায় যে, মনী বাহির হইয়া গেলে আগ্রহ কমিয়া যায় এবং জোশ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। আর মযী বাহির হইলে তাহাতে জোশ কমে না বরং বাড়ে। আর ইহাও এক পার্থক্য যে, মযী পাতলা হয় এবং মনী অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়। তবে শুধু মযী বাহির হইলে তাহাতে গোছল ওয়াজিব হয় না, ওযূ টুটিয়া যায়।

৩। মাসআলা ঃ স্বামীর পেশাবের জায়গার শুধু অগ্রভাগ অর্থাৎ, খতনার জায়গাটুকু মাত্র ভিতরে ঢুকিলেই গোছল ওয়াজিব হইয়া যায়, যদিও কিছুই বাহির না হয়। যেমন সামনের রাস্তার এই হুকুম, সেই রকম যদি কোন পাপিষ্ঠ পিছনের রাস্তায় (মহাহারাম হওয়া সত্ত্বেও) ঢুকায়, তবুও মনি বাহির হউক বা নাই হউক শুধু খতনার জায়গাটুকু ঢুকিবামাত্রই গোছল ওয়াজিব হইবে। স্মরণ থাকে যে, কোন পাপাচারী স্বামী যদি পিছের রাস্তায় ঢুকাইতে চায়, তবে কিছুতেই ঢুকাইতে দিবে না; কেননা, এরকম করাতে উভয়ই মহাপাপী হয়।

৪। মাসআলা ঃ সামনের রাস্তা দিয়া মাসে মাসে যে রক্ত আসে উহাকে হায়েয বলে। যখন এই রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তখন গোছল ওয়াজিব হয়। সন্তান প্রসবের পরে যে রক্ত পড়ে তাহাকে নেফাস বলে। এই রক্ত বন্ধ হওয়ার সময়ও নেফাসের গোছল ওয়াজিব হয়। সারকথা এই যে, চারি কারণে গোছল ওয়াজিব হয়। (১) জোশের সঙ্গে মনী বহির হইলে। (২) স্বামীর বিশেষ স্থানের অগ্রভাগ ভিতরে ঢুকিলে। (৩) হায়েয এবং (৪) নেফাসের রক্ত বন্ধ হইলে।

৫। মাসআলা ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের সঙ্গে যদি ছোহ্বত করা হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর গোছল ফরয নহে বটে, কিন্তু অভ্যাস করানোর জন্য গোছল করান উচিত।

৬। মাসআলা ঃ স্বপ্নে দেখিল যে, স্বামীর সঙ্গে ছোহ্বত করিতেছে এবং মযাও পাইয়াছে, কিন্তু সজাগ হইয়া দেখে যে মনী বাহির হয় নাই, তবে গোছল ওয়াজিব হইবে না; কিন্তু যদি মনী বাহির হইয়া থাকে, তবে অবশ্য গোছল ওয়াজিব হইবে। আর যদি কাপড় বা শরীর কিছু ভিজা ভিজা বোধ হয়, কিন্তু মনে হয় যে, ইহা মযী-মনী নহে; তবুও গোছল ওয়াজিব হইবে।

৭। মাসআলাঃ সামান্য কিছু মনী বাহির হইয়াছে, আর গোছল করিয়া ফেলিয়াছে, গোছল করার পর আবার মনী বাহির হইয়াছে, তবে আবার গোছল করিতে হইবে। কিন্তু যদি গোছল করার পর স্বামীর যে মনী রেহেমের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল সেই মনী বাহির হয়, (আর সঠিক চিনিতে পারে যে, তাহার স্বামীর মনী) তবে আবার গোসল ওয়াজিব হইবে না, পূর্বের গোছল দুরুস্ত হইয়াছে।

৮। মাসআলাঃ কোন কারণে হয়ত মনী বাহির হয়, কিন্তু জোশ এবং খাহেশ মাত্রও থাকে না, তবে গোছল ওয়াজিব হইবে না; কিন্তু ওযূ টুটিয়া যাইবে।

৯। মাসআলাঃ স্বামী-স্ত্রী একত্রে শুইয়াছিল, সজাগ হইয়া কাপড়ে মনী দেখিতে পাইল; অথচ কাহারও মনে নাই যে, স্বপ্নে কিছু দেখিয়াছে কি না, তবে উভয়ের গোছল করিতে হইবে। কেননা, তাহাদের জানা নাই যে, ইহা কাহার মনী।

১০। মাসআলাঃ বিধর্মী মুসলমান হইলে তাহার গোছল করা মোস্তাহাব।

১১। মাসআলাঃ মোর্দাকে গোছল করাইয়া গোছল করা মোস্তাহাব।

১২। মাসআলাঃ গোছলের হাজত হওয়ার পর গোছলের পূর্বেই যদি কিছু খাইতে চায়, তবে হাত মুখ ধুইয়া এবং কুল্লি করিয়া পরে খাইবে। আর যদি কেহ এ রকম না করিয়াও খায়, তবে গোনাহ্গার হইবে না।

১৩। মাসআলাঃ যাহার গোছলের হাজত হইয়াছে তাহার জন্য কোরআন শরীফ ছোঁয়া বা পড়া এবং মসজিদে ঢোকা নিষিদ্ধ; কিন্তু আল্লাহ্র নাম লওয়া, কলেমা পড়া, দুরূদ শরীফ পড়া জায়েয।

১৪। মাসআলাঃ বে-ওযূ এবং বে-গোছলে কোরআনের তফ্সীর ছোঁয়া মক্রূহ; আর তর্জমাওয়ালা কোরআন শরীফ ছোঁয়া বিলকুল হারাম।

১৫। মাসআলাঃ বে-ওযূ অবস্থাকে "হদছে আছগার" অর্থাৎ ছোট নাপাকী বলে এবং গোছল ফরয হওয়ার অবস্থাকে "হদছে আকবর" অর্থাৎ বড় নাপাকী বলে।

১৬। মাসআলাঃ হদছে আছগার দূর করিবার জন্য ওযূ করিতে হয় এবং হদছে আকবর দূর করিবার জন্য গোছল করিতে হয়।

চারি কারণে গোছল ফরয হয়ঃ

প্রথম কারণঃ মনী অর্থাৎ, বীর্য শরীর হইতে উত্তেজনার সহিত বাহির হইলে গোছল ফরয হয়—মনী স্বাভাবিক উপায়ে বাহির হউক বা অস্বাভাবিক উপায়ে বাহির হউক জাগ্রত অবস্থায় বাহির হউক বা নিদ্রিত অবস্থায়, স্বপ্নদোষ হইয়া বাহির হউক বা স্ত্রী সহবাসে, হালালভাবে বাহির হউক অথবা অন্য কোন হারাম ও নাজায়েয ও অসদুপায়ে বা কুকল্পনা, কুকর্ম, কিম্বা হস্তমৈথুন ইত্যাদি দ্বারা বাহির হউক। ফলকথা, মনী মানুষের শরীরের রাজা, এই রাজাই মানুষ জন্মাইবার বীজ, এই বীজের যদি সদ্ব্যবহার করিয়া স্ত্রী-গর্ভে বপন করে তবুও গোছল ফরয হইবে, আর যদি কেহ মহাপাপী হইয়া স্বীয় স্বাস্থ্য, শরীর এবং ঈমান নষ্ট করিয়া হস্তমৈথুন, কুকল্পনা, পুংমৈথুন, গুহ্যদ্বারে প্রবেশ, ব্যভিচার ইত্যাদি দ্বারা এই বীজের অপব্যবহার করে, তবুও গোছল ফরয হইবে। যদি স্বপ্নেও এই বীজ নষ্ট হয়, তবুও গোছল ফরয হইবে।

দ্বিতীয় কারণঃ স্ত্রী-সহবাস করিলে তো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর গোছল ফরয হয়ই, এমন কি, যদি কেহ স্ত্রী-সহবাস করিতে উদ্যত হয় এবং পূর্ণ সহবাস না-ও করে, কিন্তু উভয়ের

লিঙ্গদ্বয়ের খতনার স্থান মিলিত হয়, তখন মনী বাহির না হওয়া সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর গোছল ফরয হইবে।

তৃতীয় কারণঃ স্ত্রীলোকের হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব) হইলে যখন রক্ত বন্ধ হইবে, তখন পাক হওয়ার জন্য এবং নামায পড়ার জন্য গোছল ফরয হইবে। ইহার বিস্তৃত মাসায়েল হায়েযের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে, তথায় দেখিয়া লইবেন।

চতুর্থ কারণঃ স্ত্রীলোকের নেফাছ হইলে অর্থাৎ, সন্তান হওয়ার পর যে রক্তস্রাব হয় সেই রক্তস্রাব বন্ধ হইলে পাক হওয়ার জন্য এবং নামায পড়ার জন্য গোছল ফরয হইবে। ইহারও বিস্তারিত মাসায়েল নেফাছের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে, তথায় দেখিয়া লইবেন।

১৭। মাসআলাঃ শরীরে উত্তেজনা আসিয়া মনী বাহির হইতে থাকিলে যদি চাপিয়া রাখে এবং পরে উত্তেজনা চলিয়া গেলে মনী বাহির হয়, তবুও যখন মনী বাহির হইবে, তখন গোছল ফরয হইবে।

১৮। মাসআলাঃ ঘুম হইতে উঠিয়া কেহ কাপড়ে ভিজা বা শুক্‌না দাগ দেখিলে স্বপ্ন দেখা স্মরণ থাকুক বা না থাকুক, তাহার উপর গোছল ফরয হইবে। এমন কি ঐ দাগ বা ভিজা, মনী কি মযী, এ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তবুও গোছল করিতে হইবে।

১৯। মাসআলাঃ যদি কাহারও খতনার সুন্নত আদায় না হইয়া থাকে এবং মনী বাহির হইয়া ঐ চামড়ার মধ্যে আটকিয়া থাকে, তবুও গোছল ফরয হইবে।

২০। মাসআলাঃ পাপিষ্ঠ পুরুষ যেমন অসদুপায়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া শরীরের রাজা নষ্ট করিলে পাপীও হইবে গোছলও ফরয হইবে, তদ্রূপ কোন পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকও যদি অসদুপায়ে অঙ্গুলি ইত্যাদি শরমগাহের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া কৃত্রিম উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তবে মনী বাহির হউক বা না হউক সেও পাপিষ্ঠা হইবে এবং তাহার উপর গোছল ফরয হইবে।

গোছল ফরয হয় নাঃ

১। মাসআলাঃ যদি কোন রোগের কারণে ধাতু পাতলা হইয়া বা কোন আঘাত লাগিয়া বিনা উত্তেজনায় ধাতু নির্গত হয়, তবে তাহাতে গোছল ফরয হয় না।

২। মাসআলাঃ স্বামী-স্ত্রী শুধু লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া যদি ছাড়িয়া দেয়, কিছুমাত্র ভিতরে প্রবেশ না করায় এবং মনীও বাহির না হয়, তবে তাহাতে গোছল ফরয হয় না।

৩। মাসআলাঃ শুধু মযী বাহির হইলে তাহাতে কেবল ওযূ টুটিবে, গোছল ফরয হয় না।

৪। মাসআলাঃ ঘুম হইতে উঠার পর যদি স্বপ্ন ইয়াদ থাকে, কাপড়ে কোনকিছু না দেখা যায়, তবে তাহাতে গোছল ফরয হয় না।

৫। মাসআলাঃ পায়খানার রাস্তায় ঢুস-যন্ত্র লাগাইয়া যে পায়খানা করান হয়, তাহাতে গোছল ফরয হয় না।

৬। মাসআলাঃ মেয়েলোকের যে খুন জারী হয়, তাহা তিন প্রকারঃ হায়েয, নেফাস এবং এস্তেহাযা। হায়েয ও নেফাসের খুন রেহেম অর্থাৎ জরায়ু হইতে আসে, তাহাতে গোছল ফরয হয়; কিন্তু এস্তেহাযার খুন রেহেম হইতে আসে না, রোগ বশতঃ অন্য কোন রগ হইতে আসে, তাহাতে গোছল ফরয হয় না। এস্তেহাযার খুন চিনিবার উপায় এস্তেহাযার মাসায়েল দেখিয়া লইবেন।

ওয়াজিব গোছলঃ

১। মাসআলাঃ যদি কেহ নূতন মুসলমান হয় এবং কাফির হালাতে গোছল ফরয হইয়া থাকে, অথচ গোছল করে নাই, অথবা শরীঅত মত গোছল না করিয়া থাকে, তবে তাহার উপর গোছল ওয়াজিব হইবে।

২। মাসআলাঃ যদি কেহ পনর বৎসর বয়সের পূর্বে বালেগ হয় অর্থাৎ, এহ্‌তেলাম বা স্বপ্নদোষ হয়, তাহার প্রথম এহ্‌তেলামের জন্য গোছল করা ওয়াজিব; কিন্তু তাহার পরে যে এহ্‌তেলাম হয় তাহাতে গোছল ফরয হইবে।

৩। মাসআলাঃ মৃত মুসলমানকে গোছল দেওয়া জীবিত মুসলমানদের উপর 'ফরযে কেফায়া'।

সুন্নত গোছলঃ

১। মাসআলাঃ (১) জুমু'আর নামাযের জন্য। (২) ঈদের নামাযের জন্য। (৩) হজ্জ অথবা ওমরার এহ্‌রাম বাঁধার জন্য (৪) আর্‌ফার ময়দানে হজ্জ করিবার জন্য গোছল করা সুন্নত।

মোস্তাহাব গোছলঃ

১। মাসআলাঃ ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য গোছল করা মোস্তাহাব (যদিও সম্পূর্ণ পাক অবস্থায় থাকে)।

২। মাসআলাঃ ছেলে বা মেয়ে যদি বালেগ হওয়ার কোন আলামত যাহের না হয়, অথচ পনর বৎসর পূর্ণ হইয়া যায়, তবে পনর বৎসর পূর্ণ হওয়া মাত্রই বালেগ ধরা হইবে; তখন তাহার গোছল করা মোস্তাহাব হইবে।[১]

৩। মাসআলাঃ মোর্‌দাকে যাহারা গোছল দেওয়াইবে, গোছল দেওয়াইয়া পরে নিজেদের গোছল করা মোস্তাহাব।

৪। মাসআলাঃ শবে বরাতে এবং ৫। শবে ক্বদরের (রাত্রে) গোছল করা।

৬-৭। মাসআলাঃ মদীনা শরীফ এবং মক্কা শরীফের শহরে প্রবেশ করিবার সময় গোছল করা মোস্তাহাব।

৮। মাসআলাঃ মোয্‌দালিফাতে ওকূফ করিবার সময় ১০ই যিল্‌-হজ্জ ছোব্‌হে ছাদেকের পর গোছল করা। ৯। হজ্জের তওয়াফের জন্য এবং ১০। হজ্জের সময় মিনায় রমী করিবার জন্য, ১১। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ এবং বৃষ্টির নামায পড়িবার জন্য গোছল করা মোস্তাহাব।

১২। মাসআলাঃ বিপদকালে নামায পড়িবার জন্য, ১৩। তওবার নামায পড়িবার জন্য এবং ১৪। সফর হইতে বাড়ী আসিয়া গোছল করা মোস্তাহাব।

১৫। মাসআলাঃ কোন ভাল মাহ্‌ফিলে যাইবার সময় এবং নূতন কাপড় পরিবার সময় গোছল করা মোস্তাহাব।

১৬। মাসআলাঃ যদি কাহারও প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়, তবে তাহার পক্ষে গোছল করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়া মোস্তাহাব।

টিকা

১ ছেলে বালেগ হওয়ার আলামত এহ্‌তেলাম এবং মেয়ে বালেগ হওয়ার আলামত হায়েয। বালেগ হওয়ার পরই শরীঅতের সমস্ত হুকুম বর্তিবে। আর যেখানে এই আলামত না পাওয়া যাইবে সেখানে পনর বৎসর পূর্ণ হইলে আর অলামতের অপেক্ষা করা যাইবে না। পনর বৎসর পূর্ণ হওয়া মাত্রই বালেগ ধরা হইবে। কিন্তু পনর বৎসর সৌর মাস হিসাবে ৩৬৫ দিনের বৎসর নয়, চন্দ্র মাস হিসাবে ৩৫৫ দিনের বৎসর হিসাব করিবে। —অনুবাদক

বে-গোছল অবস্থার হুকুম

১। **মাসআলা ঃ** যাহার উপর গোছল ফরয হইয়াছে, বে-গোছল অবস্থায় তাহার কোরআন শরীফ স্পর্শ করা, কোরআন শরীফ পাঠ করা, মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। অর্থাৎ, জানাবাতের অবস্থায় এবং হায়েয-নেফাসের অবস্থায় কোরআন শরীফ পাঠ করা, স্পর্শ করা, মসজিদে প্রবেশ করা হারাম; অবশ্য যদি কাহারও মসজিদে পা রাখিবার একান্ত প্রয়োজন হয়, যেমন হয়ত মসজিদের হুজরা হইতে বাহির হইবার পথই মসজিদের ভিতর দিয়া, তাছাড়া অন্য কোন পথ নাই, অথবা কেহ হয়ত অন্য কোথাও জায়গা না পাইয়া ঠেকাবশতঃ মসজিদে নিজের বিছানায় শুইয়াছিল, রাত্রে এহ্তেলাম হইয়া গিয়াছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তায়াম্মুম করিয়া বাহিরে গিয়া গোছল করিবে।

২। **মাসআলা ঃ** ঈদ্গাহ, খান্কাহ্, মাদ্রাসাহ্, কবরস্তান ইত্যাদিতে বিনা গোছলে প্রবেশ করা অথবা কোন মুসলমানের সহিত মোলাকাত বা মোছাফাহা করা হারাম নহে।

৩। **মাসআলা ঃ** হায়েয এবং নেফাছ অবস্থায় সহবাস করা হারাম এবং স্বামীর জন্যও নিজ স্ত্রীর নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত দেখা বা স্পর্শ করা হারাম।

৪। **মাসআলা ঃ** হায়েয-নেফাছের অবস্থায় স্ত্রীর হাতের পানি পাক; একত্রে খাওয়া বা এক গ্লাসের পানি পান করা বা এক সঙ্গে ভাত খাওয়া বা চুম্বন করা বা কাপড়ের উপর দিয়া আলিঙ্গন করা বা নাভীর উপরের শরীর বা হাঁটুর নীচের শরীর স্পর্শ করা বা কাপড় আঁটিয়া পরিয়া এক বিছানায় শয়ন করা নাজায়েয নহে; বরং নাজায়েয মনে করা গুনাহ্। এই অবস্থায় আল্লাহ্র কালাম পড়া নাজায়েয; কিন্তু কলেমা শরীফ বা দুরূদ শরীফ পড়া, আল্লাহ্র যিকির করা নাজায়েয নহে।

৫। **মাসআলা ঃ** ঘুম হইতে উঠিয়া যদি পুরুষাঙ্গকে উত্তেজিত অবস্থায় পায় এবং স্বপ্নদোষ না হইয়া থাকে শুধু পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে কিছু মযী পাওয়া যায়, কাপড়ে বা শরীরে কোন দাগ বা ভিজা না পাওয়া যায়, তবে গোছল ফরয হইবে না। আর যদি কাপড়ে বা শরীরে দাগ বা ভিজা পায় তবে গোছল ফরয হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক পরিষ্কার বিছানায় শুইয়াছিল। ঘুম হইতে উঠিয়া বিছানায় দাগ দেখিতে পাইল, কিন্তু কাহারও স্বপ্নদোষের কথা মনে নাই বা কাহার মনী তাহাও ঠিক করিতে পারে না, এমতাবস্থায় উভয়ের গোছল করিতে হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** ফরয গোছল আদায়কালে যদি বেপর্দা না হইয়া কোন উপায় না থাকে তবে পুরুষ সমাজে পুরুষ এবং স্ত্রী সমাজে স্ত্রী বেপর্দা হইয়া গোছল করিবে। কিন্তু পুরুষ সমাজে স্ত্রী বা স্ত্রী সমাজে পুরুষ উলঙ্গ হইবে না, তখন তায়াম্মুম করিবে।

বে-ওযূ অবস্থার মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** বিনা ওযূতে কোরআন শরীফ অথবা ছিপারা স্পর্শ করা মক্রূহ তাহ্রীমী। এরূপে কোরআন অথবা ছিপারার কোন পাতা এবং জিল্দ স্পর্শ করাও মক্রূহ তাহ্রীমী। পাতার যে যে স্থানে লেখা না থাকে সে সে স্থানে স্পর্শ করাও মাকরূহ তাহ্রীমী। কিন্তু অন্য কোন

কিতাবের কোন পাতায় যদি কোরআনের কোন আয়াত অথবা আয়াতের অংশ লেখা থাকে, তবে কোরআনের আয়াতটুকু স্পর্শ করা জায়েয নহে; সেইটুকু বাদ দিয়া অন্য জায়গা স্পর্শ করা জায়েয আছে।

২। **মাসআলা ঃ** বিনা ওযূতে কোরআনের আয়াত স্পর্শ করা যেমন মাক্রূহ্ তদ্রূপ হাতের দ্বারা লেখাও মাকরূহ্।

৩। **মাসআলা ঃ** না-বালেগ ছেলে-মেয়েরা যদিও মোকাল্লাফ নহে, কিন্তু তাহাদিগকেও ওযূ করিয়া ছিপারা কোরআন শরীফ ধরিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং ওযূ টুটিয়া গেলে পুনরায় ওযূ করার তালীম দেওয়া উচিত।

৪। **মাসআলা ঃ** হাদীস, তফসীর, ফেকাহ্ ও তাসাওওফের কিতাব ওযূ করিয়া ধরাই উত্তম। কিন্তু এই সব কিতাবে কোরআনের আয়াত লেখা থাকিলে তাহাও বিনা ওযূতে স্পর্শ করিলে গোনাহ্ হইবে, তাছাড়া অন্য জায়গা স্পর্শ করিলে গোনাহ্ হইবে না, আদবের খেলাফ হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** ইঞ্জীল, তৌরাত ইত্যাদি মনছূখ আসমানী কিতাবগুলিও বিনা ওযূতে স্পর্শ করা দুরুস্ত নহে।

৬। **মাসআলা ঃ** ওযূ করার পর যদি সন্দেহ হয় যে, কোন একটি অঙ্গ যেন ধোয়া হয় নাই, তবে সন্দেহ দূর করিবার জন্য সেই অঙ্গটি ধুইয়া লইলেই চলিবে। কিন্তু যদি কাহারও প্রায়ই অনর্থক এইরূপ অছঅছা হয়, তবে সে অছঅছার কোন এ'তেবার করা উচিত নহে। ওযূ ঠিক হইয়াছে মনে করা উচিত।

৭। **মাসআলা ঃ** মসজিদের ভিতর ওযূ-গোছলের পানি অথবা কুল্লির পানি ফেলা দুরুস্ত নহে।

৮। **মাসআলা ঃ** পেশাব-পায়খানার পর অথবা বায়ু নির্গত হইলে অথবা ঘুম হইতে উঠিয়া তৎক্ষণাৎ ওযূ করিয়া লওয়া ভাল; কিন্তু না করিলে গোনাহ্গার হইবে না।

আহকামে শরা'র শ্রেণীবিভাগ

শরীঅতে যতগুলি হুকুম আছে, তাহা মোট ৮ ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ—১। ফরয, ২। ওয়াজিব, ৩। সুন্নত, ৪। মোস্তাহাব, ৫। হারাম, ৬। মাক্রূহ্ তাহ্রীমী, ৭। মাকরূহ্ তান্যিহী, ৮। মোবাহ বা জায়েয।

১। যে কাজে খোদার তরফ হইতে সুনিশ্চিতরূপে করিবার আদেশ করা হইয়াছে তাহাকে 'ফরয' বলে। ফরয কাজ যে না করিবে দুন্ইয়াতে তাহাকে ফাছেক বলা হইবে এবং আখেরাতে সে শাস্তির উপযুক্ত হইবে। ফরয অস্বীকারকারী কাফের।

ফরয কাজ যথা ঃ কলেমা, নামায, রোযা, যাকাৎ, হজ্জ, অঙ্গীকার (ওয়াদা) পালন করা, আমানতের হেফাযত করা, সত্য কথা বলা, রুযী হালাল খাওয়া, এল্মে-দ্বীন শিক্ষা করা, তবলীগ করা, জেহাদ করা ইত্যাদি।

ফরয দুই প্রকার, যথা ঃ—ফরযে-আয়েন ও ফরযে-কেফায়া।

ফরযে-আয়েন উহাকে বলে—যে কাজ প্রত্যেক বালেগ বুদ্ধিমান নর-নারীর উপর সমভাবে ফরয। যেমন, পাঞ্জেগানা নামায পড়া, আবশ্যক পরিমাণ এল্মে-দ্বীন শিক্ষা করা, জুমু'আর নামায পড়া ইত্যাদি।

ফরযে কেফায়া উহাকে বলে, যাহা কতক লোক পালন করিলে সকলেই গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবে; কিন্তু যদি কেহই পালন না করে, তবে সকলেই ফরয তরকের জন্য গোনাহ্‌গার হইবে, আর যাহারা পালন করিবে তাহারা ফরযেরই ছওয়াব পাইবে যেমন, জানাযার নামায পড়া, মৃত ব্যক্তিকে কাফন-দাফন করা, আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা করা, ইসলাম প্রচার করা, ইস্‌লামী খেলাফত স্থাপন করা, ইস্‌লামী নেযাম রক্ষার্থে ইমাম বা আমীরুল মু'মিনীন নিযুক্ত করা ইত্যাদি।

২। ওয়াজিব কাজ ফরযের মত অবশ্য কর্তব্য। ফরয তরক করিলে যেমন ফাছেক ও গোনাহ্‌গার হইতে হইবে এবং শাস্তির উপযুক্ত হইবে, ওয়াজিব তরক করিলেও তদ্রূপ ফাছেক ও গোনাহ্‌গার হইতে হইবে এবং শাস্তির উপযুক্ত হইবে। শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, ফরয অস্বীকার করিলে কাফের হইবে, কিন্তু ওয়াজিব অস্বীকার করিলে কাফের হইবে না, ফাছেক হইবে। যেমন, বেতরের নামায পড়া,' কোরবানী করা, ফেৎরা দেওয়া ইত্যাদি।

৩। যে কাজ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁহার আছহাবগণ করিয়াছেন, তাহাকে "সুন্নত" বলে। সুন্নত দুই প্রকারঃ সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা। যে কাজ রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁহার আছহাবগণ সব সময় করিয়াছেন, বিনা ওযরে কোন সময় ছাড়েন নাই, উহাকে সুন্নতে মোয়াক্কাদা বলে; যেমন আযান, একামত, খতনা, নেকাহ ইত্যাদি। সুন্নতে মোয়াক্কাদা আমলের দিক দিয়া ওয়াজিবেরই মত; অর্থাৎ, যদি কেহ বিনা ওযরে সুন্নতে মোয়াক্কাদা ত্যাগ করে অথবা তরক করার অভ্যাস করে, তবে সে ফাসেক ও গোনাহ্‌গার হইবে এবং হযরতের খাছ শাফাআত হইতে বঞ্চিত থাকিবে; কিন্তু ওয়াজিব তরকের গোনাহ্ অপেক্ষা কম গোনাহ্ হইবে এবং কখনও ওযরবশতঃ ছুটিয়া গেলে তাহা ক্বাযা করিতে হইবে না। ওয়াজিব ওযরবশতঃ ছুটিলে ক্বাযা করিতে হইবে। যে কাজ হযরত রসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁহার আছহাবগণ করিয়াছেন, কিন্তু ওযর ছাড়াও কোন কোন সময় তরক করিয়াছেন, তাহাকে সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা বলে। (সুন্নতে যায়েদা, সুন্নতে আদীয়াও বলে) ইহা করিলে ছওয়াব আছে, কিন্তু না করিলে আযাব নাই।

৪। যে কাজ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁহার আছহাবগণ করিয়াছেন, কিন্তু হামেশা বা অধিকাংশ সময় করেন নাই কোন কোন সময় করিয়াছেন তাহাকে 'মোস্তাহাব, বলে। ইহা করিলে ছওয়াব আছে না করিলে গোনাহ্ বা আযাব নাই। মোস্তাহাবকে নফল বা মন্দুবও বলা হয়।

৫। হারাম ফরযের বিপরীত। যদি কেহ হারাম কাজ অস্বীকার করে অর্থাৎ যদি কেহ হারাম কাজকে হালাল এবং জায়েয মনে করে, তবে সে কাফের হইবে। আর যদি বিনা ওযরে হারাম কাজ করে কিন্তু অস্বীকার না করে অর্থাৎ হারামকে হালাল মনে না করে, তবে সে কাফের হইবে না, ফাসেক হইবে, শাস্তির উপযুক্ত হইবে। হারাম কাজ; যথাঃ শূকর, শরাব, ঘুষ, যিনা, চুরি, ডাকাতি, আমানতে খেয়ানত, মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অন্যায় অত্যাচার করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, স্বামীর অবাধ্য হওয়া, স্ত্রী-পুত্রের বা মা-বাপের, ভাই-বোনের হক্ আদায় না করা, এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা না করা, নামায না পড়া, যাকাত না দেওয়া, হজ্জ না করা ইতাদি।

৬। মাকরূহ্ তাহ্রীমী ওয়াজিবের বিপরীত। মাকরূহ্ তাহ্রীমী অস্বীকার করিলে কাফের হইবে না, ফাসেক হইবে। যদি কেহ বিনা ওযরে মাকরূহ্ তাহ্রীমী কাজ করে, তবে সে ফাসেক হইবে এবং আযাবের উপযুক্ত হইবে।

৭। মাক্রূহ্ তান্যিহী না করিলে ছওয়াব আছে করিলে আযাব নাই।

৮। মোবাহ্ কাজে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে স্বাধীনতা এবং এখতিয়ার দান করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহা ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে করিতে পারে, ইচ্ছা না করিলে না করিতে পারে, করিলেও ছওয়াব নাই, না করিলেও আযাব নাই। মোবাহ কাজ যথাঃ মাছ মাংস খাওয়া, পানাহার করা, শাদী বিবাহ করা, কৃষি কর্ম করা, ব্যবসায় বাণিজ্য করা, দেশ ভ্রমণ করা, আল্লাহ্র সৃষ্টি দর্শন করা ইত্যাদি। মোবাহ্ কাজের সঙ্গে যদি ভাল নিয়ত ও ভাল ফল সংযুক্ত হয়, তবে তাহা ছওয়াবের কাজ হইয়া যায় আর যদি মন্দ ফল সংযুক্ত হয়, তবে তাহা গোনাহ্র কাজ হইয়া যায়। যথা—যদি কেহ এল্ম হাছেল করিবার জন্য, ইসলামের খেদমত করিবার জন্য, জেহাদ ও তব্লীগ করিবার জন্য, পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া ব্যায়াম করিয়া শরীর মোটাতাজা ও স্বাস্থ্য ভাল করে, তবে সে ছওয়াব পাইবে। আর যদি কেহ পরস্ত্রী দর্শন করিবার জন্য ভ্রমণ করে বা নাজায়েয খেলায় যোগদান করে, তবে তাহাতে গোনাহ্ হইবে।

শরীঅত ও তরীকতের যত হুকুম আহ্কাম আছে, সব চারিটি দলীলের দ্বারা প্রাণিত হইয়াছে; যথাঃ—কোরআন, হাদীস, এজমা, ক্বিয়াস। এই চারিটি দলীলের বাহিরে কোন দলীল নাই। সুন্নতের দুই অর্থ। এক অর্থ উপরে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ হযরতের যে কোন তরীক্বা (নীতি) তাহা ফরয হউক বা ওয়াজিব বা সুন্নত হউক। এই অর্থেই বলা হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ শাদী-বিবাহ (দ্বারা সংসারের যাবতীয় বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া ধর্ম-জীবন যাপন) করা আমার একটি সুন্নত। এই সুন্নত যে অমান্য করিবে সে আমার উম্মতভুক্ত নহে।

পানি ব্যবহারের হুকুম

১। মাসআলাঃ পানির সঙ্গে কোন নাপাক জিনিস মিশ্রিত হইয়া যদি পানির রং গন্ধ, স্বাদ এই তিনিটি গুণই (ছিফাতই) বদলাইয়া ফেলে, তবে সেই পানি কোনরূপেই ব্যবহার করা দুরুস্ত নহে। গরু,গাধাকে পান করানও দুরুস্ত নহে, এবং মাটিতে বা চুন-সুরকিতে মিশাইয়া কাজ করাও দুরুস্ত নহে। আর যদি তিনটি গুণ না বদলাইয়া থাকে, দুইটি বা একটি বদলিয়া থাকে, তবে সেই পানি গরু ঘোড়াকে পান করান বা মাটিতে মিশাইয়া কাজ করা জায়েয আছে, কিন্তু এইরূপ পানি মিশ্রিত মাটি বা কাদার দ্বারা মসজিদ লেপা দুরুস্ত নহে।

২। মাসআলাঃ নদী, খাল, বিল, হ্রদ, সমুদ্র এবং যে ঝর্ণা বা পুষ্করিণীর কোন মালিক নাই, অথবা কেহ পুষ্করিণী বা কূপ খনন করিয়া আল্লাহ্র ওয়াস্তে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ওয়াক্ফ্ করিয়া দিয়াছে, এই সমস্ত পানিই জাতি ধর্ম, দেশ-কাল নির্বিশেষে সর্বসাধারণ ব্যবহার করিতে পারিবে। কাহারও নিষেধ করিবার কোনই অধিকার নাই। অবশ্য যদি কেহ এমনভাবে পানি ব্যবহার করিতে চায়, যাহাতে সর্বসাধারণের ক্ষতির আশঙ্কা আছে; যেমন, যদি কেহ পুষ্করিণী হইতে খাল কাটিয়া গ্রাম ডুবাইয়া ফেলিতে চাহে, তবে তাহার জন্য জায়েয হইবে না। এইরূপ নাজায়েয কাজে তাহাকে বাধা প্রদান করিতে হইবে এবং বাধা প্রদান করিবার অধিকার সর্বসাধারণের আছে। —শামী

৩। **মাসআলা ঃ** কাহারও নিজস্ব জমিতে যদি ঝর্ণা, পুষ্করিণী, কূপ, হাউয বা কাটা খাল থাকে তবে সেই পানি হইতে পান করিবার, কাপড় ধুইবার, ওযূ-গোছল করিবার, থালা বাসন ধুইবার, পাক করিবার, গরু বাছুরকে খাওয়াইবার বা কলস ভরিয়া নিয়া বাড়ীর গাছের গোড়ায় ঢালিবার পানি নিতে কাহাকেও বাধা দিতে পারিবে না। কেননা, পানির মধ্যে সকলেরই হক আছে। অবশ্য যদি গরু মহিষ এত অধিক পরিমাণে কেহ আনে যে, তাহাতে পানি ফুড়াইয়া যাইবার বা পুষ্করিণী বা কূপের ক্ষতি হইবার আশংকা হয়, তবে বাধা দিতে পারিবে আর যদি সে পানি নিতে বাধা দেয় না বটে, কিন্তু সে তাহার জমিতে আসিতে বাধা দেয়, তবে দেখিতে হইবে যে, নিকটবর্তী কোথাও পানি পাওয়া যায় কিনা, এবং তদ্দ্বারা সহজে লোকের প্রয়োজন মিটিতে পারে কি না। যদি অন্যত্র লোকের প্রয়োজন মিটিবার বন্দোবস্ত সহজে হয়, তবে ত ভালই, নতুবা এই পানিওয়ালাকে বলা হইবে যে, হয় তোমার কোন ক্ষতি কেহ করিবে না এই শর্তে লোকদের পানি নিয়া তাহাদের যরূরত পুরা করিতে দাও, নতুবা তাহাদের যরূরত মোয়াফেক পানি তুমি নিজে বাহির করিয়া লোকদিগকে পৌঁছাইয়া দাও। অবশ্য এই শ্রেণীর পানি মালিকের বিনা অনুমতিতে কেহ বাগিচা বা ক্ষেতে দিতে পারি না। এরূপ করিলে মালিক তাহাতে বাধা দিতে পারিবে; পানির যে হুকুম, যে সব ঘাস আপনা হইতে উৎপন্ন হয়, (চাষ বা বীজ বপন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় না) তাহারও সেই হুকুম। কিন্তু যে সব গাছপালা কাহারও জমিতে তাহার রোপণ ছাড়াই জন্মিবে তাহার মালিক জমিনওয়ালা হইবে। আর যে সব ঘাস সে চাষ, বপন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, তাহার মালিকও জমিনওয়ালাই হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** কাহারও কূপের পানির দ্বারা কেহ তাহার ক্ষেতে বা বাগিচায় পানি দিতে চাহিলে সেই পানির মূল্য লওয়া কূয়াওয়ালার জন্য জায়েয কিনা সে সম্বন্ধে ইমামগণের মতভেদ আছে। বলখ দেশের ইমামগণ জায়েযেরই ফৎওয়া দিয়াছেন।

৫। **মাসআলা ঃ** নদী হইতে বা কূপ হইতে পানি তুলিয়া কেহ তাহার বাল্‌তি, মোশক লোটা বা কলসে রাখিল, তখন সেই তাহার মালিক হইয়া গেল। তাহার বিনা অনুমতিতে সে পানি খরচ করা অন্য কাহারও জন্য জায়েয হইবে না। অবশ্য যদি কাহারও পানির পিপাসায় প্রাণনাশের উপক্রম হয় এবং পানিওয়ালা তার প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী পানি থাকা সত্ত্বেও পানি না দেয়, তবে বল পূর্বক হইলেও তাহার নিকট হইতে পানি ছিনাইয়া লইয়া যান বাঁচাইতেই হইবে। কিন্তু পরে এই পানির পরিবর্তে পানি অথবা তাহার মূল্য তাহাকে দিয়া দিতে হইবে। (খাবারও এই হুকুম, কাহারও খানা তাহার বিনা অনুমতিতে দেওয়া ত জায়েয নাই, কিন্তু যদি তাহার নিকট তাহার প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী থাকে অথচ আপন একজন লোক ক্ষুধায় মরিতেছে তাহা সত্ত্বেও সে খুশীতে দেয় না, তখন বলপূর্বক তাহার নিকট হইতে খানা ছিনাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইবে; অবশ্য পরে মূল্য দিয়া দিতে হইবে।)

৬। **মাসআলা ঃ** যে পানি পিপাসা নিবারণের জন্য খাছ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা দ্বারা ওযূ বা গোছল করা জায়েয নহে। (অবশ্য যদি বেশী পানি থাকে, তবে জায়েয হইতে পারে। কিন্তু যে পানি ওযূ বা গোছলের জন্য রাখা হয়, তাহা দ্বারা পিপাসা নিবারণ করা জায়েয আছে।)

৭। **মাসআলা ঃ** কূপে যদি দুই একটি ছাগলের লেদী পড়িয়া যায় এবং তাহা আলাদাই বাহির করিয়া ফেলা হয়, তবে তাহাতে কূপ নাপাক হইবে না। (এই হুকুম শুধু ছাগলের লেদীর জন্য, গরুর গোবরের জন্য নহে।)

পাক-নাপাকের আরও কতিপয় মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** ধান মাড়াইবার সময় গরু চনাইলে বা লেদাইলে তাহাতে ধান নাপাক হইবে না। যরূরতের কারণে শরীঅতে মা'ফ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অন্য কোন সময় ধানের মধ্যে গরুর চনা বা লেদা মিশিলে ধান নিশ্চয়ই নাপাক হইয়া যাইবে। —শরহে তন্‌বীর

২। **মাসআলা ঃ** না ধুইয়া কাফিরদের (হিন্দু বা ইংরেজের) কাপড়ে বা বিছানায় নামায পড়া মাকরূহ্, তাহাদের হাঁড়ি পাতিলে পাক করিয়া খাওয়া বা তাহাদের পাত্রে পানাহার করা বা তাহাদের হাতের তৈয়ারী জিনিস খাওয়া মাকরূহ্ কিন্তু যে পর্যন্ত বিশেষ কোন প্রমাণ বা নিদর্শন না পাওয়া যাইবে, সে পর্যন্ত শুধু সন্দেহের বশীভূত হইয়া হারাম বা নাপাক বলা যাইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** কেহ কেহ বাঘের চর্বি ব্যবহার করে এবং উহাকে পাক মনে করে, উহা দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি কোন দ্বীনদার পারদর্শী চিকিৎসক বলেন যে, এই চর্বি ছাড়া অমুক রোগের অন্য কোন ঔষধ নাই, তবে, চর্বি ব্যবহার করিতে পারিবে বটে, কিন্তু নামাযের সময় ধুইয়া ফেলিবে। কোন হারাম জিনিসের দ্বারা ঔষধ করা জায়েয নহে। কিন্তু যদি কোন অভিজ্ঞ ঈমানদার চিকিৎসক বলেন যে, অমুক হারাম জিনিস ব্যতীত এই রোগের অন্য কোন ঔষধ নাই, তবে তাহার জন্য রোখ্‌ছত (মা'ফ) শরীঅতের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে। যেমন, পিপাসায় জীবন যায় এমন ব্যক্তির জন্য অন্য কোন বস্তু না পাইলে শরাবের দ্বারা পিপাসা নিবারণ করিয়া জীবন বাঁচাইবার এজাযত দেওয়া হইয়াছে।)

৪। **মাসআলা ঃ** রাস্তা ঘাটে বা বাজারে চলিবার সময় যে পানি বা কাদার ছিটা কাপড়ে বা শরীরে লাগে তাহাকে নাপাক বলা যাইবে না, (যরূরতের কারণে শরীঅতের পক্ষ হইতে মা'ফ।) অবশ্য যদি ঐ কাদার মধ্যে নাপাক কোন জিনিস দেখা যায়, তবে তাহা নাপাক বটে, ফৎওয়া ত ইহাই। কিন্তু মোত্তাকী লোকদের জন্য যাহাদের হাটে বাজারে যাওয়ার অভ্যাস কম যাঁহারা সাধারণতঃ খুব পাক ছাফ থাকেন, তাঁহাদের গায়ে বা কাপড়ে যদি এই কাদা বা পানির ছিটা লাগে, তবে তাহাতে নাপাক কোন জিনিস দেখা না গেলেও তাহা ধুইয়া লওয়াই উচিত। —দুঃ মুখতার

৫। **মাসআলা ঃ** নাপাক কোন জিনিস (যেমন গোবর ইত্যাদি) জ্বালাইলে উহার ধূঁয়া, বাষ্প, ছাই পাক। অতএব, ঐ ধূঁয়া এক জায়গায় জমাইয়া তাহা দ্বারা যদি কোন জিনিস তৈয়ার করা হয়, তাহাও পাক। যেমন, নওশাদর সম্পর্কে বলা হয় যে, নাপাক বস্তুর ধূঁয়া হইতে প্রস্তুত হয়। —শামী

৬। **মাসআলা ঃ** নাজাছাতের উপর পতিত ধুলা বালি পাক, যদি উহার আর্দ্রতায় উহা ভিজিয়া না যায়। —রদ্দুল মোহ্‌তার

মাসআলা ঃ সব নাপাকই হারাম, কিন্তু সব পাক হালাল নহে বা সব হারামও পাক নহে; যেমন বিছ্‌মিল্লাহ্ বলিয়া ঊদ যবাহ করিলে উহার চামড়া এবং গোশপত পাক বটে কিন্তু হালাল নহে। তদ্রূপ কবুতরের বিট নাপাক নহে, কিন্তু হালাল নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** নাজাছাত হইতে যে বাষ্প উঠে উহা পাক। —দুর্‌রে মুখতার; ফলের মধ্যে (আম, ইক্ষু ইত্যাদিতে) যে-সব পোকা জন্মে তাহা নাপাক নহে। কিন্তু ঐ সব পোকা খাওয়া জায়েয নহে। —রদ্দুল মোহ্‌তার

৮। মাসআলা ঃ খাওয়ার পাক জিনিস (যেমন পোলাও কোরমা ইত্যাদি) গান্দা হইয়া বদ্‌বুদার হইয়া গেলে তাহা নাপাক হয় না, কিন্তু স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশংকায় খাওয়া জায়েয নহে।

৯। মাসআলা ঃ ঘুমের সময় মানুষের মুখ দিয়া যে লালা বাহির হয় তাহা নাপাক নহে।

১০। মাসআলা ঃ মৃগনাভী (মেশ্‌ক্) নাপাক নহে, পাক।

১১। মাসআলা ঃ হালাল জীবের আণ্ডার ভিতরের ভাগ খারাব হইলেও আণ্ডা না ভাঙ্গা পর্যন্ত উহাকে নাপাক ধরা হইবে না। —হেদায়া

১২। মাসআলা ঃ সাপের খোলস পাক। —আলমগীরী

১৩। মাসআলা ঃ যে পানি দ্বারা কোন নাপাক জিনিস ধৌত করা হয়, সে পানি নাপাক হইয়া যায়, তাহা প্রথমবার ধৌত করা হউক, বা দ্বিতীয়বার ধৌত করা হউক বা তৃতীয়বার ধৌত করা হউক; কিন্তু পার্থক্য এতটুকু যে, যদি প্রথমবারের ধৌত করা পানি কোন কাপড়ে লাগে, তবে সেই কাপড় পাক করিতে তিনবার ধুইতে হইবে, আর যদি দ্বিতীয়বারের ধৌত করা পানি লাগিয়া থাকে, তবে দুইবার ধুইলে পাক হইবে এবং যদি তৃতীয়বারের ধৌত করা পানি লাগিয়া থাকে, তবে একবার ধুইলেই পাক হইয়া যাইবে।

১৪। মাসআলা ঃ মৃতকে যে পানির দ্বারা গোছল দেওয়া হইয়াছে তাহা নাপাক।

১৫। মাসআলা ঃ সর্পের দেহের সঙ্গে যুক্ত চামড়া নাপাক। —আলমগীরী

১৬। মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির মুখের লালা নাপাক। —আলমগীরী

১৭। মাসআলা ঃ এক পল্লা কাপড়ে যদি নাপাকী লাগে এবং তাহার দুই দিকে দেখা যায় এবং কোন দিকেরই পরিমাণ মা'ফের পরিমাণের চেয়ে বেশী না হয়, কিন্তু দুই দিকের দুইটি পরিমাণ যোগ করিলে মা'ফের পরিমাণের চেয়ে বেশী হইয়া যায়, তবে তাহা মা'ফই থাকিবে; দুই দিকের পরিমাণ যোগ করা হইবে না; কিন্তু যদি দোপল্লা কাপড় হয় বা একই কাপড়ের দুই জায়গায় নাপাকী লাগে এবং দুই দিকের নাপাকী যোগ করিলে মা'ফের পরিমাণের চেয়ে বেশী হইয়া যায়, তবে তাহা মা'ফ করা হইবে না। —শামী

১৮। মাসআলা ঃ বকরী দোহাইবার সময় যদি দুই একটি লেদী দুধের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং পড়া মাত্রই বাহির করিয়া ফেলা হয়, তবে তাহা মা'ফ। এরূপ গাভী দোহনের সময় যদি সামান্য কিছু শক্ত গোবর পড়িয়া যায় এবং পড়ামাত্র বাহির করিয়া ফেলা যায়, তবে তাহাও মা'ফ। কিন্তু যদি লেদী বা গোবর দুধের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়, তবে সম্পূর্ণ দুধ নাপাক হইয়া যাইবে, তাহা খাওয়া জায়েয হইবে না।

১৯। মাসআলা ঃ ৪/৫ বৎসরের বালক ওযূ সম্বন্ধে কিছু জানে না, তাহাদের ওযূর পানি এবং পাগলের ওযূর পানি ব্যবহৃত পানি বলিয়া ধর্তব্য হইবে না।

২০। মাসআলা ঃ পাক-ছাফ কোন জিনিস ধুইলে সেই ধোয়া পানি দ্বারা ওযূ বা গোছল জায়েয। অবশ্য যদি পানি গাঢ় না হইয়া থাকে এবং প্রচলিত কথায় ইহাকে "মায়ে মতলক" অর্থাৎ শুধু পানি বলা হয়। বাসন-কোষণে যদি খাদ্যবস্তু লাগিয়া থাকে উহার ধোয়া পানি দ্বারা ওযূ গোছল জায়েয হওয়ার শর্ত হইল পানির তিনটি গুণের দুইটি গুণ থাকা চাই যদিও একটি বদলিয়া যায়। যদি দুইটি বদলিয়া যায়, তবে জায়েয নহে।

২১। **মাসআলা** ঃ যে পানি ওযূতে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই পানি পান করা এবং খাদ্য-দ্রব্যে ব্যবহার করা মাক্রূহ্। ইহা দ্বারা ওযূ গোছল করা দুরুস্ত নাই। কিন্তু নাপাক কোন জিনিস ধোয়া দুরুস্ত আছে।

২২। **মাসআলা** ঃ যমযমের পানি দ্বারা বে-ওযূ লোকের ওযূ করা বা যাহার গোছলের হাজত হইয়াছে, তাহার গোছল করা উচিত নহে। এইরূপে উহার দ্বারা নাপাক কোন জিনিস ধৌত করা ও এস্তেঞ্জা করা মাকরূহ; কিন্তু যদি একান্ত ঠেকা পড়ে এবং যমযমের পানি ব্যতীত অন্য পানি এক মাইলের মধ্যে পাওয়া না যায়; তবে ঐ পানি দ্বারাই যরূরত পুরা করিতে হইবে।

২৩। **মাসআলা** ঃ মেয়েলোকের ওযূ বা গোছলের অবশিষ্ট পানির দ্বারা পুরুষ লোকের ওযূ বা গোছল করিতে নাই। যদিও এইরূপ করিলে আমাদের মযহাব অনুসারে তাহার ওযূ-গোছল হইয়া যাইবে, কিন্তু হাম্বলী মাযহাবে হইবে না। কাজেই অন্য ইমামের এখ্তেলাফ হইতেও বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে ভাল।

২৪। **মাসআলা** ঃ যে-স্থানে কোন সম্প্রদায়ের উপর খোদার গযব ও আযাব নাযিল হইয়াছে। যেমন, আদ-ছামূদ জাতি তথাকার পানি দ্বারাও ওযূ না করা ভাল। কিন্তু অন্য পানির অভাবে ওযূ করিতে না পারায় যদি নামাযই ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তবে ঐ পানির দ্বারাই ওযূ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। যেমন, যমযমের পানির হুকুম।

২৫। **মাসআলা** ঃ তন্দুর (চুলা) নাপাক হইলে আগুন জ্বালাইলে পাক হইয়া যায় বটে; কিন্তু যে পর্যন্ত নাপাকের চিহ্ন দেখা যাইবে, সে পর্যন্ত পাক হইবে না।

২৬। **মাসআলা** ঃ নাপাক স্থানে অন্য মাটি ফেলিলে যদি নাপাকী নীচে চাপা পড়ে এবং নাপাকীর গন্ধ না আসে, তবে ঐ মাটির উপরিভাগকে পাকই ধরা যাইবে।

২৭। **মাসআলা** ঃ নাপাক তেল বা চর্বি দ্বারা প্রস্তুত সাবান পাক।

২৮। **মাসআলা** ঃ ফোঁড়া বা যখমে পানি লাগিলে যদি ক্ষতি করে, তবে ঐ স্থানটুকু শুধু ভিজা কাপড় দ্বারা মুছিয়া দিলেই চলিবে, ভাল হওয়ার পরও ধোয়া যরূরী হইবে না।

২৯। **মাসআলা** ঃ শরীরে, কাপড়ে, চুলে বা দাড়িতে যদি নাপাক রং লাগে, তবে উহা ধুইতে হইবে। যখন রংহীন সাদা পানি বাহির হইবে, তখন রংয়ের চিহ্ন থাকিলেও শরীর, কাপড়, দাড়ি পাক হইয়া যাইবে।

৩০। **মাসআলা** ঃ যে দাঁত পড়িয়া গিয়াছে সেই দাঁত যদি আবার কোন ঔষধ দ্বারা জমাইয়া দেওয়া যায়, তবে পাকই ধরিতে হইবে। যে ঔষধ দ্বারা জমাইয়াছে তাহা যদি কিছু নাপাকও হয়, তবুও তাহা পাক হইয়া যাইবে। তদ্রূপ যদি হাড় ভাঙ্গিয়া যায় এবং অন্য কোন নাপাক জানোয়ারের হাড় দ্বারা জোড়া দেওয়া হয় বা কোন যখম, কোন নাপাক জিনিসের দ্বারা ভরিয়া দেওয়া হয়, এমতাবস্থায় যখন ভাল হইবে তখন উহা আর বাহির করার দরকার নাই, শরীরের সঙ্গে মিশিয়া আপনা-আপনি পাক হইয়া যাইবে।

৩১। **মাসআলা** ঃ নাপাক তেল চর্বি বা ঘি যদি কোন জিনিসে লাগে এবং এত পরিমাণ ধোয়া হয় যে, ছাফ পানি বাহির হইতে থাকে, তবে কিছু তেলতেলা বাকী থাকিলেও সে জিনিস পাক হইয়া যাইবে।

৩২। মাসআলাঃ পানিতে নাপাকী পড়ার কারণে যদি পানি ছিটাইয়া যায় এবং সেই ছিটা গায়ে বা কাপড়ে লাগে, কিন্তু তাহাতে নাপাকীর কোন আছর না দেখা যায়, তবে তাহাতে শরীর বা কাপড় নাপাক হইবে না।

৩৩। মাসআলাঃ দোপাল্লা কাপড়ের বা তুলাভরা কাপড়ের এক দিক যদি নাপাক হইয়া যায় এবং উভয় পাল্লা সেলাই করা হয়, তবে পাক পাল্লার উপরও নামায হইবে না। কিন্তু যদি সেলাই করা না হয়, তবে এক পাল্লা নাপাক হওয়ার কারণে অন্য পাল্লা নাপাক হইবে না; কাজেই যদি পাক পাল্লায় নামায পড়ে, তবে নামায হইবে, কিন্তু তাহার জন্য শর্ত এই যে, উপরের পাক পাল্লা এত মোটা হওয়া চাই যাহাতে নাপাকীর রং দেখা না যায় এবং গন্ধ টের না পাওয়া যায়।

৩৪। মাসআলাঃ মুরগী বা কোন হালাল জীব যবাহ্ করিয়া পেট ছাফ করার আগে যদি গরম পানিতে সিদ্ধ করা হয়, তবে তাহা নাপাক ও হারাম হইয়া যাইবে, তাহা পাক করার আর কোন উপায় নাই। যেমন, ইংরেজ ও তাহাদের সমস্বভাবী লোকেরা করিয়া থাকে।

৩৫। মাসআলাঃ কেব্‌লা তরফ মুখ বা পিঠ করিয়া পেশাব-পায়খানা করা মকরূহ্। চন্দ্র বা সূর্যের দিকে মুখ বা পিঠ করিয়া পেশাব-পায়খানা করাও মকরূহ্। পুকুর বা খালের নিকট যদিও মলমূত্র পানিতে না যায় এবং যে গাছের ছায়ায় গরমের সময় লোকেরা আশ্রয় লয়, যে গাছের ফল-ফুল লোকের উপকারে আসে, যে জায়গায় বসিয়া শীতের সময় রোদ পোহায়, গরু মহিষের পালের মধ্যে, মসজিদ বা ঈদগাহের এত নিকটে যেখান হইতে দুর্গন্ধ মসজিদে বা ঈদগাহে আসিতে পারে, কবরস্থানে, যে স্থানে ওযূ বা গোছল করে, রাস্তার মধ্যে, বাতাসের রোখের দিকে, গর্তের মধ্যে, রাস্তার নিকটে এবং লোকসমাগমের নিকটে প্রভৃতি স্থানে পেশাব-পায়খানা করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। মোটকথা, যাহা লোক যাতায়াতের স্থান বা যেখানে পেশাব-পায়খানা করিলে জনসাধারণের বা নিজের তক্‌লীফ হইতে পারে, অথবা পেশাব-পায়খানা করিলে নাপাকী বহিয়া নিজের দিকে আসে, এমন জায়গায় পেশাব-পায়খানা করা মকরূহ।

পেশাব-পায়খানার সময় নিষিদ্ধ কাজঃ

১। মাসআলাঃ পেশাব-পায়খানার সময় কথা বলিতে নাই। অকারণে কাশিবে না। কোরআনের আয়াত বা হাদীসের টুক্‌রা বা অন্য কোন তা'যীমের উপযুক্ত কালাম পাঠ করিতে নাই। আল্লাহ্‌র নাম, রসূলের নাম বা অন্য কোন পয়গম্বরের নাম; ফেরেশ্‌তার নাম বা কোরআনের আয়াত বা হাদীসের টুকরা বা অন্য দো'আ কালাম লিখিত কোন জিনিস পেশাব-পায়খানার সময় সঙ্গে রাখিবে না; অবশ্য যদি কাপড়ে মোড়ান, তাবীযে ঢাকা, জেবের মধ্যে থাকে, তবে মক্‌রূহ্ হইবে না। অকারণে শুইয়া বা দাঁড়াইয়া পেশাব-পায়খানা করা মক্‌রূহ্। যরূরত অপেক্ষা অধিক উলঙ্গ হইয়া বা একেবারে উলঙ্গ হইয়া পেশাব-পায়খনা করা মকরূহ্। ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা অর্থাৎ পাক করা মকরূহ্।

এস্তেঞ্জা ও কুলূখের বস্তুঃ

১। মাসআলাঃ পেশাবের পর কুলূখ ব্যবহার করা এ জমানায় পুরুষদের জন্য প্রায় ওয়াজিবের সমতুল্য। কেননা, কুলূখ না লইলে পেশাবের (ফোঁটা আসা বন্ধ না করিলে পরে) ফোঁটা আসিয়া কাপড় নাপাক করিয়া ফেলিতে পারে, ওযূ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। কাজেই ফোঁটা আসা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কুলূখ লওয়া যরূরী। কিন্তু সাবধান! কুলূখ লইবার সময় নির্লজ্জ হইবে না। কারণ লজ্জা ঈমানের একটি প্রধান অঙ্গ। মেয়েলোকদের জন্য পেশাবের কুলূখের

দরকার নাই। পায়খানার কুলূখ ব্যবহার করা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নত। (কুলূখ দ্বারা নাপাকী মুছিয়া ফেলিয়া পরে পানি দ্বারা শৌচ করিবে।)

২। মাসআলা ঃ হাড়, খাদ্যদ্রব্য, ছাগলের লেদী, গরুর গোবর বা অন্য কোন নাপাক জিনিস, একবার যে ঢিলা বা পাথর কুলূখের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা, পাকা ইট, ঠিকরি (চাঁড়া) পাকা, কাঁচ, কয়লা, চুনা, লোহা, সোনা, রূপা, যে জিনিসে ছাফ করে না সেইরূপ জিনিস যেমন, সিরকা, তৈল, চর্বি ইত্যাদি; গরু মহিষের খাদ্য যেমন, খড়, ঘাস,ভূষি ইত্যাদি; মূল্যবান জিনিস দাম অল্পই হউক বা বেশী হউক যেমন, নূতন কাপড়, গোলাপ পানি ইত্যাদি; মানুষের কোন অঙ্গ যেমন, চুল, হাড্ডী, গোশ্‌ত, ইত্যাদি; মসজিদের চাটাই, খড়কুটা, ঝাটা ইত্যাদি; গাছের পাতা, কাগজ, তাহা লেখা হউক বা অলেখা হউক; যমযমের পানি, অন্যের কোন জিনিস যেমন, কাপড়, পানি ইত্যাদি দ্বারা তাহার সন্তুষ্টি ও অনুমতি ছাড়া কুলূখ লওয়া মকরূহ্ এবং নাজায়েয। তূলা এবং অন্যান্য এমন জিনিস যাহা দ্বারা মানুষ এবং তাহার পশুর উপকারে আসে ইত্যাদি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মকরূহ্।

৩। মাসআলা ঃ পানি, মাটি, পাথর, মূল্যহীন কাপড় (নেক্‌ড়া) এবং অন্য যে কোন জিনিস যাহার কোন মূল বা সম্মান নাই এবং যাহার দ্বারা নাপাকী ছাফ হইতে পারে উহাদের দ্বারা এস্তেঞ্জা ও কুলূখ লওয়া জায়েয।

যমীমা—পরিশিষ্ট

এল্‌ম শিক্ষার ফযীলত

এল্‌ম অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহ্‌কাম যাহা কোরআন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে বা ইমামগণ যে-সব বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অবগত হওয়া।

১। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ○
অর্থ—যাহারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূলকে বিশ্বাস করিবে এবং যাহারা (ধর্ম) জ্ঞান অর্জন করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের দরজা অনেক বাড়াইয়া দিবেন।

২। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ○
অর্থ—বল, যাহারা (ধর্ম) জ্ঞান অর্জন করিয়াছে এবং যাহারা (ধর্ম) জ্ঞান অর্জন করে নাই তাহারা কি সমান হইতে পারে? (কখনও নয়।)

১। হাদীস ঃ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ - (جامع صغير)
অর্থ—এল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, (সে পুরুষ হউক আর নারীই হউক। ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ্, ফরয তরককারী ফাসেক)।

২। **হাদীস ঃ** مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّاللّٰهُ يُعْطِىْ -
অর্থ—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল চান তাহাকে ধর্মজ্ঞান দান করেন। (ফয়েয দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কেহ নাই।) তবে আমি শুধু এসব বন্টনকারী মাত্র, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা দানকারী। —বোখারী, মোসলেম

৩। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন ঃ মানবের মৃত্যুর পর তাহার সব আমল খতম হইয়া যায়। (অর্থাৎ, আমল করিবার শক্তি থাকে না; কাজেই ছওয়াব হাছিল করিবার এবং মর্তবা

বাড়াইবারও আর কোন ক্ষমতা থাকে না) কেবল মাত্র তিনটি আমলের ছওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে (এবং তৎকারণে তাহার মর্তবাও বাড়িতে থাকে।) ১ম ছদকায়ে জারিয়া; যেমন নেক কাজের জন্য কোন সম্পত্তি আল্লাহ্‌র নামে ওয়াক্‌ফ করিয়া যাওয়া। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মসজিদ, মোসাফিরখানা, মাদ্রাসা ইত্যাদি তৈরী করিয়া দেওয়া। ২য়, এল্‌ম; যদ্দ্বারা লোকের উপকার হয়; যেমন, ধর্ম-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, ধর্ম বিষয়ক কিতাব লিখিয়া প্রচার করা ইত্যাদি। ৩য়, নেক সন্তান, যে পিতামাতার জন্য দো'আ করিতে থাকে। —মোসলেম শরীফ

৪। **হাদীস**ঃ রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এল্‌মে দ্বীন হাছিল করার নিয়তে কোন ব্যক্তি যেপথ অতিক্রম করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য উহা বেহেশ্‌তের পথ অতিক্রমের মধ্যে গণ্য করিবেন। অর্থাৎ, এল্‌মের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণে বা মাদ্রাসা মসজিদ বা খানকায় গমনে যেপথ চলা হয় তাহা যেন বেহেশ্‌তেরই পথ চলা হইতেছে এবং বেহেশ্‌তের পথই তৈয়ার হইয়াছে'। ফেরেশ্‌তাগণ (খাঁটি) তালেবে এল্‌মগণকে (এল্‌ম অন্বেষণকারীগণকে) এত ভক্তি করেন এবং ভালবাসেন যে, তাহাদের জন্য নিজেদের বাজু বিছাইয়া দেন। খাঁটি আলেমদের এতবড় মর্তবা যে, তাহাদের জন্য জমীন ও আসমানের বাসিন্দা সকলেই দো'আ করে। এমন কি, পানির মাছও তাঁহাদের জন্য দো'আ করে। (কারণ দুনিয়াতে সকলের ভালাই আলেমদের উছিলায়।) আলেম আর আবেদের তুলনা এইরূপঃ আলেম যেন পূর্ণিমার চন্দ্র, আর আবেদ যেন একটি নক্ষত্র। পূর্ণিমার চন্দ্রের আলো এবং অন্য একটি নক্ষত্রের আলোতে যে তফাত, আলেম ও আবেদের মধ্যেও সেই তফাত। (এখানে আবেদ অর্থ—যিনি শুধু নামায রোযা প্রভৃতি এবাদতের মাসআলাসমূহের নিয়ম-পদ্ধতি জানেন, এল্‌ম চর্চায় মশ্‌গুল থাকেন না; আর আলেম অর্থ—যিনি তদুপরি অনেক বেশী এল্‌ম জানেন এবং এল্‌ম চর্চায় জীবনযাপন করেন।) আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ (নায়েবে রসূল)। পয়গম্বরগণ মীরাস সূত্রে কোন টাকা, পয়সা, সোনা-রূপা, জমিজমা রাখিয়া যান নাই, তাঁহারা শুধু এল্‌ম রাখিয়া গিয়াছেন। কাজেই যে ব্যক্তি এল্‌ম হাছিল করিয়াছে, সে অনেক বড় দৌলত হাছিল করিয়াছে।

৫। **হাদীস**ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে-আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ 'রাত্রে ঘন্টা খানেক এল্‌ম চর্চা করা সারা রাতের এবাদত অপেক্ষা উত্তম।' এই হাদীসের অর্থ এ নয় যে, নফল এবাদত একেবারে ছাড়িয়া দিয়া কেবল কিতাব পড়ার মধ্যেই লিপ্ত থাকিবে। ইহার অর্থ—নফল এবাদতও সঙ্গে সঙ্গে কিছু করা চাই, নতুবা এল্‌মের মধ্যে নূর পৌঁছিবে না; কিন্তু আলেম ও তালেবে এল্‌মগণের এল্‌মের চর্চায়ই অনেক সময় খরচ করা চাই। কারণ, এল্‌মের মর্তবা অনেক বড় এবং ইহাতে পরিশ্রম অনেক বেশী।

৬। **হাদীস**ঃ 'ওয়ায়েল তাহার জন্য, যে এল্‌ম হাছিল করে নাই।' ওয়ায়েলের দুই অর্থঃ ১। দোযখের এক নাম। ২। খারাবী, অতএব, হাদীসের অর্থ এই হইল যে, ওয়ায়েল নামক দোযখ তাহাদের জন্য যাহারা এল্‌মে দ্বীন হাছিল করে নাই, অথবা যাহারা এল্‌মে দ্বীন হাছিল করে না, তাহাদের জন্য শুধু খারাবীই রহিয়াছে। এই মর্মেই শেখ, সা'দী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

سر انجام جاهل جهنم بود   كه جاهل نكو عاقبت كم بود

'জাহেলের পরিণাম দোযখ। কেননা, যাহারা এল্‌ম হাছিল করে নাই জাহেল হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ভাগ্যে হোছ্‌নে খাতেমা (অর্থাৎ, ঈমানের সঙ্গে জীবনযাপন এবং ঈমানের সঙ্গে-মৃত্যুবরণ) খুব কমই জুটে।'

৭। **হাদীস**ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয়পাত্রকে কিছুতেই দোযখে ফেলিবেন না। —(জামে ছগীর) এই মর্মেই জনৈক আরবী শায়ের বলিয়াছেনঃ

حَسْبُ الْمُحِبِّيْنَ فِى الدُّنْيَا عَذَابُهُمْ

تَاللّٰهِ لَاعَذَّبْتُهُمْ بَعْدُ سَقَرُ

অর্থাৎ, খোদার কসম! আল্লাহ্র প্রিয়গণকে দোযখ আযাব করিতে পারিবে না! কেননা, আল্লাহ্র প্রিয়গণ দুনিয়াতে যে সমস্ত কষ্ট (বিপদ-আপদ) সহ্য করে তাহা তাহাদের কোন পাপ থাকিলে তাহা মা'ফ করিবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় হইতে হইলে প্রথমতঃ এল্মে-দ্বীন শিক্ষা করা দরকার। তারপর চিরজীবন আল্লাহ্র আশেক হইয়া, আল্লাহ্র হুকুমগুলি রীতিমত পালন করিয়া, আল্লাহ্কে রাযী রাখিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করা আবশ্যক। দৈবাৎ যদি কখনও কোন গুনাহ্র কাজ হইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ তওবা করা দরকার।

৮। **হাদীস**ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে আমার উম্মতগণ! তোমরা লোকদিগকে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র বানাইতে থাক অর্থাৎ, লোকদিগকে ধর্ম শিক্ষা দান করিয়া আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের পথে ধাবিত করিতে থাক, তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে স্বীয় প্রিয়পাত্র (ওলী) করিয়া লইবেন। —কানযোল ওম্মাল

৯। **হাদীস**ঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি এল্ম শিক্ষা করিয়া সেই এল্ম অনুযায়ী আ'মল করিবে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে এমন এল্ম দান করিবেন, যাহা সে জানিত না। অর্থাৎ, এল্মের উপর খাঁটিভাবে আ'মল করিলে আল্লাহ্র তরফ হইতে এল্মে-লাদুন্নি এবং এল্মে-আসরার দান করা হইবে।

১০। **হাদীস**ঃ আলেমের চেহ্রা দর্শন করাও এক এবাদত। —দাইলামী।

১১। **হাদীস**ঃ আলেম যদি তাহার এল্মের দ্বারা শুধু একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করে, তবে সেই আলেমকে এমন হায়বত দান করা হয় যে, তাহাকে সকলেই ভয় এবং ভক্তি করে।

১২। **হাদীস**ঃ খাঁটি আলেমগণ যদি আউলিয়া না হন, তবে অন্য কেহই আল্লাহ্র ওলী হইতে পারে না। অর্থাৎ, যে-সমস্ত আলেম এল্ম পড়িয়া আমল করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলী। —বোখারী

১৩। **হাদীস**ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ আল্লাহ্ চির উজ্জ্বল করিয়া রাখুন, ঐ ব্যক্তির চেহ্রা, যে আমার বাণী শ্রবণ করিবে এবং অবিকল যেমন শুনিয়াছে তেমনই অন্যকে পৌছাইয়া দিবে। অর্থাৎ, কোনরূপ কম-বেশী না করিয়া অবিকল হাদীস অন্যকে যিনি শিক্ষা দিবেন তিনি হযরতের এই দো'আ পাইবেন। সোব্হানাল্লাহ্! কত বড় কিস্মত। কত বড় দৌলত! যাহারা এল্মে-দ্বীন শিক্ষা দিবে তাহারাই এই দো'আর পাত্র হইবে। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানেরই হযরতের দো'আর প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া এল্মে-দ্বীন শিক্ষা করা দরকার।

১৪। **হাদীস**ঃ যে ব্যক্তির হাতে একজনও মুসলমান হইবে, সে নিশ্চয়ই বেহেশ্তী হইবে। অর্থাৎ, কাহারও চেষ্টার দ্বারা একটি মাত্র লোক মুসলমান হইলেও সে বেহেশ্তে যাইবে। —তাঃ

১৫। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি ৪০টি হাদীস শিক্ষা করিয়া আমার উম্মতকে পৌঁছাইবে অর্থাৎ, শিক্ষা দিবে, তাহার জন্য ক্বিয়ামতের মাঠে আমি খাছভাবে শাফা'আত করিব।

১৬। হাদীসঃ اِنَّ اللهَ يَكْرَهُ الْحِبْرَ السَّمِيْنَ ○

'আল্লাহ্ তা'আলা (অলস ও আরাম প্রিয়, দ্বীনের খেদমতে তৎপর নহে এরূপ) মোটা আলেমকে ভালবাসেন না। (যদি কেহ সৃষ্টিগতভাবে মোটা হয়, অথচ দ্বীনের খেদমতের কাজ স্ফুর্তির সহিত করে; তবে তাহার উপর এই 'ওঈদ' [ধমক] প্রয়োগ হইবে না।)

১৭। হাদীসঃ সর্বাপেক্ষা বেশী আযাব সেই আলেমের হইবে, যে নিজের এল্‌ম দ্বারা কাজ লয় নাই অর্থাৎ, দ্বীনের কাজ করে নাই। —জামে ছগীর

১৮। হাদীসঃ দোযখের মধ্যে একটি ভীষণ গর্ত আছে, যাহা হইতে স্বয়ং দোযখও দৈনিক চারি শতবার খোদার নিকট পানাহ্ চায়, সেই গর্তের মধ্যে রিয়াকারী আলেমগণকে নিক্ষেপ করা হইবে অর্থাৎ, যাহারা নামের জন্য, ইয্‌যতের জন্য, অর্থ সঞ্চয়ের জন্য এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা করিবে তাহাদিগকে দোযখের উক্ত গর্তে নিক্ষেপ করা হইবে।

১৯। হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে-মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) বলেন, আলেমগণ যদি এল্‌মের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন, তবে নিশ্চয় আলেমগণই জমানার সরদার হইতেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়! আলেমগণ পার্থিব লোভের বশীভূত হইয়া দুনিয়াদারের কাছে গিয়া বে-ইয্‌যত হন। নির্লোভ আলেমদের প্রতি আপনা হইতেই ভক্তির উদ্রেক হয়। পক্ষান্তরে লোভী স্বার্থপর আলেমের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই অভক্তির সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে অন্যান্য বাজে চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ধর্মের উন্নতির এবং এক আখেরাতের চিন্তা করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার যাবতীয় কাজ সুসমাধা করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার নানা চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কোনই পরওয়া করিবেন না, অবশেষে সে ঐ সব চিন্তার সাগরে ডুবিয়া বিনাশ হইবে।

আজকাল সাধারণতঃ লোকে চিন্তা করে যে, এল্‌মে-দ্বীন পড়িলে ইয্‌যতেরও অভাব হইবে এবং রুযি রোযগারেরও অভাব হইবে। উপরের হাদীসটিতে এইরূপ সংসারীদের সন্দেহ রোগের ঔষধ বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব, হে মুসলেম ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! ভীত হইবেন না, নির্ভীকচিত্তে আগ্রহের সহিত নিজেদের ছেলেমেয়েদের এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা দিবেন। নিশ্চয় জানিবেন, এল্‌মে দ্বীন হাছিল হইলে রিয্‌ক বা ইয্‌যতের অভাব হইবে না। রিয্‌কের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। দুনিয়ার জীবন চিরস্থায়ী নহে।

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے

আখেরাতের বাড়ীই চিরস্থায়ী বাড়ী। সুতরাং সেই আসল বাড়ীর যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই একান্ত কর্তব্য।

২০। হাদীসঃ সোমবারে এল্‌ম্ তলব কর। এরূপ কথাই বৃহস্পতিবারের সম্বন্ধেও আসিয়াছে। অর্থাৎ, সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার এল্‌মের সবক বা এল্‌মের কোন কাজ শুরু করা ভাল। —কানযোল ওম্মাল

২১। হাদীসঃ যে কেহ অন্যকে একটি আয়াত শিক্ষা দিল, সে যেন তাহার প্রভু হইয়া গেল। অর্থাৎ, ওস্তাদের হক্ অনেক বেশী। শাগ্‌রিদের উচিত ওস্তাদকে প্রভুর মত ভক্তি করা। বাস্তবিক

পক্ষে মানব দুনিয়াতেও দোযখের আগুনে দগ্ধ হইবার উপযুক্ত থাকে, ওস্তাদই তাহাকে ধর্ম-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বেহেশ্‌তের পথ প্রদর্শন করেন।

২২। হাদীসঃ যে-ব্যক্তি কোন মাসআলা অবগত আছে, তাহার কাছে সেই মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে যদি সে না বলে, তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরাইয়া দেওয়া হইবে।

২৩। হাদীসঃ যে ছেলে কোরআনের হাফেয হইবে, কোরআন শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী চলিবে, তাহার মা-বাপকে কিয়ামতের দিন এত এত সম্মান দান করা হইবে যে, তাহাদের টুপীর উজ্জ্বলতা সূর্যের আলোকের ন্যায় সারা পৃথিবী আলোকিত করিবে।

২৪। হাদীসঃ যে বংশের একটি ছেলে হাফেয হইবে, তাহার সুপারিশে তাহার বংশের এমন দশজন বেহেশ্‌তে যাইবে, যাহাদের জন্য দোযখ নির্ধারিত হইয়াছিল।

ওযূ-গোসলের ফযীলত

১। হাদীসঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি ওযূ শুরু করিবার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িবে। (بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ 'বিস্‌মিল্লাহ্ ওয়াল হামদুলিল্লাহ্ পড়া আরও ভাল,) এবং প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার সময় আশ্‌হাদু-আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু ওয়া-আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া-রাসূলুহু পড়িবে এবং ওযূ শেষ করিয়া পড়িবেঃ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

অর্থাৎ, হে খোদা! আমাকে তওবাকারী এবং পাক-পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তাহার জন্য বেহেশ্‌তের আটটি দরওয়াজাই খুলিয়া দেওয়া হইবে। সে মনের আনন্দে যে দরওয়াজা দিয়া ইচ্ছা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। আর যদি এইরূপ ওযূ করার পর দুই রাকা'আত তাহিয়্যাতুল ওযূ নামায হুযূরীয়ে ক্বলব (একাগ্রতার) সহিত বুঝিয়া পড়িয়া যখন এই নামায হইতে ফারেগ হয়, তখন তাহার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দেওয়া হয় এবং সে নবজাত শিশুর ন্যায় বে-গোনাহ্ হইয়া যায়।

২। হাদীসঃ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ ○

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, পাক-ছাফ থাকা ঈমানের (এবং ইসলাম ধর্মের) অর্ধেক অংশ।

৩। হাদীসঃ যে ব্যক্তি ওযূকালে দুরূদ শরীফ পাঠ না করিবে, তাহার ওযূ কামেল হইবে না।

৪। হাদীসঃ যে ঈমানদার খাঁটি দেলে ওযূ করিবে—সে যখন মুখ ধুইবে, তখন পানির শেষ ফোটার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর দ্বারা যত ছগীরা গুনাহ্ হইয়াছে, সব মা'ফ হইয়া যাইবে। তৎপর যখন দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুইবে, তখন পানির শেষ ফোটার সঙ্গে সঙ্গে হাতের দ্বারা যত ছগীরা গোনাহ্ হইয়াছে, সব মা'ফ হইয়া যাইবে। তারপর যখন পা দুইখানি ধুইবে তখন পায়ের দ্বারা যত ছগীরা গোনাহ্ হইয়াছে, পানির শেষ ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সে সব গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে। এইরূপ ওযূ শেষ করিয়া সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ বে-গোনাহ্ নিষ্পাপ হইয়া যাইবে। —মোসলেম শরীফ

৫। হাদীসঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় খাদেম হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেনঃ 'হে আনাস! তুমি ফরয গোসল করিবার সময় খুব ভাল করিয়া গোসল করিবে, (শরীরে একটি পশমের স্থানও যেন শুক্‌না না থাকে। কারণ, একটি পশমের স্থানও শুক্‌না থাকিলে দোযখের আযাব ভোগ করিতে হইবে।) যদি তুমি (এইভাবে) উত্তমরূপে গোসল কর, তবে গোসলের স্থান হইতে এইরূপে বাহির হইবে যে, তোমার

সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত আনাস (রাঃ) আরয করিলেন, হুযূর উত্তমরূপে গোসল করার অর্থ কি? হুযূর (দঃ) বলিলেন, চুল এবং পশমের গোড়াগুলিকে খুব ভাল করিয়া ভিজাইবে এবং সমস্ত শরীর খুব ভাল করিয়া (ডলিয়া মলিয়া ময়লা) ছাফ করিয়া গোসল করিবে। অতঃপর হযরত (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিলেন, প্রিয় বৎস, সব সময় ওযূর সঙ্গে থাকিবার চেষ্টা করিও। যদি ইহা পার, তবে বড়ই ফযীলতের জিনিস। কেননা, যাহার মৃত্যু ওযূর হালাতে হইবে, তাহাকে শহীদের মর্তবা দান করা হইবে।

—আবু ইয়ালা

৬। হাদীসঃ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ ○

অর্থ—মো'মিন বন্দার হাত পায়ে যাহার যে পর্যন্ত ওযূর পানি পৌঁছিবে ক্বিয়ামতের দিন তাহাকে সে পর্যন্ত নূরের অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়া দেওয়া হইবে।

ওযূর সময় পড়িবার দো'আ

[নিম্নের দো'আগুলি মূল কিতাবে নাই, তবে শিখিয়া লইয়া আমল করা ভাল।]

ওযূর শুরুতে—আঊযুবিল্লাহ্, বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া এই দো'আ পড়িবেঃ —অনুবাদক

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَّالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّالْكُفْرُ بَاطِلٌ ○

'মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি। সকল প্রশংসাই তাঁহার জন্য যিনি (আমাকে) ইসলামের উপর রাখিয়াছেন। ইসলাম আলো, কুফ্‌র অন্ধকার; ইসলামই সত্য ধর্ম, কুফ্‌র মিথ্যা।

মাঝে মাঝে—কলেমা শাহাদত; দুরূদ শরীফ ও এই দো'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ ○

'আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও, আমার বাসস্থান কোশাদা ও শান্তিময় করিয়া দাও এবং আমার রূযিতে বরকত দাও।'

কব্জি পর্যন্ত হাত ধুইবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلَكَةِ ○

'আয় আল্লাহ্! আমাকে বরকত ও মঙ্গল দান কর এবং বে-বরকতী ও অমঙ্গল হইতে রক্ষা কর। কুল্লি করিবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَكَثْرَةِ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الصَّلٰوةِ عَلٰى حَبِيْبِكَ ○

'আয় আল্লাহ্! এই মুখ দিয়া অনেক বেশী করিয়া তোমার যিক্‌র ও তোমার শোক্‌র করিবার তৌফিক দাও এবং বেশী করিয়া ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াৎ ও তোমার পিয়ারা হাবীবের প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ পড়িবার তৌফীক দাও।'

নাকে পানি দিবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّىْ رَاضٍ وَّلَا تُرِحْنِىْ رَائِحَةَ النَّارِ ○

'আয় আল্লাহ্। এই নাকের দ্বারা যেন বেহেশ্‌তের খোশ্‌বু লইতে পারি, আর তুমি যেন আমার উপর রাযী থাক, আর দোযখের বদবু ও ঘ্রাণ যেন লইতে না হয়।'

মুখমণ্ডল ধুইবার সময় পড়িবেঃ اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ○

'আয় আল্লাহ্! সেই দিন আমার চেহ্রাকে উজ্জ্বল রাখিও যেদিন অনেক লোকের (ধার্মিকদের) চেহ্রা উজ্জ্বল এবং অনেক লোকের (অধার্মিকদের) চেহ্রা মলিন হইবে।'

ডান হাতের কনুইর উপর পর্যন্ত ধুইবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ○

'আয় আল্লাহ্। আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিও এবং আমার হিসাব সহজ করিয়া দিও।'

বাম হাত কনুইর উপর পর্যন্ত ধুইবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ ○

'আয় আল্লাহ্। আমার আমলনামা আমার বাম হাতেও দিও না বা পিছনের দিকেও দিও না।'

মাথা মছ্হে করিবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَاَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ ○

'আয় আল্লাহ্! তোমার রহ্মত দ্বারা আমাকে ঢাকিয়া লও এবং তোমার বরকত আমার উপর নাযিল কর এবং যে দিন তোমার ছায়া ও আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন ছায়া ও আশ্রয় পাওয়া যাইবে না, সে দিন দয়া করিয়া তোমার আশ্রয়ে, তোমার আরশের নীচে আমাকে একটু স্থান দান করিও।'

কান মছ্হে করিবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ○

'আয় আল্লাহ্! যাহারা ভাল কথা শুনে ও তদনুযায়ী আমল করে, আমাকে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া রাখিও, (যেন আমিও ঐ কাজ করিতে পারি।)'

গর্দান মছ্হে করিবার সময় পড়িবেঃ اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ ○

'আয় আল্লাহ্! দোযখের আগুন হইতে আমার গর্দানকে ছুটাইয়া লও। (আমাকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও।)'

ডান পা ধুইবার সময় পড়িবেঃ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَىَّ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ ○

'আয় আল্লাহ্! ছেরাতে মোস্তাক্বীমের (ইসলামের সরল রাস্তার) উপর আমাকে দৃঢ়পদ রাখিও।' বাম পা ধুইবার সময় পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِىْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِىْ لَنْ تَبُوْرَ ○

'আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও। আমার আমল কবূল কর। আমার (জীবনরূপ) ব্যবসায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিও না। (লাভবান করিয়া দাও।)'

ওযূ শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া সূরা-ইন্না আন্যালনা ও এই দো'আ পরিবেঃ

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

অর্থাৎ, 'আয় আল্লাহ্! তুমি পবিত্র, তোমারই প্রশংসা, (তোমারই স্তুতি, আমি তোমারই দাস,) তোমার নিকট ক্ষমা চাই, (তোমারই দিকে লক্ষ্য আমার,) তোমারই দিকে আমি ফিরি; আমি

সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই এবং আমি ইহার সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র বন্দা ও রসূল। আয় আল্লাহ্! আমাকে সর্বদা তওবাকারী ও পাক-পবিত্রদের শ্রেণীভুক্ত রাখিও এবং তোমার ভক্ত বন্দাদের (ছালেহীন) শ্রেণীভুক্ত রাখিও এবং ক্বিয়ামতের দিন যে সব নেক বন্দার আদৌ কোন ভয় বা চিন্তা থাকিবে না আমাকেও সেই দলভুক্ত রাখিও।'

হাদীস শরীফে আছেঃ اَلْوُضُوْءُ سَلَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'ওযূ মোমিনের হাতিয়ার;' কাজেই দুনিয়ার ও আখেরাতের কামিয়াবীর উছীলা হইল পাক-ছাফ ও ওযূ-গোসল। সুতরাং পাক-ছাফ ও ওযূ-গোসলের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

দ্বিতীয় খণ্ড

নাজাছাত হইতে পাক হইবার মাসায়েল

[নাজাছাত অর্থ নাপাকী, অপবিত্রতা]

১। **মাসআলা ঃ** নাজাছাত দুই প্রকার—গলীযা এবং খফীফা। নাজাছাতে গলীযা অর্থ—খুব বেশী নাপাক, সামান্য লাগিলেই ধৌত করার হুকুম রহিয়াছে। নাজাছাতে খফীফা অর্থ—কিছু কম এবং হাল্‌কা নাপাক।

২। **মাসআলা ঃ** রক্ত, মানুষের মল-মূত্র মনী (বীর্য, শুক্র), কুকুর-বিড়ালের পেশাব ও পায়খানা, শূকরের মাংস, পশম ও হাড় ইত্যাদি; ঘোড়া, গাধা, মহিষ, বকরী ইত্যাদি সকল প্রকার পশুর মল; হাঁস, মুরগী এবং পানিকড়ির মল, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি হারাম পশুর পেশাব নাজাছাতে গলীযা।

৩। **মাসআলা ঃ** দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব-পায়খানও নাজাছাতে গলীযা।

৪। **মাসআলা ঃ** হারাম পক্ষীর পায়খানা এবং গরু, মহিষ, বকরী ইত্যদি হালাল পশুর পেশাব এবং ঘোড়ার পেশাব নাজাছাতে খফীফা।

৫। **মাসআলা ঃ** মুরগী, হাঁস, পানিকড়ি ব্যতীত অন্যান্য হালাল পক্ষীর পায়খানা পাক। যথা—কবুতর, চড়ুই, শালিক ইত্যাদি। চামচিকার পেশাব এবং পায়খানা উভয়ই পাক।

৬। **মাসআলা ঃ** পাতলা প্রবহমান নাজাছাতে গলীযা এক দের্‌হাম পর্যন্ত শরীরে বা কাপড়ে লাগিলে মা'ফ আছে। ভুলে বা অন্য কোন ওযরে যদি এক দের্‌হাম পরিমাণ নাজাছাতসহ নামায পড়ে, তবে নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় এইরূপ নাজাছাতসহ নামায পড়া মকরূহ্। ভুলে এক দের্‌হামের বেশী নাজাছাতসহ নামায হইবে না, দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে।

নাজাছাতে গলীযা যদি গাঢ় হয় যেমন, পায়খানা, মুরগী ইত্যাদির লেদ যদি ওজনে সাড়ে চার মাষা বা তদপেক্ষা কম হয়, তবে না ধুইয়া নামায জায়েয হইবে। ইহার বেশী হইলে না ধুইয়া নামায দুরুস্ত হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** নাজাছাতে খফীফা যদি শরীরে বা কাপড়ে লাগে, তবে যে অঙ্গে লাগিয়াছে সেই অঙ্গের চারি ভাগের এক ভাগের কম হইলে মা'ফ আছে, পূর্ণ চারি ভাগের এক ভাগ হইলে বা তাহার চেয়ে বেশী হইলে মা'ফ নাই। মা'ফের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে। কাপড়ের অঙ্গ যথা—আস্তিন, কল্লি, দামন ইত্যাদি। শরীরের অঙ্গ যথা—হাত, পা ইত্যাদি। এই সমস্তের চারি ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কম হইলে তাহা মা'ফ আছে। কিন্তু পূর্ণ চারি ভাগের এক বা তাহার বেশী হইলে তাহা মা'ফ নাই, না ধুইয়া নামায হইবে না।

৮। মাসআলাঃ নাজাছাত কম হউক বা বেশী হউক পানিতে অল্প নাজাছাতে গলীযা পড়িলে, ঐ পানিও নাজাছাতে গলীযা হইবে এবং নাজাছাতে খফীফা পড়িলে নাজাছাতে খফীফা হইবে।

৯। মাসআলাঃ কাপড়ে নাপাক তৈল লাগিলে যদি ইহার পরিমাণ এক দের্‌হাম অপেক্ষা কম হয়, তবে উহা মা'ফ হইবে। কিন্তু যদি দুই এক দিন পর বিস্তৃত হইয়া এক দের্‌হাম পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে উহা ধোয়া ওয়াজিব হইবে; না ধুইয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না।

১০। মাসআলাঃ মাছের রক্ত নাপাক নহে। ইহা কাপড়ে বা শরীরে লাগিলে কোন ক্ষতি নাই। মশা এবং ছারপোকার রক্তও নাপাক নহে।

১১। মাসআলাঃ চোখে ভাসে না এমন সূচের আগার মত বিন্দু বিন্দু পেশাবের ছিটা কাপড়ে বা শরীরে লাগার সন্দেহ হইলে তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহাতে কাপড় বা শরীর ধোয়া ওয়াজিব নহে।

১২। মাসআলাঃ নাজাছাত দুই প্রকার—গাঢ় এবং তরল। গাঢ় নাজাছাত (যেমন পায়খানা, রক্ত) কাপড়ে বা শরীরে লাগিলে তাহা পাক করিবার নিয়ম এই যে, নাজাছাতের স্থান এমনভাবে ধুইবে যেন দাগ না থাকে। যদি মাত্র একবার ধোয়াতেই দাগ চলিয়া যায়, তবুও পাক হইয়া যাইবে, তিনবার ধোয়া ওয়াজিব হইবে না; কিন্তু একবারে দাগ চলিয়া গেলে আরও দুইবার ধোয়া এবং দুইবারে দাগ চলিয়া গেলে তৃতীয়বার ধোয়া মোস্তাহাব। মোটকথা, একবার বা দুইবারে দাগ চলিয়া গেলে পাক হইয়া যাইবে, তবে তিনবার পূর্ণ করা মোস্তাহাব।

১৩। মাসআলাঃ যদি এমন কোন নাজাছাত লাগিয়া থাকে যে, তিন চারি বার ধোয়া সত্ত্বেও এবং নাজাছাত চলিয়া গিয়া পরিষ্কার হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও কিছু দাগ বা কিছু দুর্গন্ধ থাকিয়া যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই। সাবান প্রভৃতি লাগাইয়া দাগ বা দুর্গন্ধ দূর করা ওয়াজিব নহে।

১৪। মাসআলাঃ পানির মত তরল নাজাছাত লাগিলে, তাহা পাক করিবার নিয়ম এই যে, অন্ততঃ তিনবার ধুইবে ও প্রত্যেকবার ভাল করিয়া নিংড়াইবে। তৃতীয় বার খুব জোরে নিংড়াইবে। ভালমত না নিংড়াইলে কাপড় পাক হইবে না।

১৫। মাসআলাঃ এমন জিনিসে যদি নাজাছাত লাগে যাহা নিংড়ান যায় না; (যথা—খাট, মাদুর, পাটি, চাটি, মাটির পাত্র, কলস, বাসন, চিনা মাটির বাসন, পেয়ালা, বোতল, জুতা ইত্যাদি) তবে তাহা পাক করিবার নিয়ম এই যে, একবার ধুইয়া এমনভাবে রাখিয়া দিবে যেন সমস্ত পানি ঝরিয়া যায়। পানি ঝরা বন্ধ হইলে আবার ধুইবে। এইরূপে তিনবার ধুইলে ঐ জিনিস পাক হইবে।

১৬। মাসআলাঃ পানির দ্বারা ধুইয়া যেরূপ পাক করা যায়, তদ্রূপ যে সব জিনিস পানির ন্যায় তরল এবং পাক তাহা দ্বারাও ধুইয়া পাক করা যায়। যেমন, গোলাপ জল, আরকে গাওজবান, খেজুরের রস, আখের রস, তালের রস, ছিরকা ইত্যাদি। কিন্তু যেসব জিনিস তৈলাক্ত তাহা দ্বারা ধুইলে পাক হইবে না, নাপাকই থাকিয়া যাইবে; যথা—দুধ, ঘি, তেল ইত্যাদি।

১৭। মাসআলাঃ এই নম্বর মাসআলা পরে পাইবেন।

১৮, ১৯। মাসআলাঃ জুতা বা চামড়ার মোজায় রক্ত, পায়খানা, গোবর, গাঢ় মনী ইত্যাদি গাঢ় নাজাছাত লাগিলে, তাহা যদি মাটিতে খুব ভালমত ঘষিয়া বা শুক্‌না হইলে নখ দিয়া খুটিয়া সম্পূর্ণ পরিষ্কার করিয়া ফেলা যায় এবং বিন্দুমাত্র নাজাছাত লাগা না থাকে, তবে তাহাতেই পাক হইয়া যাইবে, না ধুইলেও চলিবে। কিন্তু পেশাবের মত তরল নাজাছাত লাগিলে তাহা ধোয়া ব্যতীত পাক হইবে না।

২০। **মাসআলা ঃ** কাপড় এবং শরীরে গাঢ় কিংবা তরল নাজাছাত লাগিলে ধোয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পাক হইতে পারে না।

২১। **মাসআলা ঃ** কাঁচের আয়না, ছুরি, চাকু সোনারূপার জেওর, কাঁসা, পিতল, তামা, লোহা, গিলটি ইত্যাদি নির্মিত কোন থাল, বাসন, বদনা, কলস ইত্যাদি নাপাক হইলে উহা ভালমত মুছিয়া, ঘষিয়া বা মাটির দ্বারা মাজিয়া ফেলিলেই পাক হইবে; কিন্তু এই জাতীয় নক্‌শিদার জিনিস উপরোক্ত নিয়মে পানি দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত পাক হইবে না।

২২। **মাসআলা ঃ** জমিনের উপর কোন নাজাছাত পড়িয়া যদি এমনভাবে শুকাইয়া যায় যে, নাজাছাতের কোন চিহ্নও না থাকে, তবে তাহা পাক হইয়া যাইবে, তথায় নামায পড়া দুরুস্ত হইবে; কিন্তু ঐ মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয হইবে না, যে ইট বা পাথর সুরকি চুনা দ্বারা জমিনের সঙ্গে জমাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাও ঐরূপ শুধু শুকাইলে পাক হইয়া যাইবে। উহাতে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে, (কিন্তু তাহা দ্বারা তায়াম্মুম দুরুস্ত হইবে না।)

২৩। **মাসআলা ঃ** যে ইটকে সুরকি, চুনা ব্যতীত শুধু বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নাজাছাত লাগিয়া শুকাইয়া গেলে তাহা পাক হইবে না, পূর্বোক্ত নিয়মে ধুইতে হইবে।

২৪। **মাসআলা ঃ** যে ঘাস জমিনের সঙ্গে লাগা আছে তাহাও জমিনেরই মত। শুধু শুকাইলে এবং নাজাছাতের চিহ্ন চলিয়া গেলে পাক হইয়া যাইবে, কিন্তু কাটা ঘাস ধোয়া ব্যতীত পাক হইবে না।

২৫। **মাসআলা ঃ** নাপাক ছুরি, চাকু বা হাড়ি-পাতিল জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলিয়া পোড়াইলেও পাক হইয়া যাইবে।

২৬। **মাসআলা ঃ** হাতে যদি কোন নাপক জিনিস লাগে এবং কেহ জিহ্বা দ্বারা তিনবার চাটিয়া লয়, তবে হাত পাক হইয়া যাইবে, কিন্তু এরূপ করা নিষেধ। শিশু মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ পান করিবার সময় বমি করিলে উক্ত স্থান নাপাক হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি শিশু বমি করিয়া আবার সেই স্থান তিনবার চাটিয়া চুষিয়া লইয়া থাকে, তবে মায়ের শরীর পাক হইবে, অবশ্য শিশুকে এইরূপ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

২৭। **মাসআলা ঃ** মাটির কোন নূতন হাড়ি, কলস বা বদ্‌না যদি নাজাছাত চুষিয়া লইয়া থাকে, তবে তাহা শুধু ধুইলে পাক হইবে না। তাহা পাক করিবার নিয়ম এই যে, পানি ভরিয়া রাখিয়া দিবে। যখন নাজাছাতের তাছীর পানিতে আসে, তখন ঐ পানি ফেলিয়া আবার নূতন পানি ভরিয়া রাখিয়া দিবে। এইরূপ বারবার ভরিয়া রাখিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে, পানির মধ্যে নাজাছাতের (রং বা গন্ধ) কোন তাছীরই দেখা যায় না, তখন পাক হইবে।

২৮। **মাসআলা ঃ** নাপাক মাটির দ্বারা যদি হাড়ি, কলস তৈয়ার করা হয়, তবে তাহা কাঁচা থাকা পর্যন্ত নাপাক থাকিবে; আগুন দ্বারা পোড়ান হইলে পাক হইয়া যাইবে।

২৯। **মাসআলা ঃ** মধু, চিনি, মিছরির শিরা, তৈল বা ঘৃত ইত্যাদি নাপাক হইলে উহা পাক করিবার এক উপায়—যে পরিমাণ তৈল বা শিরা, সেই পরিমাণ পানি উহাতে মিশ্রিত করিয়া উত্তাপে পানিটা উড়াইয়া দিবে, যখন সমস্ত পানি উড়িয়া যাইবে, তখন আবার ঐ পরিমাণ পানি মিশ্রিত করিয়া জাল দিবে। এইরূপ তিনবার করিলে ঐ তৈল বা শিরা পাক হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় উপায়—তৈল ঘৃত ইত্যাদির সঙ্গে সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করিয়া তাহাতে নাড়াচাড়া দিলে তৈলটা উপরে ভাসিয়া উঠিবে, তারপর আস্তে আস্তে কোন উপায়ে উপর হইতে তৈলটা উঠাইয়া

আবার সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করিয়া আবার ঐরূপে তৈলটা উঠাইয়া লইবে। এইরূপ তিনবার করিলে ঐ তৈল বা ঘৃত পাক হইয়া যাইবে। যদি জমাট ঘৃত হয়, তবে পানি মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে বা আগুনের আঁচের উপর রাখিবে, ঘৃত গলিয়া উপরে ভাসিয়া উঠিলে তারপর উপরোক্তরূপে তিনবার উঠাইয়া লইলে পাক হইবে।

৩০। **মাসআলা ঃ** নাপাক রংয়ের দ্বারা কাপড় রঙ্গাইলে তাহা পাক করিবার উপায় এই যে, কাপড়খানা বার বার (অন্ততঃ তিনবার) ধুইতে থাকিবে। যতক্ষণ রঙ্গিন পানি বাহির হইতে থাকিবে ততক্ষণ ধুইতে থাকিবে। যখন রং শূন্য পানি বাহির হইবে, তখন ঐ কাপড় পাক হইয়া যাইবে—কাপড় হইতে রং যাউক বা না যাউক।

৩১। **মাসআলা ঃ** গরু, মহিষ ইত্যাদির গোবর শুকাইলে তাহা যদিও নাপাক থাকে কিন্তু তাহা পাকের কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে এবং পোড়াইবার সময় যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা নাপাক নহে। অতএব, হাতে বা কাপড়ে ধুঁয়া লাগিলে তাহা নাপাক হইবে না এবং ঐ গোবর পুড়িয়া যে ছাই হয়, তাহাও নাপাক নহে। অতএব, ঐ ছাই যদি রুটিতে (কাপড় বা শরীরে) লাগে, তবে তাহাতে কোন দোষ নাই।

৩২। **মাসআলা ঃ** বিছানার এক কোণ নাপাক এবং বাকী অংশ পাক হইলে, পাক অংশে নাযাম পড়া দুরুস্ত আছে।

৩৩। **মাসআলা ঃ** যে জমিন (ঘর বা উঠান) গোবর দ্বারা লেপা হইয়াছে, তাহা নাপাক। অতএব, উহার উপর অন্য কোন পাক বিছানা না বিছাইয়া নামায পড়া দুরুস্ত নহে।

৩৪। **মাসআলা ঃ** যে জমিন গোবর দ্বারা লেপা হইয়াছে তাহা শুকাইয়া গেলে, উহার উপর ভিজা কাপড়, বিছাইয়াও নামায পড়া দুরুস্ত আছে; যদি এরূপ ভিজা হয় যে, গোবর কাপড়ে লাগিয়া যাইতে পারে, তবে উহাতে নামায পড়া জায়েয হইবে না।

৩৫। **মাসআলা ঃ** পা ধুইয়া ভালমতে মুছিয়া যদি নাপাক জমিনের উপর দিয়া যায় এবং পায়ের চিহ্ন মাটিতে পড়ে, তবে তাহাতে পা নাপাক হইবে না; কিন্তু যদি পায়ের সঙ্গে এত পরিমাণ পানি লাগা থাকে যে, তাহার সঙ্গে ঐ নাপাক মাটি কিছু কিছু লাগিয়া যায়, তবে পা নাপাক হইয়া যাইবে। পা না ধুইয়া নামায পড়া জায়েয হইবে না।

৩৬। **মাসআলা ঃ** নাপাক বিছানায় শুইলে তাহাতে শরীর বা কাপড় নাপাক হইবে না; কিন্তু যদি শরীর হইতে এত পরিমাণ ঘাম বাহির হয়, যাহাতে শরীর এবং কাপড় ভিজিয়া বিছানার নাজাছাতের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়, তবে ঐ ঘাম নাপাক হইয়া যাইবে এবং ঐ ঘাম যে অঙ্গে বা কাপড়ে লাগিবে, তাহাও নাপাক হইয়া যাইবে।

৩৭। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ নাপাক মেহেন্দি হাতে বা পায়ে লাগায়, তাহা পাক করিবার উপায় এই যে, হাত পা, খুব ভালমতে (অন্ততঃ তিনবার) ধুইবে; যখন ধোয়া পানির সঙ্গে রং বাহির না হয়, তখন হাত পা পাক হইয়া যাইবে; হাতে পায়ে শুধু রংয়ের দাগ থাকিলে (কোন ক্ষতি হইবে না) উহা উঠাইয়া ফেলা ওয়জিব নহে।

৩৮। **মাসআলা ঃ** নাপাক সুরমা চোখের ভিতর লাগাইলে তাহা ধুইয়া পাক করা ওয়াজিব নহে। অবশ্য ভিতর হইতে কিছু অংশ চোখের বাহিরে আসিলে উহা ধোয়া ওয়াজিব হইবে।

৩৯। **মাসআলা ঃ** নাপক তৈল মাথায় বা শরীরে লাগাইলে উহা তিনবার ধুইলে পাক হইয়া যাইবে। সাবান বা অন্য কিছু দ্বারা তৈল ছাড়ান ওয়াজিব নহে।

৪০। **মাসআলা ঃ** ভাত, আটা, ময়দা ইত্যাদি কোন শুক্‌না খাদ্য-দ্রব্য যদি কুকুর বা বানরে মুখ দিয়া ঝুটা করিয়া থাকে, তবে তাতে সমস্ত ভাত নাপাক হয় নাই, যে পরিমাণ স্থানে মুখ বা মুখের লোয়াব লাগিয়াছে, উহা নাপাক হইয়াছে। ঐ পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য ফেলিয়া দিলে অবশিষ্ট খাদ্য পাক থাকিবে এবং তাহা খাওয়া দুরুস্ত হইবে।

৪১। **মাসআলা ঃ** কুকুরের লোয়াব (লালা) এবং মাংস নাপাক; অতএব, পানিতে মুখ দিলে বা কাহারও গা চাটিলে সেই পানির পাত্র এবং শরীর সব নাপাক হইয়া যাইবে। কিন্তু জীবিত কুকুরের শরীরের উপরিভাগ শুক্‌না হউক কিংবা ভিজা হউক, নাপাক নহে। অতএব, কুকুরের শরীরে যদি কাহারও কাপড় লাগিয়া যায়, তবে সে কাপড় নাপাক হইবে না। কিন্তু (কুকুর প্রায়ই নাজাছাত খায় এবং নাজাছাতের মধ্যে যায় তাই) যদি কোন নাজাছাত উহার শরীরে লাগিয়া থাকে, তবে উহার শরীর নাপাক হইবে এবং তাহা কাপড়ে লাগিলে কাপড় নাপাক হইবে।

(**মাসআলা ঃ** গোবর দিয়া উঠান লেপিবার সময় বা গোবরে হাত লাগাইয়া হাত তিনবার পরিষ্কার করিয়া ধুইবার পূর্বে যদি কোন মাটির লোটা বা কলসীতে হাত দেয় তবে ঐ লোটা, কলসী এবং তাহার পানি সব নাপাক হইয়া যাইবে। পানি ফেলিয়া দিতে হইবে এবং লোটা, কলসী পাক করিবার যে নিয়ম পূর্বে লেখা হইয়াছে সেই নিয়মে পাক করিতে হইবে।)

৪২। **মাসআলা ঃ** ভিজা কাপড় পরা অবস্থায় বায়ু (মলদ্বার দিয়া) নির্গত হইলে তাহাতে কাপড় নাপাক হইবে না।

৪৩। **মাসআলা ঃ** নাপাক পানিতে ভিজা কাপড়ের সাথে পাক কাপড় জড়াইয়া রাখিলে যদি পাক কাপড়খানা এত পরিমাণ ভিজিয়া যায় যে, (তাহাতে নাজাছাতের কিছু গন্ধ বা রং আসিয়া পড়িয়াছে বা) চিপিলে দুই এক কাত্‌রা পানি বাহির হয় বা হাত ভিজিয়া যায়, তবে ঐ পাক কাপড়ও নাপাক হইয়া যাইবে। শুধু একটু একটু ভিজা ভিজা দেখাইলে তাহাতে কাপড়খানা নাপাক হইবে না। অবশ্য যদি ঐ নাপাক কাপড়খানা পেশাব ইত্যাদি কোন নাজাছাত দ্বারা ভিজা হয়, তবে পাক কাপড়খানাতে বিন্দুমাত্র দাগ কিংবা ভিজা ভিজা লাগিলেই তাহা নাপাক হইয়া যাইবে।

৪৪। **মাসআলা ঃ** যদি কোন একখানা কাঠের এক পিঠ পাক এবং অপর পিঠ নাপাক হয় এবং তাহা এতটুকু পুরু হয় যে, চিরিয়া দুইখানা তক্তা করা যায় তবে উহার পাক পিঠে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে। যদি ঐ পরিমাণ পুরু না হয়, তবে পাক পিঠেও নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না।

৪৫। **মাসআলা ঃ** দুই পাল্লা বিশিষ্ট কাপড়ের এক পাল্লা যদি নাপাক এবং অন্য পাল্লা পাক হয় এবং উভয় পাল্লা একত্রে সেলাই করা হয়, তবে পাক পাল্লার উপর নামায পড়া জায়েয হইবে না, কিন্তু সেলাই করা না হইলে নাপাক পাল্লা নীচে রাখিয়া পাক পাল্লার উপর নামায পড়া দুরুস্ত হইবে।

এস্তেঞ্জার মাসায়েল

(এস্তেঞ্জা অর্থ—পবিত্রতা হাছিল করা। এস্তেঞ্জা দুই প্রকার—পেশাবের পর যে পবিত্রতা হাছিল করা হয়, তাহাকে 'ছোট এস্তেঞ্জা' এবং পায়খানা ফিরিয়া যে পবিত্রতা হাছিল করা হয়, তাহাকে 'বড় এস্তেঞ্জা' বলা হয়।)

১। মাসআলাঃ ঘুম হইতে উঠিয়া উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত না ধুইয়া পাক হউক কি নাপাক হউক পাত্রের পানিতে হাত দিবে না। পানি যদি লোটা, বদনা ইত্যাদি ছোট পাত্রে থাকে, তবে বাম হাত দ্বারা ঐ পাত্রকে কাত্ করিয়া পানি ঢালিয়া আগে ডান হাত তিনবার ধুইবে। তারপর লোটা ডান হাতে লইয়া কাত্ করিয়া পানি ঢালিয়া বাম হাত তিনবার ধুইবে। পানি যদি মট্‌কা ইত্যাদি এমন বড় পাত্রে থাকে যাহা কাত্ করা যায় না, তবে কোন ছোট পাক পাত্রের দ্বারা পানি উঠাইয়া উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে উভয় হাত ধৌত করিবে; কিন্তু মট্‌কা হইতে পানি উঠাইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে যেন আঙ্গুল পানিতে না ভিজে। যদি তথায় কোন ছোট পাত্র পাওয়া না যায় এবং এক্বীন থাকে যে, হাত পাক আছে—রাত্রে নাপাক হয় নাই, তবে বাম হাতের আঙ্গুলগুলি খুব চিপিয়া চুল্লু বানাইবে এবং যথাসম্ভব কম অংশ পানিতে ডুবাইয়া, কিছু কিছু পানি উঠাইয়া ডান হাত তিনবার ধুইবে, তারপর ডান হাত পাক হইয়া গেলে উহা যত ইচ্ছা পানিতে ডুবাইয়া পানি উঠাইয়া বাম হাত ধুইবে। আর যদি হাত নাপাক হয়, তবে কিছুতেই মট্‌কার পানিতে হাত বা অঙ্গুল প্রবেশ করাইবে না। অন্য কোন উপায়ে পানি উঠাইয়া, আগে হাত পাক করিবে, তারপর পাক হাতের দ্বারা পানি উঠাইয়া অন্য যে কাজ হয় করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি পাক রুমাল, গামছা বা কাপড় কাছে থাকে, তবে উহার শুক্‌না অংশ ধরিয়া অন্য অংশ পানির মধ্যে ভিজাইয়া মট্‌কার বাহিরে আনিবে এবং উহা হইতে পানির যে ধারা বাহির হইবে তদ্দ্বারা ডান হাত তিনবার ধুইবে; কিন্তু কোনক্রমেই ভিজা অংশে যেন ডান হাত বা বাম হাত স্পর্শ না করে, এইরূপে ডান হাত পাক করিয়া পরে তদ্দ্বারা পানি উঠাইয়া বাম হাত তিনবার ধুইবে। কিন্তু এইরূপে ডান ও বাম হাত ধুইবার সময় দুই হাত যেন একত্রিত না হয়।

২। মাসআলাঃ পেশাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়া যে নাজাছাত বাহির হয়, তাহা হইতে পাক হওয়া সুন্নত। অর্থাৎ, পায়খানা করিলে যদি মলদ্বার অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া না থাকে, তবে শুধু ঢিলার দ্বারা এস্তেঞ্জা করা সুন্নত। এমতাবস্থায় শুধু পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা যায়। ঢিলার দ্বারা কুলূখ লইয়া তারপর পানির দ্বারা ধোয়া মোস্তাহাব।

৩। মাসআলাঃ মল যদি মলদ্বারের এদিক ওদিক না লাগে এবং এ কারণে যদি পানি দ্বারা ধৌত না করে বরং পাক পাথর অথবা ঢিলার দ্বারা এস্তেঞ্জা করিয়া লয়, যাহাতে ময়লা দূর হইয়া যায় এবং শরীর পরিষ্কার হইয়া যায়, তবে ইহাও জায়েয আছে; কিন্তু ইহা পরিচ্ছন্নতার খেলাফ। অবশ্য যদি পানি না থাকে কিংবা কম থাকে, তবে তাহা মজবুরী অবস্থা।

(মাসআলাঃ পেশাবের হুকুমও পায়খানারই মত, অর্থাৎ পেশাব যদি পেশাবের রাস্তা হইতে অতিক্রম না করিয়া থাকে তবে পানির দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব নহে, আর যদি অতিক্রম করে এবং তাহা এক দের্‌হাম হইতে বেশী না হয়, তবে পানির দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব এবং এক দের্‌হাম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী অতিক্রম করিয়া থাকিলে, পানির দ্বারা ধৌত করা ফরয এবং ঢিলার দ্বারা কুলূখ লওয়া প্রত্যেক অবস্থায়ই সুন্নত। তবে এতটুকু ব্যবধান যে, স্ত্রীলোকে পেশাবের পর কুলূখ লওয়ার আবশ্যক নাই, পেশাব করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পানির দ্বারা ধৌত করাই যথেষ্ট। কিন্তু পুরুষের জন্য যতক্ষণ না পেশাবের কাত্‌রা বন্ধ হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঢিলা ইত্যাদির দ্বারা কুলূখ লইয়া মনের সম্পূর্ণ এত্‌মিনান হাছিল করা ওয়াজিব। এইরূপ না করা অর্থাৎ, পেশাব হইতে উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ না করা গোনাহে কবীরা এবং ইহার জন্য কবর-আযাব হয়। পেশারের কাত্‌রা বন্ধ হওয়ার পূর্বে ওযূ করিলে ওযূও হইবে না এবং নামাযও হইবে না।)

৪। মাসআলা ঃ পায়খানার ঢিলা ব্যবহার করিবার বিশেষ কোন নিয়ম নির্ধারিত নাই। অবশ্য এতটুকু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পায়খানা এদিক-ওদিক না ছড়ায় বা হাতে না লাগে এবং মলদ্বার উত্তমরূপে পরিষ্কার হইয়া যায়। তবে তিনটি বা পাঁচটি অর্থাৎ, বে-জোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নত এবং স্ত্রীলোকদের জন্য ঢিলা সম্মুখ হইতে পিছন দিকে লইয়া যাওয়া উত্তম। পুরুষের জন্য প্রথমটি সম্মুখ হইতে পিছন দিকে লইয়া যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি পিছন হইতে সম্মুখ দিকে আনয়ন করা উত্তম। প্রশ্রাবের ঢিলা ব্যবহার করিবারও বিশেষ কোন নিয়ম নির্ধারিত নাই, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত মন নিঃসন্দেহ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঢিলা লইয়া হাঁটা-হাঁটি করা উত্তম। (কিন্তু হাঁটা-হাঁটি করিবার সময় বা পেশাব বা পেশাব করিতে বসিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে, যেন নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায় অর্থাৎ, হাঁটু যেন খুলিয়া না যায় বা প্রকাশ্য স্থানে লোক সম্মুখে নির্লজ্জভাবে যেন হাঁটা-হাঁটি না করা হয় এবং পেশাবের ছিটা কাপড়ে বা শরীরে যেন না লাগে।)

৫। মাসআলা ঃ ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পর পানির দ্বারা শৌচ করা সুন্নত।

৬। মাসআলা ঃ অতঃপর নির্জনে গিয়া শরীর ঢিলা করিয়া বসিবে। পানির দ্বারা শৌচ করিবার পূর্বে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুইয়া লইবে। পানির দ্বারা কয়বার ধুইতে হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারিত নাই। তবে এই পরিমাণ ধুইবে, যেন অঙ্গ সম্পূর্ণ পাক হইয়া গিয়াছে মন সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য কোন কোন লোকের মনের সন্দেহ বিশবার ধুইলেও দূর হয় না, আবার কোন কোন লোকের পাক-নাপাকের খেয়ালই থাকে না, তাহাদের জন্য কমপক্ষে তিনবার এবং ঊর্ধ্ব সংখ্যায় সাতবার নির্ধারিত, ইহার বেশী করিবে না।

৭। মাসআলা ঃ পানির দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবার জন্য স্ত্রীলোক বা পুরুষ কাহারও সামনে সতর খোলা জায়েয নহে। অতএব, নির্জন বা আড়াল জায়গা পাওয়া না গেলে পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা না করিয়া (শুধু ঢিলা দ্বারা উত্তমরূপে এস্তেঞ্জা করিয়া ওযূ করিয়া নামায পড়িবে,) তবুও সতর খুলিবে না। কেননা, সতর খোলা বড় গোনাহ্।

৮। মাসআলা ঃ হাড়, নাপাক জিনিস গোবর, লেদী, কয়লা, চাড়া (ঠিকরা), কাঁচ, পাকা ইট, খাদ্যদ্রব্য, কাগজ ইত্যাদি দ্বারা এবং ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করা অন্যায় এবং নিষেধ। অবশ্য যদি কেহ করিয়া ফেলে তবে শরীর পাক হইয়া যাইবে।

৯। মাসআলা ঃ দাঁড়াইয়া পেশাব করা নিষেধ।

১০। মাসআলা ঃ পেশাব বা পায়খানা করিবার সময় ক্বেব্লার দিকে (পশ্চিম দিকে) মুখ বা পিঠ করিয়া বসা নিষেধ।

১১। মাসআলা ঃ ছোট শিশুকেও এইরূপে পেশাব-পায়খানা করান মকরূহ্।

১২। মাসআলা ঃ এস্তেঞ্জার পর লোটার অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা জায়েয আছে। এইরূপে ওযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারাও এস্তেঞ্জা করা জায়েয আছে, তবে না করা ভাল।

১৩। মাসআলা ঃ (ক) পেশাব-পায়খানার পূর্বে (পেশাবখানা বা পায়খানার ভিতর ঢুকিবার পূর্বে) এই দো'আ পড়িবে ঃ بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্! আমাকে শয়তান হইতে এবং মন্দ খেয়াল ও মন্দ কাজ হইতে বাঁচাও। (খ) খোলা মাথায় পায়খানায় যাইবে না। (গ) আংটি বা অন্য কিছুতে যদি খোদা বা রসূলের নাম অঙ্কিত বা লিখিত থাকে, তাহা খুলিয়া রাখিবে। (ঘ) পায়খানায় যাইবার সময় প্রথমে বাম পা ভিতরে রাখিবে। (ঙ) পায়খানার ভিতর গিয়া মুখে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিবে না। যদি

হাঁচি আসে, মনে মনে আলহাম্‌দুলিল্লাহ্ বলিবে, মুখে বলিবে না। (চ) পায়খানার ভিতরে গিয়া কথাবার্তা বলিবে না। (ছ) পায়খানা হইতে বাহির হইবার সময় প্রথমে ডান পা বাহির করিবে। (জ) দরজার বাহিরে আসিয়া এই দো'আ পড়িবেঃ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোক্‌র করি, যিনি আমার ভিতর হইতে কষ্টদায়ক অপবিত্র জিনিস বাহির করিয়া দিয়া আমাকে সুখ ও শান্তি দান করিয়াছেন। (ঝ) পানির দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবার পর বাম হাত ভাল করিয়া মাটিতে ঘষিয়া ধুইবে। (ঞ) ঢিলার এস্তেঞ্জাও বাম হাত দ্বারা করিবে, পানির এস্তেঞ্জাও বাম হাত দ্বারা করিবে, পানির এস্তেঞ্জায় কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলির বেশী লাগাইবে না এবং আঙ্গুলের মাথাও লাগাইবে না।

নামায

আল্লাহ্‌র নিকট নামায অতি মর্তবার এবাদত। আল্লাহ্‌র নিকট নামায অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবাদত আর নাই। আল্লাহ্ পাক স্বীয় বন্দাগণের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। যাহারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায রীতিমত পড়িবে, তাহারা (বেহেশ্‌তের মধ্যে অতি বড় পুরস্কার এবং) অনেক বেশী ছওয়াব পাইবে (আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয় হইবে)। যাহারা নামায পড়ে না তাহারা মহাপাপী।

হাদীস শরীফে আছেঃ 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করিয়া ভয় ও ভক্তি সহকারে মনোযোগের সহিত রীতিমত নামায আদায় করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ছগীরা গোনাহ্‌সমূহ মা'ফ করিয়া দিবেন এবং বেহেশ্‌তে স্থান দিবেন।'

অন্য হাদীসে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'নামায দ্বীনের (ইসলাম ধর্মের) খুঁটি স্বরূপ। যে উত্তমরূপে নামায কায়েম রাখিল, সে দ্বীনকে (দ্বীনের এমারতটি) কায়েম রাখিল এবং যে খুঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, (অর্থাৎ, নামায পড়িল না) সে দ্বীনকে (দ্বীনের এমারতটি) বরবাদ করিয়া ফেলিল।'

অন্য হাদীসে আছে, 'কিয়ামতে সর্বাগ্রে নামাযেরই হিসাব লওয়া হইবে। নামাযীর হাত, পা এবং মুখ কিয়ামতে সূর্যের মত উজ্জ্বল হইবে; বেনামাযীর ভাগ্যে তাহা জুটিবে না।'

অন্য হাদীসে আছে, কিয়ামতের মাঠে নামাযীরা নবী, শহীদ এবং ওলীগণের সঙ্গে থাকিবে এবং বেনামাযীরা ফেরআউন, হামান এবং কারূণ প্রভৃতি বড় বড় কাফিরদের সঙ্গে থাকিবে।

(নামায আল্লাহ্‌র ফরয) অতএব, প্রত্যেকেরই নামায পড়া একান্ত আবশ্যক। নামায না পড়িলে আখেরাতের অর্থাৎ, পরজীবনের ক্ষতি তো আছেই, ইহজীবনেরও ক্ষতি আছে। অধিকন্তু যাহারা নামায না পড়িবে, কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে কাফিরদের সমতুল্য গণ্য করা হইবে। আল্লাহ্ বাঁচাউক। নামায না পড়া কত বড় অন্যায়। (অতএব, হে ভাই-ভগ্নিগণ! আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া অত্যন্ত যত্নসহকারে নামায পড়ি এবং আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র গযব ও দোযখের আযাব হইতে বাঁচিয়া বেহেশ্‌তের অফুরন্ত নেয়ামতভোগী হইয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হই।)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায সকলের উপর ফরয। পাগল এবং নাবালেগের উপর ফরয নহে। ছেলে-মেয়ে সাত বৎসর বয়স্ক হইলে তাহাদের দ্বারা নামায পড়ান পিতামাতার উপর ওয়াজিব। দশ বৎসর বয়সে যদি ছেলে-মেয়ে নামায না পড়ে, তবে তাহাদিগকে মারিয়া পিটিয়া নামায পড়াইতে হইবে; ইহা হাদীসের হুকুম।

নামায কাহারও জন্য মা'ফ নাই। কোন অবস্থায়ই নামায তরক করা জায়েয নহে। রুগ্ন, অন্ধ, খোঁড়া, আতুর, বোবা, বধির যে যে অবস্থায় আছে, তাহার সেই অবস্থাতেই নামায পড়িতে হইবে। অবশ্য যদি কেহ ভুলিয়া যায় বা ঘুমাইয়া পড়ে, ওয়াক্তের মধ্যে স্মরণ না আসে বা ঘুম না ভাঙ্গে, তবে তাহার গোনাহ্ হইবে না বটে; কিন্তু স্মরণ হওয়া এবং ঘুম ভাঙ্গা মাত্রই ক্বাযা পড়িয়া লওয়া ফরয (এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতে হইবে।) অবশ্য তখন মকরূহ ওয়াক্ত হইলে, (যেমন সূর্যের উদয় বা অস্তের সময় যদি স্মরণ আসে বা ঘুম ভাঙ্গে,) তবে একটু দেরী করিয়া পড়িবে, যেন মকরূহ্ ওয়াক্ত চলিয়া যায়। এইরূপে বেহুশীর অবস্থায় যদি নামায ছুটিয়া যায়, তবে তজ্জন্য গোনাহ্ হইবে না। অবশ্য হুশ আসা মাত্রই তাহার ক্বাযা পড়িতে হইবে।

নামাযের ওয়াক্ত

(দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। অতএব, সেই ওয়াক্তগুলি চিনিয়া লওয়া আবশ্যক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নাম। ১। ফজর, ২। যোহর, ৩। আছর, ৪। মাগরিব, ৫। এশা। ফজরে দুই রাকা'আত, যোহরে চারি রাকা'আত, আছরে চারি রাকা'আত, মাগরিবে তিন রাকা'আত এবং এশায় চারি রাকা'আত; মোট এই ১৭ রাকা'আত নামায দৈনিক ফরয।)

ছোব্‌হে ছাদেক ঃ

১। **মাসআলা ঃ** যখন রাত্র শেষ হইয়া আসে তখন পূর্বাকাশে দৈর্ঘ্যে অর্থাৎ, উপর-নীচে একটি লম্বমান সাদা রেখা দেখা যায়। এই রেখা প্রকাশের সময়কে 'ছোব্‌হে কাযেব' বলে। ঐ সময় ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হয় না। কিছুক্ষণ পরে ঐ সাদা রেখা বিলীন হইয়া আবার অন্ধকার দেখা যায়। ইহার অল্পক্ষণ পর আকাশের প্রস্থে অর্থাৎ, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তারিত সাদা রং দেখা দেয়। এই সাদা রং প্রকাশের সময় হইতে 'ছোবহে ছাদেক' আরম্ভ হয়। ছোব্‌হে ছাদেক হইলে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত থাকিবে। যখন পূর্বাকাশে সূর্যের সামান্য কিনারা দেখাদেয়, তখন ফজরের ওয়াক্ত শেষ হইয়া যায়। কিন্তু (মেয়ে লোকের জন্য) আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া ভাল।

(সবচেয়ে ছোট রাত্রে সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট এবং সবচেয়ে বড় রাত্রে ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্বে ছোব্‌হে ছাদেক হয়। ইহা শরীঅতের কথা নহে, ব্যক্তিগত হিসাব।)

২। **মাসআলা ঃ** ঠিক দ্বিপ্রহরের পর যখন সূর্য কিঞ্চিৎমাত্র ঢলিয়া পড়ে তখন যোহরের ওয়াক্ত হয় এবং প্রত্যেক জিনিসের ছায়া উহার দ্বিগুণ না হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে। কিন্তু ছায়া সমপরিমাণ হইবার পূর্বে নামায পড়িয়া লওয়া মোস্তাহাব। সকল বস্তুর ছায়াই সকাল বেলায় পশ্চিম দিকে থাকে এবং অনেক বড় থাকে। ক্রমান্বয়ে ছায়া ছোট হইতে থাকে। এমনকি, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সবচেয়ে ছোট হইয়া কিছুক্ষণ পরে আবার পূর্বদিকে বাড়িতে আরম্ভ করে। যখন ছায়া সবচেয়ে ছোট হয়, তখন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়। এই সময় সবচেয়ে ছোট যে ছায়াটুকু থাকে তাহাকে 'ছায়া আছলী' বলে। ছায়া আছ্‌লী যখন বাড়িতে আরম্ভ করে, তখন যোহরের

ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। ছায়া আছ্‌লী বাদে ছায়া যখন ঐ বস্তুর সমপরিমাণ হয় তখন পর্যন্ত যোহরের নামায পড়া মোস্তাহাব। ছায়া আছ্‌লী বাদে ছায়া দ্বিগুণ হইবার পূর্ব পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে। যখন দ্বিগুণ হইয়া যায়, তখন আর যোহরের ওয়াক্ত থাকে না, আছরের ওয়াক্ত আসিয়া যায়। ছায়া আছ্‌লী বাদে ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আছরের ওয়াক্ত। কিন্তু সূর্যের রং হলদে হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত; তাহার পর মকরূহ্ ওয়াক্ত। মকরূহ্ ওয়াক্তে অর্থাৎ, যখন সূর্যের রং পরিবর্তন হইয়া যায়, তখন নামায পড়া মকরূহ। অবশ্য যদি কোন কারণবশতঃ ঐ দিনের আছরের নামায পড়া না হইয়া থাকে, তবে ঐ সময়ই পড়িয়া লইবে, নামায ক্বাযা হইতে দিবে না। কিন্তু আগামীর জন্য সতর্ক হইবে, যাহাতে পুনঃ ঐরূপ দেরী না হয়। অবশ্য এই সময়ে ঐ দিনের আছর ব্যতীত ক্বাযা, নফল বা অন্য কোন নামায পড়িলে তাহা জায়েয হইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া মাত্রই মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত হয় এবং যতক্ষণ পশ্চিম আকাশে লালবর্ণ দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে; কিন্তু মাগরিবের নামায দেরী করিয়া পড়া মকরূহ্। সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই নামায পড়িয়া লওয়া উচিত। পশ্চিম আকাশে ঘন্টাখানেক লালবর্ণ থাকে; (পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সূর্যাস্তের পর ১ ঘন্টা ১২ মিনিট পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে।) তারপর লালবর্ণ চলিয়া গিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত সাদাবর্ণ দেখা যায়। লালবর্ণ চলিয়া গেলেই ফৎওয়া হিসাবে এশার ওয়াক্ত হইয়া যায় বটে; কিন্তু আমাদের ইমাম আ'যম ছাহেব বলেন যে, সাদাবর্ণ থাকা পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত হয় না। কাজেই সাদাবর্ণ দূর হইয়া কালবর্ণ দেখা না দেওয়া পর্যন্ত এশার নামায পড়া উচিত নহে। ঐ লালবর্ণ দূর হওয়ার পর হইতে ছোব্‌হে ছাদেক না হওয়া পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত। কিন্তু রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মোবাহ্ ওয়াক্ত এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে ছোব্‌হে ছাদেক পর্যন্ত এশার জন্য মকরূহ্ ওয়াক্ত; কাজেই রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অতীত না হইতেই এশার নামায পড়িয়া লওয়া উচিত। কোন কারণ থাকিলে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত দেরী করার এজাযত আছে, তবে বিনা ওযরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে এশার নামায পড়া মকরূহ্। (বেৎর নামাযের ওয়াক্ত এশার পর হইতেই শুরু হয় এবং ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরও বেৎর নামাযের ওয়াক্ত মকরূহ্ হয় না।)

৪। **মাসআলা ঃ** গ্রীষ্মকালে (ছায়া সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত) দেরী করিয়া যোহরের নামায পড়া উত্তম। শীতকালে যোহরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব।

৫। **মাসআলা ঃ** শীত, গ্রীষ্ম উভয় কালেই আছরের নামায ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পরই পড়া ভাল ঃ কিন্তু যেহেতু আছরের পর অন্য কোন নফল নামায পড়া জায়েয নহে, কাজেই সামান্য দেরী করিয়াই পড়া উচিত, যাহাতে কিছু নফল পড়া যাইতে পারে। কিন্তু সূর্যের রং হলদে হওয়ার পূর্বেই এবং রৌদ্রের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে আছরের নামায পড়িবে। (রং পরিবর্তন হইয়া গেলে ওয়াক্ত মকরূহ্ হইবে।) মাগরিবের নামায সূর্য সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাওয়া মাত্রই পড়া মোস্তাহাব।

৬। **মাসআলা ঃ** যাহার তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস আছে, যদি শেষ রাত্রে উঠার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তবে তাহার বেৎর নামায শেষ রাত্রে পড়াই উত্তম। যদি শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গার বিশ্বাস না থাকে, তবে এশার পর ঘুমাইবার পূর্বে বেৎর পড়িয়া লওয়া উচিত।

৭। **মাসআলা ঃ** মেঘের দিনে সঠিক সময় জানিতে না পারিলে ফজর, যোহর এবং মাগরিবের নামায একটু দেরী করিয়া পড়া ভাল (যেন ওয়াক্ত হইবার পূর্বে পড়ার সন্দেহ না হয়।) এবং আছর কিছু জল্‌দি পড়া ভাল (যাহাতে মকরূহ্ ওয়াক্তে পড়ার সন্দেহ না হয়)।

৮। **মাসআলা ঃ** সূর্য উদয়, সূর্য অস্ত এবং ঠিক দ্বিপ্রহর এই তিন সময়ে কোন নামাযই দুরুস্ত নহে, তাহা নফল হউক, ক্বাযা হউক, তেলাওয়াতের সজ্‌দা বা জানাযার নামায হউক। কিন্তু সেই দিনের আছরের নামায না পড়িয়া থাকিলে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়েও পড়িয়া লইবে। অনুরূপ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় জানাযা হাযির হইলে, কিংবা আয়াতে সজ্‌দা তেলাওয়াত করিলে জানাযার নামায এবং তেলাওয়াতের সজ্‌দা আদায় করিয়া দিবে। —মারাক্বী

(**মাসআলা ঃ** যে কয়টি সময়ে নামায পড়া মকরূহ্ বলা হইয়াছে, সে সব সময়ে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, দুরূদ, এস্তেগ্‌ফার পড়া বা যিক্‌র করা মকরূহ নহে।)

৯। **মাসআলা ঃ** ফজরের নামায পড়ার পর হইতে সূর্য উদয় পর্যন্ত নফল পড়া দুরুস্ত নাই; কিন্তু ক্বাযা নামায, তেলাওয়াতের সজ্‌দা বা জানাযার নামায দুরুস্ত আছে এবং উদয়স্থান হইতে সূর্য এক নেযা পরিমাণ (আমাদের দৃষ্টিতে ৩/৪ হাত) উপরে না উঠা পর্যন্ত নফল, ক্বাযা ইত্যাদি কোন নামাযই দুরুস্ত নহে।

এইরূপে আছরের নামায পড়ার পর নফল নামায পড়া দুরুস্ত নহে; কিন্তু ক্বাযা, তেলাওয়াতে সজ্‌দা বা জানাযার নামায পড়া দুরুস্ত আছে। যখন সূর্যের রং পরিবর্তন হইয়া যায়, তখন হইতে অস্ত পর্যন্ত নফল, ক্বাযা ইত্যাদি কোন নামায পড়া দুরুস্ত নহে।

(এক নেযার আলামত—প্রথম উদয়কালে সূর্যের দিকে তাকাইলে চক্ষু ঝল্‌সাইবে না। তারপর যখনই চক্ষু ঝল্‌সাইতে থাকিবে তখনই নামায পড়া জায়েয হইবে, এই সময়কেই এক নেযা পরিমাণ বলে। (ঘড়ির হিসাবে ২৩ মিনিট কাল মকরূহ সময়।)

১০। **মাসআলা ঃ** কোন কারণবশতঃ ফজরের ফরযের পূর্বে সুন্নত পড়িতে না পারিলে, যেমন—সময় অভাবে ফরয ফউত হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি শুধু ফরয পড়িল আর সময় রহিল না, তাহা হইলে সূর্যোদয়ের পর সূর্য এক নেযা উপরে উঠিলে সুন্নত পড়িবে, তাহার পূর্বে পড়িবে না। (কিন্তু সাধারণ লোক যাহারা কাজ-কর্মে লিপ্ত হইয়া যায়, পরে আর পড়িবার সময় পায় না, তাহারা যদি ফরযের পরে পড়ে, তাহাদিগকে নিষেধ করা উচিত নহে।)

১১। **মাসআলা ঃ** ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পর কোন নফল নামায পড়া দুরুস্ত নহে। শুধু ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নত এবং দুই রাকা'আত ফরয ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায পড়া মকরূহ্। অবশ্য ক্বাযা নামায ও তেলাওয়াতের সজ্‌দা জায়েয আছে।

১২। **মাসআলা ঃ** ফজরের নামাযের মধ্যেই যদি সূর্য উদয় হয়, তবে ঐ নামায হয় না। সূর্য এক নেযা উপরে উঠার পর পুনঃ ক্বাযা পড়িতে হইবে। কিন্তু আছরের নামাযের মধ্যে যদি সূর্য অস্ত যায়, তবে নামায হইয়া যাইবে, ক্বাযা পড়িতে হইবে না।

১৩। **মাসআলা ঃ** এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া (এবং পরে দুনিয়ার কথাবার্তা) মকরূহ্। তাই নামায পড়িয়াই শোওয়া উচিত। একান্ত ওযরবশতঃ এশার পূর্বে ঘুমাইতে হইলে নামাযের জমা'আতের সময় উঠাইয়া দিবার জন্য কাহাকেও বলিয়া রাখিবে। যদি সে ওয়াদা করে, তবে নিদ্রা যাওয়া দুরুস্ত আছে। (নাবালেগ ছেলে-মেয়েরা নামায রোযা করিলে তাহারা তাহার ছওয়াব পাইবে এবং যে মুরব্বিগণ শিক্ষা দিবেন ও তাম্বীহ্ করিবেন তাঁহারাও ছওয়াব পাইবেন।)

বেহেশ্‌তী গওহার হইতেঃ

ইমামের সঙ্গে যে-ব্যক্তি নামায পড়ে তাহাকে 'মোক্তাদী' বলে। মোক্তাদী তিন প্রকার; যথা—মোদ্‌রেক, মাছ্‌বুক এবং লাহেক্ব।

যে আউয়াল হইতে আখের পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে নামায পড়ে, তাহাকে 'মোদ্‌রেক' বলে। যে প্রথমে এক বা একাধিক রাকা'আত পায় না, মাঝখানে জমা'আতে শরীক হয়, তাহাকে 'মছ্‌বুক' বলে। যে প্রথম হইতে ইমামের সঙ্গে শরীক থাকে, পরে কোন কারণে মাঝখানে বা শেষভাগে শরীক থাকিতে পারে না, তাহাকে 'লাহেক্ব' বলে।

১। মাসআলাঃ ফজরের নামায পুরুষগণ সব সময় ছোব্‌হে ছাদেকের পর পূর্ব আকাশ উত্তমরূপে ফর্সা হইয়া গেলে পড়িবে। এমন সময় নামায শুরু করিবে যাহাতে দুই রাকা'আতে ফাতেহা বাদে চল্লিশ আয়াত রীতিমত তরতীলের সঙ্গে পড়িয়া নামায শেষ করা যায় এবং যদি ঘটনাক্রমে নামায ফাছেদ হইয়া যায়, তবে যেন সূর্যোদয়ের পূর্বেই এরূপ তরতীলের সঙ্গে আবার চল্লিশ পঞ্চাশ আয়াত পড়িয়া নামায পড়া যায়। সূর্যোদয়ের এতখানি পূর্বে নামায শুরু করাই পুরুষগণের জন্য সর্বদা মোস্তাহাব ওয়াক্ত।

(আজকালকার ঘড়ির হিসাবে সূর্যোদয়ের পৌণে এক ঘন্টা কিংবা আধ ঘন্টা পূর্বে মোস্তাহাব ওয়াক্ত হয়;) কিন্তু হজ্জের পরদিন মোযদালেফার তারিখে ফজর নামায পুরুষগণের জন্যও ছোব্‌হে ছাদেক হওয়া মাত্রই অন্ধকার থাকিতে পড়া মোস্তাহাব এবং স্ত্রীলোকের জন্য সর্বদাই অন্ধকার থাকিতে পড়া মোস্তাহাব।

২। মাসআলাঃ জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত এবং যোহরের নামাযের ওয়াক্ত একই। শুধু এতটুকু ব্যবধান যে, যোহরের নামায গ্রীষ্মকালে কিছু দেরী করিয়া পড়া মোস্তাহাব; কিন্তু জুমু'আর নামায শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই আউয়াল ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব।

৩। মাসআলাঃ ঈদের নামাযের ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের পর সূর্যের কিরণ যখন এমন হয় যে, উহার দিকে চাওয়া যায় না, অর্থাৎ সূর্য আমাদের দেখা দৃষ্টে তিন চারিহাত উপরে উঠে, তখন হইতে ঈদের নামাযের ওয়াক্ত হয় এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে। ঈদুল ফেৎর, ঈদুল আয্‌হা উভয় নামাযই যথাসম্ভব জল্‌দি পড়া মুস্তাহাব, কিন্তু ঈদুল ফেৎর নামায ঈদুল আয্‌হা হইতে কিছু বিলম্বে পড়া উচিত।

৪। মাসআলাঃ জুমু'আ, ঈদ, কুছুফ, এস্তেস্কা বা হজ্জের খোৎবার জন্য যখন ইমাম দাঁড়ায়, তখন নফল নামায পড়া মকরূহ্‌। এইরূপে বিবাহের খোৎবা এবং কোরআন খতমের খোৎবা শুরু করার পরও নামায পড়া মকরূহ্‌।

৫। মাসআলাঃ যখন ফরয নামাযের তকবীর বলা হয়, তখন আর সুন্নত বা নফল নামায পড়া যাইবে না। তবে ফজরের সময় যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সুন্নত পড়িয়া অন্ততঃ ফরযের এক রাকা'আত ধরা যাইবে, কোন কোন আলেমের মতে তাশাহ্‌হুদে শরীক হওয়ার ভরসা থাকিলে (বারেন্দায় বা এক পার্শ্বে) সুন্নত পড়িলে মকরূহ্‌ হইবে না। অথবা যে সুন্নতে মুয়াক্কাদা শুরু করিয়াছে উহা পুরা করিয়া লইবে। (যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নতে মোয়াক্কাদা আগেই শুরু করিয়া থাকিলে, যদি তিন রাকা'আত পড়া হইয়া থাকে, তবে আর এক রাকা'আত পড়িয়া পূর্ণ করিবে। যদি দুই রাকা'আতের সময় জমা'আত শুরু হয়, তবুও চারি রাকা'আত পূর্ণ করা ভাল। দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইলে পর সুন্নতের ক্বাযা পড়িতে

হইবে। যদি নফল বা সুন্নতে যায়েদা (গায়ের মোয়াক্কাদা) শুরু করিয়া থাকে, তবে দুই রাকা'আতের পর সালাম ফিরাইয়া জমাতে দাখিল হইবে। (আর যদি ঐ ফরযই একা একা শুরু করিয়া থাকে, তবে তাহা ছাড়িয়া দিয়া জমা'আতে শামিল হইবে।)

৬। মাসআলা ঃ ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে নফল পড়া মকরূহ্, (তাহা ঈদ্‌গাহে হউক বা বাড়ীতে হউক বা মসজিদে হউক।) ঈদের নামাযের পরও ঈদগাহে নফল নামায পড়া মকরূহ্; বাড়ীতে বা মসজিদে মকরূহ্ নহে।

আযান

নামাযের সময় হইলে একজন লোক উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্‌র এবাদতের সময় হইয়াছে বলিয়া, মুছল্লীগণকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হইবার জন্য আহ্বান করে; এই আহ্বানকে 'আযান' বলে। যে আযান দেয়, তাহাকে 'মোয়ায্‌যিন' বলে। বিনা বেতনে আযান দেওয়ার ফযীলত অনেক বেশী।

এক হাদীসে আছে, যে আযান দিবে ও এক্কামত বলিবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া তাহাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করা হইবে। অন্য হাদীসে আছে, যে সাত বৎসর কাল বিনা বেতনে আযান দিবে, সে বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবে। আর এক হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে মোয়ায্‌যিনের মর্তবা এত বড় হইবে যে, সে যত লোকের ভিড়ের মধ্যেই হউক না কেন সকলের মাথার উপর দিয়া তাহার মাথা দেখা যাইবে।

যে কাজের যত বড় মর্তবা, তাহার দায়িত্বও তত বেশী হয়। তাই এক হাদীসে আছে—মোয়ায্‌যিন আমানতদার এবং ইমাম যিম্মাদার; অর্থাৎ, ওয়াক্ত না চিনিয়া আযান দিলে বা মিনারার উপর চড়িয়া লোকের বাড়ী-ঘরের দিকে নযর করিলে মোয়ায্‌যিন শক্ত গোনাহ্‌গার হইবে। আর নামাযের মধ্যে কোন ক্ষতি করিলে বা যাহেরী বাতেনী তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারীর সঙ্গে নামায না পড়িলে তাহার জন্য ইমাম দায়ী।

অন্য এক হাদীসে আছে, মোয়ায্‌যিনের আওয়ায যত দূর যাইবে তত দূরে জ্বিন, ইন্‌সান, আসমান, জমিন, বৃক্ষ, পশুপাখী সকলেই তাহার জন্য সাক্ষ্য দিবে। অতএব, যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে আযান দেওয়া উচিত।

(প্রিয় মুসলমান! এখন জানিতে পারিলেন যে, মোয়ায্‌যিনের কত বড় মর্তবা। তাহা হইবে না কেন? সে যে খোদার সরকারী চাপরাশী, সে দৈনিক পাঁচবার করিয়া আপনাদিগকে খোদার এবাদত করিবার জন্য সজাগ করে এবং খোদার দরবারে হাযির হইবার জন্য আহ্বান করে। সুতরাং বুঝিয়া লউন, আজকাল কোন কোন লোক যে মোয়ায্‌যিনকে দু'মুঠা ভাত দিয়া ঘৃণার চোখে দেখে এবং তাহাকে তাচ্ছিল্য করে বা কটু কথা বলে, তাহার কি ভীষণ পরিণাম হইবে। সে বদ-দো'আ করুক বা না করুক কিন্তু সে যখন সরকারী চাকর, স্বয়ং সরকারই তাহার পক্ষ হইতে বাদী হইয়া তাহার সহিত কেহ অন্যায় বা অপব্যবহার করিলে তাহার প্রতিশোধ লইবেন। এসব কাজ করিয়া আমার ভাই-বোনেরা যেন জানে-মালে ক্ষতিগ্রস্ত ও বালা-মুছীবতে গেরেফ্‌তার না হন, তাই সতর্ক বাণীটি লিখিয়া দিলাম।) —অনুবাদক

১। মাসআলা ঃ ওয়াক্ত হইবার পূর্বে আযান দিলে সে আযান ছহীহ্ নহে, পুনরায় আযান দিতে হইবে, তাহা ফজরের আযান হউক বা জুমু'আর আযান হউক (লোক জমা থাকুক বা না থাকুক।)

২। মাসআলা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে শ্রুত এবং বর্ণিত অবিকল আরবী শব্দগুলি ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার বা অন্য কোন ভাষায় আযান দিলে তাহা ছহীহ্ হইবে না—যদিও তদ্দ্বারা আযানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

৩। মাসআলা ঃ স্ত্রীজাতির জন্য আযান নাই। পুরুষেরাই আযান দিবে। স্ত্রীলোকের আযান দেওয়া নাজায়েয। (কেননা স্ত্রীলোকের উচ্চ শব্দ করা এবং পর-পুরুষকে শব্দ শুনান নিষেধ।) সুতরাং স্ত্রীলোক আযান দিলে পুরুষকে পুনরায় আযান দিতে হইবে। পুনরায় আযান না দিলে যেন বিনা আযানেই নামায পড়া হইল।

৪। মাসআলা ঃ পাগল বা অবুঝ বালক আযান দিলে সে আযান ছহীহ্ হইবে না, পুনঃ আযান দিতে হইবে ।

৫। মাসআলা ঃ আযান দেওয়ার সুন্নত তরীকা এই যে, মোয়ায্যিনের গোসলের দরকার থাকিলে গোসল করিয়া লইবে এবং ওযূ না থাকিলে ওযূ করিয়া লইবে, তারপর মসজিদের বাহিরে কিছু উঁচু জায়গায় কেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতের শাহাদত অঙ্গুলি দুই কানের ছিদ্রের মধ্যে রাখিয়া যথাসম্ভব উচ্চ শব্দে খোশ এল্‌হানের সহিত اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর—'আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ্ সমস্ত মহান হইতে মহান') বলিয়া শ্বাস ছাড়িবে এবং এতটুকু অপেক্ষা করিবে যাহাতে শ্রোতাগণ জওয়াব দিতে পারে তারপর আবার বলিবে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর) তারপর শ্বাস ছাড়িয়া দিবে। পরে বলিবে, اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আশ্‌হাদু আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্—'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।' শ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিবে, اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া দিবে। তারপর বলিবে, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্—'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌র বিধান জারি করিবার জন্য আল্লাহ্ মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন।') তারপর শ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিবে, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবে, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়্যা আলাছ্‌ছালাহ্—'আস, সকলে নামায পড়িতে আস।') তারপর শ্বাস ছাড়িয়া আবার ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবে, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া বাম দিকে মুখ করিয়া বলিবে, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়্যা আলাল ফালাহ—'আস, যে কাজ করিলে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে, যে কাজ করিলে তোমাদের জীবন সার্থক হইবে সেই কাজের দিকে ছুটিয়া আস।') তারপর শ্বাস ছাড়িয়া আবার বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবে, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া বলিবে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিবে। ফজরের আযানে দ্বিতীয়বার হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলার পর শ্বাস ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া একবার বলিবে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আছ্‌ছালাতু খায়রুম্‌মিনান্নাওম—নিদ্রা হইতে নামায উত্তম।) তারপর শ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিবে, اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ তারপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিয়া আযান শেষ করিবে। আযানের মধ্যে মোট ১৫টি বাক্য হইল এবং ফজরের আযানে মোট ১৭টি বাক্য হইল। গানের মত গাহিয়া বা উঁচু নীচু আওয়াযে আযান দিবে না। (যথাসম্ভব আওয়ায উচ্চ করিয়া

টানিয়া লম্বা করিয়া আযান দিবে; কিন্তু যেখানে আলিফ বা খাড়া যবর নাই, সেখানে টানিবে না; যেখানে আলিফ, খাড়া যবর বা মদ আছে সেখানে টানিবে। এসম্বন্ধে ওস্তাদের কাছে শিখিয়া লইবে। আওয়ায এত উচ্চ করিবে না বা এত লম্বা টানিবে না যে, নিজের জানে কষ্ট হয়। জুমু'আর ছানী আযান অপেক্ষাকৃত কম আওয়াযে হওয়া বাঞ্ছনীয়; কারণ, ঐ আযান দ্বারা শুধু উপস্থিত লোকদিগকে সতর্ক করা হয়।)

৬। **মাসআলা**ঃ এক্বামত এবং আযান একইরূপ। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। যথাঃ—(ক) আযান, নামায শুরু হওয়ার এতটুকু পূর্বে হওয়া আবশ্যক, যেন পার্শ্ববর্তী মুছল্লীগণ অনায়াসে স্বাভাবিকভাবে এস্তেঞ্জা, ওযূ শেষ করিয়া জমা'আতে আসিয়া যোগদান করিতে পারে। কিন্তু এক্বামত শুনা মাত্রই তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া কাতার সোজা করিতে হইবে। (খ) আযান মসজিদের বাহিরে দিতে হইবে, কিন্তু এক্বামত মসজিদের ভিতরে দিতে হইবে। তবে শুধু জুমু'আর ছানী আযান মসজিদের ভিতর হইবে। (গ) আযান যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হইবে, কিন্তু এক্বামত তত উচ্চৈঃস্বরে নহে, শুধু উপস্থিত ও নিকটবর্তী সকলে শুনিতে পায় এতটুকু উচ্চৈঃস্বরে বলাই যথেষ্ট। (ঘ) ফজরের আযানের মধ্যে দ্বিতীয়বার 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বলার পর দুইবার 'আছ্ছালাতু খাইরুম মিনান্নাওম' বলা হয় ; কিন্তু এক্বামতের মধ্যে উহা বলিতে হইবে না; বরং উহার পরিবর্তে পাঁচ ওয়াক্তের এক্বামতেই দ্বিতীয়বার 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার পর দুইবার 'ক্বাদ ক্বামাতিছ্ছালাহ' বলিতে হইবে। (ঙ) আযানের সময় আঙ্গুল দ্বারা কানের ছিদ্র বন্ধ করিতে হয়; কিন্তু এক্বামতে ইহার আবশ্যক নাই এবং 'হাইয়্যা আলাছ্ছালাহ্' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময় ডানে বামে মুখ ফিরাইবারও আবশ্যক নাই। তবে কোন কোন কিতাবে যে মুখ ফিরাইবার কথা লিখিয়াছে তাহা (অতি প্রকাণ্ড মসজিদ হইলে আবশ্যকবোধে করা যাইতে পারে) যরূরী নহে।

আযান ও এক্বামত

১। **মাসআলা**ঃ মুসাফির হউক বা মুক্বীম হউক, জমা'আত হউক বা একাই হউক, ওয়াক্তী নামাযই হউক বা ক্বাযা নামাযই হউক, সমস্ত 'ফরযে-আয়েন' নামাযের জন্য পুরুষদের একবার আযান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা (প্রায় ওয়াজিব তুল্য) কিন্তু জুমু'আর জন্য দুইবার আযান দেওয়া সুন্নত। —শামী ১ম জিল্দ ৩৫৭ পৃষ্ঠা

২। **মাসআলা**ঃ জেহাদ ইত্যাদি ধর্মীয় কোন কাজে লিপ্ত থাকাবশতঃ অথবা গায়ের এখ্তিয়ারী কোন কারণবশতঃ যদি সর্ব-সাধারণের নামায ক্বাযা হয়, তবে সেই ক্বাযা নামাযের জন্যও উচ্চৈঃস্বরেই আযান এক্বামত বলিতে হইবে। কিন্তু যদি নিজের আলস্য বা বে-খেয়ালি বশতঃ নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে (সেই ক্বাযা নামায চুপে চুপে পড়া উচিত। কাজেই) তাহার জন্য আযান এক্বামত কানে আঙ্গুল না দিয়া চুপে চুপেই বলিতে হইবে, যাহাতে অন্য লোকে না জানিতে পারে। কারণ, দ্বীনের কাজে অলসতা করা বা খেয়াল না রাখা গোনাহ্র কাজ এবং গোনাহ্র কাজ বা গোনাহ্র কথা লোকের নিকট প্রকাশ করা নিষেধ। যদি কয়েক ওয়াক্তের ক্বাযা নামায এক সঙ্গে পড়ে, তবে শুধু প্রথম ওয়াক্তের জন্য আযান দেওয়া সুন্নত, বাকী যে কয় ওয়াক্ত ঐ সময় এক সঙ্গে পড়িবে তাহার জন্য পৃথক পৃথক আযান দেওয়া সুন্নত নহে—মোস্তাহাব; তবে এক্বামত সব ওয়াক্তের জন্যই পৃথক পৃথক সুন্নত। —নূরুল ঈযাহ্

৩। **মাসআলা** ঃ (কতকগুলি লোক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া সফর করিলে ইহাকে কাফেলা বলে।) যদি কাফেলার সমস্ত লোক উপস্থিত থাকে, তবে তাহাদের জন্য আযান মোস্তাহাব, সুন্নতে মোয়াক্কাদা নহে। কিন্তু এক্কামত সব অবস্থাতেই সুন্নত। —দুর্‌রে মোখতার

৪। **মাসআলা** ঃ কারণবশতঃ বাড়ীতে একা বা জমা'আতে নামায পড়িলে আযান দেওয়া মোস্তাহাব। যদি মহল্লা বা গ্রামের মসজিদে আযান হইয়া থাকে, তবে তথায় নামায পড়া উচিত। কারণ, মহল্লার মসজিদ মহল্লাবাসীদের জন্য যথেষ্ট। যে পল্লীতে বা পাড়ায় মসজিদ আছে, সেখানে মসজিদে আযান এক্কামত ও জমা'আতের বন্দোবস্ত করা পাড়াবাসীর সকলের জন্য সুন্নতে মোআক্কাদা (প্রায় ওয়াজিব।) তাসত্ত্বেও যদি আযানের বন্দোবস্ত কেহ না করে, তবে সকলেই গোনাহ্‌গার হইবে। মাঠের মধ্যে বা বিলের মধ্যে মহল্লার মসজিদের আযানের আওয়ায শুনা গেলে মসজিদে আসিয়াই নামায পড়া উচিত, কিন্তু মসজিদে না আসিয়া যদি সেইখানে পড়ে, তবে আযান দেওয়া সুন্নত নহে, মোস্তাহাব, যদি আযানের আওয়ায শুনা না যায়, তবে আযান দিয়াই নামায পড়িতে হইবে; কিন্তু এক্কামত সব অবস্থায়ই সুন্নত।

৫। **মাসআলা** ঃ মহল্লার মসজিদে আযান এক্কামতের সহিত জমা'আত হইয়া থাকিলে পুনঃ তথায় আযান এক্কামত বলিয়া জমা'আত করা মকরূহ্। কিন্তু (পথের বা বাজারের মসজিদ হইলে বা) যে মসজিদে ইমাম, মোয়ায্‌যিন বা মুছল্লী নির্দিষ্ট নাই তথায় মকরূহ্ নহে; বরং উত্তম। (মহল্লার মসজিদেও যদি বিনা আযানে জমা'আত হইয়া থাকে, তবে পুনঃ জমা'আত হইলে আযান সহকারে পড়িবে এবং আযানদাতার জমা'আত ফওত হইয়া গেলে একা ঘরে আসিয়া আযান ব্যতীত শুধু এক্কামত আস্তে আস্তে অনুচ্চ শব্দে বলিয়া নামায পড়িবে।) —শামী

৬। **মাসআলা** ঃ যে স্থানে জুমু'আর শর্তাবলী পাওয়া যায় এবং জুমু'আর নামায পড়া হয়, সেখানে কোন ওযরবশতঃ বা বিনা ওযরে জুমু'আর আগে বা পরে যদি কেহ যোহরের নামায পড়ে, তবে আযান এক্কামত বলা মকরূহ্। —শামী

৭। **মাসআলা** ঃ একাই পড়ুক বা জমা'আতে পড়ুক—স্ত্রীলোকের আযান এক্কামত বলা মকরূহ্। —দুর্‌রে মোখতার

৮। **মাসআলা** ঃ ফরযে-আয়েন ব্যতীত অন্য কোন নামাযের জন্য আযান বা এক্কামত নাই—ফরযে কেফায়াই হউক, যেমন জানাযার নামায, বা ওয়াজিব নামাযই হউক, যেমন, বেৎর এবং ঈদের নামায বা নফল হউক, যেমন, কুছুফ, খুছুফ, এশ্‌রাক, এস্তেস্কা এবং তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নামায। —আলমগীরী

৯। **মাসআলা** ঃ পুরুষ হউক, স্ত্রী হউক, পাক হউক, নাপাক হউক, যে কেহ আযানের আওয়ায শুনিবে তাহার জন্য আযানের জওয়াব দেওয়া মোস্তাহাব, কেহ কেহ ওয়াজিবও বলিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ মোস্তাহাব কওলকেই প্রাধান্য (তরজীহ্) দিয়াছেন! (কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আযানের জওয়াব দুই প্রকার; [১ম] মৌখিক জওয়াব দেওয়া এবং [২য়] ডাকে সাড়া দিয়া মসজিদের জমা'আতে হাযির হইয়া কার্যতঃ জওয়াব দেওয়া। মৌখিক জওয়াব মোস্তাহাব, কিন্তু কার্যতঃ জওয়াব দেওয়া অর্থাৎ, ডাকে সাড়া দিয়া মসজিদে জমা'আতে হাযির হওয়া ওয়াজিব।) এখানে মৌখিক জওয়াবের কথাই বলা হইতেছে। মৌখিক জওয়াবের নিয়ম এই যে, মোয়ায্‌যিন যে শব্দটি বলিবে শ্রোতাগণ সেই শব্দটি বলিবে। কিন্তু মোয়ায্‌যিন যখন 'হাইয়্যা আলাছ্‌ছালাহ্' এবং 'হাইয়্যা আলাল্‌ফালাহ্' বলিবে, তখন শ্রোতাগণ বলিবে,

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ এবং ফজরের আযানে মোয়ায্যিন যখন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলিবে, তখন শ্রোতা বলিবে, صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ আযান শেষ হইলে সকলে একবার দুরূদ শরীফ এবং নিম্নের দো'আটি পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

১০। **মাসআলাঃ** জুমু'আর প্রথম আযান হওয়ামাত্রই সমস্ত কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজিব। ঐ সময় বেচা-কেনা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়া হারাম।

১১। মাসআলাঃ এক্বামতের জওয়াব দেওয়াও মোস্তাহাব, ওয়াজিব নহে। এক্বামতের জওয়াবও আযানের জওয়াবের মত; তবে 'ক্বাদ ক্বামাতিছ্ছালাহ' শুনিয়া শ্রোতা বলিবে, اقامها الله وادامها 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা'।

১২। মাসআলাঃ আট অবস্থায় আযানের জওয়াব দেওয়া উচিত নহে। ১। নামাযের অবস্থায়। ২। খোৎবা শুনার অবস্থায়—তাহা যে কোন খোৎবা হউক। ৩-৪। হায়েয নেফাসের অবস্থায়। ৫। দ্বীনি-এল্‌ম বা শরীঅতের মাসআলা-মাসায়েল শিখিবার বা শিক্ষা দিবার সময়। ৬। স্ত্রী-সহবাস কালে। ৭। পেশাব-পায়খানার সময়। ৮। খানা খাইবার সময়। যদি আযান শেষ হইয়া বেশীক্ষণ না হইয়া থাকে, তবে খাওয়ার কাজ সারিয়া তারপর জওয়াব দিবে, কিন্তু বেশীক্ষণ হইয়া গেলে আর জওয়াব দিবে না।

আযান ও এক্বামতের সুন্নত ও মোস্তাহাব

আযান ও এক্বামতের সুন্নত দুই প্রকার। কোন কোন সুন্নত মোয়ায্যিনের সহিত সংশ্লিষ্ট, আর কোনটা আযান ও এক্বামতের সহিত সংশ্লিষ্ট। অতএব, প্রথমে ৫ নং পর্যন্ত মোয়ায্যিনের সুন্নত বর্ণনা করিব, তারপর আযানের সুন্নত বর্ণনা করিব।

১। **মাসআলাঃ** মোয়ায্যিন পুরুষ হওয়া চাই, স্ত্রীলোকের আযান মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। মেয়েলোক আযান দিলে তাহা দোহ্‌রাইতে হইবে, কিন্তু এক্বামত দোহ্‌রাইবে না, কারণ শরীঅতে এক্বামত দোহ্‌রাইবার হুকুম নাই। তবে আযান দোহ্‌রাইবার হুকুম আছে।

২। **মাসআলাঃ** মোয়ায্যিন সজ্ঞান পুরুষ হইতে হইবে। পাগল, মাথা খারাপ বা অবুঝ ছেলের আযান মকরূহ্। তাহাদের আযান দোহ্‌রাইতে হইবে, এক্বামত দোহ্‌রাইবে না।

৩। **মাসআলাঃ** মোয়ায্যিনের জরুরী মাসআলা-মাসায়েল এবং নামাযের ওয়াক্তগুলি জানা থাকা চাই। অন্যথায় সে আযানের পূর্ণ ছওয়াব পাইবে না।

৪। **মাসআলাঃ** মোয়ায্যিনকে দ্বীনদার পরহেযগার হইতে হইবে এবং কে জামা'আতে আসিল কে না আসিল, সে বিষয়ে তাহার তদন্ত ও তাম্বীহ্ রাখা চাই—যদি ফেৎনার আশংকা না থাকে।

৫। **মাসআলাঃ** যাহার আওয়ায বড় তাহাকেই মোয়ায্যিন নিযুক্ত করা উচিত।

৬। **মাসআলাঃ** মসজিদের বাহিরে উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া আযান দিবে, এক্বামত মসজিদের ভিতরে দিবে। মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মকরূহ্ তান্‌যিহী। কিন্তু জুমু'আর ছানী আযান

মসজিদের ভিতরে মিম্বরের সামনে দেওয়া মকরূহ্ নহে। ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের যমানা হইতে বরাবর সমস্ত ইসলামী শহরে মসজিদের ভিতর মিম্বরের সামনে দাঁড়াইয়া জুমু'আর ছানী আযান হইয়া আসিতেছে। (অধুনা এল্‌মে-দীন কমিয়া যাওয়ায় কোন কোন লোক না বুঝিয়া বলিতেছে যে, জুমু'আর ছানী আযান মসজিদের ভিতরে দেওয়া বেদ'আত। তাহাদের কথার দিকে ভ্রুক্ষেপও করার প্রয়োজন নাই।)

৭। **মাসআলা ঃ** আযান দাঁড়াইয়া দিতে হইবে। বসিয়া আযান দেওয়া মকরূহ্। বসিয়া আযান দেওয়া হইলে পুনরায় আযান দিতে হইবে। (তবে যদি কোন মাযূর, বিমার লোক শুধু নিজের নামাযের জন্য বসিয়া বসিয়া আযান দেয়, তাহাতে দোষ নাই।) অবশ্য যদি কোন মোসাফির, আরোহী কিম্বা মুকীম ব্যক্তি শুধু নিজের নামাযের জন্য বসিয়া আযান দেয়, তবে পুনরায় আযান দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** আযান যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে দেওয়া দরকার। যদি কেহ শুধু নিজের নামাযের জন্য আযান দেয়, তবে সে আস্তে আস্তে আযান দিতে পারে, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে আযান দিলে বেশী ছওয়াব হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** আযান দেওয়ার সময় দুই শাহাদত আঙ্গুলের দ্বারা দুই কানের ছিদ্র বন্ধ করা মোস্তাহাব। (যেহেতু কানের ছিদ্র বন্ধ করিলে আওয়ায বড় করা সহজ হয়।)

১০। **মাসআলা ঃ** আযানের শব্দগুলি টানিয়া ও থামিয়া থামিয়া বলা এবং এক্কামতের শব্দগুলি জল্‌দী জল্‌দী বলা সুন্নত অর্থাৎ আযানের তকবীরের মধ্যে প্রত্যেক দুই তকবীরের পর এতটুকু সময় চুপ করিয়া থাকিবে যেন শ্রোতা তাহার জওয়াব দিতে পারে। তকবীর ব্যতীত অন্যান্য শব্দের প্রত্যেক শব্দের পর এই পরিমাণ চুপ থাকিয়া পরে অপর শব্দ বলিবে, যদি কোন কারণ বশতঃ আযানের শব্দগুলি থামিয়া থামিয়া না বলে, তবে পুনরায় আযান দেওয়া মোস্তাহাব, আর যদি এক্কামতের শব্দগুলি জল্‌দী না বলিয়া থামিয়া থামিয়া বলে, তবে পুনরায় এক্কামত বলা মোস্তাহাব নহে।

১১। **মাসআলা ঃ** আযানের মধ্যে 'হাইয়্যা আলাছ্‌ছালাহ্' বলিবার সময় ডান দিকে এবং 'হাইয়্যাআলাল ফালাহ্' বলিবার সময় বাম দিকে মুখ ফিরান সুন্নত তাহা নামাযের আযান হউক বা অন্য আযান হউক, কিন্তু বুক এবং পা ঘুরাইবে না।

১২। **মাসআলা ঃ** (যদি আরোহী না হয়, তবে) আযান এবং এক্কামত বলিবার সময় ক্বেবলার দিকে মুখ রাখা সুন্নত; অন্য দিকে মুখ করা মকরূহ্ তান্‌যিহী।

১৩। **মাসআলা ঃ** আযান দিবার সময় হদসে আক্‌বর হইতে পাক হওয়া সুন্নত। উভয় হদস হইতে পাক হওয়া মোস্তাহাব, বে-গোসল অবস্থায় আযান দেওয়া মক্‌রূহ্ তাহ্‌রীমী। যদি কেহ বে-গোসল অবস্থায় আযান দেয়, তবে আযান দোহ্‌রাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু বে-ওযূ অবস্থায় আযান দিলে তাহা দোহ্‌রাইতে হইবে না। বে-গোসল ও বে-ওযূ অবস্থায় এক্কামত বলা মকরূহ তাহ্‌রীমী।

১৪। **মাসআলা ঃ** আযান বা এক্কামতের শব্দগুলির মধ্যে যে তরতীব লেখা হইয়াছে, সেই তরতীব ঠিক রাখা সুন্নত। যদি কেহ পরের শব্দ আগে বলিয়া ফেলে, তবে সম্পূর্ণ আযান দোহ্‌রাইতে হইবে না শুধু যে শব্দটি ছাড়িয়া দিয়াছে সেইটি বলিয়া তারপর তরতীব অনুসারে আযান দিবে। যেমন, যদি কেহ اشهد ان لا اله الا الله ছাড়িয়া اشهد ان محمدا رسول الله

বলিয়া ফেলে, তবে স্মরণ আসা মাত্র اشهد ان لا اله الا الله বলিবে এবং তারপর আবার اشهد ان محمدا رسول الله বলিবে, বা যদি কেহ حى على الصلوة না বলিয়া حى على الفلاح বলিয়া ফেলে, স্মরণ আসা মাত্র حى على الصلوة বলিবে এবং পরে حى على الفلاح আবার বলিবে, বা যদি কেহ الصلوة خير من النوم না বলিয়া الله اكبر বলিয়া ফেলে, তবে স্মরণ আসা মাত্র الصلوة خير من النوم বলিয়া আবার الله اكبر বলিবে। কিন্তু যদি আযান শেষ হওয়ার অনেকক্ষণ পরে ভুল মনে আসে বা কেহ স্মরণ করাইয়া দেয়, তবে আর আযান দোহ্‌রাইবার দরকার নাই।

১৫। **মাসআলা ঃ** আযান বা এক্কামত বলিবার সময় মোয়ায্‌যিন ত কথা বলিবেই না, (যাহারা আযান এক্কামত শুনে তাহাদেরও সব কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আযান এক্কামত শ্রবণ এবং আযান ও এক্কামতের জওয়াব দেওয়া উচিত,) এমন কি ছালাম দেওয়া লওয়াও অনুচিত।

যদি মুয়ায্‌যিন আযান ও এক্কামতের মাঝখানে অধিক কথা বলে, তবে পুনরায় আযান দিবে, পুনরায় এক্কামত বলিবে না।

বিভিন্ন মাসআলা

১। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ আযানের জওয়াব ভুলবশতঃ কিংবা স্বেচ্ছায় সঙ্গে সঙ্গে না দিয়া থাকে, তবে স্মরণ হইলে কিংবা ইচ্ছা করিলে আযান শেষ হইয়া যাওয়ার পর অনেক সময় চলিয়া না গিয়া থাকিলে জওয়াব দিতে পারে, নতুবা নহে।

২। **মাসআলা ঃ** এক্কামত বলার পর যদি অনেক সময় চলিয়া যায় অথচ জমা'আত শুরু না হয়, তবে পুনরায় এক্কামত বলিতে হইবে; কিন্তু অল্প সময় দেরী করিলে কোন ক্ষতি নাই; যদি ফজরের এক্কামত হইয়া যায় এবং ইমাম সুন্নত পড়া শুরু করে, তবে এই ব্যবধান ধরা হইবে না এবং এক্কামত দোহ্‌রাইতে হইবে না; কিন্তু যদি নামায ব্যতীত খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি অন্য কোন কাজ করে, তবে তাহাকে বেশী ব্যবধান ধরা হইবে এবং এক্কামত দোহ্‌রাইতে হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** আযান দিবার সময় আযান পূর্ণ হইবার পূর্বে যদি মোয়ায্‌যিন মরিয়া যায়, বা বেহুশ হইয়া যায়, বা আওয়ায বন্ধ হইয়া যায়, বা এমনভাবে ভুলিয়া যায় যে, নিজেরও মনে না আসে এবং অন্য কেহও বলিয়া না দেয়, বা পেশাব-পায়খানার চাপে বা গোসলের হাজতে আযান মাঝখানে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়, তবে এইসব অবস্থায় পুনঃ আযান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা।

৪। **মাসআলা ঃ** আযান বা এক্কামত বলিবার সময় ঘটনাক্রমে যদি ওযূ টুটিয়া যায়, তবে আযান এক্কামত পূর্ণ করিয়াই ওযূ করিতে যাওয়া উত্তম।

৫। **মাসআলা ঃ** এক মোয়ায্‌যিনের দুই মসজিদে আযান দেওয়া মক্‌রূহ্‌, যে মসজিদে ফরয নামায পড়িবে সেই মসজিদেই আযান দিবে।

৬। **মাসআলা ঃ** যে আযান দিবে এক্কামত বলার (ছওয়াব হাছিল করা)-ও তাহারই হক (প্রাপ্য)। অবশ্য সে যদি উপস্থিত না থাকে বা অন্য কাহাকেও এক্কামত বলার এজাযত দিয়া দেয়, তবে অন্য লোকেও বলিতে পারে।

৭। **মাসআলা ঃ** এক মসজিদে এক সময়ে কয়েক জনে মিলিয়া আযান দেওয়াও জায়েয আছে।

৮। **মাসআলা ঃ** এক্কামত যে জাগায় দাঁড়াইয়া শুরু করিবে সেইখানেই শেষ করিবে।

৯। মাসআলা ঃ আযান বা এক্বামত ছহীহ্ হওয়ার জন্য নিয়্যত শর্ত নহে বটে, কিন্তু নিয়্যত ব্যতিরেকে ছওয়াব পাইবে না। নিয়্যত এই ঃ—দেলে দেলে চিন্তা করিবে যে, আমি এই আযান বা এক্বামত শুধু ছওয়াবের নিয়্যতে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বলিতেছি, এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোন মকছুদ নাই। —গওহার

(মাসআলা ঃ ইমাম এবং মোয়ায্‌যিন যদি বেতন বা পারিশ্রমিক না লয়, তবে ইহা অতি উত্তম। কিন্তু যদি বিনা বেতনে না পাওয়া যায়, তবে বেতন দিয়া ভরণ-পোষণ দিয়া ইমাম মোয়ায্‌যিন মোকার্‌রার করা মহল্লাবাসী সকলের কর্তব্য।) —অনুবাদক

নামাযের আহ্‌কাম বা শর্ত

(নামায ছহীহ্ হইবার জন্য সাতটি শর্ত। যথা ঃ ১। শরীর পাক হওয়া, ২। কাপড় পাক হওয়া, ৩। নামাযের জায়গা পাক হওয়া, ৪। সতর ঢাকা, ৫। ক্বেবলামুখী হওয়া, ৬। ওয়াক্ত অনুসারে নামায পড়া, ৭। নামাযের নিয়্যত করা।) —অনুবাদক

১। মাসআলা ঃ নামায শুরু করিবার পূর্বে কতকগুলি কাজ ওয়াজিব ১। ওযূ না থাকিলে ওযূ করিয়া লইবে, গোছলের হাজত থাকিলে গোছল করিয়া লইবে, ২। শরীরে বা কাপড়ে যদি কোন নাজাছাত থাকে, তবে তাহা পাক করিয়া লইবে, ৩। যে জায়গায় (বিছানায়, মাটিতে বা কাপড়ের উপর) নামায পড়িবে তাহাও পাক হওয়া চাই, ৪। সতর ঢাকা, (পুরুষের ফরয সতর নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত; কিন্তু কাপড় থাকিলে পায়জামা, লুঙ্গী, কোর্তা ইত্যাদি পরিয়া নামায পড়া সুন্নত। স্ত্রীলোকের সতর হাতের কব্জি এবং পায়ের পাতা ব্যতিরেকে মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর,) ৫। যে নামায পড়িবে, সে মনে মনে চিন্তা করিয়া খেয়াল করিয়া লইবে যে, অমুক নামায, যেমন, 'ফজরের দুই রাকা'আত নামায আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের জন্য, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পড়িতেছি'। ৬। ওয়াক্ত হইলে নামায পড়িবে। (ওয়াক্ত হইবার পূর্বে নামায পড়িলে নামায হইবে না।) এই ছয়টি বিষয় নামাযের জন্য শর্ত নির্ধারিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্য হইতে যদি একটিও ছুটিয়া যায়, তবে নামায হইবে না। —নূরুল ঈযাহ্

২। মাসআলা ঃ যে পাতলা কাপড়ে শরীর দেখা যায়, সেইরূপ পাতলা কাপড় পরিয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না। যেমন, ফিনফিনে পাতলা এবং জালিদার কাপড়ের তৈরী উড়না পরিয়া নামায পড়া (দুরুস্ত নহে)। —বাহ্‌রুর রায়েক

৩। মাসআলা ঃ নামায শুরু করিবার সময় যদি সতরের মধ্যে যতগুলি অঙ্গ আছে, তাহার কোন এক অঙ্গে এক চতুর্থাংশ খোলা থাকে, তবে নামাযের শুরুই দুরুস্ত হইবে না। ঐ জায়গা ঢাকিয়া পুনরায় শুরু করিতে হইবে। যদি শুরু করিবার সময় ঢাকা থাকে, কিন্তু পরে নামাযের মধ্যে খুলিয়া গিয়া এতটুকু সময় খোলা থাকে যে, তাহাতে তিনবার 'ছোব্‌হানাল্লাহ্' বলা যায়, তবে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে; পুনঃ নামায পড়িতে হইবে; কিন্তু যদি খোলামাত্রই তৎক্ষণাৎ ঢাকিয়া লওয়া হয়, তবে নামায হইয়া যাইবে। এই হইল নিয়ম। এই নিয়মানুসারে স্ত্রীলোকের পায়ের নলার এক চতুর্থাংশ, হাতের বাজুর এক চতুর্থাংশ, এক কানের চারি ভাগের এক ভাগ, মাথার চারি ভাগের এক ভাগ, চুলের এক চতুর্থাংশ, পেট, পিঠ, ঘাড়, বুক বা স্তনের এক চতুর্থাংশ খোলা থাকিলে নামায হইবে না। (আর গুপ্ত অঙ্গসমূহের কোন একটির যেমন রানের এক চতুর্থাংশ খোলা থাকিলে স্ত্রী বা পুরুষ কাহারও নামায আদায় হইবে না।) —বাহ্‌রুর রায়েক

৪। **মাসআলা ঃ** নাবালেগা মেয়ে নামায পড়িবার সময় যদি তাহার মাথার ঘোমটা সরিয়া মাথা খুলিয়া যায়, তবে ইহাতে তাহার নামায নষ্ট হইবে না।
(কিন্তু বালেগা মেয়ে হইলে নামায নষ্ট হইবে।) —বাহ্‌র

৫। **মাসআলা ঃ** যদি শরীরের বা কাপড়ের কিছু অংশ নাপাক থাকে এবং ঘটনাক্রমে তাহা ধুইবার জন্য পানি কোথাও পাওয়া না যায়, তবে ঐ নাপাক শরীর বা নাপাক কাপড় লইয়াই নামায পড়িবে, তবুও নামায ছাড়িবে না। —কানযুদ্দাকায়েক

৬। **মাসআলা ঃ** কাহারও যদি সমস্ত কাপড় নাপাক থাকে বা চারি ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম পাক থাকে (এবং ধুইবার জন্য পানি কোথাও পাওয়া না যায়,) তবে তাহার জন্য ঐ নাপাক কাপড় লইয়া নামায পড়া দুরুস্ত আছে। যদিও ঐ কাপড় খুলিয়া রাখিয়া তখন উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়া দুরুস্ত আছে কিন্তু নাপাক কাপড় পরিয়াই নামায পড়া উত্তম; (কেননা, তাহাতে ওযরবশতঃ সতর ঢাকার ফরয আদায় হইল।) যদি এক চতুর্থাংশ বা বেশী পাক থাকে, তবে কাপড় খুলিয়া রাখা জায়েয হইবে না, ঐ কাপড়েই নামায পড়া ওয়াজিব।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও নিকট মোটেই কাপড় না থাকে, তবে বিবস্ত্র অবস্থায়ই নামায পড়িবে, কিন্তু এমন স্থানে নামায পড়িবে যেন কেহ দেখিতে না পায় এবং দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে না, বসিয়া পড়িবে এবং ইশারায় রুকূ সজ্‌দা করিবে, আর যদি দাঁড়াইয়া নামায পড়ে এবং রুকূ সজ্‌দা করে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। নামায হইয়া যাইবে, তবে বসিয়া পড়া ভাল।

৮। **মাসআলা ঃ** অন্য কোথাও পানি পাওয়া যায় না, সামান্য কতটুকু পানি কাছে আছে যে, ওযূ করিলে নাপাকী ধোয়া যায় না, আর নাপাকী ধুইলে ওযূ করা যায় না। এমতাবস্থায় ঐ পানি দ্বারা নাপাকী ধুইবে এবং পরে ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবে।

(**মাসআলা ঃ** নাপাক কাপড় ধুইয়া পাক করিলে যখন তখন সেই ভিজা কাপড়ে নামায দুরুস্ত আছে।)

বেহেশ্‌তী গওহর হইতে

১। **মাসআলা ঃ** যদি একখানা কাপড়ের এক কোণ নাপাক হয় এবং অন্য কোণ পরিয়া নামায পড়িতে চায়, তবে দেখিতে হইবে যে, নামায পড়িবার সময় নাপাক কোণ টান লাগিয়া নড়েচড়ে কি না? যদি নাপাক কোণ নড়েচড়ে, তবে নামায হইবে না, না নড়িলে আদায় হইয়া যাইবে। নামায পড়িবার কালে নামাযীর হাতে, জেবে বা কাঁধে কোন নাপাক জিনিস থাকিলে তাহার নামায হইবে না। কিন্তু যদি কোন নাপাক জীব নিজে আসিয়া তাহার শরীরে লাগে বা বসে অথচ তাহার শরীরে বা কাপড়ে কোন নাপাকী না লাগে, তবে তাহাতে তাহার নামায নষ্ট হইবে না। অবশ্য নাপাকী লাগিলে নামায বিষ্ট হইয়া যাইবে। যেমন, কেহ নামায পড়িতেছে হঠাৎ একটি কুকুর তাহার গায়ে লাগিয়া গেল, অথবা তাহার শিশু-সন্তান কোলে বা কাঁধে চড়িয়া বসিল। এমতাবস্থায় যদি কুকুর বা শিশুর গায়ে শুষ্ক নাপাকী (প্রস্রাবাদি) থাকে, তবে তাহাতে নামায নষ্ট হইবে না, কিন্তু যদি ভিজা নাপাকী থাকে এবং তাহা নামাযীর গায়ে বা কাপড়ে লাগে, তবে নামায নষ্ট হইবে। যদি শিশুর গায়ে প্রস্রাব লাগিয়া বা বমি লাগিয়া তাহা ধুইবার পূর্বে শুকাইয়া যায়, সেই শিশুকে কোলে বা কাঁধে লইয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না। এইরূপ যদি কোন নাপাক বস্তু শিশিতে বা তা'বিযে মুখ বন্ধ করিয়া সঙ্গে লইয়া নামায পড়ে, তবুও নামায হইবে না; কিন্তু

নাপাক বস্তু স্বীয় জন্মস্থানে থাকিলে তাহা (যেমন, একটি অভগ্ন পচা ডিম) সঙ্গে লইয়া নামায পড়িলে নামায হইয়া যাইবে; কেননা, এই নাপাকী ঐরূপ যেমন মানুষের পেটেও নাপাকী থাকে।

২। **মাসআলা ঃ** নামায পড়িবার জায়গাও নাজাছাত হইতে পাক হইতে হইবে (তাহা মাটিই হউক, বা বিছানাই হউক)। কিন্তু নামাযের জায়গার অর্থ দুই পা সজ্‌দার সময় দুই হাঁটু, দুই হাতের তালু, কপাল এবং নাক রাখিবার জায়গা।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি শুধু এক পা রাখিবার জায়গা পাক থাকে, নামাযের সময় অপর পা উঠাইয়া রাখে, তবুও নামায হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** কোন কাপড় বা বিছানার উপর নামায পড়িলে যদি ঐ কাপড় বা বিছানার সব জায়গা নাপাক থাকে শুধু উপরোক্ত পরিমাণ পাক থাকে, তবুও নামায হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** কোন নাপাক মাটি বা বিছানার উপর পাক কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর নামায পড়িতে হইলে ঐ কাপড় পাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শর্ত আছে যে, উহা (মোটা হওয়া চাই) এত চিকন না হয়, যাহাতে নীচের জিনিস দেখা যায়।

৬। **মাসআলা ঃ** যদি নামায পড়ার সময় নামাযীর কাপড় কোন নাপাক স্থানে গিয়া পড়ে, তবে কোন ক্ষতি নাই (যদি নাপাকী না লাগে।)

৭। **মাসআলা ঃ** নামায পড়িবার সময় যদি কোন অন্য লোকের কারণে ওযরবশতঃ সতর ঢাকিতে না পারে, তবে না ঢাকা অবস্থাতেই নামায পড়িবে। (যেমন, জেলের ভিতর পুলিশ সতর ঢাকা পরিমাণ কাপড় না দেয় কিংবা কোন যালেম কাপড় পরিলে হত্যার ভয় দেখায়, তবে ঐ অবস্থাতেও নামায ছাড়া যাইবে না; নামায পড়িতেই হইবে; কিন্তু এই কারণ চলিয়া গেলে পরে ঐ নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। আর যদি সতর ঢাকিতে না পারার কারণের উৎপত্তি কোন লোকের পক্ষ হইতে না হয় যেমন; তাহার কাছে কাপড় মাত্রও নাই, তবুও উলঙ্গ অবস্থাতেই নামায পড়িতে হইবে, পরে কাপড় পাইলে ঐ নামায পুনরায় পড়ার আবশ্যক নাই। —বাহর

৮। **মাসআলা ঃ** কাহারও নিকট শুধু এতটুকু কাপড় আছে যে, তাহার দ্বারা সতর ঢাকিতে পারে, অথবা সম্পূর্ণ নাপাক জায়গার উপর বিছাইয়া তাহার উপর নামায পড়িতে পারে, এমতাবস্থায় তাহার কাপড়-টুক্‌রা দ্বারা সতর ঢাকিতে হইবে এবং একান্ত যদি পাক জায়গা না পায়, তবে সেই নাপাক জায়গায়ই পড়িবে। নামায ছাড়িতে পারিবে না বা সতর খুলিতে পারিবে না।

৯, ১০। **মাসআলা ঃ** কেহ হয়ত যোহরের নামায পড়িয়া পরে জানিতে পাড়িল, যে সময় নামায পড়িয়াছে সে সময় যোহরের ওয়াক্ত ছিল না, আছরের ওয়াক্ত হইয়া গিয়াছিল, তবে তাহার আর দ্বিতীয়বার কাযা পড়িতে হইবে না। যে নামায পড়িয়াছে উহাই কাযার মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ নামায পড়িয়া পরে জানিতে পারে যে, ওয়াক্ত হইবার পূর্বেই নামায পড়িয়াছে, তবে সেই নামায আদৌ হইবে না, পুনরায় পড়িতে হইবে। আর যদি কেহ জ্ঞাতসারে ওয়াক্ত হইবার পূর্বেই নামায পড়িয়া থাকে, তাহাতে তো নামায হইবেই না।

১১। **মাসআলা ঃ** নামাযের নিয়্যত ফরয এবং শর্ত বটে, কিন্তু মৌখিক বলার আবশ্যক নাই। মনে মনে এতটুকু খেয়াল রাখিবে যে, আমি আজিকার যোহরের ফরয নামায পড়িতেছি। সুন্নত হইলে খেয়াল করিবে যে, যোহরের সুন্নত পড়িতেছি। এতটুকু খেয়াল করিয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া হাত বাঁধিবে। ইহাতেই নামায হইয়া যাইবে। সাধারণের মধ্যে যে লম্বা চওড়া নিয়্যত মশহুর আছে, উহা বলার কোন প্রয়োজন নাই। (তবে বুযুর্গানে দ্বীন আরবী নিয়্যত পছন্দ

করিয়াছেন ; তাই আরবীতে নিয়্যত করিতে পারিলে ভাল। নিম্নে আরবী নিয়্যত লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল কিতাবে নিয়্যত লিখা নাই। মুখে বলিলে মন ঠিক রাখা যায়, তাই আরবী ও বাংলা উভয় নিয়্যত লিখা হইল। ইচ্ছামত শিখিয়া লইবে।) —অনুবাদক

ফজরের সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নত নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

ফজরের ফরয নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ফজরের দুই রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আল্লাহ্‌র জন্য যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

যোহরের ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللهُ اَكْبَرُ ○

"আমি যোহরের চারি রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

কছর নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضِ الْمُسَافِرِ فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللهُ اَكْبَرُ ○

"আমি যোহরের দুই রাকা'আত ফরয কছর নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

যোহরের পর দুই রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللهُ اَكْبَرُ ○

"আমি যোহরের দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

টিকা

১ 'আল্লাহু আকবর' নিয়্যতের অংশ নহে ইহা নামাযের অংশ।

তাহিয়্যাতুল ওযূ, তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং অন্যান্য যাবতীয় নফল (অতিরিক্ত) নামাযের নিয়্যতঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوُضُوْءِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত নামায পড়িতেছি।"

জুমু'আর প্রথম চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি ক্বাবলাল জুমু'আর চারি রাকা'আত সুন্নত নামাযের নিয়্যত করিতেছি।"

জুমু'আর ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

যখন ইমামের সঙ্গে জমা'আতের নামায পড়িবে তখন সব জায়গায় اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ 'এই ইমামের পিছনে এক্‌তেদা করিলাম' শব্দটি বাড়াইয়া বলিবে; যেমন 'আমি এই ইমামের পিছে জুমু'আর দুই রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।

জুমু'আর পরে চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি বা'দাল জুমু'আর চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত করিলাম।"

জুমু'আর পরে দুই রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْوَقْتِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি জুমু'আর দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িতেছি।"

আছরের সুন্নতের নিয়্যত নফলেরই মত।

আছরের ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আছরের চারি রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

মাগরিবের ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللهُ اَكْبَرُ ○

"আমি মাগরিবের তিন রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

মাগরিবের সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللهُ اَكْبَرُ ○

"মাগরিবের দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

আউয়াবীনের নিয়্যত নফলেরই মত এবং এ'শার পূর্ববর্তী সুন্নতের নিয়্যতও নফলেরই মত।

এশার চারি রাকা'আত ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللهُ اَكْبَرُ ○

"এশার চারি রাকা'আত ফরয নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

এশার পরে দুই রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللهُ اَكْبَرُ ○

"এশার দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

বেৎরের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللهُ اَكْبَرُ ○

"বেৎরের তিন রাকা'আত ওয়াজিব নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

তাহাজ্জুদ, এশ্‌রাক, চাশ্‌ত প্রভৃতির নিয়্যত নফলেরই মত; অর্থাৎ—'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত নামায পড়িতেছি।'

তারাবীহ্‌র নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللهُ اَكْبَرُ ○

"তারাবীহ্‌র দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

ঈদুল ফেৎর নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبَاتٍ وَّاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"ওয়াজিব ছয় তকবীরসহ দুই রাকা'আত ঈদুল ফেৎর নামাযের নিয়্যত করিলাম।

ঈদুল আয্‌হার নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبَاتٍ وَّاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"ওয়াজিব ছয় তকবীরসহ দুই রাকা'আত ঈদুল আযহার নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

ক্বাযা নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَوْتِ الْفَجْرِ الْفَائِتَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"ফজরের দুই রাকা'আত ফউত নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

কেহ কেহ আরবী নিয়্যত মুখস্থ করিতে পারে না বলিয়া নামাযই পড়ে না। ইহা তাহাদের মস্ত বড় ভুল। কেননা, পূর্বেই বলিয়াছি যে, নিয়্যত গদ-বাঁধা আরবী এবারত পড়া ফরয বা ওয়াজিব কিছুই নহে। ফরয হইয়াছে মনের নিয়্যত।

১২। মাসআলা ঃ যদি নিয়্যতের লফ্‌যগুলি মুখে বলিতে চায়, তবে দেল ঠিক করিয়া মুখে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ' আজকার যোহরের চারি রাকা'আত ফরয পড়িতেছি' "আল্লাহু আকবার" বা ' যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িতেছি' 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি। 'কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া' এই কথাটি বলিতেও পারে, না বলিলেও দোষ নাই। (তবে যে সময় ক্বেবলা মালুম না হয় এবং তাহারই [চিন্তা] করিয়া ক্বেবলা ঠিক করিতে হয়, তখন দেল ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে মুখেও বলিয়া লওয়া ভাল।)

১৩। মাসআলা ঃ কেহ হয়ত দেলে দেলে চিন্তা করিয়া এরাদা করিয়াছে যে, 'যোহরের নামায' পড়িবে, কিন্তু মুখে বলার সময় ভুলে মুখ দিয়া 'আছরের নামায' বলিয়া ফেলিয়াছে, তবুও নামায হইয়া যাইবে।

১৪। মাসআলা ঃ এইরূপে হয়ত কেহ দেলে ঠিক করিয়াছে যে, চারি রাকা'আত বলিবে, কিন্তু ভুলে মুখে তিন বা ছয় বলিয়া ফেলিয়াছে, তবুও তাহার নামায হইয়া যাইবে, দেলের নিয়্যতকেই ঠিক ধরা হইবে।

১৫। মাসআলা ঃ যদি কাহারও কয়েক ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে ক্বাযা পড়িবার সময় নির্দিষ্ট ওয়াক্তের নাম লইয়া নিয়্যত করিতে হইবে, যেমন হয়ত বলিবে, অমুক ওয়াক্তের ফজর বা যোহরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি ইত্যাদি। নির্দিষ্ট ওয়াক্তের নিয়্যত না করিয়া শুধু ক্বাযা পড়িতেছি বলিলে ক্বাযা দুরুস্ত হইবে না, আবার পড়িতে হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ যদি কয়েক দিনের নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করিতে হইবে, (নতুবা ক্বাযা আদায় হইবে না;) যেমন হয়ত কাহারও শনি, রবি, সোম

এবং মঙ্গল এই চারি দিনের নামায ক্বাযা হইয়াছে। এখন সে নিয়্যত এইরূপ করিবে; যথা—'শনিবারের ফজরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি' যোহরের ক্বাযা পড়িবার সময় বলিলে, 'শনিবারের যোহরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি' এইরূপে শনিবারের সব নামায ক্বাযা পড়া শেষ হইলে তারপর বলিবে, 'রবিবারের ফজরের ক্বাযা পড়িতেছি।' এইরূপে দিন এবং ওয়াক্তের তারিখ ঠিক করিয়া নিয়্যত করিলে নামায হইবে, নতুবা হইবে না। যদি কয়েক মাসের বা কয়েক বৎসরের নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে সন, মাস এবং তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করিতে হইবে; যেমন হয়ত বলিল, 'অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখের ফজরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি' এইরূপে নির্দিষ্ট না করিয়া নিয়্যত করিলে ক্বাযা দুরুস্ত হইবে না।

১৭। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও দিন তারিখ ইয়াদ না থাকে, তবে এইরূপ নিয়্যত করিবে ঃ 'আমার যিম্মায় যত ফজরের ফরয রহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম দিনের ফজরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি' বা 'আমার যিম্মায় যত যোহরের ফরয রহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম দিনের যোহরের ক্বাযা পড়িতেছি' ইত্যাদি। এইরূপে নিয়্যত করিয়া বহুদিন যাবৎ ক্বাযা পড়িতে থাকিবে। যখন দেলে গাওয়াহী (সাক্ষ্য) দিবে যে, এখন খুব সম্ভব আমার যত নামায ছুটিয়া গিয়াছিল সবের ক্বাযা পড়া হইয়া গিয়াছে, তখন ক্বাযা পড়া ছাড়িবে। কিন্তু দেলে গাওয়াহী দিবার পূর্বে ছাড়িবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে মা'ফও চাহিবে।

১৮। **মাসআলা ঃ** সুন্নত, নফল, তারাবীহ্ (এশ্রাক, চাশ্ত, আউয়াবীন, তাহাজ্জুদ) ইত্যাদি নামায পড়িবার কালে শুধু এতটুকু নিয়্যত করাই যথেষ্ট যে, 'আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত (বা চারি রাকা'আত) নামায পড়িতেছি।' সুন্নত বা নফল বা ওয়াক্তের নির্দিষ্ট করার কোনই আবশ্যক নাই। যদি কেহ ওয়াক্তিয়া সুন্নতের মধ্যে ওয়াক্তের নামও লয় তাহা ভাল। কিন্তু তারাবীহ্র সুন্নতের মধ্যে 'সুন্নত তারাবীহ্' বলিয়াই নিয়্যত করা অধিক উত্তম।

বেহেশ্তী গওহার হইতে

১। **মাসআলা ঃ** মোক্তাদীকে ইমামের এক্তেদারও নিয়্যত করিতে হইবে (নতুবা নামায হইবে না। অর্থাৎ, 'এই ইমামের পিছনে নামায পড়িতেছি' এইরূপ নিয়্যত করিবে।)

২। **মাসআলা ঃ** ইমামের শুধু নিজের নামাযের নিয়্যত করিতে হইবে, ইমামতের নিয়্যত করা শর্ত নহে। অবশ্য যদি কোন স্ত্রীলোক জমা'আতে শরীক হয় এবং সে পুরুষদের কাতারে দাঁড়ায়, আর যদি ঐ নামায জানাযা, জুমু'আ অথবা ঈদের নামায না হয়, তবে ইমাম ঐ স্ত্রীলোকটির নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য তাহার ইমামতের নিয়্যত করা শর্ত। আর যদি সে পুরুষদের কাতারে না দাঁড়ায় কিংবা জানাযার নামায, জুমু'আর নামায অথবা ঈদের নামায হয়, তবে তাহার ইমামতের নিয়্যত করা শর্ত নহে।

৩। **মাসআলা ঃ** মুক্তাদী যখন ইমামের সঙ্গে এক্তেদা করার নিয়্যত করিবে, তখন ইমামের নাম লইয়া নির্দিষ্ট করার দরকার নাই, শুধু এতটুকু বলিলেই চলিবে যে, এই ইমামের পিছে নামায পড়িতেছি। অবশ্য যদি নাম লইয়া নির্দিষ্ট করে তাহাও করিতে পারে, কিন্তু যাহার নাম লইয়াছে সে যদি ইমাম না হয় যেমন; যদি কেহ বলে, 'যায়েদের পিছে নামায পড়িতেছি' অথচ ইমাম হইয়াছে, খালেদ তবে ঐ মুক্তাদীর নামায হইবে না।

৪। মাসআলাঃ জানাযার নামাযের নিয়্যত এইরূপ করিবেঃ 'জানাযার নামায পড়িতেছি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং মুর্দার জন্য দো'আ করিতে'। মুর্দা পুরুষ বা স্ত্রী জানা না গেলে এইরূপ বলিবে, 'আমার ইমাম যাহার জন্য জানাযার নামায পড়িতেছেন আমিও তাহারই জন্য (এই ইমামের পিছে চারি তক্‌বীর বিশিষ্ট) জানাযার নামায পড়িতেছি।'

কোন কোন ইমামের ছহীহ্ অভিমত এই যে, ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত অন্যান্য সুন্নত এবং নফল নামাযের নিয়্যত সুন্নত, নফল বা কোন্ ওয়াক্তের সুন্নত এবং এশ্‌রাক, চাশ্‌ত, তাহাজ্জুদ, তারাবীহ্, কুছুফ বা খুছুফ বলিয়া নির্দিষ্ট করার আদৌ কোন দরকার নাই। শুধু নামাযের নিয়্যত করিলেই চলিবে। ওয়াক্তের নামকরণ বা নফল সুন্নত ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে না (অবশ্য নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করাই উত্তম। কিন্তু ফরয ও ওয়াজিব নামায নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করা ব্যতীত শুদ্ধ হইবে না।)

ক্বেব্‌লার মাসায়েল

১। মাসআলাঃ যদি কেহ এমন জায়গায় গিয়া পড়ে যে, তথায় ক্বেব্‌লা কোন্ দিকে তাহা ঠিক করিতে পারে না এবং এমন লোকও পায় না যে, তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তবে সে তাহার্‌রি করিয়া ক্বেব্‌লার দিক ঠিক করিবে। তাহাররি অর্থ চিন্তা করা অর্থাৎ, মনে মনে চিন্তা করিবে ক্বেব্‌লা কোন্ দিকে। চিন্তার পর মন যে দিকে সাক্ষ্য দিবে সেই দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িবে। এইরূপ অবস্থায় যদি তাহাররি না করিয়া নামায পড়ে তবে নামায হইবে না। এমন কি যদি পরে জানিতে পারে যে, ঠিক ক্বেবলার দিক হইয়াই নামায পড়িয়াছে, তবুও নামায হইবে না। যদি সেখানে কোন লোক থাকে, তবে তাহার্‌রি করা চলিবে না। সেই লোকের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না, স্ত্রীলোক লজ্জায় জিজ্ঞাসা ব্যতীত আন্দায করিয়া একদিকে নামায পড়িলে তাহারও নামায হইবে না। খোদার হুকুম পালন করার বেলায় লজ্জা করিবে না, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে।

২। মাসআলাঃ যদি কোন লোক না থাকায় জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া তাহাররি করিয়া নামায পড়িয়া থাকে এবং পরে নামায শেষ হইলে জানিতে পারে যে, ক্বেবলা ঠিক হয় নাই, তবুও নামায হইয়া যাইবে। (নামায দোহ্‌রাইতে হইবে না। কেননা, এইরূপ অবস্থায় তাহার 'জেহাতে তাহাররি' অর্থাৎ, যে দিকে তাহার মন সাক্ষ্য দেয় সেই দিক হইয়া নামায পড়াই তাহার জন্য ফরয ছিল, তাহা সে আদায় করিয়াছে কাজেই তাহার নামায হইয়া যাইবে।)

৩। মাসআলাঃ উপরোক্ত অবস্থায় তাহাররি করিয়া এক দিক ক্বেব্‌লা ঠিক করিয়া নামায শুরু করিয়াছে, নামাযের মাঝখানে হয়ত নিজেই জানিতে পারিয়াছে যে, পূর্বের মত ভুল হইয়াছে, বা কেহ বলিয়া দিয়াছে যে, ওদিকে ক্বেব্‌লা নয়, তবে ছহীহ্ ক্বেব্‌লা জানার পর তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াতে হইবে, জানার পর যদি ছহীহ্ ক্বেবলার দিকে ঘুরিয়া না দাঁড়ায়, তবে নামায হইবে না।

মাসআলাঃ যদি একদল লোক এরূপ অবস্থায় পতিত হয় যে, ক্বেবলা কোন্ দিকে তাহা কেহই জানে না (এবং জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লোকও পায় না,) অথচ জামা'আতে নামায পড়িতে চায়, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ তাহাররি পৃথক (স্বাধীন) ভাবে করিবে এবং তদনুযায়ী নামায পড়িবে। (তাহাররি করিয়া দেল ঠিক করার পর যদি কয়েক জনের মত একদিকে হয়, তবে সেই কয়জন

এক সঙ্গে জামা'আত করিয়া নামায পড়িতে পারিবে,) কিন্তু যাহার মত ইমামের মতের সঙ্গে মিশিবে না, সে ঐ ইমামের পিছে এক্তেদা করিতে পারিবে না। সে পৃথক নামায পড়িবে। কেননা, তাহার মতে ঐ ইমাম ভুল মত পোষণ করিয়া ক্বেব্লা ভিন্ন অন্য দিক হইয়া নামায পড়িতেছে এবং ফরয তরক করিয়াছে। কারণ, কাহাকেও খোদার বিরুদ্ধে ভুল মত পোষণকারী মনে করিয়া তাহার পিছে এক্তেদা করা জায়েয নহে; সুতরাং ঐ ইমামের পিছে এক্তেদা করিলে তাহার নামায হইবে না। —গওহার

৪। **মাসআলা ঃ** কা'বা শরীফের ঘরের ভিতরও নামায পড়া দুরুস্ত আছে—নফলই হইক, আর ফরযই হউক।

৫। **মাসআলা ঃ** কা'বা শরীফের ঘরের ভিতরে নামায পড়িলে যে দিক ইচ্ছা সেই দিক হইয়া নামায পড়িবে, সেখানে ক্বেবলা সব দিকেই।

৬। **মাসআলা ঃ** যাহারা এমন জায়গায় আছে যেখান থেকে কা'বা শরীফের ঘর দেখা যায়, তাহাদের ঠিক ঘরের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। তাহাদের জন্য পূর্ব পশ্চিম বা উত্তর দক্ষিণের কোন কথাই নাই। কিন্তু যাহারা দূরবর্তী স্থানে আছে তাহারা কা'বা শরীফের ঘর যে দিকে আছে সেই দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িবে। কা'বা শরীফের ঘরে পূর্ব দিকের লোক পশ্চিম দিকে, পশ্চিম দিকের লোক পূর্ব দিকে, উত্তর দিকের লোক দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ দিকের লোক উত্তর দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িবে। ফলকথা, পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কেহ থাকুক না কেন, তাহাকে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** কেহ যদি নৌকায়, ষ্টীমারে বা রেলগাড়ীতে ক্বেব্লা ঠিক করিয়া ক্বেব্লার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে দাঁড়ায় এবং পরে নৌকা, গাড়ী ইত্যাদি ঘুরিয়া যায়, তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া ক্বেব্লার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে; ঘুরিয়া ক্বেব্লার দিকে মুখ না করিলে নামায হইবে না।

ফরয নামায পড়িবার নিয়ম ঃ

৮। **মাসআলা ঃ** (নামাযের সময় হইলে পূর্ববর্ণিত নিয়মানুসারে সর্বশরীর পাক করিয়া পাক কাপড় পরিধান করিবে, গোছলের হাজত হইলে গোছল করিবে, নতুবা ওযূ করিয়া পাক জায়গায় ক্বেব্লার দিকে মুখ করিয়া আল্লাহ্‌র সম্মুখে নম্রভাবে কায়মনোবাক্যে নত শিরে সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। তৎপর সর্বপ্রথমে নামাযের নিয়ত করিয়া মুখে 'আল্লাহু আকবর' বলিবে। সঙ্গে সঙ্গে (পুরুষগণ দুই হাত দুই কান বরাবর এবং) স্ত্রীলোকগণ দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাইবে। স্ত্রীলোকগণ দুই হাত কাপড় হইতে বাহির করিবে না, (পুরুষগণ বাহির করিবে। হাতের আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক ভাবে খোলা রাখিবে।)

এইরূপে তক্বীরে তাহ্‌রীমা বলিয়া পুরুষগণ নাভীর নীচে এবং স্ত্রীলোকগণ বুকের উপর হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। হাত বাঁধিবার নিয়ম এই যে, পুরুষগণ বাম হাতের তালু নাভীর নীচে (নাভীর বরাবর) রাখিবে এবং ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখিয়া কনিষ্ঠা এবং বৃদ্ধা অঙ্গুলির দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরিবে, অনামিকা, মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলি লম্বাভাবে বাম হাতের কব্জির উপরিভাগে বিছান থাকিবে। স্ত্রীলোকগণ শুধু স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে বাম হাত নীচে রাখিয়া তাহার উপর ডান হাত রাখিবে। তারপর এই ছানা পড়িবে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ○

অর্থ—আল্লাহ্! তুমি পাক, তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তোমার নাম পবিত্র এবং বরকতময়, তুমি মহান হইতে মহান, তুমি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই।

তারপর 'আউযু বিল্লাহ্' 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়িয়া 'আলহাম্‌দু' সূরা পড়িবে; وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়ার পর 'আমীন' বলিবে। তারপর আবার বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া কোন একটি 'সূরা' পড়িবে। তারপর আবার 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া রুকূতে যাইবে। রুকূতে তিন, পাঁচ বা সাতবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ বলিবে।

স্ত্রীলোকগণের রুকূ করিবার নিয়ম এই যে, বাম পায়ের টাখ্‌না ডান পায়ের টাখ্‌নার সঙ্গে মিলাইয়া মাথা ঝুকাইয়া দুই হাতের অঙ্গুলিসমূহ যুক্ত অবস্থায় দুই হাঁটুর উপর রাখিবে এবং হাতের বাজু ও কনুই শরীরের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে।[১]

(পুরুষের রুকূর নিয়ম এই যে, দুই পা স্বাভাবিকভাবে খাড়া রাখিবে, মাথা এত পরিমাণ ঝুকাইবে যাহাতে মাথা, পিঠ এবং চোতড় এক বরাবর হয়। দুই হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া দুই হাঁটু শক্ত করিয়া ধরিবে। হাতের বাজু এবং কনুই শরীরের সঙ্গে মিলাইবে না।)

এইরূপে রুকূ শেষ করিয়া তারপর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্) অর্থ—যে কেহ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিবে আল্লাহ্ তাহা শ্রবণ করিবেন, (অর্থাৎ, গ্রহণ করিবেন।) বলিতে বলিতে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। দাঁড়াইয়া رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকালহাম্‌দ) 'হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই প্রশংসা করিতেছি, বলিবে এবং ঠিক সোজাভাবে দাঁড়াইয়া তারপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলিতে বলিতে সজ্‌দায় যাইবে।

সজ্‌দা করিবার নিয়মঃ

সজ্‌দা করিবার নিয়ম এই যে, মাটিতে প্রথমে দুই হাঁটু রাখিবে, তারপর দুই হাতের পাতা মাটিতে রাখিয়া তাহার মাঝখানে মাথা রাখিয়া নাক এবং কপাল উভয়ই মাটিতে ভালমত লাগাইয়া রাখিবে। সেজদার সময় দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি মিলিত অবস্থায় ক্বেব্‌লা-দিক করিয়া রাখিবে ও দুই পায়ের অঙ্গুলিও ক্বেব্‌লার দিকে রোখ করিয়া মাটিতে লাগাইয়া রাখিবে। (কিন্তু পুরুষ উভয় পা মিলাইয়া পায়ের অঙ্গুলিগুলিকে ক্বেব্‌লা রোখ করিয়া মাটিতে রাখিবে এবং পায়ের পাতা খাড়া রাখিবে। কিন্তু স্ত্রীলোক পায়ের পাতা খাড়া রাখিবে না উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া দিয়া মাটিতে শোয়াইয়া রাখিবে এবং যথাসম্ভব পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া রাখিবে। পুরুষ সজ্‌দা করিতে দুই পা মিলিত রাখিয়া অন্যান্য সব অঙ্গুলিকে পৃথক পৃথক রাখিবে; মাথা হাঁটু হইতে যথেষ্ট দূরে রাখিবে, হাতের কলাই (কব্জার উপরিভাগ) মাটিতে লাগাইবে না। পায়ের নলা উরু হইতে পৃথক রাখিবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকগণ সর্বাঙ্গ মিলিত অবস্থায় সজ্‌দা করিবে; মাথা হাঁটুর নিকটবর্তী রাখিবে এবং উরু পায়ের নলার সঙ্গে ও হাতের বাজু শরীরের পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত রাখিবে। সজ্‌দায় অন্ততঃ তিন, পাঁচ কিংবা সর্বোপরি সাতবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى (ছোব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা, অর্থাৎ আমার সর্বোপরি প্রভু আল্লাহ্ তিনি পবিত্র) বলিবে। এইরূপে এক সজ্‌দা, করিয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া মাথা উঠাইয়া ঠিক সোজা হইয়া বসিবে। ঠিক হইয়া বসিবার পর দ্বিতীয়বার 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া পূর্বের মত সজ্‌দা করিবে। দ্বিতীয় সজ্‌দায় উপরোক্তরূপে অন্ততঃ তিনবার (কিংবা ৫ বার কিংবা ৭ বার) 'ছোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'

টিকা

১ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নামাযের পার্থক্য (১২১ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

বলিবে। এইরূপে সজ্‌দা শেষ করিয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার সময় বসিবে না বা হাতের দ্বারা টেক লাগাইবে না।

(দ্বিতীয় সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা দাঁড়াইয়া) যখন দ্বিতীয় রাকা'আত শুরু করিবে তখন আবার বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়িবে। তারপর আল্‌হামদু পড়িবে। তারপর অন্য কোন একটি সূরা পড়িবে। তারপর প্রথম রাকা'আতের মত রুকূ, সজ্‌দা করিয়া দ্বিতীয় রাকা'আত পূর্ণ করিবে। যখন দ্বিতীয় রাকা'আতের দ্বিতীয় সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইবে, তখন (পুরুষগণ বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া তাহার উপর চোতড় রাখিয়া বসিবে এবং ডান পায়ের পাতার অঙ্গুলিগুলি ক্বেবলার দিকে মুখ করিয়া খাড়া রাখিবে।) স্ত্রীলোকগণ পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া দিয়া চোতড় মাটিতে লাগাইয়া বসিবে। এইরূপে বসিয়া হাতের দুই পাতা উরু দেশের উপর হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গুলিগুলি মিলিতাবস্থায় বিছাইয়া রাখিবে। এইরূপে বসিয়া খুব মনোযোগের সহিত আত্তাহিয়্যাতু পড়িবেঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○

'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যেবাতু আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যেহান্নাবিয়্যু ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওবারাকতুহু আস্‌সালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লাহিচ্ছালিহীন। আশ্‌হাদু আল্‌লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

অর্থঃ সমস্ত তা'যীম, সমস্ত ভক্তি, নামায, সমস্ত পবিত্র এবাদত-বন্দেগী আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। হে নবী! আপনাকে সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহ্‌র অসীম রহ্‌মত ও বরকত। আমাদের জন্য এবং আল্লাহ্‌র অন্যান্য সমস্ত নেক বন্দার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে শান্তি অবতীর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বন্দা এবং তাঁহার (সত্য) রাসূল।

আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার সময় যখন (শাহাদত) কলেমায় পৌঁছিবে, তখন 'লা' বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলিকে উপরের দিকে উঠাইবে এবং বৃদ্ধা ও মধ্যমার দ্বারা গোল হাল্‌কা বানাইয়া রাখিবে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে আক্‌দ করিয়া (অর্থাৎ গুটাইয়া) রাখিবে; যখন "ইল্লাল্লাহু" বলিবে, তখন শাহাদত অঙ্গুলিকে কিছু নোয়াইয়া নামাযের শেষ পর্যন্ত রাখিয়া দিবে। বৃদ্ধা ও মধ্যমার হাল্‌কা এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠার আক্‌দও নামাযের শেষ পর্যন্ত তেমনই থাকিবে।

যদি (তিন বা) চারি রাকা'আতী নামায হয়, তবে 'আব্‌দুহু ওয়ারাসূলুহু' পর্যন্ত পড়িয়া আর বসিবে না, তৎক্ষণাৎ আল্লাহু আকবর' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আত পুরা করিবে, (কিন্তু নফল, সুন্নত বা ওয়াজিব নামায হইলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে সূরা-ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলাইবে,) আর ফরয নামায হইলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে সূরা মিলাইবে না।

এইরূপে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আত শেষ করিয়া পুনঃ বসিবে এবং আবার আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া পরে এই দুরূদ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

“আল্লাহুম্মা ছল্লে আ'লা, মোহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ও'আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মোহাম্মাদিওঁ ও'আ'লা আলি মোহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ও'আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।”

অর্থ—হে আল্লাহ্! হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং মোহাম্মদ (দঃ)-এর আওলাদগণের উপর তোমার খাছ রহ্‌মত নাযিল কর, যেমন ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আওলাদগণের উপর তোমার খাছ রহ্‌মত নাযিল করিয়াছ, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ (দঃ) এবং মোহাম্মদ (দঃ)-এর আওলাদগণের উপর তোমার খাছ বরকত চিরবর্ধনশীল নেয়ামত নাযিল কর, যেমন ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আওলাদের উপর তোমার খাছ বরকত নাযিল করিয়াছ; নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

এই দরূদ পড়িয়া তারপর নিম্নের দো'আ পড়িবেঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

১। রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাছানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতে হাছানাতাওঁ ওয়া-ক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থ—হে আমাদের প্রতিপালক খোদা! আমাদের দুনিয়ায় এবং আখেরাতে উভয় জাহানে ভাল অবস্থায় রাখ এবং দোযখের শাস্তি হইতে আমাদের নিস্তার দাও।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ ○

২। হে আল্লাহ্। আমার গোনাহ মাফ করিয়া দাও, আমার মা-বাপের গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও এবং অন্যান্য যত জীবিত বা মৃত মোমিন মোছলিম ভাই-ভগ্নী আছে সকলের গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও।

অথবা অন্য কোন দো'আ পড়িবে। যথা—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ○

৩। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমাকে কবরের আযাব হইতে বাঁচাইয়া নিও, কানা দজ্জালের কঠোর পরীক্ষায় তরাইয়া দিও, গোনাহ্‌র কাজ হইতে আমাকে দূরে রাখিও, ঋণের দায় হইতে আমাকে বাঁচাইয়া লইও।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৪। হে আল্লাহ্! আমি অনেক গোনাহ্ করিয়াছি এবং তুমি ব্যতীত গোনাহ্ মা'ফকারী অন্য কেহই নাই। অতএব, নিজ দয়াগুণে আমার সব গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও এবং আমার উপর তোমার রহ্মত নাযিল কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল এবং দয়াশীল।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهٗ دَقَّهٗ وَ جِلَّهٗ وَ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَ سِرَّهٗ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَآ اَخَّرْتُ وَمَآ اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ اَنْتَ اِلٰهِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ ○

৫। হে আল্লাহ্! আমার ছোট, বড়, আউয়াল, আখের, যাহের, বাতেন, সব গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও। হে আল্লাহ্! আমি আগে যে সব গোনাহ্ করিয়াছি, প্রকাশ্যভাবে যে সব গোনাহ্ করিয়াছি, গুপ্তভাবে যে সব গোনাহ্ করিয়াছি এবং যে সব গোনাহ্ হয়ত আমার জানা নাই, কিন্তু তুমি জান, সে সব গোনাহ্ আমাকে মা'ফ করিয়া দাও। আমার আগেও তুমি, পরেও তুমি, তুমিই মা'বুদ, এক তুমি ব্যতীত আমার আর কোন মা'বূদ নাই।

এইরূপে দো'আ মাছুরা পড়িয়া প্রথম ডান দিকে তারপর বাম দিকে সালাম ফিরাইবে। সালাম ফিরাইবার সময় মুখে, 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ্ এবং দেলে দেলে ফেরেশ্তাদের সালাম করিবার নিয়্যত করিবে। (পুরুষগণ যখন জমা'আতে নামায পড়িবে, তখন সঙ্গের মুছল্লীদের সালাম করিবার নিয়্যত করিবে।)

এই পর্যন্ত নামায পড়িবার নিয়ম বর্ণনা করা হইল। কিন্তু ইহার মধ্যে কতকগুলি কাজ ফরয, কতকগুলি ওয়াজিব এবং কতকগুলি সুন্নত ও মোস্তাহাব আছে। কোন একটি ফরয যদি কেহ তরক করে— জানিয়াই করুক বা ভুলিয়াই করুক, তাহার নামায আদৌ হইবে না, নামায পুনরায় পড়িতে হইবে। যদি কেহ স্বেচ্ছায় একটি ওয়াজিব তরক করে, তবে সে অতি বড় গোনাহ্গার হইবে এবং নামায দোহ্রাইয়া পড়িতে হইবে। ভুলে একটি ওয়াজিব তরক করিলে 'ছহো-সজ্দা' করিতে হইবে। সুন্নত বা মোস্তাহাব তরক করিলে নামায হইয়া যায়, কিন্তু ছওয়াব কম হয়।

নামাযের ফরয ঃ

১। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে ছয়টি কাজ ফরয। (১) তাহ্রীমা অর্থাৎ, নামাযের নিয়্যতের সঙ্গে সঙ্গে 'আল্লাহু আকবর' বলা। (২) ক্বেয়াম—দাঁড়াইয়া নামায পড়া। (৩) 'কেরাআত'—কোরআন শরীফ হইতে একটি পূর্ণ লম্বা আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত বা সূরা পাঠ করা। (৪) রুকূ-করা (মস্তক অবনত করিয়া খোদার সামনে মাথা ঝুঁকাইয়া দেওয়া।) (৫) দুই সজ্দা করা—দুইবার আল্লাহ্র সামনে মস্তক মাটিতে রাখা। (৬) ক্বা'দায়ে আখীরা—নামাযের শেষ ভাগে (খোদার সামনে) আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার পরিমাণ সময় বসা।

নামাযের ওয়াজিব ঃ

২। **মাসআলা ঃ** নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি নামাযের মধ্যে ওয়াজিব; (১) (ফরয নামাযে প্রথম দুই রাকা'আতে এবং বেৎর, নফল ও সুন্নতের সব রাকা'আতে) সূরা-ফাতেহা পড়া এবং

(২) ফাতেহার সঙ্গে অন্য একটি সূরা মিলান (৩) নামাযের প্রত্যেক ফরযগুলি নিজ নিজ স্থানে আদায় করা, (৪) প্রথমে ফাতেহা পড়া, তারপর সূরা পড়া, তারপর রুকু করা, তারপর সজ্‌দা করা, (৫) দুই রাকা'আত পূর্ণ করিয়া বসা (৬) প্রথম বৈঠক হউক বা দ্বিতীয় বৈঠক হউক) উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া, (৭) বেৎর নামাযে দো'আ কুনূত পড়া, (৮) আস্‌সালামুআলাইকুম ওয়রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌' বলিয়া সালাম ফিরান, (৯) তা'দীলে আরকান অর্থাৎ, নামাযের সব কাজগুলি ধীরে সুস্থে আদায় করা, তাড়াতাড়ি না করা, (রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান এবং সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া বসা ইত্যাদি। (১০) জেহ্‌রী নামাযে প্রথম দুই রাকা'আতের মধ্যে ইমামের জোরে কেরাআত পড়া এবং ছির্‌রী নামাযের মধ্যে ইমাম এবং একা নামাযীর চুপে চুপে পড়া। (১১) সজ্‌দার মধ্যে উভয় হাত এবং হাঁটু মাটিতে রাখা, (ফজর, মাগরিব ও এশা এবং জুমুআ, ঈদ ও তারাবীহ্‌ হইল জেহ্‌রী নামায; এতদ্ব্যতীত দিবাভাগের সব নামায ছির্‌রী নামায।)

৩। **মাসআলা ঃ** এই ফরয ওয়াজিবগুলি ছাড়া অন্য যে কাজগুলি নামাযে আছে তাহার কোনটি সুন্নত এবং কোনটি মোস্তাহাব।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কোন (নাদান) লোক, (১) নামাযের মধ্যে সূরা-ফাতেহা না পড়িয়া অন্য কোন আয়াত বা সূরা পড়ে, বা (২) প্রথমে দুই রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে অন্য সূরা বা আয়াত না মিলায়, বা (৩) দুই রাকা'আত পড়িয়া না বসে বা (৪) আত্তাহিয়্যাতু না পড়ে ও তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ায় কিংবা বসিয়াছে কিন্তু আত্তাহিয়্যাতু পড়ে নাই, তবে এই সব ছুরতে ওয়াজিব তরক হইবে। ফরয অবশ্য যিম্মায় থাকিবে না, কিন্তু নামায একেবারে অকেজো এবং নিকৃষ্ট হইবে। সুতরাং নামায দোহ্‌রাইয়া পড়া ওয়াজিব, না দোহ্‌রাইলে ভারী গোনাহ্‌ হইবে।

কিন্তু যদি কেহ ভুলবশতঃ এরূপ করে, তবে 'ছহো'-সজ্‌দা করিলে নামায শুদ্ধ হইবে—(ওয়াজিব ভুলবশতঃ তরক হইলে তাহার তদারক (সংশোধন) ছহো-সজ্‌দার দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু ফরয তরক হইলে বা ওয়াজিব ইচ্ছাপূর্বক তরক করিলে তাহার তদারক ছহো-সজ্‌দার দ্বারা হইতে পারে না নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হয়।)

৫। **মাসআলা ঃ** 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্‌' বলিবার স্থানে যদি কেহ এই লফযের দ্বারা সালাম না ফিরাইয়া দুনিয়ার কোন কথা বলিয়া উঠে, বা উঠিয়া চলিয়া যায়, বা অন্য কোন এমন কাজ করে যাহাতে নামায টুটিয়া যায়, তবে তাহার ওয়াজিব তরক হইবে এবং গোনাহ্‌গার হইবে। অবশ্য ফরয আদায় হইবে, কিন্তু ঐ নামায দোহ্‌রাইয়া পড়া ওয়াজিব। অন্যথায় গোনাহ্‌গার হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** পূর্বে সূরা পড়িয়া শেষে আলহামদু পড়িলে ওয়াজিব তরক হইবে এবং নামায দোহ্‌রাইতে হইবে। যদি ভুলে এরূপ করে ছহো-সজ্‌দা করিলে নামায দুরুস্ত হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** আল্‌হামদুর পর অন্ততঃ তিনটি আয়াত পড়িতে হইবে। যদি কেহ তৎপরিবর্তে এক আয়াত বা দুই আয়াত পড়ে, যদি ঐ এক আয়াত বা দুই আয়াত ছোট ছোট তিনটি আয়াতের সমপরিমাণ হয়, তবে নামায দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি রুকূ হইতে উঠিবার সময় তসমীয়া (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌) এবং রুকূ হইতে উঠিয়া তাহ্‌মীদ (রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ) না পড়ে বা রুকূতে রুকূর তসবীহ না পড়ে, বা সজ্‌দায় তসবীহ না পড়ে বা শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া দুরূদ শরীফ না পড়ে, তবে

নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে। এইরূপে যদি কেহ দুরূদ শরীফ পড়িয়াই সালাম ফিরায়, কোন দো'আ (মাছুরাহ্) না পড়ে, তবুও নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** নামাযের নিয়ত (তাহ্রীমা) বাঁধিবার সময় হাত উঠান সুন্নত। হাত না উঠাইলে নামায হইয়া যাইবে কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** প্রত্যেক রাকা'আত শুরু করিবার সময় বিস্মিল্লাহ্ পড়িয়া আলহাম্দু শুরু করিবে। অন্য সূরা শুরু করার সময়ও বিস্মিল্লাহ্ পড়িয়া শুরু করা উত্তম। (নামাযের মধ্যে সূরা আলহামদু চুপে চুপে পড়ুক বা জোরে পড়ুক বিস্মিল্লাহ্ সব সময়ই চুপে চুপে পড়িতে হইবে।)

১১। **মাসআলা ঃ** সজ্দায় নাক মাটিতে না রাখিয়া শুধু কপাল মাটিতে রাখিলেও নামায আদায় হইবে, যদি কপাল মাটিতে না রাখিয়া শুধু নাক মাটিতে রাখে, তবে নামায হইবে না। অবশ্য যদি কোন ওযরবশতঃ কপাল মাটিতে না রাখিতে পারে এবং শুধু নাক মাটিতে রাখে, তবে নামায হইয়া যাইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** রুকূর পর সোজা হইয়া দাঁড়াইল না, বরং মাথা সামান্য উঠাইয়া সজ্দায় চলিয়া গেল, নামায হইবে না, পুনঃ পড়িতে হইবে।

১৩। **মাসআলা ঃ** দুই সজ্দার মাঝখানে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া বসা ওয়াজিব! সোজা হইয়া না বসিয়া অল্প একটু মাথা উঠাইয়া দ্বিতীয় সজ্দায় গেলে নামায হইবে না, পুনরায় পড়িতে হইবে। আর যদি এতটুকু উঠায় যে বসার কাছাকাছি হইয়া যায়, তবে নামাযের যিম্মা আদায় হইয়া গেল; কিন্তু অতি বড় অকেজো এবং নিকৃষ্ট নামায হইল। কাজেই পুনরায় নামায পড়া কর্তব্য। অন্যথায় কঠিন গোনাহ্ হইবে।

১৪। **মাসআলা ঃ** তোষক বা খড় ইত্যাদি কোন নরম জিনিসের উপর সজ্দা করিতে হইলে মাথা খুব চাপিয়া রাখিয়া সজ্দা করিবে। যতদূর নীচে চাপান যায় যদি ততদূর চাপিয়া সজ্দা না করা হয়, শুধু উপরে উপরে মাথা রাখিয়া সজ্দা করে, তবে সজ্দা হইবে না। সজ্দা না হইলে নামাযও হইবে না।

১৫। **মাসআলা ঃ** ফরয নামাযের শেষের দুই রাকআতে শুধু আল্হামদু পড়িবে, সূরা মিলাইবে না। সূরা মিলাইলেও নামায হইয়া যাইবে। নামাযে কোন দোষ আসিবে না।

১৬। **মাসআলা ঃ** ফরয নামাযের শেষের দুই রাকা'আতে আল্হামদু পড়া সুন্নত। যদি কেহ আল্হামদু না পড়িয়া তিনবার ছোবহানাল্লাহ্ পড়ে, বা কিছু না পড়িয়া (তিনবার ছোবহানাল্লাহ্ পড়ার পরিমাণ সময়) চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুকূ করে, তবুও নামায হইয়া যাইবে; (কিন্তু এইরূপ করা ভাল নয়, আল্হামদু পড়া উচিত।)

১৭। **মাসআলা ঃ** ফরয নামাযে প্রথম দুই রাকা'আতে আল্হামদুর সঙ্গে অন্য সূরা মিলান ওয়াজিব। যদি কেহ প্রথম দুই রাকা'আতে আল্হামদুর সঙ্গে সূরা না মিলায় বা আল্হামদুও না পড়ে, শুধু ছোবহানাল্লাহ্ ছোবহানাল্লাহ্ বলিতে থাকে তবে শেষের দুই রাকা'আতে আল্হামদুর সঙ্গে সূরা মিলাইতে হইবে। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ করিয়া থাকিলে নামায দোহ্রাইতে হইবে, অবশ্য ভুলে এরূপ করিলে ছহো সজ্দা দ্বারা নামায হইয়া যাইবে।

১৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকগণ সব নামাযের মধ্যে ছানা, তাআওওয, তছমিয়াহ্, ফাতেহা, সূরা ইত্যাদি সব কিছু চুপে চুপে পড়িবে; কিন্তু এরূপভাবে যেন নিজের কানে নিজের পড়ার আওয়ায

পৌঁছে। যদি নিজের আওয়ায নিজের কানে না পৌঁছে, তবে স্ত্রী বা পুরুষ কাহারও নামায হইবে না। (পুরুষগণ যোহর ও আছর সম্পূর্ণ এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকা'আত এবং এশার তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে সকলেই সবকিছু চুপে চুপে পড়িবে। অবশ্য ইমাম শুধু তকবীরগুলি জোরে বলিবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নামাযে ফজর, মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আত ও জুমু'আয় ইমামের জন্য জোরে কেরাআত পড়া অর্থাৎ, সূরা উচ্চ স্বরে পড়া ওয়াজিব। জুমু'আর নামায ত একা একা হয়ই না, এতদ্ব্যতীত ফজর, মাগরিব এবং এশা একা একা পড়িলে জোরেও পড়িতে পারে বা চুপে চুপেও পড়িতে পারে।)

১৯। মাসআলা ঃ কোন নামাযের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই; যে কোন সূরা ইচ্ছা হয় তাহাই পড়িতে পারে। কোন নামাযের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া মকরূহ। (তবে হযরত রসূলুল্লাহ্ [দঃ] যে নামাযে যে সূরা পড়িয়াছেন তাহা যদি জানা থাকে, তবে নামাযে সেই সূরা পড়া মোস্তাহাব; কিন্তু সব সময় সেই সূরা পড়া—যাহাতে মনে হয় যেন অন্য সূরা পড়া জায়েযই নহে ভাল নহে।)

২০। মাসআলা ঃ প্রথম রাকা'আত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকা'আতে লম্বা সূরা পড়িবে না।

২১। মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকদের জন্য জুমু'আ, জমা'আত বা ঈদের নামাযের হুকুম নাই। অতএব, যদি এক জায়গায় কতকগুলি স্ত্রীলোক একত্র থাকে, তবে প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক নামায পড়িবে, জমা'আত করিয়া পড়িবে না। স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের সঙ্গে জমা'আতে নামায পড়িবার জন্য মসজিদে বা ঈদের মাঠে যাইবে না। অবশ্য যদি ঘরে নিজের স্বামী বা বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে কোন সময় নফল, তরাবীহ্ বা ফরয নামায জমা'আতে পড়িবার সুযোগ হয়, তবে স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত এক কাতারে দাঁড়াইবে না। একা একজন স্ত্রীলোক হইলেও এবং স্বামী বা বাপের সঙ্গে নামায পড়িলেও পিছনের কাতারে দাঁড়াইবে। এক কাতারে সমান হইয়া দাঁড়াইলে উভয়ের নামায নষ্ট হইবে।

২২। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে যদি ঘটনাক্রমে ওযূ টুটিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া দিবে এবং পুনরায় ওযূ করিয়া নামায প্রথম হইতে শুরু করিবে।

২৩। মাসআলা ঃ নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় সজ্‌দার জায়গায়, রুকূর সময় পায়ের দিকে, সজ্‌দার সময় নাকের দিকে, (বসার সময় কোলের দিকে) এবং সালামের সময় নিজের কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখা মোস্তাহাব। (ইহা ছাড়া দূরে দৃষ্টি করা অন্যায়।)

নামাযের মধ্যে হাই আসিলে যথাসম্ভব দাঁতের দ্বারা নীচের ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া বন্ধ রাখিবে; একান্ত মুখের দ্বারা চাপিয়া রাখিতে না পারিলে (দণ্ডায়মান অবস্থায় ডান হাতের পাতার পিঠ দ্বারা এবং বসা অবস্থায় বাম) হাতের পাতার পিঠ দ্বারা বন্ধ রাখিবে। নামাযের মধ্যে যদি গলা খুসখুসায় বা বন্ধ হইয়া আসে, তবে যাহাতে না কাশিয়া পারা যায়, তাহার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিবে। একান্ত সহ্য করিতে না পারিলে অতি আস্তে ভীত সংকোচিত অবস্থায়—খোদা আহ্‌কামুল হাকেমীনের দরবারে দণ্ডায়মান ভাবিয়া কাশিবে; (জোরে লা-পরোয়া অবস্থায় কাশিবে না, গলা ঝাড়া দিবে না।)

নামাযের কতিপয় সুন্নত

১। **মাসআলা ঃ** তকবীরে তাহ্রীমা বলার পূর্বে পুরুষের উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠান এবং স্ত্রীলোকের কাঁধ পর্যন্ত উঠান সুন্নত। ওযরবশতঃ পুরুষ কাঁধ পর্যন্ত উঠাইলেও কোন দোষ নাই।

২। **মাসআলা ঃ** তকবীরে তাহ্রীমা বলার সাথে সাথে পুরুষের নাভির নীচে এবং স্ত্রীলোকের সিনার উপর হাত বাঁধা সুন্নত।

৩। **মাসআলা ঃ** পুরুষের হাত বাঁধার সময় ডান হাতের পাতা বাম হাতের পাতার উপর রাখিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা বাম হাতের কব্জি চাপিয়া ধরা এবং বাকী তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপর বিছাইয়া রাখা সুন্নত।

৪। **মাসআলা ঃ** ইমাম এবং মোন্ফারেদের (একা নামাযীর) সূরা-ফাতেহা শেষে নীরবে "আমীন" বলা; আর ইমাম কেরাআত উচ্চ শব্দে পড়িলে সকল মুক্তাদীরই নীরবে "আমীন" বলা সুন্নত।

৫। **মাসআলা ঃ** পুরুষগণ রুকূর সময় এমনভাবে ঝুঁকিবে যেন পিঠ, মাথা ও নিতম্ব এক বরাবর হইয়া যায়।

৬। **মাসআলা ঃ** রুকূতে পুরুষের উভয় হাত বগল হইতে পৃথক বাখা, রুকূ হইতে দাঁড়াইবার সময় ইমামের "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলা, মুক্তাদীর "রাব্বানা লাকাল হাম্দ" বলা এবং একা নামাযীর উভয়টি বলা সুন্নত।

৭। **মাসআলা ঃ** সজ্দা অবস্থায় পুরুষের পেট রান হইতে, কনুই বগল হইতে এবং উভয় হাত মাটি হইতে উঠাইয়া রাখা সুন্নত।

৮। **মাসআলা ঃ** প্রথম ও শেষ বৈঠকে পুরুষের ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহের উপর ভর দিয়া পা খাড়া রাখিয়া আঙ্গুলগুলি ক্বেবলামুখী করিয়া বাম পা মাটির উপর বিছাইয়া উহার উপর বসা এবং উভয় হাত জানুর উপর এবং আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ হাঁটুর নিকটবর্তী রাখা সুন্নত।

৯। **মাসআলা ঃ** ইমামের উচ্চ আওয়াযে 'সালাম' বলা সুন্নত।

১০। **মাসআলা ঃ** ইমামের সালাম ফিরাইবার সময় সঙ্গে অবস্থানকারী সকল মুক্তাদী পুরুষ, স্ত্রী ও বালক এবং ফেরেশ্তাদের প্রতি নিয়্যত করা, আর মুক্তাদী সঙ্গের নামায আদায়কারী, সঙ্গীয় ফেরেশ্তা ইমাম ডান দিকে থাকিলে ডান সালামে, বাম দিকে থাকিলে বাম সালামে, আর সোজা থাকিলে উভয় সালামে ইমামের প্রতি নিয়্যত করা সুন্নত।

১১। **মাসআলা ঃ** তকবীরে তাহ্রীমা বলার সময় পুরুষের উভয় হাতকে জামার আস্তিন কিংবা চাদর ইত্যাদির ভিতর হইতে বাহির করা সুন্নত, যদি অত্যধিক শীত ইত্যাদির ন্যায় ওযর না থাকে।

নামযের কতিপয় সুন্নত ঃ

[নামাযের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুন্নত। (১) তকবীরে তাহ্ররীমার সময় আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখিয়া উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠান। (স্ত্রীলোকের জন্য কাঁধ পর্যন্ত), (২) তকবীরে তাহ্রীমার সময় মাথা না ঝুঁকান, (৩) ইমামের জন্য তকবীর, তাসমী'য় এবং সালাম

আবশ্যক পরিমাণে জোরে বলা, (মোন্ফারেদ ও মুক্তাদী শুধু নিজে শুনিতে পারে পরিমাণে চুপে চুপে বলিবে,) (৪) ছানা, (৫) তাআওওয, (৬) তাসমিয়া এবং (৭) আমীন চুপে চুপে বলিবে, (৮) নাভির নীচে হাত বাঁধা, স্ত্রীলোকের জন্য বুকের উপর বাম হাত নীচে রাখিয়া ডান হাত উপরে রাখা, (৯) রুকূতে যাইবার সময় আল্লাহু আকবর এবং (১০) রুকূ হইতে মাথা উঠাইবার সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলা, (১১) রুকূর মধ্যে তিনবার তাস্বীহ্ পড়া অর্থাৎ 'সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলা, (১২) রুকূর মধ্যে আঙ্গুলগুলি ফাঁক করিয়া উভয় হাত দ্বারা উভয় হাঁটুকে ধরা স্ত্রীলোকগণ হাঁটুর উপর কেবল হাত রাখিবে। (১৩) সজ্দায় যাইবার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলা (আল্লাহু আকবর এমনভাবে টানিয়া বলিবে যাহাতে সজ্দায় পৌঁছিয়া আকবরের রে' [ছাকেন] বলা যায়।) (১৪) সজ্দা হইতে মাথা উঠাইবার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলা (উপরোক্তরূপে লাম টানিয়া বলিবে যাহাতে দাঁড়াইয়া আকবর বলা যায়)। (১৫) সজ্দায় তিনবার তসবীহ পড়া অর্থাৎ 'ছোবহানারাব্বিয়াল আ'লা বলা, (১৬) সজ্দার সময় দুই হাত, দুই পা এবং দুই হাঁটু মাটিতে রাখা, (১৭) আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার 'সময় পুরুষের জন্য বাম পা বিছাইয়া তাহার উপর বসা, (১৮) দুই সজ্দার মাঝখানে কিছু বসা এবং তদবস্থায় দুই হাত উরুর উপর হাঁটুর সংলগ্ন রাখা (১৯) শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দুরূদ শরীফ পড়া, (২০) দুরূদের পর দো'আ মাছুরাহ্ পড়িয়া দো'আ করা, (২১) রুকূতে যাইবার সময়, সজ্দায় যাইবার সময়, সজ্দা হইতে উঠিবার সময় (২২) এবং দো'আয়ে কুনূত আরম্ভ করিবার সময় "আল্লাহু আকবর" বলা (২৩) রুকূ হইতে মাথা উঠাইবার সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলা এবং তারপর, (২৪) "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলা, (২৫) সালাম ফিরাইবার সময় ডানে বামে মুখ ফিরাইয়া পার্শ্বস্থ নামাযী এবং ফেরেশ্তার প্রতি নিয়্যত করিয়া সালাম করা।

মাসআলা ঃ ইমাম নিজে যদি এক্বামত বলে তাহাও জায়েয আছে। এক্বামত বলা শুরু করা মাত্রই সমস্ত মুছল্লী দাঁড়াইয়া যাইবে এবং পায়ের গোড়ালী বরাবর এবং কাঁধ বরাবর কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য ইমামের আসিতে যদি কিছু দেরী থাকে, তবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইমামের অপেক্ষা করিবে না, ইমাম বাহির হইতে আসিবার সময় যখন যে কাতার অতিক্রম করিবে, তখন সেই কাতার দাঁড়াইবে। ইমাম যদি মেহ্রাবের নিকট বসিয়া থাকে, তবে 'হাইয়্যাআলাল ফালাহ্' বলা মাত্র সকলে দাঁড়াইবে আর বসিয়া থাকিবে না। এক্বামত বলা শেষ হওয়া মাত্রই ইমাম নামায শুরু করিবে। শেষ হওয়ার পূর্বে শুরু করিবে না বা শেষ হওয়ার পরও অনর্থক দেরী করিবে না।] —অনুবাদক

কেরাআতের মাসায়েল

[কোরআন পাঠ করাকে কেরাআত বলে]

১। **মাসআলা ঃ** কোরআন শরীফ ছহীহ্ (শুদ্ধ) করিয়া পড়া ওয়াজিব। অতএব, প্রত্যেক অক্ষর ঠিক ঠিক মত পড়িবে।

হামযা (আলিফ) এবং ع আইনের মধ্যে যে পার্থক্য, ح (বড় হে) এবং ہ (ছোট হের) মধ্যে যে পার্থক্য, ذ 'যাল' ز 'যে' ظ যোয়া এবং ض দোয়াদের মধ্যে যে পার্থক্য ; د দাল এবং ض দোয়াদের মধ্যে যে পার্থক্য, ج এবং ز যের মধ্যে যে পার্থক্য س সিন ص ছোয়াদ এবং ث ছের মধ্যে যে পার্থক্য, غ গাইয়েন এবং گ গাফের মধ্যে যে পার্থক্য এবং

ق (বড় ক্বাফ) এবং ك (ছোট ক্বাফ)-এর মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া শিখিয়া লইবে (এবং তদনুযায়ী হামেশা পাঠ করিবে।) এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়িবে না।

২। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারো ظ,ض,ج,ث,ح,غ,ق ইত্যাদি হরফগুলির উচ্চারণ শুদ্ধ না হয়, তবে কোন উপযুক্ত ওস্তাদের নিকট মশ্‌ক্ব করিয়া শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করা তাহার উপর ওয়াজিব; সে পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক। যদি শুদ্ধ উচ্চারণ শিখিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম না করে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে এবং তাহার নামায ছহীহ্ হইবে না। অবশ্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি কাহারো জিহ্বায় কোন হরফ ঠিক উচ্চারিত না হয়, তবে আল্লাহ্‌র রহমতে তাহার মা'ফির আশা করা যায়।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ ث,ض,ق,غ,ع ইত্যাদি হরফগুলি ছহীহ্ করিয়া আদায় করিতে পারে, কিন্তু অলসতা বা অবহেলা বশতঃ ছহীহ্ করিয়া না পড়ে, বরং ح কেও ه এর মত, ع কে-এর মত বা ض কে د এর মত বা ظ এর মত, ث কে س এর মত, غ কে گ এর মত বা ج কে ز এর মত ইত্যাদি পড়ে, তবে তাহার নামায হইবে না এবং সে ভীষণ পাপী হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** প্রথম রাকা'আতে যে সূরা পড়িয়াছে, দ্বিতীয় রাকা'আতে যদি সেই সূরাই পড়ে, তবুও নামায হইয়া যাইবে; কিন্তু অকারণে এরূপ করা ভাল নহে, (মকরূহ তান্‌যীহী।)

৫। **মাসআলা ঃ** কোরআন শরীফে সূরাগুলি যে তরতীব অনুযায়ী লেখা আছে নামাযের মধ্যে সেই তরতীব অনুযায়ী পড়া উচিত। আমপারায় যে তরতীব অনুযায়ী লিখিয়াছে সে তরতীব অনুযায়ী পড়িবে না। সেখানে যে সূরা পরে লিখিয়াছে সেই সূরা আগে পড়িবে এবং যে সূরা আগে লিখিয়াছে সেই সূরা পরে পড়িবে। যথা যদি কেহ প্রথম রাকা'আতে 'কুল্‌ইয়া' পড়ে, তবে দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা-'ইযাজা' সূরা-'কুলহুআল্লাহু' 'সূরা-ফালাক' বা 'সূরা-নাস' পড়িবে, 'আলামতারা বা 'লিঈলাফি' পড়িবে না। কোরআন শরীফ উল্টা তরতীবে পড়া মকরূহ; অবশ্য কদাচিৎ ভুলবশতঃ উল্টা তরতীবে যদি কেহ পড়িয়া ফেলে, তবে মকরূহ হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** যে সূরা শুরু করা হইয়াছে সেই সূরাই পড়িয়া শেষ করিবে। অকারণে অন্য সূরা শুরু করা (বা কয়েক জায়গা হইতে কয়েক আয়াত এক রাকা'আতে পড়া) মকরূহ।

৭। **মাসআলা ঃ** যে ব্যক্তি নামায জানে না, বা কেবল নূতন মুসলমান হইয়াছে, সে নামাযের মধ্যে সব জায়গায় 'সোবহানাল্লাহ্' ('আল্লাহু আকবর' বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ') ইত্যাদি পড়িতে থাকিবে। ইহাতেই তাহার ফরয আদায় হইয়া যাইবে এবং নামাযের সূরা, কালাম, দো'আ, দুরূদ, তসবীহ ইত্যাদি শিক্ষা করিতে থাকিবে। যদি এই সব শিখিতে আলস্য বা অবহেলা করে, তবে শক্ত গোনাহ্‌গার হইবে। —বেহেশ্‌তী গওহর ৩১ পৃঃ।

ফরয নামাযের বিভিন্ন মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** সূরা ফাতেহা যখন পড়া শেষ হয় অর্থাৎ, যখন ولاالضالين পড়া হয়, তখন পাঠক এবং শ্রোতা সকলেই নীরবে (آمين-এর আলিফ টানিয়া।) "আমীন" বলিবে। তারপর ইমাম (বা মোনফারেদ) অন্য সূরা শুরু করিবে। —মারাকী

২। **মাসআলা ঃ** সফর বা যরূরতের অবস্থায় আলহামদুর পর যে কোন সূরা পড়া যাইতে পারে তাহাতে বাধা নাই। কিন্তু সফর বা যরূরতের হালাত যদি না হয়, তবে ফজরে এবং যোহরে

তেওয়ালে মোফাছ্ছাল, আছরে ও এশায় আওছাতে মোফাছ্ছাল এবং মাগরিবে ক্বেছারে মোফাছ্ছাল পরিমাণ সূরা পড়া সুন্নত। সূরা হুজুরাত হইতে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলিকে তেওয়ালে মোফাছ্ছাল, 'সূরা-ত্বারেক' হইতে 'লামইয়াকুন' পর্যন্ত আওছাতে মোফাছ্ছাল এবং 'সূরা-যিলযাল' হইতে 'সূরা-নাস' পর্যন্ত সূরাগুলিকে ক্বেছারে মোফাছ্ছাল বলে। ফজরের প্রথম রাকা'আতে দ্বিতীয় রাকা'আত অপেক্ষা অধিক লম্বা সূরা পাঠ করা উচিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নামাযে প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় রাকা'আত সমান হওয়া উচিত। দুই এক আয়াত বেশী-কম হইলে ধর্তব্য নহে। —আলমগীরী

৩। **মাসআলাঃ** রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া পূর্ণরূপে সোজা হইয়া দাঁড়াইবে এবং ইমাম সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলিলে (তৎপর ইমাম রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলিতে পারে) মুক্তাদীগণ শুধু 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলিবে কিন্তু মোন্‌ফারেদ উভয় বাক্য বলিবে। তারপর উভয় হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া সজ্‌দায় যাইবে। সজ্‌দায় যাইবার সময় তকবীর বলিবে। কিন্তু তকবীর এমনভাবে বলিবে যেন মাথা মাটিতে রাখা মাত্রই তকবীর (اكبر-এর 'রে' বলা) শেষ হইয়া যায়। —আলমগীরী

৪। **মাসআলাঃ** সজ্‌দায় প্রথম দুই হাঁটু, তারপর দুই হাত মাটিতে রাখিবে, তারপর নাক, তারপর কপাল রাখিবে, মুখ দুই হাতের মধ্যে রাখা চাই। হাতের অঙ্গুলিগুলি ক্বেবলা রোখ করিয়া মিলাইয়া রাখিবে। উভয় পায়ের অঙ্গুলিগুলি ক্বেবলার দিকে ফিরাইয়া (চাপিয়া মাটির সহিত লাগাইয়া রখিবে,) তাহার উপর ভর করিয়া পায়ের পাতা খাড়া রাখিবে, পেট হাঁটু হইতে এবং বাজু বগল হইতে পৃথক রাখিবে, পেট মাটি হইতে এত পরিমাণ উঁচু (এক হাত পরিমাণ ফাঁক) রাখিবে, যেন একটি ছোট বকরীর বাচ্চা পেটের নীচে দিয়া চলিয়া যাইতে পারে, (ইহা পুরুষদের সজ্‌দার নিয়ম। —আলমগীরী

৫। **মাসআলাঃ** ফজর, মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আতে (এবং তারাবীহ্, ঈদ ও জুমু'আর নামাযে) আলহামদু এবং অন্য সূরা 'ইমাম উচ্চস্বরে পড়িবে এবং সমস্ত নামাযের সমস্ত রাকা'আতে সামিআল্লাহু লিমানহামিদাহ্ এবং সমস্ত তকবীর ইমাম উচ্চ স্বরে বলিবে। মোন্‌ফারেদ ফজর, মাগরিব এবং এশার কেরাআত উচ্চস্বরে বা চুপে চুপে যেরূপ ইচ্ছা পড়িতে পারে, কিন্তু সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ এবং তকবীরগুলি চুপে চুপে বলিবে। যোহর ও আছরের নামায (এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকা'আতে এবং এশার শেষের দুই রাকা'আতে) ইমাম চুপে চুপে কেরাআত পড়িবে, শুধু সামিআল্লাহু লিমান হমিদাহ্ ও তকবীরগুলি ইমাম উচ্চৈঃস্বরে পড়িবে এবং একা নামাযী সবকিছু চুপে চুপে বলিবে। মুক্তাদী কেরাআত পড়িবে না, কিন্তু তকবীর ইত্যাদি চুপে চুপে বলিবে। —দুর্‌রে মুখতার

৬। **মাসআলাঃ** সালাম ফিরান হইলে নামায শেষ হইয়া গেল। তারপর উভয় হাত মিলিতভাবে সিনা বরাবর উঠাইয়া আল্লাহ্‌র নিকট নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য দো'আ করিবে। ইমাম নিজের জন্যও দো'আ করিবে এবং মুক্তাদীর জন্যও করিবে। মুক্তাদীগণ ইমামের সঙ্গে দুই হাত উঠাইয়া নিজ নিজ দো'আ পৃথক পৃথক করিতে থাকিবে। দো'আ শেষ হইলে উভয় হাত চেহ্‌রার উপর ফিরাইবে। —তাহ্‌তাবী পৃঃ ১৮৪, ১৮৫

৭। **মাসআলাঃ** যে সব নামাযের পর সুন্নত নামায আছে, যথা—যোহর, মাগরিব ও এশা, ইহাদের পর অনেক লম্বা দো'আ পড়িবে না।

কয়েকটি দো'আ মাছুরাহ্ঃ ○ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ○

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ○

এই (জাতীয়) ছোট দো'আ করিয়া সুন্নত পড়া শুরু করিবে এবং যে সব নামাযের পর সুন্নত নাই, অর্থাৎ, ফজর এবং আছরের নামাযের সালাম ফিরাইয়া যদি পিছনে কোন মছবুক নামায পড়িতে না থাকে, তবে ইমাম ডান বা বাম দিকে ঘুরিয়া মুক্তাদীর দিকে হইয়া বসিবে এবং নামাযীদের অবস্থা বুঝিয়া দীর্ঘ দো'আও করিতে পারে।

৮। **মাসআলাঃ** প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তিনবার—

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ○

আয়াতুলকুরসী, সূরা এখলাছ, ফালাক ও নাস এক একবার এবং ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়া মোস্তাহাব। যে নামাযের পর সুন্নত আছে, ইহা সুন্নতের পর পড়াই উত্তম। —মারাকী

পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নামাযের পার্থক্য

পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের নামায প্রায় এক রকম, মাত্র কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। যথাঃ

১। তকবীরে তাহ্রীমার সময় পুরুষ চাদর ইত্যাদি হইতে হাত বাহির করিয়া কান পর্যন্ত উঠাইবে, যদি শীত ইত্যাদির কারণে হাত ভিতরে রাখার প্রয়োজন না হয়। স্ত্রীলোক হাত বাহির করিবে না , কাপড়ের ভিতর রাখিয়াই কাঁধ পর্যন্ত উঠাইবে। —তাহ্তাবী,

২। তকবীরে তাহ্রীমা বলিয়া পুরুষ নাভির নীচে হাত বাঁধিবে। স্ত্রীলোক বুকের উপর (স্তনের উপর) হাত বাঁধিবে। —তাহ্তাবী

৩। পুরুষ হাত বাঁধিবার সময় ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা হাল্কা বানাইয়া বাম হাতের কব্জি ধরিবে এবং ডান হাতের অনামিকা, মধ্যমা এবং শাহাদাত অঙ্গুলী বাম হাতের কলাইর উপর বিছাইয়া রাখিবে। আর স্ত্রীলোক শুধু ডান হাতের পাতা বাম হাতের পাতার পিঠের উপর রাখিয়া দিবে, কব্জি বা কলাই ধরিবে না। —দুররুল মুখতার

৪। রুকূ করিবার সময় পুরুষ এমনভাবে ঝুঁকিবে যেন মাথা, পিঠ এবং চুতড় এক বরাবর হয়। স্ত্রীলোক এই পরিমাণ ঝুঁকিবে যাহাতে হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে।

৫। রুকূর সময় পুরুষ হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া হাঁটু ধরিবে। আর স্ত্রীলোক আঙ্গুল বিস্তার করিবে না বরং মিলাইয়া হাত হাঁটুর উপর রাখিবে।

৬। রুকূর অবস্থায় পুরুষ কনুই পাঁজর হইতে ফাঁক রাখিবে। আর স্ত্রীলোক কনুই পাঁজরের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে। —মারাকী

৭। সজ্দায় পুরুষ পেট উরু হইতে এবং বাজু বগল হইতে পৃথক রাখিবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক পেট রানের সঙ্গে এবং বাজু বগলের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে।

৮। সজ্‌দায় পুরুষ কনুই মাটি হইতে উপরে রাখিবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক মাটির সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে। —মারাকী

৯। সজ্‌দার মধ্যে পুরুষ পায়ের আঙ্গুলগুলি কেব্‌লার দিকে মোড়াইয়া রখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া পায়ের পাতা দুইখানা খাড়া রাখিবে; পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া মাটিতে বিছাইয়া রাখিবে। —মারাকী

১০। বসার সময় পুরুষ ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি কেব্‌লার দিকে মোড়াইয়া রাখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া ডান পায়ের পাতাটি খাড়া রাখিবে এবং বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া তাহার উপর বসিবে। আর স্ত্রীলোক পায়ের উপর বসিবে না, বরং চুতড় (নিতম্ব) মাটিতে লাগাইয়া বসিবে এবং উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া দিবে; এবং ডান রান বাম রানের উপর এবং ডান নলা বাম নলার উপর রাখিবে। —মারাকী

১১। স্ত্রীলোকের জন্য উচ্চ শব্দে কেরাআত পড়িবার বা তকবীর বলিবারও এজাযত নাই। তাহারা সব সময় সব নামাযের কেরাআত (তকবীর, তাস্‌মী' ও তাহ্‌মীদ —চুপে চুপে পড়িবে।) —শামী

নামায টুটিবার কারণ

১। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে কথা বলিলে নামায টুটিয়া যায়, ভুলে বলুক বা ইচ্ছা-পূর্বক বলুক।

২। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে আহ্‌, উহ্‌, হায়! কিংবা ইস্‌! ইত্যাদি বলিলে অথবা উচ্চ স্বরে কাঁদিলে নামায টুটিয়া যায়। অবশ্য যদি কাহারও বেহেশ্‌ত দোযখের কথা মনে উঠিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে এবং বে-এখ্‌তিয়ার আওয়ায বাহির হয়, তবে তাহাতে নামায টুটিবে না। —হেদায়া

৩। **মাসআলা ঃ** কঠিন প্রয়োজন ব্যতীত গলা খাকারিলে এবং গলা ছাফ করিলে যাহাতে এক আধ হরফ সৃষ্টি হয়, নামায টুটিয়া যায়। অবশ্য গলা একেবারে বন্ধ হইয়া আসিলে আওয়ায চাপিয়া আস্তে খাকারিয়া গলা ছাফ করা দুরুস্ত আছে, ইহাতে নামায নষ্ট হইবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে হাঁচি দিয়া " আলহাম্‌দু লিল্লাহ্‌" বলিলে নামায টুটিবে না, কিন্তু বলা উচিত নহে। যদি অন্যের হাঁচি শুনিয়া নামাযের মধ্যে "ইয়ারহামুকাল্লাহ্‌" বলে, তবে নামায টুটিয়া যাইবে। —শরহে বেদায়া

৫। **মাসআলা ঃ** নামাযে কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়িলে নামায টুটিয়া যায়।

৬। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে (মুখ বা চোখ এদিক ওদিক ঘুরান মকরূহ্‌, কিন্তু যদি সীনা কেবলা দিক হইতে ঘুরিয়া যায়, তবে নামায টুটিয়া যাইবে। —তান্‌বীর

৭। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে অন্যের সালামের জওয়াব দিলে নামায টুটিয়া যাইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** নামাযে থাকিয়া চুল বাঁধিলে নামায টুটিয়া যাইবে। —তান্‌বীর

৯। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে কিছু খাইলে বা পান করিলে নামায টুটিয়া যাইবে। এমন কি, যদি একটি তিলও বাহির হইতে মুখে লইয়া চিবাইয়া খায়, তবুও নামায টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি দাঁতের ফাঁকে কোন চিজ আটকাইয়া থাকে এবং তাহা গিলিয়া ফেলে, তবে ঐ জিনিস যদি আকারে (বুটের চেয়ে ছোট) তিল, সরিষা, মুগ, মসুরীর মত হয়, তবে নামায হইয়া যাইবে (কিন্তু এরূপ করিবে না)। যদি ছোলা (বুট) পরিমাণ বা বড় হয়, তবে নামায টুটিয়া যাইবে। —শরহে তান্‌বীর

১০। মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে পান মুখে চাপিয়া রাখিয়াছে, যাহার পিক গলার মধ্যে যাইতেছে, এরূপ অবস্থায় নামায হইবে না। —রদ্দে মোহ্তার

১১। মাসআলাঃ নামাযের পূর্বে হয়তো কোন মিঠা জিনিস খাইয়া তারপর ভালমত কুল্লি করিয়া নামায শুরু করিয়াছে; নামাযের মধ্যে কিছু মিঠা মিঠা লাগিতেছে এবং থুথুর সহিত গলার মধ্যে যাইতেছে, ইহাতে নামায নষ্ট হইবে না; ছহীহ্ হইবে।

১২। মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে কোন খোশ-খব্রী শুনিয়া যদি 'আল্‌হামদু লিল্লাহ্' বলে, বা কাহারও মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া 'ইন্না লিল্লাহ' বলে, তবে নামায টুটিয়া যাইবে।

১৩। মাসআলাঃ নামায পড়িতে শুরু করিয়াছে, এমন সময় একটি ছেলে হয়ত পড়িয়া গেল, তখন 'বিস্‌মিল্লাহ' বলিল; ইহাতে নামায টুটিয়া যাইবে। —তানবীর

১৪। মাসআলাঃ কোন একটি স্ত্রীলোক নামায পড়িতেছিল, এমন সময় তাহার শিশু ছেলে আসিয়া স্তন হইতে দুধ পান করা আরম্ভ করিল (বা তাহার স্বামী তাহাকে চুম্বন করিল) এইরূপ স্থলে ঐ স্ত্রীলোকের নামায টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি ছেলে মাত্র দুই এক টান চুষিয়া থাকে এবং দুধ বাহির না হয়, তবে নামায টুটিবে না।

১৫। মাসআলাঃ আল্লাহু আকবর বলার সময় বদি কেহ 'আল্লাহ্‌র' 'আলিফ' বা 'আকবরের' আলিফ টানিয়া বলে বা 'আকবরের' বে টানিয়া বলে, তবে নামায হইবে না। —দুররুল মুখতার

১৬। মাসআলাঃ নামায পড়িবার সময় যদি কোন চিঠির দিকে কিংবা কোন কিতাবের দিকে হঠাৎ নযর পড়ে এবং মনে মনে লিখার মর্ম বুঝে আসে, তবে তাহাতে নামায টুটিবে না। কিন্তু যদি কোন একটি কথা পড়ে, তবে নামায টুটিয়া যাইবে।

১৭। মাসআলাঃ নামাযীর সম্মুখ দিয়া যদি কেহ হাঁটিয়া যায় কিংবা কুকুব, বিড়াল ইত্যাদি চলিয়া যায়, তবে নামায টুটিবে না। কিন্তু নামাযীর সম্মুখ দিয়া গমনকারী শক্ত গোনহ্‌গার হইবে। কাজেই এমন স্থানে নামায পড়া উচিত, যেন সম্মুখ দিয়া কেহ যাইতে না পারে, বা চলাচলে কাহারও কষ্ট না হয়। যদি এধরনের কোন জায়গা না থাকে, তবে সম্মুখে একহাত লম্বা ও এক আঙ্গুল পরিমাণ মোটা একটি লাঠি বা কাঠি পুতিয়া রাখিবে এবং ঐ কাঠি সামনে রাখিয়া নামায পড়িবে। কাঠি একেবারে নাক বরাবর পুতিবে না; বরং ডাইন বা বাম চোখ বরাবর পুতিবে। যদি লাঠি বা কাঠি না পুতিয়া ঐ পরিমাণ উচা কোন জিনিস সামনে রাখিয়া নামায পড়ে, তবে উভয় অবস্থায় উহার বাহির দিয়া যাওয়া দুরুস্ত আছে। কোন গোনাহ্ হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

১৮। মাসআলাঃ প্রয়োজনবশতঃ যদি নামাযের মধ্যেই এক আধ কদম আগে বা পিছে সরিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বুক ক্বেব্‌লা হইতে না ফিরে, তবে তাহাতে নামায দুরুস্ত হইবে (কিন্তু যদি ছিনা ক্বেব্‌লা হইতে ঝুঁকিয়া যায় বা সজ্‌দার জায়গা হইতে বেশী সামনে সরিয়া দাঁড়ায়, তবে নামায হইবে না।) —রদ্দুল মোহ্তার

১৯। মাসআলাঃ মূর্খতাবশতঃ কোন কোন মেয়েলোকের এরূপ ধারণা আছে যে, মেয়েলোকদের জন্য দাঁড়াইয়া নামায পড়া ফরয নহে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ফরয নামায দাঁড়াইয়া পড়া স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান ফরয।

নামাযে মকরূহ্ এবং নিষিদ্ধ কাজ

১। **মাসআলা ঃ** যাহা করিলে গোনাহ্ হয় এবং নামাযের ছওয়াব কম হয় কিন্তু নামায নষ্ট হয় না, এরূপ কাজকে মকরূহ্ বলে। —রদ্দুল মোহ্তার

২। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে শরীর, কাপড় কিংবা অলংকারাদি নাড়াচাড়া করা (দাড়িতে অনর্থক হাত বুলান বা ধুলা-বালি ঝাড়া) কংকর সরান মকরূহ্। অবশ্য যদি সজ্দার জায়গায় কোন কংকর (বা কাঁটা) থাকে যাহার কারণে সজ্দা করা যায় না, তবে একবার কি দুইবার হাত দিয়া তাহা সরাইয়া দেওয়া জায়েয আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে আঙ্গুল মটকান, কোমরের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়ান, ডানে বামে এদিক-ওদিক মুখ ফিরাইয়া দেখা মকরূহ্। অবশ্য ঘাড় বা মুখ না ফিরাইয়া শুধু চোখের কোণ দিয়া ইমামের বা কাতারের উঠা-বসা দেখিয়া লওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত এরূপ করাও অনুচিত। —বেদায়া

৪। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে চারজানু হইয়া (আসন গাড়িয়া) বসা, কুকুরের মত বসা, হাঁটু খাড়া করিয়া চুতড় ও হাত মাটিতে রাখিয়া বসা, মেয়েদের উভয় পা খাড়া রাখিয়া বসা (এবং পুরুষদের সজ্দার মধ্যে উভয় হাত বা পা বিছাইয়া রাখা) মকরূহ্। অবশ্য রোগ ব্যাধির কারণে যেভাবে বসার হুকুম আছে, যদি সেইভাবে বসিতে না পারে, তবে যেভাবে পারে সেভাবেই বসিবে, ঐ সময় কোন প্রকার মকরূহ্ হইবে না। —বেদায়া, তানবীর

৫। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে হাত উঠাইয়া ইশারা করিয়া কাহারও সালামের জওয়াব দেওয়া মকরূহ্। মুখে সালামের জওয়াব দিলে নামায টুটিয়া যাইবে।

৬। **মাসআলাঃ** নামাযের মধ্যে ধুলা-বালির ভয়ে কাপড় গুটান বা সামলান মকরূহ্।

৭। **মাসআলা ঃ** যে স্থানে এরূপ আশঙ্কা হয় যে, হয়ত কেহ নামাযের মধ্যে হাসাইয়া দিবে, বা মন এদিক-ওদিক চলিয়া যাইবে, বা লোকের কথা-বার্তায় নামাযে ভুল হইয়া যাইবে, সেরূপ স্থানে নামায পড়া মকরূহ্। —রদ্দুল মোহ্তার

৮। **মাসআলা ঃ** কেহ কথাবার্তা বলিতেছে বা কোন কাজ করিতেছে, তাহার পিঠের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়া মকরূহ্ নহে, কিন্তু আশেপাশে অন্য জায়গা থাকিলে এরূপ স্থানে নামায শুরু করা উচিত নহে। কারণ, হয়ত তাহার উঠিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে এবং নামাযের কারণে যাইতে না পারায় বিরক্তি বা কষ্ট অনুভব করিতে পারে বা তাহার কোন ক্ষতি হইয়া যাইতে পারে বা হয়ত সে জোরে কথাবার্তা শুরু করিয়া দিতে পারে এবং সে কারণে নামাযে ভুল হইতে পারে। কাহারও মুখের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়া মকরূহ্। —আলমগীরী

৯। **মাসআলা ঃ** সামনে কোরআন শরীফ, (বাতি, লণ্ঠন) বা তলওয়ার লটকান থাকিলে তাহাতে নামায পড়া মকরূহ হয় না (অন্ধকার ঘরে নামায পড়া মকরূহ্ নহে।)

১০। **মাসআলা ঃ** তছ্বীরদার (ছবিওয়ালা) জায়নামায রাখা মকরূহ্ এবং ঘরে তছ্বীর বা ফটো রাখা কঠিন গোনাহ্ (অবশ্য যদি কোনখানে পাক বিছানায় ছবি থাকে এবং তাহার উপর

নামায পড়ে, তবে নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু ছবির উপর সজ্‌দা করিবে না, (পা রাখিবে।) ছবির উপর সজ্‌দা করিলে নামায মকরূহ্ হইবে।

১১। মাসআলা ঃ নামাযীর সামনে বা উপরে অর্থাৎ ছাদ বা বারেন্দায় বা ডানে কি বামে যদি ছবি থাকে, তবে নামায মকরূহ্ হইবে। (পিছনের দিকে ছবি থাকিলেও মকরূহ্ হইবে। কিন্তু কম দরজার মকরূহ্)। পায়ের নীচে ছবি থাকিলে মকরূহ্ হইবে না। ছবি যদি এত ছোট হয় যে, দাঁড়াইলে দেখা যায় না, কিংবা ছবি পূর্ণাঙ্গ নহে বরং মাথা কাটা এবং অস্পষ্ট তবে উহাতে কোন দোষ নাই। উহা যেদিকেই থাকুক নামায মকরূহ্ হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

১২। মাসআলা ঃ প্রাণীর ছবিওয়ালা কাপড় পরিয়া নামায পড়া মকরূহ্। —শরহে তান্‌বীর

১৩। মাসআলা ঃ বৃক্ষ-লতা, দালান কোঠা ইত্যাদি অচেতন পদার্থের ছবি হইলে মকরূহ্ নহে। —তান্‌বীর

১৪। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে আয়াত, সূরা বা তসবীহ্ আঙ্গুলে গণনা করা মকরূহ্। যদি হিসাব শুধু আঙ্গুল টিপিয়া ঠিক রাখে, তবে মকরূহ্ হইবে না। —তান্‌বীর

১৫। মাসআলা ঃ প্রথম রাকা'আত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকা'আত (তিন আয়াত বা ততোধিক পরিমাণ) লম্বা করা মকরূহ্। —তান্‌বীর

১৬। মাসআলা ঃ কোন নামাযের কোন সূরা এমনভাবে নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া যে, কখনও সেই সূরা ছাড়া অন্য সূরা পড়িবে না, ইহা মকরূহ্। —তান্‌বীর

১৭। মাসআলা ঃ কাঁধের উপর রুমাল (বা অন্য কোন কাপড়) ঝুলাইয়া রাখিয়া নামায পড়া মকরূহ্। —হেদায়া, তান্‌বীর

১৮। মাসআলা ঃ (ভাল লোকের সমাজে যাইতে লজ্জা বোধ হয় এমন) অত্যন্ত খারাপ ও ময়লা কাপড় পড়িয়া নামায পড়া মকরূহ্। অবশ্য যদি অন্য কাপড় না থাকে, তবে মকরূহ্ হইবে না। (কনুইর উপর আস্তিন গুটাইয়া নামায পড়া মকরূহ্।) —তান্‌বীর

১৯। মাসআলা ঃ টাকা, পয়সা, সিকি, দুয়ানি ইত্যাদি বা অন্য কোন জিনিস মুখের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া নামায পড়া মকরূহ্। যদি এমন কোন জিনিস হয়, যাহাতে কোরআন পড়া যায় না, তবে নামাযই হইবে না। —তান্‌বীর

২০। মাসআলা ঃ পেশাব পায়খানা (বা বায়ু) চাপিয়া রাখিয়া নামায পড়া মকরূহ্।
—রদ্দুল মোহ্তার

২১। মাসআলা ঃ বেশী ক্ষুধার সময় খানা তৈয়ার থাকিলে খানা খাইয়া তারপর নামায পড়িবে, নতুবা (খাইবার চিন্তায়) নামায মকরূহ্ হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া যাইবার মত হয় বা জমা'আত ছুটিয়া যাইবার ভয় হয়, তবে নামায আগে পড়িয়া লইবে।
—শরহে তান্‌বীর

২২। মাসআলা ঃ চক্ষু বন্ধ করিয়া নামায পড়া ভাল নহে। কিন্তু যদি চক্ষু বন্ধ করিয়া লইলে দিল ঠিক হয়, তবে চক্ষু বন্ধ করিয়া পড়ায় কোন দোষ নাই। —তানবীর

২৩। মাসআলা ঃ (নামাযের মধ্যে মুখ খুলিয়া হাই ছাড়া মকরূহ্।) বিনা যরূরতে থুথু ফেলা বা নাক ঝাড়া মকরূহ্। যদি ঠেকা পড়ে, তবে থুথু বা সিকনি কাপড়ের কোণে লইয়া মুছিয়া ফেলিবে, নামায টুটিবে না। কিন্তু ডান দিকে বা ক্বেব্‌লার দিকে জায়গা থাকিলেও সে দিকে থুথু ফেলিবে না। বাম দিকে থুথু ফেলিয়া দিবে।

২৪। মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে (মশা, পিপড়া, উকুন বা) ছারপোকায় কামড়াইলে উহাদিগকে মারা ভাল নয়, আস্তে হাত দিয়া তাড়াইয়া দিবে এবং না কামড়াইলে হাত দিয়া তাড়ানও মকরূহ্। (এইসব মারিয়া মসজিদে ফেলা মকরূহ্। যদি কষ্ট দেয়, তবে মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিবে।)

২৫। মাসআলাঃ ফরয নামাযে বিনা যরূরতে দেওয়াল, খুঁটি বা অন্য কোন জিনিসের উপর ভর দিয়া দাঁড়ান মকরূহ্। —মুনিয়া

২৬। মাসআলাঃ (কোন কোন লোক এত তাড়াতাড়ি নামায পড়ে যে,) সূরা খতম হইবার দুই এক লফয বাকী থাকিতেই রুকূতে চলিয়া যায় এবং ঐ অবস্থায় সূরা খতম হয়, এইরূপ করা মকরূহ্। —মুনিয়া

২৭। মাসআলাঃ পায়ের জায়গা হইতে সজ্‌দার জায়গা যদি আধ হাত অপেক্ষা উঁচু হয়, তবে নামায দুরুস্ত হইবে না, যদি আধ হাত বা আধ হাতের চেয়ে কম উঁচু হয়, তবে নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু বিনা যরূরতে এরূপ করা মকরূহ্। —মুনিয়া

বেহেশ্‌তী গওহার হইতে

১। মাসআলাঃ যে কাপড় যেরূপে পরিধান করার নিয়ম আছে নামাযের মধ্যে তাহার বিপরীতরূপে ব্যবহার করা মকরূহ্। যেমন,—যদি কেহ চাদর বা কম্বল এমনভাবে গায়ে দেয় যে, দুই কাঁধের উপর দিয়া দুই কোণা ঝুলাইয়া দেয়, কোণ ফিরাইয়া কাঁধের উপর ছড়াইয়া না দেয়, তবে তাহা মকরূহ্ হইবে। অবশ্য যদি ডান কোণ বাম কাঁধের উপর উঠাইয়া দেয় এবং বাম কোণ ঝুলান থাকে, তবে মাকরূহ্ হইবে না। যদি কেহ পিরহানের আস্তিনের মধ্যে হাত না ভরিয়া কাঁধের উপর দিয়া ঝুলাইয়া ব্যবহার করে, তবে তাহা মকরূহ্ হইবে। —শামী

২। মাসআলাঃ টুপি বা পাগড়ী ছাড়া খোলা মাথায় নামায পড়া মকরূহ্। অবশ্য যদি কেহ খোদার সামনে আজেযী দেখাইবার উদ্দেশ্যে টুপি বা পাগড়ী ছাড়া খোলা মাথায় নামায পড়ে, তবে তাহা মকরূহ্ হইবে না। —দুর্‌রে মোখ্‌তার

৩। মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে টুপি বা পাগড়ী মাথা হইতে পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ এক হাত দিয়া তাহা উঠাইয়া মাথায় পরিয়া লওয়াই ভাল। কিন্তু যদি একবারে বা এক হাত দিয়া উঠাইয়া পরিতে না পারে, তবে উঠাইবে না। —দুর্‌রে মোখ্‌তার

৪। মাসআলাঃ পুরুষদের কনুই পর্যন্ত বিছাইয়া দিয়া সজ্‌দা করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী।

৫। মাসআলাঃ সম্পূর্ণ মেহ্‌রাবের ভিতর দাঁড়াইয়া ইমামের নামায পড়ান মকরূহ্ (তান্‌যীহী) অবশ্য পা (মেহ্‌রাবের বাহিরে) রাখিয়া সজ্‌দা মেহ্‌রাবের ভিতরে করিলে মকরূহ্ হইবে না। —শামী

৬। মাসআলাঃ অকারণে শুধু ইমাম এক হাত বা ততোধিক পরিমাণ উঁচু জায়গায় দাঁড়ান মকরূহ্ তান্‌যীহী। যদি ইমামের সঙ্গে আরও দুই তিনজন লোক দাঁড়ায়, তবে মকরূহ্ হইবে না, কিন্তু শুধু একজন হইলে মকরূহ্ হইবে। কেহ কেহ বলেন, এক হাতের চেয়ে কম উঁচু হইলেও যদি সাধারণ দৃষ্টিতে উঁচু দেখা যায়, তবে তাহাও মকরূহ্ হইবে। —দু র্‌রে মোখ্‌তার

৭। **মাসআলা** ঃ যদি সমস্ত মুক্তাদী উপরে এবং ইমাম একা নীচে দাঁড়ায়, তবে তাহা মকরূহ্ হইবে; অবশ্য যদি জায়গার অভাবে এরূপ করে বা ইমামের সঙ্গে কিছু সংখ্যক মুক্তাদীও নীচে দাঁড়ায়, তবে মকরূহ্ হইবে না। —দুর্‌রে মোখ্‌তার

৮। **মাসআলা** ঃ রুকূ, সজ্‌দা ইত্যাদি কোন কাজ ইমামের আগে আগে করা মুক্তাদীদের জন্য মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। —আলমগীরী

৯। **মাসআলা** ঃ ইমামের কেরাআত পড়ার সময় মোক্তাদীর দো'আ-কালাম, সূরা-ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী; (নীরবে ইমামের কেরাআতের দিকে কান রাখা ওয়াজিব।) —দুর্‌রে মোখ্‌তার

১০। **মাসআলা** ঃ আগের কাতারে জায়গা থাকিতে পিছনের কাতারে দাঁড়ান বা একা একা এক কাতারে দাঁড়ান মকরূহ্। অবশ্য যদি আগের কাতারে জায়গা না থাকে তবে একা পিছনের কাতারে দাঁড়াইলে মকরূহ্ হইবে না।

১১। **মাসআলা** ঃ পাগড়ী ছাড়া শুধু টুপি পরিয়া নামায পড়া (বা ইমামত করা) মকরূহ্ নহে, বা টুপী ছাড়া পাগড়ী পরিয়াও নামায পড়া মকরূহ্ নহে। (অবশ্য টুপী ছাড়া পাগড়ী বাঁধিলে যদি মাথার তালু খোলা থাকিয়া যায়, তবে মকরূহ্ হইবে।) —অনুবাদক

জমা'আতের কথা (গওহার)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জমা'আতে পড়া—সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা ওয়াজিবের সমপর্যায়ভুক্ত।

১। **মাসআলা** ঃ একজন ইমাম হইয়া এবং অন্যান্য লোক তাঁহার মুক্তাদী হইয়া (অনুসরণ করিয়া) নামায পড়াকে জমা'আতে নামায বলে। লোক অভাবে ইমাম ছাড়া একজন মুক্তাদী হইলেও জমা'আত হইয়া যাইবে।

২। **মাসআলা** ঃ জমা'আত হওয়ার জন্য ফরয নামায হওয়া যরূরী নহে; বরং নফলও যদি দুইজনের একে অপরের অনুসরণ করিয়া পড়ে, তবে জমা'আত হইয়া যাইবে, ইমাম মুক্তাদী উভয়ে নফল পড়ুক বা মুক্তাদী নফল পড়ুক। অবশ্য নফল নামায জমা'আতে পড়ার অভ্যস্ত হওয়া বা তিনজন মুক্তাদীর বেশী হওয়া মকরূহ্।

জমা'আতের ফযীলত ও তাকীদ

জমা'আতের তাকীদ ও ফযীলত সম্বন্ধে বহুসংখ্যক হাদীস আছে। এখানে আমরা মাত্র দুই একটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনে কখনও জমা'আত তরক করেন নাই। এমন কি রুগ্ন অবস্থায় যখন নিজে হাঁটিয়া মসজিদে যাইতে অক্ষম হন, তখনও দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়া মসজিদে গিয়াছেন, তবুও জমা'আত ছাড়েন নাই। জমা'আত তরককারীদের উপর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভীষণ ক্রোধ হইত। তিনি জমা'আত তরককারীদের অতি কঠোর শাস্তি দিতে চাহিতেন। নিঃসন্দেহে শরীঅতে মুহাম্মাদীতে জমা'আতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং দেওয়াও সঙ্গত ছিল। নামাযের ন্যায় এবাদতের শান বা মর্যাদা ইহাই চায় যে, যে সব জিনিস দ্বারা উহার পূর্ণতা লাভ হয় তৎপ্রতিও এরূপ উন্নত ধরনের তাকীদ হওয়া উচিত। আমি এখানে

মুফাস্‌সিরীন ও ফোকাহাগণ যে আয়াত দ্বারা জমা'আতে নামায পড়া প্রমাণ করিয়াছেন, উহা লিখিয়া কতিপয় হাদীস বর্ণনা করিতেছি।

আয়াত ঃ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ কোরআনের বহু টীকাকার এই আয়াতের অর্থ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ "নামায আদায়কারীদের সহিত মিলিয়া নামায আদায় কর।" কেহ কেহ আয়াতের তফ্‌সীর করিয়াছেন, 'মস্তক অবনতকারীদের সহিত মিলিয়া মস্তক অবনত কর' কাজেই জমা'আত ফরয না হইয়া ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১। হাদীসঃ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, একাকী নামায পড়ার চেয়ে জমা'আতে নামায পড়িলে সাতাইশ গুণ অধিক ছওয়াব পাওয়া যায়। —বোখারী, মোস্‌লিম।

২। হাদীসঃ রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ একাকী নামায পড়া অপেক্ষা দুইজন মিলিয়া নামায পড়া অনেক ভাল। দুইজনের চেয়ে তিনজন মিলিয়া নামায পড়া আরও বেশী ভাল। এইরূপে যতই অধিকসংখ্যক লোক একত্র হইয়া জমা'আত করিয়া নামায পড়িবে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তত অধিক পছন্দনীয় হইবে। —আবু দাঊদ

৩। হাদীসঃ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, বনী সালমার লোকগণ তাঁহাদের পুরাতন বাড়ী (মসজিদে নববী হইতে দূরে ছিল বলিয়া উহা) পরিত্যাগ করিয়া মসজিদে নববীর নিকটে বাড়ী তৈয়ার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা যে আপনাদের দূরবর্তী বাড়ী হইতে অধিকসংখ্যক কদম ফেলিয়া (অধিক কষ্ট করিয়া) মসজিদে আসেন ইহার প্রত্যেক কদমে যে ছওয়াব পাওয়া যায়, তাহা কি আপনারা জানেন না? (অতঃপর তাঁহারা তাঁহাদের পুরাতন বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন না।) এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মসজিদে যতদূর হইতে (যত কষ্ট করিয়া) আসিবে, ততই অধিক ছওয়াব হইবে। (অবশ্য নিজের মহল্লার মসজিদ থাকিলে সেই মসজিদের হক বেশী। কাজেই যদিও সেখানে জমা'আত না হয়, তবুও সেখানেই আযান একামত বলিয়া নামায পড়িবে। —শামী

৪। হাদীসঃ (দশজন মিলিয়া একত্রিত হইয়া কোন কাজ করিতে গেলে অবশ্যই কেহ আগে এবং কেহ কিছু পরে আসে। বিশেষতঃ ঘড়ি, ঘণ্টা না থাকিলে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব, যে কেহ আগে আসে তাহার বিরক্ত হওয়া উচিত নহে, ধৈর্য ধারণ করিয়া অন্যান্য সঙ্গী ভাইদের জন্য কিছু অপেক্ষা করা উচিত। নেক কাজে যে যত আগে আসিবে যদিও কাজ শুরু না হয়, তবুও সে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হইবে। ধনী মুছল্লীর জন্য হয়ত সকলেই কিছু অপেক্ষা করে, কিন্তু নিয়মিত মুছল্লী হইলে গরীব হইলেও ক্বচিৎ কোন সময় দেরী হইয়া গেলে তাহার জন্য কিছু অপেক্ষা করা এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই সব ছুরতে কেহ আগে আসিয়া বসিয়া থাকিলে সময়টা অপব্যয় হয় না, ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই) রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 'নামাযের অপেক্ষায় যতটুকু সময় ব্যয় হয়, তাহাও নামাযের হিসাবের মধ্যে গণ্য হয়।'

৫। হাদীসঃ একদা এশার জমা'আতে হুযূর (দঃ)-এর আসিতে কিছু দেরী হইয়াছিল। যে সব ছাহাবী জমা'আতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেনঃ 'অন্যান্য লোক তো নামায পড়িয়া ঘুমাইতেছে, কিন্তু আপনারা

যে জমা'আতের অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন, (আপনাদের সময়টা বেকার যায় নাই,) যতটুকু সময় এই নামাযের অপেক্ষায় আপনাদের ব্যয় হইয়াছে তাহা সবই নামাযের মধ্যে হিসাব হইয়াছে। (অর্থাৎ, এই সময়ে নামায পড়িলে যতখানি ছওয়াব পাওয়া যাইত নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকাতেও সেই ছওয়াবই পাইবে।)

৬। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ যাহারা অন্ধকার রাত্রে জমা'আতে নামায পড়িবার জন্য মসজিদে আসিবে, তাহাদিগকে সুসংবাদ দেওয়া হইতেছে যে, (কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে) পূর্ণ আলো প্রদান করা হইবে।' —তিরমিযী

৭। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জমা'আতে পড়িবে তাহাকে অর্ধ রাত্রের এবাদতের ছওয়াব দেওয়া হইবে এবং যে এশা ও ফজর দুই ওয়াক্তের নামায জমা'আতে পড়িবে, তাহাকে সম্পূর্ণ রাত্রের এবাদতের ছওয়াব দেওয়া হইবে। —তিরমিযী

৮। **হাদীসঃ** একদিন রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহারা জমা'আতে হাযির হয় না তাহাদিকে (তিরস্কারার্থে) বলিয়াছেনঃ 'আমার ইচ্ছা হয় যে কতকগুলি কাঠ জমা করার হুকুম দেই, তারপর আযান দেওয়ার হুকুম দেই এবং অন্য একজনকে ইমাম বানাইয়া নামায পড়াইবার হুকুম দিয়া আমি মহল্লায় গিয়া দেখি, যাহারা জমা'আতে হাযির হয় নাই, তাহাদের বাড়ী ঘর জ্বালাইয়া দেই।'

৯। **হাদীসঃ** অন্য এক দিন ফরমাইয়াছেনঃ যদি ছোট শিশু ও স্ত্রী লোকদের খেয়াল না হইত, তবে আমি এশার নামাযে মশ্গুল হইয়া যাইতাম এবং খাদেমদের হুকুম দিতাম যে, যাহারা জমা'আতে না আসে, যেন তাহাদের মাল-আসবাব এবং তাহাদিগকেসহ তাহাদের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দেয়।' —মুসলিম

১০। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'যে কোন বস্তিতে বা ময়দানে তিনজন মুসলমান থাকিবে, সেখানে যদি তাহারা জমা'আত করিয়া নামায না পড়ে, তবে তাহাদের উপর শয়তানের আমল (অধিকার) জন্মাইয়া দেওয়া হইবে। অতএব, হে আবূদ্দর্দা! তুমি জমা'আত ছাড়িও না। দেখ, নেকড়ে বাঘ বকরীর দলের মধ্য হইতে সেই বকরীটাকেই ধরে, যে নিজের দল হইতে পৃথক থাকে; তদ্রূপ শয়তানও সেই মুসলমানের উপর আক্রমণ করে এবং প্রভাব বিস্তার করে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল ও জমা'আত হইতে পৃথক থাকে।'

১১। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া জমা'আতে নামায পড়িবার জন্য না আসিয়া বিনা ওযরে একা একা নামায পড়িবে তাহার নামায (আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয়) কবূল হইবে না। (অবশ্য একা একা পড়িলেও ফরয আদায় হইয়া যাইবে এবং আইনের শাস্তি হইতে রেহাই পাইবে বটে।), ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'হুযূর, ওযর কি? বলিলেনঃ '(শত্রু বা বাঘের আক্রমণের) ভয় বা রোগ।'

১২। **হাদীসঃ** মেহ্যন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ এক দিন আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম; এমন সময় আযান হইল এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামায পড়িতে লাগিলেন। আমি পৃথক গিয়া বসিয়া রহিলাম। নামায সমাপনান্তে হযরত (দঃ) আমাকে (তিরস্কার করিয়া) বলিতে লাগিলেনঃ 'হে মেহ্যন! তুমি জমা'আতে নামায পড়িলে না কেন? তুম কি মুসলমান নও?' আমি আরয করিলাম, 'হুযূর, আমি ত মুসলমান বটে; কিন্তু আমি একা একা বাড়ীতে নামায

পড়িলাম, (তাই জমা'আতে শরীক হই নাই।') রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইলেনঃ '(এরূপ করা উচিত হয় নাই,) যদি কখনও বাড়ীতে (কোন কারণবশতঃ) নামায পড় এবং তারপর মসজিদে আসিয়া দেখ যে, জমা'আত হইতেছে, তবে পুনরায় জমা'আতে শরীক হইয়া নামায পড়িবে (তবুও জমা'আত ছাড়িবে না!)' এই হাদীসে জমা'আতের কত তাকীদ দেখা যায়! জমা'আতে শরীক না হওয়ায় রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় প্রিয় ছাহাবীকে মুসলমান হইতে খারিজ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই কয়েকটি হাদীস নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইল। এখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রিয় ছাহাবীগণের কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করিতেছি। যদ্দ্বারা বুঝা যাইবে যে, ছাহাবিগণ জমা'আতের কতদূর যত্ন লইতেন। কেনইবা লইবেন না? তাঁহারাই ত প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ছাঁচে গড়া মানুষ এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সুন্নতের তাবেদারীর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

১। **আছারঃ** (ছাহাবী বা তাবেয়ীর বাণীকে আছার বলে।) আছওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমরা একদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার দরবারে উপস্থিত ছিলাম। কথায় কথায় নামাযের পাবন্দী, তাকীদ এবং ফযীলত সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। প্রমাণ স্বরূপ হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অন্তিমকালের পীড়ার ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, একদিন নামাযের ওয়াক্ত হইলে আযান দেওয়া হইল। তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের বলিলেনঃ (আমি ত যাইতে অক্ষম) সংবাদ দাও, আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) নামায পড়াইয়া দেউক।' আমরা আরয করিলামঃ হুযূর! অবুবকর (রাঃ) অতি নরম-দেল মানুষ, আপনার স্থানে দাঁড়াইলে (কাঁদিয়া) অস্থির ও অক্ষম হইয়া যাইবেন, নামায পড়াইতে আসিবেন না। কতক্ষণ পর (রোগের কারণে বেহুঁশের মত হইয়া গিয়াছিলেন, হুঁশ আসিলে) তিনি আবার ঐরূপ বলিলেনঃ আমরাও পূর্বের ন্যায়—আরয করিলাম। তখন হযরত (দঃ) বলিতে লাগিলেনঃ তোমরা তো আমার সঙ্গে ঐরূপ (চাতুরীর) কথা বলিতেছ; যে-রূপ ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের সঙ্গে মিশরীয় রমণীরা বলিয়াছিল। বলিয়া দাও, আবুবকর নামায পড়াক। যাহা হউক, অতঃপর আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) (সংবাদ দেওয়ার পর) নামায পড়াইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কিছু ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি দুইজন লোকের কাঁধের উপর ভর দিয়া জমা'আতের জন্য মস্‌জিদে চলিলেন। আমার চক্ষে এখনও সেই দৃশ্য যেন ভাসিতেছে যে, রসূল (দঃ)-এর কদম মোবারক মাটিতে হেঁচ্‌ড়াইয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া যাইতেছিল। শরীর এত দুর্বল ছিল যে, পা উঠাইবার শক্তিও ছিল না। (তবুও জমা'আত তরক করা পছন্দ করেন নাই।) ওদিকে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) নামায শুরু করিয়াছিলেন, হযরতকে দেখিয়া তিনি পিছে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হযরত নিষেধ করিলেন এবং তাঁহার দ্বারাই নামায পড়াইলেন। —বোখারী

২। **আছারঃ** হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আন্হু এক দিন ফজরের নামাযে সোলায়মান-ইবনে আবি হাছমাকে না পাইয়া তাঁহার বাড়ী পর্যন্ত (তদন্তের জন্য) গিয়াছিলেন। তাঁহার মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—সোলায়মানকে তো নামাযে দেখি নাই। তিনি বলিলেনঃ সোলায়মান আজ সারা রাত নামায পড়িয়াছিল, তাই ঐ সময় তাহার ঘুম আসিয়াছিল। এই উত্তর শ্রবণে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেনঃ 'সমস্ত রাত জাগিয়া এবাদত করা অপেক্ষা ফজরের নামায জমা'আতে পড়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।' —মোয়াত্তায়ে মালেক

৩। **আছারঃ** হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে-মসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু (তাঁহার সময়কার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে) বলেন, আমি যথাযথ পরীক্ষার পর জানিতে পারিয়াছি যে, জমা'আত তরক অন্য কেহই

করে না শুধু সেই মোনাফেক ব্যতীত, যাহার মোনাফেকী প্রকাশ্য হইয়া গিয়াছে এবং পীড়িত লোক ব্যতীত; কিন্তু পীড়িত লোকেরাও তো দুই দুইজন লোকের কাঁধের উপর ভর দিয়া জমা'আতে হাযির হইত। নিশ্চয় জানিও, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হেদায়ত এবং সত্যের রাস্তাসমূহ বাতাইয়া গিয়াছেন। যতগুলি হেদায়তের রাস্তা তিনি বাতাইয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান একটি এই যে, আযান ও জমা'আতের স্থান মসজিদ, তথায় গিয়া সমস্ত মুসলমানদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িতে হইবে। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, কাল কিয়ামতের দিন যে আল্লাহ্র সামনে মুসলমানরূপে হাযির হইতে বাসনা রাখে তাহারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাবন্দীর সহিত মসজিদে জমা'আতের সঙ্গে পড়া উচিত। নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীর দ্বারা তোমাদিগকে হেদায়তের সমস্ত রাস্তা উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও সেই সমস্ত হেদায়তের রাস্তাসমূহের মধ্যে একটি প্রধান রাস্তা। অতএব, যদি তোমরা মোনাফেকদের মত ঘরে বসিয়া নামায পড়, তবে নবীর তরীকা ছুটিয়া যাইবে এবং যদি নবীর তরীকা ছাড়িয়া দাও, তবে নিশ্চয়ই তোমরা পথভ্রষ্ট (এবং ধ্বংস) হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি ভালরূপে ওযূ করিয়া মসজিদে যাইবে তাহার প্রতি কদমে একটি নেকী মিলিবে, একটি মর্তবা বাড়িবে এবং একটি ছগীরা গোনাহ্ মাফ হইবে। আমরা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যাহারা মোনাফেক শুধু তাহারাই জমা'আতে যায় না। আমাদের লোকদের (ছাহাবাদের) অবস্থা তো এইরূপ ছিল যে, রুগ্ন ব্যক্তিকেও দুইজন লোকে কাঁধে করিয়া আনিয়া জমা'আতে দাঁড় করাইয়া দিত।

৪। **আছার ঃ** একবার একজন লোক আযানের পর নামায না পড়িয়াই মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসেমের (দঃ) নাফরমানী করিল এবং তাঁহার পবিত্র আদেশ অমান্য করিল। (দেখুন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) জমা'আত তরককারীদের কি বলিলেন। এখনও কি কোন মুসলমানের জমা'আত তরক করার সাহস হইতে পারে? কোন ঈমানদার কি হুযূরের নাফরমানী করিতে পারে?) —মুসলিম

৫। **আছার ঃ** হযরত উম্মে দরদা (রাঃ) বলেন, এক দিন আবুদ্দরদা (রাঃ) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ক্রোধের কারণ কি? তিনি জবাবে বলিলেন, খোদার কসম! রসূলুল্লাহ্র উম্মতের মধ্যে জমা'আতে নামায পড়া ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না; কিন্তু লোকেরা উহাও ছাড়িয়া দিতেছে।

৬। **আছার ঃ** বহুসংখ্যক ছাহাবী হইতে রেওয়ায়ত আছে, আযান শুনিয়া যে ব্যক্তি জমা'আতে উপস্থিত না হইবে, তাহার নামায হইবে না! অর্থাৎ, বিনা ওযরে জমা'আত তরক করা জায়েয নহে।

৭। **আছার ঃ** মোজাহেদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এক ব্যক্তি সারাদিন রোযা রাখে এবং সারারাত্রি নামায পড়ে, কিন্তু জুমু'আ এবং জমা'আতে হাযির হয় না। তাহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি উত্তর করিলেন, সে দোযখে যাইবে। —তিরমিযী

৮। **আছার ঃ** প্রাচীনকালে দস্তুর ছিল—যদি কাহারও জমা'আত ছুটিয়া যাইত, সে এত পেরেশান হইত যে, লোকেরা সাত দিন পর্যন্ত তাহার জন্য সমবেদনা ও আক্ষেপ করিত।
—এহ্ইয়াউলউলুম

জমা'আত সম্বন্ধে ইমামগণের ফৎওয়া

১। ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বলের কোন কোন অনুসারীর মতে নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য জমা'আত শর্ত। জমা'আত ব্যতীত নামায হইবে না।

২। ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবে জমা'আত ফরযে আইন, যদিও নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত নহে।

৩। ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবে কোন কোন অনুসারীর মতে জমা'আত ফরযে কেফায়া। হানাফী মাযহাবের বড় একজন ফকীহ্ ও মোহাদ্দিস ইমাম তাহাবীরও এই মত।

৪। হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ বিজ্ঞ ফকীহ্‌দের নিকট জমা'আত ওয়াজিব, মোহাক্কেক ইবনে হুমাম, হালাবী ও ছাহেবে বাহরোররায়েক প্রমুখ বড় বড় ফকীহ্‌গণেরও এই মত।

৫। অনেক হানাফী ফকীহ্‌দের মতে জমা'আত সুন্নতে মোয়াক্কাদা। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুই মতের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। (কেননা, যে ওয়াজিব রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সুন্নত দ্বারাপ্রমাণিত হইয়াছে, উহাকে কেহ কেহ সুন্নতে মোয়াক্কাদা বলিয়াছেন।)

৬। হানাফী ফোকাহাদের মত এই যে, যদি কোন বস্তির লোক জমা'আত তরক করে, তবে প্রথমে তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে। যদি বুঝাইলেও না মানে, তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বৈধ।

৭। ক্বিনিয়া প্রভৃতি ফেকাহ্‌র কিতাবে আছে, যদি কেহ বিনা ওযরে জমা'আত তরক করে, তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া তৎকালীন বাদশাহ্‌র উপর ওয়াজিব। আর যদি তাহার প্রতিবেশীরা তাহার এই পাপ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখার জন্য কিছু না বলে, তবে তাহারাও গোনাহ্‌গার হইবে।

৮। আযান শুনিয়া মসজিদে যাইবার জন্য একামত শুনিবার ইন্তেযার করিলে গোনাহ্‌গার হইবে।

৯। ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) হইতে রেওয়ায়ত আছে, জুমু'আর এবং জমা'আতের জন্য দ্রুতগতিতে হাঁটা জায়েয আছে—যদি বেশী কষ্ট না হয়।

১০। জমা'আত তরককারী নিশ্চয়ই গোনাহ্‌গার (ফাছেক)। তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে না, যদি বিনা ওযরে আলস্য করিয়া জমা'আত তরক করে।।

১১। যদি কেহ দিবারাত্র দ্বীনি এল্‌ম শিক্ষায় ও শিক্ষাদানে মশ্‌গুল থাকে এবং জমা'আতে হাযির না হয়, তবে সেও গোনাহ্ হইতে রেহাই পাইবে না এবং তাহার সাক্ষ্য কবূল হইবে না।

জমা'আত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

১। পুরুষ হওয়া; স্ত্রীলোকের উপর জমা'আত ওয়াজিব নহে।

২। বালেগ হওয়া; নাবালেগের উপর জমা'আত ওয়াজিব নহে।

৩। আযাদ হওয়া; ক্রীতদাসের উপর জমা'আত ওয়াজিব নহে।

৪। যাবতীয় ওযর হইতে মুক্ত হওয়া; মা'যূরের উপর জমা'আত ওয়াজিব নহে; কিন্তু ইহাদের জমা'আতে নামায পড়া আফযাল। কারণ, জমা'আতে না পড়িলে জমা'আতের ছওয়াব হইতে মাহ্‌রূম থাকিবে।

জমা'আত তরক করার ওযর ১৪টি

১। গুপ্তাঙ্গ (নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত) ঢাকিবার পরিমাণ কাপড় না থাকিলে।

২। মসজিদের পথে যদি এমন কাদা থাকে যে, চলিতে কষ্ট হয়। কিন্তু ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) ইমাম আবূ হানিফা (রঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, রাস্তায় কাদা পানি থাকিলে (জমা'আতে যাওয়া) সম্বন্ধে আপনার কি মত? ইমাম ছাহেব বলিলেন, জমা'আত তরক করা আমার পছন্দ হয় না।

৩। মুষলধারে বৃষ্টি বা প্রচণ্ড ঝড়তুফান হইতে থাকিলে, যদিও এমতাবস্থায় জমা'আতে হাজির না হওয়া জায়েয আছে; কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলেন, এরূপ অবস্থায়ও জমা'আতে হাযির হওয়া উত্তম।

৪। প্রচণ্ড শীতের কারণে বাহিরে বা মসজিদে গেলে যদি প্রাণের ভয় থাকে কিংবা রোগীর রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকে, তবে জমা'আত তরক করা জায়েয আছে।

৫। মসজিদে গেলে যদি মাল সামান চুরির আশংকা থাকে।

৬। মসজিদের সম্মুখে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকিলে।

৭। মসজিদে যাওয়ার পথে করযদাতা কর্তৃক উৎপীড়িত হওয়ার আশংকা থাকিলে। অবশ্য পরিশোধের সামর্থ্য না থাকিলে এই হুকুম। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি ঋণ শোধ না করে, তবে যালিম হইবে। তাহার জমা'আত তরক করা জায়েয নাই।

৮। অন্ধকার রাত্রে পথ দেখা না গেলে। কিন্তু আলোর ব্যবস্থা থাকিলে জমা'আত তরক করা জায়েয নহে।

৯। অন্ধকার রাত্রে প্রচণ্ড ধূলি ঝড় প্রবাহিত হইলে।

১০। পীড়িত ব্যক্তির সেবায় রত ব্যক্তি জমা'আতে গেলে যদি রোগী কষ্ট বা ভয় পায়, তবে জমা'আত তরক করিতে পারে।

১১। খানা প্রস্তুত হইয়াছে কিংবা হইতেছে, আবার ক্ষুধা এত বেশী যে, খানা না খাইয়া নামাযে দাঁড়াইলে কিছুতেই নামাযে মন বসিবে না, এমতাবস্থায় জমা'আত তরক করা জায়েয আছে।

১২। পেশাব পায়খানার খুব বেশী বেগ হইলে।

১৩। সফরে রওয়ানা হইবার সময় হইয়াছে, এখন জমা'আতে নামায পড়িতে গেলে দেরী হইয়া যাইবে এবং কাফেলার সঙ্গীরা চলিয়া যাইবার আশংকা হইলে জমা'আত তরক করা জায়েয আছে। রেল গাড়ীতে ভ্রমণের মাসআলা ইহার সহিত তুলনা করা যায়, তবে পার্থক্য এইটুকু যে, এক কাফেলার পর অন্য কাফেলা পাইতে অনেক দেরী হয়। আর রেলগাড়ী দৈনিক কয়েকবার পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাতে ক্ষতির পরিমাণ বেশী হইলে জমা'আত তরকে দোষ নাই। আমাদের শরীঅতে অসুবিধা ভোগ করিতে বলা হয় নাই।

১৪। রোগের কারণে চলাফেরা করিতে পারে না এমন ব্যক্তি কিংবা অন্ধ, খোঁড়া বা পা-কাটা লোকের জমা'আত মা'ফ। অন্ধ ব্যক্তি যদি অনায়াসে মসজিদে পৌঁছিতে পারে, তবে তাহার জমা'আত তরক করা উচিত নহে।

জমা'আতে (নামায পড়ার) হেকমত ও উপকারিতা

জমা'আতে নামায পড়ার হেকমত সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ওলামাগণ অনেকে অনেক কিছু আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ্ (রঃ) মুহাদ্দিসে দেহ্‌লভীর সার্বিক ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোনটি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শাহ্ ছাহেবের পবিত্র ভাষায় ঐগুলি শুনিতে পারিলে পাঠকবৃন্দ পূর্ণরূপে স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেন। সংক্ষেপে আমি এখানে শাহ্ ছাহেবের বর্ণনার সারমর্ম লিখিতেছিঃ

১। ইহাই একমাত্র উত্তম পন্থা যে, কোন এবাদতকে মুসলিম সমাজে এমনভাবে প্রথায় প্রচলিত করিয়া দেওয়া, যেন উহা একটি অত্যাবশ্যকীয় হিতকর এবাদতে পরিগণিত হয় এবং পরে উহা বর্জন করা চিরাচরিত অভ্যাস বর্জন করার ন্যায় দুষ্কর ও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

ইসলামে একমাত্র নামাযই সর্বাধিক শানদার এবং গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। কাজেই নামাযকে অত্যধিক গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে বিশেষ ব্যবস্থাপনার সহিত আদায় করিতে হইবে। ইহা একমাত্র জমা'আতে নামায পড়ার মাধ্যমেই সম্ভব।

২। সমাজে বিভিন্ন প্রকারের লোক থাকে। জাহেলও থাকে আলেমও থাকে। সুতরাং ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, সকলে একস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পরের সম্মুখে এই এবাদতকে আদায় করে। কাহারো কোন ভুল ভ্রান্তি হইলে অন্যে তাহা সংশোধন করিয়া দিবে। যেন আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত একটি অলংকার বিশেষ। যেমন যাহারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহারা উহাতে দোষ থাকিলে বলিয়া দেয়, আর যাহা ভাল হয় তাহা পছন্দ করে। নামাযকে পূর্ণাঙ্গ করিবার ইচ্ছা একটি উত্তম পন্থা।

৩। যাহারা বে-নামাযী তাহাদের অবস্থাও প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইহাতে তাহাদের ওয়ায নছীহতের সুযোগ হইবে।

৪। কতিপয় মুসলমান মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করা এবং তাঁহার নিকট দো'আ প্রার্থনা করার মধ্যে আল্লাহ্‌র রহ্‌মত নাযিল হওয়ার ও দো'আ কবূল হওয়ার একটি আশ্চর্য-জনক বিশেষত্ব।

৫। এই উম্মত দ্বারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হইল তাঁহার বাণীকে সমুন্নত করা এবং কুফরকে অধঃপাতিত করা—ভূপৃষ্ঠে কোন ধর্ম যেন ইসলামের উপর প্রবল না থাকে। ইহা তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন এই নিয়ম নির্ধারিত হইবে যে, সাধারণ ও বিশিষ্ট মুকীম মুসাফির, ছোট বড় সকল মুসলমান নিজেদের কোন বড় ও প্রসিদ্ধ এবাদতের জন্য এক স্থানে সমবেত (একত্রিত) হইবে এবং ইসলামের শান শওকত প্রকাশ করিবে। এই সমস্ত যুক্তিতে শরীঅতের পূর্ণ দৃষ্টি জমা'আতের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং উহার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং জমা'আত ত্যাগ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

৬। জমা'আতে এই উপকারিতাও রহিয়াছে যে, সকল মুসলমান একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইতে থাকিবে। একে অপরের ব্যথা বেদনায় শরীক হইতে পারিবে, যদ্দ্বারা ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব

এবং ঈমানী ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ ও উহার দৃঢ়তা সাধিত হইবে। ইহা শরীঅতের একটি মহান উদ্দেশ্যও বটে। কোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন স্থানে ইহার তাকীদ ও ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমাদের এযুগে জমা'আত তরক করা একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। জাহেলদের তো কথাই নাই, অনেক আলেমও এই গর্হিত কাজে লিপ্ত দেখা যায়। পরিতাপের বিষয়, ইহারা হাদীস পড়ে এবং অর্থ বুঝে, অথচ—জমা'আতে নামায পড়ার কঠোর তাকীদগুলি তাহাদের প্রস্তর হইতেও কঠিন হৃদয়ে কোন ক্রিয়া করিতেছে না। কিয়ামতে মহাবিচারকের সামনে যখন নামাযের মোকদ্দমা পেশ করা হইবে এবং উহা অনাদায়কারী বা অপূর্ণ আদায়কারীদিগকে জিজ্ঞাসা শুরু হইবে, তখন ইহারা কি জবাব দিবে?

জমা'আত ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ

ইমামের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুসরণ করিয়া নামায পড়ার এরাদা করাকে "এক্তেদা করা" বলে।

১ম শর্ত ঃ ইমাম মুসলমান হওয়া চাই। ইমামের যদি ঈমান না থাকে, তবে নামায ছহীহ্ হইবে না।

২য় শর্ত ঃ ইমাম বোধমান হওয়া। নাবালেগ, উন্মাদ বা বেহুঁশ ব্যক্তির পিছনে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না।

৩য় শর্ত ঃ মুক্তাদী নামাযের নিয়্যতের সঙ্গে সঙ্গে ইমামের এক্তেদার নিয়্যত করা। অর্থাৎ মনে মনে এই নিয়্যত করা যে, আমি এই ইমামের পিছনে অমুক নামায পড়িতেছি।

৪র্থ শর্ত ঃ ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের স্থান একই হওয়া। যদি ছোট মসজিদের বা ছোট ঘরে ইমাম হইতে দুই কাতার অপেক্ষাও কিছু দূরে মুক্তাদী দাঁড়ায়, তবুও এক্তেদা ছহীহ্ হইবে, কেননা স্থান একই আছে। কিন্তু অতি প্রকাণ্ড মসজিদ, ঘর বা ময়দানের মধ্যে ইমাম এবং মুক্তাদীর মধ্যে দুই কাতার পরিমাণ ব্যবধান হইলেও এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না। যদি ইমাম এবং মুক্তাদীর মধ্যে এমন একটি খাল থাকে যাহাতে নৌকা চলিতে পারে বা এমন একটি রাস্তা থাকে যাহাতে গরুর গাড়ী চলিতে পারে, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না, কিন্তু যদি ঐ খাল বা রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং খালের মধ্যে নৌকা রাখিয়া তাহার উপর খাড়া হয় এবং রাস্তার মধ্যেও কাতার দেওয়া হয়, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে, কেননা কাতার থাকায় দুই পাড় মিলিয়া একই স্থান ধরা হইবে। যদি খাল ও রাস্তা অতি সরু হয়, তবুও এক্তেদা ছহীহ্ হইবে।

এক্তেদা ছহীহ্ হওয়ার শর্ত

১। মাসআলা ঃ যদি মুক্তাদী মসজিদের ছাদের উপর দাঁড়ায় এবং ইমাম মসজিদের ভিতরে থাকে, তবে এক্তেদা দুরুস্ত আছে। কেননা, মসজিদের ছাদ মসজিদের শামিল। কাজেই উভয় স্থানকে একই বুঝিতে হইবে। এরূপ যদি কোন দালানের ছাদ মসজিদের সংলগ্ন হয় এবং মাঝখানে কোন আড় না থাকে, তবে উহা এবং মসজিদ একই স্থান বুঝিতে হইবে। উহার উপর দাঁড়াইয়া মসজিদের ভিতরের ইমামের এক্তেদা করা দুরুস্ত আছে।

২। মাসআলা ঃ যদি মসজিদ খুব বড় হয় বা ঘর খুব বড় হয় কিংবা মাঠ হয় এবং ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে দুই কাতার পরিমাণ জায়গা খালি থাকে, তবে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের স্থান পৃথক বুঝিতে হইবে এবং এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না।

৩। মাসআলা ঃ যদি ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে কোন খাল থাকে যাহাতে নৌকা ইত্যাদি চলিতে পারে, অথবা এত বড় হাউজ রহিয়াছে, যাহাতে সামান্য নাজাছত পড়িলে শরীঅত মতে উহা পাক, কিংবা সাধারণের চলাচলের পথ আছে, যাহাতে গরুর গাড়ী ইত্যাদি চলিতে পারে এবং মাঝখানে কোন কাতার না থাকে, তবে উভয় স্থানকে এক ধরা যাইবে না; কাজেই এক্তেদা দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি খুব ছোট নালা মাঝখানে থাকে যাহা একটি সংকীর্ণ রাস্তার সমান নহে। (যে পথ দিয়া একটি উট চলিতে পারে উহাকে সংকীর্ণ রাস্তা ধরা হয়) উহা এক্তেদার প্রতিবন্ধক নহে; এক্তেদা দুরুস্ত হইবে।

৪। মাসআলা ঃ দুই কাতারের মাঝখানে যদি উক্তরূপ কোন খাল কিংবা পথ থাকে, যাহারা খাল বা পথের অপর পাড়ে আছে তাহাদের ঐ কাতারের এক্তেদা দুরুস্ত হইবে না।

৫। মাসআলা ঃ একজন ঘোড়ার উপর এবং একজন মাটিতে আছে বা একজন এক ঘোড়ায় আছে অন্য জন অন্য ঘোড়ার উপর আছে, ইহাদের এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না; কেননা, ইহাদের স্থান এক নহে। একজন এক নৌকায় এবং অন্যজন অন্য নৌকায় আছে ইহাদের এক্তেদাও ছহীহ্ হইবে না। অবশ্য যদি (দুই নৌকা একত্রে রশি দিয়া বাঁধিয়া লয় বা) একই ঘোড়ার উপর দুইজন হয়, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে।

৫ম শর্ত ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর নামায এক হওয়া চাই, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে নতুবা নয়। যদি ইমাম যোহরের ক্বাযা পড়ে মুক্তাদী তাহার পিছে আছরের বা ইমাম গতকল্যের যোহরের ক্বাযা পড়ে, মুক্তাদী আজকার যোহরের নিয়্যত করিয়া এক্তেদা করে (বা ইমাম উচ্চস্বরে কেরাআত করিয়া নফল পড়া শুরু করিয়াছে তাহার পিছনে যদি কেহ মাগরিবের বা এশার ফরযের বা তারাবীহ্‌র এক্তেদা করে,) তবে এইসব এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না। অবশ্য যদি ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে একই ওয়াক্তের ক্বাযা এক সঙ্গে মিলিয়া পড়ে তাহা জায়েয আছে, বা ইমাম ফরয পড়িতেছে মুক্তাদী তাহার পিছে নফলের এক্তেদা করিতেছে তাহা জায়েয আছে। কেননা, ইমামের নামায সবল।

৬। মাসআলা ঃ ইমাম নফল পড়িতেছে মুক্তাদী তারাবীর এক্তেদা করিল, ছহীহ্ হইবে না। কেননা, ইমামের নামায দুর্বল।

৬ষ্ঠ শর্ত ঃ ইমামের নামায ছহীহ্ হওয়া চাই। যদি ইমামের নামায ছহীহ্ না হয়, তবে মুক্তাদীর নামাযও ছহীহ্ হইবে না। ঘটনাক্রমে যদি ইমামের ওযূ না থাকে, বা কাপড়ে নাজাছাত থাকে এবং নামাযের পূর্বে স্মরণ না থাকাবশতঃ নামাযে দাঁড়াইয়া যায়, তারপর নামাযের মধ্যে স্মরণ আসুক বা নামাযের পর স্মরণ আসুক তাহার নামায হইবে না এবং মুক্তাদীদের নামাযও হইবে না।

৭। মাসআলা ঃ যদি ঘটনাক্রমে ইমামের নামায না হয় এবং মুক্তাদীদের তাহা জানা না থাকে, তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া ইমামের উপর ওয়াজিব এবং নামায দোহ্‌রাইয়া পড়া তাহাদের উপর ওয়াজিব।

৭ম শর্ত ঃ ইমাম হইতে মুক্তাদী আগাইয়া দাঁড়ান উচিত নহে। মুক্তাদী ইমাম হইতে এক ইঞ্চিও আগাইয়া দাঁড়াইলে মুক্তাদীর নামায হইবে না। কিন্তু পায়ের গোড়ালী আগে না গিয়া মুক্তাদীর আঙ্গুল লম্বা হওয়ার কারণে আগে গেলে নামায হইয়া যাইবে।

৮ম শর্ত ঃ ইমামের উঠা, বসা, রুকূ, ক্বওমা, সজ্‌দা ও জলসা ইত্যাদি মুক্তাদীর জানা আবশ্যক; ইমামকে দেখিয়া জানুক বা ইমামের বা মোকাব্বেরের আওয়ায শুনিয়া জানুক বা অন্য মুক্তাদীগণকে দেখিয়া জানুক, মোটের উপর ইমামের উঠা-বসা ইত্যাদি মোক্তাদীর জানা আবশ্যক। যদি কোন কারণবশতঃ ইমামের উঠা-বসা ইত্যাদি মুক্তাদী জানিতে না পারে, যেমন, হয়ত যদি মাঝখানে উঁচু পরদা বা দেওয়াল থাকে এমন কি ইমাম বা মোকাব্বেরের আওয়াযও শুনিতে না পায়, তবে মুক্তাদীর নামায হইবে না। অবশ্য যদি উঁচু দেওয়াল মাঝখানে থাকা সত্ত্বেও ইমাম মোকাব্বেরের আওয়ায শুনিতে পায়, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে (কিন্তু পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভিন্ন জায়গা হইলে মাঝখানে যেন দুই কাতার পরিমাণ ব্যবধান না থাকে।)

৮। মাসআলা ঃ যদি ইমাম মুসাফির না মুকীম জানা না থাকে কিন্তু লক্ষণে মুকীম বলিয়া মনে হয়, যদি শহর কিংবা গ্রামে হয় এবং মুসাফিরের ন্যায় নামায পড়ায় অর্থাৎ চারি রাকা'আতী নামাযে দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরায় এবং মুক্তাদীগণ সালামের কারণে ভুল হওয়ার সন্দেহ করে, তবে ঐ মুক্তাদিকে চারি রাকা'আত পুরা করার পর ইমামের অবস্থা অনুসন্ধান করা ওয়াজিব যে, ইমামের ভুল হইয়াছে, না মুসাফির ছিল। যদি সন্ধানে মুসাফির হওয়া জানিতে পারে, তবে নামায ছহীহ্ হইয়াছে। আর যদি ভুল সাব্যস্ত হয়, তবে নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িবে। আর যদি অনুসন্ধান না করে বরং মুক্তাদী ঐ সন্দেহের অবস্থায় নামায পড়িয়া চলিয়া যায়, তবে এমতাবস্থায়ও মুক্তাদীর নামায দোহ্‌রাইয়া পড়া ওয়াজিব।

৯। মাসআলা ঃ যদি ইমাম মুকীম বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নামায শহরে কিংবা গ্রামে পড়াইতেছে না বরং শহর কিংবা গ্রামের বাহিরে পড়াইতেছে এবং চারি রাকা'আতী নামায মুসাফিরের ন্যায় পড়ায় মুক্তাদীর সন্দেহ হইল যে, ইমামের ভুল হইয়াছে, এমতাবস্থায়ও মুক্তাদী নিজের চারি রাকা'আত পুরা করিবে এবং নামাযের পর ইমামের অবস্থা জানিয়া লওয়া ভাল; না জানিয়া লইলেও নামায ফাসেদ হইবে না। কেননা, শহর কিংবা গ্রামের বাহিরে ইমামের ব্যাপারে মুক্তাদীদের ভুল হওয়ার ধারণা করা অহেতুক। কাজেই এমতাবস্থায় অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। এইরূপ ইমাম যদি চারি রাকা'আতী নামায শহর কিংবা গ্রামে বা মাঠে পড়ায় আর যদি কোন মুক্তাদীর ইমাম মুসাফির বলিয়া সন্দেহ হয়, কিন্তু ইমাম পুরা চারি রাকা'আত পড়াইয়াছে, তবুও নামাযের পর ইমামের সন্ধান লওয়া ওয়াজিব নহে। ফজর ও মাগরিবের নামাযে ইমাম মুসাফির কিনা তাহা সন্ধান লওয়ার প্রয়োজন নাই। কারণ, এইসব নামাযে মুকীম মুসাফির সবই সমান। সারকথা এই—সন্ধান ঐ সময় লইতে হইবে যখন ইমাম শহর কিংবা গ্রামে অথবা অন্য কোন স্থানে চারি রাকা'আতী নামাযে দুই রাকা'আত পড়ায় এবং ইমামের ভুল হইয়াছে বলিয়া মুক্তাদীর সন্দেহ হয়।

৯ম শর্ত ঃ কেরাআত ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রোকনের মধ্যে ইমামের সঙ্গে মুক্তাদীর শরীক থাকা চাই। তাহা ইমামের সঙ্গেই হউক বা তাহার পর কিংবা ইমামের আগে, যদি ঐ রোকনের শেষ পর্যন্ত ইমাম মুক্তাদীর শরীক হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত এই যে, ইমামের সঙ্গেই রুকূ সজ্‌দা করা। দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত হইল-ইমাম রুকূ হইতে দাঁড়াইবার পর মুক্তাদীর রুকূ

করা। তৃতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত হইল—আগেই রুকূ করিল কিন্তু রুকূতে এত দেরী করিল যে, ইমামের রুকূ তাহার সহিত মিলিত হইলে অর্থাৎ মুক্তাদী রুকূতে থাকিতেই ইমাম রুকূতে গেল।

১০। মাসআলাঃ যদি কোন রোকনে মুক্তাদী ইমামের সহিত শরীক না হয়, যেমন ইমাম রুকূ করিল কিন্তু মুক্তাদী রুকূ করিল না, অথবা ইমাম দুই সজ্‌দা করিল কিন্তু মুক্তাদী একটি সেজদা করিল কিংবা ইমামের পূর্বে কোন রোকন শুরু করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ইমাম ইহাতে শরীক হয় নাই, যেমন মুক্তাদী ইমামের পূর্বেই রুকূতে গেল, কিন্তু ইমামের রুকূ করার পূর্বেই রুকূ হইতে দাঁড়াইয়া গেল। এই উভয় অবস্থায় এক্তেদা দুরুস্ত হইল না।

১০ম শর্তঃ মুক্তাদীর অবস্থা ইমামের চেয়ে কম বা সমান হওয়া চাই।

১। দাঁড়াইতে অক্ষম ব্যক্তির পিছনে দাঁড়াইতে সক্ষম ব্যক্তির এক্তেদা দুরুস্ত আছে।

২। ওযূ বা গোসলের তায়াম্মুমকারীর পিছনে ওযূ গোসলকারীর এক্তেদা দুরুস্ত আছে। কেননা পবিত্রতার ব্যাপারে তায়াম্মুম ও ওযূ-গোসল সমান। কোনটি কোনটি হইতে কম নহে।

৩। চামড়ার মোজা বা পট্টির উপর মছহেকারীর পিছনে ওযূ ও সর্বাঙ্গ ধৌতকারীর এক্তেদা দুরুস্ত আছে। কেননা, মছহে করা এবং ধোয়া একই পর্যায়ের তাহারত। কোনটির উপর কোনটির প্রাধান্য নাই।

৪। মাযূরের পিছনে মাযূরের এক্তেদা দুরুস্ত আছে, যদি উভয়ে একই ওযরে মাযূর হয়। যেমন, উভয়ের বহুমূত্র বা উভয়ের বায়ু নির্গত হওয়ার রোগ হয়।

৫। উম্মীর এক্তেদা উম্মীর পিছনে দুরুস্ত আছে যদি মুক্তাদীর মধ্যে একজনও ক্বারী না থাকে।

৬। স্ত্রীলোক বা নাবালেগের এক্তেদা বালেগ পুরুষের পিছনে দুরুস্ত আছে।

৭। স্ত্রীলোকের এক্তেদা স্ত্রীলোকের পিছনে দুরুস্ত আছে।

৮। নাবালেগা স্ত্রীলোক বা নাবালেগ পুরুষের এক্তেদা নাবালেগ পুরুষের পিছনে দুরুস্ত আছে।

৯। নফল পাঠকারীর এক্তেদা ওয়াজিব পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত আছে। যেমন, কেহ যোহরের নামায পড়িয়াছে, সে অন্য যোহরের নামায পাঠকারীর পিছনে নামায পড়িল অথবা ঈদের নামায পড়িয়াছে সে পুনরায় অন্য জমা'আতের নামাযে শরীক হইল।

১০। নফল পাঠকারীর এক্তেদা নফল পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত আছে।

১১। কসমের নামায পাঠকারীর এক্তেদা নফল পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত আছে। কেননা, কসমের নামাযও মূলতঃ নফলই বটে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি কসম খাইল যে, আমি দুই রাকা'আত নামায পড়িব, অতঃপর কোন নফল পাঠকারীর পিছনে দুই রাকা'আত পড়িল। নামায হইয়া যাইবে এবং কসম পুরা হইয়া গেল।

১২। মান্নতের নামায পাঠকারীর এক্তেদা মান্নতের নামায পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত আছে, যদি উভয়ের মান্নত এক হয়। যেমন, এক ব্যক্তির মান্নতের পর অপর ব্যক্তি বলিল, আমিও উহারই মান্নত করিলাম অমুকে যাহার মান্নত করিয়াছে। যদি এরূপ না হয় বরং একজনে দুই রাকা'আতে ভিন্ন মান্নত করিয়াছে এবং অপর ব্যক্তি অন্য মান্নত করিয়াছে, ইহাদের কেহই কাহারও পিছনে এক্তেদা দুরুস্ত হইবে না। সারকথা যখন মুক্তাদী ইমাম হইতে কম কিংবা সমান হইবে, তখন এক্তেদা দুরুস্ত হইবে।

এক্তেদা দুরুস্ত নাইঃ

এখন ঐ প্রকারগুলি বর্ণনা করিতেছি, যাহাতে মুক্তাদী ইমাম হইতে মর্তবায় বেশী হয়, চাই একীনী হউক কিংবা এহ্‌তেমালী (সম্ভাব্য) হউক, এক্তেদা দুরুস্ত নাই।

১। বালেগ পুরুষ বা স্ত্রীর এক্তেদা নাবালেগের পিছনে দুরুস্ত নাই। ২। বালেগ বা নাবালেগ পুরুষের এক্তেদা স্ত্রীলোকের পিছনে দুরুস্ত নাই। ৩। নপুংসকের এক্তেদা নপুংসকের পিছনে দুরুস্ত নাই। নপুংসক উহাকেই বলে, যাহাকে স্ত্রী বা পুরুষ সঠিক কোনটাই বলা যায় না। এধরনের লোক খুব কম। ৪। যে স্ত্রীলোকের হায়েযের নির্দিষ্ট সময়ের কথা মনে নাই, তাহার এক্তেদা অনুরূপ স্ত্রীলোকের পিছনে দুরুস্ত নাই। এই দুই অবস্থায় ইমাম হইতে মুক্তাদীর মান বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।সুতরাং এক্তেদা জায়েয নাই। কেননা, প্রথম অবস্থায় যে নপুংসক ইমাম হয়ত সে স্ত্রীলোক এবং যে মুক্তাদী নপুংসক হয়ত সে পুরুষ। অনুরূপভাবে যে স্ত্রীলোক ইমাম, হয়ত ইহা তাহার হায়েযের সময় আর যে মুক্তাদী হয়ত ইহা তাহার পবিত্রতা বা তাহারতের সময়। তাই এক্তেদা ছহীহ্ হয় না। ৫। স্ত্রীলোকের পিছনে নপুংসকের এক্তেদা দুরুস্ত নাই। কেননা, সে নপুংসক পুরুষ হইতে পারে। ৬। উন্মাদ, বেহুঁশ বা বে-আকলের পিছনে সজ্ঞান লোকের এক্তেদা দুরুস্ত নাই। ৭। পাক বা ওযরহীন ব্যক্তির এক্তেদা মাযূর যেমন বহুমূত্র ইত্যাদি রোগীর পিছনে দুরুস্ত নাই। ৮। এক ওযরওয়ালার এক্তেদা দুই ওযরওয়ালার পিছনে দুরুস্ত নাই। যেমন কাহারও বায়ু নির্গত হওয়ার রোগ আছে তাহার এমন লোকের এক্তেদা করা যাহার বায়ু নির্গত ও বহুমূত্র রোগ আছে। ৯। এক প্রকারের মাযূরের পিছনে অন্য প্রকার মাযূরের এক্তেদা দূরুস্ত নাই। যেমন বহুমূত্র রোগীর নাক্সীর রোগীর এক্তেদা করা।

১০। ক্বারীর এক্তেদা উম্মীর পিছনে দুরুস্ত নাই। ক্বারী তাহাকেই বলে, এতটুকু কোরআন ছহীহ্ করিয়া পড়িতে পারে, যাহাতে নামায হইয়া যায়। উম্মী তাহাকে বলে, যাহার এতটুকু ইয়াদ নাই।

১১। উম্মীর এক্তেদা উম্মীর পিছনে জায়েয নাই যদি মুক্তাদীর মধ্যে কোন ক্বারী উপস্থিত থাকে। কারণ, এই অবস্থায় ঐ উম্মী ইমামের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। কেননা ঐ ক্বারীকে ইমাম বানান সম্ভব ছিল এবং তাহার ক্বেরাআত মুক্তাদীর পক্ষ হইতে যথেষ্ট হইত। যখন ইমামের নামায ফাসেদ হইল, তখন উম্মী মুক্তাদীসহ সকল মুক্তাদীর নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১২। উম্মীর এক্তেদা বোবার পিছনে দুরুস্ত নাই। কেননা, উম্মী যদিও উপস্থিত ক্বেরাআত পড়িতে পারে না, কিন্তু পড়িতে তো সক্ষম। কারণ, সে ক্বেরাআত শিখিতে পারে, বোবার মধ্যে এই ক্ষমতাটুকুও নাই।

১৩। ফরয পরিমাণ শরীর ঢাকা ব্যক্তির এক্তেদা উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে দুরুস্ত নাই।

১৪। রুকূ সজ্‌দা করিতে সক্ষম ব্যক্তির এক্তেদা রুকূ সজ্‌দা করিতে অক্ষমের পিছনে দুরুস্ত নাই। আর যদি কোন ব্যক্তি শুধু সজ্‌দা করিতে অক্ষম হয়,তাহার পিছনেও এক্তেদা দুরুস্ত নাই। ১৫। ফরয পাঠকারীর এক্তেদা নফল পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত নাই। ১৬। মান্নতের নামায পাঠকারীর এক্তেদা নফল নামায পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত নাই। কেননা, মান্নতের নামায ওয়াজিব। ১৭। মান্নতের নামায পাঠকারীর এক্তেদা কসমের নামায পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত নাই। যেমন, যদি কেহ কসম খায় যে, আজ আমি ৪ রাকা'আত নামায পড়িব, আর একজনে মান্নত করিল, আমি নামায পড়িব। তখন ঐ মান্নতকারীর নামায কসমকারীর পিছনে দরুস্ত হইবে

না। কেননা, মান্নতের নামায ওয়াজিব আর কসমের নামায নফল। কেননা, কসম পুরা করা ওয়াজিব হইলেও ইহাতে নামায না পড়িয়া কাফ্‌ফারা দিলেও চলে।

১৮। মাসআলাঃ যে ব্যক্তি সাধারণ হরফগুলি ছহীহ্ করিয়া আদায় করিতে পারে না এক হরফের জায়গায় অন্য হরফ পড়ে যেমন, ح এর জায়গায় ز পড়ে, غ এর স্থানে گ পড়ে, এরূপ ব্যক্তির পিছনে ছহীহ্ পাঠকারীর এক্তেদা দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য সমস্ত কেরাআতের মধ্যে যদি এক আধটা অক্ষর অসতর্কতা হেতু ভুল হইয়া যায়, তবে নামায হইয়া যাইবে।

১১শ শর্তঃ ইমামের ওয়াজিবুল এনফেরাদ (অর্থাৎ যাহার একাকী নামায পড়া ওয়াজিব; যেমন, মাসবুক) না হওয়া চাই। অতএব, মাসবুকের পিছনে এক্তেদা জায়েয নহে।

১২শ শর্তঃ মুক্তাদীর পিছনে এক্তেদা জায়েয নহে—লাহেক হউক, মাসবুক হউক বা মোদ্‌রেক হউক।

কোন মুছল্লীর মধ্যে উপরোক্ত ১২ শর্তের কোন শর্ত পাওয়া না যাওয়ার কারণে এক্তেদা ছহীহ্ না হইলে নামাযও ছহীহ্ হইবে না।

জমা'আতের বিভিন্ন মাসায়েল

মাসআলাঃ জুমু'আ এবং দুই ঈদের নামাযের জন্য জমা'আত হওয়া শর্ত। জমা'আত না হইলে অর্থাৎ, ইমাম ছাড়া অন্ততঃ তিনজন লোক না হইলে জুমু'আ এবং ঈদের নামায ছহীহ্ হইবে না। পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য জমা'আত ওয়াজিব, যদি কোন ওযর না থাকে। তারাবীহ্‌র নামাযের জন্য জমা'আত সুন্নতে মোয়াক্কাদা। তারাবীহ্‌র নামাযে একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। কোরআন খতম হইয়া থাকিলে তারপর যদি সূরা তারাবীহ্ পড়া হয়, তখনও জমা'আত সুন্নতে মোয়াক্কাদা। সূর্য-গ্রহণের নামায এবং রমযান শরীফে বেৎরের নামাযে জমা'আত মোস্তাহাব। রমযান শরীফ ব্যতীত অন্য সময় বেৎরের নামায জমা'আতে পড়া মকরূহ্ তান্‌যীহী। অবশ্য যদি ক্বচিৎ কোন সময় জমা'আতে পড়িয়া লয়, তবে মকরূহ্ হইবে না। চন্দ্র গ্রহণের নামায এবং অন্যান্য সব নফল নামাযে প্রকাশ্যভাবে জমা'আত করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য যদি ক্বচিৎ কোন সময় দুই তিনজন লোক জমা'আতে পড়িয়া লয়, তবে মকরূহ্ হইবে না। ফরয নামাযে জমা'আতে ছানিয়া (অর্থাৎ প্রথম জমা'আত হইয়া গেলে আবার জমা'আত করা) মকরূহ্। কিন্তু যদি সদর রাস্তার উপর মসজিদ হয় বা প্রথম জমা'আত প্রকাশ্য আযান ছাড়া নামায পড়া হইয়া থাকে বা মসজিদের নির্দিষ্ট মুছল্লী ও মোতাওল্লী ছাড়া অন্য লোকে জমা'আত করিয়া থাকে বা মসজিদের ইমাম, মোয়ায্‌যিন, মুছল্লী, জমা'আত কিছুই ঠিক না থাকে, অথবা মসজিদ ছাড়া অন্য জায়গায় জমা'আত পড়ে, তবে ছানি জমা'আত মকরূহ্ হইবে না। কিন্তু ইমাম আবু-ইউসুফ ছাহেব (রঃ) বলেন যে, সমস্ত শর্ত পাওয়া গেলেও ঐ মসজিদেই স্থান পরিবর্তন করিয়া জমা'আতে ছানিয়া করিলে মকরূহ্ হইবে না। ইমাম আযম ছাহেবের ক্বওল দলীলের দিক দিয়া অধিক প্রবল বলিয়া মোহাক্কেক আলেমগণ ইমাম ছাহেবের ক্বওলের উপরই ফৎওয়া দিয়া থাকেন। ইমাম আযম ছাহেব স্থান পরিবর্তন করা সত্ত্বেও এক মসজিদে দুই জমা'আত মকরূহ্ বলেন। কোন কারণে জমা'আত ছুটিয়া গেলে, হয় একা একা চুপে চুপে পড়িবে, না হয় মসজিদের বাহিরে অন্যত্র গিয়া জমা'আত করিবে। —অনুবাদক

ইমাম ও মোক্তাদী সম্পর্কে মাসায়েল

১। **মাসআলাঃ** সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত এবং অধিক গুণশালী ব্যক্তিকেই ইমাম নিযুক্ত করা মুছল্লীদের কর্তব্য। সর্বাপেক্ষা অধিক গুণশালী লোককে বাদ দিয়া অন্যকে ইমাম নিযুক্ত করা সুন্নতের খেলাফ। যদি একই গুণবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক লোক দলের মধ্যে থাকে, তবে অধিক সংখ্যক মুছল্লী যাঁহাকে মনোনীত করিবে, তিনিই ইমাম পদে নিযুক্ত হইবেন। (কোন স্বার্থের বশীভূত হইয়া যোগ্য ব্যক্তি থাকিতে অযোগ্য ব্যক্তিকে বা অধিক যোগ্য লোক থাকিতে কমযোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিলে বা ভোট দিলে গোনাহ্গার হইবে। ভোটের আধিক্যে যোগ্যতা সাব্যস্ত করা চলিবে না। শরীঅতের হুকুমই সকলের বিনাবাক্যে মানিয়া লইতে হইবে) শরীঅতের হুকুম এইঃ

২। **মাসআলাঃ** ১ম, আলেম যদি ফাসেক না হন, কোরআন গলত না পড়েন এবং সুন্নত পরিমাণ কোরআন তাঁহার মুখস্থ থাকে, তবে আলেমই সর্বাগ্রগণ্য। ২য়, যাহার কেরাআত ভাল (গলার সুর নয়,)—তজবীদের কাওয়ায়েদ অনুযায়ী যে পড়ে, সে-ই অধিক যোগ্য। ৩য়, যাহার তাক্বওয়া বেশী সে-ই অধিক যোগ্য। ৪র্থ, বয়সে যে বড় সে-ই অধিক যোগ্য। ৫ম, যাহার আচার-ব্যবহার ভদ্র এবং কথাবার্তা মিষ্ট সে-ই অধিক যোগ্য। ৬ষ্ঠ, যে অধিক সুন্দর পুরুষ। ৭ম, যে সবচেয়ে বেশী শরীফ। ৮ম, যাহার আওয়ায সব চেয়ে ভাল। ৯ম, যাহার লেবাস পোশাক ভাল। ১০ম, যাহার মাথা মানানসই বড়। ১১শ, মুসাফিরের তুলনায় মুক্বীম অগ্রগণ্য। ১২শ, যে বংশানুক্রমে আযাদ। ১৩শ, ওযূর তায়াম্মুমকারী গোসলের তায়াম্মুমকারীর চেয়ে যোগ্য। ১৪শ, যাহার মধ্যে একাধিক গুণ থাকিবে সে এক গুণের অধিকারী অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে। যথা, যদি একজন আলেম হয় এবং ক্বারীও হয়, আবার অন্যজন শুধু আলেম বা শুধু ক্বারী হয়, তবে যে আলেম-ক্বারী সে-ই অগ্রগণ্য হইবে। (যাঁহার মধ্যে উপরের গুণ থাকিবে, তিনি নীচের গুণের দুই বা ততোধিকের অধিকারী অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবেন।) একজন যদি অনেক বড় আলেম হন, কিন্তু আমল ঠিক না হয় বা কেরাআত গলত পড়েন এবং অন্য একজন বড় আলেম নন, কিন্তু কেরাআত ছহীহ্ পড়েন এবং আমলও ভাল; তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই অগ্রগণ্য হইবেন।) —দুর্‌রে মুখতার

৩। **মাসআলাঃ** কাহারও বাড়ীতে জমা'আত হইলে বাড়ীওয়ালাই ইমামতের জন্য অগ্রগণ্য। তারপর বাড়ীওয়ালা যাহাকে হুকুম করে, সে-ই অগ্রগণ্য অবশ্য বাড়ীওয়ালা যদি একেবারে অযোগ্য হয়, তবে অন্য যোগ্য ব্যক্তি অগ্রণ্য হইবে। —দুর্‌রে মুখতার

৪। **মাসআলাঃ** কোন মসজিদে কোন (যোগ্য) ইমাম নিযুক্ত থাকিলে সে মসজিদে অন্য কাহারও ইমামতের হক্ নাই। অবশ্য নিযুক্ত ইমাম যদি অন্য কোনো যোগ্য লোককে ইমামত করিতে বলে, তবে ক্ষতি নাই (যোগ্যতা থাকিলে বলাই উচিত) —দুর্‌রে মুখতার

৫। **মাসআলাঃ** মুসলমান বাদশাহ্ বা তাঁহার নির্বাচিত কর্মচারী উপস্থিত থাকিতে অন্য কাহারও ইমামতের হক্ নাই। —শামী

৬। মাসআলা ঃ মুছল্লিগণকে নারায করিয়া তাহাদের অমতে ইমামতি করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য ইমাম যদি আলেম মুত্তাকী এবং ইমামতের যোগ্য লোক হন এবং ঐরূপ যোগ্যতা অন্যের মধ্যে পাওয়া না যায়, তবে মকরূহ্ হইবে না ; বরং নারায ব্যক্তিই অন্যায়কারী হইবে। —দুঃ মুঃ

৭। মাসআলা ঃ ফাসেক বা বেদ'আতীকে ইমাম নিযুক্ত করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য খোদা না করুন, যদি ঐ লোক ছাড়া উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেহ উপযুক্ত না থাকে, তবে মকরূহ্ হইবে না। এইরূপ এমন কোন প্রভাবশালী ফাসেক বা বেদ'আতী জোর জবরদস্তি ইমাম হইয়া বসে যে, তাহাকে বরখাস্ত করিলে মুসলমান সমাজে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হয় বা বরখাস্ত করিবার ক্ষমতাই না থাকে, তবে মুছল্লিগণ গোনাহ্‌গার হইবে না। (তবুও জমা'আত ছাড়া যাইবে না।) —দুর্‌রে মুখতার

৮। মাসআলা ঃ যদি পাক-নাপাকের প্রতি লক্ষ্য না রাখে অন্ধ বা রাতকানা লোককে ইমাম নিযুক্ত করা মাকরূহ্ তান্‌যীহী। অবশ্য যোগ্য ব্যক্তি হইলে পাক-নাপাকের রীতিমত খেয়াল রাখিলে এবং তাহার ইমামতে যদি কাহারও আপত্তি না থাকে, তবে মকরূহ্ হইবে না। —দুর্‌রে মুখতার, শামী

ওলাদুয্‌যিনাকে (হারামযাদ সন্তান) ইমাম বানান মকরূহ্ তান্‌যীহী। অবশ্য যদি সে এল্‌ম ও তাক্বওয়া হাছিল করিয়া যোগ্যতা অর্জন করে এবং মুছল্লিগণ তাহাকে ইমাম নিযুক্ত করিতে অমত না করে, তবে মকরূহ্ হইবে না। —দুঃ মুঃ

যে সুশ্রী নব্য যুবকের এখনও দাড়ি ভাল মত উঠে নাই, তাহাকে ইমাম বানান মকরূহ্।

৯। মাসআলা ঃ নামাযের সমস্ত ফরয এবং সমস্ত ওয়াজিবের মধ্যে ইমামের পায়রবী (অনুসরণ) করা মুক্তাদিগণের উপর ওয়াজিব। সুন্নত মোস্তাহাবের মধ্যে ইমামের পায়রবী ওয়াজিব নহে। (প্রত্যেকে নিজের যিম্মাদার নিজে) অতএব, যদি অন্য মাযহাবের ইমাম হয় ; (যেমন, যদি শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম হয়, তবে, আমাদের ইমামের ক্বওল অনুযায়ী সুন্নত ও মোস্তাহাবের আমল করিবে।) অর্থাৎ, যদি শাফেয়ী ইমাম রুকূতে যাইবার সময় এবং রুকূ হইতে উঠিবার সময় রফে ইয়াদায়েন করেন বা ফজরের নামাযে দো'আ কুনূত পড়েন, (যেহেতু এই কয়টি কাজ তাঁহার মাযহাব অনুযায়ী করা সুন্নত, আর আমাদের মাযহাব অনুযায়ী রফে ইয়াদায়েন না করা এবং ফজরে দো'আ কুনূত না পড়া সুন্নত ; কাজেই) আমরা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব, এই কাজে তাঁহার পায়রবী করিব না (কিংবা যদি শাফেয়ী ইমাম ঈদের নামাযের মধ্যে ১২ তক্‌বীর বলেন, তবে আমরা ছয় তক্‌বীর বলিয়া চুপ করিয়া থাকিব, কারণ তাহাদের নিকট ১২ তক্‌বীর ওয়াজিব নহে, সুন্নত, আমাদের মাযহাবে ছয় তক্‌বীর ওয়াজিব।) কিন্তু বেৎর নামাযে যদি শাফেয়ী ইমাম হন এবং রুকূর পর দো'আ কুনূত পড়েন, তবে আমরাও রুকূর পরই পড়িব, কারণ বেৎরের মধ্যে কুনূত পড়া ওয়াজিব। (আমাদের হানাফী মাযহাবে রুকূর আগে পড়া সুন্নত, তাঁহাদের মাযহাবে রুকূর পরে পড়া সুন্নত।

১০। মাসআলা ঃ একা নামায পড়িলে কেরাআত, রুকূ বা সজ্‌দা যত ইচ্ছা লম্বা করিবে; কিন্তু জমা'আতের নামাযে কেরাআত, রুকূ, সজ্‌দা সুন্নত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক লম্বা করা ইমামের জন্য মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। মুক্তাদীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ, যরূরত মন্দ ইত্যাদি সব রকমের লোকই থাকে, কাজেই তাহাদের সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইমামের কর্তব্য। দলের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল তাহার যেন কষ্ট না হয় তদনুযায়ী কাজ করিবে ; বেশী যরূরত হইলে কেরাআত সুন্নত

পরিমাণ অপেক্ষাও কম করা যাইতে পারে—যেন লোকের কষ্ট না হয় এবং জমা'আত ছোট হইবার কারণ না হয়। (সুন্নত পরিমাণের কথা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে।)

কাতারের মাসায়েল

১১। **মাসআলা ঃ** যদি মুক্তাদী একজন হয়, বয়স্ক পুরুষ হউক বা নাবালেগ বালক হউক, তবে ইমামের ডান পার্শ্বে ইমামের সমান বা কিঞ্চিৎ পিছনে দাঁড়াইবে। যদি বাম দিকে বা ইমামের সোজা পিছনে দাঁড়ায়, তবে মকরূহ্ হইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** একাধিক মুক্তাদী হইলে ইমামের পিছনে (এক সজ্দা পরিমাণ জায়গা মাঝখানে রাখিয়া) কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। (কাতার বাঁধিবার নিয়ম এই যে, প্রথমে একজন ইমামের ঠিক পিছনে দাঁড়াইবে, তারপর একজন ডানে একজন বামে, এইরূপে ক্রমাগত আগের কাতার পূর্ণ করিয়া তারপর দ্বিতীয় কাতারও এই নিয়মেই পূর্ণ করিবে।) যদি দুইজন মুক্তাদী হয় এবং একজন ইমামের (সমান) ডান পার্শ্বে আর একজন বাম পার্শ্বে দাঁড়ায়, তবে মক্রূহ তান্যীহী হইবে। কিন্তু দুইয়ের চেয়ে বেশী লোক ইমামের পার্শ্বে দাঁড়াইলে মক্রূহ্ তাহ্রীমী হইবে। কেননা, দুইয়ের অধিক মুক্তাদী হইলে ইমামকে আগে দাঁড়ান ওয়াজিব।

১৩। **মাসআলা ঃ** নামায শুরু করিবার সময় মাত্র একজন পুরুষ লোক মুক্তাদী ছিল এবং সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াইল। তারপর আরও কয়েকজন মুক্তাদী আসিল। এই অবস্থায় প্রথম মুক্তাদী (আস্তে আস্তে পা পিছের দিকে সরাইয়া) পিছনে সরিয়া আসা উচিত, যাহাতে সকল মুছল্লী মিলিয়া ইমামের পিছনে কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারে। যদি নিজে পিছনে না সরে, তবে আগন্তুক মুছল্লিগণ আস্তে হাত দিয়া তাহাকে পিছনের কাতারে টানিয়া আনিবে। যদি মাসআলা না জানাবশতঃ আগন্তুক মুছল্লিগণ তাহাকে পিছনে না টানিয়া ইমামের ডান ও বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যায়, তবে ইমাম আস্তে (এক কদম) আগে বাড়িয়া দাঁড়াইবে। (কিন্তু সজ্দার জায়গা হইতে আগে বাড়িবে না,) যাহাতে আগন্তুক মুছল্লিগণ প্রথম মোক্তাদীর সঙ্গে মিলিয়া এক কাতার সরিয়া ইমামের পিছনে দাঁড়াইতে পারে। যদি পিছনে জায়গা না থাকে, তবে মেক্তাদীর অপেক্ষা না করিয়া ইমামেরই আগে বাড়িয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমান যুগে লোকেরা সাধারণতঃ শরীঅতের মাসআলা মাসায়েল কম অবগত থাকে, কাজেই কাহাকেও পিছনে টানিয়া আনিতে যাওয়া উচিত নহে। ইহাতে হয়ত অন্য কোন কাজ করিয়া ফেলিতে পারে, যাহাতে তাহার নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১৪। **মাসআলা ঃ** মাত্র একজন স্ত্রীলোকও বা একটি নাবালেগা বালিকাও যদি ইমামের সঙ্গে এক্তেদা করে, তবে সে ইমামের পার্শ্বে দাঁড়াইবে না, তাহাকে ইমামের পিছনে দাঁড়াইতে হইবে (সে ইমামের স্ত্রী বা মা-ভগ্নীই হউক না কেন)।

১৫। **মাসআলা ঃ** যদি মুক্তাদিগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের লোক হয় অর্থাৎ কতক পুরুষ, কতক নাবালেগ বালক, কতক পর্দানশীন এবং কতক বালিকা হয় ; তবে ইমাম তাহাদিগকে এই নিয়ম ও তরতীব অনুসারে কাতার বাঁধিতে হুকুম করিবেন—প্রমথ পুরুষগণের, তারপর নাবালেগদের, তারপর পর্দানশীনদের, তারপর নাবালিগাদের কাতার হইবে।

১৬। **মাসআলা ঃ** কাতার সোজা করা, টেরা-বেঁকা হইয়া না দাঁড়ান এবং মাঝে ফাঁক না রাখিয়া পরস্পর গায়ে গায়ে মিশিয়া দাঁড়ান ওয়াজিব এবং ইহার জন্য মুছল্লিগণের আদেশ ও

হেদায়ত করা ইমামের উপর ওয়াজিব এবং মুছল্লীগণের সেই আদেশ পালন করা ওয়াজিব। (কাতার সোজা করার নিয়ম এই যে, কাঁধে কাঁধে এবং পায়ের টাখ্‌নার গিরার সঙ্গে মিলাইয়া বরাবর করিবে; কাহারও পা লম্বা বা খাট হওয়াবশতঃ অঙ্গুলী আগে পিছে থাকিলে তাহাতে কোন দোষ নাই।)

১৭। মাসআলা ঃ যদি আগের কাতার পরিপূর্ণ হইয়া যায় এবং তারপর মাত্র একজন লোক আসে, তবে তাহার একা একা কাতারে দাঁড়ান মকরূহ্। সে ইমামের সোজা পিছনের লোকটিকে পিছনের কাতারে টানিয়া আনিয়া তাহার সঙ্গে মিলিয়া কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইবে (এবং আগের কাতারে যে ফাঁকটুকু হইল তাহা ঐ কাতারের লোকেরা আস্তে আস্তে একটু একটু করিয়া পুরা করিয়া ফেলিবে, যাহাতে ফাঁক না থাকে। কিন্তু যদি পিছনে টানিলে ঐ ব্যক্তি নিজের নামায খারাব করিবে কিংবা খারাব মনে করিবে বলিয়া ধারণা হয়, তবে টানিবে না।)

১৮। মাসআলা ঃ আগের কাতারে জায়গা থাকিতে পিছনের কাতারে দাঁড়ান মকরূহ্। আগের কাতার আগে পূর্ণ করিয়া তারপর ইমামের পিছন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় কাতার শুরু করিবে। —দুর্‌রে মুখতার

জমা'আতের নামাযের অন্যান্য মাসায়েল

১৯। মাসআলা ঃ যে স্থানে অন্য পুরুষ বা ইমামের মা, ভগ্নী বা স্ত্রী ইত্যাদি কোন মাহ্‌রাম স্ত্রীলোক না থাকে, সেখানে পুরুষের জন্য শুধু স্ত্রীলোকের ইমামত করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী।

২০। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি ফজর, মাগরিব বা এশার নামায একা একা অনুচ্চ শব্দে পড়িতেছিল। (প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা-ফাতেহার কিছু অংশ বা ফাতেহা শেষ করিয়া সূরারও কিছু অংশ চুপে চুপে পড়িয়া ফেলিয়াছে।) এমন সময় অন্য একজন লোক আসিয়া এক্তেদা করিল। এমতাবস্থায় যদি প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির ইমামত করার ইচ্ছা (নিয়্যত) করে, তবে তৎক্ষণাৎ যে পর্যন্ত পড়িয়াছে তাহার পর হইতে উচ্চস্বরে কেরাআত পড়িতে হইবে। কারণ, ফজরের এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আতে ইমামের জন্য কেরাআত উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব (মুন্‌ফারেদের জন্য ইচ্ছাধীন)। কিন্তু যদি প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির ইমামত করার ইচ্ছা না করে; বরং এই মনে করে যে, সে এক্তেদা করুক কিন্তু আমি তাহার ইমামত করিব না, আমি আমার নিজের নামায একাই পড়িতেছি, তবে জোরে কেরাআত পড়া ওয়াজিব হইবে না, এই শেষোক্ত ছুরতে মুক্তাদীর নামায হইয়া যাইবে। কারণ, এক্তেদা হইবার জন্য মুক্তাদীর নিয়্যত শর্ত, ইমামের নিয়ত শর্ত নহে।

২১। মাসআলা ঃ যেখানে লোক চলাচলের সম্ভাবনা আছে, যেমন ময়দান, উঠান বা অনুরূপ স্থানে নামায পড়িতে হইলে নামাযী ইমাম হউক বা মুন্‌ফারেদ হউক নিজের ডান বা বাম চক্ষু বরাবর সম্মুখে অন্ততঃ এক হাত লম্বা এক অঙ্গুলী পরিমাণ মোটা কোন একটি জিনিস পুঁতিয়া রাখা মোস্তাহাব। ইহাকে 'ছুত্‌রাহ্' বলে। যেখানে লোক চলাচলের সম্ভাবনা নাই, যেমন—মসজিদ, ঘর বা অনুরূপ স্থানে ছুত্‌রার আবশ্যক নাই।

ছুতরার বাহির দিয়া চলাচলে কোন গোনাহ্ হয় না। ভিতর দিয়া চলাচল করিলে ভীষণ গোনাহ্ হইবে। (হাদীসে আছেঃ চল্লিশ দিন দাঁড়াইয়া থাকা বরং ভাল, তবু নামাযীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করা উচিত নহে।) ইমামের ছুত্‌রাহ্ মুছল্লীদের জন্য যথেষ্ট। (পুঁতিতে না পারিলে বা পুঁতিবার

মত উপযুক্ত কিছু পাওয়া না গেলে অগত্যা চেয়ার, টুল, মোড়া যাহা পাওয়া যায় এবং যে ভাবে রাখা যায় রাখিয়া দিবে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন জীব জন্তুর যাতায়াতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না।)

২২। **মাসআলাঃ** লাহেক্ ঐ মুক্তাদীকে বলে, জমা'আতে শামিল হওয়ার পর যে মুক্তাদীর কিছু রাকা'আত বা সম্পূর্ণ রাকা'আত ছুটিয়া যায়। কোন ওযরবশতঃ হউক, যেমন নামাযে ঘুমাইয়া গেল, ইত্যবসের কোন রাকা'আত ইত্যাদি ছুটিয়া গেল, কিংবা লোকের আধিক্যের কারণে রুকূ সজ্দা ইত্যাদি করিতে পারিল না, কিংবা ওযূ টুটিয়া যাওয়ায় ওযূ করিতে গেল ইত্যবসরে কিছু রাকা'আত ছুটিয়া গেল, (খওফের নামাযে প্রথম দল লাহেক্। এরূপে যে মুকীম মুক্তাদী মুসাফির ইমামের এক্তেদা করে এবং মুসাফির কছর করে, তখন সেই মুকীম ঐ ইমামের নামায শেষ করার পর লাহেক্) কিংবা বিনা ওযরে ছুটিয়া গেল, যেমন ইমামের আগে কোন রাকা'আতের রুকূ বা সজ্দা করিল এবং এই কারণে এই রাকা'আত ধর্তব্য হইল না, তবে ঐ রাকা'আতের হিসাবে সে লাহেক্ বলিয়া গণ্য হইবে। লাহেকের কর্তব্য, যেই রাকা'আতগুলি ছুটিয়া গিয়াছে, প্রথমে ঐগুলি আদায় করিবে। তৎপর যদি জমা'আত বাকী থাকে, তবে জমা'আতে শরীক হইবে। নতুবা অবশিষ্ট নামাযও নিজে নিজে পড়িয়া লইবে।

২৩। **মাসআলাঃ** লাহেকের যে পরিমাণ নামায ছুটিয়া যায়, তাহা সে মুক্তাদীর মতই পড়িবে অর্থাৎ, ইমামের পিছনে যেরূপ মুক্তাদীর কেরাআত পড়িতে হয় না, বা মুক্তাদীর ছহো সজ্দাও দিতে হয় না, তদ্রূপ লাহেক্ও তাহার নামায একা একা পড়িবার সময় কেরা'আত পড়িবে না এবং তাহার ভুল হইলে তদ্দরুন ছহো সজ্দাও করিবে না।

২৪। **মাসআলাঃ** ইমামের সঙ্গে শরীক হইবার পূর্বে যে মুক্তাদীর কিছু রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে তাহাকে 'মাসবুক' বলে। মাসবুকের প্রথমে যে কয় রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে ইমামের সালাম ফিরানের পর তাহা উঠিয়া পড়িবে।

২৫। **মাসআলাঃ** মাসবুকের যে কয় রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে, মুনফারেদের মত কেরাআত সহকারে আদায় করিতে হইবে। আর যদি ঐ সমস্ত রাকা'আতে ছহো হয়, তবে সজ্দায় ছহো করিতে হইবে।

২৬। **মাসআলাঃ** মাসবুকের যে কয় রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে, তাহা আদায় করিবার নিয়ম এইঃ প্রথমে কেরাআত বিশিষ্ট রাকা'আত, তারপর কেরাআত বিহীন রাকা'আত আর যে কয় রাকা'আত ইমামের সঙ্গে পড়িয়াছে সেই হিসাবে বৈঠক করিবে অর্থাৎ ঐ রাকা'আতের হিসাবে যাহা দ্বিতীয় রাকা'আত হইবে, উহাতে প্রথম বৈঠক করিবে। আর তিন রাকা'আতী নামাযে যাহা তৃতীয় রাকা'আত হইবে, উহাতে শেষ বৈঠক করিবে। যেমন, যোহরের নামাযের তিন রাকা'আত হইয়া যাওয়ার পর, কোন লোক শরীক হইল, এখন সে ইমামের সালাম ফেরানোর পর দাঁড়াইয়া যাইবে এবং যে কয় রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে তাহা আদায় করিবার নিয়ম হইল—প্রথম রাকা'আতে সুবহানাকার পর সূরা-ফাতেহার সহিত কোন একটি সূরা মিলাইয়া রুকূ সজ্দা করিয়া প্রথম বৈঠক করিবে ও তাশাহ্হুদ পড়িবে। কেননা, পাওয়া রাকা'আত হিসাবে ইহা দ্বিতীয় রাকা'আত। অতঃপর দ্বিতীয় রাকা'আতেও সূরা-ফাতেহার সহিত সূরা মিলাইবে এবং ইহার পর বৈঠক করিবে না। কেননা পাওয়া রাকা'আত হিসাবে ইহা তৃতীয় রাক'আত অতঃপর তৃতীয় রাকা'আতে সূরা-ফাতেহার সহিত কোন সূরা মিলাইবে না। কেননা, ইহা কেরাআতের রাকা'আত

ছিল না। আর ইহাতে বৈঠক করিবে। ইহা হইল শেষ বৈঠক। বুঝিবার জন্য বিষয়টি বিস্তারিতভাবে লিখিতেছি।

(মাসবুক্ব যে রাকা'আতের রুকূ পাইয়াছে, সে রাকা'আত পুরাই পাইয়াছে এবং যে রাকা'আতের রুকূ পায় নাই সেই রাকা'আত পড়িবে। কিন্তু জমা'আতে তৎক্ষণাৎ শরীক হইয়া যাইবে। এমনকি, যদি ইমামকে সজ্‌দার মধ্যে পায়, তবে সজ্‌দার মধ্যেই শরীক হইয়া যাইবে, যদি আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে পায়, আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যেই শরীক হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় শরীক হইবার নিয়ম এই যে, সোজা দাঁড়াইয়া নিয়্যত করিয়া হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া হাত বাঁধিয়া আবার আল্লাহু আকবর বলিয়া রুকূতে বা সজ্‌দায় বা আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে গিয়া শরীক হইবে। যে সব রাকা'আত ছুটিয়া গিয়াছে তাহা সে মুন্‌ফারেদের মত আদায় করিবে। অর্থাৎ, তাহার সানা তাআওওয, বিস্‌মিল্লাহ্‌, কেরাআত সব কিছুই পড়িতে হইবে এবং যদি ভুল হয়, তবে ছহো সজ্‌দাও করিতে হইবে। যদি কেহ মাগরিবের এক রাকা'আত মাত্র পায়, তবে ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরাইবার পর এবং যদি ইমামের ছহো সজ্‌দা থাকিয়া থাকে, তবে সজ্‌দা করার পর আবার আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া যখন বাম দিকে সালাম ফিরান হইয়া যাইবে, তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং ছানা, তাআওওয, বিসমিল্লাহ্‌, কেরাআত ইত্যাদি সহ এক রাকা'আত পড়িয়া বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে এবং পুনরায় উঠিয়া আর এক রাকা'আত কেরাআতসহ পড়িয়া আত্তাহিয়্যাতু দুরূদ, দো'আ মাছুরা পড়িয়া শেষে সালাম ফিরাইবে। এইরূপে যদি এশা, যোহর বা আছরের মাত্র এক রাকা'আত পায়, তবেও ইমামের সালাম ফিরাইবার পর তাহাকে উঠিয়া এক রাকা'আত কেরাআতসহ পড়িয়া বসিতে হইবে এবং তারপর উঠিয়া এক রাকা'আত কেরাআতসহ এবং এক রাক্‌'আতে শুধু সূরা-ফাতেহা পড়িবে।)

২৭। মাসআলা ঃ যদি কেহ 'মাসবুকও' হয় এবং 'লাহেক্‌ও' হয়, তবে সে যে কয় রাকা'আতে লাহেক্‌ হইয়াছে তাহা আগে বিনা কেরাআতে পড়িবে (যেন সে ইমামের পিছেই পড়িতেছে)। তারপর যে কয় রাকা'আতে মাসবুক হইয়াছে তাহা কেরাআতসহ পড়িবে (যেন সে একা একা পড়িতেছে); যেমন—যদি কোন মুক্বীম এশার নামাযের এক রাকা'আত হইয়া যাওয়ার পর দ্বিতীয় রাকা'আতে কোন মুসাফির ইমামের পিছে এক্তেদা করে, তবে সে প্রথম রাক'আতের জন্য মাসবুক্ব হইল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতের জন্য লাহেক্‌ হইল। অতএব, ইমামের যখন সালাম ফিরান শেষ হইবে, তখন সে দাঁড়াইয়া আগে ৩য় ও ৪র্থ রাকা'আত কেরাআত ছাড়া পড়িবে এবং ইমামের হিসাবে চতুর্থ রাকা'আতের পর বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু' পর্যন্ত পড়িয়া, পুনরায় উঠিয়া প্রথম রাকা'আত কেরাআত সহ পড়িবে এবং বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দো'আ মাছুরা পড়িয়া সালাম ফিরাইবে। যদি কোন ব্যক্তি আছর বা যোহরের নামাযের এক রাকা'আত পড়ার পর দ্বিতীয় রাকা'আতে জমা'আতে দাখিল হয় এবং দাখিল হওয়ার পর রাকা'আত পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহার ওযূ টুটিয়া যায়, তবে তাহার জন্য বেহ্‌তের ও আফযল এই যে, তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া দিয়া ওযূ করিয়া আসিয়া এক রাকা'আত বা দুই রাকা'আত যাহাকিছু পায় তাহাই ইমামের সঙ্গে পড়িয়া অবশিষ্ট রাকা'আতগুলি মাসবুকরূপে পড়ে, (কিন্তু যদি সে 'বেনা'র মাসআলা উত্তমরূপে অবগত থাকে এবং বেনা করিতে চায়, তবে সে মাসবুকও লাহেক হইবে;) অতএব, ওযূ করিয়া আসিয়া যদি ইমামকে নামাযের মধ্যে পায়, তবে ইমামের সঙ্গে শরীক হইয়া যাইবে এবং ইমাম সালাম ফিরাইবার পর দাঁড়াইয়া যে কয় রাকা'আতে সে লাহেক

হইয়াছে, তাহা আগে পড়িয়া শেষে প্রথম রাকা'আত যাহা আগেই ছুটিয়া গিয়াছে পড়িবে, আর যদি ওযু করিয়া আসিয়া দেখে যে, ইমাম সালাম ফিরাইয়া ফেলিয়াছে, তবে সে প্রথম এক রাকা'আতে মাসবুক এবং শেষের তিন রাকা'আতে লাহেক হইল। অতএব, সে প্রথমে শেষের এই তিন রাকা'আত সূরা-কেরাআত ছাড়া পড়িবে, যেন সে ইমামের পিছনেই পড়িতেছে; কিন্তু এই তিন রাকা'আতের প্রথম রাকা'আত পড়িয়া বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। কেননা, ইহা ইমামের দ্বিতীয় রাকা'আত; তারপর তৃতীয় রাক'আত পড়িয়া আবার বসিবে এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। কেননা, ইহা ইমামের চতুর্থ রাকা'আত, তারপর প্রথম রাকা'আত সূরা কেরাআতসহ পড়িবে। কেননা, এই রাকা'আতে সে মাসবুক্ এবং মাসবুক্ মুনফারেদের মত কেরাআত পড়িবে। তারপর বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু ও দুরূদ পড়িবে ও সালাম ফিরাইবে। কেননা, ইহা তাহার শেষ রাকা'আত।

২৮। **মাসআলা**ঃ ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই নামাযের সমস্ত রোকন আদায় করা মুক্তাদীদের জন্য সুন্নত, দেরী করা উচিত নহে। তাহ্রীমা, রুকূ, ক্বওমা, সজ্দা ইত্যাদি সব রোকনই ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করিবে; দেরী করিবে না (আগে ত করিবেই না) কা'দায়ে উলা অর্থাৎ, প্রথম বৈঠকে যদি মুক্তাদীর আত্তাহিয়্যাতু পুরা হইবার পূর্বেই ইমাম দাঁড়াইয়া যায়, তবে মুক্তাদী আত্তা-হিয়্যাতু পুরা না করিয়া দাঁড়াইবে না, পুরা করিয়া তারপর দাঁড়াইবে। এইরূপে ক্বা'দায়ে আখিরাতে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে যদি (ঘটনাক্রমে) মুক্তাদী আত্তাহিয়্যাতু অর্থাৎ, আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত পুরা করিবার পূর্বেই ইমাম সালাম ফিরায়, তবে মুক্তাদী সালাম ফিরাইবে না, আত্তাহিয়াতু পুরা করিয়া তারপর সালাম ফিরাইবে। কিন্তু যদি রুকূ বা সজ্দায় মুক্তাদী তস্বীহ্ পূর্ণ করিবার পূর্বেই ইমাম উঠিয়া যায়, তবে ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিবে। (অবশ্য বিনা কারণে ইমামের বেশী জল্দী করা উচিত নহে বা মুক্তাদীরও অলস বা অমনোযোগী হওয়া ঠিক নহে! আবার যদি কোন কারণ বশতঃ মুক্তাদীও কিছু দেরী করিয়া ফেলে তাহাতে তাহার নামায বাতিল হইবে না।)

জমা'আতে শামিল হওয়া

১। **মাসআলা**ঃ নামাযের জমা'আতের খুব খেয়াল রাখিবে। জমা'আতের সময়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। জমা'আত শুরু হওয়ার সময়ের কিছু পূর্বে মসজিদে পৌঁছিবে, সুন্নত পড়িবে বা তাহিয়্যাতুল সমজিদ পড়িবে এবং নামাযের আগে ও পরে কিছুক্ষণ চক্ষু বন্ধ করিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া নামাযের বিষয়, খোদার দরবারে হাযিরের বিষয়ও চিন্তা করিবে, খোদার রহ্মত এবং নিজের দোষ-ত্রুটি দেখিবে। খেয়াল রাখা সত্ত্বেও যদি (দৈবাৎ কোন দিন দেরী হইয়া যায় এবং) মস্জিদে গিয়া দেখে যে, জমা'আত হইয়া গিয়াছে, তবে (ঐ মস্জিদে ছানী জমা'আত করা সুন্নতের খেলাফ) জমা'আতের তালাশে অন্য মস্জিদে যাওয়া মোস্তাহাব, বাড়ীতে ফিরিয়া বাড়ীর ছেলেপেলেদের এবং মেয়েলোকদের লইয়াও জমা'আত করিতে পারে (বা মসজিদেই একা চুপে চুপে নামায পড়িয়া আসিতে পারে। জমা'আতের খেয়াল ছিল বলিয়া জমা'আত তরকের গোনাহ্ হইবে না)।

২। **মাসআলা**ঃ ঘটনাক্রমে বাড়ীতে একা ফরয নামায পড়িয়া যদি মসজিদে আসিয়া দেখে যে, মসজিদে জমা'আত হইতেছে বা এখনই হইবে। তখন যদি যোহর বা এশার নামায হয়, তবে তো তাহার জমা'আতে শরীক হওয়া উচিত, এই নামায তাহার নফল হইয়া বাইবে; আর যদি ফজর, আছর বা মাগ্রীবের নামায হয়, তবে জমা'আতে শরীক হইবে না; কেননা, ফজর এবং

আছরের পর নফল পড়া মকরূহ্ এবং মাগ্‌রিবের নামায তিন রাকা'আত অথচ তিন রাকা'আত নফল শরীঅতে নাই।

৩। **মাসআলা ঃ** কেহ ফরয নামায শুরু করিয়াছে, তারপর ঐ নামাযেরই জমা'আত শুরু হইল, এখন তাহার কি করা উচিত? যদি দুই বা তিন রাকা'আতওয়ালা নামায হয় এবং যদি এখন সে দ্বিতীয় রাকা'আতের সজ্‌দা না করিয়া থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ (ডান দিকে এক সালাম ফিরাইয়া) জমা'আতে শরীক হইবে।

আর যদি দ্বিতীয় রাক'আতের সজ্‌দা করিয়া থাকে, তবে ঐ নামাযই পুরা করিতে হইবে, (জমা'আতে শরীক হইবে না।) আর যদি চারি রাকা'আতওয়ালা নামায হয় এবং প্রথম রাকা'আতের সজ্‌দা না করিয়া থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ ডান দিকে এক সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইবে; কিন্তু যদি এক সজ্‌দাও করিয়া থাকে, তবে তাহার দুই রাকা'আতই পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইবে।

যদি দুই রাকা'আত পূর্ণ করিয়া তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে এবং এখনও তৃতীয় রাকা'আতে সজ্‌দা না করিয়া থাকে, তবে ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায়ই সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইতে হইবে; কিন্তু যদি তৃতীয় রাকা'আতের সজ্‌দা করিয়া থাকে, তবে ঐ নামায ছাড়িতে পারিবে না, চারি রাকা'আত পূর্ণ করিতে হইবে। তখন যদি যোহর বা এ'শার ওয়াক্ত হয়, তবে চারি রাকা'আত পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরইয়া পুনরায় জমা'আতে শরীক হইতে হইবে, আর যদি আছরের ওয়াক্ত হয়, তবে চারি রাকা'আত পূর্ণ করিয়া জমা'আতে শরীক হইতে পারিবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি সুন্নত বা নফল নামায শুরু করিবার পর, জমা'আত বা জুমু'আর খোৎবা শুরু হয়, তবে সেই নামায ছাড়িবে না, দুই রাকা'আত পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইয়া তারপর জমা'আতে শরীক হইবে, যদি চারি রাকা'আতের নিয়্যত বাঁধিয়া থাকে, তবুও দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইবে। আর যদি চারি রাকা'আতের নিয়্যত বাঁধিয়া থাকে এবং তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে; তারপর জমা'আত (বা জুমু'আর খোৎবা) শুরু হয়, তবে চারি রাকা'আতই পূর্ণ করিবে।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি যোহর বা জুমু'আর সুন্নতে মোয়াক্কাদা চারি রাকা'আত শুরু করার পর, জুমু'আর খোৎবা বা যোহরের জমা'আত শুরু হয় এবং খোৎবা শুনে, তবে দুই রাক'আতের পর সালাম ফিরাইয়া গিয়া জুমু'আতে শরীক হইবে। তবে ফরযের পর পুনরায় এই চারি রাকা'আত পড়িতে হইবে। কিন্তু যদি আছর বা এ'শার সুন্নত চারি রাকা'আতের নিয়্যত করার পর জামা'আত শুরু হওয়ার কারণে দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া জামা'আতে শরীক হয়, তবে অবশিষ্ট দুই রাকা'আত আর পড়িতে হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** ফরয নামায শুরু হইলে তখন আর সুন্নত বা নফল অন্য কোন নামায হইতে পারে না। (অবশ্য আগের ওয়াক্তের ফরয নামায যদি কোন কারণবশতঃ না পড়িয়া থাকে, তবে শুধু ফরয রাকা'আতগুলি পড়িয়া লইতে হইবে, তারপর জমা'আতে শরীক হইতে হইবে; কিন্তু ফজরের সুন্নতের খুব বেশী তাকীদ আসিয়াছে, সেই জন্য যদি সুন্নত পড়িয়া জমা'আতের সঙ্গে এক রাকা'আতও পাওয়ার আশা থাকে এবং সন্নিকটে নামায পড়িবার জায়গা থাকে বা মসজিদের বারান্দা থাকে, তবে সেইখানে সুন্নত পড়িয়া লইবে, (কিন্তু যদি এক রাকা'আতও পাইবার আশা না থাকে, তবে ঐ সময় সুন্নত পড়িবে না, ফজরের জমা'আতে শামিল হইয়া যাইবে এবং সুন্নত

সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়িবে না, বেলা উঠিবার পর পড়িবে। কিন্তু কর্মব্যস্ত লোক হইলে এবং পরে পড়িবার সুযোগ পাইবার আশা না থাকিলে, যদি ফরযের পরই পড়িয়া লয়, তবে তাহাকে নিষেধ করিবে না।) জমা'আত শুরু হইয়া যাওয়ায় যদি যোহরের পূর্বের চারি রাকা'আত সুন্নত থাকিয়া যায়, তবে তাহা ফরযের পরবর্তী দুই রাকা'আত সুন্নতের পরে পড়াই ভাল।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি ভয় হয় যে, ফজরের সুন্নতের সমস্ত মোস্তাহাব এবং সুন্নত আদায় করিয়া পড়িতে গেলে জমা'আত ছুটিয়া যাইবে, তবে মোস্তাহাব এবং সুন্নত বাদ দিয়া, শুধু ফরয এবং ওয়াজিব আদায় করিয়া সুন্নত পড়িয়া লইবে। অর্থাৎ, রুকূ সজ্‌দার তসবীহ্ না পড়িয়া, শুধু তাশাহ্‌হুদ পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে। দুরূদ ও দো'আ মাছুরা পড়িবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** জমা'আত হওয়াকালীন তথায় অন্য কোন নামায পড়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। কাজেই ফজরের জমা'আত শুরু হইয়া গেলে, যদি ফজরের সুন্নত পড়িতে হয়, তবে বারান্দায় বা বাহিরে পড়িবে। একান্ত যদি জায়গা না পাওয়া যায়, তবে পিছনের এক কোণে গিয়া পড়িবে, কাতারে দাঁড়াইয়া পড়িবে না।

৯। **মাসআলা ঃ** জমা'আতের সঙ্গে যদি আখেরী বৈঠক (ক্বা'দায়ে আখিরা) পায়, তবুও জমা'আতের ছওয়াব পাইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** ইমামের সঙ্গে যে রাকাআতের রুকূ পাইবে সে রাকা'আত পাওবার মধ্যে গণ্য হইবে, কিন্তু যদি রুকূ না পাওয়া যায়, তবে সে রাকা'আত পাওয়ার হিসাবের মধ্যে ধরা যাইবে না, (অবশ্য শরীক হইয়া যাইতে হইবে এবং পরে আবার সেই রাকা'আত পড়িতে হইবে।

যে যে কারণে নামায ফাসেদ হয়

[লোক্‌মা দেওয়ার মাসআলা]

ভুল কেরাআত পাঠকের ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়াকে 'লোক্‌মা দেওয়া' বলে।

১। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে নিজের ইমাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও লোক্‌মা দিলে নামায বাতিল হইয়া যায়।

২। **মাসআলা ঃ** ছহীহ্ ক্বওল এই যে, ইমামকে লোক্‌মা দিলে নামায বাতিল হইবে না; ইমাম যদি যরূরত পরিমাণ কেরাআত পড়ার আগেই আট্‌কিয়া যায় এবং সেই অবস্থায় লোক্‌মা দেয়, তবে ত নামায বাতিল হইবে না; এমনকি, যদি যরূরত পরিমাণ কেরাআত পড়ার পরও লোক্‌মা দেয়, তবুও নামায বাতিল হইবে না। অর্থাৎ, যেই নামাযে যেই পরিমাণ কেরাআত পড়া সুন্নত সেই পরিমাণ কেরাআত পড়া।

৩। **মাসআলা ঃ** ইমাম যদি যরূরত পরিমাণ কেরাআত পড়িবার পর আট্‌কিয়া যায় তবে তাহার তৎক্ষণাৎ রুকূতে যাওয়া উচিত, (বার বার দোহ্‌রাইয়া বা ভুল বাদ্ দিয়া পড়িয়া বা চুপ করিয়া থাকিয়া) মুক্তাদীকে লোক্‌মা দেওয়ার জন্য মজ্‌বুর করা উচিত নহে, এইরূপ করা মক্রূহ। মুক্তাদীদেরও বিনা যরূরতে লোক্‌মা দেওয়া ঠিক নহে। বিনা যরূরতে লোক্‌মা দেওয়া মক্রূহ্ ঃ এখানে যরূরতের অর্থ হইল, ইমাম যদি যরূরত পরিমাণ কেরাআত পড়িতে না পারে, আট্‌কিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে বা বার বার দোহ্‌রাইতে থাকে বা ভুল রাখিয়া সামনে পড়া শুরু করে, তবে মুক্তাদী লোক্‌মা দিবে। অবশ্য যদি এইরূপ যরূরত ছাড়াও নিজের ইমামকে লোক্‌মা দেয়, তবে তাহাতে নামায বাতিল হইবে না; মক্রূহ্ হইবে।

৪। মাসআলা ঃ একজন লোক নামায পড়িতেছে, তাহাকে তাহার মু ক্তাদী ছাড়া অন্য কেহ লোক্‌মা দিল, যদি সে ঐ লোক্‌মা লয়, তবে তাহার নামায বাতিল হইয়া যাইবে, অবশ্য যদি তাহার নিজেরই স্মরণ হইয়া থাকে, (লোক্‌মার সঙ্গে সঙ্গে বা আগে বা পরে) এবং নিজের স্মরণ অনুসারে পড়ে, তবে তাহার নামায ফাসেদ হইবে না।

৫। মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে থাকিয়া নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কাহাকে লোক্‌মা দেয়, তবে তাহার নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। অন্য ব্যক্তি নামাযের মধ্যে হউক বা না হউক।

৬। মাসআলা ঃ যদি মুক্তাদী অন্যের পড়া শুনিয়া কিংবা কোরআন মজীদ দেখিয়া ইমামকে লোক্‌মা দেয়, তবে তাহার নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে, যদি ইমাম লোক্‌মা লয়, তাঁহারও নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। আর যদি কোরআন মজীদ দেখিয়া বা অন্যের পড়া শুনিয়া মুক্তাদীর স্মরণ হয় এবং নিজের স্মরণেই লোক্‌মা দেয়, তবে নামায ফাসেদ হইবে না।

৭। মাসআলা ঃ এইরূপে যদি নামাযে কোরআন মজীদ দেখিয়া একটি আয়াত পড়ে, তবুও নামায ফাসেদ হইবে। কিন্তু যে আয়াত দেখিয়া পড়িয়াছে, তাহা যদি প্রথম হইতে ইয়াদ থাকিয়া থাকে, তবে নামায ফাসেদ হইবে না কিংবা প্রথম হইতে স্মরণ তো ছিল না কিন্তু এক আয়াতের কম দেখিয়া পড়িয়া থাকে, তবে নামায ফাসেদ হইবে না।

৮। মাসআলা ঃ মেয়েলোক যদি পুরুষের সঙ্গে এইরূপে দাঁড়ায় যে, একজনের কোন অঙ্গ অপর জনের কোন অঙ্গের বরাবর হইয়া যায়, তবে নিম্ন শর্তে নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। এমন কি, যদি সজ্‌দায় যাওয়ার সময় মেয়েলোকের মাথা পুরুষের পা বরাবর হইয়া যায় তবুও নামায ফাসেদ হইবে।

১ম শর্ত ঃ মেয়েলোক বালেগা হওয়া চাই (যুবতী হইক বা বৃদ্ধা হইক,) কিংবা সহবাস উপযোগী নাবালেগা হউক। আর যদি অল্প বয়স্কা নাবালেগা মেয়ে নামাযে বরাবর হইয়া যায়, তবে নামায ফাসেদ হইবে না।

২য় শর্ত ঃ উভয়েই নামাযে হওয়া চাই। যদি একজন নামাযে অন্যজন নামাযের বাহিরে থাকে, তবে এরূপ বরাবর হওয়ায় নামায ফাসেদ হইবে না।

৩য় শর্ত ঃ উভয়ের মাঝে কোন আড়াল না হওয়া। যদি মাঝখানে কোন পর্দা থাকে কিংবা কোন সুতরা থাকে, অথচ মাঝখানে এত পরিমাণ জায়গা খালি থাকে যে, অনায়াসে একটি লোক দাঁড়াইতে পারে, তবে নামায ফাসেদ হইবে না।

৪র্থ শর্ত ঃ নামায ছহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী ঐ মেয়েলোকের মধ্যে থাকা চাই। কাজেই মেয়েলোক যদি পাগল অথবা ঋতুমতী বা নেফাস অবস্থায় হয়, তবে ঐ মেয়েলোকের বরাবরী হইলে নামায ফাসেদ হইবে না। কেননা, এসব অবস্থায় এই মেয়েলোক নামাযের মধ্যে গণ্য নহে।

৫ম শর্ত ঃ জানাযার নামায না হওয়া চাই। জানাযার নামাযে বরাবর হইলে নামায ফাসেদ হইবে না।

৬ষ্ঠ শর্ত ঃ বরাবরী এক রোকন পরিমাণ। (অর্থাৎ তিন তসবীহ্ পড়ার সময় পরিমাণ) স্থায়ী হওয়া চাই। যদি ইহার কম সময় বরাবর থাকে, তবে ফাসেদ হইবে না। যেমন, এতটুকু সময় বরাবর রহিয়াছে, ঐ পরিমাণ সময়ে রুকূ সজ্‌দা ইত্যাদি হইতে পারে না। এই অল্প সময়ের বরাবরীতে নামায ফাসেদ হয় না।

৭ম শর্তঃ উভয়ের তাহ্‌রীমা এক হওয়া চাই। অর্থাৎ এই মেয়েলোক ঐ পুরুষের মুক্তাদী হওয়া, কিংবা উভয়ে কোন তৃতীয় ব্যক্তির মুক্তাদী হওয়া।

৮ম শর্তঃ ইমামের নামাযের প্রথমে বা মাঝখানে যখন মেয়েলোক শামিল হইয়াছে তাহার ইমামতের নিয়্যত করা চাই। ইমাম যদি ইমামতের নিয়্যত না করে, তবে এই বরাবরীতে নামায ফাসেদ হইবে না; বরং ঐ মেয়েলোকের নামায ছহীহ্ হইবে না।

৯। **মাসআলা**ঃ কোন স্ত্রীলোক পুরুষের কাতারে দাঁড়াইয়া জমা'আতে নামায পড়িলে পার্শ্ববর্তী পুরুষদের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১০। **মাসআলা**ঃ ইমামের ওযূ টুটিয়া গেলে ইমাম যদি কোন উপযুক্ত লোককে খলীফা না বানাইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যায়, তবে মুক্তাদীদের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১১। **মাসআলা**ঃ ইমাম যদি কোন পাগল, নাবালেগ বা মেয়েলোককে—যে ইমামের অযোগ্য এরূপ খলীফা বানায়, তবে সকলের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১২। **মাসআলা**ঃ স্বামী নামায পড়িবার সময় যদি স্ত্রী তাহাকে চুম্বন করে (এবং স্বামীর মনে কোন চাঞ্চল্য না জন্মে) তবে তাহার নামায নষ্ট হইবে না, কিন্তু মনে চাঞ্চল্য জন্মিলে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি মেয়েলোক নামায পড়ার সময় পুরুষ তাহাকে চুম্বন করে, তবে মেয়েলোকের নামায ফাসেদ হইবে। কামভাবে চুম্বন করুক কিংবা বিনা কামভাবে। মেয়েলোকের মধ্যে কামভাব উদয় হউক বা না হউক।

১৩। **মাসআলা**ঃ নামাযীর সামনে দিয়া যদি কেহ যাইতে চায়, তবে তাহাকে বাধা দেওয়া জায়েয আছে, কিন্তু যদি নামাযের মধ্যে থাকিয়া বাধা দিতে গিয়া 'আমলে কাছীর' করিতে (অর্থাৎ, কথা বলিতে হয়, বা হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে হয়, বা ধাক্কাধাক্কী করিতে) হয়, তবে নামায বাতিল হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি আস্তে হাত দিয়া ইশারা করিয়া দেয়, বা সোব্‌হানাল্লাহ্ বলিয়া সতর্ক করিয়া দেয়, তবে তাহাতে নামায নষ্ট হইবে না। —বেহেশ্‌তী গওহর

আরম্ভ নামায ছাড়িয়া দেওয়া যায়

১। **মাসআলা**ঃ নামায পড়িতে পড়িতে যদি (রেল) গাড়ী ছাড়িয়া দেয় অথচ রেলগাড়ীতে আসবাবপত্র রাখা থাকে বা বিবি বাচ্চা বসা থাকে, তখন নামায ছাড়িয়া দিয়া গাড়ীতে উঠা জায়েয আছে। [কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এত মেহেরবান যে, বন্দার এক দেরহাম (এক সিকি) পরিমাণ ক্ষতিও তিনি করাইতে চান না।]

২। **মাসআলা**ঃ নামাযের সময় যদি সামনে সাপ আসিয়া পড়ে, তবে উহার ভয়ে নামায ছাড়িয়া দিয়া (নিজের জীবন লইয়া) পলায়ন করা বা সাপকে মারা জায়েয আছে।

৩। **মাসআলা**ঃ রাত্রে মুরগী বাহিরে রহিয়া গিয়াছিল, নামায পড়িতে জানা গেল যে, শৃগাল বা বিড়াল মুরগী ধরিবার জন্য আসিয়াছে, এমতাবস্থায় নামায ছাড়িয়া মুরগীর জীবন রক্ষা করা জায়েয আছে (তারপর শান্তির সহিত নামায পড়িবে।)

৪। **মাসআলা**ঃ নামাযের মধ্যে জানা গেল যে, জুতা-চোর আসিয়া জুতা ধরিয়াছে, এমতাবস্থায় নামায ছাড়িয়া জুতার হেফাযত করা জায়েয আছে।

৫। **মাসআলা**ঃ বন্দার এক সিকি পরিমাণ ক্ষতি হইবার আশঙ্কা যেখানে আছে, সেখানেও শরীঅতে মাল রক্ষার জন্য নামায ছাড়িয়া পরে পড়িবার এজাযত দিয়াছে। যেমন, চুলার

তরকারীর পাতিল উৎরাইয়া পড়িতেছে যাহার দাম ৩/৪ আনা, তখন নামায ছাড়িয়া উহা ঠিক করা জায়েয আছে।

৬। **মাসআলা** ঃ নামাযের মধ্যে যদি পেশাব পায়খানার বেগ হয়, তবে নামায ছাড়িয়া দিবে এবং পেশাব-পায়খানা করিয়া আসিয়া শান্তির সহিত নামায পড়িবে।

৭। **মাসআলা** ঃ নামাযে থাকিয়া জানিতে পারিল যে, একজন অন্ধ কূয়া বা গর্তের মধ্যে পড়িয়াছে বা একটি ছেলে আগুনে বা পানিতে পড়িয়া জীবন হারাইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন নামায ছাড়িয়া দিয়া অন্ধ বা ছেলের জীবন রক্ষা করা ফরয। যদি নামায না ছাড়ে এবং ছেলে বা অন্ধ পড়িয়া মারা যায়, তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

৮। **মাসআলা** ঃ নামাযের মধ্যে থাকিয়া জানিতে পারিল যে, ছেলের কাপড়ে আগুন লাগিয়াছে, এরূপ অবস্থায় নামায ছাড়িয়া দিয়া ছেলের জীবন রক্ষা করা ফরয। (অবশ্য যদি অন্য লোক রক্ষাকারী থাকে, তবে নামায ছাড়িবার দরকার নাই।)

৯। **মাসআলা** ঃ মা-বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী যদি কোন বিপদে পড়িয়া ডাকেন, তবে ফরয নামাযও ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সাহায্য করা ওয়াজিব হইবে। যদি তাঁহারা কেহ পীড়িত থাকেন এবং পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়া হয়ত পা পিছলাইয়া বা কাঁপিয়া পড়িয়া গিয়া ডাকিতেছেন, এমতাবস্থায় ফরয নামাযও ছাড়িয়া দিবে এবং গিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিবে। অবশ্য যদি অন্য লোক সঙ্গে থাকে এবং উঠাইয়া আনে, তবে অনর্থক নামায ছাড়িবে না।

১০। **মাসআলা** ঃ আর যদি এখনও পা পিছলাইয়া বা কাঁপিয়া না পড়িয়া থাকেন, কিন্তু পড়িয়া যাইবার ভয়ে ডাকেন, তবুও নামায ছাড়িয়া দিবে এবং তাঁহাদের সাহায্য করিবে।

১১। **মাসআলা** ঃ উক্তরূপ যরূরত ছাড়া ডাকিলে ফরয নামায ছাড়া জায়েয নহে।

১২। **মাসআলা** ঃ নফল বা সুন্নত নামায পড়িবার সময় যদি মা-বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী যে কেহ ডাকেন, তবে যদি নামাযে আছে একথা না জানিয়া তাঁহারা ডাকেন কিংবা বিপদ ছাড়া ডাকেন, তবে নামায ছাড়িয়া তাঁহাদের ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব, অন্যথায় গোনাহ্‌গার হইবে। আর যদি নামায পড়িতেছে একথা জানা সত্ত্বেও অযথা ডাকেন, তবে নামায ছাড়িবে না, অবশ্য যদি বিপদে বা কষ্টে পড়িয়া ডাকেন, তবে নামায ছাড়িয়া দিবে।

নামাযে ওযূ টুটিয়া গেলে—(বেঃ গওহর)

নামাযের মধ্যে অস্বাভাবিক কোন কারণে বা মানুষের ইচ্ছাকৃত কোন কর্মে যদি ওযূ টুটিয়া যায়, তবে ওযূর সঙ্গে সঙ্গে নামাযও বাতিল হইয়া যাইবে; যথা,যদি নামাযের মধ্যে গোসলের হাজত হয়, বা খিলখিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে, বা বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যায়, বা ইচ্ছাপূর্বক পেটের উল্টা বাতাস বাহির করে, তবে ওযূ ত টুটিয়া যাইবেই, সঙ্গে সঙ্গে নামাযও টুটিয়া যাইবে, কিন্তু যদি অনিচ্ছাকৃত কোন স্বাভাবিক কারণে ওযূ টুটে, যথা, যদি হঠাৎ অনিচ্ছায় পেটের উল্টা বাতাস বাহির হইয়া যায়, তবে ওযূ টুটিয়া যাইবে, কিন্তু যদি নামায ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ ওযূ করিয়া পুনরায় শুরু হইতে নামায পড়ে, তবে ইহাই উত্তম এবং মোস্তাহাব। আর যদি এই অবস্থায় নামায বাকী রাখিতে চায়, তবে তাহারও উপায় আছে। নামায বাকী রাখিবার জন্য কতকগুলি শর্ত আছে; যথাঃ (১) ওযূ টুটা মাত্রই নামায ছাড়িয়া দিবে এবং ওযূ করিতে যাইবে, নামাযের কোন রোকন আদায় করিবে না, (২) ওযূ করিতে যাইবার সময়ও কেরাআত ইত্যাদি কোন রোকন আদায়

করিবে না, (৩) কথাবার্তা ইত্যাদি যে সব কাজ নামাযের পরিপন্থী অথচ তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, তাহা করিবে না। (অবশ্য ওযূর পানি পূর্ব, দক্ষিণ বা উত্তর দিকে থাকিলে মুখ না ফিরাইয়া যাওয়া অসম্ভব; কাজেই যাইবার সময় ক্বেব্‌লা দিক হইতে মুখ ফিরিয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি হইবে না।) (৪) ওযূ টুটিবার পর বিনা ওযরে এক রোকন আদায় করার সময় পরিমাণ দেরী করিবে না, তৎক্ষণাৎ ওযূ করিতে হইবে, অবশ্য জমা'আতে যদি অনেকগুলি কাতার থাকে এবং প্রথম কাতার হইতে আসিতে আসিতে কিছু দেরী হয় বা নিকটে পানি না থাকাবশতঃ পানির কাছে যাইতে কিছু দেরী হয়, সে দেরীতে ক্ষতি হইবে না।

১। **মাসআলাঃ** মোন্‌ফারেদের যদি নামাযের মধ্যে ওযূ টুটিয়া যায়, তবে ওযূ করিয়া পুনরায় শুরু হইতে নামায পড়াই তাহার জন্য উত্তম। কিন্তু যদি সে 'বেনা' করিতে অর্থাৎ, যে পর্যন্ত পড়িয়াছে সে পর্যন্ত ঠিক রাখিয়া ওযূ করিয়া তাহার পর হইতে অবশিষ্টটুকু পড়িয়া নামায শেষ করিতে চায়, তবে সে ওযূ টুটামাত্রই নামায ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ ওযূ করিবে; ওযূ করিতে যাইবার সময় এদিক ওদিক দেখিবে না, বা কথাবার্তা বলিবে না, নিকটে পানি থাকিতে দূরে যাইবে না, সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী পানির দ্বারা অতি শীঘ্র ওযূ করিবে। (কিন্তু ওযূর সুন্নত, মোস্তাহাব ছাড়িবে না) ওযূর নিকটবর্তী স্থানেই অবশিষ্ট নামায পড়িবে, যদি পূর্বের স্থানে যায়, তাহাও জায়েয আছে।

২। **মাসআলাঃ** ইমামের যদি নামাযের মধ্যে ওযূ টুটিয়া যায়, (এমন কি, আখেরী বৈঠকের মধ্যেও ওযূ টুটে) তবে তাহার জন্যও এক দিকে সালাম ফিরাইয়া নামায ছাড়িয়া ওযূ করিয়া নূতনভাবে নামায পড়া আফ্‌যল; কিন্তু যদি 'বেনা' ও 'এস্তেখ্‌লাফ' করিতে চায় অর্থাৎ, যে পর্যন্ত পড়িয়াছে তারপর হইতে মুক্তাদীদের মধ্য হইতে অন্য একজন দ্বারা পড়াইতে চায়, তবে তাহার ছুরত এই যে, ওযূ টুটা মাত্রই তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া দিয়া একজন উপযুক্ত মুক্তাদীকে মোছাল্লার দিকে ইশারা করিয়া খলীফা (কায়েম মকাম) বানাইয়া ওযূ করিতে যাইবে, মুদরেক্‌কে খলীফা বানান উত্তম। যদি মসবুককে খলীফা বানায় তবুও জায়েয। কিন্তু মসবুককে ইশারায় বলিয়া দিবে যে, আমার উপর এত রাকা'আত ইত্যাদি বাকী আছে। রাকা'আতের জন্য আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিবে' যেমন, এক রাকা'আত বাকী থাকিলে এক আঙ্গুল দুই রাকা'আত বাকী থাকিলে দুই আঙ্গুল উঠাইবে। রুকূ বাকী থাকিলে হাঁটুর উপর হাত রাখিবে, সজ্‌দা বাকী থাকিলে কপালে, কেরাআত বাকী থাকিলে মুখের উপর, সজ্‌দায়ে তেলাওয়াত বাকী থাকিলে কপালে এবং জিহ্বার উপর, সজ্‌দায়ে ছহো করিতে হইলে সীনার উপর হাত রাখিবে। অবশ্য যখন সে-ও এই সঙ্কেত বুঝে, নচেৎ তাহাকে খলীফা বানাইবে না। তারপর ওযূ করিয়া আসিয়া যদি জমা'আত পায়, তবে মুক্তাদী স্বরূপ শামিল হইয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট নামায যাহা জমা'আতের সঙ্গে পাইয়াছে তাহা মুক্তাদী স্বরূপ এবং যদি দুই এক রাকা'আত মাঝখানে ছুটিয়া যাইয়া থাকে তাহা লাহেক্‌রূপে পরে পড়িবে। যদি ওযূর স্থানে দাঁড়াইয়া এক্তেদা করে, তবে যদি মাঝখানে এমন কোন জিনিস বা ব্যবধান থাকে, যাহাতে এক্তেদা দুরুস্ত হয় না, তবে তথায় থাকিয়া এক্তেদা করা দুরুস্ত হইবে না। আর যদি ওযূ করিয়া জমা'আত না পায়, তবে একা একা অবশিষ্ট নামায পড়িবে। (ওযুর স্থানে পড়ুক বা জমা'আতের কাতারে আসিয়া পড়ুক)।

৩। **মাসআলাঃ** পানি যদি মসজিদের ভিতরেই থাকে, তবে খলীফা বানান ছাড়াও ইচ্ছা করিলে 'বেনা' করিতে পারে। নামায ছাড়িয়া দিয়া অতি শীঘ্র ওযূ করিয়া অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ

করিবে ইমাম যথাস্থানে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত মুক্তাদীগণ যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থাতেই এন্তেযার করিতে থাকিবে।

৪। মাসআলা ঃ খলীফা বানানের পর, ইমাম আর ইমাম থাকিবে না, মুক্তাদী হইয়া যাইবে ; কাজেই যদি জমা'আত শেষ হইয়া যায়, তবে অবশিষ্ট নামায তিনি লাহেকরূপে পড়িবেন। যদি ইমাম কাউকে খলীফা না বানান, কোন মুক্তাদী নিজে আগে বাড়িয়া যায় বা মুক্তাদীরাই তাহাকে ইশারা করিয়া আগে বাড়াইয়া দেয়, তবুও দুরুস্ত হইবে ; কিন্তু যতক্ষণ ইমাম মসজিদের ভিতরে আছেন, কিংবা যদি নামায মসজিদে না হয়, তবে কাতার কিংবা ছোত্‌রা হইতে আগে না যায়, ততক্ষণ এইরূপ হইতে পারিবে, নতুবা ইমাম যদি খলীফা না বানাইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যায়, তবে সকলের নামায ফাসেদ হইবে এবং কেহই আর খলীফা হইতে পারিবে না।

৫। মাসআলা ঃ মুক্তাদীর যদি নামাযের মধ্যে ওযূ টুটিয়া যায়, তবে তাহার জন্যও 'বেনা' না করিয়া তৎক্ষণাৎ ওযূ করিয়া মাসবুকরূপে জমা'আতে শরীক হওয়া বা জমা'আত না পাইলে একা একা নূতন করিয়া নামায পড়া উত্তম। কিন্তু যদি 'বেনা' করিতে চায়, তবে তৎক্ষণাৎ ওযূ করিয়া যদি জমা'আত বাকী থাকে জমা'আতে শামিল হইয়া যাইবে, যদি প্রথম জায়গায় যাইতে পারে, তবে ভাল, (নতুবা পাছের কাতারে দাঁড়াইয়া যতটুকু জমা'আতে পায় ততটুকু মসবুকরূপে জমা'আতের সঙ্গে পড়িবে এবং যদি দুই এক রাকা'আত মাঝখানে ছুটিয়া যাইয়া থাকে তাহা পরে লাহেক্‌রূপে পড়িবে। কিন্তু যদি ইমাম ও তাহার ওযূর স্থানের মধ্যে এক্তেদায় বাধাজনক কোন জিনিস না থাকে, তবে এখানেও দাঁড়ান জায়েয আছে। আর যদি জমা'আত হইয়া গিয়া থাকে, তবে ওযূর নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়াইয়া অবশিষ্ট নামায লাহেকরূপে পড়া উত্তম। যদি পূর্ব স্থানে গিয়া পড়ে তাহাও জায়েয আছে।

৬। মাসআলা ঃ ইমাম যদি মাসবুক মুক্তাদীকে খলীফা বানায়, তাহাও জায়েয আছে, কিন্তু তাহা হইলে সে ইমামের অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইবে না, সালাম ফিরাইবার জন্য একজন মোদরেক্ মুক্তাদীকে ইশারার দ্বারা আগে বাড়াইয়া লইবে ; নিজে একটু বসিয়া দাঁড়াইয়া যে সব রাকা'আত তাহার আগে ছুটিয়া গিয়াছে, তাহা পড়িয়া শেষে পৃথকভাবে সালাম ফিরাইবে। এই জন্যই মোদরেক্‌কে খলীফা বানান উত্তম।

৭। মাসআলা ঃ শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর সালাম ফিরাইবার আগে যদি অনিচ্ছায় (বা স্বভাবিক উপায়ে) কাহারও ওযূ টুটিয়া যায়, কিংবা পাগল হইয়া যায়, বা গোসলের হাজত হয়, বা বেহুঁশ হইয়া যায় তবে তাহার নামায বাতিল হইয়া যাইবে এবং পুনরায় নূতন করিয়া নামায পড়িতে হইবে। (বেনা করিতে পারিবে না।)

৮। মাসআলা ঃ বেনা এবং এস্তেখ্‌লাফের মাসআলা অতি সূক্ষ্ম। ইহা স্মরণ রাখা অতি কঠিন। তাছাড়া একটু ভুল হইলেই নামায নষ্ট হইবার প্রবল আশঙ্কা আছে। কাজেই বেনা এবং এস্তেখ্‌লাফ না করিয়া ওযূ টুটিয়া গেলে ডান দিকে সালাম ফিরাইয়া নামায ছাড়িয়া দিয়া ওযূ করিয়া নূতন করিয়া নামায পড়াই উত্তম। —গওহর

বেৎর নামায—(বেঃ জেওর)

১। মাসআলা ঃ বেৎর নামায ওয়াজিব। ওয়াজিবের মর্তবা প্রায় ফরযের মত। ওয়াজিব তরক করিলে ভারী গোনাহ্। যদি ক্বচিৎ কখনও কোন কারণবশতঃ ছুটিয়া যায়, তবে সুযোগ পাওয়া

মাত্রই ক্বাযা পড়িতে হইবে। (বেৎর শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের পরে ছোব্‌হেছাদেকের আগে পড়া ভাল; কিন্তু যাহার শেষ রাত্রে উঠার অভ্যাস নাই বা উঠার বিশ্বাস নাই তাহার জন্য এশার পর পড়িয়া লওয়া উচিত।)

২। **মাসআলাঃ** বেৎর নামায তিন রাকা'আত; দুই রাকা'আত পড়িয়া বসিয়া শুধু আত্তাহিয়্যাতু (আব্‌দুহু ওয়ারাসূলুহু পর্যন্ত) পড়িবে, দুরূদ পড়িবে না, আত্তাহিয়্যাতু শেষ হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া যাইবে এবং সূরা-ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়িয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিবে এবং কান পর্যন্ত (স্ত্রীলোকেরা কাঁধ পর্যন্ত) উঠাইয়া আবার হাত বাঁধিয়া লইবে। তারপর দো'আ কুনূত পড়িয়া রুকূ করিবে; এইরূপে তৃতীয় রাকা'আত পড়িয়া আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ এবং দো'আ মাছুরা পড়িয়া নামায শেষ করিবে।

৩। **মাসআলাঃ** দো'আ কুনূত এইঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّـا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِـدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌّ ـ (اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ○)

(**অর্থ**—আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি; এবং তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; এবং তোমার উপর ঈমান আনিতেছি, এবং তোমারই উপর ভরসা করিতেছি, তোমারই উত্তম উত্তম প্রশংসা করিতেছি। এবং (চিরকাল) তোমার শুক্‌র-গুযারী করিব (কখনও) তোমার নাশুক্‌রী বা কুফ্‌রী করিব না, তোমার নাফরমানী যাহারা করে (তাহাদের সঙ্গে আমরা কোন সংশ্রব রাখিব না,) তাহাদের আমরা পরিত্যাগ করিয়া চলিব। হে আল্লাহ্! আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করিব (অন্য কাহারও এবাদত করিব না।) একমাত্র তোমারই জন্য নামায পড়িব একমাত্র তোমাকেই সজ্‌দা করিব (তুমি ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য নামায পড়িব না বা অন্য কাহাকেও সজ্‌দা করিব না।) এবং একমাত্র তোমার আদেশ পালন ও তাবেদারীর জন্য সর্বদা (দৃঢ় মনে) প্রস্তুত আছি। (সর্বদা) তোমার রহ্‌মতের আশা এবং তোমার আযাবের ভয় হৃদয়ে পোষণ করি। (যদিও) তোমার আসল আযাব শুধু নাফরমানগণের উপরই হইবে। (তথাপি আমরা সে আযাবের ভয়ে কম্পমান থাকি।)

৪। **মাসআলাঃ** বেৎরের তিন রাকা'আতেই আল্‌হামদুর সহিত সূরা মিলান ওয়াজিব। (অন্যান্য নামাযের মত এ নামাযের জন্যও কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু হযরত (দঃ) অনেক সময় প্রথম রাকা'আতে সূরা-ছাব্বিহিস্‌মা দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা-কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকা'আতে সূরা-ইখলাছ পড়িয়াছেন, সেইজন্য আমরাও প্রায়ই এইরূপ পড়ি।)

৫। **মাসআলাঃ** তৃতীয় রাকা'আতে যদি দো'আ কুনূত পড়া ভুলিয়া গিয়া রুকূতে চলিয়া যায় এবং রুকূতে গিয়া স্মরণ হয়, তবে আর দো'আ কুনূত পড়িবে না এবং রুকূ হইতে ফিরিবে না এবং রুকূ করিয়া নামায শেষে ছহো সজ্‌দা করিয়া লইবে। অবশ্য যদি রুকূ হইতে ফিরিয়া গিয়া খাড়া হইয়া দো'আয়ে কুনূত পড়ে, তবুও নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু এরূপ করা ঠিক নহে এবং এ অবস্থায়ও ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

৬। মাসআলা ঃ ভুলে যদি প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে দো'আ কুনূত পড়িয়া ফেলে তবে ইহা দো'আ কুনূত হিসাবে ধরা হইবে না, তৃতীয় রাকা'আতে আবার পড়িতে হইবে এবং ছহো সজ্‌দাও করিতে হইবে।

৭। মাসআলা ঃ (দো'আ কুনূতের অর্থ আরবী ভাষায় খোদার নিকট বশ্যতার স্বীকারুক্তি।) যদি কেহ দো'আ কুনূত না জানে তবে শিখিতে চেষ্টা করিবে এবং শিক্ষা না হওয়া পর্যন্ত رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ পড়িবে বা তিনবার اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ বলিবে বা তিনবার يَارَبِّ বলিবে ইহাতেই তাহার নামায হইয়া যাইবে।

সুন্নত নামায

১। মাসআলা ঃ ফজরের সময় ফরযের আগে দুই রাকা'আত নামায সুন্নতে মোআক্কাদা। হাদীস শরীফে সুন্নত নামযের মধ্যে ফজরের এই দুই রাকা'আত সুন্নতের সর্বাপেক্ষা অধিক তাকীদ আসিয়াছে, কাজেই এই সুন্নত কখনও ছাড়িবে না।

২। মাসআলা ঃ যোহরের সময় প্রথম চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িবে, তারপর চারি রাকা'আত ফরয পড়িবে, তারপর আবার দুই রাকা'আত সুন্নত পড়িবে। যোহরের এই ছয় রাকা'আত সুন্নতেরও যথেষ্ট তাকীদ আসিয়াছে, বিনা কারণে ছাড়িয়া দিলে গোনাহও হইবে।

৩। মাসআলা ঃ আছরের সময় প্রথম চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িবে, তারপর চারি রাকা'আত ফরয পড়িবে। কিন্তু আছরের সুন্নতের জন্য তাকীদ আসে নাই; কাজেই যদি কেহ না পড়ে, তবে কোন গোনাহ্ হইবে না, কিন্তু যে পড়িবে, সে অনেক ছওয়াব পাইবে।

৪। মাসআলা ঃ মাগ্‌রিবের সময় প্রথমে তিন রাকা'আত ফরয পড়িবে, তারপরই দুই রাকা'আত সুন্নত পড়িবে। মাগ্‌রিবের এই দুই রাকা'আত সুন্নতের জন্যও তাকীদ আসিয়াছে, না পড়িলে গোনাহ্‌গার হইবে।

৫। মাসআলা ঃ এশার সময় প্রথমে চারি রাকা'আত সুন্নত পড়া ভাল। তারপর চারি রাকা'আত ফরয পড়িবে। তারপরই দুই রাক'আত সুন্নতে মুয়াক্কাদা পড়িবে, ইহা না পড়িলে গোনাহ্ হইবে। তারপর মনে চাহিলে দুই রাক'আত নফল পড়িবে। এই হিসাবে এশার ছয় রাকা'আত সুন্নত হয়, কিন্তু যদি কেহ এত পড়িতে না চায়, তবে প্রথমে চারি রাকা'আত ফরয পড়িবে, তারপর দুই রাক'আত সুন্নত পড়িবে, তারপর বেৎর পড়িবে। এশার সময় দুই রাকা'আত সুন্নতের তাকীদ আসিয়াছে। অতএব, এই দুই রাকা'আত পড়া যরূরী, না পড়িলে গোনাহ্ হইবে।

৬। মাসআলা ঃ রমযান মাসে (পূর্ণ মাস) তারাবীহ্ নামায পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা। এই নামাযের অনেক তাকীদ এবং ফযীলত আসিয়াছে। যদি কেহ তারাবীহ্ নামায মাস ভরিয়া না পড়ে (বা দুই এক দিন না পড়ে) তবে গোনাহ্‌গার হইবে। মেয়েলোকেরা সচরাচর তারাবীহ্‌র নামায কম পড়ে, কিন্তু এরূপ কখনও করিবে না। (ইহাতে গোনাহ্‌গার হইতে হয়।) এশার ফরয ও সুন্নতের পর দুই রাকা'আত করিয়া নিয়্যত বাঁধিয়া বিশ রাকা'আত নামায পড়িবে। (ইহার জন্য কোন সূরা বা দো'আ নির্দিষ্ট নাই) চারি রাকা'আত করিয়া নিয়্যত বাঁধিলেও হইবে, কিন্তু দুই দুই রাকা'আত করিয়া নিয়্যত বাঁধাই আফ্‌যল। তারাবীহর বিশ রাকা'আত সম্পূর্ণ পড়িয়া তারপর বেৎর পড়িবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ যে সব সুন্নতের তাকীদ আসিয়াছে, তাহাকে 'মোয়াক্কাদা' বলে। সুন্নতে মোয়াক্কাদা দৈনিক মাত্র বার রাকা'আত—ফজরে দুই, যোহরে ছয়, মাগরিবে দুই, এবং এশাতে

দুই; মোট এই বার রাকা'আত। রমযান মাসের তারাবীহ্ও সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং অনেক আলেমের মতে তাহাজ্জুদও সুন্নতে মোয়াক্কাদা।

৭। **মাসআলা ঃ** উপরোক্ত নামাযগুলি তো শরীঅতের পক্ষ হইতে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যদি কেহ পড়িতে চায়, তবে যত ইচ্ছা পড়িতে পারে এবং যে সময় ইচ্ছা সেই সময় পড়িতে পারে। শুধু এতটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মকরূহ্ ওয়াক্তে যেন না হয়। (মকরূহ্ ওয়াক্তের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে)। ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নত ছাড়া সমস্ত নামাযকে 'নফল' বলে। নফল নামাযের কোন সীমা নাই, যে যত বেশী পড়িবে, সে তত বেশী ছওয়াব পাইবে। খোদার অনেক বন্দা এমন ছিলেন যাঁহারা সারা রাত না ঘুমাইয়া শুধু নফল পড়িতেন। (নামায সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত, কাজেই যখনই কিছু সময় পাওয়া যায়, তখনই কিছু পড়িয়া লইলে ভাল হয়।)

৮। **মাসআলা ঃ** যে সব নফলের কথা শরীঅতে উল্লেখ করা হইয়াছে, অন্য নফলের চেয়ে সেই সব নফলের ছওয়াব বেশী। যথা ঃ—তাহিয়্যাতুল ওযূ, তাহিয়্যাতুল মস্জিদ, এশ্রাক, চাশ্ত, আউয়াবীন, তাহাজ্জুদ, ছালাতুত্ তস্বীহ্ ইত্যাদি।

তাহিয়্যাতুল ওযূ

৯। **মাসআলা ঃ** যখনই ওযূ করিবে তখনই দুই রাকা'আত নফল নামায পড়ার নাম 'তাহিয়্যাতুল ওযূ'। (এই নামায স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পড়িবে।) হাদীস শরীফে এই নামাযের খুব ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য মকরূহ্ ওয়াক্তে (ও স্ত্রীলোকের ওযরের সময়) পড়িতে নাই। (অন্য সব সময় পড়া যায়, কোন খাছ নিয়্যতও নাই।)

এশ্রাকের নামায

১০। **মাসআলা ঃ** এশ্রাক নামাযের নিয়ম এই যে, ফজরের নামায পড়িয়া জায়নামাযের উপরই বসিয়া থাকিবে এবং বসিয়া দুরূদ, কলেমা, কোরআন শরীফ বা অন্য কোন তস্বীহ বা ওযীফা পড়িতে থাকিবে, দুনিয়ার কথাবার্তা বলিবে না বা দুনিয়ার কোন কাজ-কর্মও করিবে না, তারপর যখন সূর্য উদয় হইয়া (এক নেজা পরিমাণ) উপরে উঠিবে, তখন দুই রাকা'আত বা চারি রাকা'আত নামায পড়িবে। ("এশ্রাক" বলিয়া নামকরণের কোনই আবশ্যক নাই, শুধু 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত নামায পড়ি' এতটুকু নিয়্যত করিলেই যথেষ্ট হইবে। হাদীস শরীফে এই নামাযের অনেক ফযীলত বয়ান করা হইয়াছে। এমন কি বলা হইয়াছে যে,) এই নামাযে এক হজ্জ, এক ওম্রার সমান ছওয়াব পাওয়া যায়। যদি কেহ ফজরের নামাযের পর দুনিয়ার আবশ্যকীয় কাজে লিপ্ত হয় এবং সূর্য উঠার পর এশ্রাক পড়ে, তাহাও জায়েয আছে, কিন্তু ছওয়াব কিছু কম হইবে।

চাশ্ত নামায

১১। **মাসআলা ঃ** সূর্য যখন আকাশের এক চতুর্থাংশ উপরে উঠে এবং রৌদ্র প্রখর হয়, তখন চাশ্ত নামাযের ওয়াক্ত হয়। তখন দুই, চার, আট বা বার রাকা'আত নামায পড়িতে পারিলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। (ইহার নিয়্যত উপরেরই মত।)

আউয়াবীন নামায

১২। মাসআলা ঃ মাগরিবের ফরয এবং সুন্নত পড়ার পর কমের পক্ষে ছয় রাকা'আত এবং ঊর্ধ্বে বিশ রাকা'আত নফল নামায পড়িলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। ইহাকে আউয়াবীন নামায বলে। (উপরোক্ত নামাযের মতই নিয়্যত করিবে।)

তাহাজ্জুদ নামায

১৩। মাসআলা ঃ গভীর রাত্রে এক ঘুমের পর উঠিয়া নামায পড়াকে 'তাহাজ্জুদ' নামায বলে। আল্লাহ্র নিকট এই নামায সব চেয়ে বেশী প্রিয়। হাদীস শরীফে সমস্ত নফলের চেয়ে তাহাজ্জুদ নামাযের বেশী ফযীলত ও ছওয়াব বর্ণিত আছে। এমন কি অনেক আলেম তাহাজ্জুদকে সুন্নতে মোয়াক্কাদা বলিয়াছেন। তাহাজ্জুদ কমের পক্ষে চারি রাকা'আত এবং ঊর্ধ্ব সংখ্যক বার রাকা'আত পড়িবে। দুই রাকা'আত পড়িলেও তাহাজ্জুদ আদায় হইয়া যাইবে। শেষ রাত্রে উঠিতে না পারিলে এশার পর পড়িয়া লইবে। যদিও শেষ রাত্রের সমান ছওয়াব পাইবে না (তবুও একেবারে ছাড়িয়া দিবে না)

(এই কয়েক প্রকার নফল নামাযের কথা এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইল।) এতদ্ব্যতীত দিনে রাত্রে যত ইচ্ছা নফল নামায পড়া যায়। নফল যতই বেশী পড়িবে ততই বেশী ছওয়াব পাইবে। (তাছাড়া যখন কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটে যেমন, সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণকালে, ভূমিকম্প, ঝড় তুফান, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা দুনিয়া অন্ধকার হইয়া যায়, দেশে ওবা, মহামারী বা অন্য কোন বিপদ বালা মুছীবত আসে, তখন খোদার তরফ রুজু হইয়া নফল নামায পড়িয়া খোদার কাছে কাঁদাকাটি করা উচিত।

ছালাতুত্ তস্বীহ্

১৪। মাসআলা ঃ হাদীস শরীফে 'ছালাতুত্ তস্বীহ' নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত আছে। এই নামায পড়িলে অসীম ছওয়াব পাওয়া যায়, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই নামায শিক্ষা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ঃ এই নামায পড়িলে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার আউয়াল আখেরের নূতন পুরাতন, ছগীরা, কবীরা (জানা অজানা,) সব গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন, হে চাচাজান! আপনি যদি পারেন, তবে দৈনিক একবার এই নামায পড়িবেন, যদি দৈনিক না পারেন, তবে সপ্তাহে একবার পড়িবেন, যদি সপ্তাহে না পারেন, তবে মাসে একবার পড়িবেন, যদি মাসে না পারেন তবে বৎসরে একবার পড়িবেন, যদি ইহাও না পারেন, তবে সারা জীবনে একবার এই নামায পড়িবেন (তবুও ছাড়িবেন না।) এই নামাযের (সুন্নত) নিয়ম এই যে, চারি রাকা'আত নামাযের নিয়্যত করিবে, (কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই, অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায় যে কোন সূরা দ্বারা পড়া যায়, তবে এই নামাযের বিশেষত্ব শুধু এতটুকু যে, চারি রাকা'আত নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রাকা'আতে ৭৫ বার করিয়া মোট ৩০০ বার

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ এই তসবীহ্‌টি পড়িতে হইবে;) আল্‌হামদুর পর সূরা পড়িয়াই (ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায়) ১৫ বার এই তস্‌বীহ্ পড়িবে, তারপর রুকূতে গিয়া রুকূর তাস্‌বীহ্ পড়ার পর ১০ বার, তারপর রুকূ হইতে উঠিয়া ক্বওমার মধ্যে ১০ বার, তারপর প্রথম সজ্‌দার মধ্যে গিয়া সজ্‌দার তস্‌বীহ্ পড়ার পর ১০ বার, তারপর প্রথম সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইয়া বসিয়া জলসার মধ্যে ১০ বার, তারপর দ্বিতীয় সজ্‌দার তস্‌বীহ্ পড়ার পর ১০ বার, তারপর দ্বিতীয় সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইয়া বসিয়া ১০ বার, এই পর্যন্ত এক রাকা'আত হইল এবং এই এক রাকা'আতে মোট ৭৫ বার তস্‌বীহ্ হইল। তারপর আল্লাহু আকবর বলিয়া দাঁড়াইয়া এইরূপে দ্বিতীয় রাকা'আত পড়িবে। দ্বিতীয় রাকা'আত পড়িয়া যখন আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার জন্য বসিবে, তখন আগে ১০ বার তস্‌বীহ্ পড়িয়া তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতেও এইরূপে পড়িবে।

১৫। মাসআলাঃ (কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই নামাযে সূরা-আছর, ক্বাওছার, কাফেরূন, এখলাছ পড়া বা তাগাবুন, হাশ্‌র, ছফ্, হাদীদ পড়া ভাল।) এই চারি রাকা'আতে যে কোন সূরা পড়িতে পারে, কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই।

নফল নামাযের আহ্‌কাম

১। মাসআলাঃ দিনে বা রাত্রে নফল নামাযের নিয়্যত একসঙ্গে দুই বা চারি রাকা'আতের করা যায়। কিন্তু দিনে এক সঙ্গে চারি রাকা'আতের বেশী ও রাত্রে আট রাকা'আতের বেশী নিয়্যত করা মকরূহ্।

২। মাসআলাঃ এক সঙ্গে চারি রাকা'আতের নিয়্যত করিয়া যদি নফল নামায পড়িতে চায়, তবে দ্বিতীয় রাকা'আতে যখন আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার জন্য বসিবে, তখন শুধু আত্তাহিয়্যাতু (আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত) পড়িয়া উঠিয়া বিস্‌মিল্লাহ্, আল্‌হামদু হইতে শুরু করিয়া চতুর্থ রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ ও দো'আ পড়িয়া সালাম ফিরানও দুরুস্ত আছে, এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ এবং দো'আ সবকিছু পড়িয়া (শুধু সালাম বাকী রাখিয়া) দাঁড়াইয়া তৃতীয় রাকা'আতে সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ্ হইতে শুরু করিয়া আবার চতুর্থ রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ ও দো'আ সবকিছু পড়িয়া সালাম ফিরানও দুরুস্ত আছে। উভয় ছুরতই জায়েয। কোন ছুরতেই কোন দোষ নাই। এইরূপে যদি রাত্রের নামাযে ছয় বা আট রাকা'আতের নিয়্যত এক সঙ্গে করিয়া পড়িতে চায়, তবে প্রত্যেক দ্বিতীয় রাকা'আতে বসিয়া শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া উঠিতে পারে এবং শেষ রাকা'আতে দুরূদ ও দো'আ পড়িয়া সালাম ফিরাইবে, বা প্রত্যেক দ্বিতীয় রাকা'আতে দুরূদ ও দো'আ পড়িয়া তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম রাকা'আতে সোবহানাকা হইতে শুরু করিবে, উভয় রকম জায়েয আছে, (কিন্তু প্রত্যেক দ্বিতীয় রাকা'আতে বসা ফরয। ক্বাব্‌লাল জুমু'আ, বা'দাল জুমু'আ এবং যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নতের মধ্যে দুই রাকা'আতের পর বসা ওয়াজিব; কিন্তু এই তিনটি সুন্নত নামাযের মধ্যে ফরয নামাযের মত দ্বিতীয় রাকা'আতে দুরূদ ও দো'আ পড়িবে না শুধু আত্তাহিয়্যাতু (আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত) পড়িয়াই উঠিয়া যাইবে এবং তৃতীয় রাকা'আত বিস্‌মিল্লাহ্ হইতে শুরু করিবে।)

৩। মাসআলাঃ ফরয নামায দুই রাকা'আতের বেশী হইলেও শুধু দুই রাকা'আতেই সূরা মিলাইতে হয়; কিন্তু সুন্নত (বেৎর) এবং নফল নামাযের প্রত্যেক রাক্'আতে আলহামদুর সহিত

সূরা মিলান ওয়াজিব। ইচ্ছাপূর্বক না মিলাইলে গোনাহ্ হইবে এবং ভুলে না মিলাইলে ছহো সেজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। ছহো সেজ্‌দার বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

৪। **মাসআলা ঃ** নফল নামাযের নিয়্যত করিয়া নামায শুরু করিয়া দিলে তখন আর ঐ নামায নফল (ইচ্ছাধীন) থাকে না, ওয়াজিব হইয়া যায়। অতএব, (বিনা কারণে) নামায ছাড়িয়া দিলে গোনাহ্ হইবে। (কোন ওযরবশতঃ) ছাড়িলে তাহার ক্বাযা পড়িবে। নফল নামাযের প্রত্যেক দুই রাকা'আত পৃথক ধরা হয়, কাজেই যদি কেহ চারি (ছয় বা আট) রাকা'আতেরও নিয়্যত করে তবুও দুই রাকা'আতই ওয়াজিব হইবে, (যদি কেহ চারি রাকা'আত বা আট রাকা'আতের নিয়্যত করা সত্ত্বেও দুই রাকা'আত পুরা করিয়া সালাম ফিরায়, তবে তাহাতে তাহার গোনাহ্ (ও) হইবে না (বা ক্বাযাও পড়িতে হইবে না)

৫। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ চারি রাকা'আত নফল নামাযের নিয়্যত বাঁধে এবং দুই রাকা'আত পুরা হওয়ার পূর্বেই নিয়্যত ছাড়িয়া দেয় (বা কোন কারণবশতঃ নামায ফাসেদ হইয়া যায়,) তবে মাত্র দুই রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে। (চারি রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে না।)

৬। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ চারি রাকা'আত নফল নামাযের নিয়্যত বাঁধিয়া তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে নিয়্যত ছাড়িয়া দেয়, তবে যদি দ্বিতীয় রাকা'আতের পর বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদি পড়িয়া থাকে তবে দুই রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে, আর যদি দ্বিতীয় রাকা'আতের পর না বসিয়া থাকে এবং (ভুলে বা ইচ্ছাপূর্বক) আত্তাহিয়্যাতু না পড়িয়াই দাঁড়াইয়া থাকে, তবে চারি রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যোহরের (এইরূপে ক্বাবলাল জুমু'আ এবং বা'দাল জুমু'আর) চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত করার পর যদি নিয়্যত ছাড়িয়া দেয় (বা কোন কারণবশতঃ ভাঙ্গিয়া দিতে হয়,) তবে দ্বিতীয় রাকা'আতে বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদি পড়ুক বা না পড়ুক উভয় ছুরতে চারি রাকা'আতের ক্বাযা পড়িতে হইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** নফল নামায বিনা ওযরেও বসিয়া পড়া জায়েয আছে, কিন্তু অর্ধেক ছওয়াব পাইবে, কাজেই সব নামায দাঁড়াইয়া পড়াই ভাল; বিনা ওযরে বসিয়া পড়া উচিত নহে। বেৎরের পর নফলের এই হুকুম। অবশ্য ওযরবশতঃ বসিয়া পড়িলেও পুরা ছওয়াব পাইবে। কিন্তু সুন্নত (ওয়াজিব) নামায বিনা ওযরে বসিয়া পড়া দুরুস্ত নহে।

৯। **মাসআলা ঃ** নফল নামায বসিয়া বসিয়া শুরু করিয়া পরে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া পড়িলে তাহাও জায়েয হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** নফল নামায দাঁড়াইয়া শুরু করার পর প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে বসিয়া পড়িলেও জায়েয হইবে।

১১। **মাসআলা ঃ** নফল নামায দাঁড়াইয়া পড়িতে পড়িতে যদি দুর্বলতার কারণে ক্লান্ত হইয়া যায়, তবে লাঠির খুঁটি, দেওয়াল বা বেড়ার সঙ্গে টেক লাগাইয়া পড়িলেও মক্‌রূহ্ হইবে না; দুরুস্ত আছে।

নামাযের ফরয, ওয়াজিব সম্বন্ধে কতিপয় মাসআলা—(গওহার)

১। **মাসআলা ঃ** মোদ্‌রেক মুক্তাদীর জন্য কেরা'আত নাই, ইমামের কেরা'আতই তাহার জন্য যথেষ্ট, হানাফী মাযহাবে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কেরা'আত পড়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী।

২। **মাসআলাঃ** মাসবুকের উপর কেরাআত ফরয, এক রাকা'আত ছুটিলে এক রাকা'আতে ফরয এবং দুই রাকা'আত ছুটিলে দুই রাকা'আতে ফরয।

৩। **মাসআলাঃ** ফলকথা, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর যিম্মায় কেরাআত নাই। কিন্তু মাসবুক পূর্বের রাকা'আতগুলিতে ইমামের পিছনে ছিল না বলিয়া যে কয় রাকা'আত তাহার ছুটিয়া গিয়াছে তাহাতে তাহার কেরাআত পড়িতে হইবে।

৪। **মাসআলাঃ** পায়ের জায়গা হইতে সজ্‌দার জায়গা আধ হাত অপেক্ষা অধিক উচ্চ হইলে নামায দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি জায়গা সংকীর্ণ হয় এবং ভিড়ের কারণে সজ্‌দা দিবার জায়গা না থাকে, জমা'আতের লোকের পিঠের উপর সজ্‌দা দিবে এবং যে সজ্‌দা দিবে উভয়ের একই নামাযের শরীক থাকিতে হইবে; নতুবা এইরূপ সজ্‌দা দুরুস্ত হইবে না।

৫। **মাসআলাঃ** ঈদুল-ফেৎর এবং ঈদুল-আয্‌হার নামাযে সাধারণ নামাযের চেয়ে ছয়টি তক্‌বীর বেশী বলা ওয়াজিব।

৬। **মাসআলাঃ** ফজরের উভয় রাকা'আতে মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আতে এবং জুমু'আ, দুই ঈদ, তারাবীহ্ রমযানের সময় বেৎরের সব রাকা'আতে জাহ্‌রিয়া (অর্থাৎ, উচ্চস্বরে) কেরাআত পড়া ইমামের উপর ওয়াজিব।

৭। **মাসআলাঃ** মোন্‌ফারেদ (অর্থাৎ একা নামাযী) জাহ্‌রিয়া নামাযে অর্থাৎ, ফজরের উভয় রাকা'আতে এবং মাগরিব এশার প্রথম দুই রাকা'আতে (জাহ্‌রান্) উচ্চস্বরে বা চুপে চুপে (ছির্রান) উভয় রকমে পড়িতে পারে, ইহা তাহার ইচ্ছাধীন। ফেক্বাহ্‌র কিতাবে কেরাআত অন্যে শুনিতে পাইলে 'জাহ্‌রান' এবং নিজে শুনিতে পাইলে তাহাকে 'ছির্রান' বলা হইয়াছে।

৮। **মাসআলাঃ** ইমাম হউক বা মোনফারেদ হউক সকলের জন্যই যোহর ও আছরের সব রাকা'আতে এবং মাগরিবের শেষে এক রাকা'আতে ও এশার শেষের দুই রাকা'আতে ছির্রান অর্থাৎ চুপে চুপে কেরাআত পড়া ওয়াজিব।

৯। **মাসআলাঃ** দিনের নফলের কেরাআত চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব, কিন্তু রাত্রের নফলের (সুন্নতের ও বেৎরের) কেরাআত ইচ্ছাধীন, জাহ্‌রান বা ছির্রান যে কোন প্রকারে পড়িতে পারে।

১০। **মাসআলাঃ** ফজর, মাগরিব বা এশার নামাযের ক্বাযা দিনের বেলায় একা পড়িলে চুপে চুপে কেরাআত পড়া ওয়াজিব এবং রাত্রের বেলায় পড়িলে ইচ্ছাধীন, কিন্তু যদি একদল জমা'আতে ক্বাযা নামায পড়ে, তবে ইমামের জোরে কেরাআত পড়া ওয়াজিব, রাত্রে পড়ুক বা দিনে পড়ুক। (এইরূপে যোহর ও আছরের নামায জমা'আতে ক্বাযা পড়িলে রাত্রে পড়ুক বা দিনে পড়ুক কেরাআত চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব।)

১১। **মাসআলাঃ** যদি কেহ মাগরিবের বা এশার প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা মিলাইতে ভুলিয়া যায়, তবে তাহার তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে সূরা মিলাইতে হইবে (এবং ইমাম হইলে এক রাকা'আতে সূরা জোরে পড়িবে এবং শেষে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে)।

নামাযের কতিপয় সুন্নত

১। **মাসআলাঃ** তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিবার সঙ্গে (কিঞ্চিত পূর্বে) উভয় হাত পুরুষদের কান পর্যন্ত এবং মেয়েদের কাঁধ পর্যন্ত উঠান সুন্নত, ওযরবশতঃ পুরুষগণও যদি কাঁধ পর্যন্ত উঠায় তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই।

২। মাসআলা ঃ তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে (হাত না ঝুলাইয়া) উভয় হাত বাঁধিয়া লওয়া সুন্নত, পুরুষের জন্য নাভির নীচে বাঁধা সুন্নত এবং স্ত্রীলোকের জন্য বুকের উপর বাঁধা সুন্নত।

৩। মাসআলা ঃ পুরুষের হাত বাঁধিবার সময় বাম হাতের পাতার পৃষ্ঠের উপর ডান হাতের পাতার বুক রাখিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং কনিষ্ঠার দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরা এবং ডান হাতের মধ্যের তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপর বিছাইয়া রাখা সুন্নত। (স্ত্রীলোকগণ শুধু বাম হাতের পাতার পিঠের উপর ডান হাতের পাতার বুক রাখিয়া দিবে। অঙ্গুলির দ্বারা কব্জি ধরিবে না বা কব্জির উপর অঙ্গুলি বিছাইবে না।

৪। মাসআলা ঃ ইমাম এবং মোন্‌ফারেদের জন্য সূরা-ফাতেহা খতম হইলে সব সময় আস্তে 'আমীন' বলা সুন্নত এবং জাহ্‌রিয়া নামায হইলে ইমামের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদীর জন্যও আস্তে 'আমীন' বলা সুন্নত (আস্তের অর্থ—নিজে যেন শুনিতে পায়।

৫। মাসআলা ঃ পুরুষদের জন্য রুকূর অবস্থায় ভালমত ঝুঁকিয়া যাওয়া, যেন মাথা, পিঠ, চোতড় এক বরাবর (হয় এইরূপভাবে) ঝুঁকিয়া যাওয়া সুন্নত।

৬। মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য রুকূর মধ্যে হাত পার্শ্বদেশ হইতে পৃথক রাখা সুন্নত। কওমার মধ্যে ইমামের শুধু 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌' বলা, মুক্তাদীর জন্য শুধু 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলা এবং মোনফারেদের উভয়টা বলা সুন্নত।

৭। মাসআলা ঃ পুরুষের সজ্‌দার মধ্যে পেট হাঁটু হইতে পৃথক রাখা এবং কনুই পার্শ্বদেশ হইতে পৃথক রাখা এবং হাতের বাহু জমিন হইতে উঠাইয়া রাখা সুন্নত।

৮। মাসআলা ঃ উভয় বৈঠকের মধ্যে পুরুষগণ ডান পায়ের অঙ্গুলিগুলি ক্বেব্‌লার দিকে মোড়াইয়া রাখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া পাতা সোজা রাখিয়া বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া তাহার উপর বসিবে এবং উভয় হাত রানের উপর এমনভাবে রাখিবে, যেন অঙ্গুলিগুলি হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ভাবে বিছান থাকে, ইহা সুন্নত। স্ত্রীলোকদের জন্য ডান পায়ের নীচে দিয়া, বাম পা ডান দিক দিয়া বাহির করিয়া উভয় পা বিছাইয়া রাখিয়া বাম চুতড়ের উপর ভর দিয়া বসা সুন্নত।

৯। মাসআলা ঃ ইমামের উচ্চ স্বরে সালাম ফিরান সুন্নত (যেন মুক্তাদী শুনিতে পায়।)

১০। মাসআলা ঃ ইমামের জন্য সালামের মধ্যে সমস্ত মুক্তাদীকে এবং সঙ্গের ফেরেশ্‌তাগণকে সালাম করার নিয়্যত করা সুন্নত। মুক্তাদীর জন্য সালামের মধ্যে সমস্ত মুছল্লীকে এবং সঙ্গের ফেরেশ্‌তাকে এবং ইমামকে সালাম করার নিয়্যত করা সুন্নত। ইমাম যদি ডান দিকে থাকে, তবে ডান দিকে সালাম ফিরাইবার সময়, যদি বাম দিকে থাকে, তবে বাম দিকে সালাম ফিরাইবার সময় এবং যদি সামনাসামনি থাকে, তবে উভয় দিকে সালাম ফিরাইবার সময় ইমামকে সালাম করার নিয়্যত করা সুন্নত।

১১। মাসআলা ঃ তকবীরে তাহ্‌রীমা বলিবার সময় পুরুষদের জন্য আস্তীন এবং চাদর হইতে হাত বাহির করিয়া হাত উঠান সুন্নত।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ—(বেঃ গওহর)

১। মাসআলা ঃ মস্‌জিদে প্রবেশকালে আন্তরিক ভক্তি ও ভয়ের সহিত প্রবেশ করিবে এবং প্রবেশ করা মাত্র বসিবার পুর্বেই দুই রাকা'আত নামায পড়িবে। এই নামাযকে

'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' বলে। অর্থাৎ, ইহা আহ্‌কামুল হাকেমীনের দরবারের তা'যীম। হাদীস শরীফে এই নামায পড়িবার জন্য হুকুম আছে, কাজেই এই নামায সুন্নত।

২। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ মকরূহ্ ওয়াক্তে মসজিদে প্রবেশ করে, তবে নামায পড়িবে না, আদবের সহিত বসিয়া سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ এই তসবীহ্ চারিবার পড়িবে এবং দুরূদ শরীফ পড়িবে।

'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত নামায পড়ি' বা 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মস্‌জিদ নামায পড়িতেছি' এইরূপে মুখে বলিয়া ও মনে মনে চিন্তা করিয়া লইলেই নিয়্যত হইয়া যাইবে। মুখে বলার চেয়ে দেলের খেয়াল বেশী যরূরী।

৩। **মাসআলা ঃ** তাহিয়্যাতুল মস্‌জিদ যে, দুই রাকা'আতই হইবে তাহার কোন সীমা নির্ধারিত নাই, চারি বা ততোধিকও হইতে পারে, তবে দুইয়ের চেয়ে কম হইতে পারে না। এমন কি, মস্‌জিদে আসা মাত্রই যদি ফরয বা সুন্নত পড়িতে হয়, তাহাতেও তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য উহার নিয়্যত করিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** মস্‌জিদে আসিয়া যদি কেহ বসিয়া পড়ে এবং তারপর উঠিয়া তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে, তাহাতেও দোষ নাই, তবে বসিবার পূর্বে পড়াই উত্তম। হাদীসে আছে—যখন তোমরা মসজিদে যাও, তখন দুই রাকা'আত নামায না পড়া পর্যন্ত বসিও না। —মেশ্‌কাত

৫। **মাসআলা ঃ** মস্‌জিদে যদি দৈনিক কয়েকবার যাওয়া হয়, তবে যে কোন একবার তাহিয়্যাতুল মস্‌জিদ পড়িলেই যথেষ্ট হইবে।

এস্তেখারার নামায

১। **মাসআলা ঃ** যখন কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করিবে, তখন আগে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে খায়ের-বরকতের জন্য দো'আ করিয়া লইবে, তারপর কাজে হাত দিবে। এই মঙ্গল প্রার্থনাকেই আরবীতে 'এস্তেখারা' বলে। হাদীস শরীফে সব কাজের পূর্বে এস্তেখারা করিয়া লওয়ার বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খায়ের ও বরকতের জন্য দো'আ না করা বদবখ্‌তির আলামত।' (ফরয, ওয়াজিব এবং নাজায়েয কাজের জন্য এস্তেখারা নাই।) বিবাহ শাদি, বিদেশ যাত্রা, (বাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি) যাবতীয় মোবাহ কাজের আগে এস্তেখারা করিয়া তারপর করিবে, তাহা হইলে ইন্‌শা আল্লাহ্ (ফল ভাল হইবে,) পরে অনুতাপ করিতে হইবে না।

২। **মাসআলা ঃ** এস্তেখারা করিবার সুন্নত তরীকা এই যে, (এ'শার পর তাজা ওযূ করিয়া) প্রথমে দুই রাকা'আত নামায খুব ভক্তির সহিত পড়িবে, তারপর এই দো'আটি খুব মনোযোগের সহিত, (অর্থের দিকে খেয়াল রাখিয়া, খোদাকে হাযির নাযির জানিয়া অন্ততঃ তিনবার পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَآ اَقْدِرُ
وَ تَعْلَمُ وَلَآ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌلِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ
وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّلِّىْ فِىْ دِيْنِىْ
وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ○

ভাবার্থ—('হে আল্লাহ্! তুমি জান, আমি জানি না, তুমি ক্ষমতাবান, আমি অক্ষম অর্থাৎ, ভবিষ্যতের এবং পরিণামের খবর অন্য কেহই জানে না, একমাত্র তুমিই জান; এবং তুমি সর্বশক্তিমান। মন্দকেও ভাল করিয়া দিতে পার; কাজের শক্তিও তুমিই দান কর, চেষ্টাকে ফলবতীও তুমিই কর, কাজেই আমি তোমার নিকট মঙ্গল চাহিতেছি এবং কাজের শক্তি প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ্! যদি এই কাজটি আমার জন্য, আমার দ্বীনের জন্য, আমার দুনিয়ার জন্য এবং আমার পরিণাম ও আকেবতের জন্য তুমি ভাল মনে কর, তবে এই কাজটি আমার জন্য তুমি নির্ধারিত করিয়া দাও এবং উহা আমার জন্য সহজলভ্য করিয়া দাও এবং উহাতে আমার জন্য খায়ের বরকত দান কর। পক্ষান্তরে যদি এই কাজটি আমার পক্ষে, আমার দ্বীনের পক্ষে বা দুনিয়ার পক্ষে বা পরিণামের হিসাবে আমার জন্য মন্দ হয়, তবে এই কাজকে আমা হইতে দূরে রাখ, আর যেখানে মঙ্গল আছে তাহা আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দাও এবং তাহাতেই আমি যেন সন্তুষ্ট থাকি।') যখন هذا الامر ('হাযাল আম্‌রা') শব্দটি মুখে উচ্চারণ করিবে, তখন যে কাজ করিবার ধারণা করিয়াছ মনে মনে তাহা স্মরণ করিবে। তারপর পাক বিছানায় ওযূর সহিত পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিবে। ভোরে উঠিয়া মন যেদিকে ঝুঁকে বলিয়া মনে হয় তাহা করিবে, তাহাতেই ইন্‌শাআল্লাহ্ ভাল হইবে। (অনেকে মনে করে, "ইস্তেখারা" দ্বারা গায়েবের রহস্য জানা যায় বা স্বপ্নে কেহ বলিয়া দেয়, ইহা যরূরী নহে। তবে স্বপ্নে কিছু জানিতেও পারে, নাও জানিতে পারে।)

৩। **মাসআলা ঃ** যদি এক দিনে মন ঠিক না হয়, তবে পর পর সাতদিন এস্তেখারা করিবে। তাহা হইলে ইন্‌শাআল্লাহ্ ভালমন্দ বুঝা যাইবে। (আল্লাহ্‌র কাছে মঙ্গলের জন্য দো'আ করাই এস্তেখারার আসল উদ্দেশ্য; সুতরাং মন কোন দিকে না ঝুঁকিলেও এস্তেখারা করিয়া কাজ করিলে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতে মঙ্গলই হইবে।)

৪। **মাসআলা ঃ** হজ্জে যাওয়ার জন্য এই ভাবিয়া এস্তেখারা করিবে না যে, যাইবে কি না যাইবে। অবশ্য কোন নির্দিষ্ট তারিখে বা জাহাজে যাইবে কি না তজ্জন্য এস্তেখারা করিবে।

(মাসআলা ঃ যদি কোন কারণে এস্তেখারার নামায পড়িতে না পারে, অন্ততঃ দো'আটি কয়েকবার পড়িয়া লইবে, তবুও এস্তেখারা ছাড়িবে না। অন্ততঃ اَللّٰهُمَّ خِرْلِىْ وَاخْتَرْلِىْ এতটুকু পড়িবে।)

ছালাতুত্ তওবা

১। **মাসআলা ঃ** ঘটনাক্রমে যদি কোন কাজ বা কথা শরীঅত বিরোধী হইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট খুব কাঁদাকাটি করিবে এবং ক্ষমা চাহিবে এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে যে, এরূপ অন্যায় আর কখনও করিবে না। ইহাই তওবা। এইরূপ তওবা করিলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ পাক গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। (আন্তরিক প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও যদি কখনও আবার গোনাহ্ হইয়া যায়, তবে আবার ঐরূপ তওবা করিবে। কোন ওযরবশতঃ তৎক্ষণাৎ তওবা করিতে না পারিলে দিনের গোনাহ্‌র জন্য রাত্রে কাঁদিয়া কাটিয়া তওবা করিবে। খোদা দয়ালু, ক্ষমাশীল। তিনি নিজ গুণে গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন।)

ছালাতুল্ হাজাত (বর্ধিত)

(**মাসআলা** ঃ যখন কেহ কোন অভাবে বা বিপদে পড়ে বা কাহারো মনে কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে, তখন তাহার সর্বাগ্রে খোদার দিকে রুজু হওয়া উচিত। তারপর কাজ সাধ্যের মধ্যে হইলে যথোচিত চেষ্টা করিবে এবং ফলের জন্য খোদার রহ্মতের উপর নির্ভর করিবে; প্রথমে ওযূ করিয়া খুব মনোযোগের সহিত দুই রাকা'আত নামায পড়িবে, নিজের গোনাহ্র জন্য মাফ চাহিবে, তারপর আল্লাহ্র প্রশংসা করিবে سُبْحَانَكَ الخ পড়িলেও আল্লাহ্র প্রশংসা হইবে) এবং দুরূদ শরীফ পড়িয়া নিম্নের এই দো'আটি কয়েকবার কায়মনোবাক্যে পড়িবে—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ يَا عَلِيُّ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَمُنْجِيَاتِ اَمْرِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ اَللّٰهُمَّ لَاتَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَآئِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○

এবং নিজের যে কোন মকছুদ থাকে, তাহা আল্লাহ্র কাছে চাহিবে। ইনশাআল্লাহ্ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

সফরে নফল নামায—(গওহর)

১। **মাসআলা** ঃ সফরে যাইবার সময় দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবে, যখন সফর হইতে দেশে ফিরিবে, তখন আগে মসজিদে গিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িবে। তারপর বাড়ী যাইবে, এইরূপ করা মোস্তাহাব।

হাদীস ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, 'যে সফরে যাইবার সময় দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া ঘরে রাখিয়া যাইবে, তাহা অপেক্ষা উত্তম পুঁজি আর নাই।'

হাদীস ঃ নবী আলাইহিস্সালাম সফর হইতে বাড়ী আসিলে 'আগে মসজিদে গিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িতেন, তারপর বাড়ীর মধ্যে যাইতেন।'

২। **মাসআলা** ঃ সফরের মধ্যে যদি কোন স্থানে কিছুকাল অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সেখানে বসার পূর্বে দুই রাকা'আত নামায পড়া মোস্তাহাব।

মৃত্যুকালীন নামায—(গওহর)

১। **মাসআলা** ঃ যখন কোন মুসলমান মৃত্যু সন্নিকটে বলিয়া বুঝিতে পারে (যেমন, কেহ কোন মুসলমানকে হত্যা করিবার বা ফাঁসী দিবার আয়োজন করিতেছে) তখন তাহার জীবনের অন্তিম-কালে অতি ভক্তিভরে দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া আল্লাহ্র নিকট সব গোনাহ্ মাফ চাহিয়া লওয়া উচিত। তাহা হইলে এই নামায এবং এই তওবা ও এস্তেগ্ফার তাহার ইহজীবনের সর্বশেষ

নেক আমলরূপে লিখিত থাকিবে। হযরত (দঃ)-এর যমানায় কয়েকজন ক্বারী আলেম কোরআন শরীফ শিক্ষা দেওয়ার জন্য একস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে দুরাচার কাফিরদল কর্তৃক তাঁহারা ধৃত হন। একজন ব্যতীত সকলকে ঐ খানেই পাষণ্ডগণ নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া ফেলে। যিনি বাঁচিয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল খোবায়েব। নিষ্ঠুরেরা তাঁহাকে মক্কায় লইয়া গিয়া অতি সমারোহের সহিত শহীদ করে। তাহাদের এই আয়োজন দেখিয়া তিনি জীবনের অন্তিমকালে দুই রাকা'আত নামায পড়িবার জন্য (এবং মা'বূদের নিকট নিজের মনের আবেগ জানাইবার জন্য) ইজাযত লইয়াছিলেন। তখন হইতে এই নামায মোস্তাহাব হয়।

তারাবীহ্‌র নামায—(গওহর)

১। **মাসআলা ঃ** বেৎরের নামায তারবীহ্‌র পরে পড়া আফ্‌যল। যদি তারাবীহ্‌র আগে বেৎর পড়ে, তাহাও দুরুস্ত আছে।

২। **মাসআলা ঃ** তারাবীহ্‌র প্রত্যেক চারি রাকা'আতের পর, চারি রাকা'আত পরিমাণ সময় বসিয়া বিশ্রাম করা মোস্তাহাব। কিন্তু যদি এত সময় বসিয়া থাকিলে জমা'আতের লোকের কষ্ট হয় বা জমা'আত কম হওয়ার আশংকা থাকে, তবে এত সময় বসিবে না, কম বসিবে। এই বিশ্রামের সময় শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, পৃথক পৃথক নফল নামায পড়া বা তসবীহ্, দুরূদ ইত্যাদি পড়া সব জায়েয আছে। এদেশে 'সোবহানা যিল মুল্‌কে ওয়াল মালাকূতে' পড়ার এবং মোনাজাত করার যে প্রচলন আছে, তাহাও জায়েয আছে। কিন্তু এই দো'আ কোন ছহীহ্ হাদীসে নাই। আবার অনেকে এই দো'আ না জানার কারণে তারাবীহ্ই পড়ে না তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, এই দো'আ না পড়িলে নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না, নামায হইয়া যাইবে। যদি পারে, তবে শুধু سُبْحَانَ اللهِ (সোবহানাল্লাহ্) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ (সোব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আ'যীম) পড়িবে। কিছু না পড়িয়া নীরবে বসিয়া থাকিলেও নামাযের কোন ক্ষতি নাই (প্রত্যেক চতুর্থ রাকা'আতে মোনাজাত করা জায়েয আছে, কিন্তু বিশ রাকা'আতের পর বেৎরের পূর্বে দো'আ করাই আফ্‌যল।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও এশার নামায কোন কারণ বশতঃ ফাসেদ হইয়া যায় এবং তাহা বেৎর বা তারাবীহ্‌র সব বা কতক পড়ার পর জানিতে পারে, তবে তাহার এশার নামাযের সঙ্গে সঙ্গে বেৎর এবং তারাবীহ্ যত রাকা'আত পড়িয়াছে, তাহাও দোহ্‌রাইতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** এশার নামায জমা'আতে না পড়িলে তারাবীহ্‌র নামাযও জমা'আতে পড়া জায়েয হইবে না। ইহার কারণ তারাবীহ্ এশার তাবে (অনুগামী), কাজেই এশার চেয়ে তারাবীহ্‌র সম্মান বেশী করা জায়েয নহে! অতএব, যদি কোথাও পাড়ার লোকেরা দুর্ভাগ্য বশতঃ এশার নামাযের জমা'আত না করিয়া শুধু তারাবীহ্‌র জমা'আত করিতে চায়, তবে তাহা জায়েয হইবে না। কিন্তু যদি পাড়ার লোকেরা এশার জমা'আত পড়িয়া তারাবীহ্‌র নামায জমা'আতে পড়িতে থাকে এবং দুই একজন লোকে এশার নামাযের জমা'আত না পাইয়া থাকে, তবে তাহারা এশার নামায একা একা পড়িয়া তারাবীহ্‌র জমা'আতে শরীক হইতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ মসজিদে আসিয়া দেখে, এশার জমা'আত হইয়া গিয়া তারাবীহ্ শুরু হইয়া গিয়াছে, তবে সে আগে একা একা এক পার্শ্বে এশা পড়িয়া লইবে, তারপর তারাবীহ্‌র জমা'আতে শামিল হইবে। ইত্যবসরে যে কয় রাকা'আত তারাবীহ্ তাহার ছুটিয়া গিয়াছে তাহা

সে তারাবীহ্ এবং বেৎর জমা'আতের সঙ্গে পড়িয়া তারপর পড়িবে, জমা'আতের বেৎর ছাড়িবে না। (যদি কয়েক জনের কিছু তারাবীহ্ ছুটিয়া থাকে, তাহারা পরে জমা'আত করিয়াও তাহা পড়িতে পারে এবং শেষ রাত্রেও পড়িতে পারে।)

৬। মাসআলা ঃ রমযান শরীফের পুরা মাসে তারাবীহ্র মধ্যে তরতীব অনুযায়ী একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। লোকের অবহেলা বা অলসতার কারণে এই সুন্নত পরিত্যাগ করা উচিত নহে। কিন্তু যে সব লোক একেবারেই অলস, কোরআন খতমের ভয়ে হয়ত তাহারা নামাযই ছাড়িয়া দিতে পারে, তাহাদের জন্য সূরা তারাবীহ্র জমা'আত করিয়া দেওয়া যাইতে পাবে। সূরা তারাবীহ্র মধ্যে কোরআনের যে কোন অংশ বা যে কোন সূরা পড়িলেই চলে। প্রত্যেক রাকা'আতে কুল্‌হুআল্লাহ্ সূরা পড়িলেও জায়েয আছে, অথবা যদি 'সূরা ফীল' হইতে 'সূরা নাস' পর্যন্ত দশটি সূরার দ্বারা দশ রাকা'আত পড়িয়া, আবার দ্বিতীয় বার 'সূরা ফীল' হইতে 'সূরা নাস' পর্যন্ত পড়িয়া বাকী দশ রাকা'আত পড়ে, এ নিয়মও মন্দ নয়।

৭। মাসআলা ঃ তারাবীহ্র জমা'আতে সম্পূর্ণ রমযান মাসে কোরআন শরীফ এক খতমের বেশী পড়িবে না। অবশ্য যদি মুছল্লিগণের অতিশয় আগ্রহ হয়, তবে বেশী পড়াতেও ক্ষতি নাই। (আমাদের ইমাম আ'যম ছাহেব প্রত্যেক রমযান শরীফে কোরআন শরীফ ৬১ বার খতম করিতেন; ৩০ দিনে ৩০ খতম, ৩০ রাত্রে ৩০ খতম এবং তারাবীহ্র মধ্যে এক খতম ইহাতে তাঁহার মোট ৬১ খতম হইত।)

৮। মাসআলা ঃ এক রাত্রে কোরআন শরীফ খতম করা জায়েয আছে, কিন্তু যদি (লফ্য ছাড়িয়া বা কাটিয়া কাটিয়া পড়ে কিংবা) লোকের কষ্ট হয়, বা অভক্তি প্রকাশ পায়, তবে মক্রূহ।

৯। মাসআলা ঃ তারাবীহ্র খতমের মধ্যে পূর্ণ কোরআন শরীফের যে কোন একটি সূরার শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ জোরে পড়া চাই, নতুবা পূর্ণ কোরআন খতমের ছওয়াব মিলিবে না, এক আয়াত কম থাকিয়া যাইবে। যদি হাফেয ছাহেব চুপে চুপে পড়িয়া নেন, তবে হাফেয ছাহেবের কোরআন পুরা হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু মুক্তাদীদের এক আয়াত কম থাকিয়া যাইবে। অতএব, খতম তারাবীহ্র মধ্যে যে কোন একটি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ উচ্চৈস্বরে পড়িবে। (সাধারণতঃ আলেমগণ সূরা-আলাক্ব-এর পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ আওয়ায করিয়া পড়িয়া থাকেন।)

১০। মাসআলা ঃ সম্পূর্ণ রমযান মাসে প্রত্যেক রাত্রে বিশ রাকা'আত করিয়া তারাবীহ্ পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা, যে সন্ধ্যায় রমযানের চাঁদ দেখিবে সেই রাত হইতেই তারাবীহ্ পড়া শুরু করিবে এবং যে সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদ দেখিবে সেই রাত্রে ছাড়িবে। যদি কোরআন আগে খতম হইয়া যায়, তবুও অবশিষ্ট রাতগুলিতেও তারাবীহ্ পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা (সূরা তারাবীহ্ হইলেও পড়িবে) কেহ কেহ কোরআন খতম হইয়া গেলে জমা'আতে আসে না বা তারাবীহ্ পড়ে না বা কেহ আট রাকা'আত পড়িয়াই চলিয়া যায়, ইহা তাহাদের ভুল। (ইহাতে তাহারা গোনাহ্গার হইবে।)

১১। মাসআলা ঃ তারাবীহ্র মধ্যে কোরআন খতমের সময় যখন কুল্‌হুআল্লাহ্ (قل هو الله) সূরা আসে, তখন এই সূরা তিনবার পড়া মকরূহ্। (অর্থাৎ এইরূপ রছম বানাইয়া লওয়া এবং ইহাকে শরীঅতের হুকুম মনে করিয়া আমল করা মকরূহ্, নতুবা নফল নামাযে বা তারাবীহ্র নামাযে উক্ত সূরা তিনবার করিয়া পড়া মকরূহ্ নহে।)

(তারাবীহ্র জমা'আত পুরুষদের জন্য সুন্নতে কেফায়া। অতএব, যদি সকলে মিলিয়া জমা'আত করে এবং কেহ ঘরে বসিয়া তারাবীহ্র নামায পড়ে, তবে সে জমা'আতের ছওয়াব

পাইবে না বটে, কিন্তু গোনাহ্‌গার হইবে না। কিন্তু যদি পাড়ার সকলেই জমা'আত তরক করে, তবে সকলেই গোনাহ্‌গার হইবে।)

কুছুফ ও খুছুফের নামায—(গওহর)

(কুছুফ বলে সূর্যগ্রহণকে এবং খুছুফ বলে চন্দ্রগ্রহণকে। সূর্যগ্রহণের সময় যে নামায পড়া হয়, তাহাকে 'ছালাতুল কুছুফ' এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় যে নামায পড়া হয় তাহাকে 'ছালাতুল খুছুফ' বলে।)

১। **মাসআলা ঃ** সূর্যগ্রহণের সময় দুই রাকা'আত নামায পড়া সুন্নত। (শুধু 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত কুছুফের নামায পড়িতেছি' বলিয়া নিয়ত করিবে।)

২। **মাসআলা ঃ** সূর্যগ্রহণের নামায জমা'আতের সঙ্গে পড়িতে হয়। ইমামতের হকদার তৎকালীন মুসলমান বাদশাহ্‌ বা তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তি। এক রেওয়ায়ত অনুসারে প্রত্যেক মস-জিদের ইমাম নিজ নিজ মসজিদের জমা'আত করিয়া সূর্যগ্রহণের নামায পড়াইবেন। (যদি ইমাম না পাওয়া যায়, তবে প্রত্যেকে একা একা পড়িবে এবং স্ত্রীলোক নিজ গৃহে পৃথক পৃথক পড়িবে।)

৩। **মাসআলা ঃ** কুছুফের নামাযের জন্য আযান বা একামত নাই, পাড়ার লোকগণকে জমা করিবার জন্য **الصلوة جامعة** ('নামাযে চল' 'নামাযে চল') বলিয়া একজন লোক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে।

৪। **মাসআলা ঃ** ছালাতুল কুছুফের মধ্যে সূরা বাকারার ন্যায় অনেক লম্বা কেরাআত পড়া এবং রুকূ সজ্‌দা অনেক দীর্ঘ করিয়া করা সুন্নত। কেরাআত চুপে চুপে পড়িতে হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** নামায শেষে ইমাম কেবলা রোখ হইয়া বসিয়া বা লোকদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের গ্রহণ সম্পূর্ণ না ছুটে, ততক্ষণ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া দো'আ করিতে থাকিবে (এবং নিজেদের কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে,) মুক্তাদিগণ 'আমীন' বলিতে থাকিবে। ফলকথা, গ্রহণ না ছুটা পর্যন্ত (দুনিয়ার কাজকর্ম বন্ধ রাখিয়া) নামায, দো'আ ইত্যাদি এবাদত-বন্দেগী এবং আল্লাহ্‌র দরবারে কাঁদাকাটায় লিপ্ত থাকা উচিত। অবশ্য যদি গ্রহণ ছুটিবার পূর্বে সূর্য অস্ত যাইতে থাকে বা কোন ফরয নামাযের ওয়াক্ত হয়, তবে দো'আ ছাড়িয়া নামায পড়িয়া লইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** চন্দ্রগ্রহণের সময়ও (অন্ততঃ) দুই রাকা'আত নামায পড়া সুন্নত। কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের নামাযের জন্য জমা'আত করা বা মসজিদে যাওয়া সুন্নত নহে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ীতে পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়িবে;

৭। **মাসআলা ঃ** এইরূপ যখনই কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে, কোন বিপদ বা বালা মুছীবত আসে, তখন নামায পড়া সুন্নত। যেমন, ঝড়ের সময়, ভূমিকম্পের সময়, বজ্রপাতের সময়, যখন অনেক বেশী তারা ছুটে, শিলা বা বরফ পড়ে, অতিরিক্ত বৃষ্টি হইতে থাকে, দেশে কলেরা, বসন্ত বা প্লেগ ইত্যাদি মহামারী আসে বা শত্রু ঘিরিয়া লয়। কিন্তু এই সব নামাযের জন্য জমা'আত নাই, প্রত্যেকেই নিজে নিজে পৃথকভাবে নামায পড়িবে, (উভয় জাহানের বিপদ উদ্ধারের জন্য দো'আ করিবে এবং কৃত গোনাহ্‌র জন্য মা'ফ চাহিবে।) হাদীস শরীফে আছে, যখনই কোন বিপদ বা মুছীবত আসিত রসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন (এবং আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হইয়া দো'আ করিতেন।)

৮। **মাসআলা ঃ** এখানে যত প্রকার নামাযের কথা বর্ণিত হইল তাহা ছাড়াও নফল নামায যত বেশী পড়িবে ততই বেশী ছওয়াব পাইবে এবং মর্তবা বাড়িবে। বিশেষতঃ যে যে সময় এবাদত করার জন্য রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। যেমন, রমযান শরীফের শেষ দশ রাত্রের বে-জোড় রাত্রসমূহে, শা'বানের (চৌদ্দই দিন গত) পনরই রাত্র ইত্যাদি। এই সব ফযীলতের সময় নফল নামায পড়িলে অনেক বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ হক্কানী আলেমের নিকট জানিয়া লইবেন।

এস্তেস্কার নামায—(গওহর)

যখন অনাবৃষ্টিতে লোকের কষ্ট হইতে থাকে, তখন আল্লাহ্র নিকট পানির জন্য দরখাস্ত করা এবং দো'আ করা সুন্নত। ইহাকেই আরবীতে 'এস্তেস্কা' বলে। এস্তেস্কার সুন্নত তরীকা এই যে, দেশের সমস্ত মুসলমান পুরুষ সঙ্গে বালক, বৃদ্ধ এবং গরু বাছুর লইয়া পায়ে হাঁটিয়া গরীবানা লেবাস পরিয়া নেহায়েত আজেযী এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে ময়দানে বাহির হইবে এবং সকলেই নিজ নিজ কৃত পাপের জন্য আল্লাহ্র নিকট অপরাধ স্বীকার করতঃ নূতন করিয়া মা'ফ চাহিবে! মন নরম করিয়া খাঁটিভাবে তওবা করিবে। যদি কেহ কাহারও হক্ নষ্ট করিয়া থাকে তাহা ফেরত দিবে, কোন অমুসলমান বা কোন কাফিককে সঙ্গে আনিবে না। তারপর সকলের মধ্যে যিনি বেশী আল্লাহ্ওয়ালা আলেম, তাঁহাকে ইমাম নিযুক্ত করিয়া সকলে মিলিয়া জমা'আতে দুই রাকা'আত নামায পড়িবে। ইহার জন্য আযান বা এক্কামত নাই। ইমাম কেরা'আত উচ্চৈঃস্বরে পড়িবেন এবং নামাযের পর ঈদের খোৎবার মত দুইটি খোৎবা পড়িবেন।তারপর ইমাম ক্বেব্লা-রোখ হইয়া দাঁড়াইয়া উভয় হাত প্রসারিত করিয়া রহ্মতের পানির জন্য দো'আ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেও দো'আ করিবে। পর পর তিন দিন এইরূপ করিবে। তিন দিনের বেশী ছাবেত নাই। এই তিন দিন রোযা রাখাও মোস্তাহাব, যদি তিন দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি হইয়া যায়, তবুও তিন দিন পূর্ণ করা উত্তম। যাইবার পূর্বে ছদকা খয়রাত করাও মোস্তাহাব।

ক্বাযা নামায—(বেঃ জেওর)

১। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও কোন (ফরয) নামায ছুটিয়া যায়, তবে স্মরণ আসা মাত্রই ক্বাযা পড়া ওয়াজিব। বিনা ওযরে যদি ক্বাযা পড়িতে দেরী করে, তবে গোনাহ্গার হইবে। অতএব, যদি কাহারও কোন নামায ক্বাযা হইয়া যায় এবং স্মরণ আসা মাত্র তাহার ক্বাযা না পড়িয়া অন্য সময় পড়িবে বলিয়া রাখিয়া দেয় এবং হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া পড়ে, তাহার দুই গোনাহ্ হইবে। এক গোনাহ্ নামায না পড়ার, আর এক গোনাহ্ সময় পাওয়া সত্ত্বেও তাহার ক্বাযা না পড়ার। (ইচ্ছাপূর্বক নামায ছাড়িয়া দেওয়া কবীরা গোনাহ্। এই গোনাহ্ মাফ পাইতে হইলে শুধু ক্বাযা পড়িলে হইবে না বা শুধু তওবা করিলেও চলিবে না; তওবাও করিতে হইবে, ক্বাযাও পড়িতে হইবে।)

২। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও কয়েক ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হইয়া থাকে তবে যথাশীঘ্র সব নামাযের ক্বাযা পড়িয়া লওয়া উচিত। এমন কি, যদি সাহস করিয়া সব নামাযের ক্বাযা এক ওয়াক্তেই পড়িয়া লইতে পারে, তবে সব চেয়ে ভাল। যোহরের নামাযের ক্বাযা যে যোহরের ওয়াক্তেই পড়িতে হইবে এইরূপ কোন বিধান নাই। যদি কাহারও কয়েক মাসের বা কয়েক বৎসরের নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে তাহারও যথাশীঘ্র সব নামাযের ক্বাযা পড়িয়া লওয়া

উচিত। এক এক ওয়াক্তে দুই তিন বা চারি ওয়াক্তের কাযা পড়িয়া লইলেও ভাল হয়। একান্ত যদি কোন মজবুরী হয় (যেমন বেশী অভাবী লোক হয় এবং বাল-বাচ্চাদিগকে খাটিয়া খাওয়াইতে হয় বলিয়া সময় না পায়, তবে খাটুনীর বাহিরে যখনই একটু সময় পাইবে, তখনই কাযা পড়িবে,) অন্ততঃ এক ওয়াক্তের সঙ্গে এক ওয়াক্তের কাযা পড়িবে।

৩। মাসআলাঃ কাযা নামায পড়ার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নাই, যখনই একটু সময় পাওয়া যায়, তখনই ওযূ করিয়া দুই চারি ওয়াক্তের কাযা পড়িয়া লওয়া যায়। তবে মকরূহ্ ওয়াক্তে পড়িবে না।

৪। মাসআলাঃ যদি কাহারও মাত্র (দুই) এক ওয়াক্ত নামায কাযা হইয়া থাকে, ইহার পূর্বে কোন নামায কাযা হয় নাই, অথবা কাযা হইয়াছে কিন্তু কাযা পড়িয়া লইয়াছে। শুধু এক ওয়াক্তের কাযা বাকী আছে, তবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত কাযা নামায পড়িয়া না লইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার ওয়াক্তিয়া নামায দুরুস্ত হইবে না। কাযা না পড়িয়া যদি ওয়াক্তিয়া পড়ে, তবে তাহা আবার দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। অবশ্য যদি কাযা নামাযের কথা স্মরণ না থাকাবশতঃ ওয়াক্তিয়া পড়িয়া থাকে, তবে ওয়াক্তিয়া নামায দুরুস্ত হইবে, দোহ্‌রাইতে হইবে না। কিন্তু স্মরণ আসা মাত্রই কাযা পড়িয়া লইবে।

৫। মাসআলাঃ যদি ওয়াক্ত এমন সংকীর্ণ হয় যে, কাযা পড়িয়া ওয়াক্তিয়া পড়িলে ওয়াক্তিয়াও কাযা হইয়া যায়, তবে ওয়াক্তিয়া আগে পড়িয়া লইবে, তারপর কাযা পড়িবে।

৬, ৭। মাসআলাঃ যদি কাহারও দুই, তিন, চারি বা পাঁচ ওয়াক্তের নামায কাযা হয়, অর্থাৎ এক দিনের পরিমাণ নামায কাযা হয়, তবে তাহাকে 'ছাহেবে তরতীব' বলে। এক দিনের বেশী নামায কাযা হইলে অর্থাৎ ছয় বা ততোধিক নামায কাযা হইলে তরতীব থাকে না; এক সঙ্গে হউক বা পৃথক পৃথক কাযা জমা হউক। ছাহেবে তরতীব হইলে তাহার যেমন কাযা এবং ওয়াক্তিয়ার মধ্যে তরতীব রক্ষা করা ফরয, তেমনই কাযা নামাযগুলির মধ্যে তরতীব রক্ষা করা ফরয। কাহারও ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব এবং এশা (বেৎরসহ) কাযা হইলে এই নামাযগুলি পড়ার পূর্বে পরদিনের ফজরের নামায পড়িলে তাহা শুদ্ধ হইবে না এবং যে নামাযগুলি কাযা হইয়াছে তাহাও পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ আগে ফজর, তারপর যোহর, তারপর আছর, তারপর মাগরিব, তারপর এশা, তারপর বেৎর পড়িতে হইবে। ছাহেবে তরতীব না হইলে কাযা নামায রাখিয়া দিয়াও ওয়াক্তিয়া পড়িলে তাহা দুরুস্ত হইবে এবং যে নামাযগুলি কাযা হইয়াছে তাহার মধ্যে তরতীব রক্ষা করাও ফরয হইবে না।

৮। মাসআলাঃ যদি কাহারও ছয় ওয়াক্তের উপর পুরান যামানার কাযা থাকে, তারপর রীতিমত নামাযী হয় এবং বহুকাল পরে হঠাৎ এক ওয়াক্ত নামায কাযা হইয়া যায়, তবে সেও ছাহেবে তরতীব থাকিবে না। এই কাযা রাখিয়া ওয়াক্তিয়া নামায পড়িলে ওয়াক্তিয়া নামায দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৯। মাসআলাঃ কাহারও যিম্মায় ছয় কিংবা বহু নামায কাযা ছিল, সেই কারণে সে ছাহেবে তরতীব ছিল না, তারপর সে কিছু কিছু করিয়া কাযা পড়িতে পড়িতে সব পড়িয়া ফেলিল, তবে সে এখন হইতে আবার ছাহেবে তরতীব হইবে। অতএব, আবার যদি পাঁচ সংখ্যক ফরয নামায কাযা হয়; তবে আবার তরতীব রক্ষা করা ফরয হইবে এবং আবার যদি ছয় বা ততোদিক সংখ্যক কাযা একত্র হইয়া যায়, তবে আবার তরতীব মাফ হইয়া যাইবে; (কাযা নামায থাকিতে ওয়াক্তিয়া

নামায পড়িতে পারিবে।) কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে ইচ্ছাপূর্বক কাযা না পড়িয়া তরতীব মাফ হইয়া যাইবে আশায় কাযার সংখ্যা বাড়াইতে থাকিলে গোনাহ্ হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** বহুসংখ্যক নামাযের অল্প অল্প করিয়া কাযা পড়িতে পড়িতে মাত্র চারি পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকিলেও তরতীব ওয়াজিব হইবে না, এই চারি-পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে যাহা ইচ্ছা আগে পড়িতে পারিবে এবং চারি-পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামায পড়িতে পারিবে।

১১। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও বেৎর নামায কাযা হইয়া যায় এবং অন্য কোন নামায যিম্মায় কাযা না থাকে, তবে বেৎর না পড়িয়া ফজরের নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না। স্মরণ থাকা এবং সময় থাকা সত্ত্বেও যদি বেৎর না পড়িয়া ফজর পড়ে তবে বেৎর কাযা পড়িয়া তারপর ফজর পুনরায় পড়িতে হইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** কেহ শুধু এশার নামায পড়িয়া বেৎর না পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িল, শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়িয়া বেৎর পড়িল, পরে জানিতে পারিল যে, ভুলে এশার নামায বে-ওযূ অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহার শুধু এশার নামায কাযা পড়িতে হইবে, বেৎর কাযা পড়িতে হইবে না।

১৩। **মাসআলা ঃ** শুধু ফরয এবং বেৎরের কাযা পড়ার হুকুম আছে, তাহা ব্যতীত সুন্নত বা নফলের কাযা পড়ার হুকুম নাই। অবশ্য (যদি সুন্নত বা নফল নামায শুরু করার পর নিয়ত ভঙ্গ করে তবে তাহার কাযা পড়িতে হইবে বা) ফজরের নামায যদি ছুটিয়া যায় এবং দুপুরের পূর্বে কাযা পড়ে, তবে সুন্নতসহ কাযা পড়িতে হইবে; কিন্তু এক্ষেত্রেও দুপুরের পর কাযা পড়িলে শুধু ফরয দুই রাকা'আতের কাযা পড়িতে হইবে, সুন্নতের কাযা পড়িতে হইবে না।

১৪। **মাসআলা ঃ** ওয়াক্ত সংকীর্ণ হইয়া যাওয়ায় (বা জমা'আত ছুটিয়া যাওয়ার ভয়ে) যদি কেহ ফজরের সুন্নত ছাড়িয়া শুধু ফরয পড়িয়া লয়, তবে সূর্য উদয় হইয়া এক নেযা উপরে উঠার পর হইতে দুপুরের পূর্বেই সুন্নতের কাযা পড়িয়া লইবে।

১৫। **মাসআলা ঃ** যদি কোন (লোক শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া প্রথম বয়সে) বে-নামাযী (থাকে এবং কিছুদিন পর সৌভাগ্যবশতঃ) তওবা করিয়া নামায পড়া শুরু করে, তবে (বালেগ হওয়ার পর হইতে) তাহার যত নামায ছুটিয়া গিয়াছে সব নামাযের কাযা পড়া ওয়াজিব হইবে, তওবার দ্বারা নামায মা'ফ হয় না, অবশ্য নামায না পড়ার যে নাফরমানীর গোনাহ্ হইয়াছিল তাহা মা'ফ হইয়া যাইবে। এখন যদি বিগত সব নামাযের কাযা না পড়ে, তবে গোনাহ্ হইবে।

১৬। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও কিছুসংখ্যক নামায ছুটিয়া যায় এবং উহার কাযা পড়ার পূর্বে মৃত্যু আসিয়া পড়ে, তবে মৃত্যুর পূর্বেই ঐ সব নামাযের জন্য ফিদিয়া দেওয়ার ওছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। যদি ওছিয়ত না করে, তবে গোনাহ্গার হইবে। (ফিদিয়ার পরিমাণ বেৎরসহ প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে দুই সের গম বা তাহার মূল্য, অথবা একজন গরীব-দুঃখীকে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়ান।) —রোযার ফিদিয়া দ্রষ্টব্য

[**মাসআলা ঃ** যদি কোন কারণবশতঃ দলশুদ্ধ লোকের নামায কাযা হইয়া যায়, তবে তাহারা ওয়াক্তিয়া নামায যেমন জমাআতে পড়িত তদ্রূপ কাযা নামাযও জমা'আতে পড়িবে। ছির্‌রিয়া নামাযের কাযার মধ্যেও চুপে চুপে কেরাআত পড়িবে এবং জেহ্‌রিয়া নামাযের কাযার মধ্যেও কেরাআত উচ্চ স্বরে পড়িবে।

মাসআলাঃ কোন না-বালেগ ছেলে এশার নামায পড়িয়া ঘুমাইয়াছিল সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া কাপড়ে দাগ দেখিতে পাইল (অর্থাৎ, রাত্রি থাকিতে বালেগ হইয়াছে এইরূপ আলামত পাওয়া গেল,) তাহার এশার এবং বেৎরের নামায ক্বাযা পড়িতে হইবে।] —অনুবাদক

ছহো সজ্‌দা—(বেঃ জেওর)

১। **মাসআলাঃ** নামাযের মধ্যে যতগুলি ওয়াজিব আছে তাহার একটি বা কয়েকটি যদি ভুল বশতঃ ছুটিয়া যায়, তবে তাহার (ক্ষতিপূরণের জন্য) ছহো সজ্‌দা করা ওয়াজিব। ইহাতে (ওয়াজিব ছুটিয়া যাওয়ায় নামাযের যতটুকু নোকছান হইয়াছিল ছহো সজ্‌দা দ্বারা তাহা পূরণ হইয়া যাইবে এবং) নামায দুরুস্ত হইয়া যাইবে, যদি ছহো সজ্‌দা না করে, তবে নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে।

২। **মাসআলাঃ** যদি নামাযের কোন ফরয ভুলে ছুটিয়া যায় (বা কোন ওয়াজিব ইচ্ছাপূর্বক ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহার ক্ষতিপূরণের কোনই উপায় নাই,) ছহো সজ্‌দার দ্বারা নামায দুরুস্ত হইবে না, নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে।

৩। **মাসআলাঃ** ছহো সজ্‌দা করার নিয়ম এই যে, শেষ রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতু, (আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত) পড়িয়া ডান দিকে সালাম ফিরাইবে এবং আল্লাহু আকবর বলিয়া নিয়ম মত দুইটি সজ্‌দা করিবে, তারপর আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দো'আ সব পড়িয়া উভয় দিকে সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

৪। **মাসআলাঃ** যদি কেহ ভুলে ডান দিকে সালাম না ফিরাইয়া (শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া—এমন কি দুরূদ ও দো'আ প্রভৃতি পড়িয়া) ছহো সজ্‌দা করে, তবুও ছহো সজ্‌দা আদায় হইবে এবং নামাযও দুরুস্ত হইবে।

৫। **মাসআলাঃ** ভুলবশতঃ যদি কেহ দুই রুকূ করিয়া ফেলে বা তিন সজ্‌দা করিয়া ফেলে, তবে ছহো সজ্‌দা করা ওয়াজিব হইবে।

৬। **মাসআলাঃ** যদি কেহ ভুলবশতঃ আল্‌হামদু না পড়িয়া শুধু সূরা পড়ে বা আগে সূরা পড়িয়া তারপর আল্‌হামদু পড়ে, তবে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

৭। **মাসআলাঃ** ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে যদি সূরা মিলাইতে ভুলিয়া যায়, তবে শেষের দুই রাকা'আতে সূরা মিলাইবে এবং ছহো সজ্‌দা করিবে। যদি প্রথম দুই রাকা'আতের কোন এক রাকা'আতে সূরা মিলাইতে ভুলিয়া যায়, তবে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে সূরা মিলাইবে এবং ছহো সজ্‌দা করিবে। যদি প্রথম দুই রাকা'আতেও সূরা মিলাইতে ভুলিয়া গিয়া থাকে এবং শেষের দুই রাকা'আতেও স্মরণ না হয় আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় স্মরণ হয়, তবে আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া ছহো সজ্‌দা করিবে, তাহাতেই নামায দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৮। **মাসআলাঃ** (বেৎর,) সুন্নত ও নফল নামাযের সব রাকা'আতে সূরা মিলান ওয়াজিব, যদি কেহ কোন রাকা'আতে ভুলবশতঃ সূরা না মিলায়, তবে তাহার ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে।

৯। **মাসআলাঃ** কেহ আল্‌হামদু (বা অন্য কোন সূরা) পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, ইহার পর কোন্ সূরা (বা কোন্ আয়াত) পড়িবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যদি তাহার তিনবার "সোব্‌হানাল্লাহ্" পড়া যায় পরিমাণ সময় বিনা পড়ায় অতিবাহিত হয়, তবে তাহার ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। (কিন্তু যদি চুপ করিয়া না থাকিয়া কোন আয়াত বার বার দোহ্‌রাইতে থাকে,

তারপর নিজে নিজেই মনে আসে বা কোন মুক্তাদীর লোক্‌মা দ্বারা স্মরণ হয়, তবে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না।)

১০। মাসআলাঃ কেহ শেষ রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া সন্দেহের কারণে চুপ করিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, ইহা তৃতীয় রাকা'আত না চতুর্থ রাকা'আত? কতক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিল যে, ইহা চতুর্থ রাকা'আত, তারপর সালাম ফিরাইল (বা তৃতীয় রাকা'আত স্থির করিয়া দাঁড়াইয়া আর এক রাকা'আত পড়িতে প্রস্তুত হইল) কিন্তু এই চিন্তায় সে এতক্ষণ চুপ করিয়া রহিয়াছে যতক্ষণে তিনবার "সোব্‌হানাল্লাহ্" পড়া যাইত, তবে তাহার ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে।

১১। মাসআলাঃ যদি কেহ আল্‌হামদু পড়িয়া সূরা মিলাইয়া ভুলবশতঃ কিছু চিন্তা করিতে থাকে এবং সেই চিন্তায় তিনবার সোব্‌হানাল্লাহ্ পড়া যায় পরিমাণ সময় অতীত হইয়া যায় (বা কাহারও যদি রুকূর মধ্যে গিয়া স্মরণ হয় যে, সূরা মিলাইতে ভুলিয়া গিয়াছে, তারপর রুকূ হইতে উঠিয়া সূরা মিলায়, তবে তাহার আবার রুকূ করিতে হইবে।) এই (উভয়) অবস্থায় ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব।

১২। মাসআলাঃ এইরূপ যদি কেহ কোন সূরা পড়িতে পড়িতে আট্‌কিয়া যায় এবং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তিন তস্‌বীহ্ পরিমাণ চিন্তা করে, বা দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে বসিয়া তাহা না পড়িয়া চিন্তা করিয়া তিন তস্‌বীহ্ পরিমাণ দেরী করে, বা রুকূ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে থাকে এবং এই জন্য তিন তস্‌বীহ পরিমাণ দেরী হয়, বা প্রথম সজ্‌দা হইতে উঠিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে থাকে এবং সেই জন্য দ্বিতীয় সজ্‌দায় যাইতে তিন তস্‌বীহ পরিমাণ দেরী হইয়া যায়, তবে এইসব অবস্থায় ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। ফলকথা, ওয়াজিব তরক হইলে যেমন ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ ভুলে বা চিন্তা করার কারণে যদি কোন ফরয বা ওয়াজিব আদায় করিতে তিন তস্‌বীহ্ পরিমাণ দেরী হইয়া যায়, তবেও ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

১৩। মাসআলাঃ তিন বা চারি রাকা'আত ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে বসিয়া যদি কেহ ভুলে আত্তাহিয়্যাতু দুইবার পড়িয়া ফেলে, বা আত্তাহিয়্যাতু শেষ করিয়া اللهم صل على محمد (আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মুহাম্মাদিন) পর্যন্ত বা আরও বেশী দুরূদ পড়িয়া ফেলে, তৎপর স্মরণ হওয়ায় দাঁড়াইয়া গেল, তবে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। ইহার কম পড়িলে ওয়াজিব হইবে না।

১৪। মাসআলাঃ সুন্নত ও নফল নামাযে দ্বিতীয় রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ পড়াও জায়েয আছে। কাজেই নফলে দুরূদ পড়িলে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না; কিন্তু আত্তাহিয়্যাতু দুইবার পড়িলে নফলের মধ্যেও ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

১৫। মাসআলাঃ আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে বসিয়া যদি ভুলে অন্যকিছু (যেমন সোব্‌হানাকা, দো'আ কুনূত বা সূরা ফাতেহা) পড়ে, তবে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

১৬। মাসআলাঃ নামাযের নিয়্যত বাঁধিয়া কেহ যদি ভুলে سبحانك (সোব্‌হানাকা) পড়ার পরিবর্তে দো'আ কুনূত (বা আত্তাহিয়্যাতু) পড়ে তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না। এইরূপে যদি কেহ ফরয নামাযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে আল্‌হামদুর স্থলে আত্তাহিয়্যাতু বা সোব্‌হানাকা বা অন্য কিছু (যেমন আল্‌হামদুর পর সূরা) পড়ে তাহাতেও ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না।

১৭। মাসআলাঃ তিন বা চারি রাকা'আতী (ফরয) নামাযের দ্বিতীয় রাকা'আতে (বসা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কেহ) বসিতে ভুলিয়া তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াইতে উদ্যত হয় এবং শরীরের নিম্নার্ধ সোজা হওয়ার পূর্বে বসিয়া পড়ে, তবে ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে না; কিন্তু যদি শরীরের নিম্নার্ধ সোজা হইয়া যায়, তবে আর বসিবে না; দাঁড়াইয়া তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আত পড়িবে, এবং শেষ বৈঠকে ছহো সজ্‌দা করিবে। সোজা হইয়া দাঁড়ানোর পর বসিয়া তাশাহ্‌হুদ পড়িলে গোনাহ্‌গার হইবে। কিন্তু নামায হইয়া যাইবে এবং ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

১৮। মাসআলাঃ কেহ যদি চতুর্থ রাকা'আতের পর বসিতে ভুলিয়া দাঁড়াইতে উদ্যত হয়, সে শরীরের নিম্নার্ধ সোজা হওয়ার পূর্বে স্মরণ আসিলে বসিয়া পড়িবে এবং আত্তাহিয়্যাতু ও দুরূদ পড়িয়া সালাম ফিরাইবে, ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে না। আর যদি সম্পূর্ণ দাঁড়াইয়া যাওয়ার পরে স্মরণ আসে, তবুও বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে হইবে, এমন কি সূরা ফাতেহার পর কিংবা রুকূ করার পরও যদি স্মরণ আসে, তবুও বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে হইবে এবং ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে; কিন্তু যদি সজ্‌দা করার পর স্মরণ হয়, তবে আর বসিবে না, পঞ্চম রাকা'আত পূর্ণ করিবে এবং আরও এক রাকা'আত পড়িয়া ছয় রাকা'আত পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইবে কিন্তু এই অবস্থায় ফরয পুনরায় পড়িতে হইবে, এই নামায নফল হইয়া যাইবে, ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে না। আর যদি ষষ্ঠ রাকা'আত না মিলায় পঞ্চম রাকা'আতের পর বসিয়া সালাম ফিরায়, তবে এক রাকা'আত বাতিল ও চারি রাকা'আত নফল হইবে এবং ফরয পুনরায় পড়িবে!

১৯। মাসআলাঃ যদি চতুর্থ রাকা'আতে বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর ভুলে দাঁড়াইয়া যায় ও পঞ্চম রাকা'আতের সজ্‌দা করার পূর্বে স্মরণ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু না পড়িয়া এক দিকে সালাম ফিরাইয়া ছহো সজ্‌দা করিবে; তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া নামায শেষ করিবে। আর যদি পঞ্চম রাকা'আতের সজ্‌দা করার পর স্মরণ হয়, তবে আরও এক রাকা'আত পড়িয়া ছয় রাকা'আত পূর্ণ করিবে; চারি রাকা'আত ফরয এবং দুই রাকা'আত নফল হইবে এবং ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে। আর যদি পঞ্চম রাকা'আতের সঙ্গে ষষ্ঠ রাকা'আত না মিলাইয়া পঞ্চম রাকা'আতেই সালাম ফিরায় এবং ছহো সজ্‌দা করে, তবুও নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু অন্যায় হইবে। চারি রাকা'আত ফরয হইবে এবং এক রাকা'আত বৃথা যাইবে।

২০। মাসআলাঃ কেহ চারি রাকা'আত নফল (বা সুন্নত নামায) পড়িতে গিয়া যদি দুই রাকা'আতের সময় বসিতে ভুলিয়া যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় রাকা'আতের সজ্‌দা না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্মরণ আসা মাত্র বসিয়া পড়িবে, আর যদি তৃতীয় রাকা'আতের সজ্‌দা করার পর স্মরণ হয়, তবে বসিবে না। চারি রাকা'আত পূর্ণ করিয়া বসিবে। এই উভয় অবস্থায় নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে।

২১। মাসআলাঃ যদি কাহারও নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয় যে, চারি রাকা'আত পড়িয়াছে কি তিন রাকা'আত পড়িয়াছে, তবে দেখিতে হইবে যে, যদি কদাচিত এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে (একদিকে সালাম ফিরাইয়া ঐ নামায ছাড়িয়া দিয়া) নূতন নিয়্যত করিয়া নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িবে, আর যদি প্রায়ই তাহার এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে তাহার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহার মন তিন বা চারি এই দুই দিকের কোন এক দিকে বেশী ঝুঁকে কি না? যদি এক দিকে বেশী ঝুঁকে, তবে তিনের দিকে ঝুঁকিলে তিন রাকা'আত ধরিয়া আর এক রাকা'আত পড়িয়া নামায শেষ করিবে, আর যদি চারির দিকে ঝুঁকে, তবে চারি রাকা'আত ধরিয়া নামায

শেষ করিবে। এইরূপ সন্দেহের কারণে ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে না। (কিন্তু যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া চিন্তা করিয়া সময় অতিবাহিত করে, তদ্দরুন ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে) আর যদি উভয় দিকে সমান হয়, কোন দিকে মন না যায় এবং তিন বা চারি কিছুই স্থির করিতে না পারে, তবে তিনই (অর্থাৎ কমটাই) ধরিতে হইবে, কিন্তু এই তৃতীয় রাকা'আতেও বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে হইবে। (কারণ, হয়ত উহা চতুর্থ রাকা'আত হইতে পারে) তৎপর চতুর্থ রাকা'আতেও বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে হইবে এবং ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে।

২২। **মাসআলা ঃ** যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে, প্রথম রাকা'আত কি দ্বিতীয় রাকা'আত ? তাহার হুকুমও এইরূপ হইবে যে, কদাচিৎ এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে নূতন নিয়্যত করিয়া নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে, যদি অধিকাংশ সময় এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে যে দিকে মন ঝুঁকিবে সেই দিক্‌কে গ্রহণ করিবে। যদি মন কোন এক দিকে না ঝুঁকে ও উভয় দিকে সমান হয়, তবে এক রাকা'আতই (অর্থাৎ, কমটাই) ধরিতে হইবে কিন্তু এই প্রথম রাকা'আতে বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। কারণ, হয়ত ইহা দ্বিতীয় রাকা'আত হইতে পারে, দ্বিতীয় রাকা'আতের পরও বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে এবং এই রাকা'আতে সূরাও মিলাইবে (কারণ, ইহাকেই দ্বিতীয় রাকা'আত সাব্যস্ত করা হইয়াছে) তারপর তৃতীয় রাকা'আতেও বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। কারণ, হয়ত ইহা চতুর্থ রাকা'আত হইতে পারে, তারপর চতুর্থ রাকা'আত পড়িয়া বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে এবং ছহো সজ্‌দা করিয়া নামায শেষ করিবে।

২৩। **মাসআলা ঃ** যদি দ্বিতীয় কি তৃতীয় রাকা'আত হওয়ার মধ্যে সন্দেহ হয়, তবে তাহার হুকুমও এইরূপ ; যদি উভয় দিকের ধারণা সমান সমান হয়, তবে এই দ্বিতীয় রাকা'আতেও বসিবে এবং তৃতীয় রাকা'আতেও বসিবে। কারণ, হয় উহা চতুর্থ রাকা'আত হইতে পারে, তারপর চতুর্থ রাকা'আত পড়িয়া ছহো সজ্‌দা করিয়া নামায শেষ করিবে।

২৪। **মাসআলা ঃ** নামায শেষ করার পর যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে, তিন রাকা'আত হইয়াছে, না কি চারি রাকা'আত ? তবে এই সন্দেহের কোন মূল্য নাই, নামায হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যদি সঠিক স্মরণ থাকে যে, তিন রাকা'আতই হইয়াছে, তবে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আর এক রাকা'আত পড়িবে এবং ছহো সজ্‌দা করিয়া সালাম ফিরাইবে, তাহাতেই নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি সালাম ফিরাইবার পর কথা বলিয়া থাকে, বা এমন কাজ করিয়া থাকে যাহাতে নামায টুটিয়া যায় যেমন, ক্কেবলা হইতে ঘুরিয়া বসিল, তবে নূতন নিয়্যত বাঁধিয়া সম্পূর্ণ নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। এইরূপে যদি শেষ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পরে এইরূপ সন্দেহ হয়, তবে তাহারও এই হুকুম যে, সঠিকভাবে স্মরণ না আসিলে সে সন্দেহেরও কোন মূল্য নাই, (অবশ্য যদি ঠিক্‌ভাবে স্মরণ আসে যে, এক রাকা'আত কম হইয়াছে, তবে আর এক রাকা'আত পড়িয়া ছহো সজ্‌দা করিয়া নামায শেষ করিবে।) যে সব অবস্থায় সন্দেহের কোন মূল্য নাই বলা হইয়াছে, সে সব অবস্থায়ও যদি কেহ ঐ নামায শেষ করিয়া মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্য নূতন নিয়্যত করিয়া নামায দোহ্‌রাইয়া লয়, তবে তাহা অতি উত্তম।

২৫। **মাসআলা ঃ** এক নামাযে একবার মাত্র ছহো সজ্‌দা হইতে পারে। দুই বা ততোধিক ভুল হইলেও একবার ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে। এক নামাযে দুইবার ছহো সজ্‌দার দরকার হয় না।

২৬। **মাসআলা ঃ** এমন কি যদি ছহো সজ্‌দা করার পরও কোন ভুল হয়, তবুও পুনর্বার ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে না ঐ সজ্‌দাই যথেষ্ট হইবে।

২৭। মাসআলাঃ কাহারও হয়ত নামাযের মধ্যে এমন ভুল হইয়াছিল, যাহার কারণে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইয়াছিল, কিন্তু সজ্‌দা করিতে মনে নাই, উভয় দিকে সালাম ফিরাইয়া ফেলিয়াছে, তবে যাবৎ সে কথা না বলিবে, বা ছিনা ক্বেব্‌লা হইতে না ঘুরাইবে, বা নামায ভঙ্গ হওয়ার অন্য কোন কারণ না পাওয়া যাইবে, তাবৎ ছহো সজ্‌দা করিতে পারিবে; এমন কি যদি ক্বেব্‌লা-রোখ হইয়া মোছাল্লার উপর বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওযীফা পড়িতে থাকে, তারপর ছহো সজ্‌দার কথা মনে হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আল্লাহু আকবর বলিয়া দুইটি সজ্‌দা করিয়া আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দো'আ পড়িয়া সালাম ফিরাইলে নামায হইয়া যাইবে, ইহাতে কোন দোষ হইবে না (আর যদি নামায-বিরুদ্ধ কোন কাজ বা কথার পর স্মরণ আসে, তবে নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে)।

২৮।ঃ ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হওয়ার পর যদি ইচ্ছা করিয়া উভয় দিকে সালাম ফিরায় এবং এই নিয়্যত করিল যে, ছহো সজ্‌দা করিব না, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত নামায-বিরুদ্ধ কোন কাজ না পাওয়া যাইবে, ছহো সজ্‌দা করার এখতিয়ার থাকিবে।

২৯। মাসআলাঃ চারি রাকা'আত বা তিন রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে যদি কেহ দুই রাকা'আত পড়িয়াই ভুলে সালাম ফিরাইয়া ফেলে, তবে সে স্মরণ আসা মাত্র দাঁড়াইয়া নামায পূর্ণ করিতে পারিবে এবং ছহো সজ্‌দা করিবে, অবশ্য যদি সালামের পর নামায-বিরুদ্ধ কোন কাজ হওয়ার স্মরণ আসে, তবে নূতন নিয়্যত বাঁধিয়া দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে।

৩০। মাসআলাঃ বেৎরের প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আতে যদি কেহ ভুলে দো'আ কুনূত পড়িয়া ফেলে, তবে এই পড়ার কোন মূল্য নাই, তৃতীয় রাকা'আতে আবার পড়িতে হইবে এবং ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে।

৩১। মাসআলাঃ বেৎরের নামাযে যদি কাহারও সন্দেহ হয় যে, ইহা কি দ্বিতীয় রাকা'আত না তৃতীয় রাকা'আত আবার মনও কোন এক দিকে বেশী ঝুঁকে না, উভয় দিকে সমান থাকে, তবে দুই রাকা'আতই ধরিতে হইবে, কিন্তু ঐ দ্বিতীয় রাকা'আতেও দো'আ-কুনূত পড়িবে, বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে এবং তারপর যে আর এক রাকা'আত পড়িবে, সে রাকাআতেও দো'আ-কুনূত পড়িবে এবং শেষে ছহো সজ্‌দা করিবে।

৩২। মাসআলাঃ বেৎরের নামাযে যদি কেহ ভুলিয়া দো'আ কুনূতের পরিবর্তে "সোব্‌হানাকা" পড়িল, তারপর স্মরণ আসার পর আবার দো'আ-কুনূত পড়িল, তবে তাহাতে ছহো সজ্‌দা করিতে হইবে না।

৩৩। মাসআলাঃ বেৎরের নামাযে যদি কেহ দো'আ-কুনূত পড়িতে ভুলিয়া গিয়া সূরা পড়িয়া রুকূতে চলিয়া যায়, তবে রুকূ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর দো'আ-কুনূত পড়িতে হইবে না, রুকূ-সজ্‌দা করিয়া নামায শেষ করিবে এবং শেষে ছহো সজ্‌দা করিবে। (কিন্তু যদি রুকূ হইতে ফিরিয়া উঠিয়া দো'আ-কুনূত পড়ে, তাহাতেও নামায নষ্ট হইবে না, কিন্তু রুকূ পুনরায় করিতে হইবে এবং ছহো সজ্‌দাও করিতে হইবে।)

৩৪। মাসআলাঃ (নফল নামাযে) আল্‌হামদুর পর দুই বা ততোধিক সূরা পড়ায় কোন দোষ নাই (কিন্তু ফরয নামাযে আল্‌হামদুর পর দুই বা ততোধিক সূরা পড়া ভাল নয়, কিন্তু যদি কেহ পড়িয়া ফেলে, তবে) তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না। (বা যদি কেহ পড়িতে পড়িতে আট্‌কিয়া যায় এবং মুক্তাদীর লোক্‌মা লইয়া সামনে পড়ে বা সামনে চলিতে না পারায় অন্য সূরা পড়ে, তবে তাহাতেও ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না।)

৩৫। মাসআলাঃ ফরয নামাযের শেষার্ধে অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে সূরা মিলানোর হুকুম নাই, কিন্তু যদি কেহ মিলায়, তবে তাহাতে নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না, ছহো সজ্‌দাও ওয়াজিব হইবে না।

৩৬। মাসআলাঃ নামাযের শুরুতে ছানা পড়া, রুকূতে سبحان ربى العظيم পড়া, সজ্‌দাতে سبحان ربى الاعلى পড়া, রুকূ হইতে উঠিবার সময় سمع الله لمن حمده বা رَبَّنَا لك الحمد বলা, নিয়্যত বাঁধার সময় হাত উঠান এবং শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ ও দো'আ পড়া—এই সব সুন্নত কাজ, ওয়াজিব নহে। কাজেই ভুলে এই সব ছুটিয়া গেলে তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না।

৩৭। মাসআলাঃ ফরয নামাযের শেষার্ধে অর্থাৎ, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে আল্‌হামদু পড়া ওয়াজিব নহে, সুন্নত। কাজেই যদি কেহ ভুলে আলহামদু না পড়িয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুকূ সজ্‌দা করিয়া নামায শেষ করে, তবে তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না।

৩৮। মাসআলাঃ ভুলবশতঃ ওয়াজিব তরক করিলে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হয়। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ করে, তবে তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না, যদি ছহো সজ্‌দাও করে, তবুও নামায হইবে না, নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। যে সব কাজ নামাযের মধ্যে ফরয বা ওয়াজিব নহে, (সুন্নত বা মোস্তাহাব) তাহা ভুলবশতঃ তরক করিলে তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না (এবং নামাযও দোহ্‌রাইয়া পড়ার আবশ্যকতা নাই। এইরূপে ভুলে কোন ফরয তরক হইয়া গেলেও ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না; বরং নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে)।

৩৯। মাসআলাঃ যে সব নামাযে চুপে চুপে কেরাআত পড়া ওয়াজিব, (যেমন যোহর, আছর ও দিনের নফল এবং সুন্নত) সেই সব নামাযে যদি কেহ ভুলে উচ্চ স্বরে কেরাআত পড়ে, তবে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। অবশ্য দুই এক শব্দ যদি কিছু উচ্চ স্বরে বাহির হইয়া যায়, তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে না। এইরূপে যে সব নামাযে ইমামের উচ্চ স্বরে কেরাআত পড়া ওয়াজিব (যেমন ফজর, এশা, মাগরিব) সেই সব নামাযে যদি ভুলে চুপে চুপে কেরাআত পড়ে, তবে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে, কিন্তু দুই এক শব্দ যদি আস্তে পড়ে বা মোন্‌ফারেদ যদি সমস্তই আস্তে পড়ে তাহাতে ছহো সজ্‌দা ওয়াজিব হইবেনা। —গওহর

তেলাওয়াতের সজ্‌দা—(গওহর)

১। মাসআলাঃ কোরআন শরীফের মধ্যে মোট চৌদ্দটি তেলাওয়াতের সজ্‌দা আছে। কোরআন শরীফে হাশিয়ার উপর যেখানে যেখানে سجدة (সজ্‌দা) লেখা আছে, সেই সেই জায়গা পাঠ করিলে বা শুনিলে সজ্‌দা করা ওয়াজিব হয়। ইহাকেই 'তেলাওয়াতের সজ্‌দা' বলে।

২—৩। মাসআলাঃ তেলাওয়াতের সজ্‌দা করিবার নিয়ম এই যে, দাঁড়াইয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া একটি সজ্‌দা করিবে এবং তিনবার সজ্‌দার তস্‌বীহ্‌ পড়িয়া আবার আল্লাহু আকবর বলিয়া দাঁড়াইবে। হাত উঠাইতে (হাত বাঁধিতে) হইবে না (এবং দুই সজ্‌দা করিতে হইবে না। পুরুষের জন্য "আল্লাহু আকবর" শব্দ করিয়া বলা ভাল।) যদি না দাঁড়াইয়া বসিয়া বসিয়া সজ্‌দা করে বা সজ্‌দা করিয়া বসিয়া থাকে তাহাও দুরুস্ত আছে।

৪। মাসআলা ঃ সজ্‌দার আয়াত যে পাঠ করিবে তাহার উপর সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে এবং যাহার কানে ঐ শব্দ পৌঁছিবে তাহার উপরও সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। ইচ্ছাপূর্বক শ্রবণ করুক বা অন্য কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় বা বে-ওযূ অবস্থায় শ্রবণ করুক, সজ্‌দার আয়াত যে কেহ শ্রবণ করিবে তাহার উপর সজ্‌দা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। এই জন্য তেলাওয়াতের সময় সজ্‌দার আয়াত চুপে চুপে পাঠ করা ভাল, যাহাতে অন্য লোকের অসুবিধায় পড়িতে না হয়।

৫। মাসআলা ঃ নামায ছহীহ্‌ হওয়ার জন্য যে শর্ত আছে; যথা—ওযূ থাকা, জায়গা পাক হওয়া, শরীর পাক হওয়া, কাপড় পাক হওয়া, ক্বেব্‌লামুখী হওয়া ইত্যাদি—তেলাওয়াতের সজ্‌দার জন্যও সেই সব শর্ত আছে।

৬। মাসআলা ঃ নামাযের সজ্‌দা যেইরূপ আদায় করিতে হয় তেলাওয়াতের সজ্‌দাও সেইরূপ আদায় করিতে হইবে। কেহ কেহ কোরআন মজীদের উপর সজ্‌দা করে, তাহাতে সজ্‌দা আদায় হইবে না; যিম্মায় থাকিয়া যাইবে।

৭। মাসআলা ঃ সজ্‌দার আয়াত শ্রবণের সময় বা মুখস্থ তেলাওয়াতের সময় যদি ওযূ না থাকে, তবে পরে যখন ওযূ করিবে, তখন সজ্‌দা করিলেও সজ্‌দা আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওযূ করিয়া সজ্‌দা করিয়া লওয়াই ভাল; কারণ হয়ত পরে স্মরণ নাও থাকিতে পারে (এবং তজ্জন্য সজ্‌দা আদায় না হইলে গোনাহ্‌ হইবে)।

৮। মাসআলা ঃ যদি কাহারও যিম্মায় অনেকগুলি সজ্‌দায়ে তেলাওয়াত থাকে যাহা এখনও আদায় করে নাই, তবে এখন আদায় করিয়া লওয়া চাই। ইহা জীবনে যে কোন সময়ে আদায় করিতে হইবে। কোন সময়েও যদি আদায় না করে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে। (অর্থাৎ, যদি কেহ সারা জীবন বা সমস্ত কোরআন খতম করিয়া সজ্‌দা না করিয়া থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে সজ্‌দা না করা মক্‌রূহ তান্‌যীহী হইয়াছে বটে, কিন্তু যতসংখ্যক সজ্‌দা বাকী রহিয়া গিয়াছে তত সংখ্যক সজ্‌দা করিয়া লইলেই আদায় হইয়া যাইবে। কোন্‌ সজ্‌দা কোন্‌ আয়াতের জন্য তাহা নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করার দরকার নাই। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে যদি সজ্‌দা আদায় না করে এবং তেলাওয়াতের সজ্‌দা বাকী থাকিয়া যায়, তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

৯। মাসআলা ঃ হায়েয বা নেফাসের অবস্থায় যদি সজ্‌দার আয়াত শুনে, তবে তাহাতে সজ্‌দা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু গোসলের হাজতের অবস্থায় (অর্থাৎ, জানাবতের অবস্থায় বা হায়েয নেফাস হইতে পাক হইয়া গোসলের পূর্বাবস্থায়) যদি সজ্‌দার আয়াত শুনে, তবে সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

১০। মাসআলা ঃ শয্যাশায়ী রোগী যদি সজ্‌দার আয়াত শুনে বা পড়ে এবং বসিয়া সজ্‌দা করিতে না পারে, তবে নামাযের সজ্‌দায় যেরূপ ইশারা করে এই সজ্‌দাও তদ্রূপ ইশারায় করিলেই আদায় হইয়া যাইবে।

১১। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে সূরার মাঝখানে যদি সজ্‌দার আয়াত পড়ে, তবে সজ্‌দার আয়াত পড়া মাত্র নামাযের মধ্যে থাকিয়াই তৎক্ষণাৎ সজ্‌দা করিয়া লইবে, তারপর অবশিষ্ট কেরাআত পুরা করিয়া রুকূ করিবে। নামাযের মধ্যে যদি সজ্‌দার আয়াত পড়া মাত্রই সজ্‌দা না করিয়া দুই আয়াত আরও পড়িয়া তারপর সজ্‌দা করে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু তদপেক্ষা বেশী পড়িয়া তারপর যদি সজ্‌দা করে, তবু সজ্‌দা আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু গোনাহ্‌গার হইবে।

১২। **মাসআলাঃ** নামাযের মধ্যে সজ্‌দার আয়াত পড়িয়া যদি নামাযের মধ্যেই সজ্‌দা না করে, তবে নামাযের বাহিরে এই সজ্‌দা আদায় করিলে তাহাতে সজ্‌দা আদায় হইবে না, চিরকালের জন্য গোনাহ্‌গার থাকিয়া যাইবে। তওবা এস্তেগ্‌ফার ব্যতীত এই গোনাহ্ মাফ করাইবার অন্য কোন উপায় নাই।

১৩। **মাসআলাঃ** নামাযের মধ্যে সজ্‌দার আয়াত পড়িয়া তৎক্ষণাৎ যদি রুকূতে চলিয়া যায় এবং রুকূর মধ্যেই তেলাওয়াতের সজ্‌দারও নিয়্যত করিয়া লয় যে, আমি তেলাওয়াতের সজ্‌দাও এই রুকূর দ্বারাই আদায় করিতেছি, তবে তাহাতেও তেলাওয়াতের সজ্‌দা আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি রুকূর মধ্যে নিয়্যত না করে, তারপর যখন সজ্‌দা করিবে, ঐ সজ্‌দার মধ্যে নিয়্যত না করিলেও তেলাওয়াতের সজ্‌দা আদায় হইয়া যাইবে। (কিন্তু অনেক্ষণ পরে সজ্‌দা করিলে তাহা দ্বারা তেলাওয়াতের সজ্‌দা আদায় হইবে না।)

১৪। **মাসআলাঃ** নামাযে যদি অন্য কাহারও সজ্‌দার আয়াত পড়িতে শুনে, তবে নামাযের মধ্যে সজ্‌দা করিবে না, নামায শেষে সজ্‌দা করিবে। যদি নামাযের মধ্যে সজ্‌দা করে, তবে সজ্‌দা আদায় হইবে না; বরং গোনাহ্‌গার হইবে এবং নামাযের পর পুনরায় সজ্‌দা করিতে হইবে।

১৫। **মাসআলাঃ** এক জায়গায় বসিয়া যদি কেহ একটি সজ্‌দার আয়াত বার বার পড়ে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত জায়গা না বদলিবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি সজ্‌দাই ওয়াজিব হইবে। সব কয়বার পড়িয়া শেষে সজ্‌দা করুক বা একবার পড়িয়া সজ্‌দা করিয়া তারপর ঐ স্থানে বসিয়া আরও বহুবার পড়ুক, ঐ এক সজ্‌দাই যথেষ্ট হইবে। অবশ্য যদি জায়গা বদলিয়া যায়, তবে যত জায়গায় পড়িবে, তত সজ্‌দা করিতে হইবে।

১৬। **মাসআলাঃ** এইরূপে যদি একই জায়গায় আয়াত বদলিয়া যায় অর্থাৎ কয়েকটি সজ্‌দার আয়াত একই জায়গায় বসিয়া পড়ে (বা শুনে) তবে যতগুলি সজ্‌দার আয়াত পড়িবে (বা শুনিবে) ততগুলি সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। (একই জায়গায় বসিয়া একই আয়াত নিজে পড়িলে অথবা অন্যের নিকট হইতে শুনিলে যতক্ষণ স্থান পরিবর্তন না হইবে একই সজ্‌দা যথেষ্ট হইবে। চলতি নৌকায় বসিয়া সজ্‌দার আয়াত পড়িলে যদিও নৌকার স্থান পরিবর্তন হয় কিন্তু তাহাতে পাঠকের স্থান পরিবর্তন ধরা যাইবে না।)

১৭। **মাসআলাঃ** বসা অবস্থায় সজ্‌দার আয়াত পাঠ করিয়া যদি দাঁড়ায় কিন্তু চলাফিরা না করে, তাহাতে স্থান পরিবর্তন ধরা যাইবে না। অতএব, বসা হইতে দাঁড়াইয়া যদি পুনরায় ঐ আয়াত একবার পড়ে বা বার বার পড়ে, তবে একই সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। (অবশ্য যদি তিন বা ততোধিক কদম এদিক ওদিক হাঁটে, তবে স্থান পরিবর্তন ধরা হইবে এবং এইরূপ যতবার করিবে, তত সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।)

১৮। **মাসআলাঃ** কেহ যদি এক জায়গায় একটি সজ্‌দার আয়াত পাঠ করার পর উঠিয়া কোন কাজে চলিয়া যায় এবং আবার পূর্বের স্থানে আসিয়া আর একবার ঐ আয়াত পাঠ করে, তবে তাহার উপর দুইটি সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

১৯। **মাসআলাঃ** এক জায়গায় বসিয়া যদি কেহ একটি সজ্‌দার আয়াত পড়ে তারপর কোরআন তেলাওয়াত শেষ করিয়া ঐখানে বসিয়াই কতক্ষণ দুনিয়ার কোন কথাবার্তা বলে বা কাজ করে, যেমন ভাত খায়, চা পান করে, সেলাই করে বা ছেলেকে দুধ খাওয়ায় ইত্যাদি এবং

তারপর আবার ঐ আয়াত পড়ে, তবে দুইটি সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। এস্থলে মাঝখানে দুনিয়ার কাজ করায় (সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে তাই) স্থান পরিবর্তন ধরা হইবে।

২০। **মাসআলা** ঃ একটি কোঠা দালানের একটি কোণে সজ্‌দার কোন আয়াত পাঠ করিল, অতঃপর দ্বিতীয় কোণায় যাইয়া ঐ আয়াতটিই পড়িল, এমতাবস্থায় এক সজ্‌দাই যথেষ্ট, যত বারই পড়ুক। অবশ্য যদি অন্য কাজ করার পর ঐ আয়াত পড়ে, তবে দ্বিতীয় সজ্‌দা করিতে হইবে, আবার তৃতীয় কাজে লাগার পর পড়িলে তৃতীয় সজ্‌দা ওয়জিব হইবে।

২১। **মাসআলা** ঃ ঘর যদি বড় হয়, তবে দ্বিতীয় কোণে যাইয়া দোহ্‌রাইলে (পুনঃ পড়িলে) দ্বিতীয় সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে এবং তৃতীয় কোণায় পড়িলে তৃতীয় সজ্‌দা (ওয়াজিব হইবে)।

২২। **মাসআলা** ঃ একটি কোঠার যে হুকুম, মসজিদেরও সেই হুকুম, যদি সজ্‌দার একটি আয়াত কয়েকবার পড়ে, তবে একই সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে—চাই মসজিদের একস্থানে বসিয়া বারবার পড়ুক কিংবা মসজিদে এদিক ওদিক ঘুরিয়া পড়ুক।

২৩। **মাসআলা** ঃ যদি নামাযের মধ্যে একই আয়াত কয়েকবার পড়ে, তবে একই সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে। চাই সকলবার পড়ার পর সজ্‌দা করুক, কিংবা একবার পড়িয়া সজ্‌দা করিয়াছে আবার ঐ রাকা'আতে কিংবা দ্বিতীয় রাকা'আতে ঐ আয়াত পড়িয়াছে, এক সজ্‌দাই যথেষ্ট।

২৪। **মাসআলা** ঃ কেহ এক জায়গায় বসিয়া একটি সজ্‌দার আয়াত পড়িয়াছে কিন্তু এখনও সজ্‌দা করে নাই। তারপর ঐ স্থানেই নামাযের নিয়্যত বাঁধিয়া ঐ আয়াতই আবার নামাযের মধ্যে পড়িয়া সজ্‌দা করিয়াছে, তবে তাহার এক সজ্‌দাই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু যদি স্থান পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে দ্বিতীয় সজ্‌দাও ওয়াজিব হইবে, এক সজ্‌দা যথেষ্ট হইবে না, (নামাযের বাহিরে পড়ার সজ্‌দা পরে করিতে হইবে।)

২৫। **মাসআলা** ঃ আর যদি নামাযের বাহিরে পড়ার সজ্‌দা করিয়া থাকে তারপর ঐ স্থানেই নামাযের নিয়্যত বাঁধিয়া নামাযের মধ্যে আবার ঐ আয়াত পড়ে, তবে নামাযের মধ্যের সজ্‌দা নামাযের মধ্যেই করিতে হইবে। (বাহিরের সজ্‌দা দ্বারা নামাযের সজ্‌দা আদায় হইবে না।)

২৬। **মাসআলা** ঃ পাঠকারীর স্থান পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও যদি শ্রবণকারীর স্থান পরিবর্তন হয়, তবে শ্রবণকারীর যে কয় স্থান পরিবর্তন হইয়াছে সেই কয়টি সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে, অথচ পাঠকারীর একই সজ্‌দা ওয়াজিব থাকিবে।

২৭। **মাসআলা** ঃ যদি শ্রোতার স্থান পরিবর্তন না হয়, কিন্তু পাঠকের স্থান পরিবর্তন হইয়া যায়, তবে শ্রোতার একই সজ্‌দা এবং পাঠকের যে কয়টি জায়গা পরিবর্তন হইয়াছে সেই কয়টি সজ্‌দা ওয়াজিব হইবে।

২৮, ২৯। **মাসআলা** ঃ সমস্ত সূরা পাঠ করা এবং সজ্‌দার আয়াত বাদ দিয়া যাওয়া মক্‌রূহ ও নিষেধ। শুধু সজ্‌দা হইতে বাঁচিবার জন্য এই আয়াত ছাড়িবে না। ইহাতে সজ্‌দার প্রতি অস্বীকৃতি প্রকাশ পায়।

৩০। **মাসআলা** ঃ পক্ষান্তরে শুধু সজ্‌দার আয়াত পড়া মক্‌রূহ নহে, যদি নামাযে এরূপ করে, তবে উহাতে এই শর্তও আছ যে, সেই আয়াত এইরূপ বড় হওয়া চাই, যেন ছোট ছোট তিনটি আয়াতের সমান হয়। কিন্তু সজ্‌দার আয়াতের সঙ্গে আরও দুই একটি আয়াত মিলাইয়া পড়া উত্তম।

(যখন নূতন কোন নেয়ামত পাওয়া যায়, তখন ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া আল্লাহ্র শোক্র করা অতি উত্তম। আর ওযূ করিয়া ক্বেব্লা রোখ হইয়া শুধু একটি সজ্দা করা এবং সজ্দার মধ্যে আল্হামদুলিল্লাহ্ সোব্হানা রাব্বিয়াল আ'লা ইত্যাদি বলিয়া আল্লাহ্র শোক্র করাও মোস্তাহাব।) —অনুবাদক

পীড়িত অবস্থায় নামায—(বেঃ জেওর)

১। **মাসআলা ঃ** কোন অবস্থায়ই নামায ছাড়িবে না। যাবৎ দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে সক্ষম হয় দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে, আর দাঁড়াইতে না পারিলে বসিয়া নামায পড়িবে, বসিয়া বসিয়া রুকূ করিবে, রুকূ করিয়া উভয় সজ্দা করিবে, এবং রুকূর জন্য এতটুকু ঝুঁকিবে, যেন কপাল হাঁটুর বরাবর হইয়া যায়।

২। **মাসআলা ঃ** যদি রুকূ, সজ্দা করারও ক্ষমতা না থাকে, তবে ইশারায় রুকূ ও সজ্দা আদায় করিবে। এই সজ্দার জন্য রুকূর চেয়ে বেশী ঝুঁকিবে।

৩। **মাসআলা ঃ** সজ্দা করিবার জন্য বালিশ ইত্যাদি কোন উঁচু বস্তু রাখা এবং তাহার উপর সজ্দা করা ভাল নহে, সজ্দা করিতে না পারিলে ইশারা করিয়া লইবে, বালিশের উপর সজ্দা করার প্রয়োজন নাই।

৪। **মাসআলা ঃ** কোন রোগীর যদি এরূপ অবস্থা হয় যে, ইচ্ছা করিলে দাঁড়াইতে পারে ; কিন্তু ইহাতে অনেক কষ্ট হয় বা রোগ বাড়িয়া যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয়, তবে তাহার জন্য বসিয়া নামায পড়া দুরুস্ত আছে।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি কোন রোগীর এরূপ অবস্থা হয় যে, সে দাঁড়াইতে পারে কিন্তু রুকূ-সজ্দা করিতে পারে না, তবে তাহার জন্য উভয় ছুরতই জায়েয আছে—দাঁড়াইয়া নামায পড়ুক এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইশারা দ্বারা রুকূ-সজ্দা আদায় করুক, বা বসিয়া নামায পড়ুক এবং বসিয়া বসিয়া ইশারা দ্বারা রুকূ-সজ্দা আদায় করুক। অবশ্য এরূপ অবস্থায় বসিয়া ইশারা করাই উত্তম।

৬। **মাসআলা ঃ** রোগীর যদি নিজ ক্ষমতায় বসার শক্তি না থাকে, কিন্তু গাও-তাকিয়ায় বা দেওয়ালে হেলান দিয়া অর্ধ বসা অবস্থায় শুইতে পারে, তবে তাহাকে তদ্রূপ গাও-তাকিয়া মাথার এবং পিঠের নীচে দিয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া শোয়াইবে যাহাতে কতকটা বসার মত অবস্থা হয় এবং পা ক্বেব্লার দিকে প্রসারিত করিয়া দিবে, পা গুটাইয়া হাঁটু যদি খাড়া করিয়া রাখিতে পারে, তবে তদ্রূপ করিয়া দিবে এবং যদি হাঁটু খাঁড়া করিয়া না রাখিতে পারে, তবে হাঁটুর নীচে বালিশ রাখিয়া দিবে যাহাতে পা'খানি ক্বেব্লার দিক হইতে যথাসম্ভব ফিরিয়া থাকে, কারণ (বিনা ওযরে) ক্বেব্লার দিকে পা করা মকরূহ্। এইরূপ বসিয়া মাথার ইশারা দ্বারা রুকূ-সজ্দা আদায় করিয়া নামায পড়িবে, তবুও নামায ছাড়িবে নাঃ অবশ্য সজ্দার ইশারার সময় রুকূর ইশারা অপেক্ষা মাথাটা কিছু বেশী ঝুঁকাইবে। যদি এরূপ হেলান দিয়াও বসিতে না পারে, তবে মাথার নীচে কিছু উঁচা বালিশ দিয়া শোয়াইয়া দিবে, যাহাতে মুখটা আকাশের দিকে না থাকিয়া যথাসম্ভব ক্বেব্লার দিকে থাকে, তারপর মাথার ইশারা দ্বারা রুকূ-সজ্দা আদায় করিয়া নামায পড়িবে। রুকূর ইশারা একটু কম করিবে এবং সজ্দার ইশারা একটু বেশী করিবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ উহার পরিবর্তে ডান বা বাম কাতে শোয় এবং ক্বেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া অর্থাৎ, ডান কাতে শুইলে উত্তর দিকে শিয়র দিয়া এবং বাম কাতে শুইলে দক্ষিণ দিকে শিয়র করিয়া মাথার ইশারায় রুকূ-সজ্‌দা আদায় করিয়া নামায পড়ে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু চিৎ হইয়া শুইয়া নামায পড়া অধিক উত্তম।

৮। **মাসআলা ঃ** রোগীর যদি মাথা দ্বারা ইশারা করার ক্ষমতাও না থাকে তবে শুধু চক্ষুর দ্বারা ইশারায় নামায আদায় হইবে না, আর এরূপ অবস্থায় নামায ফরযও থাকে না। অবশ্য ঐরূপ অবস্থা যদি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা কাল অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত থাকে, তবে ঐ সময়ের নামাযগুলির ক্বাযা পড়িতে হইবে ; কিন্তু এইরূপ যদি চব্বিশ ঘণ্টা কালের (পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের) বেশী থাকে, তবে তাহার ক্বাযাও পড়িতে হইবে না ; নামায সম্পূর্ণ মা'ফ হইয়া যাইবে। চব্বিশ ঘণ্টা কাল বা তাহার কম এইরূপ অবস্থা থাকার পর যদি অবস্থা কিছু ভাল হয় এবং শুইয়া মাথার ইশারা দ্বারা নামায পড়িবার মত শক্তি পায়, তবে ঐ অবস্থায়ই মাথার ইশারা দ্বারা রুকূ-সজ্‌দা আদায় করিয়াই ঐ কয়েক ওয়াক্তের নামাযের ক্বাযা পড়িয়া লইবে। একথা মনে করিবে না যে, সম্পূর্ণ ভাল হইয়া তারপর ক্বাযা পড়িব। কারণ, হয়ত ঐ অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া পড়িতে পারে, তাহা হইলে গোনাহ্‌গার অবস্থায় মরিবে।

৯। **মাসআলা ঃ** এইরূপ যদি কোন লোক হঠাৎ বেহুঁশ হইয়া পড়ে এবং এক দিন রাত বা তাহার কম বেহুশ থাকে অর্থাৎ, পাঁচ ওয়াক্ত বা তাহার চেয়ে কম নামায ছুটিয়া যায়, তবে ঐ কয়েক ওয়াক্ত নামাযের ক্বাযা পড়িতে হইবে। আর যদি এক দিন রাতের চেয়ে বেশী সময় বেহুঁশ থাকে অর্থাৎ, বেহুঁশ অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্তের চেয়ে বেশী নামায ক্বাযা হয়, তবে তাহা আর পড়িতে হইবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** কোন লোক নামায শুরু করার সময় বেশ ভাল সুস্থ অবস্থায় ছিল, কিছু নামায আরম্ভ করার পর হঠাৎ রগের উপর রগ উঠিয়া বা অন্য কোন রোগ উপস্থিত হইয়া এরূপ হইয়া গেল যে, উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না, তবে অবশিষ্ট নামায বাসিয়াই আদায় করিবে। এমন কি, বসিয়া বসিয়া যদি রুকূ-সজ্‌দা করিতে পারে, করিবে ; নতুবা মাথার ইশারায় রুকূ-সজ্‌দা করিয়াও নামায পূর্ণ করিবে, তবুও নামায ছাড়িরে না। এমন কি, যদি বসিতে না পারে, তবে শুইয়া অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করিবে।

১১। **মাসআলা ঃ** কোন লোক অসুস্থ অবস্থায় দাঁড়াইতে না পারায় বসিয়া পড়ার নিয়্যত বাঁধিয়াছে এবং বসিয়া বসিয়া রুকূ-সজ্‌দা করিয়া দুই এক রাকা'আত পড়িয়াছে, তারপর কিছু সুস্থ হইয়া দাঁড়াইবার মত শক্তি পাইয়াছে, এই অবস্থায় অবশিষ্ট নামায দাঁড়াইয়া পূর্ণ করিবে। (নূতন নিয়্যত বাঁধিবার আবশ্যক নাই।)

১২। **মাসআলা ঃ** রোগীর অবস্থা যদি এমন শোচনীয় হয় যে, রুকূ-সজ্‌দা করিয়া নামায পড়িতে পারে না, মাথার ইশারায় বসিয়া বা শুইয়া নামায পড়ে এবং ঐ অবস্থায় নামাযের নিয়্যত বাঁধিয়া দুই এক রাকা'আত নামায পড়িয়াছে, তারপর বসিয়া বা দাঁড়াইয়া রুকূ-সজ্‌দা করার মত যদি শক্তি পায়, তবে যখন এইরূপ শক্তি পাইবে তখনই পূর্বের নামাযের নিয়্যত বাতিল হইয়া যাইবে এবং নূতন নিয়্যত বাঁধিয়া নামায পড়িতে হইবে।

১৩। **মাসআলা ঃ** রোগীর যদি এরূপ শোচনীয় অবস্থা হয় যে, (বসিয়া পায়খানাও করিতে পারে না, শুইয়া শুইয়া পেশাব-পায়খানা করে,) পানির দ্বারা এস্তেঞ্জাও করিতে পারে না, তবে

পুরুষ হইলে তাহার স্ত্রী এবং স্ত্রী হইলে তাহার স্বামী যদি পানির দ্বারা এস্তেঞ্জা করাইয়া দেয়, তবে অতি ভাল, নতুবা নেক্ড়ার দ্বারা মুছিয়া ফেলিয়া ঐ নাপাক অবস্থায়ই নামায পড়িবে—তবুও নামায ছাড়িবে না। পুরুষের যদি ছেলে বা ভাই থাকে বা স্ত্রীর যদি মেয়ে বা ভগ্নী থাকে, তবে তাহারা ওযূ করাইয়া দিতে পারিবে বটে, কিন্তু এস্তেঞ্জা করাইতে পারিবে না। কারণ ছেলে, মেয়ে, মা, বাপ, বোন, কাহারও গুপ্তস্থান দেখা বা স্পর্শ করা জায়েয নহে। স্বামী-স্ত্রীর জন্য একে অন্যের গুপ্তস্থান দেখা বা ছোঁয়া জায়েয আছে। রোগী যদি নিজে ওযূ বা তায়াম্মুম করিতে না পারে, তবে অন্য কেহ ওযূ বা তায়াম্মুম করাইয়া দিবে। যদি নেক্ড়ার দ্বারা মুছিবার মত শক্তিও না থাকে, (এবং পুরুষের স্ত্রী বা স্ত্রীর স্বামী না থাকে,) তবে ঐ অবস্থায়ই নামায পড়িবে, তবুও নামায ছাড়িবে না।

১৪। **মাসআলা** কোন ব্যক্তির সুস্থ অবস্থায় কিছু নামায ক্বাযা হইয়াছিল, রোগে পড়িয়া স্মরণ হইয়াছে। এখন বসিয়া, শুইয়া বা ইশারা করিয়া যেভাবে ওয়াক্তিয়া নামায পড়িবে, সেইভাবেই ঐ ক্বাযা নামায পড়িয়া লইবে। কখনও মনে করিবে না যে, সুস্থ হইয়া পড়িবে বা যখন দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পারে, তখন পড়িবে বা যখন বসিয়া রুকূ-সজ্দা দ্বারা নামায পড়িতে পারে, তখন পড়িবে। এইসব খেয়াল শয়তানী ধোঁকা, কাজেই এরূপ খেয়াল করিবে না, যখন মনে আসে, তখনই পড়িয়া লইবে; দেরী করিবে না।

১৫। **মাসআলাঃ** রোগীর বিছানা যদি নাপাক হইয়া যায় এবং বিছানা বদলাইতে রোগীর অতিশয় কষ্ট হয় (বা এতটুকু নাড়াচাড়াতেও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, তবে ঐ নাপাক বিছানায়ই নামায পড়িবে।

১৬। **মাসআলাঃ** ডাক্তার চোখ অপারেশন করিয়াছে এবং নড়াচড়া করিতে নিষেধ করিয়াছে, এমতাবস্থায় শুইয়া শুইয়া নামায পড়িবে।

মুসাফিরের নামায

১। **মাসআলাঃ** এক মঞ্জিল অথবা দুই মঞ্জিলের সফর যদি কেহ করে, তবে তাহাতে শরীঅতের কোন হুকুম পরিবর্তন হয় না এবং শরীঅত অনুযায়ী তাহাকে মুসাফিরও বলা যায় না। সমস্ত হুকুম তাহার জন্য অবিকল ঐরূপই থাকিবে যেইরূপ বাড়ীতে থাকে। চারি রাকা'আত নামায চারি রাকা'আতই পড়িতে হইবে, (রোযা ছাড়িতে পারিবে না) এবং চামড়ার মোজার উপর এক দিন এক রাত অপেক্ষা অধিক কাল মছেহ্ করিতে পারিবে না।

২। **মাসআলাঃ** যে ব্যক্তি (কমের পক্ষে) তিন মঞ্জিল দূরবর্তী স্থানে যাইবার নিয়্যত করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবে, তাহাকে শরীঅত অনুযায়ী মুসাফির বলা যাইবে। যখন সে নিজ শহরের আবাদি (লোকালয়) অতিক্রম করিবে, তখন তাহার উপর মুসাফিরের হুকুম হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আবাদির মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসাফির হইবে না। (আর যদি আবাদির বাহির হয়, তবে ষ্টেশনে পৌঁছিলে সে মুসাফির হইবে।)

৩। **মাসআলাঃ** প্রঃ তিন মঞ্জিল কাহাকে বলে? উঃ (ক্বাফেলা বাঁধিয়া চলিলে খাওয়া-দাওয়া, পাকছাফ এবং আরাম-বিশ্রামের সময় বাদ দিয়া) স্বাভাবিকভাবে হাঁটিয়া চলিয়া বা নৌকায় বসিয়া বা উটের পিঠে সওয়ার হইয়া তিন দিনে যতদূর পৌঁছা যায়, তাহাকে তিন মঞ্জিল বলে। আরব দেশে প্রায়ই মঞ্জিল নির্ধারিত আছে। আমাদের দেশে মোটামুটি হিসাবে ইহার আনুমানিক দূরত্ব

(প্রচলিত ইংরাজী মাইল হিসাব) ৪৮ মাইল। (প্রকাশ থাকে যে, শরয়ী মাইল এবং ইংরাজী মাইলের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ইংরাজী মাইল হয় ১৭৬০ গজে এবং শরয়ী মাইল হয় ২০০০ গজে। এখানে আমরা হিসাবের সুবিধার্থে ইংরাজী মাইল লিখিলাম।)

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কোন স্থান এত পরিমাণ দূরবর্তী হয় যে, স্বাভাবিকভাবে পায়ে হাঁটিয়া নৌকাযোগে বা উটযোগে গেলে তিন দিন লাগে, কিন্তু কোন দ্রুতগামী যানবাহন যেমন—ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ী, ষ্টীমার, রেলগাড়ী, (দ্রুতগামী নৌকা, মোটর, এরোপ্লেন) ইত্যাদিতে তদপেক্ষা কম সময় লাগে এরূপ অবস্থায় শরীঅত অনুযায়ী মুসাফিরই হইবে।

(**মাসআলা ঃ** যদি কম পক্ষে তিন মঞ্জিল যাইবার নিয়্যত না করে , আর সমস্ত দুনিয়া ঘুরিয়া আসে, তবুও সে মুসাফির হইবে না।)

(**মাসআলা ঃ** কোন স্থানে যাইবার যদি দুইটি রাস্তা থাকে, একটির দূরত্ব সফর পরিমাণ হয়, অন্যটির দূরত্ব তত পরিমাণ হয় না, তবে যে রাস্তা দিয়া যাইবে, সেই রাস্তারই হিসাব ধরা হইবে, অন্য রাস্তার হিসাব ধরা হইবে না।)

৫। **মাসআলা ঃ** যে ব্যক্তি শরীঅত অনুসারে মুসাফির, সে যোহর, আছর, ও এশার নামায দুই দুই রাকা'আত পড়িবে এবং সুন্নতের হুকুম এই যে, যদি ব্যস্ততা থাকে,তবে ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নত ছাড়িয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে, ইহাতে কোন গোনাহ হইবে না, আর যদি ব্যস্ততা না থাকে এবং সঙ্গীগণ হইতে পশ্চাতে থাকিয়া যাইবার ভয় না থাকে, তবে ছাড়িবে না। সফর অবস্থায় সুন্নত পুরাপুরি পড়িবে, সুন্নতের কছর হয় না।

৬। **মাসআলা ঃ** ফজর, মাগরিব এবং বেৎরের নামাযে কছর নাই, সব সময় যে ভাবে পড়িয়া থাকে তদ্রূপই পড়িবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যোহর, আছর এবং এশা এই তিন ওয়াক্তের নামায সফরের হালতে ইচ্ছা করিয়া চারি রাকা'আত পড়িলে গোনাহ্ হইবে। যেমন কেহ যদি যোহরের নামায ছয় রাকা'আত পড়ে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** সফরের হালতে যদি কেহ ভুলে চারি রাকা'আত পড়ে, তবে যদি দুই রাকা'আতের পর বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া থাকে, তবে ফরয আদায় হইয়া যাইবে, অতিরিক্ত দুই রাকা'আত নফল হইবে এবং ছহো সেজ্‌দা করিতে হইবে। আর যদি দুই রাকা'আতের পর না বসিয়া থাকে, তবে ফরয আদায় হয় নাই। ঐ নামায সব নফল হইবে, ফরয পুনরায় পড়িতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** (তিন মঞ্জিলের নিয়্যত করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার পর) পথিমধ্যে কোন স্থানে যদি কয়েক দিন থাকার ইচ্ছা হয়, তবে যতক্ষণ ১৫ দিন (বা তদূর্ধ্বকাল) থাকার নিয়্যত না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসাফিরের ন্যায় কছর পড়িতে থাকিবে। অবশ্য যদি ১৫ দিন বা তদূর্ধ্বকাল থাকিবার নিয়্যত করে, তবে যখন এইরূপ নিয়্যত করিবে, তখন হইতেই পুরা নামায পড়া শুরু করিবে। তারপর যদি নিয়্যত বদলাইয়া যায় এবং পনর দিনের আগেই চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করে, তবে পুরা নামাযই পড়িতে হইবে, কছর পড়া জায়েয হইবে না। এইরূপে পনর দিন থাকার নিয়্যত করিয়া মুকীম হইয়া যাওয়ার পর যখন ঐ স্থান হইতে অন্য স্থানে রওয়ানা হইবে, তখন দেখিতে হইবে যে, যে স্থানে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে সে স্থানের দূরত্ব কত? যদি সেই স্থানের দূরত্ব ঐ অবস্থানের স্থান হইতে তিন মঞ্জিল অর্থাৎ ৪৮ মাইল হয়, তবে আবার কছর

পড়িতে হইবে, আর যদি তাহার দূরত্ব ৪৮ মাইল না হয়, তবে ক্বছর পড়িতে পারিবে না, পুরা নামাযই পড়িতে হইবে। (এইরূপ পনর দিন অবস্থানের স্থানকে 'ওত্‌নে এক্বামত' বলে।)

১০। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, তখন তিন মঞ্জিল অর্থাৎ ৪৮ মাইল দূরবর্তী স্থানেই যাইবার নিয়্যত করিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও নিয়্যত করিয়াছে যে, পথিমধ্যে এক মঞ্জিল বা দুই মঞ্জিল দূরবর্তী অমুক গ্রামে পনর দিন থাকিবে, তবে সে মুসাফির হইবে না। সমস্ত রাস্তায়ই তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে। তারপর সেই গ্রামে গিয়া যদি পনর দিন না-ও থাকে, তবুও পুরা নামাযই পড়িতে হইবে, ক্বছর পড়া জায়েয হইবে না।

১১। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি যে স্থান হইতে চলিয়াছে সে স্থান হইতে গন্তব্য স্থান তিন মঞ্জিল বটে, কিন্তু পথিমধ্যে তাহার নিজের গ্রামে আসিল, তবে সে মোসাফির হইবে না, সমস্ত রাস্তায় তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে। কারণ, যদিও বাড়ীতে অবস্থান না করে বা বাড়ীতে প্রবেশও না করে, তবুও নিজ গ্রামের সীমানায় পা রাখা মাত্রই তাহার সফর বাতিল হইয়া যাইবে।

১২। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোক ঋতু অবস্থায় ৪ মঞ্জিল যাইবার ইচ্ছা করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়াছে। দুই মঞ্জিল যাওয়ার পর সে পাক হইয়াছে, সে মুসাফির হইবে না। গোসল করিয়া অবশিষ্ট রাস্তায় পুরা নামায পড়িবে। অবশ্য যদি পাক হওয়ার পরও অবশিষ্ট রাস্তা তিন মঞ্জিল পরিমাণ থাকে বা বাড়ী হইতে যখন চলিয়াছে তখন পাক ছিল, কিন্তু নিজ শহর অতিক্রম করার পর পথিমধ্যে ঋতু শুরু হইয়াছে, তখন সে মুসাফির, পাক হওয়ার পর ক্বছর করিবে।

১৩। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি যখন নামায শুরু করিয়াছে তখন মুসাফির ছিল, কছরেরই নিয়্যত করিয়াছে। কিন্তু নামাযের মধ্যেই নিয়্যত বদলিয়া ১৫ দিন থাকার নিয়্যত হইয়া গিয়াছে, তবে ঐ নামায এবং উহার পরবর্তী সব নামায পুরা পড়িবে।

১৪। মাসআলা ঃ যদি কেহ বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিল অপেক্ষা বেশী দূরে যাইবার নিয়্যত করিয়া বাহির হয়, কিন্তু পথিমধ্যে ঘটনাক্রমে কোন স্থানে দুই চারি দিন থাকিবার দরকার পড়িয়াছে, তারপর রোজই ধারণা থাকে যে, কাল পরশুই চলিয়া যাইবে, কিন্তু যাওয়া হয় না, এইরূপে যদি বহুকালও ঐ স্থানে থাকা হয় এবং কোন সময়ই পনর দিন থাকার ধারণা না হয়, তবে সে যতক্ষণ ঐ স্থানে থাকিবে মুসাফিরই থাকিবে, মুক্বীম হইবে না।

১৫। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তিন মঞ্জিল যাইবার নিয়্যত করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর নিয়্যত বদলিয়া গেল এবং বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তবে যখন হইতে বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তখন হইতেই তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে। (অবশ্য এইরূপ ধারণা হইবার পূর্বে যাহার ক্বছর পড়িয়াছে তাহা জায়েয হইয়াছে।)

১৬। মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত সফর করে ও স্বামীর সঙ্গ ছাড়া অন্যত্র যাইবার ধরাণা না থাকে, তবে স্ত্রীর নিয়্যতের কোন মূল্য নাই, স্বামী যেরূপ নিয়্যত করিবে স্ত্রীরও সেইরূপ নামায পড়িতে হইবে। (মনিবের সঙ্গে চাকরেরও এইরূপ হুকুম।)

১৭। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তিন মঞ্জিল যাওয়ার পর যেখানে পৌঁছিয়াছে যদি উহা তাহার নিজ বাড়ী হয় এবং সেখানে কম বেশী যে কয়দিন থাকুক নিজ গ্রামের সীমানায় পা রাখা মাত্রই তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে, আর যদি তাহা অন্যের বাড়ী হয় এবং তথায় পনর দিন থাকার নিয়্যত থাকে, তবে সে গ্রাম বা শহরের সীমানায় পা রাখার পর হইতে পুরা নামায পড়িতে হইবে,

আর যদি পনর দিন থাকার নিয়্যত না থাকে এবং নিজ বাড়ীও না হয়, তবে সেখানে পৌঁছার পরও ক্বছর পড়িতে থাকিবে।

১৮। মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তিন মঞ্জিল যাইবার এরাদা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে কিন্তু পথিমধ্যে কয়েক জায়গায় থামিবার ইচ্ছা আছে কোথাও ৫ দিন, কোথাও ১০ দিন, কিন্তু ১৫ দিন থাকিবার ইচ্ছা কোথাও নাই, তবে এই সব জায়গায় সে ক্বছরই পড়িতে থাকিবে।

১৯। মাসআলা ঃ কেহ যদি জন্মভূমি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া বাড়ী করে, তবে ঐ জন্মভূমির হুকুম এবং বিদেশের হুকুম একই হইবে, অর্থাৎ সেই জন্মভূমির গ্রামে বা সেই শহরে প্রবেশ করিলে বিনা নিয়্যতে সে মুক্বীম হইবে না। (কিন্তু যদি তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করে, প্রথম বাড়ীও রাখে অন্যত্রও বাড়ী তৈয়ার করে, তবে উভয় স্থানকেই তাহার 'ওতনে আছলি' ধরা হইবে এবং উভয় স্থানেই প্রবেশ করা মাত্র বিনা নিয়্যতে মুক্বীম হইয়া যাইবে।)

(**মাসআলা ঃ** যদি কেহ বিদেশে বাসা করিয়া ভাড়টিয়া বাড়ীতে বা জায়গীরে বা চাকুরীর স্থানে বহুকাল যাবৎ থাকে এবং এইসব স্থান বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিল দূরবর্তী হয়, তবে ১৫ দিনের নিয়্যত ব্যতিরেকে এসব স্থানে প্রবেশ করিলে সফর বাতিল হইবে না, আর যদি বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিলের কম দূরবর্তী হয়, তবে বাড়ী হইতে আসিলে আদৌ সফর হইবে না এবং অন্য স্থান হইতে সফর করিয়া আসিলে ঐ সব স্থানে আসিয়াও ১৫ দিনের নিয়্যত ব্যতিরেকে সফর বাতিল হইবে না।)

২০। মাসআলা ঃ যদি কাহারও মুসাফিরী হালতে নামায ক্বাযা হয় ও সেই নামায মুক্বিমী হালতে ক্বাযা পড়িতে চায়, তবে যোহর, আছর এবং এশার দুই রাকআতই ক্বাযা পড়িবে। এইরূপ মুক্বিমী হালতে যদি নামায ক্বাযা হইয়া থাকে এবং সেই নামায মুসাফিরী হালতে ক্বাযা পড়িতে চায়, তবে চারি রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের ক্বাযা চারি রাকা'আতই পড়িবে, দুই রাকাআত পড়িবে না।

২১। মাসআলা ঃ বিবাহের পর মেয়েকে যখন স্বামীর বাড়ীতে নেওয়া হইবে এবং তথায়ই থাকা সাব্যস্ত হইবে, তখন হইতে স্বামীর বাড়ীই তাহার আপন বাড়ী (ওতনে আছলী) বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। অতএব, তার মা-বাপের বাড়ী যদি স্বামীর বাড়ী হইতে তিন মঞ্জিল পরিমাণ দূরবর্তী হয়, তবে বাপ-মার বাড়ীতে গিয়া যদি ১৫ দিন থাকার নিয়্যত না করে, তবে তাহার ক্বছর করিতে হইবে। আর যদি স্বামীর বাড়ী স্থায়ীভাবে থাকিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করে, তবে পূর্ব ওতনে আছলী অর্থাৎ মা-বামের বাড়ী এখনও ওতনে আছলী থাকিবে। অবশ্য যতদিন স্বামীর বাড়ীতে উঠাইয়া না নেওয়া হইবে, ততদিন শুধু বিবাহের দ্বারা তাহার ওতনে আছলী বাতিল হইবে না। (পুরুষের পক্ষেও শ্বশুর বাড়ী যদি তিন মঞ্জিল দূরবর্তী হয়, তবে শুধু বিবাহের দ্বারা শ্বশুর বাড়ী ওতনে আছলীর মধ্যে গণ্য হইবে কিনা এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ আছে। মতভেদের কারণে সন্দেহস্থলে পুরা নামায পড়াই উত্তম, কিন্তু এইরূপে সন্দেহের অবস্থায় ইমামত না করা উচিত । অবশ্য যদি ঘর-জামাই থাকা শর্তে বিবাহ করে, তবে বিনা মতভেদে তাহার পূর্ণ নামায পড়িতে হইবে এবং ঐ স্থান তাহার ওতনে আছলী বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। মাসআলা ঃ নৌকায় যাতায়াতকালে যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়, তবে চলতি নৌকায়ও নামায পড়া জায়েয। যে সকল নামাযে (ফরয, ওয়াজিব এবং ফজরের সুন্নতে) দাঁড়ান ফরয, সে সকল নামায যতক্ষণ পর্যন্ত কোন গুরুতর ওযর (যেমন, গুরুতর রোগ বা মাথা ঘুরান) না

পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়ান মাফ হইবে না। অবশ্য যদি নৌকা দাঁড়াইবার উপযুক্ত না হয় বা দাঁড়াইলে মাথা ঘুরাইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়, (এবং কূলে নামিবারও কোন উপায় না থাকে, বা নামাযের সময় বৃষ্টি হইতে থাকে তজ্জন্য বাহির হওয়া না যায়, বা চতুর্দিকে কাদাময় স্থান হয় নামায পড়িবার মত শুক্না জায়গা পাওয়া না যায়) তবে অবশ্য বসিয়া নামায পড়া দুরুস্ত হইবে। (এইরূপে নামাযের মধ্যে কেব্লা দিকে মুখ করাও ফরয, এই ফরযও কিছুতেই মা'ফ হইতে পারে না। যদি নৌকা বা ষ্টীমার ঘুরিয়া যায়, তবে নামাযের মধ্যেই ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নতুবা নামায হইবে না। নৌকা যদি কূলে বা ঘাটে বাঁধা থাকে, তবে তাহাতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে দুরুস্ত হইবে বটে, কিন্তু এই অবস্থায় নৌকার তলি যদি মাটির সঙ্গে সংলগ্ন না থাকে, তবে কোন কোন আলেমের মতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলেও দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য নৌকার তলি মাটির সঙ্গে লাগান হইলে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে সকলের মতেই দুরুস্ত হইবে।)

২৩। **মাসআলা**ঃ এইরূপে রেলগাড়ীতে যাতায়াতকালেও পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইলে গাড়ীতে নামায পড়া দুরুস্ত আছে, যদি কাহারও মাথা ঘুরাইয়া পড়িয়া যাইবার প্রবল আশঙ্কা হয়, তবে তাহার জন্য অবশ্য বসিয়া নামায পড়া দুরুস্ত হইবে। (নতুবা দাঁড়াইয়াই পড়িতে হইবে।)

২৪। **মাসআলা**ঃ নামায পড়ার মধ্যে যদি গাড়ী বা নৌকা ঘুরিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া কেব্লা যে দিকে সেই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

২৫। **মাসআলা**ঃ মেয়েলোকের জন্য তিন মঞ্জিল দূরবর্তী স্থানে স্বামী বা বাপ-ভাই ইত্যাদি মাহ্‌রাম পুরুষ রিশতাদারের সঙ্গে ছাড়া একাকী সফর (যাতায়াত)করা জায়েয নহে, এইরূপ স্থানে একাকী যাতায়াত করিলে অতিশয় গোনাহ্ হইবে। এক মঞ্জিল বা দুই মঞ্জিল দূরবর্তী স্থানে মেয়েলোকের জন্য একাকী সফর করা হারাম নহে বটে ; কিন্তু তাহাও ভাল নহে । হাদীস শরীফে ইহারও কঠোর নিষেধ আসিয়াছে।

২৬। **মাসআলা**ঃ মাহ্‌রাম রিশ্‌তাদার যদি ধর্মভীরু না হয়, এবং গোনাহ্‌র কাজে তাহার ভয় না থাকে, তবে তাহার সঙ্গেও মেয়েলোকের জন্য সফর করা জায়েয নহে।

২৭। **মাসআলা**ঃ গরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াতকালে যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়, তবে গাড়ী থামাইয়া বোরকা পরিয়া নীচে নামিয়া নামায পড়িবে, (গাড়ীতে বসিয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না)। যদি ওযূ না থাকে এবং গাড়ীর ভিতর ওযূ করার সুযোগ না থাকে, তবে বোরকা পরিয়া নীচে নামিয়া কিছু আড়ালে বসিয়া ওযূ করিয়া লইবে, যদি বোরকা না থাকে, তবে বড় কোন কাপড় বা চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া নীচে নামিয়া নামায পড়িবে। শরীঅতে পর্দার এবং লজ্জাশীলতার খুব তাকীদ ও প্রশংসা আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে কোন জিনিসই ভাল থাকে না। অতএব, লজ্জার কারণে বাহির হইয়া নামায না পড়া বা ওযূ না করা কিছুতেই সঙ্গত নহে অবশ্য যথাসম্ভব পর্দা নিশ্চয়ই করিতে হইবে এবং অকারণে পর্দা-পালনে ত্রুটি করা নির্লজ্জতা ও গোনাহ্। (এইরূপে চলতি নৌকায় ইমাম আযম ছাহেবের মতে বসিয়া নামায পড়া জায়েয আছে বটে, কিন্তু ছাহেবাইনের মতে বিনা ওযরে জায়েয নাই এবং ফৎওয়াও ছাহেবাইনের কওলের উপর। অতএব, মেয়েলোকেরও লজ্জার খাতিরে নীচু ছইয়ের ভিতরে বসিয়া নামায পড়া সঙ্গত নহে, স্বামী বা বাপ-ভাই যিনি সঙ্গে থাকেন তাঁহার দ্বারা যথাসম্ভব পর্দা করাইয়া তীরে নামিয়া নামায পড়াই উচিত এবং এইরূপে স্বামী, বাপ, ভাই ইত্যাদি মাহ্‌রামের সঙ্গে ছাড়া দেবর, ভাসুর,

চাচাত ভাই, ভাসুরের পুত্র, ভাগিনা, ননদের পুত্র ইত্যাদি গায়ের মাহ্‌রামের সঙ্গে সফর করা উচিত নহে।) —অনুবাদক

২৮। মাসআলা ঃ (অবশ্য) যদি এমন রোগী হয় যে, রোগের কারণে অক্ষম হওয়াবশতঃ তাহার জন্য বসিয়া নামায পড়া জায়েয, তবে তাহার জন্য ঘোড়া বা গরুর গাড়ীতে বসিয়া নামায পড়া দুরুস্ত হইবে বটে, কিন্তু তবুও চল্‌তি গাড়ীতে বা যতক্ষণ গাড়ীর যোঁয়াল ঘোড়া বা গরুর উপর থকিবে ততক্ষণ তাহাতে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না। গাড়ী থামাইয়া ঘোড়া বা গরু ছাড়িয়া দিয়া তারপর নামায পড়িবে।

২৯। মাসআলা ঃ এইরূপে পাল্‌কি বা ডুলি যতক্ষণ বাহকের কাঁধে থাকিবে ততক্ষণ তাহাতে নামায পড়া দুরুস্ত হইবে না। অতএব, যদি পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়, তবে পাল্‌কি থামাইয়া নামায পড়িবে। যদি সুস্থ শরীর হয়, তবে বোরকা পরিয়া পাল্‌কি হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে, আর যদি এ রকম রোগগ্রস্ত হয় যে, দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পারে না , তবে পাল্‌কি জমিনে রাখিয়া পাল্‌কির মধ্যেই নামায পড়িলে তাহা দুরুস্ত হইবে।

৩০। মাসআলা ঃ এইরূপে উট বা ঘোড়ার (পিঠেও বিনা ওযরে বসিয়া বসিয়া ফরয নামায পড়া দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি) গাড়ী বা ঘোড়া হইতে নামিলে জান মাল ধ্বংস হইবার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে না নামিয়া তথায়ই বসিয়া নামায পড়িলে তাহাও দুরুস্ত হইবে। (নফল নামায ঘোড়ার পিঠে বা গাড়ীতে বা নৌকায় সর্বাবস্থায়ই বসিয়া পড়া জায়েয আছে।)

বেহেশ্‌তী গওহর হইতে

১। মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি মুসাফির হালতে দুই গ্রাম মিলাইয়া ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়্যত করে এবং ঐ গ্রামদ্বয়ের মধ্যে এতটা ব্যবধান হয় যে, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে আযানের আওয়ায না পৌঁছে, যেমন যদি কেহ মক্কা শরীফে ১০ দিন এবং মিনাবাজারে পাঁচ দিন থাকার নিয়্যত করে, তবে মুক্বীম হইবে না, মুসাফিরই থাকিবে। প্রকাশ থাকে যে, মক্কা হইতে মিনা তিন মাইল।

২। মাসআলা ঃ অবশ্য যদি ঐ দুই গ্রামের মধ্যে অল্প ব্যবধান হয়, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে আযানের আওয়ায পৌঁছার মত হয়, তবে এইরূপ দুই গ্রাম মিলাইয়া ১৫ দিনের নিয়্যত করিলেও সে মুক্বীম হইবে।

৩। মাসআলা ঃ এইরূপে বেশী ব্যবধান হওয়া সত্ত্বেও যদি রাত্রে একই জায়গায় ১৫ দিন থাকার নিয়্যত থাকে, দিনে অন্যত্র কাজের জন্য যায়, রাত্রে আসিয়া একই জায়গায় থাকে, তবে তাহাকেও মুক্বীমই বলা হইবে এবং উভয় স্থানেই পুরা নামায পড়িতে হইবে। কিন্তু যদি দিনের কর্মস্থান রাত্রের বাসস্থান হইতে তিন মঞ্জিল দূরবর্তী, হয় তবে দিনে যখন সেখানে যাইবে তখন মুসাফির হইবে এবং ক্বছর পড়িবে, অন্যথায় মুক্বীম থাকিবে। আবার রাত্রে যখন ডেরায় ফিরিয়া আসিবে, তখন মুক্বীম হইবে এবং পুরা নামায পড়িবে।

৪। মাসআলা ঃ মুক্বীমের জন্য মুসাফির ইমামের এক্তেদা সর্বাবস্থায় জায়েয আছে, আদায়ী নামায হউক বা ক্বাযা নামায হউক। কিন্তু মুসাফির ইমাম (চারি রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে) যখন দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইবে অর্থাৎ উভয় দিকে সালাম ফিরাইয়া সারিবে তখন মুক্বীম আল্লাহু আকবার বলিয়া দাঁড়াইবে এবং অবশিষ্ট দুই রাকা'আত নিজে নিজে পড়িবে, কিন্তু এই

নামাযের ভিতর তাহার কেরাআত পড়িতে হইবে না; বরং চুপ থাকিবে, কেননা, সে লাহেক। অর্থাৎ সূরা-ফাতেহা পরিমাণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রুকূ-সেজদা করিয়া নামায পুরা করিবে।

ক্বা'দায়ে উলা ওয়াজিব বটে, কিন্তু যেহেতু মুসাফির ইমামের জন্য উহা ক্বা'দায়ে আখিরা বলিয়া ফরয। কাজেই ইমামের তাবে' হইয়া মুক্তাদীর উপরও ফরয হইবে।

মুসাফির ইমামের জন্য সালাম ফিরানের সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চৈঃস্বরে সকলকে জানাইয়া দেওয়া মোস্তাহাব যে, 'আমি মুসফির, ক্বছর পড়িয়াছি, আপনারা যাঁহারা মুক্বীম আছেন তাঁহারা নিজ নিজ নামায পুরা করিয়া লইবেন; নামায শুরু করার পূর্বেই এরূপ বলিয়া দেওয়া অধিক উত্তম।

৫। **মাসআলাঃ** আদায়ী নামাযে মুসাফিরও মুক্বীমের এক্তেদা করিতে পারে। ক্বাযা নামাযে মাগরিব ও ফজরে এক্তেদা করিতে পারে। ক্বাযা নামাযে যোহর, আছর ও এশার এক্তেদা করিতে পারে না। কেননা, মুসাফির যখন ক্বাযা নামাযে মুক্বীমের এক্তেদা করিবে তখন ইমামের তাবেদারীর কারণে মুক্তাদীও চারি রাকা'আত পড়িবে, অথচ ইমামের প্রথম বৈঠক ফরয নহে;' কিন্তু মুক্তাদীর জন্য ফরয, অতএব, ফরয পাঠকের এক্তেদা গায়ের ফরয পাঠকের পিছনে হইল, সুতরাং ইহা দুরুস্ত নহে।

৬। **মাসআলাঃ** মুসাফির যদি নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে অর্থাৎ, সেজ্‌দা ছহো কিংবা সালাম ফিরানের আগে নামাযের মধ্যে যে কোন সময়ে এক্বামতের নিয়্যত করে, তবে তাহার পুরা নামায পড়িতে হইবে, কিন্তু নামাযের মধ্যেই যদি ওয়াক্ত চলিয়া যায় এবং তদবস্থায় এক্বামতের নিয়্যত করে, কিংবা লাহেক অবস্থায় এক্বামতের নিয়্যত করে, তবে ঐ নামায পুরা পড়িতে হইবে না, ক্বছরই পড়িতে হইবে।

১। যেমন, মুসাফির যোহরের নামায এক রাকা'আত পড়ার পর ওয়াক্ত চলিয়া গেল এবং এক্বামতের নিয়্যত করিল, এই নামায ক্বছর পড়িতে হইবে।

২। মুসাফির অন্য মুসাফিরের এক্তেদা করিল এবং লাহেক হইল। অতঃপর অতীত নামায আরম্ভ করিল, এমতাবস্থায় এক্বামতের নিয়্যত করিলে যদি ইহা চারি রাকা'আতী নামায হয়, তবে ক্বছর পড়িতে হইবে।

ভয়কালীন নামায

যখন কোন শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়, শত্রু চাই মানুষ হউক কিংবা হিংস্র জন্তু অথবা অজগর ইত্যাদি হউক, এমতাবস্থায় যদি সকল মুসলমান কিংবা কিছুসংখ্যক লোকও একত্রে জমা'আতে নামায পড়িতে না পারে এবং সওয়ারী হইতে অবতরণের অবসর না পায়, তবে সকলেই সওয়ারীর উপর বসিয়া বসিয়া ইশারায় একা একা নামায পড়িয়া লইবে, তখন ক্বেবলামুখী হওয়াও শর্ত নহে, অবশ্য যদি দুইজন একই সওয়ারীতে বসা থাকে, তবে তাহারা উভয়ে জমা'আত করিবে। আর যদি এতটুকুরও অবকাশ না হয়, তবে মা'যূর। তখন নামায পড়িবে না, অবস্থা শান্ত হওয়ার পর ক্বাযা পড়িয়া লইবে। আর যদি সম্ভব হয় যে, কয়েকজন মিলিয়া জমা'আতে নামায পড়িতে পারে, যদিও সকলে মিলিয়া পারে না, তবে এমতাবস্থায় তাহাদের জমা'আত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। ছালাতুল খাওফের নিয়মানুযায়ী নামায পড়িবে, অর্থাৎ, সকল মুসলমানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে, একভাগ শত্রুর সাথে অবস্থান করিবে আর অপর ভাগ ইমামের সাথে নামায শুরু করিবে, যদি তিন কিংবা চারি রাকা'আত বিশিষ্ট নামায হয়, যেমন যোহর, আছর মাগরিব ও

এশা। যদি ইহারা মুসাফির না হয়, এবং কছর না করে, তবে, যখন ইমাম দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াইবে, আর যদি ইহারা কছর করে কিংবা দুই রাকা'আত বিশিষ্ট নামায হয়, যেমন ফজর, জুমু'আ, ঈদের নামায কিংবা মুসাফিরের যোহর, আছর ও এশার নামায, তবে এক রাকা'আতের পরই এই ভাগ চলিয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় দল সেখান হইতে আসিয়া ইমামের সাথে নামায পড়িবে, তাহাদের জন্য অপেক্ষা করা ইমামের উচিত। ইমাম যখন বাকী নামায পুরা করিবেন, তখন সালাম ফিরাইবেন, আর ইহারা ছালাম না ফিরাইয়া শত্রু-সম্মুখে চলিয়া যাইবে এবং প্রথম দল এখানে আসিয়া নিজেদের বাকী নামায কেরাআত ব্যতীত শেষ করিবে এবং সালাম ফিরাইবে। কেননা, ইহারা লাহেক্ব। অতঃপর ইহারা শত্রুদের সম্মুখে চলিয়া যাইবে, দ্বিতীয় দল এখানে আসিয়া নিজেদের নামায কেরাআত সহকারে আদায় করিবে এবং সালাম ফিরাইবে; কেননা, ইহারা মসবুক।

১। **মাসআলা ঃ** ছালাতুল খওফের মধ্যে নামাযের নিয়্যত বাঁধা অবস্থায় যাতায়াতকালে পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে হইবে; (কথাবার্তা বলা যাইবে না।) যদি কেহ ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া যাতায়াত করে (বা কথাবাতা বলে বা যুদ্ধ করে,) তবে তাহার নামায টুটিয়া যাইবে। কেননা, ইহা আমলে কাছীর।

(**মাসআলা ঃ** যদি শত্রু পূর্ব দিক দিয়া আসে এবং সেই কারণে পূর্বদিকে মুখ করিতে হয় বা শত্রুর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইতে হয়, তবে তাহাতে নামায টুটিবে না, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ক্বেব্‌লা হইতে বুক ফিরাইলে নামায টুটিয়া যাইবে।)

২। **মাসআলা ঃ** ইমামের সাথে বাকী নামায পড়িয়া দ্বিতীয় দলের চলিয়া যাওয়া এবং প্রথম দল আবার এখানে আসিয়া নিজেদের নামায পুরা করা, তারপর দ্বিতীয় দলের এখানে আসিয়া নামায সম্পন্ন করা মোস্তাহাব এবং উত্তম; নতুবা ইহাও জায়েয আছে যে, প্রথম দল নামায পড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় দল ইমামের সাথে বাকী নামায পড়িয়া নিজেদের নামায সেখানেই শেষ করার পর শত্রুর সম্মুখে যাইবে, এই দল যখন সেখানে পৌঁছিবে, তখন প্রথম দল নিজেদের নামায সেখানেই পড়িয়া লইবে, এখানে আসিবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** নামায পড়ার এই নিয়ম ঐ সময় প্রজোয্য হইবে, যখন সকলে একই ইমামের পিছনে নামায পড়িতে চায়, যেমন দলে কোন বুযুর্গ লোক আছেন সকলেই তাঁহার পিছনে নামায পড়িতে চায়। নতুবা এই পন্থাই ভাল যে, একদল এক ইমামের পিছনে নিজেদের নামায শেষ করিয়া দুশ্‌মনের সম্মুখে যাইবে, দ্বিতীয় দল অন্য একজনকে ইমাম বানাইয়া পুরা নামায পড়িয়া লইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি শত্রু নিকটবর্তী মনে করিয়া এই নিয়মে নামায পড়া হয় এবং পরে দেখা যায় যে, পূর্বের ধারণা ভুল ছিল, শত্রু নিকটবর্তী হয় নাই, তবে ইমাম ব্যতীত অন্যান্য সকলের নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। কেননা, অননুমোদিত কারণে আমলে কাছীর করিলে নামায ফাসেদ হয়।

৫। **মাসআলা ঃ** না-জায়েয যুদ্ধে এধরনের নামায পড়ার অনুমতি নাই! যেমন, বিদ্রোহীরা মুসলমান বাদশাহ্‌র উপর আক্রমণ করিলে কিংবা পার্থিব কোন না-জায়েয উদ্দেশ্যে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিলে এইরূপ আমলে কাছীর মাফ হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** ক্বেব্‌লার বিপরীত দিকে নামায পড়িতেছিল ইত্যবসরে শত্রু পলায়ন করিল, তবে তৎক্ষণাৎ ক্বেব্‌লার দিকে মুখ করিবে, নতুবা নামায হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** নির্বিঘ্নে ক্বেব্‌লামুখী হইয়া নামায পড়িতেছিল, এমতাবস্থায় শত্রুর আবির্ভাব হইল, তৎক্ষণাৎ তাহাদের শত্রুমুখী হওয়া জায়েয আছে, ঐ সময় ক্বেব্‌লামুখী হওয়া শর্ত থাকিবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** (নৌকা বা জাহাজ ডুবিয়া গেলে) সন্তরণকালে যদি নামাযের ওয়াক্ত যাইবার মত হয় এবং কিছুকাল (বয়া, বাঁশ ও তক্তা ইত্যাদির সাহায্যে) হাত পা সঞ্চালন বন্ধ রাখিতে পারে, তবে ইশারা দ্বারা নামায পড়িয়া লইবে, তবুও নামায ছাড়িবে না। আর যদি এইরূপ সম্ভব না হয়, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায পরবর্তী সময়ের জন্য রাখিয়া দিবে।

এই পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং তৎসম্পর্কীয় বিষয়ের আলোচনা হইল, এখন জুমু'আর বর্ণনা লেখা হইতেছে। কেননা জুমু'আ ইসলামের অতি বড় একটি রোকন, কাজেই ঈদের নামাযের পূর্বেই লেখা হইতেছে।

জুমু'আর নামায

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নামাযের ন্যায় প্রিয় সামগ্রী আর নাই। এই জন্যই কোরআন-হাদীসে নামাযের জন্য যত তাকীদ আসিয়াছে, এত তাকীদ অন্য কোন এবাদতের জন্য নাই। এই নিমিত্তই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত; বরং জন্মের বহু পূর্ব হইতে মৃত্যুর বহু পর পর্যন্ত সেই রাহ্‌মানুর রাহীমের অসংখ্য নেয়ামত অজস্রভাবেই বন্দার উপর বর্ষিত হইতে থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ শোক্‌র আদায়ের জন্য দৈনিক পাঁচবার নামায সমাপন করা নির্ধারিত হইয়াছে।

সপ্তাহে সাতটি দিন তন্মধ্যে শুক্রবার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। কেননা, এই দিনেই সবচেয়ে বেশী নেয়ামত মানুষকে দান করা হইয়াছে। এমন কি, আদি মানব হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামকেও এই দিনেই সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কাজেই এই দিনে একটি বিশিষ্ট নামাযের হুকুম হইয়াছে।

জমা'আতের নামাযের উপকারিতা এবং ফযীলত পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যতই অধিকসংখ্যক মুসলমান একত্র হইয়া নামায পড়িবে, ততই দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামত অধিক হাছিল হইবে। কিন্তু দৈনিক পাঁচবার এক মহল্লার লোকগণ একত্র হইতে পারে, দূরবর্তী সমস্ত মহল্লার বা পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের লোকগণ একত্র হওয়া কষ্টকর। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হইল যে, বন্দাগণ সপ্তাহে এক দিন সকলে একত্র হইয়া খাছভাবে তাঁহার এবাদত বন্দেগী করুক। পূর্ববর্তী উম্মতগণকেও ঐ দিন এবাদত করার হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের দুর্ভাগ্যের কারণে উহাতে মতভেদ করিল। এই অবাধ্যতার ফল এই দাঁড়াইল যে, এই মহান সৌভাগ্য হইতে মাহ্‌রূম রহিল এবং এই জুমু'আর ফযীলতও এই উম্মতের ভাগে পড়িল। ইয়াহুদীগণ এই এবাদতের জন্য শনিবার ধার্য করিল এবং নাছারাগণ রবিবার ধার্য করিল। কারণ, রবিবারে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল এবং শনিবারে সমস্ত সৃষ্টিকার্য শেষ হইয়াছিল; (কিন্তু আল্লাহ্‌র মনঃপুত সর্বশ্রেষ্ঠ দিন তাহারা কেহই পাইল না। অবশেষে উম্মতে মোহাম্মদী যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত সেইহেতু তাহাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দিন অর্থাৎ শুক্রবার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত অর্থাৎ জুমু'আর নামায ধার্য হইল। এইজন্যই যেখানে মুসলমানের গৌরব ও আধিপত্য আছে, সেখানে শুক্রবার দুনিয়াবি সব কাজ-কারবার বন্ধ রাখিয়া দূর-দূরান্তর হইতে সকলে সকাল সকাল

গোসল করিয়া পরিষ্কার কাপড় পরিধানপূর্বক সুগন্ধি আতর লাগাইয়া জামে মসজিদে একত্র হইয়া খাছভাবে ঐ দিনটাকে আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করে।) পক্ষান্তরে যেখানে নাছারার আধিপত্য, সেখানে তাহারা রবিবারে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ দেয় এবং ঐ দিনকে তাহারা পুণ্য দিন বলিয়া মনে করে। এই দিন কাজ কর্ম বন্ধ রাখিয়া এবাদতে মশ্‌গুল হয়।

জুমু'আর দিনের ফযীলত

১। **হাদীসঃ** মোসলেম শরীফে আছে— রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ সপ্তাহের দিনসমূহের মধ্যে জুমু'আর দিনই সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনেই হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশ্‌তে স্থান দান করা হইয়াছিল, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশ্‌ত হইতে বাহির করিয়া দুনিয়াতে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং এই দিনেই কিয়ামত (হিসাব নিকাশের পর পাপীদের দোযখ নির্বাসন ও মু'মিনগণের বেহেশ্‌ত গমন) হইবে।

২। **হাদীসঃ** মসনদে আহ্‌মদে আছে—জুমু'আর রাত্রের ফযীলত শবেক্বদর অপেক্ষাও অধিক। কারণ, এই রাত্রেই হযরত সরওয়ারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাতৃগর্ভে শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং হযরতের শুভাগমনের মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের অগণিত ও অশেষ মঙ্গল নিহিত।

৩। **হাদীসঃ** বোখারী শরীফে আছে, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'জুমু'আর দিনে (সমস্ত দিনের মধ্যে) এমন একটি সময় আছে যে, সেই সময় কোন মু'মিন বন্দা আল্লাহ্‌র নিকট যাহাকিছু চাহিবে তাহাই পাইবে।' এই সময়টি যে কোন্ সময় তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। হাদীসের ব্যাখ্যাকার ইমামগণ ইহা নির্দিষ্ট করিতে গিয়া অনেক মতভেদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটি মতই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি এই যে, সেই সময়টি খুৎবার শুরু হইতে নামাযের শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় এই যে, সেই সময়টি (আছরের পর,) দিনের শেষ ভাগে আছে। এই দ্বিতীয় মতকে ওলামাদের এক বড় দল গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার সপক্ষে বহু ছহীহ্ হাদীস রহিয়াছে। শেখ দেহলভী (রঃ) বলেন—এই রেওয়ায়তটি ছহীহ্, কেননা, হযরত ফাতেমা (রাঃ) জুমু'আর দিন খাদেমকে বলিয়া দিতেন যে, জুমু'আর দিন শেষ হওয়ার সময় আমাকে খবর দিও। হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা শুক্রবার দিনের শেষ ভাগে আছরের পর সব কাজ ছাড়িয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং দো'আয় মশ্‌গুল হইতেন।

৪। **হাদীসঃ** আবূ দাউদ শরীফে আছে—রসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, জুমু'আর দিনই সর্বাপেক্ষা অধিক ফযীলতের দিন। এই দিনেই কিয়ামতের জন্য সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে। তোমরা এই দিনে আমার জন্য বেশী করিয়া দুরূদ শরীফ পড়িও। ঐ দিন তোমরা যখন দুরূদ (বা সালাম) পড় তৎক্ষণাৎ তাহা আমার সামনে পেশ করা হয় (এবং তৎক্ষণাৎ আমি তাহার প্রতিউত্তর ও দো'আ দেই)। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সামনে কিরূপে পেশ করা হয় (হইবে)? মৃত্যুর পর তো আপনার হাড় পর্যন্ত থাকিবে না। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, (জানিয়া রাখ যে,) আল্লাহ্ তা'আলা জমিনের জন্য নবীদের শরীর হজম করা হারাম করিয়া রাখিয়াছেন।

৫। **হাদীসঃ** তিরমীযী শরীফে আছে— রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'আল্লাহ্ পাক স্বীয় পবিত্র কালামে শাহেদ (شاهد) শব্দের কসম করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ—জুমু'আর দিন। আল্লাহ্র নিকট জুমু'আর দিন অপেক্ষা ভাল দিন আর নাই। এই দিনে এমন একটি সময় আছে, সেই সময়ে যে কোন মু'মিন বন্দা আল্লাহ্র নিকট যে কোন দো'আ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করিবেন এবং যে কোন বিপদ (মুছীবৎ) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্র নিকট কাঁদাকাটি করিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তাহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।' شاهد শব্দ সূরায়ে-বুরূজে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দিনের কসম খাইয়াছেন। وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ ○ অর্থাৎ, বুরূজ বিশিষ্ট আসমানের কসম, প্রতিশ্রুতি ও কিয়ামতের দিনের কসম, শাহেদ (জুমু'আ)-এর কসম, মাশ্হুদ (আরাফাত)-এর কসম।

৬। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'আল্লাহ্র নিকট ঈদুল ফেৎর এবং ঈদুল আয্হা অপেক্ষাও জুমু'আর দিন অধিক মর্যাদাশীল (এবং এই দিনই সমস্ত দিনের সর্দার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।)—ইবনে মাজাহ

৭। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'যে (মু'মিন) মুসলমান বন্দার মৃত্যু জুমু'আর দিনে বা জুমু'আর রাত্রে হয়, আল্লাহ্ পাক তাহাকে গোর-আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখেন।' —তিরমিযী

৮। **হাদীসঃ** ইব্নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এক দিন—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ○

আয়াতটি তেলাওয়াত করিতেছিলেন। (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং আমার অনুগ্রহ পূর্ণরূপে তোমাদের দান করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্মরূপে মনোনীত করিলাম।') তখন তাঁহার নিকট একজন ইয়াহুদী বসা ছিল। ইয়াহুদী (আয়াতের মর্ম বুঝিয়া) বলিল (ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ও সত্য হওয়া সম্বন্ধে এবং আল্লাহ্র এত বড় অনুগ্রহ প্রাপ্তি সম্বন্ধে) এমন (স্পষ্ট বাণীর) আয়াত যদি আমাদের ভাগ্যে জুটিত, তবে আমরা এমন আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে চিরতরে ঈদের দিন ধার্য করিয়া লইতাম।' হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) উত্তর করিলেনঃ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই এই আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে ঈদের দিন ধার্য করিয়াছেন অর্থাৎ, সেদিন জুমু'আ এবং আরাফাতের দিন ছিল; আমরা নিজেরা ঈদ বানাইবার প্রয়োজন নাই।

৯। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেনঃ 'জুমু'আর রাত নূরে ভরা রাত এবং জুমু'আর দিন নূরে ভরা দিন।' —মেশ্কাত শরীফ

১০। **হাদীসঃ** কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পর যখন বেহেশ্তের উপযোগীদিগকে বেহেশ্তে এবং দোযখের উপযোগীদিগকে দোযখে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, এই জুমু'আর দিন সেখানেও হইবে। যদিও সেখানে দিনরাত থাকিবে না, কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে দিন এবং রাতের পরিমাণ এবং ঘণ্টার হিসাব শিক্ষা দিবেন। কাজেই যখন জুমু'আর দিন আসিবে এবং সে সময় দুনিয়াতে মু'মিন বন্দাগণ জুমু'আর নামাযের জন্য নিজ নিজ বাড়ী হইতে রওয়ানা হইত, তখন বেহেশ্তের একজন ফেরেশ্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে যে, হে বেহেশ্তবাসীগণ! তোমরা "মযীদ" অর্থাৎ, অতিরিক্ত পুরস্কারের ময়দানে চল। সেই ময়দান যে কত প্রশস্ত এবং

কত বিশাল তাহা এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই বলিতে পারে না। তথায় আসমানের সমান উচ্চ মেশ্‌কের বড় বড় স্তূপ থাকিবে। পয়গম্বরগণকে নূরের মিম্বরের উপর এবং মু'মিনগণকে ইয়াকূতের কুরসির উপর বসিতে আসন দেওয়া হইবে। অতঃপর যখন সমস্ত লোক নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করিবে তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে একটি বাতাস আসিয়া ঐ মেশ্‌ক সকলের কাপড়ে, চুলে এবং মুখে লাগাইয়া দিবে। ঐ বাতাস ঐ মেশ্‌ক লাগাইবার নিয়ম ঐ নারী হইতে অধিক জানে যাহাকে সমগ্র বিশ্বের খুশবু দেওয়া হয় (এবং উহার ব্যবহার জানে)। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আর্‌শ বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণকে হুকুম দিবেন যে, আমার আরশ এই সমস্ত লোকের মাঝখানে নিয়া রাখ। তারপর স্বয়ং আল্লাহ্ পাক ঐ সমস্ত লোককে সম্বোধন করিয়া বলিবেনঃ হে আমার বন্দাগণ! তোমরা দুনিয়াতে আমাকে না দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিয়াছিলে, (আমাকে ভক্তি করিয়াছিলে) এবং আমার রসূল (দঃ)-এর কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার আদেশ পালন করিয়াছিলে,'(আজ আমি তোমাদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঘোষণা করিতেছি যে, আজ অতিরিক্ত পুরস্কারের দিন আজ তোমরা আমার কাছে কিছু চাও।' তখন সকলে সমস্বরে বলিবে, 'হে আমাদের পরওয়ারদিগার! (আমাদেরে আপনি বহু কিছু দান করিয়াছেন) আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট (আমাদের প্রাণের আবেগ শুধু এতটুকু যে,) আপনিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া যান।' তখন আল্লাহ্ পাক বলিবেনঃ 'হে বেহেশ্‌তিগণ! (আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি।) যদি আমি সন্তুষ্ট না হইতাম, তবে (আমার সন্তুষ্টি স্থান চির-শান্তি নিকেতন) বেহেশ্‌তে তোমাদের স্থান দিতাম না! ইহা ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু চাও, আজ অতিরিক্ত পুরস্কারের দিন।' তখন সকলে একবাক্যে বলিবে, 'হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদিগকে আপনার সৌন্দর্য দেখাইয়া দিন। আমরা স্বচক্ষে আপনার পাক সত্তা দেখিতে চাই।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক স্বীয় পর্দা উঠাইয়া দিবেন এবং তাহাদের উপর বিকশিত হইবেন এবং স্বীয় নূরের দ্বারা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবেন। "বেহেশ্‌তিগণ কখনও বিদগ্ধ হইবে না" এই আদেশ যদি তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব হইতে না থাকিত, তবে এই নূর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না; বরং ভস্মীভূত হইয়া যাইত। অতঃপর তাহাদিগকে বলিবেন, নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন কর। তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য ঐ নূরে রব্বানীর কারণে দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে। তাহারা নিজ নিজ পত্নীদের নিকট যাইবে কিন্তু তাহারা পত্নীদিগকে দেখিতে পাইবে না। পত্নীগণও তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। কিছুক্ষণ পর এই পরিবেষ্টনকারী নূর অপসারিত হইয়া যাইবে, তখন একে অপরকে দেখিতে পাইবে। বিবিগণ জিজ্ঞাসা করিবেন যাইবার সময় যে সৌন্দর্য আপনাদের ছিল এখন তো সেই সৌন্দর্য নাই বরং হাজারো গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতিউত্তরে ইহারা বলিবে হাঁ, ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে আমাদের উপর প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা সেই নূরকে নিজ চক্ষে দর্শন করিয়াছি। দেখুন, জুমু'আর দিন কত বড় নেয়ামত পাইল।

১১। হাদীসঃ প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় দোযখের আগুনের তেজ বাড়াইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু জুমু'আর দিন দ্বিপ্রহরে জুমু'আর বরকতে দোযখের আগুনের তেজ হয় না।

১২। হাদীসঃ এক জুমু'আর দিন হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'হে মুসলমানগণ! জুমু'আর দিনকে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য ঈদের দিন ধার্য করিয়াছেন। অতএব, এই দিনে তোমরা গোসল করিবে, (গরীব হইলেও সাধ্যমত ভাল কাপড়

পরিধান করিবে,) অবশ্য অবশ্য মিস্ওয়াক করিবে, (দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করিবে) এবং যাহার কাছে যে সুগন্ধি দ্রব্য (আতর, মেশ্ক তৈল) থাকে তাহা লাগাইবে।

জুমু'আর দিনের আদব

১। প্রত্যেক মুসলমানেরই বৃহস্পতিবার দিন (শেষ বেলা) হইতেই জুমু'আর জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং যত্ন লওয়া কর্তব্য। বৃহস্পতিবার আছরের পর দুরূদ, এস্তেগ্ফার এবং তস্বীহ্ তাহ্লীল বেশী করিয়া পড়িবে। পরিধানের কাপড় ধুইয়া পরিষ্কার করিবে! যদি কিছু সুগন্ধি ঘরে না থাকে অথচ আনাইবার সঙ্গতি থাকে, তবে ঐ দিনই আনাইয়া রাখিবে, যাহাতে জুমু'আর দিনে এবাদৎ ছাড়িয়া এইসব কাজে লিপ্ত না হইতে হয়। অতীতের বুযুর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন যে, জুমু'আর ফযীলত সবচেয়ে বেশী সে ব্যক্তি পাইবে, যে জুমু'আর প্রতীক্ষায় থাকে এবং বৃহস্পতিবার হইতেই জুমু'আর জন্য প্রস্তুত হয়। আর সর্বাপেক্ষা অধিক হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে জুমু'আ কবে তাহার খবরও রাখে না, এমন কি, জুমু'আর দিন সকাল বেলায় লোকের নিকট জিজ্ঞসা করে যে, আজ কি বার? অনেক বুযুর্গ লোক জুমু'আর জন্য তৈয়ার থাকিবার উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার দিন গত রাত্রে' মসজিদেই গিয়া থাকিতেন।

২। প্রত্যেক জুমু'আর দিন (প্রত্যেকেই হাজামত বানাইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইবে।) গোসল করিবে, মাথার চুল এবং সর্বশরীর উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে এবং মিসওয়াক করিয়া দাঁতগুলিকে পরিষ্কার করা বেশী ফযীলতের কাজ।

৩। যাহার নিকট যেরূপ উত্তম পোশাক থাকে, তাহা পরিধান করিয়া খোশ্বু লাগাইয়া মসজিদে যাইবে, নখ ইত্যাদি কাটিবে।

৪। জামে' মসজিদে খুব সকালে যাইবে। যে যত সকালে যাইবে সে ততই অধিক ছওয়াব পাইবে। হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'জুমু'আর দিনে ফেরেশ্তাগণ জামে' মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান থাকিয়া মুছল্লিগণ যে যে সময় আসিতে থাকে তাহাদের নাম লিখিতে থাকেন। যে প্রথমে আসে, তাহার নাম সকলের উপরে লেখা হয়। তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় এইভাবে পর্যায়ক্রমে সকলের নাম লেখা হয়। যে সর্বপ্রথমে আসে, সে আল্লাহ্র রাস্তায় একটি উট কোরবানী করার সমতুল্য সওয়াব পায়। যে দ্বিতীয় নম্বরে আসে, সে একটি গরু কোরবানী করার সমান সওয়াব পায়। (যে তৃতীয় নম্বরে আসে, সে একটি বকরী কোরবানী করার সওয়াব পায়) তারপর যে আসে, সে আল্লাহ্র রাস্তায় একটি মোরগ যবাহ করার সমতুল্য সওয়াব পায় এবং তারপর যে আসে সে আল্লাহ্র রাস্তায় একটি আণ্ডা দান করার মত সওয়াব পায়। তারপর যখন খুৎবা আরম্ভ হয়, তখন ফেরেশ্তাগণ ঐ খাতা বন্ধ করিয়া খুৎবা শুনিতে থাকেন। —বোখারী

পূর্বের যমানায় শুক্রবারে লোক এত সকালে এবং জাঁকজমক ও আগ্রহের সহিত জামে' মসজিদে যাইত যে, ফজরের পর হইতেই শহরের রাস্তাগুলিতে ঈদের দিনের মত লোকের ভিড় জমিয়া যাইত। তারপর যখন এই রীতি মুসলমানদের মধ্য হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল, তখন (বিজাতি) লোকেরা বলিল যে, 'ইসলামের মধ্যে এই প্রথম বেদ'আত জারি হইল।' এই পর্যন্ত লিখিয়া ইমাম গয্যালী (রঃ) বলিতেছেন, মুসলমানগণ ইয়াহুদী এবং নাছারাদের অবস্থা দেখিয়া কেন শরমিন্দা হয় না? ইয়াহুদীগণ শনিবারে এবং নাছারাগণ রবিবারে কত সকাল সকাল

তাহাদের প্রার্থনালয়ে ও গীর্জা গৃহে গমন করে। ব্যবসায়িগণ প্রাতঃকালে কেনা-বেচার জন্য বাজারে যাইয়া উপস্থিত হয়। অতএব, দ্বীন অন্বেষণকারীগণ কেন অগ্রসর হয় না?—এহ্ইয়াউল্ উলুম। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানগণ এই যমানায় এই মুবারক দিনের মর্যাদা একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহারা এতটুকু জানে না যে, আজ কোন্ দিন এবং তাহার কি-ই বা মর্তবা? অতীব পরিতাপের বিষয় যে দিনটি এক কালে মুসলমানদের নিকট ঈদ অপেক্ষা বেশী প্রিয় ও মর্যাদাবান ছিল, যে দিনের প্রতি রসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) গর্ব ছিল, পূর্বযুগের উম্মতদের যাহা জুটে নাই, আজ মুসলমানদের হাতে সেই দিন এমন অসহায়ভাবে অপদস্থ হইতেছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতকে এভাবে বরবাদ করা অতি বড় নাশোক্‌রী, যাহার অশুভ প্রতিক্রিয়া স্বচক্ষে দেখিতেছি। ইন্নালিল্লাহ্‌········

৫। জুমু'আর নামাযের জন্য পদব্রজে গমন করিলে প্রত্যেক কদমে এক বৎসরকাল নফল রোযা রাখার ছওয়াব পাওয়া যায়! —তিরমিযী শরীফ

৬। হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিনে ফজরের নামাযে "আলিফ-লাম্-মীম্ সজ্‌দা" এবং "হাল্ আতা আলাল্ ইন্‌সান" এই দুইটি সূরা পাঠ করিতেন। কাজেই মোস্তাহাব মনে করিয়া কোন কোন সময় পড়িবে, আবার কোন কোন সময় ছাড়িয়া দিবে লোকেরা যেন ওয়াজিব মনে না করে।

৭। জুমু'আর নামাযে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "সূরায়ে জুমু'আ" এবং "সূরায়ে মোনাফিকূন" এবং কখনও কখনও "সাব্বিবহিস্‌মা" এবং "হাল্ আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ্" এই দুইটি সূরা পাঠ করিতেন।

৮। জুমু'আর দিনে জুমু'আর নামাযের আগে কিংবা পরে সুরায়ে কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করিলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে সূরায়ে কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করিবে, কিয়ামতের দিন তাহার জন্য আরশের নীচে আকাশতুল্য উচ্চ একটি নূর প্রকাশ পাইবে, যদ্দ্বারা তাহার হাশরের ময়দানে সব অন্ধকার দূর হইয়া যাইবে এবং বিগত জুমু'আ হইতে এই জুমু'আ পর্যন্ত তাহার যত (ছগীরা) গোনাহ্ হইয়াছে, সব মা'ফ হইয়া যাইবে। (তওবা ব্যতীত কবীরা গোনাহ্ মাফ হয় না।) —শরহে ছেফরুস সা'আদাত

৯। জুমু'আর দিনে দুরূদ শরীফ পড়িলে অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়, এই জন্যই হাদীস শরীফে জুমু'আর দিনে বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড়িবার হুকুম আসিয়াছে।

জুমু'আর নামাযের ফযীলত এবং তাকীদ

জুমু'আর নামায ফর্‌যে আইন; কোরআনের স্পষ্ট বাণী দ্বারা, মোতাওয়াতের হাদীস দ্বারা ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা ইহা প্রামণিত আছে এবং ইহা ইসলামের একটি প্রধান অঙ্গ। কেহ ইহার ফরযিয়্যত অস্বীকার করিলে সে কাফির হইবে এবং বিনা ওযরে কেহ তরক করিলে, সে ফাসেক হইবে।

১। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

'হে মুমিনগণ! যখন জুমু'আর নামাযের আযান হয়, তখন তোমরা ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌রের দিকে দৌড়াইয়া চল। তোমরা যদি বুঝ, তবে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম।'
—সূরা-জুমু'আ

এই আয়াতে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের অর্থ জুমু'আর খুৎবা এবং নামায, আর দৌড়াইয়া চলার অর্থ দৌড়ান নহে; বরং কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ দুনিয়ার সব কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌রের জন্য ধাবিত হওয়া।

২। হাদীস শরীফে আছেঃ যে ব্যক্তি শুক্রবারে গোসল করিয়া যথাসম্ভব পাক-ছাফ হইয়া চুলগুলিতে তৈল মাখাইয়া, খোশ্‌বু লাগাইয়া জুমু'আর নামাযের জন্য যাইবে এবং মসজিদে গিয়া কাহাকেও তাহার জায়গা হইতে উঠাইয়া না দিয়া যেখানে জায়গা মিলে সেইখানেই বসিবে এবং যে পরিমাণ নামায তাহার ভাগ্যে জোটে তাহা পড়িবে, তারপর যখন ইমাম খুৎবা দিবেন, তখন চুপ করিয়া খুৎবা শুনিবে, তাহার গত জুমু'আ হইতে এই জুমু'আ পর্যন্ত যত (ছগীরা) গোনাহ্‌ হইয়াছে সব মা'ফ হইয়া যাইবে। —বোখারী শরীফ

৩। হাদীস শরীফে আছেঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে গোসল করিয়া পদব্রজে তাড়াতাড়ি জামে' মস্‌জিদে যাইবে (গাড়ী বা ঘোড়ায়) সওয়ার হইয়া যাইবে না এবং তারপর খুৎবার সময় বেহুদা কাজ করিবে না বা কথাবার্তা বলিবে না এবং চুপ করিয়া খুব মনোযোগের সহিত খুৎবা শ্রবণ করিবে, তাহার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে পূর্ণ এক বৎসরের এবাদতের—(অর্থাৎ, এক বৎসরের রোযার এবং নামাযের) ছওয়াব মিলিবে। —তিরমিযী

৪। হাদীস শরীফে আছেঃ মানুষ যেন কিছুতেই জুমু'আর নামায তরক না করে, অন্যথায় তাহাদের দিলের উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে। তারপর ভীষণ গাফ্‌লতের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে। —মুস্‌লিম শরীফ

৫। হাদীস শরীফে আছেঃ যে ব্যক্তি আলস্য করিয়া তিন জুমু'আ তরক করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার উপর নারায হইয়া যান। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার দিলের উপর মোহর মারিয়া দেন। —তিরমিযী

৬। হাদীস শরীফে আছেঃ শরয়ী গোলাম, স্ত্রীলাক, নাবালেগ ছেলে এবং পীড়িত লোক এই চারি ব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানের উপরই জুমু'আর নামায জমা'আতের সঙ্গে পড়া ফরয এবং আল্লাহ্‌র হক। —আবু দাউদ

৭। রসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'আমার দৃঢ় ইচ্ছা যে, কাহাকেও আমার স্থলে ইমাম বানাইয়া দেই, তৎপর যাহারা জুমু'আর জমা'আতে না আসে তাহাদের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দেই। —মেশ্‌কাত (এই বিষয়ের হাদীস জমা'আত তরককারীদের সম্পর্কেও বর্ণিত হইয়াছে—যাহা পূর্বে লেখা হইয়াছে।

৮। হাদীস শরীফে আছেঃ যে ব্যক্তি বিনা ওযরে জুমু'আর নামায তরক করে, তাহার নাম এমন কিতাবে লিখা হয় যাহা পরিবর্তন হইতে সংরক্ষিত অর্থাৎ, (আল্লাহ্‌র দরবারে) মোনাফিকের দপ্তরভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। —মেশ্‌কাত। (তাহার প্রতি নেফাকের হুকুম সর্বদা থাকিবে। অবশ্য যদি সে তওবা করে কিংবা দয়াল আল্লাহ্‌ মাফ করিয়া দেন, তবে স্বতন্ত্র কথা।)

৯। হাদীস শরীফে আছেঃ মুসাফির, আওরত, নাবালেগ এবং গোলাম ব্যতীত প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির উপরই জুমু'আর নামায ফরয। অতএব, যদি কেহ এই ফরয হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া

কোন বেহুদা কাজে অর্থাৎ, দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কোন কাজে লিপ্ত হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তি হইতে মুখ ফিরাইয়া লন। নিশ্চয় জানিবে, আল্লাহ্ তা'আলা বে-নিয়ায, এবং তিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয়। অর্থাৎ তিনি কাহারও এবাদতের পরওয়া করেন না, তাহার ফায়েদাও নাই, তিনি সর্বগুণের আধার, কেহ তাঁহার প্রশংসা করুক বা না করুক।

১০। হযরত আবদুল্লাহ্-ইবনে-আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি পর পর কয়েক জুমু'আ তরক করে, তবে সে যেন ইসলামকেই তরক করিল।

১১। একজন লোক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে-আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এমন কোন ব্যক্তি যদি মরিয়া যায়, যে জুমু'আ এবং জমা'আতে উপস্থিত হইত না, তবে তাহার সম্বন্ধে আপনার কি মত? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি দোযখী হইবে। প্রশ্নকারী তাঁহাকে এক মাস যাবৎ রোজ এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল এবং তিনি বরাবর ঐ একই উত্তর দিয়াছিলেন। —এহ্ইয়াউল উলুম।

এইসব রেওয়ায়ত দ্বারা জুমু'আ ও জমা'আতের নামায তরককারীর প্রতি বড় কঠোর শাস্তি ও ভীতি আসিয়াছে। এখনও কি কোন ইস্‌লামের দাবীদার এই ফরয তরক করার দুঃসাহস করিতে পারে?

জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

[জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য ৬টি শর্ত আছে, যথাঃ]

১। মুকীম হওয়া। অতএব, মুসাফিরের উপর জুমু'আ ওয়াজিব নহে, (কিন্তু যদি পড়ে, তবে উত্তম। মুসাফির যদি কোথাও ১৫ দিন অবস্থান করিবার ইচ্ছা করে, তবে তাহার উপর জুমু'আ ওয়াজিব হইবে।)

২। সুস্থকায় হওয়া। অতএব, যে রোগী জুমু'আর মসজিদ পর্যন্ত নিজ ক্ষমতায় হাঁটিয়া যাইতে অক্ষম তাহার উপর জুমু'আ ফরয হইবে না। এইরূপে যে বৃদ্ধ বার্ধক্যের দরুন জামে' মসজিদে হাঁটিয়া যাইতে অক্ষম কিংবা অন্ধ, ইহাদিগকে রোগী বলা হইবে; তাহাদের উপর জুমু'আর নামায ফরয নহে।

৩। আযাদ হওয়া। গোলামের উপর জুমু'আ ফরয নহে।

৪। পুরুষ হওয়া। স্ত্রীলোকের উপর জুমু'আ ফরয নহে।

৫। যে সব ওযরের কারণে পাঞ্জেগানা নামাযের জমাআত তরক করা জায়েয হয় সেই সব ওযর না থাকা। যথা, (ক) মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া। (খ) রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় লিপ্ত থাকা। (গ) পথে শত্রুর ভয়ে প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকা। (পথ দেখিতে পায় না এরূপ অন্ধ হওয়া। পথ চলিতে পারে না এরূপ খঞ্জ হওয়া ইত্যাদি যাহা জমা'আতের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে।)

৬। পাঞ্জেগানা নামায ফরয হইবার জন্য যে সব শর্ত আছে তাহা মৌজুদ থাকা। যথাঃ আকেল হওয়া, বালেগ হওয়া, মুসলমান হওয়া, এইসব শর্তে জুমু'আর নামায ফরয হয়, কিন্তু যদি কেহ এই শর্ত ছাড়াও জুমু'আ পড়ে, তবুও তাহার ফরযে-ওয়াক্ত অর্থাৎ, যোহর আদায় হইয়া যাইবে। যেমন, কোন মুসাফির অথবা কোন স্ত্রীলোক যদি জুমু'আর নামায পড়ে, যোহর আদায় হইয়া যাইবে।

জুমু'আর নামায ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ

[জুমু'আর নামায ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ। যথাঃ]

১। শহর হওয়া। অর্থাৎ, বড় শহর বা ছোট শহর বা ছোট শহরতুল্য গ্রাম[১] হওয়া। অতএব, ছোট পল্লীতে বা মাঠে (বা বিলের) মধ্যে (নদীর বা সমুদ্রের মধ্যে) জুমু'আর নামায দুরুস্ত নহে। যে গ্রাম ছোট শহরতুল্য অর্থাৎ, ৩/৪ হাজার লোকের বসতি আছে, তথায় জুমু'আর নামায দরুস্ত আছে।

২। যোহরের ওয়াক্ত হওয়া। অতএব, যোহরের ওয়াক্তের পূর্বে বা পরে জুমু'আর নামায পড়িলে তাহা দুরুস্ত হইবে না। এইরূপে জুমু'আর নামায পড়িতে পড়িতে যদি যোহরের ওয়াক্ত চলিয়া যায়, তবে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না, যদিও দ্বিতীয় রাকা'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু বসিয়া থাকে। আর জুমু'আর নামাযের ক্বাযাও নাই। (কাজেই এই কারণে বা অন্য কোন কারণে জুমু'আর নামায ছহীহ্ না হইলে যোহর পড়িতে হইবে।)

৩। খুৎবা। অর্থাৎ, মুছল্লিদের সম্মুখে আল্লাহ্ তা'আলার যিকর করা, শুধু সোব্হানাল্লাহ্ বলা হউক বা আল্হামদু লিল্লাহ্। অবশ্য শুধু এতটুকু বলিয়া শেষ করা সুন্নতের খেলাফ তাই মকরূহ্ হইবে।

৪। নামাযের পূর্বে খুৎবা পড়া। নামাযের পূর্বে খুৎবা না পড়িয়া পরে পড়িলে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না।

৫। খুৎবা যোহরের ওয়াক্তের মধ্যে হওয়া। অতএব, যোহরের ওয়াক্তের পূর্বে খুৎবা পড়িলে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না।

৬। জমা'আত হওয়া। অর্থাৎ, খুৎবার শুরু হইতে প্রথম রাকা'আতের সজ্দা পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে অন্ততঃ তিনজন পুরুষ থাকা চাই। যদিও খুৎবায় যে তিনজন উপস্থিত ছিল চলিয়া যায় এবং অন্য তিনজন নামাযে শামিল হয়। কিন্তু শর্ত এই যে, লোক তিনজন ইমামতের যোগ্য হওয়া চাই। সুতরাং শুধু স্ত্রীলোক বা নাবালেগ ছেলে মুক্তাদী হইলে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না।

৭। যদি সজ্দা করার পূর্বে লোক চলিয়া যায় এবং তিন জনের কম অবশিষ্ট থাকে, কিংবা কেহই না থাকে, তবে নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে, অবশ্য যদি সজ্দা করার পর চলিয়া যায়, তবে কোন ক্ষতি নাই।

টিকা

১ মোছান্নেফ (রঃ) কিতাবে লিয়িাছেন যে গ্রামের লোকসংখ্যা ছোট শহরের লোকসংখ্যার সমান অর্থাৎ যে গ্রামে তিন চারি হাজার লোকের বাস, সে গ্রামে জুমু'আ দুরুস্ত আছে। বঙ্গদেশে যে সব একলাগা বসতি গ্রাম নামে কথিত হয়, তথায় জুমু'আ দুরুস্ত হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে আলেমগণের মতভেদ দেখা যায়। অধীন মোতার্জেম বলে—আমি একলাগা বসতিসমূহে জুমু'আ পড়িয়া থাকি। অবশ্য বন, চর বা বিলের মধ্যে আবাদি হইতে অনেক দূরে কোন ছোট গ্রাম থাকিলে তথায় নিশ্চয় জুমু'আ দুরুস্ত হইবে না। যে স্থানে জুমু'আ দুরুস্ত হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ার কারণে সন্দেহ আসিয়া গিয়াছে তথায় সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য চারি রাকা'আত (আখেরী যোহর) এহ্তিয়াতি যোহর পড়িয়া থাকি।

৮। এ'লানে আম এবং এজাযতে আম্মা। অর্থাৎ, যে স্থানে জুমু'আর নামায পড়া হয়, সে স্থানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা চাই। সুতরাং, যদি কোন স্থানে গুপ্তভাবে নামায পড়া হয় যেখানে সাধারণের প্রবেশের অনুমতি নাই বা মসজিদের দরজা বন্ধ করিয়া জুমু'আর নামায পড়ে, জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না।

এইসব শর্ত জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবার শর্ত। কাজেই ইহার একটি মাত্র শর্তও যদি না পাওয়া যায়, তবে জুমু'আর নামায দুরুস্ত হইবে না, যোহর পড়িতে হইবে। যে স্থানে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, জুমু'আর নামায দুরুস্ত নহে, সেখানে যোহর পড়াই ফরয, সেখানে জুমু'আ নফল মাত্র এবং নফল ধুমধামের সহিত জমা'আত করিয়া পড়া মকরূহ্‌। সুতরাং এমতাবস্থায় জুমু'আর নামায পড়া মকরূহ্‌ তাহ্‌রীমী।

খুৎবার মাসায়েল

১। মাসআলাঃ যখন সমস্ত মুছল্লি উপস্থিত হইয়া যাইবে, তখন ইমাম মিম্বরের উপর মুছল্লিগণের দিকে মুখ করিয়া বসিবেন এবং মোয়ায্‌যিন তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া আযান দিবেন। আযান শেষ হইলে তৎক্ষণাৎ ইমাম দাঁড়াইয়া খুৎবা শুরু করিবেন।

২। **মাসআলাঃ** খুৎবার মধ্যে ১২টি কাজ সুন্নত যথাঃ (১) দাঁড়াইয়া খুৎবা পড়া, (২) (পর পর) দুইটি খুৎবা পড়া, (৩) দুই খুৎবার মাঝখানে ৩ বার সোব্‌হানাল্লাহ্‌ বলা যায় পরিমাণ সময় বসা, (৪) ওয়্‌-গোসলের প্রয়োজন হইতে পবিত্র হওয়া, (৫) খুৎবা পাঠকালে উপস্থিত মুছল্লিগণের দিকে মুখ রাখা। (৬) খুৎবা শুরু করিবার পূর্বে চুপে চুপে **اعوذ بالله من الشيطان الرجيم** বলা। (৭) লোকে শুনিতে পারে পরিমাণ আওয়াযের সহিত খুৎবা পড়া। (৮) খুৎবার মধ্যে নিম্নলিখিত ৮টি বিষয় বর্ণিত হওয়া, যথাঃ (ক) আল্লাহ্‌র শোক্‌র, (খ) আল্লাহ্‌র প্রশংসা, (গ) তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য, (ঘ) দুরূদ, (ঙ) কিছু নছীহত, (চ) কোরআন শরীফ হইতে দুই একটি আয়াত বা সূরা পাঠ করা, (ছ) দ্বিতীয় খুৎবায় উপরোক্ত বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি করা, (জ) প্রথম খুৎবায় যে স্থানে নছীহত ছিল দ্বিতীয় খুৎবায় তথায় সমস্ত মুসলমানের জন্য দো'আ করা। এই ৮ প্রকার সুন্নতের বর্ণনার পর ঐ সমস্ত সুন্নতের বর্ণনা হইতেছে যাহা খুৎবার সুন্নত। (৯) খুৎবা অত্যন্ত লম্বা না করা; (বরং নামাযের সমান সমান) বরং নামাযের চেয়ে কম রাখা, (১০) মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া খুৎবা পড়া। মিম্বর না থাকিলে লাঠি, ধনুক বা তলোয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া খুৎবা পড়িতে পারে; কিন্তু মিম্বর থাকা সত্ত্বে লাঠি হাতে লওয়া বা হাত বাঁধিয়া খুৎবা পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (১১) উভয় খুৎবাই আরবী ভাষায় (এবং গদ্যে) হওয়া। আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুৎবা পড়া বা অন্য ভাষায় পদ্য ইত্যাদি মিলাইয়া পড়া মক্‌রূহ্‌-তাহ্‌রীমী। (১২) সমস্ত মুছল্লির খুৎবা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া ইমামের দিকে মুখ করিয়া বসা। ছানি খুৎবায় হযরতের আওলাদ, আছ্‌হাব এবং বিবি ছাহেবাগণের প্রতি বিশেষতঃ খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত হাম্‌যা ও হযরত আব্বাস ('রাযিয়াল্লাহু')-এর জন্য দো'আ করা মোস্তাহাব। সাময়িক মুসলমান বাদশাহ্‌র জন্য দো'আ করা জায়েয, কিন্তু তাঁহার মিথ্যা প্রশংসা করা মকরূহ্‌ তাহ্‌রীমী।

৩। **মাসআলা ঃ** যখন ইমাম খুৎবার জন্য দাঁড়াইবেন, তখন হইতে খুৎবার শেষ পর্যন্ত নামায পড়া বা কথাবার্তা বলা মক্রূহ্-তাহ্রীমী, অবশ্য যে ব্যক্তি ছাহেবে তরতীব তাহার ক্বাযা নামায পড়া জায়েয বরং ওয়াজিব।

৪। **মাসআলা ঃ** খুৎবা শুরু হইলে দূরের বা নিকটে উপস্থিত সকলের তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং যে কোন কাজ বা কথা দ্বারা খুৎবা শুনার ব্যাঘাত জন্মে তাহা মক্রূহ্-তাহ্রীমী। এইরূপে খুৎবার সময় কোন কিছু খাওয়া, পান করা, কথাবার্তা বলা, হাঁটা, চলা, সালাম করা, সালামের জওয়াব দেওয়া, তসবীহ্ পড়া, মাসআলা বলা ইত্যাদি কাজ নামাযের মধ্যে যেমন হারাম খুৎবার মধ্যেও তেমনই হারাম ; অবশ্য ইমাম নেক কাজের আদেশ এবং বদ কাজের নিষেধ করিতে বা মাসআলার কথা বলিতে পারেন।

৫। **মাসআলা ঃ** সুন্নত বা নফল নামায পড়ার মধ্যে যদি খুৎবা শুরু হইয়া যায়, সুন্নতে মোয়াক্কাদা হইলে (ছোট সূরা দ্বারা) পুরা করিয়া লইবে এবং নফল হইলে দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** দুই খুৎবার মাঝখানে যখন বসা হয়, তখন হাত উঠাইয়া মুনাজাত করা মক্রূহ্ তাহ্রীমী, অবশ্য হাত না উঠাইয়া জিহ্বা না আওড়াইয়া মনে মনে দো'আ করা যায়। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তদীয় ছাহাবাগণ হইতে ইহা ছাবেত নাই। রমযান শরীফের শেষ জুমু'আর খুৎবায় বিদায় ও বিচ্ছেদমূলক বিষয় পড়া যেহেতু নবী (দঃ) ও ছাহাবায় কেরাম হইতে ছাবেত নাই এবং ফেকাহ্র কিতাবেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না, তদুপরি এরূপ হামেশা পড়িলে সর্বসাধারণ ইহা যরূরী বলিয়া মনে করিবে। কাজেই ইহা বেদ্আত।

সতর্ক বাণী ঃ আমাদের যুগে এই খুৎবার প্রতি এমন জোর দেওয়া হইতেছে যে, যদি কেহ না পড়ে, তবে তাহাকে দোষারোপ করা হয়। ঐ খুৎবা শুনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। (এইরূপ করা উচিত নহে।)

৭। **মাসআলা ঃ** কিতাব বা অন্য কিছু দেখিয়া খুৎবা পড়া (এবং মুখস্থ পড়া উভয়ই) জায়েয আছে।

৮। **মাসআলা ঃ** খুৎবার মধ্যে যখন হযরতের নাম মোবারক আসিবে, তখন মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়া জায়েয।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খুৎবা

নবী (দঃ)-এর খুৎবা নকল করার উদ্দেশ্য এই নহে যে, সর্বদা এই খুৎবাই পড়িবে, বরং উদ্দেশ্য এই যে, বরকতের জন্য মাঝে মাঝে পড়িবে।

হযরত (দঃ)-এর নিয়ম ছিল—যখন সব লোক জমা হইত, তখন তশ্রীফ আনিতেন এবং উপস্থিতদের 'আস্সালামু' আলাইকুম বলিয়া সালাম করিতেন। তারপর হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু আন্হু আযান দিতেন। যখন আযান শেষ হইয়া যাইত, তখন হযরত দাঁড়াইয়া খুৎবা শুরু করিতেন। মিম্বর নির্মিত হইবার পূর্বে খুৎবার সময় লাঠি বা কামানের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতেন, কখনও কখনও মেহ্রাবের নিকট যে খুঁটি ছিল উহাতে হেলান দিয়া দাঁড়াইতেন। মিম্বর তৈরী হওয়ার পর লাঠিতে ভর দেওয়ার প্রমাণ নাই। হযরত দুইটি খুৎবা পড়িতেন। দুই খুৎবার মাঝ-খানে কিছুক্ষণ বসিতেন, কিন্তু সে সময় কোন কথা বলিতেন না বা কোন দো'আও পড়িতেন না।

না। যখন দ্বিতীয় খুৎবা শেষ হইত, তখন হযরত বিলাল (রাঃ) এক্কামত বলিতেন। এক্কামত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত নামায শুরু করিতেন। খুৎবা দেওয়ার সময় হযরতের আওয়ায খুব বড় হইয়া যাইত এবং চক্ষু মুবারক লাল হইয়া যাইত। মুসলিম শরীফে আছে, এরূপ বোধ হইত, যেন আসন্ন শত্রু-সেনা হইতে নিজ লোকদিগকে সতর্ক করিতেছেন।

হযরতের (দঃ) খুৎবায় কতিপয় উপদেশ

অনেক সময় হযরত (দঃ) বলিতেনঃ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ উপমা স্বরূপ শাহাদত অঙ্গুলী এবং মধ্যমা অঙ্গুলী এই দুইটি অঙ্গুলীকে মিলাইয়া হযরত বলিতেনঃ 'আমার নুবুওত এবং কিয়ামতের মধ্যে ব্যবধান এইরূপ' অর্থাৎ, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। (আমার নুবুওত এবং কিয়ামতের মধ্যে অন্য কোন নুবুওতের ব্যবধান নাই।) তারপর বলিতেনঃ

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَّشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَّفْسِهٖ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِاَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَعَلَىَّ ○

অর্থ—তোমরা সুনিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ যে, সর্বোৎকৃষ্ট নছীহত আল্লাহ্‌র কোরআন এবং সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা মোহাম্মদ (দঃ)- এর পন্থা (সুন্নত তরীকা) এবং সব চেয়ে খারাব জিনিস বেদ্‌আত এবং সব বেদ'আত গোম্‌রাহী। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাহার নিজের চেয়ে আমি অধিক খায়েরখাহ্ (হিতাকাঙ্ক্ষী)। মৃত্যুকালে যে যাহা সম্পত্তি রাখিয়া যাইবে, তাহা তাহার ওয়ারিশগণ পাইবে; কিন্তু যদি কেহ ঋণ রাখিয়া যায় বা নিরাশ্রয় এতীম বাচ্চা রাখিয়া যায়, তবে তাহার দায়িত্ব আমার উপর। কখনও কখনও এই খুৎবা পড়িতেনঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا وَبَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَصِلُوا الَّذِىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهٗ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُوْجَرُوْا وَتُحْمَدُوْا وَ تُرْزَقُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ مَكْتُوْبَةً فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا فِىْ شَهْرِىْ هٰذَا فِىْ عَامِىْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ وَّجَدَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا فَمَنْ تَرَكَهَا فِىْ حَيَاتِىْ اَوْ بَعْدِىْ جُحُوْدًابِهَا وَاِسْتِخْفَافًا بِهَا وَلَهٗ اِمَامٌ جَائِرٌ اَوْ عَادِلٌ فَلَا جَمَعَ اللهُ شَمْلَهٗ وَلَا بَارَكَ لَهٗ فِىْ اَمْرِهٖ اَلَا وَلَا صَلٰوةَ لَهٗ اَلَا وَلَا صَوْمَ لَهٗ اَلَا وَلَا زَكٰوةَ لَهٗ اَلَا وَلَا حَجَّ لَهٗ اَلَا وَلَا بِرَّ لَهٗ حَتّٰى يَتُوْبَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللهُ اَلَا وَلَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَاَةٌ رَّجُلًا اَلَا وَلَا يَؤُمَّنَّ اَعْرَابِىٌّ مُّهَاجِرًا اَلَا وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُّؤْمِنًا اِلَّا اَنْ يَّقْهَرَهٗ سُلْطَانٌ يُّخَافُ سَيْفُهٗ وَسَوْطُهٗ ○

অর্থ—হে মানব-সমাজ! তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্বেই সকলে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হইয়া তওবা করিয়া আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়া আস এবং সময় থাকিতে ত্রস্ত হইয়া সকলে নেক আমলের দিকে এবং ভাল কাজের দিকে ধাবিত হও। আর খুব বেশী করিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর, এবং অপ্রকাশ্যে ও প্রকাশ্যে খুব বেশী করিয়া দান-খয়রাত করিয়া আল্লাহ্‌র যে অসংখ্য-অগণিত প্রাপ্য হক্ তোমদের যিম্মায় পাওনা আছে তাহার কিয়দংশ পরিশোধ কর। এইরূপ করিলে আল্লাহ্‌র নিকটে উহার ছওয়াব পাইবে, প্রশংসনীয় হইবে এবং রুজী-রোজগারেও বরকত পাইবে।

তোমরা জানিয়া রাখ যে, বর্তমান বৎসরের বর্তমান মাসের বর্তমান সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা জুমু'আর নামায তোমাদের উপর অকাট্যভাবে ফরয করিয়াছেন। যে কেহ জুমু'আ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে তাহার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ফরয আকাট্যরূপে বহাল থাকিবে। অতএব, খবরদার! এইরূপে ফরয হওয়ার পরও আমার জীবিতাবস্থায় অথবা আমার মৃত্যুর পর যদি কেহ অন্যায়কারী বা ন্যায়কারী ইমাম পাওয়া সত্ত্বেও এই ফরয অস্বীকার করে অথবা তুচ্ছ করিয়া তরক করে, তবে আল্লাহ্ তাহার বিশৃঙ্খল ভাব দূর করিবেন না, তাহার কোন কাজে বরকত দিবেন না এবং তাহার নামাযও কবূল হইবে না, রোযাও কবূল হইবে না, যাকাৎও কবূল হইবে না, হজ্জও কবূল হইবে না এবং অন্য কোন নেক কাজও কবূল হইবে না, যে পর্যন্ত সে তওবা না করিবে। অবশ্য যদি তওবা করে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া তাহার তওবা কবূল করিবেন। আরও জানিয়া রাখ যে, খবরদার! স্ত্রীজাতি যেন কখনও পুরুষ জাতির ইমামত না করে, খবরদার! জাহেল যেন কখনও আলেমের ইমামত না করে, খবরদার! ফাসেক যেন কখনও মো'মিন মুত্তাকির ইমামত না করে। অবশ্য যদি জোরপূর্বক এমন কেহ ইমামত করে যে, তাহার তরবারির বা লাঠির ভয় করিতে হয়, তবে সে ভিন্ন কথা। কখনো কখনো এইরূপ খুৎবা দিতেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ـ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَ اهْتَدٰى وَ مَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَ لَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا ○

অর্থ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের কু-প্রবৃত্তির দুষ্টামি এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়ত দান করিবেন, তাহাকে অন্য কেহ গোমরাহ্ করিতে পারিবে না এবং (স্বেচ্ছায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করায়) আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহ্ করিবেন, তাহাকে অন্য কেহ হেদায়তে আনিতে পারিবে না। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, আল্লাহ্ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বন্দা এবং আল্লাহ্‌র রসূল, (আল্লাহ্‌র বাণী বহনকারী) আল্লাহ্ তাঁহাকে সত্য বাণী মান্যকারীদের জন্য বেহেশ্‌তের (মুক্তি) সুসংবাদদাতা এবং অমান্যকারীদের জন্য দোযখের আযাবের ভয় প্রদর্শনকারীরূপে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তিনি আসিয়াছেন। যাহারা আল্লাহ্‌র বাণী এবং আল্লাহ্‌র রসূলের বাণী মান্য করিয়া চলিয়াছে, তাহারা হেদায়তের পথ পাইয়াছে এবং তাহাদের জীবন সার্থক হইয়াছে এবং যে আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ রসূলের বাণী অমান্য করিবে, সে নিজেরই সর্বনাশ সাধন করিবে, তাহাতে আল্লাহ্‌র কোনই অনিষ্ট হইবে না।

এক ছাহাবী বলেন, অধিকাংশ সময় হযরত (দঃ) খুৎবায় সূরা-ক্বাফ পড়িতেন। আমি সূবা-ক্বাফ হযরতের নিকট হইতে মুখস্থ করিয়াছি যখন তিনি মিম্বরে দাঁড়াইয়া পড়িতেন। —মুসলিম। সূরা-ক্বাফের মধ্যে হাশর-নশর এবং অনেক মা'রেফতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কখনও সূরা-আছর পড়িতেনঃ

وَالْعَصْرِ ○ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ○ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○

অর্থ—আল্লাহ্ বলেন, সময়ের সাক্ষ্য—নিশ্চয়ই সব মানুষ ধ্বংসে পতিত, শুধু তাহারা ব্যতীত, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে এবং সত্যের জন্য একে অন্যকে ওছিয়ত করিয়াছে এবং ধৈর্যের জন্য একে অন্যকে ওছিয়ত করিয়াছে ।

কখনও কোরআন শরীফের এই আয়াত পাঠ করিতেনঃ

لَا يَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ○

অর্থ—দোযখবাসী এবং বেহেশ্‌তবাসী সমান হইতে পারে না, যাহারা বেহেশ্‌তবাসী তাহারাই সফলকাম। কখনও কখনও নিম্ন আয়াত পড়িতেনঃ

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ ○

অর্থ—দোযখবাসীরা চীৎকার করিয়া বলিবে, হে দোযখরক্ষী ফেরেশ্‌তা মালেক! (দোযখের যন্ত্রণা আর আমাদের সহ্য হয় না, এর চেয়ে ভাল,) তোমার মা'বূদ আমাদের জীবন শেষ করিয়া দেউক। (উত্তরে) তিনি বলিবেন, (না, না, তোমদের মৃত্যু নাই।) তোমরা চিরকাল এখানে (এই শাস্তি ভোগ করিতে) থাকিবে।

জুমু'আর নামাযের মাসায়েল

১। **মাসআলাঃ** যিনি খুৎবা পড়িবেন নামাযও তিনি পড়াইবেন, ইহাই উত্তম। কিন্তু যদি অন্য কেহ নামায পড়ান তাহও দুরুস্ত আছে।

২। **মাসআলাঃ** খুৎবা শেষ হওয়া মাত্রই এক্বামতের পর নামায শুরু করা সুন্নত। খুৎবা ও নামাযের মাঝখানে দুনিয়াবী কোন কাজ করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। যদি খুৎবা ও নামাযের মধ্যে বেশী ব্যবধান হইয়া যায়, তবে খুৎবা পুনরায় পড়িতে হইবে। অবশ্য যদি কোন দ্বীনি যরূরী কাজ সামনে আসিয়া পড়ে, যেমন, কাহাকেও কোন যরূরী মাসআলা বলিয়া দেওয়া, অথবা ওযূ টুটিয়া গেলে ওযূ করিয়া লওয়া, কিংবা গোসলের প্রয়োজন যিম্মায় থাকিলে গোসল করিতে যাওয়া ইত্যাদি কাজ মকরূহ্ নহে, খুৎবাও দোহ্‌রাইতে হইবে না।

৩। **মাসআলাঃ** জুমু'আর নামায এইরূপ নিয়্যত করিয়া পড়িবেঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىِ الْفَرْضِ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ ○

বাংলা নিয়্যত এইঃ

"জুমু'আর দুই রাকা'আত ফরয নামায আমি আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের জন্য পড়িতেছি।"

৪। **মাসআলাঃ** এক মকামের সকল লোক একত্রিত হইয়া একই মসজিদে জুমু'আ পড়া উত্তম। অবশ্য যদি একই স্থানের কয়েকটি মসজিদে জুমু'আ পড়া হয়, তাহাতেও নামায হইয়া যাইবে।

৫। **মাসআলাঃ** যদি কেহ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় কিংবা ছহো সজ্‌দার পর ইমামের সহিত শরীক হয়, তবুও তাহার ওয়াক্তের ফরয আদায়ের জন্য যোহরের চারি রাকা'আত পড়ার দরকার নাই, জুমু'আর দুই রাকা'আত পড়িলেই ওয়াক্তের ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

৬। মাসআলা ঃ কোন কোন লোক জুমু'আর পর এহ্‌তিয়াতুয্ যোহর পড়িয়া থাকে, যেহেতু সর্বসাধারণের আক্বীদা ইহার কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কাজেই তাহাদিগকে একেবারে নিষেধ করা দরকার। অবশ্য যদি কোন আলেম সন্দেহের স্থলে পড়িতে চায়, তবে এইরূপে পড়িবে, যেন কেহ জানিতে না পারে।

ঈদের নামায

১। মাসআলা ঃ শাওয়াল চাঁদের প্রথম তারিখে একটি ঈদ, তাহাকে 'ঈদুল ফিৎর' এবং যিলহজ্জ চাঁদের ১০ই তারিখে একটি ঈদ, তাহাকে 'ঈদুল আয্‌হা' বলে। ঈদ অর্থ—খুশী। ইসলাম ধর্মের বিধানে দুইটি ঈদ নির্ধারিত হইয়াছে। এই উভয় ঈদের দিনে (মহাসমারোহে সমস্ত) মুসলমানের একত্রিত হইয়া শোক্‌র আদায়ের জন্য দুই রাকা'আত নামায পড়া ওয়াজিব। জুমু'আর নামাযের জন্য যে সব শর্ত, দুই ঈদের নামাযের জন্যও সেই সব শর্ত যরূরী। কিন্তু জুমু'আর নামাযের খুৎবা ফরয, দুই ঈদের নামাযের খুৎবা সুন্নত। জুমু'আর খুৎবার ন্যায় দুই ঈদের খুৎবা শুনাও ওয়াজিব, খুৎবা চুপ করিয়া কান লাগাইয়া শুনিতে হইবে, কথাবার্তা বলা, চলাফেরা করা, নামায পড়া বা দো'আ করা সবই হারাম।

ঈদুল ফিৎরের দিন ১৩টি কাজ সুন্নত। যথা ঃ

(১) শরীঅতের সীমার মধ্যে থাকিয়া যথাসাধ্য সুসজ্জিত হওয়া (এবং খুশী যাহির করা।) (২) গোসল করা। (৩) মিসওয়াক করা। (৪) যথাসম্ভব উত্তম কাপড় পরিধান করা। (৫) খোশ্‌বু লাগান। (৬) সকালে অতি প্রত্যুষে বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করা। (৭) ফজরের নামাযের পরেই অতি ভোরে ঈদগাহে যাওয়া। (৮) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খোরমা অথবা অন্য কোন মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করা। (৯) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ছদকায়ে ফিৎরা দান করা। (১০) ঈদের নামায মসজিদে না পড়িয়া ঈদগাহে গিয়া পড়া। অর্থাৎ, বিনা ওযরে শহরের মসজিদে না পড়া। (১১) ঈদগাহে এক রাস্তায় যাওয়া ও অন্য রাস্তায় ফিরিয়া আসা। (১২) ঈদগাহে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া। (১৩) ঈদগাহে যাইবার সময় আস্তে আস্তে নিম্নলিখিত তক্‌বীর বলিতে বলিতে যাওয়া।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ○

২। মাসআলা ঃ ঈদুল ফিৎরের নামায পড়িবার নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىِ الْوَاجِبِ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبَاتٍ ○

"আমি ঈদুল ফিৎরের দুই রাকা'আত নামায ঈদের ছয়টি ওয়াজিব তকবীরসহ পড়িতেছি।" এইরূপ নিয়্যত করিয়া, 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া হাত উঠাইয়া তাহ্‌রীমা বাঁধিবে। তারপর সোব্‌হানাকা পুরা পড়িবে। (কিন্তু আউযুবিল্লাহ্ ও বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িবে না।) তারপর পর পর তিনবার 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া তকীর বলিবে এবং প্রত্যেকবার হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া ছাড়িয়া দিবে। প্রত্যেক তকবীরের পর তিনবার সোব্‌হানাল্লাহ্ বলা যায় পরিমাণ সময় থামিবে। (জমাআত বড় হইলে এর চেয়ে কিছু বেশীও দেরী করা যায়) তৃতীয়বারে তকবীর বলিয়া হাত ছাড়িবে না। দুই হাত বাঁধিয়া তাহ্‌রীমা বাঁধিয়া লইবে। তারপর আউযুবিল্লাহ্, বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া সূরা-ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়িয়া অন্যান্য নামাযের ন্যায় রুকূ-সজ্‌দা করিবে, কিন্তু দ্বিতীয় রাকা'আতে দাঁড়াইয়া সূরা-ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়িবার পর সঙ্গে সঙ্গে রুকূতে যাইবে না; বরং উপরোক্ত

নিয়মে তিনবার তকবীর বলিবে। তৃতীয় তকবীর বলিয়া হাত বাঁধিবে না; বরং হাত ছাড়িয়া রাখিয়া চতুর্থ তকবীর বলিয়া রুকূতে যাইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** নামাযের পর ইমাম মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া দুইটি খুৎবা পড়িবে। দুই খুৎবার মাঝখানে জুমু'আর খুৎবার ন্যায় কিছুক্ষণ বসিবে। (ঈদুল ফিৎরের খুৎবার মধ্যে ছদক্বায়ে ফিৎর সম্বন্ধে আহ্‌কাম বয়ান করিবে। মুক্তাদী দূরত্বের কারণে খুৎবা না শুনিতে পাইলে চুপ করিয়া কান লাগাইয়া থাকা ওয়াজিব।)

৪। **মাসআলা ঃ** ঈদের নামাযের (বা খুৎবার) পরে দো'আ করা যদিও নবী (দঃ) ও তাঁহার ছাহাবা এবং তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন হইতে প্রামাণিত নয়, কিন্তু অন্যান্য নামাযের পর দো'আ করা যেহেতু সুন্নত, অতএব, ঈদের নামাযের পরও দো'আ করা সুন্নত হইবে বলিয়া ধারণা।

৫। **মাসআলা ঃ** উভয় ঈদের খুৎবা প্রথমে তকবীর বলিয়া আরম্ভ করিবে। প্রথম খুৎবায় ৯ বার আল্লাহু আকবর বলিবে। দ্বিতীয় খুৎবায় ৭ বার বলিবে।

৬। **মাসআলা ঃ** ঈদুল আয্‌হার নামাযের নিয়মও ঠিক ঈদুল ফিৎরের নামাযের অনুরূপ এবং যে সব জিনিস ওখানে সুন্নত সেইসব এখানেও সুন্নত। পার্থক্য শুধু এই যে, (১) নিয়্যতের মধ্যে ঈদুল ফিৎরের পরিবর্তে 'ঈদুল আয্‌হা' বলিবে, (২) ঈদুল ফিৎরের দিন কিছু খাইয়া ঈদগাহে যাওয়া সুন্নত, কিন্তু ঈদুল আয্‌হার দিনে খাইয়া যাওয়া সুন্নত নহে। (বরং ঈদুল আয্‌হার নামাযের পূর্বে কিছু না খাইয়া যাওয়াই মোস্তাহাব), (৩) ঈদুল আয্‌হার দিনে ঈদগাহে যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে তকবীর পড়া সুন্নত। ঈদুল ফিৎরে আস্তে পড়া সুন্নত, (৪) ঈদুল আয্‌হার নামায ঈদুল ফিৎর অপেক্ষা অধিক সকালে পড়া সুন্নত, (৫) ঈদুল ফিৎরে নামাযের পূর্বে ছদক্বায়ে ফিৎর দেওয়ার হুকুম; ঈদুল আয্‌হার নামাযের পর সক্ষম ব্যক্তির কোরবানী করার হুকুম; ঈদুল ফিৎর এবং ঈদুল আয্‌হা, এই দুই নামাযের কোন নামাযেই আযান বা এক্বামত নাই।

৭। **মাসআলা ঃ** ঈদের দিন ঈদগাহে, মসজিদে বা বাড়ীতে ঈদের নামাযের পূর্বে অন্য কোন নফল নামায পড়া মকরূহ্‌। অবশ্য ঈদের নামাযের পর বাড়ীতে বা মসজিদে নফল পড়া মকরূহ্‌ নহে।

৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকগণ এবং অন্যান্য যাহারা কোন ওযরবশতঃ ঈদের নামায পড়ে নাই তাহাদের জন্যও ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নফল পড়া মকরূহ।

৯। **মাসআলা ঃ** ঈদুল ফিৎরের খুৎবায় ছদক্বায়ে ফিৎর সম্বন্ধে এবং ঈদুল আয্‌হার খুৎবায় কোরবানী ও 'তক্‌বীরে তশরীক' সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে হইবে। নিম্ন তকবীরকে 'তক্‌বীরে তশরীক' বলে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ○

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর এই তকবীর বলা ওয়াজিব; যদি সে ফরয শহরে জমা'আতে পড়া হয়। স্ত্রীলোক ও মুসাফিরের উপর এই তকবীর ওয়াজিব নহে। যদি ইহারা এমন কোন লোকের মুক্তাদী হয়, যাহাদের উপর তক্‌বীর ওয়াজিব, তবে ইহাদের উপরও ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি একা নামাযী এবং স্ত্রী-লোক ও মুসাফির পড়ে, তবে ভাল। কেননা ছাহেবাইনের মতে ইহাদের উপরও ওয়াজিব।

১০। **মাসআলা ঃ** ৯ই যিলহজ্জ (হজ্জের দিন) ফজর হইতে ১৩ই যিলহজ্জ আছর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত নামাযের পর যাহারা জমা'আতে নামায পড়ে তাহাদের সকলের উপর একবার 'তকবীরে তশ্‌রীক' বলা ওয়াজিব।

১১। মাসআলা: এই তকবীর উচ্চ শব্দে বলা ওয়াজিব; স্ত্রীলোক নিঃশব্দে বলিবে।

১২। মাসআলা: নামাযের পর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ এই তকবীর বলিতে হইবে।

১৩। মাসআলা: যদি ইমাম তকবীর বলিতে ভুলিয়া যায়, তবে মুক্তাদীগণ উচ্চ স্বরে তকবীর বলিয়া উঠিবে; ইমামের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা উচিত নহে।

১৪। মাসআলা: ঈদুল আয্‌হার নামাযের পরও তকবীর বলা মতান্তরে ওয়াজিব।

১৫। মাসআলা: উভয় ঈদের নামায সমস্ত শহরের লোকের একত্রে এক জায়গায় পড়াই উত্তম। কিন্তু যদি কয়েক জায়গায় পড়ে, তবুও নামায হইয়া যাইবে। সকলের ঐক্যমতে বিভিন্ন মসজিদে পড়া জায়েয।

১৬। মাসআলা: যদি কেহ একাকী ঈদের নামায না পায়, অথবা নামায পাইয়াছিল কিন্তু কোন কারণবশতঃ একজন লোকের নামায ফাসেদ হইয়া গিয়াছে, তবে একা একা ঈদের নামায বা তাহার ক্বাযা পড়িতে পারিবে না এবং ক্বাযা পড়া ওয়াজিবও হইবে না। কেননা, ঈদের নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য জমা'আত শর্ত। অবশ্য যদি একদল লোকের নামায ছুটিয়া যায় বা ফাসেদ হইয়া যায়, তবে তাহারা (পূর্ববর্তী ইমাম ও মুক্তাদী ছাড়া) অন্য কাহাকেও ইমাম বানাইয়া নামায পড়িবে।

১৭। মাসাআলা: যদি কোন ওযরবশতঃ ১লা শাওয়াল (দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত) ঈদুল ফিৎরের নামায না পড়া হয়, তবে ২রা তারিখেও পড়িতে পারে। তারপর আর পারিবে না। আর ঈদুল আয্‌হার নামায যদি কোন ওযরবশতঃ ১০ই তারিখে না পড়িতে পারে, তবে ১১ই বা ১২ই তারিখ পর্যন্তও পড়িতে পারে।

১৮। মাসআলা: ঈদুল আয্‌হার নামায যদিও বিনা ওযরে ১০ই তারিখে না পড়া মক্‌রূহ্, তবুও যদি কেহ প্রথম দিন না পড়িয়া ২য় বা ৩য় দিনে পড়ে, তবে নামায হইয়া যাইবে। বিনা ওযরে যদি কেহ ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিৎরের নামায না পড়িয়া ২রা শাওয়ালে পড়ে, তবে তাহার নামায আদৌ হইবে না।

ওযর যথাঃ—(১) যদি কোন কারণবশতঃ ইমাম উপস্থিত না হইতে পারে, (২) অনবরত বৃষ্টি হইতে থাকে, (৩) ওয়াক্ত থাকিতে চাঁদ উঠা নির্ধারত না হইয়া থাকে, ওয়াক্ত চলিয়া গেলে তারপর চাঁদ উঠার খবর পাইয়া থাকে। (৪) নামায পড়া হইয়াছে কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় সঠিক ওয়াক্ত জানা যায় নাই, পরে মেঘ সরিয়া গেলে জানা গেল যে, তখন নামাযের ওয়াক্ত ছিল না।

১৯। মাসআলা: ঈদের নামাযে যদি কেহ ইমামের তক্‌বীর বলা শেষ হওয়ার পর নামাযে শরীক হয়, তবে যদি ইমামকে দাঁড়ান অবস্থায় কেরাআতের মধ্যে পায়, তবে নিয়্যত বাঁধিয়া একা একা তক্‌বীর বলিয়া লইবে, আর যদি ইমামকে রুকূর মধ্যে পায়, তবে যদি মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তক্‌বীর বলিয়াও ইমামকে রুকূর মধ্যে পাইবে, তবে দাঁড়ান অবস্থায় নিয়্যত করিয়া তকবীর বলিয়া তারপর রুকূতে যাইবে, আর যদি তকবীর বলিলে রুকূ না পাইবার আশংকা থাকে, তবে নিয়্যত বাঁধিয়া রুকূ'তেই চলিয়া যাইবে, কিন্তু রুকূ'তে রুকূ'র তসবীহ্ না পড়িয়া আগে তকবীর বলিয়া লইবে, তারপর সময় পাইলে রুকূ'র তস্‌বীহ্ পড়িবে। কিন্তু রুকূ'তে তকবীর বলিতে হাত উঠাইবে না। যদি তকবীর শেষ করার পূর্বেই ইমাম রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া ফেলে, তবে মুক্তাদীও দাঁড়াইয়া যাইবে, যে পরিমাণ বাকী থাকে তাহা মাফ।

২০। মাসআলা ঃ ঈদের নামাযে যদি কেহ দ্বিতীয় রাকা'আতে শামিল হয়, তবে ইমাম সালাম ফিরাইলে সে যখন প্রথম রাকা'আত পড়িবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইবে, তখন সে প্রথমে ছানা, তাআওউয, সূরা-কেরাআত পড়িবে, তারপর রুকূ'র পূর্বে তকবীর বলিবে, কেরাআতের পূর্বে তকবীর বলিবে না।

ইমাম যদি দণ্ডায়মান অবস্থায় তকবীর বলা ভুলিয়া যায় এবং রুকূ'র অবস্থায় মনে আসে, তবে রুকূ'র মধ্যেই তকবীর বলিবে। রুকূ ছাড়িয়া দাঁড়াইবে না। কিন্তু যদি রুকূ' ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া তকবীর বলিয়া আবার 'রুকূ' করে, তাহাতেও নামায হইয়া যাইবে—নামায ফাসেদ হইবে না, লোক সংখ্যার আধিক্যের কারণে ছহো সজ্‌দাও করিতে হইবে না।

কা'বা শরীফের ঘরে নামায

১। মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের ঘরের বাহিরে মানুষ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ যে দিকেই থাকুক না কেন, কা'বার দিকেই মুখ করিয়া নামায পড়িবে। কিন্তু যদি কেহ কা'বা শরীফের ঘরের ভিতরে নামায পড়িতে চায়, তবে তাহাও জায়েয আছে। তখন যে দিকে ইচ্ছা হয়, সেই দিকেই মুখ করিয়া নামায পড়িতে পারিবে; তথায় কোন এক দিক নির্দিষ্টরূপে ক্বেব্‌লা হইবে না, তথায় সব দিকেই ক্বেব্‌লা। তথায় যেরূপ নফল নামায পড়া জায়েয, তদ্রূপ ফরয নামায পড়াও জায়েয।

২। মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের ঘরের সীমানাটুকু আকাশ হইতে পাতাল পর্যন্ত সমস্তই ক্বেব্‌লা। কাজেই যদি কেহ কা'বা শরীফের ঘরের চেয়ে উচ্চ স্থানে পাহাড়ে দাঁড়াইয়া নামায পড়ে, তবে সকলের মতেই নামায দুরুস্ত হইবে। কিন্তু তাহারও ঐ দিকেই মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। (কা'বা শরীফের ছাদের উপর নামায পড়া বে-আদবী এবং মকরূহ্। কেননা, রসূল (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।)

৩। মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের ভিতরে একা, কিংবা জমা'আতে নামায পড়াও জায়েয, তথায় ইমাম মুক্তাদী উভয়ের মুখ একদিকে হওয়া শর্ত নহে। কেননা, সেখানে সব দিকেই ক্বেব্‌লা। অবশ্য একটি শর্ত এই যে, মুক্তাদী যেন ইমামের আগে বাড়িয়া না দাঁড়ায়, যদি মুক্তাদীর মুখ ইমামের মুখের দিকে হয়, তবুও দুরুস্ত আছে। কারণ, এমাতবস্থায় মোক্তাদীকে ইমামের আগে বলা যায় না, উভয়ের মুখ এক দিকে হওয়ার পর যদি মুক্তাদী সম্মুখে বাড়িয়া যায়, তবে আগে বলা যাইবে, কিন্তু এই মুখোমুখী অবস্থায় নামায মকরূহ্ হইবে, কেননা, কোন লোকের মুখের দিক হইয়া নামায পড়া মকরূহ্। মাঝখানে কোন জিনিসের আড় বা পরদা থাকিলে মকরূহ্ হইবে না।

৪। মাসআলা ঃ ইমাম যদি কা'বা শরীফের ভিতরে দাঁড়ায় এবং মুক্তাদীগণ বাহিরে চারি পাশে গোল হইয়া দাঁড়ায়, তবুও নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু ইমাম যদি একা ভিতরে দাঁড়ায় এবং সঙ্গে কোন মুক্তাদী না থাকে, তবে নামায মকরূহ্ হইবে যেহেতু কা'বা শরীফের ভিতরের জমিন বাহিরের জমিন হইতে উচ্চ, এমতাবস্থায় ইমামের স্থান মুক্তাদী হইতে এক মানুষ পরিমাণ উঁচু হইবে। তাই মকরূহ্ হইবে।

৫। মাসআলা ঃ যদি মুক্তাদী ভিতরে থাকে, আর ইমাম বাহিরে, তবুও নামায দুরুস্ত হইবে, অবশ্য যদি মুক্তাদী ইমামের আগে না হয়।

৬। মাসআলা ঃ আর যদি সকলেই বাহিরে দাঁড়ায়। এক দিকে ইমাম ও চারি দিকে মুক্তাদী দাঁড়ায় সেখানে এইরূপ নামায পড়ার নিয়ম আছে এবং তাহা দুরুস্ত আছে। কিন্তু শর্ত এই যে,

যে দিকে ইমাম দাঁড়াইয়াছে সে দিকে কোন মুক্তাদী ইমাম অপেক্ষা খানায়ে কা'বার নিকটবর্তী যেন না হয়। কেননা, এমতাবস্থায় ইমামের আগে বলিয়া গণ্য হইবে যাহা এক্তেদার জন্য নিষিদ্ধ। অবশ্য যদি অন্য দিকে মুক্তাদী ইমাম অপেক্ষা খানায়ে কা'বার অধিক নিকটবর্তী হয়, তবে কোন ক্ষতি নাই। নিম্নে একটি নক্শা দেওয়া গেল—

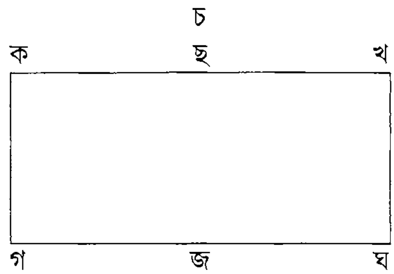

ক, খ, গ, ঘ কা'বা শরীফ। চ ইমাম ছাহেব, তিনি কা'বা হইতে দুই গজ দূরে দাঁড়াইয়াছেন এবং ছ ও জ মুক্তাদী, তাহারা কা'বার এক এক গজ দূরে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ছ চ এর দিকে দাঁড়াইয়াছে, জ অপর দিকে দাঁড়াইয়াছে, ছ এর নামায হইবে না, জ এর নামায হইবে।

মৃত্যুর বয়ান[১]

১। মাসআলা ঃ যাহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে তাহার পা ক্বেব্‌লা দিকে করিয়া চিৎ করিয়া শোয়াইবে এবং মাথা উঁচু করিয়া দিবে যেন মুখ ক্বেব্‌লার দিকে হইয়া যায়। তাহার কাছে বসিয়া জোরে জোরে কলেমা পড়িবে। মৃত্যুর সময় রোগীর বড়ই কষ্ট হয়, কাজেই তাহাকে পড়িবার জন্য জবরদস্তি করিবে না। কারণ, হয়ত তাহার মুখ দিয়া কোন খারাব কথা বাহির হইতে পারে। পার্শ্ববর্তী লোকের পড়া শুনিলে আশা করা যায় যে, সেও পড়িয়া লইবে।

২। মাসআলা ঃ রুগ্ন ব্যক্তি একবার কলেমা পড়িয়া লইলেই চুপ হইয়া থাকিবে। এ চেষ্টা করিবে না, যেন সর্বদা কলেমা জারি থাকে এবং কলেমা পড়িতে পড়িতেই দম বাহির হয়। কেননা, মকছুদ শুধু এতটুকু—যেন দুনিয়ার মধ্যে তাহার সর্বশেষ কথা কলেমা হয়; তাহার পর যেন দুনিয়ার আর কোন কথা না হয়। কলেমা পড়িতে পড়িতে দম বাহির হওয়া যরূরী নহে। কলেমা পড়ার পরও আবার দুনিয়ার কোন কথা বলিলে পুনরায় কলেমা পড়িতে থাকিবে। এখন একবার কলেমা পড়িলেই আবার চুপ হইয়া থাকিবে।

টিকা

১ সকলেই সব সময় বিশেষতঃ রাতে শয়নকালে এবং রুগ্নাবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবে। কাহারও দেনা-পাওনা থাকিলে তাহা পরিশোধ করিবে, কাহারও আমানত থাকিলে তাহা ফেরত দিবে, কাহারও কোন হক নষ্ট করিয়া থাকিলে তাহা মা'ফ চাহিয়া লইবে। নামায, রোযা; হজ্জ, যাকাৎ ছুটিয়া গিয়া থাকিলে তাহা আদায় করিবে। নিজের সম্পত্তির কোন অংশ কোন ছদকায়ে জারিয়ার জন্য অছীয়ত করিবে। সারা জীবনের গোনাহ্‌র জন্য মা'ফ চাহিতে থাকিবে এবং তওবা এস্তেগফার ও এই কলেমা পড়িতে থাকিবে رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا 'রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়া বিল্ ইসলামি দ্বীনাওঁ ওয়া বি মুহাম্মাদিন্ নাবিয়্যান্।'

অর্থ—আল্লাহ্‌কে রব্ব্ (পালনকর্তা) ইসলামকে ধর্ম এবং মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছি।

৩। **মাসআলা ঃ** যখন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, জল্‌দী জল্‌দী আট্‌কিয়া আট্‌কিয়া চলিতে থাকে, পা শিথিল হইয়া যায়, নাক বাঁকা হইয়া যায় এবং কানপট্টি বসিয়া যায় তখন জানিবে যে, মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন জোরে জোরে কলেমা পড়িবে।

৪। **মাসআলা ঃ** এইরূপ অবস্থায় নিকটে বসিয়া কেহ সূরা-ইয়াসীন পড়িলে মৃত্যুর কষ্ট কম হয়। অতএব, এইরূপ অবস্থায় সূরা-ইয়াসীন নিজে পড়িবে বা অন্যের দ্বারা পড়াইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** ঐ সময় এমন কোন কথা বলিও না, যাহাতে তাহার দিল দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, কেননা, এখন দুনিয়া হইতে পৃথক হওয়ার এবং আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময়। এখন এমন কাজ কর এবং এমন কথা বল, যদ্দ্বারা দুনিয়া হইতে দিল উঠিয়া আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়া যায়, মরণোন্মুখ ব্যক্তির কল্যাণ ইহাতেই নিহিত। এসময় ছেলেপেলেকে সম্মুখে আনা কিংবা তাহার অন্য কোন মহব্বতের বস্তুকে কাছে আনা ও এইরূপ কথা বলা, যদ্দ্বারা তাহার মন এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাহার মহব্বত অন্তরে বসিয়া যায়, ইহা বড়ই অন্যায় কথা। দুনিয়ার মহব্বত লইয়া বিদায় হইলে (নাউযুবিল্লাহ্‌) তাহার অপমৃত্যু হইল।

৬। **মাসআলা ঃ** প্রাণ বাহির হইবার সময় যদি তাহার মুখ দিয়া কুফরী বা খারাব কথা বাহির হয়, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না, তাহা আলোচনাও করিবে না ; বরং মনে করিবে, হয়ত বেহুঁশীর সহিত বলিয়াছে। মৃত্যু-যন্ত্রণার কারণে বেহুঁশ হইয়াছে এবং জ্ঞানহারা অবস্থায় যাহাকিছু ঘটিবে সব মাফ। আল্লাহ্‌র দরবারে তাহার মাগ্‌ফেরাতের জন্য দো'আ করিতে থাক।

৭। **মাসআলা ঃ** যখন দম বাহির হইয়া যায়, তখন হাত পা সোজা করিয়া দিবে, চক্ষু বন্ধ করিয়া দিবে, মুখ যাহাতে হা করিয়া না থাকিতে পারে সেজন্য চিবুক এবং মাথার সঙ্গে একখানা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিবে। এইরূপে পা যাহাতে ফাঁক হইয়া যাইতে না পারে সেজন্য দুই পা সোজাভাবে একত্র করিয়া দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী কিছুর দ্বারা বাঁধিয়া দিবে, সর্বশরীর একখানা চাদর দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। যথাসম্ভব জল্‌দী গোসল এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করিবে।

৮। **মাসআলা ঃ** মুখ, চোখ বন্ধ করিবার সময় পড়িবে— بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ○

৯। **মাসআলা ঃ** প্রাণ বাহির হইয়া গেলে তাহার নিকট লোবান বা আগরবাতি জ্বালাইয়া দিবে এবং হায়েয-নেফাসওয়ালী আওরত বা যাহার উপর গোসল ওয়াজিব হইয়াছে এমন লোক তাহার নিকট থাকিবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** গোসল দেওয়ার পূর্বে মৃতের নিকট কোরআন শরীফ পড়া দুরুস্ত নহে। (**মাসআলা ঃ** মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম হওয়া, চক্ষু দিয়া পানি বাহির হওয়া, নাকের ছিদ্র প্রশস্ত হওয়া ইত্যাদি ভাল আলামত। আর কলেমা বা যিক্‌রের সহিত দম বাহির হওয়া আরও উত্তম। —যমীমা বেঃ জেওর ২য় খন্ড)

মাইয়্যেতের গোসল

১। **মাসআলা ঃ** মৃত্যু হওয়া মাত্র সকলকে সংবাদ দিয়া কবর ও কাফনের বন্দোবস্তের জন্য লোক পাঠাইবে এবং গোসল দেওয়ার বন্দোবস্ত করিবে। একখানা চওড়া তক্তা অথবা তক্তপোষের চতুর্দিকে ৩, ৫ বা ৭ বার লোবান অথবা আগর বাতি জ্বালাইয়া মোর্দাকে উহার উপর শোয়াইবে এবং তাহার পরিধানের সব কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া শুধু নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত একখানা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে।

২। **মাসআলা ঃ** যদি গোসল দেওয়ার জন্য কোন পৃথক স্থান থাকে, যাহাতে পানি অন্য দিকে বহিয়া যাইতে পারে, তবে ভাল কথা, নচেৎ কাঠ বা চৌকির নীচে গর্ত খুঁড়িবে যেন, পানি সেখানে জমা হয়। যদি গর্ত না খোঁড়ে এবং সমস্ত পানি ঘরে ছড়াইয়া পড়ে তবুও কোন গোনাহ্ হইবে না। উদ্দেশ্য শুধু যাতায়াতে যেন কাহারও কষ্ট না হয় এবং যেন পড়িয়া না যায়।

৩। **মাসআলা ঃ** মোর্দাকে গোসল দেওয়ার নিময় এই যে, প্রথমে তাহাকে এস্তেঞ্জা করাইয়া দিবে। কিন্তু খরবদার! তাহার কাপড়ের নীচের জায়গা স্পর্শ বা দর্শন করিবে না। হাতে কিছু নেক্ড়া পেঁচাইয়া লইয়া কাপড়ের নীচে হাত প্রবেশ করাইয়া, প্রথমে ঢিলা দ্বারা তারপর পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করাইবে। তারপর ওযূর জায়গাসমূহ ওযূর তরতীব অনুসারে ধোয়াইবে; কিন্তু কুল্লি করাইবার, নাকে পানি দিবার এবং কব্জা পর্যন্ত হাত ধোয়াইবার আবশ্যক নাই। প্রথমে মুখ ধোয়াইবে, তারপর প্রথমে ডান হাত, তারপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়াইবে। তারপর মাথা মছেহ করাইবে। তারপর প্রথমে ডান পা তারপর বাম পা তিন তিন বার ধোয়াইবে। যদি কিছু তূলা বা নেক্ড়া ভিজাইয়া তিনবার দাঁতের উপর দিয়া এবং নাকের ভিতর দিয়া হাত ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাও জায়েয। কিন্তু যদি গোসলের হাজতের অবস্থায় অথবা হায়েয-নেফাসের অবস্থায় মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে এইরূপে মুখে এবং নাকে পানি পৌঁছান যরূরী। গোসল দেওয়াইবার পূর্বে মোর্দার নাকে এবং কানে কিছু তূলা ভরিয়া দিবে যাহাতে পানি ঢুকিতে না পারে। এইরূপে ওযূ করাইবার পর মোর্দার মাথা সাবান, খইল অথবা অন্য কোন জিনিস দ্বারা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। তারপর মোর্দাকে বাম কাতে শোয়াইয়া তাহার ডান পার্শ্বের শরীরের উপর; মাথা হইতে পা পর্যন্ত বরৈ (কুল) পাতাসহ গরম পানি (দ্বারা তিন বা পাঁচবার) ঢালিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইবে। তারপর আবার ডান কাতে শোয়াইয়া বাম পার্শ্বেও এরূপ পানি দ্বারা তিন কি পাঁচবার ধোয়াইবে। এইরূপে গোসল হইয়া গেলে গোসলদাতা তাহার নিজের শরীরের সঙ্গে টেক লাগাইয়া মোর্দাকে কিঞ্চিৎ বসাইবে এবং আস্তে আস্তে তাহার পেটের উপর মালিশ করিবে। ইহাতে পেট হইতে যদি কিছু ময়লা বাহির হয়, তবে কুলুখ করাইয়া শুধু ময়লাটা ধুইয়া দিবে। এই ময়লা বাহির হওয়াতে মোর্দার ওযূ বা গোসল টুটিবে না। কাজেই ওযূ বা গোসল দোহ্রাইতে হইবে না, শুধু ময়লাটা ধুইয়া দিবে। তারপর আবার মোর্দাকে বামকাতে শোয়াইয়া কর্পূরের পানি তাহার সর্বশরীরে মাথা হইতে পা পর্যন্ত তিনবার ঢালিবে। তারপর শুক্না কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর ভাল মতে মুছিয়া দিয়া কাফন পরাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** বরৈর পাতা অভাবে শুধু পানি কিছু গরম করিয়া তাহা দ্বারা ৩ বার ধুইবে। খুব বেশী গরম পানি দ্বারা গোসল দিবে না। উপরে গোসলের যে নিয়ম বলা হইয়াছে উহাই সুন্নত তরীকা। যদি তিনবার না ধুইয়া একবার মাত্র সর্ব শরীর পানি দ্বারা ধুইয়া দেয়, তাহাতেও ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** মোর্দাকে কাফনের উপর রাখিবার সময় স্ত্রীলোকের মাথায় এবং পুরুষের মাথায় ও দাড়িতে আতর লাগাইয়া দিবে এবং কপালে, নাকে, উভয় হাতের তালুতে উভয় হাঁটুতে এবং উভয় পায়ে—অর্থাৎ সজ্দার সকল জায়গায় কর্পূর লাগাইয়া দিবে। কেহ কেহ কাফনে আতর লাগায় বা তূলা লাগাইয়া কানে দেয়, তাহা করিবে না। ইহা মূর্খতা; শরীঅতে যতটুকু আছে তাহার অতিরিক্ত করিবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** মোর্দার চুল আঁচড়াইবে না, নখ, চুল ইত্যাদি কাটিবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** পুরুষের গোসল দেওয়ার জন্য কোন পুরুষ পাওয়া না গেলে, তাহার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মেয়েলোক মাহ্‌রাম হইলেও তাহাকে গোসল দিতে পারিবে না। তাহার স্ত্রী না থাকিলে তায়াম্মুম করাইতে হইবে। কিন্তু শরীরে হাত লাগাইবে না। তায়াম্মুম করাইবার সময় হাতে দস্তানা (বা কাপড়) পেঁচাইয়া লইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে এবং কাফন পরাইতে পারে, ইহা জায়েয। কিন্তু মৃত্যু স্ত্রীকে স্বামী স্পর্শ করিতে ও হাত লাগাইতে পারিবে না; কিন্তু দেখা বা কাপড়ের উপর দিয়া হাত লাগান দুরুস্ত আছে।

৯। **মাসআলা ঃ** যে মেয়েলোক হায়েয বা নেফাসের অবস্থায় আছে তাহার জন্য মোর্দাকে গোসল দেওয়া মকরূহ্‌ এবং নিষেধ।

১০। **মাসআলা ঃ** যে সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী আত্মীয়, তাহারই গোসল দেওয়া উচিত, কিন্তু যদি এরূপ লোক গোসল না দিতে পারে, তবে যথাসাধ্য কোন দীনদার পরহেযগার লোকেই গোসল দেওয়া ভাল।

১১। **মাসআলা ঃ** গোসল দিবার সময় যদি দূষণীয় কিছু দৃষ্ট হয় বা খোদা না করুন মোর্দার চেহারা কাল বা বিকৃত দেখা যায়, তবে খবরদার! কস্মিনকালেও কাহারও নিকট বলিবে না এবং আলোচনাও করিবে না; ইহা না-জায়েয। অবশ্য ঐ মৃত ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে শরীঅত বিরুদ্ধ কাজ—যথা, নাচ বা গান-বাদ্য কিংবা ব্যভিচার করিত (অথবা সুদ, ঘুষ খাইত বা যুলুম করিত,) তবে অন্য লোকে যাহাতে এইসব গোনাহ্‌ হইতে বাঁচিয়া থাকে, তদুদ্দেশ্যে উহা প্রকাশ করা জায়েয আছে।

বেহেশ্‌তী গওহর হইতে

১। **মাসআলা ঃ** পানিতে ডুবিয়া কেহ মারা গেলে তাহাকে পানি হইতে উঠাইবার পর গোসল দেওয়া ফরয। মৃত্যুর পর পানিতে শরীর ধোয়া হইয়াছে বলিয়া গোসল মা'ফ হইবে না। কেননা, গোসল দেওয়া জীবিত লোকের উপর ফরয; তাহাদের ফরয ইহাতে আদায় হয় নাই। অবশ্য পানি হইতে উঠাইবার সময় যদি গোসলের নিয়্যত করিয়া পানিতে নাড়াচাড়া দিয়া উঠায়, তবে তাহাতে গোসল হইয়া যাইবে। এইরূপে যদি কোন মৃতের উপর বৃষ্টির পানিতে বা অন্য কোন উপায়ে তাহার শরীর ধুইয়া যায়, তবুও তাহাকে গোসল দেওয়া জীবিত লোকদের উপর ফরয হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** যদি কোথাও কোন মৃত লোকের শুধু মাথা (বা হাত) পাওয়া যায়, তবে উহাকে গোসল দিতে হইবে না, অমনিই দাফন করিয়া রাখিবে। আর যদি শরীরের অর্ধেকের বেশী পাওয়া যায়—মাথাসহ হউক বা মাথা ছাড়া হউক কিংবা মাথাসহ অর্ধেক পাওয়া যায়—তবুও গোসল দিতে হইবে। (জানাযাও পড়িতে হইবে, নতুবা নহে।) আর যদি কম অর্ধেক পাওয়া যায়, মাথাসহ হউক বা মাথা ছাড়া হউক, তবে গোসলের দরকার হইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কোথাও কোন মৃত লোক মুসলমান, না অমুসলমান, চিনা না যায়, তবে (মুসলমানের কোন আলামত পাওয়া গেলে তাহাকে গোসল দিতে হইবে এবং জানাযা পড়িতে হইবে। একান্ত যদি কোনই আলামত না পাওয়া যায়, তবুও) দারুল ইসলামে ঐ লোক পাওয়া গেলে তাহাকে গোসল দিতে হইবে এবং নামায পড়িতে হইবে; (দারুল ইসলাম না হইলে এবং মুসলমানের কোন চিহ্নও পাওয়া না গেলে, গোসল দিতে বা জানাযা পড়িতে হইবে না।)

৪। মাসআলাঃ যদি মুসলমান এবং কাফেরদের লাশ একত্রে মিশিয়া যায় এবং মুসলমান অমুসলমান চিনিতে পারা যায়, তবে শুধু মুসলমানদের লাশ বাছিয়া তাহাদের গোসল দিতে হইবে, আর চিনা না গেলে সকলকে গোসল দিতে হইবে।

৫। মাসআলাঃ যদি কোন মুসলমানের কোন কাফির আত্মীয় মারা যায়, তবে তাহাকে তাহার স্বধর্মীদের হাওলা করিয়া দিবে এবং যদি এই মুসলমান ছাড়া তাহার ধর্মের কেহ তাহার কাফন-দাফন করিবার না থাকে, বা নিতে না চায় তবে এই মুসলমানই অগত্যা তাহাকে গোসল দিবে। কিন্তু সুন্নত তরীকা অনুযায়ী গোসল দিবে না, অর্থাৎ, ওযূ করাইবে না, মাথাও পরিষ্কার করিবে না, কাফুর বা খোশ্‌বু লাগাইবে না, নাপাক বস্তু ধোয়ার ন্যায় ধুইবে, কাফিরকে সাতবার ধুইলেও সে পাক হইবে না। যদি কেহ তাহাকে লইয়া নামায পড়ে, তবে তাহার নামায দুরুস্ত হইবে না।

৬। মাসআলাঃ মুসলিম রাজ্যের রাজদ্রোহী বা ডাকাত যদি যুদ্ধের সময় মারা যায় তাহাকে গোসল দিবে না।

৭। মাসআলাঃ মৃত মোর্তাদ (ইসলামত্যাগী)কে গোসল দিবে না এবং যে ধর্মে সে গিয়াছে সে ধর্মাবলম্বীরা তাহার লাশ চাহিলে তাহাদিগকেও দিবে না।

৮। মাসআলাঃ পানির অভাবে যদি কোন মৃতকে তায়াম্মুম করান হয় এবং পরে পানি পাওয়া যায়, তবে পানি দিয়া তাহাকে গোসল দিতে হইবে।

(**মাসআলাঃ** মৃত ব্যক্তিকে যে গোসল দিবে তাহার আগে ওযূ এবং পরে গোসল করা মোস্তাহাব মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়। গোসল দেওয়ার মজুরী লওয়া জায়েয নহে, ছাওয়াবের নিয়্যতে দেওয়া উচিত।)

কাফন

১। মাসআলাঃ (পুরুষের জন্য তিনখানা কাপড় দেওয়া সুন্নত; যথা-ইযার, কোর্তা এবং চাদর।) স্ত্রীলোকের জন্য পাঁচখানা কাপড় দেওয়া সুন্নত; যথা, কোর্তা, ইযার, ছেরবন্দ, চাদর এবং সীনাবন্দ। ইযার মাথা হইতে পা পর্যন্ত, চাদর উহা হইতে হাতখানেক বড় এবং কোর্তা গলা হইতে পা পর্যন্ত হইবে; কিন্তু কোর্তার কল্লি বা আস্তিন হইবে না। (শুধু মাঝখান দিয়া কিছু ফাড়িয়া মাথা ঢুকাইয়া দিতে হইবে।) ছেরবন্দ (১২ গিরা চওড়া এবং) তিন হাত লম্বা এবং সীনাবন্দ চওড়ায় বগলের নীচ হইতে রান পর্যন্ত হইবে, লম্বায় এতটুকু হইতে হইবে যেন বাঁধা যায়।

২। মাসআলাঃ স্ত্রীলোকের কাফন যদি পাঁচখানা না দিয়া ইযার, চাদর এবং ছেরবন্দ মাত্র এই তিনখানা কাপড় দেয়, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে, ইহাই যথেষ্ট। তিন কাপড়ের চেয়ে কম দেওয়া মকরূহ্। আর অক্ষম হইলে তিন কাপড়ের চেয়েও কম দেওয়া জায়েয আছে।

৩। মাসআলাঃ সীনাবন্দ যদি ছাতি হইতে নাভি পর্যন্ত দেয়, তবে তাহাও জায়েয আছে, কিন্তু রান (হাঁটুর উপর) পর্যন্ত দেওয়া উত্তম।

৪। মাসআলাঃ কাফন পরাইবার পূর্বে তাহাতে তিনবার কিংবা পাঁচবার লোবান বা আগর বাতির ধুনি দেওয়া উচিত।

৫। মাসআলাঃ কাফন পরাইবার নিয়মঃ (খাটলির উপর) সর্ব প্রথমে (নীচে) চাদর, তাহার উপর ইযার, তাহার উপর কোর্তার নীচের পাট বিছাইবে, উপরের পাট গোছাইয়া মাথার কাছে রাখিয়া দিবে। তারপর মোর্দাকে গোসলের পানি মুছাইয়া একখানা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া আস্তে

আনিয়া কাফনের উপর চিৎ করিয়া শোয়াইবে এবং কোর্তা পরাইয়া দিবে। তারপর যদি পুরুষ হয়, তবে শুধু ইযার এবং চাদর লেপ্‌টাইয়া দিবে। আর যদি মেয়েলোক হয়, তবে তাহার চুলগুলি দুই ভাগ করিয়া ডানে বামে কোর্তার উপর দিয়া বুকের উপর রাখিয়া দিবে এবং ছেরবন্দ দ্বারা মাথা ঢাকিয়া ঐ দুই ভাগ চুলের উপর দুই দিকে ছেরবন্দের কাপড়খানা রাখিয়া দিবে। এই কাপড়ে গিরাও দিবে না পেঁচাইবেও না। তারপর ইযারের বাম পার্শ্ব (মোর্দার বাম পার্শ্বে) আগে উঠাইবে এবং ডান পার্শ্বে পরে উঠাইয়া তাহার উপর রাখিবে, তারপর সীনাবন্দ দ্বারা সীনা পেঁচাইয়া দিবে, তারপর চাদর পেঁচাইয়া দিবে—বাম পার্শ্ব নীচে এবং ডান পার্শ্ব উপরে থাকিবে। তারপর একটা সূতা দ্বারা কাফনের পায়ের দিক একটা সূতা দ্বারা মাথার দিক বাঁধিয়া দিবে এবং কোন কিছুর দ্বারা কোমরের দিকে এক বাঁধ দিয়া দিলে ভাল হয়— যাহাতে কবরস্থানে লইয়া যাইবার সময় খুলিয়া না যায়—(কবরে রাখিয়া এই সব বাঁধ খুলিয়া দিবে।)

৬। মাসআলাঃ সীনাবন্দ যদি ছেরবন্দের পর ইযার পেঁচাইবার আগে বাঁধিয়া দেয় তাহাও জায়েয আছে। (কোর্তার উপর) বা সব কাফনের উপর দেওয়াও জায়েয।

৭। মাসআলাঃ (মোর্দা মেয়েলোক হইলে) মেয়ে মহলে এই পর্যন্তই কাজ হইবে। তারপর পুরুষদিগকে ডাকিয়া তাহাদের হাওয়ালা করিয়া দিবে। তাহারা জানাযা পড়িয়া দাফন করিবে।

৮। মাসআলাঃ যদি মেয়েলোকেরাই জানাযার নামায পড়িয়া দেয়, তবুও জায়েয হইবে। (পুরুষের অভাবে মেয়েলোকেরাই জানাযার নামায পড়িবে এবং দাফনও করিবে।)

৯। মাসআলাঃ কাফনের মধ্যে বা কবরের মধ্যে আ'হাদনামা, পীরের শাজ্‌রা অথবা অন্য কোন দো'আ কালাম লিখিয়া রাখা বা কাফনের উপর অথবা সীনার উপর কালি বা কর্পূর দ্বারা কোন দো'আ বা কলেমা-কালাম লিখিয়া দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য (খালি আঙ্গুলে কলেমা বা আল্লাহ্‌র নাম লিখিয়া দেওয়া বা) কা'বা শরীফের গেলাফ বা পীরের রুমাল ইত্যাদি বরকতের জন্য সঙ্গে দেওয়া জায়েয আছে।

১০। মাসআলাঃ ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই যে শিশুর মৃত্যু হইয়াছে তাহার নাম রাখিবে, উপরোক্ত নিয়মে গোসল, কাফন এবং জানাযার নামায পড়িয়া দাফন করিবে।

১১। মাসআলাঃ যে শিশু মৃত অবস্থায় প্রসব হইয়াছে, প্রসবকালে জীবিত হওয়ার কোন আলামত পাওয়া যায় নাই, তাহাকেও গোসল দিতে হইবে এবং তাহার নামও রাখিতে হইবে। কিন্তু নিয়ম মত কাফন দেওয়া (ও জানাযা পড়ার) আশ্যক নাই। একখানা কাপড় লেপ্টাইয়া কবরে মাটি দিয়া রাখিলেই চলিবে।

(শিশুর কাফন)

১২। মাসআলাঃ অকালে গর্ভপাত হইলে যদি সন্তানের হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রকাশ না পায়, তবে গোসল ও নিয়মিত কাফন দিবে না। শুধু একখানা কাপড়ে লেপ্টাইয়া একটি গর্ত খুড়িয়া মাটির নিচে পুতিয়া রাখিবে। আর যদি হাত, পা, নাক ইত্যাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়, তবে উহাকে মোর্দা বাচ্চা মনে করিতে হইবে এবং নাম রাখিতে হইবে, গোসল দিতে হইবে; কিন্তু জানাযার নামায পড়িতে বা নিয়মিত কাফন দিতে হইবে না, শুধু একখানা কাপড়ে লেপ্টাইয়া দাফন করিয়া রাখিতে হইবে।

১৩। মাসআলাঃ যে সময় সন্তানের মাথা বাহির হইয়াছে সে সময় জীবিত থাকার আলামত পাওয়া গেলেও যদি তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়, তবে ঐ বাচ্চাকে মোর্দাই পয়দা হইয়াছে মনে করিতে হইবে। অবশ্য যদি বুক পর্যন্ত বাহির হইয়া থাকে, বা উল্টা বাহির হইলে নাভি পর্যন্ত বাহির হইয়া থাকে, তবে উহাকে জীবিত পয়দা হইয়াছে মনে করিবে।

১৪। মাসআলাঃ মেয়ে যদি ছোট হয় কিন্তু বালেগা হওয়ার কাছাকাছি হয়, তবে তাহাকে বয়স্কা আওরতের নিয়মে (পাঁচ কাপড়ে) কাফন দেওয়া সুন্নত, তিন কাপড়ে দিলেও চলিবে। বয়স্কা এবং কুমারী ও ছোট মেয়েদের জন্য একই হুকুম। কিন্তু বয়স্কাদের জন্য ইহা তাকীদী হুকুম, যদি কিছু ছোট হয়, তবে তাহাকেও ঐ নিয়মেই কাফন দেওয়া উত্তম।

১৫। মাসআলাঃ যদি অত্যন্ত ছোট মেয়ে হয় যে, এখনও বালেগা হইতে অনেক দেরী, তাহার জন্যও আওরতের নিয়মে পাঁচ কাপড়ে কাফন দিবে। যদি শুধু ইযার ও চাদর এই দুই কাপড়ে কাফন দেয়, তাহাও জায়েয আছে।

১৬। মাসআলাঃ ছোট ছেলেকে মেয়েলোকেরাও উপরোক্ত নিয়মে গোসল দিতে এবং কাফন পরাইতে পারে। অবশ্য কাপড় পুরুষের নিয়মে দিতে হইবে অর্থাৎ এক চাদর, এক ইযার ও এক কোর্তা।

১৭। মাসআলাঃ পুরুষের কাফনে যদি শুধু ইযার ও চাদর এই দুইখানা কাপড় দেয়, তাহাও দুরুস্ত আছে, দুইখানার চেয়ে কম দেওয়া মকরূহ্; অক্ষম হইলে দুইখানার চেয়ে কমও মকরূহ্ নহে।

১৮। মাসআলাঃ জানাযার উপর যে চাদর ঢাকিবার জন্য দেওয়া হয়, তাহা কাফনের মধ্যে শামিল নহে।

১৯। মাসআলাঃ যে শহরে মৃত্যু হয়, সেইখানেই কাফন-দাফন করা ভাল, অন্যত্র লইয়া যাওয়া ভাল নহে। (অবশ্য প্রয়োজন হইলে দুই এক মাইল দূরে নেওয়ায় দোষ নাই।)

বেঃ গওহর হইতে

১। মাসআলাঃ যদি কোথায়ও কোন মৃত লোকের কোন অঙ্গ যথা,—মাথা, হাত বা পা, অথবা মাথা ছাড়া শরীরের অর্ধেক পাওয়া যায়, তবে তাহা শুধু একখানা কাপড়ে লেপ্টাইয়া দিলেই চলিবে। আর যদি মাথাসহ অর্ধেক অথবা মাথা ছাড়া বেশী অর্ধেক পাওয়া যায়, তবে নিয়ম মত কাফন দিতে হইবে।

২। মাসআলাঃ যদি কোথাও কবর খুড়িয়া মোর্দার লাশ পাওয়া যায়, যদি লাশ না পচিয়া থাকে আর তাহার শরীরে কাফন না থাকে, তবে তাহাকে সুন্নত নিয়ম মত কাফন পরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু যদি শরীর পচিয়া গিয়া থাকে, তবে নিয়ম মত কাফন পরাইয়া দেওয়ার দরকার নাই; শুধু একখানা কাপড়ে লেপ্টাইয়া মাটি দিয়া দিলেই চলিবে।

(**মাসআলাঃ** জীবিতাবস্থায় যে যে মূল্যের কাপড় পরে, মৃতাবস্থায়ও তাহাকে সেইরূপ মূল্যের কাপড় দেওয়া ভাল। যদি কাফনের কাপড় নূতন না হয়, পুরাতন পাক ছাফ হয় তাহাতে কোনই দোষ নাই। গোসল দিবার জন্য যেসব পাক ছাফ লোটা, ঘড়া ব্যবহৃত হয়, তাহাও পুরাতন হইলে কোনই দোষ নাই।)

(**মাসআলা ঃ** পুরুষের জানাযা চাদর দিয়া ঢাকা যরূরী নহে, কিন্তু স্ত্রীলোকের জানাযার উপর পর্দা করা যরূরী। তবে এই চাদর কাফনের মধ্যে গণ্য নহে। কাজেই এতীমের মাল দ্বারা ইহা খরিদ করা যাইবে না, অন্য কেহ খরিদ করিয়া দিতে পারে বা পুরাতন চাদর ব্যবহার করিতে পারে।) —অনুবাদক

জানাযার নামায

জানাযার নামায বাস্তবে আল্লাহ্ পাকের নিকট মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করা। (জীবিত লোকদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াছে তাহাদের উপর জানাযার নামায ফরযে কেফায়া।)

১। **মাসআলা ঃ** অন্যান্য নামায ওয়াজিব হওয়ার যে সব শর্ত উপরে বর্ণিত হইয়াছে জানাযার নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তও তাহাই। অবশ্য ইহাতে একটি শর্ত বেশী আছে তাহা এই যে, উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর খবর জানা থাকা চাই, এই খবর যাহার জানা নাই সে অক্ষম। জানাযার নামায তাহার উপর যরূরী নহে।

২। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য দুই প্রকারের শর্ত আছে। এক প্রকারের শর্ত মুছল্লির অন্যান্য নামাযের মত, যথা—জায়গা পাক, জামা পাক, সতর ঢাকা, ক্বেব্‌লা রোখ হওয়া, নিয়্যত করা। অবশ্য জানাযার নামাযের জন্য ওয়াক্তের শর্ত নাই এবং জানাযার জমা'আত ছুটিয়া যাইবার ভয়ে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়া জায়েয আছে। অন্যান্য জমা'আত বা ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়ার ভয়ে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়া জায়েয নাই।

৩। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের মুছল্লী যে স্থানে দাঁড়াইবে সেই স্থান পাক না হইলে নামায ছহীহ্ হইবে না।

অতএব, যদি কেহ জুতা পায়ে দিয়া জানাযার নামায পড়ে, তবে জুতার উপর ও তলা এবং জুতার নীচের জায়গা পাক হইলে নামায হইবে, নতুবা নহে। আর যদি জুতা পা হইতে খুলিয়া জুতার উপর দাঁড়াইয়া জানাযার নামায পড়ে, তবে জুতার উপর এবং তলা পাক হওয়া চাই (নীচের জায়গা পাক না হইলেও চলিবে) অধিকাংশ লোক এদিকে খেয়াল রাখে না, কাজেই নামায হয় না।

জানাযার নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় প্রকারের শর্ত মাইয়্যেত সম্পর্কে ছয়টি—(১) মাইয়্যেত মুসলমান হওয়া। মাইয়্যেত কাফির বা মুরতাদ হইলে নামায জায়েয নহে। মুসলমান যদি ফাসেক বা বেদ'আতীও হয়, তবুও নামায জায়েয হইবে; কিন্তু মুসলমান বাদশাহ্‌র বিদ্রোহী বা ডাকাত যদি বিদ্রোহের বা ডাকাতির অবস্থায় মারা যায় তবে তাহাদের জানাযা পড়া যাইবে না; যুদ্ধের পরে বা স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা গেলে জানাযা পড়া যাইবে। এইরূপে যদি কোন দুরাচার তাহার পিতা বা মাতাকে হত্যা করে, এবং ইহার সাজা স্বরূপ সে মারা যায়, তবে শাসনের জন্য তাহারও জানাযা পড়া যাইবে না। ইচ্ছাপূর্বক যে আত্মহত্যা করে তাহার জানাযা ছহীহ্ ক্বওল মতে পড়া যাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যে না-বালেগ ছেলে বা বাপ-মা মুসলমান, তাহাকে মুসলমানই ধরা যাইবে এবং তাহার জানাযা পড়া যাইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** মাইয়্যেতের অর্থ যে জীবিত জন্মগ্রহণ করিয়া পরে মারা গিয়াছে; যাহার জন্মই হইয়াছে মৃতাবস্থায় তাহার জানাযা দুরুস্ত নহে।

২য় শর্ত (মাইয়্যেতের পক্ষে) এই যে, মাইয়্যেতের শরীর এবং কাফন পাক হওয়া চাই। (যে স্থানে মাইয়্যেতকে রাখা হইয়াছে সে স্থানও পাক হওয়া চাই এবং মাইয়্যেতের সতরও ঢাকা হওয়া চাই;) কিন্তু যদি (কাফন পরাইবার পর) মাইয়্যেতের শরীর হইতে কোন নাপাকী বাহির হয়, একারণে তাহার শরীর একেবারে নাপাক হইয়া যায়, তবে জানাযায় ব্যাঘাত জন্মাইবে না, নামায দুরুস্ত হইবে। (কাফন পরাইবার আগে বাহির হইলে ধুইয়া দিতে হইবে।)

৬। মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে যদি গোসল দেওয়া না হয়, বা গোসল অসম্ভব হইলে তায়াম্মুমও করান না হয়, তবে জানাযা দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি গোসল এবং জানাযা ছাড়া মাটি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে কবর আর খোঁড়া যাইবে না; কবরের উপরই জানাযা পড়িতে হইবে।

যদি ভুলে বা অজ্ঞতাবশতঃ কাহাকেও বিনা গোসলে জানাযা পড়িয়া কবর দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ঐ নামায ছহীহ্ হয় নাই; পুনঃ কবরের উপর জানাযা পড়িতে হইবে। কেননা, এখন আর গোসল দেওয়া বা তায়াম্মুম করান সম্ভব নহে। কাজেই নামায হইয়া যাইবে।

৭। মাসআলাঃ কোন মুসলমানকে যদি বিনা জানাযায় কবর দেওয়া হয়, তবে কবরের উপরই তাহার জানাযা পড়িতে হইবে। কিন্তু কত দিন পর্যন্ত কবরের উপর জানাযা পড়া যাইবে সে সম্বন্ধে ছহীহ্ মত এই যে, অনুমানে যতক্ষণ পর্যন্ত লাশ না ফাটে ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়া যাইবে। কত দিনে যে লাশ ফাটে, তাহা দেশ, কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। কাজেই তাহার কোন সময় নির্দিষ্ট হইতে পারে না। এসম্বন্ধে বহুদর্শী জ্ঞানীগণের মত গ্রহণ করিতে হইবে। কেহ তিন দিন, কেহ দশ দিন এবং এক মাস সময় ধার্য করিয়াছেন। (ইহা তাহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারেই করিয়াছেন।)

৮। মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে যে স্থানে রাখা হয় ঐ স্থানটি পাক হওয়া শর্ত নহে, মাইয়্যেত পাক খাটলির উপর থাকিলে, খাটলি রাখিবার জায়গা যদি পাক নাও হয়, তবুও নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি খাটলি নাপাক হয়, বা মাইয়্যেত নাপাক জায়গায় (খাটলি ছাড়া) রাখা হয়, তবে নামায ছহীহ্ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কোন কোন আলেমের মতে মাইয়্যেতের স্থান পাক হওয়া শর্ত, কাজেই নামায হইবে না। কাহারও মতে শর্ত নহে, কাজেই নামায ছহীহ্ হইবে। (কিতাবে ছহীহ্ না হওয়ার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে।)

৩য় শর্ত (মাইয়্যেতের) এই যে, জানাযার নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য মাইয়্যেতের সতর ঢাকা হওয়া চাই। যদি মাইয়্যেত উলঙ্গ হয়, তবে নামায হইবে না। অবশ্য (জীবিতাবস্থায়) যে পরিমাণ ফরয, সে পরিমাণ সতর যদি ঢাকা হয়, তবে নামায হইবে।

৪র্থ শর্ত এই যে, মাইয়্যেত নামাযীদের সামনে হওয়া চাই। যদি মাইয়্যেত নামাযীর পিছনে থাকে, তবে নামায হইবে না।

৫ম শর্ত এই যে, মাইয়্যেত অথবা মাইয়্যেতের খাটলি মাটিতে থাকা চাই। নামাযের সময় যদি মাইয়্যেত লোকের হাতের উপর, কাঁধের উপর বা গাড়ীর উপর রাখা থাকে, তবে নামায ছহীহ্ হইবে না।

৬ষ্ঠ শর্ত এই যে, মাইয়্যেত উপস্থিত থাকা চাই, অনুপস্থিত মাইয়্যেতের উপর নামায পড়িলে (আমাদের হানাফী মযহাবে) নামায দুরুস্ত হইবে না।

৯। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের মধ্যে দুইটি কাজ ফরয। যথা ঃ—(১) চারিবার আল্লাহু আক্‌বর বলা, যেমন চারি তক্‌বীর চারি রাকা'আত। (২) দাঁড়াইয়া জানাযার নামায পড়া। অন্যান্য ফরয এবং ওয়াজিব নামায যেমন দাঁড়াইয়া পড়া ফরয, জানাযার নামাযও তদ্রূপ দাঁড়াইয়া পড়া ফরয। বিনা ওযরে জানাযার নামায বসিয়া পড়িলে দুরুস্ত হইবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের মধ্যে রুকূ, সজ্‌দা, কা'দা, কওমা, জলসা ও আত্তাহিয়্যাতু নাই।

১১। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযে তিনটি কাজ সুন্নত—(১) প্রথম তক্‌বীরের পর ছানা পড়া। (২) দ্বিতীয় তক্‌বীরের পর দুরূদ পড়া। (৩) তৃতীয় তক্‌বীরের পর মাইয়্যেতের জন্য দো'আ করা। জানাযার নামাযের জন্য জমা'আত শর্ত নহে। অতএব, যদি মাত্র একজন লোকে, পুরুষ বা স্ত্রী, বালেগ বা না-বালেগ জানাযার নামায পড়ে, তবুও ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** কিন্তু এক্ষেত্রে জমা'আতের আবশ্যকতা অতি বেশী। কেননা, জানাযার নামায প্রকৃত প্রস্তাবে মাইয়্যেতের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ' করা ও দো'আ চাওয়া, বহু সংখ্যক লোক একত্র হইয়া যদি আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করে, তবে সে দো'আ কবূল হইবার এবং আল্লাহ্‌র রহ্‌মত নাযিল হইবার আশা খুব বেশী হয়, (কাজেই লোক যত বেশী হইবে এবং দো'আ যত ভারী হইবে, ততই ভাল হইবে।)

১৩। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামায পড়িবার সুন্নত তরীকা এই যে, মাইয়্যেতকে কেব্‌লার দিকে সামনে রাখিয়া, ইমাম মাইয়্যেতের সীনা বরাবর দাঁড়াইবে এবং সকলে এই নিয়্যত করিবে—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّیَ صَلٰوةَ الْجَنَازَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰی وَدُعَاءً لِّلْمَيِّتِ ○

বাংলা নিয়ত এই—আমি জানাযার ফরযে কেফায়া নামায পড়িতেছি, যাহা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নামায এবং এই মাইয়্যেতের জন্য দো'আ।

(কিংবা এইভাবেও নিয়্যত করিতে পারে—

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّیَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰی وَالصَّلٰوةُ عَلَی النَّبِیِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰی جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ○

মাইয়্যেত স্ত্রীলোক হইলে لهذا الميت স্থলে لهذه الميت এইরূপে নিয়্যত করিয়া একবার (الله اكبر) আল্লাহু আক্‌বার বলিয়া উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া তক্‌বীরে তাহ্‌রীমার মত বাঁধিবে এবং পড়িবে— سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰی جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ○

তারপর দ্বিতীয়বার 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিবে, কিন্তু হাত উঠাইবে না (বা উপরর দিকে মাথা উঠাইয়া চাহিবে না।) তারপর নিম্নের দুরূদ শরীফ পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَرَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

তারপর 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিবে, কিন্তু হাত উঠাইবে না (বা উপরের দিকে চাহিবে না এবং) মাইয়্যেতের জন্য দো'আ করিবে। মাইয়্যেত যদি বালেগ হয়, (পুরুষ হউক বা স্ত্রী) তবে এই দো'আ পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্, (আমরা তোমার বন্দা,) আমাদের মধ্যে জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট বড়, পুরুষ, স্ত্রী সকলের গোনাহ্ দয়া করিয়া মা'ফ করিয়া দাও। আয় আল্লাহ্, আমাদের যাহাকে তুমি জীবিত রাখ, ইসলামের সহিত জীবিত রাখিও এবং যাহাকে মৃত্যু দান কর, ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করিও।

মাইয়্যেতের দো'আর জন্য হাদীস শরীফে এই দো'আটিও আসিয়াছে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُوْلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্, তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও, তাহার উপর তোমার রহ্‌মত নাযিল কর, তাহাকে চিরস্থায়ী সুখ দান কর, তাহার ভুল-ত্রুটি মা'ফ করিয়া দাও; তাহাকে সম্মানিত কর, তাহার স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও। পানি, বরফ এবং শিলার দ্বারা তাহাকে (পাপরাশিকে) ধৌত করিয়া দাও। ময়লা কাপড় যেমন ধুইয়া সাদা পরিষ্কার করা হয়, তাহাকে পাপের ময়লা হইতে সেইরূপ পরিষ্কার করিয়া দাও। এই জগতের বাড়ী, সঙ্গী এবং যুগল হইতে উত্তম বাড়ী, উত্তম সঙ্গী এবং উত্তম যুগল তাহাকে দান কর, তাহাকে বেহেশ্‌ত দান কর এবং কবরের ও দোযখের আযাব হইবে তাহাকে রক্ষা কর।

এই দুইটি দো'আর যে কোন একটি পড়িলেই কাজ চলে, কিন্তু উভয় দো'আই যদি পড়া হয়, তবে আরও ভাল হয়। আল্লামা শামী এই দুইটি দো'আকে একত্র করিয়া লিখিয়াছেন। এই দুইটি ছাড়া আরও দো'আ হাদীস শরীফে আসিয়াছে, তাহার যে কোন একটি বা সবগুলিও পড়া যায়।

মাইয়্যেত যদি না-বালেগ ছেলে হয়, তবে এই দো'আ পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ○

অর্থ—আয় আল্লাহ্! এই নিষ্পাপ শিশুকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী অগ্রদূত বানাও এবং আমাদের জন্য পুঁজি ও আখেরাতের ছওয়াবের যখিরা বানাও এবং আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানাও এবং আমাদের জন্য তাহার সুপারিশ কবূল করিও।

মাইয়্যেত না-বালেগা মেয়ে হইলে এই দো'আ পড়িব—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ○

এইরূপ দো'আ পড়ার পর চতুর্থ বার আল্লাহু আকবর বলিবে (হাত উঠাইবে না) এবং তক্‌বীর বলার পর আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্ বলিয়া (ডানে বামে) সালাম ফিরাইবে যেরূপ নামাযে সালাম ফিরাইতে হয়। জানাযার নামাযে আত্তাহিয়্যাতু বা কোরআন পাঠ ইত্যাদি নাই।

১৪। মাসআলা ঃ জানাযার নামায ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের জন্য একই রূপ, শুধু এতটুকু ব্যবধান যে, ইমাম তক্‌বীরগুলি এবং উভয় দিকে সালামদ্বয় উচ্চ স্বরে বলিবে, মুক্তাদিগণ নীরবে বলিবে। এতদ্ব্যতীত ছানা, দুরূদ এবং দো'আ ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই নীরবে পড়িবে।

১৫। মাসআলা ঃ জানাযার নামাযের মধ্যে তিন কাতার হওয়া মোস্তাহাব। এমন কি, মাত্র সাতজন হইলেও একজনকে ইমাম বানাইয়া বাকী ছয়জন এইরূপে দাঁড়াইবে ঃ প্রথম কাতারে তিনজন, দ্বিতীয় কাতারে দুইজন এবং তৃতীয় কাতারে একজন।

১৬। মাসআলা ঃ অন্যান্য নামায যেসব কারণে ফাসেদ হইয়া যায়, জানাযার নামাযও সেইসব কারণে ফাসেদ হয়। পার্থক্য এতটুকু যে, জানাযার নামাযে জোরে হাসিলেও ওযূ টুটিবে না। কোন স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইলে নামায ফাসেদ হইবে না।

১৭। মাসআলা ঃ পাঞ্জেগানা নামাযের মসজিদে বা জামে মসজিদে বা ঈদের নামাযের জন্য যে মসজিদ তৈয়ার করা হইয়াছে, তথায় জানাযার নামায মকরূহ্। জানাযা মসজিদের ভিতরে থাকুক কিংবা বাহিরে। অবশ্য জানাযার নামাযের জন্যই যদি কোন মসজিদ পৃথকরূপে অথবা কোন মসজিদের সংলগ্নে কোন স্থান প্রস্তুত করা হয়, তবে তথায় জানাযা পড়া মকরূহ নহে।

১৮। মাসআলা ঃ জমা'আত বড় হওয়ার উদ্দেশ্যে এই নামাযে বেশী দেরী করা মক্‌রূহ্।

১৯। মাসআলা ঃ বিনা ওযরে জানাযার নামায বসিয়া বসিয়া বা ঘোড়ায় চড়িয়া পড়া দুরুস্ত নহে।

২০। মাসআলা ঃ যদি কয়েকটি মাইয়্যেত একত্রে আসিয়া পড়ে, তবে প্রত্যেক মাইয়্যেতের জন্য পৃথক পৃথকভাবে জানাযা পড়াই উত্তম। কিন্তু যদি কেহ সকলের জানাযা এক সঙ্গে পড়িতে চাহে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। যদি সেইরূপ করিতে চাহে, তবে মাইয়্যেতকে পাশে পাশে এরূপভাবে সকলের মাথা একদিকে এবং সকলের পা এক দিকে রাখিবে, যেন ইমাম সকলেরই সীনা বরাবর দাঁড়াইতে পারে।

২১। মাসআলা যদি স্ত্রী, পুরুষ, বালেগ, না-বালেগ কয়েক প্রকারের মাইয়্যেতের এইরূপ একত্রে জানাযা পড়িতে হয়, তবে তাহাদিগকে এই তরতীবে রাখিতে হইবে ঃ—প্রথম পুরুষদের, তারপর না-বালেগ ছেলেদের, তারপর (খোঁজা মুসলিমের,) তারপর স্ত্রীলোকদের এবং তারপর না-বালেগা মেয়েদের লাশ রাখিবে।

২২। মাসআলা ঃ জানাযার নামাযের জমা'আতে যদি কেহ আসিয়া দেখে যে, নামায শুরু হইয়া গিয়াছে, তবে অন্যান্য নামাযের ন্যায় আসা মাত্রই তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিয়া জমা'আতে দাখিল হওয়া উচিত নহে; বরং পুনরায় ইমামের তক্‌বীর বলার এন্তেযার করা উচিত। যখন ইমাম তক্‌বীর বলিবেন, তখন এই মছ্‌বুক ব্যক্তি তক্‌বীর বলিয়া জমা'আতে দাখিল হইবে এবং ইহাই তাহার জন্য তক্‌বীর তাহ্‌রীমা বলিয়া গণ্য হইবে। তারপর যখন ইমাম স্বীয় নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইবে, তখন সে সালাম ফিরাইবে না; বরং যে কয়টি তক্‌বীর তাহার জমা'আতে দাখিল হইবার পূর্বে ছুটিয়া গিয়াছে তাহা আদায় করিবে। এই তক্‌বীরগুলি আদায় করিবার সময় দো'আ পড়ার দরকার নাই। (কারণ, মাইয়্যেতকে তখনই উঠাইয়া লওয়া হইবে।) সে মাত্র যে কয়টি তক্‌বীর তাহার ছুটিয়াছে সেই কয়বার 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া সালাম ফিরাইবে। (কিন্তু যদি কেহ চতুর্থ তক্‌বীরও বলার পর সালাম ফিরানের পূর্বে আসে, তবে তৎক্ষণাৎ 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া

সালাম ফিরানের পূর্বেই জমা'আতে দাখিল হইবে এবং ইমামের সালাম ফিরানের পর মাইয়্যেতকে উঠানের পূর্বেই তিনবার 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া সালাম ফিরাইবে।)

২৩। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ জমা'আতে উপস্থিত ছিল এবং নামায শুরু করার জন্য প্রস্তুতও ছিল, কিন্তু অলসতা বা অন্য কোন কারণে ইমামের সঙ্গে সঙ্গে তক্‌বীর বলিতে পারে নাই, তবে সে দ্বিতীয় তক্‌বীরের এন্তেযার করিবে না, ইমামের দ্বিতীয় তক্‌বীর বলিবার পূর্বেই প্রথম তক্‌বীর বলিয়া জমা'আতে দাখিল হইবে।

২৪। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযে মছ্‌বুকের যদি এই আশংকা হয় যে, দো'আ পড়িতে গেলে মাইয়্যেতকে উঠাইয়া লওয়া হইবে, তবে সে দো'আ পড়িবে না, শুধু তক্‌বীর বলিয়া সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

২৫। **মাসআলা ঃ** অন্যান্য নামাযে লাহেকের যে হুকুম, জানাযার নামাযের লাহেকেরও সেই হুকুম।

২৬। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযে ইমামতের অধিকার সর্বপ্রথমে মুসলমান বাদশাহ্‌র, তাক্বওয়া-পরহেযগারীতে অন্যের চেয়ে কমই হউক না কেন। বাদশাহ্ স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে, তাঁহার নিযুক্ত 'আমীর' (শাসনকর্তা) তারপর প্রধান বিচারক (ক্বাযীউল ক্বোযাত)। ক্বাযীও যদি উপস্থিত না থাকে, তবে তাঁহার নায়েব ইমামতের অধিকার পাইবেন। বাদশাহ্‌র পক্ষের এইসব ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে অন্যকে ইমাম করা জায়েয নহে, তাঁহাদিগকে ইমাম করা ওয়াজিব।

বাদশাহ্‌র পক্ষের কেহ না থাকিলে ইমামতের হক্ মহল্লার ইমামের। কিন্তু মাইয়্যেতের ওলীদের মধ্যে যদি কেহ মহল্লার ইমাম অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত থাকে, তবে মহল্লার ইমামের হক্ হইবে না, ওলীরই হক্ হইবে। ওলী নিজেই নামায পড়াইবে, অথবা সে যাহাকে অনুমতি দিবে সে পড়াইবে।

ওলীর বিনা অনুমতিতে যদি এমন কেহ নামায পড়ায় যাহার ইমামতের হক্ নাই, তবে ওলী পুনরায় নামায পড়িতে পারিবে। এমন কি, যদি কবর দেওয়া হইয়া থাকে, তবুও লাশ না ফাটিয়া থাকিলে কবরের উপরও নামায পড়িতে পারিবে।

২৭। **মাসআলা ঃ** যদি ওলীর বিনা অনুমতিতে এমন কোন লোক নামায পড়ায়, ইমামত করিবার যাহার অধিকার আছে, তবে আবার মাইয়্যেতের ওলী পুনরায় নামায পড়িতে পারে না। এরূপে ওলী যদি তখনকার বাদশাহ্ ইত্যাদির অনুপস্থিতিতে নামায পড়ায়, তবে তৎকালীন বাদশাহ্ ইত্যাদি প্রমুখের নামায দোহ্‌রাইয়া পড়ার এখতিয়ার থাকিবে না, বরং ছহীহ্ এই যে, যদি তৎকালীন বাদশাহ্ ইত্যাদির উপস্থিত থাকাকালীন মাইয়্যেতের ওলী নামায পড়ে তবুও বাদশাহ্ ইত্যাদির পুনরায় নামায পড়ার এখতিয়ার থাকিবে না, যদিও এমতাবস্থায় বাদশাহ্‌কে ইমাম না বানাইলে মাইয়্যেতের ওলীদের উপর ওয়াজিব তরক করার গোনাহ্ হইবে। সারকথা—এক জানাযার নামায কয়েকবার পড়া জায়েয নাই, অবশ্য মাইয়্যেতের ওলীর বিনা অনুমতিতে যদি এমন লোক পড়ায় যাহার নামায পড়াইবার হক নাই, তবে মাইয়্যেতের ওলী পুনরায় নামায পড়িতে পারে।

(**মাসআলা ঃ** বাপ থাকিলে বাপ ওলী হইবে, অন্যথায় ছেলে ওলী হইবে। কয়েক ছেলে থাকিলে বড় ছেলে ওলী হইবে। ছেলে না থাকিলে ভাই ওলী হইবে। কয়েক ভাই থাকিলে

বড় ভাই ওলী হইবে। ভাই না থাকিলে চাচা ওলী হইবে। কয়েক চাচা থকিলে বড় চাচা ওলী হইবে ইত্যাদি।)

মাসআলাঃ ছেলে আলেম এবং বাপ মূর্খ হইলে বাপের উচিত ছেলেকে আগে বাড়াইয়া দেওয়া। এইরূপে ছোট ভাই আলেম, বড় ভাই মূর্খ হইলে বড় ভাই ছোট ভাইকে আগে বাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

মাসআলাঃ স্ত্রীর কাফন তাহার স্বামীর যিম্মায় হইবে এবং যদি কেহ ওলী না থাকে, তবে স্বামী নামায পড়াইবে। যদি ওলী, স্বামী কেহই না থাকে, তবে প্রতিবেশীর মধ্যে যে উপযুক্ত হইবে সে-ই নামায পড়াইবে।

মাসআলাঃ কাফন-দাফনের খরচ মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে লইতে হইবে। যদি ত্যাজ্য সম্পত্তিও না থাকে, তবে ওয়ারিশগণ দিবে। যদি ওলী বা ওয়ারিশ কেহ না থাকে তবে কাফন খরচ মুসলমান সমাজকে দিতে হইবে। মৃতের কাফন-দাফন করা ফরয। যদি পার্শ্ববর্তী মুসলমানগণের কাফন-দাফন দেওয়ার মত সঙ্গতি না থাকে, তবে তাহারা চাঁদা করিয়া মৃতের কাফন-দাফন করিবে। (উঠান চাঁদা যদি সব খরচ না হয়, কিছু বাঁচিয়া যায়, তবে তাহা চাঁদাদাতাগণকে ফেরত দিতে হইবে। যদি চাঁদাদাতাগণকে না পাওয়া যায়, তবে উদ্বৃত্ত পয়সা এইরূপ অন্য কোন মিসকীনের কাফন-দাফনে খরচ করিতে হইবে, নতুবা কোন গরীবকে খয়রাত করিয়া দিতে হইবে।) —অনুবাদক

দাফন

১। **মাসআলাঃ** মাইয়্যেতের গোসল, (কাফন) এবং জানাযা যেমন ফরযে কেফায়া, দাফন করাও তেমনই ফরযে কেফায়া।

২, ৩। **মাসআলাঃ** জানাযার নামায শেষ হওয়া মাত্রই জানাযা কবরে লইয়া যাইবে। লইয়া যাওয়ার সুন্নত তরীকা এইঃ যদি ছোট বাচ্চা হয়, তবে একজন লোকে তাহাকে দুই হাতের উপর উঠাইয়া লইবে, তারপর তাহার নিকট হইতে অন্য একজনে নিবে; এইরূপে বদলাইয়া লইয়া যাইবে। আর যদি লাশ বড় হয়, তবে তাহাকে খাটলিতে করিয়া চারিজন তাহার চারি পায়া দুই হাতে ধরিয়া কাঁধে রাখিয়া সসম্মানে লইয়া যাইবে। মৃতকে অন্যান্য বোঝার মত কাঁধে করিয়া নেওয়া অথবা বিনা ওযরে গাড়ী-ঘোড়ায় করিয়া নেওয়া মকরূহ্। অবশ্য যদি কোন ওযর থাকে যেমন, কবরস্তান দূরে হয়, তবে গাড়ী-ঘোড়ায় করিয়া নেওয়া জায়েয।

৪। **মাসআলাঃ** মাইয়্যেতের খাটলি বহন করিবার পরে যাহারা বদলাইয়া বদলাইয়া নিবে তজ্জন্য মোস্তাহাব তরীকা হইল—প্রথমে খাটলির আগের ডান পার্শ্বের পায়া অর্থাৎ, মৃতের ডান হাতের দিকের পায়া) ডান কাঁধের উপর লইয়া অন্ততঃ পক্ষে দশ কদম হাঁটিয়া তারপর ঐ পার্শ্বেরই পাছের পায়া ডান কাঁধে লইয়া অন্ততঃ দশ কদম হাঁটিয়া তারপর বাম পার্শ্বের সামনের পায়া ধরিয়া বাম কাঁধে রাখিয়া অন্ততঃ দশ কদম চলিবে। এইরূপে প্রত্যেকের চেহেল কদমি (চল্লিশ কদম বহন করা) হইয়া যাইবে। (যদি প্রত্যেক পায়ার সহিত চল্লিশ কদম চলে, তবে তাহা আরও উত্তম। হাদীস শরীফে আছেঃ 'মাইয়্যেতকে লইয়া চল্লিশ কদম হাঁটিলে তাহার চল্লিশটি গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে।')

৫। **মাসআলা**ঃ মাইয়্যেতকে দ্রুত কবরস্তানে লইয়া যাওয়া সুন্নত। কিন্তু এইরূপ দ্রুত দৌড়াইবে না যে, লাশ নড়িতে থাকে। (এরূপ দ্রুত দৌড়ান মকরূহ্।)

৬। **মাসআলা**ঃ জানাযার সঙ্গে যাহারা যাইবে, জানাযা কাঁধ হইতে নামাইয়া রাখার পূর্বে তাহাদের বসা মক্রূহ্। অবশ্য দরকারবশতঃ বসিলে দোষ নাই।

৭। **মাসআলা**ঃ যাহারা জানাযার সঙ্গে যাইতেছে না, কোথাও বসিয়া আছে, জানাযা দেখিয়া তাহাদের দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত নহে।

৮। **মাসআলা**ঃ জানাযার সঙ্গে গমনকারীদের জানাযার পাছে পাছে যাওয়া মোস্তাহাব। কেহ যদি আগে যায়, তাহাও জায়েয আছে। কিন্তু যদি সকলেই আগে যায়, তবে তাহা মকরূহ্। এইরূপে ঘোড়া বা গাড়ীতে আগে আগে যাওয়াও মকরূহ।

৯। **মাসআলা**ঃ জানাযার সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া মোস্তাহাব, যদি কেহ গাড়ী ঘোড়ায় যায়, তবে সে পিছে পিছে যাইবে।

১০। **মাসআলা**ঃ (জানাযার সঙ্গে যাওয়াতে অনেক ছওয়াব আছে) যাহারা সঙ্গে যাইবে তাহাদের উচ্চ স্বরে দো'আ কালাম পড়া মকরূহ্ (এবং কবরস্তানে গিয়া হাসি-ঠাট্টা করা বা বাজে কথা বলা মকরূহ্।)

কবরের গভীরতা অন্ততঃপক্ষে লাশের অর্ধেক হওয়া চাই এবং পূর্ণ এক কদের চেয়ে বেশী লম্বা হওয়া উচিত নহে। কবর মাইয়্যেতের কদের পরিমাণ লম্বা হইবে, অনেক বেশী লম্বা হওয়া ঠিক নহে। (যতখানি লম্বা তাহার অর্ধেক চওড়া হওয়া চাই।) বগলি কবর সিন্দুকী কবরের চেয়ে উত্তম। কিন্তু যদি মাটি নরম হয়, বগলি খুঁড়িলে কবর বসিয়া যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে বগলি কবর খুঁড়িবে না।

(কবর খুঁড়িবার নিয়মঃ প্রথমে দিক সোজা করিয়া উত্তর শিয়রে দৈর্ঘ্যে ৪ হাত, প্রস্থে ১ হাত (পৌনে দুই হাত) এবং ২, ২৷৷০ কিংবা ৩ হাত গভীর একটি গর্ত খুঁড়িবে। তারপর তাহার পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালের ভিতর নীচে ছোট একটি গর্ত খুঁড়িবে, ইহাকে বগলি কবর বলে। আর যদি ঐ গর্তটির মাঝখানে (শোয়াইবার জন্য) ছোট একটি গর্ত খোঁড়া হয়, তবে তাহাকে সিন্দুকী কবর বলে।

১১। **মাসআলা**ঃ যদি মাটি নরম হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে বগলি কবর খোঁড়া না হয়, তবে মাইয়্যেতকে একটি কাঠ, পাথর বা লোহার সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া সিন্দুকটি মাটির গর্তের মধ্যে দাফন করিয়া দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু যদি এইরূপ সিন্দুকের মধ্যে দাফন করিতে হয়, তবে সিন্দুকের ভিতরে নীচে কিছু মাটি বিছাইয়া দেওয়া (এবং উপরের কাঠখানা ভিতরের দিক দিয়া মাটি দ্বারা লেপিয়া দেওয়া এবং কাঁচা ইট পাওয়া গেলে দুই পার্শ্বে বিছাইয়া দেওয়া অথবা দুই পার্শ্বেও মাটি দ্বারা লেপিয়া দেওয়া) উচিত। (অগ্নি সংস্পর্শে নির্মিত লৌহ ইত্যাদির সিন্দুক দেওয়া মকরূহ্।)

১২। **মাসআলা**ঃ কবর প্রস্তুত হইয়া গেলে মাইয়্যেতকে পশ্চিম দিক দিয়া নামাইবে, তাহার নিয়ম এই যে, মাইয়্যেতের খাটলিকে উত্তর শিয়রে করিয়া কবরের পশ্চিম রোখ হইয়া দাঁড়াইয়া মাইয়্যেতকে হাতের উপর রাখিয়া নামাইবে।

১৩। মাসআলাঃ কবরের মধ্যে যাহারা মাইয়্যেতকে নামাইবে তাহাদের সংখ্যা জোড় বা বেজোড় হওয়া সুন্নত নহে। হযরত নবী আলাইহিস্‌ সালামকে তাঁহার কবর শরীফে চারিজনে ধরিয়া নামাইয়াছিলেন।

১৪। মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে কবরে রাখিবার সময়—بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ○ **অর্থ**—'আল্লাহ্‌র নামের উপর ও রসূলুল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর রাখিতেছি' বলা মোস্তাহাব।

১৫। মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে ডান কাতে ক্বেব্‌লামুখী করিয়া শোয়ান সুন্নত। তাহাতে আবশ্যক হইলে মাথা এবং পিঠের নীচে কাঁচা ইট বা মাটি দিয়া দেওয়া যায়।

১৬। মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে কবরে রাখিয়া (পায়ের ধারে, মাথার ধারে বা মাঝখানে) কাফন খুলিয়া যাওয়ার ভয়ে যেসব বাঁধন দেওয়া হইয়াছিল তাহা সব খুলিয়া দিবে।

১৭। মাসআলাঃ তারপর কাঁচা ইট অথবা বাঁশ দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। তক্তা বা পাকা ইটের দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করা মকরূহ্। অবশ্য যেখানে মাটি খুব নরম ও কবর বসিয়া যাওয়ার ভয় আছে, পাকা ইট কিংবা সেখানে কাঠের তক্তা রাখিয়া দেওয়া কিংবা সিন্দুকে রাখাও জায়েয। (বগলি কবরের মুখ বন্ধ করিতে কাঁচা ইট অথবা বাঁশ খাড়া করিয়া দিতে হয়। হযরত নবী আলাইহিস্‌সালামের কবর শরীফে ৯ খানা ইট খাড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।)

১৮। মাসআলাঃ মেয়েলোককে কবরে রাখিবার সময় পর্দা করা মোস্তাহাব। (এইরূপে খাটলির উপরও পর্দা করা মোস্তাহাব। যদি শরীর খুলিয়া যাইবার আশংকা থাকে, তবে পর্দা করা ওয়াজিব।)

১৯। মাসআলাঃ পুরুষকে দাফন করিবার সময় পর্দা করিবে না। অবশ্য যদি বৃষ্টি, বরফ বা রৌদ্রের জন্য পর্দা করা হয়, তবে তাহা জায়েয।

২০। মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে কবরের মধ্যে রাখার পর ঐ কবর হইতে যত মাটি বাহির হইয়াছে, তাহা সব কবরের উপর দিবে; তাহা ছাড়া অতিরিক্ত মাটি দেওয়া মকরূহ্। কবর বিঘতখানেক উঁচা করিতে যদি অন্য মাটি লাগে, তবে সে পরিমাণ মাটি নেওয়া মকরূহ্ নহে। কিন্তু যদি অন্য মাটির দ্বারা এক বিঘতের চেয়ে অনেক বেশী উঁচা করা হয়, তবে তাহা মকরূহ্। অবশ্য ঐ কবরের মাটিতেই যদি এক বিঘতের চেয়ে সামান্য কিছু উঁচা হইয়া যায় তবে তাহা মকরূহ্ নহে।

২১। মাসআলাঃ দাফন ক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেরই তিন তিন মুঠা মাটি দেওয়া মোস্তাহাব, মাটি মাথার দিক হইতে উভয় হাতে দিবে। প্রথম মুঠি দিবার সময় বলিবেঃ

"مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ" (اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ○)

অর্থ—(আল্লাহ্ বলিয়াছেন) 'এই মাটি দ্বারাই আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি।' (হে আল্লাহ্! তাহাকে কবরের চাপ এবং কবরের আযাব হইতে বাঁচাও।)

দ্বিতীয় মুঠা দিবার সময় বলিবেঃ

"وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ" (اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ ○)

অর্থ—(আল্লাহ্ বলিয়াছেন) 'এই মাটির ভিতরেই পুনরায় আমি তোমাদিগকে আনিব।' (হে আল্লাহ্! তাহার রূহের জন্য আসমানের দরজা খুলিয়া দাও।)

তৃতীয় মুঠা দিবার সময় বলিবেঃ

"وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى" (اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ ○)

অর্থ—(আল্লাহ্ বলিয়াছেন) 'এই মাটির ভিতর হইতে পুনরায় আমি তোমাদিগকে বাহির করিব।' (হে আল্লাহ্! তাহাকে তোমার রহ্মতে বেহেশ্তে স্থান দান কর।)

২২। **মাসআলা** ঃ দাফন করার পর কিছুক্ষণ কবরের নিকট অপেক্ষা করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আয়ে মাগ্ফেরাত করা বা কিছু কোরআন পাক পড়িয়া ছওয়াব বখশিয়া দেওয়া মোস্তাহাব। (মাথার দিকে দাঁড়াইয়া সূরা-বাক্কারার শুরুর তিন আয়াত এবং পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া শেষের তিন আয়াত পড়া মোস্তাহাব। কবর দেওয়ার পর তলক্বীন করাও ভাল। তল্ক্বীন ঃ একজন লোক মৃতকে সম্বোধন করিয়া বলিবে ঃ

يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ اُذْكُرْ دِيْنَكَ الَّذِىْ كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ اَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَّالنَّارَ حَقٌّ ـ وَّ اَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَّبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا ○

অর্থ—'হে অমুকের পুত্র অমুক, তুমি তোমার ধর্ম-বিশ্বাস এবং ঈমানকে স্মরণ কর। দুনিয়াতে তুমি বিশ্বাস, স্বীকার এবং প্রকাশ করিয়াছিলে যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র রসূল। বেহেশ্ত দোযখ সত্য, কিয়ামত যে হইবে এবং সকলের যে পুনরায় জীবিত হইয়া হিসাব-নিকাশ দিতে হইবে তাহা সত্য, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সমস্ত কবরবাসীকে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় জীবিত করিবেন এবং সকলের হিসাব নিবেন। তুমি দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ্কেই মা'বূদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলে, অন্য কাহাকেও মা'বূদ বলিয়া গ্রহণ বা স্বীকার কর নাই এবং আল্লাহ্র শেষ নবী মোহাম্মদ (দঃ) কে নবীরূপে পাইয়া সন্তুষ্ট ছিলে এবং তাঁহারই তরীকা অনুযায়ী চলিয়াছিলে। তাঁহার পর অন্য কাহাকেও নবী বলিয়া স্বীকার কর নাই বা অন্য কাহারও তরীকা ধরিয়া চল নাই এবং ইসলামকে ধর্মরূপে পাইয়া সন্তুষ্ট ছিলে। অন্য কোন ধর্মে যে যুক্তি বা সত্য আছে, তাহা বিশ্বাস কর নাই বা ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি ব্যতীত অন্য কোন রীতিনীতিকে পছন্দ কর নাই। অনুসরণের জন্য একমাত্র কোরআনকে তুমি অবলম্বন করিয়াছিলে, একমাত্র কা'বাকে তুমি ক্বেব্লারূপে ধারণ করিয়াছিলে এবং তুমি সব উম্মতে মোহাম্মদীকে ভাইরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে। হে অমুকের পুত্র অমুক! তুমি তোমার এইসব ঈমানের কথা স্মরণ কর। মুনকার-নকীরের সওয়ালের জওয়াব ঠিক ঠিক দাও।' (কবরে না-বালেগের সওয়াল-জওয়াব হইবে না, কাজেই না-বালেগের কোন তল্কীনের দরকার নাই।)

২৩। **মাসআলা** ঃ মাটি দেওয়ার পর কবরে পানি ছিঁটাইয়া দেওয়া মোস্তাহাব। (পানি মাথার দিক হইতে ছিঁটাইবে।) কিন্তু কবর লেপা মকরূহ্।

২৪। **মাসআলা** ঃ মৃত ব্যক্তিকে ছোট বা বড় ঘরের মধ্যে কবর দেওয়া নিষেধ। কেননা, ঘরের মধ্যে কবর পাওয়া পয়গম্বরের জন্য খাছ।

২৫। **মাসআলা** ঃ কবরের উপরটা চতুষ্কোণ বানান মকরূহ্। বিঘাতখানেক উঁচা করিয়া উটের পিঠের ন্যায় মাঝখানে উঁচু এবং দুই দিকে ঢালু বানান মোস্তাহাব।

২৬। মাসআলা ঃ কবর এক বিঘত হইতে অনেক উঁচু করা, চুনা সুরকি দিয়া পাকা করা বা লেপা মকরূহ্‌ তাহ্‌রীমী।

২৭। মাসআলা ঃ দাফন করার পর কবরের উপর সৌন্দর্য্যের জন্য গুম্বজ বা পাকা ঘর বানান হারাম এবং মযবুতির জন্য পাকা বানান মকরূহ্‌। এইরূপ স্মরণার্থে কবরের উপর কিছু লিখিয়া রাখার যদি আবশ্যক হয়, তবে তাহা জায়েয, নতুবা জায়েয নহে। কিন্তু এই যুগের সর্বসাধারণ যেহেতু তাহাদের আকীদাহ্‌ এবং আমল অত্যন্ত খারাব করিয়া ফেলিয়াছে, সে কারণে মোবাহ্‌ জিনিসও না-জায়েয হইয়া যায়। এজন্য এসব কাজ একেবারেই না-জায়েয হইবে আর তাহারা যে কারণ প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে দর্শায় তাহা সবই নফসের বাহানা, তাহারা নিজেরাও একথা মনে মনে অনুভব করে।

[**মাসআলা ঃ** দাফন করার পর কবরের উপর কোন তাজা ডাল পুঁতিয়া দেওয়া (বা সরিষা বীজ ছিটাইয়া দেওয়া) ভাল—মোস্তাহাব।

[**মাসআলা ঃ** প্রত্যেক শুক্রবারে (শুক্রবারে না পারিলে বৃহস্পতি বা শনিবার) কবরস্তানে গিয়া কবরের কথা, কবর আযাবের কথা এবং দুনিয়ার যিন্দেগীর অসাড়তার কথা চিন্তা করিয়া দিলকে নরম করা এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য কিছু ছওয়াব বখ্‌শিয়া দেওয়া মোস্তাহাব। ছওয়াব বখ্‌শিবার কয়েকটি তরীকা আছে। **১ম তরীকা** এই যে, কিছু পয়সা-কড়ি, ভাত-কাপড় বা ফল-তরকারী কোন অভাবগ্রস্ত মু'মিন লোককে দান করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিবে যে, আয় আল্লাহ্‌! ইহার ছওয়াব অমুককে পৌঁছাইয়া দিন। **২য় তরীকা** এই যে, ছদ্‌কায়ে জারিয়ার কোন কাজ করিয়া, যথা—ইসলামী মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ, তালেবে এলেমদের খরচ, মোদার্‌রেসগণের খরচ, দ্বীনি কিতাব ইত্যাদি কাজে কিছু টাকা-পয়সা বা স্থাবর সম্পত্তি দান বা ওয়াক্‌ফ করিয়া আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করা যে, আয় আল্লাহ্‌! ইহার যা কিছু ছওয়াব হয়, অমুককে পৌঁছাইয়া দিন। অথবা নিজে জীবিতাবস্থায় কিছু স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ বা ওছীয়ত করিয়া দাও, যাহার আয় সৎকাজে ব্যয় করা হইবে। এই দুই প্রকার দানের ছওয়াব হইবার শর্ত এই যে, নিয়্যতের মধ্যে যেন গোলমাল না হয় অর্থাৎ, লোকের নিকট নাম, যশ বা সুখ্যাতির নিয়্যত হওয়া উচিত নহে। খালেছ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিয়্যত করিবে, নতুবা ছওয়াবও হইবে না, পৌঁছিবেও না। **৩য় তরীকা** এই যে, কোরআন শরীফের কিছু অংশ খালেছ নিয়্যতে পাঠ করিয়া, যথা, সূরা-ফাতিহা, সূরা-বাক্বারার প্রথম ও শেষ তিন আয়াত, সূরা-এখলাছ তিনবার বা এগার বার, সূরা-আলহাকোমুত্তাকাছোর, সূরা-ইয়াসীন, সূরা-তাবারাকাল্লাযী ইত্যাদি, অথবা পূর্ণ কোরআন শরীফ খালেছ নিয়্যতে পড়িয়া, নফল নামায, রোযা বা হজ্জ করিয়া, দুরূদ শরীফ পড়িয়া, তস্‌বীহ্‌ তাহ্‌লীল খালেছ নিয়্যতে পড়িয়া সওয়াব বখশিয়া দিবে। তস্‌বীহ্‌-তাহ্‌লীলের এই পাঁচটি দো'আ ঃ

سُبْحَانَ اللهِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ـ اَللهُ اَكْبَرُ ـ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ○

ছওবাব বখ্‌শিবার নিয়ম এই যে, পড়িবার সময় খালেছ নিয়্যতে ভক্তির সহিত পড়িবে। পয়সা-কড়ি বা দুনিয়ার কোন স্বার্থের উদ্দেশ্যে পড়িলে ছওয়াব হইবে না। পড়িবার পর আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিবে, আয় আল্লাহ্‌! আমি যাহা কিছু পড়িলাম ইহাতে যাহাকিছু ছওয়াব হইবে তাহা তুমি অনুগ্রহ করিয়া অমুককে পৌঁছাইয়া দাও। **৪র্থ তরীকা** এই, আল্লাহ্‌র কাছে এইরূপ দো'আ করিবে যে, আয় আল্লাহ্‌! অমুকের গোনাহ্‌ মাফ করিয়া দাও, আয় আল্লাহ্‌! অমুককে কবর আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখ, অমুকের আখেরাতের মুশ্‌কিল আসান করিয়া দাও ইত্যাদি।

[কোরআন শরীফ খতমকারীগণ যদি ওজরত (মজুরী বা পারিশ্রমিক) লইয়া পড়ে, তবে তাহাতে ছওয়াব হয় না। এইরূপ আখেরাতের ছওয়াবের যে কোন কাজ হউক না কেন, তাহাতে যদি দুনিয়ার ওজরত লওয়া হয়; তবে তাহাতে ছওয়াব হইবে না। কিন্তু পাঠক যদি খালেছ নিয়্যতে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পড়ে— পয়সা বা খাওয়া না পাইলে অসন্তুষ্ট না হয় এবং দাতা খালেছ নিয়্যতে দান করে, তবে দ্বিগুণ ছওয়াব হইবে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ নিয়্যত দুরুস্ত করা চাই। আল্লাহ্‌র কালাম বেচিয়া খাওয়ার চেয়ে খারাব কাজ আর নাই। আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে শরা-মোতাবেক কিছু ছওয়াব রেছানী না করা অতি অন্যায়। নামের জন্য ধুমধাম করিয়া যিয়াফত করা আরও অন্যায়] —অনুবাদক

শহীদের আহ্‌কাম

বাহ্যিক দৃষ্টিতে শহীদ যদিও মৃত, কিন্তু সাধারণ মৃতদের যাবতীয় আহ্‌কাম তাহার মধ্যে চালু হইতে পারে না, তাহার ফযীলতও অনেক বেশী। কাজেই তাহার আহ্‌কামসমূহ পৃথকভাবে বর্ণনা করাই সমীচীন মনে হইল। হাদীস শরীফে শহীদের অনেক প্রকার উল্লেখ আছে। কোন কোন আলেম শহীদদের যাবতীয় প্রকার উল্লেখ করিয়া পৃথক গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে শহীদ সম্পর্কে যে সব আহ্‌কাম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য তাহা শুধু ঐ সমস্ত শহীদের জন্য সীমাবদ্ধ, যাহাদের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত শর্তসমূহ পাওয়া যায়।

১। মুসলমান হইতে হইবে। অতএব, অমুসলমানদের প্রতি কোন প্রকারের শাহাদত ছাবেত হইতে পারে না।

২। সজ্ঞান ও বালেগ হইতে হইবে। কাজেই যে পাগল মাতাল ইত্যাদি অবস্থায় কিংবা অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যাইবে, তাহাদের প্রতি শাহাদতের যেসব আহ্‌কাম লিখা হইতেছে তাহা প্রযোজ্য নহে।

৩। গোসলের হাজত হইতে পাক হইতে হইবে। যদি কেহ জানাবতের অবস্থায় কিংবা কোন স্ত্রীলোক হায়েয-নেফাসের অবস্থায় শহীদ হইল তাহার প্রতিও শহীদের ঐ সব আহ্‌কাম প্রযোজ্য নহে।

৪। বে-গোনাহ্ নিহত হওয়া। যদি কেহ বে-গোনাহ্ নিহত হয় নাই, বরং শরীঅত অনুযায়ী অপরাধের শাস্তি স্বরূপ বধ করা হইয়াছে। অথবা মারা হয় নাই, স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে, তবে তাহার প্রতি শহীদের আহ্‌কাম প্রযোজ্য নহে।

৫। যদি কেহ কোন মুসলমান কিংবা যিম্মীর হাতে মারা যায়, তবে কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা মারা যাওয়াও একটি শর্ত। যদি কোন মুসলমান বা যিম্মীর হাতের ধার বিহীন অস্ত্র দ্বারা মারা যায়, যেমন কোন পাথর ইত্যাদির আঘাতে মারা যায়, তবে তাহার উপর শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে না, কিন্তু লোহা যে ধরনেরই হউক ধারাল অস্ত্রের শামিল, যদিও তাহাতে ধার না থাকে। আর যদি কেহ হরবী কাফের কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী বা ডাকাতের হাতে মারা যায়, কিংবা তাহাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন ধারাল অস্ত্রে নিহত হওয়া শর্ত নহে। এমন কি, উহারা যদি কোন পাথর ছুঁড়িয়া মারে, তাহাতে কোন মুসলমান মারা গেলেও শহীদের হুকুম বর্তিবে। উহাদের নিজ হাতে মারাও শর্ত নহে। উহারা নিহতের কারণস্বরূপ হওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা এমন সব কাজ প্রকাশ পাইয়াছে যাহা নিহতের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তবুও

শহীদের হুকুমসমূহ বর্তিবে। যথা—(১) কোন হরবী, যেসব কাফিরদের সহিত মুসলমানের যুদ্ধের বিধান আছে, স্বীয় জন্তুর দ্বারা কোন মুসলমানকে নিষ্পেষিত করিল এবং সে কাফির নিজেও উহার উপর উপবিষ্ট ছিল। (২) কোন মুসলমান একটি জন্তুর উপর উপবিষ্ট ছিল ঐ জন্তুকে কোন হরবী তাড়া করিলে যাহাতে ঐ মুসলমান ঐ জন্তুর উপর হইতে পড়িয়া মারা গেল। (৩) কোন হরবী মুসলমানের বাড়ীতে বা জাহাজে অগ্নিসংযোগ করিল তাহাতে কোন মুসলমান পুড়িয়া মরিল।

৬। ঐ হত্যার সাজাস্বরূপ শরীঅতের পক্ষ হইতে সর্বপ্রথম আর্থিক বিনিময় নির্ধারিত না হওয়া চাই; বরং ক্বেছাছ (খুনের বদলে খুন) ওয়াজিব হওয়া চাই। অতএব, যদি ঐ হত্যার কারণে হত্যাকারীর উপর আর্থিক বিনিময় নির্ধারিত থাকে, তবু ঐ নিহতের উপর শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে না, যদিও অত্যাচারিত ও মযলুম অবস্থায় মারা গিয়া থাকে। যেমন (১) কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে ধারাল অস্ত্র ব্যতীত অন্য ভাবে হত্যা করিল। (২) কোন মুসলমান ভুলে অন্য মুসলমানকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা বধ করিল। যেমন কোন জন্তু কিংবা চিহ্নিত বস্তুর উপর আঘাত করিতেছিল, এমন সময় লক্ষ্যচ্যুত হইয়া কোন মুসলমানের শরীরে লাগিয়াছে। (৩) কেহ যুদ্ধক্ষেত্র ব্যতীত কোন স্থানে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন হত্যাকারীর সন্ধান মিলে নাই, এইসব অস্থায় যেহেতু এই হত্যার বিনিময়ে মাল ওয়াজিব হয়, ক্বেছাছ ওয়াজিব হয় না, কাজেই এখানে শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে না। বিনিময় নির্ধারণের ব্যাপারে প্রথমাবস্থার শর্ত এই জন্য লাগান হইয়াছে যে, যদি প্রথমাবস্থায় ক্বেছাছ নির্ধারিত হয়, কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকের কারণে ক্বেছাছ মা'ফ হইয়া তাহার বিনিময়ে মাল ওয়াজিব হয়, তবে সেখানে শহীদের আহ্‌কাম জারি হইবে। যথাঃ কাহাকেও ধারাল অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিহত করা হইল, কিন্তু হত্যাকারী এবং নিহতের ওয়ারিশগণের মধ্যে কিছু অর্থের বিনিময়ে সন্ধি হইয়া গেল, তখন এই অবস্থায় যেহেতু প্রথমে ক্বেছাছ ওয়াজিব হইয়াছিল প্রথমে মাল ওয়াজিব হয় নাই, বরং সন্ধির কারণে ওয়াজিব হইয়াছে, এজন্য এখানে শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে (৪) কোন পিতা নিজের ছেলেকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা খুন করিয়াছে এমতাবস্থায় প্রথমতঃ ক্বেছাছই ওয়াজিব হইয়াছিল। প্রথমে মাল ওয়াজিব হয় নাই; কিন্তু পিতার সম্মান এবং মর্যাদার কারণে ক্বেছাছ মা'ফ হইয়া তাহার বিনিময়ে মাল ওয়াজিব হইয়াছে। কাজেই এখানেও শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে।

(৭) আহত হওয়ার পর তাহার দ্বারা আরাম কিংবা জীবন যাপনের কোন কাজ প্রকাশ না পাওয়া চাই। যেমন, খাওয়া, পিয়া, শোয়া, চিকিৎসা ও বেচাকেনা ইত্যাদির এবং এক ওয়াক্ত নামাযের সময় পরিমাণ তাহার জীবন হুঁশ ও জ্ঞান অবস্থায় অতিবাহিত না হওয়া চাই, আর জ্ঞান থাকাকালীন তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া না আনা চাই, অবশ্য যদি জীবজন্তু কর্তৃক পদ-দলিত মথিত হওয়ার ভয়ে উঠাইয়া আনে, তবে কোন দোষ হইবে না। অতএব, যদি কেহ আহত হওয়ার পর বেশী কথাবার্তা বলে, তবে সেও শহীদের আহ্‌কামে দাখিল হইবে না। কেননা, বেশী কথাবার্তা বলা জীবিতদের শান। এরূপে যদি কেহ (মৃত্যুর পূর্বক্ষণে) পার্থিব ব্যাপারে ওছিয়ত করে, তবে শহীদের হুকুম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে। দ্বীনের ব্যাপারে হইলে খারিজ হইবে না। যদি কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয় এবং তাহার দ্বারা এই সকল বিষয়াদি প্রকাশ পায়, তবে তাহার উপর শহীদের আহ্‌কাম বর্তিবে না, অন্যথায় বর্তিবে। কিন্তু এই ব্যক্তি যদি যুদ্ধে নিহত হয়, কিন্তু যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, তবে উপরোল্লিখিত পার্থিব কাজগুলি করা সত্ত্বেও সে শহীদ।

১। মাসআলা ঃ যে শহীদের মধ্যে এই সমস্ত শর্ত পাওয়া যাইবে, তাহার একটি হুকুম হইল তাহাকে গোসল দিবে না। তাহার শরীর হইতে তাহার রক্ত মুছিয়া ফেলিবে না। এভাবেই তাহাকে দাফন করিয়া দিবে। দ্বিতীয় হুকুম হইল তাহার পরিহিত কাপড় খুলিয়া ফেলিবে না। অবশ্য তাহার কাপড় যদি সুন্নত পরিমাণ সংখ্যার চেয়ে কম হয়, তবে সুন্নত তরীকার সংখ্যা পূরণ করার জন্য আরও কাপড় বেশী করিয়া দিবে। এইরূপে যদি তাহার সাথে সুন্নত তরীকার চেয়ে বেশী কাপড় হয়, তবে তাহা খুলিয়া ফেলিবে। আর যদি তাহার শরীরে এমন কাপড় থাকে, যাহা কাফন হওয়ার উপযোগী নহে। যেমন, চামড়ার কাপড় ইত্যাদি তবে ঐ সব খুলিয়া লইতে হইবে। অবশ্য যদি চামড়ার কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাপড় না থাকে, তবে উহাও খুলিবে না। টুপি, জুতা, অস্ত্র ইত্যাদি সর্বাবস্থায় খুলিয়া লইতে হইবে। বাকী যাবতীয় আহ্কাম যাহা অন্যান্য মৃতদের জন্য রাহিয়াছে। যেমন, জানাযার নামায ইত্যাদি, ঐ সব তাহাদের জন্যও জারি হইবে। যদি কোন শহীদের মধ্যে এই সমস্ত শর্তের কোন একটি পাওয়া না যায়, তবে তাহাকে গোসলও দিবে এবং অন্যান্য মৃতের ন্যায় নূতন কাফনও পরাইবে।

জানাযা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মাসআলা

১। মাসআলা ঃ ভুলিয়া যদি মাইয়্যেতকে কবরে ক্বেব্‌লামুখী করিয়া শোয়ান না হয় এবং মাটি দেওয়ার পর স্মরণ হয়, তখন আর ক্বেব্‌লামুখী করিবার জন্য পুনরায় কবর খোলা জায়েয নাই। অবশ্য যদি শুধু বাঁশ, তক্তা দেওয়ার পর স্মরণ হয়, তবে বাঁশ সরাইয়া ক্বেব্‌লামুখী করিয়া দিবে।

২, ৩। মাসআলা ঃ জানাযার সহিত মেয়েলোকের যাওয়া মকরূহ্ তাহ্রীমী। চীৎকার করিয়া ক্রন্দনকারিণী মেয়েলোকের যাওয়া নিষেধ।

৪। মাসআলা ঃ মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সময় আযান দেওয়া বেদ'আত।

৫। মাসআলা ঃ জানাযার নামাযের মধ্যে ইমাম যদি চারি তকবীর হইতে বেশী বলে, তবে হানাফী মুক্তাদিগণ ৪র্থ তকবীরের পর বেশী তকবীর বলিবে না; বরং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। তারপর যখন ইমাম সালাম ফিরায়, তখন মুক্তাদিগণ সেই সঙ্গে সালাম ফিরাইবে। অবশ্য যদি বেশী তকবীর ইমামের মুখ হইতে না শোনে বরং মুকাব্বির হইতে শোনে, তবে মুক্তাদিদের পায়রবী করা উচিত এবং প্রত্যেক তকবীরকে তকবীরে তাহ্রীমা মনে করিবে এবং ধারণা করিবে, যে, ইহার পূর্বে মোকাব্বির যেই তকবীর নকল করিয়াছে হয়ত তাহা ভুল, ইমাম এখন তকবীরে তাহ্রীমা বলিয়াছেন।

৬। মাসআলা ঃ নৌকায়, ষ্টীমারে বা জাহাজে যদি কোন লোক মারা যায় এবং কিনারা এত তফাৎ যে, তথায় পৌঁছিয়া দাফন করিতে গেলে লাশ পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া যাইবে, তবে মাইয়্যেতকে নিয়ম মত গোসল দিয়া কাফন পরাইয়া জানাযার নামায পড়িয়া দরিয়ার মধ্যে ছাড়িয়া দিবে। আর যদি কিনারা তত তফাৎ না হয়, তবে লাশ রাখিয়া দিবে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র কিনারায় পৌঁছিয়া মাটিতে দাফন করিবে।

৭। মাসআলা ঃ যদি কাহারও জানাযার দো'আ মুখস্থ না থাকে, তবে শুধু اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ বলিয়া দিলেও চলিবে, আর যদি তাহাও বলিতে না পারে, তবে অগত্যা শুধু চারিবার 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া দিলেও জানাযার নামাযের ফরয আদায় হইয়া যাইবে। কারণ, দো'আ দুরূদ পড়া ফরয নহে, সুন্নত।

৮। মাসআলা ঃ কবর দিবার পর আবার কবর খুলিয়া মাইয়্যেতকে বাহির করা দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি কোন বন্দার হক নষ্ট হয়, যেমন যদি অন্যের জমিনে মাটি দেওয়া হয় এবং জমিনওয়ালা ঐ জমিনের পরিমাণ বা তাহার মূল্য লইয়াও ক্ষান্ত না হয়, বা কাহারও মূল্যবান কোন জিনিস যদি কবরে থাকিয়া যায়, তবে কবর খোলা জায়েয হইবে।

৯। মাসআলা ঃ যদি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয় এবং পেটের মধ্যে বাচ্চা নড়া-চড়া করে, তবে পেট কাটিয়া বাচ্চা বাহির করিতে হইবে। এইরূপে যদি কেহ কাহারও টাকা বা গিনি গিলিয়া মরিয়া যায় এবং টাকাওয়ালা মা'ফ না করে বা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিও না থাকে, তবে পেট কাটিয়া টাকা বাহির করিতে হইবে। ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকিলে তাহা হইতে পরিশোধ করিবে, পেট কাটিবে না।

১০। মাসআলা ঃ যে স্থানে যাহার মৃত্যু হয় সেই স্থানের কবরস্তানেই তাহাকে মাটি দেওয়া উত্তম, অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া ভাল নহে, যদি ঐ স্থান দুই এক মাইলের বেশী দূরে না হয়। আর যদি তদপেক্ষা অধিক দূরবর্তী হয়, তবে তথায় লইয়া যাওয়া জায়েয নাই (মকরূহ্)। কিন্তু মাটি দিয়া ফেলিলে অন্যত্র লইয়া যাওয়া কোনরূপেই জায়েয নহে।

১১। মাসআলা ঃ গদ্যে বা পদ্যে মৃত ব্যক্তির গুণ প্রকাশ করা বা প্রশংসা করা জায়েয আছে। কিন্তু অতিরঞ্জিত করা বা মিথ্যা প্রশংসা করা জায়েয নহে।

১২। মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির শোকাতুর আত্মীয়দিগকে ছবরের ফযীলত ও সওয়াব বর্ণনা করিয়া সান্ত্বনা দেওয়া এবং মৃতের জন্য নাজাতের এবং তাহার আত্মীয়-স্বজনের জন্য ছবর ও সওয়াবের দো'আ করা জায়েয। শোকাতুরকে সান্ত্বনা দেওয়াকে আরবীতে তা'যিয়াত বলে। তিন দিনের পর তা'যিয়াত করা মাকরূহ্। একবারের পর দ্বিতীয় বার তা'যিয়াত করা মকরূহ্ তানযীহী; কিন্তু যদি আত্মীয়-স্বজন বিদেশ হইতে দেরীতে আসে বা খবর দেরীতে পৌঁছে, তবে মকরূহ্ নহে।

১৩। মাসআলা ঃ নিজের জন্য কাফন প্রস্তুত করিয়া রাখা মকরূহ্ নহে, কিন্তু কবর প্রস্তুত করিয়া রাখা মকরূহ্।

(**মাসআলা ঃ** মৃত ব্যক্তির জন্য বিচ্ছেদ-বেদনায় চোখ দিয়া পানি ফেলা জায়েয আছে, কিন্তু চেঁচাইয়া ক্রন্দন করা, বুকে মাথায় পিটান, জামা কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলা বা মুখে কোন না-জায়েয কথা বলা দুরুস্ত নহে।)

১৪। মাসআলা ঃ মাইয়্যেতের কাফনের উপর কালি ছাড়া শুধু আঙ্গুল দিয়া কপালে لااله الا الله محمد رسول الله এবং সিনায় بسم الله الرحمن الرحيم লিখিয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু ছহীহ্ হাদীসে ইহার কোন প্রমাণ নাই; কাজেই ইহাকে সুন্নত বা মোস্তাহাব ধারণা করা উচিত নহে।

১৫। মাসআলা ঃ কবরের উপর কোন তাজা ডাল রাখিয়া দেওয়া মোস্তাহাব, আর যদি কবরের উপর (বা পার্শ্বে) কোন গাছপালা জন্মে, তবে তাহা কাটিয়া বা মারিয়া ফেলা মকরূহ্। (কিন্তু নিজে নিজে শুকাইয়া বা মরিয়া গেলে কাটিয়া ফেলা মকরূহ্ নহে।)

১৬। মাসআলা ঃ এক কবরে একজনের বেশী মাইয়্যেত দাফন করা উচিত নহে, তবে অত্যন্ত ঠেকাবশতঃ জায়েয আছে। এইরূপ করিতে হইলে মাইয়্যেত যদি শুধু পুরুষ হয়, তবে তাহাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভাল তাহাকে সামনে অর্থাৎ, ক্বেব্‌লার দিকে রাখিতে হইবে এবং যদি পুরুষ, স্ত্রী (ও বালক) মিশ্রিত হয়, তবে প্রথমে (ক্বেব্‌লার দিকে) পুরুষ, (তারপর বালক) তারপর

স্ত্রীলোকগণকে রাখিতে হইবে। (এবং প্রত্যেক দুইজনের মধ্যে মাটি দ্বারা কিছু আড়ালের মত করিয়া দিতে হইবে।)

১৭। মাসআলাঃ পুরুষদের জন্য কবর যেয়ারত করা মোস্তাহাব। যিয়ারত করার অর্থ দেখা-শুনা। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন কবর যিয়ারত করা উচিত। সেই দিন শুক্রবার হওয়াই সবচেয়ে ভাল। বুযুর্গানে দ্বীনের কবর যিয়ারত করার জন্য সফরে যাওয়াও দুরুস্ত আছে, কিন্তু খেলাফে শরা কোন আকীদা বা আমল হওয়া ঠিক নহে। যেরূপ বর্তমানে ওরসের সময় হইয়া থাকে। (যেমন আজকাল অনেকে মাযার যিয়ারত করিতে গিয়া এইরূপ ধারণা করে যে, বুযুর্গ মনের ভেদ জানিতে পারেন বা মনের বাসনা পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন। কেহ বা মাযারকে সজ্‌দা করে, মাযারের উপর ফুল, বাতি বা শিরনি চড়ায়; এইরূপ করিলে মহা পাপ হইবে।)

(**মাসআলাঃ** কোন ব্যক্তির যিম্মায় যদি রোযা, নামায তেলাওয়াতের সজ্‌দা, কসমের কাফ্‌ফারা বা মান্নত বাকী থাকিয়া যায়, জীবিতাবস্থায় পূর্ণ করিতে না পারে, তবে এই সমস্ত ফিদিয়া আদায় করিবার জন্য ওছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। যদি সে ওছিয়ত করিয়া যায়, তবে সেই ওছিয়ত তাহার সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খরচ করিয়া পালন করা ওয়ারিসগণের উপর ওয়াজিব। তদপেক্ষা অধিক হইলে অথবা ওছিয়ত করিয়া না গেলে সম্পূর্ণ ফিদিয়া আদায় করিয়া দেওয়া ওয়ারিসগণের জন্য মোস্তাহাব।)

মসজিদ সম্বন্ধীয় কতিপয় মাসআলা

মসজিদের মাসআলা দুই প্রকারঃ ১ম ওয়াক্‌ফ সম্বন্ধীয়। ২য় নামাযের স্থান হওয়া সম্বন্ধীয়। ওয়াক্‌ফ সম্বন্ধীয় মাসায়েল ওয়াক্‌ফের বয়ানের মধ্যে লিখা হইবে। এখানে শুধু নামায কিংবা নামাযের স্থান হওয়া সম্বন্ধীয় কয়েকটি মাসআলা লিখা হইল।

১। মাসআলাঃ (মুছল্লীদের নামায পড়িবার জন্য আসিতে বাধা হয় এরূপভাবে) মসজিদের দরজা বন্ধ করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য নামাযের সময় ব্যতিরেকে অন্য সময় মাল-আসবাবের হেফাযতের জন্য দরজা বন্ধ করা জায়েয আছে।

২। মাসআলাঃ মসজিদের ভিতর যেরূপ বাহ্য, প্রস্রাব, স্ত্রীসঙ্গম ইত্যাদি করা নিষিদ্ধ; মসজিদের ছাদের উপরও এই সব কাজ করা নিষিদ্ধ।

৩। মাসআলাঃ যে ঘরে নামাযের জায়গা নির্ধারিত আছে, সে জন্য ঐ পুরা ঘরের উপর মসজিদের হুকুম বর্তিবে না।

৪। মাসআলাঃ ওয়াক্‌ফের (বা চাঁদার) টাকা দ্বারা মসজিদের দেওয়ালে কারুকার্য করা জায়েয নহে। যদি কেহ নিজের হালাল টাকা দ্বারা কারুকার্য করিতে চাহে, তবে দোষ নাই; কিন্তু মেহ্‌রাবের এবং পশ্চিম দিকের দেওয়ালে সৌন্দর্য্যের জন্য কারুকার্য করা নিজের হালাল টাকার দ্বারা হইলেও মকরূহ্।

(**মাসআলাঃ** শিশু বা পাগলকে মসজিদে ঢুকিতে দেওয়া নিষেধ।

মাসআলাঃ শোরগোল করা, উচ্চৈঃস্বরে চেঁচান, কবিতা পাঠ করা, দুনিয়াবি দরবার করা, ভিক্ষা করা, হারানো জিনিস তালাশের জন্য এ'লান করা, খাওয়া-দাওয়া করা, গল্প-গুযব করা—ইত্যাদি মসজিদের ভিতর নিষেধ।)

৫। **মাসআলাঃ** মসজিদের দেওয়ালে বা ছাদে কোরআনের আয়াত বা আল্লাহ্‌র নাম লেখা ভাল নয়।

(**মাসআলাঃ** বিনা যরুরতে মসজিদের ছাদ পা দিয়া মাড়ান মক্‌রূহ্‌।)

৬। **মাসআলাঃ** মসজিদের ভিতরে বা মসজিদের দেওয়ালে থুথু বা কাশ ফেলা মক্‌রূহ্‌। যদি নাক ঝাড়ার বা থুথু ফেলার দরকার পড়ে, তবে বাহিরে গিয়া ফেলিয়া আসিবে, অথবা নিজের রুমালে লইয়া মলিয়া ফেলিবে।

(**মাসআলাঃ** জুতা যদি পাকও হয়, তবুও বাহিরে হাঁটিবার পর জুতা পায়ে দিয়া মসজিদে প্রবেশ করা মক্‌রূহ্‌।)

৭। **মাসআলাঃ** ওযূ-গোসল বা কুল্লির পানি মসজিদে ফেলা মক্‌রূহ তাহ্‌রীমী।

৮। **মাসআলাঃ** জানাবাতের অবস্থায় বা হায়েয-নেফাসের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম।

(**মাসআলাঃ** দুর্গন্ধযুক্ত অথবা নাপাক কোন জিনিস লইয়া মসজিদে প্রবেশ করা মক্‌রূহ্‌ তাহ্‌রীমী। যেমন গন্ধক বা কেরোসিন তৈল, পিঁয়াজ, রসুন, তামাক অথবা হুক্কার দুর্গন্ধ ইত্যাদি। নাপাক জিনিস, যথা—বাহ্য, প্রস্রাব বা শুক্রযুক্ত কাপড়, গোবর ইত্যাদিসহ জুতা। গোবর বা নাপাক পানি ইত্যাদি দ্বারা মসজিদ লেপা মক্‌রূহ্‌। মসজিদের ভিতর পেটের বায়ু ছাড়া মক্‌রূহ্‌। যদি বায়ুর বেগ টের পাওয়া যায় তখন বাহিরে গিয়া বায়ু ছাড়িয়া ওযূ করিয়া আসিবে।

৯। **মাসআলাঃ** মসজিদের ভিতর বেচাকেনা করা মক্‌রূহ্‌ তাহ্‌রীমী। অবশ্য মো'তাকেফের জন্য মসজিদের ভিতরে খাওয়া-দাওয়া এবং শয়ন করা জায়েয আছে। এইরূপে তাহার খরচ চলিবার যোগ্য ক্রয়-বিক্রয়ও মসজিদে থাকিয়া জায়েয আছে, কিন্তু মাল আসবাব মস্‌জিদে আনিতে পারিবে না।

১০। **মাসআলাঃ** কাহারও পায়ে যদি কাদা থাকে, তবে তাহা মসজিদের দেওয়ালে বা খাম্বায় মোছা জায়েয নহে।

১১। **মাসআলাঃ** মসজিদের ভিতরে গাছ লাগান মক্‌রূহ্‌। কেননা, ইহা আহ্‌লে কিতাবদের প্রথা। অবশ্য যদি উহাতে মসজিদের কোন উপকার হয়, তবে জায়েয। যেমন, মসজিদের মাটি অত্যন্ত সেঁতসেতে দেওয়াল ধসিয়া পড়ার আশংকা রাহিয়াছে, এমতাবস্থায় যদি গাছ লাগান যায়, তবে গাছ ঐ আর্দ্রতা টানিয়া লইবে।

১২। **মাসআলাঃ** মসজিদকে রাস্তা বানান জায়েয নহে। যদি কোন সময় একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে জায়েয আছে।

১৩। **মাসআলাঃ** মসজিদের মধ্যে বসিয়া শিল্প বা ব্যবসায়ের কোন কাজ করা জায়েয নহে। কেননা, মসজিদ নির্মিত হয় দ্বীনের কাজের জন্য, বিশেষতঃ নামাযের জন্য নির্মিত হয়। অতএব, তথায় দুনিয়ার কাজ হওয়া ঠিক নহে। এমন কি যদি কোন লোক কোরআন শরীফও বেতন লইয়া পড়ায়, তাহারও মসজিদে বসিয়া পড়ান উচিত নহে। কারণ, ইহাও এক প্রকার দুনিয়ার পেশা। অবশ্য যদি মসজিদ পাহারা দেওয়ার দরকার পড়ে এবং কেহ পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে বসে এবং ঐ অবস্থায় নামাযীদের কোন ক্ষতি না করিয়া কিছু রোযগারের কাজও করে, যেমন সেলাইর কাজ ইত্যাদি করে, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে।

আরও কতিপয় বিভিন্ন মাসআলা

[২য় খণ্ডের যমীমা—পরিশিষ্ট]

১। **মাসআলা ঃ** মানুষের শরীর হইতে চুল, দাড়ি, গোঁফ বা অন্য পশম গোড়াশুদ্ধ উপ্‌ড়াইলে উহার গোড়ার চর্বি নাপাক। —শামী

২। **মাসআলা ঃ** যে স্থানে ঈদের নামায ওয়াজিব, সে স্থানে স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্য ফজরের পর ঈদের নামায না হওয়া পর্যন্ত নফল নামায পড়া মক্‌রূহ্।

৩। **মাসআলা** জানাবাতের হালাতে নখ, চুল কাটা বা নাভীর নীচের হাজামত হওয়া মক্‌রূহ্। —আলমগীরী

৪। **মাসআলা ঃ** না-বালেগ অবস্থায় ছেলে-মেয়েরা যে সব নামায পড়ে বা অন্য কোন এবাদত করে, তাহার সওয়াব তাহারা এবং তাহাদের পিতা-মাতা, ওস্তাদ বা অন্য কোন মুরব্বী যাহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহারও পাইবেন।

৫। **মাসআলা ঃ** যে যে সময় নামায পড়া নিষেধ (যেমন, সূর্যোদয়, সূর্য অস্ত এবং ঠিক দ্বিপ্রহর) সেই সময় যদি কেহ আল্লাহ্‌র এবাদত করিতে চায়, তবে দুরূদ শরীফ ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত বা আল্লাহ্‌র যিক্‌র করিতে পারে।

৬। **মাসআলা ঃ** নামাযে যদি একটি লম্বা সূরার প্রথম ভাগ প্রথম রাকা'আতে এবং শেষভাগ দ্বিতীয় রাকা'আতে পড়ে, তবে তাহা মক্‌রূহ্ নহে, দুরুস্ত আছে। এইরূপে যদি প্রথম রাকা'আতে কোন একটি লম্বা সূরার প্রথম হইতে বা মাঝখান হইতে কয়েক আয়াত পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে অন্য একটি সূরার প্রথম হইতে বা মাঝখান হইতে কয়েক আয়াত পড়ে অথবা অন্য একটি ছোট সূরা পুরা পড়ে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে; কিন্তু এইরূপ অভ্যাস করা এবং সব সময় এইরূপ করা ভাল নয়—খেলাফে আওলা। প্রত্যেক রাকা'আতে পূর্ণ একটি সূরা পড়াই উত্তম।

৭। **মাসআলা ঃ** তারাবীহ্‌র মধ্যে কোরআন খতম করিবার সময় হাফেয ছাহেব যদি কোন আয়াত ভুলে ছাড়িয়া গিয়া থাকেন, তবে যতটুকু পরিমাণ ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাহা ত পড়িতে হইবেই (নতুবা কোরআন খতমের সওয়াব পূর্ণ হইবে না, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে) অধিকন্তু তাহার পরে যে পরিমাণ পড়িয়াছিল, তাহাও পুনরায় পড়া মোস্তাহাব। কেননা, এমতাবস্থায় কোরআনের তরতীব ঠিক থাকে না; কিন্তু যদি বেশী পরিমাণ দোহ্‌রাইতে কষ্ট হয় বলিয়া শুধু যে পরিমাণ রহিয়া গিয়াছে তাহা দোহ্‌রাইয়া লয়, তবে তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম বাহির হওয়া, চক্ষু দিয়া পানি বাহির হওয়া এবং নাকের ছিদ্র প্রশস্ত হইয়া যাওয়া ভাল আলামত। শুধু কপালে ঘাম বাহির হওয়াও মৃত্যুর ভাল আলামত।

৯। **মাসআলা ঃ** রাস্তা দিয়া হাঁটিবার সময় যে কাদা, যে পানির ছিটা কাপড়ে লাগে যদি তাহাতে কোন নাপাক বস্তু দেখা না যায়, তবে তাহা মা'ফ, উহা লইয়া নামায পড়িলেও নামায হইয়া যাইবে।

১০। **মাসআলাঃ** ব্যবহৃত পানি নাপাক নহে এবং তাহার দুই চারি ফোঁটা কাপড়ে বা পানিতে পড়িলে তাহাও নাপাক হইবে না বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা ওযূ গোসল না-জায়েয এবং তাহা পান করা অথবা খাওয়ার জিনিসে ব্যবহার করা মকরূহ্; কিন্তু পানির অভাবে যদি কোন নাপাক কাপড় ইত্যাদি উহা দ্বারা ধোয়া হয়, তবে তাহা পাক হইয়া যাইবে।

ব্যবহৃত পানির অর্থ এই যে, যাহার ওযূ ছিল না সে ওযূ করিয়াছে, অথবা যাহার উপর গোছল ফরয ছিল সে গোছল করিয়াছে অথবা ওযূ থাকা সত্ত্বেও সওয়াবের নিয়তে পুনরায় ওযূ করিয়াছে, অথবা গোছল ফরয ছিল না, তবুও জুমু'আ বা ঈদের জন্য সওয়াবের নিয়তে গোছল করিয়াছে। এইরূপ ওযূ বা গোছলে যে পানি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাকে ব্যবহৃত পানি বলে। এইরূপ পানির কথাই উপরে বলা হইয়াছে, নতুবা গোছলের সময় যদি শরীরে কোন নাপাক বস্তু থাকিয়া থাকে বা তাহা দ্বারা অন্য কোন নাপাক বস্তু ধুইয়া থাকে, তবে সেই ধৌত করা পানি নিশ্চয়ই নাপাক, তাহা খাওয়া-দাওয়ায় ব্যবহার করা হারাম।

হায়েয ও এস্তেহাযা

১। **মাসআলাঃ** মেয়ে বালেগ হইলে প্রত্যেক মাসে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পেশাবের রাস্তা দিয়া যে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, তাহাকে হায়েয বা ঋতু বলে।

২। **মাসআলাঃ** হায়েযের মুদ্দত কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত; ঊর্ধ্ব সংখ্যায় দশ দিন দশ রাত। অতএব, যদি তিন দিন তিন রাত অর্থাৎ, ৭২ ঘণ্টার চেয়ে কম রক্তস্রাব হয়, তবে তাহা হায়েয বলিয়া গণ্য হইবে না, উহাকে এস্তেহাযা বলা হইবে। (ইহাতে নামায, রোযা ত্যাগ করিতে পারিবে না।) এইরূপে যদি দশ দিন দশ রাতের চেয়ে অর্থাৎ ২৪০ ঘণ্টার বেশী রক্তস্রাব হয়, তবে অতিরিক্ত রক্তস্রাবকে হায়েয বলা যাইবে না, উহাকে এস্তেহাযা বলা হইবে। (ঐ সময়ে গোছল করিয়া নামায পড়িতে হইবে এবং রোযার মাস হইলে রোযা রাখিতে হইবে।)

৩। **মাসআলাঃ** যদি ৩ দিন ৩ রাত হইতে সামান্যও কম হয়, তবুও হায়েয হইবে না। যেমন শুক্রবার সূর্যোদয়ের সময় শুরু হইয়াছে এবং সোমবার সূর্য উদয়ের সামান্য পূর্বে বন্ধ হইয়াছে। ইহা হায়েয না; এস্তেহাযা।

৪। **মাসআলাঃ** হায়েযের মুদ্দতের ভিতর লাল, হল্‌দে, সবুজ, কালো, মেটে যে কোন রং দেখা যাউক না কেন, হায়েযের রক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। যখন সম্পূর্ণ সাদা রং দেখা দিবে, তখন বুঝিতে হইবে যে, হায়েয বন্ধ হইয়াছে।

৫। **মাসআলাঃ** নয় বৎসরের আগে মেয়েদের হায়েয আসে না। অতএব, যদি কোন ছোট মেয়ের নয় বৎসরের কম বয়সে রক্তস্রাব দেখা দেয় তবে উহা হায়েয হইবে না, উহা এস্তেহাযা হইবে। এইরূপে পঞ্চান্ন বৎসরের পরে সাধারণতঃ মেয়েদের হায়েয আসে না, কিন্তু যদি কোন মেয়েলোকের পঞ্চান্ন বৎসরের পরেও রক্তস্রাব দেখা দেয় এবং রক্তের রং লাল কালো হয়, তবে উহাকে হায়েযই ধরিতে হইবে। আর যদি হল্‌দে, সবুজ বা মেটে রংয়ের হয়, তবে হায়েয হইবে না, এস্তেহাযা হইবে। অবশ্য যদি ঐ মেয়েলোকটির উহার পূর্বেও হল্‌দে, সবুজ বা মেটে রংয়ের স্রাব হওয়ার অভ্যাস থাকিয়া থাকে, তবে তাহা ৫৫ বৎসরের পরেও হায়েয ধরিতে হইবে। আর যদি অভ্যাসের বিপরীত হয়, তবে হায়েয হইবে না বরং এস্তেহাযা হইবে।

৬। মাসআলাঃ যে মেয়েলোকের হামেশা তিন বা চারি দিন হায়েয আসার অভ্যাস ছিল, তাহার যদি কোন মাসে রক্ত বেশী আসে, কিন্তু দশ দিনের বেশী না হয়, সব কয় দিনকেই হায়েয গণ্য করিতেই হইবে, কিন্তু দশ দিন দশ রাতের চেয়ে বেশী আসিলে পূর্ব অভ্যাসের কয় দিন হায়েয হইবে, বাকী কয় দিন এস্তেহাযা। যেমন, হয়ত কোন মেয়েলোকের বরাবর তিন দিন স্রাব হওয়ার অভ্যাস ছিল, হঠাৎ এক মাসে তাহার নয় দিন দশ রাত্রের চেয়ে এক মুহূর্তও বেশী রক্ত দেখা গিয়া থাকে, তবে তাহার তিন দিন তিন রাতের রক্তকে হায়েয গণ্য করিতে হইবে, অতিরিক্ত দিনগুলির রক্তকে এস্তেহাযা বলিতে হইবে এবং ঐ দিনগুলির নামায ক্বাযা ওয়াজিব হইবে।

৭। মাসআলাঃ একজন মেয়েলোকের হায়েযের কোন নিয়ম ছিল না। কোন মাসে চারি দিন, কোন মাসে সাত দিন, কোন মাসে দশ দিনও হইত। ইহা সব হায়েয, কিন্তু হঠাৎ এক মাসে দশ দিন দশ রাতের চেয়ে বেশী স্রাব দেখা গেল, এখন দেখিতে হইবে, ইহার পূর্বের মাসে কয় দিন রক্ত আসিয়াছিল, এই মাসেও সেই কয় দিন হায়েয হইবে, বাকী দিনগুলি এস্তেহাযা হইবে।

৮। মাসআলাঃ একজন মেয়েলোকের হামেশা প্রত্যেক মাসে চারি দিন স্রাব হইত; কিন্তু হঠাৎ এক মাসে পাঁচ দিন স্রাব দেখা গেল এবং তার পরের মাসে পনর দিন স্রাব হইল। অতএব, যে মাসে পনর দিন স্রাব দেখা গিয়াছে সেই মাসের পূর্বের মাসে পাঁচ দিন স্রাব হইয়াছে। এই পনর দিনের মধ্যে হইতে সেই হিসাবে পাঁচ দিনকে হায়েয গণ্য করিতে হইবে; অবশিষ্ট দশ দিন এস্তেহাযায় গণ্য হইবে। পূর্বেকার অভ্যাস ধর্তব্য নহে। মনে করিতে হইবে যে, অভ্যাস পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং পাঁচ দিনের অভ্যাস হইয়াছে। এমতাবস্থায় দশ দিন দশ রাত পার হওয়ার পর গোছল করিয়া নামায শুরু করিবে এবং গত পাঁচ দিনের নামায ক্বাযা পড়িবে।

৯। মাসআলাঃ মেয়েলোকদের হায়েয নেফাসের মাসআলা মাসায়েল ভালমত বুঝিয়া লওয়া একান্ত দরকার। অনেকেই লজ্জায় কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করে না। ভাল আলেমের নিকট এসব মাসআলা জানিয়া লওয়া কর্তব্য। মেয়েলোকদের জন্য কোন্ মাসে কত দিন রক্তস্রাব দেখা দিল, তাহা স্মরণ রাখাও একান্ত দরকার। কারণ, পরবর্তী মাসের হুকুম অনেক সময় পূর্ববর্তী মাসের ঘটনার উপর নির্ভর করে। যেমন, যদি কোন মেয়েলোকের কোন মাসে দশ দিনের চেয়ে বেশী রক্তস্রাব দেখা যায়, আর তার পূর্বের মাসের কথা স্মরণ না থাকে এবং পূর্বের অভ্যাসও স্মরণ না থাকে, তবে এই মাসআলা এত কঠিন হইয়া যায় যে, সাধারণ লোক ত দূরের কথা অনেক আলেমও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই জন্যই এইরূপ ভুলকারিণীর মাসআলা এখানে লিখা হইল না। চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে ভুল না হয়। ভুল হইয়া গেলে উপযুক্ত আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে।

১০। মাসআলাঃ একটি মেয়ে প্রথম প্রথম ঋতুস্রাব দেখিল। ইহার পূর্বে আর তার ঋতুস্রাব অর্থাৎ ঋতু হয় নাই। অতএব, যদি দশ দিন বা তার চেয়ে কম স্রাব হয়, তবে যে কয় দিন স্রাব হইবে, সব দিনই তাহার হায়েযের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি দশ দিন দশ রাতের চেয়ে বেশী স্রাব হয়, তবে দশ দিন দশ রাত পুরা হায়েযের মধ্যে গণ্য হইয়া অবশিষ্ট যে কয় দিন বা ঘণ্টা বেশী হয়, তাহা এস্তেহাযার মধ্যে গণ্য হইবে। (সুতরাং এই মেয়ের দশ দিন দশ রাত পূর্ণ হওয়া মাত্র গোছল করিতে হইবে এবং নামায পড়িতে হইবে।)

১১। মাসআলাঃ যদি কোন মেয়েলোকের প্রথমবারেই রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়া আর বন্ধ না হয়, একাদিক্রমে কয়েক মাস যাবৎ জারী থাকে, তবে তাহার যে দিন হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ

হইয়াছে সেইদিন হইতে দশ দিন দশ রাত হায়েয ধরিতে হইবে এবং পরের বিশ দিন এস্তেহাযা ধরিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক মাসে তাহার দশ দিন হায়েয, বিশ দিন এস্তেহাযা হিসাব করিতে হইবে।

১২। মাসআলাঃ দুই হায়েযের মাঝখানে পাক থাকার মুদ্দৎ কমের পক্ষে পনর দিন, আর বেশীর কোন সীমা নাই। অতএব, যদি কোন মেয়েলোকের কোন কারণবশতঃ কয়েক মাস যাবৎ হায়েয বন্ধ থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঋতুস্রাব না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পাক থাকিবে।

১৩। মাসআলাঃ যদি কোন মেয়েলোকের তিন দিন তিন রাত রক্ত দেখা যায়, তারপর ১৫ দিন পাক থাকে; আবার তিন দিন তিন রাত রক্ত দেখে, তবে আগেকার তিন দিন তিন রাত এবং পনর দিনের পর তিন দিন তিন রাত হায়েয ধরিবে। আর মধ্যকার দিন পাক থাকার সময়।

১৪। মাসআলাঃ যদি কোন মেয়েলোক এক দিন বা দুই দিন ঋতুস্রাব দেখিয়া পনর দিন পাক থাকে এবং আবার এক দিন বা দুই দিন রক্ত দেখে, তবে সে যে পনর দিন পাক রহিয়াছে তাহা তো পবিত্রতারই সময়, আর এদিক-ওদিক যে কয়দিন রক্ত দেখিয়াছে, উহাও হায়েয নহে বরং এস্তেহাযা।

১৫। মাসআলাঃ এক দিন, দুই দিন বা কয়েক দিন ঋতুস্রাব দেখা দিয়া যদি কয়েক দিন—পাঁচ দিন, সাত দিন বা দশ দিন, পনর দিনের কম রক্ত বন্ধ থাকিয়া আবার রক্ত দেখা দেয়, তবে মাঝের রক্তের বন্ধের দিনগুলিকে পাক ধরা যাইবে না, সে দিনগুলিকেও স্রাবেরই দিন ধরিতে হইবে। অতএব, যে কয় দিন হায়েযের নিয়ম ছিল, সেই কয় দিনকে হায়েয ধরিয়া বাকী দিনগুলিকে এস্তেহাযা ধরিতে হইবে। যেমন, একটি মেয়েলোকের নিয়ম ছিল, চাঁদের পহেলা, দোস্‌রা এবং তেস্‌রা এই তিন দিন তাহার হায়েয আসিত। তারপর একমাসে এমন হইল যে, পহেলা তারিখে স্রাব দেখা দিয়া চৌদ্দ দিন রক্ত বন্ধ থাকিল, ষোল তারিখে আবার রক্ত দেখা দিল, এইরূপ অবস্থা হইলে মনে করিতে হইবে যেন, ষোল দিনই রক্তস্রাব অনবরত জারী রহিয়াছে। এই ষোল দিনের মধ্য হইতে প্রথম তিন দিনকে হায়েয ধরিয়া বাকী তের দিনকে এস্তেহাযা ধরিতে হইবে। (অতএব, প্রথম তারিখে রক্ত দেখা দিলে নামায পড়া বন্ধ করিতে হইবে। পরে যখন দুই এক দিন পর রক্ত বন্ধ হইল, তখন গোছল করিয়া নামায পড়া আরম্ভ করিতে হইবে এবং ঐ এক দুই দিনের নামায ক্বাযা পড়িতে হইবে। পরে যখন আবার ষোল তারিখে রক্ত দেখা দিল এবং সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, প্রথমের তিন দিন হায়েয ছিল, পরের তের দিন এস্তেহাযা ছিল, তখন জানা গেল যে, প্রথম তিন দিন নামায মা'ফ ছিল, সেই কয় দিনের নামাযের ক্বাযা পড়ার দরকার নাই। তার পরের নামাযগুলি যদি গোছল করিয়া পড়িয়া থাকে, তবে নামায হইয়া গিয়াছে। আর যদি গোছল না করিয়া থাকে, তবে সেই কয় দিনের নামায ক্বাযা পড়িতে হইবে। পরে যখন ষোল তারিখে রক্ত দেখা দিয়াছে, তখন রক্ত দেখা সত্ত্বেও গোছল করিয়া নাময পড়িতে হইবে। কারণ উহা হায়েযের রক্ত নহে—এস্তেহাযার রক্ত, এই মেয়েলোকটির যদি ৪/৫/৬ তারিখে (এই তিন দিন) হায়েয আসার নিয়ম ছিল, তবে ৪/৫/৬ এই তিন দিন তাহার হায়েযের মধ্যে গণ্য হইবে। (যদিও এই তিন দিন রক্ত না দেখা গিয়া থাকে) আর প্রথম তিন দিন এবং পরে ১০ দিন এস্তেহাযা ধরিবে। আর যদি কোনই নিয়ম না থাকিয়া থাকে বরং প্রথম বারেই এইরূপ হইয়া থাকে, তবে প্রথম দশ দিনকে হায়েয এবং পরের ছয় দিনকে এস্তেহাযা ধরা হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ গর্ভাবস্থায় যদি কোন কারণবশতঃ রক্তস্রাব দেখা দেয়, তবে সেই রক্তকে হায়েয বলা যাইবে না, যে কয়েক দিনই হউক উহা এস্তেহাযা।

১৭। মাসআলা ঃ প্রসবের সময় বাচ্চা পয়দা হইবার পূর্বে যদি রক্তস্রাব হয় উহাকে এস্তেহাযা বলা হইবে। এমন কি যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চার বেশী অর্ধেক বাহিরে না আসিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে রক্ত দেখা দিবে, তাহাকে এস্তেহাযাই বলিতে হইবে।

হায়েযের আহ্‌কাম

১। মাসআলা ঃ হায়েযের মুদ্দতের মধ্যে ফরয, নফল কোন রকম নামায পড়া দুরুস্ত নহে এবং রোযা রাখাও দুরুস্ত নহে। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, হায়েযের মুদ্দতের মধ্যে যত ওয়াক্ত নামায আসে সব মা'ফ হইয়া যায়, তাহার আর ক্বাযাও করিতে হয় না। কিন্তু যে কয়টি রোযা ছুটিয়া যায়, পরে তাহার ক্বাযা করিতে হয়।

২। মাসআলা ঃ তবে ওয়াক্তের ফরয নামাযের মধ্যেই যদি হায়েয আসিয়া পড়ে, ঐ নামায মা'ফ হইয়া যাইবে। পাক হওয়ার পর ক্বাযা করিতে হইবে না। অবশ্য যদি নফল বা সুন্নত নামাযের মধ্যে হায়েয আসে, তবে সে নামাযের পুনরায় ক্বাযা পড়িতে হইবে। এইরূপে রোযার মধ্যে যদি হায়েয আসে, এমন কি যদি মাত্র সামান্য বেলা থাকিতেও হায়েয আসে, তবুও সে রোযার ক্বাযা করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থা হইলে নফল রোযারও ক্বাযা করিতে হইবে।

৩। মাসআলা ঃ ওয়াক্তের নামায এখনও পড়ে নাই, কিন্তু নামায পড়িবার মত ওয়াক্ত এখনও আছে, এমন সময় যদি হায়েয দেখা যায়, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায মা'ফ হইয়া যাইবে।

৪। মাসআলা ঃ হায়েযের মুদ্দতের মধ্যে স্ত্রীসঙ্গম জায়েয নহে ; কিন্তু এক সঙ্গে খাওয়া, বসা, পাক করা, এক বিছানায় শয়ন (চুম্বন ও আলিঙ্গন করা) জায়েয আছে। (হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করিলে যে পাপ হয়, তাহা হইবে আত্মরক্ষা করিবার মত সংযম যদি স্বামীর না থাকে, তবে তাহার চুম্বন ও আলিঙ্গন করাও উচিত নহে।)

৫। মাসআলা ঃ একজন মেয়েলোকের পাঁচ দিন বা নয় দিন হায়েয থাকার নিয়ম ছিল। নিয়ম মত ঋতুস্রাব হইয়া রক্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রক্ত বন্ধ হওয়া মাত্রই তাহার উপর গোছল করা ফরয হইবে। গোছল করার পূর্বে সহবাস জায়েয হইবে না। অবশ্য যদি কোন কারণবশতঃ গোছল করিতে না পারে এবং এত পরিমাণ সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহাতে এক ওয়াক্ত নামাযের ক্বাযা তাহার যিম্মায় ফরয হইয়া পড়ে, তখন সহবাস জায়েয হইবে, ইহার পূর্বে নহে।

৬। মাসআলা ঃ যে মেয়েলোকের পাঁচদিন হায়েয আসার নিয়ম আছে, তাহার যদি এক মাসে চারি দিন রক্ত দেখা দিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে রক্ত বন্ধ হওয়া মাত্র গোছল করিয়া নামায পড়া ওয়াজিব। কিন্তু পাঁচ দিন পুরা না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা জায়েয হইবে না। কেননা, হয়ত আবার রক্ত দেখা দিতে পারে।

৭। মাসআলা ঃ যদি দশ দিন পুরা ঋতুস্রাব হইয়া হায়েয বন্ধ হয়, তবে গোছলের পূর্বেও সহবাস করা জায়েয হইবে।

৮। মাসআলা ঃ যদি এক দিন বা দুই দিন রক্ত দেখা দিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে গোছল করা ফরয নহে, ওযূ করিয়া নামায পড়িবে, কিন্তু সহবাস করা জায়েয হইবে না। তারপর যদি পনর দিন পাক থাকার আগে আবার রক্ত দেখা দেয়, তবে বুঝা যাইবে যে, উহা হায়েযের রক্ত ছিল।

অতএব, হায়েযের কয়দিন বাদ দিয়া এখন গোছল করিয়া নামায পড়িবে। আর যদি পুরা পনর দিন পাক থাকিয়া থাকে, তবে বুঝা যাইবে যে, উহা এস্তেহাযার রক্ত ছিল। অতএব, এক দিন বা দুই দিন রক্ত দেখার কারণে যে কয় ওয়াক্ত নামায পড়ে নাই, তাহার ক্বাযা পড়িতে হইবে।

৯। **মাসআলা**ঃ কোন মেয়েলোকের তিন দিন হায়েয আসার নিয়ম ছিল। এক মাসে তাহার এইরূপ অবস্থা হইলে যে, তিন দিন পুরা হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও রক্ত বন্ধ হইল না। এইরূপ অবস্থা হইলে তাহার তখন গোছলও করিতে হইবে না, নামাযও পড়িতে পারিবে না। যদি পুরা দশ দিনের মাথায়, অথবা তার চেয়ে কমে রক্ত বন্ধ হয়, তবে এইসব কয় দিনের নামায মা'ফ থাকিবে, ক্বাযা পড়িতে হইবে না। মনে করিতে হইবে যে, নিয়মের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। অতএব, এই কয় দিনই হায়েযের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি দশ দিনের পরও রক্ত জারী থাকে, তবে এখন বুঝা যাইবে যে, হায়েয মাত্র তিন দিন ছিল, বাকী সব এস্তেহাযা ছিল। অতএব দশ দিন শেষ হওয়ার পর গোছল করিবে এবং রক্ত জারী থাকা সত্ত্বেও নামায পড়িবে এবং গত সাত দিনের নামায ক্বাযা পড়িতে হইবে।

১০। **মাসআলা**ঃ যদি দশ দিনের কম হায়েয হয় এবং এমন সময় রক্ত বন্ধ হয় যে, নামাযের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, যদি তৎক্ষণাৎ খুব তাড়াতাড়ি গোছল করে, তবে এতটুকু সময় পাইতে পারে যে, নিয়্যত করিয়া শুধু "আল্লাহু আকবর" বলিয়া তাহ্‌রীমা বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারে, এর চেয়ে বেশী সময় নাই, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায তাহার উপর ওয়াজিব এবং ক্বাযা পড়িতে হইবে। আর যদি এতটুকু সময়ও না পায় যে, গোছল করিয়া তাহ্‌রীমা বাঁধিতে পারে, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায মা'ফ হইয়া যাইবে, ক্বাযা পড়িতে হইবে না।

১১। **মাসআলা**ঃ আর যদি পূর্ণ দশ দিনে হায়েযের রক্ত বন্ধ হয় এবং এমন সময় রক্ত বন্ধ হয় যে, গোছল করার সময় নাই, মাত্র একবার "আল্লাহু আকবর" বলার সময় আছে, তবুও ঐ ওয়াক্তের ক্বাযা পড়িতে হইবে।

১২। **মাসআলা**ঃ রমযান শরীফে দিনের বেলায় যদি হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ গোছল করিবে এবং নামাযের ওয়াক্ত হইলে নামায পড়িবে এবং যদিও এই দিনের রোযা তাহার হইবে না কিন্তু অবশিষ্ট দিনে তাহার জন্য কিছুই খাওয়া-পেওয়া দুরুস্ত হইবে না, অন্যান্য রোযাদারের মত তাহারও এফ্‌তারের সময় পর্যন্ত না খাইয়া থাকা ওয়াজিব হইবে। পরে কিন্তু এই দিনেরও ক্বাযা রোযা রাখিতে হইবে।

১৩। **মাসআলা**ঃ যদি পূর্ণ দশ দিন হায়েয আসার পর রাত্রে পাক হয়, তবে যদি এতটুকু রাত বাকী থাকে যে, তাহাতে একবার "আল্লাহু আকবরও" বলিতে পারে না, তবুও সকালে রোযা ওয়াজিব হইবে। আর যদি দশ দিনের কম হায়েয আসে এবং এতটুকু রাত্র বাকী থাকে যে, তৎক্ষণাৎ গোছল করিতে পারে কিন্তু গোছলের পর একবারও "আল্লাহু আকবর" বলিতে পারে না, তবুও সকাল হইতে রোযা ওয়াজিব হইবে। এমতাবস্থায় গোছল না করিলেও রোযার নিয়্যত করিবে। রোযা ছাড়িবে না, সকালে গোছল করিবে। আর যদি রাত্র ইহা হইতে কম থাকে যে, গোছলও করিতে পারে না, তবে সকালে রোযা রাখা জায়েয নহে। কিন্তু দিনে কোনকিছু পানাহার করাও দুরুস্ত নাই বরং দিনে রোযাদারের মত থাকিবে, পরে উহার ক্বাযা রাখিবে।

১৪। **মাসআলা**ঃ ছিদ্রের বাহিরে যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত না আসিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হায়েয ধরা যাইবে না। অতএব, যদি কোন মেয়েলোক ছিদ্রের ভিতর রুই, তূলার গদ্দি রাখিয়া রক্তকে ছিদ্রের

মধ্যেই বন্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত বাহিরে না আসিবে বা গদ্দি টানিয়া বাহির না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হায়েয ধরা হইবে না। যখন রক্তের চিহ্ন বাহিরের চামড়া পর্যন্ত আসিবে বা তূলা টানিয়া বাহির করিবে, তখন হইতে হায়েয হিসাব হইবে।

১৫। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোক এশার নামায পড়িয়া পাক অবস্থায় ছিদ্রের ভিতর রুই, তূলার গদ্দি রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া যদি তূলার মধ্যে রক্তের চিহ্ন দেখে, তবে যে সময় রক্তের চিহ্ন দেখিবে, সেই সময় হইতেই হায়েয ধরা হইবে—ঘুমের সময় হইতে নহে।

এস্তেহাযার হুকুম

১। মাসআলা ঃ এস্তেহাযার কারণে নামায ও রোযা কোনটাই ছাড়িতে পরিবে না। ইচ্ছা করিলে স্বামী-সহবাস করিতে পারিবে। অবশ্য সত্বর ওযূ করিয়া নামায পড়িতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ নাক দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিলে বা হামেশা পেশাব, পায়খানা, রক্ত বা বায়ু জারী থাকিলে যেরূপ মা'যূরের হুকুম হয়, তদ্রূপ এস্তেহাযার রক্তের কারণেও মা'যূরের হুকুম হইবে। মা'যূরের হুকুম মা'যূরের বয়ানে দেখুন।

নেফাস

১। মাসআলা ঃ সন্তান প্রসব হওয়ার পর পেশাবের রাস্তা দিয়া যে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে নেফাস বলে। নেফাসের মুদ্দত ঊর্ধ্ব সংখ্যায় চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিন অপেক্ষা বেশী নেফাস হইতে পারে না। কমের কোন সীমা নাই। যদি কাহারও এক দুই ঘন্টা মাত্র রক্তস্রাব হইয়া রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তবে মাত্র ঐ এক দুই ঘন্টাকেই নেফাস বলা হইবে।

২। মাসআলা ঃ যদি কাহারও প্রসবের পর রক্তস্রাব মাত্রই না হয়, তবুও তাহার উপর গোছল ফরয হইবে।

। মাসআলা ঃ প্রসবের সময় সন্তানের অর্ধেকের বেশী বাহির হওয়ার পর যে রক্তস্রাব হইবে উহা নেফাস হইবে। আর যদি অর্ধেকের কম বাহির হওয়ার পর রক্তস্রাব হয়, তবে উহা এস্তেহাযা হইবে। অতএব, যদি হুঁশ থাকে, তবে নামাযের ওয়াক্ত হইলে ঐ অবস্থায়ও ওযূ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। নামায না পড়িলে গোনাহ্গার হইবে; এমন কি ইশারায় হইলেও নামায পড়িতে হইবে। খবরদার! হুঁশ থাকিয়া নামায ক্বাযা করিবে না। অবশ্য যদি নামায পড়িলে সন্তানের জীবন নাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে সন্তানের জীবন রক্ষার্থে নামায ছাড়িয়া দিবে (ঐ সময় এস্তেগ্ফার পড়িবে)।

৪। মাসআলা ঃ যদি কোন মেয়েলোকের গর্ভপাত হয় এবং সন্তানের এক আধটা অঙ্গ পরিষ্কার দেখা যায়, তবে গর্ভপাতের পর যে রক্তস্রাব হইবে উহাকে নেফাস ধরিতে হইবে। আর যদি সন্তানের মাত্রও আকৃতি না দেখা যায়, শুধু মাত্র একটা মাংসপিণ্ড দেখা যায়, তবে দেখিতে হইবে যে, ইতিপূর্বে অন্ততঃপক্ষে পনর দিন পাক ছিল কি না এবং রক্তস্রাব কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত জারী থাকে কি না। যদি এরূপ হয়, তবে উহাকে হায়েয গণ্য করিয়া হায়েযের কয় দিন নামায-রোযা পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর যদি এইরূপ না হয়, তবে ঐ রক্তস্রাবকে এস্তেহাযা ধরিতে হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি কোন মেয়েলোকের প্রসবান্তে চল্লিশ দিনের বেশী রক্তস্রাব হয় এবং তাহার ইহাই প্রথম প্রসব হয়, তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নেফাস ধরিতে হইবে। চল্লিশ দিন যখন পুরা হইবে, তখন গোছল করিয়া নামায পড়িতে হইবে। আর যদি ইতিপূর্বে আরও সন্তান প্রসব হইয়া থাকে এবং তাহার নেফাসের মুদ্দতের কোন নিয়ম থাকে, তবে নিয়মের কয়দিন নেফাস হইবে, বেশী কয়দিন এস্তেহাযা হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** কোন মেয়েলোকের নিয়ম ছিল, প্রসবান্তে ত্রিশ দিন রক্তস্রাব হওয়ার, কিন্তু একবার ত্রিশ দিন চলিয়া যাওয়ার পরও রক্ত বন্ধ হইল না; তাহা হইলে এই মেয়েলোক এখন গোছল করিবে না, অপেক্ষা করিবে। যদি পূর্ণ চল্লিশ দিনের শেষে বা চল্লিশ দিনের ভিতর রক্ত বন্ধ হয়, তবে সব কয়দিনই নেফাসের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি চল্লিশ দিনের বেশী রক্তস্রাব জারী থাকে, তবে ত্রিশ দিন নেফাসের মধ্যে গণ্য হইবে; অবশিষ্ট কয় দিন এস্তেহাযা। চল্লিশ দিনের পর গোছল করিবে এবং নামায পড়িবে। ত্রিশ দিনের পরের দশ দিনের নামায ক্বাযা পড়িবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি চল্লিশ দিনের পূর্বেই নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হয়, তবে স্রাব বন্ধ হওয়া মাত্রই গোছল করিয়া নামায পড়িতে হইবে। গোছল করিলে যদি স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়, তবে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে। খবরদার! এক ওয়াক্ত নামাযও ক্বাযা হইতে দিবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** নেফাসের মধ্যেও হায়েযের মত নামায একেবারে মা'ফ। কিন্তু রোযার ক্বাযা রাখিতে হইবে এবং নামায, রোযা ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন সবই হারাম।

৯। **মাসআলা ঃ** কোন মেয়েলোকের যদি ছয় মাসের ভিতরে আগে পরে দুইটি সন্তান প্রসব হয়, যেমন প্রথম সন্তান প্রসব হওয়ার দুই চারি দিন পরে বা দশ বিশ দিন পরে যদি দ্বিতীয় সন্তান প্রসব হয়, তবে প্রথম সন্তান প্রসবের পর হইতেই নেফাসের মুদ্দত গণনা করিতে হইবে—দ্বিতীয় সন্তান হইতে নহে।

নেফাস ও হায়েয ইত্যাদির আহ্‌কাম

১। **মাসআলা ঃ** যে মেয়েলোক হায়েয বা নেফাসের অবস্থায় আছে, অথবা যাহার উপর গোছল ফরয হইয়াছে, তাহার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা, কা'বা শরীফের তওয়াফ করা, কোরআন শরীফ পাঠ করা এবং স্পর্শ করা দুরুস্ত নাই, অবশ্য কোরআন শরীফ যদি জুযদানের ভিতর থাকে অথবা রুমাল দ্বারা পেঁচান থাকে, তবে জুযদানের ও রুমালের উপর দিয়া ধরা জায়েয আছে; কিন্তু চামড়া, কাপড় বা কাগজ যদি কোরআন শরীফের সঙ্গে সেলাই করা না থাকে, তবে তাহা দ্বারা উপরোক্ত অবস্থায় কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয আছে।

২। **মাসআলা ঃ** যাহার ওযূ নাই তাহার জন্যও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নহে, অবশ্য পড়াতে বাধা নাই।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি টাকা পয়সা (বা নোটের মধ্যে,) অথবা তশ্‌তরী, তাবীয বা যে-কোন পাতা বা কাগজের মধ্যে কোরআনের আয়াত লেখা থাকে, তবে তাহাও উপরোক্ত অবস্থাসমূহে অর্থাৎ, বিনা ওযূতে, হায়েয নেফাস এবং জানাবাতের অবস্থায় স্পর্শ করা জায়েয নহে। অবশ্য যদি এ সমস্ত জিনিস কোন থলির মধ্যে বা অন্য কোন পাত্রের মধ্যে থাকে, তবে সে থলি বা পাত্র ধরিতে বা উঠাইতে পারে।

৪। **মাসআলা ঃ** (উপরোক্ত অবস্থাসমূহে পরনের কাপড়ের আঁচল দিয়া বা গায়ের জামার আস্তিন বা দামান দিয়াও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নহে।)
অবশ্য যে কাপড়, চাদর, রুমাল উড়নী বা জামা পরিধানে নাই—পৃথক আছে, তাহা দ্বারা কোরআন শরীফ ধরা জায়েয আছে।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি পূর্ণ আয়াত না পড়ে ; বরং আয়াতের সামান্য শব্দ অথবা অর্ধেক আয়াত পড়ে, তবে দুরুস্ত আছে, কিন্তু ঐ অর্ধেক আয়াত এত বড় না হওয়া চাই যে, ছোট একটি আয়াতের সামান হইয়া যায়।

৬। **মাসআলা ঃ** হায়েয, নেফাস ও জানাবাত অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করা জায়েয আছে। অতএব, কোরআনের যে আয়াতের মধ্যে দো'আ (প্রার্থনা) আছে সেই আয়াত যদি কেহ তেলাওয়াতরূপে না পড়িয়া দো'আরূপে পড়িয়া তদ্দ্বারা দো'আ চায়, তবে তাহা জায়েয আছে। যেমন, যদি কেহ উপরোক্ত অবস্থায় অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া—

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

প্রার্থনারূপে পড়ে বা اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দো'আরূপে পড়ে, বা رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْاَخْطَاْنَا الخ মোনাজাতরূপে পড়ে, তবে তাহা জায়েয আছে।

৭। **মাসআলা ঃ** উক্ত অবস্থায় দো'আয়ে কুনূত পড়া জায়েয আছে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কোন মেয়েলোক মেয়েদেরে কোরআন শরীফ পড়ায়, তবে এমতাবস্থায় বানান করান দুরুস্ত আছে, মিলাইয়া পড়াইবার সময় পূর্ণ আয়াত পড়িবে না বরং একটা কিংবা দুইটা দুইটা শব্দের পর শ্বাস ছাড়িয়া দিবে এবং কাটিয়া কাটিয়া আয়াতকে মিলাইয়া বলিয়া দিবে।

৯। **মাসআলা ঃ** উপরোক্ত অবস্থাসমূহে কলেমা শরীফ পড়া, দুরূদ শরীফ পড়া, অল্লাহ্‌র যেকের করা, এস্তেগফার পড়া, তসবীহ্ পড়া অর্থাৎ, সোব্‌হানাল্লাহ্, আল্‌হামদু-লিল্লাহ্, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আক্‌বর, লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম ইত্যাদি পড়া জায়েয আছে।

১০। **মাসআলা ঃ** হায়েযের অবস্থায়ও ওযূ করিয়া পাক জায়গায় ক্বেব্‌লামুখী হইয়া বসিয়া নামাযের সময়টুকু আল্লাহ্‌র যেকেরে মশ্‌গুল থাকা মোস্তাহাব। যেন নামাযের অভ্যাস ছুটিয়া না যায়, পাক হওয়ার পর নামায পড়িতে ঘাব্‌ড়াইয়া না যায়।

১১। **মাসআলা ঃ** কোন মেয়েলোকের উপর গোছল ফরয হইয়াছিল। গোছল না করিতেই হায়েয আসিয়া গেল। এই অবস্থায় তাহার আর গোছল করার দরকার নাই, যখন হায়েয হইতে পাক হইবে, তখন এক গোছলেই উভয় গোছল আদায় হইয়া যাইবে।

না-পাক জিনিস পাক করিবার উপায়

১। **মাসআলা ঃ** শরীরে বা কাপড়ে যদি শুধু গাঢ় মনি (বীর্য) লাগিয়া শুকাইয়া যায়, তাহার সঙ্গে পেশাব মিশ্রিত না থাকে, তবে তাহা না ধুইয়া শুধু রগড়াইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারিলেও পাক হইয়া যাইবে, কিন্তু ভিজা থাকিলে বা কিছু পেশাব মিশ্রিত থাকিলে, তাহা না ধুইলে পাক হইবে না ; তখন ধোয়া ফরয হইবে।

নামাযের বয়ান

১। **মাসআলাঃ** কোন মেয়েলোকের সন্তান প্রসব হইতেছে, কিন্তু এখনও সন্তানের অর্ধেক বাহির হয় নাই, কম-অর্ধেক বাহির হইয়াছে, অথচ নামাযের ওয়াক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় যদি মেয়েলোকটির হুঁশ বুদ্ধি ঠিক থাকিয়া থাকে এবং সন্তানের কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা না থাকে, তবে তাহার এইরূপ অবস্থায়ও (ওযূ করিয়া হউক বা তায়াম্মুম করিয়া হউক) নামায পড়িয়া লইতে হইবে। আর যদি সন্তানের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে ঐ সময় নামায পড়িবে না, পরে ক্বাযা পড়িয়া লইবে। তদ্রূপ ধাত্রী যদি এইরূপ অবস্থায় সন্তান প্রসব রাখিয়া দিয়া নামায পড়িতে যায়, এবং সন্তানের বা প্রসূতির জীবনের আশঙ্কা হয়, তবে সে এইরূপ অবস্থায় নামায পড়িতে যাইবে না, তাহারও তখন নামায ছাড়িতে হইবে, পরে প্রসবের কাজ সমাধা করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র ক্বাযা পড়িয়া লইবে।

যৌবনকাল আরম্ভ বা বালেগ হওয়া

১। **মাসআলাঃ** কোন একটি মেয়ের ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়াছে, অথবা ঋতুস্রাব হয় নাই বটে; কিন্তু সহবাসের কারণে গর্ভ ধারণ করিয়াছে, অথবা গর্ভ ধারণও করে নাই, ঋতুস্রাবও হয় নাই; কিন্তু স্বপ্নে পুরুষের সঙ্গে সহবাস করিতে দেখিয়া আনন্দ বোধ করিয়াছে এবং বীর্যপাত হইয়াছে, অথবা এই তিন অবস্থার কোনটিই হয় নাই; কিন্তু বয়স (চান্দ্রমাসের হিসাবে) পূর্ণ পনর বৎসর হইয়া গিয়াছে। এই চারি অবস্থাতেই এই মেয়েকে এখন যুবতী বলিতে হইবে এবং শরীঅতের যাবতীয় হুকুম তাহার উপর এখন হইতে পূর্ণরূপে বর্তিবে।

২। **মাসআলাঃ** শরীঅতের ভাষায় যুবককে 'বালেগ' এবং যুবতীকে 'বালেগা' বলে এবং যৌবন-প্রাপ্তিকে 'বুলুগ' বা 'বালেগ হওয়া' বলে। নয় বৎসরের পূর্বে কোন মেয়েছেলে এবং বার বৎসরের পূর্বে বেটাছেলে বালেগ হয় না। যদি নয় বৎসরের পূর্বে মেয়ের ঋতুস্রাব হয়, তবে তাহা হায়েয নহে, রোগ। (এইরূপে বার বৎসরের পূর্বে যদি কোন বেটাছেলের বীর্যপাত হয়, তবে তাহাও রোগ।)

পরিশিষ্ট

নামাযের ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অনুবাদ—নামায নিবৃত্ত রাখে লজ্জাকর কাজ হইতে এবং মন্দ কাজ হইতে অর্থাৎ, নামাযের হক আদায় করিয়া পূর্ণ ভক্তির সহিত নামায আদায় করিতে থাকিলে ক্রমশঃ নামাযীর অন্যান্য সমস্ত গোনাহ্‌র অভ্যাস ছুটিয়া যায়।

১। **হাদীস**ঃ হযরত ইমাম হাসান বছরী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (ইনি উচ্চ পর্যায়ের আলেম এবং দরবেশ ছিলেন। তিনি ছাহাবায়ে কেরামের দর্শন লাভ করিয়াছেন। হাফেয মোহাদ্দেস যাহাবী (রঃ) তাঁহার ঘটনাবলী সম্বলিত একখানা পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন) জনাব রসূল (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন নামায পড়ে, যাহার নামায তাহাকে নির্লজ্জতা ও গোনাহ্র কাজ হইতে বিরত রাখে না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ হইতে দূরত্ব ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে অগ্রসর হয় নাই। ঐ নামায দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হইবে না এবং সওয়াবও পাইবে না; বরং আল্লাহ্ পাক হইতে দূরত্ব বৃদ্ধি পাইবে। এমন প্রিয় এবাদতের কদর এবং হক্ আদায় না করায় তাহার এই শাস্তি হইবে। অতএব, জানা গেল যে, নামায কবূল হওয়ার কষ্টি পাথর এবং চিহ্ন এই যে, নামাযী নামায পড়ার কারণে গোনাহ্ হইতে বিরত থাকে, কখনও যদি গোনাহ্ হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ তওবা করিয়া লয়।

২। **হাদীস**ঃ আবদুল্লাহ্-ইব্নে-মাছউদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত আছে—হযরত নবী আলাইহিস্সালাম ফরমাইয়াছেনঃ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يُطِعِ الصَّلٰوةَ الخ 'যে নামাযের তাবে'দারী না করিবে, তাহার নামায আল্লাহ্র দরবারে কবূল হইবে না।' নামাযের তাবে'দারীর অর্থ এই যে, নামায পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাযের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবে অর্থাৎ, লজ্জাকর কাজসমূহ হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। অন্য এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করিল, অমুক ব্যক্তি সারা রাত্রি জাগিয়া নামায পড়ে; কিন্তু যখন রাত্রি ভোর হয় তখন গিয়া চুরি করে। হযরত (দঃ) বলিলেন, অদূর ভবিষ্যতে উহা তাহাকে তাহার কু-অভ্যাস হইতে ফিরাইয়া আনিবে। হাদীসটি এই—

جَآءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صلعم فَقَالَ اِنَّ فُلَانًا يُّصَلِّىْ بِاللَّيْلِ فَاِذَا اَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ اِنَّهٗ سَيَنْهَاهُ مَاتَقُوْلُ — درمنثور

৩। **হাদীস**ঃ ওবাদা-ইবনে-ছামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়ত আছেঃ হযরত নবী (আঃ) ফরমাইয়াছেন, 'যে বান্দা ওযূ করিবার সময় উত্তমরূপে ওযূ করে (অর্থাৎ, সমস্ত সুন্নত, মোস্তাহাব আদায় করিয়া ওযূ করে) এবং তারপর যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন উত্তমরূপে রুকূ-সজ্দা, কেরাআত আদায় করিয়া নামায পড়ে, ঐ নামায তাহার জন্য দো'আ করে এবং বলে, তুমি যেমন আমার যত্ন লইয়াছ এবং আমার হক আদায় করিয়াছ, আল্লাহ্ তা'আলা তদ্রূপ তোমার যত্ন লউক এবং তোমার হক আদায় করুক। তারপর ঐ নামাযকে পূর্ণ উজ্জ্বলতার সহিত ফেরেশ্তাগণ আসমানের দিকে লইয়া যান এবং আসমানের দরজা ঐ নামাযের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ, আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছিয়া মকবূল হইয়া যায়। আর যে বান্দা ওযূ ভালমত করে না এবং নামাযের কেরাআত, রুকূ-সজ্দা ভালমত আদায় করে না, ঐ নামায তাহাকে বদ দো'আ করে এবং বলে, 'তুই যেমন আমাকে নষ্ট করিয়াছিস্, খোদা তোকে ঐরূপ নষ্ট করুক'। তারপর ঐ নামাযকে মলিন বেশে আসমানের দিকে লইয়া যাওয়া হয়, তখন আসমানের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ, কবূল হয় না। তারপর ময়লা কাপড়ের মত পোটলা পেঁচাইয়া ঐ নামাযীর মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারা হয় অর্থাৎ, কবূল হয় না এবং সওয়াব পায় না।

৪। **হাদীস**ঃ আবদুল্লাহ্-এব্নে মোগাফফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়ত আছেঃ রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—'সব চেয়ে বড় চোর সে-ই, যে নিজের

নামায চুরি করে, লোকেরা জিজ্ঞসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! নিজের নামায কেমন করিয়া চুরি করে?' হযরত (দঃ) বলিলেন, যে নামাযের রুকূ, সজ্‌দা ইত্যাদি পূর্ণরূপে আদায় না করে, সে নিজের নামায চুরি করে এবং সবচেয়ে বড় বখীল সে-ই, যে সালাম করিতে কৃপণতা করে। ফলকথা, নামাযের মত সহজ এবং উত্তম এবাদতের হক আদায় না করা বড় রকমের চুরি, যাহার গোনাহ্‌ও অনেক বড়। মুসলমানদের লজ্জা হওয়া চাই যে, নামায পূর্ণরূপে আদায় না করায় তাহাদের এই ধরনের খেতাব দেওয়া হইয়াছে।

৫। হাদীসঃ হযরত আনাস ইব্‌নে-মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—একদা রসূল (দঃ) বাহিরে তশ্‌রীফ আনিয়া দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে রুকূ, সজ্‌দা ঠিকমত আদায় করিতেছে না, তখন রসূল (দঃ) বলিলেন, ঐ ব্যক্তির নামায কবূল হয় না, যে ঠিকমত রুকূ, সজ্‌দা আদায় করে না।

৬। হাদীসঃ হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) অতি উচ্চ পর্যায়ের আলেম ও অতি বড় এবাদতগুযার এবং অতিশয় যিক্‌রকারী ছাহাবী ছিলেন। ছাহাবাদের মধ্যে শুধু হযরত আমর এবনুল আ'ছ তাঁহা অপেক্ষা অধিক হাদীস অবগত ছিলেন। অন্য কোন ছাহাবী তাঁহা অপেক্ষা অধিক হাদীস জানিতেন না। তাঁহার নাম আবদুর রহ্‌মান। "আবু হোরায়রা" তাঁহার কুনিয়ত। প্রথম জীবনে তিনি দরিদ্র ছিলেন। এমনকি ক্ষুধা ও আহারের কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা অতি দীর্ঘ। প্রথম জীবনে প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রতার কারণে বিবাহও করিতে পারেন নাই। নবী (দঃ)-এর ওফাতের পর তাঁহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইল। ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইল। উত্তরকালে মদীনা শরীফের প্রশাসক নিযুক্ত হন। হাকীম হইয়াও জ্বালানি কাঠের বোঝা বহন করিয়া বাজার অতিক্রম করিতেন এবং বলিতেন, হাকীমের অর্থাৎ, আমার জন্য পথ ছাড়িয়া দাও। দেখ এত বড় দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে আসীন থাকিয়াও নিজের কাজ নিজেই করিতেন, কোন প্রকার বড়ত্বের খেয়াল করিতেন না যে, আমি কালেক্টর, কোন অধীনস্থ কর্মচারী দ্বারা এই কাজ করাইয়া লই। অথচ সাধারণ মর্যাদাশালী মানুষ এরূপভাবে কাজ করাকে অপমান বোধ করিয়া থাকে, যাঁহারা নবী-সরদার হযরত (দঃ) হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার সংগে রহিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের তরীকা।

আজ কাল প্রত্যেকেই সামান্যতম পদমর্যাদা লাভ করিলেই নিজেকে অনেক বড় মনে করিতে থাকে। আবার ইসলাম এবং রসূলে মকবূল (দঃ)-এর মহব্বতের দাবী করিয়া থাকে। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলের মহব্বত ঐ ব্যক্তির অন্তরে আছে, যে ব্যক্তি তাঁহার বিধি-নিষেধ পালন করে এবং প্রত্যেক কাজে তাঁহার সুন্নতের তাবেদারী করে। কবি বলেনঃ

و كل يدعى وصلا بليلى
وليلى لا تقر لهم بذاك

অর্থাৎ, প্রত্যেকেই দাবী করে আমি লায়লার মিলন লাভ করিয়াছি, অথচ লায়লা তাহাদের এই দাবী স্বীকার করে না।

অতএব, তাহাদের দাবী কিরূপে সত্য হইতে পারে? এইরূপে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের মহব্বতের দাবী করে, অথচ কোরআন-হাদীসের বিপরীত চলে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধানসমূহ অমান্য করে, তবে তাহাদের দাবী কিরূপে সত্য হইতে পারে? হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, সত্য পথ উহাই যে পথে আল্লাহ্‌র রসূল ও তাঁহার ছাহাবীগণ রহিয়াছেন। এই হাদীসে

স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, যে পথ ও মত আল্লাহ্ ও রসূলের খেলাফ, উহা গোম্‌রাহী। ঐ পথ অবলম্বনকারীর প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল অতিশয় নারায।

হযরত অবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি এতীম অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়াছি এবং মিসকীন অবস্থায় মদীনায় হিজরত করিয়াছি। আমি গযওয়ানের কন্যার পেটে-ভাতে চাকর ছিলাম। আমার শর্ত ছিল, পথিমধ্যে কখনও পায়ে হাঁটিয়া কখনও যানে আরোহণ করিয়া যাইব। আমি গান গাহিয়া তাহার উট হাঁকাইতাম, তাহার জন্য আমি জ্বালানি কাঠ কাটিয়া আনিতাম, যখন পথিমধ্যে সে বিশ্রাম করিত। আল্লাহ্‌র শোক্‌র যিনি দ্বীন ইসলামকে মজবুত করিয়াছেন এবং আবূ হোরায়রাকে ইমাম ও নেতা বানাইয়াছেন। আর ইহা দ্বারা তিনি খোদার এই নেয়ামতের শোক্‌র আদায় করিয়াছেন। গর্ব ও অহংকারে নিজকে নেতা বলেন নাই। আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রকাশ ও উহার শোক্‌র আদায় করার জন্য মানুষ যে মর্তবা পায়, উহা প্রকাশ করা সওয়াবের কাজ। গর্ব ও অহংকারবশতঃ উহা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ এবং হারাম।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, জনাব রসূল (দঃ) আমাকে বলিয়াছেন, গণীমতের মাল হইতে আমার কাছে চাও না কেন? আমি বলিলাম, আমি ইহাই চাই যেই আল্লাহ্ আপনাকে যে এল্‌ম শিখাইয়াছেন তাহা আমাকে শিক্ষা দেন। তখন রসূল (দঃ) আমার পিঠে যে কম্বল ছিল উহা টানিয়া নামাইলেন। অতঃপর আমার এবং তাঁহার মাঝখানে বিছাইলেন। এমনকি কম্বলের উকুনগুলি আমি দেখিতে ছিলাম। বরকতস্বরূপ আমাকে কয়েকটি কথা বলিলেন। রসূল (দঃ) কথাগুলি শেষ করিয়া বলিলেন, গুটাইয়া লও। অতঃপর তোমার বক্ষদেশে স্থাপন কর। হযরত আবূ হোরায়রা বলেন, ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, হুযূর (দঃ) যাহাকিছু বলিতেন, আমি একটি অক্ষরও ভুলিতাম না। অর্থাৎ, মেধাশক্তি খুব বৃদ্ধি পাইল। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদিন বার হাজার বার তওবা এস্তেগ্‌ফার করি। (অর্থাৎ— أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ اِلَيْهِ কিংবা এধরনের অন্য কিছু বার হাজার বার পড়িতেন।) তাঁহার নিকট দুই হাজার গিরাযুক্ত একটি রশি ছিল। শোয়ার পূর্বে ২ হাজারবার "সোবহানাল্লাহ্" না পড়িয়া শুইতেন না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) যিনি উচ্চস্তরের ছাহাবী এবং আলেম ছিলেন, সুন্নতের তাবেদারী এত পরিমাণে করিতেন যে, লোকের আশংকা হইত, এই পরিশ্রমের দরুন হয়ত জ্ঞানহারা হইয়া যাইবেন। হুযূর (দঃ) তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ○

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ্ অতি উত্তম লোক, যদি সে তাহাজ্জুদের নামায পড়িত! ইহার পর হইতে তিনি কখনও তাহাজ্জুদের নামায ছাড়েন নাই। রাত্রে কম ঘুমাইতেন। তিনি বলিতেন, হে আবূ হোরায়রা (রাঃ)! নিশ্চয়, তুমি আমাদের (ছাহাবাদের) মধ্যে হুযূর (দঃ)-এর সংসর্গ সমধিক লাভ করিয়াছ এবং আমাদের মধ্যে হুযূরের হাদীস তুমিই সমধিক অবগত আছ। হযরত তাফায়ী (রাঃ) বলেনঃ আমি ছয় মাস কাল আবূ হোরায়রার মেহ্‌মান ছিলাম। ছাহাবাদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক আবেদ এবং অতিথিপরায়ণ ছিলেন। আবূ ওসমান মাহ্‌দী (একজন বড় তাবেয়ী) বলেন, আমি একাধারে সাত দিন আবূ হোরায়রার মেহ্‌মান ছিলাম। তখন দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার পত্নী এবং তাঁহার খাদেম রাত্রিকে তিন অংশে ভাগ করিয়া পালাক্রমে নামায পড়িতেন। একজন নামায পড়িতেন, এবং অপর দুইজন আরাম করিতেন, আবার দ্বিতীয় জন জাগিয়া নামায পড়িতেন, অন্যরা আরাম করিতেন, আবার তৃতীয় জন জাগিয়া এবাদত করিতেন, অন্যরা ঘুমাইতেন।

আবূ হোরায়রা বলেন, জনাব রসূল (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমাদের কেহ যদি এই খুঁটির মালিক হইত, তবে ঐ ব্যক্তি কিছুতেই সেই খুঁটিকে নষ্ট হইতে দিত না; সুতরাং কি করিয়া তোমরা এমন কাজ কর যাহাতে নামায নষ্ট হইয়া যায়, যে নামায শুধু আল্লাহ্‌র জন্য। অতএব, তোমরা যথাযথভাবে নিজের নামায আদায় কর। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণাঙ্গ নামায ছাড়া কবূল করেন না।

৭। **হাদীসঃ** আবদুল্লাহ্-ইবনে-আমর রাযিয়াল্লাহু হইতে রেওয়ায়ত আছে, একজন লোক হযরত নবী আলাইহিস্‌সালামের দরবারে হাযির হইয়া আরয করেনঃ হুযূর (ঈমানের পর) দীন-ইসলামে সবচেয়ে ভাল কাজ কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, 'ফরয নামায'। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল, তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, 'নামায'। লোকটি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, 'নামায'। (নামায যে অতি বড় মর্তবার এবাদত এবং ইহা দ্বারাই যে ইসলাম ঠিক থাকিতে পারে, অন্যথায় ইহ-পরকালের ধ্বংস অনিবার্য। এই কথা উম্মতকে বুঝাইবার জন্যই তিনবার জিজ্ঞাসার উত্তরে হযরত প্রত্যেকবার 'নামায' বলিয়া উত্তর দিয়াছেন। তিনবারের পর চতুর্থবার যখন ঐ লোকটি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হুযূর, তারপর? হযরত তখন বলিলেন, তারপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র দ্বীনকে জয়যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, জান-মাল উৎসর্গ করিয়া দেওয়াকেই বলে জেহাদ। লোকটি বলিল, হুযূর, আরও কিছু আরয আছে, আমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কি বলেন? হযরত বলিলেন, আমি তোমাকে তোমার মাতা-পিতার সহিত ভাল ব্যবহার করিবার আদেশ করিতেছি। অর্থাৎ, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর। তাহাদেরকে কষ্ট দিও না। তাহাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম। যে কাজে তাহাদের কষ্ট হয় তাহা করিও না। অবশ্য সেই কাজ পিতা-মাতার হকের চেয়ে বড় না হওয়া চাই এবং উহাতে আল্লাহ্‌র নাফরমানী যেন না হয়। কষ্ট অর্থ শরীঅত যাহাকে কষ্ট বলিয়াছে, ইহা অপেক্ষা বেশী হক আদায় করা মোস্তাহাব; যরূরী নহে। এ ব্যাপারে সাধারণ লোকেরা বড়ই ভুল করিয়া বসে। লোকটি বলিল হুযূর, আমি সেই যাতে-পাক আল্লাহ্ তা'আলার কসম করিয়া বলিতেছি, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি নিশ্চয়ই ওয়ালেদাইনের খেদমত ছাড়িয়া জেহাদ করিতে যাইব। হযরত বলিলেন, সে কথা তুমি নিজে ভালরূপে চিন্তা করিয়া বুঝ যে, এতদুভয়ের কোন্‌টির প্রতি তোমার মন ঝুঁকে, তাহাই কর। অন্য এক হাদীসে জেহাদের চেয়ে পিতা-মাতার খেদমতকে বড় বলা হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে, জেহাদ আল্লাহ্‌র হক এবং পিতা-মাতার খেদমত বান্দার হক। আল্লাহ্‌র হক আল্লাহ্ গফুরোর রহীম তওবা করিলে মা'ফ করিয়া দিবেন; বান্দার হক তওবা দ্বারা মা'ফ হইবে না। অপর উত্তর হইল, রসূল (দঃ)-এর খেদমতে বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্নকারী আসিত। তিনি প্রশ্নকারীর অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতেন।

৮। **হাদীসঃ** হযরত আবূ আইয়ূব আনছারী রাযিয়াল্লাহু হইতে রেওয়ায়ত আছে—হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম ফরমাইয়াছেন—'নামাযের উছীলায় নামাযীর পূর্বের নামায হইতে এই নামায পর্যন্ত সকল (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যায়।' —মঃ আহ্‌মদ

৯। **হাদীসঃ** আবূ উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়ত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—এক ফরয নামায অন্য ফরয নামাযের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ মুছিয়া ফেলে। এইরূপে এক জুমু'আর

নামায অন্য জুমু'আর নামাযের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পূর্ববর্তী (সপ্তাহের) সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ মুছিয়া দেয়। (অন্য এক হাদীসে আছে, জুমু'আর পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত গোনাহ্ মা'ফ হয়) এইরূপে এক রমযান শরীফের রোযা অন্য রমযানের রোযার সহিত মিলিত হইয়া তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া দেয়। এইরূপে প্রত্যেক হজ্জ মিলিত হইয়া তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া দেয়। স্বামী বা অন্য কোন মাহ্রম রেশ্তাদারের সঙ্গে ছাড়া মেয়েলোকের হজ্জ করা জায়েয নহে। —তাব্রানী

(সন্দেহ ভঞ্জন) কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারে যে, যাহার ছগীরা গোনাহ্ নাই তাহার কি ফযীলত হাছিল হইবে? অথবা পাঞ্জেগানা নামাযের দ্বারা যখন সব ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ হইয়া গেল, তখন ত আর ছগীরা গোনাহ্ রহিল না, তবে জুমু'আ, রমযান এবং হজ্জের দ্বারা কি মা'ফ হইবে? উত্তর এই যে, যাহাদের ছগীরা গোনাহ্ নাই, অথবা ছিল কিন্তু পাঞ্জেগানার দ্বারা মা'ফ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বাকী আমলের দ্বারা মর্তবা বর্ধিত হইবে।

১০। হাদীসঃ উপরোক্ত ছাহাবী রেওয়ায়ত করেন, হযরত নবী আলাইহিস্সালাম বলিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ এইরূপ যেন, তোমাদের বাড়ীর দরজার সামনে মিষ্টি পানির একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং তোমরা তাহাতে দৈনিক পাঁচবার গোছল করিতেছ। এইরূপ হইলে (বল ত দেখি) শরীরে কোন ময়লা থাকিতে পারে কি? (নিশ্চয় না)।

১১। হাদীসঃ আবূ হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়ত করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, 'নিশ্চয় জানিও, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ফরয নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি নামাযের হিসাবে বান্দা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তবে অন্যান্য হিসাবেও উত্তীর্ণ হইবে।' (কারণ, নামাযের বরকতে সাধারণতঃ অন্যান্য আমলও দুরুস্ত হইয়া যায়)। আর যদি নামাযের হিসাবে অকৃতকার্য হয়, তবে অন্যান্য আমলের হিসাবেও অকৃতকার্য হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদের বলিবেন, 'দেখ, আমার বান্দার আমলনামার মধ্যে কিছু নফল নামাযও আছে কি না? যদি কিছু নফল নামায থাকে, তবে তাহা দ্বারা ফরয নামাযের মধ্যে যে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে তাহা পূর্ণ করা হইবে।' এইরূপে অন্যান্য ফরয এবাদতগুলিরও (অর্থাৎ, রোযা, যাকাৎ এবং হজ্জেরও) হিসাব লওয়া হইবে এবং ফরযের মধ্যে ত্রুটি থাকিলে নফলের দ্বারা ত্রুটি পূর্ণ করা হইবে। নফলের দ্বারা যে ফরযের ত্রুটি পূর্ণ করিবেন, ইহা শুধু আল্লাহ্র অপরিসীম রহ্মত দ্বারাই হইবে। (নতুবা আইন অনুসারে নফল দ্বারা ফরযের ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না। আর যাহার ফরয ঠিক নাই এবং নফলও নাই তাহাকে আযাব দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি আল্লাহ্ পাক রহম করেন, তবে স্বতন্ত্র কথা।

১২। হাদীসঃ হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূল (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি যেসমস্ত এবাদত নির্ধারিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে নামায সর্বোত্তম। কাজেই বাড়াইতে পারিলে বাড়ান উচিত। অর্থাৎ, বেশী সওয়াবের জন্য বেশী নামায পড়া উচিত।

১৩। হাদীসঃ ওবাদা এবনে-ছামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়ত আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, জিব্রায়ীল আলাইহিস্সালাম আল্লাহ্ পাকের দরবার হইতে প্রেরিত হইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, 'হে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছি। যে ব্যক্তি ঐ নামাযগুলি পূর্ণরূপে ওযূ করিয়া সঠিক ওয়াক্তের পাবন্দী করিয়া ভালরূপে রুকূ, সজ্দা করিয়া

আদায় করিবে, তাহার জন্য আমি এই কথার যিম্মা লইতেছি যে, ঐসব নামাযের ওছীলায় তাহাকে আমি বেহেশ্‌তে দাখেল করিয়া দিব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমার সহিত দেখা করিবে এমন অবস্থায় যে, সে নামাযের মধ্যে ত্রুটি করিয়াছে, তাহার জন্য আমার এখানে কোন যিম্মাদারী নাই। আমার ইচ্ছা হইলে তাহাকে আযাবও দিতে পারি, ইচ্ছা হইলে দয়া করিয়া ছাড়িয়াও দিতে পারি।'

১৪। হাদীসঃ হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে, ভক্তিভরে ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায এমনভাবে পড়িবে, যাহাতে ভুলত্রুটি না হয়, (উত্তমরূপে হুযূরে-ক্বলবের সহিত নামায পড়ে,) তবে তাহার পূর্বেকার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা মা'ফ করিয়া দিবেন।' (এই নামাযকেই তাহিয়্যাতুল ওযূ বলে।)

১৫। হাদীসঃ 'নামাযের দ্বারা মো'মেন বান্দার অন্তঃকরণে নূর পয়দা হয়। অতএব, তোমরা যে যত পার নামায দ্বারা নিজের অন্তঃকরণে নূর বৃদ্ধি করিয়া লও।'

১৬। হাদীসঃ 'যদি আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ (অর্থাৎ, খোদাকে এক অদ্বিতীয় জানা) এবং নামায হইতে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস থাকিত, তবে নিশ্চয়ই ফেরেশ্‌তাদের জন্য তাহা নির্ধারিত করা হইত। কোন ফেরেশ্‌তা (চিরজীবন) রুকূতে আছেন, কোন ফেরেশ্‌তা (চিরজীবন) সজ্‌দায় আছেন।' —দাইলামী। এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবাদত আর নাই। কেননা, ফেরেশ্‌তাগণ—যাহাদের কাজই শুধু এবাদত করা, তাহারাও পূর্ণ নামায পায় নাই। আমাদের কত বড় সৌভাগ্য যে, আমরা হযরতের তোফায়েলে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতে পূর্ণরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত পাইয়াছি। রত্ন পাইয়া যে যত্ন না করে তাহার চেয়ে হতভাগা আর কে আছে?

১৭। হাদীসঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত আছে, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'তোমরা নামাযের মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ কর। কেননা, যে নামাযের মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ করিবে, সে নিশ্চয়ই নামায উত্তমরূপে আদায় করিবে। সেই ব্যক্তির নামাযের মত নামায পড়, যে মনে করে যে, এই নামাযই তাহার জীবনের শেষ নামায। এমন কাজ করিও না, যাহা করিয়া আবার মা'ফ চাহিতে হয়।'

১৮। হাদীসঃ 'নামায যত লম্বা হইবে, ততই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় হইবে।'

১৯। হাদীসঃ হাদীস শরীফে আছে, 'ঐ ব্যক্তির নামায (পূর্ণাঙ্গ) হয় না, যে নামাযে আজেযী (একাগ্রতা ও নম্রতা) প্রকাশ করে না।' কারণ, যে ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে নামায পড়িবে, সে নিশ্চয়ই এদিক-ওদিক তাকাইবে এবং অযথা নড়াচড়া করিবে। যদি একাগ্রতার সহিত নামায পড়ে, তবে এদিক-ওদিক না দেখিয়া ভালরূপে নামায পড়িবে, বে-আদবী করিবে না। (অর্থাৎ, রুকূ, সজ্‌দা, কলেমা, কেরাআত, ক্বেয়াম, কুউদ সব মনোযোগের সহিত আদায় করিবে।)

২০। হাদীসঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (দঃ) ইহধাম ত্যাগকালে বলিয়াছেনঃ '(খবরদার) নামায! (খবরদার) নামায! দাসদাসীর ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।' (খবরদার! অধীনস্থ দাসদাসী, ইত্যাদির উপর যুলুম করিও না। খবরদার! অধীনস্থদের উপর যুলুম করিও না।) এই দুই ক্ষেত্রেই প্রিয় রসূল জীবনের শেষ মুহূর্তেও উম্মতকে এই পাপরূপ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়া হইতে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন যুগে লোকের নামাযের আগ্রহ এত বেশী ছিল যে, ফরযের ত কথাই ছিল না, নফল আদায় করার জন্যও অতিশয় আগ্রহান্বিত ছিল।

মন্‌সূর ইবনে যাযান তাবেয়ীর জীবনীতে লেখা আছে যে, তিনি সূর্যোদয়ের পর হইতে (ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়টুকু বাদ দিয়া) আছর পর্যন্ত অনবরত নফল নামায পড়িতেন। এবং আছর হইতে

মাগরিব পর্যন্ত সোব্‌হানাল্লাহ্ (তসবীহ্) পড়িতেন। অতঃপর মাগরিবের নামায পড়িতেন। তাঁহার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, তাঁহাকে যদি কেহ বলিত, মালাকুল মওত দরজায় দাঁড়াইয়া আছে, তবুও তিনি তাঁহার নেক আমলের মধ্যে বিন্দুমাত্রও বৃদ্ধি করিতে পারিতেন না। কারণ, মৃত্যু আসন্ন জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে নেক আমল বেশী করিবে; কিন্তু তিনি প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুকে হাযির মনে করিয়া নেক আমল এত বাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর সময়ই ছিল না। মনসুর ইব্‌নে-মো'তামের তাবেয়ীর জীবনীতে লিখিত আছে, তিনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অনবরত দিনে রোযা রাখিতেন। এবং সারারাত নামায পড়িতেন, আর আযাবের ভয়ে কাঁদিতেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, তাঁহাকে কেহ নামায পড়িতে দেখিলে মনে করিত, তিনি বোধহয় এখনই মরিয়া যাইবেন। অর্থাৎ, নামাযের মধ্যে এত কাঁদিতেন যেন তিনি তাঁহার অন্তিমকাল চাক্ষুষ দেখিতেছেন এবং সেজন্য কাঁদিয়া কাটিয়া গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া জীবনের শেষ নামায সমাপন করিয়া দুনিয়া হইতে রোখ্‌ছত হইতেছেন। সারা রাত এইরূপ কাঁদাকাটি ও এবাদৎ বন্দেগী করিয়া সকাল বেলায় তিনি চোখে সুর্‌মা লাগাইয়া পানি দ্বারা ঠোঁট মুখ তাজা করিয়া এবং মাথায় তেল মাখিয়া লোকের সম্মুখে আসিতেন। এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মা বলিতেন, মনসূর! তুমি কি কাহাকেও খুন করিয়া আসিয়াছ যে, এইরূপে নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছ? মনসূর বলিতেন, মা, মানুষের প্রবৃত্তিতে সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জনের লিপ্সা যে কি মারাত্মক ব্যাধি তাহা আমি বেশ জানি; সেই জন্যই আমি এইরূপ করি, যাহাতে লোকে আমাকে পীর বুযুর্গ বলিয়া মশহুর না করিয়া বসে এবং আমিও কুপ্রবৃত্তির ফাঁদে না পড়ি। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কুফার কাযীর পদ গ্রহণ করিবার জন্য ইরাকের আমীর তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি উহা অস্বীকার করিলেন। এই জন্য তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। অবশ্য পরে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, (বাধ্য হইয়া) দুই মাস কাযীর পদে বহাল ছিলেন।

ছাহেবান! একটু চিন্তা করুন, ইঁহারা আল্লাহ্‌র এবাদতে কেমন আসক্ত ছিলেন এবং দুনিয়ার প্রতি কেমন বিতৃষ্ণ ছিলেন! সরকারী পদ বিনা চেষ্টা ও অন্বেষণে পাইতেন, যাহাতে উচ্চ সম্মান ও প্রচুর ধনের অধিকারী হইতে পারিতেন; যে জন্য মানুষ বহু চেষ্টা তদবীর করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, কারারুদ্ধ হইলেন। প্রত্যেক মুসলমানের এই আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজন মত খাওয়া পরার ব্যবস্থা করিয়া বাকী সময় আল্লাহ্‌র স্মরণে কাটান উচিত।

(**হাদীসঃ** যে ইচ্ছাপূর্বক নামায তরক করে, সে বাহ্যতঃ কাফের হইয়া যায়। অন্য হাদীসে আছে, 'যাহার নামায নাই তাহার ধর্ম নাই।')

২১। হাদীস শরীফে আছে, 'যে দিন-রাতের মধ্যে ফরয ছাড়া অতিরিক্ত বার রাকা'আত নামায পড়িবে, তাহার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌তে একখানা ঘর প্রস্তুত করিবেন।' (অর্থাৎ ফজরের দুই রাকা'আত, যোহরের ছয় রাকা'আত—চারি রাকা'আত ফরযের আগে দুই রাকা'আত ফরযের পরে, মাগরিব এবং এশার ফরযের পর দুই দুই রাকা'আত সুন্নত।)

—জামে ছগীর

২২। হাদীস শরীফে আছে, 'যে মাগরিব এবং এশার মাঝখানে ছয় রাকা'আত নামায এমনভাবে পড়িবে যে, তাহার মধ্যে কোন খারাব কথা বলিবে না, তাহার জন্য বার বৎসরের এবাদতের সমান সওয়াব লেখা হইবে।' —জামে'ছগীর

২৩। হাদীস শরীফে আছে, 'যে একা একা এমনভাবে দুই রাকা'আত নামায পড়িবে যে, এক আল্লাহ্ তা'আলা এবং কেরামুন কাতেবীন ছাড়া অন্য কেহ দেখিতে না পায়, তাহার জন্য দোযখ হইতে মুক্তি লিখিয়া দেওয়া হইবে।' অর্থাৎ, যে হামেশা এইরূপ করিতে থাকিবে, তাহাকে গোনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার তওফীক দান করা হইবে, ফলে দোযখ হইতে নাজাত পাইবে।

২৪। হাদীসে আছে, 'যে চাশ্‌তের বার রাকা'আত নামায পড়িবে, তাহার জন্য আল্লাহ্ পাক বেহেশ্‌তের মধ্যে সোনার অট্টালিকা নির্মাণ করিবেন।'

২৫। হাদীসঃ 'চাশ্‌তের চারি রাকা'আত এবং যোহরের পূর্বে চারি রাকা'আত নামায যে পড়িবে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একখানা ঘর তৈয়ার করিবেন।'

২৬। হাদীসে আছে, 'যে মাগরিব এবং এশার মাঝখানে বিশ রাকা'আত নামায পড়িবে আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একটি বাড়ী তৈয়ার করিবেন।'

২৭। হাদীস শরীফে আছে, যে আছরের আগে চারি রাকাআত (নফল) নামায পড়িবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর দোযখের আগুন হারাম করিয়া দিবেন।' অর্থাৎ এইসব নামায যাহারা হামেশা পড়িবে, তাহারা নেক কাজ করিবে এবং বদ কাজ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে, ফলে দোযখ হইতে মুক্তি এবং বেহেশ্‌ত লাভ করিবে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, নফল এবাদত ঐ পরিমাণই আরম্ভ করা উচিত যাহা সব সময় আদায় করা যায়। অবশ্য যদি কোন ওযরবশতঃ কখনও ছুটিয়া যায়, তবে সে ভিন্ন কথা। নফল শুরু করিলে হামেশা উহাতে লাগিয়া থাকা উচিত। শুরু করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া শুরু না করা অপেক্ষা অধিক খারাব।

২৮। হাদীসঃ 'আল্লাহ্‌র রহ্‌মত বর্ষিত হউক ঐ ব্যক্তির উপর—যে আছরের (ফরযের) আগে চারি রাকা'আত নামায পড়ে।' (হে মুসলমান ভাই বোনেরা! এই হাদীসের বিষয়বস্তুর উপর কোরবান হও। লক্ষ্য কর, সামান্য পরিশ্রমে কত বড় দরজা পাওয়া যায়। হুযূরে আকরাম (দঃ)-এর দো'আর বরকত এবং গোনাহ্ হইতে বাঁচিবার তওফীক-এর প্রতি যে পরিমাণ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয় এবং এই এবাদত নির্ধাররণের প্রতি আল্লাহ্‌র যে পরিমাণ শোক্‌র আদায় করা হয়, সবই অতি নগণ্য। জনাব রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দো'আ ভাগ্যবান ব্যক্তিই পাইতে পারে। সকাল-সন্ধ্যা উভয় ওয়াক্তে আমাদের 'আমলনামা' হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি নেক কাজ করে এবং তাঁহার উৎসাহিত এবাদতকে কার্যে পরিণত করে, তাহার প্রতি তিনি খুব সন্তুষ্ট হন। হুযূরের সন্তুষ্টিতে উভয় জাহানে রহ্‌মত এবং শান্তি লাভ হয়। কবি সত্যই বলিয়াছেনঃ فَاِنَّ فِىْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا

وَفِىْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

অর্থাৎ, আপনার দান সাখাওয়াতে দুনিয়া ও আখেরাত বিদ্যমান, আপনার জ্ঞানে লওহে মাহ্‌ফূযের এল্‌ম বিদ্যমান। মোটকথা, আপনার কৃপাদৃষ্টি এবং দানশীলতার বরকতে দীন দুনিয়ার নেয়ামতসমূহে লাভ হইতে পারে। আপনার শিক্ষায় লওহে মাহফূযের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। ঐ এল্‌ম লাভের দুইটি পন্থা আছে। একটি হইল হুযূরের বর্ণিত হাদীসসমূহে যে গুপ্ত রহস্য নিহিত আছে, আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বান্দাগণের অন্তরে উহা বিকশিত হয়। অপরটি হইল, এই গুপ্ত রহস্য ব্যতীত আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এবং হুযূরের হাদীস পড়ার বরকতে এবং উহা আমল করার কারণে অন্যান্য গুপ্ত রহস্যও আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অন্তরে প্রতিফলিত হয়। ভালরূপে বুঝিয়া লও

এবং আমল কর। আমল না করিয়া শুধু পড়িলে বেশী ফায়দা হয় না পড়িয়া তদনুযায়ী আমল করিলে আসল ফায়দা হাছিল হয়।)

২৯। হাদীস শরীফে আছে, রাত্রের নামায অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ এক রাকা'আত হইলেও নিজের উপর লাযেম করিয়া লও। সারকথা, তাহাজ্জুদের নামায অল্পই হউক না কেন অবশ্যই পড়। কেননা, উহার সওয়াব অনেক বেশী যদিও ফরয নহে। উদ্দেশ্য এই নহে যে, মাত্র এক রাকা-'আতই পড়। কারণ, এক রাকা'আত নামায পড়া দুরুস্ত নহে। কমপক্ষে দুই রাকা'আত পড়িবে।

৩০। হাদীসঃ নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা অবশ্য রাত্রি জাগিয়া এবাদত করিবে অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে। কেননা, তোমাদের পূর্বকালের সমস্ত নেক লোকেরই এই অভ্যাস ছিল। এই নামাযের দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়, গোনাহ্ মা'ফ হয়, গোনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়—সয়ূতী। ঈমাম আবূ হানীফা(রঃ) ৪০ বৎসর যাবৎ এশার ওযূ দ্বারা ফজর পড়িয়াছেন।

৩১। হাদীসে কুদ্‌সীতে আছে, আল্লাহ্ বলেন, হে মানুষ! তুমি দিনের প্রারম্ভে আমার জন্য চারি রাকা'আত নামায পড়িলে তোমার সারা দিনের কাজের বন্দোবস্ত আমি করিব এবং বালা-মুছীবত আমি দূর করিয়া দিব। (ইহা এশ্‌রাক নামাযের ফযীলত। দেখ! সওয়াবও পাওয়া যায় এবং আল্লাহ্ পাক যাবতীয় কাজ পূর্ণও করিয়া দেন। দ্বীন-দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ লাভ হয়। মানুষ বিপদে পড়িয়া এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে, মানুষের খোশামোদ করে। কত ভাল হইত, যদি তাহারা আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিত এবং তাঁহার বর্ণিত ওযীফা এবং নামায পড়িত, তবে দুনিয়ার কাজও সমাধা হইত এবং সওয়াবও পাইত। অধিকন্তু মানুষের খোশামোদের লাঞ্ছনা হইতে নাজাত পাইত। কোন বুযুর্গ বলেন, প্রত্যেক কওমের একটি নির্দিষ্ট পেশা আছে। আর আমাদের পেশা তাক্ওয়া ও তাওয়াক্কুল। তাক্ওয়া ও তাওয়াক্কুল আল্লাহ্‌র হুকুম পালনকে বলে। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা ৭ম খণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। মোটকথা, দ্বীনদারীর ওছীলায় দুনিয়ার যাবতীয় কষ্ট আপদ-বিপদও দূরীভূত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

বেহেশ্‌তী জেওর

তৃতীয় খণ্ড

রোযা

হাদীস শরীফে রোযার অনেক সওয়াব বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রোযার মর্তবা অতি বড়।

রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযান শরীফের রোযা ঈমানের সঙ্গে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সওয়াব লাভের আশায় রাখিবে, তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ হইয়া যাইবে।

হাদীস শরীফে আছেঃ রোযাদারের মুখের বদবু আল্লাহ্‌র নিকট মেশ্‌কের খোশবু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। কিয়ামতের দিন রোযার অসীম সওয়াব পাইবে।

হাদীস শরীফে আছেঃ কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক যখন হিসাব-নিকাশের কঠোরতায় আবদ্ধ থাকিবে, তখন রোযাদারের জন্য আরশের ছায়ায় দস্তরখান বিছান হইবে। তাহারা সানন্দে পানাহার করিতে থাকিবে। তখন অন্যান্য লোক আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিবে, এ কি ব্যাপার! তাহারা সানন্দে পানাহার করিতেছে, আর আমরা এখনও হিসাবের দায়ে আবদ্ধ আছি! উত্তরে বলা হইবেঃ দুনিয়াতে তোমরা সানন্দে পানাহার করিয়াছিলে, তখন তাহারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রোযা রাখিয়া ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল।

রোযা ইসলামের বড় একটি রোকন। যে রোযা না রাখিবে, সে মহাপাপী হইবে এবং তাহার ঈমান কমজোর হইয়া যাইবে।

১। মাসআলাঃ রমযান শরীফের রোযা পাগল ও না-বালেগ ব্যতীত (স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, অন্ধ, বধির, শ্রমিক) সকলের উপর ফরয। শরীঅতে বর্ণিত ওযর ব্যতীত রমযান শরীফের রোযা না রাখা কাহারও জন্য দুরুস্ত নহে। এইরূপে যদি কেহ রোযার মান্নত মানে, তবে সে রোযাও তাহার উপর ফরয হইয়া যায়, ক্বাযা ও কাফ্‌ফারার রোযাও ফরয। এতদ্ব্যতীত অন্য যত রোযা আছে, তাহা নফল। নফল রোযা রাখাতে সওয়াব আছে, কিন্তু না রাখিলে গোনাহ্ নাই। দুই ঈদের দুই দিন এবং বক্‌রা ঈদের পরে তিন দিন এই পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম।

২। মাসআলাঃ ছোব্‌হে ছাদেক হইতে সূর্যাস্ত রোযার নিয়্যতে পানাহার ও সহবাস হইতে বিরত থাকাকে শরীঅতের ভাষায় 'রোযা' বলে।

৩। মাসআলাঃ রোযার জন্য যেমন পান ও আহার পরিত্যাগ করা ফরয, তেমনই নিয়্যত করাও ফরয; কিন্তু নিয়্যত মুখে পড়া ফরয নহে, শুধু যদি মনে মনে চিন্তা করিয়া সঙ্কল্প করে যে, আমি আজ আল্লাহ্‌র নামে রোযা রাখিব এবং কিছু পানাহার বা স্ত্রী ব্যবহার করিব না, তবে

তাহাতেই রোযা হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ মনের চিন্তা এবং সঙ্কল্পের সঙ্গে মুখে ও বাংলায় বা আরবীতে নিয়্যত পড়িয়া লয় যে, 'আমি আল্লাহ্‌র নামে রোযা রাখার নিয়্যত করিতেছি' তবে তাহাও ভাল।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ সারা দিন কিছু পানাহার না করে—হয়ত ক্ষুধাই লাগে নাই, বা অন্য কোন কারণে খাওয়ার সুযোগ হয় নাই, তাহার রোযা হইবে না; অবশ্য যদি রোযা রাখার ধারণা হইত, তবে রোযা হইয়া যাইত।

৫। **মাসআলা ঃ** শরীঅত অনুসারে ছোব্‌হে ছাদেক হইতে রোযা শুরু হয়, কাজেই ছোব্‌হে ছাদেক না হওয়া পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী ব্যবহার ইত্যাদি সব জায়েয আছে। অনেকে শেষরাত্রে সেহরী খাওয়ার পর এবং রোযার নিয়্যত করিয়া লওয়ার পর রাত্রি থাকা সত্ত্বেও কিছু খাওয়া দাওয়া বা স্ত্রী ব্যবহার করাকে না-জায়েয মনে করে, তাহা ভুল। ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব জায়েয আছে, নিয়্যত করুক বা না করুক। তবে ছোব্‌হে ছাদেক হইয়া যাওয়ার সন্দেহ হইলে এইসব না করাই উচিত।

রমযান শরীফের রোযা

১। **মাসআল ঃ** যদি রাত্র হইতে রমযানের রোযার নিয়্যত করে, তবুও ফরয আদায় হইয়া যায়। যদি রাত্রে রোযা রাখার নিয়্যত ছিল না বরং ভোর হইয়া গেল, তবুও এই খেয়ালেই রহিল যে, আজ রোযা রাখিব না। অতঃপর বেলা বাড়িলে খেয়াল হইলে যে, ফরয রোযা ছাড়িয়া দেওয়া অন্যায়। তাই এখন রোযার নিয়্যত করিল, তবুও রোযা হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি সকালে কিছু পানাহার করিয়া থাকে, তবে এখন আর নিয়্যত করিতে পারে না।

২। **মাসআল ঃ** যদি কিছু পানাহার না করিয়া থাকে, তবে দিনের দ্বীপ্রহরের ১ ঘন্টা আগে পর্যন্ত রমযানের রোযার নিয়্যত করা দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআল ঃ** রমযান শরীফে যদি খাছ করিয়া রমযান শরীফের রোযা বা ফরয রোযা বলিয়া নিয়্যত না-ও করে, শুধু এতটুকু নিয়্যত করে যে, আজ আমি রোযা রাখিব, অথবা রাত্রে মনে মনে বলে যে, আগামীকাল আমি রোযা রাখিব, তবে তাহাতেই রমযানের রোযা ছহীহ্ হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআল ঃ** যদি কেহ রমযান শরীফে রমযানের রোযা না রাখিয়া নফল রোযা রাখার নিয়্যত করে এবং মনে করে যে, নফল রোযা এখন রাখিয়া লই, রমযানের রোযা পরে কাযা করিয়া লইব, তবুও তাহার রমযানের ফরয রোযা আদায় হইয়া যাইবে, নফল হইবে না।

৫। **মাসআল ঃ** গত রমযানের রোযা কোন কারণে ছুটিয়া গিয়াছিল, সারা বৎসরে কাযা রোযা রাখে নাই, এখন রমযানের মাস আসিয়া পড়িয়াছে; যদি এই রমযানে গত রমযানের কাযা রোযার নিয়্যত করে; তবুও এই রমযানের রোযাই হইবে, গত রমযানের কাযা রোযা হইবে না, সে রোযা রমযানের পর কাযা করিবে।

৬। **মাসআল ঃ** কেহ নযর (মান্নত) মানিয়াছিল যে, আমার অমুক কাজ হইয়া গেলে আমি আল্লাহ্‌র নামে দুইটি বা একটি রোযা থাকিব, তারপর তাহার সে মকছুদও পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মান্নতের রোযা রাখে নাই। যখন রমযান আসিয়াছে, তখন ঐ রোযা রাখিতে ইচ্ছা করিল। তখন যদি মান্নতের রোযার নিয়্যত করে, রমযানের রোযার নিয়্যত না করে, তবুও রমযানের রোযাই

আদায় হইবে, মান্নতের রোযা আদায় হইবে না, মান্নতের রোযা রমযানের পর রাখিতে হইবে। ফলকথা, রমযান মাসে যে কোন রোযারই নিয়্যত করুক না কেন, তাহা রমযানের রোযাই হইবে, রমযান মাসে অন্য কোন রোযা ছহীহ্ হইবে না।

ইয়াওমুশ্‌শক (সন্দেহের দিন)

৭। **মাসআলা ঃ** (শা'বানের ২৯শে তারিখে সন্ধ্যার সময় যদি রমযানের চাঁদ দেখা যায়, তবে পর দিন রোযা রাখিতে হইবে।) যদি আকাশে মেঘ থাকে এবং চাঁদ দেখা না যায়, তবে পর দিন রোযা রাখিবে না। হাদীস শরীফে ইয়াওমুশ্‌শক অর্থাৎ, এইরূপ সন্দেহের দিনে রোযা রাখার নিষেধ আসিয়াছে। শা'বানের ৩০ দিন পুরা হইলে পর রোযা রাখিবে।

৮। **মাসআল ঃ** ২৯শে শা'বান মেঘের কারণে যদি চাঁদ দেখা না যায়, তবে পর দিন নফল রোযা রাখাও নিষেধ। অবশ্য যদি কাহারও হামেশা বৃহস্পতিবার, শুক্রবার অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট দিনে নফল রোযা রাখার অভ্যাস থাকিয়া থাকে এবং ঘটনাক্রমে ঐ তারিখ ঐ দিন হয়, তবে নফলের নিয়্যতে রোযা রাখা ভাল। অবশ্য যদি পরে কোথাও হইতে খবর আসে যে, ঐ দিন রমযানের ১লা তারিখ প্রমাণিত হইয়াছে, তবে ঐ নফলের দ্বারাই ফরয রোযা আদায় হইয়া যাইবে, ক্বাযা করিতে হইবে না

৯। **মাসআলা ঃ** মেঘের কারণে যদি ২৯ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখা না যায়, তবে দুপুরের ১ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত কিছুই পানাহার করিবে না। যদি কোথাও হইতে চাঁদের খবর আসে, তবে তখনই রোযার নিয়্যত করিবে, আর যদি খবর পাওয়া না যায়, তবে পানাহার করিবে।

১০। **মাসআলা ঃ** ২৯শে শা'বান সন্ধ্যায় যদি চাঁদ দেখা না যায়, তবে পর দিন ক্বাযা রোযা, মান্নতের রোযা, কাফ্‌ফারার রোযা কোন রোযাই দুরুস্ত নহে, মকরূহ। অবশ্য দুরুস্ত না হওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ রাখে, পরে ঐদিন রমাযানের ১লা তারিখ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে ঐ রোযাতেই রমযানের রোযা আদায় হইয়া যাইবে। ক্বাযা, কাফ্‌ফারা অথবা মান্নতের রোযা পরে রাখিতে হইবে। যদি খবর না পওয়া যায়, তবে যে রোযার নিয়্যত করিয়াছে উহাই আদায় হইবে।

চাঁদ দেখা

১। **মাসআলা ঃ** আকাশে যদি মেঘ বা ধূলি থাকে, তবে মাত্র একজন পুরুষ বা স্ত্রী সত্যবাদী দ্বীনদার লোকের সাক্ষ্যতেই রমযানের চাঁদ প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** ২৯শে রমযান যদি আকাশে মেঘ থাকে, তবে ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হইবার জন্য অন্ততঃ দুইজন বিশ্বস্ত দ্বীনদার পুরুষ অথবা দ্বীনদার একজন পুরুষ এবং দ্বীনদার দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য আবশ্যক, অন্যথায় ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হইবে না। যদি একজন অতি বিশ্বস্ত, অতি ধার্মিক পুরুষেও সাক্ষ্য দেয়, অথবা শুধু চারি জন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দেয়, পুরুষ কেহই সাক্ষ্য না দেয়, তবে তাহাতে ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হইবে না এবং রোযা ভাঙ্গা যাইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** যে লোক শরীঅতের হুকুম মত চলে না, অনবরত শরা'র বরখেলাফ কাজ করিতে থাকে; যেমন, হয়ত নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, মিথ্যা কথা বলে, (অথবা সুদ খায়) অথবা এইরূপ অন্য কোন গোনাহ্‌র কাজে লিপ্ত থাকে, শরীঅতের পাবন্দী করে না। শরীঅতে এইরূপ লোকের কথার কোনই মূল্য নাই। এই রকমের লোক যদি শত শত কসম খাইয়াও বয়ান

করে, তবুও তাহার কথা বিশ্বাস করা যাইবে না। এমন কি, যদি এই ধরনের দুই তিন জন লোকেরও বর্ণনা দেয়, তবুও তাহা দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হইবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** মশহূর আছে, যে দিন রজব মাসের ৪ তারিখ হইবে, সেদিন রমযানের প্রথম তারিখ হইবে। শরীঅতে ইহার কোন মূল্য নাই। চাঁদ না দেখিলে রোযা রাখিবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** হাদীস শরীফে আছে, চাঁদ দেখিয়া এইরূপ বলা যে, চাঁদ অনেক বড়। ইহা আজকার চাঁদ নয় কালকার চাঁদ, এইরূপ বলা বড়ই খারাপ। ইহা কিয়ামতের একটি আলামত। সারকথা, চাঁদ বড় ছোট হওয়ার কথার কোন মূল্য নাই। হিন্দুদের কথা বিশ্বাস করিও না যে, আজ দ্বিতীয়া, আজ অবশ্য চাঁদ উঠিবে। শরীঅতে এ সব কথার কোন মূল্য নাই।

৬। **মাসআলা ঃ** আকাশ যদি সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে এবং তা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না যায়, তবে দুই চারিজনের বলাতে এবং সাক্ষ্য দেওয়াতে চাঁদ প্রমাণিত হইবে না। রমযানের চাঁদ হউক বা ঈদের চাঁদ হউক। অবশ্য যদি এত লোকে চাঁদ দেখার প্রমাণ দেয়, যাহাতে মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে, এত লোক কিছুতেই মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিতে পারে না, তবে চাঁদ প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** অনেক সময় এরকম হয় যে, দেশ ব্যাপিয়া মশহূর হইয়া যায় যে, কাল চাঁদ দেখা গিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত দেশ খুঁজিয়া একজনেও দেখিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গেল না; শরীঅতে এইরূপ ভিত্তিহীন গুজবের কোনই মূল্য নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** রমযান শরীফের চাঁদ মাত্র একজন লোকে দেখিল, অন্য কেহই দেখিল না; কিন্তু সে লোক শরীঅতের পাবন্দ না হওয়ার কারণে অন্য লোকে রোযা রাখিবে না। কিন্তু তাহার নিজের রোযা রাখিতে হইবে। কিন্তু যদি এই লোকের প্রমাণের হিসাবে ৩০ রোযা হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ঈদের চাঁদ দেখা না যায়, তবে তাহার ৩১ রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে, ঈদ তাহাকে সকলের সঙ্গেই করিতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** ঈদের চাঁদ যদি কেহ একা একা দেখে, অন্য কেহ না দেখে, তবে অন্যেরা ত তাহার কথা গ্রহণ করিবেই না, সে নিজেরও একা ঈদ করা দুরুস্ত নাই। পরদিন তাহারও রোযা রাখিতে হইবে, রোযা ভাঙ্গিতে পারিবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** ৩০শে রমযান যদি দিনের বেলায় চাঁদ দেখা যায়, দুপুরের পরে দেখা যাউক বা পূর্বে দেখা যাউক, কিছুতেই রোযা ভাঙ্গা যাইবে না, সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখিতে হইবে, সূর্যাস্তের পর নিয়ম মত ইফ্‌তার করিতে হইবে, ঐ চাঁদকে সামনের রাত্রের চাঁদ ধরিতে হইবে। গত রাত্রের ধরা যাইবে না। যদি কেহ দিনের বেলায় চাঁদ দেখিয়া রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে তাহার কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। —বেঃ গাওহার

ক্বাযা রোযা

১। **মাসআলা ঃ** কোন কারণবশতঃ যদি রমযানের সব রোযা বা কতেক রোযা রাখিতে না পারে, রমযানের পর যত শীঘ্র সম্ভব হয় ঐ সব রোযার ক্বাযা রাখিতে হইবে, দেরী করিবে না (হায়াত মউতের বিশ্বাস নাই,) বিনা কারণে ক্বাযা রোযা রাখিতে দেরী করিলে গোনাহ্‌গার হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** ক্বাযা রোযা রাখিবার সময় দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিবে যে, 'অমুক দিনের অমুক তারিখের রোযার ক্বাযা করিতেছি। অবশ্য এরূপ নিয়্যত করা জরুরী নহে। শুধু যে কয়টি রোযা ক্বাযা হইয়াছে, সে কয়টি রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। অবশ্য যদি ঘটনাক্রমে দুই রমযানের

ক্বাযা রোযা একত্র হইয়া যায়, তবে এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করিতে হইবে যে, "আজ অমুক বৎসরের রমযানের রোযা আদায় করিতেছি।"

৩। **মাসআলা ঃ** ক্বাযা রোযার জন্য রাত্রেই নিয়্যত করা যরূরী (শর্ত)। ছোব্‌হে ছাদেকের পরে ক্বাযা রোযার নিয়্যত করিলে ক্বাযা ছহীহ্ হইবে না, রোযা রাখিলে সে রোযা নফল হইবে। ক্বাযা রোযা পুনরায় রাখিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** কাফ্‌ফারার রোযারও একই হুকুম; যদি ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বে রাত্রেই কাফ্‌ফারার বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত না করে, তবে কাফ্‌ফারার রোযা ছহীহ্ হইবে না; (সেই রোযা নফল হইয়া যাইবে, কাফ্‌ফারার রোযা পুনরায় রাখিতে হইবে।)

৫। **মাসআলা ঃ** যে কয়টি রোযা ছুটিয়া গিয়াছে, তাহা সব একাধারে বা বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরুস্ত আছে। (একাধারে রাখা মোস্তাহাব।)

৬। **মাসআলা ঃ** গত রমযানের কিছু রোযা ক্বাযা ছিল, তাহা ক্বাযা না করিতেই পুনরায় রমযান আসিয়া গেল, এখন রমযানের রোযাই রাখিতে হইবে, ক্বাযা রোযা পরে রাখিবে। এরূপ দেরী করা ভাল নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** রমযান শরীফের সময় দিনের বেলায় যদি কেহ বেহুঁশ হইয়া পড়ে এবং কয়েকদিন যাবৎ বেহুঁশই থাকে, তবে যদি কোন ঔষধ ইত্যাদি হল্‌কুমের নীচে না যাইয়া থাকে, তবে বেহুঁশীর প্রথম দিনের রোযার নিয়ত পাওয়া গিয়াছে, কাজেই প্রথম দিনের রোযা ছহীহ্ হইয়া যাইবে, পরে যে কয়দিন বেহুঁশ রহিয়াছে, সে কয়দিনের নিয়্যত পাওয়া যায় নাই বলিয়া কিছু পানাহার না হওয়া সত্ত্বেও সে কয়দিনের রোযা হইবে না, সে কয়দিনের রোযার ক্বাযা করিতে হইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** এইরূপে যদি রাত্রে বেহুঁশ হয়, তবুও প্রথম দিনের রোযার ক্বাযা করা লাগিবে না। বেহুঁশীর অন্যান্য দিনের ক্বাযা ওয়াজিব হইবে। অবশ্য যদি পরদিন রোযা রাখার নিয়্যত না করিয়া থাকে, অথবা কোন ঔষধাদি সকাল বেলায় হলকুমের নীচে যাইয়া থাকে, তবে ঐ দিনেরও ক্বাযা রাখিতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ সমস্ত রমযান মাস ব্যাপিয়া বেহুঁশ অবস্থায় থাকে, তবে সুস্থ হওয়ার পর সমস্ত রমযান মাসের রোযা ক্বাযা করিতে হইবে। ইহা মনে করিবে না যে, বেহুঁশ থাকার কারণে রোযা একেবারে মা'ফ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যদি কেহ সমস্ত রমযান মাস ব্যাপিয়া পাগল থাকে, মাত্রই ভাল না হয়, তবে তাহার রমযানের রোযার ক্বাযা করা লাগিবে না; কিন্তু যদি রমযানের মধ্যে ভাল হয়, তবে যে দিন হইতে ভাল হইয়াছে সে দিন হইতে রীতিমত রোযা রাখিবে।

মান্নতের রোযা

১। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কোন ইবাদতের (অর্থাৎ, নামায, রোযা ছদ্‌কা ইত্যাদির) মান্নত করে, তবে তাহা পুরা করা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। যদি না করে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** মান্নত দুই প্রকার। **প্রথম**—দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া মান্নত করা। **দ্বিতীয়**—অনির্দিষ্টরূপে মান্নত করা। ইহার প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার (১)—শর্ত করিয়া মান্নত করা। যেমন বলিল, যদি আমার অমুক কাজ সিদ্ধ হয়, তবে আমি ৫০·০০ টাকা আল্লাহ্‌র রাস্তায়

দান করিব। (২)—বিনা শর্তে শুধু আল্লাহ্‌র নামে মান্নত করা। যেমন বলিল, আমি আল্লাহ্‌র নামে পাঁচটি রোযা রাখিব। মোটকথা, যেরূপই মান্নত করুক না কেন, নির্দিষ্ট হউক বা অনির্দিষ্ট হউক, শর্তসহ হউক বা বিনাশর্তে হউক আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করিয়া যবানে মান্নত করিলেই তাহা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। (অবশ্য শর্ত করিয়া মান্নত করিলে যদি সেই শর্ত পাওয়া যায়, তবে ওয়াজিব হইবে; অন্যথায় ওয়াজিব হইবে না।)

(**মাসআলা ঃ** যদি কেহ বলে, আয় আল্লাহ্! আজ যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে কালই আমি আপনার নামে একটি রোযা রাখিব, অথবা বলে, হে খোদা! আমার অমুক মকছুদ পূর্ণ হইলে পরশু শুক্রবার আমি আপনার নামে একটি রোযা রাখিব। এরূপ মান্নতে যদি রাত্রে রোযার নিয়্যত করে, তবুও দুরুস্ত আছে। আর যদি রাত্রে না করিয়া দ্বিপ্রহরের এক ঘণ্টা পূর্বে নিয়্যত করে, তাহাও দুরুস্ত আছে এবং মান্নত আদায় হইয়া যাইবে।)

৩। **মাসআলা ঃ** মান্নত করিয়া যে জুমু'আর দিন নির্দিষ্ট করিয়াছে, সেই জুমু'আর দিন রোযা রাখিলে যদি মান্নতের রোযা বলিয়া নিয়্যত না করে, শুধু রোযা রাখার নিয়্যত করে, অথবা নফল রোযা রাখার নিয়্যত করে, তবুও নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি ঐ তারিখে ক্বাযা রোযা রাখার নিয়্যত করে এবং মান্নতের রোযার কথা মনে না থাকে, অথবা মনে ছিল কিন্তু ইচ্ছা করিয়া ক্বাযা রোযা রাখিয়াছে, তবে ক্বাযা রোযাই আদায় হইবে, মান্নত আদায় হইবে না; মান্নতের রোযা অন্য আর একদিন ক্বাযা করিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** দ্বিতীয় মান্নত এই যে, যদি দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া মান্নত না করে, শুধু বলে যে, যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, আমি আল্লাহ্‌র নামে পাঁচটি রোযা রাখিব, অথবা শর্ত না করিয়া শুধু বলে, আমি আল্লাহ্‌র নামে পাঁচটি রোযা রাখিব, তবুও পাঁচটি রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে; কিন্তু যেহেতু কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে নাই, কাজেই যে কোন দিন রাখিতে পারিবে কিন্তু নিয়্যত রাত্রেই করা শর্ত। ছোব্‌হে ছাদেকের পরে মান্নতের রোযার নিয়্যত করিলে এইরূপ অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযা আদায় হইবে না এবং এই রোযা নফল হইয়া যাইবে।

নফল রোযা

১। **মাসআলা ঃ** নফল রোযার জন্য যদি এই নিয়্যত করে যে, 'আল্লাহ্‌র নামে একটি নফল রোযা রাখিব', তাহাও দুরুস্ত আছে এবং যদি শুধু এইরূপ নিয়্যত করে যে, 'আমি আল্লাহ্‌র নামে একটি রোযা রাখিব' তাহাও দুরুস্ত আছে।

২। **মাসআলা ঃ** বেলা দ্বিপ্রহরের এক ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযার নিয়্যত করা দুরুস্ত আছে। অতএব, যদি কাহারও বেলা ১০টা পর্যন্তও রোযা রাখার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখনও কিছু পানাহার করে নাই, তারপর রোযা রাখার ইচ্ছা হইল, তবে ঐ সময় রোযার নিয়্যত করিলেও নফল রোযা দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** সারা বৎসরে মাত্র পাঁচ দিন রোযা রাখা দুরুস্ত নহে। দুই ঈদের দুই দিন এবং বক্‌রা ঈদের পরে ১১ই, ১২ই, এবং ১৩ই যিলহজ্জ, মোট এই পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম, তাহা ছাড়া নফল রোযা যে কোন দিন রাখা যায় এবং নফল রোযা যত বেশী রাখা যাইবে তত বেশী সওয়াব পাওয়া যাইবে।

৪। মাসআলা ঃ যদি কেহ ঈদের দিন রোযা রাখার মান্নত করে, তবুও ঈদের দিন রোযা দুরুস্ত নহে। তৎপরিবর্তে অন্য একদিন রোযা রাখিয়া মান্নত পুরা করিতে হইবে।

৫। মাসআলা ঃ যদি কেহ এইরূপ মান্নত করে যে, 'আমি সারা বৎসর রোযা রাখিব, এক দিনেরও রোযা ছাড়িব না,' তবুও এই পাঁচ দিন রোযা রাখিবে না। এই পাঁচ দিন রোযা না রাখিয়া তাহার পরিবর্তে অন্য পাঁচ দিন রোযা রাখিতে হইবে।

৬। মাসআলা ঃ নফল রোযার নিয়্যত করিয়া লইলে সে রোযা পুরা করা ওয়াজিব হইয়া যায়। অতএব, যদি কেহ সকালে নফল রোযার নিয়ত করিয়া পরে ঐ রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে তাহার ঐ রোযার ক্বাযা করা ওয়াজিব হইবে।

৭। মাসআলা ঃ কেহ রাত্রে রোযা রাখার ইচ্ছা করিয়াছিল, 'আমি আগামীকাল রোযা রাখিব', কিন্তু ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পূর্বেই নিয়্যত বদলিয়া গেল এবং রোযা রাখিল না, তবে তাহার ক্বাযা ওয়াজিব হইবে না। (কিন্তু ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পর যদি বদলায়, তবে ক্বাযা ওয়াজিব হইবে।)

৮। মাসআলা ঃ স্ত্রীর জন্য স্বামী বাড়ীতে থাকিলে স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল রোযা রাখা দুরুস্ত নহে। এমন কি, যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল রোযার নিয়্যত করে এবং পরে স্বামী রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলার আদেশ করে, তবে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলা দুরুস্ত আছে, কিন্তু পরে স্বামীর অনুমতি লইয়া তাহার ক্বাযা করিতে হইবে।

৯। মাসআলা ঃ মেহ্‌মান বা মেযবান (মেহ্‌মান অতিথি, মেযবান বাড়ীওয়ালা) যদি একে অন্যের সঙ্গে না খাওয়াতে মনে কষ্ট পায়, তবে নফল রোযা ছাড়িয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে, কিন্তু ঐ রোযার পরিবর্তে আর একটি রোযা রাখিতে হইবে।

১০। মাসআলা ঃ কেহ ঈদের দিন নফল রোযা রাখিল এবং নিয়্যতও করিল, তবুও সেই রোযা ছাড়িয়া দিবে, উহার ক্বাযা করাও ওয়াজিব হইবে না।

১১। মাসআলা ঃ মহর্‌রম মাসের ১০ই তারিখ রোযা রাখা মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে আছে, যে কেহ মহর্‌রম মাসের ১০ই তারিখে একটি রোযা রাখিবে তাহার বিগত এক বৎসরের (ছগীরা) গোনাহ্‌ মা'ফ হইয়া যাইবে (কিন্তু শুধু ১০ই তারিখে একটি রোযা মকরূহ্‌। কাজেই তাহার সঙ্গে ৯ই তারিখে অথবা ১১ই তারিখে রোযা রাখিবে।)

১২। মাসআলা ঃ এইরূপ হজ্জের চাঁদের ৯ই তারিখে রোযা রাখাও বড় সওয়াব। (হাদীস শরীফে আছে,) যে ব্যক্তি হজ্জের চাঁদের ৯ই তারিখে এই রোযা রাখিবে, তাহার বিগত এবং আগামী বৎসরের (ছগীরা) গোনাহ্‌ মা'ফ হইয়া যাইবে। (মহর্‌রমের আশুরার তারিখে একটি রোযা মকরূহ্‌, কিন্তু এখানে একটি রোযা রাখা মকরূহ্‌ নহে।) তবে শুরু চাঁদ হইতে ৯ই যিলহজ্জ পর্যন্ত রোযা রাখা উত্তম। (এইরূপে মহর্‌রমের চাঁদের শুরু হইতে ১০টি রোযা রাখা অতি উত্তম।)

১৩। মাসআলা ঃ শা'বানের চাঁদের ১৫ ই তারিখে রোযা রাখা এবং শাওয়ালের চাঁদের ঈদের দিন বাদ দিয়া ছয়টি রোযা রাখা অন্যান্য নফল রোযা অপেক্ষা অধিক সওয়াব (রজবের চাঁদে ২৭শে তারিখে রোযা রাখাও মুস্তাহাব।)

১৪। মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক চাঁদের ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই তারিখে আইয়্যামে বীযের তিনটি রোযা রাখিল, সে যেন সারা বৎসর রোযা রাখিল। হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম এই

তিনটি রোযা রাখিতেন এবং প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবারেও রোযা রাখিতেন। যদি কেহ এইসব রোযা রাখে, তবে তাহাতে অনেক সওয়াব আছে। (না রাখিলে কোন গোনাহ্ নাই।)

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় বা হয় না

১। মাসআলা ঃ রোযা রাখিয়া যদি রোযার কথা ভুলিয়া কিছু খাইয়া ফেলে, কিংবা ভুলে স্বামী-সহবাস হইয়া যায়, রোযার কথা মাত্রই মনে না আসে, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। যদি ভুলে পেট ভরিয়াও পানাহার করে, কিংবা ভুলে কয়েক বার পানাহার করে, তবুও রোযা ভঙ্গ হয় না। (কিন্তু খাওয়া শুরু করার পর স্মরণ হইলে তৎক্ষণাৎ খাওয়া বন্ধ করিতে হইবে। কিছু জিনিস গিলিয়া ফেলিলেও রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে।)

২। **মাসআলা ঃ** কোন রোযাদারকে ভুলবশতঃ খাইতে দেখিলে যদি রোযাদার সবল হয় এবং রোযা রাখিতে কষ্ট না হয়, তবে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু যদি রোযা রাখিবার মত শক্তি তাহার না থাকে, তবে স্মরণ করাইবে না; তাহাকে খাইতে দিবে।

৩। মাসআলা ঃ রোযা রাখিয়া দিনে ঘুমাইলে ও স্বপ্নদোষ হইলে (বা স্বপ্নে কিছু খাইলে) রোযা ভঙ্গ হয় না।

৪। মাসআলা ঃ রোযা রাখিয়া সুরমা বা তেল লাগান অথবা খুশ্‌বুর ঘ্রাণ লওয়া দুরুস্ত আছে। এমন কি, চোখে সুরমা লাগাইলে যদি থুথু কিংবা শ্লেষ্মায় সুরমার রং দেখা যায়, তবুও রোযা ভঙ্গ হয় না, মকরূহ্ও হয় না।

৫। মাসআলা ঃ রোযা রাখিয়া দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে শোয়া হাত লাগান বা পেয়ার করা সমস্তই দুরুস্ত, কিন্তু যদি কামভাব প্রবল হইয়া স্ত্রীসহবাসের আশংকা হয়, তবে এরূপ করা মকরূহ্। (এই জন্যই জওয়ান স্বামী-স্ত্রীর জন্য রোযা রাখিয়া চুম্বন অথবা কোলাকুলি করা মকরূহ্। কিন্তু যে সব বৃদ্ধের মনে চাঞ্চল্য আসে না তাহাদের জন্য মকরূহ্ নহে।)

৬। মাসআলা ঃ আপনাআপনি যদি হল্‌কুমের মধ্যে মাছি, ধোঁয়া বা ধুলা চলিয়া যায়, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না; কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক এরূপ করিলে রোযা ভঙ্গ হইবে।

৭। মাসআলা ঃ লোবান বা আগরবাতি জ্বালাইয়া তাহার ধোঁয়া গ্রহণ করিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। এইরূপে যদি কেহ বিড়ি সিগারেট অথবা হুক্কার ধোঁয়া পান করে তবে তাহার রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু গোলাপ, কেওড়া ফুল, আতর ইত্যাদি যে সব খোশবুতে ধোঁয়া নাই, তাহার ঘ্রাণ লওয়া দুরুস্ত আছে।

৮। মাসআলা ঃ দাঁতের ফাঁকে যদি কোন খাদ্যদ্রব্য আট্‌কিয়া থাকে এবং খেলাল বা জিহ্বার দ্বারা তাহা বাহির করিয়া গিলিয়া ফেলে, মুখের বাহির না করে এবং ঐ খাদ্যদ্রব্য একটি বুটের পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিক হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর যদি একটি বুট অপেক্ষা কম হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে না; কিন্তু যদি মুখ হইতে বাহিরে আনিয়া তারপর গিলে, তবে তাহা একটি বুট হইতে কম হইলেও রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৯। মাসআলা ঃ মুখের থুথু যত বেশীই হউক না কেন তাহা গিলিলে রোযার কোনই ক্ষতি হয় না।

১০। মাসআলা ঃ শেষ রাত্রে সেহ্‌রী খাওয়ার পর যদি কেহ পান খায়, তবে ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বেই উত্তমরূপে কুল্লি করিয়া মুখ ছাফ করিয়া লওয়া উচিত। উত্তমরূপে কুল্লি করার পরও যদি

সকালে থুথু কিছু লাল দেখায়, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (রোযা অবস্থায় ইন্‌জেকশন নিলেও রোযা নষ্ট হয় না।)

১১। মাসআলাঃ রাত্রে যদি গোসল ফরয হয়, তবে ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বেই গোসল করিয়া লওয়া উচিত; কিন্তু যদি কেহ গোসল করিতে দেরী করে, কিংবা সারাদিন গোসল নাও করে, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য ফরয গোসল অকারণে দেরীতে করিলে তজ্জন্য পৃথক গোনাহ্‌ হইবে।

১২। মাসআলাঃ নাকের শ্লেষ্মা জোরে টানার কারণে যদি হলকুমে চলিয়া যায়, তবে তাহাতে রোযা নষ্ট হয় না। এইরূপে মুখের লালা টানিয়া গিলিলেও রোযা নষ্ট হয় না।

১৩। মাসআলাঃ যদি কেহ সেহ্‌রী খাইয়া পান মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে ঘুমাইয়া পড়ে এবং পান মুখে থাকা অবস্থাতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়, তবে তাহার রোযা শুদ্ধ হইবে না। এই রোযা ভাঙ্গিতে পারিবে না বটে, কিন্তু উহার পরিবর্তে একটি রোযা ক্বাযা রাখিতে হইবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না।

১৪। মাসআলাঃ কুল্লি করার সময় যদি (অসতর্কতাবশতঃ রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও) হলকুমের মধ্যে পানি চলিয়া যায়, (অথবা ডুব দিয়া গোসল করিবার সময় হঠাৎ নাক বা মুখ দিয়া পানি হলকুমের ভিতর চলিয়া যায়,) তবে রোযা ভঙ্গ হইবে। (কিন্তু পানাহার করিতে পারিবে না।) এই রোযা ক্বাযা করা ওয়াজিব, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব নহে।

১৫। মাসআলাঃ আপনাআপনি যদি বমি হইয়া যায়, তবে বেশী হউক কি কম হউক, তাহাতে রোযা নষ্ট হয় না। কিন্তু যদি ইচ্ছা করিয়া মুখ ভরিয়া বমি করে, তবে রোযা নষ্ট হইয়া যায়, অল্প বমি করিলে রোযা নষ্ট হয় না।

১৬। মাসআলাঃ যদি আপনাআপনিই সামান্য বমি হয় এবং আপনাআপনিই হলকুমের ভিতর চলিয়া যায়, তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে না। অবশ্য যদি ইচ্ছাপূর্বক গিলে, তবে কম হইলেও রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে, (অথবা যদি বেশী পরিমাণ আপনাআপনিই হলকুমের নীচে চলিয়া যায়, তবে রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু পানাহার করিবে না।)

১৭। মাসআলাঃ যদি কেহ একটি কঙ্কর অথবা একটি লোহার (বা সীসার) গুলি (অথবা একটি পয়সা গিলিয়া ফেলে অর্থাৎ,) এমন কোন জিনিস গিলিয়া ফেলে যাহা লোকে সাধারণতঃ খাদ্যরূপেও খায় না বা ঔষধরূপেও সেবন করে না, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না; শুধু একটি রোযার পরিবর্তে একটি রোযা ক্বাযা করিতে হইবে। আর যদি এমন কোন জিনিস গিলিয়া ফেলে, যাহা লোকে খাদ্যরূপে খায়, অথবা পানীয়রূপে পান করে, বা ঔষধরূপে সেবন করে, তবে তাহাকে ক্বাযাও রাখিতে হইবে এবং কাফ্‌ফারাও দিতে হইবে।

১৮। মাসআলাঃ রোযা রাখিয়া দিনের বেলায় স্ত্রী-সহবাস করিলে এমন কি পুরুষের খৎনা স্থান স্ত্রীর যোনি দ্বারে প্রবেশ করিলে বীর্যপাত হউক বা না হউক রোযা ভঙ্গ হইবে, ক্বাযা এবং কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হইবে।

১৯। মাসআলাঃ স্বামী যদি স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে পুরুষাঙ্গের খৎনাস্থান পর্যন্ত প্রবেশ করায়, তবুও উভয়ের রোযা ভঙ্গ হইবে। কাফ্‌ফারা, ক্বাযা উভয়ই ওয়াজিব হইবে।

২০। **মাসআলা ঃ** রমযান শরীফের রোযা রাখিয়া ভাঙ্গিলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়। রমযান ছাড়া অন্য কোন রোযা ভাঙ্গিলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না, যেরূপেই ভাঙ্গুক, যদিও রমযানের ক্বাযা রোযা রাখিয়া ভাঙ্গে। অবশ্য যদি রাত্রে রোযার নিয়্যত না করে, কিংবা রোযা ভাঙ্গার পর ঐ দিনই হায়েয আসে, তবে ঐ ভাঙ্গার কারণে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না।

২১। **মাসআলা ঃ** নাকে নস্য টানিলে বা কানে তেল ঢালিলে, অথবা পায়খানার জন্য ডুস লইলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়, কিন্তু এইরূপ করিলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না, শুধু ক্বাযা করিতে হইবে। কানে পানি টপ্‌কাইলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না।

২২। **মাসআলা ঃ** রোযা রাখা অবস্থায় পেশাবের রাস্তায় কোন ঔষধ রাখা অথবা তেল ইত্যাদি কিছু টপকান দুরুস্ত নাই। যদি কেহ ঔষধ রাখে, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে এবং ক্বাযা ওয়াজিব হইবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না।

২৩। **মাসআলা ঃ** ধাত্রী যদি প্রসূতির প্রস্রাব দ্বারে আঙ্গুল ঢুকায় কিংবা নিজেই নিজ যোনিতে আঙ্গুল ঢুকায়, অতঃপর সম্পূর্ণ আঙ্গুল বা কিয়দংশ বাহির করার পর আবার ঢুকায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না। আর যদি বাহির করার পর আবার না ঢুকায় তবে রোযা ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য যদি পানি ইত্যাদির দ্বারা আঙ্গুল ভিজা থাকে, তবে প্রথমবারে ঢুকাইলেই রোযা ভঙ্গ হইবে।

২৪। **মাসআলা ঃ** দাঁত দিয়া রক্ত বাহির হইলে যদি থুথুর সঙ্গে সে রক্ত গিলিয়া ফেলে, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে, কিন্তু যদি থুথুর চেয়ে কম হয়—যাহাতে রক্তের স্বাদ পাওয়া না যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে না।

২৫। **মাসআলা ঃ** কোন জিনিস জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়া শুধু একটু স্বাদ দেখিয়া থুথু ফেলিয়া দিলে, রোযা ভঙ্গ হয় না; কিন্তু বিনা দরকারে এরূপ করা মক্‌রূহ্। অবশ্য যদি কাহারও স্বামী এত বড় যালেম এবং পাষাণ হৃদয় হয় যে, ছালুনে নিমক একটু বেশী-কম হইলে যুলুম করা শুরু করে, তাহার জন্য ছালুনের নুন দেখিয়া থুথু ফেলিয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে, মকরূহ্ নহে।

২৬। **মাসআলা ঃ** রোযাবস্থায় শিশু সন্তানের খাওয়ার জন্য কোন জিনিস চিবাইয়া দেওয়া মকরূহ্। অবশ্য শিশুর জীবন ওষ্ঠাগত হইলে এবং কেহ চিবাইয়া দেওয়ার না থাকিলে, এইরূপ অবস্থায় চিবাইয়া দিয়া মুখ পরিষ্কার করিয়া ফেলা জায়েয আছে।

২৭। **মাসআলা ঃ** রোযা রাখিয়া দিনের বেলায় কয়লা, বা মাজন (বা বালুর) দ্বারা দাঁত মাজা মকরূহ্ এবং ইহার কিছু অংশ যদি হলকুমের নীচে চলিয়া যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কাঁচা বা শুক্‌না মেস্‌ওয়াক দ্বারা দাঁত মাজা দুরুস্ত আছে। এমন কি, যদি নিমের কাঁচা ডালের মেস্‌ওয়াক দ্বারা মেস্‌ওয়াক করে এবং তাহার তিক্ততার স্বাদ মুখে অনুভব করে, তাহাতেও রোযার কোন ক্ষতি হইবে না, মক্‌রূহ্‌ও হইবে না।

২৮। **মাসআলা ঃ** কোন স্ত্রীলোক অসতর্ক অবস্থায় ঘুমাইয়াছে, কিংবা অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে, কেহ তাহার সহিত সহবাস করিলে তাহার রোযা ভঙ্গ হইবে এবং ক্বাযা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু পুরুষের কাফ্‌ফারাও ওয়াজিব হইবে।

২৯। **মাসআলা ঃ** ভুলে পানাহার করিলে রোযা যায় না, কিন্তু এইরূপ করার পর তাহার রোযা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া যদি কিছু খায়, তবে তাহার রোযা অবশ্য ভঙ্গ হইয়া যাইবে; কিন্তু শুধু ক্বাযা করিতে হইবে, কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

৩০। **মাসআলা ঃ** কাহারও যদি আপনাআপনি বমি হয়, তাহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না, কিন্তু রোযা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া যদি পরে কিছু খায়, তবে তাহার রোযা অবশ্য টুটিয়া যাইবে; কিন্তু শুধু ক্বাযা করিতে হইবে, কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

৩১। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ সুরমা অথবা তেল লাগাইয়া অজ্ঞতাবশতঃ মনে করে যে, তাহার রোযা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এই কারণে ইচ্ছা করিয়া কিছু খাওয়া-দাওয়া করে, তবে ক্বাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হইবে।

৩২। **মাসআলা ঃ** রমযান মাসে কোন কারণবশতঃ যদি কাহারও রোযা ভাঙ্গিয়া যায়, তবুও দিনের বেলায় তাহার জন্য কিছু খাওয়-দাওয়া দুরুস্ত নহে, সমস্ত দিন রোযাদারের ন্যায় না খাইয়া থাকা তাহার উপর ওয়াজিব।

৩৩। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ রমযানে রোযার নিয়্যতই করে নাই বলিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতে থাকে, তাহার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না। রোযার নিয়্যত করিয়া ভাঙ্গিলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়।

কাফ্‌ফারা

১। **মাসআলা ঃ** রমযান শরীফের রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে একাধারে দুই মাস অর্থাৎ, ৬০টি রোযা রাখিতে হইবে। কিছু কিছু করিয়া রাখা দুরুস্ত নাই। একলাগা ৬০টি রোযা রাখিতে হইবে। যদি মাঝখানে ঘটনাক্রমে দুই একদিনও বাদ পড়ে, তবে তাহার পর হইতে আবার ৬০টি গণনা করিয়া পূর্ণ করিতে হইবে, পূর্বেরগুলি হিসাবে ধরা যাইবে না। এমন কি, যদি এই ৬০দিনের মধ্যে ঈদের বা কোরবানীর দিনও আসে, তবুও কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না, পূর্বগুলি বাদ দিয়া উহার পর হইতে ৬০টি পূর্ণ করিতে হইবে। অবশ্য এই ৬০ দিনের মধ্যে যদি মেয়েলোকের হায়েয আসে, তবে তাহা মা'ফ; কিন্তু হায়েয হইতে পাক হইবার পর দিন হইতেই আবার রোযা রাখিতে হইবে এবং ৬০টি রোযা পূর্ণ করিতে হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** নেফাসের কারণে যদি মাঝে রোযা ভাঙ্গা পড়ে, তবে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। নেফাস হইতে পাক হওয়ার পর ৬০টি পূর্ণ করিবে। নেফাসের পূর্বে যদি কিছু রোযা রাখিয়া থাকে, তাহা গণনায় ধরা যাইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** রোগের কারণে যদি মাঝখানে ভাঙ্গা পড়ে, তবে রোগ আরোগ্য হওয়ার পর নূতনভাবে ৬০টি রোযা পূর্ণ করিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি মাঝে রমযানের মাস আসে, তবুও কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও কাফ্‌ফারার রোযা রাখার শক্তি না থাকে, তবে রমযান শরীফের একটি রোযা ভাঙ্গিল তাহার পরিবর্তে ৬০ জন মিস্‌কীনকে দুই ওয়াক্ত খুব পেট ভরিয়া খাওয়াইতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** যদি এই ৬০ জনের মধ্যে কয়েকজন এমন অল্প বয়স্ক থাকে যে, তাহারা পূর্ণ খোরাক খাইতে পারে না, তবে তাহাদিগকে হিসাবে ধরা যাইবে না। তাহাদের পরিবর্তে অন্য পূর্ণ খোরাক খানেওয়ালা মিসকীনকে আবার খাওয়াইতে হইবে।

৭। **মাসআলাঃ** যদি গমের রুটি হয়, তবে শুধু রুটি খাওয়ানও দুরুস্ত আছে, আর যদি যব, বজরা, ভুট্টা ইত্যাদির রুটি বা ভাত হয়, তবে উহার সহিত কিছু ভাল তরকারী দেওয়া উচিত। যাহাতে রুটি, ভাত খাইতে পারে।

৮। **মাসআলাঃ** পাকান খাদ্য না খাওয়াইয়া যদি ৬০ জন মিসকীনকে গম বা তার আটা দেয়, তাহাও জায়েয আছে। কিন্তু প্রত্যেক মিসকীনকে ছদ্‌কায়ে ফেৎর পরিমাণ দিতে হইবে। ছদ্‌কায়ে ফেৎরের বর্ণনা যাকাত অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৯। **মাসআলাঃ** যদি এইপরিমাণ গমের দাম দেয় তাহাও জায়েয আছে।

১০। **মাসআলাঃ** কিন্তু যদি সে তাহার কাফ্‌ফারা আদায় করিবার জন্য কাহাকেও অনুমতি দেয় বা আদেশ করে এবং তারপর সেই ব্যক্তি আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহার কাফ্‌ফারা আদায় হইয়া যাইবে। যাহার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইয়াছে তাহার বিনা অনুমতিতে যদি অন্য কেহ তাহার কাফ্‌ফারা আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাতে তাহার কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না।

১১। **মাসআলাঃ** যদি একজন মিস্‌কীনকে ৬০ দিন সকাল বিকাল পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেয় বা একই জনকে ৬০ দিন ৬০ বার (ছদ্‌কায়ে ফেৎর পরিমাণ) গম বা তাহার মূল্য দেয় তাহাতে কাফ্‌ফারা আদায় হইয়া যাইবে।

১২। **মাসআলাঃ** যদি ৬০ দিন পর্যন্ত খাওয়াইবার বা মূল্য দিবার সময় মাঝখানে ২/১ দিন বাকী পড়ে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। (একাধারে ৬০ দিন না হইলেও সর্বশুদ্ধ ৬০ দিন খাওয়ান হইলে বা মূল্য দেওয়া হইলে তাহাতেই চলিবে)।

১৩। **মাসআলাঃ** ৬০ দিনের আটা বা গম অথবা তাহার মূল্য হিসাব করিয়া একই দিন একজন মিস্‌কীনকে দেওয়া দুরুস্ত নাই। (দিলে মাত্র এক দিনের কাফ্‌ফারা আদায় হইবে, বাকী ৫৯ দিনের পুনরায় আদায় করিতে হইবে।) এইরূপে যদি এক দিন একজন মিসকীনকে ৬০ বার দেয়, তাবুও মাত্র একদিনেরই কাফ্‌ফারা আদায় হইবে, বাকী ৫৯ দিনের পুনরায় আদায় করিতে হইবে। সারকথা এই যে, একদিন একজন গরীবকে একটি রোযার বিনিময় হইতে অধিক দিলে তাহার হিসাব ধরা যাইবে না, মাত্র এক দিনেরই ধরা যাইবে।

১৪। **মাসআলাঃ** কোন মিসকীনকে ছদ্‌কায়ে ফেৎর পরিমাণের কম দিলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না।

১৫। **মাসআলাঃ** যদি একই রমযানের ২ বা ৩টি রোযা ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে একটি কাফ্‌ফারাই ওয়াজিব হইবে। (কিন্তু যে কয়টি রোযা ভাঙ্গিয়াছে সেই কয়টির কাযা করিতে হইবে। যদি দুই রমাযানের দুইটি রোযা ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে একটি কাফ্‌ফারা যথেষ্ট হইবে না, দুইটি কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে।)

সেহ্‌রী ও ইফ্‌তার

১। **মাসআলাঃ** রোযা রাখিবার উদ্দেশ্যে শেষ রাত যাহাকিছু খাওয়া হয়, তাহাকে সেহ্‌রী বলে। সেহ্‌রী খাওয়া সুন্নত। ক্ষুধা না থাকিলে অন্ততঃ ২/১টি খোরমা বা অন্য কোন জিনিস খাইবে। কিছু না হইলে একটু পানি পান করিবে। (ইহাতেও সুন্নত আদায় হইবে।

২। **মাসআলাঃ** সেহ্‌রীর সময় যদি কেহ সেহ্‌রী না খাইয়া মাত্র (এক মুষ্টি চাউল পানি দিয়া খায় বা) একটি পান খায়, তাহাতেও সেহ্‌রী খাওয়ার সওয়াব হাছেল হইয়া যাইবে।

৩। মাসআলা ঃ সেহ্‌রী যথাসম্ভব দেরী করিয়া খাওয়া ভাল, এত দেরী করা উচিত নহে যাহাতে ছোবহে ছাদেক হইবার আশংকা হয় এবং রোযার মধ্যে সন্দেহ আসিতে পারে।

৪। মাসআলা ঃ যদি সেহ্‌রী খুব জল্‌দী খায়; কিন্তু তাহার পর পান তামাক, চা, পানি ইত্যাদি অনেকক্ষণ পর্যন্ত খাইতে থাকে, ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার অল্প পূর্বে কুল্লি করিয়া ফেলে, তবুও দেরী করিয়া খাওয়ার সওয়াব পাইবে। ইহার হুকুমও দেরী করিয়া খাওয়ার হুকুম। (সেহ্‌রী খাওয়ার আসল সময় সূর্যাস্ত হইতে ছোব্‌হে ছাদেক পর্যন্ত যে কয় ঘণ্টা হয় তাহার ছয় ভাগের শেষ ষষ্ঠ ভাগ। যদি কেহ ইহার পূর্বে ভাত ইত্যাদি খায়, কিন্তু চা, পান ইত্যাদি এই শেষ ষষ্ঠাংশে করে, তবে তাহাতেও মুস্তাহাবের সওয়াব হাছেল হইবে।)

৫। মাসআলা ঃ যদি রাত্রে ঘুম না ভাঙ্গে এবং সেই জন্য সেহ্‌রী খাইতে না পারে, তবে সেহ্‌রী না খাইয়া রোযা রাখিবে। সেহ্‌রী না খাওয়ার কারণে রোযা ছাড়িয়া দেওয়া বড়ই কাপুরুষতার লক্ষণ এবং বড়ই গোনাহ্‌র কাজ।

৬। মাসআলা ঃ যে পর্যন্ত ছোব্‌হে ছাদেক না হয় অর্থাৎ, পূর্বদিকে সাদা বর্ণ না দেখা যায়, সে পর্যন্ত সেহ্‌রী খাওয়া দুরুস্ত আছে। ছোব্‌হে ছাদেক হইয়া গেলে তারপর আর কিছুই খাওয়া-দাওয়া দুরুস্ত নহে।

৭। মাসআলা ঃ যদি কেহ দেরীতে ঘুম হইতে উঠিয়া 'এখনও রাত আছে, ছোব্‌হে ছাদেক হয় নাই,' এই মনে করিয়া সেহ্‌রী খায়, পরে জানিতে পারে যে, ঐ সময় রাত ছিল না, তবে ঐ রোযা ছহীহ্‌ হইবে না, ঐ রোযার পরিবর্তে আর একটি রোযা ক্বাযা করিতে হইবে; কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। কিন্তু ঐ দিনেও কিছু পানাহার করিতে পারিবে না। এইরূপে যদি সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে, এই মনে করিয়া ইফ্‌তার করিয়া ফেলে এবং পরে জানেত পারে যে, সূর্য ডুবে নাই, তবে ঐ রোযা ছহীহ্‌ হইবে না। ঐ রোযার ক্বাযা করিতে হইবে; কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। অবশ্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট সময়টুকুতে কিছুই পানাহার করিতে পারিবে না।

৮। মাসআলা ঃ দেরী করিয়া উঠিয়া যদি সন্দেহ হয় যে, হয়ত ছোব্‌হে ছাদেক হইয়া গিয়াছে, তবে ঐ সময় কিছু খাওয়া-দাওয়া মাক্‌রূহ্‌। ঐরূপ সন্দেহের সময় কিছু খাইলে গোনাহ্‌গার হইবে এবং রোযার ক্বাযা করিতে হইবে। কিন্তু যদি এক্বিনীভাবে জানিতে পারে যে, ছোব্‌হে ছাদেক হয় নাই, তবে রোযার ক্বাযা করিতে হইবে না। আর যদি কিছু ঠিক করিতে না পারে সন্দেহই থাকিয়া যায়, তবে ক্বাযা ওয়াজিব নহে, কিন্তু ক্বাযা রাখা ভাল।

৯। মাসআলা ঃ যখন নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সূর্য অস্ত গিয়াছে তখন আর দেরী না করিয়া শীঘ্রই ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব। দেরী করিয়া ইফ্‌তার করা মকরূহ্‌।

১০। মাসআলা ঃ আবরের (মেঘের) দিনে কিছু দেরী করিয়া ইফ্‌তার করা ভাল। শুধু ঘড়ি-ঘণ্টার উপর নির্ভর করা ভাল নয়। কারণ, ঘড়ি-ঘণ্টাও প্রায় সময় ভুল হয়। অতএব, আবরের দিনে যতক্ষণ ঈমানদার ব্যক্তির দিলে সূর্য অস্ত গিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য না দেয়, ততক্ষণ ইফ্‌তার করিবে না। কাহারও আযানের উপরও পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নহে। কারণ, মোয়ায্‌যেনেরও ভুল হইতে পারে। কাজেই ঈমানদারের দিলে গাওয়াহী না দেওয়া পর্যন্ত ছবর করাই ভাল। ওয়াক্ত হইল কি না সন্দেহ হইলে ইফ্‌তার করা দুরুস্ত নাই।

১১। মাসআলা ঃ খোরমার দ্বারা ইফ্‌তার করা সবচেয়ে উত্তম। খোরমার অভাবে অন্য কোন মিষ্টি জিনিস দ্বারা এবং তদভাবে পানি দ্বারা ইফ্‌তার করা ভাল। কেহ কেহ লবণ দিয়া ইফ্‌তার করাকে সওয়াব মনে করে। এই আকীদা ভুল।

১২। মাসআলা ঃ যে পর্যন্ত সূর্যাস্ত সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে, সে পর্যন্ত ইফ্‌তার করা জায়েয নহে।

যে সব কারণে রোযা রাখিয়াও ভাঙ্গা যায়

১। মাসআলা ঃ রোযা রাখিয়া হঠাৎ যদি এমন কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে যে, কিছু দাওয়া-পানি না খাইলে জীবনের আশঙ্কা হইতে পারে বা রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতে পারে, তবে এইরূপ অবস্থায় রোযা ছাড়িয়া দিয়া ঔষধ সেবন করা জায়েয আছে। যেমন, হঠাৎ পেটে এমন বেদনা উঠিল যে, একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল, অথবা সাপে দংশন করিল যে, ঔষধ না খাইলে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হয়, এইরূপে যদি এমন ভীষণ পিপাসা হয় যে, প্রাণ নাশের আশংকা হয়, তবে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে।

২। মাসআলা ঃ গর্ভবতী মেয়েলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, নিজের বা সন্তানের প্রাণ নাশের আশংকা হয়, তবে রোযা ভাঙ্গা দুরুস্ত আছে।

৩। মাসআলা ঃ খানা পাকাইবার কারণে যদি এত পিপাসা হয়, প্রাণ নাশের আশংকা হয়, তবে রোযা ছাড়িয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু যদি নিজে স্বেচ্ছায় এমন কাজ করে, যাহাতে এরূপ অবস্থা হয়, তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

যে কারণে রোযা না রাখা জায়েয

১। মাসআলা ঃ কেহ যদি এমন রোগাক্রান্ত হয় যে, যদি রোযা রাখে, তবে (ক) রোগ বাড়িয়া যাইবে, (খ) রোগ দুরারোগ্য হইয়া যাইবে, (গ) জীবন হারাইবার আশঙ্কা হয়, তবে তাহার জন্য তখন রোযা না রাখিয়া আরোগ্য লাভ করার পর ক্বাযা রাখা দুরুস্ত আছে। কিন্তু শুধু নিজের কাল্পনিক খেয়ালে রোযা ছাড়া জায়েয নহে, যখন কোন মুসলমান দ্বীনদার চিকিৎসক সার্টিফিকেট (সাক্ষ্য) দিবেন যে, রোযা তোমার ক্ষতি করিবে, তখন রোযা ছাড়া জায়েয হইবে।

২। মাসআলা ঃ চিকিৎসক, ডাক্তার বা কবিরাজ যদি কাফের (অমুসলমান) হয়, অথবা এমন মুসলমান হয় যে, দ্বীন-ঈমানের পরওয়া রাখে না, তবে তাহার কথায় রোযা ছাড়া যাইবে না।

৩। মাসআলা ঃ রোগী যদি নিজেই বহুদর্শী জ্ঞানী হয় এবং বারবার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, এই রোগে রোযা রাখিলে নিশ্চয় ক্ষতি হইবে এবং মনেও এইরূপ সাক্ষ্য দেয় তবে নিজের মনের সাক্ষ্যের উপর রোযা ছাড়িতে পারে। কিন্তু যদি নিজে ভুক্তভোগী জ্ঞানী না হয়, তবে শুধু কাল্পনিক খেয়ালের কোনই মূল্য নাই। কাল্পনিক খেয়ালের বশীভূত হইয়া কিছুতেই রোযা ছাড়িবে না। এইরূপ অবস্থায় দ্বীনদার চিকিৎসকের সাক্ষ্য (সনদ) ব্যতিরেকে রোযা ছাড়িলে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। রোযা না রাখিলে গোনাহ্ হইবে।

৪। মাসআলা ঃ রোগ আরোগ্য হওয়ার পর যে দুর্বলতা থাকে, সেই দুর্বল অবস্থায় যদি রোযা রাখিলে পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে, তবে সে অবস্থায় রোযা না রাখা জায়েয আছে।

৫। মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি বাড়ী হইতে ৪৮ মাইল বা তদূর্ধ্ব দূরবর্তী স্থানে যাইবার এরাদা করিয়া নিজ বাসস্থানের লোকদের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহাকে শরীঅতের পরিভাষায় 'মুসাফির' বলে। অবশ্য যাহারা শরীঅত অনুসারে মুসাফির তাহারা সফরে থাকাকালীন রোযা ছাড়িয়া দিয়া অন্য সময় রাখিতে পারে।

৬। মাসআলা ঃ শরয়ী সফরে যদি কোন কষ্ট না হয়, যেমন গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছে, ধারণা এই যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ী পৌঁছিয়া যাইবে, কিংবা সঙ্গে আরামের দ্রব্য আছে। তবে রোযা রাখাই উত্তম, কিন্তু না রাখিলে গোনাহ্ হইবে না; অবশ্য রমযানের ফযীলত পাইবে না। যদি রোযা রাখিতে কষ্ট হয়, তবে রোযা না রাখাই ভাল।

৭। মাসআলা ঃ যদি কেহ পীড়িতাবস্থায় মারা যায়, অথবা শরয়ী সফরেই মৃত্যু হয়, তবে যে কয়টি রোযা এই রোগের অথবা এই সফরের জন্য ছুটিয়াছে, আখেরাতে তাহার জন্য দায়ী হইবে না। কেননা, সে ক্বাযা রোযা রাখিবার সময় পায় নাই।

৮। মাসআলা ঃ কেহ পীড়িতাবস্থায় ১০টি রোযা ছাড়িয়াছে এবং পরে পাঁচ দিন ভাল থাকিয়া মৃত্যু হইল, এখন পাঁচটি রোযা মা'ফ পাইবে, কিন্তু যে পাঁচ দিন ভাল ছিল অথচ ক্বাযা রোযা রাখে নাই, সেই পাঁচটি রোযার জন্য দায়ী হইবে এবং কিয়ামতের হিসাবের সময় তাহার জন্য ধর-পাকড় হইবে। আর যদি রোগ আরোগ্য হওয়ার পর পূর্ণ দশ দিন ভাল থাকিয়া থাকে, তবে পূর্ণ দশটি রোযার জন্যই দায়ী হইবে এবং কিয়ামতের দিন ধর-পাকড় হইবে। কাজেই যদি কাহারও এইরূপ অবস্থা হয় তবে তাহার মৃত্যুর আলামত দেখিলেই তাহার মাল থাকিলে বাকী রোযার ফিদ্‌য়া আদায় করার জন্য অছিয়ত করিয়া যাওয়া উচিত (মাল থাকা সত্ত্বেও যদি অছিয়ত না করে, তবে শক্ত গোনাহ্‌গার হইবে।) ফিদ্‌য়ার বয়ান সামনে আসিতেছে।

৯। মাসআলা ঃ এইরূপ যদি কেহ শরয়ী সফরের মধ্যে রোযা না রাখে এবং বাড়ীতে ফিরিয়া কয়েক দিন পর মারা যায়, তবে যে কয়দিন বাড়ীতে আসিয়া ভাল রহিয়াছে, সেই কয় দিনের জন্য ধর-পাকড় হইবে, সেই কয়টি রোযার ফিদ্‌য়ার জন্য অছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। যে কয়দিন বাড়ীতে রহিয়াছে, রোযা যদি তাহা অপেক্ষা বেশী ছুটিয়া থাকে, তবে বেশী রোযার ফিদ্‌য়া তাহার উপর ওয়াজিব নহে এবং সেজন্য মুয়াখাযা (জবাবদেহী করিতে)-ও হইবে না।

১০। মাসআলা ঃ শরয়ী সফরে বাহির হওয়ার পর যদি বিদেশে কোন স্থানে ১৫ দিন বা তাহার বেশী অবস্থান করিবার নিয়্যত করে, তবে সেখানে থাকাকালে রোযা ছাড়া দুরুস্ত নহে। কেননা, কমপক্ষে ১৫ দিন কোন স্থানে অবস্থান করার নিয়্যত করিলে শরা' অনুসারে সে মুক্বীম হইয়া যায়, মুসাফির থাকে না। অবশ্য যদি ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যত করে, তবে রোযা না রাখা জায়েয আছে।

১১। মাসআলা ঃ গর্ভবতী মেয়েলোকের অথবা সদ্যপ্রসূত শিশুর স্তন্যদায়িনী মেয়েলোকের রোযা রাখিলে রোযা যদি নিজের বা শিশুর জীবনের আশঙ্কা হয়, তবে তাহাদের জন্য রোযা না রাখা দুরুস্ত আছে। তাহারা পরে অন্য সময় ক্বাযা রোযা রাখিয়া লইবে। অবশ্য যদি স্বামী মালদার হয় এবং অন্য কোন ধাত্রী রাখিয়া শিশুকে দুধ পান করাইতে পারে, তবে মায়ের জন্য রোযা ছাড়া জায়েয নহে। কিন্তু যদি শিশু এমন হয় যে, সে তাহার মায়ের দুধ ছাড়া অন্যের দুধ মুখেই লয় না, তবে (শিশুর দুধের জন্য) মায়ের রোযা না রাখা দুরুস্ত আছে।

১২। মাসআলাঃ কোন মেয়েলোক ধাত্রীর চাকুরী লইয়াছে। তাহাকে কোন বড় লোকের ছেলেকে দুধ পান করাইতে হয়, অন্যথায় শিশু বাঁচে না। এই অবস্থায় যদি রমযান মাস আসিয়া পড়ে, তবে তাহার জন্য তখন রোযা না রাখিয়া পরে ক্বাযা রাখা দুরুস্ত আছে।

১৩। মাসআলাঃ মেয়েলোকের যদি রোযার মধ্যে হায়েয বা নেফাস উপস্থিত হয়, তবে তদবস্থায় রোযা রাখা দুরুস্ত নহে, পরে রাখিবে।

১৪। মাসআলাঃ রাত্রে যদি মেয়েলোকের হায়েয বন্ধ হয়, তবে সকালে রোযা ছাড়িবে না, রোযার পর যদি রাত্রে গোসল নাও করে, তবুও রোযা ছাড়িতে পাড়িবে না। আর যদি ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হয়, তবে রোযার নিয়্যত করা জায়েয হইবে না। অবশ্য দিন ভরিয়া কিছু পানাহার করা দুরুস্ত নাই। সারাদিন রোযাদারের মত থাকিবে।

১৫। মাসআলাঃ যদি কেহ রমযান শরীফে দিনের বেলায় নূতন মুসলমান হয় বা বালেগ হয়, তবে তাহাদের জন্য অবশিষ্ট দিন কিছু খাওয়া-দাওয়া করা দুরুস্ত নহে, কিন্তু যদি কিছু খায়, তবে যে দিনের বেলায় বালেগ হইয়াছে বা নূতন মুসলমান হইয়াছে, তাহার ঐ দিনের ক্বাযা ওয়াজিব নহে।

১৬। মাসআলাঃ কেহ যদি সফরের কারণে রোযার নিয়্যত না করে, কিন্তু কিছু খাওয়া-দাওয়ার পূর্বে দুপুরের এক ঘণ্টা পরে বাড়ী পৌঁছিয়া যায়, অথবা কোন স্থানে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়্যত করে, তবে তাহার ঐ সময় রোযার নিয়্যত করিতে হইবে।

[**মাসআলাঃ** কেহ রোযার নিয়্যত করার পর যদি সফর শুরু করে, তবে তাহার জন্য ঐ রোযাটি ছাড়িয়া দেওয়া জায়েয নহে। এইরূপে যে ব্যক্তি সকাল বেলায় সফরে যাইবে তাহার জন্য রোযার নিয়্যত না করা জায়েয নহে। এইরূপে মুছাফের যদি রোযার নিয়্যত করিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য ঐ রোযাটি ছাড়া জায়েয নহে।]

ফিদ্‌ইয়া

[(নামায বা) রোযার পরিবর্তে যে ছদ্‌কা দেওয়া হয়, তাহাকে "ফিদ্‌য়া" বলে এবং রমযান শরীফের বরকত, রহ্‌মত ও হুকুম পালনে সক্ষম হওয়ার খুশীতে বান্দা ঈদের দিন নিজের তরফ হইতে এবং নিজের পরিবারবর্গের তরফ হইতে যাহাকিছু ছদ্‌কা করে, তাহাকে "ফেৎরা" বলে। ফেৎরার কথা পরে বর্ণিত হইবে। এখানে ফিদ্‌য়া সম্বন্ধে বর্ণিত হইতেছে।]

১। মাসআলাঃ যে ব্যক্তি এত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, তাহার আর রোযা রাখার শক্তি নাই, বা এত রোগা ও দুর্বল হইয়াছে যে, তাহার আর ভাল হইবার আশা নাই। এইরূপ লোকের জন্য শরীঅতে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যে, সে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে হয় একজন মিস্‌কীনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিবে, না হয় একটি রোযার পরিবর্তে একজন মিস্‌কীনকে ছদ্‌কায়ে ফেৎরা পরিমাণ (/১৸১০) গম বা তাহার মূল্যের চাউল বা পয়সা দান করিবে। ইহাকেই শরীঅতের ভাষায় ফিদ্‌য়া বলে।

২। মাসআলাঃ একটি ফিদ্‌য়া একজন মিস্‌কীনকে দেওয়াই উত্তম। কিন্তু যদি একটি ফিদ্‌য়া কয়েকজন মিসকীনকে কিছু কিছু করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও দুরুস্ত আছে।

৩। মাসআলাঃ বৃদ্ধ যদি পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি পায়, অথবা চিররোগী নিরাশ ব্যক্তি পুনরায় আরোগ্যলাভ করে এবং রোযা রাখার শক্তি পায়, তবে যে সব রোযার তাহার

ফিদ্‌য়া দিয়াছে সে সব রোযার ক্বাযা তাহাদের করিতে হইবে এবং যাহা ফিদ্‌য়া দান করিয়াছে তাহার সওয়াব পৃথকভাবে পাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যাহার যিম্মায় ক্বাযা থাকে, তাহার মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করিয়া যাইতে হইবে যে, আমার এতগুলি রোযা ক্বাযা আছে, তোমরা ইহার ফিদ্‌য়া আদায় করিয়া দিও। এইরূপ অছিয়ত করিয়া গেলে তাহার স্থাবর-অস্থাবর ষোল আনা সম্পত্তি হইতে—(১) আগে তাহার কাফনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। (২) তারপর তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে (যদি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও ঋণ পরিশোধ করার দরকার পড়ে, তাহাও করিতে হইবে। ঋণ পরিশোধের পূর্বে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে ওয়ারিশগণের কোন অধিকার থাকে না। (৩) তারপর যাহাকিছু অবশিষ্ট থাকে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা অছিয়ত পূর্ণ করিতে ওয়ারিশগণ শরীঅতের আইন মতে বাধ্য। যদি অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা সম্পূর্ণ অছিয়ত পূর্ণ না হয়, তবে যে পরিমাণ আদায় হয়, সেই পরিমাণ আদায় করা ওয়াজিব এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা যদি ওয়ারিশগণ নিজ খুশীতে আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাদের পক্ষে ইহা অতি উত্তম হইবে এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষে নাজাতের উপায় হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** মৃত ব্যক্তি যদি অছিয়ত না করে এবং যাহারা ওলী-ওয়ারিশ থাকে তাহারা নিজের তরফ হইতে তাহার রোযা-নামাযের ফিদ্‌য়া দেয়, তবুও আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়াগুণে তাহা কবূল করিয়া নিবেন এবং মৃত ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। যদি অছিয়ত না করিয়া থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির মাল হইতে ফিদ্‌য়া দেওয়া জায়েয নাই। এইরূপে যদি ফিদ্‌য়া এক তৃতীয়াংশ হইতে বেশী হয়, তবে অছিয়ত করা সত্ত্বেও সকল ওয়ারিশের অনুমতি ছাড়া বেশী দেওয়া জায়েয নাই। অবশ্য যদি সকলে খুশী হইয়া অনুমতি দেয়, তবে উভয় অবস্থায় ফিদ্‌য়া দেওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু শরীঅতে না-বালেগ ওয়ারিশের অনুমতির কোন মূল্য নাই। বালেগ ওয়ারিশগণ নিজ নিজ অংশ পৃথক করিয়া যদি উহা হইতে দেয়, তবে দুরুস্ত আছে।

৬। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও নামায ক্বাযা হইয়া থাকে এবং অছিয়ত করিয়া মারা যায় যে, আমার নামাযের বদলে ফিদ্‌য়া দিয়া দিও, তাহারও এই হুকুম।

৭। **মাসআলা ঃ** প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের ফিদ্‌য়া একটি রোযার ফিয়ার পরিমাণ। এই হিসাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয এবং বেৎর এই ছয় নামাযের ফিদ্‌য়া ৮০ তোলা সেরের এক ছটাক কম পৌণে এগার সের (দশ সের বার ছটাক) গম দিবে। কিন্তু সতর্কতার জন্য পুরা বার সের দিবে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও যিম্মায় যাকাত থাকিয়া যায়, (অর্থাৎ, যাকাত ফরয হইয়াছিল, না দিতেই মৃত্যু হইয়া গিয়াছে) কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে যদি অছিয়ত করিয়া যায় যে, আমার যিম্মায় এত টাকা যাকাৎ ফরয হইয়া রহিয়াছে, তোমরা আদায় করিয়া দিও, তবে ঐ পরিমাণ যাকাৎ আদায় করা ওয়ারিশগণের উপর ওয়াজিব হইবে। যদি অছিয়ত না করিয়া থাকে এবং যদি ওয়ারিশগণ নিজ খুশীতে দেয়, তবে যাকাত আদায় হইবে না, (তবে দেওয়া ভাল।) আল্লামা শামী ছেরাজুল ওয়াহ্‌হাজ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, যদি ওয়ারিশগণ অছিয়ত ব্যতীত আদায় করে, তবে আদায় হইয়া যাইবে। (খোদা তা'আলার দরবারে আশা করা যায় যে, মৃতব্যক্তি তদ্দ্বারাও নাজাত পাইয়া যাইতে পারে।)

৯। **মাসআলা ঃ** যদি ওলী মৃত ব্যক্তির পক্ষে ক্বাযা রোযা রাখে বা ক্বাযা নামায পড়ে, তবে দুরুস্ত নহে। অর্থাৎ, তাহার যিম্মার ক্বাযা আদায় হইবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** অকারণে রমযানের রোযা না রাখা দুরুস্ত নাই। ইহা অতি বড় গোনাহ্। এরূপ মনে করিবে না যে, ইহার বদলে রোযা ক্বাযা করিয়া লইবে। কেননা, হাদীসে আছে—রমযানের এক রোযার বদলে যদি পূর্ণ বৎসর একাধারে রোযা রাখে, তবু এতটুকু সওয়াব পাইবে না, যতটুকু রমযানের একটি রোযার সওয়াব পাওয়া যায়।

১১। **মাসআলা ঃ** দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কেহ রোযা না রাখে, তবে অন্যান্য লোকের সম্মুখে পানাহার করিবে না। ইহাও প্রকাশ করিবে না যে, আমি রোযা রাখি নাই। কেননা, গোনাহ্ করিয়া উহা প্রকাশ করাও গোনাহ্। যদি প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়ায়, তবে দ্বিগুণ গোনাহ্ হইবে। একটি রোযা না রাখার এবং অপরটি গোনাহ্ প্রকাশ করার। বলিয়া থাকে—যখন খোদার কাছে গোপন নাই, তবে মানুষের কাছে গোপন করিয়া কি লাভ ? ইহা ভুল। বরং কোন কারণে রোযা রাখিতে না পারিলে লোকের সামনে খাওয়া উচিত নহে।

১২। **মাসআলা ঃ** ছেলেমেয়েরা যখন ৮/৯ বৎসর বয়সের হইয়া রোযা রাখার মত শক্তিসম্পন্ন হয়, তখনই তাহাদিগকে রোযা রাখার অভ্যাস করান উচিত। যদি নাও রাখিতে পারে, তবুও কিছু অভ্যাস করান উচিত। ছেলেমেয়ে যখন দশ বৎসরের হইয়া যায়, তখন শাস্তি দিয়া হইলেও তাহাদের দ্বারা রোযা রাখান, নামায পড়ান উচিত।

১৩। **মাসআলা ঃ** না-বালেগ ছেলেমেয়েরা যদি রোযা শুরু করিয়া শক্তিতে না কুলানের কারণে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়, তবে ভাঙ্গিতে দেওয়া ভাল নহে বটে; কিন্তু যদি ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে রোযা আর দোহ্‌রাইয়া রাখার দরকার নাই; কিন্তু যদি নামায শুরু করিয়া নিয়ত ছাড়িয়া দেয়, তবে নামায দোহ্‌রাইয়া পড়ান উচিত।

এ'তেকাফ (গাওহর ৩য় খণ্ডসহ)

২০শে রমযান সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্ব হইতে ২৯/৩০ তারিখ অর্থাৎ যে দিন ঈদের চাঁদ দেখা যাইবে সে তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরুষদের মসজিদে এবং মেয়েদের নিজ গৃহের যেখানে নামায পড়ার স্থান নির্ধারিত আছে তথায় পাবন্দীর সহিত অবস্থান করাকে এ'তেকাফ বলে। ইহার সওয়াব অনেক বেশী। এ'তেকাফ শুরু করিলে পেশাব পায়খানা কিংবা পানাহারের মজবুরী হইলে তথা হইতে অন্যত্র যাওয়া দুরুস্ত আছে। আর যদি খানা পানি পৌঁছাইবার লোক থাকে, তবে ইহার জন্য বাহিরে যাইবে না, সেখানেই থাকিবে। বেকার বসিয়া থাকা ভাল নহে। কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করিবে, নফল নামায, তসবীহ্ সাধ্যমত পড়িতে থাকিবে এবং ঘুমাইবে। হায়েয বা নেফাস আসিলে এ'তেকাফ ছাড়িয়া দিবে। এই অবস্থায় এ'তেকাফ দুরুস্ত নাই। এ'তেকাফে স্বামী-স্ত্রী মিলন (সহবাস) আলিঙ্গনও দুরুস্ত নাই।

মাসআলা ঃ এ'তেকাফের জন্য তিনটি বিষয় যরূরী।

(১) যেই মসজিদে নামাযের জমা'আত হয়, (পুরুষের) উহাতে অবস্থান করা। এ'তেকাফের নিয়তে অবস্থান করা। এরাদা ব্যতীত অবস্থান করাকে এ'তেকাফ বলে না। যেহেতু নিয়ত ছহীহ্ হওয়ার জন্য নিয়তকারীর মুসলমান এবং আক্কেল হওয়া শর্ত কাজেই এই উভয়টি নিয়তের শামিল। হায়েয-নেফাস ও গোসলের প্রয়োজন হইতে পাক হওয়া।

২। মাসআলাঃ এ'তেকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হইল (কা'বা শরীফের) মসজিদে-হারাম। তারপর মসজিদে নববী, তারপর মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দস। তারপর যে জামে মসজিদে জমা'আতের এন্তেযাম আছে। অন্যথায় মহল্লার মসজিদ। তারপর যে মসজিদে বড় জমা'আত হয়।

৩। মাসআলাঃ এ'তেকাফ তিন প্রকার। (১) ওয়াজিব, (২) সুন্নতে মুআক্কাদা, (৩) মোস্তাহাব। মান্নতের এ'তেকাফ ওয়াজিব, বিনাশর্তে—হউক যেমন কেহ কোন শর্ত ব্যতীত এ'তেকাফের মান্নত করিল, কিংবা শর্তের সহিত হউক; যেমন, কেহ শর্ত করিল যে, যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে আমি এ'তেকাফ করিব। রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করা সুন্নতে মুআক্কাদা। নবী (দঃ) নিয়মিতভাবে প্রত্যেক রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিয়াছেন বলিয়া ছহীহ্ হাদীসে উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সুন্নতে মুআক্কাদা কেহ কেহ করিলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হইবে। রমযানের এই শেষ দশ দিন ব্যতীত, প্রথম দশ দিন হউক বা মাঝের দশ দিন হউক বা অন্য কোন মাসে হউক এ'তেকাফ করা মোস্তাহাব।

৪। মাসআলাঃ ওয়াজিব এ'তেকাফের জন্য রোযা শর্ত। যখনই এ'তেকাফ করিবে, রোযাও রাখিতে হইবে। বরং যদি ইহাও নিয়ত করে যে, রোযা রাখিব না, তবুও রোযা রাখিতে হইবে। এ জন্য যদি কেহ রাত্রের এ'তেকাফের নিয়ত করে, তবে উহা বেহুদা মনে করিতে হইবে। কেননা, রাত্রে রোযা হয় না, অবশ্য যদি রাত্র দিন উভয়ের নিয়ত করে কিংবা কয়েক দিনের নিয়ত করে, তবে তৎসঙ্গে রাত শামিল হইবে এবং রাত্রেও এ'তেকাফ করা যরূরী হইবে। আর যদি শুধু এক দিনের এ'তেকাফের মান্নত করে, তবে তৎসঙ্গে রাত শামিল হইবে না। খাছ করিয়া এ'তেকাফের জন্য রোযা রাখা যরূরী নহে। যে কোন উদ্দেশ্যে রোযা রাখুক এ'তেকাফের জন্য যথেষ্ট। যেমন কোন ব্যক্তি রমযান শরীফের এ'তেকাফের মান্নত করিল, রমযানের রোযা এ'তেকাফের জন্যও যথেষ্ট। অবশ্য এই রোযা ওয়াজিব রোযা হওয়া যরূরী। নফল রোযা উহার জন্য যথেষ্ট নাহে। যেমন নফল রোযা রাখার পর এ'তেকাফের মান্নত করিলে ছহীহ্ হইবে না। যদি কেহ পুরা রমযান মাসের এ'তেকাফের মান্নত করে এবং ঘটনাক্রমে রমযানের এ'তেকাফ করিতে না পারে, তবে অন্য যে কোন মাসে এ'তেকাফ করিলে মান্নত পুরা হইবে। কিন্তু একাধারে রোযাসহ এ'তেকাফ করা যরূরী হইবে।

৫। মাসআলাঃ সুন্নত এ'তেকাফে তো রোযা হইয়াই থাকে। কাজেই উহার জন্য রোযা শর্ত করার প্রয়োজন নাই।

৬। মাসআলাঃ কাহারও মতে মোস্তাহাব এ'তেকাফেও রোযা শর্ত। নির্ভরযোগ্য মতে শর্ত নহে।

৭। মাসআলাঃ ওয়াজিব এ'তেকাফ কমপক্ষে একদিন হইতে হইবে। আর বেশী যত দিনের নিয়ত করিবে (তাহাই হইবে)। আর সুন্নত এ'তেকাফ দশ দিন। কেননা, সুন্নত এ'তেকাফ রমযান শরীফের শেষ দশ দিন। মোস্তাহাব এ'তেকাফের জন্য কোন পরিমাণ নির্ধারিত নাই, এক মিনিট বা উহা হইতেও কম হইতে পারে।

৮। মাসআলাঃ এ'তেকাফ অবস্থায় দুই প্রকার কাজ হারাম। অর্থাৎ উহা করিলে ওয়াজিব ও সুন্নত এ'তেকাফ ফাসেদ হইবে এবং কাযা করিতে হইবে। মোস্তাহাব এ'তেকাফ হইলে উহা শেষ হইয়া যায়। ইহার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নাই। কাজেই উহার কাযাও নাই।

প্রথম প্রকারঃ (হারাম কাজ) এ'তেকাফের স্থান হইতে তব্‌য়ী (স্বভাবিক) বা শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে যাওয়া। স্বাভাবিক প্রয়োজন যেমন, পেশাব পায়খানা, জানাবাতের গোসল, খানা আনিবার কোন লোক না থাকিলে খানা খাইতে যাওয়া। শরয়ী প্রয়োজন যেমন, জুমু'আর নামায।

৯। **মাসআলাঃ** যে যরূরতের জন্য এ'তেকাফের মসজিদ হইতে বাহিরে যাইবে ঐ কাজ শেষ হইলে আর তথায় অবস্থান করিবে না। এমন স্থানে যরূরত পুরা করিবে যাহা যথাসম্ভব মসজিদের নিকটবর্তী হয়। যেমন, পায়খানার জন্য গেলে যদি নিজ বাড়ী দূর হয়, তবে নিকটবর্তী কোন বন্ধুর বাড়ীতে যাইবে। অবশ্য যদি নিজ বাড়ী ব্যতীত অন্যত্র গেলে যরূরত পুরা না হয়, তবে দূরে হইলেও নিজ বাড়ীতে যাওয়া জায়েয আছে। যদি জুমু'আর নামাযের জন্য অন্য কোন মসজিদে যায় এবং নামাযের পর সেইখানে থাকিয়া যায় এবং সেখানেই এ'তেকাফ পুরা করে, তবুও জায়েয আছে। অবশ্য মকরূহ্ (তান্‌যিহী)।

১০। **মাসআলাঃ** নিজ এ'তেকাফের মসজিদ হইতে ভুলেও এক মিনিট বা তদপেক্ষা কম সময়ের জন্য (অযথা) বাহিরে থাকিতে পারিবে না।

১১। **মাসআলাঃ** সাধারণতঃ যে সব ওযরের সম্মুখীন হইতে হয় না তজ্জন্য এ'তেকাফের স্থান ছাড়িয়া দেওয়া এ'তেকাফের পরিপন্থী। যেমন, কোন (কঠিন) রোগী দেখা, বা কোন ডুবন্ত লোককে বাঁচাইবার চেষ্টা করা, কিংবা আগুন নিবাইতে যাওয়া, কিংবা মসজিদ ভাঙ্গিয়া পড়ার ভয়ে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া। যদিও এসব অবস্থায় এ'তেকাফের স্থান হইতে বাহির হইলে গোনাহ্ হইবে না; বরং জান বাঁচানের জন্য যরূরী, কিন্তু এ'তেকাফ থাকিবে না। যদি কোন শরয়ী বা তব্‌য়ী যরূরতে বাহির হয় এবং ঐ সময় যরূরত পুরা হইবার আগে বা পরে কোন রোগী দেখে, বা জানাযা নামাযে শরীক হয়, তবে কোন দোষ নাই।

১২। **মাসআলাঃ** জুমু'আর নামাযের জন্য যদি জামে মসজিদে যাইতে হয়, তবে এমন সময় যাইবে, যেন মসজিদে গিয়া তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও সুন্নত পড়িতে পারে। সময়ের অনুমান নিজেই করিয়া লইবে। এবং ফরযের পর সুন্নত পড়ার জন্য দেরী করা জায়েয আছে। অনুমানের ভুলে সামান্য কিছু আগে গেলে কোন দোষ নাই।

১৩। **মাসআলাঃ** মু'তাকেফকে বলপূর্বক কেহ বাহিরে লইয়া গেলে এ'তেকাফ থাকিবে না। যেমন, কোন অপরাধে কাহারও নামে ওয়ারেন্ট জারি হইল এবং সিপাহী তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল, কিংবা কোন মহাজন দেনার দায়ে তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল।

১৪। **মাসআলাঃ** এইরূপে যদি কোন শরয়ী বা তব্‌য়ী যরূরতে বাহিরে যায় এবং পথে কোন মহাজন আটকায়, বা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, ফলে এ'তেকাফের স্থানে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়, তবুও এ'তেকাফ থাকিবে না।

দ্বিতীয় প্রকারঃ (হারাম কাজ) ঐ সব কাজ যাহা এ'তেকাফে না-জায়েয। যেমন সহবাস ইত্যাদি করা, ইচ্ছাকৃত হউক বা ভুলে হউক। এ'তেকাফের কথা ভুলিয়া মসজিদে করুক, বা বাহিরে করুক, সর্বাবস্থায় তাহাতে এ'তেকাফ বাতিল হইবে। সহবাসের আনুষঙ্গিক সব কাজ যেমন চুম্বন করা, আলিঙ্গন করা, এ'তেকাফ অবস্থায় না-জায়েয। কিন্তু ইহাতে বীর্যপাত না হইলে এ'তেকাফ বাতিল হয় না। বীর্যপাত হইলে এ'তেকাফ ফাসেদ হইবে। অবশ্য যদি শুধু কল্পনা বা চিন্তার কারণে বীর্যপাত হয় তবে এ'তেকাফ ফাসেদ হইবে না।

১৫। মাসআলা ঃ এ'তেকাফ অবস্থায় বিনা যরূরতে দুনিয়াদারীর কাজে লিপ্ত হওয়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। যেমন, বিনা যরূরতে কেনাবেচা, বা ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কাজ করা। অবশ্য যে কাজ নেহায়েত যরূরী (যেমন, ঘরে খোরাকী নাই, সে ব্যতীত বিশ্বাসী কোন লোকও নাই, এমতাবস্থায় কেনাবেচা জায়েয আছে, কিন্তু মালপত্র মসজিদে আনা কোন অবস্থায়ই জায়েয নাই—যদি উহা মসজিদে আনিলে মসজিদ খারাব হওয়ার কিংবা জায়গা আবদ্ধ হওয়ার আশংকা হয়। অন্যথায় কেহ কেহ জায়েয বলিয়াছেন।

১৬। মাসআলা ঃ এ'তেকাফ অবস্থায় (সওয়াব মনে করিয়া) একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য খারাব কথা, মিথ্যা কথা বলিবে না বা গীবত করিবে না; বরং কোরআন মজীদ তেলাওয়াত, দ্বীনি এল্‌ম শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া, কিংবা অন্য কোন এবাদতে কাটাইবে। সার কথা, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কোন এবাদত নহে।

এ'তেকাফ সম্বন্ধে একটি মাসআলা—অনুবাদক

হযরত মাওলানা যাফর আহ্‌মদ ওসমানী থানভী ছাহেবের নিকট হইতে নিম্ন মাসআলাটি সমাধান করিয়াছি—

হযরত মাওলানা ছাহেবের নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! আমরা বাংলাদেশবাসী দৈনিক গোসল করিতে অভ্যস্ত। যদি আমরা গোসল না করি, তবে আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না; অথচ ফেকাহ্‌র কিতাবসমূহে কোথাও এইরূপ গোসলের জন্য এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

হুযূর বলিলেন, 'পায়খানার জন্য বাহির হওয়া জায়েয আছে ত? পায়খানা হইতে ফিরিবার সময় অতিরিক্ত সময় না লাগাইয়া যদি গোসল করিয়া ফেলে; যেমন—পথের মধ্যে যদি বেশী পানি পায়, তবে ডুব দিয়া লইতে পারে বা পূর্বে কাহাকেও বলিয়া পথের মধ্যে পানির বন্দোবস্ত রাখিলে এবং জলদি ঐ পানি গায়ে মাথায় ঢালিয়া গোসল করিয়া চলিয়া আসিলে এ'তেকাফের কোন ক্ষতি হইবে না।'

এই উত্তরের পর আমাদের পক্ষ হইতে আলেমগণ অনেক প্রতিবাদ করেন। তিনি তাহার উত্তরে বলিলেন, 'পায়খানার পর বাহির হইতে ওযূ করিয়া আসা জায়েয কি না? ওযূ ছোট তাহারাত, গোসল বড় তাহারাত; কাজেই না জায়েয হওয়ার কি কারণ হইতে পারে?

পুনঃ প্রশ্ন করা হয়, গোসল যে বড় তাহারাত তাহার প্রমাণ কি? এ ক্ষেত্রে গোসল ত ফরয নহে। তদুত্তরে তিনি বলেন, 'হেদায়া কিতাবে আছে যে, যখন ওযূ না থাকে, তখন সমস্ত শরীরই নাপাক হয়; কাজেই আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়ার জন্য সমস্ত শরীর ধৌতকে শুধু অঙ্গগুলি ধৌত করার দ্বারা পরিবর্তন খোদার রহমতে সমস্ত শরীর ধৌতকে শুধু ওযূর অঙ্গগুলি ধৌত করার দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, গোসল বড় তাহারাত।' হযরত মাওলানা বলিলেন, 'এই তাহ্‌কীক এবং এই তকরীর আমার নিজের তরফ হইতে নহে। বরং জনাব মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী মোহাজেরে মদীনা ছাহেবের পক্ষ হইতে। তিনি অতি বড় মোহাদ্দেস ও বড় বুযুর্গ ত ছিলেনই, অতি বড় ফকীহ্‌ও ছিলেন।'

এ'তেকাফের ফযীলত

১। **হাদীসঃ** যে ব্যক্তি রমযান শরীফের (শেষ) দশ দিন এ'তেকাফ করিবে, উহা তাহার জন্য দুইটি হজ্জ এবং দুইটি ওমরার সমতুল্য হইবে অর্থাৎ দুই হজ্জ এবং দুই ওমরার সমান সওয়াব তাহাকে দান করা হইবে। —বায়হাকী

২। **হাদীসঃ** যে ব্যক্তি খালেছ নিয়তে এবং খাঁটি ঈমানের সহিত সওয়াবের উদ্দেশ্যে এ'তেকাফ করিবে, তাহার পূর্ববর্তী (সমস্ত ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দেওয়া হইবে। —দায়লামী।

৩। হাদীস শরীফে আছেঃ ইসলামী রাজত্বের সীমা রক্ষা করার পূর্ণ ফযীলত নিয়মিতরূপে ৪০ দিন পর্যন্ত সীমা রক্ষা করিলে হাছেল হয়। অতএব, যে ব্যক্তি ৪০ দিন পর্যন্ত ইসলামী রাজত্বের সীমা পূর্ণরূপে এমনভাবে রক্ষা করিবে যে, ঐ মুদ্দতের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় এবং শরী-অতের গণ্ডীর বাহিরের যাবতীয় কাজ পরিত্যাগ করিবে , সে তাহার সমস্ত গোনাহ্ হইতে এমন পবিত্র হইয়া যাইবে, যেমন ছিল তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন। অর্থাৎ সমস্ত গোনাহ্ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া যাইবে। (এই হাদীসে দুনিয়ার যাবতীয় পাপ এবং যাবতীয় সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া এমন কি, জায়েয ও হালাল সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া) ৪০ দিন যাবৎ এ'তেকাফে থাকিয়া যেকের, মোরাক্বাবা, নামায, রোযা ইত্যাদি যাহেরী ও বাতেনী ইবাদতের মধ্যে মশ্গুল থাকাকে এবং সম্পূর্ণ আল্লাহ্র হইয়া যাওয়াকে ইসলামী রাজত্বের সীমা রক্ষা করা বলা হইয়াছে। (কারণ, এইরূপ কঠোর মুজাহাদা যে করিবে, সে নিশ্চয়ই ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহ্কাম কষ্ট স্বীকার করিয়াও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিবে এবং ইসলামী রাজত্বের সীমা রক্ষাকারী যেরূপ খলিফাতুল মুসলিমীন আমীরুল মু'মিনীনের আদেশে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া, আরাম ও ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া কাফেরদের আক্রমণ হইতে সর্বসাধারণ মুসলমানের জীবন, দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করিবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দেয়, তদ্রূপ এই ব্যক্তিও নফ্স ও শয়তানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতি মুহূর্তে সজাগ ও সতর্ক থাকে। এই জন্যই এই এ'তেকাফ করাকে ইসলামী রাজত্বের সীমা রক্ষাকারীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আর যে গোনাহ্ মা'ফের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ ছগীরা গোনাহ্। কেননা, কবীরা গোনাহ্ তওবা ব্যতীত এবং "হক্কুল এবাদ" হক্কদারের নিকট মা'ফ চাহিয়া লওয়া বা পরিশোধ করা ব্যতীত মা'ফ হয় না। —তাব্রানী

এই হাদীস অনুকরণে ছুফিয়ায়ে কেরাম চিল্লাহ্কাশীর নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। (এতদ্ব্যতীত অন্যান্য হাদীসে আরও আছেঃ যে ব্যক্তি ৪০ দিন যাবৎ খালেছ নিয়তে তরকে দুনিয়া করিয়া খাঁটিভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে মশ্গুল থাকিবে, তাহার ক্বল্বের ভিতর আল্লাহ্ পাক হেকমতের ফোয়ারা জারি করিয়া দিবেন।

ফেৎরা

১। **মাসআলাঃ** ঈদের দিন ছোব্হে ছাদেকের সময় যে ব্যক্তি হাওয়ায়েজে আছলিয়া অর্থাৎ, জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ (যথা—পরিধানের বস্ত্র, শয়নের গৃহ এবং আহারের

খাদ্য-দ্রব্য) ব্যতীত ৭৷৷০ তোলা সোনা, অথবা ৫২৷৷০ (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা, অথবা এই মূল্যের অন্য কোন মালের মালিক থাকিবে, তাহার উপর ফেৎরা দেওয়া ওয়াজিব হইবে। সে মাল তেজারত বা ব্যবসায়ের জন্য হউক বা না হউক, বা সে মালের বৎসর অতিবাহিত হউক বা না হউক। ফেৎরাকে "ছদ্‌কায়ে ফেৎর" বলে। জীবিকা নির্বাহের আবশ্যকীয় উপকরণসমূহকে "হাওয়ায়েজে আছলিয়া" বলে। (২০০ দেরহাম পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারীকে মালেকে নেছাব বলে। আমাদের দেশী হিসাবে ২০০ দেরহামে ৫২৷৷০ তোলা রূপা হয়।)

২। **মাসআলা ঃ** কাহারও বসবাসের অনেক বড় ঘর আছে, বিক্রয় করিলে হাজার পাঁচ শ; টাকা দাম হইবে। পরিধানের দামী দামী কাপড় আছে, কিন্তু ইহা জরীদার নহে, ২/৪ জন খেদমতগারও আছে, হাজার পাঁচ শত টাকার প্রয়োজনীয় মাল আসবাব আছে; কিন্তু অলংকার নহে। এই সমস্তই কাজে ব্যবহৃত হয়, কিংবা কিছু মালপত্র প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী আছে এবং জরী, অলংকারও আছে, কিন্তু যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ নহে, এমন লোকের উপর ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব নহে।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ মাত্র দুইখানা বাড়ীর মালিক হয়, এক বাড়ীতে নিজে বিবি বাচ্চা নিয়া থাকে, অন্য বাড়ীখানা খালি পড়িয়া থাকে, অথবা ভাড়া দেওয়া হয়, তবে দ্বিতীয় বাড়ীখানাকে হওয়ায়েজে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য করা যাইবে না, অতিরিক্ত বলা হইবে। কাজেই দেখিতে হইবে, যদি বাড়ীখানার মূল্য ৫২৷৷০ তোলা রূপার মূল্যের সমান বা তদূর্ধ্ব হয়, তবে তাহার উপর ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব হইবে, এমন লোককে যাকাত দেওয়া জায়েয নাই। কিন্তু যদি এই বাড়ীখানার ভাড়ার উপরই তাহার জীবিকা নির্বাহ নির্ভর করে, তবে বাড়ীখানাকে হওয়ায়েজে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার উপর ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব হইবে না। এমন ব্যক্তি ছদকায়ে ফেৎর লইতে পারে এবং তাহাকে দেওয়াও জায়েয আছে। সারকথা—যে ব্যক্তি যাকাত, ছদকার পয়সা লইতে পারে তাহার উপর ছদ্‌কা ফেৎরা ওয়াজিব নহে; যাহার ছদ্‌কা যাকাত লওয়া দুরুস্ত নাই তাহার উপর ওয়াজিব। (এইরূপ যদি কেহ ৭ বিঘা জমির মালিক হয় এবং ৬ বিঘা জমির ফসলে তাহার জীবিকা নির্বাহ হইয়া যায়, আর এক বিঘা জমি অতিরিক্ত, ইহার মূল্য ৫২৷৷০ তোলা রূপার মূল্যের সমান বা তদূর্ধ্ব হয়, তাহার উপর ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব হইবে।)

(**মাসআলা ঃ** মেয়েলোকের জেওর হাওয়ায়েজে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য নহে। কাজেই যে মেয়েলোকের নিকট ৫২৷৷০ তোলা রূপা বা সমমূল্যের জেওর থাকিবে তাহার উপর ফেৎরা ওয়াজিব হইবে। ('সূক্ষ্ম হিসাবে যাহাদের উপর ফেৎরা ওয়াজিব [বাধ্যতামূলক] হয় না অথচ দেওয়ার সঙ্গতি আছে, তাহারা যদি নিজ খুশীতে ছদ্‌কা দান করে, তবে তাহা মুস্তাহাব হইবে এবং তাহারা অনেক বেশী সওয়াব পাইবে। কারণ, হাদীস শরীফে আছে, গরীব হওয়া-সত্ত্বে কষ্ট করিয়া যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ছদ্‌কা দেয়, তাহার দানকে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক বেশী পছন্দ করেন।)

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ করযদার (ঋণগ্রস্ত) থাকে, তবে ঋণ বাদে যদি মালেকে নেছাব হয়, তবে ফেৎরা ওয়াজিব হইবে, নতুবা নয়।

৫। **মাসআলা ঃ** ঈদের দিন যে সময় ছোব্‌হে ছাদেক হয়, সেই সময় ছদ্‌কায়ে ফেৎর ওয়াজিব হয়। কাজেই যদি কেহ ছোব্‌হে ছাদেকের আগে মারা যায়, তবে তাহার উপর ছদ্‌কা ফেৎর ওয়াজিব হইবে না, তাহার সম্পত্তি হইতে দিতে হইবে না এবং মালেকে নেছাবের যে

সন্তান ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বে জন্মিবে তাহার ফেৎরা দিতে হইবে। যে ছোব্‌হে ছাদেকের পরে জন্মিবে তাহার দিতে হইবে না। (এইরূপে যদি কেহ ছোব্‌হে ছাদেকের পর নূতন মুসলমান হয়, তাহার উপরও ফেৎরা ওয়াজিব হইবে না।)

৬। **মাসআলা ঃ** ঈদের নামাযের পূর্বেই ছদ্‌কায়ে ফেৎর দিয়া পরিষ্কার হওয়া মুস্তাহাব। যদি একান্ত আগে না দিতে পারে, তবে পরেই দিবে। পরে দিলেও আদায় হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** কেহ যদি ঈদের দিনের পূর্বেই রমযানের মধ্যে ফেৎরা দিয়া দেয় তাহাও দুরুস্ত আছে, ঈদের দিন পুনরায় দিতে হইবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ ঈদের দিন ফেৎরা না দেয়, তবে তাহার ফেৎরা মা'ফ হইয়া যাইবে না, অন্য সময় দিতে হইবে।

(**মাসআলা ঃ** মালেকে নেছাব পুরুষের একটি সাবালেগ সন্তান যদি পাগল হয়, তবে তাহার পক্ষ হইতে ফেৎরা দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব।)

(**মাসআলা ঃ** এতীম সন্তান যদি মালেকে নেছাব হয়, তবে তাদেরও ফেৎরা দিতে হইবে।)

৯। **মাসআলা ঃ** মেয়েলোকের শুধু নিজের ফেৎরা দেওয়া ওয়াজিব। স্বামী, সন্তান, মা, বাপ বা অন্য কাহারও পক্ষ হইতে ওয়াজিব নহে। (কিন্তু পুরুষের নিজেরও দিতে হইবে এবং নিজের ছেলেমেয়েদের পক্ষ হইতেও দিতে হইবে। সন্তান না-বালেগ হইলে তাহাদের ফেৎরা দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব। আর বালেগ হইলে এবং এক পরিবারভুক্ত থাকিলে তাহাদের ফেৎরা, স্ত্রীর ফেৎরা এবং মা বাপ থাকিলে তাঁহাদের ফেৎরা দেওয়া মুস্তাহাব।)

১০। **মাসআলা ঃ** না-বালেগ সন্তানের নিজের মাল থাকিলে যে প্রকারেই মালিক হউক না কেন, ওয়াজিব সূত্রে বা অন্য প্রকারে হউক, তাহাদের মাল হইতে দিতে হইবে। (এবং মাল না থাকিলে পিতাকে নিজের মাল হইতে দিতে হইবে।) যদি ঐ শিশু ঈদের দিন ছোব্‌হে ছাদেক হওয়ার পরে পয়দা হয়, তবে তাহার পক্ষ হইতে ফেৎরা দেওয়া ওয়াজিব নহে।

১১। **মাসআলা ঃ** (ফেৎরার সঙ্গে রোযার কোন সংশ্রব নাই। এই দুইটি পৃথক পৃথক ইবাদত। অবশ্য এই ইবাদতের তাকীদ হয়। অতএব,) যাহারা কোন কারণে রোযা না রাখে, ফেৎরা তাহাদের উপরও ওয়াজিব। আর যাহারা রাখে তাহাদের উপরও ওয়াজিব। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

১২। **মাসআলা ঃ** ফেৎরা যদি গম বা গমের আটা বা গমের ছাতু দ্বারা আদায় করিতে চায়, তবে আধা ছা' অর্থাৎ ৮০ তোলার সেরে (/১৸১০) এক সের সাড়ে বার ছটাক দিতে হইবে। কিন্তু পূর্ণ দুই সের দিয়া দেওয়াই উত্তম। কেননা, বেশী দিলে কোন ক্ষতি নাই; বরং বেশী সওয়াব পাওয়া যাইবে। পক্ষান্তরে কম হইলে ফেৎরা আদায় হইবে না। আর যব বা যবের ছাতু দ্বারা ফেৎরা আদায় করিতে চাহিলে পূর্ণ এক ছা' অর্থাৎ, তিন সের নয় ছটাক দিতে হইবে পূর্ণ চারি সের দেওয়া উত্তম।

১৩। **মাসআলা ঃ** যদি গম এবং যব ব্যতীত অন্য কোন শস্য যেমন—ধান-চাউল, বুট, কলাই ইত্যাদি দ্বারা ফেৎরা আদায় করিতে চায়, তবে বাজার দরে উপরোক্ত পরিমাণ গম বা যবের যে মূল্য হয়, সেই মূল্যের চাউল, ধান, বুট ইত্যাদি দিলে আদায় হইয়া যাইবে; (মূল্য হিসাব না করিয়া আন্দাজি দুই সের চাউল বা ধান দিলে যদি চাউলের মূল্য কম হয়, তবে ওয়াজিব আদায়

হইবে না। ইহাই আমাদের হানাফী মযহাবের ফতওয়া। শাফেয়ী মযহাবে মূল্য না দিয়া চাউল দিলেও ওয়াজিব আদায় হইবে বটে, কিন্তু পূর্ণ চারি সের চাউল দিতে হইবে।

১৪। মাসআলা ঃ যদি গম বা যব না দিয়া উপরোক্ত পরিমাণ গম বা যবের মূল্য নগদ পয়সা দিয়া দেয়, তবে তাহা সবচেয়ে উত্তম ;

১৫। মাসআলা ঃ একজনের ফেৎরা একজনকে দেওয়া বা একজনের ফেৎরা কয়েকজনকে ভাগ করিয়া দেওয়া উভয়ই জায়েয আছে।

১৬। মাসআলা ঃ যদি কয়েকজনের ফেৎরা একজনকে দেওয়া হয়, তাহাও দুরুস্ত আছে, (কিন্তু তদ্দ্বারা মিসকীন যেন মালেকে নেছাব না হইয়া যায়।)

১৭। মাসআলা ঃ যাহার জন্য যাকাত খাওয়া হালাল, তাহার জন্য ফেৎরা খাওয়াও হালাল।

মাসআলা ঃ প্রশ্ন ঃফেৎরা কাহাকে দিতে হইবে? **উত্তর ঃ** আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী এবং পার্শ্ববর্তী লোকদের মধ্যে যাহারা গরীব-দুঃখী আছে তাহাদিগকে দিতে হইবে। সাইয়্যেদকে, মালদারকে, মালদারের নাবালেগ সন্তানকে এবং নিজের মা, বাপ, দাদা, নানা, নানী বা নিজের ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনী ইত্যাদিকে ফেৎরা, যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য সাইয়্যেদ বা মা, বাপ, দাদা, দাদী, নানা, নানী বা ছেলেমেয়ে, নাতি, নাতনী যদি গরীব হয়, তবে তাহাদিগকে হাদিয়া-তোহ্‌ফা স্বরূপ পৃথকভাবে দান করিয়া সাহায্য করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ মসজিদের ইমাম, মোয়ায্‌যিন বা তারাবীহ্‌র ইমাম গরীব হইলে তাহাদিগকেও ফেৎরা দেওয়া দুরুস্ত আছে, কিন্তু নেছাব পরিমাণ দেওয়া যাইবে না এবং বেতন স্বরূপও দেওয়া যাইবে না। বেতন স্বরূপ দিলে ফেৎরা আদায় হইবে না।

রোযার ফযীলত

১। হাদীস ঃ রসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, রোযাদারের নিদ্রা এবাদতের সমতুল্য, তাহার চুপ থাকা তস্‌বীহ্‌ পড়ার সমতুল্য, সে সামান্য ইবাদতে অন্য সময় অপেক্ষা রমযানের অনেক সওয়াবের অধিকারী হয়, তাহার দো'আ কবূল হয় এবং গোনাহ্‌ মা'ফ হয়।' (রোযার বরকতে এই সব ফযীলত হাছেল হয়।) —বায়হাকী

২। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, 'দোযখের আগুন হইতে বাঁচিবার জন্য রোযা ঢাল এবং সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীর স্বরূপ' (অর্থাৎ, ঢাল ও সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীরের আশ্রয়ে যেমন শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তদ্রূপ মানুষ শরীঅতের নিয়ম মত রোযা রাখিলে দোযখের আগুন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।) —বায়হাকী

এরূপে মানুষের গোনাহ্‌র প্রাবল্য হ্রাস পায় এবং নেকীর উৎস বৃদ্ধি পায়। কাজেই বাকায়দা রোযা রাখিলে এবং সূক্ষ্মভাবে রোযার আদব রক্ষা করিলে গোনাহ্‌ হ্রাস পায় এবং দোযখ হইতে নাজাত পায়।

৩। হাদীস ঃ হাদীস শরীফে আছেঃ 'রোযা রোযাদারের জন্য ঢালস্বরূপ, যে পর্যন্ত উহাকে মিথ্যা এবং গীবতের দ্বারা নষ্ট করিয়া না ফেলে।' (অর্থাৎ, রোযা রাখিয়া মিথ্যা, গীবত, কটুবাক্য, ঝগড়া-কলহ, গালাগালি এবং অন্যান্য পাপ হইতে বিরত না থাকিলে আইনতঃ রোযা হইবে বটে, কিন্তু মস্ত বড় গোনাহ্‌ হইবে এবং রোযার বরকত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।) [দোযখ হইতে বাঁচিবার যোগ্য রোযা হইবে না।] —তাব্‌রানী

৪। হাদীস শরীফে আছেঃ 'রোযা দোযখের ঢালস্বরূপ।' অতএব, যে রোযা রাখিবে জাহেলদের ন্যায় অশ্লীল কোন কাজ করা বা কথা বলা তাহার উচিত নহে। যদি অন্য কেহ তাহার সহিত জাহেলদের ন্যায় অসভ্য ব্যবহার করে, তবে প্রতি উত্তরে তাহার অনুরূপ ব্যবহার করা সমীচীন নহে; বরং বলা উচিত, আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রোযা রাখিয়াছি; রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আরও বলিয়াছেনঃ 'আমি সেই মহান আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ্‌র নিকট রোযাদারের মুখের বদ্‌বু মেশ্‌কের খোশবু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। কিয়ামতের দিন রোযাদারকে মেশ্‌ক অপেক্ষা অধিক মূল্যবান খোশবু এই রোযার বদ্‌বুর পরিবর্তে দান করা হইবে। —নাসায়ী

৫। হাদীস শরীফে আছেঃ রোযাদার ব্যক্তিকে প্রত্যেক দিন ইফ্‌তারের সময় এমন একটি দো'আ চাহিয়া লওয়ার ইজাযত দেওয়া হয়, যাহা কবূল (মঞ্জুর) করিয়া লইবার বিশেষ ওয়াদা করা হইয়াছে।' —হাকেম

৬। হাদীস শরীফে আছেঃ একবার হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন লোককে বলিয়াছেনঃ তোমরা রোযা রাখ। জান না, রোযা দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিবার এবং বালা-মুছীবত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঢালস্বরূপ।' অর্থাৎ রোযার বরকতে আখেরাতে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এবং দুনিয়াতে বালা-মুছীবত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। —ইবনোন্নাজ্জার

৭। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কিয়ামতের দিন তিনজন লোকের খাওয়া-দাওয়ার হিসাব দিতে হইবে না। অবশ্য হালাল খাদ্য হওয়া চাই—(১ম) রোযার ইফ্‌তার করিতে যাহাকিছু খায়। (২য়) যে রোযার সেহ্‌রী খায়। (৩য়) যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইসলামী রাজ্যের সীমান্তে পাহারা দেয়। (এই তিন প্রকার লোকের খানার হিসাব যে মা'ফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা আল্লাহ্ তা'আলার অতি বড় অনুগ্রহ। (অনুগ্রহের দান পাইয়া দাতাকে ভুলিয়া যাওয়া ঠিক নহে; বরং দাতার আরও অধিক অনুগত, তাবে'দার ও ফরমাঁবরদার হওয়া উচিত।) এই হাদীসে উক্ত তিন প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র বড় অনুগ্রহ বলিয়া প্রমাণিত হইল যে, তাহাদের খাওয়ার হিসাব মা'ফ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এই অনুগ্রহের কারণে অতিমাত্রায় সুস্বাদু খাদ্য খাওয়ায় লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। অতিরিক্ত আয়েশ আরামে লিপ্ত হইলে আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়া যায় এবং গোনাহ্‌র শক্তি বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌র এই নেয়ামতের কদর করা উচিত। বেশী এবাদত করিয়া এই নেয়ামতের শোক্‌র করিবে।

৮। হাদীস শরীফে আছেঃ যে রোযাদারকে ইফ্‌তার করাইবে, সে ঐ রোযাদারের সওয়াবের সমান সওয়াব পাইবে, অথচ রোযাদারের সওয়াব কম হইবে না। ইফ্‌তার যতই সামান্য জিনিসের দ্বারা করান হউক না কেন, যেমন পানি দ্বারা, তবুও ঐ প্রকার পূর্ণ সওয়াব পাইবে (এবং ইফ্‌তারে যে খানা খাওয়ান হয় তাহাতেও ঐ প্রকার সওয়াব হইবে।) —আহ্‌মদ

৯। হাদীসঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'মানুষের যত প্রকার নেকী বা নেক কাজ আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সওয়াব দশগুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ কিন্তু রোযা। (অর্থাৎ, রোযা এই নিয়মের বহির্ভূত, রোযার সওয়াব এইভাবে সীমাবদ্ধ নহে, আরও অনেক বেশি। কারণ, রোযা খাছ আমার জন্য, রোযার সওয়াব ও পুরস্কার স্বয়ং আমি নিজ হাতে দিব।) ইহা দ্বারা রোযার সওয়াবের গুরুত্ব অনুমান করা উচিত, যাহার

কোন হিসাবই জানা নাই যে, ইহার সওয়াব কত? অন্যান্য আমলের পুরস্কার ফেরেশ্‌তাদের মারফত প্রদত্ত হইবে। রোযার পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ'লামীন নিজ হাতে দিবেন। ইহার দ্বারা ফযীলত হাছেল করিতে হইলে রোযার হক্‌ আদায় করিতে হইবে। (অর্থাৎ, মিথ্যা, গীবত, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, কটুবাক্য, গালাগালি, পরের অনিষ্ট, ঘুষ, সুদ ইত্যাদি পাপ কাজ হইতে রোযাকে পবিত্র রাখিতে হইবে, নতুবা এইসব ফযীলত হাছেল হইবে না। অনেকে রোযার দিনে ফজরের নামায বেলা উঠিলে পড়ে; অনেকে পড়েই না। ইহারা এরূপ বরকত এবং সওয়াব পাইবে না। এই হাদীস হইতে এই সন্দেহ যেন না হয় যে, নামায হইতেও রোযা উত্তম। কেননা, নামায সকল ইবাদত হইতে শ্রেষ্ঠ। সারকথা, রোযার সওয়াব অনেক বেশী। নিশ্চয় রোযাদারের জন্য দুইটি খুশী। একটি হইল ইফ্‌তারের সময়, দ্বিতীয়টি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলার সহিত সাক্ষাতের সময়। হাদীসে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। —খতীব

১০। হাদীস শরীফে আছেঃ 'রমযান শরীফের প্রথম রাত্রি যখন আসে তখনই আসমানের সমস্ত দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং রমযান শরীফের শেষ রাত্রি পর্যন্ত ঐ সকল দরজা খোলা থাকে (মু'মিন বান্দাগণের নেক আমল উঠাইবার জন্য এবং তাহাদের উপর রহ্‌মত নাযিল করিবার জন্যই ঐ সকল দরজা খোলা রাখা হয়) এবং রমযান শরীফের রাত্রিতে কোন মু'মিন বান্দা খাঁটিভাবে কিছু নামায পড়িলে, প্রত্যেক রাকা'আতের পরিবর্তে তাহাকে আড়াই হাজার (গুণ) সওয়াব দেওয়া হইবে এবং তাহার জন্য বেহেশ্‌তে লাল মণিমুক্তা দ্বারা এমন একটি অট্টালিকা নির্মাণ করা হইবে যাহার ৬০টি দরজা হইবে এবং প্রত্যেক দরজার সামনে লাল মুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত একটি স্বর্ণের কামরা থাকিবে। যে ব্যক্তি রমযান শরীফের প্রথম তারিখে খাঁটিভাবে রোযা রাখে, তাহার গত রমযানের তারিখ হইতে এই তারিখ পর্যন্ত যত (ছগীরা) গোনাহ্‌ হইয়াছে, সব মা'ফ করিয়া দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্‌র নিকট মাগ্‌ফেরাত চাহিবার জন্য প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করা হয়। তাহারা তাহার জন্য ফজরের নামাযের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো'আ করিতে থাকে। রমযান শরীফের দিনে বা রাত্রে মু'মিন বান্দা যে সকল নামায পড়িবে, তাহার প্রত্যেক রাকা'আতের বরকতে বেহেশ্‌তের মধ্যে তাহার জন্য প্রকাণ্ড একটি বৃক্ষ উৎপন্ন করা হইবে—যাহার ছায়ায় সোয়া পাঁচশত বৎসর ভ্রমণ করা যায়।' (দেখুন, রোযার কত বড় ফযীলত! আল্লাহ্‌র কি অপার মহিমা! কি অসীম দয়া মু'মিন বান্দাদের প্রতি! সামান্য কষ্টের পরিবর্তে কত অধিক পুরস্কার তিনি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন! হে মুসলমান ভাই-বোনগণ! কখনও রোযা ক্বাযা করিও না। সাহস থাকিলে নফল রোযাও রাখিও। আল্লাহ্‌র সহিত পুরাপুরিভাবে মহব্বত রাখ। যিনি এত দয়া করিয়াছেন যে, সামান্য পরিশ্রমে বিপুল সওয়াব দান করিয়াছেন, অন্ততঃ নিজ স্বার্থের জন্য আল্লাহ্‌কে প্রিয় বানাও, যিনি বেহেশ্‌তে বড় বড় নেয়ামত দান করিবেন। অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী কিছু বেশী এবং ভাল করিয়া করিবার জন্য, বিশেষতঃ গোনাহ্‌র কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া যাও, তবেই দেখিতে পাইবে, যে আল্লাহ্‌র দয়া কত বেশী! আমরা নিজেরাই পাপে ডুবিয়া খোদা হইতে দূরে সরিতে থাকি, তাই তাঁহার দয়ার কারিগরি দেখিতে পাই না।)

১১। হাদীস শরীফে আছেঃ রমযান শরীফের উদ্দেশ্য বৎসরের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বেহেশ্‌তকে সাজান হইতে থাকে এবং বেহেশ্‌তের হূরগণ (অতীব সুন্দরী রমণীরা) রোযাদারদের জন্য বৎসরের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অনুপম বেশভূষায় নিজেদেরে সাজাইতে থাকে। যখন

রমযান শরীফ আসে, তখন বেহেশ্ত বলিতে থাকেঃ হে, আল্লাহ্ পাক! আপনি আপনার নেক বান্দাদিগকে আমার ভিতরে প্রবেশাধিকার দান করুন অর্থাৎ এমন হুকুম লিখিয়া দিন, যাহাতে কিয়ামতের দিন তাহারা আমার ভিতর স্থান পাইতে পারে এবং বড় বড় চোখওয়ালা হূরগণ বলেঃ 'হে আল্লাহ্ পাক! এই পবিত্র মাসে আপনার নেক বান্দাগণ হইতে আমাদের জন্য স্বামী নির্ধারিত করিয়া দিন। যে ব্যক্তি এই পবিত্র মাসে কোন মুসলমানের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিবে না এবং নেশা পান করিবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে যে এই পবিত্র মাসে কোন মুসলমানের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিবে। (গীবত, শেকায়েত, মিথ্যা অপবাদ, গালি ইত্যাদি) অথবা নেশা পান করিবে, তাহার সারা বৎসরের ইবাদত-বন্দেগী মুছিয়া ফেলা হইবে। (অর্থাৎ, বেশী গোনাহ্ হইবে। কেননা, পবিত্র মাসে নেক কাজ করিলে যেমন বেশী সওয়াব পাওয়া যাইবে, তদ্রূপ গোনাহ্ করিলেও বেশী শাস্তি হইবে। ভাবিয়া দেখ, ইহাতে কত বড় ধমকি নিহিত আছে।) হযরত (দঃ) বলিলেনঃ 'অতএব, হে আমার উম্মৎগণ! তোমরা রমযান শরীফ সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিও। কারণ, উহা আল্লাহ্র খাছ পবিত্র মাস। (যদিও সব মাসই আল্লাহ্র কিন্তু পানাহার বর্জন আল্লাহ্র চিরাচরিত অভ্যাস। এই মাসে আল্লাহ্ পাক স্বীয় বান্দাগণকে আংশিকভাবে তাঁহার অনুকরণের অভ্যাস করাইতে এবং অনেক বেশী সম্মান দান করিতে চান। কাজেই এই মাসের অধিক মর্যাদা দেখাইবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এই মাসকে আল্লাহ্র মাস বলা হইয়াছে।) হে আমার উম্মৎগণ! এগার মাস আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে পানাহারের জন্য দিয়াছেন, এক মাস পানাহার বর্জন দ্বারা নিজের জন্য খাছ করিয়া লইয়াছেন। অতএব, তোমাদিগকে আমি অছিয়ত করিতেছি যে, তোমরা রমযান শরীফ সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিও। খবরদার! রমযান শরীফের মর্যাদা রক্ষায় কেহ ত্রুটি করিও না। এই মাস আল্লাহ্র খাছ পবিত্র মাস। [আল্লাহ্র ইবাদত সব সময়ই করিবে, গোনাহ্ হইতে সব সময়েই বাঁচিয়া থাকিবে, কিন্তু পবিত্র স্থানে (যেমন, মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ বা মসজিদ) এবং পবিত্র কালে (যেমন, রমযান শরীফ, জুমু'আর দিন, শবে-বরাত, সবে-ক্বদর, হজ্জের দিন ইত্যাদি) নেক কাজ করিলে তাহার সওয়াব অনেক বেশী পাওয়া যায়, সেইরূপ গোনাহ্ করিলে তাহার পাপ এবং শাস্তিও অনেক বেশী হয়।]

ইফ্তারের দো'আ

১২। হাদীস শরীফে আছে, রোযাদারের সামনে যখন আল্লাহ্র নেয়ামত আসে অর্থাৎ, ইফ্তারের জন্য কোন খাদ্যদ্রব্য আসে, তখন তাহার এইরূপ বলিয়া আল্লাহ্র নেয়ামতের শোক্র আদায় করা উচিতঃ

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ تَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

অর্থঃ আল্লাহ্রই নামে আরম্ভ করি এবং আল্লাহ্রই প্রশংসা করি। আয় আল্লাহ্! তোমারই উদ্দেশ্যে আমি রোযা রাখিয়াছিলাম এবং তোমারই নেয়ামতের দ্বারা ইফ্তার করিতেছি এবং তোমারই উপর আমার ভরসা। তুমি পবিত্র। তুমি প্রশংসনীয়। আমার রোযা কবূল কর। তুমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ। —দারাকুতনী

১৩। হাদীসঃ 'তোমরা যখন ইফ্‌তার কর, খোরমার দ্বারা ইফ্‌তার করা ভাল। কেননা, খোরমার মধ্যে বরকত আছে। আর যদি খোরমা না পাওয়া যায়, তবে পানির দ্বারা ইফ্‌তার করা ভাল, কেননা, পানি পবিত্রকারী।' কোন কোন হাদীসে পানি মিশ্রিত দুধের দ্বারা ইফ্‌তার করার হুকুমও আসিয়াছে। —ইব্‌নে খোযায়মা

১৪। হাদীস শরীফে আছে, যে মুসলমান খালেছ নিয়তে ৪০টি রোযা রাখিবে, সে আল্লাহ্‌র কাছে যাহা চাহিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহাই দান করিবেন। খালেছ নিয়তের অর্থ এই যে, রোযার মধ্যে শুধু মাত্র আল্লাহ্‌কে রাযী করাই উদ্দেশ্য হওয়া চাই, অন্য কোন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। এইরূপ ৪০টি রোযা রাখিতে পারিলে সে আল্লাহ্‌র নিকট এত প্রিয়পাত্র হইয়া যায় যে, আল্লাহ্ পাক তাহার প্রত্যেক দো'আই কবূল করেন, অর্থাৎ যে দো'আ তাহার জন্য কল্যাণকর হইবে তাহা নিশ্চয়ই কবূল হইবে। ছুফীয়ায়ে কেরাম যে চিল্লাকাশী দ্বারা নফ্‌সকুশী করিয়া মা'রেফাৎ হাছেল পূর্বক খোদার নৈকট্য লাভ করেন, এই হাদীসই তাঁহাদের দলীল। 'চিল্লাকাশীর' অর্থ ৪০ দিন পর্যন্ত দুনিয়ার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া রোযা রাখিয়া কোন মসজিদে গিয়া পড়িয়া থাকা এবং দিন রাত তথায় ইবদাত-বন্দেগীতে এবং আল্লাহ্‌র যেকেরে মগ্ন থাকা। এইরূপ করিতে পারিলে নৈকট্য লাভ হয়, (তবে পীরে কামেলের পরামর্শ ও উপদেশ নিয়া করিলে বেশী ফল পাওয়া যায়। নফ্‌সকুশীর অর্থ—মানুষের অন্তরের কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও অহঙ্কার ইত্যাদি রিপুগুলিকে দমন করিয়া আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হওয়া।) —দায়লামী

১৫। হাদীস শরীফে আছে, 'আশ্‌হোরে হোরোমের প্রত্যেক বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবারে যে রোযা রাখিবে, তাহার জন্য আল্লাহ্ পাক সাত শত বৎসরের ইবাদতের সমান নেকী লিখিবেন। ['আশ্‌হোর' ' শাহ্‌র' শব্দের বহুবচন। শাহ্‌র অর্থ মাস 'হোরম' 'হারামের' বহুবচন। 'হারাম' অর্থ যাহাকে সম্মান দান করা হইয়াছে এবং যাহার সম্মান করা কর্তব্য। 'হারাম' অর্থ কঠোরভাবে নিষিদ্ধও আছে; এখানে সে অর্থও লওয়া যাইতে পারে। রজব, যিলক্বদ্, যিলহজ্জ এবং মুহার্‌রাম এই চারিটি মাসকে আল্লাহ্ তা'আলা আদিকাল হইতে সম্মান দান করিয়া রাখিয়াছেন এবং লোকদিগকে ইহার সম্মান করার জন্য আদেশ করিয়াছেন এবং এই চারি মাসে পাপ কার্য করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন, কাজেই এই চারি মাসকে 'আশ্‌হোরে হোরোম অর্থাৎ সম্মানিত মাস বলা হয়। প্রকাশ থাকে যে, যিলহজ্জ মাসের ১০ই, ১১ই, ১২ই এবং ১৩ই তারিখে রোযা নিষেধ।] —ইব্‌নে শাহীন

১৬। হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি আশ্‌হোরে হোরোমের কোন এক মাসে বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার এই তিন দিন রোযা রাখিবে তাহার জন্য আল্লাহ্ পাক দুই বৎসরের ইবাদতের সমান নেকী লিখিয়া দিবেন।' (অর্থাৎ, এখন আমলনামার মধ্যে লেখা হইবে, কিয়ামতের দিন বেহেশ্‌তে এই তিনটি রোযার বরকতে দুই বৎসরের নফল ইবাদতের সমান পুরস্কার দেওয়া হইবে।) —তাব্‌রানী

শবে ক্বদরের ফযীলত

১। আয়াতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ 'শবেক্বদরের এক রাত্রি এক হাজার মাস হইতে শ্রেষ্ঠ।' অর্থাৎ অন্যান্য সময় এক হাজার মাস এবাদত-বন্দেগী

করিয়া যত সওয়াব পাওয়া যাইবে, শবে-ক্বদরের এক রাত্রিতে ইবাদত করিয়া তদপেক্ষা অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে।

আল্লামা সয়ুতি লুবাবুনু নুকূল গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ রসূল (দঃ) বলিয়াছেন, বনী ইস্রায়ীল কওমের এক ব্যক্তি এক হাজার মাস আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদে কাটাইয়াছিল। ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ বিস্মিত হইল। এবং আফ্সোস করিতে লাগিল যে, আমরা কিরূপে এমন নেয়ামত পাইতে পারি। তখন এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

إِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ـ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ○

ঐ ব্যক্তি যে হাজার মাস আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করিয়াছিল, শবে-ক্বদর উহা হইতে উত্তম। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি রাত্রে ভোর পর্যন্ত এবাদত করিত। আর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধর্মের দুশ্মনদের সহিত যুদ্ধ করিত। এক হাজার মাস কাল এইরূপ করিয়াছিল। এই কাহিনী শুনিয়া হযরত ছাহাবা কেরাম আফসোস করেন। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির হাজার মাস এবাদত ও জেহাদ হইতে এই রাত্রি উত্তম।

ভাই-বোনগণ! এই মোবারক রাত্রির ক্বদর কর। সামান্য পরিশ্রমে কত বেশী সওয়াব পাওয়া যায়! বিশেষ করিয়া এই রাত্রে দো'আ কবূল হয়। যদি পূর্ণ রাত্রি জাগিতে না পার, তবে যতটুকু সম্ভব জাগিয়া থাক। হিম্মতহারা হইয়া একেবারে মাহ্রূম থাকিও না।

২। হাদীস শরীফে আছে, হযরত (দঃ) রমযান সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ 'তোমাদের নিকট এমন একটি মাস আসিয়াছে, যাহাতে এমন একটি রাত্র আছে যাহার মূল্য এক হাজার মাস হইতেও অধিক।' যে ব্যক্তি এই রাত্রের ফযীলত ও বরকত হাছেল না করিবে, সে সমস্ত খায়ের-বরকত হইতে মাহ্রূম হইবে। বস্তুতঃ এই রাত্রে যে কিছুমাত্র ইবাদত-বন্দেগী করে না, তাহার চেয়ে দূরদৃষ্ট কেহই নাই।

৩। হাদীস শরীফে আছে, 'বিশেষ কোন হেকমতের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে শবে-ক্বদরের রাতটি নির্দিষ্ট করিয়া জানাইয়া দেন নাই। অতএব, তোমরা রমযান শরীফের শেষের সাত রাত্রিতে উহাকে তালাশ কর।' অর্থাৎ, এই রাতগুলিতে জাগিয়া আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীতে মশ্গুল থাক। —হাকেম

৪। হাদীস শরীফে আছে, শবে-ক্বদর প্রত্যেক রমযানেই হয় এবং ইহাও হাদীসে আছে, যে রমযানের ২৭শে শবে-ক্বদর হয়। —আবু দাঊদ

শবে-ক্বদরের তারিখ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু ২৭শে রাত্রে যে শবে-ক্বদর হয় ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক মশ্হুর ক্বওল। উত্তম যে, শক্তি ও সাহস হইলে শেষ দশটি রাত্র জাগিবে। (বিশেষতঃ ইহার মধ্যে বেজোড় রাতগুলিতে অধিক পরিমাণে এবাদত-বন্দেগী এবং খোদার দিকে রুজু হওয়া উচিত।) অনেকে মনে করে যে, আলো বা কোন কিছু হয়ত এই রাত্রিতে দেখা যায়; কিন্তু কোনকিছু দেখা যাওয়া যরূরী নহে, মনে-প্রাণে ইবাদত করিলেই এই রাত্রের বরকত হাছেল হইবে।

তারাবীহ্ নামাযের ফযীলত

১। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ ('হে আমার পেয়ারা উম্মতগণ।) তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর রমযান শরীফের (দিনের বেলায়) রোযা ফরয

করিয়াছেন এবং (তোমাদের উপকারের জন্য) উহার রাত্রে তারাবীহ্‌র নামায সুন্নত করিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তি খালেছ নিয়তে, ঈমানের সহিত, শুধু সওয়াবের আশায় (অন্য কোন আশায় নহে, অমনোযোগিতা বা অভক্তির সহিত নহে) এই মাসে দিনের বেলায় রীতিমত রোযা রাখিবে এবং রাত্রিতে রীতিমত তারাবীহ্‌র নামায পড়িবে, তাহার বিগত সব (ছগীরা) গোনাহ্ (এই দুইটি আমলের বরকতে) মিটাইয়া দেওয়া হইবে।' অতএব, এই পবিত্র মাসে অধিক নেকী সঞ্চয় করিয়া লওয়া উচিত। এই মাসের একটি ফরয অন্য মাসের ৭০টি ফরযের সমান এবং একটি নফল এবাদত করিলে একটি ফরযের সমান নেকী পাওয়া যায়।

দুই ঈদের রাত্রের ফযীলত

১। হাদীসঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'যে ব্যক্তি ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আযহার রাত্রে জাগরিত থাকিয়া আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগীতে মশ্‌গুল থাকিবে, যে দিন অন্যান্য দেল মরিবে, সে দিন তাহার দেল মরিবে না অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের আতঙ্কে অন্যান্য লোকের দেল ঘাব্‌ড়াইয়া মৃতপ্রায় হইয়া যাইবে; কিন্তু দুই ঈদের রাত্রে জাগরণকারীর দেল তখন ঠিক থাকিবে, ঘাব্‌ড়াইবে না।' —তাব্‌রানী

আশুরা রোযা—(বর্ধিত)

১। হাদীসঃ হাদীস শরীফে আছেঃ 'রমযানের রোযার পর আশুরার রোযার মর্তবা সবচেয়ে বড়। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, আশুরার রোযা দ্বারা আমি আশা করি যে, বিগত এক বৎসরের (ছগীরা) গোনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে। মুহার্‌রাম মাসের ১০ই তারিখকে "আশুরা" বলে। কিন্তু হাদীস শরীফে আছে যে, আশুরার রোযা রাখিতে হইলে তাহার আগে বা পরেও একটি রোযা রাখিবে, যাহাতে ইহুদীদের অনুকরণের দোষারোপ না আসে। কারণ, ইহুদীরা শুধু ১০ই তারিখে রোযা রাখে। —মুসলিম

হাদীস শরীফে ইহাও আছে যে, 'আশুরার দিন যে ব্যক্তি নিজের পরিবারবর্গকে আছুদা করিয়া খাইবার ও পরিবার দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সারা বৎসর আছুদা করিয়া খাইবার ও পরিবার দিবেন।' —বায়হাকী

রজবের রোযা

১। হাদীসঃ 'রজব মাস আশ্‌হোরে হোরোমের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশের মতে এই মাসের ২৫শে রাত্রেই মে'রাজ হইয়াছিল। কিন্তু এই রাত্রিকে একটি উৎসবের রাত্রি বা ঐ দিনের রোযাকে যরূরী মনে করিবে না।

শবে বরাত

১। হাদীসঃ 'হাদীস শরীফে আছে, শা'বানের চাঁদের ১৫ই রাত্রে (অর্থাৎ ১৪ই দিবাগত রাত্রে) সারা বৎসরের হায়াত, মওত, রেযেক ও দৌলত লেখা হয় এবং ঐ রাত্রে বান্দাগণের আমল খোদার দরবারে পেশ করা হয়।' হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় উম্মতগণকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, 'শা'বানের চাঁদের ১৫ই রাত্রে তোমরা জাগরিত থাকিয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করিও

এবং দিনের বেলায় রোযা রাখিও।' কেননা, ঐ রাত্রিতে বান্দাগণের প্রতি আল্লাহ্ পাকের খাছ রহ্মতের দৃষ্টি হয়। এমনকি, আল্লাহ্ পাক সূর্যাস্তের পর হইতে ছোব্হে ছাদেক পর্যন্ত দুনিয়ার আকাশে আসিয়া দুনিয়াবাসীদের জন্য ঘোষণা করিতে থাকেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহার গোনাহ্ মা'ফ করাইয়া লওয়া দরকার থাকে মা'ফ চাহিয়া লও, আমি মা'ফ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। তোমাদের মধ্যে যাহার রেযেকের দরকার থাকে, রেযেক চাহিয়া লও, আমি দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। তোমাদের মধ্যে যাহার রোগ আরোগ্য বা বিপদ হইতে মুক্তি চাহিয়া লওয়ার দরকার থাকে চাহিয়া লও, আমি রোগ আরোগ্য করিবার এবং বিপদ হইতে মুক্তি দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। এইরূপে বান্দাদের এক এক অভাবের নাম লইয়া আল্লাহ্ পাক ছোব্হেছাদেক পর্যন্ত ঘোষণা করিতে থাকেন। হায়! রহ্মানুররাহীম আহ্কামুল হাকেমীনের পক্ষ হইতে এমন ঘোষণার সুবর্ণ সুযোগ যাহারা হেলায় হারায় বরং আতশবাজি, ঝগড়া, বিবাদ ইত্যাদি করিয়া যাহারা পাপের আগুন বাড়ায় তাহাদের চেয়ে হতভাগা বদনছীব আর কে? হাদীস শরীফে ইহাও আছে যে, হযরত নবী আলাইহিস্সালাম এই রাত্রে কবরস্তানে গিয়া মৃত মুসলমানদের জন্য দো'আয়ে-মাগফেরাত করিতেন। কাজেই এই রাত্রিতে যদি কিছু দান-খয়রাত করিয়া বা কিছু নফল নামায বা কলেমা কালাম পড়িয়া উহার সওয়াব মৃতদের বখ্শিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের মুক্তি ও মাগফেরাতের দো'আ করা হয়, তবে তাহা অতি উত্তম। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত বাতি জ্বালাইয়া বা আতশবাজি পোড়াইয়া আমোদ-উৎসব করা ইসলামী তরীকার বিরুদ্ধ কাজ। হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেনঃ শির্ক করা, আত্মীয়দের সহিত অসদ্ব্যবহার করা এবং মুসলমানে মুসলমানে পরস্পর শত্রুতা পোষণ করা, এই তিন প্রকার গোনাহ্ ছাড়া অন্যান্য গোনাহ্ আল্লাহ্ পাক মা'ফ করিয়া দেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যাদুকর, নজুমী, বখীল, নেশা, লেওয়াতাতকারী এবং পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ব্যতীত অন্য সকলের গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।

যাকাত

মালদার হওয়া সত্ত্বেও যে যাকাত না দিবে সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ভীষণ পাপী এবং গোনাহ্গার হইবে এবং কিয়ামতের দিন তাহার কঠোর শাস্তি এবং ভীষণ আযাব ভোগ করিতে হইবে।

হাদীস শরীফে আছেঃ 'যাহার নিকট সোনা, রূপা মওজুদ থাকা সত্ত্বেও সে তাহার যাকাত দেয় নাই, কিয়ামতের দিন তাহাকে আযাব দিবার জন্য ঐ সোনা রূপার পাত বানান হইবে এবং ঐ পাতগুলি দোযখের আগুনে দগ্ধ করিয়া তাহার বুকে, পিঠে, পাঁজরে এবং কপালে দাগ দেওয়া হইবে। পাতগুলি একবার ঠাণ্ডা হইয়া গেলে পুনর্বার উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হইবে।'

অন্য হাদীসে আছেঃ 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল দিয়াছেন, সে কিন্তু উহার যাকাত আদায় করে নাই। (লোভের বসে মাটির নীচে, সিন্দুকের মধ্যে বা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখিয়াছে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র হুকুমে ঐ মালের দ্বারা অতি বিষাক্ত সাপ বানান হইবে এবং সেই সাপ ঐ ব্যক্তির গলা পেঁচাইয়া ধরিয়া উভয় গালে দংশন করিবে এবং বলিবেঃ 'আমি তোমার টাকা, আমিই তোমার সঞ্চিত ধন।'

'আল্লাহ্‌র পানাহ্‌ চাই।' জাব্বার কাহ্‌হার আল্লাহ্‌র আযাব সহ্য করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? সামান্য লোভের বশীভূত হইয়া মানুষ যেন এমন পাপ কখনও না করে। হে মানুষ! আল্লাহ্‌রই দান করা ধন, (দিয়া ধন বুঝে মন।) আল্লাহ্‌র পক্ষে দান না করা কত বড় অন্যায় কথা।

১। **মাসআলাঃ** যে ব্যক্তি ৫২৷৷০ তোলা রূপা, অথবা ৭৷৷০ তোলা সোনার কিংবা তৎমূল্যের টাকার মালিক হয় এবং তাহার নিকট ঐ পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বৎসরকাল স্থায়ী থাকে, তাহার উপর যাকাত ফরয হয়। ইহা অপেক্ষা কম হইলে যাকাত ফরয নহে। ইহা অপেক্ষা বেশী হইলেও যাকাত ফরয হইবে। এই মালকে 'নেছাব' বলে এবং যে এই পরিমাণ মালের মালিক হয়, তাহাকে 'মালেকে নেছাব' বা 'ছাহেবে নেছাব' বলা হয়।

২। **মাসআলাঃ** যদি কাহারও নিকট ৭৷৷০ তোলা সোনা বা ৫২৷৷০ তোলা রূপা ৪/৫ মাস থাকে, তারপর কম হইয়া যায় এবং ২/৩ মাস কম থাকে, তারপর আবার নেছাব পূর্ণ হইয়া যায়, তবে তাহার যাকাত দিতে হইবে। মোটকথা, বৎসরের শুরু এবং শেষ দেখিতে হইবে, বৎসরের শুরুতে যদি মালেকে নেছাব হয় এবং বৎসরের শেষেও মালেকে নেছাব হয়, মাঝখানে কিছু কম হইয়া যায়, তবে বৎসরের শেষে তাহার নিকট যত টাকা থাকিবে, তাহার যাকাত দিতে হইবে। অবশ্য বৎসরের মাঝখানে যদি তাহার সম্পূর্ণ মাল কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, তবে পূর্বের হিসাব বাদ দিয়া পুনরায় যখন নেছাবের মালিক হইবে, তখন হইতে হিসাব ধরিতে হইবে, তখন হইতেই বৎসরের শুরু ধরা হইবে।[১]

৩। **মাসআলাঃ** কাহারও নিকট ৮/৯ তোলা সোনা ছিল, কিন্তু পূর্ণ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই তাহা তাহার হাত ছাড়া হইল, (চুরি হইয়া গেল বা হারাইয়া গেল, বা দান করিয়া ফেলিল,) এমতাবস্থায় তাহার উপর যাকাত ওয়াজিব হইবে না।

৪। **মাসআলাঃ** কাহারও নিকট ২০০ টাকা আছে, কিন্তু আবার ২০০ টাকা করযও আছে, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হইবে না; পূর্ণ বৎসর থাকুক বা না থাকুক। আর যদি ১৫০ টাকাও করয হয়, তবুও যাকাত ওয়াজিব হইবে না। কেননা, ১৫০ টাকা বাদ দিলে মাত্র ৫০ টাকা থাকে। ৫০ টাকায় নেছাব পুরা হয় না। কাজেই যাকাত ওয়াজিব হইবে না।

৫। **মাসআলাঃ** যদি কাহারও নিকট ২০০ টাকা থাকে এবং ১০০ টাকার করয থাকে, তবে ১০০ টাকার যাকাত দিতে হইবে।

৬। **মাসআলাঃ** সোনা এবং রূপা যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, মাটির নীচে পোঁতা থাকুক, কারবারের মধ্যে থাকুক (নোটের পরিবর্তে) গভর্ণমেন্টের যিম্মায় বা অন্য কাহারও নিকট করয হিসাবে থাকুক, যেওর আকারে থাকুক এবং উহা ব্যবহারে থাকুক বা আজীবন বাক্সে তোলা থাকুক, কাপড়ে, টুপিতে, তলোয়ারে বা জুতায় কারুকার্যরূপে থাকুক, সব অবস্থায়ই নেছাব পরিমাণ পূর্ণ হইলে এবং এক বৎসরকাল মালিকের অধিকারে থাকিলে তাহাতে যাকাত ফরয হইবে; (অবশ্য যদি নেছাব পরিমাণ না হয়, বা পূর্ণ এক বৎসরকাল মালিকের নিকট না থাকে, তবে যাকাত ফরয হইবে না। সোনা এবং রূপা ব্যতিরেকে অন্য কোন ধাতুতে তেজারত না করা পর্যন্ত উহাতে যাকাত ফরয হইবে না।)

টিকা

১ বালেগ হওয়ার যাকাত, ফরয ও ইদ্দত পালনের কাল চাঁদ মাসের হিসাবে হয়।

৭। **মাসআলা ঃ** সোনা এবং রূপা যদি খাঁটি না হয় অন্য কোন ধাতু তাহাতে মিশ্রিত থাকে (মুদ্রা হউক, জেওর হউক বা অন্য বস্তু হউক) তবে দেখিতে হইবে যে, বেশীর ভাগ সোনা বা রূপা কি না? যদি বেশীর ভাগ সোনা বা রূপা হয়, তবে সম্পূর্ণ রূপা বা সোনা ধরিয়া লইতে হইবে এবং নেছাব পরিমাণ পূর্ণ হইলে হিসাব করিয়া তাহার যাকাত দিতে হইবে। আর যদি সোনার বা রূপার ভাগ কম হয় অন্য ধাতু (রাং বা দস্তা ইত্যাদি) বেশি হয়, তবে তাহাতে শুধু নেছাব পরিমাণ হইলে যাকাত ওয়াজিব হইবে না, অবশ্য এই মাল দ্বারা তেজারত করিলে, তেজারতের হিসাবে যাকাত দিতে হইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কিছু সোনা এবং কিছু রূপা থাকে, কিন্তু পৃথকভাবে সোনার নেছাবও পূর্ণ হয় না, রূপার নেছাবও পূর্ণ হয় না, তবে উভয়ের মূল্য যোগ করিলে যদি নেছাব পরিমাণ অর্থাৎ ৫২।।০ তোলা রূপা অথবা ৭।।০ সোনার মূল্যের সমান হয়, তবে যাকাত ফরয হইবে; নতুবা যাকাত ফরয হইবে না। আর যদি উভয়টার নেছাব পূর্ণ থাকে, তবে মূল্য ধরিয়া যোগ করার আবশ্যক নাই।

৯। **মাসআলা ঃ** ধরুন ২৫ টাকায় এক ভরি সোনা পাওয়া যায় আর এক টাকায় দেড় তোলা চাঁদি পাওয়া যায়। এখন কাহারও নিকট দুই ভরি সোনা এবং পাঁচটি টাকা বেশী আছে এবং পূর্ণ এক বৎসর তাহার কাছে আছে। এখন তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে। কেননা, দুই ভরি সোনা ৫০ টাকা; ৫০ টাকায় ৭৫ তোলা চাঁদি হইল। দুই ভরি স্বর্ণ দিয়া চাঁদি কিনিলে ৭৫ তোলা হইবে। আরও পাঁচ টাকা মওজুদ আছে। এই হিসাবে যাকাতের নেছাবের চেয়ে মাল অনেক বেশী হইল। অবশ্য যদি শুধু দুই তোলা সোনা থাকে উহার সহিত কোন চাঁদি বা টাকা না থাকে, তবে যাকাত ফরয হইবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও নিকট ত্রিশ টাকা এক বৎসর কাল থাকে এবং ঐ সময় রূপার ভরি ।।০ বিক্রয় হয় এবং ত্রিশ টাকায় ৬০ ভরি রূপা পাওয়া যায়, তবুও তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে না। কেননা, তাহার নিকট ত্রিশ টাকার মধ্যে ৩০ ভরি রূপাই আছে, যদিও উহার মূল্য ৬০ ভরি রূপা হয়; (অবশ্য ৬০ ভরি রূপা থাকিলে যাকাত ফরয হইবে, যদিও তাহার মূল্য ৩০ টাকা হয়।) কিন্তু শুধু সোনা বা শুধু রূপা থাকিলে তাহার মূল্যের হিসাব ধরা হয় না; ওজনের হিসাবই ধরা হয়।

১১। **মাসআলা ঃ** কেহ ১৬ই রজব তারিখে (হাজাতে আছলিয়া বাদে এবং করয বাদে) ১০০ টাকার মালিক হইল এবং রমযানে আরও ২০ টাকা লাভ পাইল, তারপর রবিউল আউয়ালে আরও ৩০ টাকা লাভ পাইয়া মোট ৫০ টাকা বাড়িল। এখন পর বৎসর ১৫ই রজব তারিখে হিসাব করিয়া দেখে যে (করয ও হাজাতে আছলিয়া বাদে) তাহার মবলগ ১৫০ টাকা আছে। এইরূপ হইলে ১৫ই রজব তারিখে তাহার উপর ১৫০ টাকারই যাকাত ফরয হইবে। ইহা বলা চলিবে না যে, পরে ৫০ টাকা লাভ করিয়াছে তাহার ত পূর্ণ এক বৎসর যায় নাই। কেননা, বৎসরের মাঝখানের কম বা বেশির হিসাব ধরা হয় না; হিসাব ধরা হয় বৎসরের শুরু ও শেষের।

১২। **মাসআলা ঃ** কেহ ১৫ই শওয়াল তারিখে মাত্র ১০০ তোলা রূপার মালিক ছিল (হাজাতে আছলিয়া এবং করয বাদে) তারপর বৎসরের মাঝখানে ২/৪ তোলা অথবা ৯/১০ তোলা সোনারও সে মালিক হইল, এইরূপ অবস্থা হইলে বৎসর যখন পূর্ণ হইবে অর্থাৎ পর বৎসর ১৪ই শওয়াল তারিখে তাহার সোনার এবং রূপার উভয়েরই যাকাত দিতে হইবে। এ বলা

যাইবে না যে, সোনার উপর এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই। কারণ, রূপার সঙ্গে সঙ্গে সোনার বৎসরও পূর্ণ ধরিতে হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ সোনা এবং রূপা ব্যতিরেকে অন্য যত ধাতু আছে যেমন লোহা, তামা, পিতল, কাঁসা, রাং ইত্যাদি, অথবা কাপড়, জুতা, চিনাবাসন, কাঁচের বরতন ইত্যাদি যত আসবাব-পত্র আছে তাহার হুকুম এই যে, যদি এইগুলির কেনা-বেচার ব্যবসা করে, তবে নেছাব পরিমাণ হইলে বৎসরকাল স্থায়ী হইলে তাহার যাকাত দিতে হইবে; নতুবা ব্যবসা না করিয়া শুধু ঘরে রাখা থাকিলে, এইসব আসবাবপত্রের মূল্য হাজার টাকা হইলেও তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ ডেগ, ছিউনি (খাঞ্চা) লগন, বরতন ইত্যাদি, কোঠাঘর, বাড়ী, জমীন, কাপড়, শাড়ী, জুতা ইত্যাদি এবং মণিমুক্তার মূল্যবান হার; ফলকথা এই যে, সোনা এবং রূপা ব্যতিরেকে অন্য যত জিনিস আছে তাহা দৈনন্দিন ব্যবহারে আসুক বা শুধু ঘরে রাখা থাকুক, যে পর্যন্ত তাহার কেনা-বেচা এবং ব্যবসা করা না হইবে, সে পর্যন্ত তাহাতে যাকাত নাই। অবশ্য এই-সব জিনিসের তেজারত করিলে হিসাব করিয়া তাহার যাকাত দিতে হইবে। (পক্ষান্তরে সোনা এবং রূপা শুধু সিন্দুকে রাখা থাকিলে বা মাটির নীচে পুতিয়া রাখিলেও তাহার যাকাত দিতে হইবে।)

১৫। মাসআলা ঃ কাহারও নিকট যদি দশ পাঁচটা বাড়ী থাকে এবং তাহা ভাড়ার উপর দেয়, অথবা চার পাঁচ শত টাকার বাসন কিনিয়া তাহা ভাড়া দেয় (অথবা চার পাঁচ হাজার টাকার মোটর বা নৌকা কিনিয়া তাহা ভাড়া দেয় বা নিজের কারবার চালায়) তবে এইসব মালের উপর যাকাত নাই। মোটকথা, ভাড়ার উপর হাজার হাজার টাকার গাড়ী ঘোড়া চালাইলেও তাহার উপর যাকাত নাই। অবশ্য ভাড়ার টাকা নেছাব পরিমাণ হইলে এবং বৎসর অতীত হইলে তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে, অথবা এইসব জিনিসের কেনা-বেচা করিলে এইসব জিনিসের উপরও যাকাত ফরয হইবে এবং মূল্য হিসাব করিয়া যাকাত দিতে হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ পরিধানের কাপড় বা জুতা যতই ঘরে থাকুক না কেন এবং যতই মূল্যবান হউক না কেন তাহাতে যাকাত নাই, কিন্তু যদি তাহাতে খাঁটি সোনা বা রূপার কারুকার্য থাকে, তবে সোনা বা রূপার পরিমাণ নেছাব পর্যন্ত পৌঁছিলে (অন্য সোনা রূপা থাকিলে তাহার সহিত মিলাইলে বা পৃথকভাবে) তাহার যাকাত দিতে হইবে। অন্যথায় যাকাত দিতে হইবে না।

১৭। মাসআলা ঃ কাহারও নিকট যদি কিছু পরিমাণ সোনা বা রূপার জেওর থাকে এবং কিছু পরিমাণ তেজারতের মালও থাকে (কাপড়, জুতা, ধান বা পাট হইলেও) সবের মূল্য যোগ করিলে যদি ৫২৷৷০ তোলা রূপা বা ৭৷৷০ তোলা সোনার সমান হয়, তবে যাকাত ফরয হইবে, কম হইলে ফরয হইবে না।

১৮। মাসআলা ঃ (নিজের জমির পাট বা ধান এক বৎসর কাল ঘরে জমা করিয়া রাখিলে তাহার যাকাত দিতে হইবে না। শাদী বিবাহের জন্য, যিয়াফতের জন্য, নিজের বছরের খোরাকের জন্য চাউল গোলা করিয়া রাখিলেও যাকাত দিতে হইবে না।) মোটকথা, ব্যবসার নিয়তে যে মাল খরিদ করিবে উহা তেজারতের মাল হইবে এবং তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে। নিজ খরচ বা দানের নিয়তে খরিদ করিলে পরে যদি ব্যবসার নিয়ত করে, তবে ইহা তেজারতের মাল হইবে না।

১৯। মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট তোমার টাকা পাওনা থাকে, তবে পাওনা টাকার যাকাত দিতে হইবে। পাওনা টাকা তিন প্রকার। প্রথম প্রকার এই যে, হয়ত নগদ টাকা বা সোনা

রূপা কাহাকেও ধার দিয়াছ। অথবা তেজারতের মাল বাকী বিক্রয় করিয়াছ সে বাবত টাকা পাওনা হইয়াছে। এক বৎসর বা দুই তিন বৎসর পর টাকা উসূল হইল। এখন যত টাকায় যাকাত ওয়াজিব হয় পাওনা টাকা তত পরিমাণ হইলে অতীত বৎসরসমূহের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হইবে। যদি একত্রে উসূল না হয়, তবে যখন এগার তোলা রূপার সমপরিমাণ টাকা উসূল হইবে তখন ঐ টাকারই যাকাত দিতে হইবে। যদি উহা হইতে কম উসূল হয়, তবে ওয়াজিব হইবে না। আবার যখন সেই পরিমাণ টাকা পাইবে, তখন ঐ পরিমাণ টাকার যাকাত দিবে। এরূপভাবে দিতেই থাকিবে। আর উসূলকৃত টাকার যাকাত যখন দিবে অতীত সকল বৎসরের যাকাত দিতে হইবে। আর যদি পাওনা টাকা নেছাব হইতে কম হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হইবে না। অবশ্য যদি তাহার কাছে অন্যান্য সম্পত্তি থাকে যে উভয় মিলিয়া নেছাব পুরা হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হইবে।

২০। **মাসআলা ঃ** দ্বিতীয় প্রকার যদি নগদ টাকা করয না দেয় বা তেজারতের মাল বিক্রয় না করে, তেজারতী ব্যতীত অন্য মাল বিক্রয় করিলে যেমন পরিবার বস্ত্র, গার্হস্থ্য সামগ্রী ইত্যাদি বিক্রয় করে এবং উহার দাম এই পরিমাণ বাকী আছে যে, যাকাত ওয়াজিব হয়, এই টাকা যদি কয়েক বৎসর পর উসূল হয়, তবে ঐ কয়েক বৎসরের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব, আর যদি এক সঙ্গে উসূল না হয় বরং কিছু কিছু করিয়া উসূল হয়,তবে নেসাবে যাকাত পরিমাণ টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হইবে না। যখন সেই পরিমাণ পাইবে তখন ঐ কয়েক বৎসরের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হইবে।

২১। **মাসআলা ঃ** তৃতীয় প্রকার এই যে, স্বামীর নিকট মহরের টাকা পাওনা ছিল। কয়েক বৎসর পর ঐ টাকা পাওয়া গেল। টাকা পাওয়ার পর হইতে যাকাত হিসাব করিতে হইবে। বিগত বৎসর সমূহের যাকাত ওয়াজিব হইবে না। ঐ টাকা পুরা এক বৎসর মওজুদ থাকিলে যাকাত ওয়াজিব হইবে ; অন্যথায় নহে।

২২। **মাসআলা ঃ** মালেকে নেছাব যদি পূর্ণ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার (হাওলানে হাওলের) পূর্বেই যাকাত আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। আর যদি কোন গরীব লোক মালেকে নেছাব না হওয়া সত্ত্বেও কোথাও হইতে টাকা পাওয়ার আশায় আগেই যাকাত আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাতে যাকাত আদায় হইবে না ; পরে যদি মাল পায়, তবে হাওলানে হাওলের পর হিসাব করিয়া তাহার যাকাত দিতে হইবে ; পূর্বে যাহা দিয়াছে তাহা নফল ছদ্‌কা হইয়া যাইবে এবং তাহার সওয়াব পৃথকভাবে পাইবে, উহাকে যাকাতরূপে গণ্য করা যাইবে না।

২৩। **মাসআলা ঃ** মালেকে নেছাব লোক যদি কয়েক বৎসরের যাকাত এককালীন অগ্রিম দিয়া দেয়, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু যে কয়েক বৎসরের যাকাত অগ্রিম দিয়াছে তাহার মধ্যে কোন বৎসরের মাল যদি বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ যত টাকা হিসাব করিয়া যাকাত দিয়াছে, মাল তাহা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে যত টাকা বাড়িয়াছে তাহার যাকাত পুনরায় দিতে হইবে।

২৪। **মাসআলা ঃ** আমীনের নিকট ১০০ টাকা মওজুদ আছে, আরও ১০০ টাকা অন্য কোন জায়গা হইতে পাইবার আশা পাওয়া গেল, এমতাবস্থায় বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই আমীন হয়ত পূর্ণ ২০০ টাকার যাকাত দিয়া দিল, এইরূপ দেওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি বৎসর শেষে মাল নেছাব হইতে কম হইয়া যায়, তবে যাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে এবং যাহা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে তাহা নফল ছদ্‌কা হইয়া যাইবে।

২৫। **মাসআলা ঃ** কাহারও মালের উপর পূর্ণ এক বৎসর শেষ হইয়া গেল অথচ এখনও যাকাত দেয় নাই, এমন সময় তাহার মাল চুরি হইয়া গেল বা অন্য কোন প্রকারে যেমন বাড়ী

পুড়িয়া বা নৌকা ডুবিয়া তাহার সমস্ত মাল নষ্ট হইয়া গেল, এইরূপ অবস্থা হইলে তাহার যাকাত দিতে হইবে না। কিন্তু যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া মাল নষ্ট করিয়া ফেলে বা কাহাকেও দিয়া ফেলে, তবে যাকাত মা'ফ হইবে না।

২৬। মাসআলা ঃ বৎসর পুরা হইবার পর অর্থাৎ, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর যদি কেহ নিজের সমস্ত মাল খয়রাত করিয়া দেয়, তবে যাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে।

২৭। মাসআলা ঃ কাহারও নিকট ২০০ টাকা ছিল, এক বৎসর পর তাহা হইতে ১০০ চুরি হইয়া গেল বা খয়রাত করিয়া দিল, এইরূপ অবস্থা হইলে তাহার মাত্র ১০০ টাকার যাকাত দিতে হইবে, বাকী ১০০ টাকার যাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে। যদি হিসাব করিয়া যাকতের টাকা গরীবের হাতে না দিয়া পৃথক করিয়া নিজের কাছে রাখে এবং সেই টাকা নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহাতে যাকাত আদায় হইবে না, যাকাতের টাকা পুনরায় বাহির করিয়া গরীবকে দিতে হইবে।

যাকাত আদায় করিবার নিয়ম

১। মাসআলা ঃ আল্লাহ্ পাক যে দিন তোমাকে মালেকে নেছাব করিলেন, সেই দিন আল্লাহ্ পাকের শোক্‌র করিবে এবং সেই তারিখটি (চাঁদের হিসাবে) লিখিয়া রাখিবে। তারপর যখন বৎসর শেষ হইয়া যাইবে, তখন কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া হিসাব করিয়া যাকাত বাহির করিয়া দিবে। নেক কাজে দেরী করা উচিত নয়। কারণ, কি জানি, হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নেক কাজ করার সুযোগ হারাইয়া ফেলে এবং গোনাহ্‌র বোঝা কাঁধে থাকিয়া যায়। যদি এক বৎসর অতীত হওয়ার পর যাকাত না দেওয়া অবস্থায় দ্বিতীয় বৎসরও অতীত হইয়া যায়, তবে ভারি গোনাহ্‌গার হইবে। তখন তওবা করিয়া খোদার কাছে কাকুতি মিনতি করিয়া মাফ চাহিয়া উভয় বৎসরের যাকাত হিসাব করিয়া দিয়া দিবে। মোটকথা, জীবনের যে কোন সময় দিয়া দিবে; বাকী রাখিবে না।

২। মাসআলা ঃ মালের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হইবে। একশত টাকায় ২।।০ টাকা, ৪০ টাকায় এক টাকা দিতে হইবে।

৩। মাসআলা ঃ যে সময় যাকাতের মাল কোন গরীব মিস্‌কীনের হাতে দিবে, তখন মনে মনে এই খেয়াল (নিয়্যত) করিবে যে, এই মাল আমি যাকাত বাবৎ দিতেছি। যদি দিবার সময় এইরূপ নিয়্যত মনে উপস্থিত না থাকে তবে যাকাত আদায় হইবে না, যাকাত পুনরায় দিতে হইবে। নিয়্যত ছাড়া যাহা দিয়াছে তাহা নফল ছদ্‌কা হইয়া যাইবে এবং তাহার সওয়াব পৃথকভাবে পাইবে।

৪। মাসআলা ঃ কেহ যাকাতের মাল যখন গরীবের হাতে দিয়াছে, তখন যাকাতের কথা মনে করে নাই, এইরূপ অবস্থায় ঐ মাল গরীবের হাতে থাকিতে থাকিতে যদি যাকাতের নিয়্যত করে, তবুও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু খরচ করিয়া ফেলার পর যদি নিয়্যত করে, তবে যাকাত আদায় হইবে না; পুনরায় যাকাত দিতে হইবে।

৫। মাসআলা ঃ কেহ যদি দুই টাকা পৃথক যাকাতের নিয়্যতে এক জায়গায় রাখিয়া দেয় যে, যখন কোন উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইবে, তখন তাহাকে দেওয়া হইবে, তারপর যখন উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তাহাকে দিয়াছে, তখন যাকাতের নিয়্যতের কথা তাহার মনে আসে নাই। এইরূপ অবস্থা হইলে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। যদি পৃথক করিয়া না রাখিত, তবে যাকাত আদায় হইত না।

৬। **মাসআলাঃ** কেহ হিসাব করিয়া যাকাতের টাকা বাহির করিল। এখন তাহার ইচ্ছা, একজনকেই দিয়া দেউক বা অল্প অল্প করিয়া কয়েক জনকে দেউক। যদি অল্প অল্প করিয়া কয়েক দিন পর্যন্ত দেয়, তবে তাহাও জায়েয আছে। আর যদি তখন দিয়া ফেলে, তাহাও দুরুস্ত আছে।

৭। **মাসআলাঃ** যাকাত যাহাকে দিবে অন্ততঃ এত পরিমাণ দিবে যেন, ঐ দিনের খরচের জন্য সে আর অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়। (কম পক্ষে এত পরিমাণ দেওয়া মুস্তাহাব। ইহা অপেক্ষা কম দিলেও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।)

৮। **মাসআলাঃ** যত মাল থাকিলে যাকাত ওয়াজিব হয় তত যাকাত এক জনকে দেওয়া মকরূহ্। তাহা সত্ত্বেও দিলে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। তদপেক্ষা কম দেওয়া জায়েয আছে; মকরূহও নহে।

৯। **মাসআলাঃ**কোন একজন গরীব লোক আমীনের নিকট টাকা হাওলাত চাহিল; আমীন জানে সে এমন অভাবগ্রস্ত যে, টাকা দিলে আর দিতে পারিবে না বা দিবেও না; এই কারণে আমীন হাওলাত বলিয়াই তাহাকে যাকাতের টাকা দিল, কিন্তু আমীনের মনে নিয়্যত রহিল যে, সে যাকাত দিতেছে, এমতাবস্থায় যদিও সে হাওলাত মনে করে, তবুও আমীনের যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (কিন্তু সে যদি কোনদিন হাওলাত শোধ করিতে আসে, তবে আমীন লইবে না, তাহাকেই আবার দিয়া দিবে।)

১০। **মাসআলাঃ** যদি কোন গরীবকে পুরস্কার বা বখ্‌শিশ্ বলিয়া যাকাতের মাল দেওয়া হয়, কিন্তু মনে যাকাতের নিয়্যত থাকে,, তবে তাহাতেও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (সম্মানী অভাবগ্রস্ত লোককে যাকাতের কথা বলিয়া দিলে হয়ত তাহারা মনে কষ্ট পাইতে পারে, এই জন্য তাহাদিগকে এই ভাবেই দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু যদি সাইয়্যেদ বংশ বা মালদারের না-বালেগ সন্তান হয়, তবে তাহাদিগকে যাকাতের মাল হইতে দিবে না, লিল্লাহ্‌র মাল হইতে দিবে।)

১১। **মাসআলাঃ** কোন গরীবের নিকট ১০ টাকা পাওনা ছিল এবং নিজের মালের যাকাতও হিসাবে ১০ টাকা বা তদূর্ধ্ব হইয়াছে। ইহাতে যদি যাকাতের নিয়্যতে সেই পাওনা মা'ফ করিয়া দেয়, তবে যাকাত আদায় হইবে না। অবশ্য তাহাকে যাকাতের নিয়্যতে ১০ টাকা দিলে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। এখন এই টাকা তাহার নিকট হইতে করয-শোধ বাবদ লওয়া দুরুস্ত আছে।

১২। **মাসআলাঃ** কাহারো নিকট যে পরিমাণ জেওর আছে হিসাব করিয়া তাহার যাকাত ৩ তোলা রূপা হইল, বাজারে ৩ তোলা রূপার দাম ২ টাকা। এখন যদি সে ৩ তোলা রূপা না দিয়া গরীবকে (রূপার) ২টি টাকা দিয়া দেয়, তবে যাকাত আদায় হইবে না। কেননা, ২টি টাকার ওজন ৩ তোলা নহে; অথচ শরীঅতের কানুন ও হুকুম এই যে, রূপার যাকাত যখন রূপার দ্বারা আদায় করিবে, তখন তাহার মূল্যের হিসাব ধরা যাইবে না, ওজনের হিসাব ধরিতে হইবে। অবশ্য ৩ তোলা রূপার মূল্য যে ২ টাকা হয় সেই দুই টাকার সোনা বা তামার পয়সা বা (ধান, চাউল বা কাপড় দিলে যাকাত আদায় হইবে, রূপা পুরা ৩ তোলার কম দিলে যাকাত আদায় হইবে না।)

১৩। **মাসআলাঃ** যাকাতের টাকা গরীবদিগকে নিজের হাতে না দিয়া যদি অন্য কাহাকেও উকিল বানাইয়া তাহার দ্বারা দেয় তাহাও দুরুস্ত আছে। মুয়াক্কেলের যাকাতের নিয়্যত থাকিলে উকিলের নিয়্যত যদি না-ও থাকে তাহাতেও কোন ক্ষতি হইবে না, যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

১৪। **মাসআলাঃ** আপনি গরীবদিগকে যাকাত দেওয়ার জন্য কাহাকেও উকিল নিযুক্ত করিয়া তাহার হাতে যাকাতের ২ টাকা দিলেন। সে অবিকল ঐ টাকা গরীবকে না দিয়া নিজের টাকা

হইতে ২ টাকা গরীবকে আপনার যাকাতের নিয়্যতে দিয়া দিল, মনে মনে ভাবিল যে, গরীবকে আমি আমার টাকা হইতে দিয়া দেই, পরে ঐ টাকা আমি নিয়া নিব। এইরূপ করিলে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, ঐ ২টাকা যেন তাহার কাছে মওজুদ থাকে, এইরূপ হইলে আপনার যাকাত তাহার নিজের টাকা হইতে দিয়া আপনার দেওয়া টাকা সে নিতে পারিবে এবং আপনার যাকাত আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি সে ২ টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়া থাকে (বা নিজের টাকার সহিত মিলাইয়া ফেলিয়া থাকে) এবং নিজের টাকা হইতে আপনার যাকাত দেয়, তবে আপনার যাকাত আদায় হইবে না। এইরূপে যদি নিজের টাকা হইতে দেওয়ার সময় নিয়্যত না করিয়া থাকে, তবুও আপনার যাকাত আদায় হইবে না। এখন ঐ দুই টাকা পুনরায় যাকাত বাবদ দিতে হইবে।

১৫। **মাসআলা ঃ** যদি আপনি টাকা না দিয়া কাহাকেও আপনার যাকাত দেওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করেন এবং বলিয়া দেন যে, আমার তরফ হইতে আপনার নিজ তহবিল হইতে যাকাত দিয়া দিন, পরে আমি আপনাকে দিয়া দিব, এরূপ দুরুস্ত আছে। এইরূপে যাকাতের নিয়্যতে দিলে আপনার যাকাত আদায় হইয়া যাইবে এবং যত টাকা সে দিয়াছে তত টাকা পরে আপনার নিকট হইতে সে নিয়া নিবে।

১৬। **মাসআলা ঃ** আপনার বলা ব্যতিরেকে যদি কেহ আপনার পক্ষ হইতে যাকাত দিয়া দেয়, তবে তাহাতে আপনার যাকাত আদায় হইবে না, এখন যদি আপনি মঞ্জুরও করেন, তবুও দুরুস্ত হইবে না এবং যে পরিমাণ টাকা আপনার পক্ষ হইতে দিয়াছে তাহা সে আপনার নিকট হইতে উসূল করিতে পারিবে না।

১৭। **মাসআলা ঃ** যদি আপনি কাহাকেও আপনার যাকাতের টাকা হইতে ২ টাকা দিয়া বলেন যে, আপনি এই টাকা গরীবদিগকে দিয়া দিবেন । এখন আপনি নিজেও দিতে পারেন বা নিজে না দিয়া যদি অন্য কোন বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা দিয়া দেন তাহাও দুরুস্ত আছে। নাম বলার প্রয়োজন নাই যে, অমুকের পক্ষ হইতে যাকাত দিতেছি। এইরূপে তিনি যদি নিজের মা, বাপ বা নিজের অন্য কোন গরীব আত্মীয়কে দেন, তাহাও দুরুস্ত আছে; কিন্তু যদি তিনি নিজে গরীব হন এবং উহা গ্রহণ করেন, তবে তাহা দুরুস্ত নহে। অবশ্য আপনি যদি তাহাকে টাকা দিবার সময় এইরূপ বলিয়া দিয়া থাকেন যে, যাকাতের টাকা দিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তবে তিনি নিজে গরীব হইলে (সাইয়্যেদ না হইলে) নিজেও নিতে পারিবেন।

[যাকাত দেওয়ার সময় এইরূপ দো'আ করিবে ঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ **অর্থ**—হে আল্লাহ্! দয়া করিয়া আমার এই যাকাত কবূল করিয়া লও, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।]

জমিনে উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত

১। **মাসআলা ঃ** কোন শহর কাফেরদের অধীনে ছিল। তাহারাই সেখানে বাস করিত। মুসলমান বাদশাহ্ স্বীয় প্রতিনিধি পাঠাইয়া অমুসলমানগণকে মিথ্যা ধর্ম ও দোযখের পথ পরিত্যাগ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এতীমের মালের যাকাত দিতে হইবে কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ছাহেব বলেন, এতীমের মালের যাকাত ওয়াজিব হয় না, ইমাম শাফেয়ী ছাহেব বলেন, এতীমের মালেরও যাকাত দিতে হইবে।

করিয়া সত্য ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু দুরাচার কাফেররা সে আহ্বানে সাড়া দিল না। তারপর তাহাদিগকে বলা হইল যে, তাহা হইলে তোমরা আমাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া খাজনা আদায় কর এবং আমাদের প্রজা হইয়া আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে সুখ শান্তিতে বাস করিতে থাক। কাফেররা এই আহ্বানেও সাড়া দিল না। তারপর মুসলমান বাদশাহ্ খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। খোদা তা'আলা মুসলমানগণকে জয়ী এবং কাফেরগণকে পরাস্ত করিয়া দিলেন। মুসলমান বাদশাহ্ ঐ শহর বা দেশকে যাঁহারা ঐ জেহাদের গাযী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। এইরূপে যে সমস্ত দেশ মুসলমানগণের অধীন হইয়াছে, অথবা যে দেশের অধিবাসী মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ না করিয়া আপন ইচ্ছায়ই মুসলমান হইয়া গিয়াছে এবং মুসলমান বাদশাহ্ও তাহাদিগকেই তাহাদের জমিনের স্বত্বাধিকারীরূপে বহাল করিয়াছেন, এই দুই প্রকার জমিনকে ওশ্‌রী জমিন বলে। সমগ্র আরব দেশের জমিন ওশরী। (এতদ্ব্যতীত মুসলমান বাদশাহ্ কর্তৃক যে সমস্ত জমিনের স্বত্বাধিকারী কাফেররা সাব্যস্ত হইয়াছে এবং তাহাদের উপর খেরাজ ধার্য করা হইয়াছে সেই সমস্ত জমিন খেরাজী জমিন।)

[খেরাজী জমিনের খেরাজ দিতে হয় ওশ্‌র দিতে হয় না, আর ওশ্‌রী জমিনের ওশ্‌র দিতে হয়।]

২। **মাসআলা** ঃ কাহারও পূর্বপুরুষ হইতে পুরুষানুক্রমে যদি ওশ্‌রী জমিন চলিয়া আসিয়া থাকে, অথবা কোন মুলমানের নিকট হইতে ওশ্‌রী জমিন খরিদ করিয়া থাকে, তবে সেই জমিনের যাকাত দিতে হইবে। (জমিনের যাকাতকে ওশ্‌র বলে।) ওশ্‌র দেওয়ার নিয়ম এই—যে সমস্ত জমিনে পরিশ্রম করিয়া পানি দিতে হয় না; বরং স্বাভাবিক বৃষ্টির পানিতে বা বর্ষার স্রোতের পানিতে ফসল জন্মে সে সব জমিতে যাহাকিছু ফসল হয় তাহার দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, দশ মণ হইলে এক মণ, দশ সের হইলে এক সের। আর যে সমস্ত জমিতে পরিশ্রম করিয়া পানি দিয়া ফসল জন্মাইতে হয়, সে সব জমির ফসলের ২০ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করিতে হইবে। অর্থাৎ, ২০মণ হইলে এক মণ; ২০ সের হইলে এক সের। বাগ বাগিচারও এই হুকুম। (আমাদের ইমাম আ'যম ছাহেব বলেন,) জমিনের ফসলের কোন নেছাব নির্ধারিত নাই, কম হউক বা বেশী হউক যাহা হয় তাহার দশ ভাগের এক ভাগ দিতে হইবে।

৩। **মাসআলা** ঃ ধান, পাট, গম, যব, সরিষা, কলাই, বুট, কাওন, ফল, তরকারী, শাক-সব্জি, সুপারী, নারিকেল, আখ, বেরণ, খেজুর গাছ, কলা গাছ ইত্যাদি ক্ষেতে যাহাকিছু জন্মিবে, তাহার ওশর দিতে হইবে, ইহাই জমিনের যাকাত।

৪। **মাসআলা** ঃ ওশ্‌রী জমিন হইতে, অথবা বে-আবাদ বন বা পাহাড় হইতে যদি মধু সংগ্রহ করে তাহারও ওশ্‌র দিতে হইবে।

৫। **মাসআলা** ঃ চাযের জমিনে বা বাগিচায় না হইয়া বাড়ীতে যদি কোন ফল বা তরকারী হয়, তবে তাহাতে ওশ্‌র ওয়াজিব হইবে না।

৬। **মাসআলা** ঃ ওশ্‌রী জমিন যদি কোন কাফের ক্রয় করিয়া নেয়, তবে সেই জমিন ওশ্‌রী থাকিবে না। পুনরায় সেই কাফেরের নিকট হইতে যদি কোন মুসলমান খরিদ করিয়া লয় বা অন্য কোন প্রকারে পায়, তবুও ওশ্‌রী হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা বিশ ভাগের এক ভাগ জমিনের মালিকের উপর, না ফসলের মালিকের উপর, ইহাতে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। সুবিধার জন্য আমরা বলিয়া থাকি যে, ফসলের মালিকের উপর। অতএব, জমিন যদি নগদ টাকায় পত্তন (ইজারা) দেওয়া হয়, তবে ফসল যে পাইবে, ওশ্‌র তাহারই দিতে হইবে; আর যদি বর্গা দেওয়া হয়, তবে ফসল যে যেই পরিমাণ পাইবে তাহার সেই পরিমাণের ওশ্‌র দিতে হইবে।

যাকাতের মাছ্‌রাফ

[অর্থাৎ যাকাত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি]

১। **মাসআলা ঃ** মালদার লোকের জন্য যাকাত খাওয়া বা তাহাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। [সে মালদার পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক, বালেগ হউক বা না-বালেগ হউক।] মালদার দুই প্রকার ঃ এক প্রকার মালদার যাহার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়; যেমন, যাহার নিকট ৫২।।০ তোলা রূপা বা ৭।।০ তোলা সোনা আছে বা ঐ মূল্যের দোকানদারীর মাল-আসবাব আছে, তাহার উপর যাকাত, ফেৎরা ও কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে। সে যাকাত খাইতে পারিবে না, তাহাকে দিলে যাকাত আদায় হইবে না। দ্বিতীয় প্রকার মালদার ঃ যাহার উপর যাকাত ওয়াজিব নহে; যেমন যাহার নিকট উপরোক্ত তিন প্রকার মাল নাই বটে, কিন্তু হাজাতে আছলিয়া অর্থাৎ, দৈনন্দিন জীবন যাপনোপযোগী আবশ্যকীয় মাল-আসবাব বাড়ীঘর ব্যতিরেকে উপরোক্ত মূল্যের অতিরিক্ত অন্য কোন মাল আছে, তাহার উপর যাকাত ওয়াজিব নহে; (কিন্তু ফেৎরা ও কোরবানী ওয়াজিব। তাহার জন্য যাকাত ফেৎরা, মান্নতের মাল, কাফ্‌ফারার মাল, জিযিয়া, কোরবানীর চামড়ার পয়সা ইত্যাদি ছদ্‌কায়ে ওয়াজিবার মাল খাওয়া জায়েয নহে।)

২। **মাসআলা ঃ** যাহার নিকট নেছাব পরিমাণ মাল নাই বরং অল্প কিছু মাল আছে কিংবা কিছুই নাই, এমনকি একদিনের খোরাকীও নাই এমন লোককে গরীব বলে। ইহাদিগকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত আছে, ইহাদের যাকাত লওয়াও দুরুস্ত আছে। অর্থাৎ গরীব উহাকে বলে, যাহার নিকট কিছু মাল সম্পত্তি আছে, কিন্তু নেছাব পর্যন্ত পৌঁছে নাই (যাকাতের নেছাবও নহে, ফেৎরা, কোরবানীর নেছাবও নহে)। কিংবা যাহার নিকট কিছুই নাই, এমন কি এক দিনের খোরাকও নাই, ইহাদিগকে যাকাত দেওয়াও দুরস্ত আছে এবং তাহাদের যাকাত লওয়াও দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** বড় বড় ডেগ, বড় বড় বিছানাপত্র বা বড় বড় শামিয়ানা, যাহা দৈনন্দিন কাজে লাগে না, বৎসরে দুই বৎসরে শাদী বিবাহের সময় কখনও কাজে লাগে; এইসব জিনিসকে হাজাতে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য করা হয় না।

৪। **মাসআলা ঃ** বসতঘর বা দালান, পরিধানের কাপড়, কামকাজ করার জন্য নওকর চাকর, বড় গৃহস্থের আসবাবপত্র, আলেম ও তালেবে-ইল্‌মের কিতাব, এই সবকে হাজাতে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য করা হয়।

৫। **মাসআলা ঃ** যাহার নিকট দশ পাঁচটি বাড়ী আছে, যাহার কেরায়া দ্বারা সে জীবিকা নির্বাহ করে, অথবা এক আধ খানা গ্রাম আছে, কিন্তু পরিবারবর্গের খরচ এত বেশী যে, তাহার আয়ের দ্বারা ব্যয় নির্বাহ হয় না ঃ বরং অনেক কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয় এবং তাহার নিকট অন্য কোন জিনিসও যাকাত বা ফেৎরা ওয়াজিব হওয়ার উপযুক্ত নাই, এমন লোককে যাকাতের পয়সা দেওয়া জায়েয আছে।

৬। **মাসআলাঃ** মনে করুন, কাহারও নিকট হাজার টাকা আছে, কিন্তু আবার হাজার টাকা বা তাহা অপেক্ষা বেশী দেনাও আছে, এরূপ লোককে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। আর যদি যত টাকা জমা আছে, দেনা তাহার চেয়ে কম হয় এবং দেনা আদায় করিয়া দিলে মালেকে নেছাব না থাকে, তবে তাহাকেও যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। যদি দেনা আদায় করিবার পর মালেকে নেছাব থাকে, তবে তাহাকে যাকাত দেওয়া বা তাহার জন্য যাকাত খাওয়া জায়েয নহে।

৭। **মাসআলাঃ** কেহ হয়ত বাড়ীতে খুব ধনী, কিন্তু বিদেশে এমন মুছিবতে পড়িয়াছে যে, বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিবার বা তথা হইতে টাকা আনাইয়া খরচ চালাইবার কোনই উপায় নাই, এইরূপ লোককে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। এইরূপে কোন লোক হজ্জ করিতে গিয়া পথিমধ্যে যদি অভাবে পড়ে, তাহাকেও যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। (এইরূপে ধনী হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অভাবে পড়ে তাহাকে "ইবনোস্‌সবীল" বলে। ইবনোস্‌সবীলকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।)

৮। **মাসআলাঃ** যাকাত অমুসলমানকে দেওয়া জায়েয নাই। যাকাত, ওশ্‌র, ফেৎরা, মান্নত, কাফ্‌ফারা ইত্যাদি ছদ্‌কায়ে ওয়াজিবার মাল মুসলমানকেই দিতে হইবে। ছদ্‌কায়ে নাফেলা অমুসলমানকেও দেওয়া জায়েয।

৯। **মাসআলাঃ** (যাকাত ইত্যাদি সর্বপ্রকার ছদ্‌কায়ে ওয়াজিবার হুকুম এই যে, কোন গরীবকে মালেক বানাইয়া দিতে হইবে।) কোন গরীবকে মালেক না বানাইয়া যদি কেহ যাকাতের পয়সা দ্বারা মসজিদ বা মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ করে বা উহার বিছানা খরিদ করে বা কোন মৃত ব্যক্তির কাফনে খরচ করে বা তাহার দেনা পরিশোধ করে, তবে যাকাত আদায় হইবে না।

১০। **মাসআলাঃ** নিজের যাকাত (সর্বপ্রকার ছদ্‌কায়ে ওয়াজিবা) নিজের মা, বাপ, দাদা, দাদী, নানা, নানী, পরদাদা ইত্যাদি অর্থাৎ, যাহাদের দ্বারা তাহার জন্ম হইয়াছে, তাহাদিগকে দেওয়া জায়েয নহে। এইরূপ ছেলে, মেয়ে, পোতা, পুতী, নাতি, নাত্‌নী এবং উহাদের বংশধরগণ যাহারা তাহার ঔরসে জন্মিয়াছে তাহাদিগকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। স্বামী নিজের স্ত্রীকে বা স্ত্রী নিজে স্বামীকেও যাকাত দিতে পারিবে না।

১১। **মাসআলাঃ** এতদ্ব্যতীত চাচা, মামু, খালা, ভাই, ভগ্নী, ফুফু, ভাগিনেয়, ভাতিজা, সতাল মা, শাশুড়ী ইত্যাদি রেশ্‌তাদারগণকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

১২। **মাসআলাঃ** না-বালেগ সন্তানের বাপ যদি মালদার হয়, তবে ঐ না-বালেগ সন্তানকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। বালেগ সন্তান যদি নিজে মালদার না হয়, তবে শুধু তাহার বাপ মালদার হওয়ায় তাহাকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত হইবে।

১৩। **মাসআলাঃ** না-বালেগ সন্তানের বাপ মালদার নহে; কিন্তু মা মালদার, তবে তাহাদের ঐ না-বালেগ সন্তানকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত হইবে।

১৪। **মাসআলাঃ** সাইয়্যেদকে (মা ফাতেমার বংশধরকে), হযরত আলীর বংশধরকে, এরূপে যাহারা হযরত আব্বাছ, হযরত জাফর (রাঃ), হযরত আক্বীল, হযরত হারেস ইব্‌নে আবদুল মোত্তালেব প্রমুখদের বংশধর তাহাদিগকে যাকাত দেওয়া দরুস্ত নাই এবং ওয়াজিব ছদ্‌কাও দেওয়া জায়েয নাই। যেমন, মান্নত, কাফ্‌ফারা, ছদ্‌কায়ে ফেৎর। এবদ্ব্যতীত অন্যান্য ছদ্‌কা খয়রাত দান করা দুরুস্ত আছে।

১৫। মাসআলাঃ বাড়ীর চাকর বা চাকরানীকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত আছে, কিন্তু বেতনের মধ্যে গণ্য করিয়া দিলে যাকাত আদায় হইবে না। অবশ্য ধার্য বেতন দেওয়ার পর বখশিশ স্বরূপ যদি দেয় এবং মনে যাকাতের নিয়ত রাখে, তবে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

১৬। মাসআলাঃ দুধ-মাকে বা দুধ-ছেলেকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

১৭। মাসআলা কোন মেয়েলোকের এক হাজার টাকা মহর আছে, কিন্তু তাহার স্বামী গরীব, মহরের টাকা দিবার মত শক্তি তাহার নাই, অথবা শক্তি আছে কিন্তু তলব করা সত্ত্বেও দেয় না, অথবা মেয়েলোকটি তাহার মহ্‌রের টাকা সম্পূর্ণ মা'ফ করিয়া দিয়াছে, (এতদ্ব্যতীত জেওরপাতি বা অন্য কোন দিক দিয়াও সে মালদার নহে) এরূপ মেয়েলোককে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। অবশ্য যদি স্বামী ধনী হয় এবং মহ্‌রের টাকা তলব করিলে দেয়, তবে ঐ মেয়েলোককে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত নহে।

১৮। মাসআলাঃ যাকাতের মুস্তাহেক (লওয়ার যোগ্য) মনে করিয়া যদি কোন এক অপরিচিত লোককে যাকাত দেওয়ার পর জানা যায় যে, সে যাকাতের মুস্তাহেক নহে সাইয়্যেদ বা মালদার, কিংবা অন্ধকার রাত্রে যাকাত দেওয়ার পর জানিতে পারিল যে, সে তাহার মা, মেয়ে বা নিজের এমন কোন রেশ্‌তাদার, যাহাকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত নহে, তবে তাহার যাকাত আদায় হইয়া যাইবে, (কিন্তু যে নিয়াছে তাহার জন্য ঐ পয়সা হালাল হইবে না;) যদি সে জানিতে পারে যে, ইহা যাকাতের পয়সা, তবে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হইবে। এইরূপে অপরিচিত লোককে দেওয়ার পর যদি জানা যায় যে, যাহাকে যাকাত দেওয়া হইয়াছে সে মুসলমান নহে—কাফের, তবে যাকাত আদায় হইবে না পুনরায় দিতে হইবে।

১৯। মাসআলাঃ যদি কাহারও উপর সন্দেহ হয়, সে হয়ত মালদার হইতে পারে, তবে সন্দেহের পাত্রকে যাকাত দিবে না। বাস্তবিক অভাবগ্রস্ত কি না তাহা জানিয়া তারপর যাকাত দিবে। সত্যই অভাবগ্রস্ত কি না, তাহা না জানিয়া যদি কোন সন্দেহের পাত্রকে যাকাত দেওয়া হয় এবং দেলে গাওয়াহী দেয় যে, সে অভাবগ্রস্ত, তবে যাকাত আদায় হইয়া গিয়াছে। আর যদি দেলে গাওয়াহী দেয় যে, সে মালদার, তবে যাকাত আদায় হইবে না; আবার যাকাত দিতে হইবে। আর যদি দেওয়ার পর জানা গিয়া থাকে যে, বাস্তবিক পক্ষে সে গরীব ছিল, তবুও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

২০। মাসআলাঃ যাকাত দিবার সময় আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে করিবে এবং তাহাদিগকে দিবে। কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দিবার সময় যাকাতের কথা শুধু মনে মনে নিয়ত করিবে, তাহাদের সামনে যাকাতের কথা উল্লেখ করিবে না। কারণ হয়ত লজ্জা পাইতে পারে। হাদীস শরীফে আছে, 'নিজের আত্মীয়কে খয়রাত দিলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। একে ত খয়রাতের সওয়াব, দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়ের উপকার ও অভাব মোচন করার সওয়াব। নিজের আত্মীয়দের অভাব মোচনের পর যাহা বাকী থাকিবে, তাহা অন্য লোককে দিবে।

২১। মাসআলাঃ এক শহরের যাকাত অন্য শহরে পাঠান মাকরূহ্‌। কিন্তু যদি নিজের অভাবগ্রস্ত কোন আত্মীয় অন্য শহরে থাকে, অথবা অন্য শহরের লোক এ শহর অপেক্ষা বেশী অভাবগ্রস্ত হয়, অথবা অন্য শহরে দ্বীন ইসলামের খেদমত বেশী হয়, তবে তথায় পাঠাইয়া দেওয়া মকরূহ্‌ নহে। কেননা, যাকাত খয়রাতের দ্বারা তালেবে এল্‌মগণের এবং দ্বীনী খাদেম আলেমগণের সাহায্য করাতে অনেক বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।

[**মাসআলা ঃ** যাকাত-খয়রাত দেওয়ার সময় বেশী সওয়াব তালাশ করিলে এই কয়টি জিনিসের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। (১) তাকওয়া-পরহেযগারী কাহার মধ্যে বেশী আছে? (২) অভাবগ্রস্ত বেশী কে? (৩) দ্বীন-ইসলামের উপকার কাহার দ্বারা বেশী হয়?]

কোরবানী

কোরবানী করিলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোরবানীর সময় আল্লাহ্‌র নিকট কোরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোন জিনিস নাই। কোরবানীর সময় কোরবানীই সবচেয়ে বড় ইবাদত। কোরবানী যবাহ্ করিবার সময় প্রথম যে রক্তের ফোটা পড়ে, তাহা মাটি পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই কোরবানী আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হইয়া যায়। সুতরাং একান্ত ভক্তি ও আন্তরিক আগ্রহের সহিত খুব ভাল জানওয়ার দেখিয়া কোরবানী করিবে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'কোরবানীর জানওয়ারের যত পশম থাকে প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে এক একটি নেকী লেখা হয়।'

সোব্‌হানাল্লাহ্! একটু চিন্তা করিয়া দেখ, ইহা অপেক্ষা বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? একটি কোরবানী করিয়া কত হাজার নেকী পাওয়া যায়। একটি কোরবানী বকরীর গায়ের পশম সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গণিয়াও শেষ করা যায় না। একটি কোরবানী করিলে এত নেকী। অতএব, কেহ যদি মালদার এবং ছাহেবে-নেছাব না-ও হয়, তবুও সওয়াবের আশায় তাহার কোরবানী করা উচিত। কেননা, এই সময় চলিয়া গেলে এত অল্প আয়াসে এত অধিক নেকী অর্জনের আর কোন সুযোগ নাই। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা ধনী বানাইয়া থাকেন, তবে নিজের কোরবানীর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মৃত মা, বাপ, পীর, ওস্তাদ প্রভৃতির পক্ষ হইতেও কোরবানী করা উচিত। যেন তাহাদের রূহে সওয়াব পৌঁছিয়া যায়। হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার বিবি ছাহেবানের (আমাদের মাতাগণের) এবং নিজ পীর প্রমুখের পক্ষ হইতেও কোরবানী করিতে পারিলে অতি ভাল। তাঁহাদের রূহ এই সওয়াব পাইয়া অত্যন্ত খুশী হয়। যাহা হউক, অতিরিক্ত করা নফল, কিন্তু নিজ ওয়াজিব রীতিমত আদায় করিতে কিছুতেই ত্রুটি করিবে না। কারণ আল্লাহ্‌র অগণিত নেয়ামতরাশি অহরহ ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁহারই আদেশ, তাঁহারই উদ্দেশ্যে এতটুকু কোরবানী যে না করিতে পারে তাহার চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে? গোনাহ্‌র কথা স্বতন্ত্র।

কোরবানী করিবার নিয়ম

কোরবানীর জন্তুকে কেব্‌লা রোখ করিয়া শোয়াইয়া প্রথমে এই দো'আটি পড়িবেনঃ

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ○ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ○ لَاشَرِیْکَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ـ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ○

এই দো'আ পড়িয়া بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَکْبَرُ 'বিছমিল্লাহে আল্লাহু আকবর' বলিয়া যবাহ্ করিবে। যবাহ্ করার পর বলিবেঃ

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ کَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِیْلِكَ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ○

(যদি নিজের কোরবানী হয়, তবে مِنِّى বলিবে। আর যদি অন্যের কোরবানী হয়, তবে مِنْ শব্দের পর যাহার বা যাহাদের কোরবানী তাহার বা তাহাদের নাম উল্লেখ করিবে। আর যদি অন্যের সংগে শরীক হয়, তবে مِنِّى ও বলিবে এবং مِنِّى এর পর مِنْ শব্দ লাগাইয়া তাহার পর অন্যদের নাম উল্লেখ করিবে।)

১। মাসআলা ঃ যাহার উপর ছদকা ফেৎর ওয়াজিব তাহার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব। (অর্থাৎ, ১০ই যিল্‌হজ্জের ফজর হইতে ১২ই যিল্‌হজ্জের সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন সময় যদি মালেকে নেছাব হয়, তবে তাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব হইবে।) যে মালদার নহে তাহার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও যদি করিতে পারে, তবে অনেক সওয়াব পাইবে।

২। মাসআলা ঃ মুছাফিরের উপর (মুছাফিরী হালাতে) কোরবানী ওয়াজিব নহে।

৩। মাসআলা ঃ১০ই যিল্‌হজ্জ হইতে ১২ই যিল্‌হজ্জের সন্ধ্যা পর্যন্ত এই তিন দিন কোরবানী করার সময়। এই তিন দিনের যে দিন ইচ্ছা সেই দিনই কোরবানী করিতে পারা যায় ; কিন্তু প্রথম দিন সর্বাপেক্ষা উত্তম, তারপর দ্বিতীয় দিন তারপর তৃতীয় দিন।

৪। মাসআলা ঃ বক্‌রা ঈদের নামাযের আগে কোরবানী করা দুরুস্ত নহে। ঈদের নামাযের পর কোরবানী করিবে। অবশ্য যে স্থানে ঈদের নামায বা জুমু'আর নামায দুরুস্ত নহে, সে স্থানে ১০ই যিল্‌হজ্জ ফজরের পরও কোরবানী করা দুরুস্ত আছে।

৫। মাসআলা ঃ কোন শহরবাসী যদি নিজের কোরবানীর জীব এমন স্থানে পাঠায় যেখানে জুমু'আ ও ঈদের নামায জায়েয নাই, তবে তথায় ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করা দুরুস্ত আছে, যদিও সে নিজের শহরে থাকে। যবাহ্ করার পর তথা হইতে গোশ্‌ত আনাইয়া খাইতে পারে।

৬। মাসআলা ঃ ১২ই যিল্‌হজ্জ সূর্য অস্ত যাইবার পূর্ব পর্যন্ত কোরবানী করা দুরুস্ত আছে, সূর্য অস্ত গেলে আর কোরবানী দুরুস্ত নহে।

৭। মাসআলা ঃ কোরবানীর তিন দিনের মধ্যে যে দুইটি রাত্র পড়ে সেই দুই রাত্রেও কোরবানী করা জায়েয আছে, কিন্তু রাত্রের বেলায় যবাহ্ করা ভাল নয়। কেননা, হয়ত কোন একটি রগ কাটা না যাইতে পারে ফলে কোরবানী দুরুস্ত হইবে না।

৮। মাসআলা ঃ কেহ ১০ই এবং ১১ই তারিখে ছফরে ছিল বা গরীব ছিল, ১২ই তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে বাড়ী আসিয়াছে বা মালদার হইয়াছে, বা কোথায়ও ১৫ দিন থাকার নিয়ত করিয়াছে, এরূপ অবস্থায় তাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব হইবে।

৯। মাসআলা ঃ নিজের কোরবানীর জানওয়ার নিজ হাতেই যবাহ্ করা মুস্তাহাব। যদি নিজে যবাহ্ করিতে না পারে, তবে অন্যের দ্বারা যবাহ্ করাইবে, কিন্তু নিজে সামনে দাঁড়াইয়া থাকা ভাল। মেয়েলোক পর্দার ব্যাঘাত হয় বলিয়া যদি সামনে উপস্থিত না থাকিতে পারে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

১০। মাসআলা ঃ কোরবানী করার সময় মুখে নিয়ত করা ও দো'আ উচ্চারণ করা যরূরী নহে। যদি শুধু দেলে চিন্তা করিয়া নিয়ত করিয়া মুখে শুধু 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলিয়া যবাহ্ করে, তবুও কোরবানী দুরুস্ত হইবে। কিন্তু স্মরণ থাকিলেও উক্ত দো'আ দুইটি পড়া অতি উত্তম।

১১। মাসআলাঃ কোরবানী শুধু নিজের তরফ হইতে ওয়াজিব হয়। এমন কি না-বালেগ সন্তান যদি মালদার হয়, তবুও তাহাদের উপর কোরবানী ওয়াজিব নহে এবং মা-বাপের উপরও ওয়াজিব নহে। যদি কেহ সন্তানের পক্ষ হইতেও কোরবানী করিতে চাহে, তবে তাহা নফল কোরবানী হইবে। কিন্তু না-বালেগের মাল হইতে কিছুতেই কেরাবানী করিবে না।

১২। মাসআলাঃ বকরী, পাঠা, খাসী, ভেড়া, দুম্বা, গাভী, ষাঁড়, বলদ, মহিষ, উট, এই কয় প্রকার গৃহপালিত জন্তুর কোরবানী করা দুরুস্ত আছে। এতদ্ব্যতীত হরিণ ইত্যাদি অন্যান্য হালাল বন্য জন্তুর দ্বারা কোরবানী আদায় হইবে না।

১৩। মাসআলাঃ গরু, মহিষ এবং উট এই তিন প্রকার জানওয়ারের এক একটি জানওয়ার এক হইতে সাত জন পর্যন্ত শরীক হইয়া কোরবানী করিতে পারে। তবে কোরবানী দুরুস্ত হইবার জন্য শর্ত এই যে, কাহারও অংশ যেন সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম না হয় এবং কাহারও যেন শুধু গোশ্ত খাইবার নিয়ত না হয়, সকলেরই যেন কোরবানীর নিয়ত থাকে; অবশ্য যদি কাহারও আক্বীকার নিয়ত হয়, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু যদি মাত্র একজনেরও শুধু গোশ্ত খাওয়ার নিয়ত হয়, কোরবানী বা আক্বীক্বার নিয়ত না হয়, তবে কাহারও কোরবানী দুরুস্ত হইবে না। এইরূপ যদি মাত্র একজনের অংশ সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হয়, তবে সকলের কোরবানী নষ্ট হইয়া যাইবে।

১৪। মাসআলাঃ যদি একটি গরুতে সাত জনের কম ৫/৬ জন শরীক হয় এবং কাহারও অংশ সপ্তমাংশ হইতে কম না হয়; (যেমন—৭০ টাকা দিয়া গরু কিনিল কাহারও অংশে যেন দশ টাকার কম না হয়) তবে সকলের কোরবানী দুরুস্ত হইবে। আর যদি আট জন শরীক হয়, তবে কাহারও কোরবানী ছহীহ্ হইবে না।

১৫। মাসআলাঃ যদি গরু খরিদ করিবার পূর্বেই সাত জন ভাগী হইয়া সকলে মিলিয়া খরিদ করে, তবে ত তাহা অতি উত্তম, আর যদি কেহ একা একটি গরু কোরবানীর জন্য খরিদ করে এবং মনে মনে এই এরাদা রাখে যে, পরে আরও লোক শরীক করিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া একত্র হইয়া কোরবানী করিব, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু যদি গরু কিনিবার সময় অন্যকে শরীক করিবার এরাদা না থাকে, একা একাই কোরবানী করিবার নিয়ত থাকে, পরে অন্যকে শরীক করিতে চায়, (কিন্তু ইহা ভাল নহে) এমতাবস্থায় যদি ঐ ক্রেতা গরীব হয় এবং তাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব না হয়, তবে পরে সে অন্য কাহাকেও শরীক করিতে পারিবে না, একা একাই গরুটি কোরবানী করিতে হইবে। আর যদি ঐ ক্রেতা মালদার হয় এবং তাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব হয়, তবে ইচ্ছা করিলে পরে অন্য শরীকও মিলাইতে পারে। (কিন্তু নেক কাজের নিয়ত বদলান ভাল নয়।)

১৬। মাসআলাঃ যদি কোরবানীর জীব হারাইয়া যায় ও তৎপরিবর্তে অন্য একটি খরিদ করে প্রথম জীবটিও পাওয়া যায়, এমতাবস্থায় যদি ক্রেতা মালদার হয়, তবে একটি জীব কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে। যদি লোকটি গরীব, হয়, তবে উভয় জীব কোরবানী করা তাহার উপর ওয়াজিব।

(**মাসআলাঃ** কোরবানীর জানওয়ার ক্রয় করার পর যদি তাহার বাচ্চা পয়দা হয়, তবে ঐ বাচ্চাও কোরবানী করিয়া গরীব-মিসকীনদিগকে দিয়া দিবে, নিজে খাইবে না। যবাহ্ না করিয়া গরীবকে দান করিয়া দেওয়াও জায়েয।)

১৭। মাসআলাঃ সাতজনে শরীক হইয়া যদি একটি গরু কোরবানী করে, তবে গোশ্‌ত আন্দাজে ভাগ করিবে না। পাল্লা দ্বারা মাপিয়া সমান সমান ভাগ করিবে; অন্যথায় যদি ভাগের মধ্যে কিছু বেশকম হইয়া যায়, তবে সুদ হইয়া যাইবে এবং গোনাহ্‌গার হইতে হইবে। অবশ্য যদি গোশ্‌তের সঙ্গে মাথা, পায়া এবং চামড়াও ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, তবে যে ভাগে মাথা পায়া বা চামড়া থাকিবে, সে ভাগে গোশ্‌ত কম হইলে দুরুস্ত হইবে, যত কমই হউক। কিন্তু যে ভাগে গোশ্‌ত বেশী সে ভাগে মাথা, পায়া বা চামড়া দিলে সুদ হইবে এবং গোনাহ্ হইবে।

১৮। মাসআলাঃ বকরী পূর্ণ এক বৎসরের কম বয়সের হইলে দুরুস্ত হইবে না। এক বৎসর পুরা হইলে দুরুস্ত হইবে। গরু, মহিষ দুই বৎসরের কম হইলে কোরবানী দুরুস্ত হইবে না। পূর্ণ দুই বৎসরের হইলে দুরুস্ত হইবে। উট পাঁচ বৎসরের কম হইলে দুরুস্ত হইবে না। দুম্বা এবং ভেড়ার হুকুম বকরীর মত; কিন্তু ছয় মাসের বেশী বয়সের দুম্বার বাচ্চা যদি এরূপ মোটা তাজা হয় যে, এক বৎসরের দুম্বার মধ্যে ছাড়িয়া দিলে চিনা যায় না, তবে সেরূপ দুম্বার বাচ্চার কোরবানী জায়েয আছে, অন্যথায় নহে! কিন্তু বকরীর বাচ্চা যদি এরূপ মোটা তাজাও হয়, তবুও এক বৎসর পূর্ণ না হইলে কোরবানী দুরুস্ত হইবে না।

১৯। মাসআলাঃ যে জন্তুর দুইটি চোখ অন্ধ, অথবা একটি চোখ পূর্ণ অন্ধ বা একটি চোখের তিন ভাগের এক ভাগ বা আরও বেশী দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে জন্তুর কোরবানী দুরুস্ত নহেঃ এইরূপ যে জন্তুর একটি কানের বা লেজের এক তৃতীয়াংশ বা তদপেক্ষা বেশী কাটিয়া গিয়াছে সে জন্তুরও কোরবানী দুরুস্ত নহে।

২০। মাসআলাঃ যে জন্তু এমন খোঁড়া যে, মাত্র তিন পায়ের উপর ভর দিয়া চলে, চতুর্থ পা মাটিতে লাগেই না, অথবা মাটিতে লাগে বটে, কিন্তু তাহার উপর ভর দিতে পারে না, এরূপ জন্তুর কোরবানী দুরুস্ত নহে। আর যদি খোঁড়া পায়ের উপর ভর দিয়া খোঁড়াইয়া চলে, তবে সে জন্তুর কোরবানী জায়েয আছে।

২১। মাসআলাঃ জীবটি যদি এমন কৃশ ও শুষ্ক হয় যে, তাহার হাড়ের মধ্যের মগজও শুকাইয়া গিয়া থাকে, তবে সে জন্তুর কোরবানী দুরুস্ত নহে; হাড়ের ভিতরের মগজ যদি না শুকাইয়া থাকে, তবে কোরবানী জায়েয আছে।

২২। মাসআলাঃ যে জানওয়ারের একটি দাঁতও নাই, সে জানওয়ারের কোরবানী দুরুস্ত নহে; আর যতগুলি দাঁত পড়িয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা যদি অধিকসংখ্যক দাঁত বাকী থাকে, তবে কোরবানী দুরুস্ত আছে।

২৩। মাসআলাঃ যে জন্তুর কান জন্ম হইতে নাই, তাহার কোরবানী দুরুস্ত নহে। কান হইয়াছে কিন্তু অতি ছোট, তবে তাহার কোরবানী দুরুস্ত আছে।

২৪। মাসআলাঃ যে জন্তুর শিংই উঠে নাই বা শিং উঠিয়াছিল, কিন্তু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার কোরবানী জায়েয আছে। অবশ্য যদি একেবারে মূল হইতে ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কোরবানী জায়েয নহে।

২৫। মাসআলাঃ যে জন্তুকে খাসী বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার কোরবানী দুরুস্ত আছে। এইরূপে যে জন্তুর গায়ে বা কাঁধে দাদ বা খুজলি হইয়াছে তাহার কোরবানীও জায়েয আছে। অবশ্য খুজলির কারণে যদি জন্তু একেবারে কৃশ হইয়া থাকে, তবে তাহার কোরবানী দুরুস্ত নহে।

২৬। মাসআলা ঃ ভাল জন্তু ক্রয় করার পর যদি এমন কোন আয়েব হইয়া যায়, যে কারণে কোরবানী দুরুস্ত হয় না, তবে ঐ জন্তুটি রাখিয়া অন্য একটি জন্তু কিনিয়া কোরাবানী করিতে হইবে। অবশ্য যাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব নহে, নিজেই আগ্রহ করিয়া কোরবানী করার জন্য কিনিয়াছে, সে ঐটিই কোরবানী করিয়া দিবে, অন্য একটি কেনার দরকার নাই।

২৭। মাসআলা ঃ কোরবানীর গোশ্‌ত নিজে খাইবে, নিজের পরিবারবর্গকে খাওয়াইবে। আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া তোহ্‌ফা দিবে এবং গরীব মিসকীনদিগকে খয়রাত দিবে। মুস্তাহাব তরীকা এই যে, তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ গরীবদিগকে দান করিবে। যদি কেহ সামান্য দান করে, তবে গোনাহ্ হইবে না।

২৮। মাসআলা ঃ কোরবানীর চামড়া এমনিই খয়রাত করিয়া দিবে। কিন্তু যদি চামড়া বিক্রয় করে, তবে ঠিক ঐ পয়সাই গরীবকে দান করিতে হইবে। ঐ পয়সা নিজে খরচ করিয়া যদি অন্য পয়সা দান করে, তবে আদায় হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু অন্যায় হইবে।

২৯। মাসআলা ঃ কোরবানীর চামড়ার দাম মসজিদ মেরামত বা অন্য কোন নেক কাজে খরচ করা দুরুস্ত নাই, খয়রাত করিতে হইবে।

৩০। মাসআলা ঃ যদি চামড়া নিজের কাজে ব্যবহার করে যেমন, চালুন, মশক, ডোল বা জায়নামায তৈয়ার করে, তবে ইহাও দুরুস্ত আছে।

৩১। মাসআলা ঃ কোরবানীর জীব যবাহ্‌কারী ও গোশ্‌ত প্রস্তুতকারীর পারিশ্রমিক পৃথকভাবে দিবে, কোরবানীর গোশ্‌ত চামড়া, কল্লা বা পায়ার দ্বারা দিবে না।

৩২। মাসআলা ঃ কোরবানীর জীবে যদি কোন পোশাক থাকে, তবে উহা এবং দড়ি ইত্যাদি গরীবদিগকে দান করিয়া দিবে, নিজের কাজে লাগাইবে না।

৩৩। মাসআলা ঃ গরীবের কোরবানী ওয়াজিব নহে বটে, কিন্তু যদি কোরবানীর নিয়ত করিয়া জানওয়ার খরিদ করে, তবে তাহার নিয়তের কারণে সেই জানওয়ার কোরবানী করা তাহার উপর ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

৩৪। মাসআলা ঃ কাহারও কোরবানী ওয়াজিব ছিল, কিন্তু কোরবানীর তিনটি দিনই গত হইল অথচ কোরবানী করিল না। এমতাবস্থায় একটি বকরী বা ভেড়ার মূল্য খয়রাত করিয়া দিবে। আর যদি বকরী খরিদ করিয়া থাকে, তবে হুবহু ঐ বকরীটিই খয়রাত করিবে।

৩৫। মাসআলা ঃ যদি কেহ কোরবানীর মান্নত মানে এবং যে মকছুদের জন্য মানিয়াছিল সে মকছুদ পূর্ণ হয়, তবে গরীব হউক বা মালদার হউক, তাহার উপর ঐ কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু মান্নতের কোরবানীর গোশ্‌ত গরীব মিস্‌কীনের হক হইবে, নিজে খাইতে পারিবে না। যদি নিজে খায় বা কোন মালদারকে দেয়, তবে যে পরিমাণ খাইয়াছে বা মালদারকে দিয়াছে সেই পরিমাণ পুনরায় গরীবদিগকে দান করিতে হইবে।

৩৬। মাসআলা ঃ যদি নিজের খুশীতে কোন মৃতকে সওয়াব পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে কোরবানী করে, তবে তাহা দুরুস্ত আছে এবং ঐ গোশ্‌ত নিজেও খাইতে পারিবে এবং যাহাকে ইচ্ছা দিতেও পারিবে।

৩৭। মাসআলা ঃ কিন্তু যদি কোন মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে কোরবানীর জন্য অছিঅত করিয়া গিয়া থাকে, তবে সেই কোরবানীর গোশ্‌ত সমস্তই খয়রাত করা ওয়াজিব হইবে।

৩৮। মাসআলাঃ কাহারও অনুপস্থিতিতে যদি অন্য কেহ তাহার পক্ষ হইতে তাহার বিনা অনুমতিতে কোরবানী করে, তবে কোরবানী ছহীহ্ হইবে না। আর যদি কোন জীবের মধ্যে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ তাহার বিনানুমতিতে সাব্যস্ত করে, তবে অন্যান্য অংশীদারের কোরবানীও ছহীহ্ হইবে না।

৩৯। মাসআলাঃ যদি কোন গরু ছাগল কাহারও নিকট ভাগী বা রাখালী দেওয়া হয় এবং তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া কেহ কোরবানী করে, তবে তাহার কোরবানী দুরুস্ত হইবে না; ভাগীদার জীবের মালিক হয় না। আসল মালিকই প্রকৃত মালিক। আসল মালিকের নিকট হইতে ক্রয় করিলে তবে দুরুস্ত হইবে।

৪০। মাসআলাঃ যদি একটি গরু কয়েক জনে মিলিয়া কোরবানী করে এবং প্রত্যেকেরই গরীব-মিসকীনদিগকে বিলাইয়া দেওয়ার বা পাকাইয়া খাওয়াইবার নিয়ত হয়, তবে ইহাও জায়েয আছে। অবশ্য যদি ভাগ করিতে হয়, তবে দাঁড়ি পাল্লা দ্বারা সমান ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

৪১। মাসআলাঃ কোরবানীর চামড়ার পয়সা পারিশ্রমিকস্বরূপ দেওয়া জায়েয নহে। কেননা, উহা খয়রাত করিয়া দেওয়া যরূরী।

৪২। মাসআলাঃ কোরবানীর গোশ্‌ত কাফেরদিগকেও দান করা জায়েয আছে। কিন্তু মজুরিস্বরূপ দেওয়া জায়েয নাই।

মাসআলাঃ গর্ভবতী জন্তু কোরবানী করা জায়েয আছে। যদি পেটের বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায়, তবে সে বাচ্চাও যবাহ্ করিয়া দিবে।

আক্বীক্বা

১। মাসআলাঃ ছেলে বা মেয়ে জন্মিলে উত্তম এই যে, সপ্তম দিবসে তাহার নাম রাখিবে এবং আক্বীক্বা করিবে। ইহাতে সন্তানের বালা মুছীবত দূর হয় এবং যাবতীয় আপদ হইতে নিরাপদ থাকে।

২। মাসআলাঃ ছেলে হইলে আক্বীক্বায় দুইটি বকরী বা দুইটি ভেড়া আর মেয়ে হইলে একটি বকরী বা একটি ভেড়া যবাহ্ করিবে। কিংবা কোরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই অংশ আর মেয়ের জন্য এক অংশ লইবে। সন্তানের মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলিবে এবং চুলের ওযনে রূপা বা সোনা খয়রাত করিয়া দিবে। ইচ্ছা করিলে ছেলের মাথায় জাফরান লাগাইয়া দিবে।

৩। মাসআলাঃ জন্মের সপ্তম দিবসে আক্বীক্বা করা মুস্তাহাব; যদি সপ্তম দিবসে না করিতে পারে, তবে যখনই করুক না কেন, যে বারে সন্তান পয়দা হইয়াছে তাহার আগের দিন করিবে। যেমন, শুক্রবার সন্তান হইয়া থাকিলে বৃহস্পতিবার সপ্তম দিবস পড়িবে। বৃহস্পতিবারে জন্মিলে বুধবারে আক্বীক্বা করিবে।

৪। মাসআলাঃ জন্মের সপ্তম দিবসে ৪টি কাজ। নাম রাখা, মাথা কামান, চুলের ওযনে স্বর্ণ-রৌপ্য দান করা এবং আক্বীক্বার জীব যবাহ্ করা। ইহার যে কোনটি আগে পরে হইলেও দোষ নাই। মাথা মুড়ানের জন্য খুর মাথায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে আক্বীক্বার জীব যবাহ্ করিতে হইবে, ইহা বেহুদা রসম।

৫। মাসআলাঃ যে জন্তুর কোরবানী দুরুস্ত হয় না তাহার দ্বারা আক্বীক্বা করাও দুরুস্ত নাই। যে জন্তুর দ্বারা কোরবানী দুরুস্ত তাহার দ্বারা আক্বীক্বাও দুরুস্ত।

৬। **মাসআলাঃ** আক্বীক্বার গোশ্‌ত কাঁচা ভাগ করিয়া দেওয়া, কিংবা পাকাইয়া ভাগ করিয়া দেওয়া, বা দাওয়াত করিয়া খাওয়ান সবই জায়েয।

৭। **মাসআলাঃ** তওফীক না হইলে ছেলের পক্ষ হইতে একটি বকরী দ্বারা আক্বীক্বা করা জায়েয আছে। আর আক্বীক্বা না করিলেও কোন দোষ নাই।

দান-খয়রাতের ফযীলত

১। **হাদীসঃ** 'দানশীলতা অর্থাৎ, সাখাওয়াত আল্লাহ্‌র স্বভাব' অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা অতি বড় দাতা ও দয়ালু। —এবনুন্নাজ্জার

২। **হাদীসঃ** বন্দা রুটির একখানি টুক্‌রা (এক মুষ্টি চাউল বা ভাত) দান করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহা সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করেন এবং উহাকে অনবরত বাড়াইতে থাকেন। এমন কি, এক টুক্‌রা রুটি ওহোদ পাহাড়ের সমান হইয়া যায়। অর্থাৎ, ওহোদ পাহাড়ের সমান রুটি দান করিলে যত সওয়াব হইবে, খালেছ নিয়তে এক টুক্‌রা রুটি দান করিলেও আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া তত সওয়াব দান করিবেন। কাজেই কম বেশির প্রতি লক্ষ্য করিবে না, যাহা সম্ভব হয় দান করিবে।

৩। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমরা খোরমার একটি টুক্‌রা দান করিয়া হইলেও তদ্দ্বারা দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা কর।' অর্থাৎ, অল্প জিনিস বলিয়া তুচ্ছ করিও না, যখন যাহা থাকে তাহাই দান কর। নিয়ত ঠিক হইলে অল্প জিনিসেও দোযখ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। —কান্‌যোল উম্মাল

৪। **হাদীসঃ** তোমরা ছদকা খয়রাত দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট রুযির বরকত তালাশ কর। (দানের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা রুযিতে বরকত দিয়া থাকেন।)

৫। **হাদীসঃ** পরোপকারিতা লোককে ধ্বংস হইতে বাঁচায় এবং গোপন দান করা আল্লাহ্‌র গযব হইতে বাঁচায় এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার লোকের আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দেয়। নেক কাজ করিতে দেখিলে যদি অন্যের উৎসাহ হয়, তবে এমন স্থলে নেক কাজ প্রকাশ্যে করা ভাল। যেখানে এই আশা না হয়, সেখানে গোপনে করাই ভাল, যদি প্রকাশ্যে দান করার কোন কারণ না থাকে। —তব্‌রানী

৬। **হাদীসঃ** সায়েল যদি ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া আসে, তবুও তাহার হক আছে। (অর্থাৎ অভাব শুধু যে গরীব লোকের হইতে পারে তাহা নহে, সম্মানী লোকেরও অভাব হইতে পারে। অতএব, কোন সম্মানী লোক অভাবে পড়িয়া যদি শাল গায়ে দিয়া বা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াও তোমার দ্বারে উপস্থিত হয়, তবুও যথাসম্ভব তাহার সাহায্য কর। কেননা, সম্মানী লোক একান্ত ঠেকা না হইলে নিজের অভাব অন্যের কাছে জ্ঞাপন করিতে পারে না; কাজেই তাহার ঠেকা চালাইয়া দেওয়া দরকার। কিন্তু আজকাল অনেক ঠকবাজ বাহির হইয়াছে, অনেকে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা বানাইয়া নিয়াছে, অনেকে কাজ করাকে অপমান মনে করিয়া রোযগারের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বেশী আয়ের উদ্দেশ্যে নির্লজ্জভাবে ভিক্ষা করিতে বাহির হয়। যদি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, সায়েল এই প্রকারের, তবে তাহার জন্য সওয়াল করা এবং তাহার এই পাপ কার্যে সহায়তা করাও হারাম।) —কান্‌যোল উম্মাল

৭। **হাদীসঃ** আল্লাহ্ তা'আলা দানশীল, তিনি দানশীলতা পছন্দ করেন, উন্নত স্বভাবকে ভালবাসেন। অর্থাৎ সাহসিকতার নেক কাজগুলি যেমন দান খয়রাত করা, যিল্লতির কাজ হইতে

বাঁচিয়া থাকা, অন্যের উপকারার্থে নিজে কষ্ট সহ্য করা ইত্যাদি এবং নীচ স্বভাবকে অপছন্দ করেন। যেমন—দ্বীনের কাজে দুর্বলতা। —হাকেম

৮। হাদীসঃ 'নিশ্চয়ই দান খয়রাত কবরের আযাব হইতে রক্ষা করিবে। নিশ্চয় হাশরের ময়দানে দানশীল মুসলমান দান খয়রাতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।' অর্থাৎ ছদকার বরকতে কবর-আযাব দূর হয়, কিয়ামতের দিন ছায়া পাওয়া যায়।

৯। হাদীসঃ বাস্তবিক আল্লাহ্‌র কতিপয় বিশিষ্ট বান্দা আছেন যাঁহাদিগকে তিনি মানবের অভাব মোচনের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। মানুষ নিজ প্রয়োজনে তাহাদের কাছে যাইতে বাধ্য হয়। আল্লাহ্ পাক মানুষের উপকারের জন্য তাহাদিগকে বাছিয়া লইয়াছেন। এই অভাব পূরণকারীগণ আল্লাহ্‌র আযাব হইতে নিরাপদ থাকিবেন।

১০। হাদীসঃ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলালকে বলিলেনঃ 'হে বেলাল! দান কর এবং (শয়তান গরীব হওয়ার ওসওসা দিলে) আরশের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের অফুরন্ত ভান্ডার কমিয়া যাওয়ার ভয় করিও না। যাহাদের ঈমান কমজোর, অভাবে পড়িলে অভাবের যাতনা সহ্য করিতে পারিবে না, পেরেশান হইয়া ঈমান নষ্ট করিয়া ফেলিবে, তাহাদের সব খরচ করা উচিত নহে; বরং তাহারা শুধু যরূরী যাকাত-খয়রাত এবং আবশ্যকীয় খরচ করিয়া সম্ভব হইলে কিছু পুঁজি হাতে রাখিবে। আর যাঁহাদের ঈমান পাকা, অভাবের যাতনায় কখনও মন টলমল হয় না, তাঁহারা হকদারের হক বা পরিবারবর্গের হক নষ্ট না করিয়া সব দান করিয়া দিতে পারেন। যাঁহাদের ঈমান খুব মজবুত তাঁহাদের অকাট্য বিশ্বাস আছে যে, যাহা কিস্‌মতে আছে তাহা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে এবং যাহা কিস্‌মতে নাই তাহা কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। কাজেই অভাবে বা বিপদে তাঁহাদের মন কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। যেমন, প্রথম খলীফা হযরত আবূবকর ছিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা তাঁহার যথাসর্বস্ব আনিয়া চাঁদা দিবার জন্য হুযূরের খেদমতে পেশ করিয়া দিলেন। হুযূর (দঃ) ফরমাইলেনঃ 'ঘরে কিছু রাখিয়া আসিয়াছেন কি? ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) অম্লান বদনে হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, 'ঘরে শুধু আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের নাম রাখিয়া আসিয়াছি।' [বিশ্বাস এবং অটল ঈমানের প্রমাণ তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীতে আরও অনেক পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার দেলের মধ্যে বিন্দুমাত্র ওস্‌ওসা আসার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া হুযূর (দঃ) তাঁহার সমস্ত মাল ইসলামী চাঁদায় গ্রহণ করিলেন। পক্ষান্তরে অন্য এক ছাহাবী এত বড় মর্তবায় পৌঁছিয়াছিলেন না বলিয়াই তাঁহার সামান্য কিছু স্বর্ণও হুযূর গ্রহণ না করিয়া ফেরত দিয়াছিলেন।]

১১। হাদীসঃ এক রমণী মুখে দিবার জন্য একটি লোক্‌মা ধরিয়াছিল, এমন সময় এক জন সায়েল দরজায় আসিয়া হাঁক দিল। রমণী লোক্‌মাটি নিজের মুখে না দিয়া ভিক্ষুককে দিয়া দিল। কারণ, দিবার মত তাহার নিকট আর কিছু ছিল না। অতঃপর তাহার সন্তান জন্মিলে কিছু দিন পর ঐ শিশু ছেলেকে বাঘে নিয়া গেল। মেয়েলোকটি 'হায়! বাঘে আমার ছেলে নিয়া গেল! হায়, বাঘে আমার ছেলে নিয়া গেল!' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে বাঘের পাছে পাছে দৌঁড়াইতে লাগিল। ওদিকে আল্লাহ্ পাক একজন ফেরেশ্‌তাকে ডাকিয়া বলিলেনঃ 'হে ফেরেশ্‌তা! তুমি শীঘ্র যাও এবং বাঘের মুখ হইতে ছেলেটিকে উদ্ধার করিয়া মেয়েলোকটির কাছে দিয়া আস এবং মেয়েলোকটিকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সালাম জানাইয়া বলিয়াছেন যে, এই লোক্‌মা সেই লোক্‌মার পরিবর্তে পুরস্কারস্বরূপ।' দেখ, দানের বরকতে ছেলেটি প্রাণে বাঁচিয়া গেল এবং সওয়াবও হইল। —ইবনে ছহরী

১২। হাদীসঃ 'নেক কাজের পথ প্রদর্শন করাও নেক কাজ করার মত।' অর্থাৎ, যদি কেহ নিজে নিঃসম্বল হওয়াবশতঃ সাহায্য করিতে না পারিয়া ব্যথিত হৃদয়ে অন্য কাহারও নিকট সুপারিশ করিয়া অভাবগ্রস্তের কোন অভাব মোচন করিয়া দেয়, তবে দাতা যে পরিমাণ সওয়াব পাইবে সেও সেই পরিমাণ সওয়াবই পাইবে। (অন্য হাদীসে আছে, যদি কেহ একটি নেক কাজ করে এবং তার দেখাদেখি অন্যেরাও সেই নেক কাজটি করে, তবে অন্যান্য সকলে যত পরিমাণ সওয়াব পাইবে ঐ প্রথম ব্যক্তি তাহাদের সকলের সমষ্টির সমান সওয়াব পাইবে।) —বাজ্জার

১৩। হাদীসঃ তিনজন লোক ছিল। তাহাদের একজনের নিকট দশটি দিনার ছিল, সে একটি দিনার দান করিল। একজনের নিকট দশ উকিয়া ছিল, সে এক উকিয়া দান করিল। এক জনের নিকট একশত উকিয়া ছিল, সে দশ উকিয়া দান করিল। হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম বলিলেন, এই তিনজনই সমান সওয়াব পাইবে। কেননা, প্রত্যেকেই নিজের সম্পত্তির দশ দশ ভাগের একভাগ দান করিয়াছে। যদিও দান কাহারও বেশী কাহারও কম ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নিয়তের উপর সওয়াব দেন। যেহেতু প্রত্যেকেই নিজ সম্পত্তির এক দশমাংশ দান করিয়াছে। কাজেই সকলেই সমান সওয়াব পাইবে। —তব্‌রানী

১৪। হাদীসঃ এক দেরহাম একলক্ষ দেরহাম অপেক্ষা অধিক নেকী আনিতে পারে। এক জনের মাত্র দুই দেরহাম ছিল, সে খালেছ নিয়তে আল্লাহ্‌র নামে এক দেরহাম দান করিল। আর এক জনের নিকট অগাধ সম্পত্তি ছিল, সে এক লক্ষ দেরহাম দান করিল। (প্রথম ব্যক্তি তাহার অর্ধেক সম্পত্তি দান করিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি যদিও এক লক্ষ দেরহাম দান করিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্পত্তি অর্ধেক দান করে নাই। কাজেই যে ব্যক্তি তাহার মোট পুঁজির অর্ধেক দান করিয়াছে, সে অর্ধেকের চেয়ে অনেক কম অর্থাৎ, লক্ষ দেরহাম দানকারীর চেয়ে সওয়াব বেশী পাইবে।) সায়েল সুয়াল করিলে হুযূর [দঃ]-এর কখনও 'না' বলার অভ্যাস ছিল না। থাকিলে দিয়া দিতেন, না থাকিলে বলিতেন, আল্লাহ্ পাক যখন আমাকে দিবেন, আমি তোমাকে দিব।' জীবনে তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ একাধারে দুই দিনও পেট ভরিয়া যবের রুটিও খান নাই। কত নির্দয়তার কথা যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করে না অথচ নিজে আরামে থাকে। —নাসায়ী

১৫। হাদীসঃ মু'মিন বান্দার জন্য তাহার দরজার সায়েল আল্লাহ্ প্রেরিত তোহ্‌ফা।

১৬। হাদীসঃ তোমরা ছদ্‌কা কর এবং ছদ্‌কা দ্বারা রোগীর রোগ চিকিৎসা কর। কেননা, ছদ্‌কা রোগ ও বালা-মুছীবত দূর করে এবং আয়ু ও নেকী বৃদ্ধি করে। —বায়হাকী

১৭। হাদীসঃ সাখাওয়াত এবং ভাল স্বভাব এই দুইটি জিনিস ব্যতিরেকে কেহই আল্লাহ্‌র ওলী হইতে পারে নাই। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র ওলীদের মধ্যে সাখাওয়াত ও সৎস্বভাব নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকে। —দায়লামী

হজ্জ

(হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রোকন। যাহার নিকট আবশ্যকীয় খরচ বাদে মক্কা শরীফে যাতায়াতের মোটামুটি খরচ পরিমাণ অর্থ থাকে, তাহার উপর হজ্জ ফরয।)

হজ্জ অতি বড় মরতবার ইবাদৎ। হাদীসে ইহার অনেক ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'যে হজ্জ গোনাহ্ এবং অন্যান্য খারাবী হইতে পবিত্র হইবে, তাহার পুরস্কার বেহেশ্‌ত ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।'

ওমরার জন্যও বড় সওয়াবের ওয়াদা করা হইয়াছে। হাদীসে আছে—'হজ্জ এবং ওমরার উভয়ই গোনাহ্‌সমূহকে এমনভাবে দূর করিয়া দেয়, যেমন আগুন লোহার মরিচাকে দূর করিয়া দেয়।'

যাহার উপর হজ্জ ফরয হয় সে যদি হজ্জ না করে, তবে তাহার জন্য ভীষণ আযাবের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'যাহার নিকট মক্কা শরীফে যাতায়াতের সম্বল হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করিবে সে ইহুদী বা নাছারা হইয়া মরুক, আল্লাহ্‌র সঙ্গে (এবং আল্লাহ্‌র ইস্‌লামের সঙ্গে) তাহার কোন সংশ্রব নাই।' অন্য হাদীসে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হজ্জ না করা ইসলামের তরীকা নহে।

১। **মাসআলা**ঃ সারা জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করা ফরয। একবারের বেশী হজ্জ করিলে তাহা নফল হইবে এবং অনেক বেশী সওয়াব হইবে।

২। **মাসআলা**ঃ না-বালেগ অবস্থায় যদি কেহ হজ্জ করে, তবে সে হজ্জ নফল হইবে। বালেগ হওয়ার পর সম্বল হইলে হজ্জ পুনরায় করিতে হইবে।

৩। **মাসআলা**ঃ অন্ধের উপর হজ্জ ফরয নহে; যত ধনই থাকুক না কেন।

৪। **মাসআলা**ঃ যখন কাহারও উপর হজ্জ ফরয হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই বৎসরই হজ্জ করা ওয়াজিব। বিনা ওযরে দেরী করা, এরূপ খেয়াল করা যে, এখনও অনেক সময় আছে, অন্য কোন বৎসর হজ্জ করিব, ইহা দুরুস্ত নাই। অবশ্য ইহার ২/৪ বৎসর পরও যদি হজ্জ করে, তবে আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু গোনাহ্‌গার হইবে।

৫। **মাসআলা**ঃ মেয়েলোকের হজ্জের সফরে স্ত্রীলোকের নিজ স্বামী বা কোন মাহ্‌রাম পুরুষ সঙ্গে হওয়াও যরূরী। ইহা ব্যতীত হজ্জে যাওয়া দুরুস্ত নাই। অবশ্য যদি কা'বা শরীফ হইতে এতটুকু দূরে বসবাস করে যে, তথা হইতে মক্কা শরীফ তিন মঞ্জিলের পথ না হয়, তবে স্বামী বা মাহ্‌রাম সঙ্গে না লইয়া হজ্জে যাওয়া দুরুস্ত আছে।

৬। **মাসআলা**ঃ যদি সে মাহ্‌রাম না-বালেগ কিংবা এরূপ বদদ্বীন হয় যে, কোন মতেই তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না, তবে তাহার সহিত যাওয়া দুরুস্ত নাই।

৭। **মাসআলা**ঃ যে মেয়েলোকের উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে এবং বিশ্বাসযোগ্য মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদার সঙ্গে যাইবার জন্য পাইয়াছে, তাহকে হজ্জে যাইতে স্বামীর নিষেধ করা দুরুস্ত নাই। করিলেও তাহার কথা মানিবে না; চলিয়া যাইবে।

৮। **মাসআলা**ঃ যে মেয়ে এখনও বালেগ হয় নাই, কিন্তু বালেগ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে, তাহার জন্যও ঘনিষ্ঠ মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদার ব্যতীত একা একা বা বেগানা পুরুষের সঙ্গে বা গায়র মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদারের সঙ্গে হজ্জের সফর করা যায়েয নহে।

৯। **মাসআলা**ঃ যে মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদার বা স্বামী মেয়েলোকের হজ্জ করাইবার জন্য লইয়া যাইবে তাহার সমস্ত খরচ দেওয়া ঐ মেয়েলোকের উপর ওয়াজিব।

১০। **মাসআলা**ঃ যে মেয়েলোকের উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে, সে যদি সারা জীবন মাহ্‌রাম রেশতাদার না পাওয়ায় হজ্জ করিতে না পারে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে না। অবশ্য শেষ জীবনে

বদলী হজ্জ করাইবার অছীঅত করা ওয়াজিব হইবে। এইরূপ অছীঅত করিলে সে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবে। মৃত্যুর পর তাহার ওলীওয়ারিসগণ তাহার টাকা দিয়া একজন লোককে মক্কা শরীফে হজ্জ করিতে পাঠাইবে। সে মরহুমার পক্ষ হইতে হজ্জ করিবে ইহাতে তাহার যিম্মা হইতে হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। অন্যের পক্ষে হজ্জ করাকে 'বদলী হজ্জ' বলে।

১১। মাসআলাঃ হজ্জ ফরয হওয়ার পর আলস্য করিয়া দেরী করিলে এবং পরে অন্ধ বা শক্তিহীন হইলে বদলী হজ্জের জন্য অছীঅত করা ওয়াজিব।

(**মাসআলাঃ** যদি কেহ হজ্জ ফরয হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ না করে এবং পরে গরীব হইয়া যায়, তবে ঐ ফরয তাহার যিম্মায় থাকিয়া যাইবে। যে কোন উপায়ে হজ্জ করিতে হইবে নতুবা ফরয তরকের গোনাহ্ থাকিয়া যাইবে। আগে অবহেলা করিয়াছে বলিয়া এখন গরীব হওয়া সত্ত্বেও মা'ফ পাইবে না।)

১২। মাসআলাঃ যে নিজে হজ্জ করিতে পারে নাই, সে বদলী হজ্জের অছীঅত করিয়া মরিলে, দেখিতে হইবে যে, তাহার ষোল আনা ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে প্রথমে তাহার কাফন-দাফন ও করয আদায়ের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা হজ্জের সম্পূর্ণ খরচ হইতে পারে কি না। যদি তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা হজ্জের সম্পূর্ণ খরচ হইতে পারে, তবে ওয়ারিসগণের উপর তাহার পক্ষ হইতে তাহার বাড়ী হইতে সম্পূর্ণ যাযায়াত খরচ দিয়া বদলী হজ্জ করান ওয়াজিব। (কিন্তু যদি সম্পত্তি কম হয় এবং তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা একজন লোককে পাঠান না যায়, তবে বদলী হজ্জ করাইবে না। টাকাটা কোন হাজীর সঙ্গে পাঠাইয়া দিবে। সে যেখান হইতে ঐ টাকায় একজন লোককে নিতে পারে সেস্থান হইতে একজন লোকের যাতায়ত খরচ দিয়া বদলী হজ্জের জন্য লইয়া যাইবে; নতুবা) যদি বালেগ ওয়ারিসগণ নিজ নিজ অংশের দাবী ছাড়িয়া দিয়া, অথবা নিজ তহ্‌বীল হইতেই বদলী হজ্জের জন্য লোক পাঠায়, তবে তাহা আরও ভাল। কিন্তু না-বালেগ ওয়ারিস থাকিলে তাহার অংশে দাবী ছাড়িবার বা তাহার অংশ হইতে দান করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

১৩। মাসআলাঃ কেহ যদি হজ্জে বদলের অছিঅত করিয়া মারা যায়, কিন্তু ত্যাজ্য সম্পত্তির তৃতীয়াংশের দ্বারা হজ্জে বদল না হয় এবং তৃতীয়াংশের বেশী খরচ করিতে ওয়ারিশগণ সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি না দেওয়ায় হজ্জে বদল করা না হয়, তবে অছিঅতকারীর গোনাহ্ হইবে না।

১৪। মাসআলাঃ সকল প্রকার অছিঅতেরই এই হুকুম। অতএব, যদি কাহারও যিম্মায় অনেকগুলি রোযা ও নামায ক্বাযা বা বাকী থাকে কিংবা যাকাত বাকী থাকে এবং অছিঅত করিয়া মারা যায়, তবে শুধু ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হইতে এইগুলি আদায় করিতে হইবে। ওয়ারিশগণের আন্তরিক সন্তুষ্টি ব্যতীত এক তৃতীয়াংশের বেশী খরচ করা জায়েয নাই। পূর্বেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

১৫। মাসআলাঃ বিনা অছিঅতে মৃতের সম্পত্তি হইতে হজ্জে বদল করা দুরুস্ত নাই। অবশ্য যদি সকল ওয়ারিস খুশী হইয়া এজাযত দেয়, তবে জায়েয আছে। ইন্‌শাআল্লাহ্ ফরয হজ্জ আদায় হইবে। কিন্তু না-বালেগের এজাযতের মূল্য নাই।

১৬। মাসআলাঃ মেয়েলোক যদি ইদ্দতের অবস্থায় থাকে, তবে ইদ্দতপালন ছাড়িয়া দিয়া হজ্জের জন্য সফর করা তাহার জন্য জায়েয নহে।

১৭। মাসআলাঃ যাহার নিকট শুধু মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াতের খরচ আছে, কিন্তু মদীনা শরীফ যাইবার খরচ নাই তাহার উপর হজ্জ ফরয হইবে। মদীনা যাওয়ার খরচ না থাকিলে হজ্জ ফরয নহে এরূপ ধারণা একেবারে ভুল।

১৮। মাসআলাঃ এহ্‌রামে মেয়েলোকের মুখ ঢাকার সময় মুখে কাপড় লাগান দুরুস্ত নাই। আজকাল এই কাজের জন্য একপ্রকার জালিদার পাখা পাওয়া যায়, উহা চেহারার উপর বাঁধিয়া লইবে। চোখ বরাবর জালি থাকিবে, উহার উপর বোরকা রাখিবে। ইহা দুরুস্ত আছে।

হজ্জের অবশিষ্ট মাসআলা হজ্জ করার সময় ছাড়া সবকিছু বুঝে আসিবে না এবং মনেও থাকিবে না। হজ্জে গেলে মোয়াল্লিম সবকিছু শিখাইয়া দিবে। ওমরার তরতীব সেখানে গেলে বুঝিতে পারিবে। এখানে হজ্জের প্রাথমিক কতিপয় কাজের উল্লেখ করা হইল।

হজ্জে যাইবার সময় স্ত্রী, কন্যা ইত্যাদি যাহাদের ভরণ-পোষণ যিম্মায় থাকে ফিরিয়া আসার সময় পর্যন্ত তাহাদের খরচ দিয়া যাইতে হইবে। যদি পিতামাতা জীবিত থাকেন, তবে ফরয হজ্জ করিতে নিষেধ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের যদি খোরপোষের ব্যবস্থা না থাকে, বা পথে কোন প্রবল যুদ্ধের আশঙ্কা থাকে, বা নফল হজ্জ করিতে নিষেধ করে, তবে তাহাদের অনুমতি না লইয়া এবং তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট না করিয়া সফর করা জায়েয নাই। এইরূপে পাওনাদারকে সন্তুষ্ট না করিয়াও হজ্জের সফর করা জায়েয নহে।

হজ্জে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে খুব দেল গলাইয়া সমস্ত গোনাহ্‌ হইতে খাঁটি দেলে তওবা করিবে। যদি কাহারও কোন পাওনা-দেনা থাকে তাহা পরিশোধ করিবে, যাহাদের সহিত কাজ কারবার হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে মা'ফ চাহিয়া লইবে। যদি নামায, রোযা, যাকাত, কোরবানী, ফেৎরা, মান্নত, কাফ্‌ফারা ইত্যাদি কোনকিছু যিম্মায় বাকী থাকে তাহা আদায় করিবে। দেনা আদায় করিবার পূর্বে যদি কোন পাওনাদার মারা গিয়া থাকে এবং তাহার ওয়ারিস থাকে, তবে তাহার পাওনা তাহার ওয়ারিসগণকে পৌঁছাইয়া দিবে। আর যদি ওয়ারিস না থাকে বা জানা না থাকে, তবে পাওনা পরিমাণ মাল গরীব-দুঃখীদিগকে দান করিয়া দিবে। আর যদি কাহারও কিছু শারীরিক বা মানসিক পাওনা থাকে, তবে তাহা মা'ফ চাহিয়া লইবে। যদি সে মারা গিয়া থাকে বা নিখোঁজ হইয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য মাগ্‌ফেরাত চাহিতে থাকিবে।

হজ্জের খরচ হালাল মালের দ্বারা সংগ্রহ করিবে। কেননা, হারাম মালের দ্বারা কোন এবাদত কবূল হয় না।

এইসব হক্কুল এবাদ আদায় করার পর হজ্জের সফরের জন্য সৎ-সঙ্গী তালাশ করিবে। কেননা, সৎ-সঙ্গী ছাড়া এই সফর করা বড় কঠিন। যদি কোন নেক্‌কার আলেম সঙ্গী পাওয়া যায়, তবে অতি উত্তম।

মদীনা শরীফ যিয়ারত

হজ্জ করিতে গেলে, হজ্জের আগে বা পরে মদীনা শরীফে হযরতের (দঃ) রওযা শরীফ এবং মসজিদে নববীর যিয়ারত করিয়া আসার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

১। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

مَنْ زَارَنِیْ بَعْدَ مَمَاتِیْ فَکَاَنَّمَا زَارَنِیْ فِیْ حَیَاتِیْ ○

'যে মুসলমান আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করিবে সে-ও তদ্রূপই বরকত পাইবে, যেরূপ আমার জীবিত অবস্থায় আমার সাথে মুলাকাত করিলে পাইত।

২। **হাদীস** ঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ ○

'যে হজ্জ করিয়া গেল অথচ আমার যিয়ারত করিল না, তবে সে আমার সঙ্গে বড় গোস্তাখী করিয়া গেল।' মসজিদে নববী সম্বন্ধে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন ঃ

'যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে এক রাকা'আত নামায পড়িবে,, সে পঞ্চাশ হাজার রাকা'আত নামাযের সওয়াব পাইবে।' আয় আল্লাহ্! আমাদের সকলকে মদীনা শরফের যিয়ারত নছীব কর এবং নেককাজের তওফীক দান কর, আমীন!

নযর বা মান্নত

১। **মাসআলা** ঃ কোন কাজে এবাদত জাতীয় কোন মান্নত মানিলে যদি উহা পুরা হয়, তবে ঐ মান্নত পুরা করা ওয়াজিব; পুরা না করিলে গোনাহ্গার হইবে। শরীঅতের খেলাফ জিনিসের মান্নত মানিলে, তাহা পুরা করিতে হইবে না।

২। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ বলে, হে আল্লাহ্! যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে পাঁচটি রোযা রাখিব। যদি কাজটি হইয়া যায়, তবে পাঁচটি রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে। আর যদি কাজ না হয়, তবে রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে না। যদি শুধু এতটুকু বলে যে, পাঁচটি রোযা রাখিব, তবে তাহার এখতিয়ার থাকিবে সে এক সঙ্গেও পাঁচটি রাখিতে পারে বা একটা দুইটা করিয়া পাঁচটা পুরা করিতে পারে। আর যদি মান্নত মানার সময় মুখে বলিয়া থাকে বা দেলে নিয়ত রাখিয়া থাকে যে, এক সঙ্গেই পাঁচটি রোযা রাখিব, তবে এক সঙ্গেই পাঁচটি রাখিতে হইবে। যদি কোন কারণবশতঃ মাঝে একটি ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে পুনরায় পাঁচটি একত্রে রাখিতে হইবে।

৩। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ বলে, আমি শুক্রবারে রোযা রাখিব অথবা মহর্‌রমের চাঁদের পহেলা তারিখ হইতে দশ তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখিব, তবে খাছ করিয়া শুক্রবারে রোযা ওয়াজিব হইবে না। শুক্রবার ছাড়া অন্য দিনে রোযা রাখিলেও আদায় হইয়া যাইবে। এইরূপে খাছ করিয়া মহররমের দশ দিনের রোযা ওয়াজিব হইবে না, অন্য কোন চাঁদে ১০টি রোযা রাখিলেই ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু ১০টি রোযা এক লাগা মাঝে ফাঁক না দিয়া রাখিতে হইবে। যদি কেহ বলে, আজ যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে কালই আমি একটি রোযা রাখিব। তবে যদি কাল না রাখিতে পারে, অন্য এক দিন রাখে, তবুও ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআলা** ঃ যদি মান্নতে বলে যে, মহর্‌রম চাঁদের এক মাস রোযা রাখিব, তবে পুরা মাস এক লাগা রোযা রাখিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন কারণে ঐ মাসের মধ্যে ৫/৭টি রোযা রাখিতে না পারে, তবে পূর্ণ মাসের রোযা দোহ্‌রাইতে হইবে না, শুধু যে কয়টি রোযা রাখে নাই তাহা অন্য এক সময় পুরা করিলেই চলিবে। আর যদি মহর্‌রমের চাঁদে রোযা না রাখিয়া অন্য কোন চাঁদে রাখে, তবুও ওয়াজিব আদায় হইবে, কিন্তু সব রোযা এক লাগা রাখিতে হইবে।

৫। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ মান্নত মানে যে, যদি আমার হারান জিনিসটি ফিরিয়া পাই, তবে আমি আল্লাহ্র নামে ৮ রাকা'আত নামায পড়িব, তবে ঐ জিনিসটি পাইলে ৮ রাকা'আত নামায পড়া তাহার উপর ওয়াজিব হইবে। সেই ৮ রাকা'আত নামায এক সঙ্গে এক সালামে পড়িতে

পারিবে, বা ইচ্ছা করিলে ৪ রাকা'আত করিয়া দুই সালামে, বা দুই রাকাআত করিয়া ৪ সালামেও পড়িতে পারিবে। আর যদি ৪ রাকা'আতের মান্নত মানিয়া থাকে, তবে ৪ রাকা'আত এক সালামে পড়িতে হইবে। দুই রাকা'আতের নিয়তে দুই সালামে ৪ রাকা'আত পড়িলে ওয়াজিব আদায় হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** এক রাকা'আত নামাযের মান্নত করিলে দুই রাকাআত পড়িতে হইবে। তিন রাকা'আতের করিলে চারি রাকা'আত, পাঁচ রাকা'আতের মান্নত করিলে, পুরা ছয় রাকা'আত পড়িতে হইবে। তদূর্ধ্বেও এইরূপ হুকুম।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ মান্নত মানে যে, দশ টাকা খয়রাত দিব, বা এক টাকা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করিব, তবে যে কয় টাকা বলিবে, সেই কয় টাকা খয়রাত দেওয়া ওয়াজিব হইবে। অবশ্য যদি কেহ বলে, পঞ্চাশ টাকা খয়রাত দিব, অথচ তাহার কাছে মাত্র দশ টাকার মাল আছে, তদপেক্ষা বেশী কিছু নাই, তবে দশ টাকাই ওয়াজিব হইবে। আর যদি নগদ দশ টাকা থাকে, বাকী অন্যকিছু মালও থাকে, তবে সমস্তের মূল্য ধরিয়া যদি নগদ ১০ টাকাসহ মোট পঁচিশ টাকা হয়, তবে পঁচিশ টাকাই ওয়াজিব হইবে, বেশী ওয়াজিব হইবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি এইরূপ মান্নত করে যে, দশ জন মিস্‌কীন খাওয়াইবে, তবে দেখিতে হইবে যে, এই কথা বলার সময় তাহার নিয়ত কি ছিল। যদি এক ওয়াক্ত খাওয়ানের নিয়ত থাকিয়া থাকে, তবে দশ জন মিস্‌কীনকে এক ওয়াক্ত খাওয়াইয়া দিলেই চলিবে, আর যদি দুই ওয়াক্ত খাওয়ানের নিয়ত থাকিয়া থাকে, অথবা কিছু নিয়ত ঠিক করিয়া না বলিয়া থাকে, তবে দশজন মিস্‌কীনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়া, খাওয়াইতে হইবে। আর যদি কাঁচা মাল—ডাল-চাউল দিতে চায় এবং কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ত করিয়া থাকে, তবে সেই পরিমাণই দিতে হইবে, পরিমাণের নিয়ত না করিয়া থাকিলে প্রত্যেক মিস্‌কীনকে একটি ছদকা-ফেৎরার পরিমাণ দিতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** মান্নত করিল—এক টাকার রুটি মিস্‌কীনদের দান করিব, তবে নগদ এক টাকার রুটি বা যে কোন জিনিস কিনিয়া দিলে আদায় হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** কেহ বলিল, প্রত্যেক মিস্‌কীনকে এক টাকা করিয়া দশ টাকা খয়রাত দিব, কিন্তু দশ টাকাই একজন মিস্‌কীনকে দিল, তাহাতে ওয়াজিব আদায় হইবে। কারণ, প্রত্যেক মিস্‌কীনকে এক টাকা দিবে বলাতে দশজনকে দেওয়া ওয়াজিব হয় নাই। যদি দশ টাকা বিশজনকে দেয় তাহাতেও ওয়াজিব আদায় হইবে। আর যদি মান্নতের সময় বলিয়া থাকে যে, দশ টাকা দশজন মিস্‌কীনকে দিব এবং দিতে দশজনের চেয়ে কম বা বেশীকে দেয়, তাহাতেও ওয়াজিব আদায় হইবে।

১১। **মাসআলা ঃ** মান্নত করিল, দশজন নামাযী বা হাফেযকে খাওয়াইব, এখন দশজন মিস্‌কীন খাওয়াইলেও ওয়াজিব আদায় হইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** কেহ বলিল, মক্কা শরীফে দশ টাকা খয়রাত দিব। মক্কাশরীফে খয়রাত করা ওয়াজিব নহে, যেখানে ইচ্ছা খয়রাত করিতে পারে। যদি কেহ বলে যে, শুক্রবারে খয়রাত দিব বা অমুক মিস্‌কীনকে দিব, তবে শুক্রবারে বা সেই মিস্‌কীনকে দেওয়াই যরূরী নহে। যদি বলে যে, এই টাকাটাই আল্লাহ্‌র কাজে দান করিব, তবে খাছ সেই টাকাটাই দেওয়া ওয়াজিব হইবে না, অন্য টাকা বা টাকার মূল্যের পয়সা, বা অন্য জিনিস দিলেও ওয়াজিব আদায় হইবে।

১৩। মাসআলাঃ যদি কেহ মান্নত করে যে, জুমু'আ মস্‌জিদে বা মক্কা শরীফে দুই রাকাআত নামায পড়িবে, তবুও যেখানে ইচ্ছা পড়িতে পারে।

১৪। মাসআলাঃ কেহ মান্নত মানিল, যদি আমার ভাইয়ের অসুখ ভাল হয়, তবে আমি একটা বকরী যবাহ্ করিব, বা এইরূপ বলিল যে, একটা বক্‌রীর গোশ্‌ত খয়রাত করিব, তবে মান্নত হইয়া যাইবে। আর যদি এইরূপ বলে যে, কোরবানী করিব, তবে কোরবানীর দিন যবাহ্ করিতে হইবে, এই উভয় অবস্থায় উহার গোশ্‌ত মিস্‌কীন ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেওয়া বা নিজে খাওয়া দুরুস্ত নাই। যে পরিমাণ নিজে খাইবে বা ধনী লোককে দিবে, সে পরিমাণ আবার খয়রাত করিতে হইবে।

১৫। মাসআলাঃ যদি কেহ একটি গরু কোরবানী করার মান্নত মানে, তবে গরু না পাইলে তৎপরিবর্তে ৭টি বকরী কোরবানী করিবে।

১৬। মাসআলাঃ মান্নত করিল, আমার ভাই আসিলে আমি দশ টাকা খয়রাত দিব। যদি সে আসার খবর পাইয়া, বাড়ী পৌঁছার আগেই দশ টাকা খয়রাত দেয়, তবে মান্নত পুরা হইবে না, আসার পরে দশ টাকা দিতে হইবে।

১৭। মাসআলাঃ যদি এমন কোন বিষয়ের উপর মান্নত মানে যাহা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে ত মান্নত পুরা করিতে হইবে। যেমন বলিল, আমার অসুখ যদি আল্লাহ্ তা'আলা আরোগ্য করিয়া দেয়, বা যদি আমার ভাই নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে, বা যদি আমার বাপ মোকদ্দমায় জিতিয়া যান বা চাকুরী হইয়া যায়, তবে আমি দশ টাকা খয়তার দিব; এইসব মকছুদ পুরা হইলে মান্নত পুরা করিতে হইবে। কেহ বলিল, যদি আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি, তবে দুইটা রোযা রাখিব, যদি আমি এক ওয়াক্ত নামায না পড়ি, তবে এক টাকা খয়রাত দিব। এখন কথা বলিল বা নামায পড়িল না, এমতাবস্থায় তাহার ইখ্‌তিয়ার হইবে; কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করুক, অথবা দুই রোযা রাখুক বা এক টাকা খয়রাত করুক।

১৮। মাসআলাঃ মান্নত করিল, এক হাজার বার দুরূদ বা এক হাজার বার কলেমা পড়িব, তবে মান্নত দুরুস্ত হইবে এবং পড়া ওয়াজিব হইবে। যদি বলে, সোবহানাল্লাহ্ বা লা-হাওলা এক হাজার বার পড়িব, তবে পুরা করা ওয়াজিব হইবে না।

১৯। মাসআলাঃ যদি কেহ মান্নত মানে যে, দশ খতম কোরআন শরীফ পড়িব বা এক পারা কোরআন শরীফ পড়িব, তবে মান্নত হইবে এবং পুরা করিতে হইবে।

২০। মাসআলাঃ যদি মান্নত মানে যে, যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে মৌলুদ পড়াইব, বা অমুক বুযূর্গের মাযারে চাদর চড়াইব, বা যদি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে মসজিদের তাক ভরিয়া দিব, বা মসজিদের গুলগুলা ছড়াইব, বা বড়পীরের নেয়ায দিব বা এগারই শরীফ করিব। এইরূপ মান্নত পুরা করার দরকার নাই।

২১। মাসআলাঃ মুশ্‌কিল কোশা (আলীর) রোযা বা এজাতীয় অন্য মান্নত করা দুরুস্ত নহে; বরং এইরূপ মান্নত শির্‌ক, ইহাতে ঈমান নষ্ট হয়।

২২। মাসআলাঃ কেহ মান্নত করিল—মসজিদ মেরামত করিয়া দিব, বা পুল বানাইয়া দিব, মান্নত ছহীহ্ হইবে না। তাহার যিম্মায় কিছু ওয়াজিব হইবে না।

২৩। মাসআলাঃ কেহ বলিল, যদি আমার ভাইয়ের অসুখ সারিয়া যায়, তবে নাচ করাইব, বা বাদ্য বাজাইব; তবে ভাল হওয়ার পর এরূপ করা জায়েয নহে।

২৪। মাসআলাঃ এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে মান্নত মানা দুরুস্ত নহে। কোন দেব-দেবী হউক, বা কোন পীর-পয়গম্বর হউক, বা কোন মাযার বা আস্তানার হউক, বা কোন ভূত-প্রেতের হউক—এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে মান্নত মানা ছাফ হারাম; ইহাতে ঈমান নষ্ট হইয়া যায়। যেমন, কেহ বড়পীর ছাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে বড়পীর! বা হে আবদুল কাদের জিলানী! বা হে খাজা বাবা! আমার অমুক মকছুদ পুরা করিয়া দাও, আমি তোমার নামে এত শির্ণি দিব। এইরূপ বলা হারাম ও শির্ক, ইহাতে ঈমান থাকে না। এইরূপে জ্বীনের আড্ডায় যাওয়া বা যাহার উপর জ্বীনের ভর হইয়াছে তাহার কাছে কোন ভেঁট লইয়া যাওয়া এবং কোন মকছুদের জন্য দরখাস্ত করা ছাফ হারাম। এইরূপ ভেঁট বা মান্নতের জিনিস খাওয়া হারাম। বিশেষতঃ মেয়েলোকের জন্য মাযারে যাওয়া কঠোর নিষেধ আছে।

হাদীসঃ যে সমস্ত মেয়েলোক কবর বা মাযার যিয়ারত করিতে যাইবে বা করিবে, চেরাগ জ্বালাইবে বা সজ্‌দা করিবে, তাহার উপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) লা'নত করিয়াছেন। —আবু দাঊদ (রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর রওযা শরীফ যিয়ারত করিতে পারে।)

[**২৫। মাসআলাঃ** যদি কেহ কোন শর্তের বা কোন কাজের কথা উল্লেখ না করিয়াই শুধু আল্লাহ্‌র নাম লইয়া বলে, আল্লাহ্‌র নামে দশটি রোযা রাখিব বা আল্লাহ্‌র নামে একটি খাসী কোরবানী করিব, তবুও মান্নত হইবে এবং পুরা করা ওয়াজিব হইবে।

২৬। মাসআলাঃ নির্দিষ্ট গরু, বকরী, বা মুরগী মান্নত করিলে, সেইটাই দিতে হইবে। আর যদি নির্দিষ্ট করিয়া না বলে, তবে কোরবানীর উপযুক্ত একটি গরু বা একটি খাসী দিতে হইবে।]

কসম খাওয়া

১। মাসআলাঃ বিনা যরূরতে কথায় কথায় কসম খাওয়া অন্যায় কাজ। কারণ, ইহাতে আল্লাহ্‌র নামের তা'যীম নষ্ট হয় এবং শক্ত বেআদবী হয়। কাজেই সত্য কথার উপরও কসম না খাইয়া পারিলে কিছুতেই কসম খাওয়া উচিত নহে।

২। মাসআলাঃ যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম, এই কাজ আমি করিব বা এইরূপ বলে যে, খোদার কসম বা খোদার ইজ্জত ও জালালের কসম, আল্লাহ্‌র বুযুর্গী ও বড়ত্বের কসম, এই কাজ আমি করিব, তবে কসম হইয়া যাইবে তাহার খেলাফ করা কিছুতেই জায়েয হইবে না। (ফলকথা, আল্লাহ্‌র যাতি নাম হউক বা ছেফাতি নাম হউক, আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিয়া কথা বলিলেই কসম হইয়া যাইবে।)

আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করিয়া যদি কেহ শুধু বলে যে, কসম খাইতেছি অমুক কাজ করিব না, তবুও কসম হইয়া যাইবে।

৩। মাসআলাঃ কেহ বলিল, খোদা সাক্ষী, আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি বা আল্লাহ্‌কে হাযের নাযের জানিয়া বলিতেছি, তবে কসম হইয়া যাইবে।

৪। মাসআলাঃ কেহ বলিল, কোরআন বা আল্লাহ্‌র কালামের কসম করিয়া বলিতেছি, তবে কসম হইবে। যদি কোরআন হাতে করিয়া বা কোরআনের উপর হাত রাখিয়া কোন কথা বলে কিন্তু কসম না খায়, তবে কসম হইবে না।

৫। মাসআলাঃ যদি কেহ বলে, যদি অমুক কাজ করি, তবে যেন বেঈমান হইয়া মরি, বা মৃত্যুর সময় যেন ঈমান নছীব না হয়, বেঈমান হইয়া যাই, বা বলিল, যদি অমুক কাজ

করি, তবে মুসলমানই নহি, তবে কসম হইয়া যাইবে। ইহার খেলাফ করিলে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। ঈমান যাইবে না।

৬। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ এইরূপ কসম করে যে, যদি অমুক কাজ করি, তবে যেন আমার হাত ভাঙ্গিয়া যায়, বা চোখ কান নষ্ট হইয়া যায়, বা সমস্ত শরীরে যেন কুষ্ঠরোগ হইয়া যায়, বা আমার উপর যেন খোদার গযব পড়ে, বা আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে বা যেন দানা পানি না মিলে, বা খোদার অভিশাপ পড়ে, খোদার লা'নত পড়ে, বা যদি অমুক কাজ করি, শূকর খাই, মৃত্যুর সময় যেন কলেমা নছীব না হয়, কিয়ামতে আল্লাহ্ রসূলের সম্মুখে লজ্জিত হই ইত্যাদি কথায় কসম হয় না। এই ধরনের কসম করিয়া যদি কেহ ভঙ্গ করে, তবে তাহাতে কাফ্‌ফারা নাই।

৭। **মাসআলা** ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও কসম খাইলে কসম হয় না। যেমন, রসূলুল্লাহ্‌র কসম, বা কাবা শরীফের কসম, নিজ চোখের কসম, নিজ যৌবনের কসম, নিজ হাত পা'র কসম, নিজের বাপের কসম, নিজ সন্তানের কসম,নিজ প্রিয়জনের কসম, তোমার মাতার কসম, তোমার জানের কসম, তোমার কসম, নিজের কসম, এই জাতীয় কসমের খেলাফ করিলে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও কসম খাওয়া শক্ত গোনাহ্। হাদীস শরীফে ইহার কঠোর নিষেধ আসিয়াছে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও কসম খাওয়া শেরেকী কথা, ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য।

৮। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ বলে, তোমার ঘরের ভাত পানি আমার জন্য হারাম, বা এইরূপ বলে, অমুক জিনিস আমি আমার জন্য হারাম করিয়া লইয়াছি, তবে ইহাতে কসম হইয়া যাইবে। সে জিনিস খাইলে তাহার কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

৯। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ অন্যকে কসম দেয় যে, তোমার আল্লাহ্‌র কসম, এই কাজটা করিয়া দাও বা তোমার খোদার কসম অমুক কাজ করিও না, তবে তাহাতে কসম হয় না। ইহার খেলাফ দুরুস্ত আছে।

১০। **মাসআলা** ঃ কসমের সঙ্গে 'ইনশাআল্লাহ্' বলিলে কসম হয় না। যেমন খোদার কসম ইনশাআল্লাহ্ অমুক কাজ করিব না; ইহাতে কসম হইবে না।

১১। **মাসআলা** ঃ যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহার উপর মিথ্যা কসম খাওয়া কঠিন গোনাহ্। যেমন, কেহ নামায পড়ে নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, খোদার কসম নামায পড়িয়াছি। কিংবা কেহ গ্লাস ভাঙ্গিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় বলিল, খোদার কসম আমি ভাঙ্গি নাই। জানিয়া বুঝিয়া মিথ্যা কসম খাইল। এইরূপ কসমের গোনাহ্‌র কোন সীমা নাই এবং ইহার কোন কাফ্‌ফারাও নাই। শুধু দিন রাত আল্লাহ্‌র কাছে তওবা এস্তেগফার করিয়া গোনাহ্ মাফ করাইয়া লইবে। ইহাছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। আর যদি ভুলে এবং ধোঁকায় পড়িয়া মিথ্যা কসম খায়; যেমন বলিল, খোদার কসম, এখনও অমুক আসে নাই এবং মনের বিশ্বাস এই যে, সত্য কসম খাইতেছে, পরে জানিতে পারিল যে, ঐ সময় সে আসিয়াছে, তবে ইহা মাফ, ইহাতে গোনাহ্ হইবে না এবং কাফ্‌ফারাও লাগিবে না।

১২। **মাসআলা** ঃ আগামী কোন ঘটনার জন্য কসম করিয়া বলিল, খোদার কসম আজ বৃষ্টি হইবে, বা আল্লাহ্‌র কসম আজ আমার ভাই আসিবে, অথচ বৃষ্টিও হইল না, ভাইও আসিল না, তবে কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

১৩। মাসআলাঃ কেহ কসম করিয়া বলিল যে, খোদার কসম আজ আমি কোরআন তেলাওয়াত করিবই করিব, ইহাতে কসম হইয়া যাইবে এবং কোরআন তেলাওয়াত করা তাহার উপর ওয়াজিব হইবে এবং না করিলে গোনাহ্ হইবে এবং কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। এইরূপে যদি কেহ কসম খাইয়া বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি, আজ আমি ঐ কাজ করিবই না। তবে সে কাজ করা তাহার জন্য হারাম, যদি করে তবে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

১৪। মাসআলাঃ যদি কেহ গোনাহ্‌র কাজ করার জন্য কসম খায়; যেমন, কেহ বলিল, খোদার কসম আমি অমুকের অমুক জিনিস চুরি করিয়া আনিব। অথবা খোদার কসম আজ আমি নামায পড়িব না, অথবা আল্লাহ্‌র কসম আমি মা-বাপের সঙ্গে কথা কহিব না। এইরূপ গোনাহ্‌র কসম খাইলে তাহার জন্য কসম ভঙ্গ করা ওয়াজিব। কসম ভাঙ্গিয়া কাফ্‌ফারা দিবে নতুবা গোনাহ্‌গার হইবে।

১৫। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, খোদার কসম আজ আমি অমুক জিনিস খাইব না। তারপর যদি ভুলিয়া সেই জিনিস খায়, অথবা কেহ জোর জবরদস্তিতে খাওয়ায়, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে এবং কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

১৬। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম করিয়া বলে যে, 'খোদার কসম তোকে আমি একটা ফুটা কড়িও দিব না।' তারপর যদি তাহাকে টাকা-পয়সা দেয়, কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

কসমের কাফ্‌ফারা

১। মাসআলাঃ কসম ভঙ্গ করিলে তাহার কাফ্‌ফারা এই যে, হয় দশজন মিস্‌কীনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিবে, না হয় প্রত্যেক মিস্‌কীনকে ৮০ তোলা সেরের এক সের সাড়ে বার ছটাক গম বা তাহার মূল্য দিবে। পূর্ণ দুই সের গম বা তাহার মূল্য দেওয়া উত্তম। আর যদি যব দেয়, তবে গমের দ্বিগুণ দিবে। (আর চাউল ধান দিলে গম বা যবের মূল্যের হিসাবে দিবে।) তাহা না হইলে দশজন মিস্‌কীনকে কাপড় দিবে অর্থাৎ লুঙ্গি, কোর্তা (টুপি) দিবে। প্রত্যেক মিস্‌কীনকে এত পরিমাণ কাপড় দিবে, যদ্দ্বারা তাহার শরীরের অধিকাংশ ঢাকিতে পারে। যেমন, হয়ত বড় একটি চাদর অথবা বড় একটি জামা। কিন্তু কাপড় যদি বেশী পুরাতন হয়, তবে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। আর যদি প্রত্যেক মিস্‌কিনকে এক একখানা লুঙ্গি বা এক একটি পায়জামা দেয়, তবে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। লুঙ্গি বা পায়জামা দিলে তাহার সঙ্গে কোর্তাও দিতে হইবে। পুরুষকে কাপড় দেওয়ার এই হুকুম। আর যদি কোন গরীব মেয়েলোককে কাপড় দেয়, তবে এত পরিমাণ কাপড় দিবে, যদ্দ্বারা সে সমস্ত শরীর ঢাকিয়া নামায পড়িতে পারে, ইহার কম হইলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। খাওয়ান এবং কাপড় দেওয়া এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে এখ্‌তিয়ার আছে যেটি ইচ্ছা সেটি দিতে পারিবে।

২। মাসআলাঃ যদি কেহ এমন গরীব হয় যে, ১০ জন মিস্‌কীনকে খাওয়াইতে বা কাপড় দিতে পারে না তবে সে একসঙ্গে তিনটি রোযা রাখিবে। পৃথক পৃথকভাবে তিনটি রোযা রাখিলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না, তিনটি রোযা এক লাগা রাখা দরকার। এমন কি, যদি দুইটি রোযা রাখার পর কোন কারণবশতঃ রোযা রাখিতে না পারে, তবে পুনরায় নূতনভাবে তিনটি রোযা একত্রে রাখিতে হইবে।

৩। **মাসআলা** ঃ কসম ভঙ্গ করিবার আগেই কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। কসম ভঙ্গ করার পর আবার কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে। কিন্তু পূর্বে মিস্‌কীনকে যাহাকিছু দান করিয়াছে তাহা ফেরত লওয়া দুরুস্ত নহে।

৪। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ কয়েকবার কসম খায়, যেমন একবার বলিল, খোদার কসম অমুক কাজ করিব না, তারপর ঐ দিন বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন আবার বলিল, খোদার কসম, অমুক কাজ করিব না। মোটকথা, এইরূপে কয়েকবার বলিল, অথবা এইরূপ বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, খোদার কসম, কালামুল্লাহ্‌র কসম অমুক কাজ নিশ্চয়ই করিব, পরে ঐ কসম ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তবে এইসব কসমের একই কাফ্‌ফারা দিবে। যদি কেহ কোন কাজ করিবার কসম খায়, যেমন বলিল, খোদার কসম আমি কিছুতেই মিথ্যা কথা বলিব না, তবে যতবার মিথ্যা কথা বলিবে ততটি কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

৫। **মাসআলা** ঃ যদি কাহারও যিম্মায় কয়েকটি কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়, তবে সব কাফ্‌ফারাই পৃথক পৃথক আদায় করিতে হইবে। যদি জীবিত অবস্থায় শেষ করিতে না পারে, তবে মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব।

৬। **মাসআলা** ঃ যাহারা যাকাত গ্রহণ করার উপযুক্ত, কাফ্‌ফারা শুধু তাহাদিগকেই দেওয়া যাইবে, (কেননা, মালদারকে বা কোন সাইয়্যেদকে দেওয়া দুরুস্ত নহে।)

বাড়ী ঘরে না যাওয়ার কসম

১। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ বলে যে, খোদার কসম আমি কখনও তোমার বাড়ীতে যাইব না, তবে শুধু বাড়ীর দেউড়িতে গেলে, বাড়ীর ভিতর না ঢুকিলে কসম ভঙ্গ হইবে না। এইরূপে যদি কেহ বলে যে, খোদার কসম আমি তাহাদের ঘরে যাইব না, তবে যদি শুধু আঙ্গিনায় বা উঠানে যায়, বা ঘরের কিনারে দাঁড়ায়, তাহাতে কসম ভঙ্গ হইবে না। দরজার ভিতরে গেলে কসম ভাঙ্গিয়া যাইবে।

২,৩। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, খোদার কসম এই বাড়ীতে আমি কিছুতেই যাইব না, তবে যতক্ষণ সেই বাড়ীতে ঘর-দুয়ার থাকিবে, যদি ভগ্নাবস্থায়ও থাকে, তবুও সেখানে গেলে কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে। (এমন কি, ঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর নূতন ঘর উঠাইতে গেলেও কসম টুটিয়া যাইবে।) অবশ্য যদি বাড়ীর ভগ্নাবশেষও না থাকে জমিন সমান হইয়া যায় বা ময়দান হইয়া যায়, মসজিদ বা বাগিচা বানাইয়া লওয়া হয়, তবে সেখানে গেলে কসম ভঙ্গ হইবে না।

৪। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, খোদার কসম! তোমার বাড়ীতে আমি কিছুতেই যাইব না এবং পরে বাড়ীর দরজা দিয়া না যাইয়া ছাদ টপ্‌কাইয়া ঘরের ছাদের উপর যায়, তবুও কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে, যাদিও নীচে না নামে।

৫। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ কাহার বাড়ীর মধ্যে বা ঘরের মধ্যে বসিয়া বলে যে, খোদার কসম এখানে কখনও আসিব না এবং পরে তথায় অল্পক্ষণ থাকে, তবে কসম ভঙ্গ হইবে না, যে কত দিনই তথায় থাকুক। বাহির হইয়া আসিলে তখন কসম ভঙ্গ হইবে। ইহা বাড়ীতে বা ঘরে আসা সম্বন্ধে হুকুম। কিন্তু যদি কেহ বলে, খোদার কসম এই কাপড় পরিব না, এই বলিয়া যদি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলে, তবে কসম ভঙ্গ হইবে না। আর যদি তৎক্ষণাৎ না খুলিয়া কিছুক্ষণ পরিয়া থাকে, তবে কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৬। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, এই ঘরে আমি থাকিবই না, তবে যদি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে আসবাব-পত্র সরান আরম্ভ করে, তবে কসম ভঙ্গ হইবে না; কিন্তু যদি কিছুক্ষণ দেরী করে তবে কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৭। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, তোর বাড়ীতে আর পা রাাখিব না। অর্থ এই যে তোর বাড়ীতে আসিব না, এইরূপ কসম খাইয়া পরে যদি পাল্‌কিতে বা ডুলিতে চড়িয়া ঐ বাড়ীতে আসে এবং মাটিতে পা না দিয়া পাল্‌কিতে বা ডুলিতে বসিয়া থাকে, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে।

৮। **মাসআলাঃ** কেহ বলিল, খোদার কসম তোমাদের বাড়ীতে কোন না কোন সময় যাইব। পরে যদি আর সে বাড়ীতে না যায়, তবে যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন কসম ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য যখন মরিয়া যাইবে, তখন কসম ভঙ্গ হইবে। এইরূপ অবস্থা হইলে মৃত্যকালে তাহার অছিয়ত করিয়া যাওয়া উচিত যে, আমার মাল হইতে একটি কসমের কাফ্‌ফারা দিয়া দিও।

৯। **মাসআলাঃ** যদি কেহ বলে, খোদার কসম অমুকের বাড়ীতে যাইব না, তবে সে ব্যক্তি যে বাড়ীতে বাস করে, সেখানে না যাওয়া চাই, উহা তাহার নিজস্ব বাড়ী হউক বা ভাড়াটিয়া বাড়ী হউক বা পরের বাড়ী ধার করিয়া থাকুক।

১০। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, আমি তোমাদের বাড়ীতে যাইব না এবং তারপর কাহাকেও বলে যে, তুমি আমাকে কোলে করিয়া সেই বাড়ী পৌঁছাইয়া দাও এবং সে পৌঁছাইয়া দেয়, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। অবশ্য সে বলা ব্যতীত অন্য কেহ যদি সেই বাড়ীতে বহিয়া নিয়া যায় তবে কসম টুটিবে না। অর্থাৎ যদি কসম খায় যে, আমি কখনও এই বাড়ী হইতে যাইব না, তারপর যদি কাহাকেও বলে—আমাকে কোলে করিয়া বাহিরে নিয়া যাও, আর সে যদি লইয়া যায়, তবে কসম ভঙ্গ হইবে। না বলা সত্ত্বেও যদি বাহিরে লইয়া যায়, তখন কসম টুটিবে না।

পানাহার সম্বন্ধে কসম

১। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খাইল—এই দুধ আমি খাইব না, তারপর যদি সেই দুধের দৈ খায়, তবে তাহাতে কসম ভঙ্গ হইবে না।

২। **মাসআলাঃ** যদি কেহ বলে, খোদার কসম, এই বকরীর বাচ্চার গোশ্‌ত আমি খাইব না, তারপর যদি বকরীর বাচ্চা বড় হইয়া বকরী বা খাসী হইয়া যায়, তখন তাহার গোশ্‌ত খায়, তবুও কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৩। **মাসআলাঃ** যদি কসম খায় যে, আমি গোশ্‌ত খাইব না, তার পর যদি মাছ কিংবা কলিজা বা ওঝোড়ি খায়, তবে কসম টুটিবে না।

৪। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, এই গম খাইব না। তারপর যদি উহা পিষিয়া রুটি বানাইয়া খায় বা উহার ছাতু খায়, তবে কসম টুটিবে না। আর যদি সেই গম সিদ্ধ করিয়া বা ভাজা করিয়া খায়, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি এই অর্থে বলে যে, উহার আটার কোন জিনিসই খাইব না, তবে উহার যে কোন জিনিস খাইলে কসম টুটিয়া যাইবে।

৫। **মাসআলাঃ** যদি কসম খায় যে, এই আটা খাইব না। পরে উহার রুটি খাইলে কসম ভঙ্গ হইবে। আর যদি উহার হালুয়া বা অন্য কিছু পাকাইয়া খায়, তবুও কসম ভঙ্গ হইবে। কিন্তু যদি ঐ কাঁচা আটা গিলিয়া খায়, তবে কসম টুটিবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** যদি কসম খায় যে, রুটি খাইব না, তবে সেই দেশে যে যে জিনিসের রুটি খাওয়ার প্রচলন আছে তাহার কোন রুটিই খাইতে পারিবে না। খাইলে কসম টুটিয়া যাইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ বলে, খোদার কসম, কল্লা খাইব না। তারপর যদি চড়ুইর মাথা বা মুরগীর মাথা খায়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না। অবশ্য বকরীর বা গরুর মাথা খাইলে কসম টুটিয়া যাইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** কেহ কসম খাইল মেওয়া খাইব না, তবে আনার, সেব, আঙ্গুর খুরমা, বাদাম, আখরোট, কিসমিস, মোনাক্কা, খেজুর খাইলে কসম টুটিবে।

কথা না বলার কসম

১। **মাসআলা ঃ** কসম খাইল যে, অমুক স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিব না, তারপর যদি নিদ্রাবস্থায় তার সঙ্গে কথা বলে এবং তাহার আওয়াযে স্ত্রীলোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কসম টুটিয়া যাইবে।

২। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ বলে, খোদার কসম, আম্মার অনুমতি ভিন্ন অমুকের সঙ্গে কথা বলিব না, তারপর যদি আম্মা কথা বলিবার অনুমতি দেয়, কিন্তু সে অনুমতির খবর পাইবার আগেই যদি তাহার সঙ্গে কথা বলে, তবে কসম ভঙ্গ হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলিব না, তারপর সেই মেয়েটি যুবতী হইলে বা বুড়ী হইলে যদি তাহার সহিত কথা বলে, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, কখনও তোর মুখ দেখিব না বা কখনও তোর ছুরত দেখিব না, তবে এইরূপ কথার অর্থ এই যে, তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ উঠা-বসা, মেলা-মেশা, কাজ-কারবার ইত্যাদি করিবে না। অতএব, যদি দূর হইতে ছেহারা নযরে পড়িয়া যায় তাহাতে কসম টুটিবে না।

ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে কসম

১। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, অমুক জিনিস কিনিব না। তারপর যদি অন্য কাহারও দ্বারা সেই জিনিস কেনায়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না। এইরূপ যদি কসম খায় যে, আমি অমুক জিনিস বেচিব না, তারপর অন্য কাউকে বলে যে, ভাই তুমি আমার এই জিনিসটা বেচিয়া দাও এবং সে বেচিয়া দেয়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না। এইরূপে যদি কেহ কসম খায় যে, আমি এই বাড়ী কেরায়া করিব না এবং তারপর অন্য কাহারও দ্বারা কেরায়া করায়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না। কিন্তু কসম খাওয়ার বেলায় যদি নিয়ত ও অর্থ এই লইয়া থাকে যে, নিজেও কিনিব না, অন্য কাহারও দ্বারা কেনাইব না বা নিজেও বেচিব না, অন্য কাহারও দ্বারা বেচাইব না, নিজেও কেরায়া করিব না কাহারও দ্বারাও কেরায়া করাইব না, তবে অবশ্য কসম টুটিয়া যাইবে অর্থাৎ বলিবার সময় যে অর্থে বলিবে সেই অনুযায়ী হুকুম হইবে। যে সব বড় লোকের ছেলে বা মেয়ে নিজের হাতে এইসব বেচা-কেনার কাজ করে না, সে অন্যের দ্বারা করাইলেও কসম টুটিয়া যাইবে।

২। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, আমি আমার এই ছেলেকে মারিব না এবং তারপর যদি অন্যের দ্বারা মারায়, তবে কসম টুটিবে না।

রোযা-নামাযের কসম

১। মাসআলাঃ যদি কেহ শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া এইরূপ কসম খায় যে, সে রোযা রাখিবে না, তবে যখন সে রোযার নিয়ত করিবে মুহূর্ত পরেই তাহার কসম টুটিয়া যাইবে। দিন পুরা হইবার দরকার পড়িবে না। রোযার নিয়ত করার কিছুক্ষণ পরেই যদি রোযা তুড়িয়া দেয়, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে এবং কাফ্ফারা দিতে হইবে। আর যদি এইরূপ কসম খায় যে, একটি রোযাও রাখিব না, তবে এফ্তারের সময় টুটিবে। যদি সারা দিন রোযা রাখিয়া ইফ্তারের ওয়াক্ত আসিবার পূর্বে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে কসম টুটিবে না।

২। মাসআলাঃ যে কেহ কসম খায় যে, আমি নামায পড়িব না, অতঃপর লজ্জিত হইয়া নামায পড়িতে দাঁড়ায়, তবে যখন প্রথম রাকা'আতের সজ্দা করিবে, তখন কসম টুটিবে। সজ্দার পূর্বে কসম টুটিবে না। এক রাকা'আত পড়িয়া যদি নামায ছাড়িয়া দেয় তবুও কসম টুটিয়া যাইবে। স্মরণ রাখিও, এইরূপ কসম করা শক্ত গোনাহ্। যদি এরূপ বোকামি হইয়া যায়, তবে ঐ কসম তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ করিবে এবং কাফ্ফারা দিবে।

কাপড় বিছানা ইত্যাদির কসম

১। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, এই কালীন বা সতরঞ্জির উপর আমি শুইব না, তারপর সতরঞ্জির উপর চাদর বিছাইয়া তাহার উপর শোয় বা বসে, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি সেই কালীনের উপর আর একটি কালীন বা সতরঞ্জি বিছাইয়া তাহার উপর শোয়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না।

২। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, মাটিতে বসিব না এবং তারপর মাটির উপর হোগলা, চাটাই, পাটি, চট বা অন্য কোন কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর বসে, তবে তাহার কসম টুটিবে না। কিন্তু যদি পরিধানের কাপড় বা গায়ের চাদরের আচল বিছাইয়া তাহার উপর বসে, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি পরিধানের কাপড় খুলিয়া তাহা বিছাইয়া তাহার উপর বসে, তবে কসম টুটিবে না।

৩। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, এই খাটিয়া বা চৌকির উপর বসিব না এবং তারপর চৌকির উপর সতরঞ্জি, পাটি বা গালিচা বিছাইয়া তাহার উপর বসে, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি সেই খাটিয়া বা চৌকির উপর আর একখানা চৌকি বা খাটিয়া বিছাইয়া উপরের চৌকিতে বসে, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না।

৪। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে অমুককে আমি কখনও গোছল করাইব না, তারপর যদি তাহার মৃত্যুর পর তাহাকে গোসল দেয়, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে।

৫। মাসআলাঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে কসম খাইয়া বলে যে, আমি তোমাকে কখনও মারিব না। তারপর যদি রাগের বশীভূত হইয়া চুলের খোপা ধরিয়া টানে বা গলা চিপিয়া ধরে বা কামড় দেয়, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি পেয়ার করিবার উদ্দেশ্যে (চুল টানে বা গলা জড়াইয়া ধরে বা) কামড়াইয়া ধরে, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না।

৬। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, অমুককে আমি নিশ্চয়ই মারিব; অথচ এইরূপ কসম খাওয়ার পূর্বেই সে মরিয়া গিয়াছে তবে যদি সে মৃত্যুর খবর জানা না থাকায় কসম খাইয়া থাকে, তাহা হইলে কসম টুটিবে না। আর যদি জানিয়া শুনিয়া এইরূপ কসম খাইয়া থাকে, তবে কসম খাওয়া মাত্রই কসম টুটিয়া যাইবে এবং কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

৭। মাসআলাঃ যদি কেহ কোন কাজ করার কসম খায়, তবে জীবনের মধ্যে যে কোন সময় একবার সেই কাজ করিলেই কসম পুরা হইয়া যাইবে। যেমন, যদি কেহ কসম খায় যে, আমি আনার নিশ্চয়ই খাইব, তবে জীবনের মধ্যে কোন এক সময় আনার খাইলেই তাহার কসম ঠিক থাকিবে, কসম ভঙ্গ হইবে না। আর যদি কোন কাজ না করার কসম খায়, তবে জীবনের মধ্যে সেই কাজ কখনও করিতে পারিবে না; যখনই করিবে তখনই কসম টুটিবে। যেমন, যদি কেহ কসম খায় যে, আমি আনার খাইব না, তবে জীবনের মধ্যে কখনও আনার খাইতে পারিবে না। কিন্তু যখনই আনার খাইবে তখনই কসম টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি খাছ করিয়া বলে, যেমন, বাড়ীতে আনার আনিলে ইহার সম্বন্ধে যদি বলে যে, এই আনার আমি কিছুতেই খাইব না, তবে শুধু সেই আনার খাইতে পারিবে না, অন্য আনার বাজার হইতে আনাইয়া খাইলে তাহাতে কসম টুটিবে না।

কাফের বা মোর্‌তাদ হওয়া

[মোর্‌তাদ হওয়ার অর্থ ইসলাম ধর্ম অস্বীকার করা বা পরিত্যাগ করা।]

১। মাসআলাঃ যদি কোন মুসলমান খোদা না করুক ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে, তবে তাহাকে তিন দিনের সময় দেওয়া হইবে; তাহার দেলে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহার উত্তর দেওয়া হইবে; এবং তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। যদি তিন দিনের মধ্যে তওবা করে, তবে ত ভালই, আর যদি তওবা না করে, তবে মৃত্যু পর্যন্ত আবদ্ধ রাখিতে হইবে। যখন তওবা করিবে তখন ছাড়া যাইবে।

২। মাসআলাঃ কুফরী কথা (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে, খোদা ও রসূলের বিরুদ্ধে ও কোরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে কোন কথা) মুখ দিয়া বাহির করা মাত্রই ঈমান চলিয়া যায় এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যত নেক কাজ করিয়াছে তাহা পণ্ড ও বাতিল হইয়া যায়, বিবাহ নষ্ট হইয়া যায়, যদি ফরয হজ্জ করিয়া থাকে, তাহা বাতেল হইয়া যায়। পুনরায় যদি তওবা করিয়া মুসলমান হয়, তবে নেকাহ্‌ পুনরায় নূতনভাবে করিতে হইবে, মালদার হইলে পুনরায় হজ্জ করিতে হইবে।

৩। মাসআলাঃ যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী (তওবা! তওবা!!) মোর্‌তাদ হইয়া যায়, (অর্থাৎ কোন কথা বা কাজ দ্বারা কাফের প্রমাণিত হইয়া যায়।) তবে ঐ স্ত্রী লোকের নেকাহ্‌ টুটিয়া যাইবে। তাহার স্বামী তওবা করিয়া মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তাহার সহিত কোনই সম্পর্ক রাখিতে পারিবে না। ঐ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী ব্যবহার করিলে স্ত্রীও গোনাহ্‌গার হইবে। যদি স্বামী জোর জবরদস্তি করে, তবে স্ত্রীর শরম করা উচিত নহে। মুসলমান সমাজের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবে। ঈমান রক্ষার জন্য শরম ত্যাগ করিবে। যে প্রকারেই হউক আলগ থাকিয়া ঈমান বাঁচাইতে হইবে।

৪। মাসআলা ঃ কুফরী কথা যদি মুখ হইতে বাহির করে, ঈমান চলিয়া যাইবে। যদি হাসি ঠাট্টাভাবে বলে, দেলে নাও থাকে, তবুও এই হুকুম। যেমন, কেহ বলিল, আল্লাহ্‌র কি ক্ষমতা নাই যে, অমুক কাজ করিয়া দিতে পারে? তদুত্তরে বলিল হাঁ, "ক্ষমতা নাই" তবে কাফের হইবে।

৫। মাসআলা ঃ কেহ বলিল, চল নামায পড়িতে যাই। তদুত্তরে যদি সে বলে, কে যায়, উঠক-বৈঠক করিতে, তবে কাফের হইয়া যাইবে। এইরূপে কেহ বলিল, রোযা রাখ, তদুত্তরে যদি সে বলে, কে না খাইয়া মরে, বা যার ঘরে ভাত নাই, সে-ই রোযা রাখুক, তবে সে কাফের হইবে।

৬। মাসআলা ঃ কাহাকেও কোন গোনাহ্‌র কাজ করিতে দেখিয়া যদি কেহ বলে যে, খোদার ভয় নাই যে, এমন কাজ করিতেছিস, তদুত্তরে যদি সে বলে, (নাউযুবিল্লাহ্) "হাঁ খোদার ভয় নাই" তবে সে কাফের হইবে।

৭। মাসআলা ঃ এইরূপে কাহারও কোন শরীঅত বিরুদ্ধ কাজ করিতে দেখিয়া যদি কেহ বলে যে, আরে তুই কি মুসলমান না? এমন কাজ করিতেছিস; তদুত্তরে সে বলে যে, হাঁ "মুসলমান না," তবে সে কাফের হইয়া যাইবে। যদি ঠাট্টা করিয়াও বলে, তবুও কাফের হইয়া যাইবে।

৮। মাসআলা ঃ যদি কেহ নামায পড়া আরম্ভ করার পর তাহার উপর কোন বিপদ-আপদ, বালা-মুছীবত আসিয়া পড়ায় বলে যে, এসব নামাযের নহুছতের কারণে হইতেছে, তবে সে কাফের হইয়া যাইবে।

৯। মাসআলা ঃ যদি কেহ কাফেরের কোন কাজ পছন্দ করে এবং বলে, যদি কাফের হইতাম তবে ভাল হইত, এবং আমরাও এরূপ করিতাম, তবে কাফের হইয়া যাইবে। (নাউযুবিল্লাহ্)

১০। মাসআলা ঃ কাহারও ছেলে মারা যাওয়ায় বলিল, হে আল্লাহ্, আমার উপর এই যুলুম কেন করিলে, আমাকে পেরেশান করিলে? ইহা বলায় কাফের হইয়া যাইবে।

১১। মাসআলা ঃ যদি কেহ এইরূপ বলে যে, এই কাজ যদি খোদাও আমাকে করিতে বলে, তবুও করিব না,বা এইরূপ বলে যে, জিব্‌রায়ীল যদি আসমান হইতে নামিয়া আসিয়াও আমাকে এই কাজ করিতে বলে, তবুও আমি তাহার কথা মানিব না। তবে সে কাফের হইয়া যাইবে। (তওবা না করিলে চির জাহান্নামী হইবে।)

১২। মাসআলা ঃ কেহ বলিল, আমি এমন কাজ করিব যে, তা খোদাও জানে না, বা খোদা আমার দ্বারা এমন কাজ কেন করাইল? ইহাতে কাফের হইয়া যাইবে।

১৩। মাসআলা ঃ কেহ যদি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার কোন রাসূলকে তাচ্ছিল্য করে, কিংবা শরীঅতের কোন বিষয়কে খারাব মনে করে, দোষ বাহির করে, কুফরীর কোন বিষয়কে পছন্দ করে, তবে এসব কাজে ঈমান চলিয়া যায়। যে সমস্ত কুফরী বিষয়ে ঈমান চলিয়া যায়, তাহা প্রথম খণ্ডে আকীদার বয়ানের পর বর্ণিত হইয়াছে। আর নিজের ঈমানের হেফাযতের জন্য খুব সতর্ক হওয়া দরকার। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলের ঈমান কায়েম রাখুন এবং ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করেন। আমীন!

যবাহ্

১। মাসআলা ঃ যবাহ্ করার নিয়ম এই যে, জানোয়ারের মুখ কেব্‌লা তরফ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর" বলিয়া গলা কাটিতে হইবে। গলায় চারিটি রগ আছে। একটি রগ শ্বাস-প্রশ্বাসের, একটি পানাহারের এবং দুইটি পার্শ্বের মোটা রগ, মোট এই চারিটি রগ

কাটিতে হইবে। যদি ঘটনাক্রমে চারিটি রগ না কাটিয়া তিনটি কাটে, তবুও জানোয়ার হালাল হইবে, কিন্তু যদি তিনটির কম কাটে, তবে উহা মৃত গণ্য হইয়া হারাম হইয়া যাইবে।

২। **মাসআলা ঃ** যবাহ্ করার সময় যদি ইচ্ছা করিয়া বিস্‌মিল্লাহ্ না পড়ে, তবে জানোয়ার মরা লাশের মধ্যে গণ্য হইয়া হারাম হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি ভুলে না বলিয়া থাকে, তবে গোশ্‌ত খাওয়া দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** ভোঁতা ছুরি দ্বারা বা কম ধারাল ছুরি দ্বারা যবাহ্ করা মাকরূহ্। ছুরি ধারাল না হইলে জানোয়ারের কষ্ট হয়। (কোন জীবকে অযথা কষ্ট দেওয়া শরীঅতে নিষেধ।) যবাহ্ করার পর জানোয়ার ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে চামড়া খসান, হাত পা কাটা, ভাঙ্গা বা সমস্ত গলা কাটিয়া দেওয়া মাকরূহ্।

৪। **মাসআলা ঃ** মুরগী যবাহ্ করিবার সময় ভুলক্রমে যদি সমস্ত গলা কাটিয়া যায়, তবে মুরগী খাওয়া দুরুস্ত আছে। অবশ্য গলা সম্পূর্ণ কাটিয়া দেওয়া মাকরূহ্। মুরগী খাওয়া মাকরূহ্ হইবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** মুসলমান পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক, তাহার যবাহ্ খাওয়া হালাল। এমন কি, (যদি কোন নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া যবাহ্ করে বা) কেহ নাপাক অবস্থায় যবাহ্ করে, তবুও তাহা হালাল। কাফেরের যবাহ্ খাওয়া হারাম।

৬। **মাসআলা ঃ** ছুরির অভাবে ধারাল পাথর, ইস্পাত বাঁশ বা আখের ধারাল বাক্‌ল দ্বারা যবাহ্ করা দুরুস্ত। পাথরের আঘাতে বা বন্দুকের গুলীতে মরিয়া গেলে হালাল হইবে না। দাঁত বা নখ দ্বারা যবাহ্ করা দুরুস্ত নাই।

হালাল-হারামের বয়ান

১। **মাসআলা ঃ** পশু বা পাখীর মধ্যে যাহারা শিকার ধরিয়া খায়, কিংবা যাহাদের খাদ্য শুধু নাপাক বস্তু, সেই পশু-পাখী খাওয়া জায়েয নাই। যেমন, বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, শৃগাল, শূকর, বিড়াল, বানর, (বেজী। এইরূপে পক্ষীর মধ্যেও যে সব পক্ষী পায়ের দ্বারা শিকার ধরিয়া খায় ; যেমন) বাজ, চিল, শিকরা, শকুন, কালকাক, ঈগল পক্ষী ইত্যাদি। পশু বা পক্ষীর মধ্যে যে সমস্ত পশু বা পক্ষী শিকার ধরিয়া খায় না, তাহা খাওয়া হালাল ; যেমন, গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া, মুর্‌গী, হাঁস ময়না, টিয়াপাখী, বক, চড়ূই, বটের পানিকড়ি, কবুতর, বন্যগরু, হরিণ, খরগোস, বন্যমুরগী, বন্যহাঁস, ইত্যাদি সব জায়েয।

২। **মাসআলা ঃ** সজারু, গোসাপ, কচ্ছপ, খচ্চর, গাধা খাওয়া দুরুস্ত নাই। গাধার দুধ খাওয়াও জায়েয নহে। ঘোড়া খাওয়া জায়েয আছে বটে, কিন্তু জেহাদের সামান বলিয়া আমাদের ইমাম ছাহেব মাকরূহ্ বলিয়াছেন। পানির মধ্যে যে সমস্ত জীব বাস করে, তন্মধ্যে একমাত্র মাছ খাওয়া জায়েয, তাছাড়া অন্য সব না-জায়েয।

(**মাসআলা ঃ** হালাল জানোয়ারের ভিতর পেশাব পায়খানা ব্যতীত আরও সাতটি জিনিস না-জায়েয। যেমন, রক্ত, রগ, পিত্ত, পুরুষাঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, মুত্রাশয় ও অণ্ডকোষ।)

৩। **মাসআলা ঃ** মাছ এবং টিড্ডি ব্যতীত অন্য জানদার যবাহ্ ছাড়া হালাল হইতে পারে না। মাছ এবং টিড্ডির জন্য যবাহের দরকার নাই, অন্যান্য হালাল পশু-পক্ষী যবাহ্ ছাড়া খাওয়া জায়েয নহে। যবাহ্ ব্যতীত প্রাণ বাহির হইয়া গেলে তাহা হারাম।

৪। **মাসআলা ঃ** মাছ পানিতে আপনা আপনি মরিয়া চিৎ হইয়া ভাসিলে খাওয়া জায়েয নহে। (যদি গরমি, আঘাত বা চাপাচাপির কারণে মরিয়া ভাসে, তবে খাওয়া জায়েয আছে।

৫। **মাসআলা ঃ** গরু ছাগলের নাড়িভুড়ি খাওয়া হালাল। হারামও নয়, মাক্‌রূহ্‌ও নয়।

৬। **মাসআলা ঃ** দৈ, চিনি বা গুড়ের মধ্যে পিঁপ্‌ড়া পোকা পড়িয়া থাকিলে তাহা ছাফ করিয়া খাইতে হইবে। ছাফ না করিয়া খাওয়া জায়েয নহে। ছাফ না করিলে যদি এক আধটি পিঁপড়া বা পোকা হলকুমের মধ্যে চলিয়া যায়, তবে মরা খাওয়ার গোনাহ্‌ হইবে। কোন কোন মূর্খেরা বলে যে, (আমের পোকা খাইলে সাঁতার শিখে,) এবং জগডুমুরের পোকা খাইলে চোখ উঠে না, এসব মিথ্যা কথা। ঐ সব পোকা খাওয়া হারাম, খাইলে মরা খাওয়ার গোনাহ্‌ হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** হিন্দুর দোকান হইতে বকরী, মুর্গী বা অন্য কোন শিকারের গোশ্‌ত কিনিয়া খাওয়া জায়েয নহে। এমনকি, যদি সে দোকানদার বলে যে, মুসলমানের দ্বারা যবাহ্‌ করাইয়া আনিয়াছি তবুও তাহা খাওয়া জায়েয নহে। অবশ্য যদি যবাহের সময় হইতে ক্রয়ের সময় পর্যন্ত অনবরত কোন মুসলমান লক্ষ্য করিয়া থাকে, এক মিনিটও অদৃশ্য না হইয়া থাকে এবং সেই মুসলমান বলে যে, আমি দেখিয়াছি মুসলমানই যবাহ্‌ করিয়াছে এবং যবাহ্‌র সময় হইতে এই সময় পর্যন্ত এক মিনিটের জন্যও আমি গাফেল হই নাই, তবে সেই গোশ্‌ত খাওয়া জায়েয হইবে। (এইরূপে হিন্দুর তৈয়ারী ঔষধের মধ্যে গোশ্‌ত বা কলিজার সার মিশ্রিত থাকে তাহাও ব্যবহার করা জায়েয নহে।

৮। **মাসআলা ঃ** যে সব মুরগী খোলা থাকে এবং না-পাক খাইয়া বেড়ায়, তাহা তিন দিন বন্ধ রাখিয়া যবাহ্‌ করিবে। তিন দিন না বাঁধিয়া খাইলে মাকরূহ্‌ হইবে।

নেশা পান

১। **মাসআলা ঃ** সর্বপ্রকারের মদ, শরাব, তাড়ি হারাম এবং না-পাক। ঐ সব ঔষধরূপেও ব্যবহার করা জায়েয নহে। এমন কি, যে ঔষধের মধ্যে শরাব, বা তাড়ি মিশ্রিত করা হইয়াছে, তাহা পান করা, খাওয়া, বাহিরে মালিশ লাগানও জায়েয নহে। (শরাবের এক ফোঁটা যদি তাহাতে বিন্দুমাত্রও নেশা না হয়, তবুও হারাম।)

২। **মাসআলা ঃ** শরাব এবং তাড়ি ব্যতীত (অর্থাৎ, তরল পদার্থ, ব্যতীত কঠিন পদার্থের) যত প্রকার নেশাদার বস্তু আছে, (যেমন আফিম, জা'ফরান, ভাঙ্গ, তামাক ইত্যাদি) তাহা যদি ঔষধের জন্য এত কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয় যাহাতে আদৌ নেশা না হয়, জায়েয আছে এবং এইরূপে নেশার জিনিসের তৈয়ারী ঔষধের মালিশ লাগানও জায়েয আছে, কিন্তু নেশা পরিমাণ খাওয়া হারাম।

৩। **মাসআলা ঃ** তাড়ি বা শরাবে অন্য কিছু মিশাইলে যদি সিরকা হয়, তবে তাহা খাওয়া জায়েয আছে।

৪। **মাসআলা ঃ** কোন কোন মেয়েলোক যাহাতে শিশু না কাঁদে সেই জন্য তাহাদিগকে আফিম দিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখে, ইহা সম্পূর্ণ হারাম।

সোনা বা রূপার পাত্র

১। **মাসআলা ঃ** সোনা বা রূপার যে কোন পাত্র ব্যবহার করা পুরুষ বা স্ত্রীলোক কাহারও জন্য আদৌ জায়েয নহে। সোনা-রূপার চামচ দ্বারা খাওয়া-দাওয়া, সোনা-রূপার খেলাল দ্বারা খেলাল করা, সোনা-রূপার সুরমাদানি বা সুরমার সলাই দ্বারা সুরমা লাগান, সোনা-রূপার আতরদানে আতর লাগান, সোনা-রূপার পানদান বা খাছদানে পান খাওয়া, সোনা-রূপার কৌটায় তৈল লাগান, যে খাটের পায়া সোনা-রূপার তাহার উপর শোয়া, বসা, সোনা-রূপার আয়নাতে মুখ দেখা (এবং সোনা-রূপার কলম দোয়াত, কলমদান ও ঘড়ি ব্যবহার করা)-ও হারাম। অবশ্য মেয়েলোকেরা সোনা-রূপা জড়িত আয়না জেওররূপে ব্যবহার করিতে পারে; কিন্তু কখনও মুখ দেখিবে না। মোটকথা, সোনা-রূপার জিনিস কোন প্রকারেই ব্যবহার জয়েয নাই।

পোশাক ও পর্দা

১। **মাসআলা ঃ** ছোট ছেলেদের বালা, খাড়ু হাঁসলী ইত্যাদি জেওর বা রেশমের বা মখমলের কাপড় (টুপী বা পাগড়ী) পরান না-জায়েয। এইরূপে সোনা বা রূপার তাবিয গলায় দেওয়া, বা জা'ফরান বা কুসুম ফুলের রঙ্গিন কাপড় পরানও না-জায়েয। সারকথা এই যে, পুরুষের জন্য যাহা না-জায়েয, ছেলেদের জন্যও তাহা না-জায়েয। অবশ্য যদি বানা (প্রস্থ) সূতার হয় এবং তানা (দৈর্ঘ্য) রেশমের হয়, মখমলের বানা যদি রেশমের না হইয়া সূতার হয়, তবে তাহা জায়েয আছে এবং ছেলেদের জন্যও জায়েয আছে। সোনা-রূপা বা রেশমের কামদার কাপড়, টুপী বা জুতা পরা পুরুষদের জন্যও জায়েয আছে; কিন্তু যদি চারি আঙ্গুলের বেশী হয় তবে জায়েয নাই।

২। **মাসআলা ঃ** (রেশম পুরুষের জন্য জায়েয নাই। এমন কি, কাপড়ের উপরে বা মাথায় রুমাল বা পাগড়ী বাঁধিলে তাহাও জায়েয নাই। অবশ্য চার আঙ্গুলের কম বা বানা সূতা হইলে জায়েয আছে। এইরূপে) টুপীতে, কাপড়ে বা পাগড়ীতে যদি রেশমের বা সোনা-রূপার এত ঘন কাম হয় যে, দূর হইতে শুধু সোনা-রূপা, রেশমই দেখা যায়, কাপড় একেবারেই দেখা যায় না, তবে জায়েয নাই। পাত্‌লা হইলে জায়েয আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** এমন পাতলা কাপড় যাহাতে সতর ঢাকে না, কাপড়ের নীচের শরীর ঝলকে দেখা যায়, যেমন মলমল, জালিদার কাপড় ইত্যাদি পরা এবং কাপড় না পরিয়া উলঙ্গ থাকা সমান কথা। হাদীস শরীফে আছে, 'অনেক কাপড় পরিধানকারিণী কিয়ামতের দিন উলঙ্গ সাব্যস্ত হইবে।' ইহা এইরূপ পাত্‌লা কাপড় পরিধান সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। আর যদি কোর্তা এবং উড়নী উভয়ই পাতলা হয়, তবে আরও মারাত্মক।

[পুরুষের জন্য টাখ্‌নু (পায়ের গিরা) স্পর্শ করে এরূপ লুঙ্গি, পায়জামা বা চোগা পরা হারাম। টাখ্‌নুর উপর পর্যন্ত কোর্তা পরা সুন্নত। ধূতি, পেন্ট, বা হাফপেন্ট পরা না-জায়েয। স্ত্রীলোকের জন্য পুরা আস্তিনের লম্বা কোর্তা পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা ঘাগরী এবং মাথার উড়নী ব্যবহার করা সুন্নত। পুরুষের জন্য কান পর্যন্ত বা কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা সুন্নত, সমস্ত চুল একেবারে কামাইয়া ফেলাও সুন্নত এবং আগে পাছে সমানভাবে খাট চুল রাখাও জায়েয আছে; কিন্তু পাছে

একেবারে ছোট এবং সামনে ঝুটির মত রাখা জায়েয নাই। স্ত্রীলোকেরও সম্পূর্ণ চুল রাখিতে হইবে, বাবরীর মত রাখা জায়েয নাই। পুরুষেরও মেয়েলোকের মত লম্বা চুল রাখা জায়েয নাই। মেয়েলোক চুল বেণী করিয়া বা খোঁপা বাঁধিয়াও রাখিতে পারে।]

৪। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকদের জন্যও পুরুষদের ছুরত ধরা, পুরুষের মত কাপড়-জুতা পরা জায়েয নাই। যে সব মেয়েলোক পুরুষদের ন্যায় ছুরত বানায়, হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম তাহাদের লা'নত করিয়াছেন। মুসলমান পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের জন্য কাফেরদের ছুরত ধরা, লেবাস-পোশাক, খাওয়া-বসা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে তাহাদের অনুকরণ করা জায়েয নাই। এইরূপে মুসলমান পুরুষের জন্য মুসলমান আওরতের অনুরূপ কাপড়, জুতা জেওর পরাও জায়েয নাই।

৫। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকদের জন্য হরেক রকমের জেওর-অলঙ্কার পরা জায়েয আছে। কিন্তু বেশী জেওর না পরাই ভাল। কেননা, যাহারা দুনিয়াতে জেওর পরিবে না, তাহারা বেহেশ্‌তে অনেক বেশী জেওর পাইবে। যে জেওরে শব্দ হয়, তাহা পরা জায়েয নাই। যেমন, ঝুনঝুনি, বাজনাদার খাড়ু ইত্যাদি ছোট মেয়েদেরও পরান জায়েয নাই। সোনা, রূপা ছাড়া অন্যান্য জেওর পরাও জায়েয আছে; যেমন পিতল, গিল্‌টি, তামা, দস্তা ইত্যাদি। কিন্তু আংটি সোনা, রূপা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর জায়েয নাই। (এবং পুরুষের জন্য সোনার আংটিও জায়েয নাই, অন্য কোন জেওরও জায়েয নাই। শুধু এক সিকি পরিমাণ রূপার আংটি জায়েয আছে)।

৬। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকদের জন্য মাথা হইতে পা পর্যন্ত শরীর ঢাকিয়া রাখার হুকুম। গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে শরীরের কোন অংশই খোলা জায়েয নাই। বুড়া মেয়েলোকের জন্য শুধু হাতের পাতা এবং পায়ের পাতা খোলা জায়েয আছে। তাহা ছাড়া শরীরের অন্যান্য স্থান কোন ক্রমেই খোলা জায়েয নাই। মেয়েলোকদের মাথার কাপড় অনেক সময় সরিয়া যায় এবং সেই অবস্থায়ই কোন গায়ের মাহ্‌রাম আত্মীয়ের সামনে আসিয়া পড়ে; ইহা জায়েয নাই। গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে, পর হউক বা আপন এগানা হউক, একটি চুলও খোলা জায়েয নাই। এমন কি, মাথা আঁচড়াইতে যে চুল উঠিয়া আসে বা যে নখ কাটিয়া ফেলে তাহাও এমন কোন জায়গায় ফেলা উচিত নহে, যেখানে কোন গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের নযরে পড়িতে পারে। এরূপ করিলে গোনাহ্‌গার হইবে।

(দেশে সাধারণতঃ হাতের বাজু বা কোমর খোলা অবস্থায়ই দেওর, ভগ্নিপতি বা চাচাত মামাত ভাইদের সামনে আসিয়া পড়ে, ইহা কখনও জায়েয নাই।)

এরূপ কোন গায়ের মাহ্‌রামকে শরীরের কোন অংশ দেখান জায়েয নাই, তদ্রূপ নিজের হাত পা ইত্যাদি দ্বারা গায়ের মাহ্‌রাম কোন পুরুষকে স্পর্শ করাও জায়েয নাই। (এমন কি, পীরের কদমবুছি করা বা দেখা দেওয়াও জায়েয নাই।)

৭। **মাসআলা ঃ** যুবতী মেয়েলোকের জন্য গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে নিজের চেহারা দেখান জায়েয নাই এবং এমন জায়গায় বসা, শোয়া বা দাঁড়ানও জায়েয নাই, যেখানে পরপুরুষে দেখিতে পায়। এই মাস্‌আলা হইতে বুঝা গেল যে, কোন কোন জায়গায় গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষ আত্মীয়-স্বজনকে নূতন বৌ দেখাইবার যে প্রথা আছে, তাহা সম্পূর্ণ না-জায়েয এবং ভারী গোনাহ্‌।

৮। **মাসআলা ঃ** মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে চেহারা, মাথা, সিনা, হাতের কব্জি, পায়ের নালা যদি খুলিয়া যায়, তবে গোনাহ্‌ হইবে না। কিন্তু পেট, পিঠ এবং রান তাহাদের সামনেও খুলিবে না।

৯। মাসআলা : (পুরুষদের জন্য যেমন নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত কোন পুরুষের সামনেও খোলা জায়েয নাই, তদ্রূপ) মেয়েলোকদের জন্যও হাঁটু হইতে নাভি পর্যন্ত কোন মেয়েলোকের সামনে খোলা জায়েয নাই। কোন কোন মেয়েলোক অন্য মেয়েলোকের সামনে উলঙ্গ গোসল করে, ইহা বড়ই নির্লজ্জতা ও না-জায়েয কাজ।

১০। মাসআলা : (যরূরত পড়িলে যতটুকু যরূরত ততটুকু দেখান যাইতে পারে, তাহার চেয়ে বেশী দেখান এবং যাহাকে দেখান দরকার তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও দেখান জায়েয নাই, এবং অন্যের জন্য দেখাও জায়েয নাই। ধরুন, রানের উপর যদি ফোঁড়া হয় এবং ডাক্তারকে দেখানের দরকার পড়ে, তবে শুধু ফোঁড়ার জায়গাটুকু দেখাইবে, বেশী দেখাইবে না। এইরূপ অবস্থায় দেখাইবার নিয়ম এই যে, পুরাতন কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া শুধু ফোঁড়ার জায়গাটুকু ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া দিলে চিকিৎসক শুধু সেই জায়গাটুকু দেখিয়া লইবে, আশপাশে আদৌ দেখিবে না। কিন্তু চিকিৎসক ছাড়া অন্য কোন পুরুষ বা মেয়েলোক ঐ ফোঁড়ার জায়গাটুকুও দেখিতে পারিবে না। অবশ্য যদি হাঁটু এবং নাভির মাঝখান ছাড়া অন্য কোন জায়গায় ফোঁড়া হয়, তবে তাহা অন্য মেয়েলোকেও দেখিতে পারিবে। কিন্তু অন্য পুরুষে দেখিতে পারিবে না। মূর্খ মেয়েলোকেরা প্রসবকালে এভাবে উলঙ্গ করিয়া লয় যে, সব মেয়েলোকেই দেখে; উহা বড়ই গর্হিত প্রথা। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : "সতর যে দেখিবে এবং যে দেখাইবে উভয়েরই উপর আল্লাহ্‌র লা'নত পড়িবে!" এ ব্যাপারে খুব সতর্ক হওয়া উচিত।

১১। মাসআলা : গর্ভকালে এবং অন্য কোন কারণে যদি ধাত্রী দ্বারা পেট মলিবার দরকার পড়ে, তবে নাভির নীচের শরীর খোলা জায়েয নাই। কোন কাপড় রাখিয়া তাহার উপর দিয়া মলিবে। বিনা যরূরতে ধাত্রীকেও দেখান জায়েয নাই। সাধারণতঃ পেট মলিবার সময় ধাত্রীও দেখে এবং মা বোন, খালা, ফুফু, দাদী, নানী, চাচী, মামী, ননদ ইত্যাদি বাড়ীর অন্যান্য মেয়েলোকেরাও দেখে, ইহা জায়েয নাই।

১২। মাসআলা : শরীরের যে অংশ দেখা জায়েয নাই, তাহা ছোঁয়াও জায়েয নাই। অতএব, গোসলের সময় যদি কেহ রান ইত্যাদি না খুলিয়া কাপড়ের তলে হাত দিয়া শরীর পরিষ্কার করায়, ইহা জায়েয নহে। অবশ্য দরকারবশতঃ যদি কাপড় হাতে পেঁচাইয়া পরিষ্কার করে, তবে তাহা জায়েয আছে।

১৩। মাসআলা : প্রত্যেক গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের ও প্রত্যেক গায়ের মাহ্‌রাম স্ত্রীলোকের যে পরিমাণ পর্দা করা ফরয, কাফের মেয়েলোক হইতেও সে পরিমাণ পর্দা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, যেমন কোন বুড়া গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে আসিতে হইলে শুধু হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখখানা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত শরীর ঢাকিয়া আসিতে হইবে, একটি চুলও খোলা রাখিতে পারিবে না, তদ্রূপ কোন কাফের মেয়েলোকের সামনে আসিতে হইলেও কেবলমাত্র হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখ ব্যতীত অন্য সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। উপরের এবারতের এই অর্থ। নতুবা যুবতী মেয়েলোকের জন্য ত কোন গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখও খোলা জায়েয নাই। এমন কি, সমস্ত শরীর ঢাকিয়া ও সুন্দর কাপড় পরিয়া সামনে আসাও জায়েয নাই। অবশ্য যদি পুরাতন মলিন কাপড় পরিয়া আপাদ-মস্তক (সমস্ত শরীর) ঢাকিয়া কোন দরকারবশতঃ সামনে আসে, তবে

তাহা জায়েয আছে বটে। সাধারণতঃ মেয়েলোকেরা মনে করে যে, মেয়েলোক হইতে আবার পর্দা কিসের? কিন্তু এই মাসআলার দ্বারা জানা গেল যে, হিন্দু মেয়েলোক বা খৃষ্টান মেম হইতেও পর্দা করা ওয়াজিব। তাহাদের সামনেও কেবলমাত্র হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখ ব্যতীত শরীরের একটি অংশও খোলা জায়েয নাই। মেয়েলোকদের এই মাসআলাটি খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার। এই মাসআলায় আরও জানা গেল যে, ধাত্রী যদি হিন্দু বা খৃষ্টান ইত্যাদি অমুসলমান মেয়েলোক হয়, তবে শুধু আবশ্যকীয় স্থান ব্যতিরেকে হাতের বাজু বা পায়ের নালা, মাথা, গলা ইত্যাদি তাহাকে দেখাইলে গোনাহ্‌গার হইতে হইবে।

১৪। **মাসআলা ঃ** স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী এবং স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কোন পর্দা নাই। স্বামী স্ত্রীর সর্বাঙ্গ দেখিতে এবং ছুইতে পারে; কিন্তু বিনা যরূরতে এরূপ করা ভাল নয়।

১৫। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকের জন্য যেমন পর-পুরুষের সামনে আসা, পর-পুরুষকে দেখা দেওয়া জায়েয নাই এবং পুরুষদের জন্যও যেমন পর-স্ত্রীলোককে দেখা জায়েয নাই, তদ্রূপ স্ত্রীলোকদের জন্যও পর পুরুষকে দেখা জায়েয নাই। মেয়েলোকেরা সাধারণতঃ মনে করে যে, পর-পুরুষদের সহিত দেখা দেওয়া জায়েয নাই, কিন্তু পর-পুরুষদেরে দেখাতে কোন ক্ষতি নই; এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অতএব, মেয়েলোকেরা যে নূতন দুলহাকে দেখে বা বেড়ার ফাঁক দিয়া, ছাদের উপর দিয়া এবং জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া ভিন্ন পুরুষদেরে দেখে, তাহা জায়েয নহে।

১৬। **মাসআলা ঃ** গায়ের মাহ্‌রাম কোন পুরুষদের সঙ্গে কোন স্ত্রীলোকের এবং গায়ের মাহ্‌রাম কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন পুরুষের এক কামরায় বা এক ঘরে অন্য লোক না থাকাবস্থায় শোয়া বা থাকা জায়েয নাই; যদিও বসার বা শোয়ার বিছানা কিছু কিছু দূরে হয়, তবুও জায়েয নাই।

১৭। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকের জন্য নিজের পীরকেও দেখা দেওয়া জায়েয নাই। এইরূপে পালক ছেলে বয়স্ক হইলে তাহাকেও দেখা দেওয়া জায়েয নাই। ধর্ম-বাপ ও ধর্ম-ভাইকে দেখা দেওয়া জায়েয নাই। দেওর, ভাসুর, ভগ্নিপতি, নন্দাই, চাচাত ভাই, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, খালাত ভাই, খালু-শ্বশুর, মামু-শ্বশুর, চাচা-শ্বশুর ইত্যাদি গায়ের মাহ্‌রাম পরম আত্মীয়গণকেও দেখা জায়েয নাই।

১৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকেদের জন্য গায়ের মাহ্‌রাম হিজ্‌ড়া, খোজা, অথবা অন্ধের সামনে আসাও জায়েয নাই।

১৯। **মাসআলা ঃ** কোন কোন মেয়েলোক এত বে-হায়া যে, চুড়ি বিক্রেতা দোকানদারের হাত দ্বারা চুড়ি হাতে পরে, পুরুষ ত দূরের কথা, হিন্দু মেয়েলোকের হাতে, এমন কি, যে সব মুসলমান মেয়েলোক বে-পর্দায় বেড়ায়, তাহাদের হাতের দ্বারাও এইরূপ চুড়ি হাতে পরা জায়েয নাই।

(**মাসআলা ঃ** মেয়েলোকের আওয়াজেরও পর্দার হুকুম আছে)।

পর্দা সম্বন্ধে আয়াত ও হাদীস—বর্ধিত

ইসলাম ধর্ম জগতে আসিয়া জগৎবাসীকে যাবতীয় সুনীতি শিক্ষা দিয়াছিল এবং মানব যাহাতে সম্মান ও সুখ্যাতি বজায় রাখিয়া, ঈমান সালামতে রাখিয়া, সুসন্তান জন্মাইয়া ইহজগৎ পরজগৎ উভয় জগতকে সুন্দর করিয়া গঠন করিতে পারে, সেইসব মহাশিক্ষা আমাদিগকে দান করিয়াছিল।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, একদল লোক পর্দা ফরযের সুনীতিকে উঠাইয়া দিতেছে, অথচ কোরআন এবং হাদীসে পর্দার জন্য যে কত তাম্বীহ্ রহিয়াছে তাহা তাহারা বুঝিতেছে না। তাহা ছাড়া বিবেক বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিলে এবং বাহ্যিক জগতের ঘটনাবলীর দ্বারা যৌক্তিক প্রমাণ হাছিল করিলেও যে তাঁহাদের ভুল ধরা পড়িত এবং ভুল ধারণা দূরীভূত হইত তাহাও তাহারা করিতেছে না।

আমি এখানে হযরত মাওলানা থানভী রহ্মতুল্লাহি আলাইহির একটি কিতাব হইতে কতিপয় কোরআনের আয়াত এবং হাদীসের তর্জমা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, পর্দা প্রথা পালন করা কত যরূরী। —অনুবাদক

আয়াতসমূহ ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى ـ (احزاب)

অর্থ—'তোমরা (হে আওরতগণ!) তোমাদের ঘরের (বাড়ীর চতুঃসীমানার) ভিতর (আবদ্ধ) থাক এবং বাহিরে বাহির হইও না, যেমন প্রাথমিক মূর্খ যুগের মেয়েরা বাহির হইত।' —সূরা-আহ্যাব

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ○ (احزاب)

অর্থ—'তোমরা (পুরুষগণ) যখন তাহাদের (আওরতদের) নিকট কোন জিনিস চাহিবে, তখন পর্দার আড়ালে থাকিয়া চাহিবে।' —সূরা-আহ্যাব

কোরআনের আয়াত দ্বারা কত পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে 'কোন জিনিস চাওয়ার যরূরত সত্ত্বেও পর্দা লঙ্ঘন করার এজাযত নাই, তবে হাওয়া খাইতে বা দুনিয়ার জ্ঞান হাছিল করার জন্য পর্দা লঙ্ঘন করা জায়েয হইবে কি প্রকারে?'

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ○

অর্থ—'হে নবী! আপনি আপনার বিবিগণকে এবং আপনার কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুসলমান নারীগণকে বলিয়া দিন যে, (কোন যরূরতবশতঃ যখন তাহাদের বাহিরে যাওয়ার দরকার পড়ে, তখনও যেন তাহারা পর্দার ফরয লঙ্ঘন না করে। এমন কি, চেহারাও যেন খোলা না রাখে।) তাহারা যেন বড় চাদরের ঘোম্টা দ্বারা তাহাদের চেহারাকে আবৃত করিয়া রাখে।' —পারা ঃ ২২ সূরা-আহ্যাব

এই আয়াতে দরকারবশতঃ বাহিরে যাওয়ার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ (الى قوله) اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ○

অর্থ—'আপনি মুসলিম রমণীদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন চক্ষু নীচের দিকে রাখে এবং তাহাদের সতীত্ব ও ইয্যত-আবরুকে খুব হেফাযত করিয়া রাখে এবং যেন তাহাদের সৌন্দর্য (শরীরের সৌন্দর্য, কাপড়ের সৌন্দর্য এবং অলঙ্কারের সৌন্দর্য যে কোন সৌন্দর্যই হউক) প্রকাশ না করে।—অবশ্য যতটুকু অগত্যা প্রকাশ না হইয়াই পারে না, তাহা মাফ এবং তাহারা যেন উড়নী চাদর দ্বারা গলা, মাথা, বুক ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখে এবং বাহিরে যেন না বেড়ায়, অথবা হাঁটিবার সময় পা যেন জোরে না মারে। কারণ, এইরূপ করিলে তাহাদের যে সৌন্দর্য লুকাইয়া রাখিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।' (সূরা-নূর, পারা ১৮, রুকূ ১০)

পাঠক-পাঠিকা, দেখুন, পা পর্যন্ত জোরে মারা নিষেধ, তবে কি সুন্দর সুন্দর কাপড় পরিয়া বেড়াইবার বা চেহারা দেখাইবার অধিকার থাকিতে পারে? পা জোরে মারিলে তাহার শব্দে লম্পট যুবকদের মনে কতটুকু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইতে পার? তাহাই যখন নিষিদ্ধ হইল, তখন চেহারা দেখিলে ত সাধু পুরুষগণেরও ঠিক থাকা মুশ্‌কিল, তাহা কি প্রকাশ করা জায়েয হইতে পারে?

لَا تُخْـرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ○ (سورة الطلاق)

অর্থ—'হে পুরুষগণ! তোমরা তাহাদিগকে (আওরতদিগকে) তাহাদের (ঘর-বাড়ী) হইতে বাহির করিয়া দিও না এবং তাহারা নিজেরাও যেন বাহির না হয়। (কারণ, আওরতের জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়া অত্যন্ত বে-হায়ায়ির কাজ)। অবশ্য যদি কেহ অত্যন্ত নির্লজ্জতার কাজ করে, তাহাকে বাহির করিয়া দিবে। এগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা (আইন)। যে আল্লাহ্‌র সীমা অতিক্রম করিবে (বা যে আল্লাহ্‌র আইন লঙ্ঘন করিবে) সে নিজের জানের উপর যুলুমকারী সাব্যস্ত হইবে।'

স্ত্রীজাতির সৃষ্টিগত স্বভাব এবং প্রকৃতিগত নিয়ম যে, বাড়ীর ভিতরে থাকা, তাহা অতি সুষ্ঠুরূপে এই আয়াতে প্রমাণিত হইতেছে।

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَـاحِشَـةَ مِنْ نِّسَـآئِكُمْ فَاسْتَشْهِـدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْ هُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○

অর্থ—(যিনার শাস্তি একশত কোড়া, অথবা সঙ্গেসার করা, এই হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বের কথা বলিয়াছেন) আর যে সব মুসলমান স্ত্রীলোক যিনা করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ করার জন্য চারিজন পুরুষ সাক্ষীর দরকার। যখন চারিজন মুসলমান পুরুষ সাক্ষ্য দিবে, তখন তাহাদিগকে (ঐ যিনাকারীদিগকে) ঘরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু আসে, অথবা আল্লাহ্‌ই (শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া) তাহাদের জন্য কোন পন্থা করিয়া দেন।' (যেমন, পরে অবিবাহিতের একশত কোড়া, আর বিবাহিতের সঙ্গেসারের হুকুম করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন।)

এখানে প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধীকেও পর্দার বাহির করিতে নিষেধ করা হইতেছে।

হাদীসসমূহ ঃ

(১) اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ـ (ترمزى)

অর্থ—'স্ত্রীজাতি আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া রাখিবার বস্তু। যখনই তাহারা পর্দার বাহির হয়, তখন শয়তান তাহাদের পাছে উঁকি ঝুঁকিতে লাগিয়া যায়।' —তিরমিযী

(২) اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهٖ ـ (ترمزى)

অর্থ—একদা হযতর নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ীর ভিতর বসিয়া ছিলেন। তাঁহার কাছে তাঁহার দুই বিবি হযরত উম্মে সালামা এবং হযরত মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে-উম্মে মক্‌তুম নামক একজন অন্ধ ছাহাবী হযরতের কাছে আসিতে চাহিলেন। হযরত তাঁহার বিবিদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ হুকুম করিলেনঃ 'তোমরা পর্দা কর।' তাঁহারা আরয করিলেনঃ হুযূর! ইনি তো অন্ধ; (ইনি তো আর) আমাদের

দেখিবেন না তাঁহা হইতে পর্দা করার দরকার কি?' হযরত বলিলেন, "তোমরাও কি অন্ধ! তোমরাও কি তাহাকে দেখিবে না?'

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, চিন্তা করুন। একদিকে নবী-পত্নী মুসলিম-জননী, আর এক দিকে অতি পরহেযগার সাধু চরিত্র নবী; আর এমন পবিত্র স্থানেও কি অন্ধ ছাহাবীর কোনরূপ কু-ধারণার আশঙ্কা ছিল? তাহা সত্ত্বেও হযরত স্বীয় উম্মতকে সুন্নত তরীকা এবং সাধারণ ইসলামী সুনীতি শিক্ষা দিবার জন্য আল্লাহ্‌র আইনের মর্যাদা রক্ষার্থে নিজের ঘরে আমল শুরু করিয়া কিরূপে স্ত্রীলোকদের পর্দা করিবার হুকুম দিয়াছেন।

(৩) اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ ـ (مشكواة)

অর্থ—জাহেলিয়াতের যমানার ঘটনা। সেকালে সতীত্ব রক্ষা খুব কমই হইত এবং নসল্‌ও খুব কমই ঠিক থাকিত। যাম'আহ্ নামক একজন লোক ছিল। উত্তর কালে তাহার কন্যা সওদাকে হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম বিবাহ করিয়াছিলেন। যাম'আর বাঁদীর সহিত উতবা নামক একজন লোক যিনা করিয়াছিল। সেই ঘরে একটি ছেলে পয়দা হইয়াছিল। সেই ছেলে লইয়া উতবার ভাই এবং যাম'আর জ্যেষ্ঠপুত্রের মধ্যে ঝগড়া হয়, সেই মকদ্দমার বিচার হযরতের দরবারে আসে। হযরত বিচার করিলেন—'শরীঅতের বিধান এই যে, যিনাকারীকে পাথর মারা হইবে এবং যাহার সহিত আক্‌দ হইয়াছে সন্তান তাহার থাকিবে।' এই সূত্রে ঐ ছেলে সওদা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার বৈমাত্রেয় ভাই হইল এবং মাহ্‌রাম হইল। কিন্তু উতবার ঔরষজাত বলিয়া রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি সওদাকে হুকুম দিলেন, 'হে সওদা! এই ছেলে তোমার ভাই বটে, কিন্তু সন্দেহ আছে, তাই তোমাকে ইহা হইতে পর্দা করিতে হইবে।' এই হুকুম পাওয়ার পর ঐ ছেলে যখন বালেগ হইল, তখন হইতে হযরত সওদা (রাঃ) জীবনে তাহাকে দেখা দেন নাই।

এখানে সন্দেহ হওয়াতে মাহ্‌রামের সহিত পর্দা করিবার হুকুম দিলেন।

(৪) اِيَّا كُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُالْمَوْتُ (بخارى مسلم)

অর্থ—হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, 'খবরদার! তোমরা মেয়েদের মধ্যে অবাধে যাতায়াত করিও না, (অর্থাৎ, যে বাড়ীতে বা ঘরে মেয়েলোক থাকে তথায় যাতায়াত করিও না বা যাতায়াত করার দরকার হইলে আওয়ায দিয়া পর্দা করিয়া তারপর বাড়ীর ভিতর বা ঘরের ভিতর ঢুকিও।') একজন লোক আরয করিল, 'হুযূর! দেওর সম্বন্ধে কি হুকুম? হুযূর বলিলেন, দেওর মৃত্যুসদৃশ, (দেওরের ত আরও বেশী ভয়'।)

(৫) لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ ـ (ترمذى)

অর্থ—হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, খবরদার! কোন ভিন্ন পুরুষই যেন কোন ভিন্ন মেয়েলোকের সহিত একাকী না থাকে। কারণ, যখনই কোন পুরুষ কোন মেয়েলোকের সহিত একাকী হয়, তখনই শয়তান হয় তাহাদের তৃতীয় এবং তাহাদের পাছে লাগে; (প্রথমে নানারূপ অসঅসা দেয়, তারপর আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।)

(৬) لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ — (بيهقى)

অর্থ—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, 'যে দেখিবে তাহার উপরও আল্লাহ্‌র লা'নত এবং যে দেখাইবে তাহার উপরও আল্লাহ্‌র লা'নত। অর্থাৎ, যদি কেহ বে-পর্দা চলে তাহার উপর আল্লাহ্‌র গযব পড়িবে এবং যে পর্দা সত্ত্বেও অথবা বে-পর্দাবশতঃ মেয়েলোকদের দেখিবে তাহার উপরও আল্লাহ্‌র গযব পড়িবে।

(৭) اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَنْ يَّصْلُحَ اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلَّا هٰذَا وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ ○

অর্থ—হযরত আয়েশার ভগ্নী হযরত আস্‌মা হযরত নবী আলাইহিস্‌সালামের শালী, একদিন কিছু পাতলা কাপড় পরিয়া হযরত নবী আলাইহিস্ সালামের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হযরত মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, 'দেখ আস্‌মা! মেয়েরা যখন বালেগা হইয়া যায়, তখন তাহার শরীরের কোন অংশই দেখা বা দেখান জায়েয নহে। এবং হাত ও মুখের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, কেবল মুখ এবং হস্তদ্বয়ের পাতা খোলা মা'ফ (করিয়া দেওয়া হইয়াছে) বটে।'

এই সমস্ত হাদীস এবং কোরআনের আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝে আসে যে, পর্দা প্রথা পালন করা কত যরূরী এবং হযরতের যামানায়, ছাহাবাদের যামানায়, তাবেয়ীন ও তাব্‌য়ে তাবেয়ীনদের যামানায় কেমন কঠোর পর্দা ছিল। কোরআনে বলা হইয়াছে, حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ অর্থাৎ, বেহেশ্‌তের মধ্যে যে সব হূর থাকিবে, তাহারাও খিমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশ্‌তের মধ্যেও পর্দার ব্যবস্থা থাকিবে। কারণ, ইহা স্ত্রী জাতির সৌজন্য, নৈতিক উন্নতি এবং শরাফতের পরিচায়ক।

অবশ্য পর্দার এই কড়া ব্যবস্থা এক দিনে করা সম্ভব হয় নাই এবং তাহা স্বাভাবিক নিয়মও নয়। প্রাথমিক যুগে কতিপয় বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমোন্নতির রীতি অনুযায়ী পর্দার হুকুম নাযিল করা হইয়াছে। কোন কোন হাদীসে যে, মেয়েলোকের বাহিরে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা সেই প্রাথমিক যুগের কথা, অথবা যরূরতবশতঃ নানা রকম শর্ত লাগাইয়া বাহিরে যাওয়ার বা শরীরের কিছু অংশ খোলা রাখিবার এজাযত দেওয়া হইয়াছে। সে অবস্থায়ও পুরুষদের কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহারা যেন চক্ষু নীচে রাখে, চোখের দ্বারা যেন না দেখে। স্ত্রীগণকে কঠোর আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন রাস্তার কেনারা দিয়া চলে, মাঝখান দিয়া না চলে, খোশ্‌বু লাগাইয়া বা সুন্দর কাপড় পরিয়া যেন বাহির না হয়। ময়লা কাপড় দ্বারা আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া বাহির হয় ইত্যাদি।

(৮) اَوْمَتْ اِمْرَاَةٌ مِّنْ وَّرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابُ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○ (ابوداؤد و نسائى)

অর্থ—'একটি মেয়েলোক একখানা চিঠি রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্দার আড়ালে থাকিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়াছিল।

বুঝা গেল, হযরতের সঙ্গেও সে যামানার মেয়েলোকেরা পর্দা করিত এবং পর্দার আড়ালে থাকিয়া কথাবার্তা বলিত। হযরত যদিও সমস্ত পৃথিবীর রূহানী পিতা, তা সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গে পর্দা করা হইত।

এতদ্ভিন্ন বোখারী ও মোসলেম শরীফে হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীস আছে, তিনি হযরতের সঙ্গে জেহাদের সফরে হাওদার মধ্যে থাকিতেন। হাওদা পাল্কীর মত উটের পিঠের উপর বাঁধিয়া রাখা হয়। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) রাত অন্ধকার থাকিতে কাযায়ে-হাজতের জন্য জঙ্গলে গিয়াছিলেন। হযরতের খাদেমগণ টের না পাইয়া খালি হাওদাই উটের পিঠের উপর বাঁধিয়া দিয়াছিল এবং তৎকারণে হযরত আয়েশা (রাঃ) বিপদে পড়িয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, জেহাদের সফরেও পর্দা পালন করিতেন।

(৯) قِصَّةُ الْفَتٰى الْحَدِيْثِ الْعَهْدِ بِعُرْسٍ فَاِذَا امْرَاَتُهٗ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ فَاَهْوٰى اِلَيْهَا بِرُمْحٍ لِيَطْعَنَهَا بِهٖ وَاَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ — (مسلم)

অর্থ—মোছলেম শরীফে আছে—'একজন যুবক নূতন শাদী করিয়া জেহাদে গিয়াছিলেন' একদিন হঠাৎ বাড়ী আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার স্ত্রী বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। এতদ্দর্শনে তিনি ক্রোধে আধীর হইয়া নিজ স্ত্রীকে বল্লম দ্বারা আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। পরে জানিতে পারিলেন যে, এক বিষধর সাপের কারণে সে দরজা পর্যন্ত আসিতে বাধ্য হইয়াছিল।'

১০। মাসআলাঃ মোছলেম শরীফের হাদীসে আছে, 'হযরত আনাছ (রাঃ) হযরত যয়নব রাযিয়াল্লাহু আন্হার বিবাহের অলিমার ঘটনা বয়ান করিলেন। তিনি বলেন, তখন পর্দার হুকুম ছিল না। লোকেরা অলিমার দাওয়াত খাইবার জন্য হযরতের বাড়ীর ভিতর আসিয়াছিল। খাওয়ার পর সব লোক চলিয়া গেল; কিন্তু ২/৩ জন লোক আর যায় না, অথচ হযরতের শরমবোধ হইতেছিল; তাঁহার মনে চাহিতেছিল, তাহারা চলিয়া গেলে ভাল হইত, তিনি তাঁহার বিবিগণের সহিত আলাপ করিবার বা আরাম করিবার সুযোগ পাইতেন; কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। পরে হযরত বাহানা করিয়া নিজেই উঠিয়া গেলেন, আমিও সঙ্গে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন দেখিলাম, তাহারা চলিয়া গিয়াছে। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হইল, আমার মধ্যে এবং হযরতের মধ্যেও পর্দা লটকাইয়া দেওয়া হইল।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, এর আগে পর্দার হুকুম ছিল না। ইহাও জানা গেল যে, পর্দার হুকুম নাযিল হইয়াছে বিবি যয়নবের বিবাহের সময় আর্থাৎ, ৫ম হিজরীর শেষভাগে। প্রথম قرن فى بيوتكن আয়াতে যদি কোন কু-চক্রান্তকারী আলেম বলেন, এই হুকুম তো হযরতের বিবিদের করা হইয়াছে, তবে তাহার উত্তর এই যে, উপর নীচে খুব গওর করিয়া পড়িয়া দেখুন, বুঝে আসিবে যে, পর্দার হুকুম খাছ নয়, পর্দার হুকুম সকলের জন্যই আ'ম। কেননা, পর্দার হুকুমের হেকমত হইল—যাহাতে পুরুষ জাতি এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে যে চুম্বকের আকর্ষণের মত আকর্ষণ শক্তি রাখা হইয়াছে, পরস্পর দেখাশোনায় সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়া যেন তাহাদের স্বাস্থ্যহানি, মন চঞ্চল, চরিত্র কলুষিত, আত্মা অপবিত্র, বংশ নষ্ট, ঈমান খারাব ইত্যাদি না হইতে পারে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রতা, শরাফত, সম্মান ও মর্যাদা যেন বৃদ্ধি হয়। তবে সম্মান ও মর্যাদার হুকুম খাছ হইতে পারে বটে, কিন্তু চরিত্র কলুষিত হওয়ার আশঙ্কা যেখানে বেশী সেখানে পর্দার হুকুম না হইয়া যেখানে কম সেইখানে কি শুধু পর্দার হুকুম হইতে পারে? কাজেই পর্দার হুকুম আ'ম।

বিবিধ মাসায়েল

১। মাসআলাঃ প্রত্যেক সপ্তাহে নখ, চুল, মোচ, নাকের পশম, কানের পশম, বগলের পশম নাভির নীচের পশম ইত্যাদি কাটিয়া গোসল করিয়া (কাপড় চোপড় ধুইয়া) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাও মুস্তাহাব।

যদি কেহ প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবারে না পারে, তবে ১৫ দিন অন্তর করা চাই, বেশীর পক্ষে চল্লিশ দিনের বেশী ইজাযত নাই। যদি চল্লিশ দিন পার হইয়া যায় আর নখ চুল কাটিয়া ছাফ না করে, তবে গোনাহ্গার হইবে।

২। মাসআলাঃ নিজের মা-বাপ প্রভৃতি মুরব্বিদের এবং স্ত্রীলোকদের নিজের স্বামীকে নাম ধরিয়া ডাকা নিষেধ ও মকরূহ্। কেননা, ইহাতে বে-আদবি হয়। কিন্তু যরূরতের সময় যেমন মা-বাপের নাম উচ্চারণ করা জায়েয আছে, তদ্রূপ স্বামীর নাম উচ্চারণ করাও জায়েয আছে।

এইরূপে শুধু নাম লওয়ার আদব নয়; বরং উঠা-বসা, চলাফিরা, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া সব কাজেই আদব-তমীযের লেহায রাখা একান্ত আবশ্যক।

৩। **মাসআলা ঃ** কোন জানদার জীবকে আগুনে জ্বালান জায়েয নাই। যেমন, বোল্‌তা, মধুপোকা, পিঁপড়া, ছারপোকা ইত্যাদি। এই সবকে আগুন দিয়া জ্বালান বা আগুনে নিক্ষেপ করা জায়েয নাই। অবশ্য একান্ত ঠেকাবশতঃ বোল্‌তাকে আগুন দিয়া তাড়ান বা ছারপোকার উপর গরম পানি ঢালিয়া দিয়া তাহার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা জায়েয আছে।

৪। **মাসআলা ঃ** কোন কাজের জন্য দুই পক্ষ হইতে শর্ত করিয়া বাজী ধরা জায়েয নাই। যেমন, যদি কেহ বলে যে, যদি এক সের মিঠাই খাইতে পার, তবে আমি তোমাকে এক টাকা দিব, আর যদি না পার তবে আমাকে তোমার এক টাকা দিতে হইবে। অবশ্য যদি এক পক্ষ হইতে হয়, তবে তাহা জায়েয আছে। (যেমন, যদি কেহ বলে যে, এক ঘন্টার মধ্যে যদি এই সবক্‌টি ইয়াদ করিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে এক টাকা পুরস্কার দিব, এরূপ এক পক্ষ হইতে শর্ত হইলে জায়েয আছে।)

৫। **মাসআলা ঃ** দুইজন লোককে চুপে চুপে কথা বলিতে দেখিয়া তাহাদের অনুমতি না লইয়া কাছে যাওয়া উচিত নহে এবং লুকাইয়া তাহাদের কথা শুনা অতি বড় গোনাহ্। হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি লোকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লুকাইয়া তাহাদের কথা শুনিবে, কিয়ামতের দিন তাহার কানে সীসা ঢালা হইবে।' এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, শাদী বিবাহে নূতন বর-কনের কথাবার্তা বা তাহাদের আচার-ব্যবহার গোপনে শুনা বা দেখা অতি বড় গোনাহ্।

৬। **মাসআলা ঃ** স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা বা আচার-ব্যবহার অন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করা ভারী গোনাহ্। হাদীস শরীফে আছে, যে এইসব গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবে তাহার উপর আল্লাহ্‌র গযব পড়িবে।

৭। **মাসআলা ঃ** কাহারও সহিত হাসি-ঠাট্টা করা বা কাহাকেও গুদ্‌লি দেওয়া ঐ পরিমাণ জায়েয আছে, যে পরিমাণে শুধু হাসি আসে, মনে কষ্ট না পায়। যে ব্যক্তি মনে কষ্ট পায় তাহার সহিত, বা যত পরিমাণে হাসি-ঠাট্টা করিলে মনে কষ্ট পায়, তত পরিমাণ হাসি-ঠাট্টা করা বা কাতুকুতু দেওয়া জায়েয নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** বিপদে পড়িয়া নিজকে নিজে বদ্ দো'আ অভিশাপ দেওয়া বা মৃত্যু-কামনা করা জায়েয নাই।

৯। **মাসআলা ঃ** কড়ি, তাস, শতরঞ্জ, পাশা, (ফুটবল, হকি, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলা দুরুস্ত নাই। যদি নেশা হইয়া অভ্যাসগত না হইয়া যায় এবং কোন ফরয ওয়াজিব তরক না হয়, তবে তাহা মাক্‌রূহ্ তাহ্‌রীমী।) আর যদি বাজী লাগান হয় (বা নেশা হইয়া অভ্যাস হইয়া যায় বা কোন ফরয ওয়াজিব তরক হয়,) তবে উহা স্পষ্ট জুয়া এবং হারাম।

১০। **মাসআলা ঃ** ছেলে-মেয়ের বয়স দশ বৎসর হইয়া গেলে তাহাদের বিছানা পৃথক করিয়া দেওয়া দরকার, ভাইয়ে ভাইয়ে বা ভাইয়ে বোনে বা মেয়ে বাপে বা ছেলে মায়ে এক বিছানায় শুতে দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য যদি ছেলে বাপের কাছে এবং মেয়ে মার কাছে থাকে, তবে তাহা জায়েয আছে।

১১। **মাসআলা ঃ** হাঁচি দিলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্‌হামদু লিল্লাহ্) বলিয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র করা উত্তম। যে ব্যক্তি এই প্রশংসা (الحمد) শুনিবে উত্তরে তাহার يرحمكم الله (ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্)

বলা ওয়াজিব। না বলিলে গোনাহ্‌গার হইবে। তারপর আবার হাঁচিদাতার يَرْحَمُكَ اللهُ বলিয়া দো'আ দেওয়া উচিত; কিন্তু ইহা বলা ওয়াজিব নহে, মুস্তাহাব। হাঁচিদাতা স্ত্রী-লোক বা মেয়ে হইলে জবাবে বলিবে— يَرْحَمُكِ اللهُ আর হাঁচিদাতা পুরুষ বা ছেলে হইলে জবাবে يَرْحَمُكَ اللهُ বলিবে।

১২। মাসআলা ঃ হাঁচিদাতার "আলহামদুলিল্লাহ্" বলা যদি কয়েক জন লোকে শুনে, তবে সকলেই "ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্" বলা ভাল, কিন্তু সকলের উপর ওয়াযিব নহে, যদি একজনে মাত্র বলে, তবুও সকলে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবে, কিন্তু যদি কেহই না বলে, তবে সকলেই গোনাহ্‌গার হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ যদি কেহ বার বার হাঁচি দেয় এবং বার বার الحمد لله বলে, তবে তিনবার পর্যন্ত (يرحمك الله) বলা ওয়াজিব, তারপর ওয়াজিব নহে।

১৪। মাসআলা ঃ (যখন আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয়, তখন 'তা'আলা', 'জাল্লাজালালুহু' বা 'আম্মানাওয়ালুহু' বা 'তাবারাকাছ্মুহু' ইত্যাদি তা'যীম সূচক কোন শব্দ বলা ওয়াজিব। এইরূপে) যখন হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম লওয়া হয় তখন বক্তা, শ্রোতা এবং পাঠক সকলের উপরই অন্ততঃ একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। যদি কেহ না পড়ে, তবে সকলে গোনাহ্‌গার হইবে। যদি একই জায়গায় কয়েকবার হযরতের নাম মুবারক উচ্চারণ করা হয়, তবে প্রত্যেক বার দরূদ শরীফ পাঠ করা সকলের উপর ওয়াজিব হইবে না; কিন্তু স্থান পরিবর্তন হওয়ার পর নাম লইলে, বা শুনিলে পুনরায় পড়া ওয়াজিব হইবে। (এই সম্বন্ধে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকবারই ওয়াজিব হইবে, কেহ বলিয়াছেন যে, এক মজলিসে একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করিলেই গোনাহ্ হইতে বাঁচা যাইবে, কিন্তু সকলেরই যে দুরূদ শরীফ পাঠ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। হযরতের নাম মুবারকের পর صلى الله عليه وسلم 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' এই শব্দটুকু পাঠ করিলেই দুরূদ শরীফ পাঠের হুকুম আদায় হইয়া যাইবে এবং দশটি গোনাহ্ মা'ফ হইবে, দশটি নেকী লেখা যাইবে, দশটি দর্জা বুলন্দ হইবে।)

১৫। মাসআলা ঃ ছেলেদেরও সম্পূর্ণ মাথা মুড়াইয়া দেওয়া বা সমস্ত মাথায় এক রকম চুল রাখা উচিত। কতেক মুড়াইয়া কতেক রাখা বা এক দিকে খাট করিয়া আর এক দিকে লম্বা করা জায়েয নাই; (আর টিকি রাখা ত মুসলমানের কাজই নয়।)

১৬। মাসআলা ঃ মেয়েলোকদের জন্য খোশবু, সুগন্ধি (বা সেন্ট) এরূপভাবে লাগান জায়েয নাই যাহাতে ভিন্ন পুরুষ পর্যন্ত সুঘ্রাণ যায়।

১৭। মাসআলা ঃ না জায়েয কাপড় যেমন নিজে পরা জায়েয নাই। তদ্রূপ অন্যকে সেলাই করিয়া দেওয়াও জায়েয নাই। যেমন স্বামী যদি এমন পোশাক সেলাই করিতে স্ত্রীকে বলে যাহা তাহার জন্য পরা জায়েয নাই, তবে ওযর করিবে। এরূপে দর্জি মজুরীর বিনিময়ে এরূপ কাপড় সেলাই করবে না।

১৮। মাসআলা ঃ মিথ্যা কেচ্ছা কাহিনীর পুথি-পুস্তক, সনদবিহীন হাদীস পড়াও জায়েয নাই, বেচা-কেনাও জায়েয নাই। (যেমন তা'লনামা, ফালনামা, জঙ্গনামা, সোনাভান, বিষাদ-সিন্ধু ইত্যাদি।) এইরূপে যে সমস্ত নভেল নাটক বা গান গযলের মধ্যে রূপ-কাহিনী বা প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হয়, তাহাও পড়া বিশেষতঃ মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ না-জায়েয। (যেমন, বিদ্যাসুন্দর

নৌকাবিলাস ইত্যাদি।) এই ধরনের পুথি-পুস্তক ঘরে ছেলেমেয়েদের কাছে দেখিলে তাহা পোড়াইয়া ফেলিবে।

১৯। মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যেও সালাম মোছাফাহা করা সুন্নত। এ সুন্নত জারি করা উচিত। নিজেরা পরস্পর ইহা করিবে। (অনেকে সালামের পরিবর্তে 'আদাব' ব্যবহার করে এবং মোছাফাহার পরিবর্তে কদমবুছি করে। ইহা না করিয়া আস্‌সালামু আলাইকুম বলিয়া সালাম করা দরকার এবং হাতে হাত মিলাইয়া মোছাফাহা করা দরকার।)

২০। মাসআলা ঃ কোথাও মেহ্‌মান হইলে ফকীর ইত্যাদিকে কোন খাদ্য দিবে না। বাড়ীওয়ালার অনুমতি না লইয়া দেওয়া গোনাহ্‌।

২১। মাসআলা ঃ মানুষের বা অন্য কোন জানদার জীবজন্তুর ছবি বা মূর্তি আঁকা,রাখা বা বেচা-কেনা হারাম। অবশ্য জানদার ছাড়া অন্যান্য নির্জীব পদার্থের ছবি আঁকা, রাখা বা বেচা-কেনাতে কোন দোষ নাই।

২২। মাসআলা ঃ হালাল জানোয়ারও যদি বিনা যবাহ্‌তে মরিয়া যায়, তবে তাহার চামড়া দাবাগত (পাকা করা) ছাড়া বিক্রি করা জায়েয নাই। আবার যদি হারাম জানোয়ারও বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া যবাহ্‌ করা হয়, তবে তাহার চামড়া কাঁচাও বিক্রি করা জায়েয আছে; যেমন, গোসাপের বা উদের চামড়া ইত্যাদি। শূকর এবং মানুষের চামড়া বিক্রি করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নাই।

২৩। মাসআলা ঃ হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ এবং মেয়ে ছাহাবিগণ সাধারণতঃ এইরূপ পোশাক পরিধান করিতেন—নিম্ন শরীরে পায়জামা অথবা (পায়ের পাতা ঢাকে এমন) লুঙ্গী, ঊর্ধ্ব শরীরে পুরা আস্তিনের লম্বা কোর্তা এবং মাথায় উড়নী, চাদর এই তিন কাপড়ই সাধারণতঃ পরিতেন। বাড়ীর ভিতরে হাতের পাতা ও মুখ খোলাই থাকিত। বাড়ীর মধ্যে হাতের পাতা এবং মুখের পর্দার ব্যবস্থা ছিল যে, কাহারও বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে হইলে সালাম দিয়া, এজাযত লইয়া ঢুকিতে হইত এবং যখন কোন দরকারবশতঃ বাড়ীর বাহিরে নিকটে কোথাও যাওয়ার দরকার পড়িত, তখন বড় চাদর (আজকাল বোরকা) দ্বারা আপাদমস্তক ঢাকিয়া লইতেন।

পতিত জিনিস পাওয়ার বয়ান

১। মাসআলা ঃ রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে, সভা-সমিতিতে বা অন্য কোথাও পরের কোন জিনিস পতিত পাইলে তাহা নিজে লওয়া হারাম। যদি তাহা তথা হইতে উঠাইতে হয়, তবে এই নিয়তে উঠাইতে হইবে যে, মালিককে তালাশ করিয়া দিয়া দিব।

২। মাসআলা ঃ যদি এইরূপ কোন জিনিস পায়, আর না উঠায়, তবে তাহাতে গোনাহ্‌ নাই। কিন্তু যদি ভয় হয় যে, না উঠাইলে অন্য কোন দুষ্ট লোক হয়ত লইয়া যাইবে এবং মালিককে দিবে না, নিজেই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবে, তবে লওয়া এবং মালিককে খুঁজিয়া পৌঁছাইয়া দেওয়া ওয়াজিব।

৩। মাসআলা ঃ পতিত জিনিস উঠাইলে মালিককে তালাশ করাও ওয়াজিব এবং মালিক পাওয়া গেলে তাহাকে দিয়া দেওয়া ওয়াজিব। যদি মালিককে তালাশ করা কষ্টকর মনে করিয়া আবার যেখানকার জিনিস সেখানেই ফেলিয়া আসে, তবে তাহাতেও গোনাহ্‌গার হইবে। যদি জিনিস নিরাপদ জায়গায় পড়া থাকে, নষ্ট বা পর হস্তগত হওয়ার আশঙ্কাও না থাকে, সেইখান

থেকেও একবার উঠাইলে আর সেখানে ফেলিয়া আসা জায়েয নাই, মালিককে তালাশ করিতে হইবে (ওয়াজিব) এবং মালিককে দিতে হইবে।

৪। **মাসআলা** ঃ রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে, সভা-সমিতিতে বা অন্য যেখানে লোকের চলাচল বা লোক একত্র হয়, সেই সব জায়গায় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে হইবে যে, আমি একটি জিনিস পাইয়াছি, যাহার হয় আমার কাছ থেকে নিয়া যাইবেন। জিনিসের নাম লইবার সময় সম্পূর্ণ নাম নেশানা বলিয়া দিবে না। কেননা, হয়ত কেহ মিথ্যা ফাঁকি দিয়া লইয়া যাইতে পারে; কাজেই পুরা নাম নেশান না বলিয়া কিছু বলিয়া চাপা দিয়া রাখিবে। যেমন, হয়ত একখানা জেওর পাইয়াছি বা একখানা কাপড় পাইয়াছি বা একটি মানিবেগ পাইয়াছি, তাহাতে কিছু টাকা-পয়সা আছে ইত্যাদি। যে আসিয়া দাবী করিবে এবং সম্পূর্ণ নাম নিশান পুরাভাবে বলিতে পারিবে তাহাকে দেওয়া হইবে। মেয়েলোকে পাইলে স্বামী বা অন্য কাহারও দ্বারা পুরুষদের মধ্যে ঘোষণা করাইবে।

৫। **মাসআলা** ঃ যদি বহু তালাশের পর একেবারে নিরাশ হইয়া যায় যে, আর মালিককে পাওয়া যাইবার কোনই আশা নাই, তখন ঐ জিনিসটি কোন গরীব-দুঃখীকে দান করিয়া দিবে, নিজে রাখিবে না। অবশ্য যদি নিজেও গরীব-দুঃখী হয়, তবে নিজেও রাখিতে পারে, কিন্তু গরীবকে দিয়া দেওয়ার পর বা নিজে গরীব হওয়ার কারণে নিজেই গ্রহণ করার পর যদি মালিক আসিয়া দাবী করে, তবে মালিক সেই জিনিসের মূল্য ফেরত লইতে পারে। আর যদি সে খয়রাত দেওয়া মঞ্জুর করিয়া লয়, তবে খয়রাতের সওয়াব সে-ই পাইবে।

৬। **মাসআলা** ঃ পালা কবুতর, মুরগী, হাঁস, পালা তোতা, ময়না, ঘুঘু ইত্যাদি যদি হঠাৎ কাহারও বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং তাহা ধরিয়া রাখে, তবে মালিককে তালাশ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। নিজে গ্রহণ করা হারাম।

৭। **মাসআলা** ঃ বাগানের মধ্যে যদি আম, তাল বা নারিকেল, সুপারী ইত্যাদি পড়িয়া থাকে, তবে তাহা বাগানের মালিকের বিনা অনুমতিতে উঠাইয়া লওয়া এবং ভক্ষণ করা হারাম। অবশ্য যদি এমন কোন জিনিস হয় যে, তাহার কোন মূল্য নাই বা কেহ খাইতে লইলেও নিষেধ করে না বা খাইয়া ফেলিলে মনেও কোন কষ্ট পায় না, সে রকম জিনিস উঠাইয়া লওয়া, খাওয়া বা ব্যবহার করা জায়েয আছে। যেমন হয়ত রাস্তার মধ্যে একটি বরৈ বা বুট বা ছোলা বা কলাই দানা ইত্যাদি পাইল।

৮। **মাসআলা** ঃ যদি কোন বিরান ভিটায় বা মাঠের মধ্যে মাটিতে পোতা টাকা পয়সা কেহ পায়, তবে তাহারও মাসআলা পতিত জিনিস পাওয়ার মাসআলার অনুরূপ, অর্থাৎ মালিক তালাশ করিতে হইবে, নিজে ভক্ষণ করা জায়েয হইবে না। বহু তালাশের পরেও যদি মালিক না পাওয়া যায়, তবে খয়রাত দিয়া দিতে হইবে।

ওয়াক্‌ফ

১। **মাসআলা** ঃ একটি বাড়ী বা একটি জমি বা একটি বাগিচা, একটি গ্রাম যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করিয়া দেওয়া যায় যে, (মসজিদ বা মাদ্রাসার খরচ বা) ইহাতে যাহাকিছু উৎপন্ন হইবে তাহাতে গরীব-দুঃখীরা থাকিবে বা উপভোগ করিবে, এইরূপ কাজে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়, ইহাকেই 'ছদ্‌কায়ে জারিয়া' বলে।) অন্যান্য সব এবাদৎ-বন্দেগীর সওয়াব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে

বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু এই ধরনের ছদ্‌কায়ে জারিয়ার সওয়াব যতদিন ঐ সম্পত্তি থাকিবে এবং যতদিন গরীবের উপকার (এবং ইসলামের খেদমত) হইতে থাকিবে, কিয়ামত পর্যন্ত দাতার আমলনামায় সওয়াব লেখা হইতে থাকিবে।

২। **মাসআলা ঃ** নিজের কোন জিনিস ওয়াক্‌ফ করিয়া দিতে হইলে যাহাতে দানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, মক্‌ছুদ হাছিল হয়, সম্পত্তিটি ঠিক থাকে, কোনরূপে খেয়ানত বা চুরি না হয় বা বে-জাগায় খরচ না হয়, সেই জন্য একজন বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান ধার্মিক লোককে মোতাওয়াল্লি নিযুক্ত করা দরকার।

৩। **মাসআলা ঃ** ওয়াক্‌ফ করার পর সেই সম্পত্তির মালিক বা অধিকারী ওয়াক্‌ফকারীও হইবে না, মোতাওয়াল্লিও হইবে না; সে সম্পত্তি আল্লাহ্‌র সম্পত্তি হইয়া যাইবে। মোতাওয়াল্লি শুধু রক্ষণাবেক্ষণের এবং খেদমত গোযারির মালিক হইবে, সম্পত্তির মালিক হইবে না। সে সম্পত্তি মোতাওয়াল্লি বা পূর্বের মালিক কেহই বেচিতেও পারিবে না, কিনিতেও পারিবে না, রেহান দিতেও পারিবে না, কাহাকে দানও করিতে পারিবে না, শুধু যে উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া দিয়াছে সেই উদ্দেশ্যে খরচ করিতে হইবে বা সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খরচ হইতে হইবে, তাছাড়া অন্য কোন কাজে খরচ করা দুরুস্ত নহে।

৪। **মাসআলা ঃ** মসজিদের কোন জিনিস যেমন ইট, সুরকি, চুনা, কাঠ, লোহা, টিন, মাদুর, পাথর ইত্যাদি নিজস্ব কোন কাজে লাগান দুরুস্ত নহে। যদি কোন জিনিস অতিরিক্ত বা কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া যায়, তবুও তাহা নিজস্ব কাজে লাগান জায়েয নাই, তাহা বিক্রি করিয়া মসজিদেরই কাজে খরচ করা উচিত।

৫। **মাসআলা ঃ** ওয়াক্‌ফকারী যদি নিজের জীবিতকাল পর্যন্ত নিজেই মোতাওয়াল্লি থাকিতে চায়, তাহাও জায়েয আছে বা যদি এইরূপ শর্ত করিয়া লয় যে, যতদিন আমি জীবিত আছি ততদিন ইহার রক্ষণাবেক্ষণও আমি করিব এবং ইহার আয়ের এক চতুর্থাংশ বা অর্ধেক বা আমার দরকার পরিমাণ আমি রাখিব, বাকী অমুক বা অমুক ইসলামী মাদ্রাসায় বা গরীবদের দান করিব, তবে এইরূপ ওয়াক্‌ফ করাও এবং শর্ত অনুযায়ী আয়ের অংশ গ্রহণ করাও দুরুস্ত আছে, ইহাই ওয়াক্‌ফ করার সহজ উপায়। বিশেষতঃ সন্তানহীন লোকদের জন্য ইহা একটি উত্তম পন্থা। কেননা, ইহাতে নিজেরও ক্ষতি বা কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না এবং মৃত্যুর পর সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না; বরং চিরস্থায়ী নেকী সঞ্চয়ের উপায় হয়।

এইরূপে যদি কেহ এইরূপ শর্ত করিয়া লয় যে, এই সম্পত্তি হইতে এত অংশ বা এত টাকা আগে আমার আওলাদ পাইবে, বাকী যাহাকিছু থাকিবে তাহা অমুক নেক কাজে ব্যয় হইবে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। আওলাদকে উক্ত পরিমাণেই দেওয়া হইবে।

রাজনীতি—(বর্ধিত)

[রাজ্যস্থাপন, রাজ্য বিস্তার এবং রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ]

১। **মাসআলা ঃ** সমস্ত দুনিয়া আসলে খোদার রাজ্য। ন্যায়তঃ এবং আইনতঃ মানুষের রাজত্ব করিবার বা আইন গঠন করিবার কোনই অধিকার নাই। অবশ্য মানুষ খোদার দাসরূপে খোদার আইন লইয়া খোদার প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত বটে।

২। **মাসআলা** ঃ সমস্ত মুসলমানের একতাবদ্ধ হইয়া যোগ্যতম ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করিয়া সকলে তাঁহার তাবে'দারী করিয়া চলা ফরয।

৩। **মাসআলা** ঃ জেহাদ করা ফরয। কোন কোন সময় ফরযে আইন হয়; নতুবা সাধারণতঃ ফরযে কেফায়া থাকে।

৪। **মাসআলা** ঃ 'আম্‌রবিল মা'রূফ, 'নিহি আনিল মোন্‌কার' অর্থাৎ, ইসলামের অদিষ্ট কাজে ত্রুটি দেখিলে সেই কাজ করিতে আদেশ বা উপদেশ দেওয়া এবং ইসলাম বিরোধী কাজ দেখিলে সেই কাজ করিতে নিষেধ করাও ফরয। এই ফরযও কোন সময় ফরযে আইন হইয়া যায়, কোন সময় ফরযে কেফায়া থাকে।

৫। **মাসআলা** ঃ মুসলিম পতাকা তলে মুসলিম দলের সাহায্যার্থে যদি কোন অমুসলমান আসিতে চায়, তবে (দলপতি) যদি ইহা মুসলিম জাতির স্বার্থের অনুকূলে মনে করেন এবং সেই অমুসলমান যদি প্রবল না হয়, মুসলিম পতাকা তলে থাকা স্বীকার করিয়া থাকে, পৃথক পতাকা উত্তোলন করিবার বা বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা না থাকে এবং কোন বিষয় লইয়া মতভেদ হইলে কোরআন হাদীসকে অর্থাৎ খোদা রসূলকে সালিস-বিচারক স্বীকার করে, তবে তাহাকে দলভুক্ত করা বা তাহার সাহায্য লওয়া জায়েয আছে।

৬। **মাসআলা** ঃ জেহাদ করার নিয়্যত এই যে, ইমাম স্বয়ং সঙ্গে থাকিবেন, অথবা তিনি অপেক্ষাকৃত যরূরী কার্যে আবদ্ধ থাকিলে অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করিয়া মুসলিম ফৌজ পাঠাইবেন। মুসলিম ফৌজকে আমীরের হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ অমুসলমানকে ইসলাম ধর্মের দিকে আহ্বান করিতে হইবে যে, তোমরা বিশ্বপতি, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা এক আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমরাও যেমন স্বাধীন তোমরাও তদ্রূপ স্বাধীন হইবে, আমরা যেমন একমাত্র খোদার আইনের অধীন অন্য কাহারও অধীন নহি, তোমরাও তদ্রূপ একমাত্র খোদার আইনের অধীন হইবে অন্য কাহারও অধীন হইবে না। তিনবার করিয়া এইরূপ তাহাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে এবং বুঝাইতে হইবে। যদি তাহারা ইসলাম ধর্ম স্বীকার করিয়া লয়, তবে আর তাহাদের সঙ্গে কোন যুদ্ধবিগ্রহ নাই বা তাহাদের জন্য ভিন্ন আইন, আমাদের জন্য ভিন্ন আইন নাই; সকলই এক আইনভুক্ত চলিবে। যদি তাহারা ঐ ডাকে সাড়া না দেয়, তবে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে, তাহা হইলে তোমাদিগকে আমাদের অধীনস্থ প্রজা বা আমাদের অধীনস্থ করদ রাজ্যের ভিতর থাকিতে হইবে। যদি তাহারা অধীনতা স্বীকার করে, তবুও তাহাদের সহিত কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হইবে না। আর যদি তাহারা কিছুতেই পথে না আসে, তবে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সত্য ধর্মের জায়েয উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিতে হইবে।

৭। **মাসআলা** ঃ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা হারাম। আমীরের হুকুম পালন না করা হারাম। অবশ্য যদি পুনরায় আক্রমণের কৌশল করার উদ্দেশ্যে বা মুসলিম কেন্দ্রে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে কেহ পিছ পা হয়, তবে হারাম নহে। এইরূপে আমীর বা ইমাম যদি খোদানাখাস্তা আল্লাহ্‌র বা আল্লাহ্‌র রসূলের স্পষ্ট বাণীর বিরুদ্ধে কোন হুকুম দেন, তবে তাহা পালন করা ওয়াজিব হইবে না; বরং পালন করা জায়েযই নাই। কিন্তু যে সব ব্যাপারে দলীলের দিক দিয়া মতভেদ করার অবকাশ আছে, সেই-সব ব্যাপারে নিজের মতের বা মযহাবের বিরুদ্ধে বলিয়া আমীর বা ইমামের বিরুদ্ধাচরণ জায়েয হইবে না।

৮। **মাসআলাঃ** দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়া মানব সমাজে শান্তি রক্ষা করাই শাসন-নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য। শোষণ, প্রজাপীড়ন বা গৌরব প্রদর্শন কখনো শাসন-নীতির পর্যায়ভুক্ত নয়। বিশ্বস্ত সাক্ষীসূত্রে চুরি প্রমাণিত হইয়া গেলে চোরের উপদ্রব হইতে মানব সমাজকে বাঁচাইবার জন্য আল্লাহ্‌র আইনে শরীঅতের বিধানে চোরের শাস্তি তাহার হাত কাটিয়া দেওয়া, যাহাতে একজনের হাত কাটা দেখিলে আর কাহারও চুরি করার সাহস না থাকে। এইরূপ যিনা (ব্যভিচার) প্রমাণিত হইয়া গেলে তাহার শাস্তি সর্বসমক্ষে এক শত কোড়া লাগান বা প্রস্তরাঘাতে জীবনে মারিয়া ফেলা। নেশাপান, মিথ্যা তোহ্‌মত দান প্রমাণিত হইলে তাহার শাস্তি ৮০ কোড়া লাগান। খুন প্রমাণিত হইলে তাহার শাস্তি খুনের বদলে খুন বা যদি অনিচ্ছা সত্ত্বে মারাত্মক অস্ত্র বিহনে খুন হইয়া থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস্‌গণকে ১০০ উট বা ১০০০টি দিনার বা ১০০০০ দশ হাজার দেরহাম দিতে হইবে। যদি ডাকাতি প্রমাণিত হইয়া যায়, তবে তাহাদিগকে শূলে দিতে হইবে বা হাত পা কটিয়া দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ছোট ছোট অপরাধে ইমামের এবং বিচারকের রায়ের উপর সোপর্দ থাকিবে। তিনি যাহাতে শাসন হয় তাহাই করিবে।

প্রিয় পাঠক, শাসন-নীতি বা রাজনীতির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু দেখাইতে চাই যে, এইভাবে সুশাসন ও সুবিচার প্রবর্তিত হইলে দেশ কত শান্তিময় হইত। ঘুষ, মিথ্যা সাক্ষী, শোষণনীতি, অবিচার, অত্যাচার এইসব উঠিয়া গেলে গরীব প্রজারা কত সুখী হইত।

—অনুবাদক

২য় ভলিউম

বেহেশ্‌তী জেওর

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে ফকীহ্ বানাইয়া দেন।

বঙ্গানুবাদ

বেহেশ্‌তী জেওর

৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড

[দ্বিতীয় ভলিউম]

লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

আরয

হাম্‌দ ও ছালাতের পর বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট অধীনের বিনীত আরয এই যে, মুজাদ্দেদে যমান, কুত্‌বে দাওরান, পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রহ্‌মতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় সম্পূর্ণ জীবনটি ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন কিতাব ১০/১২ জিল্‌দেরও আছে। কিন্তু এইসব কিতাবের কপি রাইট তিনি রাখেন নাই বা কোন একখানি কিতাব হইতে বিনিময় স্বরূপ একটি পয়সাও তিনি উপার্জন করেন নাই। শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দ্বীন ইসলামের খেদমতে ও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত কিতাবের মধ্যে ১১ জিল্‌দে সমাপ্ত বেহেশ্‌তী জেওর একখানা বিশেষ যরূরী কিতাব। সমগ্র পাক-ভারতের কোন ঘর বোধ হয় বেহেশ্‌তী জেওর হইতে খালি নাই এবং এমন মুসলমান হয়ত খুব বিরল, যে বেহেশ্‌তী জেওরের নাম শুনে নাই। বেহেশ্‌তী জেওর আসলে লেখা হইয়াছিল শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য; কিন্তু কিতাবখানা এত সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও এত ব্যাপক হইয়াছে যে, পুরুষেরা এমন কি আলেমগণও এই কিতাবখানা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা পাইতেছেন।

বহুদিন যাবৎ এই আহ্‌কারের ইচ্ছা ছিল যে, কিতাবখানার মর্ম বাংলা ভাষায় লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলিম ভাই-ভগ্নীদিগের ইহ-পরকালের উপকারের পথ করিয়া দেই এবং নিজের জন্যও আখেরাতের নাজাতের কিছু উছীলা করি; কিন্তু কিতাব অনেক বড়, নিজের স্বাস্থ্য ও শরীর অতি খারাপ, শক্তিহীন; তাই এত বড় বিরাট কাজ অতি শীঘ্র ভাগ্যে জুটিয়া উঠে নাই। এখন আল্লাহ্‌ পাকের মেহেরবানীতে মুসলিম সমাজের খেদমতে ইহা পেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। মক্কা শরীফের হাতীমে বসিয়া এবং মদীনা শরীফের রওযায়ে-আক্দাসে বসিয়াও কিছু লিখিয়াছি। 'আল্লাহ্‌ পাক এই কিতাবখানা কবূল করুন এই আমার দো'আ এবং আশা করি, প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণও দো'আ করিতে ভুলিবেন না। এই পুস্তকে আমার বা আমার ওয়ারিশানের কোন স্বত্ব নাই ও থাকিবে না।

মূল কিতাবে প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গেই উহার দলীল এবং হাওয়ালা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উর্দু বেহেশ্‌তী জেওর কিতাব সব জায়গায়ই পাওয়া যায় এবং উর্দু ভাষাও প্রায় লোকেই বুঝে, এই কারণে আমি দলীল বা হাওয়ালার উল্লেখ করি নাই। যদি আবশ্যক বোধ হয়, পরবর্তী সংস্করণে দলীল ও হাওয়ালা দেওয়া হইবে। আমি একেবারে শব্দে শব্দে অনুবাদ করি নাই, খোলাছা মতলব লইয়া মূল কথাটি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছি। দুই একটি মাসআলা আমাদের দেশে গায়ের যরূরী মনে করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং কিছু মাসআলা যরূরত মনে করিয়া অন্য কিতাব হইতে সংযোজিত করিয়াছি। তা'ছাড়া বেহেশ্‌তী গওহরের সমস্ত মাসআলা বেহেশ্‌তী জেওরের মধ্যেই বিভিন্ন খণ্ডে ঢুকাইয়া দিয়াছি। কাহারও সন্দেহ হইতে পারে বিধায় বিষয়টি জানাইয়া দিলাম।

আরযগুযার
শামসুল হক
৩১/৭/৮৬ হিজরী

সূচী-পত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

চতুর্থ খণ্ড

বিবাহ ১
যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম ২
ওলী ৬
মেয়ের এয্নের নিয়ম ৭
কুফু ৯
মহর ১২
মহরে মেছেল, কাফেরের বিবাহ ১৫
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ১৬
শিশুকে দুধ পান করান ১৭
ইসলামে নারীর মর্যাদা, বিবাহের ফযীলত
এবং পর্দার আবশ্যকতা (পরিবর্ধিত) ২০
তালাকের নিন্দাবাদ এবং অপকারিতা ২৭
তালাক ২৮
তালাক দেওয়ার কথা ২৯
স্বামী স্ত্রীর মিলনের পূর্বের তালাকের কথা ৩১
তিন তালাকের মাসআলা ৩২
শর্তের উপর তালাক দেওয়া ৩৩
তফ্‌বীযে তালাক, তওকীলে তালাক ৩৫
মৃত্যু-রোগে তালাক দেওয়া ৩৬
রজআতের মাসায়েল ৩৭
খোলা তালাকের মাসায়েল ৩৯
মাফ্‌কুদের মাসায়েল ৪১
তফ্‌বীযে তালাকের শর্তযুক্ত কাবিননামা ৪২
ইদ্দতের মাসায়েল ৪৪
মওতের ইদ্দত ৪৫
শোক প্রকাশের বিধান ৪৭
খোর পোশের বয়ান ৪৮
স্ত্রীর জন্য ঘর ৪৯
নছব ছাবেত হওয়ার কথা ৫০
সন্তান পালনের মাসায়েল, স্বামীর হকের বয়ান ৫২
স্বামীর সহিত মিল-মহব্বত রাখিয়া সুখময় জীবন যাপনের উপায় ৫৪
সন্তান পালনের নিয়ম ৫৯
খানা-পিনার আদব-কায়দা, মজলিসে উঠা-বসার নিয়ম ৬৩
কাহার কি হক তাহার বয়ানঃ মা-বাপের হক,
দুধ মার হক, বিমাতার হক. ভাই-বোনের হক ৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের হক, সাধারণ মুসলমানের হক	৬৫
প্রতিবেশীর হক	৬৬
নিরাশ্রয়ের হক, অমুসলমানের হক, পশুপক্ষী, জীবজন্তু ইত্যাদির হক	৬৭
একটি জরুরী বিষয়	৬৮
পরিশিষ্টঃ যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম, জরুরী মাসআলা	৬৯
ওলীর বয়ান	৭০
মহর	৭১
কাফেরের বিবাহ, স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করা, স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে তালাক	৭২
তিন তালাকের মাসআলা, শর্তের উপর তালাক, রজআতের বয়ান	৭৩
স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার কসম	৭৪
বিবিকে মাতার সমতুল্য বলা	৭৫
কাফ্ফারার বয়ান	৭৭
লে'আনের বয়ান, কোরআন শরীফ পাঠের ফযীলত	৭৮
তজবীদের বয়ান	৮৩
পঞ্চম খণ্ড	
হালাল মাল অন্বেষণ করার ফযীলত	৯০
অযথা করয করার নিন্দাবাদ	১০০
করয আদায়ের দো'আ, দানের ফযীলত (বর্ধিত)	১০২
ক্রয় বিক্রয়	১০৪
বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া	১০৫
বিক্রেয় দ্রব্যের সঠিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া	১০৭
বাকী ক্রয়-বিক্রয়	১০৮
ফেরত দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় (খেয়ারে শর্ত)	১০৯
অদেখা জিনিস ক্রয়ের বিধান (খেয়ারে রুইআত)	১১০
বিক্রয় দ্রব্যে দোষ প্রকাশ পাওয়া	১১১
বায়'য়ে-বাতেল ও বায়'য়ে ফাসেদ	১১৩
লাভের উপর মুনাফা চুক্তিতে বিক্রয় করা এবং আসল দামে বিক্রয় করা	১১৭
সুদের কারবারের বিবরণ	১১৮
বায়'য়ে সলমের বিবরণ	১২৭
করয গ্রহণ করার বিবরণ	১২৯
কাফিল বা জামিন হওয়ার বিবরণ	১৩০
একের করয অন্যের উপর বরাত দেওয়া	১৩২
কাহাকেও উকীল বানাইবার বিবরণ	১৩৩
উকীলকে বরখাস্ত করিয়া দেওয়ার বর্ণনা	১৩৫
মোযারাবাত অর্থাৎ বেপার করিতে টাকা দেওয়ার বিবরণ	১৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমানত রাখার বিবরণ	১৩৮
আরিয়াত নেওয়ার বিবরণ	১৪১
হেবা করার বর্ণনা	১৪৩
হাদিয়ার মাসআলাঃ হাদিয়া ও ঘুষ রেশওয়াতের মধ্যে পার্থক্য	১৪৫
বাচ্চাকে দান করার মাসআলা	১৪৮
দিয়া ফিরাইয়া নেওয়ার বিবরণ	১৪৯
কেরায়া এবং মজুরীর বিবরণ	১৫০
ফাসেদ ইজারার বর্ণনা	১৫১
ক্ষতিপূরণ লইবার বর্ণনা	১৫২
ইজারা (কেরায়া) ভাঙ্গিয়া দেওয়ার বর্ণনা, বিনানুমতিতে পরের জিনিস লওয়া	১৫৩
শরীকী কারবার	১৫৫
শরীকী জিনিস ভাগ করিবার বর্ণনা	১৫৬
বন্ধক রাখার বিবরণ	১৫৮
জমি বর্গা দেওয়া, পত্তন দেওয়া প্রভৃতি, ছোলেহ করা, স্বীকার-উক্তি, দাবী, সাক্ষ্য ও বিচার	১৫৯
সাক্ষী, অন্তিমকালে	১৬০
অছিয়ত	১৬১
ফারায়েযের অংশ	১৬৪
যবিল ফুরূযদের তফছীল	১৬৫
ষষ্ঠ খণ্ড	
সমাজ ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সমাজের প্রচলিত কুপ্রথার সংশোধন	১৬৭
শিশু পালন	১৬৯
আকীকাহ্	১৭০
বিস্‌মিল্লাহ্ শুরু করা ও মক্তবে পাঠান	১৭১
নামাযের অভ্যাস, খাত্‌না	১৭২
বালেগ হওয়া, সংযমের অভ্যাস	১৭৩
মসজিদ, মক্তব	১৭৫
মাদ্রাসা	১৭৬
দাড়ি রাখা ও মোচ খাট করা	১৭৭
লেবাস-পোশাক	১৭৮
হাফপ্যান্ট	১৭৯
নেক্‌টাই	১৮০
ফুলপ্যান্ট, নারীর মাথার চুল কাটা	১৮১
পুরুষের দাড়ি কাটা	১৮২
পুরুষের মাথা খোলা রাখা, নারীদের মাথা খোলা রাখা, শাড়ী, সিনেমা	১৮৩
কুসংসর্গ বর্জন, নাচ	১৮৪
গান-বাদ্য	১৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুকুর পালা এবং ছবি রাখা,	
মানুষের শরীরের ১০টি সুন্নতে আম্বিয়া	১৯২
সংযম অভ্যাসের দ্বিতীয় স্তর	১৯৩
তাস-পাশা ইত্যাদি খেলা, ফুটবল খেলা, আতশবাজি	১৯৪
মাথায় টিকি রাখা ও মাথার সামনের চুল লম্বা রাখা,	
বিবাহ সম্পর্কে	১৯৫
পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, স্বামী-স্ত্রীর শপথ গ্রহণ	১৯৭
বিবাহ সম্পর্কে আরো কথা	২০২
সন্তান জন্মিলে	২০৩
মকতব ও মাদ্রাসা সম্বন্ধে আরো কথা	২০৪
বিবাহ সম্পর্কে আরও জ্ঞাতব্য বিষয়	২০৫
একাধিক বিবাহ	২০৬
বাল্য বিবাহ, তালাক	২০৯
হিলা-শরা	২১০
পর্দা রক্ষা করা ফরয	২১১
ভোরে গাত্রোত্থান	২১২
কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, মেয়েদের কয়েকটি কুপ্রথা	২১৩
বগলের ও নাভির নীচের পশম,	
কুঅভ্যাস শুরু হইতেই বর্জন করা উচিত	২১৪
সহশিক্ষা, বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকার জুয়া, কু-চিকিৎসা	২১৫
ওয়াযের মাহ্ফিল	২১৬
জায়গীর	২১৯
সমাজ বন্ধন	২২০
সীরাতে পাক	২২১
মাদ্রাসার জন্য চাঁদা গ্রহণ	২২৩
দানের ফযীলত	২২৪
ওস্তাদ ভক্তি ও ওস্তাদের খেদমত	২২৫
ওস্তাদকে হাদিয়া ও বিনিময় প্রদান	২২৬
খাদ্য সম্বন্ধীয়, খানার মজলিস	২২৭
ডান হাত, দাঁড়াইয়া পেশাব করা, বিভিন্ন প্রকারের জুয়া	২২৮
জাতীয়তা, অছিয়ত	২২৯
মানুষ যখন মরিয়া যাইবে	২৩০
ফারায়েয	২৩১
হুকুমতকে সৎপরামর্শ, 'মুহার্‌রাম' ও 'আশুরা'	২৩৩
ছফর মাস	২৩৪
রবিউল আউয়াল শরীফ, রবিউস-সানী, রজব শরীফ	২৩৫
শা'বান—শবেবরাত, রমযান,	২৩৬
রোযার ঈদের চাঁদ—শাওয়াল	২৩৭
কোরবানীর ঈদ—যিলহজ্জ	২৩৮
কতিপয় ভুল ধারণা	২৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
যবাহ্ করিবার ফতওয়া, সালাম, মোছাফাহা, মোয়ানাকা	২৪১
জামাআতি নেযাম	২৪২
বেহ্তরীন জেহীয	২৪৩
হেদায়ত ও নছীহতসমূহ	২৪৪
শ্বশুর বাড়ীর লোকদের সহিত আচার ব্যবহার	২৪৯
সপ্তম খণ্ড	
ওযূ ইত্যাদি, নামায	২৫৪
মৃত্যু ও বিপদের সময়, যাকাত খয়রাত, রোযা	২৫৫
কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, দোঁআ ও যিকর	২৫৬
কসম এবং মান্নত, কারবার (আদান-প্রদান) ভালরূপে করা	২৫৯
বিবাহ, কাহাকেও কষ্ট দেওয়া	২৬০
খাওয়ার কুঅভ্যাস দূর করা	২৬১
কাপড় ইত্যাদি পরা	২৬২
রোগের চিকিৎসা, স্বপ্ন, সালাম	২৬৩
হাঁটা, বসা, শোয়া ইত্যাদি, অন্যের সঙ্গে বসা, কথা	২৬৪
বিবিধ	২৬৫
মনের সংশোধন ও লোভের প্রতিকার	২৬৬
বেশী কথা বলার দোষ, রাগ দমনের পন্থা	২৬৭
হাসাদ—হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা	২৬৮
দুনিয়া এবং অর্থলোভ ও তাহার প্রতিকার	২৬৯
কৃপণতার অপকারিতা ও তাহার প্রতিকার, প্রশংসা ও যশের আকাঙ্ক্ষার অপকারিতা ও তাহার প্রতিকার	২৭০
অহঙ্কার ও তাহার প্রতিকার, আত্মগর্ব ও তাহার প্রতিকার	২৭১
রিয়াকারীর দোষ ও তাহার প্রতিকার, কয়েকটি জরুরী কথা	২৭২
আরও জরুরী একটা কথা, তওবা এবং তাহার প্রণালী, আল্লাহ্ তা'আলার ভয়	২৭৩
আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আশা রাখা, ছবর	২৭৪
শোক্র, কতকগুলি উপদেশ	২৭৫
তাওয়াক্কুল, আল্লাহ্র সঙ্গে মহব্বত পয়দা করার নিয়ম	২৭৬
রেযা বিল-ক্বাযা, ছেদক ও এখলাছ হাছেল করিবার নিয়ম	২৭৭
মোরাকাবা (আল্লাহ্র ধ্যান) হাছেল করিবার নিয়ম, কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে হুযূরে ক্বাল্ব হাছেল করার নিয়ত	২৭৮
নামাযে হুযূরে ক্বালব হাছেলের নিয়ম, মুরীদ হওয়ার ফায়েদার কথা	২৭৯
পীরে কামেলের শর্ত	২৮০
পীরী-মুরিদী সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ	২৮১
নিম্নের উপদেশগুলি হামেশা পালন করিবে	২৮৪
কতকগুলি হাদীস, নিয়ত খালেছ করা, রিয়াকারী বর্জন, কোরআন হাদীসের নির্দেশানুযায়ী চলা	২৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
নেক কাজের পথ আবিষ্কার ও বদ-কাজের ভিত্তি স্থাপন, এল্‌মে দ্বীন বা ধর্ম-জ্ঞান শিক্ষা করা	২৮৮
ধর্মের কথা গোপন করা, মাসআলা জানিয়া আমল না করা, পেশাব হইতে সতর্ক থাকা, ওযু-গোসল ভাল করিয়া করা, মিসওয়াক করা, ওযূতে ভালরূপে পানি না পৌঁছান	২৮৯
নামাযের জন্য মেয়েলোকদের বাহিরে যাওয়া, নামাযের পাবন্দি, আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া, ভালরূপে নামায না পড়া	২৯০
নামাযে এদিক-ওদিক তাকান, নামাযের সামনে দিয়া যাওয়া, জানিয়া বুঝিয়া নামায ক্বাযা করা, করযে হাসানা দেওয়া, গরীব দেনাদারকে সময় দেওয়া	২৯১
কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার ছওয়াব, অভিশাপ বা বদ দো'আ দেওয়া, হারাম মাল কামাই করা ও খাওয়াপরা, ধোঁকা দেওয়া (মহাপাপ), করয লওয়া	২৯২
সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও দেনা পরিশোধ না করা, সুদ লওয়া ও দেওয়া গোনাহ্‌, পরের জমি গছব করিয়া লওয়া (মহাপাপ), মযুরী সঙ্গে সঙ্গে দিবে, একটুও দেরী করিবে না, সন্তান মারা গেলে, মেয়েলোকের পর্দা করা জরুরী	২৯৩
আতর (সুগন্ধি) লাগাইয়া পর-পুরুষের সামনে যাওয়া, মেয়েলোকের পাতলা কাপড়া পরা, মেয়েলোকের পুরুষের ছুরত বানান বা কাপড় পরা, শান দেখাইবার জন্য কাপড় পরা, কাহারো উপর যুল্‌ম (অত্যাচার) করা	২৯৪
দয়া ও রহম করা, সৎকাজে আদেশ করা বদ কাজে নিষেধ করা, মুসলমানের দোষ ঢাকিয়া রাখা, কাহারও অপমান বা অনিষ্ট দেখিয়া খুশী হওয়া, কোন গোনাহ্‌র কারণে তা'না বা খোটা দেওয়া, ছগীরা (ছোট ছোট) গোনাহ্‌ করা	২৯৫
মা-বাপকে সন্তুষ্ট রাখা, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা, পিতৃহীন (এতীমের) লালন পালন করা, পাড়া প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া	২৯৬
কোন মুসলমানের কোন কাজ করিয়া দেওয়া, লজ্জাশীলতা এবং নির্লজ্জতা, ভাল স্বভাব এবং মন্দ স্বভাব, কোমল এবং কঠোর ব্যবহার	২৯৭
কাহারও ঘরে বা বাড়ীতে উঁকি মারা, বিনা এজাযতে কাহারও গোপনীয় কথায় কান দেওয়া, রাগ করা, কথা বলা ত্যাগ করা, কোন মুসলমানকে বে-ঈমান বলা ও অভিশাপ দেওয়া	২৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
কোন মুসলমানকে (অনর্থক) ভয় দেখান,	
মুসলমানের ওযর ক্ববুল করিয়া লওয়া,	
চোগলখুরী ও গীবৎ করা বড় গোনাহ্,	
কাহারও উপর মিথ্যা দোষারোপ করা, কথা কম বলা (ভাল)	২৯৯
নম্র ব্যবহার, অহংকার করা,	
সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলা (বড় দোষ),	
দোমুখো মানুষ (ভাল নহে),	
এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কসম খাওয়া,	
ঈমানের কসম খাওয়া	৩০০
রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়া, ওয়াদা ঠিক রাখা,	
আমানত পুরা না করা, জ্যোতিষী দ্বারা ভাগ্য গণনা করান,	
কুকুর পালা, ফটো বা ছবি রাখা, বিনা ওযরে উপুড় হইয়া শয়ন করা,	
কিছু রৌদ্রে কিছু ছায়ায় শোয়া বা বসা,	
কুলক্ষণ বা কুযাত্রা মানা,	৩০১
দুনিয়ার লোভ না করা, মৃত্যুকে স্মরণ করা,	
বিপদে ও বালা মুছীবতে ছবর, রোগীর সেবা শুশ্রূষা,	
মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন,	৩০২
চিল্লাইয়া ক্রন্দন করা, এতীমের মাল খাওয়া,	
কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ	৩০৩
বেহেশ্ত ও দোযখের কথা, কিয়ামতের আলামত	৩০৪
দাজ্জালের ফেৎনা	৩০৭
সারা দুনিয়ায় মুসলমান, ইয়াজুজ মাজুজের ফেৎনা,	
আকাশের ধূঁয়া,	৩০৯
পশ্চিম দিকে সূর্য উদয়, দাব্বাতুল আর্দ (অদ্ভুত জন্তু),	
সারা দুনিয়ায় কাফের, বায়তুল্লাহ্ শহীদ এবং কিয়ামত	৩১০
খাছ কিয়ামতের কথা, বড় শাফাআত, হিসাব শুরুর সুপারিশ	৩১১
কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ, অন্যান্য শাফা'আত	৩১২
বেহেশ্তের নেয়ামতের বর্ণনা	৩১৩
দোযখের আযাবের বর্ণনা	৩১৫
যে কাজ না করিলে ঈমান অপূর্ণ থাকিয়া যায়ঃ	
ঈমানের শাখা-প্রশাখার বয়ান	৩১৬
স্বীয় নফ্স ও সাধারণ লোকদের অপকারিতা	৩১৮
নিজ নফ্সের সঙ্গে ব্যবহার	৩১৯
জনগণের সঙ্গে ব্যবহার ও গোনাহ্ হইতে আত্মরক্ষা	৩২২
প্রথম প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার,	
দ্বিতীয় প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার	৩২৩
তৃতীয় প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার	৩২৫
অন্তর পরিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা	৩২৬
সাধারণ মেয়েলোকদের প্রতি নছীহত	৩৩০
খাছ যাহারা মুরীদ হইবে তাহাদের প্রতি নছীহত	৩৩১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বেহেশ্‌তী জেওর

চতুর্থ খণ্ড

বিবাহ

১। **মাসআলা ঃ** বিবাহ আল্লাহ্ তা'আলার অতি বড় একটি নেয়ামত। ইহা দ্বারা দ্বীনেরও উপকার হয় এবং দুনিয়ারও উপকার হয়। ইহার উপকারিতা এবং সদুদ্দেশ্যাবলী অনেক বেশী। বিবাহ দ্বারা মানুষ গোনাহ্ হইতে রক্ষা পায়, চক্ষু বা দিল এদিক ওদিক যায় না এবং মনের চাঞ্চল্য দূর হয়। বড় বিষয় এই যে, বিবাহে যেমন পার্থিব উপকার হয়, তেমন আখেরাতেরও উপকার হয়। কেননা, (পার্থিব উপকারিতা, ঘর-গৃহস্থালির সুশৃঙ্খলা ত আছেই, তাছাড়া হাদীস শরীফে আছে,) 'স্বামী-স্ত্রী যে সময়মত গোপন ঘরে বসিয়া প্রেমালাপ বা হাসি-ঠাট্টা করে তাহার ছওয়াব নফল নামাযের চেয়ে কম নহে।

২। **মাসআলা ঃ** দুই জনের মুখের দুইটি কথা অর্থাৎ 'ঈজাব' এবং 'কবূলের' দ্বারা নেকাহ্র আক্‌দ (বিবাহ-বন্ধন) সম্পাদিত হইয়া যায়। যেমন—যদি দুল্‌হানের পিতা সাক্ষীদের সামনে দুল্‌হাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, 'আমি আমার কন্যাকে আপনার নিকট বিবাহ দিলাম' এবং দুল্‌হা বলে যে, 'আমি কবূল করিলাম'—তবেই নেকাহ্র আক্‌দ হইয়া যাইবে এবং দুল্‌হা-দুল্‌হান উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হইয়া যাইবে।

অবশ্য যদি তাহার একাধিক কন্যা থাকে, তবে মেয়ের নামও উল্লেখ করিতে হইবে (এবং নেকাহ্র আক্‌দের সময় মহরের উল্লেখ করিয়া দেওয়াও উত্তম এবং তৎপূর্বে খোৎবায়ে মাছুরা পড়া এবং পরে খোরমা, মিঠাই ইত্যাদির দ্বারা হাজিরানে মজলিসের মুখ মিঠা করা মোস্তাহাব। যদিও দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের সামনে 'ঈজাব-কবূল' হইলেই নেকাহ্র আক্‌দ হইয়া যায়; তবুও ভাই-বেরাদর, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের প্রকাশ্য সভায় বিবাহ হওয়াই উত্তম।

৩। **মাসআলা ঃ** কেহ যদি বলে, 'আপনার অমুক মেয়ের বিবাহ আমার সহিত দিয়া দেন' এবং তদুত্তরে মেয়ের পিতা বলে, 'আচ্ছা আমি তাহার বিবাহ আপনার সহিত দিয়া দিলাম', তবে (এইরূপ বলাতেও) বিবাহ হইয়া যাইবে, প্রার্থী পুনরায় 'আমি কবূল করিলাম' এই কথা না বলিলেও চলিবে।

৪। **মাসআলা ঃ** মেয়ে যদি সামনে উপস্থিত থাকে এবং তাহার দিকে ইশারা করিয়া বলে যে, 'আমার এই মেয়ের বিবাহ আপনার সহিত দিয়া দিলাম' এবং দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ দুল্‌হা বলে যে, 'আমি কবূল করিলাম', তবে তাহাতেই বিবাহ দুরুস্ত হইবে, মেয়ের নাম উল্লেখ করার দরকার

হইবে না। আর যদি মেয়ে সামনে উপস্থিত না থাকে, তবে মেয়ের নাম এবং তাহার পিতার নাম এই পরিমাণ উচ্চ শব্দে বলিতে হইবে যে, সকল সাক্ষীরা যেন পরিষ্কার শুনিতে পায় যদি শুধু বাপের নাম উল্লেখ করাতে যথেষ্ট পরিচয় না হয়, সকলে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে না পারে যে, কাহার বিবাহ কাহার সহিত হইল, তবে দাদার নামও উল্লেখ করিতে হইবে। ফলকথা এই যে, নাম-ধাম এমনভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যাহাতে সকলেই বুঝিতে পারে যে, অমুকের বিবাহ হইতেছে।

৫। মাসআলা ঃ বিবাহ দুরুস্ত হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, অন্ততঃ (পূর্ণ বয়স্ক সজ্ঞান মুমিন মুসলমান) পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে ঈজাব কবূলের কথা দুইটি হওয়া দরকার এবং তাহাদেরও নিজ কানে উভয়ের কথা শুনা দরকার; আর যদি মেয়ের পিতা একা একা অথবা একজন পুরুষের সামনে অথবা শুধু স্ত্রীলোকদের বা বালকদের সামনে ঈজাবের কথা বলে যে, 'আমি আমার অমুক মেয়েকে আপনার সহিত বিবাহ দিলাম' এবং অপর পক্ষ বলে যে, 'আমি কবূল করিলাম' তবে তাহাতে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না।

৬। মাসআলা ঃ যদি শুধু দশ বার জন মেয়েলোকের সাক্ষাতে ঈজাব-কবূল করে, তবে তাহাতেও বিবাহ হইবে না। ফলকথা এই যে, দুইজন মেয়েলোকের সঙ্গে একজন পুরুষ থাকাই চাই, বহু সংখ্যক মেয়েলোক হইলে তবুও তাহাদের সহিত একজন পুরুষ থাকাই চাই।

৭। মাসআলা ঃ যদি দুইজন অমুসলমান পুরুষের সামনে অথবা একজন মুসলমান পুরুষ এবং অন্যান্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের সামনে অথবা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান পুরুষ এবং একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান স্ত্রীলোক এবং অন্যান্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদের সামনে 'ঈজাব-কবূল' হয়, তবে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না।

৮। মাসআলা ঃ প্রকাশ্য সভায়, যেমন জামে' মসজিদে জুমু'আর নামাযের পর অথবা এইরূপ অন্য কোন মজলিসে বিবাহ হওয়াই অতি উত্তম, যাহাতে বিবাহের সংবাদ সকলেই অবাধে জানিতে পারে; গোপনে বিবাহ হওয়া উচিত নহে। অবশ্য একান্তই যদি কোন ঠেকা পড়ে, তবে কমের পক্ষে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের অবশ্যই উপস্থিত থাকিতে হইবে যাহারা নিজ কানে বিবাহের 'ঈজাব-কবূল' কথাগুলি শুনিতে পায়।

৯। মাসআলা ঃ পাত্র এবং পাত্রী উভয় যদি পূর্ণ বয়স্ক বালেগ হয়, তবে তাহারা তাহাদের 'ঈজাব-কবূল' নিজেরাই করিতে পারে। সাক্ষীদের সামনে যদি তাহাদের একজন বলে, 'আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম' এবং অন্যজন বলে, 'আমি কবূল করিলাম' তবে তাহাতেও বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

১০। মাসআলা ঃ সাবালেগ পাত্র বা পাত্রী যদি নিজে 'ঈজাব-কবূল' না করিয়া অন্য কাহাকে বিবাহে 'ঈজাব-কবূল'-এর জন্য উকীল বানাইয়া দেয় এবং উকীল সাক্ষীদের সামনে উকীল স্বরূপ 'ঈজাব-কবূল' করিয়া দেয় তাহাতেও বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে। উকীলের 'ঈজাব-কবূল'-এর পর আর মোয়াক্কেলের অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম

১। মাসআলা ঃ (১) নিজের সন্তানের সহিত বিবাহ হারাম। যেমন ছেলে, পোতা, পরপোতা, নাতি, নাতির ছেলে ইত্যাদি (যতই নীচে দিকে যাউক না কেন) সকলের সহিতই বিবাহ হারাম।

(২) এইরূপে বাপ, দাদা, পরদাদা, নানা, পরনানা ইত্যাদি (যতই উর্ধ্বে যাউক না কেন,) সকলের সহিতই বিবাহ হারাম।

২। **মাসআলাঃ** (৩) আপন ভাই, (৪) মামু, (৫) চাচা, ভাতিজা, ভাগিনা ইহাদের সহিত বিবাহ হারাম।

শরীঅতে ভাইয়ের অর্থ এই যে, উভয়েরই মা এবং বাপ উভয়ই এক, অথবা বাপ দুই মা এক, অথবা মা দুই বাপ এক। নতুবা যদি বাপ ও মা উভয়েই ভিন্ন হয়, তবে তাহারা শরীঅত অনুসারে ভাই নহে। তাহাদের সহিত বিবাহ্ দুরুস্ত আছে। (যেমন, বাপের স্ত্রীর ছেলে। এইরূপে শরীঅতে মামু তাহাকে বলে, যে মার শরীঅতী ভাই হয় নতুবা মার চাচাত, মামাত ইত্যাদি ভাইকে শরীঅতে মামু বলে না, তাহাদের সহিত বিবাহ দুরুস্ত আছে। এইরূপে চাচা তাহাকে বলে, যে বাপের উপরোক্ত প্রকারের ভাই হয়, নতুবা বাপের চাচাত, খালাত ইত্যাদি ভাই শরীঅত অনুসারে চাচা নহে, তাহাদের সহিত বিবাহ দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআলাঃ** (৬) জামাই অর্থাৎ মেয়ের স্বামীর সহিত বিবাহ হারাম। মেয়ের যদি কাহারও সহিত শুধু আক্‌দ হয়, রোখছতী না হয় বা মেয়ে স্বামীর সহিত গৃহবাস নাও করে, তবুও সেই জামাইর সহিত শাশুড়ীর বিবাহ হারাম।

৪। **মাসআলাঃ** (৭) বাপ মরিয়া যাওয়ার পর মা যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে, তবে মায়ের সেই স্বামীর সহিত মেয়ের বিবাহ হারাম। কিন্তু সেই স্বামীর সহিত সহবাস করিবার পূর্বেই যদি মা মরিয়া যায় বা তালাক প্রাপ্তা হয়, তবে মায়ের সেই স্বামীর সহিত মেয়ের বিবাহ হারাম নহে।

৫। **মাসআলাঃ** (৮) সতীনের পুত্রের সহিত বিবাহ হারাম। স্বামী-সহবাস ভাগ্যে ঘটুক বা সহবাসের পূর্বেই স্বামী তালাক দেউক বা মরিয়া যাউক; তথাপি স্বামীর জন্য স্ত্রীর সন্তানদের সহিত বিবাহ হারাম। (ভাসুর-পুত) বা দেওর-পুতের সহিত বিবাহ হারাম নহে।

৬। **মাসআলাঃ** (৯) শ্বশুর এবং তাহার বাপ, দাদা, পরদাদা ইত্যাদির সহিত পুত্র-বধূর বিবাহ হারাম। (চাচা-শ্বশুর, মামা-শ্বশুরের সহিত বিবাহ হারাম নহে।)

৭। **মাসআলাঃ** (১০) নিজের ভগ্নীর স্বামীর সহিত বিবাহ হারাম, যে পর্যন্ত ভগ্নী তাহার বিবাহে থাকে। আর যদি ভগ্নী মরিয়া যায় অথবা ভগ্নীকে তালাক দেয় এবং তালাকের ইদ্দতও শেষ হইয়া যায়, তখন ভগ্নীপতির সহিত বিবাহ হারাম নহে। (এই জন্যই ভগ্নীপতি মাহ্‌রাম নহে, গায়ের মাহ্‌রাম। কেননা, মাহ্‌রাম উহাকে বলে, যাহার সহিত জীবনে কখনও বিবাহ দুরুস্ত হইতে পারে না।) ভগ্নীকে তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হইবার পূর্বেই যদি অন্য ভগ্নীকে বিবাহ করে, তবে সে বিবাহ দুরুস্ত নহে। (নন্দাই অর্থাৎ, ননদের স্বামীর সহিত, বহনই অর্থাৎ ভগ্নীর স্বামীর সহিত ভগ্নীর মৃত্যু বা তালাকের ইদ্দতের পর এবং বিহাই অর্থাৎ ভাইয়ের শালা, ছেলের শ্বশুর, মেয়ের শ্বশুর প্রভৃতির সহিত বিবাহ হারাম নহে।)

৮। **মাসআলাঃ** যদি দুই ভগ্নীর একই পুরুষের সহিত বিবাহ হয়, তবে যাহার বিবাহ প্রথমে হইয়াছে তাহার বিবাহ দুরুস্ত হইবে, যাহার বিবাহ পরে হইয়াছে তাহার বিবাহ হারাম ও বাতেল হইবে। (আর যদি আগে পরে আক্‌দ না হইয়া এক সঙ্গেই দুই বোনের আক্‌দ একই পুরুষের সহিত হয়, তবে উভয়েরই বিবাহ বাতিল হইবে।)

৯। **মাসআলাঃ** (১১) নিজের ফুফা এবং খালুর সহিত বিবাহ হারাম, যতদিন পর্যন্ত ফুফু, ফুফার এবং খালা, খালুর বিবাহে থাকে; নতুবা যদি ফুফু বা খালা মরিয়া যায় অথবা তালাক

দিয়া দেয় এবং তালাকের ইদ্দতও শেষ হইয়া যায়, তবে বিবাহ হারাম হইবে না। (এই জন্যই ফুফা এবং খালু মাহ্‌রাম নহে, গায়ের মাহ্‌রাম।)

১০। মাসআলা ঃ ফলকথা এই যে, একত্রে এমন দুইজন মেয়েলোককে একজন পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না, যাহাদের যে কোন একজনকে যদি পুরুষ ধারণা করা হয়, তবে তাহাদের পরস্পর বিবাহ হইতে পারে না। যেমন, খালা, বোন্‌ঝী, ফুফু, ভাতিজী ইত্যাদি।

১১। মাসআলা ঃ (আর যদি একজনকে পুরুষ ধরিলে বিবাহ হারাম হয়, কিন্তু অন্য জনকে পুরুষ ধরিলে হারাম হয় না, তবে এইরূপ দুইজনকে একত্রে বিবাহ করা যায়; যেমন) সতাল মা এবং সতীন-ঝি; (কেননা সতীন-ঝিকে যদি পুরুষ ধরা যায়, তবে এ বিবাহ হারাম হয়; কারণ সতাল মাকে বিবাহ করা হারাম; কিন্তু যদি সতাল মাকে পুরুষ ধরা যায়, তবে সতীন-ঝির সহিত তাহার কোন সম্পর্কই থাকে না, কাজেই বিবাহ হারাম হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে) দুইজনকে একত্রে একজনে বিবাহ করিতে পারে।

১২। মাসআলা ঃ পালক-পুত্র বা ধর্ম-ছেলের সহিত বিবাহ হারাম নহে। কেননা শরীঅতে মুখবোলা কুটুম্বিতার কোনই অস্তিত্ব নাই (কাজেই ধর্ম-ছেলে বা ধর্ম-বাপ মাহ্‌রামও হইবে না।)

১৩। মাসআলা ঃ আপন মামু অর্থাৎ, মার হাকীকী বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাই ব্যতিরেকে অন্য রেশ্‌তার মামুর সতি বিবাহ হারাম নহে। যেমন, মায়ের চাচাত, ফুফাত, মামাত, খালাত ভাইগণ (এইজন্য এইসব মামু মাহ্‌রাম নহে) এইরূপে আপন চাচা ব্যতিরেকে অন্য রেশ্‌তার চাচাদের সহিতও বিবাহ হারাম নহে। এইরূপে আসল ভাঞ্জা, ভাতিজা ব্যতিরেকে অন্য কোন রেশ্‌তার ভাঞ্জা, ভাতিজাদের সহিতও বিবাহ দুরুস্ত আছে। এইরূপে আপন ভাই ব্যতিরেকে চাচাত, মামাত, ফুফাত, খালাত ইত্যাদি রেশ্‌তার ভাইদের সঙ্গেও বিবাহ দুরুস্ত আছে।

১৪। মাসআলা ঃ এইরূপে যেখানে বলা হইয়াছে যে, দুই বোনকে বা ভাতিজীকে বা খালা-ভাঞ্জীকে একত্রে একজনে বিবাহ করিতে পারে না, সেখানে এই-ই অর্থ যে, আপন বোন বা আপন খালা-ভাঞ্জী বা আপন ফুফু-ভাতিজী; নতুবা যদি চাচাত, মামাত, খালাত বোন বা ফুফু-ভাতিজী বা খালা-ভাঞ্জী হয়, তবে তাহাদেরকে একত্রে বিবাহ করা হারাম নহে।

১৫। মাসআলা ঃ নসবের দিক দিয়া অর্থাৎ, জন্ম ও জাতিগত দিক দিয়া যে সব রেশ্‌তাদারের সহিত বিবাহ হারাম (বাপ, দাদা, ছেলে, চাচা, মামু ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, আর নানা, নাতি, পুতি) দুধের দিক দিয়াও সেইসব রেশ্‌তাদারের সহিত বিবাহ হারাম।যেমন, দুধ-বাপ অর্থাৎ, যাহার দুধ খাইয়াছে তাহার স্বামীর সহিত বিবাহ হারাম; দুধ-ভাই অর্থাৎ, যাহার দুধ খাইয়াছে তাহার পেটের ছেলে বা মেয়ে এবং দুধ পানকারী ছেলে-মেয়ের সহিত বিবাহ হারাম। দুধ-ছেলে,দুধ-পোতা অর্থাৎ যাহাকে নিজের দুধ খাওয়াইয়াছে তাহার সহিত এবং তাহার ছেলের সহিত বিবাহ হারাম। দুধ-চাচা অর্থাৎ দুধ-বাপের ভাইয়ের সহিত বিবাহ হারাম, দুধ-মামু অর্থাৎ দুধ-মার ভাইদের সহিত বিবাহ হারাম। দুধ-ভাতিজা অর্থাৎ দুধ-ভাইয়ের ছেলের সহিত বিবাহ হারাম। দুধ-ভাঞ্জা অর্থাৎ দুধ-ভগ্নীর ছেলের সহিত বিবাহ হারাম।

১৬। মাসআলা ঃ (নসবের দিক দিয়া এক, এইরূপ দুই ভগ্নীকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। দুধের দিক দিয়া এক, এইরূপ দুই ভগ্নীকেও একত্রে বিবাহ করা (তদ্‌রূপ) হারাম। অর্থাৎ, যদি দুইটি বেগানা মেয়েকে শৈশবে কোন একটি মেয়েলোক দুধ খাওয়াইয়া থাকে, তবে ঐ দুইটি মেয়েকে কোন পুরুষ একত্রে বিবাহ করিতে পারিবে না। (এমন কি, একটির তালাকের ইদ্দতের

মধ্যেও অন্যটিকে বিবাহ করিতে পারিবে না।) মোটকথা, উপরে যে হুকুম বর্ণিত হইয়াছে দুধের রেশ্‌তারও সেই হুকুম! ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ নং **মাসআলা** পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২১। মাসআলা ঃ মুসলমান মেয়ের বিবাহ অন্য কোন ধর্মাবলম্বী পুরুষের সহিত (বা মোর্‌তাদ[১] বা বে-ঈমানের সহিত) জায়েয নহে।

২২। মাসআলা ঃ কোন মেয়েলোকের স্বামী তাহাকে তালাক দিয়া দিলে অথবা স্বামী মরিয়া গেলে যতদিন পর্যন্ত তালাক বা মৃত্যুর ইদ্দত শেষ না হইয়া যাইবে, ততদিন পর্যন্ত অন্য কোন পুরুষের সহিত তাহার বিবাহ জায়েয নহে।

২৩। মাসআলা ঃ যে মেয়ের বিবাহ কাহারও সহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার বিবাহ অন্য কোন পুরুষের সহিত জায়েয নহে যতদিন পর্যন্ত না ঐ স্বামী মরিয়া যায় অথবা তালাক দিয়া দেয় এবং তালাকের ও মৃত্যুর ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যায়।

২৪। মাসআলা ঃ দেখুন পরিশিষ্ট 'যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম।

২৫। মাসআলা ঃ যে পুরুষের বিবাহে চারিটি মেয়েলোক বর্তমান আছে, তাহার জন্য পঞ্চম বিবাহ জায়েয নহে। আর যদি সে চারি স্ত্রীর এক স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেয়, তবে যতদিন তাহার ইদ্দত শেষ না হইয়া যাইবে, ততদিন অন্য কোন স্ত্রীলোকের বিবাহ তাহার সহিত জায়েয নহে।

২৬। মাসআলা ঃ সুন্নী মুসলমান মেয়ের বিবাহ শিয়া পুরুষের সহিত বহু সংখ্যক আলেমের ফৎওয়া মতে জায়েয নহে।

(কাদিয়ানীর সহিত বিবাহ সমস্ত আলেমগণের ফৎওয়া অনুসারে আদৌ জায়েয নহে।)

আরও এই চারিজন হারাম—(১) পরের স্ত্রী ; (২) পুত্র-বধূ ; (৩) স্ত্রীর মেয়ে ; (৪) দুই বোনের বিবাহ এক সঙ্গে হারাম। খালা বোনঝিও তেমনি এক সঙ্গে হারাম।

যাহাদের সহিত চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম তাহাদিগকে মাহ্‌রাম বলে ; যথা ঃ—ফুফু, খালা, শাশুড়ী ইত্যাদি। অস্থায়ীভাবে যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম তাহারা মাহ্‌রাম নহে ? যথা শালী, পরের-স্ত্রী, খালা-শাশুড়ী, ফুফু-শাশুড়ী ইত্যাদি।

মা, দাদী, নানী আর নাতিনী, পুতিনী
বেটী, ফুফু, খালা আর ভাতিজী, ভাগিনী
দুধ-মাতা, দুধ-বোন, শাশুড়ী, ভাগিনী
এই চৌদ্দ জন জান হারাম একিনী

সাধারণতঃ লোকে যে মামী, চাচী, ভাবী, শালী, শালা-বৌ, সতাল শাশুড়ী, ধর্ম-মা, ধর্ম-বোন বা মেয়েলোকের পক্ষ হইতে চাচা-শ্বশুর, মামা-শ্বশুর, দেওর, দেওর-পুত, ননদ-পুত, ধর্ম-বাপ, ধর্ম-ভাই ইত্যাদিকে মাহ্‌রামের মত মনে করিয়া তদ্রূপ দেখা-শুনা বা আলাপ ব্যবহার করে বা দাদা পুত্রীকে, নানা পুত্রীকে বিবাহ করিতে পারে বলিয়া হাসি চাতুরী করে, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং শরীঅত বিরুদ্ধ।

(যাহাদের সহিত জীবনে কখনও বিবাহ হইতে পারে তাহাদিগকে গায়েরে-মাহ্‌রাম বলে। —অনুবাদক)

টিকা

১ যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করিয়া কাফের হইয়াছে।

ওলী

(ছেলে বা মেয়েকে বিবাহ দিবার ক্ষমতা যাহার আছে, তাহাকে ওলী বলে। ওলীর জন্য আকেল, বালেগ এবং ওয়ারিশ হওয়া শর্ত। আকেল বালেগের উপর কেহ ওলী হইতে পারে না।)

১। মাসআলা ঃ মেয়ে এবং ছেলের সর্বপ্রথম ওলী তাহাদের পিতা। পিতা না থাকিলে, দাদা থাকিলে দাদা ওলী হইবে। পিতা এবং দাদা না থাকিলে পরদাদা থাকিলে পরদাদা ওলী হইবে। যদি পিতা, দাদা এবং পরদাদা কেহই না থাকে, তবে হাকীকী ভাই থাকিলে হাকীকী ভাই ওলী হইবে, যদি হাকীকী ভাই না থাকে, তবে বৈমাত্রেয় ভাই থাকিলে বৈমাত্রেয় ভাই ওলী হইবে। যদি বৈমাত্রেয় ভাইও না থাকে এবং হাকীকী ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা থাকে, তবে হাকীকী ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা ওলী হইবে। যদি হাকীকী ভাইয়ের ঘরে ভাতিজা না থাকে এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ঘরে ভাতিজা থাকে, তবে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা ওলী হইবে। যদি ভাতিজা কেহই না থাকে, তবে ভাতিজার ছেলে এবং ভাতিজার ছেলে না থাকিলে ভাতিজার পোতা (উপরোক্ত তরতীব অনুযায়ী) ওলী হইবে। যদি ইহারা কেহই না থাকে, তবে হাকীকী চাচা ওলী হইবে। হাকীকী চাচা না থাকিলে সতাল চাচা, যদি চাচা কেহই না থাকে, তবে চাচাত ভাই ওলী হইবে। যদি চাচাত ভাই কেহই না থাকে, তবে চাচাত ভাইয়ের ছেলে ওলী হইবে। যদি চাচাত ভাইয়ের ছেলে না থাকে, তবে চাচাত ভাইয়ের পোতা ওলী হইবে। (উপরোক্ত তরতীব অনুযায়ী) যদি চাচা বা চাচার কোন আওলাদ না থাকে, তবে বাপের চাচা ওলী হইবে, বাপের চাচা না থাকিলে তাহার আওলাদ থাকিলে তাহারা ওলী হইবে। যদি বাপের চাচা বা তাহার ছেলে, পোতা, পরপোতা কেহই না থাকে, তবে দাদার চাচা, তারপর তাহার ছেলে, তারপর তাহার পোতা পরপোতারা তরতীব অনুসারে ওলী হইবে।

যদি এইসব জ্ঞাতির পুরুষবর্গের মধ্যে কেহই না থাকে, তবে তখন মা ওলী হইবে, তারপর দাদী, তারপর নানী, তারপর নানা, তারপর হাকীকী ভগ্নী, তারপর বৈমাত্রেয় ভগ্নী, তারপর বৈপিত্রেয় ভাই, ভগ্নী, তারপর ফুফু, তারপর মামু, (তাপরপর চাচাত ভগ্নী,) ক্রমাগত এইসবও ওলী হইতে পারে। (এক শ্রেণীর কয়েকজন ওলী হইলে বড়জন অন্যান্যদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিবে। মুরুব্বীর অনুমতি লইয়া অন্যেও কাজ করিতে পারে।)

২। মাসআলা ঃ নাবালেগ ছেলে বা উন্মাদ, পাগল কাহারও ওলী হইতে পারিবে না। এইরূপে কাফেরও কোন মুসলমানের ওলী হইতে পারে না। (এমনকি, বাপ যদি কাফের হয় এবং মেয়ে মুসলমান হয়, তবে ঐ মেয়ের ওলী ঐ বাপ হইতে পারিবে না।)

৩। মাসআলা ঃ মেয়ে বালেগা (আকেলা) হইলে সে স্বাধীন। তাহার উপর কোন ওলী বা অন্য কাহারও এমন ক্ষমতা থাকে না যে, তাহার বিনা অনুমতিতে তাহার বিবাহ দিয়া দিতে পারে। বিনা ওলীতে নিজেদের মন মত বিবাহ বসিবার ক্ষমতাও তাহাদের আছে। এরূপ করিলে ওলী অস্বীকার করিলেও তাহাদের বিবাহ জায়েয হইয়া যাইবে ; কিন্তু মেয়ে যদি সমান ঘরে বিবাহ না বসিয়া নীচ ঘরে বিবাহ বসে এবং ওলী তাহাতে মত না দেয়, তবে তাহার বিবাহ দুরুস্ত

হইবে না। আর যদি সমান ঘরে বিবাহ বসিয়া থাকে, কিন্তু মহর অনেক কম হইয়া থাকে, তবে জ্ঞাতি পুরুষগণ মুসলমান হাকিমের নিকট নালিশ করিয়া তাহার ঐ বিবাহ ভঙ্গ করাইয়া দিতে পারে। (এইসব কারণেই হাদীস শরীফে বিনা ওলীতে মেয়েদের বিবাহ বসিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে এবং ওলীদেরকে বলা হইয়াছে যে, তাহারাও যেন বালেগ ছেলে-মেয়েদের মত না লইয়া তাহাদের বিবাহ না দেয়।)

৪। মাসআলাঃ কোন ওলী যদি সাবালেগ মেয়ের বিবাহ তাহার "এয্‌ন" (অনুমতি) ছাড়া দিয়া দেয়, তবে সে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না; মওকুফ্ থাকিবে। পরে যদি মেয়ে রাজী হয়, তবে বিবাহ জায়েয হইবে। আর যদি রাজী না হয়, তবে সে বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে।

মেয়ের এয্‌নের নিয়ম

৫। মাসআলাঃ সাবালেগা অবিবাহিতা মেয়ের থেকে এয্‌ন নেওয়ার নিয়ম এই যে, ওলী যদি তাহাকে বলে, 'আমি তোমাকে অমুক জায়গায় অমুকের ছেলে অমুকের সহিত বিবাহ দিতেছি বা বিবাহ দিলাম বা বিবাহ দিয়াছি' এবং এই কথার পর মেয়ে (অসম্মতিসূচক কোন ভাব প্রকাশ না করিয়া সম্মতিসূচক ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ, গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া) চুপ করিয়া থাকে অথবা (মানসিক খুশীতে মিটি মিটি) হাসিতে থাকে অথবা (মা-বাপের বাড়ী ছাড়িয়া পরের বাড়ী যাইতে হইবে এই মনবেদনায়) চোখের পানি ছাড়িয়া দেয়, তবেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার সম্মতি আছে। এতটুকু সম্মতি পাইয়া ওলী যদি বিবাহ দিয়া দেয়, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে, অথবা যদি আগেই বিবাহ দিয়া থাকে এবং পরে এতটুকু সম্মতি পায়, তবে ইহাতেই পূর্বের আকদ্ ছহীহ্ হইয়া যাইবে। খামখা জোর-জবরদস্তী লজ্জাশীলার লজ্জা ভাঙ্গিয়া তাহার মুখের কথা "রাযী আছি" বাহির করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন এবং অন্যায়।

৬। মাসআলাঃ ওলী যদি এয্‌ন লইবার সময় স্বামীর নাম-ধাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করিয়া থাকে, যাহাতে মেয়ে সহজেই তাহাকে চিনিতে পারে এবং পূর্বেও মেয়ে তাহাকে না চিনে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে মেয়ে চুপ করিয়া থাকিলে তাহাতে তাহার এয্‌ন বা সম্মতি ধরা যাইবে না; বরং স্বামীর নাম-ধাম এমন স্পষ্টভাবে তাহার সামনে উল্লেখ করা দরকার যাহাতে সে সহজেই বুঝিতে পারে যে, সে অমুক ব্যক্তি। এইরূপে এয্‌ন লইবার সময় যদি মহরের কথা উল্লেখ না করে এবং অনেক কম মহরে বিবাহ দেয়, তবে মেয়ের বিনা অনুমতি ও সম্মতিতে সেই বিবাহ দুরুস্ত হইবে না। পুনরায় বা-কায়েদা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি এজাযত দেয়, তবে বিবাহ হইবে, নতুবা হইবে না।

৭। মাসআলাঃ যদি পাত্রী অবিবাহিতা না হয় অর্থাৎ, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে তাহার এয্‌ন বিনা কথায় হইবে না। ওলী জিজ্ঞাসা করিলে যদি চুপ করিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার সম্মতি বুঝা যাইবে না; বরং মুখ দিয়া পরিষ্কারভাবে "রাযী আছি" এতটুকু বলার আবশ্যক হইবে। যদি এতটুকু না বলা সত্ত্বেও ওলী বিবাহ করাইয়া দেয়, তবে সেই বিবাহ দুরুস্ত হইবে না, যে-পর্যন্ত পাত্রী মঞ্জুর না করে। অবশ্য পাত্রী পরে মঞ্জুর করিয়া লইলে বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৮। মাসআলাঃ বাপ বর্তমান থাকা সত্ত্বে যদি ভাই, চাচা ইত্যাদি অবিবাহিতা পাত্রীর নিকট এয্‌ন চায়, তবে চুপ থাকাতে এয্‌ন ধরা যাইবে না; বরং মুখ দিয়া পরিষ্কার বলিলে তখন এয্‌ন ধরা যাইবে। অবশ্য যদি বাপ তাহাদিগকে এয্‌ন আনিবার জন্য পাঠায়, তবে চুপ থাকিলেও এয্‌ন

ধরা যাইবে। সারকথা এই যে, শরীঅত অনুসারে যে ওলীর হক অগ্রগণ্য, তিনি নিজে বা তাঁহার প্রেরিত লোকে জিজ্ঞাসা করিলে চুপ থাকিলেও এজাযত ধরা যাইবে, নতুবা অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে চুপ থাকিলে এজাযত ধরা যাইবে না। যেমন, বাপ বর্তমান থাকা সত্ত্বে যদি দাদা অবিবাহিতা পাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, তবে চুপ থাকিলে এজাযত ধরা যাইবে না। এইরূপে যদি ওলী হওয়ার হক থাকে ভাইয়ের, আর জিজ্ঞাসা করে চাচা, তবে চুপ থাকিলে এজাযত ধরা যাইবে না; বরং মুখে স্পষ্ট এজাযতের শব্দ বলিলে, তবেই এজাযত ধরা যাইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** ওলী যদি অবিবাহিতা বালেগা পাত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া বিবাহ দিয়া দেয় এবং পরে নিজেই বলে অথবা অন্য কাহারও মারফৎ বলায় যে, তোমার বিবাহ অমুকের সঙ্গে করিয়া দিয়াছি এবং তাহা শুনিয়া পাত্রী চুপ থাকে, তবে তাহাতেও এজাযতই ধরা যাইবে। কিন্তু যদি (ওলী বা ওলীর প্রেরিত ব্যক্তি ছাড়া) অন্য কেহ এই খবর পৌঁছায় তবে দেখিতে হইবে, যদি দুইজন লোক অথবা একজন বিশ্বস্ত লোক খবর পৌঁছাইয়া থাকে এবং সে খবর শুনিয়া চুপ থাকিয়া থাকে, তবে তাহাতে এজাযতই ধরা যাইবে। আর যদি একজন অবিশ্বস্ত লোক খবর পৌঁছাইয়া থাকে, তবে তাহাতে চুপ থাকিলে এজাযত ধরা যাইবে না, বিবাহ মওকুফ থাকিবে। যদি পাত্রী মঞ্জুর করে, দুরুস্ত হইবে; নতুবা বাতিল হইয়া যাইবে।

১০ নং **মাসআলা** পরিশিষ্টে ওলীর বয়ান দ্রষ্টব্য।

১১। **মাসআলা ঃ** তদ্রূপ ছেলেও বালেগ হইলে তাহার উপর তাহার ওলীর সম্পূর্ণ অধিকার থাকে না; বরং তাহার অনুমতি লইয়া তাহার বিবাহ ধার্য করিতে হইবে এবং বিনা অনুমতিতে বিবাহ করাইলে তাহার সম্মতি ছাড়া সে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না। যদি সম্মতি দেয়, তবে দুরুস্ত হইবে, আর যদি সম্মতি না দেয়, তবে বাতিল হইয়া যাইবে। অবশ্য বালেগ ছেলে এবং বালেগা মেয়ের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য আছে যে, বালেগা মেয়ে যদি অবিবাহিতা হয়, তবে বলার বা জিজ্ঞাসার পর তাহার চুপ থাকাই সম্মতি এবং অনুমতি ধরা যাইবে; কিন্তু ছেলে বালেগ হইলে তাহার মুখের কথা ব্যতিরেকে অনুমতি বা সম্মতি ধরা যাইবে না, মুখে পরিষ্কার বলা ছেলের জন্য জরুরী।

১২। **মাসআলা ঃ** ছেলে বা মেয়ে না-বালেগ থাকিলে তাহাদের কোনই ক্ষমতা বা স্বাধীনতা থাকে না, ওলীর বিনা অনুমতিতে তাহাদের বিবাহ-শাদী করিবার ক্ষমতা নাই। এমনকি, যদি কোন না-বালেগ নিজের বিবাহ নিজে বা অন্য কেহ করাইয়া দেয়, তবে ওলীর অনুমতি সাপেক্ষ দুরুস্ত হইবে, আর যদি ওলী এজাযত না দেয়, তবে বাতিল হইয়া যাইবে। তাহাদের বিবাহ দেওয়া না দেওয়ার পুরা এখ্‌তিয়ার ওলীর। যাহার সাথে ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারে। না-বালেগ ছেলে-মেয়ে ঐ বিবাহ রদ করিতে পারে না। না-বালেগা মেয়ে কুমারী হউক অথবা পূর্বে অন্যত্র বিবাহ হইয়া থাকুক এবং স্বামী-গৃহে গমন করিয়া থাকুক বা না থাকুক উভয়ের একই হুকুম।

১৩। **মাসআলা ঃ** না-বালেগা মেয়ে বা ছেলের বিবাহ যদি বাপ বা দাদা করায়, তবে তাহাদের বালেগ হওয়ার পরও সেই বিবাহ রদ করিবার কোনই ক্ষমতা নাই।

১৪। **মাসআলা ঃ** যদি বাপ এবং দাদা ছাড়া অন্য কোন ওলী (চাচা, ভাই ইত্যাদি) না-বালেগ ছেলে বা মেয়ের বিবাহ করায়, তবে যদি সমান সমান ঘর হয় এবং মহরও ঠিক মত হয়, তবে ত উপস্থিত তাহাদের বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে যখন বালেগ হইবে, তখন যদি তাহারা ঐ বিবাহ ঠিক রাখিতে না চায়, তবে সে ক্ষমতা তাহাদের আছে, কিন্তু

তাহাদের মুসলমান হাকিমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মুসলমান হাকিম যদি ঐ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেন, তবে সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া বাতিল হইয়া যাইবে, (নতুবা যে পর্যন্ত মুসলমান হাকিম না ভাঙ্গিয়া দিবেন, শুধু নিজে নিজে বিবাহ ভাঙ্গিতে পারিবে না বা কোন বিধর্মী হাকিমের হুকুমেও বিবাহ ভঙ্গ হইবে না,) আর যদি এই শ্রেণীর ওলীরা অর্থাৎ, বাপ এবং দাদা ছাড়া অন্য ওলীরা মেয়ের বিবাহ নীচ ঘরে বা অনেক কম মহরে এবং ছেলের বিবাহ অনেক বেশী মহরে করায়, তবে সে বিবাহ দুরুস্ত হইবে না।

১৫ নং এবং ১৬ নং মাসআলাঃ পরিশিষ্টে ওলীর বয়ান দেখুন।

১৭। মাসআলাঃ শরীঅতের নিয়ম অনুসারে যিনি না-বালেগা মেয়েকে বিবাহ দিবার হক্দার ওলী ছিলেন, তিনি হয়ত এত দূরদেশে আছেন যে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে গেলে হয়ত এমন সুযোগ্য পাত্র আর পাওয়া যাইবে না, পাত্র পক্ষ হইতে যাহারা পয়গাম পাঠাইয়াছে তাহারাও দেরী করিতে প্রস্তুত নহে, এরকম ক্ষেত্রে আসল ওলীর পরবর্তী যে ওলী থাকিবে তাহারও বিবাহ দিবার ক্ষমতা থাকিবে। যদি এরকম ক্ষেত্রে আসল ওলীর পরবর্তী ওলী আসল ওলীর নিকট হইতে অনুমতি বা পরামর্শ না লইয়াই বিবাহ দিয়া দেয়, তবুও সে বিবাহ দুরুস্ত হইবে। কিন্তু যদি এত দূরে না থাকে যে, তাহার অনুমতি আনিতে গেলে সুযোগ ছুটিয়া যাইবে, তবে আসল ওলীর বিনা অনুমতিতে অন্য কোন ওলীর বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। যদি দেয়, তবে সে বিবাহ মওকুফ থাকিবে। যদি আসল ওলী এজাযত দেয়, তবে দুরুস্ত হইবে, নতুবা বাতিল হইয়া যাইবে।

১৮। মাসআলাঃ এইরূপে আসল ওলীর উপস্থিতি সত্ত্বেও যদি পরবর্তী ওলী তাহার নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই না-বালেগা মেয়ের বিবাহ দিয়া দেয়; যেমন, আসল ওলী ছিল বাপ, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া দাদা যদি বিবাহ দিয়া দেয় বা আসল ওলী ছিল ভাই, তাহার অনুমতি না লইয়া চাচা যদি বিবাহ দিয়া দেয়, তবে এই বিবাহ মওকুফ থাকিবে। (যদি আসল ওলী অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বাপ বা ভাই এজাযত দেয়, তবে ত বিবাহ দুরুস্ত হইবে, আর তাহারা এজাযত না দিলে বাতেল ধরা হইবে।)

১৯। মাসআলাঃ কোন মেয়েলোক যদি পাগল ও বুদ্ধিহারা হইয়া যায় এবং তাহার না-বালেগ ছেলেও থাকে এবং বাপও থাকে, এমতাবস্থায় তাহার বিবাহ দিতে হইলে তাহার ছেলে তাহার ওলী হইবে। কেননা, ওলী হওয়ার ব্যাপারে ছেলে বাপের অগ্রগণ্য।

কুফু

[কে সমান ঘরের, কে সমান ঘরের নয়]

১। মাসআলাঃ মেয়ে বিবাহ দিবার সময় যাহাতে সমান ঘরে বিবাহ হয়, কুফু ছাড়া নীচ ঘরে বিবাহ না হয়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখিবার জন্য শরীঅতে যথেষ্ট তাকীদ আসিয়াছে। (কারণ, বিবাহের উদ্দেশ্য হইল অশান্তি দূর করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা এবং স্বামী-স্ত্রী একত্রে মিল-মহব্বতের সহিত জীবন যাপন করিয়া ইহ পরকালের উন্নতি সাধন করিয়া যাওয়া। যদি স্বামী-স্ত্রীতে সামঞ্জস্য না থাকে, তবে কাজ-কর্মের দিক দিয়া, আচার ব্যবহারের দিক দিয়া সংসার-জীবনযাত্রার অনেক অসুবিধা ঘটিতে পারে। বিশষতঃ স্ত্রী পরাধীনা, কাজেই তাহার দিক হইতেও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার তাকীদ বেশী করা হইয়াছে।) স্বামী ত স্বাধীন, সক্ষম। সে ইচ্ছা

করিলে একটার পরিবর্তে চারিটি বিবাহ্ করিতে পারে বা মিল্‌মিশ্ না হইলে ছাড়িয়াও দিতে পারে; স্ত্রীর ত আর সে ক্ষমতা নাই। এই জন্যই ছেলেকে বিবাহ্ করাইবার সময় কুফু দেখার জন্য বেশী তাম্বীহ্ নাই। শুধু অপাত্রে বীজ বপন না হয়, এইজন্য সচ্চরিত্রা, লজ্জাশীলা, খোদাভক্তা, স্বামীসেবিকা, সন্তান পালনকারিণী দেখিয়া বিবাহ করানই যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বড় ঘর, সমান ঘর বা ছোট ঘরের কথা বলা হইতেছে, ইহার উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও এই নয় যে, বড় ঘরওয়ালারা নিজেরা বড়াই বা ফখর করিবে এবং ছোট ঘরওয়ালাদের ঘৃণা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিবে; যদি এরূপ হয়, তবে তাহারা মহাপাপী হইবে। অবশ্য ছোট ঘরওয়ালারাও বড় ঘরওয়ালাদের হিংসা করিবে না; বরং বড়দের প্রতি ভক্তি ও তা'যীম এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসাই হাদীসের বিধান। কুফু রক্ষা করিয়া চলা শুধু দুনিয়ার উপকারের জন্যই শরীঅত নির্ধারিত করিয়াছে। তাহার প্রমাণ এই যে, যদি কোন বালেগা মেয়ে নিজ ইচ্ছায় কোন নীচ ঘরের স্বামী পছন্দ করে এবং তাহার বাপ-ভাইয়েরও কোন আপত্তি না থাকে, তবে সে বিবাহ অবাধে জায়েয আছে। তাহাতে আখেরাতের কোন গোনাহ্ বা শাস্তি নাই, আর বাপ ভাইয়েরা যদি কলঙ্কের ভয়ে আপত্তি উঠায় এবং বাধা দেয়, তাহাতেও তাহাদের কোন গোনাহ্ বা শাস্তি নাই। কারণ, শরীঅতের উদ্দেশ্য যেমন আখেরাতের সুখ-শান্তির বিধান করা তেমনই দুনিয়ার মান-সম্মান রক্ষা ও সুখ-শান্তির বিধান করা। কাজেই পরে অশান্তি সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কাজেও শরীঅতে বাধা প্রদান করা হইয়াছে।

—অনুবাদক

২। মাসআলাঃ সমান সমান ঘর কি না, তাহা বিচার করিবার বেলায় পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, (১) বংশের দিক দিয়া, (২) মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া, (৩) দ্বীনদারী, পরহেযগারীর দিক দিয়া, (৪) মালদারীর দিক দিয়া এবং (৫) পেশার দিক দিয়া সমান কি না।

৩। মাসআলাঃ বংশের দিক দিয়া সমান হওয়ার অর্থ এই যে, শেখ, সাইয়্যেদ, আনছারী এবং আল্‌বী[১] সকলকে একই শ্রেণীর ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ, যদিও সাইয়্যেদের মর্তবা বড় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি কোন সাইয়্যেদের মেয়ের বিবাহ শেখের বা আনছারীর ছেলের সহিত হয়, তবে তাহাকে "কুফু ছাড়া বিবাহ" বলা হইবে না; বরং এই বলা হইবে যে, সমান সমান ঘরে বিবাহ হইয়াছে। (শেখ বলিতে বড় বড় কোরায়শী ছাহাবাদের বংশধরগণকে বুঝায়; যেমন ছিদ্দীকী, ফারূকী, ওসমানী ইত্যাদি। অধুনা বাংলাদেশে যে মুসলমান মাত্রকেই "শেখ" বলে—হউক না সে বঙ্গীয় বা ভারতীয় কোন নওমুসলিম বংশোদ্ভব, সে অর্থ এখানে নয়।)

৪। মাসআলাঃ মোগল, পাঠান ইত্যাদি সব 'আজমীদিগকে বংশের দিক দিয়া একই শ্রেণীভুক্ত ধরা হইয়াছে। কারণ, তাহারা সকলেই 'আজমী' এবং সব 'আজমী' একই শ্রেণীভুক্ত। আর 'আজমী' আরবী কুফু অর্থাৎ সমান হইতে পারে না। কাজেই যদি কোন সাইয়্যেদ বা শেখের মেয়ের বিবাহ কোন পাঠান বা মোগলের ছেলের সহিত হয়, তবে বলা হইবে যে, কুফু ঠিক হয় নাই, নীচ ঘরে বিবাহ হইয়াছে। [জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ছিদ্দীকী বা সাইয়্যেদ বলিয়া মিছামিছি দাবী করা হারাম। যাহাদের কাছে সনদ বা শেজ্‌রা আছে বা অন্য কোন বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা সাইয়্যেদ বা শেখ, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই সাইয়্যেদ

টিকা

১ হযরত আলীর বংশধরের মধ্যে যাহারা ফাতেমার গর্ভজাত বংশধর, তাঁহারা সাইয়্যেদ আর তাঁহার অন্যান্য বিবিদের গর্ভজাত তাঁহারা 'আল্‌বী'।

এবং শেখ। নতুবা অনর্থক দাবী করা বা ফখর করা জায়েয নহে। এক শ্রেণীর লোকেরা আনছারী-ছাহাবাদের বংশোদ্ভব না হওয়া সত্ত্বেও আনছারী বলিয়া দাবী করিতেছে, ইহাও সম্পূর্ণ না-জায়েয এবং হারাম।]

৫। **মাসআলা ঃ** বংশ ধরা হয় বাপের দিক দিয়া। মার দিক দিয়া বংশ ধরা হয় না। সুতরাং যদি বাপ সাইয়্যেদ হয়, তবে ছেলেমেয়েও সাইয়্যেদ হইবে এবং যদি বাপ শেখ হয়, তবে ছেলেমেয়েও শেখ হইবে, মা যে কোন বংশেরই হউক না কেন। যদি কোন সাইয়্যেদযাদা কোন পাঠানের বা অন্য কোন নওমুসলিমের মেয়ে বিবাহ করে, তবে সেই ঘরে যে সব ছেলেমেয়ে হইবে তাহাদের বংশ সাইয়্যেদেরই সমান হইবে। অবশ্য যাহার মা-বাপ উভয়ই সাইয়্যেদ তাহার সম্মান নিশ্চয়ই বেশী হইবে। কিন্তু শরীঅতে সবাইকে একই শ্রেণীভুক্ত ধরা হইবে। [এইরূপে বঙ্গদেশে হিন্দুদের দেখাদেখি যে কু-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, বিধবা নারীকে বিবাহ করিলে বা দ্বিতীয় বিবাহ করিলে সেই ঘরের ছেলেমেয়েকে নীচ বলিয়া ধরা হয়, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং শরীঅত অনুসারে বাতিল ও গোনাহ্র কথা।]

৬। **মাসআলা ঃ** মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া কুফু বা সমান হওয়ার অর্থ এই যে, যে ছেলে নিজেই নূতন মুসলমান হইয়াছে, কিন্তু তাহার বাপ-দাদা সব অমুসলমান। সে সেই মেয়ের কুফু নহে, যে নিজেও মুসলমান এবং তাহার বাপও মুসলমান। যে ছেলে নিজেও মুসলমান, তাহার বাপও মুসলমান, কিন্তু দাদা অমুসলমান, সে ঐ মেয়ের কুফু নহে যাহার বাপ এবং দাদা উভয়ই মুসলমান।

৭। **মাসআলা ঃ** যে ছেলের বাপ দাদা মুসলমান, কিন্তু পর-দাদা অমুসলমান তাহাকে সেই মেয়ের কুফু (অর্থাৎ, সমস্তরের) ধরা হইয়াছে, যাহার পর-দাদা বা তারও উপরে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত মুসলমান। ফলকথা, বাপ-দাদা এই দুই পুরুষ পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া কুফুর হিসাব ধরা হইয়াছে, তাহার উপরে ধরা হয় নাই। আর শেখ, সাইয়্যেদ ও আনছারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া কুফুর হিসাব ধরা হয় নাই, শুধু মোগল পাঠান প্রভৃতি আজমীদের মধ্যে দুই পুরুষ পর্যন্ত ধরা হইয়াছে, উপরে ধরা হয় নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** দ্বীনদারী-পরহেযগারীর দিক দিয়া কুফু বা সমান হওয়ার অর্থ এই যে, লুচ্চা, বদমাআশ, শরাবী, বে-নামাযী, (সুদখোর, চোর, ডাকাত, দাড়ি মুণ্ডনকারী, পর্দা অমান্যকারী ইত্যাদি ফাছেক ছেলে পর্দানশীন, লজ্জাবতী,) নেকবখ্ত, সতী, দ্বীনদার, পরহেযগার মেয়ের কুফু হইবে না।

৯। **মাসআলা ঃ** মালদারীর দিক দিয়া কুফু হওয়ার অর্থ এই যে, ছেলে যদি এইরূপ গরীব কাঙ্গাল হয়, যাহার ভাত, কাপড় ও ঘরবাড়ী নাই, তবে সে মালদার মেয়ের কুফু হইবে না। কিন্তু যদি একেবারে তেমন গরীব না হয়; বরং মেয়ের নগদ মহর, (যেওররূপে বা নগদভাবে দিবার মত) এবং ভাত কাপড় ও ঘর দিবার মত (সঙ্গতি) সম্পন্ন হয়, তবে সে ছেলেকে বড় মালদার মেয়েরও কুফু ধরা হইবে। মোটকথা, ছেলে এবং মেয়ে সম স্তরের মালদার হওয়ার আবশ্যক নাই, উপরোক্ত পরিমাণ মালদার হইলেই মালদারীর দিক দিয়া সেই ছেলেকে অনেক বড় মালদার মেয়েরও কুফু ধরা হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** পেশা এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়া কুফু হওয়ার অর্থ এই যে, যাহারা তাঁতী তাহারা দর্জিদের সমান নহে, যাহারা নাপিত, ধোপা তাহারা দর্জিদের সমান নহে। যাহারা কাপড়

সেলাই করে (দর্জি) তাহারা, যাহারা কাপড়ের তেজারত করে, তাহাদের সমান নহে। যাহারা নাপিত (ক্ষৌর কার্য করে) ধোপা (কাপড় ধৌত করে) বা তেলী (তৈল বাহির করে) তাহারা যাহারা কাপড় সেলাই করে (দর্জি) তাহাদের সমান নহে [কুলি-মজুর গৃহস্থের সমান নহে। গৃহস্থ ব্যবসায়ীর সমান নহে।]

১১। মাসআলাঃ পাগল, জ্ঞানহীন, উন্মত্ত ছেলে, জ্ঞানসম্পন্না মেয়ের কুফু নহে।

মহর

১। মাসআলাঃ বিবাহ পড়াইবার সময় মহরের কথা উল্লেখ হউক বা না হউক, বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে এবং মহর দিতে হইবে। কারণ, মহর ছাড়া বিবাহ হইতে পারে না। এমনকি, যদি কেহ মহর না দিবার কথা উল্লেখ করিয়া বিবাহ করে, তবুও মহর দিতে হইবে। (কারণ মহর ছাড়া বিবাহ হয় না।)

২। মাসআলাঃ কমের পক্ষে মহরের পরিমাণ (দশ দেরহাম) প্রায় পৌনে তিন তোলা রূপা। (ইহার চেয়ে কম মহর হইতে পারে না।) বেশীর কোনই সীমা নির্ধারিত নাই। উভয় পক্ষ (ছেলে এবং মেয়ে) রাজী হইয়া যত স্বীকার করিবে ততই ওয়াজেব হইবে, কিন্তু অনেক বেশী মহর ধার্য করা ভাল নহে। [বিশেষতঃ যদি শুধু নামের জন্য অনেক বেশী মহর ধার্য করা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা দিবার কোন ইচ্ছা না থাকে, তবে তাহা অতি বড় গোনাহ্‌।] যদি কেহ এক টাকা বা আট আনা মহর ধার্য করিয়া বিবাহ করে, তবে বিবাহ হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু ঐ পৌণে তিন তোলা রূপার কম মহর হইতে পারিবে না। যদি এক টাকা বা আট আনা মহর ধার্য করিয়া বিবাহ করে এবং বাসর-ঘর[১] হইবার পূর্বে তালাক দেয়, তবে (এক টাকা বা আট আনার অর্ধেক দিবে না; বরং) পৌনে তিন তোলা রূপার অর্ধেক দিবে।

৩, ৪, ৫ এবং ৬ নং মাসআলা পরে লিখিত 'মহরের বয়ান' দ্রষ্টব্য।

৭। মাসআলাঃ যদি বিবাহের সময় মহর কত হইবে তাহা আদৌ উল্লেখ না হয় অথবা এই শর্তের উপর বিবাহ করে যে, মহর মাত্রই দিবে না, তারপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কোন একজন মরিয়া যায় অথবা বাসর-ঘর হইয়া যায়, তবে পূর্ণ মহর দিতে হইবে এবং এই রকম ছুরতে (অর্থাৎ আদৌ মহরের উল্লেখ না হইয়া বা বিনা মহরে বিবাহ হইলে) 'মহরে মেছেল' ওয়াজিব হইবে। (মহরে মেছেল কাহাকে বলে তাহা সামনে বলা হইবে।) আর যদি এই রকম ছুরতে (অর্থাৎ, যদি মহরের উল্লেখ ছাড়া বা বিনা মহরে বিবাহ হইয়া থাকে।) বাসর-ঘর হইবার পূর্বেই পুরুষ মেয়েলোকটিকে তালাক দিয়া দেয়, তবে মেয়েলোকটি মহর পাইবে না, শুধু এক জোড়া কাপড় পাইবে এবং এই কাপড় জোড়া দেওয়া পুরুষের জিম্মায় ওয়াজেব হইবে; যদি না দেয়, তবে গোনাহ্‌গার হইবে। (এতদ্ব্যতীত অন্যান্য তালাক দিলে কাপড় দেওয়া ওয়াজেব নহে; মোস্তাহাব।)

৮। মাসআলাঃ এক জোড়া কাপড় ওয়াজেব হওয়ার অর্থ এই যে, (লম্বা আস্তিনের হাঁটু পর্যন্ত) একটি কোর্তা, মাথায় দিবার একটি উড়নী বা ছোট চাদর, পায়জামা অথবা একখানা শাড়ী

টিকা

১ বাসর ঘরের অর্থ স্বামী-স্ত্রী এক ঘরে একাকী থাকা, স্বামী সহবাস করুক বা না করুক একাকী সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও বিনা কারণে স্ত্রীসহবাস না করিলেও তাহাকে খালওয়াতে ছহীহ্‌ বলে। মহর ওয়াজেব হওয়ার বেলায় খাল্‌ওয়াতে ছহীহ্‌কে সহবাসেরই হুকুমে ধরা হয়।)

এবং একটি বড় চাদর (অথবা কোর্তা) যাহার দ্বারা আপাদমস্তক ঢাকিতে পারে, এই চারিখানা কাপড় ওয়াজেব হয়, ইহার চেয়ে বেশী ওয়াজেব নহে।

৯। মাসআলাঃ পুরুষের যেমন অবস্থা সে রকম মূল্যের কাপড় দিবে। যদি গরীব হয়, তবে সূতার কাপড় দিবে, যদি গরীব না হয়, কিন্তু বড় ধনীও না হয়, তবে তসরের কাপড় দিবে, আর যদি বড় ধনী হয়, তবে রেশমের কাপড় দিবে। কিন্তু প্রত্যেক অবস্থাতেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মহরে মেছেলের অর্ধেকের চেয়ে অধিক মূল্যের কাপড় ওয়াজেব হইবে না এবং এক টাকা ছয় আনার চেয়ে কম মূল্যের কাপড় দেওয়া জায়েয হইবে না; তাছাড়া আপন ইচ্ছায় যত ইচ্ছা বেশী দিতে পারে।

১০। মাসআলাঃ বিবাহের সময় ত মহর ধার্য হইয়াছিল না, কিন্তু পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একমত হইয়া মহর ধার্য করিয়া লইয়াছিল, এরূপ হইলে ধার্যকৃত মহরই ওয়াজেব হইবে, মহরে মেছেল ওয়াজেব হইবে না। কিন্তু যদি "বাসর-ঘর" হওয়ার পূর্বেই তালাক হইয়া যায়, তবে স্ত্রী পরের ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক পাইবে না; বরং (উপরের বর্ণিতরূপে) এক জোড়া কাপড় পাইবে। (আর যদি একজন মরিয়া যায় অথবা "বাসর-ঘর" হওয়ার পর তালাক হয়, তবে পরের ধার্যকৃত মহর ওয়াজেব হইবে।)

১১। মাসআলাঃ বিবাহের সময় হয়ত একশত টাকার মহর ধার্য করা হইয়াছিল পরে স্বামী নিজ ইচ্ছায় স্ত্রীকে বলিল যে, একশত টাকার জায়গায় দেড়শত টাকা মহর আমি তোমাকে দিব। এইরূপ নিজ মুখে স্বীকার করিলে পরে স্বামী নিজ ইচ্ছায় যে পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা দেওয়া ওয়াজেব হইবে। যদি না দেয়, তবে গোনাহ্গার হইবে। কিন্তু যদি বাসর-ঘর হওয়ার পূর্বে তালাক হইয়া যায়, তবে স্ত্রী পূর্বের ধার্যকৃত মহরের অর্ধেকই পাইবে, পরের বৃদ্ধিকৃত পরিমাণের অর্ধেক পাইবে না। এইরূপে যদি বিবাহের সময় যে মহর ধার্য হইয়া থাকে পরে স্ত্রী নিজ খুশীতে স্বামীকে তাহার কতেক অংশ বা সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দেয়, তবে তাহা মাফ হইয়া যাইবে, স্ত্রী পুনরায় তাহা পাইবার অধিকারিণী থাকিবে না। (অবশ্য স্বামী নিজ ইচ্ছায় যদি দেয় সে ভিন্ন কথা।)

১২। মাসআলাঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে ধমক দিয়া বা ভয় দেখাইয়া বা অন্য কোন প্রকার কৌশলে ও অসদুপায়ে স্ত্রীর আন্তরিক অনিচ্ছা সত্ত্বে তাহার দ্বারা মহর মাফ করাইয়া লয়, তবে তাহাতে মহর মাফ ইইবে না, স্বামীর জিম্মায় মহর দেওয়া ওয়াজিব থাকিবে; না দিলে গোনাহ্গার হইবে।

১৩। মাসআলাঃ মহরের জন্য যদি টাকা-পয়সা বা সোনা-রূপার অলঙ্কার ধার্য না করিয়া একটা নির্দিষ্ট গরু, ঘোড়া, জমিন বা বাগান ধার্য করে, তবে জায়েয আছে, যাহা ধার্য করিয়াছে তাহাই দিতে হইবে।

১৪। মাসআলাঃ মহর ধার্য করিবার সময় যদি কেহ বলে যে, একটি ঘোড়া বা একটি হাতী বা এক বিঘা জমি বা একটি বাগিচা দিব, তবে তাহাতে বিবাহ ত হইয়া যাইবে এবং মহরও ধার্যকৃত সাব্যস্ত হইবে, তবে যথাক্রমে মধ্যম প্রকারের এক বিঘা জমি বা মধ্যম প্রকারের একটি বাগিচা দিতে হইবে, (কিন্তু যদি নির্দিষ্ট করিয়া বলে যে, অমুক ঘোড়াটি বা অমুক হাতীটি বা অমুক জমিখানা বা অমুক বাগিচাটি দিব, তবে তাহা অধিক উত্তম।) আর যদি শুধু এইরূপ বলে যে, মহর কিছু দিব বা কোন একটি বস্তু দিব বা কোন একটি মাল দিব, তবে এইরূপ বলাতে মহর ধার্য হইবে না। এইরূপ ছুরত হইলে "মহরে মেছেল" দিতে হইবে। (মহরে মেছেলের বয়ান সামনে আসিতেছে।)

১৫ নং এবং ১৬ নং মাসআলা পরে বর্ণিত মহরের বয়ান দ্রষ্টব্য।

১৭। মাসআলাঃ যে দেশে প্রথম মোলাকাতের সময়ই সমস্ত মহর আদায় করিবার প্রথা আছে, সে দেশে প্রথম রাত্রিতেই সমস্ত মহর উসুল করিয়া লইবার হক (অধিকার) স্ত্রীর আছে। যদি প্রথম রাত্রিতে না চায়, তবে যখন চাহিবে তখনই দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হইবে, বিলম্ব করা বা টালবাহানা করা জায়েয হইবে না।

১৮। মাসআলাঃ আমাদের দেশে প্রথা আছে যে, মহরের লেনদেন তালাক কিংবা মৃত্যুর পর হয়। অর্থাৎ স্ত্রীকে যখন তালাক দেয়, তখন মহরের দাবী করে, কিংবা স্বামী সম্পত্তি রাখিয়া মরিয়া গেলে ঐ সম্পত্তি হইতে মহর উসুল করে, স্ত্রী মরিয়া গেলে তাহার ওয়ারিসগণ মহর দাবী করে। কিন্তু যাবৎ স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে কেহ মহর চায়ও না দেয়ও না, এমত স্থানে প্রথার কারণে তালাকের পূর্বে স্ত্রী মহরের দাবী করিতে পারে না। অবশ্য প্রথম সাক্ষাতের রাত্রে যে পরিমাণ মহর অগ্রিম দেওয়ার দস্তুর আছে ঐ পরিমাণ প্রথমে দেওয়া ওয়াজেব, অবশ্য যদি কোন সম্প্রদায়ে এরূপ দস্তুর না থাকে, তবে এই হুকুম হইবে না।

১৯। মাসআলাঃ দেশপ্রথা অনুসারে (বা পরিষ্কার দুই পক্ষের নির্ধারণ অনুসারে) নগদ মহর আদায় ব্যতিরেকে স্ত্রীর কাছে স্বামীর যাইবার অধিকার নাই বা তাহাকে নিজ বাটিতে আবদ্ধ রাখিবার বা বিদেশে লইয়া যাইবারও অধিকার নাই এবং নগদ মহর না পাওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর এ অধিকার আছে যে, স্বামীকে কাছে থাকিতে না দেয় বা স্বামীর সঙ্গে তাহার দেশে না যায় বা স্বামীর বাড়ীতে না থাকিয়া বাপের বাড়ীতে চলিয়া যায়। কিন্তু মহর আদায় করার পর স্ত্রীর কোনই অধিকার নাই, স্বামীকে কাছে আসিতেও বাধা দিতে পরিবে না এবং স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর বাড়ী ছাড়িয়া বাপের বাড়ীও যাইতে পারিবে না এবং স্বামী বিদেশে কোথাও নিয়া যাইতে চাহিলে তাহাও আস্বীকার করিতে পারিবে না। (৪র্থ খণ্ড ৫২ পৃঃ হইতে গৃহীত)

২০। মাসআলাঃ স্বামী যদি মহরের নিয়তে (খোরাক, পোশাক এবং বাসস্থান ব্যতিরেকে) কিছু টাকা বা অন্য কোন মাল জিনিস দেয়, তবে তাহা মহর হইতেই কাটা যাইবে। স্ত্রীকে এ বলার অবশ্যক হইবে না যে, আমি ইহা তোমার মহর বাবত দিতেছি। [অবশ্য পরিষ্কার বলিয়া দেওয়াই ভাল, যাহাতে পরে কোন গোলমাল বা মতভেদের সৃষ্টি না হইতে পারে। কিন্তু খোরাক, পোশাক বা বাসের ঘর দিয়া স্বামী বলিতে পারিবে না যে, ইহা আমি মহর বাবত দিলাম। কারণ খোরাক, পোশাক, এবং ঘর ত বিবাহের ঈজাব-কবূলের সঙ্গে সঙ্গে মহর ছাড়াই স্বামীর উপর ওয়াজেব হইয়াছে এবং স্ত্রী পাওনা হইয়াছে।]

২১। মাসআলাঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন জিনিস দিয়া থাকে এবং পরে (মতভেদ হয় ;) স্বামী বলে যে, আমি মহর বাবত দিয়াছি, স্ত্রী বলে যে, না—আপনি মহর বাবত দেন নাই, এমনি আমাকে দিয়াছেন, তবে বিচারকগণ দেখিবেন যে, সেই জিনিস কোন ধরনের ছিল, যদি খাওয়া-পিয়ার বা পচা-গলার কোন অস্থায়ী জিনিস (বা ব্যবহারের কাপড় বা ঘর) হয়, তবে স্বামীর কথা হিসাবে ধরা যাইবে না এবং মহর হইতে কাটা যাইবে না। আর যদি অন্য কোন জিনিস (টাকা, পয়সা, গহনা, অতিরিক্ত ঘর বা কাপড় বা কোন গরু, ছাগল, থালা, বাসন ইত্যাদি) হয়, তবে স্বামীর কথাই ধর্তব্য হইবে এবং মহর হইতে কাটা (বাদ দেওয়া এবং উসুল দেওয়া) হইবে।

মহরে মেছেল

১। **মাসআলা ঃ** (মহরে মেছেলের নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীঅতের পক্ষ হইতে নির্ধারিত নাই। তবে শরীঅতের হুকুম এই যে, যে খান্দানে যে দেশে যত পরিমাণ মহর লওয়ার প্রচলন আছে তাহাই তাহাদের মহরে মেছেল অর্থাৎ খান্দানী মহর।) খান্দানী মহরের মধ্যে বাপ-দাদার বংশের মেয়ের মহর দেখিতে হইবে, (যেমন, বোন, ফুফু, ভাতিজী, চাচাত বোন ইত্যাদি। মা, খালার বংশ দেখিতে হইবে না) এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে, যাহার সঙ্গে ইহার মহরের তুলনা করা হইতেছে তাহার এবং ইহার বিবাহ এক বয়সে হইয়াছে কি না, সৌন্দর্যের দিক দিয়া উভয়ে একরূপ কি না, উভয়েরই বিবাহ অবিবাহিতা অবস্থায় হইয়াছে কি না; উভয়ই সমান সম্পত্তি-শালিনী কি না? উভয়েরই বিবাহ একই দেশে হইয়াছে কি না? দ্বীনদারী, পরহেযগারীর দিক দিয়া উভয়ে সমান কি না? বুদ্ধিমত্তা ও লজ্জাশীলতা, সচ্চরিত্রতা এবং কর্মপটুতার দিক দিয়া উভয়ে সমান কি না? এলেমের দিক দিয়া সমান কি না? মোটকথা—যুগের পরিবর্তনে, জায়গার পরিবর্তনে, রূপগুণ, বয়স, পাত্র, দ্বিতীয় এবং প্রথম বিবাহের তারতম্যে—মহরের অনেক তারতম্য হইয়া যায়। কাজেই যখন কোন মেয়ের মহরে মেছেলের পরিমাণ বিচার করিতে হইবে, তখন উপরোক্ত সব বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে, নতুবা শুধু খান্দানী মহর দেখিলে চলিবে না। যে যে ক্ষেত্রে মহরে মেছেলের কথা বলা হইয়াছে, সে সব ক্ষেত্রে ইহাই করিতে হইবে যে, মেয়ের পিতৃকুলের (উপরোক্ত সব গুণে সমতুল্য।) একটি মেয়ের মহর কত ধার্য হইয়াছে। তাহাই ঐ মেয়ের মহর সাব্যস্ত করা হইবে। (কোন গুণে কম হইলে, তাহার মহর সেই পরিমাণ কম হইবে। কোন গুণে বেশী হইলে তবে মহরও সেই পরিমাণ বেশী হইতে পারে।)

কাফেরের বিবাহ

১। **মাসআলা ঃ** (কাফেরের অর্থাৎ, মুসলমান ছাড়া অন্যান্য বিধর্মীদের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করার আবশ্যক এই যে, যদি তাহারা কেহ সৌভাগ্যবশতঃ মুক্তির অন্বেষণে অগ্রসর হয় এবং ইসলাম ধর্মই যে একমাত্র মুক্তিদাতা সত্য-ধর্ম এবং একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মেই যে মুক্তি নাই, এই কথা উপলব্ধি করিয়া মুসলমান হয়, তবে তাহা পুর্ব-বিবাহ সম্বন্ধে কি সাব্যস্ত করা হইবে? তাহার হুকুম শরীঅতের আইন হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।) যদি দুইজন স্বামী-স্ত্রী (অমুসলমান) এক সঙ্গে মুসলমান হয় এবং তাহাদের পূর্ব ধর্ম অনুসারে তাহাদের বিবাহ হইয়া থাকে, (যদি বিবাহ ছাড়া মিলন না হইয়া থাকে বা কোন মাহ্‌রামের সহিত বিবাহ না হইয়া থাকে), তবে মুসলমান হওয়ার পর তাহাদের বিবাহ দোহ্‌রাইতে হইবে না, (পূর্বের বিবাহ ঠিক থাকিবে।)

২। **মাসআলা ঃ** যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন মুসলমান হয়, অন্য জন না হয়, তবে তাহাদের বিবাহ বাতেল হইয়া যাইবে, এখন আর স্বামী-স্ত্রীর মত থাকিতে পারিবে না। (অবশ্য দ্বিতীয় জনের সামনে পেশ করা হইবে, অর্থাৎ ইসলামের সৌন্দর্য্য ও সত্যতা তাহাকে বুঝাইয়া

দেওয়া হইবে। তাহাতে যদি সেও মুসলমান হইয়া যায়, তবে তাহারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রী থাকিবে এবং স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে পারিবে। আর যদি মুসলমান না হয়, তবে তাহাদের বিবাহ ছুটিয়া যাইবে এবং স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করিতে পারিবে না।)

৩। মাসআলাঃ যদি কোন বিধর্মী মেয়েলোক মুসলমান হয়, (আর তাহার স্বামী মুসলমান না হয়,) তবে যতদিন ঐ মেয়েলোকের তিনটি হায়েয অতিবাহিত না হইয়া যায়, (বা অল্প বয়স্কা বা অধিক বয়স্কা হওয়ার কারণে হায়েয বন্ধ হইলে তিন মাস অতিবাহিত না হইয়া যায়, বা গর্ভবতী হইলে—যতদিন প্রসব না হয়,) ততদিন পর্যন্ত ঐ মেয়েলোকের বিবাহ দুরুস্ত নহে।

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

১। মাসআলাঃ যে পুরুষের বিবাহ বন্ধনে একাধিক স্ত্রী থাকিবে, তাহাদের সকলকে সমানভাবে রাখা তাহার উপর ওয়াজেব; (অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব করা হারাম। কেহ সাইয়্যেদের মেয়ে হউক, ঝোলার মেয়ে হউক বা) একজন দ্বিতীয় বিবাহের হউক, অন্য জন প্রথম বিবাহের হউক, উভয়কে সমানভাবে দেখিতে হইবে। একজনকে যেমন ঘর বা খোরাক-পোশাক দিবে অন্যজনও ঠিক সেইরূপ ঘর এবং সেইরূপ খোরাক-পোশাক পাইবার দাবীকারিণী হইবে। একজনের কাছে এক রাত থাকিলে অন্য জনের কাছেও এক রাত থাকিতে হইবে। যুবতীর কাছে দুই তিন রাত থাকিলে বৃদ্ধার কাছেও দুই তিন রাত থাকিতে হইবে। (হাদীস শরীফে স্ত্রীদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করার কারণে ভীষণ আযাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে; এমনকি যে স্বামী স্ত্রীদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করিবে, সে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে, এরূপও বর্ণনা করা হইয়াছে।)

২। মাসআলাঃ নব বিবাহিতা স্ত্রী এবং পুরাতন স্ত্রী উভয়েরই হক এবং দাবী সমান, তাহাতে আদৌ কোন বেশ-কম নাই। (অবশ্য নব বিবাহিতা স্ত্রীর মন রক্ষার্থে যদি তাহার কাছে প্রথম প্রথম কিছু বেশী দিন থাকে, তবে পরে সেই কয়দিন আবার পূর্বের স্ত্রীর কাছে থাকিতে হইবে।)

৩। মাসআলাঃ রাত্রে থাকার মধ্যে সমতা অর্থাৎ সমান ভাব রক্ষা করা ওয়াজেব বটে, কিন্তু দিনে থাকার মধ্যে সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব নহে। সুতরাং যদি দিনের বেলায় একজনের কাছে কিছু বেশীক্ষণ থাকে, অন্যজনের কাছে কিছু অল্পক্ষণ থাকে, তবে তাহাতে গোনাহ্ হইবে না; কিন্তু রাত্রের বেলায় যদি একজনের কাছে মগরেবের পর যায় অন্যজনের কাছে এশার পর যায়, তবে গোনাহ্‌গার হইবে। অবশ্য যদি কোন পুরুষ এমন হয় যে, রাত্রের বেলায় তাহার চাকরির ডিউটি দিতে হয়, দিনের বেলায় সে স্ত্রীদের কাছে থাকিবার সময় পায়, তবে তাহার জন্য দিনের বেলায়ই সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব হইবে।

৪। মাসআলাঃ সমতা শুধু থাকার মধ্যে ওয়াজেব, সহবাস করার মধ্যে সমতা ওয়াজেব নহে। সুতরাং যদি এক স্ত্রীর পালার রাত্রিতে সহবাস করে, তবে অন্য স্ত্রীর পালার রাত্রিতে সহবাস করা ওয়াজেব হইবে না (এবং সহবাস না করিলে তাহাতে গোনাহ্ হইবে না।)

৫। মাসআলাঃ স্বামী-স্ত্রী রোগগ্রস্ত হউক বা সুস্থ শরীর থাকুক, কিন্তু কাছে থাকার মধ্যে সমতা রক্ষা করিতেই হইবে।

৬। মাসআলাঃ (ব্যবহারের বেলায় বা দেওয়া-থাকার বেলায় সমতা রক্ষা করা মানুষের ক্ষমতার ভিতরে, কাজেই তাহা ওয়াজেব; কিন্তু মনের টানের বেলায় সমতা রক্ষা করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে, কাজেই মনের টান একজনের দিকে বেশী, অন্য জনের দিকে কম হইলে

তাহাতে গোনাহ্ হইবে না। (কিন্তু মনের টানের বশীভূত হইয়া যদি কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ দেওয়া এবং থাকাতে পক্ষপাতিত্ব করিয়া বসে, তবে নিশ্চয়ই গোনাহ্গার হইবে।)

৭। **মাসআলা ঃ** বিদেশে সফরের সময় সমতা রক্ষা করা ওয়াজেব নহে, যাকে ইচ্ছা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে। অবশ্য স্ত্রীদের মধ্যে যাহাতে মনক্ষুণ্ণতা না থাকে, সেই জন্য যদি 'কোরা' ঢালিয়া (লটারী করিয়া) নাম বাহির করিয়া লয়, তবে তাহা অতি উত্তম। (মোবাহ্ কাজে অন্য পক্ষের মনঃকষ্ট দূরীকরণার্থে 'কোরা' ঢালা মোস্তাহাব। কোরা ঢালার নিয়ম এই যে, প্রথমতঃ উভয়কে স্বীকার করাইবে যে, কোরায় যাহার নাম উঠিবে তাহাকেই সঙ্গে লইয়া যাইবে, অন্য জন অসন্তুষ্ট হইতে পারিবে না; তারপর সমান দুখানা কাগজে দুইজনের নাম লিখিয়া কাগজ দুইখানাকে পৃথক পৃথক করিয়া বানাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিবে এবং একটি অবোধ বে-গোনাহ্ শিশুকে ডাকিয়া দুইখানা কাগজের একখানা উঠাইতে বলিবে। সে নিজ ইচ্ছায় যে কাগজখানা উঠাইবে, সেই কাগজে যাহার নাম থাকিবে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যদি উভয়কে সন্তুষ্ট করা যায়, তবে তাহাও করা যাইতে পারে।

শিশুকে দুধ পান করান

১। **মাসআলা ঃ** সন্তান হইলে তাহাকে দুধ পান করান মায়ের উপর ওয়াজেব। অবশ্য যদি বাপ মালদার হয় এবং কোন দাই (ধাত্রী) রাখে, তবে মা দুধ পান না করাইলে গোনাহ্গার হইবে না।

২। **মাসআলা ঃ** অন্য কাহারও শিশুকে দুধ পান করান স্বামীর বিনা অনুমতিতে জায়েয নহে। অবশ্য যদি কোন শিশু দুধের পিপাসায় ছট্ফট্ করিতে থাকে, এবং দুধ না পাইয়া মরিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে দুধ পান করাইয়া শিশুর জীবন রক্ষা করিতে হইবে, স্বামীর এজাযতের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে না। (এরূপ ক্ষেত্রে এজাযত না হইলে গোনাহ্ হইবে না।)

৩। **মাসআলা ঃ** ছেলে হউক বা মেয়ে হউক, শিশুকে পূর্ণ দুই বৎসর পর্যন্ত দুধ পান করান যাইবে। দুই বৎসরের বেশী দুধ পান করান হারাম, একেবারেই দুরুস্ত নাই।

৪। **মাসআলা ঃ** শিশু যদি দুই বৎসরের মধ্যেই অন্য কোন জিনিস খাওয়া-পিয়া শুরু করে এবং তদ্দ্বারা জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তবে দুই বৎসরের আগে দুধ ছাড়াইয়া দিলে তাহাতেও কোন ক্ষতি বা গোনাহ্ নাই।

৫। **মাসআলা ঃ** শিশু যদি অন্য কোন মেয়েলোকের দুধ পান করে, তবে সেই মেয়েলোকটি ঐ শিশুর দুধ-মা হইবে, আর তাহার স্বামী ঐ শিশুর বাপ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের ছেলে-মেয়েরা ঐ শিশুর ভাই-বোন হইবে, সুতরাং বিবাহ হারাম হইবে। নছবের দিক দিয়া যে সব রেশ্তাদারের সঙ্গে বিবাহ্ হারাম, দুধের দিক দিয়াও সেই সব রেশ্তাদারের সঙ্গে বিবাহ হারাম (ইহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে,) কিন্তু এই হারাম হইবার জন্য শর্ত এই যে, জন্মের দুই বৎসরের মধ্যেই দুধ পান করান চাই, নতুবা বেশী বয়সে দুধ পান করাইলে তাহাতে হারাম হইবে না, ভাই-বোন, মা-বাপ ইত্যাদি রেশ্তাও হইবে না। শুধু আমাদের ইমাম আযম ছাহেব বলেন যে, আড়াই বৎসর পর্যন্ত দুধ পান করাইলে তাহাতেও হারাম হইবে; আড়াই বৎসরের পর দুধ পান করাইলে কোন ইমামের মতেই হারাম হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** শিশুর হলকুম পর্যন্ত সামান্য দুধ গেলেই উপরোক্ত সমস্ত রেশ্‌তা প্রমাণিত হইয়া বিবাহ হারাম হইয়া যাইবে, দুধ বেশী হউক বা কম হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় না।

৭। **মাসআলা ঃ** শিশু যদি স্তন হইতে নিজ মুখে দুধ চুষিয়া পান না করে, বরং মেয়েলোকটি নিজ হাত দিয়া স্তন হইতে দুধ বাহির করিয়া শিশুর মুখে দেয় বা নাকের পথে হলকুম পর্যন্ত পৌঁছায় তাহাতেও উপরোক্ত সমস্ত রেশ্‌তা প্রমাণিত হইয়া যাইবে এবং বিবাহ হারাম হইবে। (অবশ্য দুধ যদি কানের ভিতরে দেয়, হলকুমে না পৌঁছে, তাহাতে কিছুই হইবে না। দুধ যদি কেবল মুখের ভিতরে দেয়, হলকুমে না পৌঁছে তাহাতেও কিছুই প্রমাণিত হইবে না বা বিবাহ হারাম হইবে না।)

৮। **মাসআলা ঃ** কোন মেয়েলোকের দুধ যদি শিশুকে পানির সঙ্গে বা ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পান করান হয়, তবে যদি মেয়ে লোকের দুধ বেশী বা সমান হয় তবে রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে এবং বিবাহ হারাম হইবে, নতুবা যদি ঔষধ বা পানি বেশীর ভাগ হয়, তবে রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে না এবং বিবাহ হারাম হইবে না।

৯। **মাসআলা ঃ**যদি গরু বা বকরীর দুধের সহিত মেয়েলোকের দুধ মিশিয়া যায় এবং সেই দুধ কোন শিশুকে পান করান হয়, তবে দেখিতে হইবে যে, গরু বা বকরীর দুধ বেশী না মেয়েলোকের দুধ বেশী; যদি গরু বা বকরীর দুধ বেশী হয়, তবে রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে না, (এবং বিবাহ হারাম হইবে না,) আর যদি মেয়েলোকের দুধ বেশী বা সমান সমান হয়, তবে রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে (এবং বিবাহ হারাম হইবে।)

১০। **মাসআলা ঃ** ঘটনাক্রমে যদি কোন অবিবাহিতা মেয়ের স্তনে দুধ হয় এবং তাহা কোন শিশু পান করে, তবে ঐ মেয়ে ঐ শিশুর মা হইয়া যাইবে এবং দুধের অন্যান্য রেশ্‌তা প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

১১। **মাসআলা ঃ** মৃতা স্ত্রীলোকের দুধ বাহির করিয়া যদি কোন শিশুকে পান করান হয়, তবে তাহাতে দুধের সমস্ত রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে। (বিবাহ হারাম হইবে।)

১২। **মাসআলা ঃ** দুইজন শিশুকে যদি একই গাই বা বকরীর দুধ পান করান হয়, তবে ইহাতে পরস্পরের মধ্যে রেশ্‌তা প্রমাণিত হয় না এবং বিবাহ হারাম হয় না।

১৩। **মাসআলা ঃ** (যেহেতু দুধের দ্বারা বিবাহ হারাম হওয়ার জন্য বা রেশ্‌তা প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুই বা আড়াই বৎসর বয়সের মুদ্দত শর্ত করা হইয়াছে, কাজেই) যুবক স্বামী যদি নিজ স্ত্রীর দুগ্ধ পান করে, তবে তাহাতে স্ত্রী তাহার মা হইবে না, তাহার উপর হারাম হইবে না বটে, কিন্তু এরূপ করা ভারী গোনাহ্; কেননা দুই বৎসর বয়সের পর মানুষের দুধ পান করা সম্পূর্ণ হারাম।

১৪। **মাসআলা ঃ** একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে উভয়ে একটি মেয়েলোকের দুধ পান করিয়াছে, একই সঙ্গে পান করিয়া থাকুক বা পাঁচ দশ বৎসর আগে পরে পান করিয়া থাকুক, ঐ দুইটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। কারণ, তাহারা উভয়ে ভাই-বোন।

১৫। **মাসআলা ঃ** একটি মেয়ে বকরের স্ত্রীর দুধ পান করিয়াছে, ঐ মেয়ের বিবাহ বকরের সঙ্গে হারাম এবং বকরের বাপ, দাদা পুত্রের-পৌত্রের সঙ্গেও হারাম, এমন কি বকরের অন্য স্ত্রীর পক্ষের ছেলে থাকিলে তাহার সঙ্গেও হারাম।

১৬। **মাসআলা ঃ** আব্বাস নামক একটি শিশু খদিজা নাম্নী একটি মেয়েলোকের দুধ পান করিয়াছিল। খদিজার স্বামী কাসেমের জয়নব নাম্নী অন্য স্ত্রী ছিল। কিছুকাল পরে কাসেম

জয়নবকে তালাক দিয়া দিল। এখন আব্বাস জয়নবকে বিবাহ করিতে পারিবে না, কেননা আব্বাস জয়নবের স্বামীর দুধ-ছেলে। স্বামীর ছেলের সঙ্গে বিবাহ হারাম। এইরূপে আব্বাস যদি নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেয়, তবে কাসেম তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। কেননা পুত্র-বধূর সহিত বিবাহ হারাম। এইরূপে কাসেমের ভগ্নীর সহিত আব্বাসের বিবাহ হইতে পারে না, কারণ কাসেমের ভগ্নী আব্বাসের ফুফু হইয়াছে। অবশ্য আব্বাসের ভগ্নীকে কাসেম বিবাহ করিতে পারে, (কেননা আব্বাসের ভগ্নী যখন কাসেমের স্ত্রীর দুধ পান করে নাই, তখন কাসেমের সহিত আব্বাসের ভগ্নীর কোনই সম্পর্ক নাই।)

১৭। মাসআলাঃ আব্বাসের এক ভগ্নী ছাজেদা। সে একজন মেয়েলোকের দুধ পান করিয়াছিল, কিন্তু আব্বাস তাহার দুধ পান করে নাই, তবে সেই মেয়েলোককে আব্বাস বিবাহ করিতে পারিবে।

১৮। মাসআলাঃ আব্বাসের ছেলে জায়েদা খাতুনের দুধ পান করিয়াছে; জায়েদা খাতুনের সহিত আব্বাসের বিবাহ হইতে পারে। (কেননা আব্বাসের সহিত জায়েদা খাতুনের কোনই সম্পর্ক নাই।)

১৯। মাসআলাঃ কাসেম এবং যাকের দুই ভাই। যাকেরের একজন দুধ-ভগ্নী আছে। যাকেরের দুধ-ভগ্নীর সহিত কাসেমের বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু যাকেরের বিবাহ হইতে পারে না। দুধ-রেশ্‌তা সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলা আছে। বিবাহের সময় খুব তাহ্‌কীক করিয়া লওয়া দরকার এবং শরীঅতে অভিজ্ঞ ভাল আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া দরকার। এই কিতাবে আমরা মাত্র কয়েকটি ছুরত লিখিলাম, সব লিখিলাম না; কারণ সকলের পক্ষে বুঝা একটু কঠিন।

২০। মাসআলাঃ একটি ছেলের সহিত একটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল। তারপর একজন মেয়েলোক আসিয়া বলিল, আমি তাহাদের দুইজনকেই দুধ পান করাইয়াছি। এই কথা শুধু ঐ একটি মেয়েলোক ছাড়া অন্য কেহ বলে না এবং তাহার কথাও ষোল আনা বিশ্বাস হয় না। এইরূপ অবস্থা হইলে যতদিন হুজ্জতে শরয়ী না পাওয়া যাইবে অর্থাৎ, যতদিন দুইজন বিশ্বস্ত দ্বীনদার পুরুষ অথবা একজন দ্বীনদার পুরুষ এবং দুইজন দ্বীনদার মেয়েলোক সাক্ষী না দিবে, ততদিন দুধের রেশ্‌তা প্রমাণিত হইবে না এবং বিবাহ হারাম হইবে না। তেমন সাক্ষ্য ব্যতীত দুধের রেশ্‌তা ছাবেত হইবে না। অবশ্য যদি একজন পুরুষ বা একজন মেয়েলোক বা দুই তিন জন মেয়েলোকে বলাতে মনের মধ্যে বিশ্বাস হয় যে, তাহারা ঠিকই বলিতেছে, নিশ্চয়ই তেমন হইয়া থাকিবে, তবে তেমন বিবাহ না করা উচিত; অনর্থক সন্দেহের কাজের মধ্যে পড়া উচিত নহে।

২১। মাসআলাঃ মানুষের দুধের দ্বারা কোন ঔষধ প্রস্তুত করা জায়েয নহে। যদি তাহার দ্বারা কোন ঔষধ তৈয়ার করা হয়, তবে তাহা খাওয়া বা ব্যবহার করা জায়েয নহে, হারাম। এইরূপে কানে বা চোখে মানুষের দুধ দেওয়া জায়েয নহে। মোটকথা, মানুষের দুধ শিশুকে পান করান ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে লাভবান হওয়া বা নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েয নহে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা, বিবাহের ফযীলত এবং পর্দার আবশ্যকতা (পরিবর্ধিত)

১। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى ○

অর্থ—(হে বণিতাগণ!) "তোমরা তোমাদের বাড়ীর ভিতরে থাক, পূর্বেকার অজ্ঞতা যুগের রূপ-প্রদর্শনীর ন্যায় বাহিরে বেড়াইয়া ফিরিও না।" এই আয়াতের দ্বারা নারীর মর্যাদা এবং পর্দার আবশ্যকতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। কেননা, পর্দা পালন ব্যতিরেকে নারীর মর্যাদা রক্ষা হইতে পারে না। বহু মূল্যবান মণিমাণিক্য মূল্যবান এবং মর্যাদাশালী বস্তু বলিয়াই কত পল্লা আবরণের ভিতরে অতি যত্নে রক্ষিত হয়। ঠিকরী চাঁড়ার কোন মূল্য বা মর্যাদা নাই বলিয়াই তাহা যথায় তথায় বা পথেঘাটে পড়িয়া থাকে।

২। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

অর্থ—"নরগণ নারীগণের উপরিস্থ অধিনায়ক" এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট ও অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, নারীগণ পুরুষগণের নিম্নস্থা এবং অধীনা। কিন্তু এই অধীনতার দ্বারা নারীর মর্যাদার হানি করা হয় নাই; বরং ইহা দ্বারা তাহাদের মর্যাদা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা, উপার্জনের, ক্লেশের,কৃষি, ব্যবসায় এবং রাজত্ব, নেতৃত্ব, সমাজ ও পরিবার পরিচালনার ভার যদি নারী জাতির ঘাড়ে চাপান হইত, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের অবমাননাই করা হইত; তাছাড়া আল্লাহ্র সৃষ্টিরহস্য وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ (কতককে কতকের চেয়ে বড় করিয়া আমি সৃষ্টি করিয়াছি) এবং প্রাকৃতিক নিয়ম, ন্যায়ের মাথায় পদাঘাত করা হইত।

হাদীসঃ فَجَعَلَ الْاَمْرَ اِلَيْهَا - نسائى বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে—কুমারী হউক বা বিধবা হউক 'বালেগা মেয়েকে স্বাধীনতা দান করা হইয়াছে।' এই হাদীস দ্বারা নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার পরিমাণ বুঝা যাইতেছে যে, তাহার বিনা অনুমতিতে এবং তাহার অমতে তাহাকে কেহ বিবাহ দিতে পারিবে না; কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। কারণ, অন্য হাদীসে আছেঃ

اَيُّمَا امْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ○

অর্থাৎ, 'যে কোন মেয়েলোক তাহার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিবে তাহার বিবাহ বাতেল হইবে।' এই দুই হাদীসের মধ্যে স্থূল দৃষ্টিতে কিছু বিরোধ-ভাব দেখা যায়। সামঞ্জস্য এই যে, অভিভাবক উপরিস্থ অধিনায়ক বটেন এবং বিবাহ দেওয়ার কর্তাও তিনিই বটেন, কিন্তু বালেগা মেয়ের সামান্য স্বাধীনতাটুকু তাঁহার হরণ করা উচিত নহে, মেয়ের মতামত লইয়াই বিবাহ দেওয়া উচিত।

৩। কোরআনঃ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

অর্থ—ফরায়েয মতে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুণ ভাগ পাইবার অধিকারী।' এই আয়াত দ্বারাও ন্যায়-ধর্ম ঘোষণা করা হইয়াছে। কেননা, অন্য কোন ধর্মে নারীকে ভাগ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই; কিন্তু ইসলাম নারীর মর্যাদাও রক্ষা করিয়াছে, আবার নারীর মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া নরের মর্যাদাহানি করে নাই।

৪। কোরআন ঃ
وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ○

অর্থ—'তোমাদের পুরুষগণ হইতে দুইজন সাক্ষী রাখ। যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে তোমাদের পছন্দনীয় একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক।' এই আয়াতে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, প্রকাশ্য সভা সমিতি, বিচার ব্যবস্থা ক্ষেত্রে যেন নারীর কোন অধিকার নাই; কিন্তু অগত্যা নর অভাবে ইসলাম নারীকে নরের অর্ধেক ক্ষমতা দান করিয়াছে; তাও স্বাধীনভাবে নয়, অন্য একজন নরের সহিত সংযোগ করিয়া।

৫। কোরআন ঃ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

অর্থ—(হে নরগণ! তোমাদিগকে অধিনায়কত্ব দান করিয়াছেন বলিয়া তোমরা দুর্বল ও অধীনগণের ন্যায্য প্রাপ্য দাবী নষ্ট করিও না, খবরদার!) 'নারীদের সহিত তোমরা সদ্ব্যবহার করিও।' একঘেয়ে বুদ্ধিধারী সঙ্কীর্ণচেতাদের ন্যায় ইসলাম একজনকে তাহার অধিকার দিতে যাইয়া অন্য পক্ষের ন্যায্য পাওনা-দাবী আদৌ ভুলে নাই। তাই এই আয়াতে স্পষ্টরূপে নারীর মর্যাদা রক্ষার্থে তাহাদের অধিনায়কদিগকে পূর্ণ তাকীদ করা হইয়াছে।

৬। কোরআন ঃ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থ—'তাহারা (ভার্যারা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (পতিরা) তাহাদের পরিচ্ছদ।' পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বারা মানুষ ধুলা-বালি হইতে শরীরকে বাঁচায়, শীত, গ্রীষ্মের কষ্টে সাহায্য পায়, ভদ্রতা রক্ষা করে, সম্মান বর্ধিত করে। বাস্তবিক এই চারিটি উদ্দেশ্য নিয়াই দাম্পত্য জীবন রচনা করা হয় এবং এক্ষেত্রে নর ও নারী উভয়েরই সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। কিন্তু এই সমতার ভিতর দিয়াও কোরআন ইঙ্গিত করিতে ছাড়ে নাই যে, মেয়েদিগকে বাড়ীর ভিতর পর্দায় অবস্থান করিতে হইবে। কেননা, দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্যগুলি পর্দা ব্যতিরেকে সফল হইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ কন্যাকে বিবাহ দিয়াছেন, তখন তিনি ইহার এই সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, কাজ ভাগ করিয়া দিয়াছেন এবং পজিশন নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। মা ফাতেমাকে বলিয়াছেন, 'মা তোমাকে রান্না করা, কাপড় ধোয়া, আটা পিষা, পানি তোলা, বাড়ী পাহারা দেওয়া ইত্যাদি ঘরের কাজ করিতে হইবে' এবং আলী (রাঃ)কে বলিয়া দিয়াছিলেন, 'বাড়ীর বাহিরের কাজ সব তোমাকে করিতে হইবে।' কাজ ভাগ করা ব্যতিরেকে পরিবার, সমাজ এবং রাজত্ব কিছুরই শৃঙ্খলা রক্ষা হইতে পারে না। একজনে দশ কাজ বা দশজনে এক কাজ করিলেই শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। ভাগ করার বেলায়ও যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক এবং সকলে একজনকে মানিয়া চলা আবশ্যক এবং সেই একজন হইবেন যিনি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হইতে জ্ঞানপ্রাপ্ত। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভাবে কাজ ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং পজিশন ধার্য করিয়া দিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ, পুরুষের বাহিরে বেড়ান এবং মজুরি, কৃষি, ব্যবসা, নেতৃত্ব, রাজত্ব ইত্যাদি বাহিরের কাজ করা; নারীর বাড়ীর ভিতরে অবস্থান করা এবং ঘরের কাজ করা; আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্ধারিত এই সুনিয়ম পালন ব্যতিরেকে শান্তি নাই, পর্দা পরিত্যাগ করিয়া নারী জাতির বাহিরে বিচরণ অপেক্ষা সমাজ ও জাতির পক্ষে অশান্তিজনক আর কোনও কাজ নাই। মেয়েদের আবশ্যকবশতঃ যদি কখনও বাহিরে যাইতে হয়, তার জন্যও ব্যবস্থা আছে—

৭। **কোরআন ঃ** وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

'নারীরা যেন তাহাদের শোভা প্রদর্শন না করে'—

وَلَايَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ○

'নারীরা যেন পায়ের দ্বারা বাহিরে বিচরণ না করে বা নারীরা যেন তাহাদের পায়ের দ্বারা সজোরে ঠোকর না দেয়, তাহা হইলে তাহাদের যে শোভা তাহারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।' আল্লাহ্ পাক আরও বলেন—

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ○

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদিগকে, আপনার কন্যাদিগকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীদিগকে বলিয়া দিন যে, তাহারা যেন বড় চাদর বা বোর্কা দ্বারা ঘোম্‌টা খুব ঝুলাইয়া দেয়।' হাদীস শরীফে আছে, আবশ্যকবশতঃ যদি মেয়েলোকের বাহিরে যাইতে হয়, তবে তাহারা মলিন বেশে, বিনা-সজ্জায়, বিনা সুগন্ধিতে পথের কিনারায় কিনারায় যাইবে, পথের মধ্য দিয়া যাইবে না। হাদীস শরীফে আছে—হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁহার কোন স্ত্রীকে সফরে লইয়া যাইতেন, তখনও তাঁহার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করিতেন। মেয়েলোকের আওয়াজেরও পর্দার ব্যবস্থা শরীঅতে আছে।

মাসআলা ঃ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কন্যা ফাতেমা যাহ্‌রা রাজিআল্লাহু আনহাকে ১৫।।০ বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়াছিলেন। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহাকে সৎ-পাত্রে দান করিবার জন্য তাকীদ করিয়াছেন। কাজেই উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেওয়াই আসল সুন্নত এবং আদর্শ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহকে নিষিদ্ধ বলিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। এতটুকু বলিতে হইবে যে, বাল্যবিবাহ জায়েয বটে কিন্তু তাহা সুন্নত নহে।

পিতৃহীন না-বালেগা মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে অন্যান্য ইমামগণ বলেন, না-বালেগা অবস্থায় তাহার বিবাহ আদৌ দুরুস্ত নহে। শুধু আমাদের ইমাম ছাহেব বলেন, দাদা বিবাহ দিলে, তাহার বিবাহ দুরুস্ত হইবে। চাচা বা অন্য কেহ বিবাহ দিলে সে যখন বালেগা হইবে, তখন তাহার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে সেই বিবাহকে সে না-মঞ্জুর করিতে পারিবে, কিন্তু বিবাহ ভঙ্গ করিবার জন্য মুসলমান হাকিমের হুকুমের আবশ্যক হইবে। —অনুবাদক

১। **হাদীস ঃ** اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَّخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ ○

অর্থ—'দুনিয়া বলিতে যাহাকিছু আছে তাহার কোনটিই চিরস্থায়ী নয়, সবই ক্ষণস্থায়ী ব্যবহারের এবং কাজ চালাইবার জিনিস মাত্র। আর ক্ষণস্থায়ী কাজ চালাইবার যত জিনিস আছে, তার মধ্যে সতী-সাধ্বী পতি-ভক্তা নারী সবচেয়ে উৎকৃষ্টা। অর্থাৎ, কেহ যদি সৌভাগ্যক্রমে সতী-সাধ্বী পতি-ভক্তা স্ত্রী পায়, তবে তাহা আল্লাহ্‌র অতি বড় অনুগ্রহের দান। কেননা, এরূপ স্ত্রী দ্বারা স্বামীর ইহকাল এবং পরকাল উভয় কালেরই সাহায্য এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় (কাজেই এহেন নেয়ামতের শোকর করা চাই।)

২। **হাদীস ঃ** اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ○

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—'বিবাহ আমার সুন্নত ; যে আমার সুন্নতকে প্রত্যাখ্যান করিবে সে আমার (উম্মত) নয়।' এই হাদীসে হযরতের সুন্নত-তরিকা পালনের জন্য অত্যন্ত তাকীদ করা হইয়াছে। কেননা, সুন্নত লঙ্ঘন করার প্রতি হযরত অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সুন্নত তরক্‌কারী হইতে হযরত নিজের সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া লওয়ার

ঘোষণা করিয়াছেন। খোদা যেন এমন দিন না দেখান, যেদিন কোন মুসলমান হযরতের এহেন অসন্তোষ সহ্য করিতে পারিবে। অন্য হাদীসে আছে—হযরত বলিয়াছেনঃ 'তোমরা বিবাহ্ কর, তাহা হইলে আমার উম্মত বেশী হইবে। আমার উম্মত বেশী হইলে আমি অন্যান্য উম্মতদের মোকাবেলায় (প্রতিযোগিতায়) গৌরব করিতে পারিব। তোমাদের মধ্যে যাহারা সঙ্গতি সম্পন্ন আছে অর্থাৎ, এত পরিমাণ অর্থ সম্পত্তি আছে যে, তদ্দ্বারা তাহারা স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ করিতে পারে, তাহাদের বিবাহ্ করা উচিত এবং যাহাদের সঙ্গতি নাই তাহাদের রোযা রাখা উচিত; ঐরূপ রোযার দ্বারাও মানুষের কাম-রিপু দমন হইয়া যায়।

মাসআলাঃ পুরুষের কাম-রিপু যদি প্রবল না হয় এবং বিবাহের খরচ বহন করিবার সঙ্গতি থাকে, তবে তাহার জন্য বিবাহ্ করা সুন্নত, আর যদি কাম-রিপু অনেক প্রবল হয়, তবে তাহার জন্য বিবাহ্ করা ওয়াজেব; কেননা, খোদা না-করুক, যেনায় লিপ্ত হইলে হারামকারী করার গোনাহ্ হইবে। আর যদি কাম-রিপু প্রবল হয়, কিন্তু বিবাহের খরচ বহনের সঙ্গতি না থাকে, তবে তাহার হামেশা রোযা রাখিতে হইবে এবং যখন খরচ যোগাড় করিতে পারে, তখন বিবাহ্ করিবে।

৩। **হাদীসঃ** শিশু সন্তান বেহেশ্‌তের ফুলস্বরূপ অর্থাৎ বেহেশ্‌তের ফুল পাইলে যেমন আনন্দ এবং খুশী হয়, সন্তান-সন্ততি পাইয়াও মানুষের মনে তদ্রূপ খুশী এবং আনন্দ পায়। একমাত্র বিবাহ্ ছাড়া সন্তান লাভ করিবার অন্য কোনই উপায় নাই। কাজেই দেখা গেল যে, বিবাহের দ্বারা বেহেশ্‌তের ফুল লাভ করা যায়।

৪। **হাদীসঃ** কিয়ামতের দিন কোন কোন লোকের মর্তবা বেহেশ্‌তের মধ্যে তাহার আশাতীতরূপে অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, তখন তাহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিবে, 'হে পাক পরওয়ারদেগার! আমরা ত এমন কোন আমল করিয়াছিলাম না, যাহার কারণে এত বড় মর্তবার অধিকারী হইতে পারি।' তখন তাহাদিগকে উত্তর দেওয়া হইবে যে, 'তোমাদের উত্তরাধিকারী সন্তানগণের দো'আর বরকতে তোমাদের মর্তবা এত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।'

৫। **হাদীসঃ** যে সব সন্তান গর্ভপাত হইয়া মারা যায়, তাহারাও তাহাদের মা-বাপের জন্য (যখন তাহাদের মা-বাপকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে তখন) আল্লাহ্‌র সঙ্গে জিদ করিবে যে, আমাদের মা-বাপকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া দিতেই হইবে এবং বেহেশ্‌তের মধ্যে আনিয়া দিতেই হইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা দয়াপরবশ হইয়া বলিবেন, 'হে জিদ্দী ছেলে! নে, এই নে, তোর মা-বাপ নিয়া বেহেশ্‌তে যা।' তখন সে তাহার মা-বাপকে সঙ্গে লইয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, গর্ভপাতের সন্তানও মা-বাপের কাজে আসিবে এবং বিবাহের উছিলায়ই এই ফযীলত হাছেল হইবে।

৬। **হাদীসঃ** স্বামী যখন (প্রেম-ভরে) স্ত্রীর দিকে তাকায় এবং স্ত্রী যখন (প্রেম-ভরে) স্বামীর দিকে তাকায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উভয়ের উপর খাছ রহ্‌মতের দৃষ্টি করেন। কারণ, সৎস্বামী নিজের স্ত্রীর দিকেই তাকায়, তা ছাড়া অন্য মেয়েলোকের দিকে তাকায় না এবং সতী স্ত্রী নিজের স্বামীর দিকেই তাকায়, পর পুরুষের দিকে তাকায় না; অথচ শুধু বিবাহের দ্বারাই ইহা রক্ষা পাইতে পারে।

৭। **হাদীসঃ** যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হারাম কৃত (কুনজর, কুচিন্তা, কুকর্ম ইত্যাদি) পাপ কাজ হইতে নিজের আত্মা ও চরিত্রকে পবিত্র রাখিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ এবং রাসূলের তাবেদারীর

নিয়্যতে বিবাহ্ করিবে, তাহার (পরিবার পরিচালনের আবশ্যকীয় খরচ ইত্যাদিতে) সাহায্যের ভার আল্লাহ্ তা'আলা লইয়াছেন।

৮। হাদীসঃ বিবি বাচ্চাওয়ালা ব্যক্তির দুই রাকা'আত, বিবি-বাচ্চাহীন ব্যক্তির বিরাশি (অন্য এক রেওয়ায়তে সত্তর) রাকা'আতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সত্তর এবং বিরাশির বিরোধ ভঞ্জন এইরূপে হইতে পারে যে, যে আদেশ পালনার্থে সন্তানদের শুধু যরুরী হক আদায় করিবে, তাহার দুই রাকা'আত অন্যের সত্তর রাকা'আতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে। আর যে আল্লাহ্‌র আদেশের যরুরী হক আদায় ছাড়া শারীরিক পরিশ্রম, আর্থিক ব্যয় এবং ভাল ব্যবহার দ্বারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভার্থে বিবি-বাচ্চাদিগকে আরও বেশী ভালবাসিবে তাহার দুই রাকা'আত অন্যের বিরাশি রাকা'আতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে।

৯। মাসআলাঃ মানুষের বড় পাপ এই যে, যাহাদের ভরণ-পোষণ, লালন-পালন এবং তরবীয়তের ভার তাহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের সেই হক আদায়ের মধ্যে সে ত্রুটি বা অবহেলা করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

১০। মাসআলাঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'আমি আমার পরে পুরুষ জাতির ধর্ম নষ্টকারী স্ত্রীজাতির ফেৎনার চেয়ে বড় ফেৎনা আর দেখি না।' ফেৎনার অর্থ—মানুষ যে বিভ্রাটে পড়িয়া হতবুদ্ধি হইয়া হিতাহিত জ্ঞান এবং দ্বীন, ঈমান নষ্ট করিয়া ফেলে তাহাকে ফেৎনা বলে। স্ত্রীজাতির কারণে পুরুষের কয়েক প্রকারের ধর্ম নষ্ট হয়—

প্রথমতঃ পুরুষ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ভিতর সৃষ্টিগতভাবে স্ত্রীজাতির প্রতি এক প্রকার আকর্ষণ শক্তি জন্মে। সেই আকর্ষণের ফলে পুরুষের মন আপনা আপনি স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য অবলোকন, কথোপকথন, কাছে উপবেশন এবং মিলন লাভ করিতে চায়। এই উত্তাপ তরঙ্গ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত নবযুবকের মনের ভিতর উঠে, তখন তাহাকে বাধা দিয়া রাখিবার মত জিনিস এক আলেমুল গায়েব ওয়াশ্‌শাহাদাত, (অন্তর্যামী) আল্লাহ্‌র ভয় ব্যতীত আর কিছুই নাই। কারণ, সরকারী পুলিশ বা মা-বাপ, গুরুজন সব সময় মানুষের সঙ্গে থাকিতে পারে না, দুর্নামের ভয় বা আত্মা কলুষিত, চরিত্র ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার ভয় মনের সেই দুর্দমনীয় শয়তানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত শক্তি রাখে না। শয়তান তখন মানুষের কল্পনা শক্তিকেও পরিবর্তিত করিয়া ফেলে। একমাত্র আল্লাহ্‌র গযব ও আযাবের ভয়ই তখন মানুষকে পাপ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে; তাছাড়া অন্য কোন কিছুই পারে না। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা-প্রথা পালন এবং বিবাহ্ করা ফরয করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ পুরুষ যখন বিবাহ্ করে তখন তাহার মন সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং তার মন শুধু প্রেম-পাত্রীর মন যোগাইয়া চলিতে চায়। এই জন্যই অনেক হতভাগ্য যুবক তার মা-বাপ ভাই-বোন বা পিতৃকুলের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনগণকে ভুলিয়া শুধু শ্বশুরকুলের মন যোগাইয়া চলিতে আরম্ভ করে। কারণ যৌবনকে হাদীসে বুদ্ধিহীনতা এবং পাগলামির একশাখা বলা হইয়াছে এবং স্ত্রীজাতিকে 'নাকেছাতোল আক্‌ল' অপূর্ণ জ্ঞান-বিশিষ্ট জাতি বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কেননা, সাধারণতঃ যদিও কোন কোন মেয়েলোককে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বিশিষ্টা দেখা যায়, কিন্তু জাতিগতভাবে স্ত্রীজাতির বুদ্ধিতে ব্যাপকতা ও দূরদর্শিতা কম হয়। যাহারা বুদ্ধিমতি মেয়েলোক হয়, তাহাদের বুদ্ধিও সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ হয়, দূরদর্শী হয় না। নিজের ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সুখ-দুঃখ, উপস্থিত লাভ-লোকসান বুঝে, ব্যাপকভাবে জগতজোড়া গোটা জাতির বা

দূরের সুখ-দুঃখ লাভ-লোকসান ভাল মতে বুঝে না। তাছাড়া যৌবন-স্রোতে ভাসমান যুবতীদের মধ্যে বিলাসিতা, অনুকরণপ্রিয়তা এবং প্রবৃত্তির বশবর্তিতা এত অধিক হয় যে, তাহা চাপিয়া রাখা এক আল্লাহ্র কঠোর আদেশের পর্দা-প্রথা পালন ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ বেপর্দায় বেড়াইয়া সৌন্দর্য, অলঙ্কার ও কাপড় দেখাইবার প্রবৃত্তি ধর্ম-শিক্ষাবিহীন চরিত্রহীনা সুন্দরী নারীর হইয়া থাকে এবং যুবকগণও প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া বিজাতীয় অন্ধ অনুকরণ করতঃ পর্দা-প্রথা উঠাইয়া দিয়া সৌন্দর্য অবলোকন করিতে চায়। পরিণামে এই পর্দা-প্রথা পালন না করার ফলে মানুষের স্বাস্থ্য, সমাজ, সম্মান, ধর্ম, পরবর্তী বংশ, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি সবই নষ্ট হয়। পুরুষের চক্ষু যখন পর-স্ত্রীর উপরে পড়ে, তখন তাহার মনের ভিতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক এবং এই মনের চাঞ্চল্যের কারণেই তাহার জীবনীশক্তি দুর্বল এবং হীন-বীর্য হইয়া যায়, ফলে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং পরবর্তী নছল অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি নষ্ট হয়; এইরূপে স্ত্রীজাতির সতীত্ব নষ্ট এবং নছল বা সন্তান-সন্ততি ধ্বংস শুধু গোনাহ্ কবীরার দ্বারাই যে হয় তাহা নহে; বরং স্ত্রীর চক্ষু যখন পর-পুরুষের দিকে ধাবিত হয়, তখনই তাহার কোমল মন দোটানায় পড়িয়া যায়; ফলে জ্ঞানহীন, লজ্জাহীন, স্বাবলম্বনহীন, পিতৃ-মাতৃ ভক্তিহীন কুসন্তান জন্মে। কাজেই ইহা অতি বড় ফেৎনা এবং এই ফেৎনার সৃষ্টি স্ত্রীজাতি হইতেই হইয়া থাকে। (অবশ্য শীতপ্রধান দেশে মনের চাঞ্চল্য কম হয় এবং সেই কারণেই ইংরেজগণ পর্দা প্রথা পালন না করা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যবান থাকে। তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট কম হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য কুকর্ম কম হয় না।)

তৃতীয়তঃ মানুষ উপরোক্ত দুইটি পাপ ছাড়া নারীর কারণে আরও অনেক পাপ করিয়া ধর্ম নষ্ট করে। যথা—স্ত্রীর বিলাসিতা, অমিতব্যয়িতা বা বেহুদা কাজকর্ম, রছুম-রেওয়াজ প্রভৃতি কারণে অনেক সময় স্বামীকে সুদ ঘুষ, মাপে কম দেওয়া, মিথ্যা কথা বলিয়া জিনিস বিক্রয় করা ইত্যাদি অসদুপায়ে আয় বাড়াইতে হয়। এখানে মাত্র দুনিয়ার কয়েকটি ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হইল। তাছাড়া দুনিয়ার আরও অনেক রকম ক্ষতি স্ত্রীজাতির ফেৎনার কারণে হয়, আর আখেরাতের ক্ষতি ত অসীম। স্ত্রীজাতির ফেৎনায় যে পড়িবে তাহাকে অনেক প্রকার কঠোর আযাব দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও ভুগিতে হইবে। —অনুবাদক

১১। হাদীসঃ "একজনে যেখানে বিবাহের পয়গাম দিয়াছে যতদিন না সে ছাড়িয়া যায়, বা মেয়ের পক্ষ হইতে জওয়াব দিয়া দেওয়া হয়, সেখানে অন্য কেহ পয়গাম দিবে না। এইরূপে যে মাল একজনে দর করিতেছে—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ছড়িয়া যায় বা বিক্রেতা তাকে জওয়াব দিয়া দেয়, সে মাল অন্য কেহ দর করিবে না" এই হুকুমের মধ্যে মুসলমান অমুসলমান সকলেরই একই হুকুম। অর্থাৎ একজন হিন্দু যে জিনিস দর করিতেছে একজন মুসলমানের সে জিনিস দর করা চাই না,যতক্ষণ না সে ছাড়িয়া যায়। (অবশ্য নিলামের মালের এই হুকুম নহে। নিলামের মালের নিলাম ডাকা এবং বলা সকলের জন্য জায়েয আছে।)

১২। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, "হে আমার উম্মত! কেহ বিবাহ করে সম্পত্তি দেখিয়া, কেহ বিবাহ করে সৌন্দর্য দেখিয়া, (কেহ বিবাহ করে সম্মান ও উচ্চ বংশ দেখিয়া) এবং কেহ বিবাহ করে দ্বীনদারী পরহেযগারী দেখিয়া। অতএব, হে আমার প্রিয় উম্মত! আমি তোমাদিগকে অছিয়ত করি যে, তোমরা দ্বীনদারী-পরহেযগারী দেখিয়া বিবাহ করিবে; তাহা হইলেই ইন্‌শা-আল্লাহ্ তোমাদের জীবন সার্থক ও শান্তিময় হইবে।"

১৩। হাদীসঃ সব চেয়ে ভাল (বিবাহ, ভাল কুটুম্ব এবং) বিবি সেই, (যে বিবাহে কম খরচ হয় এবং যাহারা কুটুম্বিতা করিতে কুটুম্বের উপর বেশী বোঝা না চাপায় এবং) যে বিবির (বিবাহ খরচ এবং) মহর কম হয়। আজকাল বিবাহ কার্যে লোকেরা অনেক আড়ম্বর ও অপব্যয় করিতেছে, গৌরব দেখাইবার জন্য অনেক জেওর কাপড় ও বেশী মহর চাহিতেছে। এই কুপ্রথায় সমাজের এবং ধর্মের অনেক ক্ষতি আছে, কাজেই এই কু-প্রথা বর্জন করা দরকার।

১৪। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা তোমাদের (সন্তানের) বীজ বপনের জন্য উত্তম ক্ষেত্র (স্ত্রী) বাছিয়া লও। কেননা, মেয়েরা ভাই-ভগ্নীদের অনুরূপ সন্তান জন্মায়।" এই হাদীসের মর্ম এই যে, যাহাদের পুরুষগণের মধ্যে কোনরূপ কু-কাজ ও কলঙ্ক নাই, বিবাহ করিবার সময় তেমন সদ্বংশ-জাত মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করা দরকার। কেননা সাধারণতঃ সন্তান মা এবং মাতুল কুলের অনুরূপ বেশী হয়। অতএব, মা বা মাতুল কুলের মধ্যে যদি কোনরূপ চরিত্র-দোষ (চুরি, জেনা, বে-পর্দা, হারামখোরী, বেহায়াপনা ইত্যাদি) থাকে, তবে খুব সম্ভব সন্তানের মধ্যেও সেই দোষ রক্তে টানিয়া আনিবে।

১৫। হাদীসঃ স্ত্রীলোকের উপর সব চেয়ে বড় হক তার স্বামীর, আর পুরুষের উপর সব চেয়ে বড় হক তার মার (অর্থ এই যে, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের হক ত সব চেয়ে বেশী, তারপর স্ত্রীর উপর তার স্বামীর হকের চেয়ে বড় হক আর কাহারও না। এমনকি, মা-বাপের চেয়েও স্ত্রীর উপর তার স্বামীর হক আরও বড়, আর পুরুষের উপর মাতার হক সব চেয়ে বেশী, এমনকি বাপের চেয়েও বেশী।)

১৬। হাদীসঃ যখন তোমরা স্ত্রী-সহবাস করিবার ইচ্ছা কর তখন—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا ○

এই দো'আটি পড়িয়া আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া লইও, তাহা হইলে যদি ঐ সহবাসে সন্তান হওয়া তক্দীরে লেখা থাকে, তবে শয়তান সেই সন্তানের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না। (দো'আটির অর্থ এই—আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিয়া আমি এই কামে লিপ্ত হইতেছি। আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে শয়তানের হাত হইতে বাঁচাও এবং তুমি আমাদেরে যাহা দান করিবে তাহাকেও শয়তানের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিও।)

১৭। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইব্নে-আওফ নামক জনৈক ছাহাবীকে আদেশ করিয়াছেন اولم ولوبشاة। অর্থাৎ, অলীমা কর, (যদিও বেশী না পার, মাত্র একটি বকরী যবাহ করিয়া খাওয়াইবার তৌফীক থাকে, তবুও অলীমা করিতে ত্রুটি বা তাকাল্লোফ করিও না। মাত্র একটি বকরীর দ্বারাই অলীমা কর।) অর্থ এই যে, যদি বেশী ধুমধাম করিয়া বা আত্মীয়-স্বজন খেশকুটুম্ব, পাড়া পড়শী গ্রামবাসীদের দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবার তৌফীক না থাকে, তবে ধার করয না করিয়া সহজে যে পরিমাণ পার, সেই পরিমাণই অলীমা খাওয়াইয়া দাও, একেবারে বন্ধ করিও না বা একেবারে খুলিয়া দিয়া দেনা দায়িক হইয়া পড়িও না।

(হযরত নবী আলাইহিস সালাম তাঁহার এক বিবাহে মাত্র দুই সের যবের দ্বারা অলীমা করিয়াছেন এবং সব চেয়ে বড় অলীমা করিয়াছেন হযরত জয়নবের বিবাহে। তখন একটি বকরী যবাহ করিয়া আছহাবগণকে গোশ্‌ত-রুটি পেট ভরিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। অন্য এক বিবাহে খোরমা, পনির এবং ঘৃত মিশ্রিত ক্ষীর খাওয়াইয়াছেন।)

অলীমা করা মোস্তাহাব। অলীমা কোন্ সময় খাওয়ান চাই, এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রথম মিলনের পরবর্তী দিনই অলীমা করা ভাল। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন যে, বৌ উঠাইয়া আনার পূর্বে ও আক্‌দ হইয়া যাওয়ার পরই অলীমা হইতে পারে (জোর জবরদস্তি করিয়া কাহারও নিকট হইতে দাওয়াত খাওয়া হারাম। ফখরের জন্য পাল্লা দিয়া খাওয়ান বা সেইরূপ দাওয়াতে খাওয়া না-জায়েয। ঋণ করিয়া খাওয়ান বা সেইরূপ দাওয়াত খাওয়া না-জায়েয।)

তালাকের নিন্দাবাদ এবং অপকারিতা

১৮। হাদীসঃ "মোবাহ্ জিনিসের মধ্যে তালাকের চেয়ে ঘৃণিত জিনিস আল্লাহ্র নিকট আর নাই।"—হাকিম, আবুদাউদ, ইবনে মাজা। অর্থ এই যে, বান্দাদের (জরুরতের) জন্য আইনতঃ তালাককে জায়েয রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে (বিনা জরুরতে) যদি কেহ তালাক দেয়, তবে তাহা আল্লাহ্র নিকট বড়ই ঘৃণিত। অতএব, প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর খুব সতর্ক হইয়া চলা দরকার। উভয়ের মধ্যে যাহাতে মিল-মহব্বত থাকে তাহারও চেষ্টা করা উভয়ের দরকার। একজনের রাগ, অসুখ বা অন্যায় ব্যবহারের সময় অন্য জনের বিশেষভাবে ছবর বরদাশ্ত করিয়া চলা দরকার; নতুবা নানাবিধ খারাবীর আশঙ্কা আছে— দুনিয়ারও খারাবী এবং আখেরাতেরও খারাবী। আখেরাতের খারাবী এই যে, স্বামী স্ত্রীর জন্য এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য আল্লাহ্র অতি বড় একটি নেয়ামত এবং অনুগ্রহের দান। আল্লাহ্র এই নেয়ামতের না-শুকরী এবং বে-কদরী যে করিবে তাহার উপর আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হইবেন। তাহা ছাড়া একজনের মনে কষ্ট দেওয়া অতি বড় পাপ। দুনিয়ার খারাবী এই যে, দুইটি বংশ বা দুইটি গ্রামের মধ্যে শত্রুতা, আদাওতির সৃষ্টি হইয়া দুর্নাম, বদনাম, ঝগড়া কলহ, মারামারি, কাটাকাটি, মামলা মকদ্দমা কত যে হয় এবং আরও কতদূর যে ইহার জের গড়ায় তাহার সীমা নাই। যদি একজন একটু ছবর করিত, তবে এত অপকর্মের সৃষ্টি হইত না। অবশ্য যখন ছবরের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়াও অন্য পক্ষের ক্ষোভ না মিটে এবং কোন প্রকারেই মিল মহব্বত এবং একতা না হইতে পারে, তখন তালাকের কথা মুখে আনা যাইতে পারে। (এইরূপ প্রয়োজনবোধে তালাক দিতে হইলেও তাহা রাগের বশীভূত হইয়া বা গালাগালি করিয়া দিবে না বা হায়েয-নেফাসের সময়ও তালাক দিবে না এবং এক সঙ্গে তিন তালাক বা দুই তালাক দিবে না। একবার পাক অবস্থায় দুইজন ভাল লোককে সাক্ষী করিয়া মাত্র একটি তালাক দিবে এবং তালাকের পর তিন মাস পর্যন্ত খোরাক ও পোশাক দিবে।)

১৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা বিবাহ কর, কিন্তু তালাক দিও না। কেননা, যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক অনেক জায়গার স্বাদ গ্রহণ করে, তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না।" অর্থ এই যে, বিনা জরুরতে নানা জায়গার স্বাদ গ্রহণ করাকে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ বা স্ত্রীলোক কাহারও জন্য পছন্দ করেন না। —তাবরাণী

২০। হাদীসঃ স্ত্রীকে যতক্ষণ পর্যন্ত ফাহেশা কাজে প্রবৃত্ত না পাও ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে তালাক দিও না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন স্থানের স্বাদ গ্রহণকারীকে পছন্দ করেন না, সে পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক। এই হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি স্ত্রী সতীত্ব এবং নছল নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয় কিংবা এধরনের কোন কাজ করিয়া থাকে, তবে তালাক দেওয়া যায়।

২১। **হাদীসঃ** বিবাহ্ কর কিন্তু তালাক দিও না। কেননা, তালাক দিলে আল্লাহ্‌র আরশ কম্পিত হয়। —ইবনে আদী

২২। **হাদীসঃ** ইবলিস শয়তান সমুদ্রের পানির উপর তাহার সিংহাসন পাতিয়া বসে এবং তাহার দলকে দুনিয়ার চতুর্দিকে লোকদিগকে পাপকর্ম করাইবার জন্য প্রেরণ করে। তারপর আবার সকলের নিকট হইতে হিসাব লয়, যে যত বড় এবং যত বেশী পাপ করাইতে পারে, তাহাকে তত বড় পদ এবং অধিক নৈকট্য দান করে। অতঃপর হিসাবের সময় কেহ বলে যে, "আমি অমুক অমুক পাপ করাইয়া আসিয়াছি।" তখন বুড়া শয়তান বলে যে, "তুই কিছুই করিস নাই" অর্থাৎ, বড় কোন কাজ করিতে পারিস নাই। এইরূপ সকলেই বলিতে থাকে। এমনকি যখন কেহ বলে যে, "আমি অমুক স্বামী হইতে তাহার স্ত্রীকে ছাড়াইয়া পৃথক করিয়া দিয়া আসিয়াছি, "তখন বুড়া শয়তান খুব সন্তুষ্ট হয় এবং ঐ কর্মবীরকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার সহিত কোলাকুলি গলাগলি করে এবং বলে, ("সাবাস বেটা! সাবাস!) তুই খুব বড় কাজ করিয়া আসিয়াছিস।" অতএব, প্রত্যেক মুসলমানেরই খুব সতর্ক থাকা দরকার যাহাতে আল্লাহ্ ও রাসূলের মনে কষ্ট দিয়া নিজের দ্বীন ও দুনিয়ার পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া যেন বুড়া শয়তানের মন সন্তুষ্ট না করে। —মোসলেম, আহ্‌মদ

২৩। **হাদীসঃ** যে মেয়েলোক একান্ত ঠেকা ছাড়া নিজে ইচ্ছা করিয়া স্বামীর নিকট তালাক চাহিবে তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম। অর্থাৎ বড় কঠিন গোনাহ্। অবশ্য ঈমানের সহিত মরিলে পাপ কার্যের শাস্তি ভোগ করিয়া অবশেষে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। —আহ্‌মদ, হাকেম

২৪। **হাদীসঃ** যেসকল মেয়েলোক স্বামীর সহিত এমন খারাপ ব্যবহার করে যাতে সে অবশেষে তালাক দিতে বাধ্য হয়, তাহারা এবং যাহারা একান্ত ঠেকা ছাড়া স্বামীর নিকট খোলা তালাক চাহিবে তাহারা মোনাফেক দলভুক্ত। অর্থাৎ ইহা মোনাফেকের স্বভাব। ভিতরে এক রকম বাহিরে আর এক রকম। বাহ্যতঃ বিবাহ চিরদিনের জন্য হইয়া থাকে অথচ সে চায় বিচ্ছিন্নতা। কাজেই যদি কাফের না-ও হয় গোনাহ্‌গার হইবে।

তালাক

১। **মাসআলাঃ** আকেল বালেগ স্বামী অর্থাৎ, বালেগ হইয়াছে এবং পাগল নহে, সে তালাক দিলে অবশ্য তালাক হইয়া যাইবে। (আকেল বালেগের মুখের কথা বৃথা যাইবার নহে।) যে স্বামী এখনও বালেগ হয় নাই, সে তালাক দিলে তালাক হইবে না। এইরূপে পাগল স্বামী তালাক দিলে তালাক হইবে না।

২। **মাসআলাঃ** ঘুমন্ত স্বামীর মুখ দিয়া যদি এইরূপ কথা বাহির হয় যে, 'তোকে তালাক' বা 'আমার স্ত্রীকে তালাক' এরূপ বিড় বিড় করিলে তালাক হইবে না।

৩। **মাসআলাঃ**কোন যালেম যদি স্বামীর উপর অত্যাচার করিয়া বলে যে, 'তুই তোর স্ত্রীকে তালাক না দিলে তোকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিব' এইরূপ মজ্‌বুরীতে সে তালাক দিল তবুও তালাক হইয়া যাইবে; (কিন্তু ঐ যালেম এইরূপ অত্যাচারের দরুন মহাপাপী হইবে।)

৪। **মাসআলাঃ** কেহ যদি কোন নেশা পান করিয়া মাতাল হইয়া তালাক দিয়া পরে আক্ষেপ করে, তবে তাহাতেও তালাক হইয়া যাইবে। এইরূপ যদি কেহ রাগে অধীর হইয়া তালাক দেয়, তাতেও তালাক হইয়া যাইবে। (অতএব, সাবধান মুসলমানগণ! রাগ, নেশা ত্যাগ

করার অভ্যাস কর, একান্ত যদি তাহা না পার তবে আর যত কিছুই কর, কিন্তু তালাক শব্দ মুখে উচ্চারণ করিও না।)

৫। **মাসআলা ঃ** তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও নাই। (স্বামীর বাপেরও নাই বা স্ত্রীরও নাই, স্ত্রীর বাপেরও নাই।) অবশ্য স্বামী যদি কাহাকেও তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দেয়, (স্ত্রীকে বা অন্য কাহাকেও) তবে সে তালাক দিতে পারে।

তালাক দেওয়ার কথা

১। **মাসআলা ঃ** তালাক দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বামীকে দেওয়া হইয়াছে, স্ত্রীর তাহাতে আদৌ কোন ক্ষমতা নাই। অতএব, স্বামী যদি তালাক দেয় আর স্ত্রী যদি গ্রহণ না করে, তবুও তালাক হইয়া যাইবে। স্ত্রী নিজের স্বামীকে তালাক দিতে পারে না।

২। **মাসআলা ঃ** স্বামীকে মাত্র তিন তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বেশী তালাক দেওয়ার ক্ষমতা তাহার নাই। যদি কেহ চার পাঁচ তালাক দেয়, তবুও তিন তালাকই হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** স্বামী মুখে বলিল, "আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম" এতটুকু জোরে বলিয়াছে যে, নিজে এই শব্দগুলি শুনিয়াছে। এতটুকু বলাতেই তালাক হইয়া যাইবে। কাহারও সাক্ষাতে বলুক বা কাহারও সাক্ষাতে না বলিয়া একা একাই বলুক অথবা স্ত্রীকে শুনাইয়া বলুক বা না শুনাইয়া বলুক, বা সর্বাবস্থায়ই তালাক হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** তালাক তিন প্রকারঃ ১। তালাকে বায়েন (মোখাফ্‌ফফা) ২। তালাকে বায়েন (মোগাল্লাযা) ৩। তালাকে রজ্‌য়ী।

বায়েন এমন তালাক যে, তাহাতে বিবাহ সম্পূর্ণ টুটিয়া যায়, পুনরায় বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া স্বামীর জন্য স্ত্রীকে রাখা জায়েয নহে এবং স্ত্রীর জন্য ঐ স্বামীর কাছে থাকা জায়েয নহে । (বায়েন তালাক হওয়া মাত্রই স্ত্রী পৃথক হইয়া যাইবে এবং ঐ স্বামীকে দেখা দেওয়াও জায়েয হইবে না। অবশ্য পরে যদি স্বামী ঐ স্ত্রীকে রাখিতে চায় বা স্ত্রী যদি ঐ স্বামীর কাছে থাকিতে চায়, তবে উভয়ের মত লইয়া বিবাহ পড়াইতে হইবে। এক তালাক বা দুই তালাক পর্যন্ত বায়েন (মোখাফ্‌ফফা) হইতে পারে।

মোগাল্লাযা তালাক ঃ তিন তালাক হইলে মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে, (বায়েন বলুক বা না বলুক বা রজয়ী বলুক, এক সঙ্গে এক সময় বলুক বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা বহুকাল পরে বলুক ; মোটকথা তিন তালাক হইলে মোগাল্লাযা হইবে।) তালাকে মোগাল্লাযা হইলে বিবাহ ত যখন তখন টুটিয়া যাইবেই, এমনকি দ্বিতীয়বার বিবাহ দোহ্‌রাইয়া রাখিতে বা থাকিতে চাহিলে তাহাও জায়েয নহে। অবশ্য যদি ঐ স্ত্রী ইদ্দতের পর অন্য কোন জায়গায় বিবাহ বসে এবং স্বামী-স্ত্রী সহবাস করার পর তালাক দেয় অথবা মরিয়া যায় এবং তাহার ইদ্দতের পর প্রথম স্বামী তাহাকে পুনরায় আনিতে চায়, তবে সে রাজি হইলে শরীঅতের নিয়ম অনুসারে পুনরায় বিবাহ করিয়া তাহাকে আনিতে পারিবে।

তালাকে রজয়ী এমন তালাক যে, স্বামী পরিষ্কার শব্দে এক তালাক দিলাম বা দুই তালাক দিলাম বলিবে। ইহাতে বিবাহ সম্পূর্ণ টুটিবে না, যদি পরে পরিণাম চিন্তা করিয়া স্বামী ঐ স্ত্রীকে রাখিতে চায়, তবে বিবাহ দোহ্‌রাইবার দরকার হইবে না, বিবাহ না দোহ্‌রাইয়াও রাখিতে পারিবে। এমনকি, মুখ দিয়া কিছু না বলিয়াও যদি স্বামী স্ত্রীর মত আচার-ব্যবহার করে, তবে তাহাও দুরুস্ত

আছে। অবশ্য যদি রজয়ী তালাক দেওয়ার পর কিছুই না বলে বা না করে এবং রজআত না করে অর্থাৎ নিজের কথা ফিরাইয়া না লয় আর ঐ ভাবেই ইদ্দত শেষ হইয়া যায়, তবে ঐ রজয়ী তালাকই বায়েন তালাকে পরিণত হইয়া যাইবে এবং পরে আর বিবাহ্ না দোহ্‌রাইয়া ঐ স্ত্রীকে আনিতে পারিবে না। একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, তিন তালাক রজয়ী হইতে পারে না; এমনকি 'তালাক রজয়ী' নাম উচ্চারণ করা সত্ত্বেও তিন তালাক হইয়া গেলে আর স্বামীর কোন ক্ষমতা থাকিবে না, তালাক বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। (এই জন্যই তিন তালাক দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা কোরআন, হাদীসে আছে। কেননা, তালাক এতই খারাপ জিনিস যে, যদি কেহ্ এক তালাক দিয়া রজআত করিয়া বা বিবাহ্ দোহ্‌রাইয়া দুই তিন বৎসর পরে পুনরায় এক তালাক দেয় এবং তারপর দুই তিন বৎসর পরে আবার এক তালাক দেয়, তবুও সব মিলিয়া যোগ হইয়া বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া সম্পূর্ণ ভাবে তালাক হইয়া যাইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, তালাক এতই খারাপ জিনিস যে, শব্দই মুখে আনা চাই না।

৫। মাসআলা ঃ তালাক দিতে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহা দুই প্রকার। এক প্রকার পরিষ্কার অর্থ প্রকাশক এবং একার্থবোধক, ইহাকে 'ছরীহ্' বলে। যেমন কেহ্ তাহার স্ত্রীকে বলিল, "আমি তোমাকে তালাক দিলাম" বা "আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম।" দ্বিতীয় প্রকার যাহার অর্থ পরিষ্কার নহে, একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে; তালাকের অর্থও হইতে পারে, অন্য অর্থও হইতে পারে, যেমন কেহ তাহার স্ত্রীকে বলিল, "আমি তাহাকে দূর করিয়া দিলাম।" এই কথার অর্থ তালাকও হইতে পারে এবং এই অর্থও হইতে পারে যে, তালাক দেই নাই, বর্তমানে আমি আমার স্ত্রীকে আমার কাছে আসিতে নিষেধ করিয়াছি। এইরূপ শব্দকে 'কেনায়া' বলে। কেনায়ার আরও অনেক শব্দ আছে। যেমন, কেহ্ তাহার স্ত্রীকে বলে, "তুই তোর বাপের বাড়ী গিয়া থাক, আমি তোর খবরবার্তা লইতে পারিব না, আমার সঙ্গে তোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, তুই আমার না, আমি তোর না, আমার বাড়ী থেকে চলিয়া যা, দূর হইয়া যা", (আমি তোকে ছাড়িয়া দিলাম, তুই যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যা ইত্যাদি।) এই সব শব্দেরই দুই দুইঅর্থ হইতে পারে, তালাকের অর্থও হইতে পারে, অন্য অর্থও হইতে পারে।

৬। মাসআলা ঃ ছরীহ্ শব্দের দ্বারা অর্থাৎ পরিষ্কার একার্থবোধক শব্দের দ্বারা তালাক দিলে তালাক দেওয়ার নিয়ত হউক বা না হউক, এমনকি হাসি-ঠাট্টারূপে বলিলেও যখন তখন তালাক হইয়া যাইবে। আর এক তালাক বলিলে বা শুধু তালাক বলিলেও এক তালাক রজয়ী এবং দুই তালাক বলিলে বা দুই বার তালাক শব্দ বলিলে—দুই তালাক রজয়ী হইবে। কিন্তু তিন তালাক বলিলে বা তালাক শব্দ তিন বার বলিলে তিন তালাক হইয়া বায়েনে মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। (খবরদার! তিন তালাক এক সঙ্গে দিলে ভারী গোনাহ্ হয়।)

৭। মাসআলা ঃ এক তালাক দেওয়ার পর যত দিন ইদ্দত শেষ না হইয়া যায় তত দিন আরও দুই তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীর থাকে, ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয়, তৃতীয় তালাকও দিতে পারে। (অতএব, ইদ্দতের মধ্যে) যদি আরও এক তালাক বা দুই তালাক দেয়, তবে তাহাও তালাক হইবে।

৮। মাসআলা ঃ 'তালাক দিব' বলিলে তালাক হইবে না। (অর্থাৎ, অতীত কালের বা বর্তমান কালের শব্দ ব্যবহার করিলে তালাক হইবে; কিন্তু ভবিষ্যৎকালের শব্দ ব্যবহার করিলে তালাক হইবে না।) অতএব, যদি তাহার স্ত্রীকে বলে যে, "যদি তুই অমুক কাজ করিস, তবে তোকে

তালাক দিয়া দিব” এইরূপ বলিলে সেই কাজ করুক বা না করুক তালাক হইবে না। অবশ্য যদি এইরূপ বলে যে, “যদি তুই অমুক কাজ করিস, তবে তোকে তালাক (দিলাম বা তবে তোকে তালাক দিতেছি) এইরূপ বলিলে অবশ্য যখন সেই কাজ করিবে, তখনই তালাক হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ তালাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইনশা-আল্লাহ্ বলিয়া দেয় বা এইরূপ বলে, খোদা চাহে ত তালাক, তাহাতে তালাক হইবে না। অবশ্য তালাক দেওয়ার পর কিছুক্ষণ দেরী করিয়া যদি ইনশা-আল্লাহ্ বলে, তবে তালাক হইয়া যাইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে ‘ও তালাক্নী’ বলিয়া ডাকে, তবে তাহাতেও তালাক হইয়া যাইবে। যদিও হাসি ঠাট্টারূপে এইরূপ বলে।

১১। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে, “যখন তুই লক্ষ্ণৌ (তোর বাপের বাড়ী বা অমুক জায়গায়) যাইবি, তখন তোকে তালাক,” এইরূপ বলিলে যখন সে তথায় যাইবে, তখন তালাক হইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** যদি ছরীহ অর্থাৎ পরিষ্কার শব্দের দ্বারা তালাক না দেয় বরং গোলমেলে বা ইশারা, কেনায়া শব্দ (অর্থাৎ একাধিক অর্থ-বোধক শব্দের) দ্বারা তালাক দেয়, তবে ঐ সব শব্দ বলিবার সময় যদি তালাকের নিয়ত থাকে, তবে তালাক হইবে অন্যথায় তালাক হইবে না। (কাজেই তালাক্দাতা অর্থাৎ স্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, তোমার নিয়ত কি ছিল? সে যদি তালাকের নিয়তে বলিয়া থাকে, তবে ত তালাক হইবে। আর যদি অন্য অর্থে বলিয়া থাকে, তবে তালাক হইবে না) অবশ্য যদি হাবভাবে বুঝা যায় যে, তালাকের নিয়তেই বলিয়াছিল, কিন্তু এখন সে মিথ্যা বলিতেছে, মিছামিছি অস্বীকার করিতেছে তবে স্ত্রী স্বামীর কাছে থাকিবে না। স্ত্রী ইহাই বুঝিবে যে, তাহার তালাক হইয়া গিয়াছে এবং ঐ স্বামী হইতে পৃথক থাকিবে। যেমন স্ত্রী রাগ হইয়া স্বামীকে বলিল যে, “তোমাতে আমাতে বনিবনাৎও হইবে না, তুমি আমাকে তালাক দিয়া দাও”, এই কথার উত্তরে স্বামী বলিল, “যা তোরে ছাড়িয়া দিলাম” তখন স্ত্রী ইহাই বুঝিবে যে, আমাকে তালাক দিয়াছে। অন্য অর্থ লয় নাই; কাজেই এক তালাক বায়েন পড়িবে। স্ত্রী স্বামী হইতে পৃথক থাকিবে।

১৩। **মাসআলা ঃ** কেহ তিনবার বলিল, তোকে তালাক, তালাক, তালাক, তবে তিন তালাক পড়িবে। কিংবা গোলমেলে শব্দে তিনবার বলিল, তবুও তিন তালাক পড়িবে। কিন্তু যদি নিয়ত এক তালাকের হয় শুধু কথা পাকা করিবার জন্য তিন বার বলিয়াছে, তবে এক তালাকই হইবে। কিন্তু স্ত্রীর তো স্বামীর মনের অবস্থা জানা নাই। কাজেই স্ত্রী ইহাই বুঝিবে যে, তিন তালাক দিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বের তালাকের কথা

১। **মাসআলা ঃ** মিলনের পূর্বে (অর্থাৎ, খাল্ওয়াতে ছহীহা অথবা সহবাসের পূর্বে) তালাক দিলে বায়েন হইবে। স্পষ্ট কথায় বলুক বা অস্পষ্ট কথায় বলুক। ইহাতে স্ত্রীকে ইদ্দতও পালন করিতে হইবে না, তালাক হওয়ার পরক্ষণেই ইচ্ছা করিলে অন্যত্রও বিবাহ বসিতে পারিবে আর এক তালাক দেওয়ার পর অন্য তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। অবশ্য প্রথম বারই যদি এক সঙ্গে দুই তালাক দেয়, তবে যাহা দিবে তাহাই পড়িবে (যদি এইরূপ বলে যে, ‘তোকে তিন তালাক’ তবে তিন তালাক হইবে,) আর যদি এইরূপ বলে যে, ‘তোকে তালাক, তালাক, তালাক, তবে এক তালাক হইয়া বায়েন হইয়া যাইবে। (পরের দুই তালাক হইবে না।)

তিন তালাকের মাসআলা

১। **মাসআলাঃ** কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, ছরীহ্ শব্দের দ্বারা দেউক বা কেনায়া শব্দের দ্বারা অথবা এক তালাক বা দুই তালাক দেওয়ার দুই চারি বৎসর পর আবার দুই তালাক বা এক তালাক দেউক, সারকথা এই যে, যদি কোন প্রকারে মোট তিন তালাক হয়, তবে সেই স্ত্রী তাহার জন্য একেবারে হারাম হইয়া যাইবে এবং সেই স্ত্রীর জন্য ঐ স্বামীর কাছে থাকা সম্পূর্ণ হারাম হইবে। এমনকি বিবাহ দোহ্রাইলেও বিবাহ হইবে না এবং হালালও হইবে না।

২। **মাসআলাঃ** এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহাও তালাক। যেমন, যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে যে, 'তোকে তিন তালাক' বা এইরূপ বলে 'তোকে তালাক' তোকে তালাক, তোকে তালাক তবে তিন তালাক হইয়া বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। এইরূপ যদি পৃথক পৃথক করিয়া তিন তালাক দেয়, যেমন, আজ এক তালাক দিল, কাল এক তালাক দিল, পরশু এক তালাক দিল বা প্রথমে এক তালাক দিল, তার এক মাস পর আর এক তালাক দিল, আবার এক মাস পর আর এক তালাক দিল, অর্থাৎ তিন তালাকই ইদ্দতের মধ্যে দিল। সকলেরই একই হুকুম অর্থাৎ তিন তালাক হইয়া স্ত্রী একেবারে হারাম হইয়া যাইবে। এমনকি, যদি তিন তালাক রজয়ী দেয়, তবুও বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে এবং রজআত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, কেননা রজআত করিবার ক্ষমতা থাকে এক তালাক বা দুই তালাক রজয়ী দিলে, তিন তালাক দিলে রজআত করিবার ক্ষমতা থাকে না।

৩। **মাসআলাঃ** কেহ হয়ত তাহার স্ত্রীকে এক তালাক রজয়ী দিল, তারপর আবার (ইদ্দতের মধ্যে) রজআত করিয়া লইল, আবার দুই চার বৎসর পর রাগ হইয়া আবার এক তালাক রজয়ী দিল, আবার ইদ্দতের মধ্যে রাজী খুশী হইয়া রজআত করিয়া লইল। এই মোট দুই তালাক হইল। তারপর যদি আবার এক তালাক দেয়, তবে সব মিলিয়া তিন তালাক হইয়া যাইবে এবং বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া স্ত্রী একেবারে হারাম হইয়া যাইবে, অন্য স্বামীর ঘর না করিয়া আর এই স্বামীর সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না। এইরূপে যদি এক তালাক বায়েন দেয়, যাহাতে রাখিবার ক্ষমতা থাকেনা, বিবাহ টুটিয়া যায়; অতঃপর লজ্জিত হইয়া স্বামী স্ত্রী সম্মত হইয়া আবার বিবাহ পড়াইয়া লয় এবং কিছু দিন পর আবার রাগের বশীভূত হইয়া আর এক তালাক দেয় এবং রাগ থামিবার পর বিবাহ পড়াইয়া লয়, তবে এই দুই তালাক হইল। এখন যদি তৃতীয় বার তালাক দেয়, তবে তালাকে মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে, সর্বসমেত তিন তালাক হইয়া স্ত্রী একেবারে হারাম হইয়া যাইবে, বিবাহ দোহ্রাইলেও হালাল হইবে না।

৪। **মাসআলাঃ** তিন তালাকের হারামের হাত এড়াইবার জন্য যদি কাহারও সহিত এই অঙ্গীকারে বিবাহ হয় যে, বিবাহ করতঃ সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দিবে, তবে সেই অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, (বরং এরূপ অঙ্গীকার লওয়া এবং করা উভয়ই হারাম) এখন তাহার ইচ্ছা, সে ইচ্ছা করিলে ছাড়িতেও পারে, না ছাড়িলেও তাহার কিছু করার উপায় নাই। এইরূপ শর্ত করিয়া

বিবাহ করিলে তাহার উপর খোদার লানত পতিত হয়। কিন্তু যদি কেহ এইরূপ গোনাহ্‌র কাজ করিয়া একবার সহবাস করিয়া স্ত্রীকে তালাক দেয় বা মরিয়া যায়, তবে ইদ্দত পালনের পর পূর্বের স্বামীর জন্য বিবাহ করা হালাল হইবে।

শর্তের উপর তালাক দেওয়া

১। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কোন বেগানা স্ত্রীলোককে বলে যে, 'যদি আমি তাহাকে বিবাহ করি, তবে তাকে তালাক', পরে যখনই তাহাকে বিবাহ করিবে, তখনই এক তালাক বায়েন হইবে, পুনরায় বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া ঐ স্ত্রীকে ঘরে আনিতে পারিবে না। এইরূপে যদি দুই তালাকের কথা বলে, যেমন, 'যদি তাকে বিবাহ করি, তবে তাকে দুই তালাক।' বিবাহ করা মাত্রই দুই তালাক বায়েন হইবে, (বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া ঐ স্ত্রীকে ঘরে আনিতে পারিবে না; বিবাহ দোহ্‌রাইয়া আনিতে পারিবে।) আর যদি তিন তালাকের কথা বলে, যেমন, 'যদি তাহাকে বিবাহ করি, তবে তাকে তিন তালাক' এমতাবস্থায় বিবাহ করা মাত্রই তিন তালাক হইবে এবং বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। (পরে আর দোহ্‌রাইবারও ক্ষমতা থাকিবে না।)

২। **মাসআলাঃ** উপরের মাসআলায় 'যদি' শব্দ ব্যবহার করার কারণে এই হুকুম হইল যে, বিবাহ করা মাত্রই (এক বার দুই তালাক) হইল বটে কিন্তু পুনরায় বিবাহ করিলে পূর্বের কথার কারণে দ্বিতীয়বার তালাক হইবে না। হাঁ, যদি এইরূপ বলে যে, 'যতবার (বা যখনই বা যখন যখন) তাহাকে বিবাহ করিব ততবার তাকে তালাক' তবে অবশ্য যতবার তাহাকে বিবাহ করিবে, ততবারই তালাক হইবে, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বিবাহ দোহ্‌রাইলে তাহাতেও তালাক হইবে; এমনকি, তিন তালাক হওয়ার পর অন্য স্বামীর ঘর করিয়া পুনরায় যদি এই লোকই বিবাহ করে, তবুও তালাক হইবে।

৩। **মাসআলাঃ** যদি কেহ এইরূপ বলে, 'যে কোন স্ত্রীলোককে আমি বিবাহ করিব, তাকে তালাক', এখন যে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে, বিবাহ করা মাত্রই তালাক হইবে। কিন্তু একবার একজনের উপর তালাক হওয়ার পর যদি বিবাহ দোহ্‌রাইয়া আবার তাকে বিবাহ করে, তবে আর তাহার উপর তালাক হইবে না। (অবশ্য নূতন যাকেই বিবাহ করুক না কেন তাহার উপর তালাক হইবে।)

৪। **মাসআলাঃ** (যে স্ত্রী নিজের বিবাহে আছে অথবা যে স্ত্রী রজয়ী তালাকের ইদ্দতে আছে শুধু তাহাকে তালাক দেওয়া যায়; কিন্তু যাহার সঙ্গে এখনও বিবাহ হয় নাই বা তালাক বায়েন যাহার হইয়া গিয়াছে, তাহাকে তালাক দেওয়া যায় না। দিলেও তালাক হইবে না; সুতরাং) যদি কেহ কোন বেগানা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বলে যে, যদি সে অমুক কাজ করে, তবে তাকে তালাক, এই কথার কোনই মূল্য নাই, এমনকি পরে যদি ঐ স্ত্রীলোককে সে বিবাহ করে এবং তারপর সেই স্ত্রীলোকটি সেই কাজটি করে, তবুও তালাক হইবে না। অবশ্য বিবাহের বাহিরে স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়ার একটি মাত্র ছুরত আছে, তাহা এইঃ যদি কেহ বলে যে, 'যদি আমি তাহাকে বিবাহ করি, তবে তাকে তালাক', এই ছুরতে বিবাহ করার পর তালাক হইবে (অর্থাৎ যদি শর্তের ভিতর বিবাহের কথার উল্লেখ করিয়া তালাক দেয়, তবে শর্ত পাওয়ার পর তালাক হইবে, নতুবা বিবাহের বাহিরে স্ত্রীলোককে তালাক দিলে বা বিবাহ ছাড়া অন্য কোন শর্ত করিয়া তালাক দিলে তাহাতে তালাক হইবে না।)

৫। মাসআলাঃ নিজের স্ত্রীকে যদি কেহ কোন শর্ত করিয়া তালাক দেয় যে, যদি তুমি অমুক কাজ কর, তবে তোমাকে তালাক, যদি আমার নিকট হইতে যাও, তবে তোমাকে তালাক, যদি ঐ ঘরে যাও, তবে তোমাকে তালাক, যদি এক ওয়াক্ত নামায না পড়িস তবে তোকে তালাক বা এইরূপ অন্য শর্ত করিয়া তালাক দেয়, তবে যখন সেই কাজ করিবে, তখন এক তালাক রজয়ী হইবে। অবশ্য যদি কোন কেনায়া শব্দ বলে, যেমন বলে, যদি অমুক কাজ কর, তবে তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই, তবে যখন সেই কাজ করিবে, বায়েন তালাক পড়িবে, যদি স্বামী ঐ শব্দ বলার সময় তালাকের নিয়ত করে।

৬। মাসআলাঃ যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে, 'যদি তুই অমুক কাজ করিস্, তবে তোকে দুই তালাক বা তিন তালাক,' আর যদি সে সেই কাজ করে, তবে যখন সেই কাজ করিবে, তখন যে কয় তালাকের কথা বলিয়াছে সেই কয় তালাক হইবে।

৭। মাসআলাঃ যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে ('যদি' শব্দ ব্যবহার করিয়া শর্তের উপর তালাক দেয়, যেমন) বলিল, যদি তুই অমুক কাজ করিস তবে তোকে তালাক। তারপর সে সেই কাজ করিল এবং তালাক হইল, কিন্তু স্বামী ইদ্দতের মধ্যে রজআত করিয়া লইল বা বিবাহ দোহরাইয়া লইল, তারপর যদি স্ত্রী দ্বিতীয়বার সেই কাজ করে তবে দ্বিতীয়বার আর তালাক হইবে না, (কারণ, একবার সেই কাজ করিতেই শর্ত শেষ হইয়া গিয়াছে।) অবশ্য যদি শর্তের মধ্যে যতবার বা যে কোন সময়, 'যখন যখন' 'যখনই' শব্দ ব্যবহার করে, যেমন, বলিল, 'যতবার তুই অমুক কাজ করিবি তোকে তালাক,' তবে একবার সেই কাজ করিলে এক তালাক হইবে, পুনরায় ইদ্দতের ভিতর বা বিবাহ দোহ্‌রানের পর যদি সেই কাজ আবার করে, তবে আবার এক তালাক হইবে, এমন কি দ্বিতীয় তালাকের ভিতর বা তৃতীয়বার দোহ্‌রাইয়া লওয়ার পর যদি সেই কাজ আবার করে, তবে তিন তালাক হইয়া বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে। আর বিবাহ দোহ্‌রাইতেও পারিবে না, অবশ্য যদি দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করার পর আবার পূর্বের এই স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হয়, তখন আর সেই কাজ করিলে তালাক হইবে না। (কারণ, দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করার পর আর পূর্বের শর্তের ক্রিয়া থাকিবে না।)

৮। মাসআলাঃ কেহ তাহার স্ত্রীকে বলিল, যদি তুমি অমুক কাজ কর, তবে তোমাকে তালাক। এখনও স্ত্রী এ কাজ করে নাই অথচ স্বামী আর একটি তালাক দিয়া দিল এবং ছাড়িয়া দিল, কিছু দিন পর আবার ঐ স্ত্রীলোককে বিবাহ করিল। ঐ বিবাহের পর এখন সে ঐ কাজ করিল, তবে আবার তালাক পড়িল। অবশ্য যদি তালাকের পর এবং ইদ্দত গত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিবাহের পূর্বে ঐ কাজ করিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় বিবাহের পর ঐ কাজ করিলে তালাক পড়িবে না। আর যদি তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে ঐ কাজ করে, তবুও দ্বিতীয় তালাক পড়িল।

৯। মাসআলাঃ শর্তের উপর তালাক শিরোনামা দ্রষ্টব্য।

১০। মাসআলাঃ যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে, 'যদি তুই রোযা রাখিস্, তবে তোকে তালাক' তবে রোযা রাখা মাত্রই তালাক হইবে, আর যদি এইরূপ বলে, 'যদি তুই একটি রোযা রাখিস, তবে তোকে তালাক' বা এইরূপ বলে, 'যদি তুই সারাদিন রোযা রাখিস, তবে তোকে তালাক', এই অবস্থায় যখন রোযা পুরা হইবে (অর্থাৎ, এফতারের ওয়াক্ত হইবে,) তখন তালাক হইবে, যদি (এফতারের ওয়াক্ত হইবার পূর্বে) রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে তালাক হইবে না।

১১। মাসআলা ঃ স্ত্রী ঘর হইতে বাহিরে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে এমন সময় স্বামী বলিল, এখন বাহিরে যাইও না; স্ত্রী মানিল না, স্বামী রাগ হইয়া বলিল, যদি বাহিরে যাস্, তবে তোকে তালাক। এইরূপ বলার হুকুম এই যে, যদি তখনই বাহিরে যায়, তবে তালাক হইবে, নতুবা তারপর অন্য সময় বাহিরে গেলে তালাক হইবে না। কেননা এরূপ স্থলে ইহার অর্থ এই হয় যে, এখন যাইও না, এ অর্থ হয় না যে, জীবনে কখনও যাইও না। (আরবীতে এইরূপ কথাকে ইয়ামিনে ফওর বলে। ইয়ামিনে ফওরের অর্থ যখনকার কথা তখন শেষ হইয়া যাওয়া।)

১২। মাসআলা ঃ যদি কেহ বলে, যে দিন তারে বিবাহ করিব, তারে তালাক, তবে বিবাহ দিনে করুক বা রাত্রে করুক তালাক হইবে। কেননা এইরূপ স্থলে দিন শব্দের অর্থ রাত্রের বিপরীত যে দিন তাহা নহে; বরং এইরূপ স্থলে দিন শব্দের অর্থ সময়।

তফ্‌বীযে তালাক

(তফ্‌বীযে তালাকের অর্থ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার স্বামীর যে ক্ষমতা ছিল তাহা স্ত্রীকে দান করা। যেমন, স্বামী স্ত্রীকে মৌখিক বলিল বা লিখিয়া দিল যে, যদি আমি ছয় মাসের মধ্যে তোমার কোন খবর-বার্তা না লই, তবে আমি তোমাকে ক্ষমতা প্রদান করিলাম, ছয় মাস অতীত হইয়া গেলে যে কোন সময় তুমি তোমার নফ্‌ছকে (নিজকে) তালাক দিতে পারিবে, স্বামী এইরূপ বলিলে বা লিখিয়া দিলে শর্ত পূর্ণ হওয়ার পর স্ত্রী নিজকে তালাক দিয়া ঐ স্বামী হইতে মুক্ত হইবার ক্ষমাতাশালিনী হইবে বটে, কিন্তু তফ্‌বীয ছহীহ্ হইবার জন্য পাঁচটি শর্ত আছে। প্রথম শর্ত, স্বামীর কথার মধ্যে "নফছ্ বা নিজ" শব্দের উল্লেখ হওয়া জরুরী। দ্বিতীয় শর্ত বিবাহের আক্‌দ হওয়ার পর এইরূপ কথা বলা বা লিখা জরুরী। বিবাহের আক্‌দ হওয়ার পূর্বে এইরূপ কথা লিখিলে তফ্‌বীয ছহীহ্ হইবে না এবং স্ত্রীর তালাক লওয়ার ক্ষমতাও হইবে না। তৃতীয় শর্ত, স্বামীর কথার মধ্যে অতীত বা বর্তমান কালের ক্রিয়া থাকা চাই, নতুবা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া হইলে তফ্‌বীয ছহীহ্ হইবে না। চতুর্থ শর্ত, স্বামী যে শর্ত করিয়াছে সেই শর্ত পূর্ণ হইয়া যাওয়া চাই; শর্ত পূর্ণ না হইলে স্ত্রীর তালাক লইবার ক্ষমতা হইবে না। পঞ্চম শর্ত, স্বামীর শর্তের মধ্যে 'যে কোন সময়' শব্দের উল্লেখ হওয়া চাই, নতুবা যখন শর্ত পূর্ণ হইবে, তখনই সেই মজলিসেই যদি তালাক লয় তবে তালাক হইবে। মজলিস পরিবর্তন হইয়া গেলে আর তালাক লওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না, অবশ্য 'যে কোন সময়' শব্দের উল্লেখ থাকিলে শর্ত পূর্ণ হওয়ার পর যে কোন সময় ইচ্ছা তালাক লইতে পারিবে)। —অনুবাদক

তাওকীলে তালাক

১। মাসআলা ঃ তাওকীলে তালাকের অর্থ নিজে তালাক না দিয়া অন্য কাহাকেও তালাক দিবার জন্য উকীল বানাইয়া দেওয়া, যেমন বাপ ছেলেকে বলিল, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দাও,' ছেলে বলিল, আপনাকে উকীল বানাইলাম, আপনি আমার পক্ষ হইতে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেন। এই কথার দ্বারা বাপ ছেলের পক্ষে উকীল হইবে। অতএব, বাপ যদি এইরূপ বলে যে, আমি অমুকের পক্ষ হইতে উকীল হইয়া অমুকের বেটি অমুককে তালাক দিতেছি, তবে তালাক হইয়া যাইবে। কিন্তু উকীল তালাক দেওয়ার পূর্বে যদি মোয়াক্কেলের রায় বদলিয়া যায় এবং তালাক দেওয়ার মত ফিরিয়া যায় আর উকীলকে ডাকিয়া বলে যে, আপনাকে যে তালাক

দিবার জন্য উকীল বানাইয়াছিলাম সে ওকালতি আমি বাতেল করিতেছি, আপনি তালাক দিবেন না, তবে আর সেই উকীলের তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। এইরূপে উকীল যদি ওকালতি গ্রহণ না করিয়া রদ করিয়া দেয় এবং বলে যে, আমি তোমার ওকালতি গ্রহণ করিতে পারিব না, তবে তাহার আর তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। কিন্তু তফবীযের মধ্যে স্ত্রীর গ্রহণ করারও দরকার নাই বা সে যদি রদ করে, তবে তাহাতেও রদ হইবে না; বরং রদ করার পরও তাহার তালাক লওয়ার ক্ষমতা থাকিবে এবং স্বামীরও একবার ক্ষমতা দেওয়ার পর আর সেই ক্ষমতা ফেরত লওয়ার অধিকার নাই, অবশ্য যদি সময় সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়, তবে সেই সময়ের পর স্ত্রীর আর ক্ষমতা থাকিবে না।

প্রশ্ন ঃ হিন্দু বা ইংরেজ, মুসলমানের উকীল হইতে পারে কি না?

উত্তর ঃ হাঁ, মুসলমান যদি উকীল বানায়, তবে হিন্দু বা ইংরেজ তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত উকীল হইতে পারে, কিন্তু ওলী মুসলমান ছাড়া অন্য জাতি হইতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ হিন্দু, ইংরেজ বা মুসলমান জজ যদি স্ত্রীর দরখাস্ত পাইয়া স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেয়, তবে তাহাতে তালাক হইবে কি না?

উত্তর ঃ না, তাহাতে তালাক হইবে না। এইরূপ হইলে ঐ স্ত্রীর জন্য ঐ স্বামী হইতে পৃথক হওয়া বা অন্য স্বামী গ্রহণ করা হারাম হইবে। হাঁ, জজ সাহেব যদি স্বামীকে হাজির করাইয়া তার মুখ দিয়া তালাক দেওয়াইয়া দেন, তবে অবশ্য তালাক হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন ঃ যে ক্ষেত্রে স্ত্রীর ক্ষমতা থাকে ঠিক রাখার বা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার, যেমন পিতৃহীনা নাবালেগাকে যদি তাহার চাচা বিবাহ দেয়, তবে ঐ মেয়ে যখন বালেগা হইবে, তখন তাহার ক্ষমতা হইবে ঐ বিবাহ ভাঙ্গিয়া ফেলার, এইরূপ ক্ষেত্রে যদি মেয়ে নিজে নিজেই বিবাহ ভাঙ্গিয়া ফেলে বা কোন হিন্দু বা ইংরেজ হাকিমের দ্বারা ভাঙ্গাইয়া ফেলে, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে কি না?

উত্তর ঃ না, তাহা দুরুস্ত হইবে না, মেয়ে নিজে বিবাহ ভাঙ্গিলে তাহাও দুরুস্ত হইবে না, অন্য জায়গায় বিবাহ বসা তাহার জন্য হারাম হইবে এবং হিন্দু বা ইংরেজ আদালতে দরখাস্ত দিলে এবং তাহারা ভাঙ্গিয়া দিলে তাহাও দুরুস্ত হইবে না। (অবশ্য হিন্দু বা ইংরেজ হাকিম যদি স্বামীকে হাজির করাইয়া তার মুখ দিয়া বলাইয়া দেয়, অথবা মুসলমান হাকিম হয় এবং সে ঐ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে দুরুস্ত হইবে।) —অনুবাদক

মৃত্যু-রোগে তালাক দেওয়া

১। মাসআলা ঃ (মৃত্যু-রোগের অর্থ, যে রোগে ভুগিয়া মানুষ মারা যায়, আরোগ্য লাভ করে না।) এইরূপ রুগ্ন অবস্থায় যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকা অবস্থায় যদি স্বামী মারা যায়, তবে (তালাক হওয়া সত্ত্বেও) ফরায়েয অনুসারে স্বামীর সম্পত্তির যে অংশ স্ত্রীর প্রাপ্য তাহা সে পাইবে, (তালাকের কারণে অংশ হইতে বঞ্চিতা হইবে না,) এক তালাক দেউক দুই বা তিন তালাক দেউক বা রজয়ী তালাক দেউক বা বায়েন তালাক দেউক, ইদ্দতের ভিতর মৃত্যু হইলে সর্বাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে। অবশ্য যদি স্বামীর মৃত্যু ইদ্দত পার হইয়া যাওয়ার পর হয়, অথবা ঐ রোগে স্বামী মরে নাই বরং ভাল হইয়াছে, তারপর আবার রোগ হইয়া (ইদ্দতের ভিতর অথবা ইদ্দতের পর) মারা গিয়াছে, তবে স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে না।

২। **মাসআলা ঃ** তালাক যদি স্ত্রী নিজে চাহিয়া লয় এবং সেই কারণে স্বামী স্ত্রীকে (মৃত্যু-রোগে) তালাক দেয় তবে স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে না। চাই ইদ্দতের মধ্যে মরুক বা ইদ্দতের পর মরুক । অবশ্য স্বামী যদি রজয়ী তালাক দেয় তবে ইদ্দতের ভিতর স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাহার মীরাছ পাইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** রুগ্নাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে বলিল, তুমি যদি বাড়ীর বাহিরে যাও, তবে তোমাকে বায়েন তালাক। এইরূপ বলা সত্ত্বেও যদি স্ত্রী বাহিরে চলিয়া যায়, তবে তাহার বায়েন তালাক হইবে এবং স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ পাইবে না; কেননা, এই তালাক স্ত্রীর নিজ ইচ্ছাকৃত কর্মের দোষে হইয়াছে, কাজেই মীরাছ হইতে মাহ্রুম হইবে। অবশ্য স্বামী যদি এমন কোন কাজ করিতে নিষেধ করে, যে কাজ না করিলেই চলে না। যেমন বলিল, যদি তুই ভাত খাস, তবে তোকে বায়েন তালাক বা এইরূপ বলিল, যদি তুই নামায পড়িস, তবে তোকে এক তালাক বায়েন। স্বামী যদি এইরূপ বলে এবং পরে স্ত্রী ভাত খায় এবং নামায পড়ে সেই কারণে তালাক হওয়াতে ইদ্দতের মধ্যে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাহার মীরাছ পাইবে। কেননা, ভাত না খাইয়া এবং নামায না পড়িয়া মানুষ কিরূপে বাঁচিতে পারে? কাজেই স্ত্রীর কোন কছুর নাই। রজয়ী তালাক যে কোন প্রকারে দেউক না কেন স্ত্রীর কছুর হইলেও রজয়ী তালাকের ইদ্দতের ভিতর স্বামী মারা গেলে স্ত্রী মীরাছ পাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** কেহ সুস্থ অবস্থায় (স্ত্রীকে) বলিল, যখন তুমি বাড়ীর বাহিরে যাইবে, তখন তোমাকে বায়েন তালাক, অতঃপর যখন স্ত্রী বাড়ী হইতে বাহিরে গেল তখন স্বামী পীড়িত ছিল এবং ঐ পীড়িতাবস্থায় ইদ্দতের মধ্যে মারা গেল, তবুও মীরাছ পাইবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** সুস্থাবস্থায় বলিল, যখন তোমার পিতা বিদেশ হইতে (বাড়ীতে) আসিবে, তখন তোমাকে বায়েন তালাক, যখন সে বিদেশ হইতে আসিল তখন স্বামী অসুস্থ ছিল এবং ঐ রোগেই মরিয়া গেল, তবে মীরাছ পাইবে না। আর যদি অসুস্থ অবস্থায় বলিয়া থাকে এবং ঐ অসুখে ইদ্দতের মধ্যে মারা যায়, তবে অংশ (মীরাছ) পাইবে।

রজআতের মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** স্বামী যদি স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাক রজয়ী দেয়, তবে ইদ্দত পার না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্ত্রীকে তাহার বিনা সম্মতিতে ফিরাইয়া রাখিবার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। (এই ফিরিয়া রাখাকে 'রজআত' করা বলে এবং যে তালাকের মধ্যে ফিরাইয়া রাখার ক্ষমতা থাকে, তাহাকে রজয়ী তালাক বলে।) রজয়ী তালাকে যতদিন ইদ্দত পার না হইবে, ততদিন স্ত্রী সম্মত না হইলেও স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া রাখিতে পারে, স্ত্রীর তাহাতে কোনই অধিকার নাই। (পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রজয়ী তালাকের ইদ্দত পার হইয়া গেলে বায়েন তালাক হইয়া যায়। তখন স্ত্রীকে পুনরায় আনিতে হইলে স্ত্রীর সম্মতি লইয়া পুনরায় বিবাহ দোহ্রাইয়া আনিতে হইবে।) এবং তিন তালাক হইলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সম্মত থাকা সত্ত্বেও বিবাহ দোহ্রাইয়াও আনিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

২। **মাসআলা ঃ** রজ্আত করিবার নিয়ম অর্থাৎ সুন্নত তরিকা এই যে, (দুই জন সাক্ষীর সামনে) স্বামী স্ত্রীকে বলিবে যে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন আমি রজআত করিতেছি, তোমাকে ছাড়িব না, তোমাকে ফিরাইয়া রাখিতেছি অথবা এরূপও বলিতে

পারে যে, আমি (তোমাকে পুনরায় আমার বিবি বানাইতেছি বা) পুনরায় তোমাকে বিবাহের মধ্যে আনিতেছি। অথবা যদি স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া স্ত্রীর সাক্ষাতেও মুখ দিয়া বলে যে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন আবার তাহাকে ফিরাইয়া রাখিলাম বা রজআত করিলাম, এইরূপ বলিলে তাহার রজআত হইয়া যাইবে এবং পুনরায় তাহার স্ত্রী হইয়া যাইবে। (মুখ দিয়া এইরূপ বলার পর যদি ছয় মাস সহবাস নাও করে, তবুও বায়েন তালাক হইতে পারে না।) আর যদি মুখ দিয়া কিছু না বলিয়া (রজয়ী তালাকের) ইদ্দতের ভিতর সহবাস করে, স্বামী-স্ত্রীর মত চুম্বন, আলিঙ্গন করে কিংবা কামভাবের সহিত স্পর্শ করে, তাহাতেও রজআত হইয়া যাইবে। পুনরায় বিবাহ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু খবরদার বায়েন তালাকে বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া তাহা কিছুই করা দুরুস্ত নহে। রজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে যদি মুখ দিয়াও কিছু না বলে এবং কার্যতও স্বামী-স্ত্রীর আচার-ব্যবহার না করে, তবে ইদ্দত খতম হইয়া গেলে বায়েন তালাক হইয়া যাইবে।

৩। **মাসআলাঃ** রজআত করিবার সময় মৌখিক বলিয়া রজআত করা এবং বলিবার সময় চারজন লোক সাক্ষী রাখা মোস্তাহাব; কেননা, হয়ত পরে কোন মতভেদ সৃষ্টি হইতে পারে। আর যদি সাক্ষী নাও রাখে, তবুও রজআত দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআলাঃ** ইদ্দত পার হইয়া যাওয়ার পর আর রজআত করিবার ক্ষমতা স্বামীর থাকে না। বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া আর স্বামীর ঐ স্ত্রীকে রাখিবার বা স্ত্রীর স্বামীর নিকট থাকিবার অধিকার নাই, বিবাহ না দোহ্‌রাইয়া যদি স্বামী স্ত্রীকে রাখে বা স্ত্রী থাকে, তবে উভয়ে শক্ত গোনাহ্‌গার হইবে।

৫। **মাসআলাঃ** যে স্ত্রীর হায়েয জারী আছে তাহার তালাকের ইদ্দত তিন হায়েয। যখন তিন হায়েয পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন ইদ্দত শেষ হইবে।

এখন জ্ঞতব্য বিষয় এই যে, যদি তৃতীয় হায়েয পূর্ণ দশ দিন পর্যন্ত জারী থাকে, তবে তো যখন রক্ত বন্ধ হয় এবং দশ দিন পূর্ণ হয়, তখনই ইদ্দত শেষ হইয়া যায়। স্ত্রী গোছল করুক বা না করুক স্ত্রীকে রাখিবার অধিকার যাহা স্বামীর ছিল, রহিল না। আর যদি তৃতীয় হায়েয দশ দিনের কম হইয়া থাকে এবং দশ দিনের পূর্বেই রক্ত বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু এখনও গোছল করে নাই কিংবা কোন ওয়াজেব নামাযও তাহার ক্বাযা হয় নাই, তবে এখনও স্বামীর ক্ষমতা বাকী রহিয়াছে, যদি সে নিজ ইচ্ছায় তালাক হইতে বিরত থাকে, তবে সে তাহার হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি রক্ত বন্ধ হওয়ার পর স্ত্রী গোছল করিয়া থাকে কিংবা গোছল তো করে নাই কিন্তু এক নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া গেল অর্থাৎ এক ওয়াক্ত নামাযের ক্বাযা তাহার জিম্মায় ওয়াজেব হইয়া গেল, এই দুই অবস্থায় স্বামীর ক্ষমতা চলিয়া গেল, এখন বিবাহ ব্যতিরেকে স্ত্রীকে রাখিতে পারিবে না।

৬। **মাসআলাঃ** যে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহের পর এখনও পর্যন্ত স্বামী সহবাস করে নাই, যদিও নির্জনে স্বামী-স্ত্রী এক জায়গায় থাকিয়া থাকে—আর তাহাকে এক তালাক রজয়ী দেয়, তবে রজয়ী তালাক পড়িবে না; বরং এক তালাক বায়েন পড়িবে।

৭। **মাসআলাঃ** স্বামী-স্ত্রী একত্রে নির্জন বাস করিয়াছে, কিন্তু স্বামী বলে, আমি সঙ্গম করি নাই। এই স্বীকারোক্তির পর তালাক দিল, এখন তালাক বায়েন হইবে, রজয়ী হইবে না।

৮। **মাসআলাঃ** রজয়ী তালাকের মধ্যে অর্থাৎ এক বা দুই তালাকের রজয়ীতে স্ত্রীর খুব সাজসজ্জা করিয়া সুন্দরী সাজিয়া থাকা উচিত যাহাতে স্বামীর মনে মহব্বত ও আকর্ষণ জন্মিয়া

জলদি রজআত করিয়া লইতে পারে। আর যদি স্বামীর রজআত করার ইচ্ছা না থাকে, তবে ঘরে আসিবার সময় কাশ দিয়া বা শব্দ করিয়া আসা উচিত, (কারণ, যদি কোন বে-কায়দা জায়গায় নজর পড়িয়া যায়, তবে হয়ত রজআত হইয়া যাইতে পারে, অথচ তাহার রজআত করার ইচ্ছা নাই, তারপর আবার তালাক দেওয়ার দরকার পড়িবে এবং ইদ্দত অনেক লম্বা হইয়া যাইবে তাহাতে তাহার কষ্ট হইতে পারে। (যাহা হউক) স্ত্রী ইদ্দত পর্যন্ত স্বামীর ঘরে থাকিয়া ইদ্দত শেষ হইলে তথা হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাইয়া থাকিবে।

৯। **মাসআলা ঃ** তালাক দিয়া রজআত করার পূর্বে সেই স্ত্রীকে লইয়া ছফর করা বা স্ত্রী তাহার সহিত ছফরে যাওয়া জায়েয নহে।

১০। **মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক বায়েন দেওয়া হইয়াছে, সে যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে চায়, তবে ইদ্দত শেষ হইবার পূর্বে তাহা পারিবে না। যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে চায়, তবে ইদ্দত শেষ হইবার পূর্বে তাহা পারিবে না। ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ দুরুস্ত নহে, কিন্তু যদি প্রথম স্বামীই বিবাহ করিতে চায়, তবে সে বিবাহ ইদ্দতের মধ্যেও দুরুস্ত আছে।

খোলা তালাকের মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি মিল-মহব্বত না হয়, আর স্বামী তালাক না দেয়। ইহার উপায়ের জন্যই শরীঅতে খোলা তালাকের বিধান জারী করা হইয়াছে। স্ত্রীর মন যদি স্বামীর সহিত না মিশে, তবে প্রথমেই তালাক চাহিবে না বা খোলা চাহিবে না, প্রথমে ছবরই করিবে এবং মিল-মহব্বত করিবার জন্য শত প্রকারের চেষ্টা করিবে। একান্তই যদি কিছুতেই মন মিশাইতে এবং ছবর করিতে না পারে, তবে স্বামীকে বলিতে পারে যে, আপনি কিছু টাকা-পয়সা লইয়া আমাকে রেহাই দেন, বা এরূপও বলিতে পারে যে, আপনার জিম্মায় যে মহরের টাকা আমার পাওনা আছে, তাহার আমি কোন দাবী দাওয়া রাখি না, আপনি আমাকে রেহাই দেন। এইরূপ বলাতে স্বামী যদি (সেই মজলিসেই) বলে, আচ্ছা "আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম" তবে এইরূপ উক্তিতে স্ত্রীর উপর এক তালাক বায়েন হইবে। স্বামীর আর তাহাকে ফিরাইয়া রাখিবার ক্ষমতা থাকিবে না। অবশ্য যদি স্বামী ঐ মজলিসে কিছু না বলে, অথবা স্বামী কিছু না বলিয়া চলিয়া যায় বা স্বামী কিছু বলিবার পূর্বেই স্ত্রী উঠিয়া চলিয়া যায়, তারপর স্বামী বলে, আচ্ছা আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, তবে ইহাতে খোলা হইবে না। অর্থাৎ, সওয়াল জবাব একই স্থানে হওয়া চাই। এই উপায়ে স্ত্রীর জান ছুটানকে 'খোলা তালাক' বলে।

২। **মাসআলা ঃ** স্বামী বলিল, আমি তোমা হইতে খোলা করিলাম। স্ত্রী বলিল, আমি কবূল করিলাম, তখন খোলা হইয়া গেল। আর যদি স্ত্রী ঐ স্থানে উত্তর না দিয়া চলিয়া যায়, কিংবা স্ত্রী কবূলই করিল না, তবে কিছুই হইল না। কিন্তু স্ত্রী স্বস্থানে বসিয়া রহিল এবং স্বামী ইহা বলিয়া চলিয়া গেল এবং স্ত্রী স্বামীর যাওয়ার পর কবূল করিল, তবুও খোলা হইয়া গেল।

৩। **মাসআলা ঃ** স্বামী যদি শুধু এতটুকু বলে যে, "আমি তোমাকে খোলা করিলাম" এবং স্ত্রী বলে যে, "আমি কবূল করিলাম" টাকা-পয়সা সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রী কেহই উল্লেখ করে নাই, তবে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ সম্পর্কীয় দেনা-পাওনা সব মাফ হইয়া যাইবে, স্ত্রী যাহাকিছু মহর পাওনা ছিল তাহা মাফ হইয়া যাইবে এবং স্বামীও যদি পূর্ণ মহর দিয়া থাকে, তাহা ফেরত দিতে হইবে না।

কিন্তু ইদ্দতের খোরপোষ এবং (থাকিবার) ঘর স্বামীর দিতে হইবে। অবশ্য যদি স্ত্রী স্বামীকে বলিয়া থাকে যে, "আমি খোরপোষ বা ঘরও চাই না।" তবে দিতে হইবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** আর যদি স্বামী টাকা-পয়সা উল্লেখ করিয়া বলে যে, আমি একশত টাকার বিনিময়ে তোমাকে খোলা করিলাম, এবং স্ত্রী তাহা কবূল করে, তবে যদি মহর নিয়া থাকে, তবে একশত টাকা দেওয়া ওয়াজেব হইবে। আর যদি মহর না নিয়া থাকে, তবুও স্ত্রী স্বামীকে তাহার একশত টাকা দিতে হইবে এবং মহরও পাইবে না। কেননা, খোলার কারণে মহর মাফ হইয়া গিয়াছে।

৫। **মাসআলা ঃ** খোলার ব্যাপারে অন্যায় যদি স্বামীর হয়, তবে স্বামী যে টাকা পাইবে, তাহা তাহার জন্য হারাম হইবে এবং উহা নিজের কাজে ব্যয় করাও হারাম। আর যদি স্ত্রীর অন্যায় হয়, তবে মহর পরিমাণের বিনিময়ে খোলা করিবে। মহর অপেক্ষা অধিক টাকা স্বামীর লওয়া উচিত নহে, কিন্তু যদি বেশী লয়, তবে অন্যায় হইবে, গোনাহ্ হইবে না, কিন্তু খোলা হইয়া যাইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** স্ত্রী যদি খোলা করিতে স্বইচ্ছায় রাজি না হয়, স্বামী মারপিট করিয়া ধম্‌কাইয়া তাহার দ্বারা খোলা করায়, তবে তালাক হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামী টাকা পাইবে না বা স্বামীর যিম্মায় মহর বাকী থাকিলে উহা মাফ পাইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** এই বিষয়গুলি ঐ সময়ের, যখন 'খোলা' শব্দ বলা হয়, কিংবা স্ত্রী এইরূপ বলে যে, শ' কিংবা হাজার টাকার বিনিময়ে আমাকে ছাড়িয়া দাও, কিংবা এরূপ বলে যে, আমার মহরের বিনিময়ে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আর যদি এভাবে না বলে বরং তালাক শব্দ উচ্চারণ করে—যথা এরূপ বলিল, একশত টাকার বিনিময়ে আমাকে তালাক দাও, তবে উহাকে, 'খোলা' বলা যাইবে না। যদি স্বামী ঐ মালের বিনিময়ে তালাক দেয়, তবে এক তালাক বায়েন পড়িবে উহাতে কোন হক মাফ হইবে না। স্বামীর উপর যে হক আছে তাহাও না এবং স্ত্রীর উপর যে হক আছে তাহাও না। স্বামী যদি মহর না দিয়া থাকে, তবে তাহা মাফ হইবে না। স্ত্রী উহা দাবী করিতে পারিবে এবং স্বামী স্ত্রী হইতে ঐ একশত টাকা নিয়া নিবে।

৮। **মাসআলা ঃ** স্বামী বলিল, একশত টাকার বিনিময়ে তালাক দিলাম, তবে স্ত্রীর কবূল করার উপর নির্ভর থাকিবে, স্ত্রী যদি কবূল না করে, তালাক পড়িবে না। আর যদি কবূল করে, তবে এক তালাক বায়েন পড়িবে। কিন্তু যদি স্থান পরিবর্তন করার পর কবূল করে, তবে তালাক পড়িবে না।

৯। **মাসআলা ঃ** স্ত্রী বলিল, আমাকে তালাক দাও, স্বামী বলিল, তুমি স্বীয় মহর ইত্যাদি নিজের যাবতীয় হক মাফ করিয়া দাও, তবে তালাক দিব, তখন স্ত্রী বলিল, আচ্ছা আমি মাফ করিলাম। ইহার পর স্বামী তালাক দিল না, তবে কিছুই মাফ হইল না, আর যদি ঐ বসাতেই তালাক দিয়া দেয়, তবে মাফ হইয়া গেল।

১০। **মাসআলা ঃ** স্ত্রী বলিল, তিন শত টাকার বিনিময়ে আমাকে তিন তালাক দাও, অতঃপর স্বামী শুধু এক তালাক দিল, তবে স্বামী শুধু এক শত টাকা পাইবে। আর যদি দুই তালাক দেয়, তবে দুইশত টাকা, আর যদি তিন তালাক দেয়, তবে পুরা তিনশত টাকা স্ত্রী স্বামীকে দিতে হইবে এবং সকল অবস্থাতেই তালাকে বায়েন পড়িবে। কেননা, মালের বিনিময়ে এই তালাক।

১১। **মাসআলা ঃ** স্বামী নাবালেগ বা পাগল হইলে খোলা করার কোন উপায় নাই, (তাহাদের ওলী তাহাদের পক্ষ হইতে খোলা করিতে পারিবে না। আর যদি স্ত্রী নাবালেগা বা পাগলী হয়

এবং তাহাদের পিতা নিজে টাকার যিম্মা হইয়া খোলা করায়, তবে তালাক হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু মহর মাফ হইবে না।

মাফ্‌কুদের মাসায়েল

১। মাসআলাঃ যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী একেবারে নিখোঁজ ও লা-পাতা হইয়া যায়, জীবিত আছে, না মরিয়া গিয়াছে তাহার কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া না যায়, তবে সে অন্যত্র বিবাহ বসিতে পারিবে না, হয়ত স্বামী আসিতে পারে এই আশায় তাহার স্বামীর ৯০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছবর করিতে হইবে। তখন হুকুম দেওয়া হইবে যে, সে মরিয়া গিয়াছে। তারপর যদি অন্যত্র বিবাহ বসিবার স্ত্রীর বয়স এবং ইচ্ছা থাকে, তবে স্বামীর ৯০ বৎসর বয়সের পর হইতে (চার মাস দশ দিন) ইদ্দত অতীত হওয়ার পর অন্যত্র বিবাহ বসিতে পারিবে। কিন্তু শর্ত এই যে, কোন মুসলমান হাকিমের দ্বারা ঐ স্বামীর মৃত্যুর হুকুম লাগাইতে হইবে। (মুসলমান হাকিমের হুকুম ব্যতীত অন্যত্র বিবাহ জায়েয হইবে না।)

[এই যে হুকুম বর্ণনা করা হইল ইহাই আমাদের হানাফী মাযহাবের হুকুম। কিন্তু এই হুকুমে আজকাল অনেক স্ত্রীলোকের কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এমন কি কোন কোন হতভাগিনী ছবর করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা বা ঈমান বরবাদ করিয়া বসে। এই অবস্থা দর্শনে মোজাদ্দেদে হক্কানী আলেমে রব্বানী হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেব পাক-ভারতের সমস্ত আলেমের মত সংগ্রহ করিয়া মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ এবং মেছের ও মগরেব হইতে ইমাম মালেক ছাহেবের মাযহাব অনুযায়ী ফৎওয়া সংগ্রহ করিয়া 'আল্‌হীলাতোন্নাজেযাহ্,' নামক একখানা কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। সেই কিতাবে এইরূপ হতভাগিনীদের যেমন, (১) যাহার স্বামী লা-পাতা হইয়া গিয়াছে, (২) যাহার স্বামী নপুংসক অথচ স্ব-ইচ্ছায় তালাক দেয় না, (৩) যাহার স্বামী স্ত্রীকে ছাড়েও না আনেও না, (৪) যে পিতৃহীনাকে তাহার চাচা বা ভাই নাবালেগা অবস্থায় বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু মেয়ে বালেগা হইয়া স্বামীকে কবূল করে না, তবুও স্বামী তাহাকে ছাড়ে না, (৫) যাহার স্বামী নিখোঁজ নয় বটে কিন্তু চির পরবাসে বা চির কারাবাসে থাকে, স্ত্রীর কোন খবরগীরি করে না বা করিতে পারে না। তাহার জান ও ঈমান বাঁচাইবার ব্যবস্থা কি এবং তাহার জন্য কি কি শর্ত পালন করিতে হইবে, তাহা সব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তথায় দেখিয়া লওয়া দরকার। এখানে আমি সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম বর্ণনা করিতেছি—এইরূপ হতভাগিনীদের জান ছুটাইবার দুইটি উপায় আছে। একটি এই যে, বিবাহের সময় কাবিননামায় স্বামীর নিকট হইতে শর্ত লাগাইয়া মেয়ের জন্য বা মেয়ের বাপ-ভাই মুরব্বীদের জন্য তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্থাৎ "তফ্‌বীযে তালাক" লইয়া রাখিবে।

তফ্‌বীযে তালাকের কাবিন লিখিতে অনেকে এমন ভুল করিয়া বসে যে, আসল মক্‌ছুদ হাছেল হয় না। এই জন্য আমরা এখানে একটি কাবিননামার নমুনা লিখিয়া দিতেছি।]

—অনুবাদক

তফ্‌বীযে তালাকের শর্ত যুক্ত কাবিননামা

কস্য কাবিননামা পত্র মিদং কার্যাঞ্চাগে—

আমি অমুক, পিং অমুক, পেশা অমুক, সাং অমুক, থানা অমুক, জিং অমুক। আমার বিবাহ মোসাম্মাৎ অমুক, পিং অমুক, পেশা অমুক, সাং অমুক, জিং অমুক এর সহিত নিম্নলিখিত শর্তসমূহের উপর এত টাকা দেন-মহরের পরিবর্তে ধার্য হইয়াছে। নগদ এত, বাকী এত।

অতএব, আমি স্বজ্ঞানে সুস্থ শরীরে স্বইচ্ছায়, অত্র কাবিননামা ও অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতেছি, যাহাতে আমি শর্তসমূহ স্মরণ রাখি এবং পালন করি এবং খোদা-নাখাস্তা যদি আমি শর্তসমূহ পালন না করি, তবে যেন বিবি মজকুরা সহজেই নিজ জান ছুটাইয়া লইতে পারে। অতএব, আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, যতদিন বিবি মজকুরা আমার বিবাহে থাকিবে ততদিন নিম্নলিখিত সমস্ত শর্ত আমি রীতিমত পালন করিব। উভয় পক্ষের এতমিনান করিবার নিমিত্ত লিখিয়া দিতেছি যে, যদি আমি বিবি মজকুরাকে বিবাহ করি, (১) এবং বিবাহের পর নিম্নলিখিত শর্তসমূহ হইতে একটি শর্তও বিবি মজকুরা (অথবা তাহার অমুক গার্জিয়ান) খেলাফ পায়, তবে বিবি মজকুরাকে (অথবা তাহার অমুক মুরব্বিকে) আমি ক্ষমতা অর্পণ করিতেছি যে, শর্ত খেলাফ হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ অথবা তারপর অত্র বিবাহের মধ্যে যে কোন সময় সে (বা তাহার অমুক মুরব্বি) এক তালাক বায়েন, (২) তাহার নফ্‌সকে দিয়া আমার বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করুক।

শর্তসমূহ এই—

অত্র কাবিননামা আমি দেখিয়া বা পড়াইয়া শুনিয়া দস্তখত বা আঙ্গুলের টিপ দিতেছি,

তাং মাস সন বাং ইং হিং

খাকছার সাক্ষী সাক্ষী

সাধারণতঃ আমাদের দেশে ঈজাব-কবূলের পূর্বেই কাবিননামা লেখা হয়, কাজেই কাবিননামায় যদি "আমি বিবি মজকুরাকে বিবাহ করি", কথাটি উল্লেখ থাকা দরকার; নতুবা শর্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কাবিননামায় সাধারণতঃ তিন তালাক বায়েন যেন না হয়, ইহা অত্যন্ত গর্হিত কাজ; কারণ শরীঅত অনুযায়ীও গোনাহ্‌গার হইতে হয়, তাছাড়া দুনিয়াতেও পরে অনেক মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই জন্য আমরা নমুনায় এক তালাক বায়েন লিখিয়াছি। সাধারণতঃ কাবিনে শুধু "আমি" শব্দ লেখা হয়, কিন্তু তাহাতে শুধু সেই মজলিসে থাকাকালে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকে পরে থাকে না অথবা একেবারে ব্যাপকভাবে 'যে কোন সময়' লেখা হয় তাহাতে অত্র বিবাহের পরেও তিন তালাক না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতা থাকে; কাজেই আমরা "যদি"ও লিখিয়াছি "যে কোন সময়"ও লিখিয়াছি অতঃপর "অত্র বিবাহের মধ্যে"ও লিখিয়াছি।

দ্বিতীয় উপায় এই যে, মুসলমান হাকিমের নিকট বিচারপ্রার্থী হইতে হইবে। কারণ বিবাহ বন্ধন এতই শক্ত বন্ধন যে, তাহা ছিন্ন করার মাত্র তিনটিই উপায়; এতদ্ব্যতীত চতুর্থ উপায় নাই! যথা—(১) মৃত্যু, (২) সাবালেগ স্বামীর তালাক, (৩) মুসলমান হাকিমের হুকুম। হাকিমের জন্য

আবার মুসলমান হওয়ার শর্ত এবং মুসলমান হাকিমের জন্য আবার শরীঅতের মোয়াফেক মকদ্দমার শুনানি এবং হুকুম জারী শর্ত। নতুবা যদি কোন অমুসলমান হাকিম মকদ্দমার শুনানি লইয়া ফয়সালা লিখিয়া যায়, পরে কোন মুসলমান হাকিম হুকুম জারী করে অথবা মুলমান হাকিমও শরীঅতের নিয়ম পালন না করিয়া বিচার করে, তবে বিবাহ ফছ্খ্ হইবে না।

কিন্তু বিধর্মী রাজত্বের দেশে শর্ত অনুযায়ী মুসলমান হাকিম পাওয়া বড় দুষ্কর। কেননা, গভর্ণমেন্টের আইনে আমাদের এই বিপদ দূর করিবার জন্য খাছ কোন মুসলমান হাকিম নাই; অথচ আমাদের ধর্মের বিধান অনুসারে মুসলমান হাকিম ব্যতিরেকে আমাদের এই বিপদ উদ্ধার হইতে পারেনা। বিশেষতঃ মকদ্দমার শুনানি এবং হুকুম জারী উভয় মুসলমান হাকিমের হাতে হওয়ার শর্ত থাকায়। কারণ, হয়ত হাকিম বদল হইয়া গেলে অমুসলমান হাকিমের হাতে মকদ্দমা পড়িলে সব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কাজেই হয়ত কোন মুসলমান স্বাধীন বা করদ মিত্র রাজ্যে গিয়া হুকুম আনিতে হইবে, না হয় "আদেল জমা'আতে মুসলেমীন"-এর উপর বিচার-ভার ন্যস্ত করিতে হইবে।

আদেল জমা'আতে মুসলেমীনের জন্যও ৪টি শর্ত আছেঃ প্রথম শর্ত—কম পক্ষে তিন জন লোকের জমা'আত হইতে হইবে। দ্বিতীয় শর্ত—জমা'আতের প্রত্যেক মেম্বারকেই আদেল হইতে হইবে অর্থাৎ এরূপ হওয়াই চাই যে, কেহই গোনাহে কবীরা ত আদৌ করেই নাই, ছগীরা গোনাহ্ও পর পর বিনা তওবায় তিনবার করে নাই। যদি কোন সময় ভুল-ত্রুটিবশতঃ গোনাহ হইয়া যায়, তবে অবিলম্বে তওবা করিয়া লয়। অতএব, সুদখোর, ঘুসখোর, মিথ্যাবাদী, বে-নামাযী, অত্যাচারী, শরাবী, জুয়ারী, দাড়ীমুণ্ডনকারী, পর্দা ছেদনকারী প্রভৃতি লোক জমা'আতের মধ্যে মোটেই থাকা উচিত নহে; নতুবা ছহীহ্ হইবে না; তৃতীয় শর্ত—বিচার পদ্ধতি শতীঅতের নিয়ম অনুসারে হওয়া চাই; কাজেই জমা'আতের সব মেম্বার জ্ঞানী আলেম হওয়া চাই, অন্তত এক জন জ্ঞানী আলেম ত হওয়া চাই-ই। জ্ঞানীর অর্থ হইল—তিনি যেমন শরীঅতের মাসআলা মাসায়েল ওয়াকেফ থাকিবেন, বৈষয়িক বিচার-পদ্ধতির জ্ঞানেও তেমন পরিপক্ক থাকিবেন। চতুর্থ শর্ত—জমা'আতের সদস্যদের মধ্যে বিচারে কাহারও আদৌ মতভেদ না থাকা চাই, হুকুমের বেলায় সকলকে একমত হইতে হইবে, যদি একজনেরও সামান্য মতভেদ থাকে, তবে হুকুম ছহীহ্ হইবে না। পঞ্চম শর্ত—বিচার পদ্ধতি, তাহ্কীক্বাত, সাক্ষী, জবানবন্দী, হুকুম জারী সবই শরীঅতের বিধান মতে হওয়া চাই। এই পাঁচ শর্তের একটি শর্তেরও বিন্দুমাত্র খেলাফ হইলে বিবাহ বন্ধন ছেদন হইবে না, অন্যত্র বিবাহও দুরুস্ত হইবে না। নপুংসকের জন্য কি শর্ত, পাগলের জন্য কি শর্ত, মাফ্কুদের মৃত্যুর হুকুমের জন্য চার বৎসর কোন্ তারিখ হইতে ধরিতে হইবে, ইদ্দত কোন তারিখ হইতে হিসাব হইবে, উপস্থিত অত্যাচারী স্বামী বা অনুপস্থিত অত্যাচারী স্বামীর সহিত কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে এবং খেয়ারেবলুগের জন্য কি কি শর্ত, মকদ্দমা দায়ের করার জন্য কত দিন সময়—তাহা সব উক্ত কিতাবে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বড় আলেম ব্যতীত এই সব মাসআলা মীমাংসার ক্ষমতা সাধারণ আলেমের নাই। বড় আলেমেরও উক্ত কিতাব দেখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া হুকুম জারী করা চাই। —অনুবাদক

ইদ্দতের মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** স্বামীর মৃত্যু বা তালাক ইত্যাদি কারণে স্ত্রীর যে কিছু মুদ্দতের (কালের) জন্য এক বাড়ীতে থাকিতে হয়, অন্যত্র যাইতে পারে না বা অন্য কোথাও বিবাহ্ বসিতে পারে না, ইহাকে ইদ্দত বলে। ইদ্দত পুরা হওয়ার পূর্বে অন্যত্র যাওয়া ও বিবাহ্ বসা হারাম। ইদ্দত পুরা হইলে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে।

২। **মাসআলা ঃ** স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে, রজয়ী তালাক হউক অথবা বায়েন তালাক হউক, এক তালাক হউক অথবা তিন তালাক হউক, স্ত্রীর পূর্ণ তিনটি হায়েয অতীত না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর বাড়ীতেই নির্জন বাসস্থানে থাকিতে হইবে, (রাত্র বা দিনে তথা হইতে অন্য কোথাও যাইতে পারিবে না এবং অন্য কোথাও বিবাহ্ও বসিতে পারিবে না। [তালাকের তারিখের] পর যতদিন পর্যন্ত তিনটি হায়েয পূর্ণরূপে অতীত না হইবে, তত-দিন পর্যন্ত অন্যত্র বিবাহ্ বসা হারাম ;) অবশ্য যখন পূর্ণ তিনটি হায়েয অতীত হইয়া যাইবে তখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিবে (এবং ইচ্ছামত বিবাহ বসিতে পারিবে।)

৩। **মাসআলা ঃ** যদি এমন স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয় যে, তাহার বয়স কম হওয়ার কারণে বা বৃদ্ধা হওয়ার কারণে হায়েয আসে না, তবে তাহার তিন হায়েযের পরিবর্তে পূর্ণ তিন মাস ইদ্দত পালন করিতে হইবে। তালাকের তারিখ হইতে তিন মাস পর্যন্ত অন্য কোথাও যাইতে বা বিবাহ বসিতে পারিবে না। পূর্ণ তিন মাস অতীত হওয়ার পর অন্যত্র যাইতেও পারিবে এবং বিবাহও বসিতে পারিবে।

৪। **মাসআলা ঃ** অল্প বয়স্কা স্ত্রীর তালাক হওয়াতে হায়েয না আসার কারণে মাসের হিসাবে ইদ্দত পালন শুরু করিয়াছিল এক মাস বা দুই মাস অতীত হওয়ার পর হায়েয আসিল, এইরূপ অবস্থায় হায়েযের হিসাবই ধরিতে হইবে। অর্থাৎ, তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি হায়েয শুরু হয়, তবে আর সামনে হিসাব ধরা যাইবে না, পূর্ণ তিনটি হায়েয অতীত না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** গর্ভাবস্থায় তালাক হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে। যখন সন্তান প্রসব হইবে, তখনই ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। যদি তালাকের কয়েকদিন পরেও সন্তান প্রসব হয়, তবুও সন্তান প্রসব হওয়া মাত্রই ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। (তিন মাস বা তিন হায়েয পুরা করিতে হইবে না।)

৬। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ হায়েযের হালতে তালাক দেয়, তবে ঐ হায়েযকে ইদ্দতের মধ্যে ধরা যাইবে না, উহার পর পূর্ণ তিনটি হায়েয ইদ্দত পালন করিতে হইবে। হায়েযের হালাতে তালাক দেওয়া হারাম।

৭। **মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস বা নির্জনবাস হইয়াছে, নির্জনবাসের কারণে পূর্ণ মহর ওয়াজেব হউক কিংবা না হউক, এধরনের স্ত্রীর উপর তালাকের পর ইদ্দত পালন করা ওয়াজেব। আর যদি কোন প্রকারের নির্জনবাস না হইয়া থাকে, তবে এমন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পালন ওয়াজেব নহে।

৮। মাসআলাঃ কেহ পর স্ত্রীকে নিজ স্ত্রী মনে করিয়া ধোঁকায় পড়িয়া সহবাস করিল। অতঃপর জানা গেল যে, উক্ত রমণী তাহার স্ত্রী ছিল না, তখন ঐ রমণীরও ইদ্দত কাটাইতে হইবে। যতদিন ইদ্দত শেষ না হইবে ততদিন নিজ স্বামীকেও সহবাস করিতে দিবে না। যদি সহবাস করে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পাপী হইবে। উপরোল্লিখিত ইদ্দতই এরূপ সহবাসের ইদ্দত। যদি ঐ দিন গর্ভবতী হইয়া থাকে, তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ছবর করিবে এবং ইদ্দত কাটাইবে। এই সন্তান হারামী হইবে না, ইহার বংশ ঠিক আছে, যে ব্যক্তি ধোঁকায় পড়িয়া সহবাস করিয়াছে তাহারই সন্তান ধর্তব্য হইবে।

৯। মাসআলাঃ শরীঅতের খেলাফ বিবাহ হইয়া যদি সহবাস হইয়া যায়, যেমন যদি স্বামীর মৃত্যুর বা তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হইবার পূর্বে বিবাহ করে অথবা স্বামী জীবিত থাকিতে তালাক দেওয়ার পূর্বে বিবাহ করে (অথবা বিনা সাক্ষীতে বিবাহ করে) অথবা দুধ-ভগ্নী ইত্যাদিকে বিবাহ করে, তবে যখন হইতে ঐ ব্যক্তি তওবা করিয়া ঐ স্ত্রীলোকটিকে পরিত্যাগ করিবে, তখন হইতে ইদ্দত গণনা শুরু করিতে হইবে। অবশ্য এইরূপ বে-কায়দা বিবাহে যদি সহবাস না হয়, তবে ইদ্দত পালন করিতে হইবে না (বা ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকিলে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর যদি সেই ব্যক্তির সহিতই বিবাহ সাব্যস্ত হয়, তবেও পুনরায় ইদ্দত পালন করিতে হইবে না।)

১০। মাসআলাঃ ইদ্দত কালের ভরণ-পোষণ এবং অন্য সবই তালাকদাতার যিম্মায়। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা পরে আসিতেছে।

১১, ১২। মাসআলাঃ তালাকে বায়েন দেওয়ার পর পূর্ব স্বামী হইতে সতর্কতার সহিত পূর্ণ মাত্রায় পর্দা করা স্ত্রীর কর্তব্য। তা সত্ত্বেও যদি ভুলক্রমে ইদ্দতের মধ্যে সহবাস হইয়া পড়ে, তবে ঐ সহবাসের পর হইতে পুনরায় ইদ্দত গণনা করিবে। অর্থাৎ ঐ সহবাসের পর হইতে পূর্ণ তিনটি হায়েয অতীত হইলে পর ইদ্দত খতম হইবে।

মওতের ইদ্দত

১। মাসআলাঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গিয়াছে তাহার চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করা ফরয। স্বামীর মৃত্যুর কালে স্ত্রী যে বাড়ীতে ছিল সেই বাড়ীতেই থাকিবে, তাহা হইতে বাহিরে যাওয়া দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি স্ত্রীলোক খুব গরীব হয় এবং বাহিরে কাজকর্ম ব্যতিরেকে খাওয়া-পরার অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে দিনের বেলায় কাজের জন্য বাহিরে যাইতে পারিবে বটে, কিন্তু রাত্রির বেলায় সেই বাড়ীতেই থাকিতে হইবে। বৃদ্ধা হউক বা যুবতী হউক, না-বালেগা হউক বা বালেগা হউক সকলের জন্যই চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালনের হুকুম। অবশ্য যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তবে চার মাস দশ দিন হিসাব ধরা হইবে না, ধরা হইবে সন্তান প্রসব ; এমনকি স্বামীর মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পরে যদি সন্তান প্রসব হয়, তবে সন্তান হওয়া মাত্র ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে।

২। মাসআলাঃ বাড়ীর মধ্যে যদি কয়েকটি ঘর বা ঘরের মধ্যে কয়েকটি কামরা থাকে, তবে যে-কোন ঘরে বা যে-কোন কামরায় থাকিতে পারিবে (এবং উঠানের মধ্যেও বাহির হইতে পারিবে। অবশ্য যদি বাড়ীর অন্য ঘরগুলি বা ঘরের মধ্যের অন্য কামরাগুলি অন্যের হয়, তবে তথায় যাইবে না।) কোন কোন স্থানে প্রথা আছে যে, স্ত্রীলোকেরা শোকের জন্য একটি খাছ জায়গা ঠিক করিয়া লয়, সেই জায়গা ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় না। ইহার কোন দলীল নাই।

৩। মাসআলা ঃ না-বালেগ স্বামীর মৃত্যুকালে যদি স্ত্রী গর্ভবতী থাকে, তবে গর্ভ খালাস পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে। কিন্তু সন্তান হারামী হইবে স্বামীর হইবে না।

৪। মাসআলা ঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু চাঁদের ১ম তারিখ হইবে, সে (যদি গর্ভবতী না হয়, তবে) চাঁদের হিসাবে চার মাস দশ দিন পূর্ণ করিবে। (চাঁদ ২৯ দিনের হউক বা ৩০ দিনের হউক, চারিটি চাঁদ শেষ হইয়া পঞ্চম চাঁদের ১০ দিন অতীত হইলেই তাহার ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যাইবে। আর যদি স্বামীর মৃত্যু চাঁদের ১ম তারিখে না হয়, তবে ৩০ দিনের চারিটি মাস ধরিতে হইবে এবং তারপর দশ দিন ধরিতে হইবে। (মোট ১৩০ দিন অতীত হইলে ইদ্দত পূর্ণ হইবে। ইহা ত হইল মওতের ইদ্দতের হুকুম।) তালাকের ইদ্দতের হুকুমও ঠিক এইরূপ। অর্থাৎ, ঋতুবতী বা গর্ভবতী মেয়েলোক না হইলে তাহার মাস হিসাবে ইদ্দত পালন করিতে হইবে। অতএব, যদি চাঁদের ১ম তারিখে তালাক দেয়, তবে তিনটি চাঁদ অতীত হইয়া গেলেই ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যাইবে। চাঁদ ২৯ দিনের হউক বা ৩০ দিনের হউক। (চাঁদের বেশী-কমের কারণে ২/১ দিন বেশী কম হইলে তাহা হিসাবে ধরা যাইবে না) আর যদি চাঁদের ১ম তারিখে ছাড়া তালাক হয়, তবে ৩০ দিনের হিসাবে মাস ধরিয়া পূর্ণ ৯০ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে। [প্রকাশ থাকে যে, আমাদের ইসলামী শরীঅতে সবক্ষেত্রেই চান্দ্র মাসের এবং চান্দ্র বৎসরের হিসাব ধরা হয়। চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ দিনে হয়। সৌরবৎসর ৩৬৫ দিনে হয়, কাজেই চান্দ্র বৎসরের চেয়ে সৌরবৎসর ১১ দিন বেশী।

৫। মাসআলা ঃ শরার বরখেলাফ কাহারও বিবাহ হইল, যেমন, সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হইয়াছিল বা ভগ্নীপতির বিবাহ বন্ধনে ভগ্নী থাকা সত্ত্বেও ভগ্নীপতির সহিত বিবাহ হইয়াছিল (বা অন্য স্বামীর ইদ্দতের ভিতর বিবাহ হইয়াছিল), তারপর এই শরার বরখেলাফকারীর মৃত্যু হইয়া গেল। এইরূপ অবস্থা হইলে ঐ স্ত্রীলোকটির তখন চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে না; (কারণ সে ত তাহার স্বামীই নয়। অবশ্য অন্যায়রূপে সে এই স্ত্রীলোকটির উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া পবিত্র হওয়ার জন্য) তাহার তিন হায়েয বা হায়েয না আসিলে তিন মাস আর গর্ভবতী হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

৬। মাসআলা ঃ মৃত্যু-শয্যায় যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বায়েন তালকা দেয় এবং তালাকের ইদ্দত শেষ না হইতেই স্বামীর মৃত্যু হইয়া যায়, তবে ঐ স্ত্রীর তালাকের ইদ্দত এবং মৃত্যুর ইদ্দত এই দুইটির যেইটি পরে শেষ হইবে সেই পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে আর যদি রজয়ী তালাক দিয়া ইদ্দতের মধ্যেই স্বামী মারা যায়, তবে অবশ্যই মৃত্যুর ইদ্দত পালন করিতে হইবে। (আর যদি উভয় ক্ষেত্রে তালাকের ইদ্দতের পর মৃত্যু হয়, তবে আর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করিতে হইবে না।

৭। মাসআলা ঃ (বিদেশে) স্বামী মারা গিয়াছে, স্ত্রী খবরও পায় নাই, খবর হয়ত মৃত্যুর চার মাস দশ দিন পর (বা স্ত্রী গর্ভবতী হইলে প্রসবের পর) পাইয়াছে। এমতাবস্থায় খবর পাওয়ার পর আর ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। বে-খবরীর অবস্থায়ই ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। স্বামী তালাক দিয়াছে কিন্তু স্ত্রী জানিল না বা অনেক দিন পর খবর পাইল ইদ্দতের মুদ্দত খবর পাওয়ার পূর্বেই শেষ হইয়াছে তবে তাহার ইদ্দত পুরা হইয়া গেল, এখন ইদ্দত পালন করা ওয়াজেব নহে।

৮। মাসআলা ঃ স্ত্রী হয়ত বাহিরে কোথাও গিয়াছিল, ইত্যবসরেই স্বামী মারা গিয়াছে এই অবস্থায় সংবাদ পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর নিজালয়ে চলিয়া আসিয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকিবে।

৯। মাসআলা ঃ (তালাকের ইদ্দতের খোরাক-পোশাক স্বামীর যিম্মায় ; কিন্তু) মৃত্যুর ইদ্দতের খোরাক-পোশাক স্বামীর যিম্মায় নয়, নিজ হইতে খরচ করিবে।

১০। মাসআলা ঃ কোন কোন স্থানে প্রথা আছে, স্বামীর মৃত্যুর পর বৎসরকাল ইদ্দত পালনের ন্যায় বসিয়া থাকে। ইহা একেবারে হারাম।

শোক প্রকাশের বিধান

১। মাসআলা ঃ যে স্ত্রীলোককে রজয়ী তালাক দেওয়া হইয়াছে, তাহার ইদ্দত এই যে, তিনটি হায়েয অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত সে স্বামীর বাড়ী হইতে অন্যত্র যাইতে পারিবে না এবং অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহার জন্য সীতা পাটি এবং সুরমা, খোশ্‌বু ব্যবহার সবই জায়েয আছে। আর যে স্ত্রীলোকের এক তালাক-বায়েন বা তিন তালাক হইয়াছে, অথবা অন্য কোন প্রকারে বিবাহ টুটিয়া গিয়াছে, অথবা স্বামী মরিয়া গিয়াছে, তাহার হুকুম এই যে, সে ইদ্দতের মুদ্দতের মধ্যে স্বামীর বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্রও যাইবে না, অন্য স্বামীও গ্রহণ করিবে না, সীতা-পাটি এবং সুগন্ধি তৈলও ব্যবহার করিবে না। এই কাজ তাহার জন্য হারাম। এইসব অবস্থায় বিনা পরিপাটিতে মলিন বেশে আবদ্ধ থাকাকেই শোক করা বলে।

২। মাসআলা ঃ যতদিন ইদ্দত শেষ না হয়, ততদিন পর্যন্ত সুগন্ধি তৈল বা আতর ব্যবহার করা, কাপড়ে সুগন্ধি লাগান, অলঙ্কার পরিধান করা, নাকফুল পরিধান করা, সুরমা লাগান, পান খাইয়া মুখ লাল করা, পাউডার লাগান, মাথায় ও শরীরে তৈল লাগান, চিরুণী দ্বারা চুল আঁচড়ান, মেহেদী লাগান, সুন্দর কাপড় পরা, রেশমী বা চটকদার রঙ্গীন কাপড় পড়া হারাম। অবশ্য যে-রঙ্গের মধ্যে চমক নাই সে রং জায়েয আছে। মোটকথা, ইদ্দতের শোকের মধ্যে সাজসজ্জা জায়েয নহে।

৩। মাসআলা ঃ মাথায় ব্যথা হওয়ার কারণে যদি তৈল লাগান দরকার হয়, তবে খোশ্‌বু ছাড়া তৈল ব্যবহার করা দুরুস্ত আছে। এইরূপ দরকারবশতঃ সুরমাকে ঔষধরূপে ব্যবহার করা জায়েয আছে বটে, কিন্তু রাত্রিতে লাগাইয়া আবার দিনে মুছিয়া ফেলিবে। আর মাথা ধোয়া ও গোসল করা দুরুস্ত আছে। একান্ত দরকার হইলে মাথা আঁচড়াইতেও পারে, কিন্তু পরিপাটি করিয়া খোপা বাধিবে না বা চিকন চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া চুলকে এমন পালিশ করিবে না যাহাতে বেশী সুন্দর দেখায়।

৪। মাসআলা ঃ শোক প্রকাশ করা বালেগা স্ত্রীলোকের উপর ওয়াজেব, না-বালেগাদের জন্য উহা ওয়াজেব নহে। উপরে বর্ণিত নিষিদ্ধ কাজগুলি তাহারা করিতে পারে। তবে দ্বিতীয় বিবাহ করা এবং বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাওয়া ইহাদের জন্যও দুরুস্ত নহে।

৫। মাসআলা ঃ যাহার বিবাহ শরীঅত মতে শুদ্ধ হয় নাই, শরীঅতের বরখেলাফ হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে কিংবা এই পুরুষ মরিয়া গিয়াছে, তবে এমন স্ত্রীর শোক প্রকাশ ওয়াজেব নহে।

৬। মাসআলা ঃ স্বামী ছাড়া অন্য কেহ মরিলে শোক প্রকাশ করা দুরুস্ত নহে। স্বামী নিষেধ না করিলে আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে তিন দিন পর্যন্ত সাজসজ্জা না করা দুরুস্ত আছে, তিন দিনের বেশী করা হারাম। স্বামী নিষেধ করিলে তিন দিনও করা যাইবে না।

খোর-পোশের বয়ান

১। **মাসআলা**ঃ স্ত্রীর খোরাক-পোশাক দেওয়া পুরুষের উপরে ওয়াজেব। স্ত্রীর টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি যতই থাকুক না কেন, তাহার খরচ-পত্রের জন্য পুরুষ দায়ী। বাস করিবার ঘরের জন্যও পুরুষ দায়ী।

২। **মাসআলা**ঃ বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীকে বাড়ীতে নেওয়া হয় নাই, তবুও স্ত্রী খোর-পোশের জন্য দাবী করিতে পারে। কিন্তু পুরুষ যদি বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রী যায় নাই, তবে স্ত্রী খোর-পোশের দাবী করিতে পারে না।

৩। **মাসআলা**ঃ স্ত্রী এত ছোট যে, সঙ্গম করিবার উপযুক্ত হয় নাই, এই অবস্থায় পুরুষ যদি নিজের কাজ-কর্মের জন্য বা মনকে খুশী করার জন্য তাহাকে নিজের বাড়ীতে নিয়া রাখে, তবে পুরুষের উপর তাহার খোরাক-পোশাক ওয়াজেব হইবে। আর যদি না রাখে, বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়, তবে ওয়াজেব হইবে না। আর যদি স্বামী না-বালেগ হয় এবং স্ত্রী বড় হয়, তবে খোরাক-পোশাক পাইবে। —উঃ বেঃ ৬১ পৃঃ

৪। **মাসআলা**ঃ যে পরিমাণ মহর প্রথমতঃ দেওয়ার প্রথা আছে, উহা সম্পূর্ণ না দেওয়ায় স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে যায় না, এই রকম অবস্থায় স্ত্রী খোরাক-পোশাক পাইবে। আর যদি বিনা কারণে স্বামীর বাড়ীতে না যায়, তবে খোরাক-পোশাক পাইবে না। যখন হইতে স্বামীর বাড়ীতে যাইবে, তখন হইতে দেওয়া হইবে।

৫। **মাসআলা**ঃ স্বামী হইতে যত দিনের অনুমতি লইয়া মা-বাপের বাড়ীতে থাকিবে, স্বামীর নিকট হইতে ততদিনের খোরাক-পোশাক লইতে পারে।

৬। **মাসআলা**ঃ স্ত্রীর অসুখ হইলে সেই অবস্থায় স্বামীর বাড়ীতে থাকুক বা অন্য কোন আত্মীয়ের বাড়ীতেই থাকুক, অসুখের সময়ের খোরাক-পোশাক সে পাইবে। আর অসুখ অবস্থায় যদি স্বামী তাহাকে বাড়ীতে নিতে চায় আর সে না যায়, তবে পাইবে না। অসুখ অবস্থায় শুধু খোরাক-পোশাক পাইবে বটে, চিকিৎসার খরচ সে নিজে দিবে। আর যদি পুরুষ দেয়, তবে উহা তাহার অনুগ্রহ।

৭। **মাসআলা**ঃ স্ত্রী হজ্জ করিতে গেলে এই সময়ের খোরাক-পোশাকের জন্য স্বামী দায়ী নহে। যদি স্বামী সঙ্গে থাকে, তবে স্বামীই উহা বহন করিবে। কিন্তু খোরাকী বাবদ বাড়ীতে যে পরিমাণ পাইত ঐ পরিমাণই পাইবে। অতিরিক্ত লাগিলে উহা নিজে খরচ করিবে। যানবাহনের ভাড়াও নিজে বহন করিবে।

৮। **মাসআলা**ঃ খোরাক-পোশাকের বেলায় উভয়ের অবস্থার দিকে খেয়াল রাখিতে হইবে। যদি উভয়েই ধনী হয়, তবে আমীরের মত খোরাক-পোশাক পাইবে, যদি উভয়ে গরীব হয়, তবে গরীবের ন্যায় পাইবে। আর যদি স্বামী গরীব স্ত্রী ধনী বা স্বামী ধনী, স্ত্রী গরীব হয়, তবে মাঝামাঝি রকমের খোরাক-পোশাক পাইবে।

৯। **মাসআলা**ঃ স্ত্রীর যদি এমন কোন অসুখ থাকে যে, ঘর সংসারের কাজ করিতে পারে না অথবা বড় ঘরের মেয়ে হয়, তাই সে নিজে ধোয়া, ঘসা-মাজা রান্না ইত্যাদি কাজ নিজ হাতে

করিতে পারে না বা ঐ সব করাকে দূষণীয় মনে করে, তবে তাহাকে রান্না-বান্না করাইয়া খাওয়াইতে হইবে। অন্যথায় বাড়ীর কাজ-কর্ম স্ত্রীর নিজ হাতে করা ওয়াজেব। স্বামী লাকড়ী, আনাজ, বরতন ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিবে, স্ত্রী নিজে পাক করিয়া খাইবে।

১০। মাসআলা ঃ তৈল, চিরুণী, সাবান, ওযূ-গোসলের পানি, ধোওয়া মাজার পানি ইত্যাদি ব্যবস্থা করা পুরুষের উপর ওয়াজেব। কিন্তু পান, তামাক, সুরমা মিশী ইত্যাদি পুরুষের উপর ওয়াজেব নহে। ধোপা খরচও পুরুষে দিবে না, যদি সে দেয় এটা তাহার অনুগ্রহ।

১১। মাসআলা ঃ ধাত্রী ও প্রসব করাইবার খরচ, যে ধাত্রীকে ডাকিয়া আনে সেই দিবে। যদি স্বামী ডাকিয়া আনিয়া থাকে, তবে স্বামী, আর যদি স্ত্রী ডাকিয়া আনে তবে স্ত্রীই দিবে। আর যদি বিনা ডাকে আসিয়া থাকে, তবে পুরুষই ঐ খরচ-বহন করিবে।

স্ত্রীর জন্য ঘর

১। মাসআলা ঃ স্ত্রীকে পৃথক একখানা ঘর দেওয়াও স্বামীর যিম্মায় ওয়াজেব অর্থাৎ এমন একখানা ঘর বা কামরা দেওয়া চাই যে, তথায় স্বামীর মা-বাপ, ভাই, বোন, ভগ্নে, ভাতিজা কেহ যেন না থাকে। স্বামী-স্ত্রী যেন পূর্ণ স্বাধীনভাবে তথায় আচার-ব্যবহার উঠা-বসা করিতে পারে। অবশ্য যদি স্ত্রী স্ব-ইচ্ছায় এই হক মাফ করিয়া দিয়া শরীকী ঘরে থাকিতে চায়, তবে স্বামীর গোনাহ্ হইবে না।

২। মাসআলা ঃ স্ত্রী স্বাধীনভাবে তাহার মাল-আসবাব কাপড়-চোপড় রাখিতে এবং বন্ধ করিতে ও খুলিতে পারে, অন্য কেহ তাহাতে কোনরূপ বাধা দিতে না পারে এই পরিমাণ কামরা ঘরই যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশীর দাবী করার হক স্ত্রীর নাই ।

৩। মাসআলা ঃ স্ত্রীর যেমন হক আছে যে, সে স্বামীর নিকট হইতে এমন ঘর দাবী করিয়া নিবে যথায় স্বামীর কোন আত্মীয়-স্বজন থাকিতে বা আসিতে না পারে, তদ্রূপ স্বামীরও হক আছে যে, সে যে ঘর স্ত্রীকে দিয়াছে তথায় স্ত্রীর কোন আত্মীয়কে এমনকি তাহার মা-বাপকেও ঢুকতে বা থাকিতে না দেয়।

৪। মাসআলা ঃ স্ত্রী তাহার মা-বাপকে দেখার জন্য সপ্তাহে একবার যাইবার হক আছে তাছাড়া অন্যান্য মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদারদের (যেমন, আপন চাচা,আপন মামু, আপন ভাই ইত্যাদিকে) দেখার জন্য বৎসরে একবার যাইবার হক আছে, এর বেশী নয়। এইরূপ মা-বাপও সপ্তাহে একবার এবং অন্যান্য মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদার বৎসরে একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারে তাহাতে বাধা দিবার অধিকার স্বামীর নাই। ইহা অপেক্ষা বেশী আসিতে নিষেধ করার ক্ষমতা স্বামীর আছে।

৫। মাসআলা ঃ বাপের যদি রোগ হয় এবং তাহার খেদমত করার জন্য কেহ না থাকে, তবে আবশ্যক মত দৈনিক বাপের খেদমতে যাইতে পারিবে, স্বামী তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। বাপ যদি বে-দ্বীন কাফেরও হয় তাহারও হক আছে। স্বামী যদি নিষেধ করে, তবুও যাওয়া চাই; কিন্তু স্বামীর আদেশ ছাড়া গেলে খোরপোশ পাইবে না।

৬। মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকের জন্য গায়ের মাহ্‌রামদের বাড়ীতে যাওয়া আদৌ উচিত নহে। বিবাহ-শাদীর সময় যদি স্বামী এজাযতও দেয়, তবুও যাওয়া দুরুস্ত নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে স্বামী যদি এজাযত দেয়, তবে স্বামীও গোনহ্‌গার হইবে। এমনকি, বিবাহ-শাদীর মাহ্‌ফেলের সময় মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদারের বাড়ীতে যাওয়াও দুরুস্ত নহে।

৭। মাসআলা ঃ যে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হইয়াছে সেও ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর নিকট ভাত কাপড় এবং ঘর পাওয়ার হক্‌দার; অবশ্য মউতের ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর নিকট ভাত কাপড় বা ঘর পাওয়ার হক্‌দার নহে; কিন্তু জওয়িয়তের অংশ তাহার স্বামীর প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই আছে। (এমন কি ঘর-দুয়ার বিছানা-পত্র থাল, বাসনের মধ্যেও আছে।)

৮। মাসআলা ঃ স্ত্রীর গোনাহ্‌র কাজ করার কারণে, যদি বিবাহ টুটিয়া যায়, যেমন, কামভাবের সহিত সতাল পুত্রের গায়ে শুধু হাত দিল, তজ্জন্য তালাক দেওয়া হয় কিংবা বে-দ্বীন হইয়া গেল, তবে ইদ্দতের খোরাক-পোশাকের দাবী সে করিতে পরিবে না। অবশ্য থাকিবার ঘর পাইবে কিন্তু যদি স্ত্রী নিজ ইচ্ছায় চলিয়া যায়, তবে স্বতন্ত্র কথা, পরে আর দেওয়া হইবে না।

নছব ছাবেত হওয়ার কথা

১। মাসআলা ঃ স্বামীওয়ালা স্ত্রীর সন্তান হইলে স্বামীকেই সন্তানের বাপ বলিতে হইবে, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহের কারণে ইহা বলা জায়েয হইবে না যে, এই সন্তান তাহার স্বামীর নহে, অমুকের অথবা এই সন্তান হারামী; যদি কেহ এরূপ বলে, তবে শরীঅতের বিচার অনুসারে তাহাকে কোড়া লাগাইতে হয়। (এমনকি স্বয়ং স্বামীও এই সন্তানকে অস্বীকার করিতে পারিবে না। যদি চারিজন সাক্ষীর প্রমাণ ব্যতিরেকে সন্তানকে অস্বীকার করে, তবে তাহারও হয় তোহ্‌মতের শাস্তি (৮০ দোর্রা) ভোগ করিতে হইবে, 'না হয়, লেআন' করিতে হইবে। (লেআনের বয়ান দ্রঃ)

২। মাসআলা ঃ হামলের মুদ্দত কমপক্ষে ছয় মাস এবং অধিকের অধিক দুই বৎসর অর্থাৎ, ছয় মাসের কমে সন্তান হইতে পারে না এবং দুই বৎসরের বেশীও সন্তান পেটে থাকিতে পারে না। (অতএব, যদি বিবাহের পর ছয় মাসের একদিন কম থাকিতেও সন্তান হয়, সন্তানকে হারামী বলিতে হইবে এবং ঐ স্বামীর সন্তান বলা যাইবে না।)

৩। মাসআলা ঃ শরীঅতের হুকুম এই যে, (স্ত্রীকে তোহ্‌মত হইতে বাঁচাইবার জন্য এবং লোকদের ফাহেশা কথার আলোচনা হইতে দূরে রাখিবার জন্য এবং) সন্তানকে যাহাতে হারামী না বলিতে হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য যখন একেবারে অসম্ভব হইয়া যায়, তখন বাধ্য হইয়া সন্তানকে হারামী এবং সন্তানের মাকে হারামকারিণী বলিতে হইবে।

৪। মাসআলা ঃ যদি কেহ নিজ স্ত্রীকে রজ্‌য়ী তালাক দেয় এবং তালাকের তারিখ হইতে দুই বৎসরের ভিতর সন্তান জন্মে, তবে সেই সন্তানকে হারামের সন্তান বলা যাইবে না, সে সন্তানের বাপ ঐ স্বামীকেই সাব্যস্ত করা হইবে। শরীঅতের আইন অনুসারে এই সন্তানের নছব ঠিক আছে, তাহার নছব বাতেল করা যাইবে না। যদি দুই বৎসরের মাত্র একদিন বাকী থাকিতে সন্তান হয়, তবুও তাহার এই হুকুম। এইরূপ ঘটনা হইলে মনে করিতে হইবে যে, তালাকের পূর্বেই গর্ভধারণ হইয়াছে । সন্তান দুই বৎসর মাতৃগর্ভে রহিয়াছে, সন্তান হওয়ার পর ইদ্দত শেষ হইয়াছে এবং বিবাহ ছুটিয়াছে। (ইহার পূর্বে ইদ্দতও শেষ হয় নাই এবং বিবাহও ছুটে নাই।) অবশ্য যদি স্ত্রীলোকটি নিজ মুখে স্বীকার করে যে, সন্তান প্রসবের পূর্বেই তাহার ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে বাধ্য হইয়া তাহাকে হারামকারিণী এবং সন্তানকে হারামজাদা বলিতে হইবে। এই রজয়ী তালাকের ছুরতে যদি দুই বৎসরের পরেও সন্তান হয় এবং স্ত্রীলোকটিও ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার না করে, তবে সন্তানের নছব ছাবেত মানিতে হইবে। কেননা, রজ্‌য়ী তালাকের ছুরতে ইদ্দতের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রী মিলনের দ্বারা রজআত করা জায়েয আছে, যত বৎসরই হউক না কেন।

মনে করিতে হইবে যে, তালাকের পর ইদ্দতের ভিতর স্বামী-সহবাসের দ্বারা রজআত করিয়াছে, সন্তান হওয়ার পরও তাহার বিবাহ ছুটে নাই। আর যদি স্বামীর ছেলে না হয়, সে বলিয়া দিবে, ইহা আমার ছেলে নহে। যখন অস্বীকার করিবে, তখন লেআনের হুকুম বর্তিবে।

৫। **মাসআলা ঃ** আর যদি বায়েন তালাক দিয়া থাকে, তবে অবশ্য দুই বৎসরের ভিতর সন্তান হইলে তাহার নছব ছাবেত হইবে, দুই বৎসরের পরে হইলে আর নছব ছাবেত করা যাইবে না, বাধ্য হইয়া সন্তানকে হারামের সন্তান বলিতে হইবে। কিন্তু যদি স্বামী দাবী করে যে, আমারই সন্তান, তবে ছাবেত হইবে এবং মনে করিতে হইবে যে, হয়ত ইদ্দতের ভিতর ভুলে সহবাস করিয়াছে। ইহাতে গর্ভ হইয়াছে।

৬। **মাসআলা ঃ** যে মেয়ের বালেগা হওয়ার এখনও কোন আলামত পাওয়া যায় নাই কিন্তু বালেগ হইবার নিকটবর্তী হইয়াছে, সেইরূপ মেয়েকে স্বামী তালাক দিলে যদি বায়েন তালাক দেয়, আর মেয়েটি তিন মাসের মধ্যেই গর্ভবতী আছে বলিয়া প্রকাশ করে, তবে নয় মাসের ভিতর সন্তান হইলে হালালের সন্তান মনে করিতে হইবে; আর যদি রজয়ী তালাক দেয়, তবে ২৭ মাসের ভিতর সন্তান হইলে হালালের অর্থাৎ ঐ স্বামীর সন্তান সাব্যস্ত করিতে হইবে। সন্তানকে হারামের সন্তান বলা যাইবে না। অবশ্য যদি বায়েন তালাক দিয়া থাকে এবং ইদ্দতের মধ্যে গর্ভের কথা প্রকাশ না করিয়া থাকে এবং নয় মাসের পরে গিয়া সন্তান হয়, তবে বাধ্য হইয়া হারামের সন্তান বলিতে হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** যে স্ত্রীলোকের স্বামী মরিয়া গিয়াছে তাহার যদি দুই বৎসরের মধ্যে সন্তান হয়, তবে সেই সন্তানকে হালালের সন্তান বলিতে হইবে। অবশ্য যদি স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসবের পূর্বেই ইদ্দত শেষ হইয়া যাওয়ার কথা নিজ মুখে স্বীকার করিয়া থাকে অথবা দুই বৎসর পরে গিয়া সন্তান হয়, তখন বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, হালালের সন্তান নয়, হারামের সন্তান।

তাম্বীহ্ ঃ মূর্খ সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর নয় মাসের বেশী এক দুই মাস হইয়া সন্তান জন্মিলেও মেয়েলোকটিকে খামাখা তোহ্মত লাগাইতে থাকে। উপরোক্ত মাসআলার দ্বারা বুঝা গেল যে, ঐরূপ অনর্থক তোহ্মত লাগান জায়েয নহে।

৮। **মাসআলা ঃ** বিবাহের পর ঠিক ছয় মাসের পরদিন অথবা তাহার দুই এক দিন বেশী হইলে যদি সন্তান হয়, তবে সে সন্তানকে হালালের সন্তান বলিতে হইবে (হারামের বলা দুরুস্ত নহে)। অবশ্য যদি ছয় মাসের কমে হয়, তখন বাধ্য হইয়া হারামের সন্তান বলিতে হইবে বা স্বামী যদি অস্বীকার করে, তবে 'লেআন' করিতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** শুধু কলেমা, আক্দ হইয়া যাওয়ার ছয় মাস পরে বৌ উঠাইয়া আনার পূর্বে যদি সন্তান হয়, তবুও সে সন্তানকে হারামের সন্তান বলা যাইবে না, ঐ স্বামীর সন্তানই বলিতে হইবে। অবশ্য স্বামীর না হইলে স্বামী যদি অস্বীকার করে, তবে লে'আন করিতে হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** স্বামী অনেকদিন যাবৎ বিদেশে আছে, এমনকি কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে বাড়ী আসে নাই। এদিকে সন্তান পয়দা হইয়াছে। এই সন্তানকে হারামযাদা বলা যাইবে না। স্বামীরই সন্তান বলা যাইবে। সংবাদ পাইয়া যদি স্বামী অস্বীকার করে, তবে লেআনের হুকুম বর্তিবে। (শরীঅতী আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে স্বামীর সন্তান বলা যাইবে। মীরাস ইত্যাদির হুকুম তাহার উপর বর্তিবে। ইহার একটি কারণ এই যে, হয়ত কোন সময় স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইয়া থাকিবে অথচ অন্য লোক তাহা জানিতে পারে নাই।)

সন্তান পালনের মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** সন্তান কোলে থাকা অবস্থায় যদি তালাক দেওয়া হয় তবে বাপ সন্তানকে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। সন্তান মায়ের কাছেই থাকিবে; কিন্তু সন্তানের সমস্ত খরচ বাপকেই দিতে হইবে। আর এই অবস্থায় যদি মা সন্তান পালনের ভার গ্রহণ না করে বাপকে দিয়া দেয়, তবে তাহাকে সন্তান পালনের জন্য মজবুর করিতে পারিবে না; এই অবস্থায় সন্তান পালনের ভার বাপের উপরই পড়িবে।

২। **মাসআলা ঃ** মা না থাকা অবস্থায় কিংবা থাকিলেও যদি ভার নিতে অস্বীকার করে, তবে সন্তান পালনের হক নানীর বেশী, তারপর পরনানী, তারপর দাদীর, তারপর পরদাদীর, তারপর সহোদরা ভগ্নীর, তারপর বৈপিত্রেয়া ভগ্নীর, তারপর বৈমাত্রেয়া ভগ্নীর, তারপর খালার, তারপর ফুফুর।

৩। **মাসআলা ঃ** মা যদি সন্তানের মাহ্‌রাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ্ করে তবে ঐ সন্তানের লালন-পালনের হক মার থাকে না। অবশ্য যদি সন্তানের মাহ্‌রামের সহিত বিবাহ্ হয় যেমন, সন্তানের চাচা কিংবা এ ধরনের অন্য কোন আত্মীয়, তবে সন্তানের লালন পালনের হক মার থাকিয়া যায়। মা ব্যতীত অন্যান্য মেয়েলোক যেমন সন্তানের ভগ্নী, খালা ইহাদের যদি কোন বেগানা পুরুষের সহিত বিবাহ হয় তাহাদেরও এই হুকুম অর্থাৎ শিশুর লালন-পালনের হক তাহাদের থাকে না।

৪। **মাসআলা ঃ** বেগানার সঙ্গে বিবাহ্ হওয়ার পর সন্তান পালনের হক চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার পর হয়ত স্বামী তালাক দিয়া দিয়াছে অথবা মারা গিয়াছে এরূপ অবস্থায় পুনরায় সন্তান পালনের ভার পাইবার অধিকারিনী হইবে মা এবং তৎপরবর্তী হক্‌দারগণ।

৫। **মাসআলা ঃ** সন্তান পালনের জন্য তাহার মা, নানী, খালা, ফুফু ইত্যাদি কোন মেয়েলোক যদি না থাকে, তবে সন্তান পালনের ভার পুরুষ ওলীদের উপর পড়িবে। প্রথমে বাপ, তারপর দাদা, তারপর ভাই, তারপর চাচা ইত্যাদি যেরূপ তরতীব বিবাহের বয়ানে লেখা হইয়াছে। কিন্তু যদি আত্মীয়গণ না-মাহ্‌রাম হয় এবং সন্তানকে তাহার হাতে সোপর্দ করায় ভবিষ্যতে কোন অনিষ্টের আশংকা থাকে, তবে এমন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করিবে, যেখানে সব দিক দিয়া নিরাপদ হয়।

৬। **মাসআলা ঃ** পুত্র-সন্তানের লালন-পালনের হক সাত বৎসর পর্যন্ত। যখন ছেলের বয়স সাত বৎসর হইবে, তখন তাহার বাপ তাহাকে জোর জবরদস্তিও মা, নানী ইত্যাদির নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারে। কন্যা-সন্তানের লালন-পালনের হক নয় বৎসর পর্যন্ত। যখন মেয়ের বয়স নয় বৎসর হইবে, তখন তাহার বাপ তাহাকে লইয়া যাইতে পারিবে। মা, নানী প্রভৃতির তাহাকে বাধা দিবার কোন অধিকার নাই।

স্বামীর হকের বয়ান

আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীকে অনেক বড় বানাইয়াছেন এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক হক ও অনেক দাবী নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা স্ত্রীর পক্ষে অতি বড় এবাদত এবং স্বামীকে অসন্তুষ্ট বা নারায রাখা অতি বড় গোনাহ্।

১। হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

اَلْمَرْاَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ ○ (مشكواة)

"যে স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায রীতিমত পড়িবে, রমযান মাসের রোযা রীতিমত রাখিবে, রীতিমত পর্দানীতি পালন করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে (এবং রীতিমত সন্তান পালন, মুরব্বী ভক্তি ও গৃহস্থালীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া) স্বামীর তাবেদারী করিয়া চলিবে, বেহেশ্তের যে কোন দরওয়াজা দিয়া সে ইচ্ছা করিবে অবাধে তাহাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবার অধিকার দান করা হইবে।" অর্থাৎ, বেহেশ্তের ৮টি দরওয়াজা আছে তাহার যে কোন দরওয়াজা দিয়া সে প্রবেশ করিতে চাহিবে, কেহই কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে পারিবে না।

২। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ○ (ابن ماجه)

"যে কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিয়া ঈমানের সহিত মরিতে পারিবে, সে নিঃসন্দেহে বেহেশ্তী হইবে।"

৩। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

لَوْكُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَّاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ○ (ترمذى)

"যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সজ্দা করা জায়েয হইত, তবে আমি নিশ্চয়ই স্ত্রীকে হুকুম দিতাম যে, সে তাহার স্বামীকে সজ্দা করুক।" (কিন্তু এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করা জায়েয নাই, তাই সজ্দা করা এবং এবাদত করার ত হুকুম দেওয়া যায় না, এছাড়া অন্যান্য সর্বপ্রকার তাবেদারী এবং পতিভক্তি দেখান স্ত্রীর কর্তব্য।)

৪। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

স্বামী যদি স্ত্রীকে হুকুম করে যে, এই পাহাড়ের পাথরসমূহ বহিয়া ঐ পাহাড়ে এবং সেই পাহাড় হইতে অন্য আর এক পাহাড়ে লইয়া যাও, তবে এই সুকঠিন এবং অনর্থক হুকুম পালনের জন্যও স্ত্রীর তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া যাওয়া উচিত।

৫। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

স্বামী যদি স্ত্রীকে নিজের কাজের জন্য ডাকে, তবে স্ত্রী যদি চুলার কাজেও থাকে, তবুও তৎক্ষণাৎ স্বামীর আদেশ রক্ষা করা স্ত্রীর সর্বপ্রধান কর্তব্য।

৬। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

স্বামী যদি রাত্রে শয়নকালে স্ত্রীকে নিজের কাছে আসার জন্য ডাকে এবং স্ত্রী রাগ করিয়া না আসে, আর স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ে, তবে সারা রাত্রি ফেরেশ্তাগণ ঐ স্ত্রীর উপর লা'নত করিতে থাকে।

৭। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

দুনিয়াতে যখন কোন স্ত্রী তাহার স্বামীকে বিরক্ত করে বা কোনরূপ কষ্ট দেয়, তখন বেহেশ্তের যে হূর কিয়ামতের দিন তাহার স্ত্রী হইবে, তাহারা ঐ স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলে, ওহে হতভাগিনী! আল্লাহ্ তোর সর্বনাশ করুন। তুই আর তাঁহাকে কষ্ট দিস্ না, তিনি কয়েক দিন মাত্র তোর নিকট মেহ্মান স্বরূপ আছেন, অল্পদিন পরেই তিনি তোকে ছাড়িয়া আমাদের নিকট চলিয়া আসিবেন।"

৮। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

তিন প্রকার লোকের নামায বা অন্য কোন এবাদত আল্লাহ্র দরবারে কবূল হয় না। (১) গোলাম-বান্দী মালিকের নিকট হইতে পলাইয়া গেলে তাহাদের এবাদত বন্দেগী আল্লাহ্র দরবারে কবূল হইবে না, যে পর্যন্ত না ফিরিয়া আসিয়া মাফ চাহিবে। (২) যে স্ত্রীর স্বামী তাহার উপর অসন্তুষ্ট তাহার কোন এবাদত-বন্দেগী কবূল হইবে না, যে পর্যন্ত না সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবে। (৩) মদ্যপায়ী নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির কোন এবাদত কবূল হইবে না, যে পর্যন্ত না তাহার নেশা ছুটিয়া যাইবে।

৯। কেহ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞসা করিয়াছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সব চেয়ে ভাল স্ত্রী কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, (১) যে স্ত্রীকে দেখিলে স্বামীর নয়ন জুড়ায়, (২) যে স্ত্রীকে আদেশ করা মাত্রই স্বামীর আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করে, (৩) যে স্ত্রী তাহার ইজ্জত বা সম্পত্তি সম্বন্ধে স্বামীর বিনা হুকুমে বা স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ না করে।

স্বামীর ইহাও একটি হক যে, স্বামীর উপস্থিতিতে স্বামীর নিকট এজাযত না লইয়া স্ত্রী নফল রোযা ও নফল নামায না পড়ে। ইহাও স্বামীর একটি হক যে, স্বামীর উপস্থিতিকালে স্ত্রী মলিন বেশে না থাকে; বরং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হাসিমুখে সুসজ্জিত হইয়া স্বামীর সামনে আসে। এমন কি, স্বামীর আদেশ সত্ত্বেও যদি স্ত্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হয়, তবে সেই জন্য প্রহার করিবার অধিকার পর্যন্ত স্বামীর আছে। স্বামীর ইহাও একটি হক যে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী স্বামীর বাড়ীর বাহিরে কোথাও যাইতে পারিবে না, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতেও না, অন্য কাহার বাড়ীতেও না।

স্বামীর সহিত মিল-মহব্বত রাখিয়া সুখময় জীবন যাপনের উপায়

এই কথা চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, স্বামী-স্ত্রীর বসবাস দুই এক দিনের জন্য নয়, আজীবন স্বামীর সহিত একত্রে বসবাস করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় খোদা না করুন যদি উভয়ের মধ্যে কিছু মন-ভাঙ্গা ভাব আসিয়া যায়, তবে তার চেয়ে দুঃখ ও পরিতাপের আর জগতে নাই। অতএব, স্ত্রীর প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে সে স্বামীর মন অধিকার করিয়া থাকিতে পারে। ইহার উপায় স্বামীর চোখের ইশারায় চলা। স্বামী যদি হুকুম করে যে, সারারাত্রি হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাক, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিবে। কেননা, দুনিয়া এবং আখেরাত দোজাহানের সুখ লাভ নির্ভর করে স্বামীর মনস্তুষ্টির উপর! কাজেই দুনিয়ার সামান্য একটু কষ্ট ভোগ করিয়া যদি পরম সুখ লাভ করা যায়, তবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিবে না। কোন সময় এমন কোন কথা বলিবে না বা এমন কোন ব্যবহার করিবে না যাহাতে স্বামীর মনে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হইতে পারে। স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবে না বা কোন কাজ করিবে না। এমন কি, স্বামী যদি দিনকে রাত, রাতকে দিন বলে, তবে তাহারও প্রতিবাদ করিবে না।

কোন কোন মেয়েলোক নির্বুদ্ধিতাবশতঃ পরিণাম চিন্তা না করিয়া এমন কথা বলিয়া বসে বা এমন কাজ করিয়া বসে, যাহাতে হয়ত স্বামীর মনে ময়লা আসিয়া যায়, পরে সারাজীবন কাঁদিয়া কাটায়, (কিন্তু সে কান্নায় কোন ফল ফলে না। 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।') মনে রাখিও, একবার দেলে ময়লা আনিয়া দেওয়ার পর যদি হাত পা ধরিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া

রাযী করিয়াও লও, তবুও পূর্বের মত টাট্‌কা গোলাপ ফুলের সুবাস কি আর হয়? পরেও যখন আবার কোন দিন কোন বিষয় হইবে, তখনই আগের সেই কথা মনে পড়িবে যে, এ'ত সে-ই যে অমুক দিন আমাকে অমুকভাবে মনে আঘাত দিয়াছিল। অতএব, স্বামীর সহিত কথা বলিতে বা ব্যবহার করিতে খুব সতর্ক হইয়া চলা উচিত। কারণ, যেমন, আল্লাহ্ ও রাসূলের খুশীও স্বামীর খুশীতেই, তেমনি নিজের ইহজীবনের এবং পরজীবনের খুশীও স্বামীর খুশীতেই; কাজেই যে ভাবেই হউক না কেন স্বামীর মনকে খুশী রাখিতেই হইবে।

বুদ্ধিমতী মেয়েদের বলিবার ত দরকার করে না, কারণ তাহারা নিজেরাই বুদ্ধি খাটাইয়া যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্মরণ রাখার জন্য আমরা কয়েকটি কথা এখানে লিখিয়া দিতেছি। এই কথাগুলি ভালমত স্মরণ রাখিলে এবং পালন করিলে অন্যান্য ক্ষেত্রের অন্যান্য কথা আল্লাহ্ চাহেন ত আপনাআপনি বুঝে আসিতে থাকিবে। যথা— (১) স্বামীর আর্থিক অবস্থার চেয়ে বেশী খরচ করিবে না। (২) স্বামীর যেমন অবস্থা, স্বামী শাক-ভাত মোটা কাপড় যখন যেমন যোগাইতে পারে তাহাতেই হাসি মুখে সন্তুষ্টচিত্তে জীবন যাপন করিবে, কখনও বেশীর আকাঙ্ক্ষা করিবে না বা মুখ বেজার করিয়া থাকিবে না। (৩) যদি কোন সময় কোন কাপড় বা কোন জিনিস পছন্দ হয়, আর স্বামীর আর্থিক অবস্থায় তাহা কুলাইয়া না উঠে, তবে মনের কথা মনেই চাপা দিয়া রাখিবে, কখনও তাহা মুখে আনিবে না ও স্বামীকে ফরমায়েশ করিবে না বা সে জন্য মুখ ভার বা মন ভারও করিবে না। নিজেই মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, যদি আমি স্বামীকে বলি, তবে তিনি মনে করিবেন যে, দেখ সে আমার দিকে একটুও চায় না, আমার যে এত কষ্ট তা সে একটুও বুঝে না। ইহাতে মনে মিল থাকিতে পারে না, স্বামীর মনে আঘাত লাগিতে পারে অথচ স্বামীর মনের কিঞ্চিৎ আঘাতও সাধ্বী-পত্নীর জন্য অতি অধিক। এই জন্যই জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন, স্বামী ধনী হইলেও নিজে কোন কিছুর জন্য ফরমায়েশ দেওয়া চাই না, কারণ তাহাতে স্বামীর চোখে একটু পাতলা হইতে হয়। অবশ্য স্বামী যদি নিজ খুশীতে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমার মনে কি চায় একটু বল, তবে নিজের মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় কোন দোষ নাই, কিন্তু তাহাও চাপিয়া চাপিয়া চতুর্দিকে খেয়াল রাখিয়া বলা উচিত। তাহা হইলে স্বামী তোমাকে আপন দরদী মনে করিবে; নতুবা তাহার নজরে তোমার সম্মান ও পজিশন কমিয়া যাইবে। (৪) নিজের কথার উপর কখনও জেদ করিবে না। যদি কোন কথা তোমার মতের বিরুদ্ধেও স্বামী বলেন, তবুও তখন তাহার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিবে। পরে হয়ত সুযোগ মত ঠাণ্ডা সময়ে বুঝাইয়া দিবে বা বুঝিয়া নিবে।

স্বামীর সংসারে খাওয়া পরার কিছু কষ্ট হইলে (বা বাড়ী-ঘর জিনিস, কাপড়, ছুরত, চেহারা মন মত না হইলে তাহাতে কখনও মন কালা বা চেহারা মলিন করিবে না,) মুখে কখনও কিছু বলিবে না; বরং হাসি মুখে ও প্রফুল্লচিত্তে কালাতিপাত করিবে যেন স্বামীর মনে কষ্ট না হয়। তুমি যদি সন্তোষ ভাব প্রকাশ কর, তবে স্বামীর মন তোমার অধিকারে আসিয়া যাইবে।

স্বামী যদি তোমার জন্য কোন জিনিস আনেন এবং তাহা যদি তোমার মনমত না হয়, তবুও খুশীর সঙ্গে তাহাই হাসি মুখে প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করিয়া লইও। জিনিস যে তোমার পছন্দ হয় নাই, তাহা ভাষায় বা ভাবে আদৌ কোনরূপ প্রকাশ পাইতে দিও না। কেননা, তাহাতে স্বামীর মন ছোট হইয়া যাইবে এবং আগামীতে কোন জিনিস আনিতে তাহার মন চলিবে না। পক্ষান্তরে যদি তুমি খুশীভাব দেখাও, তবে তাহার মন সন্তুষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে আরও ভাল ভাল জিনিস আনিবার জন্য

তাহার মনে আগ্রহ্ জাগিবে। ফলকথা, মনে রাখিবে শোকরে নেয়ামত বাড়ে, না-শোকরীতে এবং শেকায়েতে নেয়ামত পাওয়া ত যায়ই না, তাছাড়া মনেও আঘাত লাগে। ক্রোধ-রিপুর বশীভূত হইয়া কখনও স্বামীর বাড়ীর বা শ্বশুর, শাশুড়ীর নিন্দাবাদ প্রকাশ করিবে না, কখনও না-শোকরী করিবে না। হাদীস শরীফে আছেঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমি দোযখের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী দেখিয়াছি। লোকেরা আরয করিল, দোযখে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণ কি? হযরত (দঃ) বলিলেনঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রধান দুইটি দোষ আছে, সেই দুইটির কারণেই তাহারা অধিকাংশ দোযখী হইবে। একটি দোষ এই যে, তাহারা সামান্য সামান্য কারণে গালি, বদ-দো'আ এবং অভিশাপ দিতে থাকে। দ্বিতীয় দোষ এই যে, তাহারা পরের বাড়ীর অর্থাৎ স্বামীর বাড়ীর শেকায়েত ও না-শোকরী বহুত করে। চিন্তা করিয়া বুঝা দরকার যে, না-শোকরী করা বড় গোনাহ্ এবং গালি দেওয়া, লা'নত করা, অভিশাপ দেওয়া, বদ-দো'আ দেওয়া কত বড় গোনাহ্! এইসব গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা একান্ত দরকার।

স্বামী যদি রাগান্বিত হয়, তবে তুমি এমন কোন কথা বলিবে না এমন কোন ব্যবহার করিবে না যাহাতে তাহার রাগ আরও বৃদ্ধি পায়; বরং এমন ব্যবহার করিবে যাহাতে তাহার রাগ থামিয়া যায়। সব সময় মাথা খাটাইয়া মেযাজ বুঝিয়া কথা বলিবে। যদি বুঝ যে, এখন হাসি চাতুরীতে সন্তুষ্ট হইবে, তবে হাসি চাতুরীর কথা বলিতে দোষ নাই। আর যদি দেখ যে, এখন হাসি চাতুরী ভালবাসিবে না, তবে তখন কিছুতেই হাসি চাতুরীর কথা বলিবে না। ফলকথা এই যে, মেযাজ বুঝিয়া চলা দরকার। স্বামী যদি কোন সময় গোস্বা করিয়া কথা না বলে, তবে তখন তুমিও মুখ ফুলাইয়া বসিয়া থাকিবে না; বরং খোশামোদ তোষামোদ করিয়া কাকুতি নিমতি করিয়া হাত জুড়িয়া পা ধরিয়া অপরাধ না হইলেও অপরাধ স্বীকার করিয়া স্বামীর অন্যায় হইলেও তুমি তোমার নিজের অন্যায় স্বীকার করিয়া মাফ চাহিবে এবং যে প্রকারেই হউক না কেন স্বামীর মন সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিবে। কখনও তুমি গোস্বা করিবে না বা বেজার হইয়া বসিয়া থাকিবে না; বরং স্বামীর হাত পা ধরিয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাহাকেই প্রকৃত সম্মান মনে করিবে।

নিশ্চয় জানিও, স্বামীর সহিত আপনাআপনি প্রণয় ও মহব্বত হয় না প্রাণপণে স্বামীর খেদমত করিতে হয়, অন্তঃকরণের সহিত স্বামীকে ভক্তি করিতে হয়, প্রাণে সব সময় স্বামীর ভয় ও আদব রাখিতে হয়। নির্বোধ মেয়েলোক বড় বংশের বা রূপের বা আধুনিক কুশিক্ষার গৌরব করিয়া হয়ত স্বামীকে হেয় বা নিজকে স্বামীর সমান সমান বলিয়া মনে করিয়া বসে। নিশ্চয় জানিও, ইহা অতি বড় বে-আদবী। স্বামী হয়ত ভদ্রতা, নম্রতা বা প্রেম পরবশ হইয়া তোমার কোন খেদমত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু খবরদার! তুমি যদি মানুষ হও, তোমার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও মনুষ্যত্ব থাকে, তবে কস্মিনকালেও স্বামীর কোন খেদমত লইবে না। মনে কর কোন পিতা যদি ছেলের পা বা শরীর টিপিতে বা পাখা করিতে বা জুতা বাড়াইয়া দিতে থাকে, তখন ছেলে যদি মানুষ হয়, তবে কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে? নিশ্চয়ই না। ছেলের তুলনায় বাপ যত বড় পদের, স্ত্রীর তুলনায় স্বামী তাহা অপেক্ষা অনেক বড় পদের। কাজেই স্বামীর খেদমত স্ত্রী কিরূপে লইতে পারিবে? অতএব, কথাবার্তা, চলা-ফেরা, খাওয়া-বসা সব কাজেই স্বামীর আদব রক্ষা করিয়া চলা স্ত্রীর পক্ষে একান্ত কর্তব্য। যদিও স্বামী হাসি-ঠাট্টা করিবে, কিন্তু তবুও স্ত্রীর সে হাসি-ঠাট্টাতে ভুলিয়া স্বামীর মর্তবার কথা এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে যদি স্বামীরই অন্যায় হয়, তবে ত তাহাও ধরা চাই না। নিজেরই অন্যায় না

হইলেও অন্যায় স্বীকার করা উচিত, কারণ ইহাতে স্বামীর মন সন্তুষ্ট হইবে। বিশেষতঃ যদি নিজেরই অন্যায় হয়, তবে ত কিছুতেই রাগ গোস্বা করিবে না, তৎক্ষণাৎ ত্রুটি স্বীকার করিয়া মাফ চাহিয়া লওয়া উচিত। অন্যথায় একবার স্বামীর মন ভাঙ্গিয়া গেলে সেই ভাঙ্গা মনকে জোড়া লাগান অনেক কষ্ট।

স্বামী যখন বিদেশ হইতে বা বাহির হইতে বাড়িতে আসেন, তখন অন্য সব কাজ পরিত্যাগ করিয়া আগে আসিয়া স্বামীর সামনে উপস্থিত হওয়া উচিত এবং উপস্থিত হইয়া যাহাতে তাহার ক্লান্তি, শ্রান্তি এবং কষ্ট দূর হয় সেইরূপ কথা বলিবে এবং সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করিবে, আর প্রাণপণে খেদমতে লাগিয়া যাইবে। কখনও নিজের গরজের কথা বা শাশুড়ী-ননদের ঝগড়ার কথা বলিবে না। কোথায় কি খাইয়াছেন? কোথাও কোন কষ্ট পাইয়াছেন না কি? এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিবে। পানির দরকার হইলে পানি আনিয়া দিবে। ক্ষুধা থাকিলে জলদী খাবার যোগাড় করিয়া দিবে। গরমের দিন হইলে পাখা করিবে, হাত-পা টিপিয়া দিবে, ওযূর পানি, জুতা, খড়ম আনিয়া দিবে, কোন কাজ আছে নাকি জিজ্ঞাসা করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার জন্য কি আনিয়াছেন? টাকার থলি কোথায়? বাক্সের মধ্যে কি? ইত্যাদি বিরক্তিজনক কথা কিছুতেই বলিবে না। তিনি কিছু আনিয়া থাকিলে নিজেই যখন দিবেন, তখন যা দেয় তাহাই সন্তুষ্ট চিত্তে হাসিমুখে গ্রহণ করিবে, কোনরূপ অসন্তুষ্টি বা বিরক্তি প্রকাশ করিবে না। অবশ্য যদি কোন কিছুর দরকার থাকে বা স্বামীর অবহেলা অমিতব্যয়িতা, অপরিণামদর্শিতা বা অকর্মন্যতা সম্বন্ধে কিছু বুঝ দিতে হয়, তবে অন্য সময় মেযাজ যখন ঠাণ্ডা হয়, তখন ধীর ও নম্রভাবে বুঝাইয়া বলিবে।

স্বামীর মা-বাপ অর্থাৎ তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন তাঁহাদের খেদমত করিয়া তাঁহাদের মন সন্তুষ্ট রাখাকে তোমার বড় ফরয মনে করিবে। এমন কি, স্বামী টাকা-পয়সা রোযগার করিয়া আনিয়া যদি তোমার কাছে না দিয়া তাহাদের কাছে দেন তাহাতে তুমি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইবে না বা হাবভাবেও কোন বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিবে না; বরং তোমার কাছে দিলেও তোমার বলা উচিত যে, আম্মা মুরুব্বি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে দেন কেন? আম্মার হাতে দেওয়াই ভাল। শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করাতে কোন অপমান বা গৌরবের হানি মনে করিবে না; বরং ইহাতেই প্রকৃত সম্মান এবং সমাদর পাওয়া যাইবে মনে রাখিবে। শাশুড়ী, ননদ হইতে পৃথক হইয়া জীবন যাপন করার কথা কখনও উত্থাপন করিবে না। যদি কোন সময় মনে সেরূপ ভাবনা আসেও, তবে তাহাকে শয়তানের অছঅছা মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিবে। এরূপ খেয়ালকে মনের কোণেও জায়গা দিবে না। শাশুড়ী-ননদের সহিত খুব ভাল ব্যবহার করিবে। বিশেষতঃ ননদের কারণেই সাধারণতঃ শাশুড়ীর মন খারাপ হয়, তারপর নানা কথা কয়। শাশুড়ী, ননদের কোন ব্যবহারে বা কথায় যদি মনে কিছু ব্যথা লাগে, তবে নীরবে তাহা সহ্য করিবে, সে সব কথা আবার মা-বাপের কাছে গিয়া কখনও বলিবে না। কারণ এইরূপ কূটনামিতে লাভ কিছু নাই, শুধু ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং জিন্দিগী বিষময় হইয়া উঠে। তুমি নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার শাশুড়ী আম্মা কত কষ্ট করিয়া তোমার স্বামীকে লালন-পালন করিয়াছেন এবং কত আগ্রহ করিয়াছেন যে, বৌকে দেখিবেন এবং বুড়াকালে বৌ-এর কিছু খেদমত পাইবেন আশা করিয়া ছেলেকে বিবাহ করাইয়াছেন। এখন সে ছেলে যদি ভিন্ন হইয়া যায়, তবে তাতে তাঁহার মনে কত কষ্ট হয় এবং সেই কষ্টের রাগটা গিয়া পড়ে তোমার উপর যে, এমন বৌ আনিয়াছি যে, সে দুই দিনেই আমার সোজা ছেলেকে নিজের

বশ করিয়া লইয়াছে, আমার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। খবরদার! এইরূপ কথা যেন মনে কখনও না হয়, এমন দোষে এবং এমন অভিশাপে যেন তুমি কখনও না পড়। বাড়ীর যাল, ননদ, দেওর, ভাসুরের ছেলেমেয়ে, ননদের ছেলেমেয়ে সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে। কাহাকেও মন্দ জানিবে না বা কাহারও প্রতি হিংসাভাব পোষণ করিবে না। শুরু হইতেই আদব-লেহাযের এবং ছবর বরদাস্তের আচার ব্যবহার করিবে। যাহারা বড় তাহাদের সম্মান করিবে এবং যাহারা ছোট তাহাদের স্নেহ করিবে। নিজের হিস্বামত কাজকর্ম রীতিমত করিবে। নিজের কাজ তো কখনও অন্যের ঘাড়ে ফেলিবেই না; বরং অন্যের কাজও কিছু তুমি করিয়া দিবে এবং অন্যের কাজে কিছু ত্রুটি দেখিলে তাহার শেকায়াত করিবে না বা তাহাতে মনে কষ্ট আনিবে না। এইরূপ ব্যবহার যদি তুমি কর তাহা হইলে দেখিবে যে, সকলেই তোমাকে ভালবাসিতেছে এবং সমাদর করিতেছে। দুনিয়াতেও ভাল থাকিবে এবং আখেরাতেও ভাল থাকিবে। নতুবা প্রতিযোগিতা করিলে বা বুদ্ধি চালাইলেই অথবা শুধু নিজের স্বার্থ টানিলে বা নিজের গৌরব দেখাইলে কেহই ভালবাসিবে না। শাশুড়ী, ননদেরা বা যালেরা যে কাজ করে, সে কাজ করিতে তুমি কখনও লজ্জা বা অপমান বোধ করিও না; বরং তাহাদের হাতের কাজ তুমিও করিয়া দিবে। এইরূপ করিলে তাহাদের মন অধিকার করিয়া লইতে পারিবে।

দুইজনকে চুপিচুপি কিছু কথাবার্তা বলিতে দেখিলে তুমি সেখান হইতে সরিয়া যাও, পাছে কান লাগাইয়া তাহাদের কথা শুনিও না বা এইরূপ মনে কু-ধারণা আনিও না যে, তাহারা বুঝি তোমারই সম্বন্ধে কিছু বলাবলি করিতেছে। এইরূপ বদ-খেয়ালীতেই যত মন ভাঙ্গাভাঙ্গি এবং শত্রুতার সৃষ্টি হয়, কাজেই বদ-খেয়ালী হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

অনেক নির্বোধ মেয়ে এরূপ আছে যে, শ্বশুরালয়ে গিয়া তাহারা সব সময় উদাসীন গমগীন হইয়া বসিয়া থাকে, দুই দিন না যাইতেই বাপের বাড়ী যাইবার জন্য কান্নাকাটা বা মাতলামি শুরু করিয়া দেয়। এইরূপ করা কিছুতেই উচিত নয়। ইহাতে লোকে পাতলা এবং নির্বোধ বলিয়া মনে করে। বেশী কথা বলিবে না (বা বেশী হাসিবে না, কারণ ইহাতে লোকে বে-হায়া বা নির্বোধ বলিয়া মনে করে) বা ইহাও করিবে না যে, একেবারে কথা বন্ধ করিয়া বার বার জিজ্ঞাসা এবং খোশামোদ করা সত্ত্বেও উত্তর নাই। ইহাতেও লোকে ভালবাসে না, লোকে মনে করে, আমাদিগকে বুঝি হেয় মনে করে (বা আকল-বুদ্ধি নাই)।

শ্বশুরালয়ে কোন বিষয়ে কোন কষ্ট হইলে তাহা কখনও মা-বাপের বাড়ীতে কাহারও নিকট বলিবে না। মা-বোনেরা বারবার জিজ্ঞাসা করিবে বটে, কিন্তু তুমি ভাল ছাড়া মন্দ আদৌ প্রকাশ করিবে না। মা-বাপেরও উচিত, মেয়ে যদি স্বামীর বাড়ীর কোন কথা আসিয়া বলে, খবরদার! তাহাতে যেন তাঁহারা কর্ণপাত না করেন। শেকায়েত অভ্যাসটাই ভাল নহে। শোকরে নেয়ামত বাড়ে; আর শেকায়েতে অশান্তি বাড়ে।

স্বামীর মাল-পত্র, কাপড়-চোপড় খুব যত্ন করিয়া হেফাযত করিয়া রাখিবে। সব জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং যে জিনিসের যে স্থান সেইখানে সে জিনিস সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিবে। জমাইয়া বা ছড়াইয়া রাখিবে না। কাপড়-চোপড় সুন্দররূপে ভাঁজ করিয়া রাখিবে; মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিবে। বিশেষতঃ পশমী কাপড় অবশ্য রৌদ্রে দিবে। ভাদ্র মাসে অবশ্য সব কাপড়ই রৌদ্রে দিবে। বাড়ী-ঘর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। লেপার দরকার হইলে লেপিবে। ঝাড়ু দেওয়ার দরকার হইলে ঝাড়ু দিবে। কালির ঝুল ঘরে পড়িতে দিবে না। স্বামীর কাপড় একটু

ময়লা দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বলিয়া কাপড় লইয়া গিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। বিছানা, বালিশের গেলাফ, লেপের খোল যদি ময়লা হয় তৎক্ষণাৎ ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। যদি না থাকে, তবে সেলাই করিয়া লইবে, যদি কিছু ছেঁড়া থাকে তবে রিফু করিয়া দিবে বা তালি লাগাইয়া দিবে, স্বামীর বলার অপেক্ষা করিও না, বলার আগেই কাজ করিয়া ফেলিও। কারণ বলার আগে করিতে পারিলে সেইটাই তারীফের বিষয় নতুবা বলার দরকার পড়িলে এবং বলার পর করিলে সেটা বেশী তা'রীফের বিষয় নহে।

কখনও কোন কাজ-কর্মে চোরামী বা আলসেমী করিও না, আপন কর্তব্য মনে করিয়া সব কাজ সময়মত কাহারও বলার আগেই করিয়া ফেলিও। কখনও মিথ্যা কথা বলিও না। কারণ মিথ্যা কথা বলায় গোনাহ্ ত আছেই, তাছাড়া লোকের কাছেও অপমানিত হইতে হয়। খাওয়ার লোভ সামলাইয়া চলিও, সবাইকে খাওয়াইয়া তারপর নিজে খাইও। সব সময় পাক-ছাফ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিও, জিনিস-পত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিও। কাহারও সহিত ঝগড়া-কলহ বা উচ্চবাচ্য করিও না। বিশেষতঃ কোন মুরুব্বি রাগ করিয়া যদি কোন কথা বলেন, তবে খবরদার! সে কথায় উত্তর দিও না, চুপ করিয়া মুখ বুঝিয়া থাকিও। মনে করিও না যে, সমানে সমানে উত্তর না দিলে বুঝি তোমার হার হইয়া গেল, এ কথা ভুল। চুপ করিয়া থাকিলেই দেখিবে যে, পরিণামে তোমার জিত হইবে, সকলে তোমাকে ভাল বলিবে।

স্বামীর যদি কোন স্বভাব মন্দ থাকে সেজন্য স্বামীর খেদমতের ত্রুটিও করিও না, বা স্বামীর সহিত পাল্লা দিয়া চলিও না, বা রাগ করিয়া তাহাকে সোজা করিতে চাহিও না। কারণ, পুরুষের মেযাজ বাঘের মতই হয়। যাঘ রাগ করিলে তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না, ফাঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলে। আর যদি কেহ বাঘের কাছে নম্রতা স্বীকার করে, তবে বাঘ তাকে কিছুই করে না। ঠিক এরূপ, স্বামীকে বাধ্য করিতে চাহিলে বা তাঁহার কোন কু-অভ্যাস বদলাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহার নিকট খুব নত হইয়া চলিবে। তিনি যা বলেন, গোনাহ্র কাজ না হইলে তাই শুনিবে। কখনও তাঁহার কথার বা মেযাজের খেলাফ কোন কাজ করিবে না। কাহারও নিকট তাঁহার গীবৎ-শেকায়েত করিবে না। এই উপায়ে দেখিবে যে, ক্রমান্বয়ে স্বামী তোমার বশ হইয়া যাইবে, যদি বশ নাও হয়, তবুও অন্ততঃ আখেরাতেও তুমি তোমার ছবরের ফল পাইবে। আর যদি ইহার বিপরীত কর, তবে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় কূলের অশান্তি ভোগ করিতে হইবে। হাঁ, নম্রভাবে গোপনে কোন বিষয় বুঝ দিতে পারিলে সে ভাল কথা; কিন্তু খবরদার! এমন কোন কথা বলিবে না যাহাতে স্বামীর মন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

সন্তান পালনের নিয়ম

ছোট বেলার আদত-আখলাকই সারা জীবন বাকী থাকে। এই জন্যই বাল্যকাল হইতে যৌবন পর্যন্ত যে স্বভাবগুলি শিক্ষা দেওয়ার এবং অভ্যাসে পরিণত করার দরকার তাহার কিছু আমরা এখানে লিখিয়া দিতেছি যাহাতে মাতাগণ উত্তম ছেলেমেয়ে গঠন করিতে সমর্থ হন।

১। নেকবখ্ত ও দ্বীনদার মেয়ে লোকের দুধ পান করান উচিত। কেননা দুধের আছর চরিত্রের উপর অনেক বেশী পড়ে।

২। মেয়েলোকেরা সাধারণতঃ ছেলে-মেয়েকে সিপাহীর বা ভয়াল জিনিসের ভয় দেখাইয়া থাকে, এরূপ করিবে না। ইহাতে ছেলে-মেয়ের দেল কমজোর হইয়া যায়, কাপুরুষ হইয়া যায়।

৩। ছেলে-মেয়েদের দুধ পান করার ও খাওয়ার সময় নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া উচিত যেন সুস্থ থাকে।

৪। ছেলে-মেয়েকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

৫। ছেলে-মেয়েকে বেশী সাজাইয়া গুজাইয়া রাখিও না।

৬। ছেলেদের মাথার চুল বেশী লম্বা হইতে দিবে না।

৭। মেয়েরা যে পর্যন্ত পর্দায় থাকিতে অভ্যস্ত না হয়, সে পর্যন্ত তাহাদের অলংকার পরাইও না। কারণ, একে ত এতে জান-মালের উপর আশঙ্কা আছে, তাছাড়া ছোট বেলা হইতে জেওরের প্রতি আকর্ষণ হওয়া ভাল নহে।

৮। ছেলে-মেয়েদের হাতে দিয়া গরীবদের দান করার এবং ভাই-বোনদের এবং অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মধ্যে খাবার জিনিস ভাগ করার অভ্যাস করাইবে। কারণ, ইহাতে ছাখাওতির অভ্যাস বাড়িবে, লোভের অভ্যাস কমিবে। অবশ্য শরীঅত মতে ছেলেরা যেসব বস্তুর মালিক তাহা কাহাকেও দিতে বলা জায়েয নাই। তোমাদের নিজস্ব বস্তু তাহাদের দ্বারা দান করাইবে।

৯। যাহারা বেশী খায় ছেলে-মেয়েদের সামনে তাহাদের দুর্নাম করিবে। কিন্তু কাহারও নাম লইয়া বয়ান করিবে না। এইরূপ বলিবে, যাহারা বেশী খায়, লোকে তাহাদের ঘৃণা করে ইত্যাদি। (ইহাতে ছেলে-মেয়েদের কম খাওয়ার অভ্যাস হইবে।)

১০। ছেলেদের সাদা কাপড়ের অভ্যাস করাইবে এবং রঙ্গীন কাপড়ের নিন্দা করিবে যে, ইহা মেয়েদের পোশাক। তুমি ত পুরুষ তোমার এসব সাজে না।

১১। মেয়েদের সব সময় বা প্রতিদিনই সীতাপাটি এবং বিলাসিতার অভ্যাস করাইবে না। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে, সীমার ভিতরেই সে জিনিস ভাল, সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে সব জিনিসই খারাপ।

১২। ছেলে-মেয়েদের জেদ সব পুরা করিবে না। কারণ, ইহাতে স্বভাব খারাপ হয়। (হট এবং জেদ করার কু-অভ্যাস হয়।)

১৩। ছেলে-মেয়েদের চীৎকার করিয়া কথা বলিতে দিবে না; বিশেষতঃ মেয়েদের ত খুবই তাকীদ করিবে; নতুবা বড় হইয়াও ঐ কু-অভ্যাস থাকিয়া যাইবে।

১৪। যে সব ছেলেদের স্বভাব খারাপ বা লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয় না; (মুরুব্বির আদব রক্ষা করিয়া চলে না; গালাগালি করে বা) সুন্দর সুন্দর কাপড় পরে বা ভাল ভাল খাবার খায়, এরূপ ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই ছেলে-মেয়েদের মিশিতে দিবে না।

১৫। রাগ, মিথ্যা কথা, হিংসা, চুরি, চুগলি, খামাখা নিজের কথার উপর জেদ করা, বেহুদা কথা বলা, খামাখা হাসা বা বেশী হাসা, কাউকে ধোঁকা দেওয়া, ভাল-মন্দ আদব-তমীয বিবেচনা না করিয়া কথা বলা ইত্যাদি দোষগুলির প্রতি ছেলে-মেয়েদের যাহাতে আন্তরিক ঘৃণা জন্মে সেইরূপ উপদেশ দিবে (এবং ঘটনা শুনাইয়া ভাল স্বভাব এবং মন্দ স্বভাবের ছবি তাহাদের হৃদয় পটে আঁকিয়া দিবে।) যখনই কোন একটি দোষ দেখিবে তখনই তাম্বীহ্‌ করিবে এবং বুঝাইয়া উপদেশ দিবে।

১৬। ছেলে-মেয়েরা অসাবধানতাবশতঃ যদি কোন জিনিস ভাঙ্গিয়া ফেলে বা নষ্ট করিয়া ফেলে বা কোন ছেলে-মেয়েকে যদি দুষ্টামি করিয়া মারে বা গালি দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার

শাস্তির ব্যবস্থা করিবে যেন আগামীতে এরূপ কাজ আর না করে; নতুবা এইসব ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিলে ছেলে-মেয়ের স্বভাব চিরতরে খারাপ হইয়া যাইবে।

১৭। ছেলে-মেয়েদের অসময় ঘুমাইতে দিবে না, (সময় মত ঘুমাইতে দিবে এবং সময় মত উঠাইবে।)

১৮। ছেলে-মেয়েদের ঘুম হইতে ভোর সকালে উঠার অভ্যাস করাইবে, (ঘুম হইতে উঠিয়া মুরুব্বিগণকে দেখিলেই নম্রভাবে সালাম করিতে অভ্যাস করাইবে।)

১৯। সাত বৎসর বয়স হইলে নামায পড়ার অভ্যাস করাইবে।

২০। মক্তবে যাওয়ার বয়স হইলে সর্বপ্রথমে কোরআন শরীফ পড়াইবে। (খুব ছোট থাকিতে অনেক পড়ার বোঝা চাপাইয়া দিবে না। ইহাতে যেহেন এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। যেমন বয়স তেমন চাপ দিবে। কিছু দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলা আমোদ-স্ফূর্তিও করিতে দিবে। কিন্তু কুসংসর্গে যাইতে দিবে না।)

২১। ছোট বেলার শিক্ষা যাহাতে দ্বীনদার পরহেযগার ওস্তাদের কাছে হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

২২। মক্তবে যাইতে না চাহিলে কখনও প্রশ্রয় বা ঢিল দিবে না। যে প্রকারেই হউক নিয়মিতরূপে মক্তবে যাওয়ার অভ্যাস করাইবে।

২৩। ছেলে-মেয়েদের মাঝে মাঝে আউলিয়াগণের এবং পয়গম্বরদের কেচ্ছা শুনাইবে।

২৪। ছেলে-মেয়েদের নাটক নভেল, বা আশেক-মাশুকের কেচ্ছা পড়িতে দিবে না (এবং বায়স্কোপ থিয়েটার ও অন্যান্য খেলাফে শরা সভা-সমিতিতে যাইতে দিবে না এবং জীব জন্তুর ফটো বিশেষতঃ উলঙ্গ ছবি কিছুতেই দেখিতে দিবে না।)

২৫। ছেলে-মেয়েদের এরূপ বিষয় পড়িতে দিবে, যাহাতে ধর্মজ্ঞান ও নৈতিক উপদেশ লাভ হয় এবং দুনিয়ারও আবশ্যকীয় জ্ঞান লাভ হয়।

২৬। ছেলে মক্তব হইতে আসিলে কিছুক্ষণ তাহাকে খেলিবার সময় দিবে (সব সময় পড়াতে লাগাইয়া রাখিবে না। ইহাতে যেহেন কমজোর হইয়া যায়।) কিন্তু এমন খেলা খেলিবে যাহাতে গোনাহ্ না হয়, হাত পা ভাঙ্গিবার আশঙ্কা না থাকে (এবং খারাপ বালকদের সঙ্গে না মিশে)।)

২৭। কোনরূপ বাঁশী, বাদ্য বা আতশবাজি কিনিবার জন্য ছেলেদের পয়সা দিবে না।

২৮। ছেলে-মেয়েদের (বায়স্কোপ, যাত্রা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদির) খেল-তামাশা দেখিতে দিবে না।

২৯। ছেলে-মেয়েদের এমন কোন হাতের কাজ অবশ্য শিক্ষা দিবে, যাহা দ্বারা দরকার পড়িলে হালাল রুজি কামাই করিয়া নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিতে পারে।

৩০। (মেয়েদের দুনিয়ার বিদ্যা বা লেখা বেশী শিখাইবে না, যাহাতে চরিত্রের উন্নতি হয় এমন বিদ্যা শিক্ষা দিবে।) লেখা এত পরিমাণ শিখাইবে যাহাতে আবশ্যকীয় হিসাব এবং আবশ্যকীয় চিঠি-পত্র লিখিতে পারে; (হাতের শিল্প কাজ এবং পাকের কাজ বেশী শিক্ষা দিবে)।

৩১। ছেলে-মেয়েদের সব কাজ নিজ হাতে করিবার অভ্যাস করাইবে যাহাতে অকর্মা বা অলস না হইয়া যায়। রাত্রে শুইবার সময় বিছানা নিজ হাতে বিছাইবে। সকালে উঠিয়া নিজ হাতে বিছানা গুটাইয়া রাখিবে। নিজের কাপড়-চোপড়ের হেফাযত নিজেই করিবে। কাপড়ের সেলাই খুলিয়া গেলে বা ছিড়িয়া গেলে নিজ হাতে সেলাই করিয়া লইবে। (যে বাড়ীতে পানি আনার, ধান ভানার অভ্যাস আছে সে বাড়ীতে পানি আনার, ধান ভানার অভ্যাস করাইবে। ভালকথা,

নিজের মালের যত্ন এবং দরদ যাহাতে পয়দা হয় ও সতর্কতা জন্মে তাহার জন্য চেষ্টা করিবে এবং অকর্মন্য, অলস বা অসতর্ক হইতে দিবে না।)

৩২। মেয়েদের গায়ে যে সব জেওর থাকে তাহা ঘুমাইবার পূর্বে এবং ঘুম হইতে উঠিয়া যেন ভাল করিয়া দেখিয়া লয় যে, ঠিক আছে কিনা, ইহার তাকীদ করিবে।

৩৩। ছেলে-মেয়ের দ্বারা যখন কোন ভাল কাজ হয়, তখন তাহাদিগকে খুব সাবাস দিবে এবং পেয়ার করিবে বরং কিছু পুরস্কার দিলে আরও ভাল হয়। কারণ এই উপায়ে তাহাদের ভাল কাজ করার প্রতি আগ্রহ বাড়িবে। যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন সকলের সামনে শরম না দিয়া নির্জনে নিয়া বুঝাইবে যে, দেখ এমন কাজ করিলে সমস্ত লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে, কেহই তোমাকে ভালবাসিবে না, শরীফ লোকেরা এমন কাজ করে না, লোকে বলিবে ছোট লোকের ছেলে, গোনাহ্‌র কাজ করিলে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে ইত্যাদি। নির্জনে বুঝাইবে যাহাতে শরম ভাঙ্গিয়া একেবারে বে-শরম না হইয়া যায়। পুনরায় যদি এরূপ করে, তবে কিছু শাস্তি দিবে।

৩৪। পাক করা, সেলাই করা, চরখা ঘুরান, ফুল বুটা করা, কাপড় রঙ্গান ইত্যাদি যে কাজ বাড়ীতে হয়, মেয়েদের সেই সব খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিতে এবং শিখিতে বলিবে।

৩৫। বাপের ভয় ও হায়বত ছেলে-মেয়েদের দেলে পয়দা করা মার কর্তব্য।

৩৬। ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-লওয়া বা খেলাধুলা কোন কাজই গোপনে করিতে দিবে না। কারণ, তাহারা যে কাজ গোপনে করে, সে কাজ তাহাদের নিকট মন্দ বলিয়া তাহারা গোপনে করে। অতএব, বাস্তবিকই যদি কাজ মন্দ হয়, তবে ত তাহা করিতেই দিবে না। আর যদি বাস্তবিক পক্ষে মন্দ না হয়, তবে সকলের সামনে তাহা করিতে ক্ষতি কি?

৩৭। পরিশ্রমের কোন না কোন কাজ ছেলে-মেয়েদের জন্য নিয়মিতরূপে নির্ধারিত করিয়া দিবে যাহাতে তাহাদের পরিশ্রমের অভ্যাসও থাকে, কর্ম-প্রিয়তা এবং নিয়মানুবর্তিতাও শিখে। যেমন, ছেলেদের জন্য আধ মাইল বা এক মাইল দৌড়ান, মুগুর চালনা (বোঝা উঠান, কোদাল দ্বারা কোপান, নৌকা চালান, সাঁতার কাটা ইত্যাদি এবং মেয়েদের জন্য চরখা কাটা, যাঁতা পিষা, (ধান ভানা) ইত্যাদি, এইসব কাজ করাতে এই উপকারও আছে যে, এইসব কাজকে ঘৃণা করিবে না।

৩৮। ছেলে-মেয়েদের হাঁটার সময় যেন উপরের দিকে চাহিয়া বা (এদিক ওদিক চাহিয়া বা) অতি তাড়াতাড়ি না হাঁটে, ইহার তাকীদ করিবে (এবং খাওয়ার সময়ও যেন এদিক ওদিক না চায়, খাবার দিকে চাহিয়া ধীরভাবে খায় এবং পথের দিকে চাহিয়া ধীরভাবে হাঁটে এই অভ্যাস করাইবে)।

৩৯। ছেলে-মেয়েদের নম্রতা, ভদ্রতা শিক্ষা দিবে, ফখর বা গৌরব করিতে দিবে না এবং নিজের কাপড়, নিজের বাড়ী, নিজের বংশ, নিজের বই-পুস্তক, দোয়াত-কলম ইত্যাদির উপর গৌরব করিতে দেখিলেও নিষেধ করিবে (যে, নিজের তারীফ নিজে করিলে ইহাতে গৌরব প্রকাশ পায়, ইহা দূষণীয়)।

৪০। ছেলে-মেয়েদের মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছা মত (রাখিবার জন্য বা) কোন জিনিস কিনিয়া লইবার জন্য দুই চারিটা পয়সা দিবে; কিন্তু গোপনে কিনিবার অভ্যাস করিতে দিবে না, (যাহা কিনিবে সাক্ষাতে কিনিবে বা বলিয়া কিনিবে।)

৪১। ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-পিয়ার এবং মজলিসে উঠা-বসার আদব কায়দা শিক্ষা দিবে। আমরাও এখানে অল্প কিছু আদব লিখিয়া দিতেছি।

খানাপিনার আদব-কায়দা

খানাপিনার শুরুতে 'বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলিবে, তারপর ডান হাত দিয়া লোকমা ধরিয়া খাইবে এবং (পানির গ্লাস বা চায়ের পেয়ালা ডান হাতে ধরিয়া পান করিবে।) এক বর্তনে কয়েকজন খাইতে বসিলে নিজের সামনে হইতে খাইবে। (এক মজলিসে কয়েকজন খাইতে বসিলে সকলের সামনে যখন ভাত তরকারী পৌঁছিয়া যাইবে, তখন সকলে এক সঙ্গে "বিসমিল্লাহ্" বলিয়া খাওয়া শুরু করিবে।) নিজে একা একা আগে খাওয়া শুরু করিবে না, অন্যের খাওয়ার দিকেও তাকাইবে না। অন্যকে খাইতে দেখিলে সেখানে যাইবে না। কেহ কোন খাওয়ার জিনিস দিলে তাহা লইবে না (অবশ্য মুরুব্বির হুকুম হইলে তখন লইবে।) খুব জলদি খাইবে না (এবং অনেক আস্তেও খাইবে না। ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইবে কিন্তু চিবাইবার সময় যেন চপ্ চপ্ শব্দ না হয়।) এক লোক্মা ভাল মত না গিলিয়া আর এক লোক্মা ধরিবে না তরকারীর দাগ যেন কাপড়ে বা বিছানায় না লাগে এবং হাতেও যেন আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা বেশী না লাগে সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। (মজলিসের আগে খাওয়া হইলে আগে উঠিয়া যাইবে না। এক সঙ্গে উঠিবে বা এজাযত লইয়া উঠিয়া যাইবে। খাওয়ার কোন জিনিস অপছন্দ হইলে তাহা প্রকাশ করিবে না। খাওয়া শেষ হইলে 'আল্‌হামদু লিল্লাহ্' বলিয়া আল্লাহ্‌র শোকর করিবে।)

মজলিসে উঠা-বসার নিয়ম

(মজলিসে গিয়া নম্রভাবে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিয়া সকলকে সালাম করিবে। কোন খাছ মুরুব্বি তথায় থাকিলে তাঁহাকে খাছভাবে সালাম করিবে।) নম্রভাবে কথা বলিবে এবং নম্রভাবে বসিবে। মজলিসের মধ্যে থুথু ফেলিবে না বা নাক ছাফ করিবে না। যদি একান্ত দরকার পড়ে, তবে মজলিস হইতে উঠিয়া গিয়া নাক ঝাড়িয়া আসিবে। মজলিসের মধ্যে যদি হাই বা হাঁচি আসে তবে মুখের উপর হাত বা রুমাল রাখিয়া লইবে (হাইয়্যের মধ্যেও আদৌ আওয়াজ না হওয়া চাই,) হাঁচির মধ্যেও যথাসম্ভব কম আওয়াজ করিবে। কাহাকেও পাছে ফেলিয়া বসিও না বা কাহারও দিকে পা মেলিয়া বসিও না। মুখের নীচে হাত লাগাইয়া বসিও না, মজলিসের মধ্যে আঙ্গুল ফুটাইও না। বার বার কাহারও দিকে তাকাইও না। আদবের সহিত বসিয়া থাকিবে। বেশী কথা বলিও না। কথায় কথায় কছম খাইও না। (নিজের বড়াই দেখাইবার জন্য) নিজে নিজে কথা শুরু করিও না, (অন্যে যখন আদেশ করে তখন শুরু করিও।) অন্যে যখন কথা বলে, তখন তাহার কথা খুব কান লাগাইয়া শুন এবং তাহার কথার মধ্যে কথা বলিও না বা এদিকে-ওদিকে দেখিও না, এরূপ করিলে তাহার অপমান করা হয় এবং মনে কষ্ট পায়। অবশ্য যদি কোন গোনাহ্‌র কথা গীবৎ-শেকায়েত ইত্যাদি হয়, তবে তাহা শুনিবে না, হয় বন্ধ করিয়া দিবে, না হয় নিজে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। মজলিসের মধ্যে বসা অবস্থায় যদি অন্য কেহ তথায় আসে, তবে একটু সরিয়া তাহার জন্য জায়গা করিয়া দিবে। প্রথম সাক্ষাৎ বা মোলাকাতের সময় 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিয়া সালাম করিবে (এবং নম্রভাবে 'মেযাজ-শরীফ' বা ভাল আছেন ত, বলিয়া

কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবে) এবং রোখ্‌ছতের সময় ('আমি এজাযত চাই' বা 'এখন আসি' বলিয়া এজাযত লইয়া) আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিয়া বিদায় হইবে।

॥ কাহার কি হক তাহার বয়ান ॥

মা-বাপের হক

১। মা-বাপ যদি অন্যায়ভাবেও কষ্ট দেয় তবুও মা-বাপকে কষ্ট দিবে না।

২। কথায়, কাজে এবং ব্যবহারে সবক্ষেত্রে মা-বাপের তা'যীম করিবে।

৩। (আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নাফরমানির কথা না হইলে) মোবাহ কাজে মা-বাপের আদেশ অবশ্য পালন করিবে।

৪। মা-বাপ কাফের হইলেও দরকার হইলে তাহাদের ভরণ-পোষণের খেদমত করিবে।

৫। মা-বাপ মারা গেলে আজীবন তাঁহাদের গোনাহ্‌ বখশাইবার জন্য এবং আল্লাহ্‌র রহ্‌মত পাইবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিতে থাকিবে এবং নফল নামায, রোযা, তসবীহ, তাহ্‌লীল ইত্যাদি পড়িয়া এবং দান-খয়রাত করিয়া তাঁহাদিগকে ছওয়াব পৌঁছাইতে থাকিবে।

৬। মা-বাপের প্রিয়জনের সহিত (মা-বাপের খাতিরে) ভাল ব্যবহার করিবে। তাহাদের উপকার করিবে। তাহাদের খাওয়া পরার অভাব হইলে নিজের শক্তি অনুসারে তাহাদের সাহায্য করিবে।

৭। মা-বাপের ঋণ পরিশোধ করিবে এবং জায়েয অছিয়ত পালন করিবে।

৮। মা-বাপের মৃত্যুর পর চীৎকার করিয়া কাঁদিবে না; কারণ ইহাতে তাঁহাদের রূহের কষ্ট হয়।

দাদা, দাদী এবং নানা, নানীর হক মা-বাপেরই তুল্য। এইরূপে খালা এবং মামুর হক মার তুল্য, চাচা এবং ফুফুর হক বাপের তুল্য। হাদীস শরীফের ইশারায় এইরূপই প্রমাণিত হয়।

দুধ-মার হক

দুধ-মার সহিত আদব তা'যীমের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। যদি তাঁহা খাওয়া পরার অভাব হয়, তবে নিজের সাধ্য অনুসারে তাঁহার সাহায্য করিবে।

বিমাতার হক

সতাল মা নিজের জননী মা নন বটে, কিন্তু মার মতই তাঁহার আদব করিতে হইবে এবং যেহেতু তিনি পিতার প্রিয়জনের মধ্যে একজন প্রধান প্রিয়া, কাজেই তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার এবং জানে-মালে তাঁহার খেদমত করিতে হইবে।

ভাই-বোনের হক

হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বড় ভাই পিতৃ-তুল্য। অর্থাৎ, ছোট ভাই বড় ভাইকে পিতার ন্যায় সম্মান করিবে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, বড় ভাই ছোট ভাইকে সন্তানের ন্যায়

স্নেহ করিবে। এইরূপে বড় ভগ্নীকে মার মত সম্মান করিবে এবং ছোট ভগ্নীকে মেয়ের মত আদর করিবে।

অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হক

চাচা, ফুফু, ভাতিজা, ভাতিজী ভাগিনা, ভাগ্নী, মামু, খালা ইত্যাদি যাহাদের সহিত জন্মগত ভাবেই আত্মীয়তা হয়, তাহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে। সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যদি তাহাদের খাওয়া-পরার কষ্ট হয়, তবে সঙ্গতি অনুসারে তাহাদের সাহায্য করিতে হইবে। মাঝে মাঝে তাহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে হইবে। তাহাদের দ্বারা যদি কোন কষ্ট হয়, তবে তাহা সহ্য করিতে হইবে। আত্মীয়তা ছেদন করা যাইবে না।

শ্বশুর, শাশুড়ী, শালা, ভগ্নিপতি, জামাই, বৌ, স্ত্রীর আগের ঘরের সন্তান, স্বামীর অন্য পক্ষের সন্তান ইত্যাদি যাহাদের সহিত বিবাহের কারণে আত্মীয়তা হয়, তাহাদেরও কিছু হক কোরআন শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব, তাহাদের সহিতও সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে বেশী সদ্ব্যবহার করা দরকার। তাহারা কোন কষ্ট দিলে তাহা সহ্য করা দরকার। সাধ্যমত তাহাদের উপকার ও সাহায্য করা দরকার।

সাধারণ মুসলমানের হক

১। কোন মুসলমান কোন অন্যায় করিলে তাহা মাফ করিয়া দিবে। ২। কোন মুসলমানকে কাঁদিতে দেখিলে (বা কষ্টে দেখিলে) তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। ৩। কোন মুসলমানের দোষ অন্বেষণ করিবে না। ৪। কোন মুসলমান কোন ওজর পেশ করিলে বা মাফ চাহিলে তাহা গ্রহণ করিবে। ৫। কোন মুসলমানের কোন কষ্ট দেখিলে বা জানিতে পারিলে, তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। ৬। প্রত্যেক মুসলমানের খায়েরখাহী অর্থাৎ হিতকামনা করিবে। ৭। কোন মুসলমানের ভালবাসাকে উপেক্ষা করিবে না (এবং চিরজীবন তাহা নির্বাহ করিয়া চলিবে।) ৮। মুসলমানদের সহিত অঙ্গীকারের খেয়াল রাখিবে। ৯। কোন মুসলমান পীড়িত হইলে তাহার যত্ন নিবে। ১০। কোন মুসলমান মরিয়া গেলে (তাহার দাফন-কাফনে শরীক হইবে এবং) তাহার জন্য দো'আয়ে মাগফেরাত করিবে। ১১। কোন মুসলমান (ডাকিলে তাহার ডাকে সাড়া দিবে, কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিবে, আর্জু করিয়া, মহব্বত করিয়া) দাওয়াত করিলে তাহা গ্রহণ করিবে। ১২। কোন মুসলমান কোন তোহ্ফা হাদিয়া দিলে তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার মন সন্তুষ্ট করিয়া দিবে। ১৩। কোন মুসলমান সামান্য কোন উপকার করিলেও (তাহা সারা জীবন স্মরণ রাখিবে,) তাহার প্রত্যুপকারের জন্য আজীবন চেষ্টা করিবে। ১৪। কোন মুসলমান সামান্য নেয়ামত দান করিলেও (তাহা অতি বড় মনে করিয়া) তাহার শোকর গুজারী করিবে। ১৫। কোন মুসলমানের কোন কাজে ঠেকা পড়িলে সকলে মিলিয়া সেই কাজ উদ্ধার করিয়া দিবে। ১৬। যে কোন মুসলমানের বিবি বাচ্চার হেফাযত করিবে। ১৭। যে কোন মুসলমানের কাজ করিয়া দিবে (তাহাতে লজ্জাবোধ করিবে না বা বখীলী করিবে না বা পর মনে করিবে না।) ১৮। যে কোন মুসলমান কোন কথা বলিতে চাহিলে (কিছু সময় দিয়া মনোযোগ দিয়া) তাহা শুনিবে। ১৯। কোন মুসলমান কোন সুপারিশ করিলে তাহা যথাসম্ভব গ্রহণ করিবে। ২০। কোন মুসলমান কোন আশা করিয়া আসিলে আশায় তাহাকে নিরাশ বা বঞ্চিত করিবে না। ২১। কোন

মুসলমান হাঁচি দিয়া 'আলহাম্‌দু লিল্লাহ্‌, বলিলে, "ইয়ারহামুকাল্লাহ্‌" বলিয়া তাহাকে আল্লাহ্‌র রহমতের দো'আ দিবে। ২২। কোন মুসলমানের হারান জিনিস পাইলে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবে। ২৩। (কোন মুসলমানকে দেখিলে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিয়া সালাম করিবে এবং) কেহ সালাম করিলে "ওআলাইকুমুস্‌সালাম" বলিয়া তাহার জওয়াব দিবে। ২৪। প্রত্যেক মুসলমানের সহিত নম্রভাবে হাসিমুখে মিষ্টি ভাষায় কথা বলিবে। ২৫। (কোন মুসলমানেরই কোন ক্ষতি বা অপকার করিবে না;) প্রত্যেক মুসলমানেরই উপকার করিবে (এবং করাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে।) ২৬। কোন মুসলমান যদি কোন বিষয়ে ন্যায্য কসম খাইয়া বসে, তবে তাহা পূর্ণ ও রক্ষা করার জন্য সকলে চেষ্টা করিবে। ২৭। কোন মুসলমানের উপর অত্যাচার হইতে দেখিলে তাহার সাহায্য করিবে এবং কোন মুসলমানকে অত্যাচার করিতে দেখিলে তাহাকে বাধা দিবে। ২৮। কোন মুসলমানের সহিত শত্রুতা করিবে না। প্রত্যেক মুসলমানকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ভালবাসিবে। ২৯। কোন মুসলমানকে লজ্জা দিবে না বা অপমান করিবে না। ৩০। নিজে যেইরূপ ব্যবহার পাইতে ভালবাস, প্রত্যেক মুসলমানের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিবে। ৩১। পুরুষের সহিত পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের সহিত স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ হইলে একে অন্যকে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিয়া সালাম করিবে এবং হাতে হাতে ধরিয়া মুছাফাহা করিয়া দেল মিশাইয়া রাখিবে। ৩২। যদি কোন কারণবশতঃ মুসলমানে মুসলমানে কিছু দ্বন্দ্ব-কলহ হইয়া যায়, তবে তিন দিনের বেশী তাহা মনে রাখিবে না, তিন দিনের মধ্যে তাহা আপোষ-মীমাংসা করিয়া ফেলিয়া রীতিমত সালাম কালাম করিবে। ৩৩। কোন মুসলমানের উপর বদগোমানী অর্থাৎ কু-ধারণা পোষণ করিবে না। ৩৪। মুসলমানের সহিত হিংসা-বিদ্বেষ করিবে না এবং কোন মুসলমানের সহিত মনোমালিন্য রাখিবে না। ৩৫। প্রত্যক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানকে সৎ-কাজে আদেশ এবং বদ-কাজ হইতে নিষেধ করিতে থাকিবে। ৩৬। প্রত্যেক মুসলমানই বড়কে আদব এবং ছোটকে স্নেহ করিবে। ৩৭। দুইজন মুসলমানের মধ্যে কোন ঝগড়া-কলহ হইয়া পড়িলে প্রত্যেক মুসলমানের তাহা মিটাইয়া দেওয়া ওয়াজেব। ৩৮। কোন মুসলমানেরই অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা বা গীবত করিবে না। ৩৯। কোন মুসলমানেরই কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি বা সম্মানের লাঘবজনক কোন কাজ করিবে না। ৪০। (মজলিসের মধ্যে) কোন মুসলমানকে তাহার জায়গা হইতে উঠাইয়া দিয়া তাহার জায়গায় বসিবে না।

প্রতিবেশীর হক

১। প্রতিবেশীর উপকার করিবে। প্রতিবেশীর সহিত অসদ্ব্যবহার করিবে না। (প্রতিবেশীর দ্বারা বা তাহার গরু-বাছুর ছাগল মুরগী বা ছেলে-মেয়ের দ্বারা যদি কিছু নষ্ট বা ক্ষতি হয়, তবে সে কারণে তাহার সহিত ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারি করিবে না, ছবর করিবে।)

২। প্রতিবেশীর বিবি-বাচ্চার, (গরু-বাছুর) ইত্যাদির হেফাযত করিবে। (তাহার অনুপস্থিতিতে বা তাহার অপারগ অবস্থায় লাকড়ি, পানি, বাজার সদায় ইত্যাদি কাজে তাহার সহায়তা করিবে। প্রতিবেশী গরীব হইলে তাহাকে বা তাহার ছেলে-মেয়েদের দেখাইয়া তাহাদের না দিয়া তুমি ভাল ভাল জিনিস খাইবে না বা ব্যবহার করিবে না।)

৩। মাঝে মাঝে প্রতিবেশীর বাড়ীতে তোহ্‌ফা হাদিয়া পাঠাইবে; তোমার ঘরে যাহাকিছু খাবার তৈয়ার হয়, তাহা হইতে কিছু তাহাদের দিবে। বিশেষতঃ প্রতিবেশী যদি গরীব হয় এবং খাওয়া পরার কষ্ট থাকে, তবে অবশ্য তাহাকে খাবার দিয়া তাহার সাহায্য করিবে।

৪। প্রতিবেশীকে কিছুতেই কোনরূপ কষ্ট দিবে না।

জানিয়া রাখিবে, প্রতিবেশী যেরূপ শহরের বা গ্রামের বাড়িতে হয়, তদ্রূপ সফরে এবং বিদেশেও হয়। বাড়ি হইতে যাহার সহিত একত্রে সফরে যায় বা বিদেশে গিয়া এক সঙ্গে সফর করে (বা স্কুলে বা মাদ্রাসায় বা অফিসে থাকে) এই সবই প্রতিবেশী। প্রতিবেশী সম্বন্ধে মোটামুটি এতটুকু খেয়াল রাখা দরকার যে, (নিজের কষ্টের চেয়ে তাহার কষ্টকে বড় মনে করিবে) নিজের আরামের চেয়ে তাহার আরামের জন্য বেশী চেষ্টা করিবে। কোন কোন নির্বোধ লোক গাড়ীর বা জাহাজের সহযাত্রীদের সহিত অনেক নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, ইহা বড়ই জঘন্য।

নিরাশ্রয়ের হক

১। যাহারা এতীম, বিধবা, অন্ধ, চিররোগা, আতুর, কর্মশক্তিহীন, দরিদ্র, ভিক্ষুক, মুসাফের, তাহাদের দয়া করা এবং তাহাদের সাহায্য করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য।

২। টাকা-পয়সা বা খাওয়া-পরার জিনিস দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে।

৩। তাহাদের বাড়ীর কাজ নিজ হাতে করিয়া দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে।

৪। কথার দ্বারা সান্ত্বনা দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে।

৫। এইরূপ হতভাগ্যের আকাঙ্ক্ষা রক্ষা করিয়া তাহাদের আবদার রদ না করিয়া তাহাদের সান্ত্বনা দিবে।

অমুসলমানের হক

১। (হিন্দু-খ্রীষ্টান প্রভৃতি অমুসলমানগণ মুসলমান না হইলেও তাহারা মানুষ। কাজেই মানুষ হওয়ার কারণে তাহাদেরও হক আছে।।) তাহাদের হক এই যে, অন্যায়ভাবে কাহারও জানে কষ্ট দিবে না বা কাহারও মালের কোন ক্ষতি করিবে না।

২। অন্যায়ভাবে কাহাকেও মন্দ বলিবে না বা গালি দিবে না বা কাহারও সহিত খামাখা ঝগড়া করিবে না।

৩। কাহাকেও খাওয়া-পরার অভাবে বা রোগের যন্ত্রণায় কষ্টভোগ করিতে দেখিলে বা বিপদগ্রস্ত দেখিলে বা আগুনে পুড়িতে বা পানিতে ডুবিতে দেখিলে তাহার জান-মাল বাঁচাইয়া দিবে, কষ্ট দূর করিয়া দিবে।

৪। শরীঅতের আইন অনুসারে কেহ শাস্তির উপযুক্ত হইলে ন্যায্য বিচার এবং ন্যায্য শাস্তি দিবে, অন্যায়ভাবে বিচার করিবে না বা শাস্তি দিবে না।

পশুপক্ষী, জীবজন্তু ইত্যাদির হক

১। (পশুপক্ষী, জীবজন্তু ইত্যাদি মানুষেরই উপকারার্থে সৃষ্টি করা হইয়াছে; কিন্তু অযথা কাহাকেও কষ্ট দেওয়ার কাহারও অধিকার নাই। কাজেই,) যে-সব পক্ষী বা পশুর দ্বারা মানুষের

কোন কাজ হয় না, উহাদের অনর্থক আবদ্ধ করিয়া রাখা চাই না। বিশেষতঃ বাসা হইতে শাবকদের নিয়া আসা এবং উহাদের মা-বাপকে এইরূপে কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা।

২। যে-সমস্ত পশু বা পক্ষী খাওয়ার উপযুক্ত নহে তাহাদের শুধু মনের আনন্দের জন্য বধ করিবে না।

৩। গৃহপালিত পশুপক্ষীদের খাওয়া-পিয়া এবং থাকার সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিবে, তাহাদের যাহাতে কষ্ট না হয়, আরামে থাকিতে পারে সে ব্যবস্থা করা দরকার এবং যেসব পশুর দ্বারা কাজ নেওয়া হয় তাহাদের শক্তির চেয়ে অতিরিক্ত কাজ তাহাদের দ্বারা নিবে না এবং নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের প্রহার করিবে না।

৪। যেসমস্ত জানওয়ার খাওয়ার জন্য যবাহ্ করা হয় বা মানুষের কষ্টদায়ক হওয়ার কারণে বধ করিয়া ফেলা হয় তাহাদেরও ধারাল অস্ত্র দ্বারা অতি শীঘ্র কাজ শেষ করিয়া দিবে। ক্ষুধার কষ্ট দিয়া বা ভোঁতা ছুরি দ্বারা কষ্ট দিবে না।

একটি জরুরী বিষয়

যদি কাহারও হক আদায় করার মধ্যে কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে (সে হক কি প্রকার।) যদি পরিশোধ করার উপযুক্ত হক হয় (যেমন কাহারও নিকট হইতে কোন মাল ধার আনিয়া তাহা দেয় নাই বা করয আনিয়া তাহা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে নাই বা বাকী সদায় আনিয়া দোকানদারের পয়সা দেয় নাই বা সুদ ঘুষ খাইয়াছে বা চুরি ডাকাতি করিয়াছে বা আমানত খেয়ানত করিয়াছে, যদি এই প্রকারের হক হয়,) তবে পরিশোধ করিয়া দিবে অথবা মাফ চাহিয়া লইবে। আর যদি পরিশোধ করার উপযুক্ত হক না হয় (যেমন কাহারও গীবত করিয়াছে বা কাহাকেও গালি দিয়াছে বা কাহাকেও অনর্থক মারিয়াছে) তবে শুধু মাফ চাহিয়া লইবে। আর যদি কোন কারণবশতঃ (হয়ত নিজের কাছে টাকা না থাকার দরুন বা হকদারের কোন ঠিকানা না পাওয়ার দরুন) হকদারের দেনা পরিশোধও করিতে পারে না এবং তাহাদের থেকে মাফও লইতে পারে না, তবে জীবন ভরিয়া হামেশা তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আয়ে মাগফেরাত করিতে থাকিবে। হয়ত এইরূপে চিরজীবন কান্না-কাটার ফলে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে রাযী করিয়া তাহাদের থেকে মাফ লইয়া দিতে পারেন। কিন্তু যদি পরে আবার কোন সময় মাফ লওয়ার বা পরিশোধ করার সুযোগ হয়, তবে অবহেলা করিলে চলিবে না, মাফ চাহিয়া লইবে অথবা পরিশোধ করিয়া দিবে। (এইসব হকুকুল এবাদের ব্যাপার বড়ই কঠিন বিষয়। এসম্বন্ধে কিছুতেই অবহেলা করিবে না।)

আর তোমার যেসব হক (পাওনা) অন্যের কাছে রহিয়া গিয়াছে তাহা যদি উসুল হওয়ার আশা থাকে, তবে নরমির সহিত উসুল করিয়া লইবে; আর যদি উসুল হওয়ার আশা না থাকে বা হকই এমন হয় যে, তাহা উসুল হওয়ার উপযুক্ত নহে (যেমন গীবত, গালি ইত্যাদি) তবে যদিও ঐ সব হকের পরিবর্তে কিয়ামতের দিন নেকী পাওয়ার আশা আছে তবুও মাফ করিয়া দেওয়াতে আরও অধিক নেকী পাওয়ার আশা আছে; কাজেই একেবারেই মাফ করিয়া দিলে অধিক নেকী পাওয়ার আশা। তাই একেবারেই মাফ করিয়া দেওয়াই অধিক উত্তম। বিশেষতঃ যদি কেহ মাফ চায় বা খোশামোদ করে, তবে ত অবশ্যই মাফ করিয়া দেওয়া উচিত।

পরিশিষ্ট (জমীমা)

যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম

১৭। মাসআলা ঃ কোন পুরুষ অপর এক স্ত্রীর সহিত যিনা করিল। এখন ঐ স্ত্রীলোকের মা, ঐ স্ত্রীলোকের মেয়ে (বা মেয়ের মেয়ে অর্থাৎ নিম্নদিকে কোন মেয়ের সহিত (ই) ঐ পুরুষের বিবাহ দুরুস্ত হইবে না।

১৮। মাসআলা ঃ কোন স্ত্রীলোক কামভাবের সহিত বদ নিয়্যতে অপর কোন পুরুষের শরীর স্পর্শ করিল। এখন এই স্ত্রীলোকের মা এবং তাহার সন্তানের সহিত ঐ পুরুষের বিবাহ দুরুস্ত হইবে না। এইরূপে যদি কোন পুরুষ কামভাবসহ অপর কোন স্ত্রীলোকের শরীর স্পর্শ করিল, এখন ঐ পুরুষ, তাহার মা এবং সন্তানগণ ঐ স্ত্রীলোকের জন্য হারাম হইয়া যাইবে।

১৯। মাসআলা ঃ রাত্রে নিজের স্ত্রীকে জাগাইবার জন্য উঠিল। কিন্তু ভুলে তাহার কন্যার বা শাশুড়ীর গায়ে হাত এবং নিজ স্ত্রী মনে করিয়া কামভাবের সহিত তাহার গায়ে হাত দিল। এমতাবস্থায় এই পুরুষ তাহার স্ত্রীর জন্য চিরতরে হারাম হইয়া গেল। কোন প্রকারেই তাহাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না। এই পুরুষের তাহার স্ত্রীকে তালাক দিতেই হইবে।

২০। মাসআলা ঃ কোন ছেলে কুমতলবে তাহার বিমাতার শরীরে হাত লাগাইল। এখন ঐ ছেলের পিতার জন্য ঐ স্ত্রীলোক একেবারেই হারাম হইয়া গেল। কোন প্রকারে তাহার জন্য হালাল হইবে না। আর যদি বিমাতাও তাহার বিপুত্রের শরীরে কুমতলবে হাত লাগায়, তবেও ঐ একই হুকুম। অর্থাৎ স্বামীর জন্য একেবারে হারাম হইয়া যাইবে।

২১। মাসআলা ঃ কোন স্ত্রীলোকের স্বামী নাই। কিন্তু বদকারীতে হামল (গর্ভবতী) হইল। এই স্ত্রীলোকের বিবাহ দুরুস্ত আছে। কিন্তু সন্তান প্রসবের পূর্বে স্বামী-সহবাস দুরুস্ত নহে। অবশ্য যে ব্যক্তি যিনা করিয়াছে তাহার সহিত বিবাহ হইলে সহবাস দুরুস্ত হইবে।

জরূরী মাসআলা

তালাক দেওয়া অতি জঘন্য কাজ। একান্ত জরুরতবশতঃ অপারগ অবস্থায় যদি তালাক দিতে হয়, তবে নিম্নোক্ত তরীকা (নিয়ম) অবলম্বন করিবে। তালাকের তিনটি তরীকা আছে। ১। অতি উত্তম, ২। বেদ'আত এবং ৩। হারাম।

১। তালাকে অতি উত্তম তরীকা—স্ত্রী যখন হায়েয হইতে পাক হইবে, তখন (দুই হায়েযের মধ্যবর্তী পাকীর সময়কে ত্বহুর বলে) অর্থাৎ ত্বহুরের সময় এক তালাক দিবে। কিন্তু শর্ত হইল, যে ত্বহুরে তালাক দিবে ঐ পূর্ণ ত্বহুরের মধ্যে তাহার সহিত সহবাস হইতে বিরত থাকিবে। ইদ্দতের সময় কোন তালাক দিবে না; ঐ তালাকের ইদ্দত অতীত হইলে বিবাহ টুটিয়া যাইবে। বেশী তালাকের দরকার নাই। কারণ শরীঅতে একান্ত প্রয়োজনের সময়ে তালাকের অনুমতি আছে। সুতরাং প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক তালাকের কি দরকার থাকিতে পারে?

২। উত্তম তরীকা—স্ত্রী হায়েয হইতে পাক হইলে তিন তুহুরে তিন তালাক দিবে। ঐ সময় ঐ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না।

৩। তালাকের বেদ'আত এবং হারাম তরীকা—ইহা হইল উপরোক্ত তরীকার বিপরীত নিয়মে তালাক দেওয়া। যেমন, এক সঙ্গেই তিন তালাক দেওয়া, অথবা হায়েযের সময় তালাক দেওয়া, বা যে তুহুরে সহবাস করিয়াছে ঐ তুহুরে তালাক দেওয়া। শেষোক্ত তরীকার যে কোন অবস্থায় তালাক দিলে তালাক নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হইয়া যাইবে; কিন্তু গোনাহ্ হইবে। শরীঅতের এই মাসআলাটি বিশেষভাবে অনুধাবনীয় ও পালনীয়। উপরে যে হায়েযের সময় তালাক দেওয়া অবৈধ বলা হইয়াছে উহা ঐ স্ত্রী সম্বন্ধে যাহার সহিত সহবাস বা নির্জন-মিলন হইয়াছে। যদি স্বামী-সহবাস বা নির্জন-মিলন না হইয়া থাকে হায়েযের সময়েই হউক বা পাকীর সময়েই হউক উভয় অবস্থায়ই তালাক দেওয়া দুরুস্ত হইবে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় এক তালাক দিবে। তিন তালাক দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই।

ওলীর বয়ান

১০। মাসআলা ঃ (বিবাহের প্রস্তাব পেশ করার পর) কন্যা জবান দ্বারা স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করে নাই। কিন্তু বর যখন সহবাস করিতে আসিয়াছে তখন সে অস্বীকার করে নাই, এরূপ অবস্থায় হইলেও বিবাহ দুরুস্ত হইয়া গিয়াছে।

১৫। মাসআলা ঃ পিতা বা দাদা ব্যতীত অন্য কেহ (ভাই বা চাচা) বিবাহ দিয়া দিল। বিবাহের কথা মেয়ের জানা ছিল, পরে বালেগা হইল (স্বামী এখনও তাহার সহিত সহবাস করে নাই। কিন্তু যেইমাত্র বালেগা হইল তন্মুহূর্তেই সে বিবাহের কথা অস্বীকার করিয়া বলিল, 'আমি এই বিবাহে রাযী নাই' অথবা বলিল, 'আমি এই বিবাহ বাকী রাখিতে চাই না'। তথায় আর কেহ চাই উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, চাই একাই বসা থাকুক তবুও বিবাহ ভঙ্গ করাইতে হইলে ঐ কথা আওয়ায করিয়া বলিতেই হইবে যে, 'আমি এই বিবাহে রাযী নহি' কিন্তু শুধু এতটুকু বলাতেই বিবাহ ভঙ্গ হইবে না। শরয়ী হাকিমের নিকট যাইতে হইবে, তিনি যদি বিবাহ ভঙ্গ করিয়া দেন, তবে বিবাহ ভঙ্গ হইবে, অন্যথায় বিবাহ বিচ্ছেদ হইবে না। বালেগা হওয়ার পর এক মুহূর্তও যদি চুপ থাকে, তবে আর বিবাহ ভঙ্গ করাইবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু যদি বিবাহের কথা মেয়ের জানা না থাকে, বালেগা হওয়ার পর জানিতে পারিয়াছে, তবে যে মুহূর্তে জানিতে পারিয়াছে সেই মুহূর্তেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে হইবে। তখন এক মুহূর্তও যদি চুপ থাকে, তবে বিবাহ ভঙ্গ করাইবার অধিকার থাকিবে না। (এই হুকুম হইল মেয়ের বেলায়। ছেলে বালেগ হইলে তৎমুহূর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা জরুরী নহে; বরং তাহার রেযামন্দী বা সম্মতি কার্যে বা কথায় প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কবূল করা না করার অধিকার বজায় থাকিবে।

১৬। মাসআলা ঃ স্বামী সহবাস করার পর মেয়ে বালেগা হইল। এই অবস্থায় যদি বিবাহ ভঙ্গ করিতে চায়, তবে বালেগা হওয়া মাত্র কিংবা বিবাহের সংবাদ জ্ঞাত হওয়া মাত্রই এন্‌কার করা জরুরী নহে; বরং যে পর্যন্ত তাহার রেযামন্দীর (সম্মতির) অবস্থা জানা না যাইবে, সে পর্যন্ত কবূল করা না করার অধিকার বাকী থাকিবে—যত সময়ই অতীত হউক না কেন। অবশ্য সে যখন মুখে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিল যে, অমি মঞ্জুর করিলাম অথবা অনুরূপ কোন কথা প্রকাশ পাইল

যাহাতে রেযামন্দী ছাবেত হয়। যেমন, নির্জনে স্বামীর সহিত স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় রহিল তবে আর বিবাহ ভঙ্গের অধিকার থাকিবে না। বিবাহ লাযেম হইয়া যাইবে।

মহর

মাসআলা ঃ নিজ অবস্থানুযায়ী ১০·০০, ২০·০০, ১০০·০০, বা হাজার টাকা। মহর ধার্য করিয়া বিবিকে নিজের বাড়ীতে নিয়া আসিল এবং তাহার সহিত সহবাস করিল কিংবা সহবাস করে নাই বটে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী এমন নির্জন স্থানে অবস্থান করিল যেখানে সহবাসের কোনও প্রতিবন্ধকতা ছিল না, এখন নির্ধারিত পূর্ণ মহর দিতে হইবে। অথবা এরূপ কোন অবস্থা হয় নাই, অথচ স্বামী বা স্ত্রী মারা গেল, তবুও পুরা মহর ওয়াজেব হইবে। আর যদি উক্তরূপ কোন অবস্থা না হইয়া স্বামী তালাক দিয়া থাকে, তবে নির্ধারিত মহরের অর্ধেক দিতে হইবে। মোটকথা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি উক্তমত নির্জন-মিলন হইয়া থাকে অথবা উভয়ের মধ্যে কেহ মারা যায়, তবে পুরা মহর ওয়াজেব হইবে। আর যদি উপরোক্ত মতে নির্জন-মিলন হওয়ার পূর্বে তালাক হইয়া যায়, তবে অর্ধেক মহর ওয়াজেব হইবে।

৪। মাসআলা ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কোন একজন অসুস্থ ছিল অথবা রমযানের রোযা রাখিয়াছিল অথবা হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধিয়াছিল অথবা স্ত্রী হায়েয ছিল অথবা তথায় কেহ উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল, এসকল অবস্থায় যদি তাহাদের নির্জন-মিলন হইয়া থাকে, তবে তাহা নির্জন-মিলন বলিয়া ধরা হইবে না। ইহাতে পুরা মহর ওয়াজেব হইবে না। এমতাবস্থায় যদি তালাক দেওয়া হয়, তবে স্ত্রী অর্ধেক মহর পাইবার অধিকারিণী হইবে। রমযানের রোযা রাখে নাই, নফল বা কাযা রোযা বা মান্নতের রোযা রাখিয়াছে এবং নির্জন-মিলন হইয়াছে, এমতাবস্থায় স্ত্রী পুরা মহরের হকদার হইবে এবং স্বামী পুরা মহর দিতে বাধ্য হইবে।

৫। মাসআলা ঃ স্বামী 'না-মরদ', এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নির্জন-মিলন হইয়াছে, এরূপ হইলে পুরা মহর ওয়াজেব হইবে। এইরূপ নপুংসক বিবাহ করিয়া নির্জন-মিলনের পর তালাক দিয়াছে, তবুও পুরা মহর ওয়াজেব হইবে।

৬। মাসআলা ঃ স্বামী-স্ত্রী নির্জনে রহিল ; কিন্তু স্ত্রী এত ছোট যে, সহবাসের যোগ্য নহে, কিংবা স্বামী খুব ছোট, সহবাসে সক্ষম নহে, এরূপ অবস্থায় নির্জন-মিলন হইলেও পুরা মহর ওয়াজেব হইবে না।

১৫। মাসআলা ঃ কেহ বে-কায়দা বিবাহ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন, গোপন বিবাহ করিয়াছে, যথারীতি দুইজন সাক্ষী সম্মুখে ছিল না অথবা দুইজন সাক্ষী উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহারা বধির ছিল, বিবাহ বন্ধনের শব্দগুলি শুনিতে পায় নাই, কিংবা পূর্ব স্বামী তালাক দিয়াছিল, অথবা মারা গিয়াছিল এখনও ইদ্দত পূর্ণ হয় নাই, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছে। এইরূপ কোন (শরীঅত বিরোধী) বেকায়দা কাজ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু স্বামী এখনও সঙ্গম করে নাই, তবে কোন মহর পাইবে না। যদি সঙ্গম করিয়া থাকে, তবে মহরে মেছেল দিতে হইবে। কিন্তু যদি বিবাহকালে কোন মহর নির্ধারিত করিয়া থাকে, মহরে মেছেল তদপেক্ষা বেশী হয়, তবে ঐ নির্ধারিত মহরই পাইবে, মহরে মেছেল পাইবে না।

১৬। মাসআলাঃ কেহ আপন স্ত্রী মনে করিয়া ভুলে অন্য স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিল তাহাকেও মহরে মেছেল দিতে হইবে। এই সঙ্গমকে যেনা বলা যাইবে না এবং ইহাতে গোনাহ্‌ও হইবে না। ইহাতে যদি গর্ভ হয়, তবে তাহার নছব ঠিক থাকিবে। নছবে কোন দোষ বা কলঙ্ক হইবে না, উহাকে হারামী বলা দুরুস্ত হইবে না। যখন জানা যাইবে যে, সে তাহার স্ত্রী নহে, তখন তাহাকে ঐ স্ত্রী হইতে পৃথক থাকিতে হইবে, পুনরায় সঙ্গম করা দুরুস্ত হইবে না। ঐ স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা ওয়াজেব হইবে। ইদ্দত পুরা করা ব্যতীত নিজ স্বামীর সহিত অবস্থান করা এবং স্বামীরও তাহার সহিত সঙ্গম করা দুরুস্ত হইবে না। ইদ্দতের বিধান পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭। মাসআলাঃ যে পরিমাণ মহর অগ্রিম দেওয়ার নিয়ম আছে, সেই পরিমাণ মহর পূর্বে দেয় নাই। এমতাবস্থায় স্বামীকে সহবাস করিতে না দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর আছে। একবার সঙ্গম করিয়া থাকিলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারও সহবাস হইতে বঞ্চিত রাখার অধিকার স্ত্রীর থাকিবে। স্বামী বিদেশে সফরে নিতে চাহিলে ঐ মহর আদায় না করিয়া নিতে পারিবে না। আর যদি এমতাবস্থায় স্ত্রী নিজের কোন প্রিয় মাহ্‌রাম আত্মীয়ের সহিত বিদেশে যায় বা নিজের পিত্রালয়ে চলিয়া যায়, তবে স্বামী তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। ঐ নির্ধারিত মহর পরিশোধ করিয়া দিলে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঐসব কিছুই করিতে পারিবে না। স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোথাও আসা-যাওয়া করা জায়েয হইবে না। স্বামী যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারিবে তাহাতে অস্বীকার করিতে পারিবে না।

কাফেরের বিবাহ

৩। মাসআলাঃ স্ত্রী মুসলমান হইয়া গেল, স্বামী মুসলমান হইল না। (এখন বিবাহ রহিল না, কিন্তু) এই স্ত্রী পূর্ণ তিন হায়েয অতীত না হওয়া পর্যন্ত অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে না।

স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

৪। মাসআলাঃ রাত্রে সকল স্ত্রীর ঘরে সমভাবে থাকা ত ওয়াজেব; কিন্তু সকল স্ত্রীর সহিত সমপরিমাণ সঙ্গম করা ওয়াজেব নহে। একজনের পালায় সঙ্গম করিলে অন্য জনের পালায়ও জরুরী নহে।

স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে তালাক

স্বামী-স্ত্রী যদি নির্জনে মিলিত হইয়া থাকে, সঙ্গম হউক বা না হউক এখন স্ত্রীকে পরিষ্কার শব্দে তালাক দিলে তালাকে রজয়ী হইবে, পুনঃ বিবাহ ব্যতীত স্ত্রীকে রাখিবার এখ্‌তিয়ার স্বামীর থাকিবে। একাধিক অর্থবোধক শব্দের দ্বারা তালাক দিলে বায়েন তালাক পড়িবে; (পুনর্বিবাহ ব্যতিরেকে স্বামী তাহাকে পুনর্বার গ্রহণ করিতে পারিবে না।) কিন্তু স্ত্রীর ইদ্দত পালন করিতে হইবে, ইদ্দত পুরা হইবার পূর্বে অন্যের সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না। এই ইদ্দতের মধ্যে তাহার স্বামী ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালাক দিতে পারে।

তিন তালাকের মাসআলা

১। **মাসআলাঃ** (তিন তালাকের পর) যদি পুনরায় ঐ পুরুষের সহিত থাকিতে চায় এবং বিবাহে আবদ্ধ হইতে চায়, তবে উহার একটি মাত্র ছুরত (উপায়) আছে। তাহা এই—প্রথমে অন্য কোন পুরুষের সহিত বিবাহে আবদ্ধ হইবে এবং সহবাসও করিবে। যখন এই স্বামী মরিয়া যায় বা স্বইচ্ছায় তালাক দিয়া দেয়, তখন ইদ্দত পুরা করার পর প্রথম স্বামীর নিকট বিবাহ বসিতে পারিবে। অন্য স্বামী গ্রহণ ব্যতীত প্রথম স্বামী বিবাহ করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিল, এখনও স্ত্রী-সহবাস হয় নাই কিন্তু স্বামী মারা গেল অথবা সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়া দিল, এই বিবাহ ধর্তব্য নহে। প্রথম স্বামীর সহিত ঐ সময় বিবাহ হইতে পারিবে যখন দ্বিতীয় স্বামীর সহিত সহবাসও হইবে। দ্বিতীয় স্বামীর সহিত সহবাস ব্যতীত প্রথম স্বামী পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(প্রকাশ থাকে যে, অনেক দুষ্ট লোক পরামর্শ করিয়া 'এক দুই রাত রাখিয়া তালাক দিয়া দিবেন' এই শর্ত করিয়া দ্বিতীয় স্বামীর নিকট বিবাহ দেয় এবং উহাকে হিলাশরা বলে, ইহা অতি জঘন্য পাপ। হাদীস শরীফে আছে, এইরূপ যে করিবে এবং যাহার কথায় বা পরামর্শে করিবে উভয়ের উপর লা'নত।)

৪। **মাসআলাঃ** যদি দ্বিতীয় স্বামীর সহিত এই শর্তে বিবাহ হইয়া থাকে যে, সহবাসের পর স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিবে। এরূপ এক্‌রার লওয়া ধর্তব্য নহে। তাহার ইচ্ছা, ছাড়িয়াও দিতে পারে, নাও দিতে পারে। এরূপ এক্‌রার করিয়া বিবাহ করা হারাম। ইহাতে বড় গোনাহ হয়। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে লা'নত পতিত হয়; কিন্তু বিবাহ হইয়া যায়, দ্বিতীয় স্বামী সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দেউক বা মারা যাউক, প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হইবে।

শর্তের উপর তালাক

১। **মাসআলাঃ** কেহ তাহার স্ত্রীকে বলিল, যদি তোমার হায়েয আসে, তবে তোমাকে তালাক। ইহার পর তাহার রক্ত দেখা দিল, তখনই তাহার উপর তালাকের হুকুম বর্তিবে না; বরং পূর্ণ তিন দিন তিন রাত রক্ত আসিলে এই তিন দিন তিন রাত্রির পর যে সময় হইতে রক্ত আসিয়াছিল, সেই সময় তালাক বর্তিবে।

আর যদি একথা বলিয়া থাকে যে, যখন তোমার এক হায়েয আসিবে, তখন তোমাকে তালাক। এই অবস্থায় যখন হায়েয শেষ হইবে, তখন তালাক পতিত হইবে।

রজআতের বয়ান

২। **মাসআলাঃ** (রজয়ী তালাক দেওয়ার পর) রজআতের এক তরীকা ইহাও যে, মুখে ত কিছুই বলে নাই, কিন্তু তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে, অথবা তাহাকে চুম্বন করিয়াছে বা পেয়ার করিয়াছে বা কামভাবের সহিত তাহার শরীরে হাত লাগাইয়াছে, এসমস্ত অবস্থায় সে স্ত্রী হইয়া যাইবে, পুনরায় বিবাহের প্রয়োজন নাই।

৫। মাসআলাঃ যে নারীর হায়েয আসে তাহার তালাকের ইদ্দত তিন হায়েয। তিন হায়েয পুরা হইয়া গেলে ইদ্দত পুরা হইয়া যাইবে। এখন বুঝিয়া লও যে, তৃতীয় হায়েয পুরা দশ দিন আসিল, তখন যে সময় রক্ত বন্ধ হইল এবং দশ দিন পূর্ণ হইল, ঐ সময়েই তাহার ইদ্দত শেষ হইল। রজয়ী তালাকের পর ফিরাইয়া লওয়ার যে অধিকার পুরুষের ছিল তাহা আর কোনদিন থাকিবে না, স্ত্রী গোসল করুক বা না করুক ইহা ধর্তব্য নহে। যদি তৃতীয় হায়েয দশ দিনের কম আসিয়া রক্তও বন্ধ হইল, আওরত এখনও গোসল করে নাই এবং তাহার উপর কোন নামাযও ওয়াজেব হইল না, তবে এখনও পুরুষের এখ্‌তিয়ার থাকিবে, এখনও যদি স্বেচ্ছায় মত ফিরাইয়া লয়, তবে সে নারী তাহার স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু রক্ত বন্ধ হওয়ার পর নারী গোসল করিল, অথবা গোসল করে নাই বটে, কিন্তু এক নামাযের সময় অতীত হইয়া গেল, অর্থাৎ এক নামাযের ক্বাযা তাহার উপর ওয়াজেব হইল, এই উভয় অবস্থাতেই পুরুষের এখ্‌তিয়ার থাকিবে না। এখন বিবাহ ব্যতীত আর তাহাকে রাখা যাইবে না।

৬। মাসআলাঃ যে স্ত্রীর সহিত এখনও সহবাস করে নাই যদিও নির্জন মিলন হইয়া থাকে, তাহাকে এক তালাক দিয়া ফিরাইয়া রাখার এখতিয়ার থাকে না। কেননা, তালাক দিলে বায়েন তালাক বলিয়া গণ্য করা হইবে। এসম্বন্ধে উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ভাল করিয়া স্মরণ রাখিবে।

৭। মাসআলাঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একস্থানে নির্জনে রহিল। কিন্তু পুরুষ বলে, আমি সহবাস করি নাই। এমতাবস্থায় তালাক দিয়া দিল, এখন আর তালাক হইতে রজ'আত করার এখতিয়ার রহিল না।

স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার কসম

১। মাসআলাঃ এক ব্যক্তি কসম খাইয়া বলিল খোদার কসম, এখন আর সহবাস করিব না; খোদার কসম, তোর সহিত কখনও সহবাস করিব না; কসম খাইতেছি যে, তোমার সহিত ছোহ্‌বত করিব না, অথবা অন্য কোন প্রকারে বলিল, এ সমস্ত অবস্থায় হুকুম হইল এই—যদি সহবাস না করিয়া থাকা অবস্থায় চারি মাস অতীত হইয়া যায়, তবে স্ত্রীর উপর বায়েন তালাক পড়িবে। এখন পুনঃ বিবাহ ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় সহবাস করিতে পারিবে না। যদি চারি মাসের ভিতর কসম ভঙ্গ করে এবং সহবাস করে, তবে তালাক হইবে না, অবশ্য কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হইবে। এইরূপ কসমকে শরীঅতের ভাষায় "ঈলা" বলে।

২ মাসআলাঃ হামেশার জন্য সহবাস না করার কসম খাইল না; বরং শুধু চারি মাসের জন্য কসম খাইল, যেমন বলিল, খোদার কসম চারি মাস কাল তোমার সহিত সহবাস করিব না, ইহাতে ঈলা হইয়া যাইবে। ইহারও বিধান এই যে, ৪ মাস সহবাস না করিলে বায়েন তালাক পতিত হইবে। ৪ মাসের পূর্বে সহবাস করিলে কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। কসমের কাফ্‌ফারা সম্বন্ধে পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

৩। মাসআলাঃ চারি মাস হইতে কম সময়ের কসম খাইলে তাহাতে ঈলা হইবে না। এমন কি, চারি মাসের একদিন কমের কসম খাইলেও ঈলা হইবে না। অবশ্য যত দিনের কসম খাইবে, ততদিনের পূর্বে সহবাস করিলে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। সহবাস না করিলে তালাক বর্তিবে না, কসমও পুরা থাকিবে।

৪। **মাসআলাঃ** কেহ শুধু চারি মাসের জন্য কসম খাইল, কসম ভাঙ্গিল না, চারি মাসের পর তালাক বর্তিল। তালাকের পর ঐ পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হইল। এখন চারি মাস পর্যন্ত সহবাস না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

হামেশার জন্য কসম খাইল, যেমন বলিল, 'কসম খাইতেছি যে, এখন হইতে আর তোমার সহিত সহবাস করিব না'। অথবা বলিল, 'খোদার কসম, তোমার সহিত কখনও সহবাস করিব না'। সে কসম ভঙ্গ করিল না। চারি মাস পর তালাক হইয়া যাইবে। ইহার পর তাহাকে বিবাহ করিল, বিবাহের পর চারি মাস পর্যন্ত সহবাস করিল না, এখন পুনরায় তালাক হইয়া যাইবে। তৃতীয় বার তাহাকেই বিবাহ করিল, তাহারও হুকুম এই যে, এই বিবাহের পর যদি চারি মাস সহবাস না করে, তবে তৃতীয় তালাক পতিত হইবে। এখন অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ইহার সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না। অবশ্য যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিবাহের পর সহবাস করিত, তবে কসম ভঙ্গ হইত। তাহা হইলে আর কখনও তালাক পড়িত না, অবশ্য কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইত।

৫। **মাসআলাঃ** যদি এইরূপে আগে পিছে তিন বিবাহেই তিন তালাক পড়িয়া গেল। ইহার পর স্ত্রী অপর স্বামী গ্রহণ করিল, এখন এই স্বামী তালাক দিল। এমতাবস্থায় ইদ্দত শেষে প্রথম স্বামীর সহিত পুনরায় বিবাহ হইল, সে সহবাস করিল না। এখন তালাক পড়িবে না, যত দিনই সহবাস না করুক না কেন। কিন্তু যখনই সহবাস করিবে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। কারণ, সে যে কসম খাইয়াছিল "কখনও তাহার সহিত সহবাস করিবে না" সে কসম ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

৬। **মাসআলাঃ** স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেওয়ার পর যদি তাহার সহিত সহবাস করার কসম খায়, তবে ঈলা হইবে না। এখন যদি পুনরায় বিবাহের পর সহবাস না করে তবে তালাক বর্তিবে না। কিন্তু সহবাস করিলে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। যদি রজয়ী তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের ভিতর এইরূপ কসম খায়, তবে ঈলা হইবে। যদি রজ'আত করে এবং সহবাস না করে, তবে চারি মাস পর তালাক বর্তিবে। যদি সহবাস করে, তবে কসমের কাফ্‌ফারা দিবে।

৭। **মাসআলাঃ** খোদার কসম খায় নাই; বরং বলিল, 'যদি তোমার সহিত সহবাস করি, তবে তুমি তালাক। ইহাতেও ঈলা হইয়া যাইবে। সহবাস করিলে রজয়ী তালাক হইবে, কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। সহবাস না করিলে চারি মাস পর বায়েন তালাক হইবে।

আর যদি বলে, 'তোমার সহিত সহবাস করিলে আমার উপর এক হজ্জ অথবা এক রোযা, এক টাকা খয়রাত অথবা এক কোরবানী,' এই সকল ছুরতেও ঈলা হইবে। যদি সহবাস করে, তবে যে কথা বলিয়াছে উহা করিতে হইবে, কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। যদি চারি মাস সহবাস না করে, তবে তালাক হইবে।

বিবিকে মাতার সমতুল্য বলা

[ঈলা ও যেহারের বয়ান দ্রষ্টব্য]

১। **মাসআলাঃ** কেহ আপন স্ত্রীকে বলিল, "তুমি আমার মায়ের সমতুল্য অথবা বলিল, 'তুমি আমার জন্য মায়ের সমতুল্য, তুমি আমার হিসাবে মার তুল্য, এখন তুমি আমার নিকট মাতার ন্যায় বা মাতার মত'। এই সকল অবস্থায় দেখিতে হইবে, তাহার মতলব কি। যদি এই মতলব

হয় যে, তা'যীম ও বুযুর্গীতে মায়ের বরাবর অথবা এই মতলব হয় যে, তুই একেবারে বুড়ি, বয়সে আমার মায়ের সমান, তাহা হইলে এরূপ বলায় যেহার হইবে না। আর যদি বলার সময় কোন নিয়্যত না থাকে এবং কোন মতলব না থাকে, এমনি বলিয়া ফেলিয়াছে তাহাতেও যেহার হইবে না। যদি তালাক বা ছাড়িয়া দিবার নিয়্যত থাকিয়া থাকে, তবে এক তালাক বায়েন হইবে; যদি তালাক দিবারও নিয়ত না থাকিয়া থাকে, স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিবারও নিয়্যত ছিল না; বরং মতলব শুধু এই যে, যদিও তুমি আমার স্ত্রী, তোমা হইতে বিবাহ ছিন্ন করিতেছি না, কিন্তু তোমার সঙ্গে কখনও সহবাস করিব না, তোমার সহিত সহবাস করা আমার উপর হারাম করিয়া লইলাম। ভরণ-পোষণ নিয়া পড়িয়া থাক। মোটকথা, তাহাকে ছাড়িয়া দিবার নিয়্যত ছিল না, সহবাস করাকে হারাম করিয়া লইয়াছে। ইহাকে শরীঅতের বিধানে 'যেহার' বলে। ইহার হুকুম হইল এই—সে স্ত্রী স্ত্রীই থাকিবে, কিন্তু স্বামী কাফ্‌ফারা আদায় না করা পর্যন্ত তাহার সহিত সহবাস করা, কামভাবের সহিত তাহাকে স্পর্শ করা, চুম্বন করা, পেয়ার করা ইত্যাদি হারাম থাকিবে। এই অবস্থায় যত বৎসরই অতীত হউক না কেন কাফ্‌ফারা আদায় করিলে উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় থাকিতে পারিবে, পুনরায় বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইহার কাফ্‌ফারা রোযা ভঙ্গে কাফ্‌ফারার ন্যায় দিতে হইবে।

২। মাসআলা ঃ কাফ্‌ফারা দিবার পূর্বেই যদি সহবাস করে, তবে বড় গোনাহ্ হইবে। তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গোনাহ্ মাফের জন্য তওবা এস্তেগফার করিবে। আর দৃঢ় সংকল্প করিবে যে, কাফ্‌ফারা না দিয়া আর কখনও সহবাস করিবে না। কাফ্‌ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীও স্বামীকে তাহার নিকট ঘেঁষিতে দিবে না।

৩। মাসআলা ঃ যদি ভগ্নী, মেয়ে, ফুফু অথবা এমন এক স্ত্রীলোকের সহিত তুলনা করে যাহার সহিত চিরকাল বিবাহ হারাম, তবে তাহারও এই একই হুকুম।

৪। মাসআলা ঃ কেহ বলিল, তুই আমার জন্য শূকর সদৃশ, তবে যদি তালাক বা ছাড়িয়া দিবার নিয়্যত থাকিয়া থাকে, তবে ত তালাক হইবেই। আর যদি যেহারের নিয়্যত করিয়া থাকে অর্থাৎ মতলব ছিল যে, তালাক ত দিতাম না; বরং সহবাস করা নিজের উপর হারাম করা, তবে কিছুই হয় নাই, তদ্রূপ যদি কোন নিয়্যত না করিয়া থাকে, তবেও কিছু হয় নাই।

৫। মাসআলা ঃ যদি যেহারে চারি মাস কিংবা তদপেক্ষা অধিককাল স্ত্রী-সহবাস না করিয়া থাকে এবং কাফ্‌ফারা না দিয়া থাকে, তবে তালাক হইবে না ইহাতে ঈলাও হইবে না।

৬। মাসআলা ঃ কাফ্‌ফারা না দেওয়া পর্যন্ত দেখা ও কথাবার্তা বলা হারাম নহে, তবে গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দুরুস্ত নহে।

৭। মাসআলা ঃ সর্বদার জন্য যেহার না করিয়া একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিল। যেমন বলিল, "এক বৎসরের জন্য বা চারি মাসের জন্য তুই আমার মায়ের সমতুল্য" তাহা হইলে নির্ধারিত সময় যেহার থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে সহবাস করিতে চাহিলে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের পর সহবাস করিলে কিছুই দিতে হইবে না। স্ত্রী তাহার জন্য হালাল হইবে।

৮। মাসআলা ঃ যেহারেও যদি তৎক্ষণাৎ ইন্‌শাআল্লাহ্ বলিয়া ফেলে, তবেও কিছুই হয় নাই।

৯। মাসআলা ঃ নাবালেগ ছেলে এবং উন্মাদ পাগল যেহার করিতে পারে না। করিলেও কিছুই হইবে না। যাহার সহিত এখনও বিবাহ হয় নাই, এমন স্ত্রীলোকের সহিত যেহার করিলেও কিছু হইবে না। এখন তাহার সহিত বিবাহ দুরুস্ত হইবে।

১০। মাসআলা ঃ যদি যেহারের শব্দ কয়েকবার বলে। যেমন, দুইবার তিনবার এই কথাই বলিল যে, তুই আমার জন্য মায়ের ন্যায়; এরূপ যে কয়বার বলিয়াছে, ঐ পরিমাণ কাফ্ফারা দিতে হইবে। অবশ্য দুই বা তিনবার যদি কথাটি পাকা ও মজবুত করার নিয়্যতে বলিয়া থাকে এবং নূতন করিয়া বলিবার ইচ্ছা না থাকিয়া থাকে, তবে একই কাফ্ফারা দিবে।

১১। মাসআলা ঃ যদি কয়েক স্ত্রীকে এরূপ বলিয়া থাকে, তবে যে কয়েকজন স্ত্রী থাকিবে, তত কাফ্ফারা দিবে।

১২। মাসআলা ঃ যদি 'তুমি আমার মার তুল্য, তুমি আমার ভগ্নীর তুল্য' না বলিয়া থাকে (অর্থাৎ তুল্য শব্দ না বলে) শুধু 'তুমি আমার মা' 'তুমি আমার ভগ্নী' বলিয়া থাকে, তবে ইহাতে যেহার হইবে না, স্ত্রী হারাম হইবে না। অবশ্য এরূপ বলা অন্যায় ও গোনাহ্। তদ্রূপ ডাকিবার সময় এরূপ বলা যে, আমার বোন, অমুক কাজ কর, এরূপ বলাও অন্যায়, তবে ইহাতে যেহার হইবে না।

১৩। মাসআলা ঃ কেহ বলিল, যদি তোমাকে রাখি, তবে মাকে রাখিলাম। অথবা বলিল, যদি তোমার সহিত সহবাস করি, তবে যেন মায়ের সহিত সহবাস করি। ইহা অত্যন্ত খারাপ কথা, অত্যন্ত গোনাহের কথা, কিন্তু ইহাতে যেহার হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ যদি বলে, তুমি আমার জন্য মায়ের ন্যায় হারাম, তবে তালাকের নিয়্যতে বলিয়া থাকিলে তালাক হইবে, আর যেহারের নিয়্যত করুক বা কিছুই নিয়্যত না করুক, যেহার হইবে, কাফ্ফারা দিয়া সহবাস করিতে পারিবে।

কাফ্ফারার বয়ান

১। মাসআলা ঃ যেহারের কাফ্ফারা রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারার ন্যায়। এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পূর্বেই পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তথায় ভাল করিয়া দেখিবে। এখানে কতকগুলি জরুরী কথা বর্ণনা করিতেছি, তাহা তথায় বর্ণনা করা হয় নাই।

২। মাসআলা ঃ সামর্থ্য থাকিলে পুরুষ একলাগা ৬০টি রোযা রাখিবে। মাঝখানে কোন রোযাই ছুটিতে পারিবে না। রোযা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সহবাস করিতে পারিবে না। রোযা শেষ হইবার পূর্বে, রাত্রেই হউক বা দিনেই হউক, স্বেচ্ছায় হউক, বা ভুলে হউক যদি স্ত্রী-সহবাস করে, তবে পুনঃ প্রথম হইতে শুরু করিয়া সমস্ত রোযা রাখিতে হইবে।

৩। মাসআলা ঃ যদি চাঁদের মাসের প্রথম তারিখ হইতে রোযা রাখা শুরু করে, তবে পুরা দুই মাস রোযা রাখিবে। ৩০, ৩০ করিয়া পুরা ৬০ দিন হউক, অথবা তার চেয়ে কম দিন হউক। উভয় প্রকারের কাফ্ফারা আদায় হইয়া যাইবে। প্রথম তারিখ হইতে শুরু না করিয়া থাকিলে পুরা ৬০ দিন রোযা রাখিতে হইবে।

৪। মাসআলা ঃ রোযার দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করিতে শুরু করিয়াছে। কাফ্ফারা পুরা হইবার পূর্ব দিনে বা রাত্রে ভুলে সহবাস করিয়া ফেলিয়াছে, এখন কাফ্ফারা দোহ্‌রাইতে হইবে। (অর্থাৎ, পুনরায় প্রথম হইতে রোযা শুরু করিতে হইবে।)

৫। মাসআলা ঃ রোযা রাখার শক্তি না থাকিলে ৬০ জন গরীব-মিসকীনকে দুই বেলা আহার করাইবে, অথবা প্রত্যেককে /২ সের করিয়া গেঁহু দিবে।

সমস্ত ফকীরকে যদি এখনও আহার করাইয়া শেষ করে নাই, মাঝখানে হঠাৎ সহবাস করিয়া ফেলিয়াছে ইহাতে গোনাহ্‌ হইবে কিন্তু কাফ্‌ফারা দোহ্‌রাইতে হইবে না। খানা খাওয়াইবার ছুরত (নিয়ম) পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

৬। মাসআলা ঃ কাহারও জিম্মায় যেহারের দুইটি কাফ্‌ফারা ছিল। সে ৬০ জন মিস্‌কীনকে চার চার সের গেঁহু দিয়া দিল এবং মনে করিল, প্রত্যেক কাফ্‌ফারার জন্য দুই সের করিয়া দিতেছি। এমতাবস্থায় এক কাফ্‌ফারাই আদায় হইবে। অপর কাফ্‌ফারা আবার দিবে। আর যদি রোযা ভঙ্গের জন্য এক, যেহারের জন্য এক কাফ্‌ফারা থাকিয়া থাকে, উহা আদায়ের জন্য যদি এরূপ করিয়া থাকে, তবে উভয় কাফ্‌ফারা আদায় হইয়া যাইবে।

লে'আনের বয়ান

১। মাসআলা ঃ কেহ আপন স্ত্রীর উপর যিনার তোহ্‌মত লাগাইল, অথবা যে সন্তান পয়দা হইল তাহাকে বলিল, ইহা আমার নহে, জানি না কাহার সন্তান। ইহার বিধান হইল এই—স্ত্রী কাজী কিংবা মুসলমান শরয়ী হাকেমের নিকট নালিশ দায়ের করিবে। হাকেম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কসম লইবেন। প্রথমে স্বামী হইতে এইভাবে বলাইবেন—আমি খোদাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, যে তোহ্‌মত, তাহার উপর লাগাইয়াছি, ইহাতে আমি সত্য আছি। অর্থাৎ, ঘটনা সত্য। এইভাবে চারিবার বলিবে। পঞ্চমবার বলিবে, আমি যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি, তবে আমার উপর খোদার লা'নত পড়ুক।

পুরুষ পাঁচবার বলার পর স্ত্রী চারিবার বলিবে, আমি খোদাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, তিনি আমার উপর যে তোহ্‌মত লাগাইয়াছেন উহা মিথ্যা। আর পঞ্চমবার বলিবে, এই তোহ্‌মত লাগাইবার ব্যাপারে যদি তিনি সত্য হন, তবে আমার উপর খোদার গযব পড়ুক। এইরূপে উভয়ে কসম খাওয়ার পর হাকেম উভয়কে পৃথক করিয়া দিবেন এবং ইহাতে বায়েন তালাক বর্তিবে। এই সান্তানকে পিতার সন্তান বলা যাইবে না, উহাকে মায়ের হাওলা করিয়া দিবে। এরূপ কসম করাকে শরীঅতের ভাষায় "লে'আন" বলে।

কোরআন শরীফ পাঠের ফযীলত

১। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আল্লাহ্‌ তা'আলার সহিত কথাবার্তা বলিতে চায়, তবে সে কোরআন শরীফ পড়ুক। (অর্থাৎ কোরআন শরীফ পড়া যেন আল্লাহ্‌ তা'আলার সহিত কথা বলা।) মানবের মধ্যে সমধিক ধনী ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ্‌র কোরআন বহনকারী। (অর্থাৎ যাহাদের সিনার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন শরীফ রাখিয়াছেন।) উদ্দেশ্যগত অর্থ যাহারা কোরআন শরীফ পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, তাহাদের চাইতে ধনী আর কেহ নাই। উহা আমল করার বরকতে আল্লাহ্‌ পাক অনুগ্রহ করিয়া বাতেনী ধন প্রদান করেন। আর যাহেরী আর্থিক সচ্ছলতাও লাভ হয়। —আহ্‌মদ, হাকেম

এ সম্পর্কে হযরত হাসান বছরী (রাঃ) হইতে একটি বাস্তব ঘটনা বর্ণিত আছে—

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্যে খলীফার দ্বারদেশে যাতায়াত করিত। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, যাও বেশী করিয়া আল্লাহ্‌র কিতাব (কোরআন মজীদ) তেলাওয়াত কর। ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি চলিয়া গেল। ইহার পর

হযরত ওমর (রাঃ) দীর্ঘদিন যাবৎ তাহাকে দেখিতে পান নাই। এক দিন তিনি স্বয়ং তাহার সন্ধান করিয়া অনুযোগ করিলেন (অর্থাৎ বলিলেন,) আমি তোমার সন্ধান করিতেছিলাম। কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে? (কেহ যদি কাহারও নিকট সর্বদা যাতায়াত করে, আর হঠাৎ ঐ যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেয়, তবে স্বভাবতঃই সে চিন্তিত হইয়া পড়ে যে, লোকটার কি হইল, কি অবস্থায় আছে ইত্যাদি।) উত্তরে লোকটি আরয করিল, আমি আল্লাহ্র কিতাবে এমন জিনিস পাইয়াছি যাহা আমাকে ওমরের দরওয়াজার মুখাপেক্ষী হইতে বে-পরোয়া করিয়া দিয়াছে। (অর্থাৎ, পবিত্র কোরআন মজীদে আমি এমন আয়াত প্রাপ্ত হইয়াছি যাহার বরকতে সৃষ্টজীব হইতে আমার দৃষ্টি উঠিয়া গিয়াছে এবং সমস্ত বিষয়ের অভাব মোচনকারী আল্লাহ্র উপর আমার ভরসা জন্মিয়াছে।) তোমার কাছে দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই আসিতাম। এখন আসিয়া কি করিব? এই ব্যক্তি যে আয়াতের বরকতে হযরত ওমরের দ্বারদেশ ত্যাগ করিয়াছিল, সম্ভবতঃ উহা নিম্ন আয়াতের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতই হইবে—যেমন বলা হইয়াছে— وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ○

অর্থাৎ, তোমাদের রিযিক আসমানেই রহিয়াছে (তথা হইতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তোমাদের রিযিক পাঠান হয়) এবং যে বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের সহিত ওয়াদা করা হইয়াছে (উহাও আসমানে আছে) অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের রিযিক ইত্যাদি যাবতীয় কার্যের ব্যবস্থা আমারই দরবার হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আমা ব্যতিরেকে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার কি সার্থকতা থাকিতে পার? —সূরা যারিয়া

২। **হাদীসঃ** افضل العبادة تلاوة القرآن রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সর্বোত্তম এবাদৎ কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা। (অর্থাৎ, ফরয এবাদৎসমূহের পর সর্বোত্তম নফল এবাদত হইল কোরআন মজীদ পাঠ করা)। —কান্যুল উম্মাল

৩। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যাহারা কোরআন মজীদ ইয়াদ করিয়াছে তাহাদের তা'যীম কর। কোরআন ইয়াদকারীকে যাহারা তা'যীম করিবে, তাহারা যেন আমাকেই তা'যীম করিল। (আর রাসূলুল্লাহ্কে তা'যীম করা ওয়াজেব, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।) [কোরআন শরীফ ইয়াদকারীকে তা'যীম করা যখন হুযূরকে তা'যীম করার সমতুল্য তখন কোরআন ইয়াদকারীকেও তা'যীম করা জরুরী বলিয়া প্রমাণিত হইল।] —দায়লমী

(**হাদীসঃ** তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি, যে কোরআন শিক্ষা করিয়াছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়াছে। —ইব্নে মরদুবিয়া)

৪। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা দিয়াছে এবং উহাতে যাহা আছে তদনুযায়ী আমল করিয়াছে, (অর্থাৎ, যাবতীয় হুকুম-আহ্কামের উপর আমল করিয়াছে) আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির পিতামাতাকে এমন একটি নূরের টুপী পরাইয়া দিবেন, যাহার আলো দুনিয়ায় তোমাদের ঘরে সূর্যের আলো পতিত হইলে ঘর যেরূপ আলোকিত হইয়া যায়, উহা অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল হইবে। (কোরআন অনুযায়ী আমলকারীর পিতাকে আল্লাহ্ পাক যখন এত উচ্চ মার্যাদা দান করিবেন; তখন স্বয়ং কোরআন অনুযায়ী আমলকারীকে কত অধিক মর্যাদা দান করিবেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।)

৫। **হাদীসঃ** যে ব্যক্তি কোরআন পড়িল (শিক্ষা করিল) আর মনে করিল যে, সে যে নেয়ামত প্রাপ্ত হইয়াছে খোদার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কোরআন শিক্ষায় বঞ্চিত অন্য কোন শিক্ষায়

শিক্ষিত অপর কাহাকেও ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর নেয়ামত প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে সে নিশ্চয় ঐ জিনিসকে ছোট করিল, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা বড় করিয়াছেন এবং ঐ জিনিসকে বড় করিল আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ছোট করিয়াছেন।

কোরআন শিক্ষিতদের সঙ্গত নহে যে, যদি তাঁহার সঙ্গে কেহ কঠোর ব্যবহার করে তিনিও তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিবেন, আর যে তাঁহার সহিত মূর্খোচিত ব্যবহার করিবে, তিনিও তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিবেন, বরং কোরআনের মাহাত্ম্যের দরুন তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া উচিত। (অর্থাৎ, আলেম ও কোরআন শিক্ষিতদের উচিত তাঁহারা যেমন পৃথিবীর যাবতীয় নেয়ামত অপেক্ষা কোরআনের এল্‌মকে সর্বাধিক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। যদি তাঁহারা অন্য কোন জিনিসকে কোরআন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তবে খোদা যাহাকে বড় করিয়াছেন তাহাকে হেয় ও ছোট করিলেন। আর হাকেম (খোদা) যাহাকে বড় করিয়াছেন তাহাকে ছোট করা কত বড় গুরুতর অপরাধ (তাহা চিন্তা করা উচিত)। কোরআন শিক্ষিতদের উচিত তাহারা যেন জনগণের সহিত মূর্খোচিত এবং দুর্ব্যবহার না করেন; কোরআনের আয্‌মত এবং ইজ্জত ইহাই চায়। জনগণের মধ্যে যদি কেহ তোমাদের সহিত মূর্খোচিত ব্যবহার করে, তবে তাহা মা'ফ করিয়া দেওয়া উচিত।

৬। হাদীস ঃ

اَلْقُرْاٰنُ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ ○ (رواه ابو نعيم عن ابن عمر)

আসমান, যমীন এবং তন্মধ্যে যাহারা আছে, তাহাদের চেয়ে কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয়। অর্থাৎ, কোরআন মজীদের মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টির উপরে। আর কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমধিক প্রিয়।

[**হাদীস ঃ** হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, লোহায় পানি লাগিলে যেমন মরিচা পড়ে, ক্বলব অর্থাৎ হৃদয় মধ্যেও (আল্লাহ্ হইতে গাফেল থাকিলে ও পাপ করিলে) মরিচা পড়িয়া থাকে। ছাহাবিগণ আরয করিলেন, মরিচা পরিষ্কারের উপায় কি? তিনি ফরমাইলেন, ইহার উপায় মৃত্যুকে অত্যধিক স্মরণ করা ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। —বায়হাকী। —অনুবাদক]

৭। হাদীস ঃ

مَنْ عَلَّمَ عَبْدًا اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ مَوْلَاهُ لَايَنْبَغِىْ لَهٗ اَنْ يَّخْذُلَهٗ وَلَايَسْتَاْثِرَ عَلَيْهِ فَاِنْ هُوَ فَعَلَهٗ قَصَمَ عُرْوَةً مِّنْ عُرَى الْاِسْلَامِ ـ (رواه ابن عدى و الطبرانى)

"রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র) কোন বান্দাকে খোদার কিতাব (কোরআন শরীফ) হইতে একটি আয়াত শিক্ষা দিল এই (শিক্ষাদাতা) তাহার (ঐ শিক্ষার্থীর) মনিব হইয়া গেল। অতএব, এই শিক্ষার্থীর (তালেবে এলমের) পক্ষে প্রয়োজনের সময় ঐ ওস্তাদের সাহায্য হইতে বিরত থাকা সঙ্গত হইবে না এবং ঐ ওস্তাদের উপর অন্য কাহাকেও অধিক মর্যাদা দান করাও সঙ্গত হইবে না, যে প্রকৃতপক্ষে ঐ ওস্তাদের তুলনায় অধিক মর্যাদাশালী না হয়। যদি ঐ তালেবে এল্‌ম এরূপ করে, তবে সে ইসলামের হল্‌কা (কড়া) সমূহের একটি হল্‌কা ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অর্থাৎ, এরূপ অসঙ্গত কাজ করিলে সে ইসলামের মধ্যে ভীষণ

ফেৎনা সৃষ্টিকারী এবং শরীঅতের মহা বিধান লঙ্ঘনকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে; যাহার ফলে ইহ্কাল ও পরকালে অকল্যাণ ও কঠিন শাস্তির আশঙ্কা রহিয়াছে।"

৮। হাদীসঃ

عَنْ عُبَادَةَبْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ لَّمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهٗ ـ اسناده حسن

অর্থাৎ, "রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমাদের বড়দিগকে সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ (সুলভ ব্যবহার) করে না এবং আমাদের আলেমদের হক ও মর্যাদা বুঝে না (শ্রদ্ধা করে না) সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নহে। এখানে যে কোরআন শরীফ পড়ে এবং যে শিক্ষা দেয় উভয়েই আলেম শব্দের অন্তর্ভুক্ত [কাজেই আলেম ও তালেবে এল্‌ম উভয়কে শ্রদ্ধা করা জরুরী] যে ব্যক্তি এই হাদীস অনুযায়ী কার্য না করিবে, সে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উম্মতের বাহিরে, তাহার ঈমান দুর্বল। সুতরাং বড়কে সম্মান করা, ছোটকে স্নেহ করা এবং আলেমের হক ও মর্যাদা বুঝা এবং আলেমদের শ্রদ্ধা করা একান্ত কর্তব্য।"

৯। হাদীসঃ যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ শিক্ষা করিয়াছে, উহার অর্থ ও তফসীর বুঝিয়াছে অথচ তদনুযায়ী আমল করিল না, সে দোযখকে আপন বাসস্থান নির্ধারিত করিয়া লইল। (অর্থাৎ, কোরআন শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আমল না করা অত্যন্ত কঠিন গোনাহ্। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া জাহেলদের খুশী হইবার কারণ নাই যে, আমরা তো কোরআন পড়িই নাই, সুতরাং তদনুযায়ী আমল না করিলে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা, এই সমস্ত জাহেল ডবল আযাবের উপযোগী হইবে। একটি এল্‌ম হাছেল না করার, অপরটি আমল না করার) —আবুনঈম

১০। হাদীসঃ

قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فُلَانًا يَّقْرَأُ بِالَّيْلِ كُلِّهٖ فَاِذَا اَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ سَتَنْهَاهُ قِرَائَتُهٗ

(سعيد بن منصور عن جاب)–

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করা হইল, অমুক (ব্যক্তি) সারা রাত্রি জাগিয়া কোরআন শরীফ পড়ে, কিন্তু যখন রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসে, তখন চুরি করে। (উত্তরে) তিনি বলিলেন, অদূর ভবিষ্যতে তাহার এই কোরআন পাঠ তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে। (অর্থাৎ, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের বরকতে শীঘ্রই তাহার এই অভ্যাস দূর হইয়া যাইবে।)

১১। হাদীসঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়িবে এবং উহা হেফ্য করিবে, উহার (নির্দেশিত) হালালকে হালাল মান্য করিবে এবং উহার (নির্দেশিত) হারামকে হারাম মান্য করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করিবেন এবং তাহার খান্দানের এমন দশ ব্যক্তির জন্য তাহার সুপারিশ কবূল করিবেন, যাহাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। —আহ্মদ, তিরমিযী

১২। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি খোদার কিতাব (কোরআন শরীফ) হইতে ওযূর সহিত একটি অক্ষর শুনিল, তাহার আমলনামায় দশটি নেকী (দশটি নেকীর সওয়াব) লিখা হইবে এবং তাহার দশটি গোনাহ দূর করিয়া (মিটাইয়া) দেওয়া হইবে, তাহার দশটি মরতবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অক্ষর নামাযে বসিয়া পড়িবে, (যখন বসিয়া নামায পড়িবে) তাহার আমলনামায় পঞ্চাশটি নেকী (৫০টি নেকীর ছওয়াব) লিখা হইবে। তাহার পঞ্চাশটি গোনাহ্ মিটাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার পঞ্চাশটি মরতবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হইবে। উল্লিখিত নামাযের মুরাদ হইতেছে নফল নামায। কেননা, ফরয নামায বিনা ওযরে বসিয়া পড়া জায়েয নাই। ওযরবশতঃ বসিয়া পড়িলেও খাড়া হইয়া পড়ার পূর্ণ ছওয়াব পাইবে। ওযর ব্যতীত নফল নামায বসিয়া পড়া জায়েয আছে। (কিন্তু অর্ধেক ছওয়াব পাওয়া যাইবে। ওযরের কারণে নফল নামায বসিয়া পড়িলেও পূর্ণ ছওয়াব পাইবে।) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব হইতে (নামাযে) দাঁড়াইয়া একটি হরফ পড়িবে, তাহার আমলনামায় একশত নেকী (একশত নেকীর ছওয়াব) লিখা হইবে। তাহার একশত গোনাহ্ মিটাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার একশত (দরজা) মরতবা বুলন্দ করা হইবে। যে ব্যক্তি কোরআন পড়িতে পড়িতে উহা (পূর্ণ) খতম করিল—আল্লাহ্ তা'আলা (আপন দরবারে) তাহার জন্য দো'আ লিখিয়া লইবেন, যাহা হয়ত তৎক্ষণাৎ কবূল হইবে। অথবা ভবিষ্যতে কবূল হইবে। (অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে হউক বা পরে হউক তাহার দো'আ কবূল হইবে।)

১৩। হাদীসঃ

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ وَصَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مَكَانَهٗ ـ (رواه البيهقى)

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পাঠ করিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার তা'রীফ প্রশংসা করিল (আল্‌হামদুলিল্লাহ বলুক বা অনুরূপ অর্থবোধক অন্য কোন শব্দ বলুক ইহাতে আল্লাহ্‌র তা'রীফ হইয়া যাইবে)এবং নবী আলাইহিস্‌সালামের উপর দুরূদ পড়িল এবং আল্লাহ্‌র নিকট নিজের গোনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল, নিঃসন্দেহ সে কল্যাণকে উহার স্থান হইতে চাহিয়া লইল। অর্থাৎ দ্রুত কবূল হওয়ার জন্য দো'আ করার যে নিয়ম আছে তদনুযায়ী সে দো'আ করিয়াছে; সুতরাং তাহার দো'আ দ্রুত কবূল হওয়ার আশা রহিয়াছে। (মোটকথা, কোরআন পাঠ করিয়া পরে আল্লাহ্‌র হামদ তা'রীফ ও দুরূদ পড়িয়া দো'আ করিলে দো'আ কবূল হওয়ার প্রবল আশা থাকে।)

১৪। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদের স্ত্রীদিগকে সূরা-ওয়াক্বিয়া শিখাও। নিশ্চয় এই সূরা ধন-সম্পদ আনয়নকারী অর্থাৎ সূরা-ওয়াক্বিয়া পাঠ করিলে ধনাগম হয় ও স্বচ্ছলতা আসে; রূহানী সম্পদও লাভ হয়। যেমন, অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা-ওয়াক্বিয়া পড়িবে কখনও রিযিকের অভাব তাহার হইবে না। স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের অন্তর বেশী দুর্বল থাকে। সামান্য অভাব অনটনে ইহারা পেরেশান হইয়া পড়ে। তাই স্ত্রীলোকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য অভাব অনটন দূর হওয়ার জন্য সূরা-ওয়াক্বিয়া পাঠ করা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই উপকারী। —দায়লমী

১৫। হাদীসঃ اَحْسَنُ النَّاسِ قِرَائَةً نِ الَّذِىْ اِذَا قَرَءَ اٰيَةً اِنَّهٗ يَخْشَى اللّٰهَ ـ (كنز العمال)

"কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকারীদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে কোরআন শরীফ পাঠকালে মনে করে যে, সে খোদাকে ভয় করে। (অর্থাৎ তেলাওয়াতকারীকে দেখিয়া দর্শক এ কথা মনে করে যে, সে খোদাকে ভয় করিতেছে।) মোটকথা, এমন সতর্কতার সহিত পড়ে, যেন কোন ভীত ব্যক্তি হাকেমের সম্মুখে কোন প্রকার ত্রুটি ও বেআদবী প্রকাশ পাইবার ভয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কথা বলিয়া থাকে।"

কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করিবার উত্তম পন্থা এই যে, ওযূ সহকারে ক্বেব্‌লামুখী হইয়া বসিবে। ভক্তি ও নম্রতার সহিত পাঠ করিবে। আর একথা মনে করিবে যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথা বলিতেছি। অর্থ জানা থাকিলে অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া পড়িবে। যেখানে রহ্মতের আয়াত আসিবে, সেখানে রহ্মতের দো'আ করিবে। যেখানে আযাবের আয়াত আসিবে, সেখানে দোযখ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। পড়া শেষ হইলে প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা তৎপর রাসূলের প্রতি দুরূদ পাঠ করিয়া গোনাহ্ মা'ফ চাহিবে। অথবা যে কোন নেক দো'আ করিবে এবং পুনরায় দুরূদ শরীফ পড়িবে। কোরআন তেলাওয়াতের সময় মনে বাজে খেয়াল আসিতে দিবে না। যদি কোন খেয়াল আসিয়াই যায়, তবে ঐ দিকে লক্ষ্য করিবে না। আপনা হইতেই ঐ খেয়াল চলিয়া যাইবে। তেলাওয়াতের সময় যথাসম্ভব পাক ছাফ কাপড় পরিবে।

(**হাদীসঃ** শরহে এহ্ইয়াউল উলুম গ্রন্থে হযরত আমর ইব্নে ময়মুন (রাঃ) হইতে (একটি হাদীস) বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তি প্রত্যহ ফজরের নামায পড়িবার পর কোরআন শরীফ খুলিয়া একশত আয়াত পরিমাণ পড়িয়া লইবে, তাহার নামে সমগ্র দুনিয়া পরিমাণ ছওয়াব লিখিত হইবে।

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন—যাহার প্রত্যেক রাবী বলেন, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কম ছিল। তিনি তাঁহার ওস্তাদের নিকট অভিযোগ করিলে ওস্তাদ তাঁহাকে কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতে বলিলেন। তিনি এইরূপ করিয়া উপকার পান—দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়াতে বিশেষ উপকার আছে। —ফাযায়েলে কোরআন

হযরত আউস সাক্বাফী (রাঃ) বলেন, জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোরআন শরীফ না দেখিয়া (মুখস্থ) পড়িলে হাজার দরজা সওয়াব পাওয়া যায় আর দেখিয়া পড়িলে উহার সওয়াব দুই হাজার দরজা পর্যন্ত বর্ধিত হইয়া যায়।

—বায়হাকী, ফাযায়েলে কোরআন

তজবীদের বয়ান (পরিবর্ধিত)

[ছহীহ্ করিয়া কোরআন শরীফ পড়ার নিয়মাবলী]

মাসআলাঃ তজবীদ অর্থ কোরআন শরীফ ছহীহ্ পড়া। কোরআন শরীফ ছহীহ্ করিয়া পড়ার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরই ফরয। এ সম্বন্ধে অবহেলা বা আলস্য করা শক্ত গোনাহ্। (ছহীহ্ করিয়া পড়ার অর্থ আরবী অক্ষরগুলিকে আরববাসী যেরূপ উচ্চারণ করে তদ্রূপ উচ্চারণ করা এবং ইমামগণ যে সমস্ত ক্বায়দা লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত ক্বায়দা অনুসারে আরবী লাহ্জায় কোরআন শরীফ পাঠ করা। উপযুক্ত ওস্তাদের নিকট মশ্ক্ করা ব্যতিরেকে শুধু কিতাব দেখিয়া কোরআন শরীফ ছহীহ্ করিয়া পড়া যায় না। কাজেই প্রত্যেকেরই উপযুক্ত ওস্তাদ অন্বেষণ করা দরকার। এখানে আমরা ওস্তাদ ও শাগরেদের সাহায্যার্থে অতি সহজে ও সংক্ষেপে মোটামুটি ক্বায়দাগুলি লিখিয়া দিতেছি—)

ক্কায়দা ঃ যে হরফগুলি ভাল মত লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চারণ না করিলে এক হরফের পরিবর্তে আর এক হরফ উচ্চারণ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে, সেই হরফগুলি লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, যাহাতে এক হরফের পরিবর্তে আর এক হরফ "লাহানে জলী" হইয়া গোনাহ্‌গার না হইতে হয় যথা—

(১) আলিফ ا 'আয়েন ع এবং হামযা ء (-আয়েনকে গলার মাঝখান হইতে ডাবাইয়া নরম করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। এবং হামযাকে গলার নীচ ছিনার কাছ হইতে শক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। হামযা যেন নরম না হয়। হামযার আওয়ায গলার মধ্যে বাজিয়া উঠিবে।)

(২) ت এবং ط -(ت কে বারিক করিয়া এবং ط কে মুখ গোল করিয়া মোটা করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।)

(৩) ج এবং ز - ج কে শক্ত করিয়া জিহ্বার মাঝখানের এবং তালুর সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হইবে এবং ز কে জিহ্বার আগা দিয়া দাঁতের গোড়ার সাহায্যে নরম করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৪) ح এবং ه -বড় হে বা হায়েহুত্তি এবং ছোট হে বা হায়ে হাওয়ায। ح কে গলার মধ্য হইতে গলা ডাবাইয়া এবং ه কে গলার নীচ হইতে ছিনার কাছ হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৫) ث এবং س - ث কে নরম করিয়া জিহ্বার অগ্রভাগকে সামনের দাঁতের অগ্রভাগে লাগাইয়া উচ্চারণ করিতে হইবে এবং س কে কিছু শক্ত করিয়া দাঁতের গোড়া হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৬) س এবং ص -(س বারিক হইবে এবং ص মোটা হইবে)

(৭) د এবং ض - د কে সামনের দাঁতের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হইবে; কিন্তু ض কে সামনের দাঁতের সাহায্যে উচ্চারণ করিলে ভয়ানক গলতি হইবে। —১০ নং দ্রষ্টব্য

(৮) ذ এবং ز - ذ কে সামনের দাঁতের অগ্রভাগের সাহায্যে নরম করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে এবং ز কে দাঁতের গোড়ার সাহায্যে কথঞ্চিৎ শক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

(৯) ذ এবং ظ - ذ বারিক হইবে এবং ظ মোটা হইবে।

(১০) ظ -ض- ظ কে সামনের দাঁত এবং জিহ্বার অগ্রভাগের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হইবে এবং ض কে জিহ্বার পার্শ্বদেশ এবং মাড়ির দাঁতের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হইবে।

(১১) ع - غ কে গলা ডাবাইয়া গলার ভিতর হইতে উঠাইতে হইবে।

(১২) ق এবং ك -বড় এবং ছোট ক্কাফ- ق কে গলা ডাবাইয়া গলার ভিতর হইতে উঠাইবে এবং ك কে গলার বাহির হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে। —অনুবাদক

(১৩) ف কে উপরের সামনের দাঁতের অগ্রভাগ ও নীচের ঠোঁটের ভিতরাংশের সাহায্যে উচ্চারণ করিবে। —অনুবাদক

১। ক্কায়দা ঃ خ ص ض ط ظ غ (এবং) ق এই সাতটি হরফ সর্ববস্থায় পোর অর্থাৎ, মোটা হইবে, কোন অবস্থাতেই বারিক বা চিকন হইবে না। পক্ষান্তরে ر -এর উপর যদি যবর বা পেশ থাকে, তবে মোটা হইবে, নতুবা বারিক হইবে; আর ل হামেশা চিকন হইবে, শুধু লফ্‌যে আল্লাহ্‌র মধ্যে যখন লামের আগে পেশ বা যবর থাকিবে, তখন পোর হইবে।

২। **ক্বায়দা ঃ** م – ن -এর উপর তশ্‌দীদ থাকিলে গুন্না করিতে হইবে। অর্থাৎ, আওয়ায নাকের মধ্যে নিয়া এক আলিফ পরিমাণ দেরী করিয়া উচ্চারণ করিবে।

৩। **ক্বায়দা ঃ** যবরের পরে যদি আলিফ না থাকে, তবে যবরকে টানিয়া পড়িবে না, খাট করিয়া পড়িবে। এইরূপে যেরের পর যদি ى এবং পেশের পরে যদি و না থাকে, তবে যেরকে এবং পেশকেও টানিয়া পড়িতে হইবে না। (এইরূপ টানিয়া পড়া অতি বড় দোষ। খুব লক্ষ্য করিয়া এই দোষ এড়াইয়া চলিবে।) কোন কোন লোক الحمد কে الحمدو এবং ملك কে ملكى এবং ايالك কে اياكا করিয়া পড়ে ইহা অতি মারাত্মক ভুল। এই ভুল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবসময় সতর্ক থাকিবে।

এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে যেখানে যবরের পর আলিফ বা খাড়া আলিফ আছে এবং যেরের পর যেখানে ى আছে, বা খাড়া যের আছে অথবা পেশের পরে যেখানে و আছে অথবা উল্টা পেশ আছে সেখানে এক আলিফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হইবে। (এইরূপ জায়গায় খবরদার যেন কমান না হয়।)

৪। **ক্বায়দা ঃ** (উরদু ও পার্সীতে সাধারণতঃ যেরকে আমাদের বাংলা এ-কারের মত এবং পেশকে ও-কারের মত পড়া হয়; কিন্তু কোরআন শরীফের মধ্যে যেরকে (হ্রস্ব ই-কারের মত) একটু ى -এর গন্ধ দিয়া এবং পেশকে (হ্রস্ব উ-কারের মত) একটু و -এর গন্ধ দিয়া পড়িতে হইবে; (কিন্তু খবরদার যেন পুরা ى অর্থাৎ দীর্ঘ ঈ-কার এবং পুরা و অর্থাৎ, দীর্ঘ উ-কার না হইয়া যায়, অন্যথায়, মস্ত বড় ভুল হইয়া যাইবে।)

৫। **ক্বায়দা ঃ** যেখানে নূনের উপর জযম থাকিবে এবং তারপর নিম্নের ১৫টি অক্ষরের কোন একটি অক্ষর থাকিবে, সেখানে গুন্না করিয়া অর্থাৎ, নাকের মধ্যে আওয়ায নিয়া এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করিয়া পড়িতে হইবে। ১৫টি অক্ষর এই—

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

যেমন

اَنْتُمْ ـ مِنْ ثَمَرَةٍ ـ فَاَنْجَيْنَاكُمْ ـ اَنْدَادًا ـ اَنْذَرْتُهُمْ ـ اَنْزَلَ مِنْسَاتَهٗ يَنْشُرْ ـ لِمَنْ صَبَرَ ـ مَنْضُوْدٍ ـ

فَاِنْ طِبْنَ ـ فَانْظَرَ ـ يُنْفِقُوْنَ ـ مِنْ قَبْلِكَ ـ اِنْ كُنْتُمْ ○

৬। **ক্বায়দা ঃ** এইরূপে যদি কোন হরফের উপর দুই পেশ বা দুই যবর বা দুই যের থাকে এবং সে কারণে একটি নূন উচ্চারিত হয় এবং তাহার পর উপরোক্ত ১৫টি হরফের মধ্যে কোন একটি হরফ আসে, তবে সে ছুরতেও ঐ উচ্চারিত নূনের কারণে গুন্না করিতে হইবে। যেমন—

جَنّٰتٌ تَجْرِىْ ـ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى ـ مِنْ نَّفْسٍ شَيْئًا ـ رِزْقاً قَالُوْا ـ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ـ وَغَيْرَهٗ○

৭। **ক্বায়দা ঃ** যে নূনের উপর জযম থাকে, তাহার পরে যদি ر বা ل আসে তবে নূনের উচ্চারণ মাত্রই থাকিবে না; গুন্নাও থাকিবে না; বরং ر এবং ل -এর দ্বিত্ব অর্থাৎ, তাশ্‌দীদ হইয়া যাইবে। যেমন— وَلٰكِنْ لَّايَشْعُرُوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ○

৮। **ক্বায়দা ঃ** এইরূপে যদি কোন হরফের উপর দুই পেশ, দুই যবর বা দুই যের থাকে এবং সে কারণে নূনের আওয়ায উচ্চারিত হয় তারপর ر বা ل আসে তবে ঐ ছুরতেও নূনের আওয়ায মাত্রই থাকিবে না, গুন্নাও থাকিবে না; বরং ر এবং ل -এর দ্বিত্ব হইয়া যাইবে;

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

৯। ক্বায়দা ঃ যদি নূনের উপর জযম থাকে এবং তাহার পর ب থাকে তবে ঐ নূনকে মীমের মত পড়িতে হইবে এবং গুন্না করিতে হইবে। যেমন اَنْبِئْهُمْ কে اَنْبِئْهُمْ পড়িতে হইবে। এইরূপ যদি দুই যবর, দুই যের বা দুই পেশওয়ালা হরফের পর ب থাকে, তবেও নূনের আওয়ায না পড়িয়া মীমের আওয়ায পড়িতে হইবে এবং গুন্নাও করিতে হইবে। যেমন—اَلِيْمٌ بِمَا কে اَلِيْمٌ بِمَا পড়িবে। কোন কোন ছাপার কোরআন শরীফে এইরূপ স্থানে ছোট একটি মীম অতিরিক্ত লিখিয়া দিয়া থাকে, আবার কোন জায়গায় লিখে না; কিন্তু এই ক্বায়দা যেখানে পাওয়া যাইবে সেখানে লিখুক বা না লিখুক মীম পড়িতে হইবে।

১০। ক্বায়দা ঃ যেখানে মীমের উপর জযম থাকিবে এবং তাহার পর ب আসিবে, সেখানে গুন্না করিতে হইবে— يَعْتَصِمْ بِاللهِ

১১। ক্বায়দা ঃ যে ক্ষেত্রে কোন হরফের উপর দুই যবর বা দুই পেশ বা দুই যের থাকিবে এবং তারপর যে হরফ আছে তাহার উপর জযম থাকিবে, সে ক্ষেত্রে দুই যবরের পরিবর্তে এক যবর পড়িতে হইবে এবং দুই যবরের পরে যে আলিফ থাকে, সে আলিফ পড়িতে হইবে না; বরং আলিফের স্থানে একটি নূনে যের দিয়া পরের হরফের সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে। যেমন— خَيْرًا الْوَصِيَّةُ কে خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ হইবে। এইরূপে দুই যেরের স্থানে এক যের পড়িবে এবং একটি নূনে যের দিয়া পরের হরফের সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে। যেমন—فَخُوْرٍ الَّذِيْنَ কে فَخُوْرِنِ الَّذِيْنَ পড়িতে হইবে। এইরূপে দুই পেশের স্থানে এক পেশ পড়িতে হইবে। যেমন— نُوْحٌ اِبْنَهٗ কে نُوْحُ نِ ابْنَهٗ পড়িতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রায় ছাপাতেই কোরআন শরীফের মধ্যে ছোট একটি 'নূন কুতনী' আকারে লিখিয়া দিয়া থাকে যদি নাও লিখে তবুও এই ক্বায়দা যেখানে পাওয়া যাইবে, সেখানে পড়িতে হইবে চাই লিখুক চাই না লিখুক।

১২। ক্বায়দা ঃ ر -এর উপর যদি যবর বা পেশ থাকে, তবে ر কে পোর পড়িতে হইবে। যেমন— اَمْرُهُمْ شُوْرٰى - رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ر-এর নীচে যদি যের থাকে, ر কে বারীক পড়িতে হইবে। যেমন–غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ ر এর উপর যদি জযম থাকে এবং আগের হরফে যবর বা পেশ থাকে, তবে ر পোর হইবে (যেমন— مُرْسَلٌ - اَنْذَرْتَهُمْ আর যদি আগের হরফে যের থাকে, তবে ر বারীক হইবে। যেমন—لَمْ تُنْذِرْهُمْ ; ر -এর পোর এবং বারীক হওয়া সম্বন্ধে আরও কিছু ক্বায়দা আছে, তাহা এখন বুঝে আসিবে না বলিয়া এখানে লিখা হইল না। ওস্তাদের কাছে জানিয়া লইবে বা উপরের কিতাবে জানিতে পারিবে।

১৩। ক্বায়দা ঃ اَللهُ এবং اَللّٰهُمَّ এই দুই লফ্‌যের মধ্যে যে লাম আছে, এই লামের পূর্বে যদি যবর বা পেশ থাকে, তবে লামকে পোর পড়িবে। যেমন— وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ - فَزَادَهُمُ اللهُ خَتَمَ اللهُ আর যদি লামের আগে যের থাকে, তবে লামকে বারীক পড়িবে।
যেমন— بِسْمِ اللهِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

১৪। ক্বায়দা ঃ যেখানে গোল 'তে' লেখা থাকে, সেই লফ্‌যের উপর যদি 'অক্‌ফ করা হয়, তবে ঐ গোল ة 'তে' পৃথক লেখা থাক বা অন্য হরফের সহিত যোগে লেখা থাক, কিংবা ঐ গোল (ة) তে-এর উপর পেশ থাক, যবর থাক বা যের থাক অথবা দুই যবর থাক বা দুই পেশ থাক বা দুই যের থাক সব ছুরতেই ঐ গোল (ة) 'তে' (ه) হে ছাকেনের মত পড়িতে

হইবে। যেমনঃ طَيِّبَةً কে طَيِّبَهْ এবং قَسْوَةً কে قَسْوَهْ এবং وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ কে وَاٰتُوا الزَّكٰوهْ পড়িতে হইবে।

১৫। **ক্বায়দাঃ** একমাত্র গোল 'তে' (ة) ব্যতীত অন্য কোন হরফের উপর যদি যবর থাকে এবং সেই হরফের উপর অক্‌ফ্ করিতে হয়, তবে সেই হরফের পরে একটি আলেফ বাড়াইয়া পড়িতে হইবে। (প্রায়ই আলেফ লেখা থাকে, কোন ক্ষেত্রে যদি লেখা নাও থাকে, তবুও পড়িতে হইবে।) যেমন— نداء কে نداءا পড়িতে হইবে। এতদ্ব্যতীত দুই যের বা দুই পেশওয়ালা হরফের উপর অকফ্ করিতে হইলে যেরূপ এক যবর এক পেশ এক যেরওয়ালা হরফকে ছাকেন করিয়া অকফ করিতে হয়, তদ্রূপই করিতে হইবে।

১৬। **ক্বায়দাঃ** কোরআন শরীফের কোন কোন শব্দে এইরূপ চিহ্ন ~ ~ থাকে, ইহাকে মদ বলে। যেখানে মদ থাকে সেখানে কিছু টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন— فِيْٓ اٰذَانِهِمْ এখানে অন্য জায়গা হইতে কিছু বাড়াইয়া পড়িবে قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ এখানে অন্য জায়গা হইতে কিছু বাড়াইয়া পড়িবে وَلَاالضَّآلِّيْنَ এখানে অন্য জায়গা হইতে বাড়াইয়া পড়িবে।

১৭। **ক্বায়দাঃ** কোরআন শরীফের যেখানে ط বা م বা لا বা قف বা ق চিহ্ন থাকে সেখানে শ্বাস ছাড়িয়া দিয়া অক্‌ফ করিবে; আর যেখানে س বা سكته বা وقفه লেখা থাকে, সেখানে শ্বাস না ছাড়িয়া শুধু একটু চুপ করিয়া সামনে পড়িবে এবং যেখানে لا লেখা থাকে, সেখানে না থামা উচিত এবং যেখানে এক আয়াতের মধ্যে দুই জায়গায় তিন নোক্‌তা থাকে সেখানে দুই জায়গার এক জায়গায় থামা উচিত, যেখানে উপরে নীচে দুই রকম চিহ্ন থাকে সেখানে উপরটির আমল করিবে। আর যেখানে গোল আয়াত থাকে, সেখানেও থামা ভাল, তাছাড়া অন্য চিহ্নের জায়গায় অক্‌ফ করিতে পারে, নাও করিতে পারে। (যদি একান্ত শ্বাস টুটিয়া যায়, তবে শব্দের মাঝখানে ত কিছুতেই অক্‌ফ করিবে না করিলে শব্দটি শেষ করিয়া অকফ করিবে এবং পুনরায় ঐ শব্দ দোহ্‌রাইয়া পড়িবে।)

১৮। **ক্বায়দাঃ** কোরআন শরীফে কোন হরফের উপর জযম থাকিলে এবং তাহার পরের অক্ষরের উপর তাশদীদ থাকিলে জযমওয়ালা হরফকে পড়িতে হইবে না। যেমন— قَدْتَّبَيَّنَ -এর মধ্যে د পড়া যাইবে না قَالَتْ طَّآئِفَةٌ এর মধ্যে ت পড়া যাইবে না لَئِنْ بَسَطْتَّ এর মধ্যে ط পড়া যাইবে না। اَثْقَلَتْ دَّعَوُا اللّٰهَ -এর মধ্যে ت পড়া যাইবে না اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمْ -এর ت পড়া যাইবে না اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ -এর মধ্যে ق পড়া যাইবে না। অবশ্য যদি জযমওয়ালা হরফ নূন ছাকেন বা নূনে তন্‌বীন হয় এবং তাহার পরে ى বা و -এর উপর তাশ্‌দীদ থাকে, তবে গোন্না করিয়া তাশ্‌দীদ আদায় করিতে হইবে। যেমন— ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ - وَمَنْ يَّقُوْلُ অর্থাৎ ن -এর আওয়ায নাকে পয়দা করিবে।

১। **ফায়দাঃ** وَمَا مِنْ دَابَّةٍ (১২শ) পারার ৪র্থ রুকূতে ৬ষ্ঠ আয়াতে যে مَجْرٖىهَا শব্দটি আছে। এই শব্দটি ر -এর নীচে যে খাড়া যের লেখা থাকে, তাহা অন্যান্য খাড়া যেরের মত পড়া যাইবে না; (উহাকে বাংলা একারের মত পড়িতে হইবে এবং একারকে) একটু টানিয়া পড়িতে হইবে। যেমন—উর্দুতে ستارے -এর ر কে একার কিছু টানিয়া পড়িতে হয়।

২। **ফায়দাঃ** حٰمٓ (২৬শ) পারার সূরা-হুজুরাত ২য় রুকূ ১ম আয়াতে যে بِئْسَ الْاِسْمُ শব্দটি আসিয়াছে, এই শব্দটি পড়ার নিয়ম এই যে, প্রথম ছিনের যবর পরের লামের সহিত মিলাইতে হইবে না; বরং লামে যের পড়িতে হইবে। এইরূপ পড়িতে হইবে بِئْسَ لِسْمُ

৩। **ফায়দাঃ** تِلْكَ الرُّسُلُ (তৃতীয়) পারার সূরা-আলে ইমরান-এর শুরুতে যে الم 'আলিফ লাম মীম' আছে এবং তাহার পর الله। লফ্য আছে। এই মীমকে আল্লাহ্ শব্দের লামের সহিত মিশাইতে হইবে। হেজ্জে এইরূপ হইবে মীম ইয়া যের মী, মীম লাম যবর মাল, মীমাল। কোন কোন লোক মীমমাল পড়িয়া বসে, উহা ভুল।

৪। **ফায়দাঃ** কতকগুলি মকাম এরূপ আছে যে, লেখা হয় এক রকম এবং পড়া হয় অন্য রকম তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। কোরআন শরীফের এই মকামগুলি দেখিয়া বুঝিয়া লইবে। যথা—

১। **মকামঃ** কোরআন শরীফের মধ্যে যত লফ্যে اَنَا (অর্থ আমি) আছে সেখানে নূনের বাদের আলেফ পড়িতে হইবে না, শুধু নূন-যবর نَ পড়িতে হইবে।

২। **মকামঃ** কোরআন শরীফের মধ্যে যেখানে يَبْصُطُ লিখিয়াছে, প্রায় স্থানে ص দিয়া লিখিয়াছে এবং ص-এর উপর একটি ছোট س বানাইয়া দিয়াছে; এইরূপে بَسْطَةً ও ص দিয়া লিখিয়াছে এবং ص-এর উপর একটি ছোট س বানাইয়া দিয়াছে। এই সব জায়গায় ছোট س উপরে লেখা থাকুক বা না থাকুক ص পড়িতে হইবে না, س ই পড়িতে হইবে।

৩। **মকামঃ** لَنْ تَنَالُوْا (৪র্থ) পারায় ৬ষ্ঠ রুকূর প্রথম আয়াতে اَفَائِنْ এখানে ف-এর পর একটি আলেফ থাকে কিন্তু ঐ আলেফ পড়িবে না পড়িতে হইবে এইরূপ اَفَئِنْ

৪। **মকামঃ** لَنْ تَنَالُوْا (৪র্থ) পারায় ৮ম রুকূর তৃতীয় আয়াতে লেখা আছে لَاِلَى اللهِ অথচ পড়িতে হইবে لَ اِلَى اللهِ অর্থাৎ, লামের বাদে যে আলেফ লিখিয়াছে উহা পড়িতে হইবে না।

৫। **মকামঃ** لَايُحِبُّ اللهُ (৬ষ্ঠ) পারার নবম রুকূর তৃতীয় আয়াতে লেখা আছে لن تبوء অর্থাৎ, হামযার বাদে আলেফ লেখা আছে, এই আলেফ পড়িতে হয় না।

৬। **মকামঃ** قَالَ الْمَلَاءُ الَّذِيْنَ (৯ম) পারার তৃতীয় রুকূর ৪র্থ আয়াতে লেখা আছে, ملائه অর্থাৎ লামের বাদে একটা আলেফ লেখা আছে, এই আলেফটি পড়িতে হইবে না। পড়িতে হইবে ملئه এইরূপে এই শব্দটি আরও কয়েক জায়গায় আছে সব জায়গায় এইরূপ আলেফ ছাড়িয়া দিয়াই পড়িতে হইবে; কিন্তু مَلَائِكَتِهٖ এর মধ্যে আলেফ পড়িতে হইবে, স্মরণ থাকে যেন।

৭। **মকামঃ** وَاعْلَمُوْا (১০ম) পারার ১৩ রুকূর ৪র্থ আয়াতে লেখা আছে, لَاَاوْضَعُوْا কিন্তু পড়িতে হইবে, ل اَوْضَعُوْا অর্থাৎ, লামের বাদের আলেফ পড়িতে হইবে না।

৮। **মকামঃ** وَمَا مِنْ دَابَّةٍ (১২শ) পারার ৬ষ্ঠ রুকূর ৮ম আয়াতে ثَمُوْدَا-এর মধ্যে د-এর পর একটি আলেফ লিখিয়াছে, ঐ আলেফ পড়িতে হইবে না, ثَمُوْدَ পড়িতে হইবে। এইরূপে এই লফ্যটি সূরা-অন্নাজমের والنجم ৩নং রুকূর ১৯ আয়াতের মধ্যেও এইরূপ লিখিয়াছে, সেখানেও ثَمُوْدَ ই পড়িতে হইবে। আলেফ পড়িতে হইবে না।

৯। **মকামঃ** وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِىْ (১৩শ) পারার ১০ম রুকূর ৪র্থ আয়াতে لِتَتْلُوَا-এর মধ্যে و এর পর আলেফ লেখা আছে, কিন্তু এই আলেফ পড়িতে হইবে না, পড়িতে হইবে لِتَتْلُوَ

১০। **মকাম ঃ** سُبْحَانَ الَّذِىْ (১৫শ) পারার ১৪শ রুকূর ২য় আয়াতে আছে لَنْ نَّدْعُوَا কিন্তু পড়িতে হইবে لَنْ نَّدْعُوَ ওয়াও و -এর পর আলেফ পড়িতে হইবে না এইরূপ এই পারার ১৬ রুকূর প্রথম আয়াতে লেখা আছে لِشَاىْءٍ শীনের (ش) বাদে আলেফ লেখা আছে, এই আলেফ পড়িতে হইবে না; বরং পড়িতে হইবে لِشَىْءٍ

১১। **মকাম ঃ** سُبْحَانَ الَّذِىْ (১৫শ) পারার ৭ম আয়াতে লেখা আছে لَكِنَّا নূনের বাদে আলেফ লেখা আছে, এই আলেফ পড়িতে হইবে না, পড়িতে হইবে لَكِنَّ

১২। **মকাম ঃ** وَقَالَ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ (১৯শ) পারার ১৭ রুকূর ৭ম আয়াতে লেখা আছে لَااَذْبَحَنَّهٗ লামের বাদে দুই আলেফ লেখা আছে এক আলেফ পড়িতে হইবে না, বরং পড়িতে হইবে, لَاَذْبَحَنَّهٗ

১৩। **মকাম ঃ** وَمَالِىَ (২৩শ) পারার ৬ষ্ঠ রুকূর ৫৭ আয়াতে লেখা আছে لَااِلَى الْجَحِيْمِ কিন্তু পড়িতে হইবে, لَ اِلَى الْجَحِيْمِ লামের বাদের আলেফ পড়া যাইবে না।

১৪। **মকাম ঃ** حٰمٓ (২৬শ) পারার সূরা-মোহাম্মদের প্রথম রুকূর ৪র্থ আয়াতে লেখা আছে, لِيَبْلُوَا এইরূপে এই সূরার ৪র্থ রুকূর তৃতীয় আয়াতে লেখা আছে, لِنَبْلُوَا কিন্তু পড়া যাইবে لِيَبْلُوَ এবং لِنَبْلُوَ দোনো জায়গায় و -এর পরের আলেফ পড়া যাইবে না।

১৫। **মকাম ঃ** تَبَارَكَ الَّذِىْ (২৯শ) পারার সূরা-দাহ্‌রের প্রথম রুকূর ৪র্থ আয়াত লেখা আছে, سَلَاسِلَا দ্বিতীয় লামের পরে যে আলেফ লেখা আছে উহা পড়িতে হইবে না, পড়িতে হইবে, سَلَاسِلَ এইরূপে এই সূরার এই রুকূতেই ১৫, ১৬ আয়াতে قَوَارِيْرَا قَوَارِيْرَا দুই বার আসিয়াছে ও দোনো স্থানে দ্বিতীয় ر -এর পর আলেফ লেখা আছে। ইহার হুকুম এই যে, প্রায়ই লোকে প্রথম قَوَارِيْرَ -এর উপর অক্‌ফ করিয়া থাকে, দ্বিতীয় قَوَارِيْرَا -এর উপর অক্‌ফ করে না, যদি এইরূপ করে, তবে প্রথম জায়গায় আলেফ পড়িতে হইবে। দ্বিতীয় জায়গায় قَوَارِيْرَا ই পড়িতে হইবে। আর যদি প্রথম قَوَارِيْرَا -এর উপর অক্‌ফ না করে, তবে প্রথম জায়গায়ও আলেফ পড়া যাইবে না, দ্বিতীয় জায়গায় ত যাইবেই না, চাই অক্‌ফ করুক বা না করুক।

১৬। **মকাম ঃ** وَاعْلَمُوْا (১০ম) পারার মধ্যে সূরা-তওবা আছে। সূরা শুরু হয় بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ হইতে। এই সূরার শুরুতে بِسْمِ اللهِ লেখা নাই। ইহার হুকুম এই যে, যদি উপর হইতে পড়িয়া আসিতে থাকে, তবে بِسْمِ اللهِ পড়িবে না, আর যদি এই সূরা হইতে তেলাওয়াত শুরু করে, তবে আউযুবিল্লাহ্, বিছমিল্লাহ্ পড়িতে হইবে। আর যদি উপরের 'সূরা পড়িয়া বন্ধ করিয়া থাকে এবং অনেকক্ষণ পর আবার সূরায়ে তওবা হইতে পড়া শুরু করে, তবুও আউযু বিল্লাহ্ বিছমিল্লাহ্ পড়িয়া শুরু করিবে, অন্যান্য জায়গায়ও এইরূপ করিতে হয়।

॥ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

পঞ্চম খণ্ড (পরিশিষ্ট)

হালাল মাল অন্বেষণ করার ফযীলত[১]

عَنْ عَبْدِاللّٰهِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَالْفَرِيْضَةِ (بيهقى)

১। **হাদীস**ঃ হাদীসে আছে, অন্যান্য ফরযের পর হালাল (মাল) অন্বেষণ করা ফরয। অর্থাৎ যে ফরযগুলি ইসলামের আরকান (খুঁটি) যেমন—নামায, রোযা ইত্যাদি সেগুলি আদায়ের পর। —মেশকাত

হালাল মাল অন্বেষণ করা ফরয বটে, কিন্তু এই ফরযের দর্জা অন্যান্য ফরযের চেয়ে কম, যাহা ইসলামের আরকান বা খুঁটিস্বরূপ। এই ফরয ঐ ব্যক্তির জিম্মায় যে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খরচের জন্য মালের মুখাপেক্ষী, তাহা নিজস্ব জরুরত দূর করার জন্য হউক কিংবা পরিবারবর্গের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য হউক। আর যাহার নিকট আবশ্যক পরিমাণ অর্থ মওজুদ আছে, যেমন বিত্তশালী লোক, কিংবা অন্য কোন উপায়ে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার উপর এই ফরয থাকে না। কেননা, সম্পত্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা জরুরত মিটাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যেন বান্দা জরুরী অভাব পূরণ করিয়া আল্লাহ্ পাকের এবাদত বন্দেগীতে মশ্‌গুল হইতে পারে। কেননা, পানাহার ব্যতীত এবাদত সম্ভব নহে। কাজেই সম্পত্তি আসল উদ্দেশ্য নহে, বরং অন্য কারণে কাম্য। অতএব, যখন দরকারোপযোগী মাল সম্পদ হস্তগত হয়, তখন অযথা লোভে পড়িয়া উহার অন্বেষণ করা এবং বাড়ান উচিত নহে। অতএব, যাহার নিকট আবশ্যক পরিমাণ (মাল) মওজুদ আছে তদপেক্ষা অধিক বাড়ান ফরয নহে, বরং সম্পত্তির লোভ লিপ্সা (মানুষকে) আল্লাহ্ হইতে গাফেল করে এবং উহার আধিক্য গোনাহের কাজে লিপ্ত করে। ভাল ভাবে বুঝিয়া লও। আর এদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন হালাল মাল হস্তগত হয়। হারাম মালের দিকে মুসলমানের বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নহে। কেননা, ঐ সমস্ত মালে বরকত হয় না এবং হারামখোর লোক দ্বীন ও দুনিয়ার লাঞ্ছনা এবং আল্লাহ্‌র লা'নতে নিপতিত থাকে। কোন কোন নির্বোধের এই ধারণা যে, আজকাল হালাল মাল রোজগার করা অসম্ভব। এমন কি হালাল মাল পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা একেবারেই ভুল ধারণা এবং শয়তানী ধোঁকা মাত্র।

টিকা

১ ইহা মূল কিতাবের শেষে আছে!

মনে রাখিও, যাহারা শরীঅতের উপর আমল করে, গায়েব হইতে তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ইহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত যে, হালাল খাওয়া এবং হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকা যাহার নিয়্যত থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সে ধরনের মালও দান করেন। কোরআন হাদীসেও বহু স্থানে এই ওয়াদার উল্লেখ আছে। এই দুর্দিনে আল্লাহ্ তা'আলার যে সমস্ত বান্দা হারাম এবং সন্দেহযুক্ত মাল হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখে তাহাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম হালাল মাল দান করিয়া থাকেন। যাহারা নিজেদের এবং অন্যান্য বুযুর্গদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার এই ব্যবহার দেখিতে পায় এবং কোরআন হাদীসের বিভিন্নস্থানে এই বিষয়ের বর্ণনা দেখিতে পায়, তাহারা এ ধরনের নির্বোধদের উক্তির প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিতে পারে না। আর যদি কোন বিশ্বাসযোগ্য কিতাবে এই ধরনের বিষয় নজরে পড়ে, তবে তাহার মর্ম অজ্ঞ লোকেরা যাহা বুঝিয়া লইয়াছে তাহা নহে। অতএব, যখন এ ধরনের কোন বিষয় দেখিতে পাও, তখন কোন অভিজ্ঞ দ্বীনদার আলেমের নিকট হইতে উহার অর্থ ও মর্ম জানিয়া লইবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ তোমার বুঝে আসিবে, মন শান্ত হইবে এবং এ সকল বেহুদা উক্তির ওছ্‌ওছা অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। ভালরূপে বুঝিয়া লও, মানুষ অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে অতি অল্পই সাবধানতা অবলম্বন করে। শরীঅত বিরোধী নাজায়েয চাকুরী করে, অন্যের হক নষ্ট করে, এ সবই হারাম। আর খুব স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্‌র দরবারে কোন বিষয়েরই অভাব নাই, অদৃষ্টে যে পরিমাণ লিখা আছে নিশ্চয়ই পাইবে, তবে নিয়্যত খারাপ করা এবং দোযখে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা কোন্ বিবেক সম্মত কথা?

যেহেতু হালাল মালের দিকে মানুষের লক্ষ্য খুবই কম, এজন্য বারংবার তাকীদ সহকারে বর্ণনা করা হইল। দুনিয়াতে মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ্‌র বন্দেগী করিবে। কাজেই সর্বক্ষেত্রে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। আর পানাহারের উদ্দেশ্য হইল দেহে শক্তি সঞ্চয় করা যেন আল্লাহ্‌র নাম লওয়া যায়। পানাহারের উদ্দেশ্য এই নয় যে, দিন রাত ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকা, আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলিয়া যাওয়া এবং তাঁহার নাফরমানি করা। কোন কোন নির্বোধের ধারণা—দুনিয়াতে শুধু খাওয়া পরা ও ভোগ-বিলাসের জন্য আসিয়াছে। সাবধান, ইহা নিতান্ত বদদ্বীনী। আল্লাহ্ তা'আলা নির্বুদ্ধিতার অবসান করুন। কি জঘন্য আপদ!

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِىْ كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَااَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ـ (رواه البخارى)

২। **হাদীসঃ** জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নিজের দুই হাতে অর্জিত খাদ্যের চেয়ে কোন উত্তম খাদ্য নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নবী হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে অর্জিত খাদ্য খাইতেন। অর্থাৎ নিজ হাতের অর্জিত বস্তু অতি উত্তম জিনিস। যেমন, কোন শিল্প বা ব্যবসা করা ইত্যাদি। অযথা কাহারও উপর বোঝা চাপাইবে না। কোন পেশাকেই তুচ্ছ মনে করা উচিত নহে। যখন এ ধরনের কাজ হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামগণ করিয়াছেন, তবে আর কে এমন ব্যক্তি আছে, যাহাদের মান মর্যাদা তাঁহাদের চেয়ে বেশী? বরং কাহারও মর্যাদা তাঁহাদের সমতুল্যই নহে, তদপেক্ষা বেশীর তো প্রশ্নই উঠে না। এক হাদীসে আছে, এমন কোন নবী নাই যিনি বকরী চরাণ নাই। ভালরূপে বুঝিয়া লও এবং নির্বুদ্ধিতা হইতে বাঁচিয়া থাক। কোন কোন লোকের এই ধারণা যে, যদি কাহারও নিকট হালাল মাল থাকে, কিন্তু স্বীয় হস্তে অর্জিত নহে, বরং ওয়ারিসী সূত্রে পাইয়াছে, কিম্বা অন্য কোন হালাল উপায়ে হস্তগত

হইয়াছে, অথচ অযথা নিজে অর্জনের চিন্তা করে এবং উহাকে বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে উত্তম মনে করে, ইহা নিতান্ত ভুল; বরং এমন লোকের জন্য এবাদতে মশ্‌গুল হওয়া উত্তম। যখন আল্লাহ্ তা'আলা শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং জীবিকার চিন্ত-ভাবনা হইতে নিশ্চিন্ত করিয়াছে, তখন নেহাত না-শুকরি যে, তাঁহার নাম ভাল ভাবে লয় না এবং অর্থ-সম্পদ বাড়াইতেই থাকে। অথচ হালাল মাল যে ভাবেই হস্তগত হউক না কেন বিনা অপমানে উহা সবই উত্তম ও আল্লাহ্ তা'আলার বড় নেয়ামত। ইহার খুব যত্ন করা উচিত এবং নিয়মিতভাবে ব্যয় করা উচিত, অযথা অপব্যয় করিবে না। হাদীসের মর্ম এই যে, মানুষ যেন নিজের ব্যয়ভার অন্যের উপর না চাপায় এবং লোকদের কাছে ভিক্ষা না করে, যে পর্যন্ত না কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হয়—যাহাকে শরীঅতে মজবুরী বলে। আর কোন পেশাকেই যেন হেয় মনে না করিয়া হালাল মাল অন্বেষণ করে, কামাই রোজগারকে দূষণীয় মনে না করে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়কে গুরুত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, যেন লোকেরা নিজ হাতে কামাই রোযগার করাকে দূষণীয় মনে না করে এবং কামাই রোযগার করিয়া নিজেরা খায়, অন্যকে খাওয়ায় ও দান-খয়রাত করে। হাদীসের এই উদ্দেশ্য নহে যে, নিজ হাতে অর্জন ব্যতীত যে সমস্ত হালাল মাল অন্য কোন উপায়ে পাওয়া যায় উহা হালাল নহে, কিংবা স্বহস্তে অর্জিত অর্থের সমতুল্য নহে, অথচ কোন কোন মাল নিজ হাতে উপার্জিত অর্থ অপেক্ষা উত্তম হইয়া থাকে।

আর কোন কোন নির্বোধ লোক আল্লাহ্‌র সত্যিকারের বিশিষ্ট বান্দাদের উপর যাহারা তাওয়াক্কুলের অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করে তাহাদের বিরূপ সমালোচনা করে এবং প্রমাণ স্বরূপ অত্র বর্ণিত হাদীস পেশ করে। তাহারা বলে, তাহাদের উচিত নিজ হাতে উপার্জন করা। শুধু আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করিয়া বসিয়া থাকা এবং হাদিয়া তোহ্‌ফার উপর জীবন যাপন করা ভাল নহে। এইরূপ সমালোচনা করা আমাদের নিতান্ত বোকামি। এই অমূলক সমালোচনা জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছে। তাহাদের ভয় করা উচিত যে, ঐ সকল বুযুর্গদের সহিত বে-আদবি এবং তাঁহাদের প্রতি তিরস্কার ও ভৎর্সনা করায় কঠিন মছীবতে নিপতিত হইবার আশংকা রহিয়াছে যে, এইরূপ তিরস্কারকারীকে ধ্বংস করিয়া দিবে। আউলিয়াদের সাথে বে'আদবীর কারণে ঈমান চলিয়া যাওয়ার এবং বেঈমান হইয়া মরিবার আশংকা রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোককে ধ্বংস করুন ঐ সময়ের পূর্বে যখন বুযুর্গদের সম্পর্কে এইরূপ সমালোচনা করে। কেননা তাহার জন্য ইহাই উত্তম। আমি বলি, কোরআন, হাদীসে গভীর চিন্তা করিলে বুঝা যায়, যদি ন্যায় ও ইনছাফ সহকারে সত্যের অন্বেষণে গভীর চিন্তা করা হয় যে, যাহার মধ্যে তাওয়াক্কুলের (নির্ভরতার) শর্তাবলী পাওয়া যায়, তাহার পক্ষে তাওয়াক্কুল করা উপার্জনের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। ইহা বেলায়েতের মকামসমূহের মধ্যে অতি উচ্চ মকাম। জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং মুতাওয়াক্কেল ছিলেন এবং মুতাওয়াক্কেলদের আমদানি হাতের উপার্জনের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। উহাতে বিশেষ বরকত এবং বিশিষ্ট নূর নিহিত আছে। যাহাকে আল্লাহ্ এই মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং জ্ঞান চক্ষু, বিবেক-বুদ্ধি এবং বাতেনী নূর প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইহার বরকতসমূহ দর্শন ও অনুধাবন করিয়া থাকেন। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা কোন বিশেষ স্থানে বর্ণিত হইবে। যেহেতু ইহা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, এজন্য বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ নাই। এতটুকু বুঝিয়া লওয়াই যথেষ্ট যে, এই উক্তি নিতান্তই ভুল যেমন উপরে বর্ণিত হইল।

আর বড় অন্যায় কথা যে, একে তো নিজে নেক কাজ হইতে বঞ্চিত, অন্যে করিলে তাহার প্রতি দোষারোপ ও কটুক্তি করিতেছ? কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে মুখ দেখাইবে, যখন তাঁহার ওলীদের অপমান করিতেছ?

উপরোক্ত উপকারিতা ব্যতীত তাওয়াক্কুল করাতে আরও অনেক দ্বীনী উপকারিতা নিহিত আছে। আরও ঐ সমস্ত মুতাওয়াক্কেল যাহারা লোকদিগকে এলম শিক্ষা দেন তাঁহাদের প্রয়োজনীয় খরচ পরিমাণে তাহাদের খেদমত করা ফরয। অতএব, তাহাদের স্বীয় হক হাদিয়া তোহ্ফা হইতে গ্রহণ করাকে কেন অন্যায় মনে করা হইতেছে? অথচ যাহারা তাওয়াক্কুলের ধার ধারে না তহারা নিজেদের প্রাপ্য মারামারি ঝগড়া-ফাসাদ করিয়া উসুল করিয়া লয়। পক্ষান্তরে মুতাওয়াক্কেলগণ লোকদের অতিশয় অনুনয় বিনয়ের পর আদবের সহিত আপন হক্ কবূল করেন। নজরানা, হাদিয়া কবূল করাতে যদি অপদস্ত হইতে হয় এবং মুহ্তাজ না হইয়া বেপরোয়াভাবে লওয়া হয়—বিশেষতঃ যখন উহা ফেরত দিলে দাতার মনে কঠিন আঘাত লাগে! ইহাতে বুঝা যায়, ইহা ভাল না মন্দ? মুদ্দা কথা সত্যিকারের মুতাওয়াক্কেলগণ বড়ই মান সম্মানের জীবিকা পাইয়া থাকেন, যদি তাঁহাদের নিয়্যত এবং লক্ষ্য শুধু আল্লাহ্র উপর ভরসা হয়, মানুষের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি না হয়। যাহারা মানুষের উপর আশা রাখে এবং দৃষ্টি রাখে তাহাদের মালের উপর, সে তো ধোঁকাবাজ, সে আমাদের এই উক্তির বাহিরে। আমি তো সত্যিকারের মুতাওয়াক্কেলদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি। কাহাকেও হেয় মনে করা, বিশেষতঃ আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দাগণকে—বড় শক্ত গোনাহ্। ইহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই বরং লাভ। কেননা মন্দ উক্তিকারীদের নেকীসমূহ রোজ কিয়ামতে তাঁহারা পাইবেন। সর্বনাশ তো উহাদের যাহারা মন্দ বলে। কেননা, তাহাদের দ্বীন দুনিয়া বরবাদ হয়।

আর এই কথাও স্মরণযোগ্য যে, শরীঅতে তাওয়াক্কুলের অনুমতি সকলকেই দান করে নাই। ইহাতে সৎসাহস করা এবং উহার শর্তাবলী পুরা হওয়া বড়ই কঠিন! এ জন্যই এধরনের বুযুর্গ বিরল। আর অনেক ভাল ও উত্তম জিনিস সর্বদা কমই হয়। আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শোক্র যে, এই অধ্যায়টা একটু সাধারণ দৃষ্টিপাত করাতেই খুব উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়া গেল। আল্লাহ্ যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে আমলের তৌফীক দেন, আমীন।

৩। **হাদীসঃ** নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র অর্থাৎ সর্বগুণ সম্পন্ন এবং যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কবূল করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ্ পবিত্র। পবিত্র (হালাল) মাল কবূল করেন, হারাম মাল তথায় গৃহীত হয় না। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, হারাম মাল খয়রাত করিয়া ছওয়াবের আশা রাখা কুফরী। নিশ্চই আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদিগকে ঐ জিনিসের আদেশ করিয়াছেন যাহার আদেশ নবীগণকে করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইয়াছেন, হে নবীগণ! পবিত্র বস্তু অর্থাৎ হালাল মাল ভক্ষণ করুন আর নেক আমল করুন। (আল্লাহ্ তা'আলা) আরও ফরমাইয়াছেন, হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদিগকে যে পবিত্র বস্তু দান করিয়াছি তাহা হইতে খাও। অতঃপর জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির কথা বলিয়াছেন, যেব্যক্তি (হজ্জ করিতে, এল্ম শিক্ষা করিতে ও অন্যান্য নেক কাজে দূর দেশে ভ্রমণ করে এ অবস্থায় যে, সফরের কষ্টে এলোমেলো কেশে ধুলায় ধূসরিত অবস্থায় আসমানের দিকে হাত বাড়ায় এবং) বলে, হে আমার পরওয়ারদেগার! হে আমার পরওয়ারদেগার! অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের দরবারে বারংবার প্রার্থনা করে—দয়া করিয়া

উদ্দেশ্য সফল কর, অথচ তাহার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, তাহার পরিহিত বস্ত্র হারাম। অর্থাৎ খাদ্য, পানীয় ও পরিহিত বস্ত্র হারাম উপায়ে অর্জিত, আর প্রতিপালিত হইয়াছে হারাম (মাল) দ্বারা (অর্থাৎ হারাম মালে জীবন ধারণ করে, উহা দ্বারা প্রতিপালিত হয়; অবশ্য যাহার মাতা-পিতা নাবালেগ অবস্থায় হারাম মাল দ্বারা লালনপালন করিয়াছে; কিন্তু বালেগ হইয়া সে হালাল মাল অর্জন করিয়া নিজের ভরণ পোষণে ব্যয় করিয়াছে, এমন ব্যক্তি এই হুকুমের আওতায় নহে। নাবালেগ অবস্থার গোনাহ্ শুধু পিতা-মাতার উপর।) কাজেই কিরূপে কবূল করা হইবে (সেই দো'আ) অর্থাৎ এত কষ্ট করা সত্ত্বেও হারাম মাল ব্যবহারের কারণে কিছুতেই দো'আ কবূল হইবে না। আর যদি কোন সময় উদ্দেশ্য সাধন হইয়াও যায়, তবে তাহা দো'আর কারণে নহে; বরং ঐ উদ্দেশ্য সাধন হওয়া তাহার অদৃষ্টের লিখনের কারণে যেমন, কাফেরদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। দো'আ কবূল হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর রহ্‌মতের দৃষ্টি করেন এবং ঐ রহ্‌মতের ওছিলায় তাহাকে তাহার কাম্যবস্তু দান করেন এবং ঐ কাম্য বস্তুর উপর নেকী দান করেন। সুতরাং ইহা ঐ ব্যক্তিই পায়, যে শরীঅতের পাবন্দী করে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কামনা করে। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, হালাল খাদ্যে নেহায়েত বরকত আছে, আর বাস্তবিকই তার একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া আছে। এমন মাল ভক্ষণ করিলে নেক কাজের শক্তি সঞ্চয় হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জ্ঞান বিবেকের তাবেদারী করে। —মেশকাত শরীফ, লুমআত

হযরত ছাইয়্যেদুনা মাওলানা আবুহাম্মাদ মোহাম্মাদ গাজ্জালী [(রঃ) তাঁহার কবরকে আল্লাহ্ আলোকিত করুন] একজন অতি বড় দরবেশ—হযরত সোহাইল (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হারাম খায়, দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উহার (বিবেকের) তাবেদারী ছাড়িয়া দেয় (অর্থাৎ বিবেক সৎকাজের আদেশ করে) আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার বিরোধিতা করে, আদেশ পালন করে না। কিন্তু এই বিষয় শুধু মাত্র ঐ সকল বুযুর্গগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যাঁহাদের অন্তর-চক্ষু দীপ্তিমান, আলোকিত; নচেৎ যাহাদের অন্তর কলুষিত ও কালিমাময় তাহারা দিন রাত ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, তাহাদের নেক আমলের বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হয় না। আল্লাহ্ মানুষের অন্তরের অনুভূতি এবং দিলের দৃষ্টি শক্তি এবং জ্ঞান বিবেককে কায়েম রাখুন। আমীন!

৪। **হাদীসঃ** হযরত ছাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক [যিনি অতি বড় বিখ্যাত নামজাদা আলেম ও বড় বুযুর্গ এবং ইমাম আবুহানিফা (রঃ)-এর শাগরেদ] বলেন, আমার মতে সন্দেহযুক্ত মালের একটি দেরহাম (যাহা আমি হাদিয়াস্বরূপ বা অন্য উপায়ে পাইয়াছি) ফিরাইয়া দেওয়া ছয় লক্ষ টাকা খয়রাত করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ও উত্তম। ইহা দ্বারা অনুভব করা উচিত যে, সন্দেহযুক্ত মালের কি মূল্য? দুঃখের বিষয় যাহারা পরিষ্কার হারামকেও বর্জন করে না, যেভাবেই হউক টাকা পাওয়া চাই। অথচ বুযুর্গানে দ্বীন সন্দেহযুক্ত মালকে কতই না খারাপ মনে করিতেন! সুতরাং প্রত্যেকেরই হারাম মাল হইতে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। ইহাতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। খারাব মাল ভক্ষণ করিলে অসংখ্য দোষ-ত্রুটি নফসের মধ্যে সৃষ্টি হয়, ইহা মানুষকে বিনাশ করে।

৫। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হালাল প্রকাশ্য এবং হারামও প্রকাশ্য। এতদুভয়ের মধ্যে সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলি বিদ্যমান। (অর্থাৎ ইহাদের হালাল বা হারাম হওয়াতে সন্দেহ আছে। এক দিক দিয়া হালাল এবং অন্য দিক দিয়া হারাম বলিয়া মনে হয়।) যাহা অধিকাংশ লোকে জানে না। যাঁহারা উহা জানেন, এমন লোক অতি অল্প। তাঁহারা

অতি বড় মুত্তাকী আলেম, যাঁহারা স্বীয় এল্‌ম অনুযায়ী উত্তমরূপে আমল করেন।) অতএব, যে পরহেযগারী এখ্‌তিয়ার করিল সে সন্দেহযুক্ত জিনিস হইতে স্বীয় দ্বীনকে বাঁচাইয়া রাখিল (অর্থাৎ, দোযখের আযাব হইতে আশ্রয় পাইল) এবং মান সম্মানকে বাঁচাইয়া রাখিল (অর্থাৎ, কুৎসা রটনাকারীদের হইতে স্বীয় সম্মান রক্ষা করিল।) কেননা, শরীঅতের বিরোধীদেরকে লোকেরা দোষারোপ করে, গালিগালাজ করে (আর একথা সকলেই জানে যে, দ্বীন দুনিয়ার বেইজ্জতি হইতে বাঁচিয়া থাকা সকল বুদ্ধিমানেরই কর্তব্য)। আর যে ব্যক্তি সন্দেহের জিনিসগুলিতে পতিত হইবে সে হারামে নিপতিত হইবে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্দেহের বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকে না, সে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হারাম কাজে লিপ্ত হইয়া যায়। যেখানেই নফ্‌সকে একটু অবকাশ দেওয়া গেল, ব্যাস সে একটু একটু করিয়া এমন মারাত্মক কাজ করিয়া বসিবে যে, আল্লাহ্‌র পানাহ্‌ ব্যতীত উপায়ান্তর থাকিবে না। মানুষকে একেবারেই বিনাশ করিয়া ফেলিবে।)

অতএব, যে ব্যক্তি ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করে, যাহা পায় তাহাই গ্রহণ করে, কোন সন্দেহযুক্ত মাল সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপও করে না, সে অতি সত্বরই হারাম খাইতে অভ্যস্ত হইবে। নফ্‌সকে সর্বদা শরীঅতের বন্দী বানাইয়া রাখিবে, কখনও স্বাধীনতা দিবে না। আর যদিও এমন সন্দেহের মাল যাহার সঠিক অবস্থা জানা নাই যে, উহাতে কতটুকু হালাল আছে, আর কতটুকু হারাম, উহা খাওয়া জায়েয আছে বটে, কিন্তু মকরূহ। কিন্তু একটু একটু করিয়া সন্দেহ হইতে স্পষ্ট হারামে পতিত হওয়ার আশংকা খুব বেশী আছে। কাজেই সন্দেহের বিষয় হইতেও বাঁচিয়া থাকা উচিত! কেননা, আসল উদ্দেশ্য এবং সাহসের কথা তো ইহাই।

ভালরূপে ঐ রাখালের দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও, যে রাখাল ঐ চারণ ভূমির আশেপাশে পশু চরায় যাহাকে বাদশাহ্ স্বীয় গবাদির জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন। সম্ভাবনা আছে হয়ত সেই (নিষিদ্ধ) মাঠে চরাইয়া বসিবে। অর্থাৎ যে রাখাল এমন (নিষিদ্ধ) চারণ ভূমির আশেপাশে চরায় সে শীঘ্র বিশিষ্ট চারণ ভূমিতে চরাইতে থাকিবে। এরূপ চরাণ অবস্থায় যে পশুগুলি সীমা অতিক্রম করিবে না বা স্বয়ং রাখালেরই হয়ত এরূপ দুঃসাহস হইতে মোটেই সতর্কতা অবলম্বন করিবে না, তাহা বলা অসম্ভব। এরূপে নফসের সতর্কতা থাকে না, কখনও বা শুরুতেই সন্দেহস্থলে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই হারামে লিপ্ত হইয়া পড়ে। অথবা কোন সময় হয়ত কিছু দিন পর এই অবস্থায় পড়িতে হয়।

মনে রাখিবে, যে সমস্ত ঘাস বিনা তদ্‌বীরে নিজে নিজে উৎপন্ন হয় এমন ঘাসের মাঠকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া এবং চরাইতে বারণ করা ভূমির মালিকের জন্য জায়েয নহে। এখানে শুধু দৃষ্টান্ত দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল।

সাবধান! প্রত্যেক বাদশার একটি চারণভূমি আছে (এবং) সাবধান আল্লাহ্‌র চারণভূমি (যাহা সংরক্ষিত) তাহার হারামসমূহ (অর্থাৎ যে জিনিস তিনি হারাম করিয়াছেন)।যে ব্যক্তি ঐ হারামে পতিত হইবে, সে আল্লাহ্‌র খেয়ানত করিবে। আর ইহা পরিষ্কার কথা যে, বাদশার সহিত খেয়ানত করা রাষ্ট্রদ্রোহিতা! আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু সর্বোচ্চ বাদশাহ, কাজেই তাঁহার খেয়ানত উচ্চ স্তরের রাষ্ট্রদ্রোহিতা, যাহার শাস্তিও অতি ভীষণ। জানিয়া রাখ, মানুষের শরীরে এমন একটা মাংস-টুকরা আছে। যখন উহা সুস্থ থাকিবে অর্থাৎ উহাতে আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক দোষ না থাকিবে, তখন সমস্ত শরীর সুস্থ থাকিবে। যখন উহা ফাসেদ ও খারাব হইবে, তখন সমস্ত শরীর খারাব হইবে। জানিয়া রাখ, উহা (মাংস টুকরা হইল) দিল বা অন্তর (অর্থাৎ দিল শরীরের রাজা।) দিল সুস্থ

থাকিলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে। আর দিলের সুস্থতা আল্লাহ্‌র এবাদতের উপর নিবদ্ধ। গোনাহ্‌ করিলে দেল অন্ধ হইয়া যায়। সারকথা, আত্মার সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত নেক কাজ সম্ভব নহে। হালাল খাওয়া দিলের পরিচ্ছন্নতার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহা দ্বারা হালাল খাওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইল। —মেশ্‌কাত শরীফ

৬। হাদীসঃ জনাব রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহুদীদের ধ্বংস করুক। তাহাদের প্রতি চর্বি হারাম করা হইয়াছিল (অর্থাৎ গরু বকরীর চর্বি। যেমন, কোরআন পাকে উল্লেখ আছে) তখন তাহারা উহাকে গলাইয়া তরল করিল। অতঃপর তাহারা উহা বিক্রয় করিল (অর্থাৎ তাহারা এই হিলা-বাহানা করিল যে,) হুবহু চর্বি খাইল না, বরং উহার মূল্য খাইল। তাহারা মনে করিল, ইহা চর্বি খাওয়া নহে। অথচ ঐ আদেশের মর্ম এই ছিল যে, চর্বি দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হইতে পারিবে না। বিক্রয় করিয়া দাম খাওয়াও উহার শামিল ছিল। আজকাল কোন কোন সুদখোর এই ধরনের বাহানা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে, যেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদ হইতে বাঁচিয়া যায় এবং বাস্তবে সুদ খাইতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা আলেমুল গায়েব, মনের নিয়্যত ভাল ভাবেই জানেন। কিছুতেই এরূপ বাহানা করা ঠিক নহে। —মেশ্‌কাত শরীফ

৭। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহা সম্ভব নহে যে, হারাম মাল রোজগার করিয়া তাহা হইতে দান করিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা উহা কবূল করিবেন। উহা খরচ করিলে উহাতে বরকত হইবে না। আর ইহা নিশ্চিত যে, মাল ত্যাজ্য সম্পত্তিরূপে রাখিয়া গেলে উহা দোযখে পৌঁছিবার সম্বল হইবে। অর্থাৎ হারাম উপায়ে মাল রোজগার করিয়া দান করিলে কবূল হইবে না এবং ছওয়াব পাইবে না। এমনকি, কতক আলেম বলিয়াছেন, হারাম মাল খয়রাত করিয়া ছওয়াবের আশা রাখা কুফরী। যদি কেহ ছওয়াবের নিয়্যতে কোন ভিক্ষুককে হারাম মাল দান করে, আর সেই ভিক্ষুক উহা হারাম মাল জানিয়াও যদি দাতার জন্য দো'আ করে উক্ত ওলামাদের মতে কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি এই ধরনের ধন-সম্পত্তি অন্য কোন কাজে ব্যয় করা হয়, তবু বিন্দুমাত্র বরকত হইবে না। (আর নিজের মৃত্যুকালে যদি ত্যাজ্য সম্পত্তিরূপে এই ধরনের সম্পত্তি রাখিয়া যায়, তবে উহার কারণে দোযখে দাখিল হইবে। খাইবে তো ওয়ারিশান আর দোযখে যাইবে সেই সঞ্চয়কারী। মোটকথা, হারাম মালে ক্ষতি ছাড়া কোনই লাভ নাই।) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনও মন্দকে মন্দ দ্বারা দূর করেন না। অর্থাৎ, যেহেতু হারাম মাল খয়রাত করা নিষেধ এবং গোনাহ্‌, কাজেই ঐ গোনাহ্‌র দ্বারা অন্য গোনাহ্‌ মাফ হইতে পারে না। কিন্তু ভাল দ্বারা মন্দকে মিটাইয়া দেন (অতএব, যখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে শরীঅত অনুযায়ী হালাল মাল দান করা হয়, ঐ দান গোনাহের কাফ্‌ফারা হইবে।) নিশ্চয় খবিছ (অর্থাৎ হারাম মাল) খবিছকে (অর্থাৎ গোনাহ্‌কে) দূর করে না। —মেশ্‌কাত শরীফ

৮। হাদীসঃ দেহের যে গোশত হারাম মাল দ্বারা পালিত ও বর্ধিত হইয়াছে, উহা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না আর এমন প্রত্যেক মাংস যাহা হারাম মালে পালিত ও বর্ধিত হইয়াছে জাহান্নামই উহার উপযুক্ত। (অর্থাৎ হারামখোর শাস্তি ভোগ করা ব্যতীত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহার অর্থ এই নহে যে, কাফেরের মত কস্মিনকালেও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না; বরং যদি ইসলামের উপর মরিয়া থাকে, কিন্তু ছিল হারামখোর; তবে নিজের গোনাহ্‌র শাস্তি

ভোগ করিয়া বেহেশ্‌তে যাইবে। যদি মৃত্যুর আগে হারাম খাওয়া হইতে তওবা করে এবং তার জিম্মায় যার যার হক আছে উহা আদায় করিয়া দেয়, তবে আল্লাহ্ তাহার এ সকল গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। এই হাদীসে যে আযাবের কথা উল্লেখ আছে, উহা হইতে রক্ষা পাইবে। —মেশ্‌কাত শরীফ

৯। হাদীসঃ বান্দা পুরাপুরি পরহেযগার হইতে পারে না যাবৎ ঐ হালালকে বর্জন না করে যাহাতে হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ কোন বস্তু সম্পূর্ণ হালাল এবং কোন কাজ মোবাহ্ এবং জায়েয; কিন্তু উহাতে আকৃষ্ট হইয়া এমন মাল ভক্ষণ করিলে গোনাহে পতিত হইবার আশংকা আছে। তখন এমন হালাল মালও খাইবে না এবং এমন জায়েয কাজও করিবে না। কেননা যদিও এই মাল খাওয়া এবং এই কাজ করা গোনাহ্ নহে, কিন্তু উহার দ্বারা গোনাহে পতিত হওয়ার আশংকা আছে। কারণ, অন্যায় কাজের উপায় উপকরণও অন্যায়। যেমন, ভাল ভাল দ্রব্য খাওয়া-পরা জায়েয ও হালাল। কিন্তু অতিরিক্ত ভোগবিলাসে লিপ্ত হইলে গোনাহে জড়িত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য পূর্ণ খোদাভিরুতা এবং উচ্চস্তরের পরহেযগারী হইল এই ধরনের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা। সন্দেহের মাল লওয়া মকরূহ, কিন্তু উহা খাওয়ার সাহস করিলে ভয় আছে যে, অদূর ভবিষ্যতে হারাম খাইতে বাধ্য হইবে। অতএব, এমন মাল হইতে বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য।) —মেশ্‌কাত শরীফ

১০। হাদীসঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর একটি গোলাম ছিল। সে হযরত আবুবকর (রাঃ) কে তাহার সমস্ত আয়ের (নির্ধারিত) অংশ খেরাজ বা মাসুল দিত। হযরত আবুবকর (রাঃ) গোলাম প্রদত্ত ঐ খেরাজ আহার করিতেন। একদিন ঐ গোলাম কিছু খাওয়ার বস্তু আনিল, হযরত আবুবকর (রাঃ) উহা হইতে কিছু খাইলেন। তখন গোলাম বলিল, আপনার কি জানা আছে, আপনি যাহা খাইলেন তাহা কি ছিল? (এবং কোথা হইতে আসিল?) তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, উহা কি জিনিস ছিল (যাহা আমি খাইলাম?) সে বলিল, আমি (ইসলাম-পূর্ব) অজ্ঞ যুগে এক ব্যক্তিকে গণকদের নিয়মানুযায়ী কোন একটা খবর দিয়াছিলাম, অথচ ঐ কাজে আমার জ্ঞান ছিল না। (অর্থাৎ গণকেরা যাহাকিছু বলে তাহা কখনো সত্য ও ঠিক হয় আবার কখনো ভুল হয়। কিন্তু উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা নিষেধ। আর তাহাদের ঐ বিষয়ের নির্ধারিত নিয়ম-কানুন আমি ভালরূপে জ্ঞাত ছিলাম না) আমি ঐ ব্যক্তিকে ধোঁকা দিয়াছিলাম। অতঃপর তার সাথে আমার দেখা হইলে (আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার বিনিময়ে) সে আমাকে (এই জিনিস) দিয়াছে যাহা আপনি খাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া হযরত আবুবকর (রাঃ) সতর্কতা ও পূর্ণ তাকওয়ার কারণে নিজের হাত গলায় ঢুকাইয়া দিয়া পেটের সমস্ত ভুক্ত বস্তু বমি করিয়া দিলেন। কেননা, শুধু ঐ ভুক্ত বস্তু বাহির করা ত সম্ভব ছিল না, কাজেই সমস্ত পেট খালি করিয়া দিলেন। অথচ তিনি যদি বমি না করিতেন, তবুও গোনাহ্ হইত না। —মেশ্‌কাত শরীফ

১১। হাদীসঃ যে ব্যক্তি দশ টাকার কোন কাপড় খরিদ করিল, উহাতে এক টাকা হারামের ছিল। যতদিন পর্যন্ত ঐ কাপড় তাহার শরীরে থাকিবে আল্লাহ্ তাহার নামায কবূল করিবেন না। (অর্থাৎ যদিও ফরয আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু নামাযের ছওয়াব পুরা পাইবে না। এরূপে অন্যান্যগুলি, অনুমান করিয়া লইবে। আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত। একেতো মানুষ এবাদত করেই

বা কি? আর যাহাকিছু করা হয় তাহাও যদি এরূপে বরবাদ হয়, তবে কিয়ামতের দিন কি জওয়াব দেওয়া হইবে আর কিভাবে যন্ত্রণাময় আযাব সহ্য হইবে। —মেশ্‌কাত শরীফ

١٢ ـ رواه ابن ابى الدنيا فى القناعة والبيهقى فى المدخل و قال انه منقطع ونص الحديث

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنِّىْ لَااَعْلَمُ شَيْئًا يُّقَرِّبُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ وَيُبَعِّدُكُمْ مِّنَ النَّارِ اِلَّا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ وَلَااَعْلَمُ شَيْئًا يُّبَعِّدُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ وَيُقَرِّبُكُمْ مِّنَ النَّارِ اِلَّا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَالرُّوْحُ الْاَمِيْنُ نَفَثَ فِىْ رَوْعِىْ اِنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَوْفِىَ رِزْقَهَا وَاِنْ اَبْطَاْعَنْهَا فَاتَّقُوا اللهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَايَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَىْءٍ مِّنَ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعْصِيَةٍ فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى لَايُنَالُ مَاعِنْدَهٗ مِنَ الرِّزْقِ وَغَيْرِهٖ بِمَعْصِيَّةٍ

১২। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ নিশ্চয় আমার জানামতে যে সব কাজ তোমাদিগকে বেহেশ্‌তের নিকটবর্তী করিয়া দেয় এবং দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে আমি তোমাদিগকে সে কাজের হুকুম দিয়াছি। (অর্থাৎ, বেহেশ্‌তে যাওয়ার এবং দোযখ হইতে বাঁচিয়া থাকার যাবতীয় কাজ আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছি) এবং আমার জানামতে যাহা তোমাদিগকে বেহেশ্‌ত হইতে দূরে সরাইয়া দেয় এবং দোযখের নিকটবর্তী করিয়া দেয়, আমি তোমাদিগকে উহা হইতে নিষেধ করিয়াছি। (অর্থাৎ দোযখে প্রবেশ করায় এবং বেহেশ্‌ত হইতে দূরে সরাইয়া দেয় এমন সব কাজ হইতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছি যে, এমন কাজ করিও না।) এবং রূহুল আমিন (জিব্‌রায়ীল আঃ) আমার অন্তরে এলহাম করিয়াছেন যে, নিশ্চয় কেহই মরিবে না, যে পর্যন্ত না পুরাপুরি তাহার জীবিকা ভোগ করে। (অর্থাৎ, অদৃষ্টে যে পরিমাণ রিযিক প্রত্যেকটি সৃষ্টজীবের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে ঐ পরিমাণ পাওয়ার পূর্বে কেহ মরিতে পারে না) যদিও ঐ জীবিকা দেরিতে পায় (অর্থাৎ পাইবে ত নিশ্চয়, যে সময়ের জন্য লিখিয়াছেন ঐ সময়ে পৌঁছিবে। নিয়্যত খারাব করিলে এবং হারাম উপার্জন করিলে জল্‌দী পাওয়া সম্ভব নহে) আল্লাহ্‌কে ভয় কর (অর্থাৎ, তাঁহার উপর ভরসা কর তাঁহার ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস কর এবং হারাম উপার্জন হইতে বাঁচিয়া থাক) এবং (জীবিকা) অন্বেষণে সংক্ষেপ কর (অর্থাৎ দুনিয়া উপার্জনে সীমা অতিক্রম করিও না এবং লোভী হইও না। শরীঅত বিরোধী অবৈধ উপার্জন হইতে বাঁচিতে থাক)। আর খবরদার জীবিকা প্রাপ্তিতে দেরী হওয়া যেন তোমাদিগকে (একথার উপর) উৎসাহিত না করে যে, আল্লাহ্‌র নাফরমানী পন্থায়—উহা অর্জনে লাগিয়া যাও। (অর্থাৎ, রিযক পৌঁছিতে যদি কিছু দেরী হয়, তবে গোনাহ্ এবং হারাম উপায়ে উপার্জন করিও না। কেননা, সময়ের পূর্বে কিছুতেই পাইবে না অযথা বিস্বাদ পাপে লিপ্ত হইবে।) কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে রিযিক ইত্যাদি যাহাকিছু আছে তাঁহার নাফরমানীর দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নহে। —ইবনে আবিদ্দুনিয়া

১৩। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, দশ ভাগের নয় ভাগ জীবিকা ব্যবসার মধ্যে (অর্থাৎ, তেজারত অতি বড় আমদানির উপায়, উহা অবলম্বন কর।) —বায়হাকী শরীফ

১৪। হাদীসঃ আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন ঐ মু'মিনকে যে পরিশ্রমী এবং শিল্পকাজ দ্বারা জীবিকা উপার্জনকারী কি পরিতেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। (অর্থাৎ মেহনত ও পরিশ্রমকালে

সাধারণ ময়লা কাপড় পরে। এতটুকু অবসর নাই এবং এমন সুযোগ নাই যে, কাপড় বেশী ছাফ রাখিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি মজবুর ও অপারগ না হয় তাহার উচিত সাদাসিধাভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।)

১৫। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার নিকট এই মর্মে ওহী আসে নাই যে, আমি ধন-সম্পত্তি জমা করি। (অর্থাৎ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিতে এবং ব্যবসায়ী হইবার জন্য আমার নিকট ওহী আসে নাই। অবশ্য এই মর্মে আমার নিকট ওহী আসিয়াছে যে, তুমি আল্লাহ্র তসবীহ্ (সোবহানাল্লাহে ওয়াবেহামদিহি) পড় এবং সজ্দাকারীদের শামিল হও, (অর্থাৎ সদাসর্বদা নামায কায়েম রাখ এবং ঐ সকল লোকদের শ্রেণীভুক্ত হও যাহারা সর্বদা নামায পড়ে এবং এবাদত করে) এবং আমৃত্যু স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবাদত কর, (প্রয়োজনের অধিক দুনিয়াতে লিপ্ত হইবে না। কেননা, আবশ্যক পরিমাণ জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা সকলের প্রতিই ওয়াজিব। অবশ্য যাহার মধ্যে তাওয়াক্কুলের শক্তি ও তাওয়াক্কুলের শর্তাবলী পাওয়া যায় এমন ব্যক্তি যাবতীয় কাজকর্ম ছাড়িয়া শুধু এল্মী ও আমলী এবাদতে মশ্গুল হইবে।
—বায়হাকী শরীফ

١٦ ـ عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَابَاعَ وَ اِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا قَضٰى ـ بخارى

১৬। হাদীসঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সরওয়ারে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, রহম করুন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর যে নম্র ব্যবহার করে যখন (কোন জিনিস) বিক্রি করে আর যখন (কিছু) ক্রয় করে, আর ঋণ উসুল করে। (সোবহানাল্লাহ্! কেনাবেচা, ঋণ উসুল করার হালতে নরম ব্যবহার ও খাতির করার কত বড় দর্জা যে, জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির জন্য খাছভাবে দো'আ করিতেছেন এবং হুযূরের দো'আ নিশ্চিতরূপে মকবুল।) যদি নম্র ব্যবহারের শুধু এতটুকু ফযীলতই হইত এবং উহা ব্যতীত অন্য সওয়াব পাওয়া নাও যাইত তথাপি অতি বড় নেয়ামত ছিল। অথবা এই খাতির ও নম্র ব্যবহারের সওয়াবও সে পাইবে কাজেই ব্যবসায়ীদের কর্তব্য এই হাদীসের উপর আমল করিয়া জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহের পাত্র হওয়া। আর নম্র ব্যবহারে পার্থিব উপকারিতা এই যে, ইহাতে লোক সন্তুষ্ট হয়, ব্যবসা ভাল চলে, এমন বিনয়ীদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশী হয়। এমন কি, কোন কোন সময় সন্তুষ্ট হইয়া দো'আ দেয়। মোদ্দা কথা, যাহারা শরীঅতের উপর আমল করে দ্বীন দুনিয়ায় তাহারা যেন বাদশাহর ন্যায় থাকে এবং বড় শান্তিতে ও আরামে জীবন যাপন করে। ঐ ব্যক্তির চেয়ে সৌভাগ্যশালী আর কে আছে যাহার দ্বীন ও দুনিয়ার বরকতসমূহ হাছেল হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার ও অধিকাংশ লোকের প্রিয়পাত্র হয়।

১৭। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মাল বিক্রি করার সময় বেশী কসম খাইও না (যে, মাল খুব বিক্রি হইবে।) বেশী কসম খাইও না। (কেননা, বেশী কসমের মধ্যে কোন না কোন একটা মিথ্যা হইতে পারে। ইহাতে বরকত চলিয়া যায় এবং আল্লাহ্র নামের বেআদবী হয়। অবশ্য ঘটনাক্রমে যদি হঠাৎ এরূপ হইয়া পড়ে, তবে দোষ নাই। কেননা, একথা সত্য যে, উহাতে (অর্থাৎ, বেশী কসমে) মাল কাটতি হয় (কসমের কারণে মাল

সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকেরা বিশ্বাস করে) কিন্তু পরে বরকত উঠিয়া যায় (যদ্দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হয়।) —মেশ্‌কাত শরীফ

১৮। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যবসায়ী (কথায় ও ব্যবহারে) অতিশয় সত্যবাদী, বড় আমানতদার; (কিয়ামতে) আম্বিয়া, ছিদ্দিকীন (যাঁহারা আল্লাহ্‌র বড় বড় ওলী আর যাঁহারা প্রত্যেক কথায় ও কাজে উচ্চস্তরে সত্যবাদিতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগী অতি উচ্চ ধরনে করিয়াছেন) এবং শহীদগণের সাথে হইবে। (অর্থাৎ, যে ব্যবসায়ীর মধ্যে উপরোল্লিখিত গুণাবলী রহিয়াছে কিয়ামতে সে ব্যবসায়ী আম্বিয়া (আলাইহিমুচ্ছালাতু ওয়াসসালাম,) ছিদ্দিকীন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) শহীদ (রাহেমাহুমুল্লাহ)-গণের সঙ্গী হইবে এবং দোযখ হইতে নাজাত পাইবে। সঙ্গী হওয়ার অর্থ এই নহে যে, তাঁহাদের সমান মর্যাদা পাইবে; বরং ইহার অর্থ এক বিশিষ্ট ধরনের সম্মান, যাহা বড়দের সঙ্গে থাকিলে হাছিল হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বুযুর্গকে দাওয়াত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন খাদেমকেও দাওয়াত করিল। তখন ইহা তো জানা কথা যে, ঐ বুযুর্গের খাবারস্থল এবং খানা এবং ঐ খাদেমের খাবারস্থল এবং খানা একই ধরনের হইবে। কিন্তু গৃহস্বামীর কাছে ঐ বুযুর্গের যে মর্যাদা হইবে খাদেমের তদ্রূপ নহে। অবশ্য সঙ্গ লাভ হওয়ার মান ইজ্জত এবং খাওয়া বসায় শরীক হওয়া অতি বড় মর্তবার কথা যাহা খাদেমগণ পাইল। বিশেষতঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভ হওয়া অতি বড় দৌলত মনে কর, যদি খানাও না পাওয়া যায়, সঙ্গলাভে কোন সম্মানও পাওয়া গেল না; শুধু মাত্র সঙ্গলাভই হাছিল হইল, তবে হুযূরকে যে মুসলমান অন্তর দিয়ে ভালবাসেন তার জন্য হুযূরের একটু দীদার এবং হুযূরের একটু সঙ্গলাভই বড় দৌলত। দীদার তো অতি বড় বস্তু বটে, হুযূরের পড়শী হওয়াও বড় নেয়ামত। কাজেই মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য যে, জনাব রাসূলুল্লল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মোবারক দো'আ পাওয়ার হকদার হওয়া। —মেশ্‌কাত শরীফ

১৯। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হে ব্যবসায়ী দল! বস্তুতঃ বেচা-কেনা এমন জিনিস যে, উহাতে (অনেক সময়ে) অযথা কথাবার্তা হইয়া থাকে এবং কসম খাওয়া হয়। অতএব, তোমরা উহাতে দান খয়রাত মিশাইয়া লও। (অর্থাৎ অযথা কথাবার্তা এবং কসম খাওয়া অন্যায়। কাজেই দান খয়রাত করা উচিত যাহাতে ঐ অনিচ্ছাকৃতভাবে যে সব অযথা কথাবার্তা ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে উহার কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে। আর অন্তরে যে ময়লা সৃষ্টি হইয়াছে উহা দূর হইয়া যাইবে। —আবুদাউদ

২০। হাদীসঃ ব্যবসায়ীকে কিয়ামতের দিন বদকার গোনাহ্‌গাররূপে উঠান হইবে কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়াছে এবং সত্য বলিয়াছে (এবং বেচা কেনায় কোন গোনাহ্ করে নাই। সে মহা বিপদ হইতে বাঁচিয়া যাইবে।) —মেশ্‌কাত শরীফ

অযথা করয করার নিন্দাবাদ

১। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করিতেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ "হে খোদা আমাকে কুফর এবং করয হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।" একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন হুযূর; আপনি করযকে কুফরের সঙ্গে মিলাইয়া দিতেছেন? হুযূর বলিলেন, 'হাঁ' (করয বড় ভাড়ী বিপদ।) —তরগীব হাকিম

২। হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ধার করয ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ্র ঝাণ্ডা, যখন তিনি কোন বান্দাকে অপদস্থ করিতে চাহেন, তখন তাহার ঘাড়ে দেনার বোঝা চাপাইয়া দেন।

৩। হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, তিনি এক ব্যক্তিকে এভাবে ওছিয়ত (নছীহত) ফরমাইতেছিলেন যে, গোনাহ্ কম কর, তোমার মৃত্যু সহজ হইবে এবং ধার-করয কম কর, স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে পারিবে।

৪। হাদীসঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যদি কেহ ঠেকাবশতঃ করয লয়, পরিশোধ করিবার নিয়্যতও রাখে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহা পরিশোধ করাইয়া দিবেন। আর যদি কেহ মানুষের ক্ষতি করিবার জন্য মানুষের টাকা-পয়সা নেয়, তবে আল্লাহ্ তাহাকে ধ্বংস করিয়া দেন।" (যদি কোন মুমিন মুসলমান ভাই অত্যন্ত ঠেকাবশতঃ করয করিয়া ফেলেন, তবে তিনি যেন 'খবরদার!' একান্ত খাওয়া-পরার ঠেকা জরুরী জিনিস ব্যতীত অন্যান্য জিনিস ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দেন—বেহুদা অতিরিক্ত খরচ যেন একদম বন্ধ করেন। ঘরের অতিরিক্ত জিনিস বিক্রয় করিয়া করয পরিশোধ করিয়া দিবেন। এইরূপভাবে জীবনযাপন করিয়া যাহাকিছু বাঁচে, কম হউক বেশী হউক তদ্দ্বারা করয পরিশোধ করিতে থাকিবেন। ইহাতে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার করয পরিশোধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।) —তরগীব তরহীব

৫। হাদীসঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির উপর করযের (দেনার) ভারী বোঝা চাপে, অতঃপর উহা পরিশোধ করিতে পূর্ণরূপে চেষ্টা করে, কিন্তু পরিশোধ করিবার পূর্বে মারা যায়, তবে আমি তাহার সহায় হইব। —আহ্মদ, তাবরানী

৬। হাদীসঃ ময়'মন কুরদী তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যদি কেহ কম বা বেশী মহর দিবার অঙ্গীকারে কোন মেয়েলোককে বিবাহ্ করে অথচ সেই মেয়েলোকের হক আদায়ের নিয়্যত করে নাই, ধোঁকা দিয়াছে, তবে কিয়ামতের দিন সেই লোককে আল্লাহ্র দরবারে যেনাকাররূপে হাযির করা হইবে। তদ্রূপ যদি কেহ কাহারও নিকট হইতে করয লইয়া থাকে কিন্তু অন্তরে উহা পরিশোধের নিয়্যত না থাকে; ধোঁকা দিয়া মাল লইয়াছে এবং সেই করয পরিশোধ না করিয়া মারা যায়, তবে কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে চোররূপে আল্লাহ্র দরবারে হাযির করান হইবে। —তাবরানী

৭। হাদীসঃ উমর ইবনে শোয়ায়েব তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ঋণ পরিশোধ না করে, তাহার আবরু-ইজ্জত, মাল-সম্পত্তি পাওনাদারের জন্য হালাল হইয়া যায়। অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি দেনা পরিশোধ না করে তবে উক্ত দেনাদারকে শক্ত কথা বলা, তাহার দুর্নাম প্রচার করা, শেকায়েত করা, মামলা করা, (মিথ্যা মামলা নয়) এবং গোপনে বা প্রকাশ্যে যে কোন উপায়ে তাহার হক উসুল করিয়া লওয়া পাওনাদারের পক্ষে জায়েয হইয়া যায়। —ইবনে হিব্বান

৮। হাদীসঃ আবুযর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং তাহাদিগকে খুব বেশী

ঘৃণা করেন। যথা—(১) যে বৃদ্ধ হইয়াও যেনা করে, (২) দরিদ্র হইয়াও যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে। (৩) ধনী অত্যাচারী। অর্থাৎ টালবাহানা করিয়া করযদারের প্রতি যুলুম করে। —তিরমিযি, নাসায়ী, আবু দাউদ। (অর্থাৎ পাপের মধ্যে ছোট বড় আছে। বড় পাপের মধ্যেও অধিক বড় পাপ আছে। এইরূপ যেনা করা মহা পাপ, কিন্তু যে পড়শী বা বন্ধু বিশ্বাস করিয়া তাহার বাড়ী-ঘর মান-ইজ্জত বন্ধুর হাতে বা পড়শীর হাতে আমানত রাখে, তাহার আমানতে খেয়ানত করা তাহার মান-ইজ্জত নষ্ট করা আরও অধিক মহাপাপ। এইরূপ ধনী হইয়া অহঙ্কার করা, অন্যকে হিংসা হেকারত করা মহাপাপ। কিন্তু গরীব হইয়া ধনীদের প্রতি হিংসা বা অহঙ্কার করা আরও অধিক পাপ। সাধারণভাবে মিথ্যা তো মহাপাপ আছেই, কিন্তু রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্র পরিচালক হইয়া মিথ্যা বলা প্রজাদের ধোঁকা দেওয়া মিথ্যা ওয়াদা করিয়া প্রতিপালন না করা আরও মহাপাপ।)

এইরূপ কাহারও নিকট হইতে করয করিয়া সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উহা পরিশোধ না করা আরও অধিক মহাপাপ। সামর্থ্য না থাকিলে পাওনাদারের নিকট ঘন ঘন যাইবে এবং অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করিয়া ক্ষমা চাহিবে। অন্যথায় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি না দিবার জন্য টালবাহানা করে, ওয়াদা খেলাফ করে, তবে উহা আরও অধিক মহাপাপ।)

করয আদায়ের দো'আ

৯। **হাদীসঃ** হযরত আলী রাযিয়াল্লাহুর নিকট একদিন একজন দেনাদার মোকাতাব গোলাম নিজের অবস্থা জানাইয়া কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে এমন একটি দো'আ শিখাইয়া দিতেছি, যাহা হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, ছবীর পাহাড় সমান দেনা থাকিলেও পূর্ণ ঈমানের সহিত, পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে ইহা পড়িলে তাহা ইন্‌শাআল্লাহ্ আদায় হইয়া যাইবে। তিরমিযী শরীফের দো'আটি এইঃ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

১০। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মোআয-ইবনে-জাবালকে আর একটি দো'আ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, পাহাড় সমান করয হইলেও (ঈমান ও আমলের শর্তে) উহা ইন্‌শাআল্লাহ্ আদায় হইয়া যাইবে। দো'আটি এই—

اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا تُعْطِيْهِمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ اِرْحَمْنِىْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِىْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةٍ مَّنْ سِوَاكَ ـ (طبرانى)

(দো'আ কবূল হওয়ার জন্য ভক্তি বিশ্বাস, নেক-নিয়্যত, নেক-আখলাক' নেক-আমল, খাদ্য হালাল, সত্য কথা এবং যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাধনা শর্ত।)

দানের ফযীলত (বর্ধিত)

১। **হাদীসঃ** হযরত আবুযর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—
هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ অর্থাৎ, "এই কা'বা গৃহের মালিকের শপথ—তাহারা বড় হতভাগা।"

আমি আরয করিলাম, আমার মা-বাপ, আমার জান-মাল আপনার উপর কোরবান হউক, কাহারা এত দুর্ভাগ্য, যাহাদের ভাগ্যবান বানাইবার জন্য এত বেচায়েন হইয়া আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই সংবাদ আমাদিগকে দান করিয়াছেন? হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ধনপতি ও পুঁজিপতিরা যদি সাখাওতি করে অবারিতভাবে হামেশা সৎকাজে লাগিয়া থাকে, ডানে বামে পশ্চাতে সব দিকে দান করিতে থাকে, তবে এই এক উপায়ে তাহারা ভাগ্যবান হইতে পারে। অন্যথায় বড়ই হতভাগা বড়ই ভাগ্যহারা।

২। **হাদীসঃ** হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলিতেন, আমার নিকট ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি আসে, তাহা হইলেও তিন দিনের বেশী আমি উহা আমার নিকট রাখা পছন্দ করিব না। অবশ্য করয পরিশোধের পরিমাণ ও জরুরী খরচের পরিমাণ রাখিব।

৩। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ ছখী ব্যক্তিকে ফেরেশ্‌তারা রহ্‌মত ও বরকতের দো'আ দেয় এবং বখীলকে বদদো'আ দেয়।

৪। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বোন আসমা (রাঃ)-কে বলিতেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করিতে বখিলী করিও না, হিসাব করিয়া দান করিও না। তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলাও হিসাব না করিয়া তোমাকে দান করিবেন।

৫। **হাদীসঃ** হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ পাক বলেন, হে ইবনে-আদম! তুমি আমার কাজে আমার মখলুককে দান কর। আমি তোমাকে দান করিব।

৬। **হাদীসঃ** আবু উমামা (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) বলিতেন, হে আদম সন্তান! তোমাদের জরুরত পরিমাণ মাল রাখিতে পার। ইহাতে তোমাদের উপর কোনরূপ দোষারোপ বা পাপ নাই। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহা থাকিবে, তাহা দান করিয়া দেওয়াই তোমাদের জন্য মঙ্গল। দানের বেলায় যাহারা তোমার উপর নির্ভরশীল সর্বাগ্রে তাহাদিগকে দান করিবে।

৭। **হাদীসঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামেশা বলিতেন, যুল্‌ম এবং বখিলী এই দুইটি রোগই মানবাত্মাকে ধ্বংস করার জন্য প্রধান রোগ। খবরদার! তোমরা এই রোগ হইতে বাঁচিয়া থাকিও।

৮। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ ـ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ ○

অর্থঃ ছখী আল্লাহ্‌রও নিকটে, বেহেশ্‌তেরও নিকটে, মানুষেরও নিকটে, দোযখ হইতে দূরে; বখীল আল্লাহ্ হইতে দূরে, অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নিকট ঘৃণিত, বেহেশ্‌ত হইতে দূরে, জনগণের অন্তর হইতে দূরে, দোযখের নিকটে। বখীল আবেদ হইতে মূর্খ ছখী আল্লাহ্‌র নিকটে অধিক প্রিয়— (বখীল আবেদ নহে।)

৯। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

لَاَنْ يَّتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِىْ حَيَاتِهٖ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَّه مِنْ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهٖ ـ

অর্থাৎ, সুস্থ শরীরে (যখন মানব মনে ধন-দৌলতের মহব্বত থাকে এবং গরীব ও অভাবে পতিত হওয়ার আশঙ্কা শয়তান মনে জাগাইয়া দেয়, তখন) এক টাকা দান করা (আসন্ন) মৃত্যুকালে একশত টাকা দান করা অপেক্ষা অধিক উত্তম।

১০। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ

خَصْلَتَانِ لَايَجْتَمِعَانِ فِىْ مُؤْمِنٍ اَلْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ ـ

অর্থাৎ, দুই খাছলত মুমিনের মধ্যে একত্রে সমাবেশ হইতে পারে না। একটি বখিলী, অপরটি কর্কশ ব্যবহার এবং বদ আখলাক।

১১। হাদীসঃ شَرُّ مَافِى الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ جُبْنٌ خَالِعٌ ـ ابو داؤد

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষের দুইটি খাছলত বড়ই নিন্দনীয়। বখিলীর কারণে হক কাজে সাহায্য করিতে না পারা এবং কাপুরুষতার কারণে হক কথা বলিতে না পারা।

مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا ـ

হযরত (দঃ) কছম করিয়া বলিয়াছেন, (সৎকাজে) দান ধনকে কমায় না; ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ্ কাহাকেও শক্তি ও সম্মান বাড়ান ছাড়া কমান না। —অনুবাদক

ক্রয় বিক্রয়

১। মাসআলাঃ একজন বলিল, এত দামে আমি এই জিনিস বিক্রয় করিলাম। অপরজন বলিল, আমি ক্রয় করিলাম। দুই পক্ষ হইতে এই দুইটি কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করায় ঐ জিনিস বিক্রয় চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন যদি বিক্রেতা মাল না দিতে চায় বা ক্রেতা মাল নিতে না চায়, তবে সে অধিকার আর তাহাদের কাহারও নাই। এরূপ পরিষ্কার কথায় ঈজাব-কবূলের নামই ক্রয়-বিক্রয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে চুক্তি হয়, তাহাকে 'আক্‌দ' বলে।

২। মাসআলাঃ যদি একজন বলে, এই জিনিস দুই পয়সায় আমি আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম, অপর জন বলিল, আমি গ্রহণ করিলাম। উভয় পক্ষের এরূপ উক্তির দ্বারা জিনিস বিক্রয় এবং ক্রয় হইয়া গিয়াছে। জিনিসের মালিক এখন ক্রেতা হইল। এখন ঐ জিনিস ক্রেতাকে না দিবার এখতিয়ার বিক্রেতার নাই এবং ক্রেতারও এখতিয়ার নাই যে, ঐ জিনিস না নিয়া পারে। কিন্তু এই আইন প্রয়োগ হওয়ার শর্ত এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই একই স্থানে মজলিস বদলিবার পূর্বেই উভয় পক্ষের কথা চূড়ান্ত হইবে। আর যদি বিক্রেতা দুই পয়সা বলার পর ক্রেতা কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে, অথবা সেখান হইতে চলিয়া গিয়া থাকে অথবা কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য গিয়া থাকে বা অন্য কোন কাজে গিয়া থাকে, তবে ঈজাব বাতেল হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া যদি বলে যে, হাঁ, আপনার কথিত মূল্যে খরিদ করিতেছি, তবে আইনতঃ এই কথার কোন মূল্য নাই। অবশ্য যদি বিক্রেতা রাজী হইয়া মাল দেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু বিক্রেতাকে বাধ্য করা যাইবে না। তদ্রূপ ক্রেতা কবূল করার পূর্বে বিক্রেতা যদি উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহা হইলেও ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে না। আইনতঃ ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত করার জন্য পুনরায় উভয়ের রাযীনামা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। ফলকথা, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের স্থান পরিবর্তনের পূর্বেই যদি ঈজাব-কবূল হইয়া যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে। অন্যথায় ইচ্ছামূলক থাকিবে;

৩। মাসআলাঃ খরিদ্দার বলিল, আপনার এই জিনিসটা এত মূল্যে দিয়া দেন, দোকানদার বলিল, দিয়া দিলাম। ঈজাব-কবূল পুরা হয় নাই। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে না। অবশ্য পরে যদি খরিদ্দার বলে যে, আমি নিয়া নিলাম তবে ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইয়া যাইবে।

(আবেদন বা প্রশ্নবাচক বা ভবিষ্যতবাচক শব্দ ব্যবহার করিলে তিনবার বলিতে হইবে) আদান প্রদানবাচক বা বর্তমানকাল বাচক শব্দ ব্যবহার করিলে দুইবার বলাতেই হইবে।)

৪। মাসআলা ঃ ক্রেতা বলিল, এই জিনিসটি এক পয়সায় নিলাম। বিক্রেতা বলিল, নিন। ইহাতে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া যাইবে।

৫। মাসআলা ঃ আলোচনা দ্বারা দ্রব্যের মূল্য ঠিক করিয়া ক্রেতা যদি মুখে কিছু না বলিয়া মূল্য বিক্রেতার হাতে দিয়া দ্রব্য উঠাইয়া লয় এবং বিক্রেতাও রাযী হইয়া মূল্য গ্রহণ করে, মুখে কিছু না বলে, তবেও বিক্রয় দুরুস্ত হইয়া যায়। উভয় পক্ষের রাযী রগবতে আদান-প্রদানই বাচনিক ঈজাব-কবূলের কায়েম-মকাম হইয়া যাইবে।

৬। মাসআলা ঃ আলোচনা দ্বারা মূল্য ঠিক না করিয়াও যদি কেহ বাজার দর জানার কারণে জিনিস হাতে লইয়া বিক্রেতার হাতে পয়সা দিয়া দেয়, বিক্রেতা রাযী হইয়া পয়সা গণিয়া গ্রহণ করে, তাহাতেও ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত হইবে। রাযী না হইলে হইবে না।

৭। মাসআলা ঃ যে সকল জিনিস গোছা বা ছড়া হিসাবে বিক্রয় হয়, সে সকল জিনিস যদি ১২ দানার গোছা বা ২০ টার ছড়া থাকে, আর বিক্রেতা বলে যে, গোছার দাম এত বা ছড়ার দাম এত, তবে ক্রেতার গোছা বা ছড়া ভাঙ্গিয়া নেওয়ার অধিকার থাকিবে না, পুরা গোছা বা পুরা ছড়া নিতে হইবে। যদি বিক্রেতা প্রত্যেক দানা পৃথক পৃথক মূল্য বলিয়া দেয়, তবে ক্রেতার ৫ বা ৭ দানা ৫টা বা ৭টা পৃথক করিয়া নেওয়ার অধিকার থাকিবে।

৮। মাসআলা ঃ কাহারও নিকট চারি প্রকারের জিনিস আছে। সে বলিল, এইসব চারি আনায় বিক্রয় করিলাম। এখন তাহার অনুমতি ছাড়া কোনটি লওয়া এবং কোনটি না লওয়ার অধিকার নাই। (কেননা, সে সবগুলি একত্রে বিক্রয় করিতে চায়।) অবশ্য যদি প্রত্যেকটি জিনিসের দাম পৃথক পৃথক করিয়া বলে, তবে উহা হইতে এক আধটা খরিদ করিতে পারে।

৯। মাসআলা ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সমস্ত কথা এমন পরিষ্কার হওয়া দরকার যাহাতে ভবিষ্যতে কোন ঝগড়ার সৃষ্টি না হইতে পারে। সওদা এবং মূল্য উভয় সম্পর্কে কথা পরিষ্কার হইতে হইবে। (কোন কথাই যেন গোলমাল না থাকে। যদি এই উভয়ের মধ্যে একটি কথাও ভালরূপে জানা না যায় এবং নির্ধারিত না হয়, তবে বিক্রয় ছহীহ্ হইবে না।)

১০। মাসআলা ঃ একজন এক টাকার একটি জিনিস ক্রয় করিয়াছে। এখন ক্রেতা বলে, আপনি আগে জিনিস দেন, পরে টাকা দিব। বিক্রেতা বলে, আপনি আগে টাকা দিলে জিনিস দিব। এখানে শরীঅতের আইন এই যে, আগে ক্রেতা টাকা দিবে পরে জিনিস পাইবে। ক্রেতা টাকা না দেওয়া পর্যন্ত জিনিস না দেওয়ার অধিকার বিক্রেতার আছে। অবশ্য যদি উভয় দিকে একই রকমের জিনিস হয়, যেমন, যদি টাকার বিনিময়ে পয়সা নেয় অথবা কাপড়ের বিনিময়ে কাপড় নিতে হয়, তবে উভয়ের আদান-প্রদান এক সঙ্গে হইবে। এক্ষেত্রে কাহারও আগে-পাছে দেওয়া-নেওয়ার অধিকার নাই।

বিক্রয় দ্রব্যের মূল্য স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া

১। মাসাআলা ঃ কেহ মুঠ বন্ধ করিয়া বলিল, আমার মুঠের ভিতর যত মূল্য আছে, তত মূল্যের জিনিস আমাকে দিন। অথচ মুঠের মধ্যে টাকা আছে, না পয়সা আছে, না গিনি আছে, একটা আছে, না দুইটা আছে কিছুই জানা নাই—এরূপ ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত নাই।

২। মাসআলাঃ যে দেশে দুই রকমের মুদ্রা প্রচলিত আছে, তথায় কোন্ প্রকারের মুদ্রায় আদান-প্রদান হইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে। যদি ক্রয়-বিক্রয়ের ঈজাব-কবূলের সময় পরিষ্কার বলিয়া না থাকে যদি শুধু এতটুকু বলে যে, আমি এই জিনিস এক পয়সায় বিক্রয় করিলাম, ক্রেতা বলিল, আমি নিলাম। তবে শরীঅতের বিধান মতে যে মুদ্রা অধিক পরিমাণে প্রচলিত আছে, তাহাই ধর্তব্য হইবে। যদি উভয়ই সমান প্রচলিত থাকে, ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইয়া যাইবে। (তওবা করিয়া উভয়ে রাযী হইয়া পুনরায় পরিষ্কার ভাষায় ক্রয়-বিক্রয়ের ঈজাব-কবূল করিতে হইবে।)

৩। মাসআলাঃ যদি পয়সা, টাকা বা নোট মুঠা খুলিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, কিংবা পয়সার স্তূপ দেখাইয়া দেওয়া হয়, সংখ্যা বা পরিমাণ বলা না হয়, বিক্রেতাও সংখ্যা না জানিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া মাল বিক্রয় করে, তবে পরে সংখ্যা সম্পর্কে গোলমাল করার অধিকার বিক্রেতার থাকিবে না; যাহা দেখিয়াছে তাহারই বিনিময়ে মাল বিক্রয় হইয়া যাইবে; কেননা, চোখের সামনে দেখিয়া লইলে কারবার দুরুস্ত হওয়ার জন্য সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে না। ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত হওয়ার জন্য সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে। অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত হইবে না।

৪। মাসআলাঃ বিক্রেতা যদি বলে যে, আপনি জিনিস নিয়া নেন, দাম নির্ধারণ করার কি দরকার? আপনার নিকট হইতে কি আর বিশী নিব? ন্যায্য মূল্যই নেওয়া হইবে। অথবা যদি এরূপ বলে যে, আপনি জিনিস নিয়া যান, আমি আমার আব্বার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তিনি যে দাম বলেন, তাহাই আপনার নিকট হইতে নিব। অথবা যদি এরূপ বলে, ঠিক এই নমুনার মালই অমুকে নিয়াছেন, তিনি যে দাম দেন, আপনিও ঠিক তাহাই দিবেন। অথবা যদি বলে, আপনার যাহা মর্জি হয় তাহাই দিবেন, এখন মাল লইয়া যান, আমি তাহাতে একটুও অমত করিব না বা গোলমাল করিব না। অথবা যদি বলে, বাজার যাচাই করিয়া নেন, পাঁচ জায়গায় যে দাম হয় তাহাই দিবেন, আমি নিয়া নিব। অথবা যদি বলে, আপনি মাল নিয়া আপনার আব্বাকে দেখান, তিনি যাহা বলেন, তাহাই নিয়া নিব। এই সব ছুরতে যেহেতু ঈজাব-কবূলের সময় কথা পরিষ্কার হয় নাই—কাজেই এই সব অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইয়াছে। অবশ্য উভয়ে ঐ জায়গায় থাকাকালেই যদি কথা পরিষ্কার করিয়া লইত, তবে ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত হইত। নতুবা জায়গা পরিবর্তন হইয়া যাওয়ার পর যদি কথা পরিষ্কার করা হয়, তবে পুনরায় নূতন করিয়া উভয়ে রাযী খুশী হইয়া ঈজাব-কবূল করিতে হইবে। পূর্বের ঈজাব কবূল ঠিক হয় নাই। (তাহা তওবা করিয়া পূর্ব ঈজাব কবূল ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।)

৫। মাসআলাঃ দোকান নির্ধারিত আছে, যখন জিনিসের প্রয়োজন হয় তথা হইতে আনা হয়, যেমন আজ সুপারি, কাল ডাল ইত্যাদি আনায় এবং দাম জিজ্ঞাসা করা হয় না। মনে করে যখন হিসাব হইবে, তখন চুকাইয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ করা দুরুস্ত আছে। এইরূপে ঔষধের দোকান হইতে ঔষধ আনিয়াছে, দাম জিজ্ঞাসা করে না। মনে করিয়াছে ভাল হওয়ার পর দাম দিব; ইহাও দুরুস্ত আছে।

৬। মাসআলাঃ কাহারও হাতে হয়ত একটা টাকা আছে। তিনি বলিলেন, এই টাকাটার পরিবর্তে আপনার ঐ মালটা আমাকে দিন। এরূপ কারবার করিলে অবিকল ঐ টাকাটাই যে দিতে হইবে, তার কোন মানে নাই। মোটের উপর একটা টাকা দিতে হইবে। অবশ্য যে টাকা দিবে তাহা যেন অচল না হয়। চল টাকাই দিতে হইবে।

৭। মাসআলা ঃ এক টাকার মাল কিনিলে একটি টাকা বা দুইটি আধুলি বা চারিটি সিকি দিলে বিক্রেতা তাহা নিতে বাধ্য থাকিবে, অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি এক টাকার পয়সা দেয়, তবে বিক্রেতার ইচ্ছা, নিতেও পারে, নাও নিতে পারে। পয়সা নিতে না চাহিলে টাকাই দিতে হইবে।

৮। মাসআলা ঃ কলমদান কিংবা বাক্স বিক্রয় করিলে সঙ্গে সঙ্গে চাবিও বিক্রয় হইয়া গেল। চাবির দাম পৃথক লইতে পারিবে না। চাবি নিজের কাছেও রাখিতে পারিবে না। তদ্রূপ তালা বিক্রয় করিলে তার চাবিও সে সঙ্গে দিতে হইবে। বিক্রেতা একথা বলিতে পারিবে না যে, আমি তালা বিক্রয় করিয়াছি, চাবি তো বিক্রয় করি নাই। (অবশ্য যদি প্রথমেই বলিয়া দেয় যে, আমি তালা বা চাবি বিক্রয় করিতেছি, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। নতুবা সাধারণ কথার অর্থ সর্বজন প্রচলিত [ওরফের] মোতাবেকই গৃহীত হইবে।)

বিক্রেয় দ্রব্যের সঠিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া

১। মাসআলা ঃ ধান, চাউল, গম, যব, ছোলা, মটর, মসুরী ইত্যাদি খাদ্য-শস্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তার রকম, তার গুণ, তার পরিমাণ নির্দিষ্টরূপে জ্ঞাত থাকা চাই। গুণ এবং রকম দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া লইবে। পরিমাণ জানার জন্য নিক্তির ওজনে হউক বা কাঠা পোয়ার দ্বারা হউক বা এক জায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া দেখিয়া হউক তিনো প্রকারেই দুরুস্ত আছে। যে দেশে যেরূপ প্রচলন আছে সেরূপে করিলেও তাতে কোন দোষ নাই। মোটের উপর সঠিকভাবে জানা থাকা চাই। যে পরিমাণ ক্রয় করিবে সেই পরিমাণের অধিকারী ক্রেতা হইবে এবং বিক্রেতা সেই পরিমাণ পুরাপুরি দিতে বাধ্য থাকিবে।

২। মাসআলা ঃ আম, আমরুদ, লেবু, শশা, কুসি ঝিংগা, তরৈ ইত্যাদি ফল-ফলারি বা তরি-তরকারী গণনা হিসাবে হউক বা ওজন হিসাবে হউক উভয় প্রকারে দুরুস্ত আছে। টুকরী বা স্তূপ (টাল) দেখাইয়াও বিক্রয় দুরুস্ত আছে। যে পরিমাণ বিক্রয় করিবে, তাহা সম্পূর্ণ ক্রেতার হইয়া যাইবে।

৩। মাসআলা ঃ কেহ কুল জাম ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আসিল। তাহাকে বলা হইল, এক পয়সার বিনিময়ে এই ইটের ওজনে মাপিয়া দাও। বিক্রেতা ইহাতে রাযী হইল। কিন্তু ইটের ওজন কতটুকু তাহা কাহারও জানা নাই। এমতাবস্থায় এই ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত আছে।

৪। মাসআলা ঃ আম বা আমরুদের টুকরী যদি এইভাবে বিক্রয় করে যে, এই টুকরীতে একশত আছে, এক টাকায় বিক্রয় করিতেছি। গণিয়া দেখা গেল ৭৫টা আম আছে, তবে যদি ক্রেতা ইচ্ছা করে, তবে হিসাব করিয়া একশত আমের মূল্য এক টাকা হিসাবে ৭৫টির দাম বার আনা দিতে পারিবে। পুরা এক টাকা তাহার দিতে হইবে না। যদি গণনার পর দেখা যায় যে, ১২৫টি আম আছে, তবে ক্রেতা ১০০টি এক টাকায় নিতে পারিবে, বাকী ২৫টি বিক্রেতার থাকিবে অতিরিক্ত ২৫টি নেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকিবে না। অবশ্য যদি সংখ্যার উল্লেখ আদৌ না করিয়া থাকে, তবে কম বেশী কিছুই দেখা যাইবে না, পুরা টুকরী ক্রেতা পাইবে চাই কম হউক, চাই বেশী হউক।

৫। মাসআলা ঃ ধুতি, শাড়ী, চাদর ইত্যাদি যে সব কাপড় গজ হিসাবে কাটিয়া বিক্রয় হয় না, কিন্তু গজ, হাত ফুট ইত্যাদি বা গিরার মাপ থাকে, সেই সব কাপড় যদি এইভাবে বিক্রয় হয় যে,

৩ গজি চাদর বা পাঁচ গজি ধুতি ৬·০০ বা ৭·০০ টাকায় ক্রয়-বিক্রয়ের ঈজাব-কবূল দ্বারা বিক্রয় সাব্যস্ত হইল। পরে মাপিয়া দেখা গেল যে, চাদর ৬ হাতের জায়গায় ৫ হাত আছে এবং ধুতি ১০ হাতের স্থলে ৯ হাত আছে, এরূপ অবস্থা হইলে ক্রেতার এই অধিকার হইবে না যে, এক হাত কমের পরিবর্তে এক টাকা কম দিবে। অবশ্য ক্রয়-বিক্রয় নিয়ম মত সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে এই অধিকার দেওয়া হইবে যে, ইচ্ছা করিলে নাও দিতে পারিবে। যদি ৬ হাতের স্থলে ৬১/২ হাত ১০ হাতের পরিবর্তের ১০১/২ হাত হয়, তবুও ক্রেতার এই আধ হাতের দাম অতিরিক্ত দিতে হইবে না। বিক্রেতাও ঐ অতিরিক্ত আধ হাত কাটিয়া রাখিতে বা উহার মূল্য আদায় করিতে পারিবে না।

৬। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি দুইটি রেশমী ইজারবন্দ রাতে এক সঙ্গে এক টাকায় খরিদ করিয়াছে। দিনের বেলায় দেখিল একটা সূতী অপরটি রেশমী। এরূপ অবস্থা হইলে উভয়টির ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত হয় নাই। বিক্রেতার উভয়টা ফেরত নিতে হইবে। এইরূপে যদি দুইটি আংটি এই শর্তে খরিদ করে যে, উভয়টির পাথর ফিরোজা। পরে জানা গেল যে একটার ফিরোজা নাই, অন্য কিছু, তবে উভয়টির বিক্রি নাজায়েয হইবে। ক্রেতা যদি একটা নিতে চায়, তবে পুনরায় দাম দস্তুর করিয়া দিতে হইবে। পূর্বের দাম দস্তুর ও আকদ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

বাকী ক্রয়-বিক্রয়

১। মাসআলা ঃ বাকী ক্রয়-বিক্রয় দুরুস্ত আছে। কিন্তু, সময় নির্ধারিত করিয়া দিতে হইবে। ক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয় ঈজাব-কবূল এবং আকদ করার সময়েই বলে যে, আমি বাকী নিব, তবে টাকা দেওয়ার তারিখ ও সময় নির্ধারিত করিয়া বলিতে হইবে, নতুবা ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইবে। আর যদি আকদের সময় কিছু না বলে, পরে বলে যে, টাকা কিছুদিন পরে দিব, তবে আক্‌দ ফাসেদ হইবে না, দুরুস্ত হইবে। কিন্তু বিক্রেতা তখনই মূল্য পাইবার অধিকারী হইবে। অবশ্য ইচ্ছা করিলে সময় দিতে পারে, নাও দিতে পারে।

২। মাসআলা ঃ ক্রেতা বিক্রেতাকে বলিল, আপনার অমুক জিনিসটি আমাকে দিয়া দিন, যখন আমার আব্বাজান বাড়ী আসিবেন বা টাকা পাঠাইবেন, যখন ধান কাটা পড়িবে বা পাট কাটা পড়িবে, তখন দাম দিব। অথবা বিক্রেতাই ক্রেতাকে বলিল, আপনি নিয়া নেন, যখন টাকা হাতে হয় তখন দাম দিবেন। এরূপ ছুরতে ক্রয়-বিক্রয় করিলে তাহা ফাসেদ হইবে এবং গোনাহ্ হইবে। (কেননা সময় নির্দিষ্ট করা হয় নাই, পরে ঝগড়া হইবে। হয়ত বিক্রেতা আগে তাগাদা করিবে, ক্রেতা পরে দিতে চাহিবে। এইজন্য সময় নির্দিষ্ট হওয়া চাই।) অবশ্য যদি কেনা-বেচার সময় এরূপ কথা না বলিয়া খরিদ করার পর বলে (ক্রয়-বিক্রয়) দুরুস্ত হইবে বটে, কিন্তু যখনই দাম দেওয়া হইবে এবং বিক্রেতার তখনই দাম আদায় করিয়া নেওয়ার অধিকার হইবে। (বায়-ফাসেদ হইলে সে বায় তুড়িয়া দিয়া পুনরায় ছহীহ্‌ভাবে বায় করা উচিত। তাহা হইলে বায়ে-ফাসেদের গোনাহ্ হইতে রেহাই পাইবে।)

৩-৪। মূল মাসআলা ঃ এক টাকায় ত্রিশ সের গেঁহু নগদ মূল্যে বিক্রয় হয়, কিন্তু কেহ ধারে ক্রয় করিতে চাহিলে তাহার নিকট টাকায় ১৫ সের গেঁহু বিক্রয় করিল, ইহা দুরুস্ত আছে। কিন্তু ঐ সময় জ্ঞাত হওয়া চাই যে, ধারে বিক্রয় হইতেছে। এই হুকুম ঐ সময়ে প্রযোজ্য যখন ক্রেতার নিকট প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়া লয় যে, নগদ না বাকী। নগদ বলিলে দিল ২০ সের আর বাকী

বলিলে ১৫ সের দিল, ইহা জায়েয। আর যদি বিক্রেতা বলে যে, নগদ দামে টাকায় ২০ সের আর বাকী নিলে টাকায় ১৫ সের তবে ইহা জায়েয হইবে না।

৫। মাসআলা ঃ কেহ এক মাসের ওয়াদায় একটি জিনিস ধারে ক্রয় করিল বহু চেষ্টা চরিত্রের পর সময় মত মূল্য পরিশোধ করিতে পারিল না। পরে অনেক বলিয়া কহিয়া আরও ১৫ দিনের সময় চাহিল। বিক্রেতা রাযী হইয়া ১৫ দিনের সময় দিল, ইহা দুরুস্ত আছে। যদি বিক্রেতা রাযী না হয়, তবে সে মূল্য প্রাপ্তির জন্য তাগাদা করিতে পারে। (অভাবগ্রস্তকে সময় দিলে পাওনাদার নেকী পাইবে। দেনাদার ত যেহেতু ওয়াদার সময় হাযির হইয়া মাফ চাহিয়াছে সেজন্য সেও ওয়াদা খেলাফীর গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবে। শরীঅত মত দ্বিতীয় সময় শেষ হওয়ার পূর্বে তাগাদা করিতে পারিবে না। অতিরিক্ত সময় দেওয়ার বিনিময়ে যদি দাম কিছু বাড়াইতে চায়, তবে উহা তাহার জন্য হালাল হইবে না। —অনুবাদক)

৬। মাসআলা ঃ দেয় মূল্য নিকটে থাকা সত্ত্বেও আজ নয় কাল, এখন নয় তখন, ভাংতি টাকা নাই, টাকা ভাঙ্গাইলে দাম পাইবে, এইরূপ টালবাহানা করা হারাম। চাওয়া মাত্র টাকা ভাঙ্গাইয়া দাম দেওয়া উচিত। অবশ্য ধারে খরিদ করিয়া থাকিলে যে কয়দিনের ওয়াদা করিয়াছে তাহা পুরা হওয়ার পর দেওয়া ওয়াজিব (পাওনাদারও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাগাদা করিতে পারিবে না) নির্ধারিত সময় শেষ হইলে পর টালবাহানা বা খামাখা দৌড়ান ও পেরেশান করা জায়েয নহে। অবশ্য সত্য সত্যই যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজের নিকট হইতে বা অন্য কোথাও হইতে সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে স্বতন্ত্র কথা। সংগ্রহ হওয়া মাত্র দেনা শোধ করিবে। (হক্কুল এবাদের খুব বেশী খেয়াল রাখিবে।)

ফেরত দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয়
(খেয়ারে শর্ত)

১। মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি মাল কিনিবার সময় বলে যে একদিন, দুইদিন বা তিন দিন (৩দিনের বেশী নহে) আমাকে সময় দিন, আমি চিন্তা ও পরামর্শ করিয়া ঠিক করি মাল নিব কি না। এইরূপে শর্ত করা দুরুস্ত আছে। (তিন অথবা তিনের কম) যে কয় দিনের কথা বলিয়াছে সেই কয় দিনের মধ্যে তাহার এখতিয়ার আছে, নিতেও পারিবে, ফেরতও দিতে পারিবে। এই সময়ে বিক্রেতা অন্যের নিকট মাল বিক্রয় করিতে পারিবে না।

২। মাসআলা ঃ 'আমাকে তিন দিনের সময় দেন'—এই কথা বলিয়া ক্রেতা টাকা দিয়া অথবা দিবার ওয়াদা করিয়া মাল নিয়া গিয়াছে। তিন দিনের মধ্যে আর কোন জওয়াব দেয় নাই। এইরূপ অবস্থা হইলে ক্রেতার আর মাল ফেরত দিবার অধিকার থাকিবে না, মাল নিতে বাধ্য হইবে। অবশ্য বিক্রেতা যদি নিজে স্বেচ্ছায় ফেরত নেয়, তবে সে তাহার মেহেরবানী। তাহার অসম্মতিতে ফেরত দিতে পারিবে না।

৩। মাসআলা ঃ তিন দিনের বেশী শর্ত করা দুরুস্ত নহে। যদি ৪ দিন কিংবা ৫ দিনের শর্ত করিয়া থাকে, তবে তিন দিনের মধ্যে মাল ফেতর দিলে ফেরত হইয়া যাইবে, বায় থাকিবে না। আর যদি বলিয়া থাকে যে, আমি মাল নিলাম, তবে বায় ছহীহ্ হইয়াছে। তিন দিনের মধ্যে কিছু না বলিয়া থাকিলে বা কিছু না করিয়া থাকিলে, 'বায়' ফাসেদ হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআলাঃ** উক্তরূপে বিক্রেতাও তিন দিনের শর্ত করিতে পারে যে, আমি মাল বিক্রয় করিব কি না—তজ্জন্য (এক, দুই বা) তিন দিনের সময় চাই। এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইচ্ছা করিলে সে মাল নাও দিতে পারিবে বা ফিরাইয়া লইতে পারিবে। ইহা জায়েয।

৫। **মাসআলাঃ** ক্রেতা মাল নিবে কিনা, তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তিন দিনের সময় চাহিল। একদিন বা দুই দিন পর দোকানে আসিয়া বলিল, মাল ফেরত দিব না বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি, মাল নিতেছি। এমন কি, মাল নিয়া বাড়ী আসিয়াই বলে যে, আমি মাল নিতেছি, এখন আর ফেরত দিব না। এইরূপ একবার বলা মাত্রই মাল ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে না। পুনরায় ফেরত দেওয়া স্থির করিলে তাহা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য হইবে না। ইহা হইল মাল রাখার রায় স্থির করিলে তাহার বিধান। যদি ফেরত দেওয়ার মত করে, তবে বিক্রেতার সম্মুখে গিয়া বলিতে হইবে, বা অন্ততঃ তাহাকে খবর পৌঁছাইতে হইবে। অগোচরে বলিলে দুরুস্ত হইবে না। (নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খবর না পৌঁছাইলে মাল ফেরত দিবার অধিকার ক্রেতার থাকিবে না।)

৬। **মাসআলাঃ** ক্রেতা বলিল, আমি তিন দিনের সময় দিতেছি, যদি আমার মার মত হয়, তবে মাল রাখা হইবে, তাঁহার মত না হইলে ফেরত দেওয়া হইবে। এইরূপও দুরুস্ত আছে। তিন দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়ার এখ্‌তিয়ার থাকিবে। তিন দিনের মধ্যে সে বা তাহার মা বলিল, "মাল নিলাম" ; এখন আর ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৭। **মাসআলাঃ** দুই কিংবা তিন খানা জিনিস লইল। বলিল, তিন দিন পর্যন্ত আমার এখতিয়ার থাকিবে যে, পছন্দ হইলে ইহার যে কোন একখানা দশ টাকায় লইব। এইরূপ তিনটি জিনিসের তিন দিনের মধ্যে একখানা পছন্দ করিয়া লওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু ৪/৫ খান লইয়া যদি বলে যে, ইহার মধ্যে হইতে একখানা পছন্দ করিয়া লইব, তবে দুরুস্ত হইবে না। (অর্থাৎ তিনের বেশী জিনিস তিন দিনের জন্য লওয়া দুরুস্ত হইবে না। তিন দিনের মধ্যে যদি একটিও ফেরত না দেয়, তবে তিনটি জিনিসই রাখিতে বাধ্য হইবে। তিনটির বেশী জিনিস লইলে 'বায়' ফাসেদ হইবে।)

৮। **মাসআলাঃ** ক্রেতা একটি জিনিস তিন দিনের সময় লইয়া বাড়ী নিয়া উহা ব্যবহার করিতে লাগিল। এখন আর উহা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৯। **মাসআলাঃ** অবশ্য যদি জামা বা চাদর গায়ে ঠিকমত লাগে কি না, সতরঞ্জি কামরার সমান হয় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য নেয় এবং একবার মাত্র দেখিয়া (মাল লাট না করিয়া) সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে।

অদেখা জিনিস ক্রয়ের বিধান
(খেয়ারে রুইআত)

১। **মাসআলাঃ** না দেখিয়া জিনিস ক্রয় করা জায়েয আছে কিন্তু দেখার পর ক্রেতার এখতিয়ার থাকিবে, যদি পছন্দ হয় তবে নিবে। পছন্দ না হইলে ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকিবে। জিনিসের কোন আয়েব না থাকিলেও শুধু দেখিয়া রাখা না রাখার অধিকার ক্রেতার আছে।

২। **মাসআলাঃ** উক্ত বিক্রেতা যদি কোন জিনিস না দেখিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে ক্রেতাকে জিনিস দিতে বাধ্য থাকিবে। দেখার পর এখতিয়ার থাকে কেবল ক্রেতার, বিক্রেতার নহে।

৩। **মাসআলা ঃ** ধান, চাউল, গম, মটর ও শুপারি ইত্যাদি জিনিস সাধারণতঃ (উপরে নীচে এক রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপরে ভাল নীচে মন্দ এরূপ ধোঁকা দেওয়া উচিত নহে।) যে সব জিনিস নমুনা দেখাইয়া বিক্রয় হয় নমুনার খেলাফ হওয়া চাই না। এই ধরনের জিনিস যদি ক্রেতার সরল বিশ্বাসে শুধু উপরে দেখিয়া ক্রয় করে, আর উপরে নীচে একই রকম মাল নমুনার মোতাবেক পাওয়া যায়, তবে বায় দুরুস্ত এবং চূড়ান্ত হইয়া যাইবে। ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু যদি নীচে নমুনার খেলাফ খারাব মাল পাওয়া যায়, তবে ঐ মাল সম্পূর্ণ ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকিবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যে সব জিনিস সাধাণতঃ উক্ত রকম হয় না, ছোট বড় হয় সেই সব জিনিস শুধু উপরে দেখিয়া কেনা উচিত নহে। উপরে নীচে ভালরূপে দেখিয়া ক্রয় করিবে। উপরে নীচে ভালমত না দেখা পর্যন্ত খেয়ারে রুইয়াত থাকিবে। অর্থাৎ দেখিয়া পছন্দ না হইলে ফেরত দিতে পারিবে। উপরে নীচে ভালরূপে দেখিয়া ক্রয় করিলে ফেরত দিতে পারিবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** পানাহারের জিনিস যাহা চাখিয়া দেখিতে হয় তাহা শুধু চোখে দেখিয়া ক্রয় করিলে ফেরত দিবার এখতিয়ার চলিয়া যাইবে না; বরং চাখিয়াও দেখিতে হইবে। চাখিয়া দেখার পরে অপছন্দ হইলে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে (এরূপ ঘ্রাণ লইবার বা হাতে ধরিয়া দেখার জিনিসেরও এই একই হুকুম।)

৬। **মাসআলা ঃ** অনেক দিন আগে একটি জিনিস দেখিয়াছিল, এখন তাহা খরিদ করিল, কিন্তু এসময় দেখে নাই। ঘরে নিয়া দেখিল পূর্বে যেরূপ দেখিয়াছিল ঠিক সেরূপ আছে, এখন দেখার পর ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে না। কিন্তু অনেক দিনের পর কিছু পরিবর্তন হইয়া থাকিলে নেওয়া না নেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে।

বিক্রয় দ্রব্যে দোষ প্রকাশ পাওয়া

১। **মাসআলা ঃ** বিক্রয় করার সময় মালে যদি কোন প্রকার দোষ থাকে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া বিক্রেতার উপর ফরয। দোষের কথা না বলিয়া ধোঁকা দিয়া মাল চালাইয়া দেওয়া হারাম। (যে এরূপ করিবে সে ফাসেক দলভুক্ত হইবে।)

২। **মাসআলা ঃ** এক থান কাপড় কিনিয়া বাড়ী আনার পর দেখা গেল যে, তাহাতে দোষ আছে; এখন ক্রেতার এখতিয়ার আছে, থান ফেরত দিয়া তাহার টাকা সে ওসুল করিয়া নিতে পারিবে। আর যদি পূর্ণ দাম দিয়া উহা রাখিতে চায় তাহাও সে পারিবে, দোষের কারণে দাম কম দিতে পারিবে না। দোষ থাকায় যদি স্বেচ্ছায় কিছু দাম ফেরত দেয় তাহা সে দিতে পারে।

৩। **মাসআলা ঃ** ক্রেতা একখানা কাপড় কিনিয়া বাড়ী আনিয়াছে। ছেলেমেয়েরা উহার একটি কোনায় কিছু ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে অথবা কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে, তারপর দেখিল যে, কাপড়ে আরও পূর্বের দোষ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় সে ঐ মাল ফেরত দিতে পারিবে না। কারণ, বিক্রেতার বাড়ীর পুরাতন আয়েব ছাড়া ক্রেতার নিকট আসার পর আরও নূতন আয়েব লাগিয়া গিয়াছে। এখন এই করিতে হইবে যে, উভয়ে দুইজন ন্যায়বান সালিস মানিয়া তাহারা পূর্বের পুরাতন আয়েবের কারণে যত দাম কম করিতে বলে তত দাম কম করিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** ক্রেতা জামার কাপড় কিনিয়া দরজির দ্বারা কাটানোর পর কাপড়ে আয়েব প্রকাশ পাইয়াছে। এখন আর এই কাপড় ফেরত দিবার এখতিয়ার ক্রেতার থাকিবে না। অবশ্য

উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী সালিস মাধ্যমে আয়েব পরিমাণ দাম ফেরত পাইবার অধিকারী হইবে। কিন্তু যদি বিক্রেতা ঐ কাটা অবস্থায়ই পুরা দাম ফেরত দিয়া সম্পূর্ণ কাপড় ফেরত নিতে চায়, তবে সে অধিকার তাহার হইবে, ক্রেতা তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। জামা সেলাই করার পর আয়েব ধরা পড়িলে বিক্রেতা উহা ফেরত নিবার অধিকারী হইবে না। আয়েব পরিমাণ মূল্য তাহার ফেরত দিতে হইবে। যদি ক্রেতা ঐ কাপড় বিক্রয় করিয়া থাকে বা নিজের নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের জামা বানাইয়া দেওয়ার নিয়তে কাপড় কাটাইবার পর আয়েব ধরা পড়ে, তবে আয়েবের পরিবর্তে দাম ফেরত দিতে পারিবে না। যদি বালেগ ছেলে-মেয়েদের জামা বানাইবার নিয়তে কাটাইয়া থাকে, তবে আয়বের পরিমাণ দাম ফেরত নিতে পারিবে।

৫। **মাসআলা ঃ** ক্রেতা প্রতিটি আণ্ডা এক আনা করিয়া এক কুড়ি আণ্ডা খরিদ করিয়া ভাঙ্গিয়া দেখিল সবগুলি খারাব। এমতাবস্থায় ক্রেতা সমস্ত পয়সা ফেরত লইতে পারিবে। আর যদি কতকগুলি খারাব বাহির হইয়া থাকে, তবে খারাবগুলির দাম প্রতি আণ্ডায় এক আনা করিয়া ফেরত লইতে পারিবে। যদি গণনা হিসাবে না কিনিয়া ঝাঁকা হিসাবে কিনিয়া থাকে যে, এই ঝাঁকা আণ্ডার দাম পাঁচ টাকা, তবে দেখিতে হইবে, খারাব কি পরিমাণ বাহির হইয়াছে। যদি শতের মধ্যে ৪/৫টা খারাব বাহির হইয়া থাকে, তবে উহার কোন হিসাব নাই। আর যদি বেশী খারাব বাহির হইয়া থাকে, তবে মোট আণ্ডা হিসাব করিয়া পড়তা হিসাবে খারাবগুলির দাম ফেরত লইতে পারিবে।

৬। **মাসআলা ঃ** ক্রেতা কদু, কুমড়া, পটল, ঝিঙ্গা, কুসি ইত্যাদি তরকারি অথবা আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল ক্রয় করিয়াছে; ভাঙ্গিয়া ভিতরে দেখে যে, একেবারে সব পচা বা পোকা বা খাওয়ার অনুপযুক্ত। এমতাবস্থায় দেখিতে হইবে, কোন কাজে লাগিতে পারে কি না, যদি কাজের অনুপযুক্ত হয়, তবে এই বেচাকিনাই শুদ্ধ হয় নাই, এসমস্ত মূল্য ফেরত লইতে পারিবে। আর যদি কোন কাজের উপযুক্ত থাকে, তবে বাজারে ইহার দাম যাহা হইতে পারে বিক্রেতা সেই দামই পাইবে, অতিরিক্ত পাইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** বাদাম, পটল ইত্যাদি জিনিসের মধ্যে যদি শতকরা ৪/৫টা খারাব বাহির হয়, তবে তাহার কোন হিসাব নাই। এর চেয়ে বেশী খারাব বাহির হইলে অবশ্য সেই হিসাবে দাম কাটিয়া লওয়া হইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** এক টাকায় ১৫ সের গম কিনিল বা এক টাকায় দেড় সের ঘি কিনিল বা কোন একটি জিনিস ক্রয় করিলে যদি অনেক অংশ ভাল থাকে এবং কতক অংশ আয়েবদার থাকে, অথবা যে-জিনিস মাপে ওজনে বিক্রি হয়—যেমন, ধান, চাউল ইত্যাদি সেই জিনিস যদি কতক ভাল থাকে, কতক আয়েবদার হয়, তবে ক্রেতার এই অধিকার হইবে না যে, ভাল অংশ বাছিয়া রাখিয়া অন্য অংশ ফেরত দেয়। যদি তার নিতে হয়, সব অংশ নিতে হইবে নচেৎ সব ফেরত দিতে হইবে। অবশ্য যদি বিক্রেতা নিজে খুশী হইয়া বলে যে, আপনি ভাল অংশ নিতে পারেন অন্য অংশ ফেরত দিতে পারেন, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে। বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া ক্রেতার নিজের ইচ্ছামত এরূপ করিতে পারিবে না।

৯। **মাসআলা ঃ** মালের মধ্যে আয়েব ধরা পড়লে আয়েবের কারণে মাল ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার ততক্ষণ থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা না বুঝা যায় যে, সে ঐ আয়েবদার মালই রাখিতে রাযী আছে। যদি তার কথা দ্বারা বা কাজ দ্বারা বুঝা যায় যে, সে ঐ আয়েব সমেত

মাল রাখিতে রাযী আছে, তবে তারপর আর মাল ফেরত দেওয়ার অধিকার তাহার থাকিবে না। যেমন, একজন ক্রেতা একটি গাভী বা বকরী ক্রয় করিল। বাড়ী আনিয়া আয়েব দেখিল, আয়েব দেখা সত্ত্বেও যদি বলে যে, এই আয়েব সহই আমি এই গাভী রাখিব, তবে তাহার আর ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে না। অথবা যদি মুখে না বলিয়া এমন কাজ করে, যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে ঐ আয়েবসহ মাল রাখিবে। যেমন হয়ত গাভীর গায়ে যখম ছিল, সে সেই যখমের চিকিৎসা করা শুরু করিয়া দিল, তবে আর সেই গাভী ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার তাহার থাকিবে না। অবশ্য যদি বিক্রেতা নিজে ইচ্ছা করিয়া ফেরত নেয় তাহা ভিন্ন কথা।

১০। মাসআলাঃ ক্রেতা বকরীর গোশ্‌ত কিনিয়া আনিয়াছে। পরে ধরা পড়িয়াছে যে, বকরীর গোশ্‌ত নহে, ভেড়ার গোশ্‌ত, তবে ক্রেতা গোশ্‌ত ফেরত দিতে পারিবে।

১১। মাসআলাঃ মোতির হার অথবা অন্য কোন জেওর অথবা জুতা খরিদ করিয়াছে। যদি উহা ব্যবহার (এস্তেমাল) শুরু করিয়া দেয়, জুতা পরিয়া চলাফেরা করে, বা গলায় হার, হাতে জেওর পরিয়া রাখে, তবে আর ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না। অবশ্য যদি হাতে, পায়ে বা গলায় ফিট হয় কিনা তাহা দেখার উদ্দেশ্যে অল্প সময়ের জন্য পরিয়া যখন তখন খুলিয়া থাকে, তবে ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে। কেহ হয়ত একখানা তখতপোষ বা পালঙ্ক খরিদ করিয়াছে। যদি কোন যরূরতবশতঃ এস্তেমাল করে, বিছাইয়া বসে বা নামায পড়ে, তবে আর ফেরত দিতে পারিবে না।

(**জ্ঞাতব্যঃ** আয়েব এমন দোষ-খোঁতকে বলা হয় যাহার কারণে মালের মূল্য কম হইয়া যায়। আর যার কারণে মালের মূল্য কমে না তাহাকে আয়েব বলা হয় না।)

১২। মাসআলাঃ বিক্রেতা মাল বিক্রয় করার সময় ক্রেতাকে বলিয়া দিয়াছে—ভাই! আপনি খুব ভাল করিয়া দেখিয়া নিন। পরে কোন দোষ খুঁত বাহির হইলে আমি তার জন্য দায়ী নহি। ইহা বলা সত্ত্বেও ক্রেতা ক্রয় করিয়া নিয়াছে। পরে যদি কোন আয়েব বাহির হয়, ক্রেতার মাল ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না। এইরূপ বলিয়া বিক্রয় করা দুরুস্ত আছে। আর এরূপ বলিলে আয়েবের কথা বলিয়া দেওয়াও বিক্রেতার জিম্মায় ওয়াজিব থাকে না।

বায়'য়ে বাতেল ও বায়'য়ে ফাসেদ

[বায়' চারি প্রকারঃ ১। বায়'য়ে জায়েয, ২। বায়'য়ে মওকুফ ৩। বায়'য়ে বাতেল, ৪। বায়'য়ে ফাসেদ।

(১) বায়'য়ে জায়েযের দ্বারা শরীঅত অনুসারে ক্রেতা বিক্রেতার ঈজাব-কবূল হইয়া যাওয়ার পরক্ষণেই মালের উপর ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হয়।

(২) বা'য়য়ে মওকুফ। পরের মাল তাহার বিনা অনুমতিতে বিক্রয় করিলে মালের আসল মালিকের বিনা অনুমতিতে ক্রেতার প্রমাণিত স্বত্ব প্রমাণিত হইবে না। অর্থাৎ, ঐ মাল ব্যবহার করা, অধিকার করা তাহার জন্য জায়েয হইবে না। কিন্তু আসল মালিক অনুমতি দিলে ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হইবে এবং তাহার সকল রকমের দখল ব্যবহার জায়েয হইবে।

(৩) বায়'য়ে বাতেল হইলে তাহার দ্বারা আদৌ কোন রকমের মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হইবে না এবং আদৌ কোন রকমের দখল ব্যবহার জায়েয হইবে না। ক্রয়-বিক্রয়, ঈজাব-কবূলও জায়েয হইবে না।

(৪) বায়'য়ে ফাসেদ হইলে তাহার দ্বারা মালিকের অনুমতির পর মাল হস্তগত করিলে ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হইবে বটে, কিন্তু আদৌ কোনরূপ ব্যবহার, খাওয়া পেওয়া বা পরিধান করা জায়েয হইবে না। ঐ বায়'কে তুড়িয়া দেওয়া প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব হইবে।]

১। মাসআলাঃ শরীঅত মতে আদৌ বায়'য়ে বাতেলের কোনরূপ অস্তিত্ব বা মূল্য নাই বরং ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। তা সত্ত্বেও যদি কেহ ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে তার কারণে ক্রেতা জিনিসের মালিক হইবে না, কাহাকেও সে দান করিলে তাহাও জায়েয হইবে না এবং তার নিজের জন্যও ঐ জিনিস ব্যবহার করা জায়েয হইবে না। ঐ জিনিস লাভে বিক্রয় করিলে ঐ লাভ খয়রাত করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েয নহে। (যেমন, শরাব বা শূকর যদি কোন মুসলমান বিক্রয় করে, তবে তাহা হারাম হইবে এবং বাতেল হইবে। নদী, খাল, বিল, বাঁক, গোল ইত্যাদির মাছের কেহই মালিক নহে। সেই মাছ শিকার না করিয়া যদি কেহ বিক্রয় করে, তবে বায়'য়ে বাতেল হইবে। জঙ্গলী পাখীর মালিকও কেহই হয় না। সেই পাখী শিকার না করিয়া যদি কেহ বিক্রয় করে, তবে তাহা বায়'য়ে বাতেল হইবে।)

২। মাসআলাঃ কিন্তু যদি কেহ মাছের জন্য পুকুর খুদিয়া রাখিয়া থাকে সেই পুকুরে মাছ আটকিয়া গিয়া থাকে বা নিজে মাছ ধরিয়া পুকুরে ছাড়িয়া থাকে, তবে পুকুরের মালিকই সেই পুকুরের মাছের মালিক হইবে। মাছ সে বিক্রি করিতে পারিবে। অবশ্য যদি না জানা যায় যে, পুকুরে কি পরিমাণ মাছ আছে, ক্রেতার বা বিক্রেতার ঠকিবার আশংকা আছে, তবে বায়' ফাসেদ হইবে। বায়' ফাসেদ হইলে সেই বায়'কে তুড়িয়া দেওয়া ওয়াজিব; অতএব, যদি কেহ পুকুরের মাছ না ধরিয়া বিক্রি করে, তবে এই করা যাইতে পারিবে যে, পানি সেচিয়া দেখিবে বা মাছ শিকার করিয়া লইলে যখন জানা যাইবে যে, এত পরিমাণ মাছ আছে তখন আগের বায়' তুড়িয়া দিয়া এখন রাযী হইয়া নূতন করিয়া বায়' লইতে হইবে। তাহা হইলে বিক্রেতার পক্ষে ঐ মাছের পয়সা হালাল হইবে। নতুবা হালাল ও পাক হইবে না এবং ক্রেতার পক্ষেও যদি বায়' না তুড়িয়া থাকে, তবে ঐ মাছ ভক্ষণ করা, বিক্রি করা হালাল ও পাক হইবে না। আর যদি কিছু লাভ করিয়া থাকে, তবে লাভের সেই পয়সাও তাহার জন্য হালাল হইবে না। সেই পয়সা গরীব-দুঃখীকে দান করিয়া দিতে হইবে। আর যদি আগের আকদ তুড়িয়া দিয়া রাযী খুশী হইয়া নূতন করিয়া আকদ লইয়া থাকে, তবে হালাল ও পবিত্র হইবে।

৩। মাসআলাঃ কাহারও নিজস্ব জমিতে আপনাআপনি মালিকের বিনা তদবীরে যে ঘাস হয় ঐ ঘাস বিক্রি করা জমির মালিকের জন্য জায়েয নহে, ঐ ঘাসের কেহই মালিক নহে। ঐ ঘাস যে ইচ্ছা কাটিয়া নিতে পারে বা গরু ছাগল দিয়া খাওয়াইতে পারে। কিন্তু জমির মালিক যদি ঐ ঘাসের জন্য কোন তদবীর করিয়া থাকে, চাষ করিয়া থাকে, সার দিয়া থাকে বা বীজ লাগাইয়া থাকে, তবে ঐ ঘাসের মালিক সে-ই হইবে এবং সে ঘাস বিক্রি করাও তার জন্য জায়েয হইবে। অন্যের জন্য তাহার অনুমতিতে সে ঘাস কাটিয়া নেওয়া বা গরু দিয়া খাওয়ান জায়েয হইবে না।

৪। মাসআলাঃ বকরী, গরু, বা ঘোড়া ইত্যাদি জীবের পেটে যে বাচ্চা আছে সেই বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নহে, হারাম এবং বাতেল। বাচ্চা প্রসব হইলে তারপর ক্রয়-বিক্রয় করিবে। কেহ কেহ এইরূপ করিয়া থাকে যে, গাই বিক্রি করিল কিন্তু পেটে যে বাছুর আছে তা বিক্রি করিল না, এইরূপ করা জায়েয নাইঃ (গাই বিক্রি করিলে তার পেটের বাছুরও তার সঙ্গে বিক্রি হইয়া যাইবে।)

৫। মাসআলা ঃ গাইয়ের বাঁটে যে দুধ আছে, না দুহিয়া তাহা বিক্রয় করা বাতেল। দুধ দুহিয়া তারপর ক্রয়-বিক্রয় করিবে।

৬। মাসআলা ঃ কড়ি বর্গা যাহা দালানের ছাদে লাগান আছে, পৃথক করা ব্যতীত তাহা বিক্রয় করা জায়েয নহে।

৭। মাসআলা ঃ মানুষের চুল, দাড়ি, পশম ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা দুরুস্ত নহে, হারাম। (এই হারাম, মানুষের মর্যাদার জন্য।)

৮। মাসআলা ঃ (শূকরের হাড্ডি, পশম ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। এই হারাম, শূকরের নাজাস ও পলীদ হওয়ার কারণে।) শূকর ব্যতীত অন্যান্য মৃত জীবের পশম হাড় এবং শিং ক্রয়-বিক্রয় করা দুরুস্ত আছে।

৯। মাসআলা ঃ কেহ হয়ত কোন জিনিস ক্রয় করিয়াছে কিন্তু এখনও তার দাম চুকাইয়া দিতে পারে নাই। এমন অবস্থায় বিক্রেতা তার নিকট হইতে ঐ জিনিস কম দামে ক্রয় করিয়া নিতে চায়, এইরূপ ক্রয় করা জায়েয নহে। নিলে পুরা দাম দিয়া নিতে হইবে, যেমন কেহ ৫ টাকায় একটি বকরী কিনিয়া নিয়াছে এখনও দাম দেয় নাই। পরে দাম দিতে না পারায় এবং রাখিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় বিক্রেতাকে বলে, ইহা ৪ টাকায় নিয়া যাও বকরীর সঙ্গে একটি টাকা দিয়া দিব। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নাই। বিক্রেতাকে পুরা দাম না দেওয়া পর্যন্ত বিক্রেতার কাছে বিক্রি জায়েয নাই।

১০। মাসআলা ঃ বাড়ী, জমি বা অন্য কোন জিনিস এইরূপ শর্ত করিয়া বিক্রয় করা যে, বিক্রি করিলাম বটে, কিন্তু এত দিন পর্যন্ত দখল দিব না, আমার দখলেই থাকিবে অথবা এইরূপ শর্ত করা যে, এত টাকায় বিক্রি করিলাম বটে, কিন্তু এত টাকা আমাকে করয দিতে হইবে। অথবা এইরূপ শর্ত করা যে, আপনার নিকট হইতে কাপড় কিনিলাম বটে, কিন্তু শর্ত এই যে, জামা সিলাই করিয়া দিতে হইবে। এই ধরনের শর্ত করিয়া একটার মধ্যে আর একটা ঢুকাইয়া গড়-বড় করিয়া বিশৃঙ্খলা করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা না-জায়েয। এইরূপ করিলে বায়'য়ে ফাসেদ হইবে। (সেই আক্‌দ ভাঙ্গিা দিতে হইবে। একটা আকদের দায়িত্ব এবং প্রাপ্য চুকানের পর আর একটা আকদ পৃথকভাবে করা যাইতে পারে, তাতে দোষ নাই। কিন্তু একটার মধ্যে আর একটি ঢুকাইয়া দিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ইসলামী তাহ্‌যীব-বিরুদ্ধ।)

১১। মাসআলা ঃ এইরূপ শর্ত করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা যে, এই গাইটা পাঁচ সের দুধ দিবে, এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় না-জায়েয। এইরূপ করিলে বায়'য়ে ফাসেদ হইবে। অবশ্য জিনিসের সত্য সত্য তারিফ যে টুকু আছে তাহা বর্ণনা করা যাইবে। কিন্তু মিথ্যা তারীফ বর্ণনা করা যাইবে না। তাহা হারাম হইবে।

১২। মাসআলা ঃ মাটির, চীনা মাটির বা রবারের মূর্তির খেলনা অথবা ফটো ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। শরীঅতের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের হইলে ঐরূপ মালের বিক্রেতা দাম পাইবে না; কেহ ঐ ফটো বা মূর্তি নষ্ট করিয়া ফেলিলে মালিক তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারীও হইবে না।

১৩। মাসআলা ঃ ধান, চাউল, তৈল ও ঘি ইত্যাদি যেসব জিনিস ওজন করিয়া বা মাপিয়া ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং উহার মূল্য ঠিক করিয়া ক্রয় করার পর যদি উহা ক্রেতার বা ক্রেতা যে লোক (উকিল) পাঠাইয়াছে তাহার সামনে ওজন করিয়া দিয়া থাকে, তবে বাড়ী যাইয়া ঐ জিনিস পুনরায়

না মাপিয়াও খাওয়া, বেচা বা ব্যবহার করা জায়েয হইবে কিন্তু ক্রেতা বা তাহার উকিলের সামনে না মাপিয়া থাকিলে বরং আগেই মাপিয়া রাখে বা বলে যে, মাপিয়া পাঠাইয়া দিব, এমতাবস্থায় বাড়ী যাইয়া পুনরায় না মাপিয়া ঐ জিনিস খাওয়া, বেচা বা ব্যবহার করা দুরুস্ত হইবে না। না মাপিয়া বিক্রয় করিলে বায়' ফাসেদ হইবে। পরে যদি মাপিয়াও লয়, তবুও বিক্রয় দুরুস্ত হইবে না।

১৪। মাসআলাঃ ক্রয়-বিক্রয়ের আগে যদি ক্রেতার সামনেও মাপা হইয়া থাকে, তবে সে মাপের এ'তেবার করা হইবে না। ক্রেতার আবার মাপিতে হইবে, না মাপিয়া খাওয়া বা বিক্রয় করা দুরুস্ত নাই।

১৫। মাসআলাঃ জমিন, বাড়ী ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য অস্থাবর দ্রব্য ক্রয় করিলে তাহা হস্তগত (কবযা) করার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করিলে বায়'য়ে ফাসেদ হইবে।

১৬। মাসআলাঃ একটা বকরী, একটা গরু বা একখানা নৌকা একজনের কাছ থেকে আপনি কিনিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে একজন আসিয়া বলে যে, এ নৌকা ত আমার; কে যেন চুরি করিয়া আনিয়া আপনার নিকট বিক্রি করিয়া দিয়াছে।' এই দাবীদার তাহার দাবী যদি শরীঅতের আদালতে দুইজন সত্যবাদী সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করিতে পারে, তবে ঐ জিনিস তাহাকে দিয়া দিতে হইবে এবং তার কাছ থেকে কোন দাম বা ক্ষতিপূরণ আপনি আদায় করিতে পারিবেন না। (কারণ, ভুল আপনারই, তাহার ভুল নহে।) অবশ্য আপনি যদি আপনার বিক্রেতাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন, তবে তাহার নিকট হইতে জিনিসের দাম এবং ক্ষতিপূরণ উসুল করিবার আপনি হকদার হইবেন।

১৭। মাসআলাঃ মরা মুরগী, বকরী বা গরু বিক্রয় করা হারাম, মৃত জানোয়ার মেথর চামারকে খাইতে দেওয়া হারাম, অবশ্য যদি ফেলাইয়া দিবার জন্য তাহাকে দেওয়া হয় এবং সে লইয়া গিয়া খায়, তবে জানোয়ারের মালিক গোনাহ্‌গার হইবে না। অবশ্য যদি কেহ ঐ জানোয়ারের চামড়া তুলিয়া নিয়া দাবাগাত করিয়া বিক্রয় করে বা নিজে ব্যবহার করে, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে।

১৮। মাসআলাঃ একজনে একটা জিনিস দাম ঠিক করিতেছে। যাবৎ সে ছাড়িয়া না যায় তাবৎ অন্য একজনের ঐ জিনিসের দাম ঠিক করা জায়েয নহে। (অবশ্য নিলাম ডাকের ছুরত হইলে যাহার যত ইচ্ছা দাম বাড়াইতে পারে।)

একজন একটা জিনিস একজনের নিকট হইতে কিনিতেছে তখন ঐ খরিদ্দারকে ভাগাইয়া নিজের দিকে আনা অর্থাৎ এইরূপ বলা যে, আপনি ওর কাছ থেকে কিনিবেন না, আমি ওর চেয়ে কম দামে দিব, এরূপ করা জায়েয নহে।

১৯। মাসআলাঃ আপনি একজনের নিকট হইতে চারিটি পেয়ারা চারি পয়সায় ক্রয় করিয়াছেন। তারপর একজন আসিয়া অনেক ঝগড়া ও তাকরার করিয়া তাহার কাছ থেকেই চারি পয়সায় পাঁচটি পেয়ারা লইয়াছে। এখন আপনি তার কাছ থেকে আর একটি পেয়ারা নিতে পারেন না। যদি জবরদস্তি করিয়া নেন, তবে তাহা আপনার জন্য হারাম হইবে এবং অন্যায় হইবে। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে যার সঙ্গে যেরূপ সাব্যস্ত হয়, তার তদ্রূপই নিবার অধিকার আছে। তার চেয়ে বেশী নিবার ন্যায়সংগত অধিকার নাই।

২০। মাসআলাঃ একজন লোক একটা জিনিস বেচিতে চায়, কিন্তু আপনার নিকট বেচিতে চায় না। এইরূপ অবস্থায় আপনার তাহার উপর জবরদস্তি করার আধিকার নাই। আপনি যদি

জোর জবরদস্তি তাহার নিকট হইতে ঐ জিনিস নেন, তবে এইরূপ নেওয়া হারাম হইবে। পুলিশেরা (বা গ্রামের মাতব্বরেরা) অনেকে এইরূপ করে। কিন্তু খবরদার, এইরূপ করা চাই না। (বাড়ীর মেয়েলোকদের তাহ্‌কীক করিয়া লওয়া দরকার যে, পুরুষেরা জবরদস্তি করিয়া কোন জিনিস আনে কি না।)

২১। মাসআলাঃ আট আনা করিয়া আলুর সের বিক্রয় হয়। আপনি আট আনা দিয়া এক সের আলু কিনিয়া আরও ৪/৫টি আলু জোর জবরদস্তি বেশী নিয়া নিলেন। ইহা আপনার জন্য হারাম। অবশ্য বিক্রেতা যদি খুশি হইয়া আপনাকে কিছু বেশী দিয়া দেয়, তবে তাহা আপনার জন্য হালাল হইবে। এইরূপে যে মূল্য ধার্য করা হইয়াছে, সেই মূল্যই আপনার দিতে হইবে। (জিনিস হাতে নিয়া মূল্য দেওয়ার সময় জোর জবরদস্তি বা বিক্রেতাকে লাজে শরমে ফেলিয়া দুই-এক আনা কম দেওয়া আপনার জন্য জায়েয নাই। অবশ্য বিক্রেতা যদি খুশী হইয়া, এক আনা দুই আনা কম নেয়, তাহা সে কম নিতে পারে। সে খুশী হইয়া কম নিলে সেটা আপনার জন্য হালাল হইবে।

২২। মাসআলাঃ যদি কাহারো বাড়ীতে বা জমিতে মৌমাছি বাসা বাধে, তবে ঐ মৌচাকের মালিক বাড়ীওয়ালা বা জমিওয়ালাই হইবে। অন্যের জন্য তাহার বিনা অনুমতিতে ঐ চাক কাটিয়া নেওয়া জায়েয নহে। কিন্তু একটি বন্য (জঙ্গলী) পাখী যদি কাহারও গাছে বাসা বাঁধে এবং বাচ্চা দেয়, তবে সে পাখীর মালিক ঐ গাছওয়ালা হইবে না। যে ধরিবে সে-ই মালিক হইবে। কিন্তু পাখীর শাবক ধরিয়া পাখীকে কষ্ট দেওয়া জায়েয নহে।

২৩। মাসআলাঃ বেশী লাভ পাইবার আশায় দুধের সঙ্গে পানি মিলান। পাটে পানি মিশান, তূলায় মাটি মিশান, ঘিয়ে নারিকেল তৈল মিশান, চাউলের মধ্যে কঙ্কর মিশান ইত্যাদি-এক কথায় ভাল জিনিসের মধ্যে মন্দ জিনিস মিশান বা মাপে কম দেওয়া অতি জঘন্য কাজ। শরীঅত অনুসারে ইহা অতি বড় ভীষণ পাপ এবং সাংঘাতিক হারাম। —অনুবাদক

লাভের উপর মুনাফা চুক্তিতে বিক্রয় করা এবং আসল দামে বিক্রয় করা

১। মাসআলাঃ এক টাকা দিয়া মাল কিনিয়া সে মাল দশ-বিশ টাকায় বিক্রয় করাও জায়েয আছে; কিন্তু যদি ধোঁকা বা ফাকি হয় তবে এইরূপ ফাকি দিয়া এক পয়সা লাভ হইলেও তাহা হারাম হইবে এবং গোনাহ্‌ কবীরা হইবে। যদি মোয়ামালা এইরূপ সাব্যস্ত হয় যে, টাকায় চারি আনা লাভ দেওয়া হইবে অথবা আসল দামে বিক্রয় হইবে—অর্থাৎ, ক্রেতা এইরূপ বলিয়াছে যে, মোটের উপর চারি আনা লাভে মালটা আমাকে দিন, অথবা এইরূপ বলিয়াছে যে, মোটের উপর চারি আনা লাভ নিন, অথবা এইরূপ বলিয়াছে যে, আসল দামে মালটা আমাকে দিন এবং বিক্রেতা তদ্রূপই স্বীকার করিয়া নিয়া এইরূপ বলিয়াছে যে, টাকায় চারি আনা লাভে বিক্রয় করিতেছি, অথবা এইরূপ বলিয়াছে যে, মোটের উপর চারি আনা লাভে আপনার নিকট বিক্রয় করিতেছি অথবা এইরূপ বলিয়াছে যে, আসল দামে আপনার নিকট বিক্রয় করিতেছি, তবে ক্রয় দাম ঠিক ঠিক বলিয়া দেওয়া ফরয। এক পয়সা অতিরিক্ত বলিলেও মহাপাপ গোনাহ্‌ কবীরা হইবে (পয়সা হারাম হইবে, বরকত চলিয়া যাইবে)।

২। মাসআলা ঃ আসল দামের চুক্তিতে অথবা মুনাফা চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইলে ঐ সময় ঐ স্থলেই কেনা দাম বলিয়া দিতে হইবে, নতুবা চলিবে না। যদি এইরূপ বলে যে, আপনি নিয়া যান আমি বিল দেখিয়া দাম ঠিক করিয়া নিব বা বলিয়া পাঠাইব, তবে এইরূপ 'বায়' (ক্রয়-বিক্রয়) জায়েয হইবে না, বায়'য়ে ফাসেদ হইবে।

৩। মাসআলা ঃ মুনাফা চুক্তিতে মাল ক্রয়ের পর জানা গেল যে, বিক্রেতা ধোঁকাবাজি করিয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতা এবং খেয়ানত করিয়াছে, খরিদ-দাম বেশী লাগাইয়াছে, অথবা চুক্তির চেয়ে মুনাফা বেশী লাগাইয়াছে। এইরূপ অবস্থা হইলে ক্রেতা নিজ ইচ্ছায় যত দাম বেশী লাগাইয়াছে উহার কম দিতে পারিবে না। অবশ্য ইচ্ছা করিলে জিনিস ফেরত দিতে পারিবে; আর যদি আসল দামে ক্রয়-বিক্রয়ের পর এইরূপ ধরা পড়ে যে, আসল দাম বেশী লাগাইয়াছে, তবে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে যত বেশী লাগাইয়াছে, তাহা কম দিতে পারিবে।

৪। মাসআলা ঃ মাল যদি বাকী খরিদ করিয়া থাকে এবং পরে মুনাফা চুক্তিতে বা আসল দামে ঐ মাল বিক্রয় করে, তবে বলিয়া দিতে হইবে যে, ভাই, আমি মাল বাকী খরিদ করিয়াছিলাম, তাতে এত পড়িয়াছিল। বাকী খরিদের উল্লেখ ব্যতিরেকে মুনাফা চুক্তিতে বা আসল দামে বিক্রয় করিলে সে বিক্রয় দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি মুনাফা চুক্তির কোন কথা না থাকে বা আসল দামে বিক্রয়ের কোন কথা না থাকে, তবে বাকী খরিদ বা নগদ খরিদ এইরূপ কিছুই ক্রেতাকে বলার দরকার করে না।

৫। মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি একখানা কাপড় পাঁচ টাকায় কিনিয়া তারপর ধোলাই করিয়াছে বা রং করিয়াছে বা সেলাই করিয়াছে (বা উহাতে বহন খরচ লাগিয়াছে) এখন যদি এই কাপড় মুনাফা চুক্তিতে বা আসল দামে বিক্রয় করে, তবে খরিদ দামের সঙ্গে ধোলাই, রং, সেলাই বা বহনের খরচ যোগ করিতে পারিবে। কিন্তু এইরূপ বলিবে না যে, আমি এততেই কিনিয়াছি; বরং বলিবে যে, আমার এত পড়তা পড়িয়াছে। এইরূপ বলিলে মিথ্যা হইবে না।

৬। মাসআলা ঃ একটা গাভী একজনের একশত টাকায় কিনিয়াছে এবং এক মাস পর্যন্ত খাওয়ানে দশ টাকা খরচ গিয়াছে। এখন যদি মুনাফা চুক্তিতে বিক্রয় করিতে হয়, তবে ঐ দশ টাকা একশত টাকার সঙ্গে যোগ করিয়া বলিতে পারিবে যে, আমার ১১০ টাকা পড়িয়াছে। কিন্তু যদি গাভীটি ৫ টাকার দুধ দিয়া থাকে, তবে তাহা বাদ দিয়া দিতে হইবে এবং বলিবে যে, ১১০ টাকা পড়িয়াছিল কিন্তু ৫ টাকার দুধ পাইয়াছি, সে জন্য ১০৫ টাকা পড়িয়াছে।

সুদের কারবারের বিবরণ

সুদ বড় পাপ বড়ই ঘৃণিত কাজ এবং উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার তাকীদ কোরআন হাদীসে বর্ণিত আছে। (ঘুষ খাওয়াও পাপ, দেওয়াও পাপ, ঘুষের দরবার করাও পাপ। অবশ্য কোন যালেম অফিসার বা কোন পাপিষ্ঠ কেরানী আপনারই হক আপনাকে দিয়া দেওয়ার তার যে কর্তব্য ছিল সে কর্তব্য পালন না করিয়া আপনাকে ঘুষ দিতে বাধ্য করে নতুবা আপনার হক অন্য কাউকে দিয়া দিবে। ঐমতাবস্থায় কিছু কিছু দিয়া যদি আপনি আপনার হক আদায় করিয়া নেন, তবে আপনি গোনাহ্গার হইবেন না বটে, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ কেরানী বা অফিসার গোনাহ্গার হইবে। কিন্তু যদি আপনার মনোবৃত্তিই হইয়া থাকে যে, নিয়মতান্ত্রিকতা ব্যতীত ঘুষ দিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া নিবেন, তবে আপনি গোনাহ্গার হইবেন। এইরূপে সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া, সুদের

দলীল-পত্র লেখা, সুদের সাক্ষ্য দেওয়া, সুদের পক্ষে বিচার করা, ডিক্রি দেওয়া—সবই অতি বড় গোনাহ্‌' অতি বড় জঘন্য পাপ। কিন্তু একজন না খইয়া মরিতেছে। দেশবাসী জনসাধারণ বা সরকার তাহার সাহায্য করিতেছে না বা বিনা সুদে কর্জ দিতেছে না, এমতাবস্থায় যদি সুদে টাকা আনিয়া সে তাহার বাল-বাচ্চার জীবন রক্ষা করে, তবে এর জন্য সে যতটা গোনাহ্‌গার হইবে তার চেয়ে বেশী গোনাহ্‌গার হইবে দেশবাসী জনসাধারণ এবং দেশের সরকার। (ছহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত আছে—হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ গ্রহণকারী, ঘুষ দাতা এবং ঘুষের দরবার করনেওয়ালা এই তিনজনের উপর লা'নৎ অবতীর্ণ হওয়ার ঘোষণা দিয়াছেন। (এইরূপে) সুদদাতা, সুদ গ্রহীতা উহার মধ্যস্থতাকারী, সুদের সাক্ষ্যদাতা, সুদের দলীল লেখক সকলের উপরই লানৎ পতিত হওয়ার ঘোষণা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, সুদদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই সমান পাপী। —মুসলেম

আমাদের দেশে সাধারণতঃ শুধু টাকা করযের ব্যাপারে যে সুদ হয় উহাকে সুদ মনে করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা ছাড়াও আরো অনেক প্রকারের সুদ আছে, সর্বপ্রকারের সুদ হইতে প্রত্যেক মুসলমানেরই বাঁচিয়া থাকা একান্ত কর্তব্য।)

১। **মাসআলা** ঃ সাধারণতঃ চারি প্রকারের মাল আছে—(১) সোনা-রূপা বা সোনা-রূপার তৈরী জিনিস-পত্র বা সোনা-রূপার স্থলবর্তী নোট, চেক ইত্যাদি। (২) সোনা-রূপা ব্যতীত অন্যান্য যে সব জিনিস ওজনে বা মাপে ক্রয়-বিক্রয় হয়, লেন-দেন হয় যেমন, ধান, চাউল, গম, আটা, লোহা, পিতল, রূই, তরকারী ইত্যাদি। (৩) যে সব জিনিস গজ দিয়া বা নল দিয়া অথবা শিকল বা ফিতা দিয়া মাপিয়া ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন হয় যেমন, কাপড়, চট, জমি ইত্যাদি। (৪) যে সব জিনিস গণনা করিয়া ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন হয় যেমন, ডিম, আম, আমরূদ, পেয়ারা, কমলা, মাছ, বকরী, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি। সুদ সম্পর্কে এইসব জিনিসের হুকুম ভিন্ন ভিন্নরূপে ভালরূপে বুঝিয়া লউন।

২। **মাসআলা** ঃ সোনা-রূপা ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি ছুরত আছে। এক ছুরত এই যে, সোনার বিনিময়ে সোনা বা রূপার বিনিময়ে রূপা ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে। যেমন, হয়ত গিনি দিয়া সোনা, সোনার জেওর কিনিতেছে অথবা রূপার টাকা বা নোট দিয়া জেওর কিনিতেছে। যদি এইরূপ ছুরত হয়, তবে দুইটি কাজ ফরয হইবে। একটি এই যে, উভয় দিকে ওজনে সমান হওয়া চাই, একদিকে বেশী বা কম হইলে সুদ হইবে। দ্বিতীয় ফরয কাজ এই হইবে যে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ঐ মজলিসেই একে অন্যের থেকে পৃথক হইবার পূর্বেই উভয় পক্ষের দেনা-পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে, বাকী যেন না থাকে। যদি জেওর নিয়া পরে গিনি দেয় বা গিনি নিয়া জেওর পরে দেয়, অথবা টাকা বা নোট নিয়া গিনি বা রূপা পরে দেয় বা রূপা নিয়া টাকা পরে দেয়, তবে সুদ হইবে।

৩। **মাসআলা** ঃ দ্বিতীয় ছুরত এই যে, দুই দিকে একই প্রকার জিনিস নয়—একদিকে সোনা, অন্যদিকে রূপা। এই ছুরতে সমান সমান হওয়া ফরয নহে। (কিন্তু ঐ মজলিসেই উভয় পক্ষের আদান-প্রদান হইয়া যাওয়া ফরয। একটা টাকা বা এক তোলা রূপার বিনিময়ে যতখানি ইচ্ছা সোনা ক্রয়-বিক্রয় তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী করিতে পারে। কিন্তু ঐ মজলিসেই উভয়ের আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে। এইরূপে গিনির বিনিময়ে বা এক তোলা সোনার বিনিময়ে যতখানি ইচ্ছা রূপা তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু ঐ মজলিসেই তাহাদের উভয়ের

আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে, আল্লাহ্‌র শরীঅতের পক্ষ হইতে এই বাধ্য-বাধকতা তাহাদের উপর ফরয করা হইয়াছে।

৪। মাসআলা ঃ বাজারে রূপার ভাও খুব চড়া; এক তোলা রূপার মূল্য হয়ত ১ টাকা। এক টাকায় এক তোলা রূপা বাজারে কেউ দেয় না অথবা রূপার জেওর খুব ভাল গড়নের পাওয়া যায়। ওজন ১০ তোলা, কিন্তু ১২ টাকার কমে দেয় না।

উক্ত অবস্থায় সুদ হইতে বাঁচিবার উপায় এই যে, রূপার টাকায় খরিদ করিও না বরং পয়সা দিয়া কিন। যদি বেশী ক্রয় করিত হয়, তবে আশরাফী দ্বারা ক্রয় কর। অর্থাৎ আঠার আনা পয়সার বিনিময়ে এক ভরি রূপা লও। কিংবা এক টাকার কম রেজকী আর কিছু পয়সা দিয়া কিন, তবে গোনাহ্ হইবে না; কিন্তু রূপার এক টাকা ও দুই আনা পয়সা দিবে না। এইরূপ করিলে সুদ হইবে। এইরূপ যদি ৮ ভরি রূপা ৯ টাকায় নিতে চাও, তবে ৭ টাকা এবং দুই টাকার পয়সা দাও। ৭ টাকার বিনিময়ে ৭ ভরি রূপা হইল। বাকী সব রূপা এই পয়সার বিনিময়ে হইবে। আর যদি দুই টাকার পয়সা না দাও, তবে কম পক্ষে আঠার আনা পয়সা দিতে হইবে; অর্থাৎ, ৭ টাকা ও চৌদ্দ আনার রেজকী দিলে রূপার বিনিময়ে ঐ পরিমাণ রূপা হইল। বাকী রূপা পয়সার বিনিময়ে হইল। আর যদি ৮ টাকা এবং এক টাকার পয়সা দাও, তবে গোনাহ্ হইতে বাঁচিতে পারিবে না কারণ ৮ টাকার বিনিময়ে আট ভরি রূপা হওয়া চাই। আবার এই পয়সা কিসের বিনিময়ে? অর্থাৎ এই পয়সা সুদ হইবে। মোটকথা, এতটুকু সর্বদা মনে রাখিবে, যে পরিমাণ রূপা লইবে উহা অপেক্ষা কম রূপা দিবে আর বাকী পয়সা দিবে। যদি পাঁচ ভরি রূপা পাও তবে পুরা ৫ টাকা দিবে না। দশ ভরি রূপা লইলে পুরা দশ টাকা দিবে না কম দিবে। বাকীটা পয়সায় দিয়া দিবে, তবে সুদ হইবে না। আর একথা স্মরণ রাখিবে এরূপে কোন সময়েই ক্রয় করিবে না যে, ৯ টাকায় এত পরিমাণ রূপা দেও, যদি এরূপ বল তবে সুদ হইবে। বরং বল যে, ৭ টাকা এবং দুই টাকার পয়সার বিনিময়ে এই পরিমাণ রূপা দেও। ভালরূপে বুঝিয়া লও।

৫। মাসআলা ঃ অথবা যদি উভয় পক্ষ রাজি হইয়া যেদিকে কম সেদিকে কিছু তামার (দস্তার) পয়সা শামিল করিয়া দেওয়া হয়—যেমন, হয়ত ১০ ভরি রূপার সঙ্গে দুই আনার পয়সা শামিল করিয়া দেওয়া হইল। ক্রেতা ১৪টি টাকা এবং ৮ আনা তামার পয়সা দিল—ইহাও দুরুস্ত হইবে। এস্থলে তামার পরিবর্তে রূপা এবং রূপার পরিবর্তে তামা ধরিয়া লওয়া হইবে এবং সুদের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। আর বিক্রেতা যদি এইরূপ করিতে রাজী না হয় বা তাকে এরূপ করিতে বলাও সম্ভব না হয়, তবে ক্রেতা এইরূপ করিলে রেহাই পাইতে পারিবে যে, নয়টি টাকা রূপার দিবে বা ৯ টাকার নোট দিবে, বাকী ১ ভরি রূপার পরিবর্তে দস্তা তামা বা পিতলের ৫ টাকা ৬ আনার পয়সা দুয়ানী প্রভৃতি দিবে, ১০ ভরি রূপার পরিবর্তে পুরা ১০ টাকা রূপা (বা ১০ টাকার নোট) দিবে না। কারণ, তাহা হইলে সুদ হইতে রেহাইর ছুরত হইবে না। (অজ্ঞ লোকেরা এইরূপ করাকে হিলা, চতুরতা বা খেলা মনে করে। কিন্তু যাহারা বিজ্ঞ লোক তাহারা জানেন যে, ইহা খেলা বা হিলা চতুরতা নয়; বরং ইহা আল্লাহ্‌র আইনের মর্যাদা রক্ষার্থে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।)

৬। মাসআলা ঃ যদি বাজারে রূপা সস্তা হয়। রূপার এক টাকায় দেড় তোলা রূপা পাওয়া যায়। এ অবস্থায় রূপার এক টাকা দিয়া এক ভরি রূপা নিলে নিজের দুনিয়ার লোকসান হয়। আবার এক টাকা দিয়া দেড় ভরি নিলে সুদ হইয়া যায় এবং নিজের দ্বীনের ও ঈমানের লোকসান হয়। এখন বুদ্ধি খাটাইয়া এমন পথ অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে দুনিয়ার লোকসানও না হয়,

আবার সুদ হইয়া দ্বীনের লোকসানও না হয়। সেই পথ এই যে, দামের সংগে কিছু তামা পিতলের বা দস্তার পয়সা মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে—চাই দুই আনার বা এক আনার পয়সা হউক বা এক পয়সাই হউক। যেমন, হয়ত যদি ১০ টাকায় ১৫ তোলা রূপা পাওয়া যায়, তবে নয় টাকা এবং এক টাকার পয়সা দিলে বা সাড়ে নয় টাকা ও আট আনার পয়সা দিলে সুদ হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। এইরূপ ধরা হইবে যে, ৯ টাকার পরিবর্তে ৯ ভরি রূপা এবং এক টাকার তামা, দস্তা প্রভৃতির পয়সার পরিবর্তে ছয় ভরি রূপা। এইরূপ করিলে সুদের গোনাহ্ হইতে মুক্তি পাওয়ার পথ হইবে। দুনিয়া এবং দ্বীন উভয়ই রক্ষা পাইবে। মনে রাখিবে এরূপ বলিবে না যে, ১০ টাকায় ১৫ তোলা রূপা কিনিলাম; বরং এইরূপ বলিবে যে, ৯ টাকা এবং এক টাকার তামার পয়সার পরিবর্তে ১৫ ভরি রূপা কিনিলাম।

৭। **মাসআলা ঃ** কম দরের খারাপ রূপা বা সোনা দিয়া বেশী দরের ভাল রূপা বা সোনা নিতে হইবে অথচ বাজারে সমান সমান কেহই দিবে না। আবার কম বেশী করিলে সুদ হইয়া গোনাহ্গার হইতে হইবে। এখন এই গোনাহ্ হইতে বাঁচার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যে, আগে আপনার কাছে যে খারাপ রূপা বা সোনা আছে তার দাম লাগাইয়া সেই দামে বিক্রয় করিয়া ফেলেন; তারপর ভাল রূপা বা সোনা তার দর দিয়া কিনেন। এখানেও মনে রাখিবেন, বেচা-কেনার সময় সুদ হইতে বাঁচার জন্য উপরে যে দুই-তিনটি উপায় লেখা হইয়াছে তদনুসারে কাজ করিবেন।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি চাঁদির জরিদার কাপড় রূপার টাকায় ক্রয় করিতে হয়, তবে এইখানেও সহজ পন্থা এই যে, উভয় দিকে এক এক পয়সা মিলাইয়া লও।

৯। **মাসআলা ঃ** খাটি সোনা বা খাঁটি রূপার তৈয়ারী কোন জিনিস কিনিতে হইলে যদি সোনার জিনিস রূপার টাকা দিয়া কিনেন, বা রূপার জিনিস সোনার গিনি বা তামার পয়সা দিয়া কিনেন, তবে ওজনে সমান হওয়ার প্রশ্ন এখানে আসিবে না। কিন্তু খবরদার, উভয় পক্ষের আদান-প্রদান যখন তখন হইতে হইবে, কাহারো তরফ কিছু বাকী থাকিতে পারিবে না, নতুবা গোনাহ্গার হইতে হইবে। আর যদি সোনার জিনিস সোনার গিনি দিয়া এবং রূপার জিনিস রূপার টাকা বা নোট দিয়া কিনেন, তবে সমান সমান হইতে হইবে। যদি বাজার দরের কারণে বা অন্য কারণে কম বেশী করিতে হয়, তবে উপরে যে তামার পয়সা মিলাইয়া দেওয়ার উপায়ের কথা বলা হইয়াছে সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচার জন্য তদ্রূপ করিতে হইবে।

১০-১১। **মাসআলা ঃ** সোনা-রূপার জেওর কিনিতে হইবে। জেওরের মধ্যে সাধারণতঃ অন্য কিছু পাথর ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। এরূপ অবস্থায় সোনার জেওর রূপার টাকার পরিবর্তে বা রূপার জেওর গিনির টাকার পরিবর্তে কিনিতে কোন মুশ্কিল নাই। কিন্তু যদি রূপার জেওর টাকার পরিবর্তে বা সোনার জেওর গিনির পরিবর্তে কিনিতে হয়, তবে লক্ষ্য রাখিবে যে, যদি মূল্যের সোনা-রূপা জেওরের সোনা রূপার চেয়ে কম বা সমান হয়, তবে জায়েয হইবে না, সুদ হইবে। কিন্তু যদি মূল্যের সোনা রূপা জেওরের সোনা-রূপার চেয়ে বেশী হয়, তবে জায়েয হইবে, সুদ হইবে না। কেননা এরূপ ছুরত হইলে কেনা-বেচার জন্য ঐ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা উপরে লেখা হইয়াছে অর্থাৎ মূল্যের রূপা জেওরের রূপা হইতে কিছু কম রাখিয়া বা মূল্যের সোনা জেওরের সোনা হইতে কিছু কম রাখিয়া বাকীটি অন্য জিনিস দিয়া (তামা, দস্তার পয়সা ইত্যাদি দিয়া) পুরা করিয়া দিতে হইবে।

১২। মাসআলা ঃ আপনার হাতের আংটি দিয়া অন্যের হাতের আংটি আপনি নিতে চান। এখন দেখুন, উভয়ের আংটিতে পাথর (নাগিনা) লাগান আছে কিনা। যদি উভয়ের আংটিতে পাথর লাগান থাকে, তবে (ওজন) কম বেশী হইলে ক্ষতি নাই। আর যদি দোনোটা সাদা (নাগিনা পাথরহীন) হয়, তবে কম বেশী হইতে পারিবে না। আর যদি একটা সাদা এবং অন্যটা পাথর লাগান হয়, তবে যেটা সাদা সেইটার সোনা কিছু বেশী হওয়া চাই, নতুবা সুদ হইবে এবং গোনাহ্ হইবে। তবে এর সব ছুরতেই সংগে সংগে যখন তখন উভয় তরফের আদান-প্রদান হইয়া যাইতে হইবে। যদি একজনে বলে যে, আমাকে অবিশ্বাস করেন না কি? আমার আংটিটা আমি একটু পরে দিব—এরূপ বলা জায়েয হইবে না। এরূপ করিলে সুদের গোনাহ্ হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ যে-সব মাসআলার মধ্যে বলা হইয়াছে যে, যখন তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়পক্ষের আদান-প্রদান হইতে হইবে, তাহার অর্থ এই যে, ঐ মজলিসে বসা থাকিতে, উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার আগেই উভয়ের আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে। যদি একজন উঠিয়া চলিয়া যায়, তবে আর কেনা-বেচা হইল না। এইরূপ কাজ না করিলে সুদের গোনাহ্ হইবে। মেছাল স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আপনি দশ টাকার রূপা বা সোনা অথবা সোনা-রূপার কোন জিনিস সোনার পোদ্দার হইতে ক্রয় করিয়াছেন, এখন আপনার যখন-তখন ঐখানে থাকিতে থাকিতেই দশটি টাকা দিয়া দিতে হইবে। যদি আপনি টাকা সঙ্গে সঙ্গে না দিয়া থাকেন, তবে ঐ কেনা-বেচা ঠিক রাখিতে হইলে আপনার ঐখানে বসিয়া থাকিয়াই কাহারো দ্বারা টাকা নেওয়াইতে হইবে বা কাহারো নিকট হইতে হাওলাৎ নিয়া টাকা দিতে হইবে (এইরূপে পোদ্দারও যদি জিনিস বাড়ী রাখিয়া আসিয়া থাকে, তবে হয় তাহার ঐখানে আপনার সামনে বসিয়া থাকিয়াই জিনিস অন্য কাহারো দ্বারা আনাইয়া তাহাকে আপনার হাতে দিতে হইবে, নতুবা সে যদি বলে যে, আমি নিজে যাইয়া বাড়ী হইতে আনিয়া দিতেছি, তবে আপনার তার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইবে। যদি আপনাকে বাহিরে রাখিয়া সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া যায় বা অন্য কোথাও চলিয়া যায়, তবে আগের ঐ বেচা-কেনা আর থাকিবে না; নূতন করিয়া বেচা-কেনা করিতে হইবে, দর-দামও নূতন হইতে পারিবে। (শরীঅতের এরূপ কড়াকড়ি করার মধ্যে বড় হেকমত আছে। দুনিয়াতে আমরা দেখি, সোনা-রূপার দাম ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়িতে কমিতে থাকে।)

১৪। মাসআলা ঃ (সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ের আইন বড় কড়া।) ইহা কেনা-বেচার কথা হইয়া যাওয়ার পর যদি ক্রেতা বা বিক্রেতা পেশাব করিতে চলিয়া যায় বা দোকানদার দোকানের ভিতরের দিকে চলিয়া যায় এবং একে অপর হইতে পৃথক হইয়া যায়, তবুও আগের বেচা-কিনা না-জায়েয হইবে এবং সুদী কারবার হইয়া যাইবে (অর্থাৎ, তাহার কোন মূল্য থাকিবে না।) পুনরায় নূতন করিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলিতে হইবে।

১৫। মাসআলা ঃ যদি সোনা-রূপার কোন জিনিস বাকী কিনিতে হয়, তবে তাহার উপায় এই যে, দোকানদারের নিকট হইতে দামের টাকা আপনি করয নেন। করয দিয়া সেই টাকা দ্বারা দাম পরিশোধ করেন। করযের টাকা আপনার জিম্মায় বাকী থাকুক, পরে শোধ করিবেন। এইরূপ করিলে সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবেন।

১৬। মাসআলা ঃ যদি খাঁটি সোনার কামদার দোপাট্টা, টুপি, চাদর বা অন্য কোন জিনিস কিনিতে হয়, তবে উহাতে যে পরিমাণ সোনা আছে উহার মূল্য যখন তখন দিতে হইবে, ঐ পরিমাণ বাকী থাকিতে পারিবে না, অন্যথায় সুদ হইবে। অতিরিক্তটার দাম পরে দিলেও চলিবে।

১৭। মাসআলাঃ টাকা দিয়া টাকার পয়সা বা দস্তা-পিতলের সিকি দুয়ানী রেজগী নিতে হইলে যখন তখন আদান-প্রদান না হইলেও সুদের গোনাহ্ হইবে না। অবশ্য যদি পয়সার সাথে রূপার রেজগী থাকে, তবে আদান-প্রদান সঙ্গে সঙ্গে হইতে হইবে। শর্ত এই যে, দোকানীর কাছে পয়সা আছে কোন কারণে দিতে পারে না। আর যদি সব পয়সা তখন দোকানাদের কাছে না থাকে অথচ আপনার এখনই কিছু পয়সার প্রয়োজন তবে এই করিতে পারেন যে, যেই পরিমাণ পয়সা তার কাছে আছে সেই পরিমাণ আপনি তখন তার কাছ থেকে করয নেন। আর আপনার টাকা তার কাছে আমানত রাখেন। তারপর যখন তার কাছে পুরা পয়সা আসিবে, তখন সব পয়সা নিয়া আপনি আপনার কাজ মিটাইয়া দিবেন এবং আমানতের টাকা তাকে নিজস্ব করিয়া দেওয়ার এজাযত দিবেন। এইরূপ করিলে সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচিবেন। (ভিড়ের মধ্যে ভুল হইয়া পরে গোলমাল না হয় সেজন্য বারবার বলিয়া বলাইয়া লওয়া উচিত। নতুবা একে অন্যের সামনে দেখাইয়া লিখিয়া লওয়া সবচেয়ে ভাল।)

১৮। মাসআলাঃ টাকা দিয়া গিনি লওয়া বা গিনি দিয়া টাকা লওয়ার মধ্যে যখন তখন সামনা-সামনি উভয় পক্ষের আদান-প্রদান হইয়া যাওয়া ওয়াজিব।

১৯। মাসআলাঃ সোনা-রূপার জিনিস টাকা বা গিনি দিয়া কিনিলে এরূপ বলা জায়েয নাই যে, তিন দিন পর্যন্ত আমার নেওয়ার বা না দেওয়ার এখতিয়ার আছে। অর্থাৎ সোনা-রূপার কারবারে খেয়ারে শর্ত নাই।

২০। মাসআলাঃ সোনা রূপা ব্যতীত অন্যান্য যে সব জিনিস বাটখারা দিয়া বা কাঁটা দিয়া ওজন করিয়া অথবা কাঠা পোয়া দিয়া মাপিয়া ক্রয়-বিক্রয় হয়—যেমন, ধান, চাউল, গম, যব, তামা, পিতল, তেল, তরকারী, নিমক ইত্যাদি—সেই সব জিনিস বদলাই করিতে হইলে যদি প্রকার এক হয়, তবে পরিমাণও এক সমান হইতে হইবে। যেমন যদি কেউ ধানের বদলে ধান নিতে চায় বা গমের বদলে গম নিতে চায়, তবে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব। প্রথমটি এই যে, দোনো দিকে পরিমাণ সমান হইতে হইবে, একটু বেশী-কম লইলে সুদ হইবে। দ্বিতীয় এই যে, দোনো দিকের আদান-প্রদান এক সময় হইতে হইবে। অন্ততঃ পক্ষে এতটুকু হইতে হইবে, দোনো দিকের ধান বা দোনো দিকের গম আলগ করিয়া মাপিয়া রাখিয়া দেখাইয়া বলিতে হইবে যে, এই আপনার ধান; যখন ইচ্ছা আপনি নিয়া যাইবেন। যদি এরূপ না করিয়া একে অন্যের থেকে পৃথক হইয়া যায় তবে সুদের গোনাহ্ হইবে। (এক্ষেত্রে বাকী কেনা-বেচা চলিবে না। যদি বাকী কেনা-বেচা করিতে হয়, তবে টাকা হিসাবে দাম ধরিয়া কেনা-বেচা করিতে হইবে। যেমন, যদি একজনে খাবার ধান দিয়া বীজধান দিতে চায় এবং দুই এক দিন পরে দিতে চায়, তবে এইরূপ করিতে হইবে যে, আপনার নিকট হইতে আমি এক মণ বীজধান ২০·০০ টাকায় কিনিলাম, এই বিশ টাকার আমি এক মণ খাবার ধান অমুক সময় আপনাকে দিব।)

২১। মাসআলাঃ পরিমাণ করিয়া যেসব জিনিসের কেনা-বেচা হয় সেইসব জিনিসের নাম প্রকার এক হইলে একটার সঙ্গে আর একটার বদলাই করিতে হইলে গুণ বিভিন্ন হওয়ার দরুন পরিমাণে কম-বেশী করা যাইবে না, কম-বেশী করিলে সুদ হইবে। খারাপ ধান দিয়া ভাল ধান নেওয়ার ইচ্ছা, আউস ধান দিয়া বালাম ধান নেওয়ার ইচ্ছা বা খাবার ধান দিয়া বীজধান নেওয়ার ইচ্ছা—কিন্তু সমান সমান কেউ দেয় না। এ অবস্থায় সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচার উপায় এই যে, আগে আপনি আপনার খারাপ ধান টাকার হিসাবে বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তারপর টাকার হিসাবে

আবার ভাল ধান ঐ টাকা দিয়া ঐ লোকের নিকট হইতে কেনেন বা অন্যের নিকট হইতে কেনেন। এইরূপ করিলে দুরুস্ত হইবে; সুদের গোনাহ্ হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে।

২২। মাসআলাঃ পরিমাণ এবং পরিমাপ করিয়া যে সব জিনিস বিক্রয় হয়, যদি তার নাম প্রকার এক না হয়, তবে পরিমাণ সমান না হইলেও চলিবে। যেমন, যদি ধান দিয়া গম নিতে হয় বা তিল নিতে হয়, তবে পরিমাণ এক সমান হইতে হইবে না। এক মণ ধানের বদলে দুই মণ গম, তিল বা সরিষা নিতে পারিবে ইহাতে সুদ হইবে না, কিন্তু উভয় পক্ষের আদান-প্রদান এক সংগে করা এক্ষেত্রেও ওয়াজিব। —উভয় পক্ষ সামনে থাকিতে থাকিতেই আদান-প্রদান করিতে হইবে। অথবা অন্ততঃ পক্ষে উভয় পক্ষের জিনিস পৃথক করিয়া দিতে হইবে, নতুবা সুদের গোনাহ্ হইবে।

২৩। মাসআলাঃ এক সের চাউল দিয়া যদি আলু কিনিতে হয়, তবে পরিমাণে সমান হওয়ার প্রয়োজন নাই। এক সের চাউলের পরিবর্তে দুই সের আলুও বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু এক সংগেই চাউল এবং আলুর আদান-প্রদান হইতে হইবে, স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র গেলে সুদের গোনাহ্ হইবে।

২৪। মাসআলাঃ যে সব জিনিস ওজনে বিক্রয় হয় তাহা যদি টাকা পয়সা দিয়া খরিদ করা হয় কিংবা কাপড় ইত্যাদি যাহা ওজনে বিক্রয় হয় না বরং গজ মাপিয়া কিংবা গণনা করিয়া বিক্রয় হয়; যেমন এক থান কাপড়ের বদলে গম ইত্যাদি দিল কিংবা গম, বুট দিয়া আমরুদ, কমলা ইত্যাদি যাহা গণিয়া বিক্রয় হয়। মোটকথা, এক দিকে এমন জিনিস যাহা ওজনে বিক্রয় হয় আর অপর দিকে গণনা বা গজের মাপে বিক্রয়ের জিনিস, তবে এমতাবস্থায় ঐ দুইটি বিষয়ের কোনটির ওয়াজিব নহে। এক পয়সার যতটুকু ইচ্ছা গম আটা তরকারী খরিদ করিতে পারে। এইরূপে কাপড় দিয়া যত ইচ্ছা শস্য লইতে পারে। গম, বুট ইত্যাদি দিয়া যত ইচ্ছা আমরুদ, কমলা লেবু ইত্যাদি লইতে পারে। স্থানে থাকিতেই আদান-প্রদান হউক কিংবা পৃথক হওয়ার পর হউক, সব রকমেই দুরুস্ত আছে।

২৫। মাসআলাঃ আটার বদলে গম কোন প্রকারেই দুরুস্ত নাই। এক সের গমের বদলে এক সের আটা কিংবা কম বেশী হওয়া সর্ব অবস্থায়ই নাজায়েয। অবশ্য যদি গম দিয়া গমের আটা না লয় বরং বুট ইত্যাদি অন্য কোন জিনিসের আটা লয়, তবে জায়েয আছে। কিন্তু সামনাসামনি আদান-প্রদান করিতে হইবে।

[**মাসআলাঃ** সোনা-রূপা ব্যতীত অন্যান্য যে সব জিনিস কাঠা পোয়া দিয়া মাপিয়া বা কাঁটা বাটখারা দিয়া ওজন করিয়া বিক্রয় হয় না গণনা করিয়া বিক্রয় হয় বা গজ-ফুট বা ফিতা দিয়া মাপিয়া বিক্রয় হয়, সে সব জিনিস একে অন্যের সংগে বদলাই করিতে হইলে সংখ্যায় এক সমান হওয়ার প্রয়োজন নাই এবং এক সংগে আদান-প্রদান হওয়ারও প্রয়োজন নাই। ১০টা পেয়ারার পরিবর্তে ৫টা আম বা কমলা বদলাই হইতে পারে এবং যখন-তখন উভয় পক্ষের আদান-প্রদান না হইলেও গোনাহ হইবে না।]

২৬। মাসআলাঃ এক দিকে বালাম চিকন চাউল অন্য দিকে আউসের মোটা চাউল বদলাই করিতে হইলে বেশকম করা চলিবে না। বদলাই করিতে ইহার দোনো দিক এক সমান হইতেই হইবে, এইরূপ সমান হওয়া ওয়াজিব। যদি এক সমান না দেয়, তবে দাম ধরিয়া টাকা-পয়সায় ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইবে, তবেই সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচা যাইবে, নতুবা নহে। আর যদি চাউল

দিয়া গম বা গমের আটা বদলাই করিতে হয়, তবে বেশকম করা যাইবে, তাতে দোষ হইবে না, কিন্তু এক সংগে আদান প্রদান হইতে হইবে।

২৭। মাসআলা ঃ সরিষার বদলাই সরিষার তেলের সংগে বা তিলের বদলাই তিলের তেলের সংগে জায়েয নাই। অবশ্য তিল বা সরিষার বিনিময়ে যে তেল লওয়া হইতেছে তাহা যদি তিল এবং সরিষার মধ্যে যে তেল আছে তার চেয়ে বেশী হওয়া নিশ্চিত হয়, তবে জায়েয আছে। অবশ্য সামনাসামনি আদান-প্রদান হইতে হইবে আর যদি কম কিংবা সমান হয়, কিংবা যদি সন্দেহ হয় যে, বেশী হইবে না, তবে জায়েয নাই, সুদ হইবে। (অবশ্য গমের বদলাই যবের ছাতুর সংগে বা তিলের বদলাই সরিষার তেলের সংগে এবং সরিষার বদলাই তিলের তেলের সংগে জায়েয আছে। তিলের বদলাই তিলের তেলের সংগে বা সরিষার বদলাই সরিষার তেলের সংগে করিতে হইলে উভয় তরফে পয়সা হিসাবে দাম ধরিয়া ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইবে, নতুবা সুদের গোনাহ্ হইবে।)

২৮। মাসআলা ঃ গরুর গোশ্‌তের বদলে বকরীর বা খাসীর গোশ্‌ত নিতে হইলে পরিমাণে এক সমান হইতে হইবে না, বেশ কম জায়েয আছে। কিন্তু এক সংগে আদান-প্রদান হইতে হইবে।

২৯। মাসআলা ঃ তামার লোটা দিয়া তামার ডেগ লইলে বা এলুমিনিয়ামের বদনা দিয়া এলুমিনয়ামের পাতিল লইতে হইলে ওজনে এক সমান হইতে হইবে এবং এক সংগে আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে। আর যদি একদিকে তামা অপর দিকে লোহা বা পিতল হয় তবে ওজনে কম বেশী জায়েয আছে। অবশ্য আদান-প্রদান সামনাসামনি হইতে হইবে।

৩০। মাসআলা ঃ এক সের চাউল একজনে ধার নিতে চায়, কিন্তু তার বদলে ২ সের আলু দিতে চায়। এরূপ করা জায়েয নাই। যদি এরূপ করার দরকার পড়ে, তবে এই করিতে হইবে যে, হয়ত আলু এখনই দিয়া দিতে হইবে, না হয় এখন এক সের চাউল ধার নিয়া যাউক; পরে যখন দেওয়ার সময় হয়, তখন বলিতে হইবে যে, ভাই, আপনার নিকট আমি এক সের চাউল দেনাদার আছি; সেই দেনার পরিবর্তে আমি দুই সের আলু দিতেছি; এরূপ করা জায়েয আছে।

৩১। মাসআলা ঃ মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সব মাসআলার মধ্যে বলা হইয়াছে যে, যখন তখন সংগে সংগে সামনাসামনি উভয় পক্ষের আদান-প্রদান হইতে হইবে—তাহার অর্থ এই যে, সোনা রূপার কারবারের মধ্যে ত যখন তখন উভয় পক্ষের মাল উভয় পক্ষের হস্তগত হইতে হইবে। এ ছাড়া অন্যান্য ছুরতে হস্তগত না হইলেও যদি তৎক্ষণাৎ সংগে সংগে সামনা-সামনি উভয়পক্ষের মাল নির্দিষ্ট হইয়া যায় এবং পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে সুদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। উভয় পক্ষের মাল কমছে-কম নির্দিষ্ট এবং পৃথক করা না হইলে সুদ হইবে।

৩২। মাসআলা ঃ যে সব জিনিস কাঁটা বা বাটখারা দিয়া ওজন করিয়া বা কাঠা পোয়া দিয়া বিক্রয় করা হয় না; গণনার দ্বারা, গজ দ্বারা বা ফিতার দ্বারা মাপিয়া বিক্রয় হয়, সেই সব জিনিসের মাসআলা এই যে, যদি পয়সার দ্বারা বিক্রয় না করিয়া দুইটি জিনিসের বদলাই করে, তবে উভয় জিনিসের নাম-প্রকার এক হইলে—যেমন, যদি পেয়ারার বদলে পেয়ারা নেয়, কাপড়ের বদলে কাপড় নেয় তবে উভয় দিকে সমান হওয়া শর্ত নহে; বেশকম হইতে পারিবে। কিন্তু ঐ একই সময়ে উভয়ের আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে। আর যদি দুই দিকে দুই প্রকার

জিনিস হয়—যেমন, যদি পেয়ারার বদলে কমলা নেয় বা চাউল দিয়া কমলা নেয় বা শাড়ি দিয়া লুঙ্গি নেয়, তবে এক সমান হওয়াও ওয়াজিব নহে এবং এক সংগে আদান-প্রদান হওয়াও ওয়াজিব নহে।

৩৩। মাসআলা ঃ সোনা-রূপার কারবার ছাড়া অন্য জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় মাসআলার সারকথা সহজের জন্য আবার বলিতেছি, ভালো মত বুঝিয়া লউন ঃ টাকা-পয়সার পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয় হইলে ত কথাই নাই। সেখানে দুই শর্তের এক শর্তও নাই। প্রথম শর্ত এই যে, উভয় পক্ষের মাল সমান হওয়া, আর দ্বিতীয় শর্ত এই যে, উভয় পক্ষের আদান-প্রদান এক সংগে যখন তখন সামনাসামনি হওয়া। অবশ্য মালের বদলাই যদি মালের সংগে করিতে হয়, তবে দেখিতে হইবে—যদি উভয় দিকে এক প্রকারের মাল হয় এবং ওজনে মাপে বিক্রয় হয় যেমন, যদি ধানের বদলে ধান, ছোলার বদলে ছোলা নিতে চায়, তবে উপরের দোনো শর্ত পালন করিতে হইবে। আর যদি এমন হয় যে, দোনো দিকে একই প্রকারের জিনিস বটে, কিন্তু ওজনে বিক্রয় হয় না গণনায় বা গজে বিক্রয় হয়—যেমন যদি ডিমের বদলে ডিম, কমলার বদলে কমলা, কাপড়ের বদলে কাপড় নিতে চায়, অথবা দুই প্রকার মাল হয়, কিন্তু ওজনে বিক্রয় হয়—যেমন ধানের বদলে তিল নিতে চায় বা মটরের (ডালের) বদলে সরিষা নিতে চায়, তবে এই দুই ছুরতে এক সমান হওয়ার যে শর্ত সে শর্ত থাকিবে না। কিন্তু এক সংগে যখন তখন আদান-প্রদানের শর্ত ওয়াজিব থাকিবে। আর যেখানে প্রকারে এক নয়, ওজন বা মাপে বিক্রয় হয় না, যেমন যদি ডিমের বদলে কমলা বিক্রয় করে বা কাপড়ের বদলে জমিন বিক্রয় করে, দুই শর্তের এক শর্তও ওয়াজিব থাকিবে না।

৩৪। মাসআলা ঃ চীনা রেকাবীর বদলে যদি চীনা রেকাবী নেওয়া হয় বা এনামেলের মাল নেওয়া হয়, তবে এক সমান হওয়ার শর্ত থাকিবে না। একখানা চীনা রেকাবীর বদলে দুই খানা চীনা রেকাবী অথবা দুইখানা এনামেলের থাল নিলে তাহা জায়েয হইবে। এইরূপে একটি সুঁচের বদলে দুইটি সুঁচ নিল তাহাও জায়েয হইবে। কিন্তু যদি কেছেম ও নাম-প্রকার এক হয়—যেমন, যদি চীনা রেকাবীর বদলে চীনা রেকাবী নেয় অথবা এনামেলের বদলে এনামেল নেয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সামনা সামনি উভয় পক্ষের আদান-প্রদান এক সঙ্গে হইতে হইবে। আর যদি কেছেম ভিন্ন হয়— যেমন, যদি এনামেলের বদলে এলুমিনিয়াম নেয়, তবে এক সংগে আদান-প্রদানের শর্তও ওয়াজিব থাকিবে না।

৩৫। মাসআলা ঃ আপনার বাড়ীতে মেহ্‌মান আসিয়াছে; ঘরে ভাত পাকান নাই; পড়শীর বাড়ী হইতে ভাত করয আনিতে হইবে। যত পরিমাণ চাউলের ভাত তত পরিমাণ চাউলের ভাত দিয়া দিলে এরূপ করয নেওয়া-দেওয়া জায়েয আছে।

৩৬। মাসআলা ঃ (বাড়ীর মেয়েলোকদিগকে এই সব মাসআলা ভালোমত বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। এমন কি) যে চাকর বা মামার দ্বারা সদায়পাতি কেনা হয়, তাহাদিগকেও বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, এইভাবে কিনিলে সুদ হইবে; আর এইভাবে কিনিলে সুদ হইবে না। স্বামী বা মেহমান যাহাকে খাওয়াইবে সকলের গোনাহ্‌ তোমার উপর বর্তিবে।

বায়'য়ে সলমের বিবরণ

১। মাসআলাঃ ফসল পাকার আগে বা পরে ভাদ্র মাসে বা অগ্রহায়ণ মাসে আপনি একজন ফসলকারকে একশত টাকা দিলেন যে, আমাকে ৫ টাকা মণ দরে ২০ মণ আমন ধান দিতে হইবে এবং ১৫ই মাঘের মধ্যে আমার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে এবং তখন বাজার দর কি হইবে—বেশী হইবে না কম হইবে তাহা দেখা যাইবে না; আমাকে ৫ টাকা মণ দরে দিতে হইবে। এই কথায় স্বীকার করিয়া টাকা গ্রহণ করিলে টাকা গ্রহণকারী নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট মাল পৌঁছাইয়া দিতে শরীঅতের আইন অনুযায়ী বাধ্য থাকিবে। এইরূপ অগ্রিম দাম দিয়া ক্রয়-বিক্রয় করাকে বায়'য়ে সলম বলে। বায়'য়ে সলম শরীঅতে দুরুস্ত আছে। কিন্তু ইহা দুরুস্ত হইবার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। যথা—(১) প্রথম শর্ত এই যে, ধান, পাট বা মটর যে মাল ক্রয় করিবে তার কোয়ালিটি (গুণ) এমন পরিষ্কারভাবে বলিতে হইবে, যাহাতে পরে কোন মত বিরোধ বা ঝগড়া-বিবাদ দেখা না দিতে পারে। আউস ধান, গোড়ালে, না গোড়ালে আগালে মিশান ধান, খুব শুকনা, না আধা শুক্না, আধা ভিজা ধান ইত্যাদি কোয়ালিটি এমন পরিষ্কারভাবে দুইজন সাক্ষীর সামনে লিখিতে বা বলিতে হইবে, যাহাতে আদৌ কোন মতবিরোধ বা ঝগড়া দেখা দিতে না পারে। শুধু যদি এতটুকু বলে যে, আমাকে ১০০ টাকায় ২০ মণ ধান দিতে হইবে, তবে জায়েয হইবে না। (২) দ্বিতীয় শর্ত এই যে, যে সময় এইরূপ বেচা-কেনার কথাবার্তা ঠিক হইবে অর্থাৎ আকদ বাঁধা হইবে, তখনই দর কাটিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে যে, এত টাকা মণ দরে দিতে হইবে। যেমন, হয়ত বলিল, ৫ টাকা দরে দিতে হইবে। আর যদি এইরূপ বলে যে, তখন বাজারে যে দর থাকে সেই দরে দিতে হইবে বা তার চেয়ে মণ প্রতি ২ টাকা কম নিতে হইবে বা বর্তমানে বাজারে যে দর আছে, তার চেয়ে মণ প্রতি ২ টাকা কম বেশী দিতে হইবে, তবে এরূপ বেচা-কেনা শরীঅতে দুরুস্ত এবং জায়েয হইবে না। (৩) তৃতীয় শর্ত এই যে, যত টাকার মাল নিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া ঐ সময়েই বলিতে হইবে। যেমন, হয়ত বলিল যে, আমাকে ১০০ টাকার ধান দিতে হইবে। যদি এইরূপ বলে যে, আমি কিছু টাকার ধান নিব, আপনি আমাকে এত দরে দিবেন, তবে তাহা দুরুস্ত হইবে না। (৪) চতুর্থ শর্ত এই যে, যে সময় কেনা-বেচার কথা হইবে ঐ সময় টাকা না দিয়া একজন উঠিয়া যায়, তবে যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা সব বাতিল হইয়া যাইবে; পুনরায় নূতন করিয়া আকদ বা কথা-বার্তা ঠিক করিতে হইবে। আর যদি ৫০ টাকা ঐ মজলিসে দিয়া বাকী ৫০ টাকার জন্য দোকানে বা বাড়ী যায়, তবে ঐ মজলিসে যে ৫০ টাকা দিয়াছে তাহার কিনা-বেচা ত দুরুস্ত হইয়াছে; বাকী ৫০ টাকার কথাবার্তা পুনরায় নূতনভাবে বলিতে হইবে, নতুবা নহে। (৫) পঞ্চম শর্ত এই যে, মাল দেওয়ার মুদ্দৎ কমছে কম এক মাস হইতে হইবে। অর্থাৎ, যখন টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং মাল দেওয়ার কথাবার্তা হইয়াছে, তখন হইতে মাল দেওয়ার মুদ্দৎ কমছে কম এক মাসের হওয়া চাই। এক মাসের কম হইলে বায়'য়ে সলম দুরুস্ত হইবে না। বেশী যত হয় তাতে দোষ নাই। কিন্তু দিন তারিখ মাস সব ঠিক করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে যাহাতে পরে ঝগড়া না বাধে। যদি দিন

তারিখ মাস ঠিক না করিয়া শুধু এইরূপ বলে যে, যখন ধান কাটা হইবে তখন দিব, তবে এইরূপ বলা দুরুস্ত হইবে না। (৬) ষষ্ঠ শর্ত এই যে, ইহা উল্লেখ করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া স্পষ্ট ভাষায় ঐ সময়েই বলিয়া দিতে হইবে যে, মাল কোথায় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে এবং মাল পৌঁছানের বারবরদারি কাহার জিম্মায়। যেমন, হয়ত ক্রেতা বিক্রেতাকে বলিল, ধান আমার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে বা দোকানে বা গুদামে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, কুলি খরচ, নৌকা ভাড়া, গাড়ী ভাড়া আপনার জিম্মায় থাকিবে। যদি এইরূপ পরিষ্কার ভাষায় না বলে, তবে কারবার দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি এমন কোন মাল হয় যে, তাতে কোন ভার বোঝাই নাই; যেমন হয়ত মেশ্‌ক ক্রয় করিল অথবা মোতি ক্রয় করিল তবে মাল পৌঁছানের জায়গার কথা উল্লেখ না করিলে ক্ষতি নাই, যেখানে ক্রেতাকে পায় সেইখানেই দিয়া দিবে, যদি এইসব শর্ত পুরা করা হয়, তবে বায়'য়ে সলম দুরুস্ত হইবে, নতুবা নহে।

২। **মাসআলা ঃ** ধান, পাট, মটর, মসূর ছাড়া অন্যান্য জিনিসেরও বায়'য়ে সলম দুরুস্ত আছে, যদি তার কোয়ালিটি ঠিক করা যায় এবং উপরোক্ত শর্তসমূহ পুরা হয় এবং পরে কোন ঝগড়া বিরোধ না হয়। যেমন, যদি বলে যে, আমাকে ৫০০ মুরগীর ডিম দিতে হইবে বা আপনার কারখানায় মাল তৈরী হইলে আমাকে দশ হাজার ইট দিতে হইবে বা দশখানা কাপড় দিতে হইবে। কিন্তু উপরোক্ত ছয়টি শর্ত সব পুরা করিতে হইবে; কোন কথায় গোলমাল না থাকে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে পরে আদৌ কোনরূপ ঝগড়া বিরোধ বা মনোমালিন্য না হইতে পারে। ইটের মাপ (দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে) ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে, কোয়ালিটি বলিতে হইবে। কাপড় কিরূপ হইবে—সূতি, পশমী, মোটা, না মিহিন সব কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে—একটুও যেন গোলমালের অবকাশ না থাকে।

৩। **মাসআলা ঃ** টাকায় পাঁচ বোঝা ঘাস বা পাঁচ বস্তা ভূষি দিতে হইবে, এরূপ বলিলে বায়'য়ে সলম দুরুস্ত হইবে না। কারণ, বোঝার মধ্যে, বস্তার মধ্যে অনেক বেশকম হয়। অবশ্য যদি পরিমাণ ঠিক করার উপায় বাহির করিয়া পরিমাণ ঠিক করিয়া বলিয়া দেওয়া হয়, তবে দুরুস্ত হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** বায়'য়ে সলম দুরুস্ত হওয়ার জন্য আর একটি শর্ত এই যে, ঐ জিনিস ঐ দেশে সব সময় বাজারে পাওয়া যাওয়া চাই। যদি বিদেশ হইতে কষ্ট-ক্লেশ করিয়া আনাইতে হয়, দেশে না পাওয়া যায়, তবে বায়'য়ে সলম বাতেল হইয়া যাইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** বায়'য়ে সলমের আক্‌দ করার সময় যদি এইরকম বলে যে, আমাকে নূতন ধান দিতে হইবে বা আমাকে অমুক ক্ষেতের ধান দিতে হইবে, তবে ইহা জায়েয হইবে না, অতএব, এরূপ শর্ত করা চাই না। দেওয়ার সময় চাই নতুন দেউক চাই পুরান দেউক—দোনো এখ্‌তিয়ার থাকিবে। অবশ্য নতুন ধান কাটা শুরু হইয়া গিয়াছে বা বাজারে নতুন ধান আসা আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় যদি আক্‌দ হয় আর নতুন ধানের শর্ত লাগায়, তবে তাহা নাজায়েয হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** আপনি হয়ত ভাদ্র মাসে ১০০ টাকা দিয়াছিলেন যে, পৌষ মাসে আপনাকে ২০ মণ ধান দিবে, কিন্তু পৌষ গুযারিয়া গেল তবুও সে ধান দিল না—তার কাছে ধান নাই, আছে হয়ত পাট বা মটর এবং সে এখন বলে যে, আপনি সেই একশত টাকার ২০ মণ ধানের বদলে ১০ মণ বা ১৫ মণ পাট নেন বা ২৫ মণ মটর নেন এইরূপ করা জায়েয নাই। অর্থাৎ বায়'য়ে সলম আক্‌দের সময় যে মালের জন্য আক্‌দ করিয়াছেন সেই মালের পরিবর্তে অন্য মাল

নেওয়া জায়েয নাই। অতএব, আপনার কর্তব্য হইবে এই যে, তাহাকে কিছু দিন সময় (মোহ্‌লত) দিতে হইবে, সে কিছু দিন পরে আপনাকে ধান দিবে, না হয় তার কাছ থেকে আপনার আসল টাকা ফেরত নিতে হইবে। আসল টাকা ফেরত নিয়া তার দ্বারা যে মাল যে দরে ইচ্ছা হয় কিনিতে পারিবেন। কিন্তু বায়'য়ে সলমের বদলে অন্য মাল নিতে পারিবেন না। এইরূপে সময় আসার পূর্বেই যদি বায়'য়ে সলম আপনি ভাঙ্গিয়া দেন যে, আপনি কার্তিক মাসে বলিলেন, ভাই, আমার ধান নেওয়া হইবে না বা হয়ত বাজারে ঐ মাল একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া গেল, তবে আপনি এই বলিতে পারিবেন না যে, আমাকে ধানের বদল পাট দেন বা মটর দেন; এইরূপ করা জায়েয হইবে না। অবশ্য আপনি আপনার আসল টাকা ফেরত নিতে পারিবেন। আসল টাকা ফেরত নিয়া যে মাল যে দরে ইচ্ছা হয় কিনিতে পারিবেন।

করয গ্রহণ করার বিবরণ

(একান্ত ঠেকা ব্যতীত বিনা জরুরতে ঋণ গ্রহণ করা এবং করয গ্রহণ করা অত্যন্ত দূষণীয়। আমাদের হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করয হইতে বাঁচার জন্য আমাদিগকে অনেক তাকীদ করিয়া গিয়াছেন এবং ঠেকা বা জরুরতবশতঃ করয করার পর যখন হাতে হইবে, তখন একটুও দেরী বা টালবাহানা না করিয়া যখন তখন করয পরিশোধ করার জন্য তাকীদ করিয়াছেন। বিনাসুদে অভাবগ্রস্তকে করয দেওয়ার অনেক ফযীলত আছে। হাদীস শরীফে আছেঃ অভাবগ্রস্তকে করয দিয়া সাহায্য করিলে ১৮ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাইবে।)

—অনুবাদক

১। **মাসআলাঃ** যেমনটি নেওয়া যায় তেমনটি দেওয়া যায়' অর্থাৎ ওজনের দ্বারা যে জিনিসের পরিমাণ করা যায়, সেই জিনিসের করয দুরুস্ত হইতে পারে। যেমন, টাকা-পয়সা, ধান-চাউল, গম-আটা ইত্যাদি। এমন কি গণার দ্বারাও যদি সমান সমান দেওয়ার মত হয় অর্থাৎ যে সব জিনিস পরস্পর একটা অন্যটার চেয়ে বেশী বেশ-কম হয় না, প্রায় সমান সমানই হয় সে-সব জিনিসের করয গণনার দ্বারাও দুরুস্ত হইবে। যেমন ডিম, সুপারী, নারিকেল ইত্যাদি। যেসব জিনিসের যেমনটি নেওয়া যায় তেমনটি দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নাই তাহার করয দুরুস্ত হইতে পারে না। যেমন আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বকরী, গরু ইত্যাদি।

২। **মাসআলাঃ** আপনি এক মণ ধান করয নিয়াছেন কিন্তু যে সময় আপনি ধান করয নিয়াছেন সে সময় হয়ত ধানের মণ ছিল ১০ টাকা। যখন করযের ধান পরিশোধ করিতে পারিতেছেন, তখন ধানের মণ হইয়াছে ২০ টাকা। এরূপ অবস্থা হইলে আপনার সেই এক মণ ধানই দিতে হইবে, দাম বাড়িলে সেজন্য আপনি কম দিতে পারিবেন না বা দাম কমিলে সেজন্য করযদাতাও আপনার নিকট হইতে বেশী নিতে পারিবেন না। যেমনটি নিয়াছেন, যে পরিমাণ নিয়াছেন তেমনটি, সেই পরিমাণই আপনার দিতে হইবে এবং করযদাতারও নিতে হইবে।

৩। **মাসআলাঃ** যেমন ধান আপনি করয নিয়াছিলেন, করয পরিশোধের সময় আপনি তার চেয়ে ভাল ধান দিতেছেন। এই ভাল ধান গ্রহণ করা করযদাতার পক্ষে নাজায়েয নহে। কিন্তু করয দেওয়ার সময় এরূপ বলা জায়েয নাই যে, আমাকে এর চেয়ে ভাল ধান দিতে হইবে। (এরূপ বলিলে সুদ হইবে।) আর যদি ওজনে বা মাপে বেশী লওয়া হয়, তাহাও সুদ হইবে।

খুব ঠিক ঠিক ওজন করিয়া দেওয়া নেওয়া দরকার। অশ্য যদি নিজ খুশীতে (বিনা শর্তে) দেওয়ার সময় কিছু ঢলক মাপিয়া কিছু বেশী দেয়, তবে তাহাতে দোষ নাই।

৪। **মাসআলা ঃ** আপনি কাহারও নিকট হইতে কিছু টাকা বা কিছু চাউল করয লইয়াছেন। করয লওয়ার সময় আপনি বলিয়াছেন যে, ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে ইন্‌শাআল্লাহ্ আমি আপনার করয পরিশোধ করিব; করযদাতাও আপনার এই ওয়াদা মঞ্জুর করিয়া লইলেন। এইরূপ ওয়াদা করা উচিত নহে এবং আইনেও এই ওয়াদার কোন মূল্য নাই। কেননা, আপনি করযদার, প্রতি মুহূর্তে আপনার উপর ওয়াজিব যে, যখন পারেন তখনই আপনি করয পরিশোধ করেন। আবার করযদাতারও অধিকার আছে যে, যখন তিনি ইচ্ছা করেন আপনার নিকট করযের টাকার তাগাদা করিতে পারেন এবং তখন আপনার দিয়া দেওয়া উচিত হইবে। এমনকি, না দেওয়ার কারণে যদি তিনি কিছু শক্তও আপনাকে বলেন, তাহাও আপনার নীরবে সহ্য করিয়া নেওয়া উচিত হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** আপনি একজনের কাছ হইতে এক সের চাউল করয আনিয়াছিলেন। যখন করয পরিশোধের সময় আসিল তখন আপনি বলিলেন, ভাই, আপনি এক সের চাউলের পরিবর্তে এক সের চাউলের মূল্য আট আনার পয়সা নিয়া নেন। যদি করযদাতা ইহাতে রাযী হয়, তবে এরূপ মোয়ামালা করা জায়েয আছে, কিন্তু ঐ মজলিসেই মোয়ামালা শেষ করিতে হইবে। যদি ঐ মজলিস বদলিয়া যায়, তবে এই কথাবার্তার কোন মূল্য থাকিবে না; পুনরায় নূতন করিয়া কথাবার্তা বলিতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** আপনি এক টাকার ষোল আনা পয়সা করয গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর পয়সার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে এবং টাকায় পনর আনার পয়সা পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় আপনার ষোল আনার পয়সা দিতে হইবে না। এক টাকা দিলেই চলিবে। করযদাতা একথা বলার অধিকারী হইবে না যে, আমি এক টাকা নিব না, আপনি যে ষোল আনার পয়সা নিয়াছিলেন সেই ষোলআনার পয়সাই দিতে হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** বাড়ী-ঘরে প্রথা আছে, ঠেকা সময়ে অন্য বাড়ী হইতে রুটি গণিয়া বা ভাত মাপিয়া আনা হয়, তারপর আবার যখন নিজের ঘরে পাকান হয়, তখন রুটি গণিয়া বা ভাত মাপিয়া পাঠাইয়া দেয়, এরূপ মোআমালা দুরুস্ত আছে।

কাফিল বা জামিন হওয়ার বিবরণ

১। **মাসআলা ঃ** কোন বিশ্বস্ত লোক যদি কোন ব্যক্তিকে হাজির করিয়া দেওয়ার জামিন হয়, যাহাতে সে ভাগিয়া থাকিতে না পারে বা কাহারো নিকট কাহারো টাকা পাওনা আছে; কোন বিশ্বস্ত লোক যদি দেনাদারের পক্ষ হইতে তাহার জামিন হয় এবং পাওনাদার ইহা স্বীকার এবং মঞ্জুর করিয়া নেয়, তবে শরীঅতে এরূপ আক্‌দ দুরুস্ত আছে এবং কাফিলের উপর ইহাতে দায়িত্বও বর্তাইবে। (কিন্তু এতটুকু কাজের জন্য কাফিলের মজদুরি চাওয়া এবং মজদুরি খাওয়া শরীঅতে দুরুস্ত নাই। কারণ একজন বিপদগ্রস্তের এতটুকু উপকারের প্রতিদান ছওয়াবস্বরূপ আখেরাতের জন্য তুলিয়া রাখা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।)

যে জামিন হয় তাহাকে জাবিন বা কাফিল বা জামিনদার বলে। যার কাছে টাকা পাওনা থাকে তাহাকে দেনদার বা দেনাদার বলে এবং যার টাকা পাওনা থাকে তাহাকে হক্‌দার, পাওনাদার বা পানাদার বলে। পানাদার জামিন স্বীকার করিয়া নেওয়ার পর টাকার তাগাদা জামিনদারের নিকট

করিতে পারিবে এবং দেনাদার যদি টাকা না দেয়, তবে জামিনদারের দিতে হইবে। অবশ্য যদি দেনাদার পানাদারকে টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় অথবা তাহার নিকট হইতে মাফিনামা এবং মুক্তিপত্র লেখাইয়া লয়, অথবা খোদ পানাদারই যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া জামিনদারকে জামিন হইতে মুক্তি দিয়া দেয়, তবে জামিনদারের দিতে হইবে না বা পানাদার জামিনদারের নিকট তাগাদাও করিতে পারিবে না। কিন্তু যে মজলিসে জামিনের কথাবার্তা এবং আক্‌দ হইয়াছিল সেই মজলিসেই জামিনদারের স্বীকারোক্তি যথেষ্ট হইবে না, পানাদারেরও স্বীকারোক্তির প্রয়োজন। যদি পানাদার স্বীকার এবং মঞ্জুর না করিয়া থাকে বরং বলিয়া দিয়া থাকে যে, আপনার জিম্মাদারী এবং জামানাতদারী (অর্থাৎ, জামিন হওয়াকে) আমি বিশ্বাস করি না, তবে জামিনদার পানাদারের জন্য দায়ী হইবে না।

২। **মাসআলা ঃ** আপনি হয়ত কাহারো পক্ষ হইতে টাকার জামিন হইয়াছিলেন, দেনাদার বেচারার কাছে টাকা ছিল না, সে জন্য আপনি নিজেই নিজের পকেট হইতে পানাদারের পাওনা টাকা দিয়াছেন, এখন আপনি এই টাকা দেনাদারের নিকট হইতে পাইবার অধিকারী কি না, সে সম্পর্কে শরীঅতের বিধান এই যে, যদি ঐ দেনাদারের অনুরোধ এবং তার কথায় আপনি জামিন হইয়া টাকা দিয়া থাকেন, তবে তার কাছ থেকে আপনি টাকা নিতে পারিবেন, নেওয়ার অধিকারী আপনি হইবেন। আর যদি এমন হয় যে, দেনাদারের কথায় নহে বরং নিজ খুশীতে আপনি জামিন হইয়াছেন, তবে দেখিতে হইবে যে, আপনার জামিন কে আগে স্বীকার করিয়াছে—দেনাদার আগে স্বীকার করিয়াছে না পাওয়নাদার আগে স্বীকার করিয়াছে? যদি দেনাদার আগে স্বীকার করিয়া থাকে, তবে ইহাই ধরিয়া লওয়া হইবে যে, তার কথায়ই আপনি তার জামিন হইয়াছেন এবং এই অবস্থায় তার কাছে থেকে আপনার টাকা নেওয়ার অধিকারী হইবেন আর যদি পানাদার আগে মঞ্জুর করিয়া থাকে, (দেনাদার কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে বা পরে স্বীকার উক্তি দিয়া থাকে,) তবে এইরূপ ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, আপনি মেহেরবানী করিয়া তার দেনাটা শোধ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য যদি সে নিজে ইচ্ছা করিয়া ঐ টাকা দিয়া দেয়, তবে স্বতন্ত্র কথা।

৩। **মাসআলা ঃ** পানাদার যদি দেনাদারকে কিছু দিনের, যেমন পনর দিন, এক মাস, ছয় মাসের মোহ্‌লত দেয়, তবে সে জামিনদারকেও ঐ সময়ের মধ্যে তাগাদা করিতে পারিবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** জামিনদারের নিকট দেনাদারের কোন জিনিস ছিল বলিয়া সে দেনাদারের জামিন হইয়াছিল এবং একথা পাওয়নাদারও জানিয়াছিল। এখন যদি ঐ জিনিস চুরি হইয়া গিয়া থাকে বা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে পাওয়নাদার আর জামিনদারের নিকট তাগাদা করিতে পারিবে না বা জামিনদার দায়ী থাকিবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** আপনি একখানা টেক্‌সি বা একখানা রিক্‌শা কেরায়া করিলেন; অন্য এক-জনে জামিন হইল যে, সে টেক্‌সি বা রিক্‌শার ব্যবস্থা না করিলে আমি আমার রিক্‌শা বা টেক্‌সি আপনাকে দিব। এইরূপ জিম্মাদারী করা জায়েয আছে; জিম্মাদারী তাহার পুরা করিতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** একজন আপনার উকিল হইয়া আপনার জিনিস বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু ক্রেতার পক্ষে জামিন হইয়া মূল্য আনে নাই, এরূপ করা তাহার পক্ষে দুরুস্ত হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** একজন বলিল যে,—আপনার মুরগী খাঁচার মধ্যে বন্ধ থাকিতে দেন। যদি বিড়ালে খাইয়া ফেলে, তবে আমি দায়ী আছি; বা এইরূপ বলিল যে, আপনার বকরী এখানে থাকিতে দেন, শিয়ালে মারিলে আমি দায়ী হইব,— এরূপ দায়িত্ব দেওয়া কখনো ঠিক নহে।

৮। **মাসআলা**ঃ না-বালেগ ছেলে বা মেয়ে যদি কাহারও জামিন হয়, তবে ঐ জিম্মাদারী ছহীহ্ হইবে না।

একের করয অন্যের উপর বরাত দেওয়া

১। **মাসআলা**ঃ আপনি হয়ত রাশেদের টাকার দেনাদার আছেন আবার আপনার হয়ত হামেদের কাছে টাকা পাওনা আছে। যখন রাশেদ আপনার নিকট টাকার তাগাদা করিল, তখন আপনি বলিলেনঃ ভাই রাশেদ, আমার হামেদের নিকট টাকা পাওনা আছে, আপনি মেহেরবানী করিয়া আমার নিকট তাগাদা না করিয়া হামেদের নিকট হইতে তাগাদা করিয়া টাকা নিয়া নেন। যদি রাশেদ এই প্রস্তাব ঐ মজলিসেই স্বীকার করিয়া মঞ্জুর করিয়া নেয় যে, আচ্ছা, আমি হামেদের নিকট হইতেই টাকা নিয়া নিব এবং হামেদও টাকা রাশেদকে দিতে স্বীকার করে, তবে আপনি আর রাশেদের দেনাদার থাকিবেন না। রাশেদ আর টাকার তাগাদা আপনার নিকট করিতে পারে না। রাশেদ হামেদের নিকট টাকার তাগাদা করিতে পারিবে এবং আপনি যত টাকা রাশেদের বাবৎ কাটাইয়া দিয়াছেন হামেদের নিকট তত পরিমাণ টাকার আর তাগাদা করিতে পারিবেন না। অবশ্য হামেদের নিকট যদি অরো বেশী পরিমাণ টাকা আপনার পাওনা থাকিয়া থাকে, তবে বেশী পরিমাণের তাগাদা আপনি হামেদের নিকট করিতে পারিবেন। রাশেদকে যত টাকার বরাত দেওয়া হইয়াছিল হামেদ যদি তত টাকা দিয়া দেয়, তবে ত ভালই। নতুবা যদি সে টাকা না দিয়া মরিয়া যায়, তবে তার যা কিছু ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকিবে তাহা বিক্রয় করিয়া রাশেদকে টাকা দেওয়া হইবে। যদি ত্যাজ্য সম্পত্তি কিছু না থাকে বা জীবিত থাকা অবস্থায়ই হামেদ কছম খাইয়া আপনার করয অস্বীকার করিয়া থাকে এবং আপনিও সাক্ষী-প্রমাণ পেশ না করিতে পারিয়া থাকেন, তবে রাশেদের দেনা হইতে আপনি মুক্তি পাইবেন না। রাশেদের টাকা আপনার দিতে হইবে। আর যদি রাশেদ হামেদের নিকট হইতে টাকা তাগাদা করিয়া নিতে স্বীকার না করে বা হামেদও রাশেদকে দিতে স্বীকার না করে, তবে আপনি রাশেদের দেনা হইতে মুক্তি পাইবেন না, আপনারই রাশেদের টাকা দিতে হইবে। (হামেদ যদি আপনার দেনাদার থাকিয়া থাকে, তবে সে টাকা আপনি তাহার নিকট হইতে তাগাদা করিয়া আদায় করিয়া নিবেন।)

২। **মাসআলা**ঃ হামেদ যদি আপনার দেনাদার নাও থাকে, আর রাশেদের কাছে আপনি যে দেনা আছেন সেই দেনা হামেদ এখনও গছিয়া লয় এবং রাশেদও তার কাছ থেকে নিতে রাযী হয়, তবুও উপরে যেরূপ মাসআলা বয়ান করা হইয়াছে তদ্রূপ করিতে হইবে। হামেদ রাশেদের টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার আগে নয়, পরে আপনার থেকে সেই টাকা নিবার অধিকারী হইবে।

৩। **মাসআলা**ঃ আপনার কিছু টাকা বা অন্য মাল হামেদের নিকট হয়ত আমানত রাখা ছিল সেজন্য হামেদ আপনার নিকট রাশেদের পাওনা টাকার বরাত গ্রহণ করিয়াছিল। এখন আপনার সে মাল হয়ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা হামেদের বাড়ী চুরি হইয়া আপনার আমানতের টাকাও সেই সংগে চুরি হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থা হইলে রাশেদ আর হামেদের নিকট তাগাদা করিবে না, আপনার নিকট হইতে তাগাদা করিয়া তার টাকা আদায় করিয়া নিবে। এখন আর হামেদের নিকট তাগাদা করার অধিকার রাশেদের নাই।

৪। **মাসআলাঃ** হামেদের উপর বরাত দেওয়া সত্ত্বেও যদি আপনি নিজেই রাশেদের টাকা দিয়া দেন তাও আপনি দিতে পারিবেন এবং রাশেদও নিতে পারিবে, ইহাতে দোষ নাই। রাশেদ বলিতে পারিবে না যে, আপনার নিকট হইতে নিব না, হামেদের নিকট হইতেই নিব।

কাহাকেও উকিল বানাইবার বিবরণ

১। **মাসআলাঃ** মানুষ যে কাজ নিজে করিবার অধিকারী সে কাজ অন্যের দ্বারা করাইবারও সে অধিকারী। ইহাকেই শরীঅতের ভাষায় উকিল বানান বলে। কোন জিনিস ক্রয় করা, বিক্রয় করা, কেরায়া দেওয়া, বিবাহ করা ইত্যাদি। চাকরের দ্বারা সদায়-পাতি ক্রয় করান (বা হাল চাষ করান) ইহাকেও উকিল, বানান বলা হয়। (কর্মচারীর দ্বারা কাজ করান বা দোকান চালনাও উকিল বানানের অন্তর্ভুক্ত হইবে। উকিলের হাতে যে পয়সা দেওয়া হয় বা যে মাল তার হাতে দেওয়া হয় বা যে মাল তার হাতে আসে, সে পয়সা এবং সে মাল প্রকৃত প্রস্তাবে মালিকের থাকে, উকিলের হাতে আমানত থাকে মাত্র। আমানতের মধ্যে আদৌ কোনরূপ খেয়ানত করা শক্ত হারাম। অবশ্য উকিলকে মেহনতানা যাহা কিছু দেওয়া হইবে, সেটার মালিক সে হইবে। উকিলের কাজ করিয়া মেহনতানা চুকাইয়া নেওয়া শরীঅতে জায়েয আছে।)

২। **মাসআলাঃ** আপনার কর্মচারী কোন জিনিস বাকী খরিদ করিয়া আনিলে বিক্রেতা সেই টাকার তাগাদা আইনতঃ সেই কর্মচারীর নিকট দাবী করিবার অধিকারী, আপনার নিকট নয়। (অবশ্য আপনি যদি দিয়া দেন, সে স্বতন্ত্র কথা।) এইরূপে আপনার কর্মচারী যদি কোন মাল বিক্রয় করে তবে ক্রেতার নিকট তাগাদা করিবার অধিকারী আপনি নহেন বরং আপনার কর্মচারীর। (আপনার অধিকার আছে আপনার কর্মচারীর নিকট তাগাদা করার।) অবশ্য ক্রেতা নিজে ইচ্ছা করিয়া যদি আপনার নিকট দিয়া দেয়, তবে সে টাকা অপনি নিয়া নিতে পারেন। কিন্তু ক্রেতাকে আপনি জবরদস্তি করিতে পারিবেন না।

৩। **মাসআলাঃ** কাহারও দ্বারা আপনি মাল কিনাইয়াছেন, যে মাল কিনিয়া আনিয়াছে, যাবৎ আপনি টাকা তাকে না দিবেন, তাবৎ সে মাল আটকাইয়া রাখিবার ন্যায়তঃ অধিকারী; চাই সে মাল নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়া আনিয়া থাকুক বা না দিয়া থাকুক দোনো ছুরতে সে আপনার থেকে টাকা না পাইলে মাল আটাইয়া রাখিবার এবং আপনার থেকে টাকা তাগাদা করিবার অধিকারী। অবশ্য যদি সে দশ দিনের সময় নিয়া আসিয়া থাকে, তবে সেই সময় পার হইবার পূর্বে আপনার নিকট টাকা পাইবার বা তাগাদা করিবার অধিকারী নয়।

৪। **মাসআলাঃ** আপনি কাহাকেও এক সের গোশ্‌ত আনিতে বলিয়া দিলেন; কিন্তু সে আনিয়াছে দেড় সের। এখন আপনি দেড় সের নিতে আইনত বাধ্য নহেন, এক সের নিতে বাধ্য। বাকী আধ সের তার জিম্মায়। (অবশ্য আপনি যদি ভদ্রতার খাতিরে নিয়া নেন, সে ভিন্ন কথা।)

৫। **মাসআলাঃ** আপনি কাহাকেও নির্দিষ্ট একটি মাল নির্দিষ্ট একটি মূল্যে ক্রয় করিতে পাঠাইলেন। এখন সেই মাল তার নিজের জন্য ক্রয় করার অধিকার তার নাই। অবশ্য আপনি যদি মূল্য সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া থাকেন যে, এত মূল্যে হইলে আমি রাযী, নতুবা রাযী নহি। এমতাবস্থায় বিক্রেতা যদি সেই নির্দিষ্ট মূল্যে না দেয় এবং আপনার পাঠান লোক যদি বেশী মূল্য দিয়া নিজের জন্য কিনে, তবে সে কিনিতে পারিবে। কিন্তু আপনি যদি বেশী মূল্য সীমাবদ্ধ না

করিয়া দিয়া থাকেন, তবে কিছুতেই সে নিজের জন্য কিনিতে পারিবে না; কিনিলে সে মাল আইনত আপনার হইবে।

৬। মাসআলা ঃ তুমি নির্দিষ্ট বকরী খরিদ করিতে বল নাই। শুধু বলিয়াছ যে, একটি বকরীর দরকার, আমাকে কিনিয়া দাও। তখন সে যে বকরী ইচ্ছা নিজের জন্য খরিদ করিতে পারে বা তোমার জন্য খরিদ করিতে পারে। নিজের নিয়তে ক্রয় করিলে নিজের হইবে। আবার যদি তোমার নিয়তে ক্রয় করে, তোমার হইবে। আর যদি তোমার দেওয়া টাকা দিয়া ক্রয় করে, তবে তোমারই হইবে—যে নিয়তেই ক্রয় করুক না কেন।

৭। মাসআলা ঃ আপনি একজনকে একটি বকরী কিনিতে পাঠাইয়াছিলেন। সে আপনার জন্য বকরী কিনিয়াছে, কিন্তু এখনো আপনার নিকট পৌঁছাইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে বকরীটা চুরি হইয়া গেল অথবা মরিয়া গেল। এমতাবস্থায় বকরীর দাম আপনারই দিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে আপনি যদি দাবী করেন যে ঐ বকরী সে আপনার জন্য কিনিয়াছিল না, তবে দেখিতে হইবে যে, যদি আপনি তাকে টাকা দিয়া পাঠাইয়া থাকেন, তবে ত আপনারই টাকা যাইবে, তাতে কোন দ্বিমত নাই। যদি এমন হয় যে, টাকা আপনি দেন নাই, কিন্তু কিনিতে বলিয়াছিলেন। সে বলিতেছে, আপনার জন্য কিনিয়াছে আর আপনি বলিতেছেন, সে নিজের জন্য কিনিয়াছে। এমতাবস্থায় আপনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন বা প্রমাণসূত্রে কসম খাইতে পারেন যে, সে নিজের জন্য কিনিয়াছে, তবে ত টাকা তার যাইবে। আর যদি আপনি কসম খাইতে না পারেন, তবে তাহার কথাই আপনার বিশ্বাস করতে হইবে, তাহা ছাড়া উপায় নাই। মিথ্যা কসম করা গোনাহ্ কবীরাহ্।

৮। মাসআলা ঃ আপনি যাকে মাল কিনিতে উকিল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, সে মাল কিনিয়াছে কিন্তু দাম বেশী দিয়া আনিয়াছে, যদি অল্প কিছু বেশী হয়, তবে ত মাল আপনার নিতে হইবে। আর যদি অনেক বেশী হয়—এত বেশী যে, বাজারে কেহই অত দাম লাগাইবে না—তবে অত বেশী দাম দিয়া মাল নিতে আপনি বাধ্য নহেন। আপনি না নিলে তাহাকেই নিতে হইবে। (যদি ভদ্রতার খাতিরে নিয়া নেন, সে ত ভিন্ন কথা। এজন্য আগেই বিশ্বস্ত এবং যোগ্য দেখিয়া লোক নিযুক্ত করা উচিত। তাহা হইলে আর এইরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব হয় না।)

৯। মাসআলা ঃ একজনকে আপনি উকিল বানাইলেন আপনার একটি জিনিস বিক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য। এখন ঐ উকিল নিজে ঐ মাল কিনিতে পারিবে না। যদি তার নিবার ইচ্ছা হয়, তবে সোজা আপনাকে বলিতে হইবে যে, আপনার ঐ জিনিসটা আমিই কিনিতে চাই। এইরূপে যদি কাউকে কোন জিনিস কেনার জন্য উকিল বানাইয়া থাকেন, তবে সে নিজের জিনিস আপনাকে আনিয়া দিতে পারিবে না; যদি নিজের জিনিস আপনাকে তার দেওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে তার সোজা আপনাকে বলিতে হইবে যে, অমি উকিল হইব না, আমি বিক্রেতা হইতে চাই, যদি আপনি আমার মাল নেন, তবে কত দিবেন বলেন। (উকিল যদি গোপনে নিজের মাল আনিয়া দেয়, তবে খেয়ানতের গোনাহ্ হইবে।)

১০। মাসআলা ঃ আপনি কাহাকেও উকিল বানাইয়াছেন বকরীর গোশ্‌ত আনিবার জন্য, কিন্তু সে নিয়া আসিল গরুর গোশ্‌ত। এমতাবস্থায় আপনি গোশ্‌ত নিতে আইনতঃ বাধ্য নহেন। আপনি আলু আনিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সে ঢেঁড়স বা অন্য কিছু আনিয়াছে, তবে আপনি উহা লইতে বাধ্য নন। আপনি অস্বীকার করিলে তাহারই নিতে হইবে।

১১। মাসআলাঃ এইরূপে আপনি যেখানে এক টাকার মাল আনিতে বলিয়াছেন, সেখানে যদি সে দুই টাকার মাল আনিয়া থাকে, তবে দুই টাকার মাল নিতে আপনি আইনতঃ বাধ্য নহেন, এক টাকার মাল নিতে বাধ্য। (অর্থাৎ, উকিল যদি মোয়াক্কেলের কথার খেলাফ করে, সে খেলাফের জন্য মোয়াক্কেল দায়ী নহে, তার জন্য দায়ী হইবে উকিল। কিন্তু এই খেলাফ যদি মোয়াক্কেলের লাভের দিকে হয়, তবে সেইরূপ খেলাফ করিলে তাহা বেআইনী হইবে না। যেমন, হয়ত আপনি বলিয়াছেন বকরীটা ১০ টাকায় বিক্রয় করিতে পার। এখন সে যদি ১০ টাকার স্থলে ১২ টাকায় বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে তাহা আইনতঃ দূষণীয় হইবে না।)

(মনে করুন, আপনি একজনকে উকিল বানাইলেন আপনার একটি মোকদ্দমা চালাইবার জন্য। এক্ষেত্রে আপনিও একথা বলিতে পারিবেন না যে, আমাকে মোকদ্দমায় জিতাইয়া দিতে হইবে এবং উকিলও একথা বলিতে পারিবেন না যে, আমি নিশ্চয়ই মোকদ্দমায় জিতাইয়া দিব। অবশ্য জিতাইবার জন্যই প্রত্যেকের চেষ্টা হইবে একথা সুনিশ্চিত হারিবার জন্য ত আর কেহ মোকদ্দমা করে না। কিন্তু এইরূপ শর্ত করা বা শর্ত লাগান অথবা মোকদ্দমা জিতাইবার বা জিতাইবার জন্য মিথ্যা সাক্ষী বানান বা ঘুষের আশ্রয় গ্রহণ করা হারাম, গোনাহ্ কবীরাহ্। অবশ্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার দ্বারা, মস্তিষ্কের প্রখরতার দ্বারা ও বিদ্যার গভীরতার দ্বারা সত্যের সীমা লঙ্ঘন না করিয়াও অনেক সময় অনেক সূক্ষ্ম পয়েন্ট এমন বাহির করা, যাহা দ্বারা উকিলের কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়, মিথ্যা সাক্ষীও লাগে না। ফলকথা এই যে, সত্যের সীমা, ন্যায়ের সীমা ধর্মের সীমা লঙ্ঘন না করিলে, ওকালতি ব্যবসার দ্বারা পয়সা উপার্জন করা জায়েয আছে। বিনা পয়সায় নিঃসহায়ের সহায়তা করিয়া দিলেও তাহাতে ছওয়াব আছে।) —অনুবাদক

১২। মাসআলাঃ কোন কাজের জন্য দুইজনকে একত্রে উকিল বানাইলে দোনোজনের পরামর্শে দোনোজনের একযোগে সে কাজ হওয়া দরকার। অন্যথায় একজন যদি অন্যজন ছাড়া সে কাজ করে, তবে তাহা আপনার উপর লাযেম হইবে না, আপনার অনুমতি সাপেক্ষ হইবে।

১৩। মাসআলাঃ আপনি একজনকে একটা জিনিস কেনার জন্য উকিল বানাইয়াছেন। তিনি নিজে না কিনিয়া অন্যের দ্বারা কিনাইলেন। এই জিনিস এখন আপনার নেওয়া লাযেম নহে। নেওয়া না নেওয়া আপনার ইচ্ছা। আর সে নিজে কিনিলে আপনার উপর লাযেম হইবে। সেটা অবশ্যই নিতে হইবে।

উকিলকে বরখাস্ত করিয়া দেওয়ার বর্ণনা

১। মাসআলাঃ উকিলকে বরখাস্ত করিয়া দেওয়ার অধিকার এবং এখতিয়ার মোয়াক্কেলের (যে উকিল নিয়োগ করে, তাহার) সব সময় আছে, (কিন্তু অন্য কাহারো হক্ নষ্ট না হয়, সে দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং উকিলের অবগত হওয়া চাই যে, মোয়াক্কেল তাহাকে বরখাস্ত করিল। নিজের মনে মনে বরখাস্ত করিয়া অন্যের হক নষ্ট করা চলিবে না।) যেমন, ধরুন, আপনি কাহাকেও বলিয়াছেন, একটি বকরী কিনিয়া আনিতে। এখন আপনার তাকে মানা করার অধিকার সব সময় আছে এবং আপনার মানা করার পর যদি সে বকরী কিনে, তবে সে বকরীর টাকার জন্য আপনি দায়ী হইবেন না।

২। মাসআলাঃ উকিলকে বরখাস্ত করিবার খবর হয় তাকে আপনি নিজে গিয়া সাক্ষাতে বলিবেন বা তাকে ডাকাইয়া আনিয়া সাক্ষাতে বলিবেন বা আপনার লোক (কাছেদ) মারফৎ তাকে

খবর পৌঁছাইয়া দিবেন বা পত্রের দ্বারা তাকে খবর দিয়া দিবেন। কিন্তু খবর পৌঁছার আগ পর্যন্ত উকিল যে কাজ করিবে, তাহা আপনার দায়িত্বে পড়িবে। আর যদি আপনি নিজে সাক্ষাতেও না বলিয়া থাকেন বা খবর না পাঠাইয়া থাকেন কিন্তু এমনিই জানিয়া থাকে বা কেউ তাহাকে বলিয়া থাকে, তবে যদি দুইজন সাক্ষীর মারফৎ জানিয়া থাকে, তবে ত সে বরখাস্ত হইয়া যাইবে। (এর পর যদি সে জিনিস কিনিয়া থাকে সেটার দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে পড়িবে না।) কিন্তু যদি বিশ্বস্ত উপায়ে খবর না পাইয়া সে জিনিস কিনিয়া থাকে, তবে সেটার দায়িত্ব আপনার উপর পড়িবে।

মোযারাবাত অর্থাৎ বেপার করিতে টাকা দেওয়ার বিবরণ

১। মাসআলাঃ আপনার কাছে কিছু টাকা আছে। কিন্তু আপনি হয়ত কাজ জানেন না বা পরিশ্রম করিতে পারেন না। আর একজন হয়ত এমন আছে যে, সে কাজ জানে, পরিশ্রম করিতে পারে কিন্তু তার পুঁজি নাই এবং সেইজন্য সে কারবার করিতে পারিতেছে না; এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এই ব্যবস্থা রাখিয়াছেন যে, যদি আপনি কাউকে এই বলিয়া টাকা দেন যে, মিঞা, এই টাকা নিয়া কারবার কর। আল্লাহ্ যদি কিছু মুনাফা দেয়, আমরা ভাগ করিয়া নিব, টাকার অংশ হইবে, শ্রমের অংশও হইবে। এইরূপ কারবারকে শরীঅতের ভাষায় মোযারাবাত বলে। এইরূপ কারবার শতীঅতে জায়েয আছে। তবে জায়েয হওয়ার জন্য কতকগুলি শর্ত আছে। শর্তের মোতাবেক হইলে জায়েয হইবে, আর শর্তের খেলাফ হইলে নাজায়েয ও হারাম হইবে। (১) প্রথম শর্ত এই যে, যত টাকা মহাজন বেপারীকে বেপার করার জন্য দিবে, তাহা কারবারের কথার সময় বলিয়া দিতে হইবে এবং সে টাকাটা বেপারীর হাতে দিয়া দিতে হইবে। নিজের হাতে টাকা রাখিলে কারবার হইল না। (২) দ্বিতীয় শর্ত এই যে, মুনাফার মধ্যে কত অংশ কাহার হইবে তাহাও ঐ সময় উভয়ের সামনেই উভয়ের রেযামন্দিতেই ঠিক করিয়া পরিষ্কার করিয়া নিতে হইবে। যদি অপরিষ্কার বা গোলমেলে থাকে বা এইরূপ বলা হয় যে, লাভ হইলে দেখা যাইবে, আপনার আমার মধ্যে কি কোন গোলমাল হইবে?—যে লাভ আল্লাহ্ দিবেন তাহা উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া ভাগ করিয়া নিব, ইহাতে কারবার ফাসেদ হইয়া যাইবে। (৩) তৃতীয় শর্ত এই যে, মুনাফার ভাগ অংশ হিসাবে হওয়া চাই, নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা হিসাবে হইলে মোয়ামালা ফাসেদ হইয়া যাইবে। এরূপ বলা যাইবে না যে, যাহা লাভ হইবে তার থেকে ১০ টাকা আমার, বাকীটা তোমার বা ১০ টাকা তোমার এবং বাকী যাহা থাকে তাহা আমার। এইরূপ বলিলে মোয়ামালা ফাসেদ হইয়া যাইবে—কারবার নষ্ট হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা এতটুকু স্বাধীনতা দান করিয়াছেন যে, নিজেরা ইচ্ছা করিয়া উভয়ে রাযী খুশী হইয়া যত অংশ যার জন্য ঠিক করিবে উভয়ে রাযী হইয়া ঠিক করার পর তাহাই শরীঅতের হুকুমে পরিণত হইয়া যাইবে, তার খেলাফ করা যাইতে পারিবে না। (যেমন, হয়ত উভয়ে মিলিয়া টাকার অংশ ঠিক করিল যে, ঘর-ভাড়া, নৌকা-ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন এসব বাদে শ্রমের অংশ থাকিবে টাকায় চারি আনা এবং টাকার অংশ থাকিবে টাকায় বার আনা অথবা ঐ সকল বাদে ছয় আনা বা দশ আনা বা আট আনা অংশ ঠিক করা হইল। এরূপ হইলে মোয়ামালা ঠিক হইবে।) মোটের উপর কথা এই যে উভয়ে রাযী হইয়া যত অংশ ঠিক করিবে সেইটাই ঠিক হইবে। (এই মোয়ামালায় যখন তখন সাক্ষী সাবুত রাখিয়া লেখাপড়া করিয়া লওয়া ভাল, যাহাতে পরে গোলমাল হইয়া বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্ব বা আত্মীয়তা নষ্ট হইতে না পারে। কারবার শুরু করিয়া যে পর্যন্ত হিসাব বুঝাইয়া দিয়া কারবার ক্ষান্ত না করিবে,

সে পর্যন্ত যদি কোন বারে (ক্ষেত্রে) লাভ, কোন বারে লোকসান হয়, তবে লোকসান লাভের উপর থেকে কাটা যাইবে; বেপারীর উপর ফেলান হইবে না বা মহাজনের উপরও ফেলান হইবে না। অবশ্য হিসাব চুকাইয়া কারবার বন্ধ করার সময় যদি দেখা যায় যে, মোটের উপর লাভ দাঁড়াইয়াছে, তবে লাভের টাকাকে পূর্বের ঠিক করা হার অনুসারে ভাগ করিয়া নিবে,) আর যদি দেখা যায় যে, মোট হিসাবে লাভও হয় নাই এবং লোকসানও হয় নাই; সমান সামান রহিয়াছে, তবে মহাজন আপন আসল টাকা লইয়া যাইবে এবং বেপারীর শ্রম বৃথা যাইবে। সে তার শ্রমের পরিবর্তে মহাজনের নিকট কিছু দাবী করিতে পারিবে না; আর যদি দেখা যায় যে, লাভ ত হয়ই নাই বরং উল্টা লোকসান গিয়াছে, তবে এই লোকসান বেপারীর উপর ফেলান যাইবে না। এ লোকসান মহাজনের যাইবে। বেপারীর ত বহু পরিশ্রম বিনা লাভে গেল। যদি এইরূপ শর্ত করে যে, আসল টাকায় লোকসান গেলে সে টাকার অংশ হারাহারি মতে বেপারীর দিতে হইবে বা যদি এইরূপ শর্ত করে যে, বেপারীর শ্রম বৃথা গেলে (যদি কারবারে লাভ না হয় বা লোকসান যায়) তবে শ্রমের মজুরি মহাজনের দিতে হইবে, এই দোনো রকম শর্ত করা ফাসেদ এবং না-জায়েয।

২। **মাসআলাঃ** মহাজনের অধিকার আছে যে, যে কোন সময় বেপারীকে বরখাস্ত করিতে পারবে। কিন্তু বরখাস্তের খবর বেপারীর নিকট পৌঁছা চাই। খবর পৌঁছার আগে যদি মাল কিনিয়া থাকে, তবে সেই মাল বিক্রয় না করা পর্যন্ত বেপারী বরখাস্ত হইবে না।

৩-৪। **মাসআলাঃ** মোযারাবাতের মধ্যে যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, মহাজন নিজে বা তাঁহার পক্ষ হইতে কোন লোক মোযারাবাতের কারবারের মধ্যে থাকিবে, তবে ইহা মোযারাবাত থাকিবে না। কেননা, এক্ষেত্রে যদি মহাজন (বা তাহার পক্ষের লোক) আসল কারবারী হয়, তবে বেপারী হইবে তাহার অধীনস্থ কর্মচারী, অথচ অধীনস্থ কর্মচারী কেমন করিয়া টাকার দায়িত্ব নিতে পারে? আর যদি বেপারী হয় আসল কারবারী, তবে তাহার মহাজন (বা মহাজনের পক্ষের লোক) হইবে তাহার অধীস্থ কর্মচারী—ইহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে? কাজেই এই দোনো ছুরতে গোলমাল হইবার আশংকা আছে বলিয়া এইরূপ শর্ত করিলে মোয়ামালা ফাসেদ হইয়া যাইবে। এইরূপে যদি শর্ত করা হয় যে, লাভের মোটের উপর থেকে ১০০ একশত টাকা মহাজনকে দিয়া—তারপর যা থাকিবে তাহা স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী ভাগ হইবে, তবে ইহাতেও মোয়ামালা ফাসেদ হইয়া যাইবে; আর মোয়ামালা ফাসেদ হইলে লাভ হউক বা লোকসান হউক বেপারী তার যোগ্য বেতন পাইবার অধিকারী হইবে। লোকসান হইলে তার শ্রম বৃথা যাইতে পারিবে না। অবশ্য যখন লাভ হইবে, তখন বেতন যদি লাভের অংশের চেয়ে বেশী হয়, তবে সে বেশী পাইবার অধিকারী হইবে না; লাভের অংশে যাহা পড়ে তাহাই পাইবে। মোয়ামালা ফাসেদ হইলে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। আর মোয়ামালা ছহীহ্ ভাবে হইলে যা কিছু লাভ হয়, তাহা স্থিরকৃত অংশ অনুযায়ী ভাগ হইবে। লোকসানের অংশ বেপারীর ঘাড়ে ফেলান হইবে না। (প্রকাশ থাকে যে, মোযারাবাত এমন একটি সুন্দর তরীকা যাহাকে এক প্রকার বিনা সুদের ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে। ইহার দ্বারা ইমাম আবু হানীফা [রহঃ] কোটি টাকার তেজারত এবং ছানাআত করিয়া লাভবান হইয়াছেন এবং তৎকালে জনসাধারণ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছে। হুকুমত এখনো যদি শরীঅত পালনের দিকে, ইসলামী আদর্শের উন্নতির দিকে একটু দৃষ্টি দেয়, তবে মোযারাবাতের এই নিয়ম চালু করিয়া পুঁজিপতি এবং শ্রমিকদের ঝগড়া খতম করিয়া দিতে পারে। সুদের অভিশাপ হইতে

দেশবাসীকে মুক্তি দিতে পারে এবং সমস্ত গরীব জনসাধারণ মিলের এবং ব্যাঙ্কের অংশীদার হইয়া শ্রম এবং পুঁজি উভয়েরই মর্যাদা দান করিতে পারে এবং শরীঅত পালন করিয়া সুখে শান্তিতে দুনিয়ার উন্নতি করিয়া আখেরাতের মুক্তি এবং চিরশান্তি লাভ করিতে পারে।)

আমানত রাখার বিবরণ

[আমানত ঈমানের মূল। হাদীস শরীফে আছেঃ যার আমানতদারী নাই তাহার ঈমান নাই।

আমানত প্রধানতঃ তিন প্রকারঃ (১) টাকা-পয়সা মাল-মালিয়াতের আমানত, (২) কথার আমানত। যেমন, আপনি একজনকে একটি কথা দিলেন অর্থাৎ ওয়াদা করিলেন যে, আপনি তার খেলাফ করিবেন না বা আপনি একজনকে একটি কথা বলিয়া বলিলেন যে, 'ইহা অন্য কাহাকেও বলিবেন না।' (৩) কাজের আমানত যেমন কর্মচারীকে কাজ দেওয়া হইল সে কাজে ত্রুটি করা চাই না। এই তিন প্রকারেরই আমানতের মধ্যে খেয়ানত করা গোনাহ্ কবীরাহ্। এখানে টাকা-পয়সা, মাল-মালিয়াতের আমানত সম্বন্ধে কয়েকটি মাসআলা লেখা হইবে। যাহার কাছে আমানতের মাল রাখা হইবে, তাহাকে বলা হয় আমানতদার। যাহার মাল আমানত রাখা হয়, তাহাকে বলে আমানতকারী। —অনুবাদক]

১। **মাসআলাঃ** আপনার নিকট একজনে একটা মাল আমানত রাখিল, আপনিও সেটা গ্রহণ করিয়া নিলেন। ঐ মালের পূর্ণ হেফাযত করা আপনার উপর ওয়াজিব, যদি আপনি হেফাযতে ত্রুটি করেন আর মালটা নষ্ট হইয়া যায়, তবে আপনার ক্ষতিপূরণ (বা ভর্তুকি) দিতে হইবে। অবশ্য যদি নিজের মালের মত পূর্ণ হেফাযত করা সত্ত্বেও মাল চুরি হইয়া যায় বা ঘরে আগুন লাগিয়া মাল জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তবে আমানতকারী ভর্তুক পাইবার অধিকারী থাকে না। এমনকি আমানতদার যদি আমানত রাখিবার সময় স্বীকারও করিয়া নিয়া থাকে যে, মাল নষ্ট হইলে তার জিম্মাদার আমি। কিন্তু পরে পূর্ণ হেফাযত করা সত্ত্বেও বাড়ী চুরি ডাকাতি হইয়া মাল নষ্ট হইয়া গেল বা আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেল। এমতাবস্থায় আইনতঃ আমানতকারী ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবে না। কিন্তু আমানতদার যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া নিজের তরফ হইতে আমানতকারীকে উহার ক্ষতিপূরণ দিয়া দেয়, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা; ইহার জন্য সে ছওয়াব পাইবে।

২। **মাসআলাঃ** একজন আপনাকে বলিল, 'ভাই আমি একটু কাজে যাইতেছি, আমার এই মালটা রাখুন।' আপনি বলিলেন, 'আচ্ছা রাখুন' অথবা কিছুই বলিলেন না, সে আপনার কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে ঐ মালটি আপনার নিকট আমানত হইয়া গেল এবং উহার হেফাযত করাও আপনার উপর ওয়াজিব হইয়া গেল। (এখন উহার হেফাযত না করিলে আপনি গোনাহ্‌গার হইবেন।) অবশ্য কোন কারণ বা ওযরবশতঃ যদি আপনি উহার হেফাযত করিতে অপারগ হন, তবে যখন সে ব্যক্তি বলিয়াছিল যে, ভাই আমার এই মালটা একটু দেখিবেন, তখনই পরিষ্কার ভাষায় আপনার বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল যে, 'না ভাই আমার কিছু ওযর আছে, আমি রাখিতে বা দেখিতে পারিব না, এবং এ কথা এতটুকু উচ্চৈঃস্বরে এবং পরিষ্কারভাবে বলিতে হইবে, যেন সে শোনে। তারপরও যদি সে রাখিয়া যায়, তবে কোন মতেই আপনি দায়ী নহেন। অবশ্য হাত দিয়া উঠাইয়া রাখিলেই আমানতের দায়িত্ব আপনার উপর আসিয়া পড়িবে এবং হেফাযতের জন্য আপনি দায়ী হইবেন।

৩। **মাসআলা ঃ** এক জায়গায় কয়েকজন লোক বসা ছিল। আর একজনে তার একটা মাল সকলের জিম্মায় করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া চলিয়া গেল, এখন ঐ মালের হেফাযত সকলের জিম্মায় ওয়াজিব হইয়া পড়িয়াছে। যদি সকলে উঠিয়া চলিয়া যায়, আর ঐ মালটা খোয়া যায়, তবে সকলেই দায়ী এবং পাপী হইবে। আর যদি সকলে এক সঙ্গে না যাইয়া থাকে ; এক একজন করিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইয়া থাকে, তবে সকলের শেষ যে ছিল তার দায়িত্বে ঐ মালটা আসিয়াছে; তার জিম্মায় ঐ মালের হেফাযত ওয়াজিব হইয়াছে। সেও যদি চলিয়া যায় আর মালটা খোয়া যায়, তবে সে দায়ীও হইবে, পাপীও হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** যাহার নিকট যে মাল আমানত থাকিবে, সে মালের হেফাযত সে নিজেই করিবে ; সে নিজেই তার জন্য দায়ী। অবশ্য পরিবারের মধ্যে স্ত্রীর কাছে, মায়ের কাছে, মেয়ের কাছে বা এরূপ অন্য কারুর কাছে—যাদের উপর তার পূর্ণ আস্থা আছে এবং যাদের কাছে সে নিজের টাকা-পয়সা সচরাচর রাখে, তাদের কাছে এই আমানতের মাল রাখিতে পারিবে। কিন্তু পরিবারস্থ যাহাকে সে আমানতদার বলিয়া মনে করে না, তাদের কাছে উহা হেফাযতের জন্য রাখা যাইবে না। পরিবারস্থ যাহাকে সে পূর্ণ বিশ্বাস করে না, এমন লোকের কাছে রাখিলে যদি মাল খোয়া যায়, তবে ভর্তুক দিতে হইবে। মালের হেফাযতের জন্য আমানতদাতার এতদ্ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয় বা বন্ধুর নিকট মালের মালিকের বিনা অনুমতিতে রাখিতে পারিবে না। যদি রাখে আর খোয়া যায় তবে ভর্তুক দিতে হইবে। অবশ্য যদি এমন কোন বন্ধু বা বিশ্বস্ত আত্মীয় থাকে, যার কাছে সে নিজের টাকাও রাখে, তবে তার কাছে (মালিকের অনুমতি না লইয়াই) রাখিতে পারিবে।

৫। **মাসআলা ঃ** কেহ আপনার নিকট কোন মাল আমানত রাখিল। আপনি ভুলে মাল ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, ঐ মাল পরে খোয়া গেল। এ মালের জন্য আপনি দায়ী হইবেন এবং ভর্তুক দিতে হইবে। অথবা ঐ মাল বাক্সে, সিন্দুকে বা আলমারিতে রাখিয়া চাবি না দিয়া চলিয়া গেলেন (অথচ তথায় নানা প্রকারের লোকজন উপস্থিত ছিল।) জিনিসটাও এমন যে, সাধারণতঃ তালা বন্ধ না করিলে হেফাযত হয় না। ফলে ঐ আমানতের মাল খোয়া গেলে ভর্তুক দিতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** আপনার কাছে কাহারো কোন মাল আমানত ছিল, ঘটনাক্রমে আপনার বাড়ীতে আগুন লাগিয়া গেল, এমতাবস্থায় যদি আমানতের মালটা আপনি বাহির করিতে পারিয়া থাকেন, তবে আপনার পড়শীর বাড়ীতে নিয়া ঐ মালটা আমানত রাখিতে পারেন। কিন্তু ওযর চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই আবার সে মাল আপনার ফিরাইয়া আনিয়া হেফাযত করিতে হইবে। এইরূপে হঠাৎ যদি মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে আপনি কাহাকেও না পাইলে, যাহাকে পান তাহার কাছে রাখিয়া যাইতে পারেন।

৭। **মাসআলা ঃ** কেহ কোন টাকা-পয়সা আমানত রাখিলে অবিকল সেই টাকা পয়সাই পৃথকভাবে হেফাযত করিয়া রাখা ওয়াজিব। নিজের টাকার সঙ্গে ঐ টাকা মিশান জায়েয নাই এবং ঐ টাকার থেকে খরচ করাও জায়েয নাই। এইরূপ মনে করিবেন না যে, টাকায় টাকায় ত সমান, খরচ করিয়া ফেলি, পরে যখন চাহিবে, তখন দিয়া দিব। যদি এরূপ করিতে হয় তবে মালিকের নিকট হইতে এজাযত লইতে হইবে। তবে যদি অবিকল সেই পয়সা পৃথকভাবে পোটলা বাঁধিয়া পূর্ণ হেফাযতের সহিত রাখিয়া থাকেন এবং তা সত্ত্বেও চুরি হইয়া যায় বা আগুনে

জ্বলিয়া বা নদীতে ডুবিয়া যাইয়া থাকে, তবে আপনার ভর্তুক দিতে হইবে না। আর যদি এজাযত লইয়া খরচ করিয়া থাকেন বা মিশাইয়া থাকেন, তবে ঐ টাকা আপনার জিম্মায় করয হইয়া যাইবে; ঘর পুড়িয়া বা নদীতে ডুবিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও আপনি দায়ী থাকিবেন; তাহার মাল যাইবে না, যাইবে আপনার মাল। আপনি এমনকি খরচ করার পর যদি পৃথক করিয়া তাহার জন্য টাকা রাখিয়াও থাকেন, তবুও দায়ী থাকিবেন। মালিকের হাতে না পৌঁছান পর্যন্ত আপনিই জিম্মাদার থাকিবেন।

৮। **মাসআলা ঃ** আপনার নিকট কেহ একশত টাকা আমানত রাখিয়াছে। আপনি মালিকের অনুমতিতে তার মধ্য হইতে ৫০ টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন আর বাকী ৫০ টাকা যেমন ছিল তেমনই পৃথকভাবে হেফাযতে আছে। তারপর আপনার হাতে টাকা আসিয়াছে। (এখন ৫০ টাকা পূর্ণ করিয়া রাখিতে চাহেন) তবে এই ৫০ টাকা আগের ৫০ টাকার সঙ্গে মিশাইবেন না। কারণ, এই ৫০ টাকা করযের এবং আগের ৫০ টাকা আমানতের। যদি মিশাইয়া ফেলেন, তবে সব টাকা করযের হইয়া যাইবে এবং আপনি সব টাকার করযের জিম্মাদার হইবেন।

৯। **মাসআলা ঃ** আপনি আমানতকারীর এজাযত লইয়া তার ১০০ টাকা আপনার ১০০ টাকার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। এখন ঐ মোট ২০০ টাকা আপনারা দুইজনে সমান সমান শরীকী ভাগে মালিক হইয়াছেন। যদি চুরি হইয়া যায়, তবে দুই জনেরই যাইবে, আর যদি অর্ধেক চুরি হয়, তবে সেই অর্ধেকের অর্ধেক যাইবে তার এবং অর্ধেক যাইবে আপনার। আর যদি তার হয় ১০০ টাকা এবং আপনার হয় ২০০ টাকা, তবে তার যাইবে তিন ভাগের একভাগ এবং আপনার যাইবে তিন ভাগের দুই ভাগ। এজাযত লইয়া মিশাইলে মাসআলা এরূপ হইবে। আর বিনা এজাযতে মিশাইলে কি হইবে সে মাসআলা উপরে বলা হইয়াছে। আমানতের টাকা বিনা অনুমতিতে মিশাইলে করয হইয়া যায়, এখন আর উহা আমানত থাকে না, যাহা খোয়া গেল তোমার গেল, তাহার টাকা তাহাকে দিতেই হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ গাই বা বকরী আমানত রাখে, তবে মালিকের বিনা এজাযতে তার দুধ খাওয়া বা বিনা এজাযতে গরুর দ্বারা (হালচাষ করা) আমানতদারের পক্ষে আদৌ জায়েয নাই। মালিকের এজাযত থাকিলে জায়েয হইবে, বিনা এজাযতে দুধ খাইয়া থাকিলে তার দাম মালিককে ফেরত দিতে হইবে।

১১। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ কাহারও নিকট জেওর, কাপড়, হাড়ি-পাতিল বা বাসন-বরতন আমানত রাখে, তবে মালিকের বিনা অনুমতিতে আমানতদারের পক্ষে তাহা ব্যবহার করা জায়েয হইবে না। যদি এরূপ বিনা এজাযতে ব্যবহার করা অবস্থায় ঐ জিনিস চুরি হয় বা নষ্ট হয়, তবে তার জন্য ক্ষতিপূরণ বা ভর্তুক দিতে হইবে। অবশ্য যদি (মাসআলা) জানার পরে, হুশ আসার পরে তওবা করিয়া যেমন ছিল তেমন আলগ করিয়া হেফাযত করিয়া রাখিয়া দেয় এবং তারপরে চুরি হইয়া যায়, তবে ভর্তুক দিতে হইবে না।

১২। **মাসআলা ঃ** সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া পরের আমানতের কাপড় এইজন্য রাখিয়া দেওয়া হইল যে, সন্ধ্যার সময় ঐ কাপড় পরিয়া বেড়াইতে যাওয়া হইবে। পরে সন্ধ্যার আগেই ঐ কাপড় চুরি হইয়া গেল। এরূপ অবস্থায় আমানতদারকে ভর্তুক দিতে হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ আমানতের গরু কিংবা বকরী রোগাক্রান্ত হইলে আপনি তাহার চিকিৎসার্থে ঔষধ ব্যবহার করাইয়াছেন। সেই ঔষধে ঐ জীব মরিয়া গেল, তবে ভর্তুক দিতে হইবে । আর যদি ঔষধ ব্যবহার না করান, আর ঐ জীব মরিয়া যায়, তবে আপনার ভর্তুক দিতে হইবে না।

১৪। মাসআলা ঃ কেহ আমানতস্বরূপ আপনাকে টাকা দিল, আপনি ব্যাগে কিম্বা পকেটে রাখিয়া দিলেন, কিন্তু রাখিবার সময় সেই টাকা ব্যাগে কিম্বা পকেটে পড়ে নাই; বরং নীচে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আপনি মনে করিয়াছেন যে, ব্যাগে রাখিয়াছি, তবে ভর্তুক দিতে হইবে না।

১৫। মাসআলা ঃ আমানতের মাল যখনই আমানতকারী (মালিক) চাহিবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে। বিনা ওযরে না দেওয়া বা দেরী করা জায়েয নাই। একজন আপনার নিকট কিছু মাল আমানত রাখিয়াছিল। সে আসিয়া চাহিলে আপনি বলিলেন, 'ভাই, এখন অবসর নাই। আগামীকাল আপনি নিবেন।' ইহাতে যদি সে 'বহুত আচ্ছা' বলিয়া রাযী হইয়া যায়, তবে ত ভাল, নতুবা যদি সে নারায হইয়া রাগ করিয়া চলিয়া যায়, তবে ঐ মাল আর আমানত রহিল না, খিয়ানত হইয়া গেল। এখন যদি ঐ মাল চুরি হইয়া যায় বা নষ্ট হইয়া যায়, তবে আপনার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ একজনে আপনার নিকট কোন মাল আমানত রাখিয়াছিল। কিন্তু নেওয়ার সময় আমানতকারী নিজে না আসিয়া, নেওয়ার জন্য অন্য লোক পাঠাইয়াছে। এখন এই অন্য লোকের কাছে দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছা। আপনি তাহাকে না দিয়া ইহাও বলিয়া দিতে পারেন যে, মালিক নিজে না আসিলে আমি অন্য কাহারও কাছে দিব না। কেননা, আপনি যদি বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট দিয়া দেন, আর যদি মালিক অস্বীকার করে যে, সে তাহাকে পাঠায় নাই; তবে মালিক আপনার কাছ থেকে মাল আদায় করিয়া নিতে পারিবে। অবশ্য আপনি যাহাকে মাল দিয়াছেন, তাহাকে পাইলে তাহার নিকট হইতে মাল ফেরত নিতে পারিবেন। আর যদি কেহ আপনাকে ফাঁকি দিয়া থাকে, তবে সে ফাঁকিতে আপনি পড়িলেন; মালিকের মালের ক্ষতিপূরণ আপনাকে অবশ্যই দিতে হইবে।

আরিয়াত নেওয়ার বিবরণ

(একজনের একটা জিনিস থাকে। তার নিকট থেকে সে জিনিস নিয়া পাড়াপ্রতিবেশীও অনেক সময় কাজ চালায় এবং কাজ সারিয়া জিনিস আবার ফেরত দেয়। এইরূপ চাহিয়া নেওয়াকে 'আ'রিয়াত' বলে। আ'রিয়াত দেওয়াতে বড় সওয়াব পাওয়া যায়। আ'রিয়াতের মালের হেফাযত খুব বেশী করিয়া করিতে হয় এবং আ'রিয়াতদাতার এহ্সানও স্বীকার করিতে হয়। এই মালের যথাযথ হেফাযত না করিলে আমানতে খিয়ানতের গোনাহ্ হইবে। বাড়ীর দৈনন্দিন ব্যবহারের সাধারণ জিনিস 'আ'রিয়াত না দেওয়া অত্যন্ত দূষণীয় এবং বড় বখিলীর পরিচায়ক। কোরআন শরীফে এরূপ লোকের বড় নিন্দা করা হইয়াছে। আ'রিয়াত না দিলে বা আ'রিয়াতের মালের হেফাযত না করিলে সমাজে হামদরদী বা সহানুভূতি থাকে না এবং সে সমাজ আল্লাহ্র রহ্মত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। —অনুবাদক)

১। মাসআলা ঃ কেহ হয়ত আপনার কাছ থেকে একটা ছাতি বা একটা বদনা বা একখানা খন্তা বা একটা মই কয়েক দিনের জন্য আ'রিয়াত চাহিয়া নিল যে, কাজ সারিয়া আপনার জিনিস আপনাকে ফেরত দিয়া যাইবে। এইরূপে নেওয়ার পর সেই জিনিসের পূর্ণ হেফাযত করা তাহার

জিম্মায় ওয়াজিব হইয়া যাইবে, ঐ জিনিস তাহার নিকট এখন আমানত হইয়াছে। যদি পূর্ণ হেফাযত না করে, তবে আমানত খিয়ানতের গোনাহ্ হইবে। অবশ্য পূর্ণ হেফাযত সত্ত্বেও যদি জিনিসটি খোয়া যায়, তবে আইনত ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগিবে না। যদি ক্ষতি হইলে ভর্তুক দিবে বলিয়া নেয়, তবুও ক্ষতিপূরণ দেওয়া জায়েয নাই। আর হেফাযতে ত্রুটি করিলে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** আ'রিয়াতের জিনিস মালিক যে কাজে যে ভাবে এস্তেমাল ও ব্যবহার করার অনুমতি দিয়াছে সেই কাজে সেইভাবে এস্তেমাল করা জায়েয হইবে, তাহার কিছুমাত্র খেলাফ করাও জায়েয হইবে না। খেলাফ করিলে যদি জিনিসটা নষ্ট হয়, তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। যেমন, কেহ হয়ত একটা চাদর নিয়াছে গায় দিবার জন্য ; কিন্তু সে ফরাসের কাজ করিল, ইহা জায়েয নহে। কিংবা ফরাসের কাজে ৩ দিন ব্যবহার করার জন্য নিয়াছে ; এখন যদি ঐ চাদর অন্য কাজে ৫ দিন ব্যবহার করে—তবে তাহা জায়েয হইবে না। এইরূপ খেলাফ করার ফলে যদি চাদর ছিঁড়িয়া যায়, তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। অথবা কেহ হয়ত একখানা কুরছি (চেয়ার) আ'রিয়াত নিয়াছে। কুরছি সাধারণতঃ একজন বসার জন্য হয়। কিন্তু তাহাতে দুইজন বসিয়াছে এবং তার ফলে কুরছি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ; আর যদি এই নিয়তে 'আ'রিয়াত' লয় যে, ইহা আর ফিরাইয়া দিবে না, তবে যদি ক্ষতি হইয়া যায়, তখন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** এক বা দুই দিনের জন্য কোন জিনিস চাহিয়া আনিল ; এখন এক বা দুই দিন পরেই তাহা ফেরত দিতে হইবে। ওয়াদাকৃত সময়ে না দিলে যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** আ'রিয়াতের জিনিস সম্বন্ধে মালিক যদি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিয়া থাকে যে, চাই আপনি নিজে ব্যবহার করেন বা অন্যকে ব্যবহার করিতে দেন আমার এজাযত আছে, তবে ত যে আ'রিয়াত আনিয়াছে সে নিজেও ব্যবহার করিতে পারিবে অথবা অন্য কোন আত্মীয় বা বন্ধুকেও দিতে পারিবে। আর যদি এমন হয় যে, মালিক এরূপ পরিষ্কার ভাষায় এজাযতের কথা বলে নাই, কিন্তু তার সাথে তার এমন বন্ধুত্ব আছে যে, তার একীনী বিশ্বাস আছে যে, মালিক নিশ্চয়ই এজাযত দিবে, তবে এই ছুরতেও ঐ হুকুম যে, নিজেও ব্যবহার করিতে পারিবে এবং অন্যকেও দিতে পারিবে। আর মালিক যদি পরিষ্কার ভাষায় নিষেধ করিয়া দেয় যে, শুধু আপনাকে ব্যবহার করার অনুমতি দিতেছি, অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবেন না, তবে অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেওয়া কিছুতেই দুরুস্ত হইবে না। যে আ'রিয়াত আনিয়াছে, সে যদি এই বলিয়া আনিয়া থাকে যে, সে নিজে ব্যবহার করিবে এবং মালিক পরিষ্কার ভাষায় অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার কথা নিষেধ করে নাই, তবে জিনিসটি কোন্ ধরনের তাহা দেখিতে হইবে। যদি এমন ধরনের জিনিস হয় যে, সকলের ব্যবহার সমান হয়, ব্যবহারে কোন বেশকম হয় না ; তবে যে আ'রিয়াত আনিয়াছে, সে নিজেও ব্যবহার করিতে পারিবে এবং অন্যকেও ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে। আর যদি জিনিসটি এমন ধরনের হয় যে, সকলের ব্যবহার সমান হয় না, বরং কেহ ভালভাবে ব্যবহার করে আর কেহ খারাপভাবে ব্যবহার করে, তবে এইরূপ জিনিস যে আ'রিয়াত আনিয়াছে শুধু সে-ই ব্যবহার করিতে পারিবে, অন্যকে ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে না। এইরূপ যদি এই বলিয়া আ'রিয়াত আনা হয় যে, সে এই জিনিস তাহার অমুক আত্মীয় বা বন্ধুকে ব্যবহার

করিতে দিবে, কিন্তু মালিক কিছু না বলিয়াই জিনিসটি দিয়া দিয়াছে, তবে উপরের মাসআলার মত হইবে। অর্থাৎ যদি দেখা যায়, ঐ জিনিসটির ব্যবহার লোকের নিকট বিভিন্ন প্রকার, তবে যাহার নাম করিয়া আ'রিয়াত আনা হইয়াছে, শুধু সে-ই ব্যবহার করিতে পারিবে, এমনকি যে ব্যক্তি আ'রিয়াত আনিয়াছে, সেও ব্যবহার করিতে পারিবে না। আর যদি কহারও নাম না করিয়া, 'আ'রিয়াত আনা হইয়া থাকে আর জিনিসটি যদি এমন হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে, তবে যে-ব্যক্তি প্রথমে ব্যবহার শুরু করিয়াছে শুধু সে-ই ব্যবহার করিতে পারিবে, অন্য আর কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না। আর জিনিসটি যদি এমন হয় যে, উহার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হয় না, তবে নিজেও ব্যবহার করিতে পারিবে এবং অন্য একজনকেও ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে।

৫। **মাসআলা ঃ** যে জিনিসের মালিক কোন না-বালেগ বাচ্চা, সে জিনিস কেহ আ'রিয়াত দিতেও পারিবে না, কেহ আ'রিয়াত নিতেও পারিবে না (না-বালেগ বাচ্চা এতীম হইলে ত কেহই পারিবে না)। এমনকি, এই বচ্চার মা-বাপ জীবিত থাকিলে তাহারাও দিতে পারিবে না। না-বালেগ বাচ্চা নিজে দিতে চাহিলেও কাহারও পক্ষে তাহা আ'রিয়াত নেওয়া জায়েয হইবে না। (না-জায়েয হওয়া সত্ত্বেও) যদি কেহ তাহার নিকট হইতে আ'রিয়াত নেয়, আর জিনিসটি নষ্ট হয় বা খোয়া যায়, তবে তার ভর্তুক দিতে হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** কেহ কাহারও নিকট হইতে কোন জিনিস আ'রিয়াত আনিল কিন্তু ফেরত দেওয়ার আগেই মালের মালিক মরিয়া গেল। তাহা হইলে মরিয়া যাওয়ার খবর পাওয়ামাত্রই ঐ জিনিস আর ব্যবহার করা দুরুস্ত হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিয়া আসিতে হইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি আ'রিয়াত আনিয়াছে, সে যদি (মাল ফেরত দেওয়ার আগে) মরিয়া যায়, তবে তার ওয়ারিশরা ঐ জিনিস আর ব্যবহার করিতে পারিবে না। (সঙ্গে সঙ্গে মালিকের কাছে ফেরত পৌঁছাইতে হইবে।)

হেবা করার বর্ণনা

১। **মাসআলা ঃ** (কাহাকেও কোন জিনিস বিনা মূল্যে দান করার নাম হেবা করা।) আপনি কাহাকেও একটি জিনিস দান করিতে চাহেন। এ জন্য মুখে বলিলেন যে, আমি আপনাকে এই জিনিসটি দান করিলাম, সেও মুখে বলিল, আমি গ্রহণ করিলাম, ইহাতে হেবা পূর্ণ হইবে না। যাহাকে দান করা হইতেছে যাবৎ তাহার কব্যা এই জিনিসের উপর না হইবে তাবৎ দান এবং গ্রহণ কিছুই পূর্ণ হইবে না। (দানের জন্য) আপনি আপনার একটি জিনিস একজনের হাতে দিলেন, সেও তাহা গ্রহণ করিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না, এখন সেই জিনিসের মালিক সে হইয়া যাইবে। শরীঅতের ভাষায় ইহা 'হেবা' বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ইহার কয়েকটি শর্ত আছে। একটি হইল তাহাকে দখলে দিয়া দিতে হইবে এবং সেও দখলে নিয়া নিবে। দাতার দান করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতা (অর্থাৎ, যাহাকে দান করা হইতেছে সে) কব্যা করিয়া না নিলে হেবা হয় না। শুধু ঐ ভাবে কব্যা না করার জন্যই দাতা-গ্রহীতার কথা-বার্তা কোনই কাজে আসিবে না; পরে গ্রহীতা ঐ মাল কব্যা করিতে চাহিলে দাতার বিনা অনুমতিতে কব্যা করিতে পারিবে না।

২। **মাসআলা:** দাতা গ্রহীতার সামনে এমনভাবে জিনিসটি রাখিয়া দিল যে, গ্রহীতা ইচ্ছা করিলে হাতে তুলিয়া নিতে পারে এবং বলিল যে, আপনি এই জিনিসটি গ্রহণ করুন; এই অবস্থায় বুঝা যাইবে এবং ধরিয়া লওয়া হইবে যে, গ্রহীতা কব্‌যা করিয়া নিয়াছে।

৩। **মাসআলা:** বন্ধ করা সিন্দুকের ভিতরকার কাপড় কাহাকেও দান করা হইল; সিন্দুক সামনেই আছে, কিন্তু খুলিয়া দেওয়া হইল না বা চাবিও দেওয়া হইল না এইরূপ হইলে কব্‌যা হইল না এবং গ্রহীতা কাপড়ের মালিকও হইল না। চাবি দেওয়া হইলে গ্রহীতা মালিক হইবে।

৪। **মাসআলা:** আপনি কাহাকেও একটি বোতল দান করিলেন; কিন্তু বোতলে আপনার তেল রাখা আছে; তবে তেল আপনি রাখিয়া বোতল না দেওয়া পর্যন্ত আপনার দান করা কার্য পূর্ণ হইবে না, গ্রহীতারও স্বত্বাধিকার প্রমাণিত হইবে না। কিন্তু যদি বোতলে করিয়া তেল দান করেন আর বোতল না দান করেন, তবে দান কার্য পূর্ণ হইয়া যাইবে। গ্রহীতা তেল রাখিয়া বোতল আপনাকে ফেরত দিবে। ঠিক এইরূপে আপনি একটি বাড়ী দান করিলেন, কিন্তু ঐ বাড়ীতে আপনার আসবাবপত্র রাখা আছে, যাবৎ আপনি বাড়ী খালি করিয়া না দিবেন তাবৎ দানকার্য পূর্ণ হইবে না গ্রহীতারও স্বত্বাধিকার প্রমাণিত হইবে না; যখন খালি করিয়া দখল দিয়া হস্তগত করাইয়া দিবেন তখন গ্রহীতার স্বত্ব প্রমাণিত হইবে।

৫। **মাসআলা:** কোন জিনিসের অর্ধেক বা কিছু অংশ কাহাকেও দান করিলে দেখিতে হইবে যে, ঐ জিনিস ভাগ করিতে পারা যায় কি না। অর্থাৎ ভাগ হওয়ার পরেও জিনিসটা (আগের মত) কাজের থাকে কি না। যদি ভাগ হওয়ার পরে কাজের থাকে, তবে ভাগ করিয়া দান করিলে দান কার্য পূর্ণ হইয়া যাইবে, নতুবা হইবে না। আর যদি জিনিসটি এমন হয় যে, ভাগ করার পর কাজের থাকে না, তবে (দান করার পরে) ঐ জিনিসটি শরীকী অংশ হিসাবে দুইজনের হইবে। যদি আপনি কাহাকেও বলেন, এই বর্তনের অর্ধেক ঘি আপনাকে দিলাম। সে বলিল, আমি নিলাম। এই দান ছহীহ্ হইবে না, যদিও বর্তন দখল করিয়া লয়। কিন্তু ঐ ঘি-এর মালিক আপনিই থাকিবেন। অবশ্য যদি অর্ধেক ঘি পৃথক করিয়া তাহাকে দিয়া দেন, তবে সে উহার মালিক হইবে।

৬। **মাসআলা:** এক থান কাপড়, এক খণ্ড জমি বা একটি বাগিচা দুই জনে শরীকী অংশ হিসাবে ক্রয় করিয়া একজনের অংশ ভাগ করিয়া না আনিয়া কাহাকেও দান করিলে সে দান কার্য সম্পূর্ণ হইবে না। বণ্টন করিয়া নেওয়ার পর দানকার্য করা উচিত।

(**জ্ঞাতব্য**—জমিনের উপর কব্‌যার নিয়ম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নরূপে দেখা যায়। কোথাও কব্‌যা হয় জমিনের চার আইল দিয়া হাঁটিয়া আসিলে, আবার কোথাও চাষবাস করিলে ইত্যাদি।)

—অনুবাদক

৭। **মাসআলা:** আট আনা কিংবা বার আনা পয়সা দুইজনকে দিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়েই আধাআধি ভাগ করিয়া নেও। ইহা ছহীহ্ নহে বরং ভাগ করিয়া দিতে হইবে। অবশ্য যদি তাহারা ফকীর হয়, তবে ভাগ করার প্রয়োজন নাই। যদি একটি টাকা বা একটি পয়সা দুইজনকে দেওয়া হয়, তবে এই দান ছহীহ্ হইবে।

৮। **মাসআলা:** বকরী বা গাভীর পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় ঐ বাচ্চা দান করা ছহীহ্ নহে। বাচ্চা পয়দা হওয়ার পর উহা কব্‌যা করিলেও মালিক হইবে না। বাচ্চা দান করিতে হইলে বাচ্চা পয়দা হওয়ার পর নূতন ভাবে দান করিবে।

৯। মাসআলা ঃ বকরী বা গাভীর পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় ঐ বকরী বা গাভী যদি কেহ দান করিয়া দেয় আর বলে যে, উহার পেটে যে বাচ্চা আছে, ঐ বাচ্চা দান করিলাম না—ইহা আমারই থাকিবে, তবে এইরূপ দুরুস্ত হইবে না। (এবং বলায় কোন কাজও হইবে না), বাচ্চাসহ বকরী বা গাভী গ্রহীতার হইয়া যাইবে।

১০। মাসআলা ঃ আপনার কোন জিনিস কাহারও নিকট আমানত রাখা আছে বা পাওনা আছে। এখন ঐ জিনিসই তাহাকে দান করিতে হইলে শুধু মুখে বলিয়া দিলে দান কার্য পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ঐ জিনিস তাহার হইয়া যাইবে। তাহাকে নূতন করিয়া কব্যা করাইতে হইবে না।

১১। মাসআলা ঃ না-বালেগ ছেলেমেয়ে যদি তাহাদের জিনিস কাহাকেও দান করে, তবে এইরূপ দান করাও দুরুস্ত হইবে না আর নেওয়া ত দুরুস্ত হইবেই না।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—শরীঅতের মাসআলা এই যে, ছেলেমেয়েদেরকে যেরূপ দ্বীন-ঈমান এবং ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেওয়া ফরয, আল্লাহ্ রাসূল সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া ফরয, তদ্রূপ দান-ছাখাওতির শিক্ষা দেওয়াও ফরয। সেই দান-ছাখাওতি এইভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, নিজেদের জিনিস তাহাদের হাতে দিয়া দেওয়াইতে হইবে, যাহাতে তাহাদের দান করার এবং খেদমত করার অভ্যাস হয়। দান-ছাখাওতির অভ্যাস করা ও অভ্যাস করান অত্যন্ত জরুরী।

(বিনামূল্যে) দান কয়েক প্রকারের হয়—

১। গরীবকে ছওয়াবের নিয়তে দান করা। ইহাকে ছদ্‌কা বলে। ছদ্‌কা আবার দুই প্রকার, যথা—(১) ওয়াজিব ছদ্‌কা ও (২) নফল ছদ্‌কা।

২। স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ বড়র পক্ষ হইতে ছোটকে দান করা। যেমন, স্বামী স্ত্রীকে দান করে, বাপ বেটাকে দান করে। এই প্রকার দানকে সাধারণতঃ হেবা বলে।

৩। ভক্তি ও মহব্বত সহকারে ছোটর পক্ষ হইতে বড়কে দান করা বা ভালবাসার নিদর্শন-স্বরূপ এক দোস্তের পক্ষ হইতে অন্য দোস্তকে দান করা।—যেমন, বেটা মা-বাপকে, শাগরেদ-মুরিদ ওস্তাদ বা পীরকে দান করে। এই প্রকার দানকে সাধারণতঃ হাদিয়া বা তোহ্‌ফা বলে।

প্রকাশ থাকে যে, হেবার জন্য যে সকল মাসআলা বলা হইয়াছে তাহা এই তিন প্রকার দানের জন্যও প্রয়োজন হইবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) দান-ছাখাওতি করার জন্য অনেক তাকীদ করিয়া গিয়াছেন; গরীবদিগকে ছদ্‌কা দেওয়ার জন্যও খুব তাকীদ করিয়াছেন। মা-বাপ ওস্তাদ পীরকে এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব একে অন্যকে হাদিয়া-তোহ্‌ফা দেওয়া-নেওয়ার প্রথা জারি রাখার জন্যও তাকীদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ تَهَادَوْا وَتَحَابُّوْا

"তোমরা একে অন্যকে হাদিয়া তোহ্‌ফা দান কর এবং এইভাবে পরস্পরের মধ্যে মহব্বত ও ভালবাসা বাড়াও।" —অনুবাদক)

হাদিয়ার মাসআলা (বর্ধিত)

হাদিয়া ও ঘুষ-রেশওয়াতের মধ্যে পার্থক্য

১। মাসআলা ঃ হাদিয়া এবং রেশওয়াত দেখিতে প্রায় এক রকম দেখায় এবং সাধারণতঃ যারা ঘুষ দেয়, তাহারা উহাকে তোহ্‌ফা, নাজরানা, ডালি বা ভালবাসার নিদর্শন বলিয়া প্রকাশ

করিতে চায়। তাহারা এরূপ বলে, পান খাইতে দিলাম, ছেলেকে, মাকে মিঠাই বা নাশ্‌তা খাইবার জন্য দিলাম ইত্যাদি। ইহা দ্বারা হাদিয়া এবং রেশওয়াতের পার্থক্য সাধারণতঃ লোকের বুঝে আসে না। কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে আসমান-জমিনের পার্থাক্য আছে। প্রথম বড় পার্থক্য এই যে, হাদিয়া দেওয়ার নিয়তের মধ্যে এক আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের মহব্বত ছাড়া দুনিয়ার কোন গরয, স্বার্থ বা কোনরূপ কোন সাহায্য পাওয়ার আশা থাকে না। পক্ষান্তরে রেশওয়াত দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে কিছু গরয বা স্বার্থ হাছিল করা এবং কিছু সাহায্য পাওয়া। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, হুকুমত পাবলিকের কাছ থেকে ট্যাক্স বসাইয়া টাকা আদায় করিয়া পাবলিকেরই খেদমত করার জন্য বেতন দিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করে। এইসব বেতনভোগী কর্মচারীদের উপর ওয়াজিব এই যে, পাবলিকের যে কাজের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই কাজ করিয়া দিতে হইবে। পাবলিকের নিকট হইতে সে উপরি কিছু গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে কষ্ট দিতে পারিবে না, তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ খোশামোদ তোষামোদের আশা করিতে পারিবে না। সবাইকেই সমান চোখে দেখিয়া নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষভাবে তাহাদের কাজ করিয়া দিতে হইবে। এই বেতনভোগী কর্মচারীরা যদি তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় পাবলিকের নিকট হইতে পার্টি লয়, পাবলিকের বাড়ীতে দাওয়াত খায়, পাবলিকের নিকট হইতে কোন হাদিয়া তোহ্‌ফা গ্রহণ করে বা তাহাদের ছেলে-মেয়ে বা স্ত্রী মিঠাই খাবার বা নাশ্‌তা খাবার গ্রহণ করে, তবে তাহা সব ঘুষ বা রেশওয়াত হইবে, হারাম হইবে, আমানতে খেয়ানত হইবে, গোনাহ্‌ কবীরা হইবে।

পক্ষান্তরে মা-বাপ, ওস্তাদ-পীর—যাহাদের এহ্‌সান শুমার করা যায় না, যাহারা আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা দেন, যাহারা ওয়ায নছীহত করিয়া আখেরাতের নাজাতের পথ বাতাইয়া থাকেন, যাহারা মসজিদে ইমামতী করিয়া নামায পড়াইয়া আখেরাতের বড় পুঁজি সংগ্রহের কাজে সাহায্য করিয়া থাকেন, যাহারা ফতুয়া দিয়া ও মাসআলা বাতাইয়া ধর্মমতে সমস্যার সমাধান করিয়া দেন, যাহারা ইসলামী শিক্ষা দান করিয়া কোরআন হাদীস পড়াইয়া, কোরআন হাদীসের সত্যকে প্রচার করিয়া ইসলাম ধর্মকে চিরজীবন্ত করিয়া রাখিতেছেন—হুকুমতের পক্ষ হইতে যখন ইহাদের কাহারো জন্য কোন বেতন নাই, তখন তাহাদিগকে দান করিয়া কোন কাজ উদ্ধার করিয়া নেওয়ার আশা নাই; কাজেই তাহাদিগকে হাদিয়া তোহ্‌ফা দান করা রেশওয়াত নহে; বরং অতি বড় পুণ্যের কাজ এবং অতি বেশী ছওয়াবের কাজ। কেননা, তাহাদিগকে যাহাকিছু দান করা হয়, তাহা শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র মহব্বতে দান করা হয়। অন্য কোন উদ্দেশ্যে দান করা হয় না।

২। **মাসআলা** ঃ শাসনকর্তা, বিচারকর্তা, পুলিশ, তহ্‌শীলদার, আমীন, সেরেশ্‌তাদার পেশকার, কেরানী—এরা সবাই হুকুমতের পক্ষ হইতে পাবলিকের কাজ করিয়া দেওয়ার জন্য বেতনভোগী কর্মচারী। কাজেই ইহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং এমন বন্ধু যাহাদের সঙ্গে চাকুরীর আগে হইতেই দেওয়া-নেওয়ার ও খাওয়া-খাওয়াইবার প্রথা ছিল তাহা ছাড়া অন্য কাহারও দাওয়াত গ্রহণ করা, হাদিয়া তোহ্‌ফা গ্রহণ করা, করয লওয়া আ'রিয়াত লওয়া এবং এছাড়া অফিসের চাকরের দ্বারা বা অফিসের জিনিসের দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজ লওয়া সবই রেশওয়াতের মধ্যে শামিল এবং সম্পূর্ণরূপে হারাম। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও পুরাতন বন্ধুও বাদী বা বিবাদী হয়, তবে তাহাদের থেকেও কিছু গ্রহণ করা হারাম। এইরূপে গ্রাম্য যেসব পঞ্চায়েতের হাতে কোন সালিসী বিচার ইত্যাদি থাকে, তাহাদের জন্যও বাদী বা বিবাদী পক্ষের নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা বা দাওয়াত ইত্যাদি খাওয়া সবই ঘুষ এবং রেশওয়াত হইবে।

৩। মাসআলা ঃ মুফতী ছাহেব—যিনি ফতওয়া দেন, তিনি—যদি টাকা পাইয়া বা দাওয়াত লইয়া পক্ষপাতিত্ব করেন, তবে তাঁহার পক্ষেও কিছু গ্রহণ করা রেশওয়াতের অন্তর্গত এবং হারাম। আর যদি মাসআলা বাতানের পারিশ্রমিকস্বরূপ গ্রহণ করেন, তবে তাহাও তাহার পক্ষে হালাল নহে। অবশ্য তিনি যদি হক্ ফতওয়া দেন এবং লোকে এলমের মহব্বতে আল্লাহ্ রাসূলের মহব্বতে তাঁহাকে নায়েবে রাসূল ও দ্বীনের খাদেম মনে করিয়া হাদিয়া তোহ্ফা দেয়, তবে তাহা অতি বড় নেকের কাজ হইবে এবং তাহা গ্রহণ করা আওলা ও আফযাল হইবে।

অবশ্য ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, শরীঅতের মাসআলা মৌখিক বাতানের উজরত হালাল নহে; কিন্তু উহা কাগজে কলমে লিখিয়া দিয়া তাহার উজরত নেওয়া হালাল।

৪। মাসআলা ঃ রমযান মাসে হাফেয ছাহেব তারাবীহ্র খতম পড়েন। যদি তিনি চুক্তি করিয়া খতমের উজরত লন, তবে তাহা তাহার পক্ষে হালাল নহে। কিন্তু জনসাধারণ যদি কোরআনের মহব্বতে আল্লাহ্ রাসূলের মহব্বতে হাফেযে কোরআনের সম্মানার্থে হাদিয়া তোহ্ফা স্বরূপ টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় বা দুধ-ঘি দান করে, তবে তাহারা আল্লাহ্র খাছ রহ্মতের পাত্র হইবে এবং আল্লাহ্র কাছে অনেক বেশী নেকী পাইবে। আর হাফেয ছাহেব যদি দেলে কোন লোভ না আনিয়া দেলকে পবিত্র রাখিয়া দেলের মধ্যে শুধু আল্লাহ্র এবং কোরআনের প্রতি ভক্তি ও মহব্বত রাখিয়া উহা গ্রহণ করেন, তবে তাহার জন্য তাহা হালাল হইবে; কিন্তু দেলের মধ্যে লোভ রাখিলে সে মালে বরকত ও রহ্মত থাকিবে না।

৫। মাসাআলা ঃ পীর মামলা জিতাইয়া দিবে, পীর রোগ ভাল করিয়া দিবে, পীর বিপদ দূর করিয়া দিবে, পীর দোকানে, ক্ষেতে বা চাকুরীতে বরকত দিয়া দিবে—এইরূপ আকীদা রাখা শেরেকী গোনাহ্ এবং এইরূপ আকীদা রাখিয়া যদি কেহ হাদিয়া বা নযরানা দেয়, তবে তাহা (দেওয়া অন্যায় এবং) গ্রহণ করাও গোনাহ্।

(মোকদ্দমায় জিতাইয়া দেওয়া, রোগ ভাল করিয়া দেওয়া, বিপদ দূর করিয়া দেওয়া, দোকানে , ক্ষেতে বা চাকুরীতে বরকত দেওয়া—এগুলি পীরের কাজ নয়, এগুলি আল্লাহ্র হাতের কাজ। মানুষকে আল্লাহ্ নিয়মিতভাবে চেষ্টা করিবার হুকুম দিয়াছেন। নিয়মানুসারে চেষ্টা হইলে চেষ্টার ফল দেওয়া আল্লাহ্র কাজ, চেষ্টার সঙ্গে দো'আও যদি যোগ হয়, বিশেষ করিয়া যদি নেক লোকদের দো'আ যোগ হয়, তবে চেষ্টা আরো বেশী ফলবতী হয়। পীর ছাহেব দো'আ করিতে পারেন বটে, কিন্তু দো'আর জন্য কোন টাকা লাগে না; আর পীরের আসল কাজ ত হইল লোকের নৈতিক চরিত্র ঠিক করিয়া দিয়া লোকদিগকে আল্লাহ্র পেয়ারা করিয়া দেওয়া এবং আল্লাহ্কে চিনাইয়া দিয়া আল্লাহ্কে লোকের কাছে পেয়ারা করিয়া দেওয়া। আল্লাহ্র মহব্বতের কারণে যদি আল্লাহ্র পেয়ারা নেক বান্দাদের সঙ্গে মহব্বত রাখে এবং সেই মহব্বতের কারণে হাদিয়া তোহ্ফা দেয়, তবে তা অতি বড় নেক কাজ। এই নেক কাজ হয় চারি কারণে। যথা—(১) আল্লাহ্র মহব্বতের পরিচয় এবং প্রমাণ পাওয়া যায় দানের দ্বারা। (২) যাহারা আল্লাহ্র মহব্বতের লোক তাহাদের সহিত মহব্বত করার হুকুম আল্লাহ্ তা'আলা করিয়াছেন, সেই মহব্বতের পরিচয় পাওয়া যায় হাদিয়া তোহ্ফার দ্বারা। (৩) আল্লাহ্র দ্বীনকে জারি করার কাজে সহায়তা করা হইবে এই দানের দ্বারা। (৪) এই আশা থাকে যে—

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ ○ لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِىْ صَلَاحًا

"নিজে যখন ভাল হইতে পারি নাই, তখন ভাল লোকদিগকে এই জন্য ভালবাসি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা (হাদিয়া মারফতে) এই ভালবাসার কারণে আমাকেও ভাল বানাইতে পারেন।"

সমাজে ন্যায় বিচার কায়েম করা, সামজের দুষ্টদের দমন করিয়া শিষ্টদের পালন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা, যাহাতে সমাজের মধ্যে শান্তিভঙ্গ না হয়, সেজন্য শান্তি রক্ষার চেষ্টা করা, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বদমাআশী ইত্যাদি না হইতে দেওয়া, রোগীর চিকিৎসা এবং সেবা করা, পথ-ঘাট, পুল ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া দিয়া লোকের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেওয়া, লোকের স্বাস্থ্য যাহাতে নষ্ট না হয় এবং ভাল থাকে সেজন্য চেষ্টা করা—এগুলি সবই বড় বড় নেক কাজ, যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয় এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেরা মানুষের সেবার নিয়তে করা হয়; প্রকৃত প্রস্তাবে এইসব কাজ এত বড় নেকের কাজ যে, এর কোন উজরত বা বেতন হইতে পারে না। কিন্তু যাহারা এই সমস্ত বিভাগে কাজ করেন, তাঁহারা যেহেতু জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং নিজেদের সমস্ত সময়টুকু উৎসর্গ করিয়া রাখেন, সেইজন্য জনগণের যে টাকা সরকারের নিকট থাকে, সেই টাকা হইতে তাহাদিগকে ভাতা বা বেতন স্বরূপ কিছু দেওয়া হয়। আর যেহেতু বেতন দেওয়া হয়, সেইজন্য জনগণের নিকট হইতে হাদিয়া তোহ্‌ফা গ্রহণ করা তাহাদের জন্য নাজায়েয হইয়া যায়। কিন্তু এইসব নেক কাজের চেয়ে আরো অনেক বড় নেকের কাজ হইতেছে আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলামের শিক্ষাকে চালু রাখা। আল্লাহ্‌র রাসূলের কোরআন হাদীস শিক্ষাকে জারি রাখা। হুকুমতের উচিত এই যে, যাহারা এই কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে ভাতা দেওয়া। কিন্তু যেহেতু হুকুমত তাহার কিছুই করিতেছে না, কাজেই জনগণের উপর ফরয হইতেছে তাহাদিগকে হাদিয়া তোহ্‌ফা স্বরূপ দান করিয়া হউক বা সমিতি কমিটি করিয়া মাসিক ভাতা নির্ধারিত করিয়া হউক তাঁহাদের খেদমত করা এবং এই উছিলায় আল্লাহ্‌র কোরআন ও রাসূলের হাদীস শিক্ষাকে জারি রাখা। —অনুবাদক)

বাচ্চাকে দান করার মাসআলা

১। **মাসআলঃ** ছেলে জন্মিলে ছেলেকে দেখিয়া বা ছেলের খত্‌নার সময় আত্মীয়-স্বজনগণ বা শাগরেদ মুরীদগণ ছেলেকে যে টাকা দেয়, সে টাকা সাধারণতঃ ছেলেকে দেওয়া মকছুদ হয় না—ছেলের মা-বাপকেই সন্তুষ্ট করা মকছুদ হয়। সুতরাং এইসব টাকার মালিক ছেলে নহে, বরং মা-বাপ মালিক হইবে। অবশ্য যদি কেহ খাছ করিয়া বাচ্চাকেই দেওয়া মকছুদ বলিয়া উল্লেখ করিয়া দেয় বা বাচ্চার ব্যবহারের জিনিস দেয়, তবে বাচ্চাই তার মালিক হইবে। বাচ্চার যদি দেওয়া নেওয়ার বুঝ-বুদ্ধি হইয়া থাকে, তবে বাচ্চার হাতে দিলেই বাচ্চার কব্‌যা হইয়া যাইবে এবং বাচ্চা মালিক হইয়া যাইবে। আর বাচ্চা যদি অবুঝ হয়, তবে বাচ্চার পক্ষ হইতে বাপ কবযা করিলে বা বাপের অবর্তমানে দাদা কব্‌যা করিলে বা বাপের পক্ষে অছি বা দাদার পক্ষের অছি কব্‌যা করিলে অথবা ইহারা না থাকিলে বাচ্চা যার তত্ত্বাবধানে আছে (চাই সে মা হউক, ভাই হউক, চাচা হউক, বা মামা হউক, বা অন্য কেহ হউক,) সে কব্‌যা করিয়া লইলে বাচ্চা মালিক হইয়া যাইবে। বাপ দাদা বর্তমান থাকিতে মা, নানা, দাদী ইত্যাদি কব্‌যা করিলে ছহীহ্‌ হইবে না।

২। **মাসআলাঃ** বাপ-দাদা বা বাচ্চা যাহার তত্ত্বাবধানে আছে, সে নিজেই যদি বাচ্চাকে কিছু দিতে চায়, তবে যদি শুধু এতটুকু বলে যে, 'আমি বাচ্চাকে এই মালটা দিলাম' তাহা হইলে বাচ্চা সেই মালের মালিক হইয়া যাইবে। কব্‌যা করার প্রয়োজন নাই।

৩। **মাসআলা ঃ** বাপ মা (যদি কোন মেয়েকে বা কোন ছেলেকে বেশী ভালবাসে তাহাতে গোনাহ্ নাই, কিন্তু) কোন জিনিস দিতে হইলে সব ছেলেমেয়েকেই সমান দিতে হইবে; বিনা কারণে বেশ-কম করা মাকরূহ্। উপযুক্ত কারণবশতঃ (যেমন, যদি কোন ছেলে দ্বীনের খাদেম, আলেম বা হাফেয হয় বা মা-বাপের বেশী খেদমত করে বা কামাই রোজগারের উপযুক্ত না হয়, তবে এই কারণে) বেশী দিলে কোন গোনাহ্ হইবে না, যদি যাহাকে কম দিয়াছে তাহার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না হয়।

৪। **মাসআলা ঃ** যে জিনিসের মালিক কোন না-বালেগ বাচ্চা, সেই জিনিস শুধু ঐ বাচ্চারই কাজে লাগাইতে হইবে, অন্য কাহারো কাজে সেই জিনিস ব্যবহার করা জায়েয হইবে না। এমন কি, মা-বাপও সে জিনিস নিজেদের কাজে বা এক বাচ্চার জিনিস অন্য বাচ্চার কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** (ফল ফলাদি, মিঠাই বা এই ধরনের) কোন (খাবার) জিনিস যদি কেহ বাচ্চার নাম করিয়া দেয় বা বাচ্চার হাতে দেয়, অথচ নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, আসল মাকছুদ মা-বাপকে দেওয়া কিন্তু সামান্য জিনিস মনে করিয়া বাচ্চার নাম করিয়াছে (তাহা হইলে ঐ জিনিস মা-বাপেও খাইতে পারিবে)। যদি মায়ের পক্ষের আত্মীয়গণ দিয়া থাকেন, তবে মা মালিক হইবে; আর যদি বাপের পক্ষের আত্মীয়গণ বা শাগরেদ মুরীদগণ দিয়া থাকেন, তবে বাপ মলিক হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** মা-বাপ যদি নিজেদের ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য জেওর বা কাপড় বানায়, তবে যাহার নামে সেটা বানাইবে সেটার মালিক সে হইয়া যাইবে; এখন আর অন্য কাহাকেও দেওয়া জায়েয হইবে না। অবশ্য মা বা বাপ যদি স্পষ্টভাবে বলিয়া দেয় যে, জিনিস আমার রহিল, ছেলে বা মেয়েকে শুধু ব্যবহার করার জন্য দিলাম, তবে সে জিনিস অবশ্য বাপ বা মায়ের থাকিবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, অনেকে ছোট ছেলে বা মেয়ের জিনিস নিয়া নিজে ব্যবহার করে বা এক ছেলের জিনিস অন্য ছেলেকে দেয়। এরূপ করা মোটেই দুরুস্ত নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** ছোট ছেলেমেয়ে নিজের জিনিস নিজের হাতে দান করিলে তাহা নেওয়া জায়েয নহে । ইহা মা-বাপেরও অধিকার নাই যে, ছোট ছেলেমেয়ের জিনিস অন্য কাহাকেও দান করিবে বা নিজেরা ব্যবহার করিবে। অবশ্য মা-বাপ যদি এত গরীব হয় যে, তাহাদের আর অন্য উপায় নাই, তবে তাহারা ছোট ছেলেমেয়ের জিনিস ব্যবহার করিতে পারে বটে।

৮। **মাসআলা ঃ** ছোট ছেলেমেয়ের জিনিস কাহাকেও করয দেওয়া জায়েয নাই। খোদ মা-বাপের জন্যও করয নেওয়া ছহীহ্ হইবে না।

দিয়া ফিরাইয়া নেওয়ার বিবরণ

১। **মাসআলা ঃ** একজনকে একটি জিনিস দিয়া আবার ফিরাইয়া নেওয়া ভারী অন্যায়, ভারী লজ্জার কথা এবং বড় গোনাহ্। অবশ্য যদি কেহ ফিরাইয়া নেয় এবং যাহাকে দান করা হইয়াছিল সেও খুশী হইয়া ফিরাইয়া দেয়, তবে সে ঐ জিনিসের মালিক হইয়া যাইবে। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় ফিরাইয়া নেওয়ারই অধিকার থাকে না। যেমন, যদি কেহ একটি বকরী কাহাকেও দিয়া থাকে এবং সে উহাকে খাওয়াইয়া চরাইয়া খুব মোটা তাজা করিয়াছে, এখন আর ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার নাই। যদি কেহ এক টুকরা জমি কাহাকেও দান করে এবং সে সেই জমিনে বাগিচা বানায় বা বাড়ী বানায়, তবে ঐ জমি আর ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকিবে না। যদি

কেহ কাহাকেও কাপড় দান করে এবং সেই কাপড় সেলাই করিয়া জামা বানায় বা সেই কাপড়ে রং দেয়, তবে আর ঐ কাপড় ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকিবে না।

২। মাসআলা ঃ কেহ কাহাকেও একটি বকরী দান করিল। তাহার ঐ বকরীর বাচ্চা হওয়ার পর দাতার খেয়াল চাপিল যে, বকরী সে ফেরত নিবে, তবে সে বকরী ফেরত নিতে পারবে; কিন্তু বাচ্চা নিতে পারিবে না (এবং যাবৎ বাচ্চার দুধ খাওয়া না ছুটিবে, তাবৎ বকরীও নিতে পারিবে না।)

৩। মাসআলা ঃ দান করার পর দাতা বা গ্রহীতার যে কেহ একজন মরিয়া গেলে দান করা মাল আর ফেরত লওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৪। মাসআলা ঃ দানের বদলে প্রতিদান হওয়ার পর দানের মাল ফেরত লওয়ার অধিকার থাকে না। আর যদি প্রতিদান বলিয়া না দেওয়া থাকে, তবে উভয়ে উভয়ের জিনিস ফিরাইয়া লইতে পারিবে।

৫। মাসআলা ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে কোন জিনিস দান করিলে বা স্ত্রী তার স্বামীকে কোন জিনিস দান করিলে সে জিনিস ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে না। এইরূপ ভাগ্নে-ভাগ্নী, ভাতিজা-ভাতিজী, ভাই-ভগ্নি, মামা-খালা, চাচা-ফুফু ইত্যাদি যী-রাহ্‌ম, মাহ্‌রামকে কোন জিনিস দান করিলে তাহা আর ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে না। আর যদি এরূপ হয় যে, আত্মীয়তা আছে কিন্তু বিবাহ হারাম নহে, যেমন চাচাত বোন, ফুফাত বোন ইত্যাদি; কিংবা বিবাহ হারাম কিন্তু বংশের দিক দিয়া আত্মীয়তা নাই, যেমন দুধ-ভাই, বোন, শ্বশুর, শাশুড়ী, দামাদ ইত্যাদি, তবে ইহাদের নিকট হইতে ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে।

৬। মাসআলা ঃ অবশ্য (উপরোক্তরূপ আত্মীয় ছাড়া) অপর কেহ হইলে তাহাকে দান করার পর তাহার নিকট হইতে ফেরত লওয়া গোনাহ্‌ বটে, কিন্তু ফেরত নিতে চাহিলে যদি সে খুশী হইয়া দিয়া দেয়, তবে সে জিনিসের মালিক হইয়া যাইবে; আর খুশী হইয়া না দিলে এবং জবরদস্তী ফেরত নিলে, সে ঐ জিনিসের মালিক হইবে না। কিন্তু কোর্টের বিচারে ফেরত পাইলে সে ঐ জিনিসের মালিক হইবে।

৭। মাসআলা ঃ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আখেরাতের ছওয়াবের নিয়তে কোন গরীবকে বা কোন তালেবে এলমকে কিছু দান করিলে উহা ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে না।

৮। মাসআলা ঃ কোন গরীবকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এক পয়সা দান করিতে গিয়া ভুলে যদি আধুলি তার হাতে চলিয়া যায়, তবে সে আধুলি ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার আর তাহার থাকে না।

কেরায়া এবং মজুরীর বিবরণ

(ঘর-বাড়ী গাড়ীঘোড়া প্রভৃতির উজরতকে সাধারণতঃ কেরায়া বা ভাড়া বলে; আর মানুষের উজরতকে সাধারণতঃ মজুরী বা পারিশ্রমিক বলে; আর একটু উপরের হইলে বেতন বলে। জমিনের উজরতের কারবারকে সাধারণতঃ ইজারা বলে। কিন্তু এইগুলির সবই হইতেছে পয়সার পরিবর্তে কোন জিনিসকে বা কাহাকেও খাটাইয়া নেওয়া। আরবী ভাষায় এই ধরনের সমস্ত কারবারকে “ইজারা” বলে।)

১। **মাসআলাঃ** মাসিক কেরায়া ঠিক করিয়া আপনি একখানা ঘর কেরায়া করিলেন; বাড়ীওয়ালাও আপনাকে চাবি বুঝাইয়া দিল। এখন মাস অন্তর ধার্যকৃত কেরায়া দেওয়া আপনার উপর ওয়াজিব হইয়া গেল—চাই আপনি ঐ বাড়ীতে থাকেন বা না থাকেন, (এইরূপে বার্ষিক কেরায়া নগদ টাকা বা ধান বা পাট বা অন্য কোন জিনিস ঠিক করিয়া আপনি এক খন্ড জমি বার্ষিক কেরায়া নিলেন জমিওয়ালাও আপনাকে জমিতে দখল দিয়া দিল; এখন বৎসর অন্তে ধার্যকৃত কেরায়া দিয়া দেওয়া আপনার উপর ওয়াজিব হইয়া গেল—চাই আপনি চাষ করেন আর না করেন, ফসল হউক বা না হউক।)

২। **মাসআলাঃ** আপনার নিকট দর্জি কাপড় সেলাই করিয়া আনিয়াছে, রংরেজ কাপড়ে রং দিয়া আনিয়াছে বা ধোপা কাপড় ধুইয়া আনিয়াছে—এ অবস্থায় তাহাদের পয়সা আগে দিয়া তারপর আপনার জিনিস নেওয়া উচিত; পয়সা না দিয়া জোর করিয়া মাল আপনি নিতে পারেন না; বরং পয়সা না পাওয়া পর্যন্ত তাহারা আপনার মাল আটকাইয়া রাখিতে পারে। এই অধিকার তাহাদের আইনত আছে। কিন্তু কোন মেহনতী মজদুর দ্বারা একটা বোঝা বহন করাইয়া আনিলে মজুরীর জন্য তাহার মাল আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কেননা, তাহাদের কাজের কারণে মালের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয় না। কিন্তু দরজী এবং রংরেজের কাজে পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়াছে। (তাহাদের গায়ের ঘাম শুকাইবার আগে ধার্যকৃত ন্যায্য মজুরী তাহাদিগকে দিয়া দিতে হইবে।)

৩। **মাসআলাঃ** যদি এইসব কাজে মজুরী ঠিক করিবার সময়ে এইরূপ শর্ত করে যে, তুমিই সেলাই করিবে, তুমিই রং করিবে, তোমার নিজেরই এই কাজ করিতে হইবে, তবে অন্যের দ্বারা উহা করান জায়েয হইবে না, নিজেরই করিতে হইবে। আর যদি তদ্রূপ শর্ত না করে, তবে অন্যের দ্বারাও করাইতে পারিবে।

ফাছেদ ইজারার বর্ণনা

১। **মাসআলাঃ** যদি বাড়ীভাড়া নেওয়ার কালে সময় নির্দিষ্ট না করে যে, কত দিনের জন্য এই কেরায়া নিয়াছে কিম্বা ভাড়া নির্ধারিত না করিয়াই লইয়াছে, কিংবা এই শর্ত করিয়াছে যে, যাহাকিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে, উহাও আমি (ভাড়াটিয়া) ঠিক করিয়া লইব, কিংবা এই ওয়াদায় বাড়ীভাড়া নিয়াছে যে, বাড়ী মেরামত করাইয়া নিবে এবং ইহাই বাড়ী ভাড়াস্বরূপ হইবে। এই ধরনের কেরায়া ফাছেদ। আর যদি এরূপ বলে যে, তুমি এই বাড়ীতে থাক এবং বাড়ী মেরামত করিও ভাড়া লাগিবে না, তবে ইহা আ'রিয়াত হইবে এবং জায়েয হইবে।

২। **মাসআলাঃ** কেহ এই বলিয়া ভাড়া লইল যে, দুই টাকা মাসিক ভাড়া দিব, তবে শুধু এক মাসের জন্যই কেরায়া ছহীহ্ হইল। মাসের শেষে বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াকে উঠাইয়া দিতে পারে। আবার যদি দ্বিতীয় মাসে ভাড়াটিয়া রহিয়া গেল, তবে আবার এক মাসের জন্য কেরায়া ছহীহ্ হইয়া গেল, এমনিভাবে প্রত্যেক মাসে নূতন কেরায়া হইতে থাকিবে। অবশ্য যদি ভাড়া লইবার সময় ইহাও বলে যে, চার মাস কিংবা ছয়মাস থাকিব, তবে যত দিনের কথা বলিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত ভাড়া লওয়া ছহীহ্ হইবে। ঐ সময়ের পূর্বে বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াকে উঠাইতে পারিবে না।

৩। **মাসআলাঃ** কেহ্ পিষাইবার জন্য গম দিয়া বলিল, ইহার মধ্যে হইতে এক পোয়া আন্দাজ মজুরী হিসাবে নিবেন। কিংবা ক্ষেতের ফসল কাটাইয়া বলিল, ইহা হইতে এই পরিমাণ ফসল মজুরী হিসাবে নিবেন, এসমস্ত (কেরায়া) ফাছেদ।

৪। **মাসআলাঃ** ফাছেদ ইজারার হুকুম এই যে, যাহাকিছু নির্ধারিত হইয়াছে তাহা দেওয়া যাইবে না; বরং এতটুকু কাজের জন্য যে পরিমাণ মজুরীর দস্তুর আছে, কিংবা এমন ঘরের ভাড়া যে পরিমাণ দস্তুর আছে, তাহা দেওয়া হইবে। কিন্তু যদি দস্তুর পরিমাণ ভাড়া বা মজুরী বেশী হয় অথচ ঠিক হইয়াছিল কম, তবে দস্তুর পরিমাণ দেওয়া হইবে না; বরং যাহা ঠিক হইয়াছিল তাহাই পাইবে। মোট কথা, যাহা কম হইবে তাহাই পাইবে।

৫। **মাসআলাঃ** গান, বাদ্য, নাচ, বানর নাচান ইত্যাদি বেহুদা কাজের ইজারা ছহীহ্ নহে, একেবারেই বাতেল। এজন্য কিছুই দেওয়া যাইবে না।

৬। **মাসআলাঃ** কোন হাফেযকে মজুর রাখিল যে, এতদিন পর্যন্ত অমুকের কবরে কোরআন পড়িতে থাক এবং ছওয়াব বখশাইতে থাক। ইহা ছহীহ্ নহে, বাতেল। পড়নেওয়ালাও ছওয়াব পাইবে না এবং মৃত ব্যক্তিও পাইবে না এবং সে কোন বেতন পাইবার হকদার হইবে না।

৭। **মাসআলাঃ** পড়ার জন্য কোন কিতাব ভাড়া লইল, ইহাও ছহীহ্ নহে; বরং বাতেল।

৮। **মাসআলাঃ** ছাগী, গাভী, মহিষ ডাকিলে ষাঁড়, পাঁঠা দেখাইয়া তার মজুরী লওয়া বিলকুল হারাম।

৯। **মাসআলাঃ** ছাগী, গাভী, মহিষের দুধ পান করিবার জন্য ভাড়া লওয়া দুরুস্ত নাই।

১০। **মাসআলাঃ** জানোয়ার আধাআধি ভাগে দেওয়া দুরুস্ত নাই, অর্থাৎ এরূপ বলা যে, মুরগী, বকরী লইয়া যাও এবং ভালমত লালন-পালন কর। যত বাচ্ছা হইবে, অর্ধেক তোমার অর্ধেক আমার। ইহা দুরুস্ত নাই।

১১। **মাসআলাঃ** বাড়ী সাজাইবার জন্য ঝাড় ফানুস ইত্যাদি ভাড়া লওয়া জায়েয নাই। যদি আনে, দাতা ভাড়া পাইবে না; অবশ্য যদি ঝাড় ফানুস আলো জ্বালাইবার জন্য আনে, তবে দুরুস্ত আছে।

১২। **মাসআলাঃ** কোন ঘোড়া-গাড়ী বা গরুগাড়ী ভাড়া লইল, তবে সাধারণত প্রচলিত প্রথার চেয়ে বেশী বোঝা চাপান দুরুস্ত নাই, এমনিভাবে পাল্কী বহনকারীদের অনুমতি ব্যতীত উহাতে দুই দুইজন বসা দুরুস্ত নাই।

১৩। **মাসআলাঃ** কাহারও কোন জিনিস হারাইয়া (খোয়া) গেল, সে বলিল, যে হারান জিনিসের সন্ধান বলিয়া দিবে, তাহাকে এক পয়সা দিব। ইহাতে যদি কেহ বলিয়া দেয়, তবুও পয়সা পাইবে না। কেননা এই ইজারা ছহীহ্ হয় নাই। আর যদি কোন নির্দিষ্ট লোককে বলে যে, তুমি যদি বলিতে পার, তবে পয়সা দিব, তবে যদি সে ঐ স্থানে বসিয়াই কিংবা তথায় দাঁড়াইয়া বলিয়া দেয়, তবে কিছু পাইবে না। আর যদি কিছু চলাফেরা করিয়া বলিয়া দেয়, তবে পয়সা আধ পয়সা যাহা ওয়াদা ছিল তাহা পাইবে।

ক্ষতিপূরণ লইবার বর্ণনা

১। **মাসআলাঃ** পেশাগত রংকার, ধোপা, দর্জি প্রভৃতি দ্বারা কোন কাজ করাইবার জন্য কোন জিনিস দিলে তাহা তাহাদের নিকট আমানত হইবে। যদি চুরি হইয়া যায় বা অনিচ্ছাকৃতভাবে

অন্য কোন রকমে নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহাদের থেকে ভর্তুক লওয়া দুরুস্ত নাই; অবশ্য যদি ধোপার আছাড়ের কারণে কাপড় ফাটিয়া যায় অথবা দামী রেশমী কাপড়কে ভাটী দেওয়ার কারণে উহা খারাপ হইয়া যায়, তবে উহার ভর্তুক লওয়া জায়েয আছে। এমনিভাবে যে কাপড় বদল করিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ লওয়া জায়েয আছে। আর কাপড় খোয়া গেলে যদি বলে, জানি না কিভাবে গেল, কোথায় গেল, তবে উহার ভর্তুক লওয়া জায়েয আছে। আর যদি বলে, আমার বাড়ী চুরি হইয়াছে, উহাতে খোয়া গিয়াছে, তবে ভর্তুক লওয়া দুরুস্ত নাই।

২। **মাসআলা ঃ** কোন কুলী মুজুরকে ঘি, তেল ইত্যাদি বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে বলিল। কুলীর কাছ হইতে উহা রাস্তায় পড়িয়া গেল, তবে উহার ভর্তুক লওয়া জায়েয আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** আর যাহারা পেশাগতভাবে মজুর নহে; বরং নির্দিষ্টভাবে শুধু আপনার কাজের জন্য যেমন বাড়ীর চাকর-বাকর বা ঐ মজুর যাহাকে এক বা দুই-দিনের জন্য রাখিয়াছেন, তাহার হাতে যাহাকিছু ক্ষতি হইবে, উহার ক্ষতিপূরণ লওয়া জায়েয নহে। অবশ্য সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করে, তবে ক্ষতিপূরণ লওয়া জায়েয আছে।

৪। **মাসআলা ঃ** যে চাকর শিশুকে খাওয়ানের কাজে নিযুক্ত আছে তাহার বে-খেয়ালিতে শিশুর অলংকার কিংবা অন্য কিছু হারাইয়া গেলে, তাহার ক্ষতিপূরণ লওয়া জায়েয নহে।

ইজারা (কেরায়া) ভাঙ্গিয়া দেওয়ার বর্ণনা

১। **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি বাড়ী ভাড়া নিয়াছে কিন্তু বেশী রকম পানি পড়ে কিংবা কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে অথবা অন্য কোন ত্রুটি প্রকাশ পাইল যাহার কারণে এখন বসবাস করা মুশকিল, তবে কেরায়া তুড়িয়া দেওয়া দুরুস্ত আছে। আর যদি একেবারেই পড়িয়া যায়, তবে কেরায়া নিজে নিজেই ভাঙ্গিয়া গেল আপনার তুড়িয়া দেওয়া এবং বাড়িওয়ালার অনুমতি দরকার নাই।

২। **মাসআলা ঃ** কেরায়া গ্রহীতা এবং দাতা উভয়ের মধ্যে যদি কেহ মরিয়া যায়, তবে কেরায়া টুটিয়া যাইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি এমন কোন ওযর সৃষ্টি হয়, যে কারণে কেরায়া তুড়িয়া দেওয়ার আবশ্যক হয়, তবে এই অসুবিধার সময় কেরায়া তুড়িয়া দেওয়া জায়েয আছে। যেমন, কোথাও যাওয়ার জন্য গাড়ী ভাড়া করিল, অতঃপর মত বদলিয়া গেল, যাওয়ার ইচ্ছা রহিল না, তখন কেরায়া তুড়িয়া দেওয়া ছহীহ্ হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** কেরায়া ঠিক করিয়া বায়না দেওয়ার যে প্রথা আছে যদি যাওয়া হয় তবে তাহাকে সম্পূর্ণ ভাড়া দেয় এবং ঐ বায়না ভাড়া হইতে কাটিয়া লয়, আর না গেলে ঐ বায়না ফেরত দেয় না, ইহা দুরুস্ত নহে বরং উহা ফেরত দেওয়া চাই।

বিনানুমতিতে পরের জিনিস লওয়া

(বিনা এজাযতে কাহারও কোন জিনিস নেওয়া অন্যায়। অনেকে চাচার বা ভাইর জিনিস আপন লোকের জিনিস বলিয়া বিনা এজাযতে গোপনে বা জোর করিয়া নেয়—ইহা অতি বড় গোনাহ্। যার জিনিস সে যদি খুশী হইয়া না দেয়, তবে সে যতই আপন লোক হউক না কেন, সে জিনিস নেওয়া হারাম হইবে এবং বড় গোনাহ্ হইবে। যতই সামান্য জিনিস হউক না কেন,

মালিকের বিনা খুশীতে গোপনে নিলে চুরির গোনাহ্ হইবে ও প্রকাশ্যে জোরজবরদস্তী করিয়া নিলে যুলুমের গোনাহ্ হইবে। হাদীস শরীফে আছেঃ لَايَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُّسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِهٖ 'কোন মুসলমানের কোন মাল অন্য কাহারও হালাল হইবে না যে পর্যন্ত না সে আন্তরিক খুশীতে এজাযত দিবে।' —মেশ্‌কাত—অনুবাদক)

১। মাসআলাঃ কাহারও কোন জিনিস জবরদস্তী লওয়া, কিম্বা অনুপস্থিতি বিনা অনুমতিতে লওয়া বড় গোনাহ্। কোন কোন স্ত্রীলোক নিজের স্বামী কিম্বা আত্মীয়ের জিনিস বিনানুমতিতে লয়, ইহাও দুরুস্ত নহে। যে জিনিস বিনানুমতিতে লইয়াছে, যদি সেই জিনিস এখনও মওজুদ থাকে, তবে অবিকল সেই বস্তু ফেরত দিয়া দিবে। আর যদি খরচ হইয়া গিয়া থাকে, তবে (তাহার হুকুম এই যে—যদি সে বস্তু এ ধরনের ছিল যে,) বাজারে তাহার অনুরূপ বস্তু পাওয়া গেলে যেমন, ঘি, তেল, টাকা-পয়সা, তবে যে ধরনের বস্তু লইয়াছে—ঐ রকমই আনাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি এমন বস্তু নিয়া নষ্ট করিয়াছে যে) তার নমুনা পাওয়া মুশ্‌কিল হয়। যেমন, মুরগী, বকরী, পেয়ারা, কমলা, নাশপাতি—ইত্যাদি, তবে তার দাম দিতে হইবে।

২। মাসআলাঃ চার পাইয়ার (চৌকির) একটা পায়া ভাঙ্গিয়া গেল, কিম্বা কার্নিশ বা কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেল, কিম্বা অন্য কোন বস্তু নিয়াছিল উহা নষ্ট হইয়া গেল, তবে নষ্ট হওয়াতে যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা দিতে হইবে।

৩। মাসআলাঃ যদি কেহ মালিকের বিনানুমতিতে পরের টাকা দিয়া ব্যবসা করে, তবে আসল টাকা মালিককে ফেরত দিতে হইবে এবং লাভের টাকা গরীব দুঃখীদিগকে খয়রাত করিয়া দিতে হইবে, নিজে নিতে পারিবে না।

৪। মাসআলাঃ কেহ কাহারও একটি চাদর নিয়া ছিড়িয়া ফেলিল; যদি ছেঁড়া অল্প হয়, তবে ত তৎপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, আর যদি অনেক ছেঁড়া হয় এবং এমন হয় যে, এখন আর চাদররূপে ব্যবহার করা যাইবে না, তবে ঐ ছেঁড়া চাদর তাহাকে দিয়া তাহার নিকট হইতে কাপড়ের সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করিতে হইবে।

৫। মাসআলাঃ যদি কেহ মালিকের বিনানুমতিতে পাথর নিয়া নিজের আংটিতে লাগাইয়া থাকে, তবে পাথরের দাম দিতে হইবে। আংটি ভাংগিয়া পাথর খুলিবার দরকার হইবে না।

৬। মাসআলাঃ যদি কেহ অন্যের কাপড় (মালিকের বিনানুমতিতে) রং করাইয়া থাকে, তবে কাপড় ফেরত লইবার সময় তাহার রঙের দাম দিতে হইবে; অথবা ঐ কাপড় তাহাকে দিয়া তাহার নিকট হইতে সাদা কাপড়ের দাম নিতে হইবে।

৭। মাসআলা ঃ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর যদি আসল জিনিস পাওয়া যায়, তবে দেখিতে হইবে, যদি মালিকের কথা অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব নহে। যদি মালিকের কথার খেলাফ নিজের কথা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিয়া থাকে, তবে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিয়া জিনিসটি তাহাকে দিতে হইবে।

৮। মাসআলাঃ পরের গাই বা বকরী যদি কাহারও বাড়ীতে আসিয়া পড়ে, তবে তার দুধ দোহন করা হারাম। যদি দুধ দুহিয়া বা বেচিয়া থাকে, তবে তার মূল্য দেওয়া ওয়াজিব।

৯। মাসআলাঃ সুই, সূতা, কাপড়ের টুকরা, পান সুপারী, খয়ের তামাক ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসও বিনা অনুমতিতে নিয়া থাকিলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। দুনিয়াতে না দিলে আখেরাতে দিতে হইবে, সুতরাং দুনিয়াতেই তাহা পরিশোধ করিবে বা মাফ চাহিয়া নিবে।

১০। মাসআলা ঃ স্বামী নিজের ব্যবহারের জন্য কোন কাপড় আনিল। কাটিবার সময় স্ত্রী উহা হইতে কিছু বাঁচাইয়া চুরি করিয়া রাখিল, স্বামীকে বলিল না। ইহাও জায়েয নাই। যাহাকিছু নিবে, বলিয়া নিবে। অনুমতি না দিলে লইবে না।

শরীকী কারবার

(শরীকী কারবারের মধ্যে বড় বরকত। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ فَاِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ○

"অর্থাৎ, দুইজনে মিলিয়া শরীক হইয়া যদি কোন শরীকী কারবার করে, তবে আমি নিজে আমার রহ্মত ও বরকত লইয়া তাহাদের সঙ্গে থাকি। যখন তাহারা আমানতে খেয়ানত করে, তখন আমি আমার রহ্মত ও বরকত লইয়া তাহাদের কারবার হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাই।"

দেখা গেল এবং প্রমাণ হইল যে, শরীকী কারবার অর্থাৎ লিমিটেড কোম্পানির কারবার বড়ই বরকতের কারবার—চাই সে কারবার কৃষির মধ্যে হউক বা শিল্পের মধ্যে হউক বা অন্য যে কোন বাণিজ্যের মধ্যে হউক। কিন্তু বরকতের জন্য শর্ত এই যে, কোন শরীকের দ্বারা যেন কোনরূপ খেয়ানত না হয়। খেয়ানত হয় দুই প্রকারে—(১) কাম চুরি করিলে এবং (২) পয়সা চুরি করিলে। অর্থাৎ, শরীকদের মধ্যে যদি একজনেরও নিয়ত, দেল খারাপ হইয়া যায় এবং এইরূপ ভাবে যে, আমি একটু কাজ কম করি ও' খাটিয়া মরুক বা একজনে যদি অন্যের অগোচরে একটি পয়সাও সরাইয়া নেয় বা গোপনে তহ্বীল তছ্রুফ করে, তবে সে কারবারে আর বরকত এবং আল্লাহ্র খাছ রহ্মত থাকিবে না। —অনুবাদ)

১। মাসআলা ঃ একজন লোক মরিয়া গেল এবং বাড়ী-ঘর কাপড়-চোপড়, লেপ-তোষক, কাঁথা-বালিশ, থাল-বাসন, ঘটি-কলস, টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি ইত্যাদি সম্পত্তি রাখিয়া গেল এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কয়েকজন ছোট-বড়, দুর্বল-সবল ওয়ারিস রাখিয়া গেল। এমন সব মাল সকল শরীকদের শরীকী অংশ হিসাবে হইয়া যাইবে। এখন আর যার যার অংশ পৃথক পৃথক ভাগ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মালের কিছুমাত্র জিনিস সব শরীকদের এজাযত ব্যতিরেকে ব্যবহার করা জায়েয হইবে না। যদি কেহ সকলের বিনা এজাযতে ব্যবহার করে, তবে সে গোনাহ্গার হইবে।

২। মাসআলা ঃ (ত্যাজ্য সম্পত্তির কয়েকজন ওয়ারিস হইলে তাহারা যেমন ভাগ করার আগে একে অন্যের শরীক হয় এবং একজনের বিনা অনুমতিতে অন্যজনে সে জিনিস এস্তেমাল করিতে পারে না। ঐরূপে) দুই তিনজনে মিলিয়া যদি কোন একটা জিনিস খরিদ করে, তবে তাহারাও ঐ জিনিসে একে অন্যের শরীক হয়, কজেই এক শরীকের বিনা অনুমতিতে অন্য শরীক জিনিস এস্তেমাল বা বিক্রয় করিতে পারে না। (এইরূপ শরীক হওয়াকে 'শেরকাতে মিলক' বলে। আর এক রকম শেরকাত আছে, তাহার নাম "শেরকাতে আকদ", এ সম্পর্কে সামনে বলা হইবে।)

৩। মাসআলা ঃ দুইজন লোক এক সঙ্গে শরীক হইয়া আপন পয়সা মিলাইয়া কোন জিনিস কিনিলে সেই জিনিস ভাগ করার সময় উভয়ের সামনে থাকিতে হইবে। একজনে নিজের মতে অন্য জনের অসাক্ষাতে ভাগ করিয়া নিজে নিয়া থাকিলে শক্ত গোনাহ্ হইবে। অবশ্য যদি এমন জিনিস ক্রয় করে, যার মধ্যে ভাল-মন্দ বেশ-কম নাই সবই সমান, তবে সে জিনিস যদি আমানতদারীর সহিত একজনে অন্যজনের অসাক্ষাতে ভাগ করে, তবে তাহা করিতে পারিবে বটে,

কিন্তু ভাগ করার পর তাহাকে দেওয়ার পূর্বে যদি চুরি বা খেয়ানত হয়, তবে এই ক্ষতি উভয়েরই হইবে এবং ভাগ করনেওয়ালার সংগে উভয়ে শরীক হইয়া ভাগ করিয়া নিতে হইবে।

৪। মাসআলাঃ দুইজন লোক ১০০, ১০০ শত টাকা মিলাইয়া মাল কিনিয়া তেজারত (ব্যবসা) করিতে চাহিতেছে এবং পরস্পর চুক্তি করিতেছে যে, আমরা শরীকী কারবার করিব; যাহা কিছু মুনাফা হইবে আমরা সমান ভাগ করিয়া নিব। এরূপ করা শরীঅতে দুরুস্ত আছে এবং এ সম্বন্ধে শরীঅতের কিছু বিধানও আছে। মূলধন সমান হওয়া সত্ত্বেও যদি মুনাফার মধ্যে বেশ-কম ভাগ রাখে, তবে তাহাও জায়েয আছে, এটা তাহাদের এখতিয়ার। আর যদি মূলধন বেশ-কম হওয়া সত্ত্বেও মুনাফার মধ্যে সমান সমান অংশ রাখে, তবে সেটাও তাহাদের দুইজনের এখতিয়ার। (কিন্তু প্রথমেই সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া লইতে হইবে, গোলেমালে কোন কথা বলা যাইবে না।)

৫। মাসআলাঃ শরীক হইয়া কারবার করার চুক্তি ও কথাবার্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে এবং দুই জনের টাকা-পয়সা একত্র করিয়া মিশাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু এখনও কোন মাল কেনা হয় নাই। এমতাবস্থায় হয়ত খোদা নাখাস্তা, সব টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে অথবা টাকা-পয়সা মিশান হয় নাই, এর মধ্যে একজনের টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থা হইলে শরীকী কারবারের যে চুক্তি হইয়াছিল সে চুক্তি শেষ হইয়া যাইবে। পুনরায় শরীকী কারবার করিতে হইলে পুনরায় চুক্তি ও কথাবার্তা ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

৬। মাসআলাঃ দুইজনে শরীকী কারবার করার এইরূপ চুক্তি করিল যে, আমরা দুইজনে সমান সমান মূলধন দিয়া কারবার করিব, আল্লাহ্ কিছু মুনাফা দিলে সমান ভাগ করিয়া নিব (এইরূপ চুক্তি করার পর একজনে তার টাকা দিয়া কিছু মাল খরিদ করিয়াছে, কিন্তু ঘটনাক্রমে অন্যজনের সব টাকা চুরি হইয়া গেল; এমতাবস্থায় যে মাল খরিদ করা হইয়াছে উহাতে দুইজনেই শরীক থাকিবে। যার টাকা দিয়া মাল খরিদ করা হইয়াছে সে অন্যজনের কাছ থেকে মালের অর্ধেক টাকা নিতে পারিবে (এবং মালে লাভ লোকসান হইলে তাহা দুই জনেরই হইবে।)

৭। মাসআলাঃ দুইজনে শরীকী কারবারের চুক্তি করার সময় যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, যাহাকিছু লাভ হইবে তাহা হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা (দশ বিশ, পঞ্চাশ ইত্যাদি) আমার আর বাকী সবই তোমার; এইরূপ শর্ত করিলে তাহা দুরুস্ত হইবে না। (লাভ অংশে অংশে ঠিক করিতে হইবে—তা চাই সমান অংশ হউক বা বেশ-কম হউক। যেমন,অর্ধেক-অর্ধেক, সিকি-বার আনা, দশ আনা-ছয় আনা ইত্যাদি।)

৮। মাসআলাঃ শরীকী কারবারে মাল কেনার পর যদি মাল চুরি হয়, তবে তাহা উভয়েরই যাইবে, একজনের যাইবে না। যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, মুনাফা (লাভ) হইলে দুইজনের, কিন্তু লোকসান হইলে সেটা সবই আমার, এইরূপ শর্ত করা দুরুস্ত নহে।

৯। মাসআলাঃ শরীকী কারবার যদি কোন শর্তের কারণে ফাছেদ বা না-দুরুস্ত সাব্যস্ত হয় তবে মুনাফা (লাভ) ভাগ করার সময় চুক্তির কথাবার্তার (কওল ও করার) প্রতি দেখা যাইবে না; বরং মূলধনের প্রতি দেখিয়া মুনাফা ভাগ করিতে হইবে; যার যে পরিমাণ পুঁজি সে সেই পরিমাণ লাভের অংশ পাইবে। চুক্তির সময়কার' কওল ও করার ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্য হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীকী কারবার ছহীহ্ হইবে, কোন শর্তের কারণে ফাছেদ না হইবে।

১০। মাসআলাঃ যদি দুইজন দর্জি এইরূপ শরীকী কারবারের চুক্তি করে যে, আমরা দুইজনে এক সঙ্গে কারার করিব, যা কিছু সেলাইর কাজ আসিবে দুইজনেই করিব এবং উহার মজুরী দুইজনে ভাগ করিয়া নিব। এরূপ চুক্তিতে শরীকী কারবার দুরুস্ত আছে। (যদি কাজ সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও পয়সা কম-বেশ নেওয়ার চুক্তি করিয়া থাকে বা কাজে কিছু বেশ-কম সত্ত্বেও পয়সা সমান সমান নেওয়ার চুক্তি করিয়া থাকে, তবে সেরূপ চুক্তি করাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু এরূপ চুক্তি করা দুরুস্ত নাই যে, যা কিছু পাওয়া যাইবে তার থেকে পাঁচ টাকা আমার আর বাকী সব তোমার।

১১। মাসআলাঃ শরীকী কারবারের চুক্তিতে যে কয়জন আবদ্ধ হইবে তাহাদের প্রত্যেককেই সকল কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। একজনে কাজ নিলে অন্যজনে বলিতে পারিবে না যে, 'তুমি কাজ নিয়াছ, তুমিই কাজ কর, আমি করিব না, বরং সকলের উপরই ঐ কাজ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে। (সময় মত নিয়ম মত সকলেরই কাজ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে।)

১২। মাসআলাঃ শরীকী কারবারের দোকানে একজনে কাপড় সেলাই করিতে দিল; কাপড়ওয়ালা যখন কাপড় নিতে আসিবে, তখন শরীকদের যেই উপস্থিত থাকুক না কেন, তাহার নিকটই সে কাপড় চাহিতে পারিবে। উপস্থিত ব্যক্তি এরূপ বলিতে পারিবে না যে, 'আমি ত আপনার কাপড় রাখি নাই, যে রাখিয়াছে তাহার কাছে চাহিবেন।' এইরূপ বলা একদম জায়েয হইবে না। শরীকদের মধ্যে যাহার কাছেই চাওয়া হউক সেই দিতে বাধ্য থাকিবে যদিও সে নিজে কাপড় না রাখিয়া থাকে।

১৩। মাসআলাঃ ঐ কাপড়ওয়ালার কাছ থেকে পয়সা গ্রহণ করার অধিকারও শরীকদের মধ্যে সকলেরই আছে এবং ইহাদের যাহার কাছে দিবে কাপড়ওয়ালা দেনামুক্ত হইয়া যাইবে। কাপড়ওয়ালাও ইহা বলিতে পারিবে না যে, যাহাকে কাপড় দিয়াছিলাম, পয়সা তাহাকে দিব। (আর যাহার কাছে কাপড় দেওয়া হইয়াছিল সেও একথা বলিতে পারিবে না যে, পয়সা আমারই কাছে দিতে হইবে, অন্য শরীকদের কাছে দিতে পারিবে না।)

১৪। মাসআলাঃ দুইজনে যদি এইরূপ চুক্তি করে যে, চল, দুইজনে শরীকীভাবে নদী বা বিল হইতে মাছ ধরিয়া আনি অথবা জঙ্গল বা মাঠ হইতে লাকড়ী বা নাড়া (খড়) যোগাড় করিয়া আনি, তবে যেহেতু বিলের বা নদীর মাছ সকলের জন্য মোবাহ, সেই হেতু যে যেইটা ধরিবে সেই সেইটার মালিক হইবে। আর জঙ্গল বা মাঠের লাকড়ী বা নাড়া যে যাহা সংগ্রহ করিবে, সে তাহার মালিক হইবে। এইজন্য এইরূপ মোবাহ জিনিসের মধ্যে শরীকী কারবারের কোন অর্থ হয় না। (কিন্তু যদি চুক্তি করিয়া এইরূপ কাজ করে এবং কাঠ বা লাকড়ী একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখে, তবে যে হিসাবে চুক্তি করিয়াছে সেই হিসাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।)

১৫। মাসআলাঃ একজন অপর জনকে বলিল, আমার ডিমগুলি তোমার মুরগীর নীচে (তাও দিবার জন্য) রাখ, যে পরিমাণ বাচ্চা ফুটিবে আমরা উভয়ে আধাআধি ভাগ করিয়া লইব। ইহা দুরুস্ত নাই।

শরীকী জিনিস ভাগ করিবার বর্ণনা

১। মাসআলাঃ দুইজনে মিলিয়া বাজার হইতে গেঁহু আনাইল। এখন ভাগ করার সময় উভয়ের উপস্থিতি দরকার নাই। দ্বিতীয় অংশীদার উপস্থিত না থাকিলে তবু ঠিক ঠিক মাপিয়া

উহার অংশ পৃথক করিয়া নিজের অংশ লওয়া দুরুস্ত আছে। যখন নিজের অংশ পৃথক করিয়া লইবে তখন খাও পান কর, কাহাকেও দান কর, যা ইচ্ছা কর সব জায়েয। এরূপে ঘি, তৈল, ডিম ইত্যাদিরও এই হুকুম। মোটকথা, যে বস্তু এরূপ যে উহাতে কিছু বেশ-কম হয় না; যেমন ডিম, সব ডিম সমান হয় কিম্বা গেঁহু দুই ভাগ করা হইল এই ভাগ ঐ ভাগ একই রকম, উভয় অংশ সমান। এ সকল বস্তুর শুধু এই হুকুম যে, দ্বিতীয় জন উপস্থিত না থাকিলেও অংশ ভাগ করিয়া লওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু দ্বিতীয় অংশীদার নিজের অংশ গ্রহণ করে নাই, অথচ তাহার অংশ নষ্ট হইয়া গেল, তবে ঐ ক্ষতি উভয়েরই হইবে, যেমন শরীকী কারবারে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু যেসমস্ত জিনিসে বেশ কম হয়, যেমন পেয়ারা, কমলা ইত্যাদি, তবে উভয় অংশীদার উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অংশ ভাগ করিয়া লওয়া দুরুস্ত নহে।

২। মাসআলাঃ দুই জনে মিলিয়া আম, পেয়ারা ইত্যাদি আনাইল এবং একজন কোথাও চলিয়া গেল এখন আর উহা হইতে খাওয়া দুরুস্ত নাই। যখন সে আসিবে তাহার সম্মুখে নিজের ভাগ পৃথক করিয়া লইবে নচেৎ শক্ত গোনাহ্ হইবে।

৩। মাসআলাঃ দুই জনে মিলিয়া বুট ভাজাইল। এখন শুধু অনুমান করিয়া ভাগ দুরুস্ত নাই; বরং খুব ভাল ভাবে মাপিয়া সমান সমান করিয়া লওয়া চাই; কোন অংশে বেশী হইলে সুদ হইবে।

বন্ধক রাখার বিবরণ

১। মাসআলাঃ তুমি কাহারও নিকট হইতে ১০ টাকা করয লইয়াছ এবং বিশ্বাসের জন্য নিজের কোন জিনিস তাহার কাছে রাখিয়াছ; যখন টাকা দিব, তখন আমার জিনিস লইয়া যাইব। ইহা জায়েয, ইহাকে বন্ধক বা রেহেন বলে। কিন্তু সুদ দেওয়া কোন প্রকারেই দুরুস্ত নাই। যেমন আজকাল মহাজনেরা সুদ লইয়া বন্ধক রাখে ইহা দুরুস্ত নাই। সুদ লওয়া এবং দেওয়া উভয় হারাম।

২। মাসআলাঃ কোন জিনিস বন্ধক দিলে যাবৎ করয পরিশোধ না করিবে তাবৎ সে জিনিস ফিরাইয়া লওয়ার বা দখল লওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৩। মাসআলাঃ কোন জিনিস বন্ধক রাখিলে সেই জিনিস বন্ধক গ্রহীতা আদৌ কোনরূপ ব্যবহার করিলে তাহা না-জায়েয হইবে। বাগান বন্ধক রাখিলে উহার ফল খাওয়া, জমি বন্ধক রাখিলে তাহার ফসল খাওয়া বা টাকা খাওয়া, ঘর বন্ধক রাখিলে উহাতে বাস করা। (জেওর বন্ধক রাখিলে তাহা ব্যবহার করা, থালা বাটি বন্ধক রাখিলে তাহা ব্যবহার করা)—সবই না-জায়েয (এবং সবই সুদ।)

৪। মাসআলাঃ যদি গরু, ঘোড়া বা বকরী বন্ধক রাখে, তবে (তার খোরাক ইত্যাদির খরচ মালিকের জিম্মায়। রেহেন রাখনেওয়ালা গাই বা বকরীর দুধ খাইতে পারিবে না। বলদ দ্বারা হাল চাষ করিতে পারিবে না, ঘোড়ায় ছওয়ার হইতে পারিবে না।) গাই, বকরীর দুধ, বাছুর সবই তার কাছে আমানত থাকিবে। যখন করযদার করযের টাকা পরিশোধ করিবে, তখন দুধের টাকা ও বাছুর সবই তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। অবশ্য যাহাকিছু খরচ হইয়াছে সে খরচের টাকা কাটিয়া রাখিতে পারিবে। (খোরাকী খরচ ও দুধের দাম যদি সমান হয় এবং ঘোড়ার ঘাস প্রভৃতি খরচ যদি ঘোড়ার কেরায়ার সমান হয় বা বলদের হালের দাম এবং বলদের খোরাকীর খরচ সমান

হয়, তবে অন্যের দ্বারা সালিসী বিচার করাইয়া খোরাকীর খরচ পরিমাণ ঘোড়া বা বলদ খাটাইয়া নিতে পারিবে এবং গাই বকরীর দুধও সেই পরিমাণ নিতে পারিবে।)

৫। মাসআলাঃ করযের কতক টাকা পরিশোধ করার পর বন্ধকী জিনিস ছাড়াইয়া নেওয়ার অধিকার হয় না। করযের টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিয়া দিলে বন্ধকী জিনিস ফেরত পাইবে।

৬। মাসআলাঃ করযের টাকার পরিমাণ এবং বন্ধকী জিনিসের মূল্যের পরিমাণ যদি সমান সমান হয় অথবা বন্ধকী জিনিসের মূল্যের পরিমাণ করযের টাকার চেয়ে বেশী হয় এবং বন্ধকী জিনিস কোন রকমে খোয়া যায়, তবে করযের টাকা শোধ হইয়া যাইবে। করয দেনেওয়ালা আর তার করযের টাকা চাহিতে পারিবে না এবং জিনিসওয়ালাও তার জিনিস চাহিতে পারিবে না। আর যদি বন্ধকী জিনিসের মূল্য করযের টাকার চেয়ে কম হয়, তবে জিনিসের যে মূল্যে ছিল সেই পরিমাণ করয পরিশোধ হইবে এবং বাকী টাকা দিয়া দিতে হইবে।

জমি বর্গা দেওয়া,পত্তন দেওয়া প্রভৃতি

১। মাসআলাঃ অংশ হিসাবে জমি বর্গা দিলে তাহা জায়েয আছে। এখানে ৪টি জিনিস আছেঃ—(১) জমি, (২) লাঙ্গল-গরু, (৩) বীজ এবং (৪) মেহ্নত। জমি একজনের, বাকী তিনটি অন্য জনের বা জমি এবং বীজ একজনের, লাঙ্গল-গরু ও মেহনত অন্য জনের, অথবা জমি, বীজ ও লাঙ্গল-গরু একজনের এবং মেহ্নত অন্য জনের অথবা জমি এবং লাঙ্গল-গরু একজনের, বীজ এবং মেহ্নত অন্য জনের—এই সব রকমেই জমি বর্গা দেওয়া জায়েয। ভাগ কি রকম হইবে সেটা নির্ভর করে দুইজনের স্বাধীন ইচ্ছার উপর; দুইজনে রাজী হইয়া যাহা ধার্য করিবে সেইটাই ওয়াজিব হইবে। কার কত অংশ হইবে সেটা দুইজনে মিলিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে, নতুবা জায়েয হইবে না। এইরূপে অংশ হিসাবে ধার্য না করিয়া যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করে যেমন, এক মণ আমার, বাকী সব তোমার বা জমির এই পার্শ্বে যা কিছু হইবে সেটা আমার আর বাকীটা তোমার—তাহা হইলে ইহা জায়েয হইবে না।

২। মাসআলাঃ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার পরিবর্তে অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ ধানের বা চাউলের পরিবর্তে জমি বাৎসরিক পত্তন দেওয়া অর্থাৎ ইজারা দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু যদি শর্ত করা হয় যে, এই জমিতে যে ধান হইবে, সেই ধানের দুই মণ ধান আমাকে দিতে হইবে, তবে তাহা জায়েয হইবে না।

ছোলেহ করা

১। মাসআলাঃ ছোলেহ করিবার এবং শর্ত করিবার অধিকার মানুষের আছে। যে যাহা ছোলেহ করিবে বা শর্ত করিবে, তার জন্য সেটা পালন করা ওয়াজেব হইবে—যাবৎ ছোলেহ এবং শর্ত শরীঅতের সীমা লংঘন না করিবে।

স্বীকার-উক্তি, দাবী, সাক্ষ্য ও বিচার

মানুষ যাহাকিছু নিজ মুখে নিজের উপর স্বীকার করিবে, সেজন্য সে দায়ী হইবে; তাহার জন্য আর কোন সাক্ষী-সাবুতের দরকার হইবে না। অন্যের উপর যদি দাবী করে, তবে তাহার জন্য অবশ্য সত্য সাক্ষীর দরকার হইবে। সত্য সাক্ষী ব্যতিরেকে অন্যের উপর কিছু প্রমাণ করা যাইবে

না। কাহারও বিরুদ্ধে যদি কেহ কিছু দাবী করে, তবে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, বাদীর ঐ দাবী স্বীকার করে কি না। যদি স্বীকার করে, তবে কোন অসুবিধা রহিল না। আর যদি স্বীকার না করে, তবে বাদী পক্ষ যদি তাহাকে কছম খাওয়াইতে চায়, তবে তাহার কছম খাইতে হইবে।

মিথ্যা দাবী করা, মিথ্যা মোকদ্দমা করা গোনাহ্ কবীরা। মিথ্যা কছম খাওয়া, মিথ্যা হলফ করা গোনাহ্ কবীরা। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া গোনাহ্ কবীরা। অন্যায় বা পক্ষপাতিত্ব করিয়া বিচার করাও গোনাহ্ কবীরা। বিচারকের দায়িত্ব সত্য সাক্ষী তদন্ত করিয়া বাহির করা এবং সত্য সাক্ষীর উপর নির্ভর করিয়া বিচার করা, তদন্ত করা সত্ত্বেও যদি মিথ্যা না ধরিতে পারে, তবে অবশ্য বিচারক দায়ী হইবে না। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকিলে সাক্ষীই দায়ী হইবে।

সাক্ষী

১। **মাসআলা ঃ** সত্য সাক্ষ্য দান করা ফরয, মিথ্যা সাক্ষ্য দান হারাম, গোনাহে কবীরা। যখন কাহারও হক নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, তখন সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। যেনার সাক্ষ্য গোপন করা আফযাল। চারিজনে একত্রে যেনার সাক্ষ্য না দিলে, একজন দুইজন বা তিনজনে সাক্ষ্য দিলে হদ্ লাগানোর উপযুক্ত হইবে না।

২। **মাসআলা ঃ** যেনা প্রমাণ করার জন্য চারিজন চরিত্রবান সত্যবাদী পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন। চুরি, মিথ্যা, তোহ্‌মাত, মদ্যপান এবং মানুষ খুন প্রমাণ করার জন্য দুইজন চরিত্রবান সত্যবাদী সাক্ষীর প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে দুইজন চরিত্রবান সত্যবাদী পুরুষ বা একজন চরিত্রবান সত্যবাদী পুরুষ এবং দুইজন চরিত্রবতী সত্যবাদিনী স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে। অবশ্য স্ত্রীলোকের এমন বিষয় যাহা পুরুষের জানার কথা নয়—যেমন, প্রসব, কৌমার্য, সহবাসের অনুপযুক্ততা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

৩। **মাসআলা ঃ** সব ক্ষেত্রে সাক্ষী সত্যবাদী হইতে হইবে। মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য কোথাও গ্রহণযোগ্য নহে। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রামাণ হইলে সে শাস্তির উপযুক্ত। হযরত ওমর (রাঃ) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে চল্লিশ কোড়া মারার শাস্তি প্রদান করিয়াছেন।

অন্তিমকালে

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় চিন্তা খাতেমা-বিল-খায়ের অর্থাৎ ঈমানের সহিত মউত। যখন মানুষ ক্ষণস্থায়ী জীবন পার হইয়া পরপারের যাত্রী হয়, তখন তাহার কর্তব্য হয় পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের সরঞ্জাম এইখান হইতেই যোগাড় করিয়া নেওয়া। গোনাহ্-খাতার জন্য তওবা এস্তেগফার করিয়া, কাহারও কোন দেনা থাকিলে তাহা পরিশোধ করিয়া, যাহাদের সঙ্গে উঠা-বসা, চলা-ফেরা করা হইয়াছে তাহাদের কাছে মাফ চাহিয়া নেওয়া—এগুলি তখনকার কর্তব্য—যাহাতে পবিত্র আত্মা নিয়া মনের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রেম ও ভালবাসা রাখিয়া আল্লাহ্‌র যেকর কলেমা শরীফ পড়িতে পড়িতে যে মাওলার কাছ হইতে তাহার জান আসিয়াছে, সেই মাওলার কাছেই আবার জানকে সোপর্দ করিয়া দেওয়া যায়। —অনুবাদক

অছিয়ত

১। মাসআলা ঃ (মৃত্যুকালে কিছু আদেশ উপদেশ দান করিয়া যাওয়াকে অছিয়ত বলে।) আমার মৃত্যুর পরে এত মাল বা এত টাকা অমুককে বা অমুক সৎকাজে দান করিও—এইরূপ বলার নাম অছিয়ত। এইরূপ কথা যদি জীবিত অবস্থায় সুস্থ শরীরেও বলে তাহাও অছিয়ত হইবে। আর যদি যে রোগে মারা যায়, সেই রোগ-শয্যায় বলে তাহাও অছিয়ত হইবে। আর যদি রুগ্ন অবস্থায় বলে এবং সে রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহাও অছিয়ত হইবে। যদি নিজ হাতে দান করে বা কাহারও করয মাফ করিয়া দেয়, তবে ইহা সুস্থ শরীরে হইলে দান হইবে, সর্বপ্রকারে জায়েয; আর যদি এমন রোগের অবস্থায় বলে, যে রোগ হইতে সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে, তবে তাহাও দুরুস্ত হইবে। আর যদি রুগ্ন অবস্থায় দান করে, কিন্তু সেই রোগেই সে মারা যায়, তবে সেটা (দান হইবে না,) অছিয়ত হইবে। অছিয়ত সম্বন্ধে সামনে মাসআলা বয়ান করা হইবে।

২। মাসআলা ঃ যদি কাহারও জিম্মায় কাযা নামায থাকিয়া থাকে, কাযা রোযা থাকিয়া থাকে, যাকাৎ না দিয়া থাকে, (কোরবানী না দিয়া থাকে,) কছমের কাফ্‌ফারা আদায় না করিয়া থাকে, রোযার কাফ্‌ফারা আদায় না করিয়া থাকে, কছমের (শর্ত পুরা হওয়া সত্ত্বেও মান্নত আদায় না করিয়া থাকে, বা ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করিয়া থাকে, অথচ) এগুলি আদায় করার মত অর্থ-সংগতি তাহার আছে, তবে মৃত্যুর পূর্বে এইগুলি আদায় করার জন্য অছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। এইরূপে যদি কাহারও দেনা থাকিয়া থাকে অথবা তাহার নিকট অন্য কাহারও মাল আমানত রাখা থাকে, তবে করয আদায় করিয়া দেওয়ার জন্য, আমানতের মাল যারটা তাহাকে দিয়া দেওয়ার জন্য মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব (এইসব অছিয়ত না করিয়া মরিলে ভীষণ গোনাহ্‌গার হইবে)। এতদ্ব্যতীত যদি কোন আত্মীয় গরীব হয় এবং শরীঅত মতে ওয়ারেস হয় না, অথচ মৃত ব্যক্তির প্রচুর সম্পত্তি আছে, তাহাদিগকে কিছু দেওয়ানের ব্যবস্থা করা বা অছিয়ত করা মোস্তাহাব।[১] এছাড়া অন্যান্যদের জন্য অছিয়ত করা, না করা তাহার ইচ্ছা।

৩। মাসআলা ঃ মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে সর্বপ্রথমে তাহার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর যাহাকিছু থাকে, তাহার দ্বারা আগে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। এমন কি, যদি তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও তাহার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, তবে তাহাও করিতে হইবে। ওয়ারিসগণ কিছু না পাইলেও তাহার ঋণ আগে পরি-শোধ করিতে হইবে। ঋণ পরিশোধের অছিয়ত না করিয়া থাকিলেও ঐ ভাবে আগে ঋণ পরিশোধ করিতেই হইবে। (কেননা, এটা হক্কুল এবাদ। ঋণ পরিশোধের পর কিছু বাঁচিলে ওয়ারিসগণ পাইবে, নতুবা পাইবে না) এছাড়া অন্যান্য যত অছিয়ত (এমন কি ফরয যাকাতের অছিয়তও)

টিকা

১ কোন কোন ইমামের নিকট ওয়াজিব, কোন কোন ইমামের নিকট মোস্তাহাব।

তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তির মধ্যে তাহার করিবার এখতিয়ার আছে, তার বেশীর মধ্যে নহে এবং অছিয়ত করিয়া থাকিলে তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি পর্যন্তই অছিয়ত পালনের জন্য খরচ করা ওয়ারিসদিগের উপর ওয়াজিব, তাহার বেশীতে নয়। অবশ্য ওয়ারিসগণ সকলে খুশী হইয়া যদি নিজ নিজ অংশ না নেয় এবং বলে যে, অছিয়ত পুরা কর, তবে তৃতীয়াংশের অধিক অছিয়তে ব্যয় করা জায়েয আছে। কিন্তু এখানে সাবধান, ওয়ারিসগণের মধ্যে কেহ নাবালেগ থাকিলে তাহার অংশ সে অনুমতি দিলেও কাহার খরচ করিবার অধিকার নাই (এবং যাহার অংশ তাহার বিনা অনুমতিতে অন্যের খরচ করিবারও অধিকার নাই।)

৪। **মাসআলাঃ** যাহারা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হইবে, তাহাদের কাহারও জন্য অছিয়ত করিলে সে অছিয়ত ছহীহ্ হইবে না। আত্মীয়দের মধ্যে যাহারা ওয়ারিস হইবে না, তাহাদের জন্য অছিয়ত করিতে পারিবে; আত্মীয় ছাড়া অন্যদের জন্যও অছিয়ত করিতে পারিবে। কিন্তু (ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট) মোট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত করিতে পারিবে, তার বেশী নয়। যদি কোন ওয়ারিসের জন্য অছিয়ত করা হয় এবং বাকী ওয়ারিসগণ খুশীর সংগে তাহাতে এজাযত দেয়, তবে তাহা পালন করা যাইবে। এইরূপে যদি সম্পত্তির তিন ভাগের চেয়ে বেশীরও অছিয়ত করে এবং সব ওয়ারিসগণ খুশীর সঙ্গে এজাযত দেয়, তবে তাহাও জারি করা যাইবে; অন্যথায় এক তৃতীয়াংশই পাইবে। কিন্তু ওয়ারিসগণের মধ্যে কেহ কেহ নাবালেগ থাকিলে তাহার এজাযত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫। **মাসআলাঃ** যদিও সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ অছিয়ত করার এখতিয়ার আছে কিন্তু পূর্ণ তৃতীয়াংশ অছিয়ত না করিয়া কম অছিয়ত করাই উত্তম; বরং খুব বড় মালদার না হইলে অছিয়ত না করাই উচিত; ওয়ারিসানদের জন্য ছাড়িয়া যাওয়া ভাল, যেন ভালভাবে আরামে জীবন যাপন করিতে পারে। কেননা, নিজের ওয়ারিসানদের স্বচ্ছন্দে আরামে ছাড়িয়া যাওয়াতেও ছওয়াব পাওয়া যায়। অবশ্য যদি দরকারী ও জরুরী অছিয়ত হয়, যেমন, নামায, রোযার ফিদিয়া, তবে উহার অছিয়ত সর্বাবস্থায় করিয়া যাইবে, নচেৎ গোনাহ্‌গার হইবে।

৬। **মাসআলাঃ** এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে বলিয়া গেল যে, আমার মৃত্যুর পর একশত টাকা দান করিয়া দিও। এরূপ অবস্থায় দেখিতে হইবে যে, তাহার কাফন ও ঋণ আদায়ের পর তিনশত টাকা তাহার সম্পত্তিতে আছে কি না। যদি তিনশত টাকা বা তাহারও বেশী থাকিয়া থাকে, তবে পুরা একশত টাকা দান করাই তাহার ওয়ারিসদিগের উপর ওয়াজিব হইবে। আর যদি তিনশত টাকার কম থাকে, তবে যাহা থাকিবে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ যত টাকা হয়, তত টাকা দান করা ওয়াজিব, তাহার বেশী ওয়াজিব হইবে না। আর সমস্ত ওয়ারিস খুশী হইয়া একশত পুরা করিয়া দান করিলে সেটা স্বতন্ত্র কথা (কিন্তু এইরূপ করা ওয়াজিব হইবে না।)

৭। **মাসআলাঃ** যাহার আদৌ কোন ওয়ারিস নাই, সে তাহার ষোল আনা সম্পত্তিও দান করিয়া যাইতে পারিবে, তাহাতে আপত্তি নাই। যদি শুধু স্ত্রী থাকে এবং আর কেহ না থাকে, তবে চারি ভাগের তিন ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত করিতে পারিবে। যদি শুধু স্বামী থাকে এবং আর কেহ না থাকে, তবে অর্ধেক সম্পত্তির অছিয়ত করিতে পারিবে।

৮। **মাসআলাঃ** না-বালেগের অছিয়ত দুরুস্ত নহে।

৯। **মাসআলাঃ** কেহ অছিয়ত করিল, আমার জানাযার নামায অমুক ব্যক্তি পড়িবে, অমুক শহরে, অমুক কবরস্থানে, অমুকের কবরের কাছে আমাকে দাফন করিবে, অমুক কাপড় দ্বারা

আমাকে কাফন দিবে, আমার কবর পাকা করাইবে, কবরে বুরূজ তৈয়ার করিবে, কোন হাফেয ছাহেবকে বসাইয়া দিবে যে, কোরআন পড়িয়া পড়িয়া আমাকে বখশিয়া দিবে, তবে এই সমস্ত অছিয়ত পূর্ণ করা জরুরী নহে, বরং শেষের তিনটি অছিয়ত তো জায়েযই নহে। পুরা করিলে গোনাহ্গার হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ অছিয়ত করিয়া স্বীয় অছিয়ত হইতে ফিরিয়া যায়, যেমন, বলে যে, এখন আর এই অছিয়তের ইচ্ছা নাই, উহা পছন্দ করি না, আমার এই অছিয়ত এতেবার করিও না ও মানিও না। এমতাবস্থায় ঐ অছিয়ত বাতেল হইয়া গেল।

১১। **মাসআলা ঃ** যেরূপ সম্পত্তির তৃতীয়াংশের বেশী অছিয়ত করা দুরুস্ত নাই, তেমনিভাবে রুগ্নাবস্থায় স্বীয় সম্পত্তির তৃতীয়াংশের অধিক নিজের নিতান্ত আবশ্যকীয় খরচ যেমন, খাওয়া-দাওয়া পথ্য ইত্যাদি ব্যতীত খরচ করাও জায়েয নাই। যদি এক তৃতীয়াংশের বেশী কাহাকেও দিয়া দেয়, তবে ওয়ারিসানদের অনুমতি ব্যতীত এরূপ দেওয়া ছহীহ্ হইবে না। তৃতীয়াংশের চেয়ে যতটুকু বেশী দিয়াছে ওয়ারিসানদের ফেরত লইবার এখতিয়ার আছে, আর না-বালেগ ওয়ারিস যদি এজাযত দেয়, তবুও ধর্তব্য (মো'তাবার) নহে। আর কোন ওয়ারিসের এক তৃতীয়াংশের মধ্য হইতেও দেওয়া অন্যান্য ওয়ারিসানদের অনুমতি ব্যতীত জায়েয নাই। এরূপ হুকুম এই অবস্থায় হইবে, যখন সে জীবদ্দশায় (রুগ্নকালে) দান করে এবং গ্রহীতা দখলও করিয়া লয়। আর যদি এরূপ হয় যে, দান তো করিয়াছে কিন্তু এখনও দখল হয় নাই, তবে মৃত্যুর পরে দেওয়া একেবারেই বাতেল, সে কিছুই পাইবে না। সকল সম্পত্তি ওয়ারিসানদের হক। রুগ্নাবস্থায় আল্লাহ্র রাস্তায় এবং নেক কাজে দান করারও এই হুকুম। মোটকথা, এক তৃতীয়াংশের বেশী কোন প্রকারেই খরচ করা জায়েয নাই।

১২। **মাসআলা ঃ** রুগ্ন ব্যক্তির কাছে খেদমতের জন্য কিছু লোক আসিল, কিছুদিন এখানে কাটিল। এখানেই থাকে, রোগীর সম্পত্তি হইতে খায়। এমতাবস্থায় যদি রোগীর খেদমতের জন্য তাহাদের থাকার আবশ্যক হয়, তবে কোন ক্ষতি নাই। আর যদি প্রয়োজন না হয়, তবে তাহাদেরও খাতিরদারী খাওয়া-দাওয়ায় এক তৃতীয়াংশের বেশী ব্যয় করা জায়েয নহে। আর যদি রোগীর সেবা ও খেদমতের আবশ্যকও না হয় এবং তাহারা ওয়ারিস হয়, তবে তৃতীয়াংশের কমও ব্যয় করা জায়েয নাই। অর্থাৎ, রুগ্ন ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে ওয়ারিস মেহ্মানদের খাওয়া জায়েয নাই। অবশ্য যদি সকল ওয়ারিসগণ খুশী হইয়া অনুমতি দেয়, তবে জায়েয হইবে।

১৩। **মাসআলা ঃ** যে রোগে মরিয়াছে, সেই রোগ-শয্যায় অন্যের নিকট তাহার প্রাপ্য মাফ করার এখতিয়ার তাহার নাই। যদি ওয়ারিসেরা কোন ঋণ মাফ করিয়া দেয়, তাহাও মাফ হইবে না। যদি সকল ওয়ারিস এই মাফ মঞ্জুর করে এবং সকলে বালেগ হয়, তবে মাফ হইবে।

আর যদি ওয়ারিস ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহার দেনা মাফ করিয়া দেয়, তবে সমস্ত সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ মাফ হইবে, তাহার বেশী মাফ হইবে না। স্ত্রী যদি মৃত্যুকালে নিজে মহর মাফ করিয়া দেয়, এই মাফ করা ছহীহ্ হইবে না।

১৪। **মাসআলা ঃ** গর্ভাবস্থায় প্রসব-ব্যথা শুরু হওয়ার পর যদি কাহাকেও কিছু দেয় কিম্বা মহরানা ইত্যাদি মাফ করিয়া দেয়, তবে ইহার হুকুমও মৃত্যু রোগে দান করার হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ, খোদা না খাস্তা যদি ঐ প্রসবাবস্থায় মারা যায়, তবে তো অছিয়তের মধ্যে গণ্য হইবে, অর্থাৎ, ওয়ারিসের জন্য কিছুই জায়েয নাই। আর ওয়ারিস না হইলে এক তৃতীয়াংশের বেশী

দেওয়া কিংবা মাফ করিয়া দেওয়ার এখতিয়ার নাই। অবশ্য যদি নিরাপদে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে এখন ঐ সমস্ত দেওয়া লওয়া এবং মাফ করা ছহীহ্ হইয়া গেল।

১৫। মাসআলাঃ মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি হইতে দাফন-কাফন করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে সর্বপ্রথম তাহার ঋণ শোধ করা চাই, অছিয়ত করুক বা না করুক। সর্বাবস্থায় সর্বাগ্রে ঋণ শোধ করিতে হইবে। বিবির মহরানাও ঋণের অন্তর্ভুক্ত। যদি কর্জ না থাকে কিম্বা কর্জ শোধ করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকে, তখন দেখিতে হইবে যে, অছিয়ত করিয়াছে কি না, যদি অছিয়ত করিয়া থাকে, তবে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হইতে পরিশোধ করা হইবে। যদি অছিয়ত না করিয়া থাকে, অথবা অছিয়ত পরিশোধ করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা সবই ওয়ারিসগণের হক। কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহার অংশ তাহাকে দেওয়া কর্তব্য। বর্তমানে যে দস্তুর আছে, যে যাহাকিছু হাতে পাইল হস্তগত করিল ইহা সাংঘাতিক গোনাহ্। এখানে না দিলে কিয়ামতের দিন দিতে হইবে। সেখানে টাকার বিনিময়ে নেকী দিতে হইবে। এইরূপে মেয়েদের অংশও তাহাদিগকে দিতে হইবে। শরীঅত অনুযায়ী তাহাদেরও হক আছে।

১৬। মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে লোকদের মেহমানদারী, আগন্তুকদের খাতিরদারী, খাওয়ান-দাওয়ান, ছদকা-খয়রাত ইত্যাদি কিছুই জায়েয নাই। এমনিভাবে মৃত্যুর পর হইতে দাফন কার্য সম্পাদন পর্যন্ত যাহাকিছু চাউল ডাল ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে দান করাও হারাম। ইহাতে মৃত ব্যক্তির জন্য কোন ছওয়াবই পৌঁছিবে না; বরং ছওয়াব মনে করা কঠিন গোনাহ্। কেননা এই সম্পত্তি তো এখন ওয়ারিসদের হইয়া গেল, অন্যের হক নষ্ট করিয়া দান করা, অন্যের মাল চুরি করিয়া দান করার ন্যায়। সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া উচিত। তারপর তাহাদের এখতিয়ারে নিজ নিজ অংশ হইতে ইচ্ছা করিলে শরীঅত সম্মতভাবে কিছু দান-খয়রাত করিতে পারে বা নাও করিতে পারে; বরং ওয়ারিসগণের নিকট হইতে (বন্টনের পূর্বে) খরচ করা বা দান-খয়রাত করার জন্য অনুমতিও লওয়া উচিত নাহে। কেননা, অনুমতি লইতে গেলে বদনামির ভয়ে শুধু মুখে মুখে অনুমতি দেয়, অন্তরে দেয় না এরূপ অনুমতির কোনই মূল্য নাই।

১৭। মাসআলাঃ এমনিভাবে যে প্রথা আছে, মৃত ব্যক্তির ব্যবহারের কাপড়-চোপড় খয়রাত করিয়া দেয়। ইহাও ওয়ারিসদের বিনানুমতিতে কিছুতেই জায়েয নাই। আর যদি ওয়ারিসানদের কেহ নাবালেগ হয়, তবে এজাযত দিলেও জায়েয হইবে না। আগে ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিবে, অতঃপর বালেগ ওয়ারিসগণ স্বীয় অংশ হইতে যাহা ইচ্ছা দিয়া দিতে পারে। ভাগ করা ব্যতীত কখনও দিবে না।

ফারায়েযের অংশ (মূল কিতাবে নাই)

১। মাসআলাঃ মানুষ মরিয়া গেলে হুকুমতের কর্তব্য বিশ্বস্ত লোক দ্বারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে যার যা হক আছে তাহা তাহাদের দিয়া দেওয়া। বিশেষতঃ শান্তিপ্রিয় দুর্বলের সাহায্যের জন্যই হুকুমত। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনই হুকুমতের প্রথম ফরয। হুকুমত যদি তাহাদের কর্তব্য পালন নাও করে, তবুও সমাজের জনসাধারণের তাহাদের ফরয আদায় করিতেই হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** নিম্নে বর্ণিত তিন প্রকার লোক মীরাস পাইবে না—(১) যদি কেহ কাহাকেও কতল করিয়া থাকে, তবে সেই কাতেল মাকতুল ব্যক্তির কোন মীরাস পাইবে না। (২) যদি (নাউযু বিল্লাহ্) দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে বা ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যায়, তবে সে মীরাস পাইবে না। (৩) কেহ যদি বে-দ্বীন কাফির অবস্থায় থাকে, সে মুসলমানদের মীরাস পাইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** ওয়ারিস তিন প্রকার হয়—(১) যবিল ফুরূয—অর্থাৎ যাহাদের অংশ কোরআন শরীফে নির্ধারিত আছে। (২) আছাবা—অর্থাৎ যাহাদের অংশ ঐ ভাবে নির্ধারিত নাই বটে, কিন্তু যবিল ফুরূযদের অংশ নেওয়ার পর যাহাকিছু অবশিষ্ট থাকিবে, সবই এই আছাবারা পাইবে। আছাবা হামেশা পুরুষ হইবে; যেমন ছেলে, পোতা, বাপ, দাদা, চাচা, ভাতিজা ইত্যাদি অথবা মেয়েলোক হইলে পুরুষের সঙ্গে বা পুরুষের মাধ্যমে তাহার যোগাযোগ হইবে, যেমন ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতি। যবিল আরহাম—ইহারা হামেশা মেয়েলোক হইবে, আর পুরুষ হইলে কোন মেয়েলোকের মাধ্যমে তাহার যোগাযোগ হইবে, যেমন নানা, নানী ইত্যাদি।

৪। **মাসআলা ঃ** কোরআন শরীফে ৮ জন মেয়েলোক এবং ; ৪ জন পুরুষের জন্য অংশ নির্ধারিত আছে। ইহাদের অংশ আগে দিতে হইবে। তারপর অবশিষ্ট থাকিলে তাহা আছাবাদিগকে দিতে হইবে, আছাবাদের নিয়ম এই যে, নিকটবর্তী থাকিলে দূরবর্তী পাইবে না। তারপর দুই সম্পর্কওয়ালা এক সম্পর্কওয়ালা অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে এবং বেটা অগ্রগণ্য হইবে বাপের উপর।

যবিল ফুরূযদের তফছীল

১। **মা**—১/৬ অংশ পাইবে, যদি মাইয়েতের সন্তান থাকে অথবা ভাই-বোনের দুইজন থাকে; ১/৩ অংশ পাইবে, যদি সন্তান না থাকে অথবা ভাই-বোনের দুইজন না থাকে।

২। **বাপ**—১/৬ অংশ পাইবে, যদি মৃতের ছেলে থাকে বা ছেলের ছেলে থাকে। যদি মৃতের ছেলে বা ছেলের ছেলে না থাকে, শুধু মেয়ে থাকে বা পুতী থাকে, তবে বাপ অবশিষ্ট সব পাইবে।

৩। **দাদা**—বাপ থাকিলে দাদা কিছুই পাইবে না, বাপ না থাকিলে দাদা ১/৬ অংশ পাইবে।

৪। **দাদী-নানী**—মা থাকিলে দাদী বা নানী কেহ কিছু পাইবে না। বাপ-মা কেহ যদি না থাকে, আর দাদী, নানী উভয়ে থাকে, তবে ১/৬ অংশ দাদী ও নানী দুইজনে সমান ভাগ করিয়া নিবে। নানা যবিল ফুরূযও নহে আছাবাও নহে। যদি যবিল ফরূযের মধ্যে কেহ না থাকে, আর আছাবার মধ্যেও কেহ না থাকে, তবে যবিল আরহাম হিসাবে হয়ত নানা কিছু পাইতে পারে, নতুবা নহে।

৫। **স্ত্রী**—১/৮ অংশ পাইবে যদি মৃতের এই স্ত্রীর পক্ষের বা অন্য পক্ষের বেটা বা বেটি বা বেটার ঘরের বেটা বা বেটি কোন সন্তান থাকে। আর যদি এরূপ কোন সন্তান না থাকে, তবে স্ত্রী পাইবে ১/৪ অংশ । স্ত্রী যদি একাধিক থাকে, তবে যে কয়জন থাকিবে তাহারা ঐ ১/৮ বা ১/৪ অংশ সমান ভাগ করিয়া নিবে।

৬। **স্বামী**—সন্তান থাকিলে (চাই এ স্বামীর ঔরসে হউক, চাই পূর্বের স্বামীর ঔরসের ছেলে বা মেয়ে হউক) স্বামী পাইবে ১/৪ অংশ, আর সন্তান না থাকিলে স্বামী পাইবে ১/২ অংশ।

৭। **কন্যা**—পুত্র না থাকা অবস্থায় এক কন্যা থাকিলে সে ১/২ অংশ পাইবে, একাধিক কন্যা হইলে যে কয়জন হইবে, সকলে এক সাথে ২/৩ অংশ পাইবে। আর যদি পুত্র থাকে, তবে প্রতি পুত্র প্রতি কন্যার দুই গুণ—এইভাবে ভাগ করিবে।

৮। পুত্নী—বেটা-ছেলে থাকিলে পোতা-পুত্নীরা কেহ কিছু পাইবে না। আর বেটা ছেলে না থাকিলে পোতা পুত্নীরা পাইবে। বেটা ছেলে এবং পোতার কোন অংশ নির্ধারিত নাই। বেটা-ছেলে থাকিলে যবিল ফুরূযদের অংশ দেওয়ার পর যাহাকিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সবই পাইবে। আর বেটা-ছেলে কেহ না থাকিলে পোতা-পুত্নীরা বেটার কায়েম-মোকাম হইবে অর্থাৎ আছাবা হিসাবে পাইবে।

৯। ভগ্নী—ভগ্নী তিন প্রকার—(১) মা-শরীক ভগ্নী, (২) বাপ-শরীক ভগ্নী এবং (৩) মা ও বাপ উভয় শরীক হাকীকী ভগ্নী।

(১) মা-শরীক ভগ্নী বা ভাই একজন থাকিলে ১/৬ অংশ পাইবে আর একাধিক থাকিলে সকলে মিলিয়া ১/৩ অংশ পাইবে। এখানে ভাই ও ভগ্নীর সমান অংশ হইবে। মৃতের সন্তান থাকিলে বা বাপ-দাদা থাকিলে মা-শরীক ভাই-ভগ্নীরা কেহই কিছু পাইবে না।

(২) বাপ-শরীক ভগ্নী—আপন হাকীকী ভগ্নীরই মত। কিন্তু মাইয়েতের আপন হাকীকী ভাই থাকিলে, বাপ-শরীক ভাই-বোনেরা কেহ কিছু পাইবে না।

(৩) মা ও বাপ-শরীক ভগ্নী—মাইয়েতের বেটা ছেলে থাকিলে বা পোতা থাকিলে অথবা বাপ থাকিলে আপন হাকীকী ভগ্নীরা বা ভাইরাও কেহ কিছু পাইবে না। যদি মাত্র এক মেয়ে থাকে, তবে সেই মেয়ে পাইবে ১/২ অংশ আর ভগ্নী পাইবে ১/৬ অংশ। আর যদি দুই বা ততোধিক মেয়ে থাকে আর ভাই-ভগ্নী থাকে, তবে মেয়েরা পাইবে ২/৩ অংশ; ভাই-ভগ্নী বাকী ১/৩ অংশ পাইবে (কিন্তু ভাইকে ভগ্নীর দুইগুণ—এই হিসাবে ভাগ করিতে হইবে)।

(প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আমাদের ইমাম আ'যম ছাহেব ৮৩ হাজার আইন [মাসআলা] কোরআন হাদীস হইতে বাহির করিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩৮ হাজার মাত্র ইবাদত বন্দেগী সম্বন্ধে এবং বাকী ৪৫ হাজার অর্থনীতি এবং রাজনীতি সম্বন্ধে।

এখানে সহজ সরল কতকগুলি মাসআলা বা শরীঅতের আইন অতি সংক্ষেপে শুধু সর্বসাধারণের জন্য লেখা হইয়াছে। অনেক জটিল এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আইন রহিয়াছে, যেগুলি বড় বড় কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যখন যে ঘটনা সামনে পেশ আসে সে সম্পর্কে আপনারা সব সময়ই মাসআলা বা শরীঅতের আইন সম্বন্ধে মোহাক্কেক আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সে অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং সামাজিক জীবন পরিচালিত করিবেন। যার-তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করিবেন না; অবার না জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের মনগড়া মত কাজ করিবেন না। অন্ততঃপক্ষে যে আলেম ছাহেব পূর্ণ জালালাইন শরীফ দুই জিলদ আদ্যোপান্ত, পূর্ণ মিশ্‌কাত শরীফ দুই জিল্‌দ আদ্যোপান্ত এবং পূর্ণ হেদায়া চারি জিলদ আদ্যোপান্ত আসল আরবী ভাষায় কোন কামেল ওস্তাদের নিকট ইবারতসহ বুঝিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিবেন। উহা অপেক্ষা কম এলেম হইলে তাহাকে আলেম বলা যায় না।)

॥ পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

ষষ্ঠ খণ্ড (উপক্রমণিকা)

সমাজ ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সমাজের প্রচলিত কুপ্রথার সংশোধন

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এমন একটি জাতিরূপে গঠন করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদিগকে এমন একটি ধর্ম-শরীঅত তথা আদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থা দান করিয়া গিয়াছেন যাহা সর্বদিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই জন্যই তিনি সমাজ ব্যবস্থায় অন্য জাতির অনুকরণ (পরানুকরণ) করিতে এবং নিজেদের মধ্যে হীনতা নীচতা (Inferiority Complex) আনিতে আমাদিগকে অতি কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। হাদীস শরীফে আছেঃ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ইহার মর্ম এই যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা একথা উত্তমরূপে জানিয়া রাখ যে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যদি তোমরা অন্য কোন বিজাতির অনুকরণ কর, তবে যে যেই জাতির অনুসরণ করিবে, সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। কোরআন শরীফে আছেঃ وَلَاتَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ইহার মর্মার্থ এই যে, "হে মুসলমানগণ; তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ যে, যাহারা নিজেদের উপর নিজেরা যুলুম করিয়া আল্লাহ্‌কে এবং আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিনিধিকে অস্বীকার করিয়া কাফের হইয়াছে তাহাদের দিকে তোমরা ঝুকিও না; অর্থাৎ, তাহাদের অনুকরণ অনুসরণ করিও না বা নিজেদের ধর্মকে এবং আদর্শকে হীন মনে রাখিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বকে মনে স্থান দিও না; যদি তোমরা তদ্রূপ কর, তবে তোমাদের দোযখের আযাব ভোগ করিতে হইবে—একথা ভালরূপে জানিয়া রাখিও।" মানুষ অন্যের অনুসরণ করে না, যাবৎ সে অন্যের সেই আদর্শকে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দরতম মনে না করে। অতএব, যাহারা মুসলিম জাতির মেম্বর এবং মুসলিম সমাজের সভ্য হওয়া সত্ত্বেও অন্য জাতির অনুকরণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নির্ভুল নীতিকে এবং রাসূলের শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম আদর্শের অবমাননা করিয়াছে, কাজেই দুনিয়াতে এবং আখেরাতে তাহাদের আযাব ভোগ করিতে হইবে। এই জন্য যে-সব মুসলমানের অন্য জাতির সঙ্গে মেলা-মেশা ও উঠা-বসার প্রয়োজন হয়, তাহাদের জন্য উভয় জাতির সমাজ ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণের একান্ত প্রয়োজন আর যাহাদের অন্য জাতির সঙ্গে মেলা-মেশা ও উঠা-বসার দরকার না হয় বা সুযোগ না ঘটে, তাহারা যদি শুধু নিজেদের ধর্মের ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা জানিয়া তদ্রূপ জীবন যাপন করে, তবে তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। এই যুগের মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এবাদত-বন্দেগী,

ধর্ম-বিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থার ন্যায় ইসলামের সমাজ ব্যবস্থাও সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য, প্রত্যেক ব্যাপারে নিজেদের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা জানিয়া তদনুযায়ী সমাজ জীবন যাপন করা। পরানুসরণ করা বা নিজেদের সমাজ ব্যবস্থার প্রতি হীনতাবোধ আনয়ন করা কোন মুসলমানের পক্ষে কিছুতেই উচিত নহে। অন্যথায় তাহাদের পতন ও ধ্বংস অনিবার্য। হযরত মাওলানা থানভী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহে তাঁহার যমানায় এবং তাঁহার সময়ের কুসংস্কারগুলির সংশোধন লিখিয়াছেন। আমি তাঁহার কথাগুলির অনুবাদ করি নাই; বরং তাঁহারই অনুকরণে তাঁহারই কথাগুলি অবলম্বনে বর্তমান যুগের কু-সংস্কারগুলির সংশোধন লেখার চেষ্টা করিয়াছি।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আনিয়া আমাদিগকে এমন কতকগুলি সধারণ সূত্র এবং মাপকাঠি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যাহা দ্বারা সেই শিক্ষায় অভিজ্ঞগণ নব প্রচলিত কার্যগুলির কোন্‌টি অনুমোদনযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌টি অননুমোদনীয় ও গ্রহণের অযোগ্য তাহা বাছাই করিয়া দেখিতে পারেন। কাজেই যে সমস্ত প্রথা সে যমানায় ছিল না, পরবর্তী যুগে চালু হইয়াছে, ইহাদিগকে সেই মাপকাঠি দ্বারা মাপিয়া গ্রহণ বা বর্জন করিতে হইবে।

আল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র রাসূল যে কার্যকে 'কর' বলিয়া স্পষ্টভাবে আদেশ করিয়াছেন, তাহাকে বলা হয় 'ফরয' এবং 'ওয়াজিব; আর যাহা করিও না বলিয়া স্পষ্টভাবে নিষেধ করিয়াছেন তাহাকে বলা হয় 'হারাম'। আর যাহা করিবার জন্য স্পষ্ট আদেশ করেন নাই, কিন্তু পছন্দ করিয়াছেন, উহাকে বলা হয়, 'মুস্তাহাব'। আর যাহা করিতে স্পষ্ট নিষেধ করেন নাই, কিন্তু না-পছন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে বলা হয়, 'মাক্‌রূহ'। তার মধ্যে আবার দুইটি স্তর আছেঃ যাহাকে বেশী পছন্দ করিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) এবং তাঁহার ছাহাবীগণ সব সময় আমল করিয়াছেন, উহাকে বলা হয় সুন্নৎ। আবার যে সুন্নতের জন্য তাকীদ পাওয়া গিয়াছে উহাকে বলা হয় সুন্নতে মুআক্কাদাহ্‌; আর যাহা বেশী না-পছন্দ করা হইয়াছে উহাকে সলফে ছালেহীন (প্রাচীন বুযুর্গগণ) সর্বদা বর্জন করিয়াই চলিয়াছেন। উহাকে বলা হয় 'মাক্‌রূহ তাহ্‌রীমী'। আর যাহা কম না-পছন্দ করা হইয়াছে উহাকে বলে, মাক্‌রূহ তান্‌যীহী' এবং যেটার বেলায় মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে—করা না করা তাহার ইচ্ছাধীন, সেটাকে বলা হয় 'মুবাহ্‌'। আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ, পছন্দ অপছন্দ জানার উপায় একমাত্র আল্লাহ্‌র কোরআন এবং আল্লাহ্‌র রাসূল। আর রাসূলের আদেশ-নিষেধ পছন্দ বা অপছন্দ জানিবার উপায় রাসূলের হাদীস এবং তাঁহার ছাহাবীগণের চালচলন বা জীবনযাপন পদ্ধতি।

আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল প্রদত্ত কোরআন ও হাদীসের এই মাপকাঠি দ্বারা যাঁহারা কোরআন ও হাদীসের অভিজ্ঞতা হাছিল করিয়া তদনুযায়ী জীবন গঠন করতঃ উহারই আলোচনা ও গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা দেশ প্রথাগুলিকে মাপিয়া বা যাছাই বাছাই করিয়া কোন্‌টা গ্রহণ করা উচিত এবং কোন্‌টা বর্জন করা উচিত তাহা বাতাইয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র নীতি অনুসারে যে নিখুঁত ও নির্ভুল আদর্শ আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শ ছাড়িয়া অন্য কোন জাতির বা ব্যক্তির আদর্শ গ্রহণ করা যে কিছুতেই উচিত নহে, তাহাও তাঁহারা তুলনামূলক বিশ্লেষণ দ্বারা আমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এখন সেগুলি এক একটি করিয়া আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, সমাজের আচার-ব্যবহার এবং দেশপ্রথা দুই প্রকার। এক প্রকার প্রথা এমন আছে যে, তাহার উপকারিতা অপকারিতা বা উহা খোদা রাসূলের আদেশকৃত বা অনুমোদিত কি না তাহার কিছুই দেখা যায় না শুধু অন্ধানুকরণ বা সমাজের বদ রসম বলা যায়। আর এক প্রকারের প্রথা এমন আছে, যাহা আল্লাহ্‌র আদেশ বা রাসূলের আদর্শে প্রচার করা হইয়াছে; তাহার প্রত্যেকটির মূলেই তাবলীগ আছে এবং আল্লাহ্‌ রাসূলের মধ্যে যোগাযোগ আছে। এগুলিকে রসম বলা যায় না, Tradition বা সংস্কারও বলা যায় না। কারণ এগুলির প্রত্যেকটিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেকটিই আধ্যাত্মিকতার সংগে সংশ্লিষ্ট। কাজেই এরূপ প্রথাকে প্রথা না বলিয়া সুন্নত কিম্বা গুরুত্ব বিশেষ ফরয বলা উচিত। কিন্তু মানুষ কোরআন হাদীসের সত্যিকার জ্ঞানের অভাবে অনেক সময় সত্যের সংগে মিথ্যা, কর্তব্যের সংগে অকর্তব্য বা সুন্নতের সংগে বেদআৎ মিশাইয়া ফেলে। সে সময় যাহারা প্রকৃতভাবে কোরআন হাদীসের জ্ঞানের আলোকের মালিক, তাঁহাদের উচিত মানুষের সুপথ দেখান ও কুপথ হইতে ফিরাইয়া রাখা।

শিশু পালন

আল্লাহ্‌ পাক যখন মানুষকে একটি সন্তান দান করেন, তখন সেই সন্তানের পিতা-মাতার উপর মস্ত বড় দায়িত্বের বোঝা চাপান হয়। সন্তানটি প্রকৃত প্রস্তাবে মা-বাপের কাছে আল্লাহ্‌র অতি বড় একটি আমনত। সন্তানের দেহকে পালন করা, দেহকে সুস্থ ও তন্দুরুস্ত রাখা যেমন মা-বাপের কর্তব্য এবং ফরয তদ্রূপ সন্তানের দেহ পালনের সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মার প্রতিপালনও মাতা-পিতার প্রতি অতি বড় একটি দায়িত্ব। সন্তানের স্থূল দেহকে এমনভাবে পালন করিতে হইবে, যাহাতে তাহার আত্মা বক্র বা বিকৃত হইয়া না যায়। শিশুর মস্তিষ্ক হইয়াছে ফটো তোলার ক্যামেরার মত। ক্যামেরার সামনে যেমন বাঁকা বা সোজা যাহাকিছু ধরা যায় তাহারই ফটো ঐ ক্যামেরাতে উঠে, তদ্রূপ শিশুর সামনে ভাল-মন্দ যেরূপ আচার-ব্যবহার কথাবার্তা বা আলোচনা করা হয়, যেরূপ সংসর্গ দান করা হয়, উহা সেইরূপই শিশুর মন-মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া যায়। অতএব, খুব সতর্কতা সহকারে শিশুর মন-মস্তিষ্ককে খারাব কথা, খারাব আচার-ব্যবহার খারাব সংসর্গ বা খারাব পরিবেশ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে—বাঁচাইতে হইবে তাহার দেহকে, তাহার চক্ষুকে বেশী ঠাণ্ডা হইতে, বেশী গরম হইতে বেশী পানি বাতাস হইতে বা বেশী তাপ ও রৌদ্র হইতে। প্রসূতি ও শিশু পালনের যে সমস্ত নিয়ম পদ্ধতি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ বলেন, সেই অনুযায়ী শিশুর পালন ও রক্ষণা-বেক্ষণ করা মাতা-পিতার মহান দায়িত্ব। মাতা-পিতার মৃত্যু হইয়া শিশু এতীম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এতীম পালনের দায়িত্ব ফারায়েয শাস্ত্রে বর্ণিত পর্যায় অনুসারে তাহার আছাবা জাতীয় আত্মীয়দের প্রতি বর্তিবে, তদভাবে সে দায়িত্ব যথাক্রমে সমাজের ও রাষ্ট্রে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন কথাবার্তা শিশুর কানে প্রবেশ করার পূর্বেই তাহার কানে আল্লাহ্‌র নাম প্রবেশ করান উচিত। ধাত্রী প্রসূতিকে সযত্নে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখিয়া, আউযুবিল্লাহ্‌, বিসমিল্লাহ্‌ পড়িতে পড়িতে শিশুকে ঈষদুষ্ণ পানি দ্বারা ধোয়াইয়া আঙ্গুল দিয়া আস্তে আস্তে মুখ পরিষ্কার করিয়া জলদি গা মোছাইয়া দিয়া কাঁথার মধ্যে লেপটাইয়া কোলে করিবে। এবং মহল্লায় কোন বুযুর্গ আলেম, ইমাম বা কোন নেক লোকের কোলে দিবে। তিনি স্বল্প আওয়াযে সুমধুর স্বরে শিশুর ডাইন কানের কাছে আযানের লফ্‌যগুলি বলিবেন এবং বাম কানের কাছে একামতের লফ্‌যগুলি বলিবেন। এইভাবে আযান একামত বলাকে 'তা'যীন' বলা হয়।

অতঃপর 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' বলিয়া স্বল্প মধু নিজের মুখে দিয়া পরে আঙ্গুল দিয়া শিশুর মুখে দিবেন। এইরূপে মধু দেওয়াকে 'তাহ্‌নীক' বলা হয়। তাহ্‌নীক যে মধুই হইতে হইবে তাহার কোন শর্ত নাই। উহার বদলে খোরমা বা অন্য কোন মিষ্টি জিনিস চিবাইয়া লালার মত করিয়া আঙ্গুল দ্বারা শিশুর মুখের ভিতরে তালুতে লাগাইয়া দেওয়া ভাল। তারপর স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পন্ডিত বা চিকিৎসকগণের নিয়ম নির্দেশ অনুযায়ী শিশুর স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হইবে। কিন্তু চিকিৎসকের এমন হওয়া দরকার যেন তিনি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে বিশেষতঃ প্রসূতি ও শিশু পালন সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—তাঁহার চরিত্রে যেন মিথ্যা বলার, নাপাক থাকার, নামায না পড়ার প্রভৃতি দোষ না থাকে। কারণ দূষিত চরিত্রের লোকের সামান্য সংসর্গেও মানুষের চরিত্র নষ্ট হইয়া থাকে। আজকাল মৌলভী ছাহেবগণ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিখে না, ইহা বড় আফসুসের কথা। আবার যাহারা ডাক্তারী পড়ে তাহাদের অনেকে রোযা নামায ছাড়িয়া দেয়, মিথ্যা কথা বলে, ধোঁকা দেয়, নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, হারাম হালালের ভেদ বিচার করে না। ইহাও সমাজের পক্ষে বড় বিপজ্জনক। সমাজকে এই আয়েব হইতে এবং এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতে হইবে।

জন্মের সময় শিশুর জন্য এত সুন্দর ব্যবস্থা, এত সুন্দর আদর্শ আমাদের ইসলাম ধর্মে আছে যে, অন্য কোন সমাজে এমন সুন্দর আদর্শ পাওয়া যাইবে না। আযান একামতের দ্বারা শিশুর অন্তরকে আল্লাহ্‌র যেকরের সঙ্গে সম্পর্কিত করিতে দেওয়ায় এবং প্রথমে মধু ভক্ষণের দ্বারা শিশুর যে কত উপকার হয় এবং কত বিপদ আপদের হাত হইতে সে রক্ষা পায়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

আকীকাহ

শিশুর বয়স যখন সাত দিন হইবে, তখন পিতার প্রতি কয়েকটি কাজ কর্তব্য হয়। সন্তানের জন্মের সপ্তম দিবসে—(১) তাহার মাথার চুল কামাইয়া দিতে হইবে। (২) চুলের ওজনের স্বর্ণ বা রূপা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের দ্বারা শিশুর জন্য দো'আ করাইতে হইবে। (৩) কোন নেক বুযুর্গ 'আলেমের দ্বারা দো'আ করাইয়া ভাল নাম রাখিতে হইবে। (৪) আকীকা করিতে হইবে। সন্তান বেটা ছেলে হইলে তার জন্য দুইটি বকরী বা খাসী যবাহ্‌ করিয়া আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও গরীব দুঃখীকে খাওয়াইয়া তাহাদের দ্বারা শিশুর জন্য দো'আ করাইতে হইবে, যাহাতে শিশু দীর্ঘজীবী হয়, ভাল স্বাস্থ্য পায় এবং নেক্‌বখ্‌তী (সৌভাগ্য) লাভ করিতে পারে। বকরীর পরিবর্তে গরু যবাহ করিলে তাহাও জায়েয হইবে। সমাজের যাহারা ধনী ও বড়লোক, সমাজের গরীবদের প্রতি সর্বদাই তাহাদের সহানুভূতি থাকিতে হইবে, যাহাতে গরীবগণ ভাত-কাপড় বা খাওয়া-পরার কষ্ট না পায় এবং অভাবে পড়িয়া তাহাদের স্বভাব নষ্ট না হয়। এইজন্য প্রতি ক্ষেত্রেই গরীবদের কথা স্মরণ করিতে হইবে। তাহাদের স্বভাব-চরিত্র যাহাতে ভাল হয়, সেজন্য তাহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু গরীবই ধনীদের টাকার মুখাপেক্ষী নহে, ধনীরাও গরীবদের দো'আর মুখাপেক্ষী; উভয়ে উভয়ের মুখাপেক্ষী, কেহ কাহারো অপেক্ষা বড় বা অমুখাপেক্ষী (বেনিয়ায) নহে। এই সহানুভূতি সমাজের ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীর মধ্যে জাগাইতে হইবে, যাহাতে ধনীদের মধ্যে অহঙ্কার না ঢুকে এবং গরীবদের মধ্যে প্রতিহিংসা এবং মনঃকষ্ট ও হীনতাবোধ না ঢুকে।

বিস্‌মিল্লাহ্‌ শুরু করা ও মক্তবে পাঠান

যখন শিশুর বয়স প্রায় ৫ বৎসর হইবে, তখন শিশুকে কোন নেক বুযুর্গ আলেমের দ্বারা দো'আ করাইয়া বিস্‌মিল্লাহ্‌ শুরু করাইয়া মক্তবে পাঠাইতে হইবে। মক্তবের মু'আল্লিমকে নেক, চরিত্রবান এবং শিশু মনস্তত্ত্বের জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ হইতে হইবে। ৮/৯ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলে এবং মেয়ে এক সঙ্গে পড়িতে পারিবে। মক্তবের মু'আল্লিম শিশুদিগকে মিষ্ট ভাষায় মধুর ব্যবহারে এত আদর করিয়া সবক নিবেন ও দিবেন যেন শিশুরা বাড়ীতে থাকার চেয়ে মক্তবে আসিতে বেশী ভালবাসে। আদরে ও মিষ্ট ভাষায় যে কাজ হইবে, কঠোরতায় ও কর্কশ ভাষায় সে কাজ কখনও হইবে না। মক্তবে ওস্তাদ ছাহেব শুধু হরফ এবং হেজ্জে পড়া ও লেখাই শিক্ষা দিবেন না ; বরং তাহাদিগকে আস্তে আস্তে আদব-আখলাকও শিক্ষা দিবেন। জরুরী জরুরী দো'আ কালাম শিক্ষা দিবেন এবং হাতে ধরিয়া ওযূ নামায, আদব-কায়দা ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন। শিশুর পিতামাতা মক্তবের ওস্তাদকে অবহেলা করিবেন না ; বরং প্রাণের সহিত ভালবাসিবেন এবং ভক্তি করিবেন। কারণ মা-বাপের ভক্তি দেখিয়া ছেলেও ওস্তাদকে-ভক্তি করিবে এবং আদব-কায়দা শিখিবে। ওস্তাদ-ভক্তি ব্যতিরেকে ছেলের 'এলম হয় না এবং ছেলের যেহেন খোলে না।' ওস্তাদ কখনও টাকার লোভী হইবেন না। তিনি বেশীর ভাগ খেয়াল এই দিকে রাখিবেন যাহাতে ছেলেটি মানুষ হইতে পারে। একটি মানব-সন্তানকে 'এবাদত বন্দেগী শিখাইয়া সুন্দর স্বভাব গঠন করিয়া মা-বাপ ও মুরুব্বিয়ানদের প্রতি আদব-তমীয শিক্ষা দিয়া মানুষ বানাইয়া দিতে পারিলে আখেরাতে আল্লাহ্‌র কাছে কত নেকী আর কত বড় দর্জা ও সম্মান পাওয়া যাইবে, ওস্তাদের সেই খেয়াল রাখাই বেশী উচিত।' দুনিয়ার টাকা পয়সার লোভ করা ভাল নহে ; টাকা-পয়সার লোভ করিলে আলেমের কদর মর্যাদা থাকে না। মা-বাপ খেয়াল রাখিবে ওস্তাদের প্রতি এবং ওস্তাদ খেয়াল রাখিবে মা-বাপের প্রতি। মা-বাপের সম্মান ও আদব করা এবং তাঁহাদের খেদমত করা শিক্ষা দিবে ওস্তাদ। আর ওস্তাদের আদব করা ও তাঁহার খেদমত করা শিক্ষা দিবে মা-বাপ। এইরূপে মা-বাপ ও ওস্তাদ উভয়ে মিলিয়া শিশুর জীবন গঠন করিতে হইবে। ওস্তাদ দৈনিক শিশুর পিছনের সবক শুনিয়া ভালমত ইয়াদ করাইয়া তারপর সামনের সবক দিবেন ; যাহাতে পিছনের পড়া ভুলিয়া না যায় বা ইয়াদ কাঁচা না থাকে, সেদিকে ওস্তাদকে খেয়াল রাখিতে হইবে। তিনি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাও শিক্ষা দিবেন। ছেলে প্রথমে অমিশ্র হরফ লিখিবে, তারপর মিশ্র হরফ লিখিবে। তারপর মানুষের নাম, জায়গার নাম ইত্যাদি লিখিবে, ইহার পর এবারত দেখিয়া লিখিবে, তারপর শুনিয়া লিখিবে। অতঃপর চিঠিপত্র, দলিল, দরখাস্ত প্রভৃতি লিখিবে তারপর তরজমা লিখিবে ; ইহার পর রচনা লিখিবে। অতঃপর বিস্তারিতকে সংক্ষেপে এবং সংক্ষিপ্তকে বিস্তারিত করিয়া লিখিবে। সঙ্গে সঙ্গে হিসাব লেখা ও অঙ্ক কষা শিক্ষা করিবে।

শৈশবেই যদি শিশুকে আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে শেষে আর সন্তানের চরিত্র গঠন করা যায় না। কথায় বলে—"কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, শেষে করে ঠাস ঠাস," অর্থাৎ কচি বয়সে শিশুকে ধর্মোপদেশ শিক্ষা দিয়া অভ্যাসগত করাইয়া না দিলে শেষে আর ছেলেকে ভাল বানানো যায় না।

বিস্‌মিল্লাহ্‌ শুরু করাইতে সাধারণতঃ লোকে কিছু মিঠাই খাওয়ানের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। এইরূপে শিশু যখন কোরআন শরীফ শুরু করে বা কোরআন শরীফ খতম করে, তখনও ওস্তাদকে কিছু বখশিশ দেয় বা কিছু মিঠাই খাওয়ায়। এরূপ করা বেদআ'ত নহে; বরং এর দ্বারা কোরআনের তা'যীম করা হয় এবং ইহাতে ছেলের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা দরকার। ওস্তাদের উচিত লোভ না করা, শাগরিদের উচিত প্রাণপণে ওস্তাদের যথাসাধ্য খেদমত করা। ওস্তাদকে মাহিনার কর্মচারী মনে করা উচিত নয়। ওস্তাদকে অবশ্য অবশ্য অত্যন্ত ভক্তির পাত্র মনে করিতে হইবে। অন্যথায় কখনও এল্‌ম হাছিল হইবে না।

নামাযের অভ্যাস

ছেলে বা মেয়ের বয়স যখন ৭ বৎসর হইবে তখন হইতে ছেলেমেয়েদিগকে ভালবাসা দিয়া আদর পেয়ার করিয়া নামাযের অভ্যাস করাইতে হইবে। অত্যন্ত সুকৌশলে আদর-যত্ন করিবে, মহব্বত দেখাইয়া পুরস্কার দিয়া সুপরিবেশে রাখিয়া যেভাবেই হউক দশ বৎসরের মধ্যে ছেলেমেয়েদিগকে নামাযে অভ্যস্ত করাইতেই হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, সবচেয়ে বড় কৌশল এবং বড় হেকমত হইতেছে ছেলেমেয়েদেরকে সুপরিবেশে রাখা।

ছেলেমেয়েদের বয়স যখন ৯/১০ বৎসর হইবে, তখনই তাহাদের বিছানা পৃথক করিয়া দিতে হইবে। এমনকি, তখন নিজেদের ছেলেমেয়েদিগকেও দুইজনকে এক বিছনায় শুইতে দিবে না। এ ছাড়া ৭/৮ বৎসরের হইলে বালক-বালিকাদিগকে একত্রে স্কুলে পড়িতে দিবে না। আর দশ বৎসর বয়সের ভিতর উপরোক্ত কৌশল সত্ত্বেও নামাযের অভ্যাস পাকা না হইয়া থাকিলে কিছু কঠোরতা করিয়া এমনকি প্রহার করিয়া বা শাস্তি দিয়া হইলেও নামাযের অভ্যাস করাইতে হইবে।

খাৎনা

ছেলের বয়স যখন ৭/৮ বা ৯/১০ বৎসর হইবে, তখন তাহার খাৎনা করাইতে হইবে। খাৎনা করা শুধু একটা প্রথা মাত্রই নয়, ইহা ইসলাম ধর্মের বড় একটি সুন্নত। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌ সালামের উপর আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ১০টি সুন্নত পালন করার জন্য ওহী আসিয়াছিল, যথা—

১। খাৎনা করান।
২। পেশাব-পায়খানা করার পর পানি দিয়া ধৌত করা।
৩। কুলি করিয়া মুখ পরিষ্কার করা।
৪। মিস্‌ওয়াক করিয়া দাঁত পরিষ্কার করা।
৫। নাকে পানি দিয়া, নাকের পশম বড় হইতে না দিয়া নাক পরিষ্কার রাখা।
৬। বগলের পশম বড় হইতে না দিয়া বগল পরিষ্কার রাখা।
৭। নাভির নীচে পশম হইলে তাহা মুণ্ডাইয়া (কামাইয়া) ফেলিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
৮। দাড়ি হইলে দাড়ি লম্বা করিয়া রাখা।
৯। মোচ কাটিয়া খাট করিয়া রাখা।
১০। হাত পায়ের নখ কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা।

খাৎনা করার সময় অনেকে অনেক রকম আড়ম্বর করিয়া থাকেঃ শরীঅতে উহার কোন হুকুম নাই। অনেকে রসম করার টাকা যোগাড় করিতে পারে না বলিয়া ছেলের বয়স অধিক হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও খাৎনা করায় না। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। শরীঅতে যেটাকে জরুরী সাব্যস্ত করিয়াছে, শুধু সেইটাকেই জরুরী মনে করা উচিত। শরীঅতের নির্দেশ ছাড়া অতিরিক্ত রসম পালন করার চাপ দেওয়াও অন্যায় এবং রসমের জন্য যে বয়সের যে কাজ সেই বয়েসে সেই কাজ না করিয়া ছেলের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া অন্যায়। মেয়ের খাৎনা করার প্রচলন আমাদের দেশে নাই বটে, কিন্তু মেয়ের খাৎনা করাও মুস্তাহাব। অবশ্য ছেলের খাৎনা করান সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। ছেলের খাৎনা করান ইসলাম ধর্মের একটি গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ। খৃষ্টান ধর্মে ও হিন্দুদের ধর্মে এই সুন্দর আদর্শ নাই।

১০/১১ বৎসর বয়স হইতেই ছেলেমেয়েদেরকে রমযানের রোযার কিছু কিছু অভ্যাস করান উচিত। এ সময়ে তাহাদিগকে শওক দেলাইতে হইবে এবং তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করিতে হইবে; আদেশ বা কঠোরতা করিতে হইবে না। কঠোরতা তখনই করিতে হইবে, যখন বালেগ হওয়া সত্ত্বেও রোযা না রাখিবে। ৭ বৎসরের আগে যেরূপ নামাযের জন্য বলা চাই না, তদ্রূপ ১২ বৎসরের আগে রোযার জন্যও বলা চাই না। ১২ বৎসর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের পড়ার সময় আদায় করিয়া কিছু সময় (আছরের পরের সময়ে) দৌড়াদৌড়ি করিতে ও খেলিতে দেওয়া উচিত। তাহাদিগকে শুধু পড়ার মধ্যে না লাগাইয়া রাখিয়া কিছু কিছু কাজেরও অভ্যাস করান উচিত, যাহাতে মনে স্ফূর্তি থাকে এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

বালেগ হওয়া

ছেলের যখন স্বপ্নদোষ হয়, তখন সে বালেগ হয়। আর মেয়ের যখন ঋতু আসে, তখন সে বালেগা হয়। আর যদি বয়স ১৫ বৎসর হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও মেয়ের ঋতু না আসে বা ছেলের স্বপ্নদোষ না হয়, তবে চাঁদের হিসাবে জন্মদিবস হইতে যেদিন ১৫ বৎসর পূর্ণ হইয়া যাইবে, তার পরদিন হইতেই ছেলে বা মেয়েকে শরীঅতের হুকুমে বালেগ বলিয়া গণ্য করা হইবে। আর এই সময় হইতেই নামায, রোযা, ওযূ গোসল, রুযী-রোযগার ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্বই তাহাদের ঘাড়ে চাপিবে।

সংযমের অভ্যাস

যৌবনের প্রারম্ভের সময়টা বড়ই বিপজ্জনক। এই সময়ে রীতিমত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, যৌন-ক্ষুধা জাগিয়া অনেক মানুষকে বিপথগামী করিয়া ফেলে। একে ত ছেলেদের থাকে না অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয়তঃ শরমের দরুন তাহাকে উপদেশ দেওয়া বা শিক্ষা দেওয়ারও কেহ থাকে না। আর উপদেশ চাওয়ারও সাহস বা সুযোগও তাহার নিজের হয় না। অথচ যৌবনের যৌন-প্রেরণাকে সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিলে, মানুষের জীবন সবদিক দিয়াই পঙ্গু হইয়া যায়। পাপের বোঝা মাথায় চাপে, স্বভাব নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য খারাব হয়, সম্পদও ধ্বংস হয়। কারণ, শরীরের বীর্যই মানবদেহের রাজা, ইহা হইতেই মানুষ সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক কিছু তৈয়ার করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, যে জিনিসকে সমস্ত বৈজ্ঞানিকগণ মিলিয়াও সৃষ্টি করিতে পারেন না, ঐ

জিনিস যে জিনিস দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয়, তাহা কত মূল্যবান এবং কত দামী এবং সেই জিনিসকে নষ্ট বা অপচয় করা কত বড় মহাপাপ।

হাদীস শরীফে আছেঃ اَلشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْجُنُوْنِ ইহার মর্মার্থ এই যে, যৌবনের ঢেউ উন্মত্ততার ঢেউ সদৃশ। অতএব, এই ঢেউকে সুসংযত করিয়া রাখার জন্য এবং এই ঢেউয়ের মধ্য দিয়া জীবন তরীকে তরাইয়া নেওয়ার জন্য, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। প্রবীণ বয়স্ক কোন মুরব্বীর দ্বারা যৌবনে পদার্পণকারী বালকদিগকে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উপদেশ দেওয়া দরকার যে, এই বয়সে শরীরের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সুন্দর মেয়ে বা সুন্দর বালক দেখিতে ইচ্ছা হয়, বা তাহাদিগকে কাছে রাখিতে বা তাদের কথা শুনিতে মনে চায়। এমন কি নিজের শরীরের বিশিষ্ট অংগকে দেখিতে, স্পর্শ করিতে এবং হাত পা দিয়া ঘর্ষণ করিতে মন চায়—মনের এই চাহিদাগুলি সবই পাপ—বড় পাপ—এমন পাপ যে, তার আর 'তদারক' হইতে পারে না। এই প্রকার পাপের দ্বারা ভবিষ্যতে জীবন এমনভাবে নষ্ট হয় যে, জীবনে তাহার আর প্রতিকার হইতে পারে না। অতএব, মনের এই ধরনের চাহিদার সময় মনকে এবং দেহকে চাপিয়া, জোর জবরদস্তি করিয়া সংযত রাখিতেই হইবে। ইহাকেই বলা হয় সংযম অভ্যাস। যতবারই এইরূপ চাহিদা মনের ভিতরে জাগিবে, ততবারই সংযম অভ্যাসের দ্বারা মন ও দেহকে সংযত করিয়া রাখিবে এবং যথাসম্ভব কুসংসর্গ বর্জন করিবে। সাপের সংসর্গ গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তবুও কুসংসর্গ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ সাপের দ্বারা হয়ত মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবন ধ্বংস হয়। কিন্তু কুসংসর্গের দ্বারা মানুষের চিরস্থায়ী জীবন ধ্বংস হয়। আর মনে রাখিতে হইবে, এই রকম বালকদিগকে এক বিছানায় কিছুতেই শুইতে দেওয়া উচিত নয়। এমন কি নির্জন কামরাতেও তাহাদিগকে একত্রে থাকিতে দেওয়া চাই না। অপরকে নিজের গোপন শরীর দেখিতে বা স্পর্শ করিতে ত দেওয়াই চাই না; এমন কি নিজেও নিজের গুপ্তাঙ্গ বিনা ঠেকায় বা বিনা জরুরতে দেখা বা ছোয়া চাই না। অনেক সময় অনেক বদ লোকে এই ধরনের অশ্লীল কথা আলোচনা করে, অশ্লীল ও উলংগ ছবি রাখে ও দেখে, অশ্লীল প্রেমের নভেল-নাটক পড়ে এবং অশ্লীল ও নগ্ন ছবি প্রচার করে। খবরদার! খবরদার!! এই ধরনের অশ্লীল কাজ হইতে ছেলেমেয়েদিগকে অতি সতর্কতার সহিত দূরে রাখিতে হইবে। যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা ও এক সঙ্গে উঠা-বসা হলাহল বিষের চেয়েও অধিক জীবনহন্তা মনে করিবে। প্রথম প্রথম হয়ত টের পাওয়া যায় না বা ইহাতে কোন খারাব উদ্দেশ্যও থাকে না। কিন্তু অনভিজ্ঞতাবশতঃ একবার জড়াইয়া পড়িলে শেষে আর ছাড়ান যাইবে না, জীবন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

মেয়েদিগকে দশ বৎসরের পর বাড়ীর বাহিরে খেলাইতে বেড়াইতে দিবে না। খবরদার! খবরদার!! হিন্দুদের দেখাদেখি, ইংরেজদের দেখাদেখি, ধর্মহীনদের দেখাদেখি বা দুনিয়ার কোন প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া ঈমান নষ্ট করিবে না, ধর্ম নষ্ট করিবে না এবং ছেলেমেয়েদের জীবন বরবাদ করিবে না।

ছোট বয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া তত ভাল নয়। মেয়ের ১৪ বৎসরে এবং ছেলের ২০/২৫ বৎসরে বিবাহ দেওয়া ভাল কিন্তু ইহার পূর্বেও যদি কোন যৌন জরুরত উপস্থিত হয়, তবে বিবাহ করাইয়া দিবে। ঘটনাক্রমে ছেলে-মেয়ে উভয়ের মধ্যে যদি প্রেমের উদয় হইয়া বসে, তবে তাহাদের দুই জনেরও বিবাহ করাইয়া দেওয়া চাই। বিবাহের মধ্যে কোন কুপ্রথার

অনুসরণ করা চাই না। সরল ও সাদাসিধাভাবে, দায়িত্ব-জ্ঞান, ঈমানী শক্তি ও চরিত্রবান দেখিয়া বিবাহ করান উচিত।

মসজিদ

ইসলাম ধর্ম ব্যক্তিগত ধর্ম নয়, সমাজ ধর্ম। সমাজের সাফল্য নির্ভর করে মানুষের একতার ফলে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, সেই শক্তির উপরে। একটি কঞ্চিকে সকলেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু পঞ্চাশটি কঞ্চির আঁটিকে কেহই ভাঙ্গিতে পারে না। একটি পাটের আঁশকে সকলেই ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু কতকগুলি আঁশ একত্র করিয়া যখন দড়ি পাকান হয়, সে দড়িকে কেহই ছিঁড়িতে পারে না। নির্জীব পদার্থের একতার মধ্যে যখন এত শক্তি, তখন আশ্‌রাফুল মাখলুকাত—সমস্ত জীবের সেরা মানুষের যদি একতা হয়, তবে তাহাদের শক্তি যে কতগুণ বাড়িয়া যায়, তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তখন তাহাদিগকে অবনত করিতে পারে এমন শক্তি কাহারো থাকে না; বিশেষতঃ ঈমানদার লোকের একতাবদ্ধ জমা'আতের যখন সৃষ্টি হয়, তখন তাহাদের প্রতি নাযেল হয় আল্লাহ্‌র রহ্‌মত। এই জন্যই আমাদের ইসলাম ধর্মে মসজিদে একত্র হইয়া শৃঙ্খলার সহিত একতাবদ্ধভাবে একজন ইমামের তাবেদারী করিয়া দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার হুকুম হইয়াছে। এই জন্যই যেখানে মুসলমানদের বসতি থাকিবে, সেইখানেই প্রতি মহল্লায় মহল্লায়—পল্লীতে পল্লীতে মসজিদ থাকিতেই হইবে। মসজিদকে কেন্দ্র করিয়াই হইবে মুসলমান সমাজের সংগঠন। ইহা শুধু Tradition বা সংস্কার নয়; ইহা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রবর্তিত উত্তম আদর্শ। মহল্লার প্রতিটি লোকের যোগাযোগ থাকে মসজিদের সঙ্গে এবং দায়িত্ব থাকে মসজিদের প্রতি। মসজিদের একজন ইমাম থাকেন এবং একজন মুআয্‌যিন থাকেন। ইমাম ও মুআয্‌যিনের খেদমত করা এবং চেরাগ-বাতি বিছানা বা পানির ব্যবস্থা করা মহল্লাবাসীদেরই কর্তব্য। প্রত্যেকেরই কিছু কিছু করিয়া মসজিদের সাহায্য করিতে হইবে।

মক্তব

মসজিদের দ্বারাই মক্তবের কাজ চলে। ইসলামের বুনিয়াদী তা'লীম—প্রাথমিক শিক্ষা মক্তবেই হয়। আল্লাহ্‌কে চেনা, রাসূলকে চেনা এবং কিসে আল্লাহ্ পরকালে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং কিসে অসন্তুষ্ট হইবেন, তাহা জানা প্রত্যেকটি মানুষের উপরই ফরয। এই শিক্ষার প্রাথমিক সূচনা হয় মক্তবে। অতএব, মক্তব মুসলমানদের জন্য কতদূর জরুরী তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

মক্তবের ওস্তাদজীর দায়িত্ব এবং মর্তবা যে কত অধিক, তাহা ইহার দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে যে, মানুষ জীবনভর যাহাকিছু কলেমা, নামায, রোযা প্রভৃতি করিবে, তাহার সবকিছুরই গোড়াপত্তনকারী হইতেছে মক্তবের এই ওস্তাদজী। অতএব, তিনি সকলের সমস্ত এবাদত বন্দেগীর সমপরিমাণ সওয়াব পাইবেন। সুতরাং সকলের ঊর্ধ্বে তাঁহার মর্তবা হইবে। কাজেই সকলের উচিত, মক্তবের ওস্তাদজীর এবং মসজিদের ইমাম ও মুআয্‌যিনের তা'যীম ও সম্মান করা। ইমাম ও মুআয্‌যিনের সম্মান এইজন্য করিতে হইবে যে, মুআয্‌যিন সবাইকে আল্লাহ্‌র দরবারের দিকে ডাকিয়া আনেন এবং ইমাম ছাহেব সকলকে আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছাইয়া তাহাদের আরযী (দরখাস্ত) পেশ করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পবিত্র দরবারের আদব-কায়দা ও নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন।

মাদ্রাসা

আল্লাহ্‌কে চেনা, আল্লাহ্‌র রাসূলকে চেনা, আখেরাতের নেকী-বদীর হিসাবের কথা জানা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিষয়সমূহ জানা প্রত্যেক মানুষের উপরই সর্বপ্রধান ফরয। এইসব বিষয়ের, মূল বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে কোরআন শরীফে এবং হাদীস শরীফে। তথা হইতেই বড় বড় আলেমগণ কিছু কিছু বিভিন্ন ভাষায় লিখিয়া থাকেন বা বর্ণনা করিয়া থাকেন। আজকাল সকলেই নিজ চোখে দেখিতে চায়, অন্যের কথায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে চায় না। কাজেই কোরআন হাদীসের এলম হাছিল করা সকলের উপর ফরয। কোরআন হাদীসের ভাষা আরবী, আল্লাহ্‌র ভাষা আরবী, বেহেশ্‌তবাসীদের ভাষা হইবে আরবী, নামাযের ভাষা আরবী, কাজেই সকলেরই আরবী ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য। আরবী ভাষা না শিখিয়া শুধু অনুবাদ পড়িলে তাহাতে অনুবাদকের কথাই পড়া হয়; আল্লাহ্‌র বাণী পড়া হয় না। অবশ্য অনুবাদক যদি বিশ্বস্ত ও খোদাভীরু হন, তবে তাহার মুখে আল্লাহ্‌র বাণী কিছু বুঝিতে পারিয়া কিছু তৃপ্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরিপূর্ণ তৃপ্তি কখনো হইতে পারে না। আর অনুবাদক যদি খোদাভীরু বা খোদাভক্ত না হয় বা কোরআনের ভাষায় যদি তার পূর্ণ দক্ষতা না থাকে বা ইসলামের প্রতি শত্রুতাবশতঃ যদি সে কোরআন শরীফের অর্থ বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে অথবা টাকার লোভে বা অন্য কোন হীন উদ্দেশ্যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে সে অনুবাদ পড়িয়া কিছুতেই আল্লহ্‌র কথা পাওয়া যাইবে না। এজন্য মুসলমানের আল্লাহ্‌র কোরআনের ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা জন্মাইতেই হইবে। নতুবা জাতি ধর্ম সবকিছুই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

কোরআনের ভাষায় দক্ষতা জন্মাইবার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা মুসলমানদের উপর ফরয এবং মাদ্রাসা পরিচালনার খরচ বহন করাও মুসলমানদের উপর ফরয। হুকুমৎ ইহাতে সহায়তা না করিলেও মুসলমানদের উপর ইহা ফরয থাকিবেই থাকিবে। ফলকথা এই যে, ধর্ম রক্ষার খাতিরে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসার দরকার আছেই আছে। ইহা কোন রসম নয় বা কোন গোঁড়ামিও নয়; বরং ইহা আল্লাহ্‌র কোরআন রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী দ্বীনের খেদমত। যেহেতু ইসলামের শত্রুদের দ্বারা আমাদের সমাজ বহুকাল যাবৎ শাসিত ও পরিচালিত হইয়াছে এবং তাহার প্রভাবে অনেকেই মসজিদের মুআয্‌যিনকে আলেমকে বা তালেবে এলমকে তাঁহাদের যোগ্য মর্যাদা দেয় না; বরং অনেকেই তাঁহাদের নিজেদের দুর্ভাগ্য টানিয়া আনার জন্য তাঁহাদিগকে অনেক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, তাঁহাদিগকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া থাকে। এইসব অত্যন্ত জঘন্য পাপ। এহেন পাপের মধ্য দিয়া একজন আলেম বা তালেবে এলমের মনে আঘাত দিলে হয়ত তাহার কারণে দেশকে-দেশ তাবাহ ও বরবাদ হইয়া ধ্বংসে পতিত হইতে পারে। হযরত মাওলানা থানভী চিশ্‌তী (রঃ) অধিকাংশ সময়ে সমাজের লোকদের ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহাদিগকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে এ বয়াতটি নছীহত স্বরূপ পড়িতেন—

مبیں حقیر گدایان عشق راکیں قوم   شاهان بیے کمر و خسروان بیے کلاه اند

ইহার মর্মার্থ এইঃ হে মুসলমানগণ! এই ইমাম মুআয্যিনগণ এই আলেম ও তালেবে এলেমগণ যদিও তাহারা দেখিতে গরীব, কিন্তু হাকীকতে তাহারা আল্লাহ্র আশেক। অতএব, খবরদার! খবরদার! তোমরা তাহাদিগকে কখনও হাকীর (তুচ্ছ) মনে করিও না। কেননা, যদিও তাহাদের কাছে তাজ ও তখত নাই, বিল্ডিং বা ফার্নিচার নাই; কিন্তু যেহেতু তাহারা আল্লাহ্র আশেক, কাজেই তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহ্। অতএব, সাবধান! আল্লাহ্র ব্যথিতদের মনে তোমরা কোনরূপ ব্যথা দিও না; দিলে তোমাদের আর খায়ের নাই; তোমরা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

নেক লোকদিগকে তাহাদের দারিদ্র্যের দরুন তুচ্ছ করার চেয়ে জঘন্য পাপ আর কিছুই হইতে পারে না। আজকাল অনেকেই খেয়াল না করিয়া এইরূপ পাপে ডুবিয়া ধ্বংস হয়, সেই জন্য দেলের দরদে এই কথা কয়টি সমাজের উপকারার্থে লিখিলাম।

দাড়ি রাখা ও মোচ খাট করা

বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীঅতের যাবতীয় দায়িত্ব আসিয়া ঘাড়ে চাপে। এতদিন বাপে খাওয়াইয়াছে, বাপে টাকা দিয়াছে; এখন আর বাপের কাছে চাওয়া উচিত নয়। বাপের কাছে এখন চাহিতেও লজ্জাবোধ করা উচিত। বাপ যদি এখনো দেয়, তবে সে তাহার অনুগ্রহ, তাহার মেহেরবানী। এ অবস্থায় তাহার শোকর আদায় করা উচিত। কিন্তু তাহার নিকট কোনরূপ দাবী চলিবে না; বরং এখন বাপকে কামাই রোজগার করিয়া খাওয়ান উচিত। অবশ্য এই রোজগারের সময়ে যাবতীয় পাপ পথ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

যৌবনের সংগে সংগে মুখে দাড়ি দেখা দিলে, কুসংসর্গের প্রভাবে ও পরানুকরণের দুর্বলতার কারণে, দাড়ি ফেলিয়া দিতে মনে চাহিবে; কিন্তু এ সময় মনে রাখিবে, যে লোক রাসূলের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কুসংসর্গের তাবে'দারী করিবে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মনে ব্যথা দিয়া বিজাতির অনুসরণ করিবে, তাহার স্থান পরকালে কোথায় হইবে, উহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে। ইহা কখনো মনে করিবে না যে, ইহা মোল্লা-মৌলবীদের মনগড়া কথা; বরং ইহা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) -এর অলংঘনীয় আদেশ যে, اوفوا اللحى واحفوا الشوارب অর্থাৎ, (হে মুসলমানগণ! খবরদার! তোমরা দাড়ি লম্বা করিয়া রাখ এবং মোচ খাট করিয়া ফেল।

রাসূলের এই আদেশটি যে কত বড় উপকারী এবং কত প্রয়োজনীয় তাহা আখেরাতে ত বুঝিবেই, আর দুনিয়াতে যখন জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইবে, তখনও বুঝিবে।

অনেকে বিজাতীয় অনুকরণে বগলের পশম লম্বা করিয়া রাখে। নাভির নীচের পশম ছাফ করে না—ইহা অতি জঘন্য রকমের কুঅভ্যাস এবং অতি ঘৃণিত ধরনের পাপ। বিজাতীয় অনুকরণের ন্যায় হীনতা-নীচতা আর নাই। জাতির গৌরববোধ যাহাদের নাই, তাহারা অতি নির্লজ্জ মানুষ। মনুষ্য সমাজে তাহারা স্থান পাওয়ার যোগ্য নহে।

অনেক সময় বিধর্মীদের অনুকরণে পুরুষ লোক মাথার চুল পিছনের দিকে কামাইয়া বা ছোট করিয়া সামনের দিকে লম্বা করিয়া রাখে, মেয়েদের মাথার চুলও কাটিয়া খাট করিয়া রাখে—ইহা একদিকে আখেরাতের বিচারে পাপ, তেমনি দুনিয়ার ইজ্জতের দিক দিয়াও খুবই ঘৃণিত কাজ। কেননা, ইহাতে বিধর্মীরা মনে করিবে যে, এই হতভাগাদের নিজেদের কোন আদর্শ নাই—এরা

আমাদেরই অনুসারী বা তাবেদার, আমাদেরই পদলেহনকারী। ইহা কতখানি ঘৃণার কথা, কতখানি লজ্জার বিষয়!

লেবাস-পোশাক

লেবাস-পোশাক সম্বন্ধে আমাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটি আদর্শ আছে। মুসলমান পুরুষের আদর্শ পোশাক হইতেছেঃ নিম্ন শরীরের জন্য—প্রাইভেট জীবনে এবং সাধারণ লোকের জন্য লুঙ্গি। আর তাহাদের সামাজিক জীবনে এবং উচ্চস্তরের জন্য পায়জামা (পায়ের গিরা না ঢাকে এইরূপে)। খৃষ্টানদের আদর্শ হইতেছেঃ প্যান্ট, ফুল প্যান্ট বা হাফ প্যান্ট। আর হিন্দুদের আদর্শ হইতেছেঃ ধুতি। ঊর্ধ্ব শরীরের জন্য মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ পোশাক হইতেছেঃ প্রাইভেট জীবনে এবং সাধারণ লোকের জন্য কোর্তা, পিরহান বা পাঞ্জাবী এবং তাহাদের সামাজিক জীবনে ও উচ্চস্তরের জন্য আচ্‌কান শিরওয়ানী এবং আরো উচ্চস্তরের জন্য আবা, চোগা, মেশলাহ্ প্রভৃতি। ইংরেজ বা খৃষ্টানদের আদর্শ পোশাক, কোট শার্ট। আর হিন্দুদের আদর্শ পোশাক হয়ত নাই বা ধুতির খুট। আর মাথার জন্য—মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ টুপী ও পাগড়ী। (বিনা প্রয়োজনে গলায় কিছু না।) খৃষ্টানদের জাতীয় আদর্শ হ্যাট; আর তাহাদের ধর্মীয় আদর্শ গলায় ধর্মীয় প্রতীক ক্রুশ চিহ্ন স্বরূপ নেকটাই পরা এবং হিন্দুদের আদর্শ খোলা মাথা। মুসলিম মহিলাদের আদর্শ পোশাক—নিম্ন শরীরের জন্য—পায়ের পাতা ঢাকে এরূপ পায়জামা, ঊর্ধ্ব শরীরের জন্য লম্বা আস্তিনের লম্বা ঝুলের কোর্তা এবং বুক উঁচু না দেখায় তার জন্য বুক-বন্ধনী আর মাথার জন্য মুখঢাকা ঘোমটাসহ চাদর। হিন্দু মহিলাদের পোশাক—ধুতি বা শাড়ী, শাড়ীর একপাশ দ্বারা মাথা ঢাকা। খৃষ্টান বা ইংরেজ মহিলাদের—মাথা খোলা, বুক খোলা, মুখ খোলা ও হাঁটুর নীচে খোলা গাউন। (নীচে কি তাহা আমি জানি না, তবে সম্ভবতঃ আণ্ডার-ওয়ার জাতীয় কিছু।)

ইসলাম ধর্ম যেহেতু আল্লাহ্ মনোনীত ধর্ম মানুষের কোন মনগড়া ধর্ম নয়, সেইজন্য ইহাতে যেমন খোদার বন্দেগীর ব্যবস্থা আছে, যেমনি ইহাতে সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিধি ব্যবস্থা, লেবাস-পোশাকের ব্যবস্থা, খাদ্য খোরাকের ব্যবস্থা, বাসস্থানের ব্যবস্থা, এক কথায়—সব ব্যবস্থাই আছে। সুতরাং যেক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বাধীন একটি ব্যবস্থা আছে, সেক্ষেত্রে যদি কেহ নিজের জাতীয় আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন বিজাতীয় আদর্শ গ্রহণ করে, তবে তাহাকে যে জাতিচ্যুত বলা যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বাহ্নেই আমাদিগকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, من تشبه بقوم فهو منهم ইহার মর্ম এই যে, যদি কেহ অন্য কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিয়া তাহাদের লেবাস-পোশাক এবং ছুরত-সীরত অবলম্বন করে, তবে তাহাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সেই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। উপরের হাদীসটি কোরআনের এই আয়াতেরই প্রতিধ্বনি করিতেছেঃ

وَلَاتَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ○

ইহার মর্মার্থ এই যে, হে মুসলমানগণ! যাহারা যালেম, কাফের, আল্লাহ্‌কে চিনে না, রাসূলকে মানে না, তাহাদের দিকে তোমরা ঝুঁকিও না। অর্থাৎ, যাবতীয় লেবাস-পোশাক ছুরত-সীরতের ব্যাপারে খাদ্য-খোরাক বা বিলাস-ব্যাসনের ব্যাপারে তোমরা তাহাদের অনুকরণ করিও না। যদি

তোমরা তদ্রূপ কর, তবে তোমাদিগকে দুনিয়া এবং আখেরাতে আগুন স্পর্শ করিবে; অর্থাৎ আখেরাতে দোযখের আযাব ও দুনিয়ায় লাঞ্ছনার আযাব ভোগ করিতে হইবে। কোরআন শরীফে আরও আছেঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○ سورة النساء

ইহার মর্মার্থ এই যে, রাসূলের তরীকা, রাসূলের হেদায়ত এবং রাসূলের আদর্শ পরিষ্কার প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও যাহারা উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে এবং মু'মিন মুসলিমগণের জীবনধারাকে ছাড়িয়া অন্যরূপ জীবনধারা গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে (দুনিয়ার জীবনে) আমি তাহা করিতে দিব। জোর করিয়া বলপূর্বক ফিরাইয়া রাখিব না। কিন্তু পরিণামে পরকালে আমি তাহাদিগকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে স্থান দান করিব,—জানিয়া রাখিও জাহান্নাম অত্যন্ত খারাব স্থান। সুতরাং কোন মুসলিম নর-নারীর বা বালক-বালিকার লেবাসে-পোশাকে, ছুরতে-সীরতে খাদ্য-খাদকে কখনও বিজাতীয় অনুকরণ করা চাই না। কারণ, মানব জাতি যাবৎ তাহাদের জাতীয় গৌরব বোধকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া মানবতার স্তর হইতে ইতর প্রাণীর স্তরে নামিয়া না যায়, তাবৎ তাহারা নিজেদের জাতীয় আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য জাতির আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে না।
—সূরা-নেছা, রুকূ ৭

পরানুকরণ দূষণীয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নীত যদি অন্য কোন জাতি করে, তবে সে উন্নতির পথ আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না। এ সম্পর্কে হযতর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেনঃ

كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا -

'জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা মুমিনদের জন্য হারানিধি স্বরূপ। অতএব, জ্ঞানের কথা যেখানেই পাওয়া যাউক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা মুমিনেরই হক এবং মুমিনেরই হারান ধন।'

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন, প্রতি ক্ষেত্রেই দেখিবেনঃ মুসলিম জাতির পোশাক মানুষের ভিতরে গাম্ভীর্য, চিন্তাশীলতা ও আত্মসম্মান বোধের চেতনা জাগ্রত করে, পক্ষান্তরে অন্যান্য খাট, অর্ধ বা উলঙ্গ পোশাক মানুষকে উলঙ্গই রাখে, এমন পোশাক মানুষের মধ্যে ছেলেমী, বাচালতা ইত্যাদি ভাব আনয়ন করে।

হাফপ্যান্ট

হাফপ্যান্ট পরার মধ্যে পরানুকরণ ছাড়া আরও খারাবী এই যে, হাফপ্যান্ট পরা আমাদের দেশের গামছা পররা মত। হাফপ্যান্ট পরিলে ফরয তরক হইয়া যায়। কারণ, ছতর ঢাকা ফরয। পুরুষের ছতর হইতেছে নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত। অতএব, যদি কাজের সময়ের জন্য হাঁটু ঢাকার মত ছোট পায়জামা তৈয়ার করিয়া পরা হয়, তবে গামছা পরা ও হাফপ্যান্ট পরার ফরয তরকের পাপ হইতে বাঁচা যায়।

নেক্‌টাই

নেক্‌টাই-এর মধ্যে পরানুকরণ ছাড়া আরও খারাবী এই যে, নেক্‌টাই-এর গিরা বাঁধাটা খৃষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক। তাহারা বলে যে, যীশুখৃষ্টকে শূলীতে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। যেহেতু তাহাদের মিথ্যা মতে তিনি জগতের সব পাপ হরণ করিয়া নিজের জীবনকে শূলীবিদ্ধ করিয়া, কোরবান করিয়া সমস্ত মানুষের পাপ দূর করিয়া গিয়াছেন, কাজেই খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী যে কেহই হইবে, তাহার সেই শূলীকাষ্ঠের চিহ্ন সর্বদা গলায় ধারণ করিতে হইবে। এইজন্য খৃষ্টানরা শূলীকাষ্ঠের চিহ্নস্বরূপ নেকটাই ব্যবহার করিয়া থাকে। সুরাং নেকটাই ধারণ করা কোন মুসলমানের কিছুতেই উচিত নহে। কারণ, মুসলমানের দৈনিক পাঁচবার আল্লাহ্‌কে সজ্‌দা করিতে হয়—মিথ্যার প্রতীক গলায় ঝুলাইয়া সত্য খোদার দরবারে যাওয়া সাজে কি? যাহারা পরানুকরণের ন্যায় নীচাশয়তা ভিতরে রাখে, তাহাদের দ্বারা জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা যায় কি?

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ইহুদী এবং খৃষ্টান, এই দুইট জাতিই ছিল তৎকালীন প্রধান জাতি। কিন্তু এই উভয় জাতিই সাংসারিক ব্যাপারে নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়; বরং স্বর্গীয় ধর্মীয় ব্যাপারে দারুণ মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। ইহুদীরা সত্যকে মিথ্যা করিয়া রাখিয়াছিল। হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র অতি মর্যাদাশালী সত্য পয়গম্বর। কিন্তু ইহুদী পাপিষ্ঠরা এহেন সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করিয়া হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলিত, হারামের পয়দায়েশ। (নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক।) কোরআন এহেন মিথ্যাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য বারবার ঘোষণা দিয়াছেঃ 'ঈসা পবিত্র, ঈসার জন্ম পবিত্র, ঈসার মৃত্যু পবিত্র।' দ্বিতীয় দিকে খৃষ্টানরা অতি ভক্তিতে মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা শুধু যে, ধর্মের ব্যাপারে এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল তাহাই নহে, অধিকন্তু তাহারা সারা দুনিয়াতে পাপের ও যুল্‌মের তাণ্ডবলীলা চালাইবার জন্য জঘন্যতম মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিল যে, 'ঈসা খোদার বেটা। খোদার বেটা শূলীকাষ্ঠে ঝুলিয়া নিজের জীবন কোরবান দিয়া সমস্ত দুনিয়াবাসীদের পাপ মোচন করিয়া গিয়াছেন। কাজেই এখন লোকে যতই পাপ, যতই যুল্‌ম করুক না কেন, তাহাতে তাহার কোনই ক্ষতি হইবে না। এই দুইটি মিথ্যা এত বড় মিথ্যা যে, এক দিকে ইহাতে আল্লাহ্‌র তাওহীদ (একত্ববাদ) নষ্ট হইতেছে, অন্য দিকে দুনিয়াতে পাপ এবং অনাচারের তাণ্ডবলীলা চালাইবার সুযোগ হইয়াছে। খৃষ্টানদের এই রকম জঘন্য মিথ্যার প্রতীক হইতেছে 'ক্রুশ-টাই' অর্থাৎ 'নেক্‌টাই'। সেন্টপলের এই সৃজিত জঘন্য ইতিহাসকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বারবার ঘোষণা দিয়াছেঃ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ الاية "তাহারা (ইহুদীরা) তাঁহাকে (ঈসাকে) বধও করিতে পারে নাই, শূলীতেও চড়াইতে পারে নাই।"
—সূরা নেছা, রুকূ-৩

সুতরাং যাহারা নেকটাই পরে, তাহারা যেন কোরআনকে মিথ্যা বলিতেছে এবং জঘন্য মিথ্যা ইতিহাসকে সত্য বলিতেছে। (নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক।)

ফুলপ্যান্ট

ফুলপ্যান্টের মধ্যে পরানুকরণ ভিন্ন আরও খারাবী এই যে, ইহাতে সাধারণতঃ পায়ের গোড়ালীর গিরা ঢাকিয়া যায়। অথচ এই গিরা ঢাকিয়া পুরুষের কোন কাপড় পরা হারাম। এতদ্ব্যতীত মুসলমানদের দৈনিক পাঁচবার নামায পড়িতে হয়; কিন্তু ফুলপ্যান্ট পরিয়া নামায পড়ার বিশেষ অসুবিধার কারণে এবং নামাযে উঠা-বসায় উহার ভাঁজ ভাংগিয়া যায় বলিয়া অনেকে নামাযী হওয়া সত্বেও মাঝে মাঝে নামায পড়ে না; পরে ক্বাযা করিয়া লয়। ইহা কত বড় দুঃখের বিষয়! উপরন্তু পায়জামা পরিয়া যেমন আরাম পাওয়া যায়, ফুলপ্যান্টে সেরূপ আরাম পাওয়া যায় না।

নারীর মাথার চুল কাটা

দোররোল মোখ্তার কিতাবে আছেঃ قَطَعَتْ شَعْرَ رَأْسِهَا اَثِمَتْ وَلُعِنَتْ ○

অর্থাৎ, "কোন নারী যদি তাহার মাথার চুল কাটে, তবে সে পাপিনী হইবে এবং অভি-শপ্তা হইবে।"

ফতওয়া বাযযাযিয়া কিতাবে আছেঃ

وَاِنْ بِاِذْنِ الزَّوْجِ لِاَنَّهٗ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَلِذَا يُحْرَمُ قَطْعُ لِحْيَتِهٖ ـ

ইহার মর্মার্থ এই যে, নারী যদি তাহার স্বামীর অনুমতি বা আদেশক্রমেও মাথার চুল কাটে, তথাপি সে পাপিনী ও অভিশপ্তা হইবে। কেননা, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করিয়া কোন মানুষের (চাই সে স্বামীই হউক বা রাষ্ট্রনায়ক হউক) আদেশ, অনুমতি পালন করা যাইতে পারে না। এই জন্যই স্বয়ং স্বামীর পক্ষেও তাহার দাড়ি কাটা হারাম।

নারীর মাথার চুল কাটার মধ্যে দুইটি পাপ রহিয়াছে। প্রথমটি হইতেছে নারীর জন্য নরের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম। হাদীস শরীফে এই সাদৃশ্য অবলম্বনের জন্য অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ـ

(ترمذی ابو داؤد ابن ماجة و مسند امام احمد)

অর্থাৎ 'যে নারী লেবাস-পোশাকের দ্বারা বা চুল দাড়ি দ্বারা নরের রূপ আকৃতি ধারণ করিবে, তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ পতিত হইবে; এবং যে পুরুষ লেবাস-পোশাকের দ্বারা বা চুল দ্বারা নারীর রূপ আকৃতি ধারণ করিবে তাহাদের উপরও আল্লাহ্র অভিশাপ পতিত হইবে।'

আর দ্বিতীয় পাপ হইতেছে বিজাতীয় সাদৃশ্যতা গ্রহণ করা। নরনারী নির্বিশেষে যে কোন মুসলমানের পক্ষেই বিজাতীয় অনুকরণ করা হারাম। এ সম্বন্ধে হাদীস এবং কোরআন শরীফের আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

'সাদৃশ্যতা' শব্দের মূল আরবী হইতেছে 'তাশাব্‌বুহ' (تشبہ) [সাদৃশ্যতা শব্দটি আমি ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু এই শব্দটি সম্পূর্ণরূপে আমার মনঃপুত হইতেছে না। কেননা, শব্দটি সাধারণভাবে প্রচলিত হইলেও ব্যাকরণ অনুসারে ইহা ভুল। দ্বিতীয়তঃ এই শব্দের দ্বারা মূল تشبہ শব্দের পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশ পায় না। এজন্য تشبہ শব্দের পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়া পরে আমি 'সাদৃশ্যের' পরিবর্তে تشبہ শব্দই ব্যবহার করিব] হাদীসে تشبہ-ই আছে, تشابہ নহে। تشبہ-এর অর্থ অনুরূপ হওয়া (চাই অনিচ্ছাকৃতভাবেই হউক)। আর تشبہ অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ দৃশ্য গ্রহণ করা। ইহার অর্থ—"অনুকরণ করা" ও করা যায় না। কারণ যে সব জিনিস দৃশ্য নয় যেমন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি, তাহাতে অনুকরণ হারাম নহে। শুধু যেটা দেখা যায় দৃশ্য হয়, যেমন বাহিরের পোশাক, চুল, দাড়ি, উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা প্রভৃতির নিয়মপদ্ধতি এই জাতীয় সমস্তের উপরই تشابہ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। যেটা দেখা যায় না, সেটার উপর প্রয়োগ হইতে পারে না।

কেহ যদি তাশাব্বুহ করার এরাদা না করিয়া শুধু নিজের আরামের জন্য, নিজের নফ্‌সের খাহেশের জন্য করিয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে, তাহার এইরূপ খাহেশ কেন হইতেছে? —অন্যের দেখাদেখিই ত হইতেছে? কাজেই গুপ্ত অনুকরণেচ্ছা নিশ্চয়ই আছে। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অনুকরণেচ্ছাকে রদ করিয়া দিয়া শুধু নিজের আরাম বা দরকারবশতঃ করে, তবুও দেখিতে হইবে যে, ঈমানের মূল ভিত্তি হইতেছে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের অর্থাৎ কোরআন হাদীস, ফরয-ওয়াজিব, সুন্নত, মাদ্রাসা-মসজিদ প্রভৃতির মহব্বতের উপর। আর মহব্বত কাহারও প্রতি প্রমাণিতই হইতে পারে না—যে পর্যন্ত মহব্বতের বিপরীত বস্তু (অর্থাৎ, শত্রুতা) তাহার শত্রুর সঙ্গে প্রমাণিত না হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি, কোরআন হাদীসের প্রতি, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতের প্রতি বা মাদ্রাসা-মসজিদের প্রতি যাহারা ঘৃণা, বিরক্তি বা শত্রুতা পোষণ করে, তাহাদের প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতার ভাব পোষণ না করিলে, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি মহব্বতের দাবীর কোন অর্থই হয় না। সুতরাং দরকারবশতঃ বা আরামের জন্য যদিও কোন জিনিস তাহাদের অনুরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তবুও হয় জিনিসকে কিছু অন্যরূপ করিয়া লইতে হইবে, না হয় বিরক্তি বা অনিচ্ছার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা ঈমানের হানি হইবে।

পুরুষের দাড়ি কাটা

আজকাল নব্য যুবকদের মধ্যে প্রথা হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও দাড়ি রাখে না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য প্রথা এবং সাংঘাতিক পাপ। দাড়ি না রাখার মধ্যে নিম্নরূপ অনেকগুলি পাপ একত্র হয় ;—(১) হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া যত নবী বা যত ওলী অতীত হইয়াছেন, সকলেই দাড়ি রাখিয়াছেন। দাড়ি না রাখিলে সেই আদি সুন্নত (নবীদের আদর্শ) তরক হইয়া যায়। (২) স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর আদর্শঃ

اوفوا اللحى واحفوا الشوارب

"তোমাদের দাড়ি লম্বা করিয়া রাখ এবং মোচকে খাট কর।"

যে প্রাণপ্রিয় রাসূলের 'শাফাআত' ছাড়া কাহারও বেহেশ্‌তে যাওয়ার সাধ্য নাই, তাঁহার আদর্শের উপর ছুরি, কাঁচি চালাইলে তাঁহার মনে ব্যথা লাগে না কি? এইরূপ নবীর মনে ব্যথা দিয়া আমরা তাঁহার শাফাআতের আশা করিতে পারি কি? চিন্তা করুন, আমাদের নবী আমাদিগকে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে গঠন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই আদর্শ ছাড়িয়া হীনমন্যতার

পরিচয় দিয়া অন্য জাতির আদর্শ গ্রহণ করিলে আমাদের ইহ-পরকাল ভাল হওয়ার আশা করা যাইবে কি? মনে রাখিবেন, একদিন তাঁহার দরবারে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

পুরুষের মাথা খোলা রাখা

পুরুষের মাথায় টুপি রাখা এবং আরও একটু উন্নত পর্যায়ের হইলে টুপির সঙ্গে রুমাল বা পাগড়ী রাখা ইসলামী তরীকাহ্।

হিন্দুদের প্রথা ছিল মজলিসে খোলা মাথা থাকা আর ইংরেজদের প্রথা ছিল হ্যাট মাথায় দেওয়া; কিন্তু আজকাল প্রায় সকলেই মাথা খোলা রাখে। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা কোন সভ্যতা নয়; বরং একটা বড় রকমের অসভ্যতা। অতএব, বিজাতির অনুকরণ না করিয়া মুসলমান ছেলে-দের পক্ষে নিজেদের জাতীয় আদর্শ পালন করাই দরকার। টুপি মাথায় রাখা একান্ত অপরিহার্য।

নারীদের মাথা খোলা রাখা

নারীদের মাথা চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখা ইসলামের নির্দেশ। তাহাদের মাথা খোলা রাখা জঘন্য রকমের পাপ। কারণ, তাহাদের মাথার চুল খোলা দেখিলে, যুবকদের মনে যৌন উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নারীর মাথার চুলও ছতরের মধ্যে গণ্য। ছতর খোলা রাখিলে যে পাপ হয়, চুল খোলা রাখিলেও তদনুরূপ পাপ হইবে।

শাড়ী

শাড়ী পরা নারীদের জন্য সুন্নতের বরখেলাফ। কারণ, হযরত নবী আলাইহিস্সালামের বিবিগণ এবং কন্যাগণ—যেমন আমাদের মা ফাতেমা, মা আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ কখনও শাড়ী পরেন নাই। তাঁহাদের লেবাস ছিল মাথায় উড়নী, গায়ে লম্বা আস্তিনের ও লম্বা ঝুলের জামা বা কোর্তা আর পরনে পায়ের পাতা ঢাকা পায়জামা বা ছায়া। এতদ্ভিন্ন হযরত নবী আলাইহিস্সালাম আদেশ করিয়াছেনঃ خَالِفُوا الْمَجُوْسَ وَالْمُشْرِكِيْنَ (হে মুসলমানগণ! তোমরা অগ্নিপূজকদের এবং মূর্তিপূজকদের অনুরূপ লেবাস পরিধান করিও না এবং শরীরের দৃশ্যকে তদ্রূপ বানাইও না—বরং তাহাদের বিপরীত করিও।'

গাউন পরিলেও মেয়েদের পায়ের নিম্নদিক খোলা থাকে। অথচ মেয়েদের পায়ের নীচের দিকেও খোলা রাখা জায়েয নহে। মেয়েদের বুক যাহাতে খোলা না থাকে বা উঁচু না দেখা যায়, সেজন্যও চাদর দিয়া বুক, গলা, ঘাড় ভালমত ঢাকিয়া লওয়া দরকার। ঠেকা জরুরতবশতঃ মেয়েদের যদি কোন সময় বাড়ীর বাহির হইয়া পথে হাঁটিতে হয় তবে ময়লা-কাপড় পরিয়া, ময়লা চাদর গায় দিয়া, ময়লা-বোরকা মুড়ি দিয়া বাহির হওয়া শ্রেয়ঃ—যাহাতে মেয়েলোকদের রূপ-সৌন্দর্য কোন বেগানা পুরুষের নজরে না পড়ে, ইহাই ইসলামের বিধান।

সিনেমা

সিনেমার মধ্যে পাঁচ রকমের পাপ রহিয়াছেঃ ১। সময় নষ্ট, ২। সম্পদ নষ্ট, ৩। স্বভাব নষ্ট, ৪। স্বাস্থ্য নষ্ট ও ৫। ঈমান নষ্ট।

এই পাপগুলির কারণে আমাদের শুধু স্রোতে ভাসিয়া না যাইয়া হিতাহিত চিন্তা করা দরকার।

যদি নারী-চিত্র বাদ দিয়া শিক্ষামূলক ফিল্ম কেহ তৈয়ার করে, তবে তাহার মধ্যে অতগুলি পাপ থাকিবে না; শুধু জীবের ছবি তোলার পাপ থাকিবে। জীবের ছবিও বাদ দিয়া যদি শিক্ষামূলক ফিল্ম করা যায়, তবে তাহাতে পাপ নাই।

কুসংসর্গ বর্জন

ছেলেমেয়ে হইতেছে পিতামাতার হাতে আমানতস্বরূপ। তাহারা বে-গোনাহ্। পিতামাতারও কর্তব্য হইতেছে তাহাদিগকে কুসংসর্গ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহাদের জন্য সুশিক্ষার এবং সৎ সংসর্গের ব্যবহার করা। যাহারা নামায পড়ে না, পাক-নাপাক, হালাল-হারাম বাছে না, যাহারা ইসলাম বিরোধী এবং ধর্মের বা অন্য মতবাদের প্রচারক প্রচারিকা, তাহাদের সংসর্গে বে-গোনাহ্ সন্তানদিগকে দেওয়া অতি বড় খেয়ানত। এতবড় খেয়ানতের মহাপাপের কথা কল্পনা করাও অসম্ভাব।

নাচ

আজকাল নাচকে একটা চারু শিল্প (fine art) বলিয়া মনে করা হয়। মানুষ যখন একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, নিজের সৃষ্টিকে ভুলিয়া যায়, মৃত্যুকে ভুলিয়া যায়, আখেরাতকে ভুলিয়া যায় এবং আল্লাহ্ ও রাসূলকে ভুলিয়া গিয়া একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, তখনই মানুষ নাচ-শিল্পে মত্ত হয়। মানুষের ধ্বংস তখন অতি নিকটে আসিয়া যায়। যত জাতি দুনিয়ার দর্শন-বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি করা সত্ত্বেও ধ্বংস হইয়াছে, তাহাদের সকলেই নাচ ও রংয়ের মধ্যে, মদ ও স্ত্রীলোকের নেশার মধ্যে পড়িয়াই ধ্বংস হইয়াছে। এই সেই দিনকার কথা—মোঘল সাম্রাজ্যও ধ্বংস হওয়ার বড় কারণ ছিল ইহাই। তাহারা আল্লাহ্-রাসূলকে ভুলিয়া নফ্‌সের খাহেশের পূজার মধ্যে এবং মদ ও নারীর নেশায় পড়িয়াই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। নারীর নেশা মদের নেশার চেয়ে কোন অংশে কম নেশা নয়। এ নেশা মানুষের শিরায় শিরায় এমনভাবে ঢোকে যে, শেষ পর্যন্ত মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে; পাপ-পুণ্যের কোন জ্ঞান থাকে না, মন-মগজ একেবারে বিকৃত হইয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে ত একটু দেরীতে হয়, কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহা শীঘ্রই হয়।

অতএব, এই শিল্পকে উন্নত করার অর্থই হইতেছে জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া। কাজেই আল্লাহ্ যাহাদিগকে বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দান করিয়াছেন, তাহারা জাতিকে এই পাপ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করুন। যুবকদের অবস্থা ত এই যে, যাবৎ তাহাদের যৌবনের প্রবাহ আছে, তাবৎ তাহাদের গায়ে একবার এই বিষবাষ্প লাগিয়া গেলে তাহারা চিন্তা করার শক্তিই হারাইয়া ফেলে। যুবতীরাও তথৈবচঃ; কারণ, নারী জাতির মধ্যে ভাবপ্রবণতা এবং আশু আনন্দপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশী; স্থির বুদ্ধিতা এবং পরিণাম চিন্তা খুবই কম। এই ত গেল জাতি ধ্বংসের কথা, জাতির চরিত্র নষ্ট হওয়ার কথা।

ব্যক্তিগতভাবেও যাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ঘৃণা-লজ্জা, পুরুষত্ব বোধ বা গায়রাতের নাম-নিশানা আছে, তাহার নিজের স্ত্রী-কন্যাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে বা সামনে নাচিতে অথবা নিজের স্ত্রী-কন্যাকে অন্য পুরুষকে দেখিতে দিতে পারে না। বেগানা আওরতকে চোখ দিয়া দেখা চোখের যেনা, কান দিয়া তাহার কণ্ঠস্বর শোনা কানের যেনা, মন দিয়া তাহার কল্পনা করা মনের যেনা,

হাত দিয়া আগ্রহ সহকারে তাহার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করা ও গায়ে হাত লাগান হাতের যেনা, পা দিয়া বেগানা আওরতকে দেখিবার খাহেশে হাঁটিয়া যাওয়া পায়ের যেনা। এইসব ছোট ছোট যেনার পরেই আসে বড় যেনা করিয়া মহা পাতকী হওয়ার পালা। হে মানুষ! তুমি চিন্তা করিয়া দেখ; তোমার এই অংগগুলি তুমি নিজে সৃষ্টি কর নাই। যিনি তোমাকে এই অংগগুলি দান করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ পাপ কাজে ও এইরূপ অপকর্মে এই অংগগুলিকে ব্যবহার করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার নাফরমানী করার সময় তিনি ইচ্ছা করিলে এই অংগগুলিকে ছিনাইয়া নিয়া তোমাকে বিকলাংগ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি মহা ধৈর্যশীল। দুনিয়ার জীবনে তিনি এইগুলি ছিনাইয়া নিবেন না—যথেষ্ট মোহ্লৎ (সময়) দিবেন। কিন্তু পরকালে তাঁহার ভীষণ আযাবের কথা এবং সীমাহীন গযব ও গোস্বার কথা তোমাদের মনে রাখা উচিত এবং পাপ কাজে আল্লাহ্র এই দানসমূহকে ব্যবহার করা হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত। দুনিয়াতেও পাপের শাস্তি যে একেবারে হয় না তাহা নহে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা সব সময় উহা দেখান না। কখনও কখনও শুধু নজীর দেখাইয়া থাকেন। কারণ, প্রশ্ন আউট হইয়া গেলে ত আর পরীক্ষা হয় না। আর এ দুনিয়া ত শুধু পরীক্ষারই জায়গা। হাদীস শরীফে আছেঃ

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ حَتّٰى يُعْلِنُوْابِهَا اِلَّا فَشَافِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْاَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ مَّضَتْ فِىْ اَسْلَافِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا ـ (ترغيب ترهيب)

অর্থাৎ, যে জাতির মধ্যে যেনা-ব্যভিচার এবং বেহায়ায়ী (নির্লজ্জতা) খুব বেশী হইবে, এমন কি শেষে আর লজ্জাবোধ বলিতে কিছু থাকিবে না, প্রকাশ্য হইয়া পড়িবে, তখন তাহাদের মধ্যে মড়ক, মহামারী দেখা দিবে এবং এমন এমন বিরাট রোগ দেখা দিবে, যাহা তাহাদের পূর্ব-পরুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল না।

যে ব্যক্তি নাচ বা রং-তামাশার অনুষ্ঠান করিবে বা মাহ্ফিল করিবে, তাহার পাপ হইবে সকলের চেয়ে বেশী।

কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়া গিয়াছেনঃ

مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَّايَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَايَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ـ (ترمذى شريف)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্-রাসূলের সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে কোন নূতন পাপের পন্থা সৃষ্টি করিবে—যতলোক তদনুযায়ী আমল করিবে সকলের সমষ্টির সমান পাপের ভাগী সে একা হইবে; অথচ তাহাতে তাহাদের পাপ কম হইবে না।

অনেক সময় এমন হয় যে, পরস্ত্রীর সুর, রং এবং নাচ দেখার কারণে নিজের স্ত্রী হইতে মন ফিরিয়া যায়। এইরূপ হইলে মানুষের সংসারও মাটি হইয়া যায়। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য—আল্লাহ্, রাসূল যে জিনিসকে ঘৃণা করেন সে জিনিসকে তাহারও ঐরূপ ঘৃণা করা উচিত, যেরূপ সে তাহার নিজের মনের ঘৃণিত জিনিসকে ঘৃণা করে।

গান-বাদ্য

মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, কিন্তু সে স্বাধীনতা নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে। মানুষ যত রকমেরই শিল্পের উন্নতি করুক না কেন, তাহার সবেরই মূল সম্পদ আল্লাহ্রই সৃষ্ট এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত। কাজেই আল্লাহ্র দান করা সম্পদের দ্বারা শিল্পের উন্নতির বেলায় আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার ভিতরেই মানুষের থাকা উচিত। মানুষ চায় আনন্দ, নিরানন্দ জীবন তাহার পক্ষে হইয়া পড়ে দুর্বিষহ। কিন্তু সে আনন্দের সীমা নির্ধারিত আছে। সীমাহীনভাবে আনন্দ ভোগ করার জন্য মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। নাচ-শিল্প, বাদ্য শিল্প, সুর-শিল্প—এক কথায় যাবতীয় শিল্পের মূল সম্পদ আল্লাহ্ প্রদত্ত। নাচ-শিল্পের জন্য দরকার হয় একটি দেহের, সেই দেহটি আল্লাহ্ প্রদত্ত ; বাদ্য শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয় হাতের, মুখের, যন্ত্রের মস্তিষ্কের এবং শক্তির, ইহার সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত ; আর সুর-শিল্পের মূল সম্পদ গলার আওয়াজ, কিন্তু গলার আওয়াজ কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্র সৃষ্ট পদার্থের ভিতর আল্লাহ্র দেওয়া মাথা খাটাইয়া, আল্লাহ্র দেওয়া শক্তি খাটাইয়া সৌন্দর্য বাড়ানোর নামই শিল্পের উন্নতি।

আল্লাহ্ তা'আলা আনন্দ উপভোগের জন্য যে সীমা নির্ধারিত করিয়াছেন তাহাতে নাচ শিল্পের আদৌ অনুমতি নাই। এইরূপে নারীর সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধান অথবা উহার প্রদর্শনী করার আদৌ স্বাধীনতা নাই। নারীর দেহের মালিক স্বয়ং নারী নয়, তাহার দেহের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এই জন্যই সে যদি তাহার নিজের গলা কাটিয়া ফেলিতে চায় বা তার নিজের বুকে সে নিজে পিস্তলের গুলী করিতে চায়, এমন স্বাধীনতা তাহাকে দেওয়া হয় নাই। এইরূপে নারীকে এ স্বাধীনতাও দেওয়া হয় নাই যে, সে তাহার দেহের সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়া উহা পরপুরুষকে দেখাইবে বা সে তাহার দেহের অংগগুলি দ্বারা নাচ করিয়া অন্য পুরুষকে দেখাইবে। —অবশ্য সে তাহার নিজের স্বামীকে দেখাইতে পারে। এইরূপে পুরুষেরও স্বাধীনতা নাই পরস্ত্রীকে দেখার। শুধু নাচের বেলায় এবং সৌন্দর্য প্রদর্শনীর বেলায়ই নয়, নারীর সৌন্দর্য একমাত্র স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের পক্ষে কোন রকমেই দেখার স্বাধীনতা নাই।

সাধারণতঃ গান এবং বাদ্য একই সংগে হয় এবং বাদ্যের সংগে যে গান হয় তাহা সাধারণতঃ স্ফুর্তি এবং আনন্দ উপভোগের জন্যই হইয়া থাকে। এইজন্য গান-বাদ্যকে সাধারণভাবে হারাম করা হইয়াছে। গান অর্থাৎ সুর-শিল্প সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ط أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

ইহার মর্মার্থ এই যে, অনেক লোক এমন আছে, তাহারা গ্রহণ করে, ক্রয় করে কথার খেলা, কথার শিল্প, আল্লাহ্র দ্বীন থেকে লোকদিগকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার জন্য, আল্লাহ্র দ্বীনকে লোকের নিকট ঠাট্টার বস্তু করার জন্য। (অর্থাৎ, তাহারা কথায় কথায় খেলা খেলায়। কথা-শিল্পের এবং সুর-শিল্পের তাহারা উৎকর্ষ সাধন করিয়া আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে মানুষের যে আধ্যাত্মিক

উন্নতির বস্তু আছে, তাহা হইতে মানুষকে গাফেল করিয়া হাসি-ঠাট্টা, মিথ্যা আনন্দ উপভোগ এবং খেল-তামাশায় তাহাদিগকে মগ্ন করিয়া দেয়।) যাহারা এই ধরনের লোক তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে এমন শাস্তি এবং এমন আযাব, যাহার কারণে তাহাদের ভীষণভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

বাদ্য-শিল্প সম্বন্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

اِنَّ اللهَ بَعَثَنِىْ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ وَاَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ وَالْاَوْثَانِ وَ الصَّلِيْبِ وَاَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ـ (مسند احمد)

অর্থাৎ, বিশ্বমানবকে সত্য পথ বাতাইয়া দিয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্র অনুগ্রহের পাত্র বানাইবার জন্যই আল্লাহ্ আমাকে এই দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন। সর্বশক্তিমান মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করিয়াছেন হাতের বাদ্য এবং মুখের বাদ্য উভয় প্রকার বাদ্যের অবৈধতা ঘোষণা করার জন্য এবং উভয় প্রকার বাদ্যকে, মূর্তিপূজাকে, ক্রুশকে এবং আল্লাহ্র প্রেরিত ইসলামী আদর্শ বিরোধী অন্যান্য যত প্রকার জাহেলিয়াতের কুসংস্কার আছে সবগুলিকে দুনিয়া হইতে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত করিয়া দেওয়ার জন্য।

অবশ্য লোকদিগকে বিপদ হইতে সতর্ক করিবার জন্য বা কোন খবর ঘোষণা করিবার জন্য বা যোদ্ধাদের মধ্যে বীরত্বের জোশ পয়দা করিবার জন্য যদি বাদ্য হয় তবে তাহা শরীঅতে জায়েয আছে—যেমন গাড়ী ছাড়িবার সময় বাঁশী বাজান হয়, ইফ্তারের, নামাযের, সেহ্রীর বা রোযার খবর ঘোষণা করার জন্য নাকারা বাজান হয় বা যুদ্ধক্ষেত্রে রণবাদ্য বাজান হয়, এগুলি জায়েয আছে। কিন্তু সারাঙ্গী, বেহালা, হারমোনিয়াম, বাঁশী, করতাল, দোতার, সেতার, ঢোল, তবলা ইত্যাদি বাদ্য জায়েয নাই। এই সকল বাদ্য হয় সাধারণতঃ সময় নষ্ট করার জন্য, আনন্দ উপভোগের জন্য এবং মানুষকে পরকালের চিন্তা হইতে বিরত রাখিয়া ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য।

বাদ্যসহ ত কোন গানই জায়েয নাই। বাদ্য ছাড়া গান যদি নারী বা বালক-প্রেমের কথা সংক্রান্ত না হয়, পরনিন্দা বা ব্যক্তিগত কোন সীমাহীন প্রশংসা তাহাতে না হয়; বরং আল্লাহ্র প্রশংসা, রাসূলের প্রশংসা, ইসলাম ধর্মের প্রতি এবং ইসলামী আদর্শের প্রতি যদি তাহাতে প্রেরণা থাকে, দেশপ্রেমের কথা যদি তাহাতে থাকে, তবে তাহা নারীর গলায় না হইয়া যদি পুরুষের কণ্ঠে সুন্দর আওয়াজে গাওয়া হয়, তবে তাহা না-জায়েয হইবে না। এই ধরনের গানকে বাংলার মুসলমান সমাজে গান বা সঙ্গীত বলা হয় না, বলা হয় গযল। নাম যাহাই হউক না কেন, আসল বস্তু চিনিয়া লওয়া দরকার।

আজকাল দুইদল লোক গান-বাদ্যের প্রতি খুব ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একদল হইতেছে এইরূপ যে, ধর্মের প্রতি তাহাদের আদৌ কোন মতিগতি নাই। তাঁহাদের জন্য শুধু আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি— যাহাতে তাহারা সত্য জিনিসটা বুঝিয়া ধর্মের দিকে ফিরিয়া আসে। আর একদল লোক এমন আছে, যাহারা ধর্মের নামে, মারে'ফাৎ বা তাছাওউফের নামে বা চিশ্তিয়া তরীকার নামে গান বাদ্যের দিকে ঝোঁকে। তাহাদের একটু চিন্তা করিয়া ও খোঁজ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি যে, নবীর তরীকার বিরুদ্ধে কোন পীরের তরীকা হইতে পারে কি ? আর কোন নামধারী পীর নবীর তরীকার বিরুদ্ধে কোন তালীম করিলে যদি তাহা নবীর তরীকার বিরুদ্ধে যায়, তাহা হইলে সে নাজাত পাইতে পারে কি ?—কস্মিনকালেও না। এইভাবে যে নবীর তরীকার বিরুদ্ধে যাইবে, সে

আল্লাহ্‌কে পাইতে পারিবে কি? কখনও না। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি কি নবীর তরীকার বিরুদ্ধে কোন কাজ নিজে কখনও করিয়াছেন? বা কোন তরীকতপন্থীকে তিনি ঐরূপ করিতে এজাযৎ দিয়াছেন? কখনো দেন নাই। বিশ্ববিখ্যাত পীরে-কামেল হযরত শায়খ সা'দী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید   که هرگز بمنزل نخواهد رسید

"অর্থাৎ, নবীর তরীকার খেলাফ কোন তরীকা ধরিয়া কেহ কস্মিনকালেও খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না।" খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতীকে অনর্থক তোহ্‌মত বা অপবাদ দেওয়া ভয়ানক গোনাহের কাজ। তিনি কখনও গান-বাদ্য করিয়া যান নাই। অবশ্য সুন্দর আওয়াজে আল্লাহ্‌র কালাম বা ছন্দবদ্ধ কবিতায় আল্লাহ্, রাসূলের প্রেমের কথা বা কোন আশেকে রাসূল, আশেকে খোদা বুযুর্গের রচিত এশকে রাসূল বা এশকে খোদার কবিতা কোন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দ্বারা বিনা বাদ্যযন্ত্রে খাছ মজলিসে পড়াইয়া শুনিয়াছেন, তাহাও কোন নফসানী আনন্দ উপভোগের জন্য নহে ব্যবসা বা পেশা আকারে নহে; বরং নিজের ভিতরে আল্লাহ্‌র ও রাসূলের এশকের আগুন বাড়াইবার জন্য। হাদীস শরীফে এইরূপ আসিয়াছে যে, হুযূরের নিকট দুইজন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা দফ বাজাইয়াছিল ও তাহারা সুর দিয়া কবিতা পাঠ করিয়াছিল বা গান গাহিয়াছিল, তাহা আমাদের নবী করীম (দঃ) আদৌ নিষেধ করেন নাই; বরং তিনি তাহা নীরবে শুনয়াছিলেন। এই হাদীসের দ্বারা যাহারা গান-বাদ্য জায়েয হওয়ার দলীল গ্রহণ করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে নবীর তরীকা গ্রহণ করে না; বরং তাহারা নফ্‌সের খাহেশের কারণে হিন্দুর তরীকা ও প্রচলিত প্রথাকে গ্রহণ করিয়াছে; আর এখন শুধু জিদ বা হঠকারিতার কারণেই হাদীসের বাহানা করে। কারণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু পরিমাণ পবিত্র আমোদ-প্রমোদ স্ফুর্তি বা খেলাধুলা জায়েয রাখা হইয়াছে। ইহাও সেই পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ দফ্—বন্ধ ঢোল বা তবলাকে বলে না। দফ্ বলে সেই ঢোলকে যার পিছনের দিক বন্ধ নয়— একেবারেই খোলা। যেমন আমাদের ছেলেমেয়েরা বক্‌রা ঈদের সময় গরুর ঝিল্লিপর্দাকে ভাংগা কলসী বা ঘড়ার মুখে লাগাইয়া বাজাইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ঢোল বাজান, করতাল বাজান, বাঁশী বাজান, দোতার, সেতার, সারাঙ্গ, বেহালা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাজান কিছুতেই প্রমাণিত হইতে পারে না। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের এতটুকু গান-বাদ্যও যখন মাত্রায় কিছু বেশী হইয়া গেল এবং হযরত ওমর যখন ঐ মজলিসে আসিলেন, তখন মেয়েরা সব গান-বাদ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম তখন বলিলেন, "হে ওমর!" আপনাকে দেখিয়া শয়তান পলায়। আপনি যে গলি দিয়া হাঁটেন, শয়তান সে গলিতে যাইতেও ভয় পায়।' যদি গান বাদ্য পছন্দনীয় কাজ হইত, তবে এই কাজকে নবী আলাইহিস্‌সালাম শয়তানী কাজ বলিলেন কেন? প্রিয় পাঠক! নফ্‌সের খাহেশের পায়রবী ছাড়িয়া চিন্তা করিয়া নবীর তরীকা ধরিয়া চলুন; অন্য মানুষের অন্ধ অনুকরণ ছাড়ুন। নিম্নে উক্ত পূর্ণ হাদীসটি উদ্ধৃত করা গেল।

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ كُنْتُ نَذَرْتُ اِنْ رَدَّكَ اللهُ صَالِحًا اَنْ اَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَاَتَغَنّٰى فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِىْ وَاِلَّا فَلَافَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ اَبُوْبَكْرٍ

رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ وَھِیَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِیٌّ رَضِیَ اللہ عَنْہُ وَھِیَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ (رضی) وَھِیَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ (رضی) فَاَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اِسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهَا فقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَاعُمَرُ اِنِّیْ كُنْتُ جَالِسًاوَّ هِیَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ اَبُوْبَكْرٍ وَهِیَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِیٌّ وَهِیَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِیَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلْتَ اَنْتَ يَاعُمَرُ اَلْقَتِ الدُّفَّ ـ

(رواہ الترمذی)

وَقَالَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَیْضًا یَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِہٖ مَالَقِیَكَ الشَّیْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَیْرَ فَجِّكَ ـ (متفق علیه)

وَقَالَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنِّیْ لَاَنْظُرُ شَیَاطِیْنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ قَدْفَرُّوْا مِنْ عُمَرَ ـ (رواہ ترمذی)

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ دَخَلَ اَبُوْبَكْرٍ وَّ عِنْدِیْ جَارِیَتَانِ (وَالْجَارِیَةُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَّمْ تَبْلُغِ الْحُلُمَ) مِنْ جَوَارِی الْاَنْصَارِ تُغَنِّیَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْاَنْصَارُ یَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتْ وَلَیْسَتَا بِمُغَنِّیَتَیْنِ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ اَمَزَامِیْرُ الشَّیْطَانِ فِیْ بَیْتِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَذٰلِكَ فِیْ یَوْمِ عِیْدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَااَبَابَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِیْدًا وَّھٰذَا عِیْدُنَا ـ (بخاری شریف) صفحه ۱۳۰ ـ ج ۱

এই হাদীসের মর্মার্থ—একবার হযরত নবী (আঃ) জেহাদে গিয়াছিলেন। জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার নিকট একটি অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা আসিয়া বলিল; হুযূর! আমি মান্নত মানিয়াছিলাম, আল্লাহ্ যদি আপনাকে ছহীহ্ সালামতে ফিরাইয়া আনেন, তবে আমি খুশীতে আপনার সামনে দফ্ বাজাইয়া এবং গীতগাহিয়া আনন্দ প্রকাশ করিব। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন; আচ্ছা যদি তুমি মান্নত মানিয়াই থাক, তবে তুমি দফ্ বাজাও। যদি মান্নত না মানিয়া থাক, তবে বাজাইও না। বালিকাটি দফ্ বাজাইতে লাগিল। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিলেন—তখনও সে দফ্ বাজাইতেছিল। তারপর হযরত আলী (রাঃ) আসিলেন, তখনও সে দফ্ বাজাইতেছিল। তারপর হযরত ওসমান (রাঃ) আসিলেন, তখনও সে দফ্ বাজাইতেছিল। তারপর যখন হযরত ওমর (রাঃ) আসিলেন, তখন ঐ বালিকাটি ভয়ে দফ্ বাজান ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি দফ্‌টি লুকাইবার জন্য উহা তাহার পাছার তলে রাখিয়া উহার উপর বসিয়া পড়িল। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন; 'হে ওমর! শয়তান আপনাকে বড়ই ভয় করে। আমি বসিয়াছিলাম, তখনও সে বালিকাটি দফ্ বাজাইতেছিল; তারপর আবু বকর আসিলেন তখনও সে দফ্ বাজাইতেছিল; তারপর আলী আসিলেন, তখনও সে উহা বাজাইতেছিল; তারপর ওসমান (গণী) আসিলেন, তখনও সে দফ্ বাজাইতেছিল। কিন্তু যখন আপনি আসিলেন, হে ওমর! তখন সে আর দফ্ বাজাইতে সাহস করে নাই। তখন সে দফ্ ফেলিয়া দিয়াছে। —তিরমিযী শরীফ। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত ওমর সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন; হে ইবনে খাত্তাব! আমি খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, শয়তান আপনাকে এত ভয় করে যে, আপনাকে যদি সে একটা রাস্তা দিয়া যাইতে দেখে, তবে সে ঐ রাস্তায় আসিতেও সাহস পায় না! সে অন্য

রাস্তার দিকে চলিয়া যায়। (বোখারী ও মুসলিম।) হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন; 'হে ওমর! আমি দেখি যে, মানুষ শয়তান এবং জ্বিন শয়তান উভয়ে আপনাকে দেখিলে ভাগিয়া পালায়'। এই হাদীসের দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের দফ্ বাজান এবং গীত গাওয়া যদিও হারাম নহে, কিন্তু কাজটা শয়তানী কাজ। অন্য হাদীসে আছে; আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক দিন আমি আমার বাড়ীতে ছিলাম; আমার আব্বা হযরত আবুবকর আসিয়া দেখিলেন, দুইটি বালিকা গীত গাহিতেছে। তাহারা অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা ছিল এবং গায়িকাও ছিল না। বিনা শিক্ষায় বিনা সুরশিল্প চর্চায় স্বাভাবিকভাবে তাহারা গীত গাহিতেছিল। আমি তাহাদিগকে মানা করিতেছিলাম না এবং হযরত রাসলুল্লাহ্ (দঃ)-ও তাহাদিগকে মানা করিতেছিলেন না। কিন্তু আমার আব্বা হযরত আবুবকর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ঘরে গীত গাহিতে দেখিয়া খুব রাগান্বিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌র ঘর আর শয়তানের গীত! বালিকাদ্বয়ের গীতের বিষয়বস্তু কি ছিল? আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সর্বনাশা বুআস নামক যুদ্ধের দিন আনছারগণ যেসব বীরত্ব ব্যঞ্জক কবিতা গাহিয়া স্ব স্ব দলের যুদ্ধোন্মাদনা বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহাদের গীতের বিষয়বস্তু ছিল তাহাই। গীতের সময়টা ছিল ঈদের দিন। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে আবুবকর! প্রত্যেক জাতির একটা খুশীর দিন থাকে। এটা আমাদের ঈদের খুশীর দিন। তাই এইরূপ খুশীর দিনে, ঈদ বা বিবাহের দিনে ছোট বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের কিছু খুশী করিতে দেওয়া উচিত। এই হাদীস দুইটি খুবই প্রণিধানযোগ্য।

কোন কোন তথাকথিত ছুফী নামধারী লোক এই দুইটি হাদীসের দ্বারা তাহাদের নফসানী খাহেশে গান-বাদ্য নর্তন-কুর্দন ইত্যাদি জায়েয প্রমাণ করিতে চাহেন। অধিকন্তু তাঁহারা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ইহাও বলিয়া থাকেন যে, চিশতিয়া তরীকায় গান-বাদ্য জায়েয আছে। এইরূপ উক্তি করা তাঁহাদের শুধু মূর্খতাই নহে, অধিকন্তু ইহা তাঁহাদের নির্লজ্জতা এবং ধৃষ্টতারও পরিচায়ক। কারণ, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের কাজ বয়স্কদের জন্য কোন দলিল হইতে পারে কি? অধিকন্তু যে কাজকে রাসূলুল্লাহর সামনে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) দুই প্রধান ও প্রথম খলীফাদ্বয় শয়তানী কাজ বলিলেন, অথচ হযরত রাসূললুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহাদের কথা রদ করিলেন না; সেই কাজ কোন ছুফী দরবেশের কাজ হইতে পারে কি? হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ) নিজে শওক করিয়া কাহারও দ্বারা গান গাওয়াইয়া বা বাদ্য বাজাইয়া সারা জীবনে কখনও শুনিয়াছেন কি? খোলাফায়ে রাশেদীন কখনও গীত বা বাদ্য শুনিয়াছেন কি? তরীকতের পীরগণ—যেমন, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) কখনও গান গাওয়াইয়া বা বাদ্য বাজাইয়া শুনিয়াছেন কি? কেহ ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে কি? কস্মিনকালেও নয়। অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রথম হাদীসে উল্লিখিত ঘটনায় বালিকাটিকে দফ্ বাজাইতে এজাযত দেওয়া হইল কেন এবং দ্বিতীয় হাদীসেই বা নিষেধ করেন নাই কেন? আবার শেষ ভাগে তিনি একথা বলিলেন কেন যে, এইটা আমাদের ঈদের দিন, খুশীর দিন? একথার তাৎপর্য এখন শুনুনঃ—দুনিয়াতে যত কাজ আছে, তাহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে;—(১) অবশ্য করণীয়—যেমন নামায, রোযা, যাকাত, সতীত্বরক্ষণ, চরিত্রসংরক্ষণ, দুর্নীতি দূরীকরণ, লোকসেবা, পরোপকার ইত্যাদি। ইহাকে ফরয বা ওয়াজিব বলা হয়। এই প্রকারের কাজ ব্যক্তিগতভাবেও করিতে হইবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে পক্ষ হইতেও জারি করার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে। (২) দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে পছন্দনীয় কাজ, ইহাকে মুস্তাহাব বলে। এই ধরনের কাজ ব্যক্তিগতভাবে এইরূপে করিতে হইবে, যাহাতে

অন্য কোন ফরয কাজ তরক না হয়। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কোন বাধ্যবাধকতা অরোপ করা যাইবে না, যেমন নফল এবাদত-বন্দেগী। (৩) তৃতীয় প্রকারের কাজ যাহা অবশ্য বর্জনীয় হারাম। এই ধরনের কাজ ব্যক্তিগতভাবেও বর্জন করিতে হইবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ হইতেও বর্জন করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেমন, সুদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, মানুষ খুন, যুবক-যুবতীদের অবাধ সহ-মিলন, সতীত্ব হরণ, যুল্ম অত্যাচার ইত্যাদি। (৪) চতুর্থ প্রকারের কাজ, যাহা বর্জন করার জন্য স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নাই বটে, কিন্তু কোরআন হাদীসের ইশারা ইংগিতে বুঝা যায় যে, উহা বর্জন করাই আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট অধিক পছন্দনীয়; ইহাকে মকরূহ বলে। (৫) পঞ্চম প্রকারের কাজ, যাহা মানুষের মনের মধ্যে আপনাআপনি স্বভাবগত ভাবেই উৎপন্ন হয়। এরূপ কাজ এক সীমা পর্যন্ত সহনীয় হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে তাহাও বর্জনীয় এবং উহাকে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালক-বালিকাদের খুব ভালবাসিতেন। তাহাদের কোমল মনে তিনি কখনও ব্যথা দিতে চাহিতেন না। এই জন্যই তিনি প্রথম অবস্থায় অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদিগকে বীরত্বব্যঞ্জক গীত গাহিতে বা দফ্ বাজাইতে নিষেধ করেন নাই। বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ছহীহ্ সালামতে ফিরিয়া আসিবার জন্য যে বালিকাটি মান্নত মানিয়াছিল, তাহার মনে আবেগ কতদূর প্রবল ছিল! এত প্রবল আবেগকে বাধা দেওয়া যাইতে পারে শুধু তখন যখন কোন পরিষ্কার হারাম বা বর্জনীয় কাজ করিতে চাওয়া হয়, নতুবা সহনীয় কাজের বেলায় এত প্রবল আবেগকে বাধা দেওয়া সমীচীন হয় না। ঠিক এরূপে ঈদের খুশীর দিনেও শাদীর খুশীর দিনেও সীমার ভিতরকার সহনীয় কাজে বালক-বালিকাদিগকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। অবশ্য ইহা শুধু অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালক-বালিকাদের জন্য, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ লোকদের জন্য বা স্ত্রীলোকদের জন্য নহে। এইরূপে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদিগকে যে বাদ্য-যন্ত্রের এজাযত দেওয়া হইবে,তাহাও শুধুমাত্র দফের জন্য দেওয়া যাইবে; অন্য কোন বাদ্য-যন্ত্রের এজাযত কিছুতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না এবং গীতের বিষয়বস্তুও বীরত্বমূলক বা ঈমান, ইসলাম ও নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক হইতে হইবে—ফাসেকী, অবৈধ-প্রেমমূলক, পরনিন্দামূলক বা শিরক্‌মূলক হইলে তাহার এজাযত কিছুতেই দেওয়া হইবে না।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সহনীয় বিষয়গুলি শিল্প হিসাবে চর্চা বা ইহার জন্য সময় ও সম্পদ নষ্ট করা কিছুতেই সহনীয় হইবে না। ষ্টেটের বায়তুল মালের পয়সাও ইহার জন্য খরচ করার এজাযত হইবে না। অবশ্য আপনাআপনি ছেলেপিলেরা তাহাদের মনের স্ফূর্তির জন্য বা শরীরের কসরতে জন্য কিছু সময় পরিমাণ কিছু চর্চা করিলে তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত হইবে না।; তবে সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে বাধা দিতে হইবে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন শরীফ পড়াইয়া শুনিয়াছেন, ভাল কবিতা পুরুষ লোকের দ্বারা পড়াইয়া শুনিয়াছেন। হাতিয়ার লইয়া যুদ্ধ চর্চা বা দৌড়াইয়া পরিমিত পরিমাণ শরীর চর্চা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কাজের ভিতর দিয়া শরীর চর্চা করিয়াছেন। ছাহাবায়ে কেরামগণও তদ্রূপ করিয়াছেন। এতটুকু ছাড়া কস্মিনকালেও তাঁহারা শওক করিয়া গান-বাদ্য শুনেন নাই বা খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুকে অযথা সময় বা সম্পদ নষ্ট করেন নাই। অতএব, যাহারা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে বা যাহারা ছুফী দরবেশ, তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা এবং ছাহাবাগণের তরীকার সীমা ছাড়াইয়া যাওয়া কিছুতেই উচিত হইবে না।

কুকুর পালা এবং ছবি রাখা

খৃষ্টান ধর্মে বা হিন্দু ধর্মে কুকুর পালায় বা ছবি (মূর্তি ও ফটো) রাখায় কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। খৃষ্টানদের প্রভাবে যাহারা প্রভাবিত হইয়াছে তাহারা খৃষ্টানদের অনুকরণ করিয়া কুকুর পালা এবং ছবি রাখা শুরু করিয়াছেন। সেই দেখাদেখি ধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ কিছুসংখ্যক মুসলমানও ছবি রাখা এবং কুকুর পালা শুরু করিয়াছেন। অথচ আমাদের প্রাণপ্রিয় পয়গম্বর আলাইহিসসালাম অত্যন্ত তাকীদের সহিত কুকুর পালিতে এবং ছবি রাখিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যাহারা মুসলমান নাম ধারণ করা সত্ত্বেও নবীর আদেশ পালন না করিয়া অন্য মিথ্যা ও ভুল ধর্মের অনুকরণ করে, তাহাদের চেয়ে হতভাগা ইহ-পরকালে আর নাই। হযরত নবী (আঃ) বলিয়াছেন, যে বাড়ীতে বা যে ঘরে কুকুর থাকিবে অথবা ছবি থাকিবে, সে ঘর এবং সে বাড়ী হইতে আল্লাহ্র রহ্মতের খাছ ফেরেশ্তা চলিয়া যাইবে। বোখারী শরীফে হযরত নবী আলাইহিস্সালাম আরও বলিয়াছেন। সবচেয়ে বেশী আযাব তাহাদের হইবে, যাহারা ছবি (মূর্তি বা ফটো) বানাইবে।

নবী আলাইহিস্সালাম বলিয়াছেনঃ (১) শিকার ধরিবার উদ্দেশ্যে, (২) বকরী পাহারার উদ্দেশ্যে, (৩) আখ ইত্যাদি কৃষিক্ষেত্রে পাহারার উদ্দেশ্যে, এই তিনটি উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে যে কেহ কুকুর পালিবে, দৈনিক তাহার নেকী হইতে এক এক কীরাত কম হইতে থাকিবে (বোখারী শরীফ)। অন্য হাদীসে আছে, এক কীরাত ওহুদ পাহাড়ের সমান।

এইসব হাদীসের দ্বারা ছবি রাখা এবং কুকুর পালা হারাম প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব, শিশুদের খেলনারূপেও রবারের মূর্তি অথবা মাটি, পাথর বা কাঠের পুতুল ব্যবহার করা ও ঘরে রাখা না-জায়েয। কোন কোন ছেলের কুকুরের বাচ্চা পালার শওক হয়। কিন্তু কিছুতেই মুরব্বিদের এই শওক পুরা করা চাই না।

ছবি ফটো চার প্রকার হইয়া থাকেঃ—(১) প্রথম প্রকার যাহাকে ভক্তি করা হয়। যেমন, কোন দেব-দেবীর ছবি বা কোন পীর-পয়গম্বরের ছবি, কোন মন্দিরের ছবি বা কোন ক্রুশ কাঠের ছবি; ইহা সবচাইতে বড় গোনাহ্। (২) দ্বিতীয়—কোন সুন্দরী নারীর ছবি, যাহা দেখিলে পুরুষের উত্তেজনা বাড়ে, ইহাতে দ্বিগুণ গোনাহ্। (৩) তৃতীয়—সাধারণ ছবি যাহাতে কোন উত্তেজনা নাই, ইহাতে এক গোনাহ্। (৪) চতুর্থ—নির্জীব পদার্থের ছবি। কোন মিথ্যা ধর্মের ধর্মীয় চিহ্ন না হইলে, সেরূপ নির্জীব পাদার্থের ছবি আঁকাতে বা রাখাতে কোন গোনাহ্ নাই। কুকুর এতই অপবিত্র জিনিস যে, কুকুর যদি পাত্রে মুখ দেয়, তবে সে পাত্রকে সাতবার পানি দিয়া ও একবার মাটি দিয়া ধৌত করার হুকুম হাদীস শরীফে আসিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—ধর্মজ্ঞান না থাকার কারণে অনেকে এহেন না-পাক জিনিসকে ঘরে স্থান দেয়।

মানুষের শরীরের ১০টি সুন্নাতে আম্বিয়া

মানুষের শরীরের মধ্যে ১০টি প্রধান ইসলামী সুন্নত (আদর্শ) আছে। এই সুন্নতগুলি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম হইতে শুরু করিয়া সমস্ত নবীরই সুন্নত। কিন্তু যখন ইঞ্জিল-তৌরাতকে

দুষ্ট লোকেরা বিকৃত করিয়াছে, তখন হইতে এই সুন্নতগুলিকেও তাহারা বাদ দিয়াছে। দুঃখের বিষয়, খৃষ্টানী প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া কিছুসংখ্যক মুসলিম নামধারী অজ্ঞ যুবকও (নেহাত অল্প বুদ্ধিবশতঃ) খৃষ্টানী সভ্যতা বনাম বর্বরতার অন্ধ অনুকরণ করিয়া, দুনিয়াতে নিজেদের দুর্বলতার পরিচয় দিতেছে। এবং আখেরাত বরবাদ করিতেছে। উক্ত ১০টি সুন্নত, যথা—'খাৎনা' অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের শরীঅতে মোহাম্মদীয়াতে এই ১০টি আদর্শত আছেই, তদুপরি আরো দুইটি ফরয আদর্শ বর্ধিত করা হইয়াছে। তাহার প্রথমটি হইতেছে, শরীর হইতে পেশাব-পায়খানা, রক্ত পুঁজ-পিত্ত, উল্‌টা বাতাস ইত্যাদি বাহির হইলে অথবা শরীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলে তখন ওযূ করিয়া পবিত্রতা হাছিল করিতে হইবে। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন বা স্বপ্নদোষ হইলে অথবা স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব শেষ হইলে ফরয গোসল করিয়া পবিত্রতা হাছিল করিতে হইবে।

খৃষ্টান প্রভাবে প্রভাবিত বা কোন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইসলামী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত লোক এই আদর্শগুলিকে ধর্মের অংগ মনে করে না। ইহা তাহাদের অজ্ঞতা বা পরানুকরণের হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে যেহেতু এই কাজগুলির প্রত্যেকটি কাজই নবী কর্তৃক ওহী দ্বারা শুধু যে প্রেরিত তাহাই নহে; বরং ইহা করার জন্য আদেশও করা হইয়াছে। সুতরাং উহাদের প্রত্যেকটি কাজই ধর্মের ফরয অংগ এবং রূহানিয়াত বা আত্মিক শক্তির পরিবর্ধক।

সংযম অভ্যাসের দ্বিতীয় স্তর

সংযম অভ্যাসের দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়; নতুবা মানুষ যদি সংযম অভ্যাস না করে, তবে মানুষ ইতর প্রাণী হইতেও অধম হইয়া যায়। বাল্যকালে লোভ রিপু প্রবল থাকে যাহা খাইতে মনে চায় তার সবকিছুই খাইতে দেওয়া হয় না। হারাম জিনিস হইতে মনকে ফিরাইয়া রাখিতে হয়, ক্রোধ রিপু বাল্যকালেও কিছু থাকে; যৌবনকালে উহা আরও বাড়ে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই গালি দেওয়া বা মারপিট করা যায় না; বরং উহা না করার জন্য মনকে চাপিয়া বাধ্য করিতে হইবে। যৌবনের প্রারম্ভে আর একটি সর্বনাশা রিপু—অর্থাৎ কাম রিপু দেখা দেয়। তাহা হইতে কিভাবে সংযমের অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা আমরা পূর্বে 'সংযম অভ্যাস' পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছে। এরপর দেখা দেয়, মানুষের মধ্যে অহঙ্কার, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা রিপু। মহত্ত্ব হাছিল করিতে হইলে মানুষের এই রিপুগুলিকে অবশ্য জয় করিতে হইবে এবং তারপর মোহ রিপুকে অর্থাৎ, খোদা ও আখেরাতকে ভুলিয়া দুনিয়ার মোহে মত্ত হইয়া থাকার ভাবকেও জয় করিতে হইবে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল পাশ্চত্য শিক্ষার মধ্যে জড় বিজ্ঞানের শিক্ষা ত প্রচুর পরিমাণেই আছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব শিক্ষা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা মোটেই নাই, এবং এজন্যই বিজ্ঞানের উন্নতিও টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। অবস্থা দৃষ্টে ইহাই মনে হইতেছে যে, হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি হইয়া একদিন বিজ্ঞানও হয়ত শেষ হইয়া যাইবে। অথচ জড় বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাও যদি দেওয়া হইত, তবে মানুষ ইহকাল এবং পরকাল উভয় কালেরই উন্নতি করিতে পারিত এবং সে উন্নতি স্থায়ীও হইত।

আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে যদিও আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, কিন্তু এখনও আমরা স্বাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা যোলআনা চালু করিতে পারি নাই। এখনও পাশ্চাত্যের অন্ধ

অনুকরণের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। এখনো আমরা জড় বিজ্ঞানের এবং আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধন করার এবং কোরআন ও সুন্নার আলোকে বিজ্ঞানের রিসার্চ করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারি নাই।

তাস-পাশা ইত্যাদি খেলা

প্রত্যেক পাপই মানুষের মধ্যে ছোট আকারে প্রবেশ করে, তারপর ক্রমশঃ উহা বড় হয়। ছোট বেলায় ছেলেরা হয়ত সামান্য বরই বা কুল চুরি করে; কিন্তু মা-বাপ মুরুব্বিয়ান তখনই যদি শক্তভাবে বাধা না দেয়, তবে শেষে হয়ত এই ছেলেরা একদিন সিদকাটা চোরে (বা ডাকাতে) পরিণত হইবে। এইরূপ আমাদের দেশে তাস-পাশা, কেরামবোর্ড, ফ্লাস, লটারী, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি খেলার প্রথা চালু হইয়াছে। এইসব খেলার ভিতর যদি বাজী রাখা হয়, তবে ত তাহা একেবারেই হারাম হইবে। আর যদি সেরূপ নাও হয়, তবুও মকরূহ তাহরীমা হইবে। কেননা, এইরূপ খেলার মধ্যে এত নেশা হয় যে, সময় কোথা দিয়া কত নষ্ট হইয়া যায় তাহার পাত্তাও থাকে না; এমন কি অনেক সময় নামাযেরও খেয়াল থাকে না। ঘুড়ি উড়ানের বাতিকও এই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, উপরোক্ত সর্ববিধ ক্ষতি ইহাতেও বিদ্যমান। বিশেষতঃ ঘুড়ি উড়ানের মগ্নাবস্থায় অনেক ছেলেকে ছাদ হইতে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেও দেখা যায়। অতএব, যাহারা সমাজের মুরব্বি তাহাদের এই ধরনের খেলা যাহাতে চালু না হইতে পারে, সেজন্য চেষ্টা করা দরকার। মানুষের জীবনের সময় অতি মূল্যবান সম্পদ, খেলা-ধুলায় এই সম্পদ নষ্ট করা নিতান্ত অন্যায়।

ফুটবল খেলা

ফুটবল খেলা বা ক্রিকেট খেলা আসল খেলা নয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে ভাল জিনিসও মন্দ হইয়া যায়। যদি অতিরিক্ত সময় নষ্ট, পয়সা নষ্ট বা কাজ নষ্ট হয়, যদি নামায কাযা না হয়, সতর না খোলে, কুসংসর্গে মেশা না হয়, তবে ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা শরীঅত অনুযায়ী মোবাহ থাকিবে। অতএব, যদি কেহ উপরোক্ত দোষগুলি এড়াইয়া শরীরের ব্যায়ামের উদ্দেশ্য উহা খেলে, তবে তাহা না-জায়েয হইবে না। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, খানার মধ্যে যেমন লবণ খুবই ভাল এবং প্রয়োজনীয় জিনিস, কিন্তু উহা অতিরিক্ত হইয়া গেলে খানা অখাদ্য হইয়া যায়। তেমনি মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যায়াম নেমকের তুল্য। অতএব, ২৪ ঘন্টার মধ্যে এক দেড় ঘন্টার অতিরিক্ত ব্যায়াম হওয়া উচিত নহে। ব্যায়ামও যদি এমন খেলার ভিতর দিয়া হাছিল করা যায় যদ্দ্বারা বীরত্ব বা সাহস বাড়ে অথবা তদুপায়ে কিছু কিছু রোযগারের উপায়ও হয়, তবে সেইটা আরও ভাল। ন্যায়ের কাজ বা ধর্মের কাজে লিপ্ত না হইয়া, খেলার মধ্যে বৃথা সময় নষ্ট করা অতীব অন্যায়—কাজেই উহা বড় পাপ।

আতশবাজি

আতশবাজির কুপ্রথা সম্ভবতঃ হিন্দুদের অনুকরণেই মুসলমান সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ শবে-বরাতে বা শাদী-বিবাহের সময় আতশবাজি ফুটান হইয়া থাকে। ইহার অপকারিতা

এই যে, ইহাতে অনর্থক পয়সা অপব্যয় হয়। অথচ অযথা পয়সা অপব্যয়কারীদিগকে আল্লাহ্ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে শয়তানের ভাই বলিয়া অখ্যায়িত করিয়াছেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলিয়াছেনঃ অযথা পয়সা অপব্যয়কারীদের আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন না। এতদ্ব্যতীত অনেক সময় আতশবাজি বা উহার আগুন নিয়া খেলা করাতে ছেলেমেয়েদের কাপড়-চোপড় বা গায়ে আগুন ধরিয়া যায়; এমন কি অনেক সময় বাড়িতেও আগুন লাগিয়া যায়। ইহাতে মানুষও অনেক মারা যায়। অতএব, এরূপ অপকারী কুপ্রথাকে বর্জন করা দরকার। ছেলেমেয়েদিগকেও এসমস্ত খারাপ কাজে পয়সা অপব্যয় করিতে দেওয়া শরীঅত বিরুদ্ধ।

মাথায় টিকি রাখা ও মাথার সামনের চুল লম্বা রাখা

মাথায় টিকি রাখা হিন্দুদের প্রথা! টিকি রাখা ত অত্যন্ত জঘন্য কাজ। কিছুদিন হইল খৃষ্টান ইংরেজদের দেখাদেখি অনেকে মাথার পিছনের দিকের চুল খুব খাট করিয়া সামনের দিকের চুল অনেক লম্বা করিয়া রাখে। এই প্রথাও যেহেতু বিধর্মীদের অনুকরণে আমাদের সমাজে ঢুকিয়াছে কাজেই ইহা ঘৃণ্য এবং বর্জনীয়। ছোট বালকদের মাথার চুল ত মুণ্ডাইয়া ফেলাই ভালো। এ ছাড়া পুরুষদের মাথার চুলও মুণ্ডাইয়া ফেলা জায়েয আছে। আগে পাছে সমান করিয়া ছাটিয়া রাখাও জায়েয আছে। আর যদি কেহ কান পর্যন্ত বা কাঁধ পর্যন্ত লম্বা করিয়া রাখে, তবে তাহাও জায়েয আছে; বরং ইহাতে যদি ফখর বা রিয়াকারী না থাকিয়া সুন্নত পালনের নিয়ত থাকে, তবে সুন্নতের সওয়াবও পাইতে পারে। স্ত্রীলোকের মাথার চুল কাটিয়া খাট করিয়া রাখা খৃষ্টানদের অনুকরণ। আর ঐ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিজাতীয় অনুকরণের পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক। অতএব, এই জঘন্য প্রথা হইতে বাঁচিয়া থাকা একান্ত আবশ্যক।

স্ত্রীলোকদের মাথার চুল লম্বা করিয়া রাখা উচিত। স্ত্রীলোকদের মাথার চুল অন্য পুরুষদের দেখাও হারাম। এই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে।

বিবাহ সম্পর্কে

অন্যান্য জাতি বা অন্যান্য ধর্মের মধ্যে অনেক পুরাতন প্রথাই উহার পুরাতনত্বের দরুন ঐ জাতির সভ্যতার বা ঐ ধর্মের অংগে পরিণত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে আধুনিক যুগে কোন প্রথার আধুনিকতাকেই সেই প্রথাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট বলিয়া ধরা হইতেছে। আবার আর একদল যুক্তিবাদীদের নিকট কোন প্রথার যৌক্তিকতাই উহাদের ধর্মের অংগ হওয়ার জন্য যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এত মজবুত যে, এখানে পুরাতনত্বের কোন দোহাইও চলে না, আধুনিকতার কোন যুক্তিও চলে না, আর নিছক যৌক্তিকতার কোন বুলিও গৃহীত হইতে পারে না। ইসলাম চায় কি? এবাদত বন্দেগীর অনুষ্ঠানই হউক, সভ্যতার কোন বিষয় হউক, কিংবা হালাল-হারাম, পাক-নাপাকের কোন মাসআলাই হউক, চাই চরিত্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোন বিষয়ই হউক—সর্বক্ষেত্রেই যতক্ষণ না কোরআন হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহ্-রাসূলের সাক্ষ্যের সনদ পাওয়া যাইবে, সে পর্যন্ত উহাকে কিছুতেই ইসলামের অঙ্গীভূত বলিয়া মানা যায় নাই এবং কস্মিনকালে যাইবেও না। কারণ, ইসলাম ধর্ম মানুষের মনগড়া ধর্ম নহে। ইহা নিছক আল্লাহ্র প্রেরিত ও রাসূলের প্রবর্তিত ধর্ম। ইহাতে রাজা-বাদশাহ বা মাওলানা-মৌলবীদের আদৌ কোন দখল নাই। মৌলবী-মাওলানাদের কৃতিত্ব শুধু এতটুকু যে, তাহারা

দুনিয়ার আয়েশ-আরামকে বিসর্জন দিয়া, জানমাল কোরবান করিয়া আসল আরবী ভাষায় কোরআন-হাদীসের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার জন্য হাজার কষ্ট সহ্য করিয়া নিজেদের জীবনকে তদনুযায়ী গঠন করিতে এবং সমাজকে তদনুযায়ী হেদায়ত করিতে ত্রুটি করেন না।

যুক্তি দুমুখো জিনিস। ইহা এদিকও চলিতে পারে ওদিকও চলিতে পারে। বহু পুরাতন প্রথাও এমন থাকিতে পারে যাহা আল্লাহ্‌র নিকট কিছুতেই পছন্দনীয় হইতে পারে না। আর আধুনিকতা বা যুগের চাহিদার ত কোন অর্থই হইতে পারে না। কারণ যুগের কোন চাহিদাই নাই—চাহিদা হয় মানুষের মনের। আর মানুষের মনকে সর্বদাই রাখিতে হইবে আল্লাহ্‌র তাবেদার করিয়া। নতুবা মনকে যদি স্বেচ্ছাচারী করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে মানুষের মুক্তি বা মানুষের উন্নতি সুদূর পরাহত।

পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি ইতর প্রাণীর মধ্যে বিবাহ্ বন্ধনের প্রথা নাই। কিন্তু মানব জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা মর্যাদা দান করিয়াছেন। কিন্তু মানব জাতির মধ্যে (সে যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউক না কেন) বিবাহ বন্ধনের প্রথা আদিকাল হইতেই প্রচলিত আছে। শুধু পুরাতন প্রথা বলিয়াই ইহা ইসলাম ধর্মে স্থান পায় নাই; বরং স্থান পাওয়ার কারণ এই যে, ইহার পিছনে কোরআন-হাদীসের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এবং প্রত্যেক যুগের নবীগণের সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

নারীর সতীত্ব রক্ষা করা যেমন আদি ফরয, নারী-পুরুষের মিলনের জন্য বিবাহ বন্ধনও তেমনি ফরয।

বিবাহ ইসলামী সভ্যতার একটি প্রধান অংগ। ইহা একটি সুসভ্য পবিত্র ধর্মীয় চুক্তি। এই পবিত্র চুক্তির জন্য বর-কনে উভয় পক্ষের (তরফাইনের) শপথ ও স্বীকারোক্তি প্রয়োজন এবং তাহাদের স্বীকারোক্তি বা ইজাব-কবূল সর্বসমক্ষে বা অন্ততঃপক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষীর সাক্ষাতে হওয়া চাই। এই পবিত্র চুক্তির বিষয়-বস্তুসমূহ ইসলামী সভ্যতার প্রাধান্যের যুগে সকলেরই জানা ছিল। এইজন্য সে জমানার যে মাসআলাগুলির উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় নাই—সেগুলি এই খৃষ্টানী সভ্যতার, তথা পাশ্চাত্য বর্বরতার প্রাধান্যের যুগে ইসলামী শিক্ষার অভাব হেতু, ইসলামের অন্যান্য মাসআলার ন্যায় বিবাহের চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কেও জনসাধারণ অজ্ঞ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা ধর্মকে বাদ দিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সভ্যতার অনুসারী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই মনে ইসলামী-সভ্যতা সম্পর্কে এমনকি পাপ-পুণ্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হইয়া পড়িয়াছে। একদল লোক ত মানব সভ্যতার কোন সনদ না পাইয়া পশুত্বের দিকে দ্রুত গতিতে ধাবিত হইতেছে। এইজন্য আমি বিবাহ-চুক্তির বিষয়বস্তুগুলিকে কোরআন-হাদীস হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিতেছি যাহাতে কেহ পদস্খলিত না হইতে পারে।

বিবাহ চুক্তি হয় একটি যুবক এবং একটি যুবতীর মধ্যে। কিন্তু যেহেতু যুবক ও যুবতীর মধ্যে উভয়ই বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন এবং ভাবাবেগে মত্ত থাকে, সেজন্য যদিও শেষ পর্যন্ত পাত্র-পাত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ হইতে পারে না, তবুও তাহাদের মুরুব্বিয়ানদের মধ্যে যাহাদের দাম্পত্য জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, যাহাদের মধ্যে এতদুভয়ের হিতকামনা প্রেরণাও পুরাপুরি বর্তমান আছে, এমন মুরুব্বিয়ানদের দ্বারাই পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত হইয়া থাকে। ইহা শুধু প্রথাই নহে; বরং সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসংগত এবং কোরআন-হাদীস দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত, বিশেষ করিয়া পাত্রীর পক্ষে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খৃষ্টানী সভ্যতার এবং পাশ্চাত্য বর্বরতার অন্ধ

অনুকরণকারীরা courtship প্রথা অর্থাৎ, বিবাহের পূর্বে অবাধ ও স্বাধীনভাবে মেলামেশার দ্বারা পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের জানা-শোনা ও পছন্দ করার প্রথাকে এদেশে চালু করিতে চাহিতেছে। আবার কেহ বা ইহাকে যুগের চাহিদা সাব্যস্ত করিয়া আমলও শুরু করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা যুগের চাহিদা নহে; বরং ইহা হীনমন্যতা ও বিবেক-বিচারহীন প্রবৃত্তির চাহিদা। যখন পতন আসে তখন মানুষ এমনি করিয়াই বিবেক বুদ্ধিহীন হইয়া থাকে। ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করিয়া মানুষ কখনও মনুষ্যত্বের উন্নতি করিতে পার না, পারে একমাত্র পশুত্বের বিকাশ সাধন করিতে। এই জন্য কোরআন মজীদে আল্লাহ্ পাক সমগ্র জগৎবাসীকে বজ্রগম্ভীর স্বরে জানাইয়া দিয়াছেন— وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ ইহার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ মানুষের ভিতর দুইটি জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন; একটি বিবেক (قلب) আর একটি প্রবৃত্তি (هوى نفس)। তারপর তিনি জানাইয়া দিতেছেন যে, "যাহারা প্রবৃত্তির বশবর্তী হইবে তাহারা নিশ্চয়ই বিপথগামী হইবে।"

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

আমাদের নবী করীম (দঃ) বলিয়া গিয়াছেন, সাধারণতঃ লোকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনকালে কুলীন বংশ, চামড়ার চাকচিক্য ও রূপ-সৌন্দর্য এবং মেয়ের পিতার অর্থ সম্পত্তি তালাশ করিয়া থাকে; কিন্তু তোমরা যারা আমার উম্মত তোমাদিগকে আমি বলিতেছি, খবরদার! খবরদার!! সর্বাগ্রে তোমরা লক্ষ্য করিবে—দ্বীনদারী ও পরহেযগারীর দিকে ঈমান ঠিক আছে কি না, নামায রোযার পাবন্দী আছে কি না, পর্দা পুশিদা ও সতীত্ব আছে কি না? আদব তমীয, মুরব্বি মান্যতা, পতিভক্তি, ছবর বরদাশত ও অল্পে তুষ্টির গুণ আছে কি না? সারকথা এই যে, রূপের চেয়ে বংশের চেয়ে এবং সম্পত্তির চেয়ে চরিত্রগুণের মূল্য অনেক বেশী। কাজেই সর্বাগ্রে তাহাই হইতে হইবে লক্ষণীয় বিষয়। সাবধান থাকিতে হইবে যে, আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়—কোন কোন আধুনিক নব্যশিক্ষিত যুবক-যুবতীর মধ্যে ঈমানদারী নাই, রোযা নামায নাই, পর্দা ও সতীত্বের কোন পরোয়া নাই। ইসলাম ধর্মের প্রতি কোন আস্থা নাই। কাজেই খবরদার! পাত্র-পাত্রীর দ্বীনদারী ও পরহেযগারীর অবস্থা অবশ্য বিশেষভাবে তাহকীক করিয়া পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন করিবে।

স্বামী-স্ত্রীর শপথ গ্রহণ

বিবাহ চুক্তিতে স্বামীর পক্ষের শপথ নিম্নরূপ হইবেঃ আমি স্ত্রীর (১) খোরাক (২) পোশাক ও (৩) থাকার ঘরের দায়িত্ব ভার এবং (৪) স্ত্রীর ইজ্জত-আবরু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতেছি। আর আমি (৫) স্ত্রীর সংগে যাবজ্জীবন সদ্ব্যবহারের অংগীকারও করিতেছি।

স্ত্রীর পক্ষের শপথ নিম্নরূপ হইবেঃ দুইটি মানুষের দ্বারা একটি সংসার গঠিত হইবে। দুইটি মানুষ দুই দিকে গেলে, সে সংসারে উন্নতি সুদূর পরাহত। কজেই একজনের নিশ্চয়ই অনুগমনকারী বা অনুসরণকারী হইতে হইবে। দুইটি মানুষ পৃথক পৃথকভাবে একেবারে অসম্পূর্ণ। দুইটি মানুষ মিলিয়াই একটি পূর্ণ মানুষ হইতে পারে। সুতরাং অংগীকার করিতেছি যে, (১) আমি আমার অস্তিত্বকে অদ্য হইতে আমার স্বামীর অস্তিত্বের সঙ্গে মিশাইয়া দিলাম। আমি স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিলাম। পতিই সতীর গতি—পতি-ভক্তিই সতী নারীর সর্বাপেক্ষা বড় পুণ্য—একথা আমি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া নিলাম। স্বামীর গার্হস্থ্য বিষয়াদি আমারই গার্হস্থ্য বিষয়।

স্বামীর সন্তান আমার সন্তান। স্বামীর মান-ইজ্জত আমারই মান-ইজ্জত। কাজেই (২) স্বামীর গৃহ ও গার্হস্থ্য বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণ আমারই দায়িত্ব, (৩) স্বামীর সন্তান পালন আমারই দায়িত্ব, (৪) স্বামীর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমারই দায়িত্ব এবং (৫) স্বামীর মান-ইজ্জত রক্ষা করাও আমারই দায়িত্ব।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের শপথ নিম্নরূপঃ আমাদের গুপ্ত অঙ্গের কোনরূপ ব্যবহার একমাত্র স্বামীর সহমিলন ব্যতিরেকে আমরা কুত্রাপি অন্য কোথাও করিব না; ইহা কঠোরভাবে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করি। অতএব, আমরা একে অন্যের গোপন ভেদ রক্ষণের এবং নিজ নিজ সততা ও সতীত্ব রক্ষণের অংগীকারে আবদ্ধ হইতেছি।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমনই মধুর প্রেমময় সম্পর্ক যে, এ ক্ষেত্রে আইন অপেক্ষা প্রেমই কার্যকরী করিতে হয় বেশী। যদিও আইনগতভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রক্ষাণাবেক্ষণ স্বামীর জিম্মায়, যদিও হাট-বাজার, মাঠ-ঘাঠ, কাচারী, দরবার প্রভৃতি স্বামীই করে, কিন্তু সে তাহার স্ত্রীর হাতেই খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করে। স্ত্রী স্বামীর ঘর সুসজ্জিত করিয়া রাখে। স্ত্রীই স্বামীর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করিয়া রাখে, স্ত্রীর কারণেই দরবারে স্বামীর সম্মান বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীর দরবারের কাজ স্বামীই করিয়া দেন। কাজেই ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করিলে পুরুষ জাতির পৃথক পৃথক শ্রেণী যুদ্ধ লাগানোর আদৌ কোন প্রশ্ন দেখা যায় না। কারণ, ইসলামের আইনগুলি পুরুষের গড়া নয়। স্বয়ং তিনি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সৃষ্টিকর্তা, তাঁহারই গড়ান।

খৃষ্টান পাদ্রীগণ বা হিন্দুসন্ন্যাসীরা বিবাহকে ধর্ম-বিরোধী মনে করিয়াছে। কিন্তু ইসলাম বিবাহকে ধর্মের একটি বিশেষ অংগ বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছে। কিন্তু বিবাহ্ ক্রিয়া কোন ব্যক্তির জন্য ধর্মের অংগ তখনই হইবে, যখন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বিবাহকারীই আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত শরীঅতের বিধান ও উপদেশানুসারে বিবাহ সম্পর্কিত কর্তব্যসমূহ সমাধা করিবে।

বৈবাহিক জীবন-যাপনই আমাদের নবীর আদর্শ। এখানে দুইটি কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন মনে হইতেছে। একটি কথা এই যে, বৈবাহিক জীবনের বিপরীত দিক কি এবং উহা কেমন? বৈবাহিক জীবনের বিপরীত দিক দুইটি। একটি এই যে, বিবাহ্ না করিয়া সংযম অভ্যাস করত পবিত্র আল্লাহ্‌র যেক্‌র-ফেকর এবং আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগীর ভিতর দিয়া জীবন-যাপন করা। এই কথাটি আপাত-মধুর এবং স্থূল দৃষ্টিতে খুবই উচ্চ ধরনের বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে ইহার কোনই মূল্য নাই, ইহা একেবারেই অবান্তর। দ্বিতীয় দিকটি এই যে, দায়িত্বের বোঝা বহনের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া পশুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করা। এই দিকটা যে পশুত্বের শামিল সে কথাটা এখনো দুনিয়ার অধিকাংশ লোক কার্যতঃ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে এমনও দিন আসিতে পারে, যেদিন উচ্ছৃঙ্খল মানুষেরা ইহাকে পশুত্ব মনে না করিয়া পরম মনুষ্যত্ব মনে করিবে। কিন্তু শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন মানুষ অস্বীকার করিলেও যেটা সত্য সেটা চিরকালই সত্য। আমাদের নবী (আঃ) বলিয়াছেনঃ

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ○

অর্থাৎ, বৈবাহিক জীবন যাপন করা আমার আদর্শ। যে আমার আদর্শকে অবজ্ঞা করিবে, তাহার সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নাই।

দ্বিতীয় কথাটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রথম কথাটির পরিপূরকও বটে। উহা এই যে, আমাদের আদর্শ এবং অন্যান্য জাতির আদর্শের মধ্যে পার্থক্য আছে। অন্যান্য জাতির আদর্শ মানুষের

রচিত—যাহা ভুল প্রমাদ হইতে মোটেই মুক্ত নয়, আর ভুল ধরা পড়িলে উহা পরিবর্তিত হইতেও বাধ্য। পক্ষান্তরে ইসলামের আদর্শগুলির একটিও মানুষের রচিত নহে। সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী কর্তৃক প্রমাণিত। কাজেই ইহা ভুল—প্রমাদের ঊর্ধ্বে এবং অপরিবর্তনীয়। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ইসলামের সব আদর্শই অপরিবর্তনীয় হইলে কালের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলা যাইবে কি করিয়া? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইসলামের বিধানগুলি যেহেতু মানুষের রচিত নহে; বরং সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী ও অন্তর্যামী খোদার রচিত, কাজেই যে যে বিষয়ে মানুষের উন্নতির জন্য পরিবর্তন পরিবর্ধন আবশ্যক, সে সে বিষয়ে মূল নীতিসমূহের পরিবর্তন ব্যতিরেকেই শাখানীতি রচনার যথেষ্ট অবকাশ রাখা হইয়াছে। এবং যে যে বিষয়ে পরিবর্তনের কোন আবশ্যকতা নাই, সে সে বিষয়কে সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় রাখা হইয়াছে। এই বিষয়টিই নবী আলাইহিস্‌সালাম এইভাবে বুঝাইয়াছেন— أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ইহার মর্মার্থ এই যে, আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন ব্যাপক শরীঅত দান করিয়াছে, ভাষাও তদ্রূপ ব্যাপকভাবে দান করিয়াছেন।

ইসলামের বিধানগুলিকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারেঃ

(১) ঈমানিয়াত—অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালাৎ ও আখেরাত। ইহা সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত একইরূপ রহিয়াছে এবং একইরূপ থাকিবে। হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পূর্বে নবী ও রাসূলের পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার পরে রাসূল ও নবী আসার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(২) রূহানিয়াত—অর্থাৎ কলেমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। এসমুদয়ও অপরিবর্তনীয়। মানবতার উন্নতির জন্য পরিবর্তনের কোনই আবশ্যকতা নাই।

(৩) আখলাকিয়াত—অর্থাৎ সত্য, সততা, সতীত্ব, সহানুভূতি, সহৃদয়তা, সেবা ও সুবিচার ইত্যাদি। এসব চির অপরিবর্তনীয়।

(৪) সমাজ-ব্যবস্থা (سماجيات ـ تهذيب و ثقافت) অর্থাৎ, ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার, পানাহার, চাল-চলন ইত্যাদি। ইসলামী তাহ্‌যীবকে পরিবর্তন করিয়া বা বাদ দিয়া খৃষ্টানী বা হিন্দুয়ানী তাহ্‌যীব গ্রহণ করার কোনই প্রয়োজন নাই। মানবতার উন্নতির জন্য ধুতি পরার, ফুলপ্যান্ট, হ্যাট-নেক্‌টাই পরার, নিজ স্ত্রী দ্বারা পরপুরুষের খেদমত করানের, হ্যাণ্ডশেক্ করার, ড্যান্স করার, মাথা খুলিয়া বুক ফুলাইয়া হাটে-বাজারে চলাফেরা করার, পর্দাহীন বাড়ি তৈরী করার, কুকুর পালার, ছবি রাখার, খাড়া হইয়া খাওয়ার, খাড়া হইয়া পেশাব করার, পেশাব-পায়খানা করিয়া পাক না হওয়ার, স্ত্রী-সহবাস করিয়া গোসল না করার, দাড়ি মুণ্ডানের, বগলের পশম বাড়ানের, একাধিক বিবাহ বন্ধ করার, সন্তানের জন্মরোধ করার, আওরতের হাতে তালাকের ক্ষমতা দেওয়ার, জাতীয়তার সংজ্ঞা পরিবর্তনের, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় দৌড়ানের, ছবি-খেলনা আমদানী করার, শূকর বা শরাব খাওয়ার, 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলাকে এবং উহার জাবাব দেওয়াকে অপমান মনে করা ইত্যাদির আদৌ কোন আবশ্যক করে না। এই সকল কাজ শুধু ঐ সকল মুসলমানই নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে করিতে পারে যাহারা জাতীয় গৌরব ভুলিয়া পরানুকরণ ও জঘন্য নীচাশয়তার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ এইরূপ দুর্ভাগারাই মুসলিম জাতিকে কলঙ্কের টিকা পরাইয়া দিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে শরীঅতে মোকাদ্দাসার অর্থাৎ পবিত্র ও সনাতন ইসলাম ধর্মের ব্যবস্থা এতই সুন্দর যে, তাহাতে কাহারো মনমরাও হইতে হয় না। তাহার মধ্যে পরানুকরণের রোগও ঢুকিতে পারে না বা বিলাসিতা বা

অকর্মন্যতার রোগেও আক্রমণ করিতে পারে না। শরীঅতে মোকাদ্দাসা কতকগুলি সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে। নূতনত্বের পথও বন্ধ করে নাই, আর উন্নতির পথও রুদ্ধ করে নাই।

(৫) অর্থ-ব্যবস্থা,

(৬) (ক) রাষ্ট্র-ব্যবস্থা,

(খ) সমর-ব্যবস্থা,

(গ) আন্তর্জাতিক চুক্তি,

(ঘ) বিজ্ঞান চর্চা,

(ঙ) সাহিত্য ও ভাষা চর্চা,

(চ) যোগাযোগ ব্যবস্থা।

অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে শরীঅতে মোকাদ্দাসা আমাদিগকে কতকগুলি অপরিবর্তনীয় মূলনীতি দান করিয়াছেঃ—যেমন, সুদ হারাম, জুয়া হারাম, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা হারাম, ঘুষ হারাম, চুরি হারাম, আমানতে খেয়ানত হারাম, জোর দখল হারাম ইত্যাদি। এই মূলনীতিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যত ইচ্ছা উন্নতি করা যাইতে পারে। এখানে শরীঅতে মোকাদ্দাসা প্রয়োগ-পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ করে নাই; বরং সীমাহীন উন্নতির পথ করিয়া দিয়াছে।

পাশ্চাত্যের হুমকির ভয়ে ভীত হইলে চলিবে না। নিজেদের মস্তিস্ক (Brain) খাটাইতে হইবে। অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন পথের সন্ধান করিতে হইবে। জনসংখ্যা বন্ধ করিবার অধিকার কাহারও নাই। জনসেবার জন্যই হুকুমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য নয়। পাশ্চাত্য পীর ছাহেবগণ বলিয়াছেন, সুদ ছাড়া ব্যাঙ্ক চলে না, জুয়া ছাড়া কারবার চলে না। সে সব পীর ছাহেবদের অন্ধ অনুকরণ করা যাইবে না। সুদ ছাড়া ব্যাঙ্ক করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। জুয়া ছাড়া কারবারের উন্নতি করিয়া আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে। 'জোর দখল' অর্থাৎ, 'জোর যার মুল্লুক তার' দুর্নীতি দ্বারা যথেচ্ছা হুকুম বা যথেচ্ছা ট্যাক্‌স বৃদ্ধি করা চলিবে না। শরীঅতের জ্ঞান অর্জন করিয়া শরীঅতের সীমার ভিতরে থাকিতে হইবে।

রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্যও শরীঅতে মোকাদ্দাসা কোনরূপ উন্নতির পথ বন্ধ করে নাই। যুগের সাথে তাল মিলাইয়া চলা তথা যুগের দাসত্ব করার হীন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। যুগের স্রষ্টা হইতে হইবে;—যুগের চালক ও নায়ক হইতে হইবে। খোদা রাসূলের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া কোরআন হাদীসের অধীন হইয়াই আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। কোরআন ও সুন্নার বিরুদ্ধে কোন আইনই প্রণয়ন করা যাইবে না। যে কোন আইনই হউক কোরআন হাদীসের কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া লওয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই থাকিবে।

সমর ব্যবস্থার পদ্ধতি ও উহার হাতিয়ার সম্বন্ধে শরীঅতে মোকাদ্দাসা কোথাও উন্নতির পথ বন্ধ করে নাই। তবে এখানেও কতকগুলি মূলনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। খোদাকে এবং মানবতাকে বাদ দিয়া নিষ্ঠুর ও নির্মম আঞ্চলিকতাবাদ বা ভৌগলিক জাতীয়তাবাদকে কিছুতেই গ্রহণ করা যাইবে না। নিজেদের স্বার্থে অন্যের উপর যুলুম চালান যাইবে না।

আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে চুক্তি করা যাইবে। যে কোন মুহূর্তে উহা শেষ করার ঘোষণাও দেওয়া যাইবে। কিন্তু চুক্তি বহাল রাখা অবস্থায় উহার খেলাফ বা বিরোধিতা করা যাইবে না। তবে অন্যে যাহাতে ধোঁকা দিতে না পারে, সেদিকে সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক পন্থায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় যাবতীয় উন্নতি করা যাইতে পারিবে, ইহাতে বাধা নাই।

বিজ্ঞান চর্চার উন্নতি করিতে শরীঅতে-ইসলাম কোথাও বাধা দেয় নাই। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার বিষয়বস্তুতে যদি খোদাকে, খোদার রাসূলকে, খোদার ওহীকে, আখেরাতের জিন্দেগী বা অদৃশ্য জগতকে অস্বীকার করা হয়, তবে উহা বিজ্ঞান চর্চাকারীর জন্য সম্পূর্ণরূপেই অনধিকার চর্চা হইবে। কারণ, বিজ্ঞান মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বাহিরে অন্য কিছুর অস্তিত্বই নাই, এরূপ উক্তি করা বৈজ্ঞানিকের জন্য চরম অবৈজ্ঞানিকতা বটে এবং সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক ও হাস্যকর।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় শরীঅতের সীমা লংঘন করিয়া হালাল-হারামের কোনরূপ পরওয়া না করিয়া উন্নতি কল্পনা করার অধিকার মানুষের নাই। শরীঅত প্রদত্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে।

ভাষা বা সাহিত্যের চর্চা করিতে শরীঅতের কোথাও বাধা দেওয়া হয় নাই। তবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। পরানুকরণ প্রবণতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে। বিজাতীয় নোংরা প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া নিজের জাতীয় গৌরবকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আপাতঃ মধুর চাকচিক্য দেখিয়া তাহাদের পদলেহন করিলেও চলিবে না; বরং নিজেদের জাতীয় নির্ভুল আদর্শকে এবং নিখুঁত তাহ্‌যীবকে সর্বোপরি স্থান দিতে হইবে। নিজেদের সংহতিকে দৃঢ় করিয়া ক্রমান্বয়ে যাহাতে একটি কেন্দ্রীয় ভাষায় এবং একটি কেন্দ্রীয় তাহ্‌যীবে আমরা একতাবদ্ধ হইতে পারি, সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। শত্রু আমাদের আছে, তাহারা অতি চালাক। তাই শত্রু ও চোরদের প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের কচি-কাঁচার দলকে গায়ের ইসলামী তাহ্‌যীবের পরিবেশ হইতে অর্থাৎ তাহাদের কুসংসর্গ হইতে সর্বক্ষণ দূরে রাখিতে হইবে। পরাধীন যুগের পরানুকরণের প্রভাবের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজেদের জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। গোড়ার গলদ দূর করিতে হইবে। গোড়ার গলদ কী? আমাদের প্রাণপ্রিয় পয়গম্বর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেনঃ জীবনে যত কাজ কর, প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে নিয়ত ঠিক করিয়া লও; অর্থাৎ, দেলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া লও। তোমার মঞ্জিলে কমসূদ—তোমার গন্তব্যস্থানকে ঠিক করিয়া লও। এই লক্ষ্য স্থির করিয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়, নতুবা তোমার সময় বৃথা যাইবে, জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে।

প্রত্যেকটি কাজের ভিতর দিয়াই তোমাকে আল্লাহ্-রাসূলের দিকে ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে হইবে। অতএব, প্রথমেই তোমার চিন্তা করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে, এই কাজের দ্বারা আমি আল্লাহ্-রাসূলের নিকটবর্তী হইতে পারিব কি? বিবাহ-শাদীই হউক, শিক্ষা লাভই হউক, চাকুরী লাভই হউক বা ব্যবসা-বাণিজ্যই হউক, প্রত্যেকটি কাজের ভিতরেই আমাদের এরূপ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পরিতাপের বিষয়, শত্রুরা আমাদিগকে মূল লক্ষ্য বিন্দু হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। আমাদের শিক্ষারও চরম লক্ষ্য হওয়া চাই—আল্লাহ্ ও রাসূলের সান্নিধ্য লাভ করা। বিবাহ্-শাদীরও চরম লক্ষ্য হওয়া চাই—আল্লাহ্ রাসূলের প্রতি অগ্রসর হওয়া। লক্ষ্য ঠিক থাকিলে আমাদের সমগ্র জীবনই সঠিক পথে চালিত হইবে।

বিবাহ সম্পর্কে আরো কথা

বিবাহের মধ্যে ইসলামী বিধান অনুসারে চারিটি আদর্শ কর্তব্য আছে। যথা—(১) নিয়ত দুরুস্ত করা অর্থাৎ লক্ষ্য ঠিক করা। বিবাহের উদ্দেশ্য হইবে পশু-প্রবৃত্তিকে পূর্ণ করা নয় বা শুধুমাত্র সাংসারিক জীবনের একজন সাথী তালাশ করাই নয়, বরং মূল উদ্দেশ্য এই হইবে যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে ও রাসূলের আদর্শ (সুন্নত তরীকা) অনুসারে দুইজন মানুষ (স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের জীবন-সাথী হইয়া দুনিয়াতে আপন আপন দায়িত্ব পালন করিয়া দুনিয়া ও আখেরাতের কাজে একে অন্যের সহায়তা করিয়া আল্লাহ্র মর্জি মোতাবেক আল্লাহ্র সংসারকে আবাদ করিবে। আল্লাহ্র বান্দা ও নবীর উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে এবং পরে সকলে একসংগে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করিবে।

(২) স্বামী-স্ত্রীর প্রথম যখন নির্জনে মোলাকাত হইবে, তখন স্বামী তাহার দুই হাত দিয়া স্ত্রীর মাথা ধরিয়া মুখে চুম্বন করিবে এবং আল্লাহ্র কাছে দো'আ করিবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ○

"হে খোদা! এই দুনিয়ার সব কিছুর মধ্যে ভাল-মন্দ দুই-ই আছে। তুমি যে আমাকে এই (স্ত্রীরূপ) নেয়ামত দান করিয়াছ তাহার ভালায়ী (মঙ্গল) আমি তোমার কাছে চাই এবং ইহার বুরায়ী (মন্দ) হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিও।"

[বুরায়ী এই যে, স্ত্রীর কারণে দুনিয়ার ও দ্বীনের কোন নোক্সান হইয়া যাওয়া এবং ভালায়ী হইতেছে স্ত্রীর কারণে দুনিয়ার ও দ্বীনের উপকার লাভ হওয়া]

(৩) স্বামী স্ত্রী যখন প্রথম নির্জনে মোলাকাত করিবে, তখন তাহারা যৌবনের উন্মাদনায় সাধারণতঃ ভাবপ্রবণতায় অধীর থাকে। কিন্তু যে হইবে মুসলমান—সে যুবকই হউক বা বৃদ্ধই হউক—তাহাকে সর্ব অবস্থাতেই আল্লাহ্ প্রেমের ভাব প্রবণতাকেই তাহার দৈহিক ভাব-প্রবণতার উপর স্থান দিতে হইবে। স্বামী-স্ত্রীর মিলন-মুহূর্তেও আল্লাহ্কে স্মরণ রাখিতে হইবে। নিজেদের স্বার্থেও আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ আমাদের পরম শত্রু শয়তান যেমন আমাদের গাফ্লতির সুযোগ অনুসন্ধান করে, আমাদেরও তেমনি তার সুযোগ পণ্ড করিয়া দেওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। মিলন পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করিবেঃ

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا ○

অর্থাৎ, হে খোদা! এই অবস্থায়ও আমরা তোমাকে ভুলি নাই, আমরা তোমার নাম স্মরণ করিতেছি। তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে খোদা! আমাদিগকে শয়তানের প্রভাব হইতে বাঁচাইয়া রাখ এবং আমাদিগকে তুমি যে আওলাদ দান করিবে, তাহাকে শয়তানের প্রভাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিও।

(৪) স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন ঋতু অবস্থায় মিলন না হয়, মলদ্বারে সঙ্গম না হয়। কারণ, ঋতু অবস্থায় বা মলদ্বারে সঙ্গম করা মহাপাপ, সাংঘাতিক হারাম। তাহাদের

মিলন এমন নির্জন স্থানে হওয়া চাই যেন অন্য কেহ না থাকে বা অন্য কেহ দেখিতে না পায়। স্বামী-স্ত্রীর গোপন ব্যবহার বা আলাপ-আলোচনা অন্য কাহারও জন্য উঁকি মারিয়া দেখা বা কান লাগাইয়া শুনা সম্পূর্ণরূপে হারাম। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক গোপন আচার-ব্যবহার অন্য কাহারও কাছে বলা বা প্রকাশ করাও হারাম। মিলনান্তে, ফজরের নামায কাযা না হয় এমনভাবে সকালে উঠিয়া উভয়কেই গোসল করিতে হইবে। মিলনের পরে উভয়ের উপরই গোসল ফরয হইয়া যায়। এজন্য পানির ব্যবস্থা আগে হইতেই করিয়া রাখা দরকার।

সন্তান জন্মিলে

১। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছেলেই হউক আর মেয়েই হউক, সর্বপ্রথম যে আওয়ায তাহার কানে পড়িবে, তাহা হওয়া চাই আল্লাহ্র নাম এবং আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের গুণগান। ২। সন্তান জন্মিলে সর্ব-প্রথম তাহার পেটে যাহা প্রবেশ করিবে তাহা হওয়া চাই কোন নেককার বুযুর্গ লোকের দ্বারা আল্লাহ্র যেকেরের সঙ্গে সঙ্গে কোন মিষ্টি জিনিস—মধু, খোরমা বা অন্য কোন মিষ্ট খাদ্য চিবাইয়া লালার মত করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা শিশুর মুখে তালুতে লাগাইয়া দেওয়া। ৩। সপ্তম দিবসে কোন আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গ লোকের দ্বারা দো'আ করাইয়া ভাল দেখিয়া নাম রাখা, মাথা মুণ্ডইয়া ফেলা এবং আকীকাহ্ করা। ৪। সন্তানের দেহ পালন ও স্বাস্থ্য গঠনের সুবন্দোবস্ত করা। শুধু তাহাই নহে—সন্তানকে স্বাস্থ্যবান করার নিমিত্ত যেমন নিয়মিতভাবে সুখাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়, তৎসঙ্গে শৈশব হইতেই তাহার আত্মার প্রতিপালনের প্রতিও তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রদান করা আবশ্যক। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, শিশুর আত্মার প্রতিপালন সে আবার কেমন কথা? মনে রাখা আবশ্যক, শিশুর মস্তিষ্ক ফটো তোলা ক্যামেরার তুল্য। সে যাহাকিছু দেখে ও শুনে, তাহাই তাহার মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া যায়। অতএব, লক্ষ্য রাখিতে হইবে—যেন তাহার চোখের সম্মুখে কোন খারাপ ব্যবাহার বা কার্য করা না হয়। কোন অশ্লীল বা খারাপ শব্দ যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে না পারে। যাহাতে তাহার সামনে ভাল কাজ করা হয়, তাহার কানের কাছে ভাল আলাপ-আলোচনা, কোরআন তেলাওয়াত এবং আল্লাহ্র গুণগান করা হয়, তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন নেওয়া আবশ্যক।

শিশুর জন্য মায়ের দুধই সর্বপেক্ষা উত্তম খাদ্য। কিন্তু স্বাস্থ্যের অভাবে মায়ের দুধ দূষিত হইলে, শিশুর পক্ষে সে মায়ের দুধের চেয়ে খারাব খাদ্য আর কিছুই নাই। স্বাস্থ্যহীনা মাতার স্তন-দুগ্ধ পান করিয়া অনেক শিশুর মাতৃকায় দোষ দেখা দেয়। লোকে উহাকে জ্বিনের আছর মনে করে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে জ্বিনের আছর হয় না। রোগের তাছিরও হয়। শিশুকে তীব্র আলোকে নিলে শিশুর চোখের জ্যোতি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শিশুর যখন প্রথম কথা ফুটিবে তখন সর্বপ্রথম তাহাকে আল্লাহ্র নাম, বিস্মিল্লাহ, কলেমা ইত্যাদি শিখাইবে। বাপের নাম, দাদার নাম, বাসস্থানের নাম-ঠিকানা ডাইন-বাম ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে শিক্ষা দিবে।

শিশুর বয়স ৫/৬ বৎসরের কাছাকাছি হইলে কোন নেক্কার বুযুর্গ আলেম দ্বারা দো'আ করাইয়া তাহাকে আল্লাহ্র কালামও শিক্ষা দেওয়ার সূচনা করিবে। অর্থাৎ, বিস্মিল্লাহ্ শুরু করাইবে। এই উদ্দেশ্যে শিশুকে কোন নেক্কার আদর্শবান ওস্তাদের মক্তবে পাঠাইবে। মনে

রাখিবে প্রাথমিক শিক্ষার উপরই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত বিষয়গুলি ইতিপূর্বেও সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

মক্‌তব ও মাদ্রাসা সম্বন্ধে আরো কথা

মক্তবে ছেলেমেয়েদেরকে কায়দা, ছিপারা ও কোরআন শরীফ ত শুদ্ধ করিয়া পড়ান চাই-ই, তার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম, চারি কলেমা, ঈমানে মুজ্‌মাল, ঈমানে মুফাচ্ছাল প্রভৃতি অর্থসহ পড়ান চাই। এ ছাড়া মোটামুটি ইসলামী আক্বায়েদ, নামায, রোযা, পাক-নাপাক, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয প্রভৃতি মাসআলা মাসায়েল, ইসলামী আদব-কায়দা ও চরিত্র গঠন প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। নবী করীম (দঃ)-এর জীবনী এবং চারি খলিফার জীবনী দেশীয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে। তারপর হালালভাবে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কোন একটি হাতের কাজ—মেয়েদিগকে হস্তশিল্প, গৃহস্থালী রক্ষণাবেক্ষণ (বা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান), সেলাই, রন্ধন, সন্তান পালন, পতি-ভক্তি, পতি-সেবা প্রভৃতি খুব ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে পারিবারিক চিকিৎসা-বিদ্যা, ধাত্রী-বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া উচিত। অবশ্য সতর্ক থাকিতে হইবে যে, এসকল ক্ষেত্রে ধর্ম রক্ষা করিয়া চলা ফরয।

আজকাল হিতাহিত চিন্তা না করিয়া ইংরেজী শিক্ষার বড় হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। একথা সত্য যে, ভাষা শিক্ষা করিতে দোষ নাই। কিন্তু ভাবিবার বিষয় এই যে, মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ, তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ, অথচ বিষয় সীমাহীন। কাজের শক্তি ও সময়ের সীমার ভিতরে থাকিয়া আখেরাতের দৃষ্টিতে যাহা সবচাইতে বেশী আবশ্যকীয় তাহাই সর্বপ্রথমে শিখিতে হইবে। তারপর তার চেয়ে কম আবশ্যকীয়, তারপর যাহা তাহার চেয়েও কম আবশ্যকীয়। আমরা মুসলমান। আমাদের সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় বিষয় হইতেছে আমাদের ধর্ম-ভাষা শিক্ষা করা, তারপর আবশ্যক হইতেছে আমাদের দেশীয় রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করা। (বিভিন্ন জ্ঞান অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষা করাতেও কোন দোষ নাই।) ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। কাজেই উচ্চস্তরের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু এজন্য সকলকেই শিশুকাল থেকে ইংরেজী ভাষা, ইংরেজী চালচলন ও ইংরেজী ফ্যাশান শিক্ষা দেওয়ার কোনই আবশ্যক নাই। কিছুসংখ্যক মেধাবী, পরিপক্ক, ধার্মিক ও দৃঢ় আদর্শবাদী ছাত্রকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিয়া বিদেশে পাঠান দরকার; কিংবা বিদেশ হইতে কিছুসংখ্যক পারদর্শী অধ্যাপক আনাইয়াও উহা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এছাড়া বিজ্ঞানের বিষয়গুলি যথাশীঘ্র নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করার দরকার, যাহাতে আমাদের নিজেদের মাতৃভাষায়ই রিসার্চ বা গবেষণা করিতে পারে।

বিদেশে ছেলেদের যখন পাঠান হইবে, তখন এমন পরিপক্ক আদর্শসম্পন্ন ছেলেদিগকে পাঠাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা বিদেশী চালচলন ও সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হইতে না পারে; বরং তাহারা সেই বিদেশে গিয়াও যেন ইসলামী তাহ্‌যীব ও ইসলামী আদর্শের প্রাধান্য স্থাপন করিতে এবং তাহা প্রচার করিতে পারে। ইহা সর্বক্ষণই মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, কোন অবস্থাতেই ইহার প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না।

একদল লোক ধর্মবিদ্যায় পারদর্শী এবং পূর্ণ জ্ঞানী হইতে হইবে। সমাজে তাহাদিগকে স্থান দিতে হইবে সবচাইতে উন্নত স্তরে। এর জন্য উন্নত ধরনের মাদ্রাসা তথা আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপন করিতে হইবে এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষার সংগে সংগে কোরআন হাদীসের যাবতীয় আহকাম যেন আমলেও পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, এইসব কারণেই ইসলামী শিক্ষাগার অর্থাৎ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে বড় নেকের ও বেশী সওয়াবের কাজ আর নাই।

বিবাহ সম্পর্কে আরো জ্ঞাতব্য বিষয়

ছেলে যখন এলেম শিখিয়া রোযগার করার উপযুক্ত হয় এবং মেয়ে যখন গৃহস্থালী বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত হয়, তখন বাপের কর্তব্য (বাপ না থাকিলে যিনি অভিভাবক ও অলী হইবেন তাঁহার কর্তব্য) ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দেওয়া।

যে জিনিস যত অধিক জরুরী সেই জিনিসকে আল্লাহ্ ততই সহজলভ্য করিয়া দিয়াছেন। বিবাহ যেহেতু ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র সকল মানুষের জন্যই অত্যন্ত জরুরী, এই জন্য ইহা অতি সহজে এবং নিতান্ত অনাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া যাওয়াকেই আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন। তাই শরী'অতে বিবাহ ব্যাপারে ব্যয়বাহুল্য ও অতিরিক্ত আড়ম্বর নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন সমাজে কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া এই সহজসাধ্য কাজকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া ফেলিয়াছে। বিবাহকে কঠিন করিয়া তোলা অন্যায়, তবে যথাসম্ভব মর্যাদা রক্ষিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বিবাহে স্ত্রীর জন্য যথোপযোগী জেওর ও মহর হওয়ার দরকার। কারণ, পুরুষের মর্যাদা এই যে, সে যে একটি পরিবারের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত, সে কথার সক্রিয় প্রমাণ তাহাকে পেশ করিতে হইবে। ভবিষ্যতে সে যে তাহার স্ত্রীকে দাসীরূপে না দেখিয়া প্রেমপাত্রী, মাহবুবা ও মা'শুকারূপে দেখিবে, তার প্রমাণস্বরূপ তাহাকে মহর-জেওর দিতে হইবে। কিন্তু মহর কোন ক্রমেই পাত্রের বহনশক্তির অতিরিক্ত হওয়া চাই না। এইরূপে মেয়ের পিতার কাছে মেয়ে জামাই যে স্নেহের পাত্র ও অত্যন্ত আদরণীয় তাহার প্রমাণস্বরূপ মেয়ে-জামাইকে কিছু জেহিয বা যৌতুক দিতে হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে। মহর-জেওর এবং জেহিযের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মহর ত দাবী করিয়া লওয়া যাইবে, কিন্তু জেহিয দাবী করিয়া লওয়া যায় না। আজকাল পাত্রী পক্ষের নিকট খরচের ও নানাবিধ যৌতুকের দাবী করার একটি কু-প্রথা আমাদের শিক্ষিত সমাজে চালু হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত জঘন্য ও ঘৃণা প্রথা। পাত্রী পক্ষকে কোন টাকার চাপ দেওয়ার অর্থ হইতেছে শরীঅতকে উল্টাইয়া দেওয়া। কেননা আল্লাহ্ পাত্র পক্ষের উপর মহর, জেওর ফরয করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পাত্রীপক্ষের উপর খরচ দেওয়া আদৌ ফরয করেন নাই। পাত্রীর পিতা ১৪/১৫ বৎসর যাবৎ বহু অর্থ ব্যয় ও অতি আদর যত্নে লালন-পালন করিয়া তাহার কলিজার টুকরাকে পরের হাতে জীবনের তরে সোপর্দ করিতেছে, ইহাই ত অনেক বেশী। ইহারই ত শোকরিয়া আদায় করিয়া শেষ করা যায় না। এর পরেও তাহার উপর কিছু দাবী করা বা চাপ দেওয়া যুল্ম ছাড়া আর কি হইতে পারে? অবশ্য পাত্রপক্ষের বিনা দাবীতে, বিনা চাপে মহব্বতের আলামতস্বরূপ পাত্রীর মাতাপিতা যদি তাহাদের সংগতি অনুসারে কন্যাজামাতাকে কিছু দান করেন, তবে তাহাও শোকরিয়ার কাবেল হইবে। ধনীরা বিবাহের মধ্যে অনেক আড়ম্বর করে ও তাহাদের দেখাদেখি গরীবরাও ঐরূপ করিতে চায়; ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাহারা ঋণও গ্রহণ করিয়া বসে। এইজন্য কাহারও পক্ষেই বেশী আড়ম্বর করা সংগত নহে।

আমাদের হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম দোনো জাহানের বাদশাহ্‌ হওয়া সত্ত্বেও নিতান্ত সাদাসিধাভাবেই নিজের মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন। প্রথমে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হুযূরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। তারপর ওমর ফারূক (রাঃ) দরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু হুযূর দোনো ক্ষেত্রেই মেয়ের বয়স কম বলিয়া ওযর করিয়াছেন। তারপর ছিদ্দীক ও ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ে মিলিয়া হযরত আলী (রাঃ)-কে দরখাস্ত করিতে বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ) লজ্জাবনত অবস্থায় যখন হুযূরের নিকট দরখাস্ত করিলেন, তৎক্ষণাৎ জিব্‌রায়ীল মারফৎ হুযূরের নিকট আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ওহী আসিল। হুযূর (দঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া নিলেন। ঐ সময় হযরত আলী (রাঃ)-এর ছিল ২১ বৎসর এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বয়স ছিল পনর কি সাড়ে পনর বৎসর।

এই হাদীস দ্বারা আমরা কতকগুলি উপদেশ পাই—(১) ছেলে এবং মেয়ের বিবাহের উপযুক্ত বয়স জানা গেল। (২) পাত্রের বয়স পাত্রীর চেয়ে কিছু বেশী হওয়া ভাল। (৩) পাত্র এবং পাত্রীর বয়স মানানসই হওয়া উচিত। পাত্রের বয়স অনেক বেশী হইলে, পাত্রীর বাপ বিবাহ দিতে না চাহিলে তাহাকে দোষী করা যাইবে না। (৪) পাত্র যদি পাত্রীর জন্য দরখাস্ত করে, তবে তাহাতে কোন দোষ নাই।

অতএব হুযূর (দঃ) ঘনিষ্ঠ ছাহাবাগণকে ডাকাইয়া তৎক্ষণাৎ নিজেই খোৎবা পড়িয়া নিজেই বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। হুযূর মহর ধার্য করিলেন ৪০০ মেস্‌কাল (আমাদের দেশের হিসাবে আনুমানিক ১৫০ টাকা)। হুযূর এক খাঞ্চা খোরমা আনাইয়া বিবাহ মজলিসে উপস্থিত সকলের মধ্যে তাকসীম' করিয়া (বাঁটিয়া) দিলেন এবং উম্মে আয়মানকে সংগে দিয়া পায়ে হাঁটাইয়া দোনো জাহানের শাহ্‌জাদী মা ফাতেমাকে হযরত আলীর সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

এই হাদীস দ্বারা আমরা নিম্ন উপদেশগুলি পাইঃ

(১) বিবাহ গোপনে হওয়া চাই না; বরং খাছ ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের মজলিসে হওয়া চাই।

(২) মহর অনেক বেশী হওয়া চাই না। কারণ, হুযূর (দঃ) দোনো জাহানের বাদশাহ্‌ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নিজের মেয়ের মহর অনেক বেশী করেন নাই।

(৩) বিবাহের মজলিসে কিছু মিষ্টিমুখ করা সুন্নত। (কিন্তু সামর্থ্যের অতিরিক্ত কখনো করা চাই না)।

(৪) দুলহা-দুলহানকে পায়ে হাঁটাইয়া পাঠানে কোন দোষ নাই। অবশ্য আবশ্যকবোধে সওয়ারী ব্যবহার করাতেও দোষ নাই। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পাল্কীর ব্যবস্থাকে অত্যন্ত জরুরী বলিয়া মনে করাটা ভুল।

(৫) মেয়ের সঙ্গে—যেহেতু নূতন বাড়ী, নূতন ঘর—একজন বে-তাকাল্লুফ সঙ্গিনী—যাহার সহিত সে মন খোলাভাবে কথা বলিতে পারে—পাঠান সুন্নত।

অতঃপর সন্ধ্যাবেলায় হুযূর (দঃ) নিজে হযরত আলীর বাড়ীতে গেলেন। মা ফাতেমাকে আদেশ করিলেন, কিছু পানি আন। মা ফাতেমা নিজেই পানি আনিলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, নূতন বৌর নিজ হাতে কাজ করাতে কোনই দোষ নাই। দোজাহানের শাহজাদী যদি নূতন বৌ অবস্থায় নিজ হাতে কাজ করিতে পারেন, তবে অপরের সম্বন্ধে কোন কথাই আসিতে পারে না। তারপর হুযূর (দঃ) সূরা-ফালাক এবং সূরা-নাস পড়িয়া নিজের লোয়াব মোবারক পানির মধ্যে দিয়া মা ফাতেমার মাথায়, বুকে ও মুখে কিছু পানি নিজ হাতে ছিটাইয়া দিলেন, এবং এইরূপ

দো'আ করিলেন—"হে খোদা! ফাতেমাকে এবং তাহার সন্তানকে শয়তান থেকে রক্ষা করিও।" তৎপর মা ফাতেমার পিঠের দিকেও কিছু পানি ছিটাইয়া দিলেন এবং উপরোক্তরূপ দো'আ করিলেন। তারপর তাঁহাকে কিছু পানি পান করিতে এবং ঐ পানির দ্বারা ওযূ করিতেও বলিলেন। ইহার পর হযরত আলীকেও পানি পান করিতে বলিলেন। সেই পানিতেও তিনি উপরি-উক্তরূপ দো'আ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহারও বুকে, মুখে ও পিঠের দিকে পানি ছিটাইয়া দিয়া দো'আ করিলেন এবং তাঁহাকে ঐ পানি দ্বারা ওযূ করিতে ও উহা পান করিতে বলিলেন; এরপর বলিলেনঃ যাও, বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া আরাম কর।

সম্ভবপর হইলে মেয়ে-জামাইর জন্য এরূপ আমল করা সুন্নত।

এই বিবাহে নবী (দঃ) জেহিয দিলেন—(১) দুইটি চাদর, (২) দুইটি তোষক, বিছানা, (৩) ৪টি বিভিন্ন রকমের বালিশ, (৪) দুইটি বাজুবন্দ জেওর, (৫) ১টি কম্বল, (৬) ১টি পেয়ালা, (৭) এক জোড়া আটা পিষার যাঁতা বা চাক্কি, (৮) ১টি পানি আনার মশক, (৯) ২টি পানি রাখার কলসি এবং (১০) একখানা পালঙ্ক। মোট এই কয় পদের জিনিস হযরত নবী (দঃ) জেহিয স্বরূপ দিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা একটি নূতন পরিবার গঠন করার সাময়িক কাজ চলিতে পারে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি জেরা ছিল, তিনি উহা বিক্রয় করিয়া মহরের টাকা পরিশোধ করিলেন। মহর জেওর মেয়েদের মর্যাদার সম্পদ। কাজেই উহা পরিশোধ করা একান্ত দরকার। উহার দ্বারা বুঝা গেল যে, মেয়ে-জামাইকে জেহিয দেওয়া সুন্নত। কিন্তু অবস্থা বা সঙ্গতির অতি-রিক্ত আড়ম্বর করা, অথবা ঋণ করা বা ভিক্ষা করিয়া আড়ম্বর বা ধুমধাম করা শরীঅত-বিরুদ্ধ।

তারপর হুযূর (দঃ) মেয়ে-জামাইর বাড়ীর কাজ ভাগ করিয়া দিলেন। বাড়ীর বাহিরের সব কাজ হযরত আলীর জিম্মায় এবং বাড়ীর ভিতরকার যাবতীয় কাজ মা ফাতেমার জিম্মায় দিলেন।

হাদীস শরীফে আছেঃ মা ফাতেমা নিজ হাতে যাঁতায় আটা পিষিতেন, নিজ হাতে রুটি পাকাইতেন, নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। নিজে কূয়া হইতে পানি তুলিয়া মশকে করিয়া পানি আনিতেন এবং নিজ হাতে কাপড় কাচিতেন।

আজকাল আশরাফ-আতরাফের একটি কু-প্রথা আমাদের দেশে চলিতেছে। আশরাফযাদিরা বাড়ীর ভিতরকার কাজও করিতে চায় না; কাজ করাকেই তাহারা অপমান মনে করে। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কাজ করিতে কোনই অপমান নাই। যিনি সমস্ত আশরাফদের বড় আশরাফ তিনিও নিজ হাতে কাজ করিয়াছেন, নিজ হাতে আটা পিষিয়াছেন। আরব দেশের আটা পিষা আমাদের ধান ভানিয়া চাউল করারই সমান। কোন কোন অঞ্চলে ধান ভানাকে শরাফতের খেলাফ বা অপমান মনে করে, ইহা ভুল ধারণা।

কাজ করাতে হাত-পা শক্ত হইয়া যায়, কাপড় ময়লা হইয়া যায়—এজন্য হযরত আলীর অনুরোধে মা ফাতেমা হুযূরের কাছে কাজের সাহায্যের জন্য দাসী চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হুযূর (দঃ) নিজের কলিজার টুকরার জন্য নিজ হাতে কাজ না করা পছন্দ করেন নাই; আর দাসী-বাঁদীও মঞ্জুর করেন নাই; বরং নিজ হাতে সারাদিন কাজ করার পর ৩৩ বার سبحان الله ৩৩ বার الحمد لله এবং ৩৪ বার الله اكبر বলিয়া আল্লাহ্‌র শোকর গোজারী করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মা ফাতেমা এবং হযরত আলী (রাঃ) এই উপদেশ অনুযায়ী জীবনভর চলিয়াছেন।

'শবে-যোফাফে'র পর (বিবাহের পর প্রথম মিলনের রাত্রিকে 'শবে যোফাফ' বলে।) হযরত আলী ওলিমা করিয়াছেন। শাদীর পর ওলিমা করা সুন্নত, তবে ওলিমার ব্যাপারেও অবস্থা হিসাবে

ব্যবস্থা হওয়া চাই। অবস্থার অতিরিক্ত অযথা ধুমধাম, অতিরিক্ত অপব্যয় বা ফখরের জন্য কোনরূপ খানা-পিনা হওয়া চাই না বা ঋণ গ্রহণ করিয়াও কোন আড়ম্বর করা চাই না। চাপ দিয়া বা জোর যুলুম করিয়াও কোন দাওয়াত আদায় করা চাই না। বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে সীমার মধ্যে থাকিয়া অবস্থা অনুযায়ী কিছু পরিমাণ শরীঅত সম্মত আমোদ-উৎসব করাতে দোষ নাই; বরং সুন্নত।

বাদ্য-বাজনা, নৃত্য-গীত (গান) বা বায়স্কোপ-সিনেমা কোনক্রমেই হওয়া দুরুস্ত নহে। আর যে কাজ ফরয, ওয়াজিব নহে, তাহা যদি ছুটিয়া যায়, তবে সেজন্য আত্মীয়-এগানার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়া উচিত নহে। সবচেয়ে বড় জিনিস হইল মুসলমানের মনের মিল, একতা ও সৌহার্দ্য। খবরদার! কাহাকে দাওয়াত না করিলে বা কাহারও বাড়ীর হাদিয়া তোহ্‌ফা পাঠাইতে ত্রুটি হইয়া গেলে, সেজন্য মনোমালিন্যের সৃষ্টি যেন না হয়। মুসলমানের দিল হওয়া চাই— স্বচ্ছ পরিষ্কার নির্মল ও উদার।

একাধিক বিবাহ

সর্বজ্ঞানী মহা অন্তর্যামী আল্লাহ্ তা'আলা একজন পুরুষকে অধিকার দিয়াছেন—এক সঙ্গেই চারিজন স্ত্রী রাখিবার। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই শর্তহীন অধিকারকে খর্ব বা নিষিদ্ধ করার বা ইহার উপর কোন শর্ত আরোপ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এক বিবাহ করিলে যেমন সেই স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ফরয হয় এবং সে উহা পালন করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু যদি কেহ সেই ফরয পালনে ত্রুটি করে, তবে সে কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। তাহার বিবাহকে নিষিদ্ধ বা শর্তাধীন করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে একাধিক বিবাহ করিলেও বিবিদের মধ্যে সকল বিষয়ে সমতা রক্ষা করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করা স্বামীর উপর ফরয হয় এবং সে ফরয পালন করিতেও স্বামী বাধ্য হয়। কিন্তু যদি কেহ উক্ত ফরয প্রতিপালনে ত্রুটি করে, সে ত্রুটির কারণেও তাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। অথচ সে কারণে তাহার বিবাহকে নিষিদ্ধ বা শর্তাধীন করা যাইতে পারে না। বহু পয়গম্বর (আঃ) বহু ছাহাবী (রাঃ) এবং বহু ওলীয়ে কামেল (রাঃ) একাধিক বিবাহ করিয়াছেন—দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র বান্দার ও নবীর উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং বিবিগণের মধ্যে যথাবিহিত সমতা রক্ষা করিয়াছেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, আজকাল একদল দুর্বলচেতা হীনমন্য লোক ইউরোপ আমেরিকার লজ্জাকর কুপ্রথার ভক্ত সাজিয়া, একাধিক বিবাহ্‌কে দূষণীয় মনে করে। কিন্তু নির্লজ্জ লম্পটের মত গণ্ডায় গণ্ডায় উপপত্নী বা গার্লস-ফ্রেণ্ড রাখিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইহারাই নিজেদের লজ্জা ও নোংরামী ঢাকিবার জন্য আমাদের দুর্বলচেতা, ধর্মে অনভিজ্ঞ যুবকদিগকে এই বলিয়া উপহাস করিতে চেষ্টা করে যে, তোমাদের মধ্যে একাধিক বিবাহের মধ্যযুগীয় কুপ্রথা এখনো চালু আছে। বস্তুতঃ ইহারা অন্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহা বুঝিবার তাহাদের শক্তিই নাই। ইহা মধ্যযুগীয় কুপ্রথা নহে।, ইহা আল্লাহ্‌র দেওয়া, মানুষের জন্য চিরমঙ্গলময় নীতি। ইহা কোরআনে বিবৃত হইয়াছে এবং নবীগণ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, অধুনা উপরি-উক্ত ইউরোপীয় নির্লজ্জ নীতির একদল অন্ধ পূজারী আমাদের মুসলমান সমাজে দেখা দিয়াছে। তাহারা একাধিক বিবাহকে আইন বিরুদ্ধ বা শর্তসাপেক্ষ বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চাহিতেছে। ইহা খৃষ্টানী প্রভাব এবং তাহাদের অন্ধ অনুকরণ বৈ আর কিছুই নহে।

বাল্য বিবাহ

বাল্য বিবাহ নিরুৎসাহিত করিবার জিনিস, বে-আইনী সাব্যস্ত করিবার জিনিস নহে। কারণ, বাল্য বিবাহের দুইটি দিক আছে—একটি উপকারিতার, অপরটি অপকারিতার। উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শরী'অতে মোকাদ্দাসা ইহাকে হারাম বা বে-আইনী সাব্যস্ত করে নাই; বরং একান্ত জরুরতবশতঃ যে করা যাইতে পারে, তাহারই আমলী নমুনা দেখানের জন্য স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাল্য বিবাহ করিয়াছেন। বাল্যকালে বিবাহ না করা হইলে বাস্তবিকই অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। সেই সব ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়াই বাল্য বিবাহ করাইতে হয়।

আর একটি কথা এই যে, দেশে ইচ্ছাকৃত যেনা ব্যভিচার দূরীকরণের জন্য কোন আইন বা শাস্তি নাই। যে দেশে যুবক-যুবতীদের একত্রে উঠা-বসা বা মেলামেশা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নাই, যে দেশে ১৩/১৪ বৎসরের মেয়েরা প্রায়ই যৌবন প্রাপ্ত হয়, সে দেশে যদি ২৬ বৎসরের কম বয়সে বিবাহ দেওয়া বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়, সে দেশের সতীত্বরত্ন যে কিভাবে লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইবে তাহা চিন্তা করিতেও চিন্তাবিদগণের শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের একদল দুর্বলচেতা যুবক পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মোহে মত্ত হইয়া বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে নাক সিটকাইতেছে। কিন্তু যাঁহারা চিন্তাশীল এবং ধার্মিক, তাঁহারা চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

তালাক

বিবাহ হয় আজীবন মিলন এবং আজীবন বন্ধুত্বের জন্য। বিচ্ছেদের জন্য কখনো বিবাহ হয় না। গোপন অঙ্গকে বার বার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খোলা যায় না। এই জন্যই শরী'অতে মোকাদ্দাসা তালাককে— اَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ "মুবাহ্ কাজসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষো নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা যত জিনিসকে আইন অনুমোদিত করিয়াছেন, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট এবং অধিক ঘৃণ্য ও কদর্য জিনিস তালাক। হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে, তালাক শব্দ উচ্চারণে আল্লাহ্র আরশ কাঁপিয়া উঠে। অবশ্য এতদসত্ত্বেও মানবীয় জরুরতের কারণে তালাকের আইনগত অনুমোদন দান করা হইয়াছে। কাজেই একান্ত ঠেকা জরুরত ব্যতিরেকে রাগের বশীভূত হইয়া বা হঠাৎ কোন ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হইয়া তালাক দেওয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য। একান্ত জরুরতবশতঃ তালাক দিতে হইলেও এক সঙ্গে একবারে একাধিক তালাক দেওয়া শরীঅত বিরুদ্ধ। হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়াও অন্যায়। যে তোহরের (দুই হায়েযের মধ্যবর্তীকালে পাক থাকা অবস্থার) মধ্যে স্ত্রী-সহবাস করা হইয়াছে, সে তোহরের মধ্যেও তালাক দেওয়া উচিত নহে। এতগুলি শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তারপর তালাক দেওয়া সমীচীন—যদি তালাক দেওয়ার একান্তই আবশ্যক হয়। এইসব কড়া শর্ত লংঘন করিয়া যাহারা তালাক দেয়, বাস্তবিক তাহারাই ঐ রকম পাপী যে রকম পাপী সেই অত্যাচারী ব্যক্তি, যে একজন

দুর্বল অধীনস্থ মানুষকে কামরার মধ্যে নিঃসহায় অবস্থায় পাইয়া গুলী করিয়া মারে। কিন্তু এ ব্যক্তি পাপী হওয়া সত্ত্বেও তাহার গুলীতে যেমন লোকটি মরিয়াই যায়, মৃত্যু ঠেকান যায় না, ঠিক সেইরূপে যদি কোন নির্বোধ পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এক সঙ্গে তিন তালাক বা দুই তালাক কিংবা উপরোক্ত নিষিদ্ধ অবস্থাসমূহে তালাক দেয়, তবে সে তালাক পড়িবেই পড়িবে, স্ত্রী বিচ্ছেদ হইবেই হইবে। অতএব, সমাজের লোকদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। তালাক যেন কোনক্রমেই দেওয়া না হয়। তালাক শব্দ মুখে আনাই মানবতার দিক হইতে ভীষণ অন্যায় । আর যদি একান্তই দিতে হয়, তবে একাধিক তালাক কিছুতেই দেওয়া চাই না। একদল লোক ব্যক্তিগত বা দলগত প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তিন তালাক দেওয়া সত্ত্বেও সেই যালেম স্বামীকে কোনরূপ শাস্তি না দিয়া এবং শরী'অতের ব্যবস্থার দিকে না যাইয়া তাহাকেই ঐ স্ত্রী পুনরায় রাখার ব্যবস্থা দিতে চহিতেছে। ইহা তাহাদের বুদ্ধির ভুল এবং ধর্মকে বাদ দিয়া ভুল বুদ্ধির অনুবর্তিতা ও ইসলাম বিরোধী কোন এক সংখ্যালঘু দলের পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শরী'অতে মোকাদ্দাসা তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীকে দান করিয়াছে, স্ত্রীকে দান করে নাই।

হিলা-শরা

আমাদের দেশে শরী'অত সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে আর একটি কু-প্রথা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। একে ত অনেকেই রাগের বশীভূত হইয়া, ঝগড়া কলহ করিয়া তিন তালাক এক সঙ্গে দেয়। এছাড়া মূর্খতা এত চরমে পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, রেজিষ্টারী অফিসেও তালাক লেখাইতে হইলে এক সংগে তিন তালাক লেখায়; অথচ এক তালাক লেখাইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায় এবং তিন তালাক এক সঙ্গে দেওয়ার গোনাহ্ হইতেও বাঁচিয়া যাইতে পারে। এক দিকে এই মূর্খতা, তারপর যখন রাগ থামিয়া যায়, আর ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করে, তখন চৈতন্য হয় এবং চেষ্টা করে যে, কোন রকমে ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা যায় কি না। তখন কোন নিম-মোল্লা হয়ত এই জঘন্য পরামর্শ দিয়া দেয় যে, "মিঞা, 'হিলা-শরা করিয়া লও । হিলা-শরা ছাড়া তুমি ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পার না।" "হিলা-শরা কাহাকে বলে?"—প্রশ্ন করিলে নিম-মোল্লা তখন বলিয়া দেয় যে, এমন কাহাকেও ঠিক করা, যে তোমার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া এক রাত্রি রাখিয়া (সহবাসও করিবে) তারপর ছাড়িয়া দিবে, তখন তুমি বিবাহ করিবে। কি দারুণ মূর্খতা! একে ত হিলা শব্দের অর্থই খারাব—যাহাকে আমাদের সোজা বাংলায় বলা যাইতে পারে, বজ্জাতি, চালাকি বা দুষ্টামী। এখন খারাব শব্দকে আবার নেছবত করা হয় শরার সাথে। এহেন জঘন্য প্রথাকে সর্বতোভাবে বর্জন করা দরকার—ইহা বড়ই লজ্জার কথা। বর্জনের উপায় এই নহে যে, তিন তালাক এক সঙ্গে দিলে মাত্র এক তালাক পড়িবে। (কেননা, ইহাতে তিন তালাক দেওয়ার সংখ্যা ত আরো বাড়িয়া যাইবে। তাহা ছাড়া শরী'অতের বরখেলাফ ত হইবেই।) বর্জনের উপায় এই যে, প্রথমতঃ, যে কেহ এক সঙ্গে তিন তালাক দিবে, তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে। (অবশ্য ঐ তালাকের ফলে তাহার বিবি ত হারাম বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে।) দ্বিতীয়তঃ যে পাপী হিলা-বাহানার পরামর্শ দিবে, যাহারা ইহাতে সংশ্লিষ্ট থাকিবে এবং যে এইরূপ বিবাহ করিবে, তাহাদের সকলকেই কঠোর শাস্তি দিতে হইবে। হাদীস শরীফে এক সঙ্গে তিন তালাকদাতাকে কতলের পর্যন্ত ধমকি দেওয়া হইয়াছে। এছাড়া তাহাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের সঙ্গে উপহাসকারীও বলা হইয়াছে। আর হিলা বাহানায় যে কেহ চুক্তি করিয়া বিবাহ করিবে অথবা

করাইবে, উভয়ের উপরই আল্লাহ্‌র লা'নত (অভিশাপ) বর্ষিত হইবে বলিয়া হাদীসে উল্লেখ আছে। কাজেই আইনত এদের শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। আল্লাহ্ পাক কোরআন শরীফে তিন তালাকের জঘন্যতা এবং কঠোরতা বর্ণনার জন্য এই বলিয়াছেন যে, স্ত্রী পুনরায় গ্রহণ করার জন্য তালাক হয় মাত্র দুইটি। তারপর হয় স্ত্রীকে শরী'অত মোতাবেক রাখিতে হইবে, নতুবা সদ্ব্যবহারের সঙ্গে পরিষ্কার ছাড়িয়া দিতে হইবে। পরিষ্কার ছাড়াটা হইবে তৃতীয় তালাক। যদি কেহ অবাঞ্ছিত এবং নিন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় তালাক দিয়া ফেলে অথবা যদি কেহ জঘন্য হওয়া সত্ত্বেও এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়া ফেলে—যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, যদি তিন তালাক দিয়া ফেলে, তবে সেই স্ত্রী আর তাহার জন্য কস্মিনকালেও হালাল হইবে না—যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী এই স্বামী ছাড়া অন্য স্বামীকে বিবাহ না করিবে; তারপর যদি দ্বিতীয় স্বামী (কোন দিন) স্বোচ্ছায় ঐ স্ত্রীকে তালাক দিয়া বসে এবং তারপর যদি পূর্ব স্বামীও এই স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ করে, তবে তাহতে তাহাদের গোনাহ্ হইবে না—যদি তাহারা আল্লাহ্‌র সীমা ঠিক রাখে; আর যাহারা আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করিবে তাহারা হইবে যালেম।

আইনের উদ্দেশ্যকে সফল হইতে না দিয়া যাহারা শুধু আইনের ফাঁক তালাশ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের জন্যই বলা হইয়াছে—যাহারা আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করিবে, তাহারা যালেম সাব্যস্ত হইবে।

এই আয়াতের দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, তিন তালাক হইয়া গেলে সেই স্ত্রী আর পুনরায় গ্রহণ করা যাইবে না। অবশ্য ইদ্দত পার হওয়ার পর, বিনা চুক্তি বা বিনা কথাবার্তায় এমনিই ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করিলে সেই স্বামী যদি কোন দিন তাহাকে তালাক দিয়া দেয় বা সে মরিয়া যায়, তাহা হইলে সেখানের ইদ্দত পার হওয়ার পর পুনরায় পূর্ব-স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের সম্মতিতে পুনর্বিবাহ হইলে তাহাতে অবশ্য তাহারা গোনাহ্‌গার হইবে না।

পর্দা রক্ষা করা ফরয

স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং পুরুষের চরিত্র রক্ষা করা এত বড় ফরয যে, এই ফরয সর্বপ্রথম পয়গম্বর হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম হইতে আরম্ভ করিয়া আখেরী পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল শরী'অতেই ফরয রহিয়াছে। আমাদের নবী যেহেতু শেষ পয়গম্বর, যেহেতু তাঁহার শরী'অতই সর্বশেষ এবং সর্বব্যাপী শরী'অত, যেহেতু মেয়েলোকের সতীত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যবান এবং অধিক লোভনীয় রত্ন—দুর্বলের নিকট গচ্ছিত; এইজন্য লোকেরা যেমন তাহাদের মূল্যবান রত্নকে সাত পাল্লা লোহার সিন্দুকে হেফাযত করিয়া রাখে তদ্রূপ কোন মানুষে নয়, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি রাসূল মেয়েলোকের সতীত্বের হেফাযতের জন্য, সাত পাল্লা লোহার সিন্দুকের ব্যবস্থা বাতাইয়া দিয়াছেন। যাহারা এই মূল্যবান রত্নকে হেফাযত করিতে চায়, তাহারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে; আর যাহারা গ্রহণ করিবে না, তাহারা নিশ্চয়ই ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

প্রথমতঃ সর্বদা ছতর ঢাকিয়া রাখার হুকুম করা হইতেছে। পুরুষের ছতর নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত; মেয়েলোকদের ছতর মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি এবং পায়ের পাতা ছাড়া বাকী সর্ব-শরীর। কাহারো ছতর ছোঁয়া ত দূরের কথা, দূর থেকে দেখাও হারাম এবং দেখানও হারাম।

দ্বিতীয়তঃ, মেয়েলোকের শরীরের সৌন্দর্য, **তৃতীয়তঃ,** মেয়েলোকের জেওরের সৌন্দর্য, **চতুর্থতঃ,** মেয়েলোকের কাপড়ের সৌন্দর্য—এমনভাবে খোলা রাখাকে হারাম করা হইয়াছে, যাহাতে উহা অন্য পুরুষে দেখিতে পায়। **পঞ্চমতঃ,** মিষ্ট সুরে গান গাহিয়া পরপুরুষকে শুনান ত দূরের কথা, নরম ও কোমল স্বরে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে পর্যন্ত মেয়েদিগকে শরী'অতে নিষেধ করা হইয়াছে। **ষষ্ঠতঃ,** বিশেষ জরুরতবশতঃ বাড়ীর চার দেওয়ালের বাইরে যাইতে হইলে, পথ চলার সময় পায়ের জেওরের আওয়ায যাহাতে পরপুরুষে শুনিতে না পারে, চেহারা যাহাতে পরপুরুষের দৃষ্টিগোচর না হয়, তজ্জন্য পা জোরে ফেলিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং বোরকা পরিয়া অথবা বড় চাদরের ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকিয়া লইতে এবং উড়নীর দ্বারা গর্দান ঢাকিয়া লইতে আদেশ করা হইয়াছে। **সপ্তমতঃ,** মেয়েদের কর্মক্ষেত্র বাড়ীর ভিতরে সাব্যস্ত করিয়া দিয়া পুরুষদিগকে এইরূপ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বাড়ীর ভিতরকার মেয়েলোকদের নিকট কোন জিনিস চাহিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে তাহারা যেন পর্দার বাহিরে বা আড়ালে থাকিয়া উহা চাহে। এই সাতটি বিধান পরিষ্কার ভাষায় কোরআন এবং হাদীসে বর্ণিত আছে। ইহার একটি কথাও কোন মানুষের গড়ান নয়। অতএব, এগুলি প্রথা নয়, অপরিহার্য ফরয এবং ওয়াজিব।

হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামের শরী'অত, হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর শরী'অতে উপরি-উক্তরূপ কড়া ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা ছিল না। কাজেই কোরআন-হাদীসের বিধান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, খৃষ্টান ইংরেজদের প্রভাবে যাহারা প্রভাবিত হইয়াছে, তাহারাই খৃষ্টান মিশনারীদের প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত হইয়া ইসলামের চির সুন্দর ব্যবস্থার প্রতি 'খাঁচায় আট্‌কাইয়া রাখা, সিন্দুকে ভরিয়া রাখা, পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগ করা, ইত্যাদি ব্যঙ্গোক্তি করিয়া আমাদের ধর্মে অনভিজ্ঞ, মনস্তত্বে অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতীদের প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র ফরয-কৃত পর্দাকে লঙ্ঘন করাইয়া পরিশেষে সতীত্ব হরণেরও বিরাট সুযোগ করিয়া লইয়াছে। কাজেই এখনো সনির্বন্ধ অনুরোধ করি, হে মুসলমান ভাই-ভগ্নিগণ! এখনো ধর্মে ফিরিয়া আসুন। আর ইতর প্রাণীর ন্যায় উচ্ছৃংখল জীবনের দিকে যাইবেন না; ভ্রমরের মত এ-ফুলের সৌরভ লুটিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন না।

ভোরে গাত্রোত্থান

পূর্বকাশে রাত্রিশেষে সূর্যের আগমনবার্তা বহন করিয়া যখন প্রথম সাদা ভাব দেখা দেয়, তখনকার সময়টা বড়ই পবিত্র সময়। এই সময়কার হাওয়া বড় পবিত্র হাওয়া। এই হাওয়া গায়ে লাগাইলে মনে স্ফূর্তি ও ভাল স্বাস্থ্য লাভ হয়। এই পবিত্র ও মহোপকারী মুহূর্তে কাহারো বিছানায় ঘুমাইয়া থাকা উচিত নহে। সকাল সকাল ঘুম হইতে উঠিয়া আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিয়া 'আউযুবিল্লাহ্‌' 'বিসমিল্লা' কলেমা এবং দো'আ পড়িয়া পেশাব-পায়খানা প্রভৃতি হইতে সারিয়া মসজিদে গিয়া জমা'আতে ফজরের নামায পড়া এবং খোদার কাছে সারাদিনের কামিয়াবীর জন্য দো'আ চাওয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য।

দুঃখের বিষয়, আজকাল বিধর্মীদের কু-সংসর্গে পড়িয়া অনেক মুসলমান ছেলেদের মধ্যেও এইরূপ রোগ ঢুকিয়াছে যে, তাহারা সকালে গাত্রোত্থান করে না; বরং সূর্যোদয়েরও অনেক পরে বেলা ৮/৯ টায় ঘুম হইতে উঠে। ইহা অত্যন্ত খারাব অভ্যাস। যাহার মধ্যে এই কু-অভ্যাসের

বিষবাষ্প ঢুকিয়াছে, অতি যত্ন ও চেষ্টা সহকারে যথাশীঘ্র সম্ভব তাহার এহেন গর্হিত কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করা দরকার।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত

প্রত্যেক মুসলমানেরই—চাই সে ইউরোপে থাকুক বা আমেরিকায় থাকুক—স্বদেশে বা বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন—সকালে উঠিয়া ফজরের নামায পড়িয়া আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোরআন শরীফ হাতে লইয়া চুমা দিয়া চোখে মুখে লাগাইয়া কিছুক্ষণ অতি মনোযোগের সহিত অতীব ভক্তি সহকারে কোরআন তেলাওয়াত করা দরকার। যদি অর্থ বুঝিয়া তরজমা দেখিয়া তেলাওয়াত করা যায়, তবে ত খুবই ভালো; নতুবা অন্ততঃপক্ষে আল্লাহ্‌র দিকে দেল রুজু করিয়া ভক্তির সঙ্গে কোরআন শরীফের শব্দগুলি পড়িলেও অনেক আধ্যাত্মিক (রূহানী) উন্নতি সাধিত হয়। অর্থ না বুঝিলেও এতটুকু কথা সকলেরই বুঝে আসে যে, আমি আল্লাহ্‌কে ভক্তি করিয়া আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করিতেছি। প্রাথমিক অবস্থায় এই মৌলিক ভক্তির বড় অর্থ, তারপর ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত অর্থ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করা দরকার। অর্থ না বুঝিয়া পড়িলেও কোরআন পাকের প্রতিটি হরফে এই ভক্তির কারণে আল্লাহ্ পাক দশ-দশটি নেকী পুরস্কার দিবেন। আর অর্থ বুঝিয়া ভক্তি, চিন্তার সঙ্গে পড়িলে আরো অনেক বেশী নেকী দিবেন। আর মানব জীবনে নেকীই পরম কাম্য, পরম সম্পদ—আখেরাতের সওদা কিনিবার জন্য ইহাই একমাত্র মুদ্রা।

মেয়েদের কয়েকটি কুপ্রথা

আজকাল এইরূপ একটি কুপ্রথা চালু হইয়াছে যে, হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমান মেয়েদের কপালেও সিন্দুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। ইহা অতি জঘন্য কুপ্রথা—বিজাতীয় অনুকরণ। ইহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। মুসলমান মেয়েদের বিশিষ্ট লেবাস কোর্তা,পায়জামা, উড়নী, চাদর বোরকা প্রভৃতি হওয়া দরকার—যাহাতে মুসলমান বলিয়াই চেনা যায়। অন্য জাতির কোন আলামত মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বা পুরুষদের মধ্যে কোনক্রমেই হওয়া চাই না।

আজকাল আর একটি ঘৃণ্য প্রথা চালু হইয়াছে যে, যে-সব মেয়েরা হায়া-লজ্জাকে ত্যাগ করিয়া একেবারে ইতর পশু সাজিতেছে, তাহারা বুক উঁচু করিয়া রাখে। ইহা অত্যন্ত জঘন্য প্রথা। শ্লীলতা, ভদ্রতা ও মানবতার অনুভূতি যার মধ্যে বিন্দুমাত্রও আছে, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান বিদ্যমান আছে, সেই নারী এরূপ কিছুতেই করিতে পারে না। বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যাইতে হইলে এমন অবস্থায় বাহির হইবে যাহাতে পুরুষদের মধ্যে যৌন প্রেরণা বা উত্তেজনার সৃষ্টি না করে।

আমাদের শরীঅতে মোকাদ্দাসার মহান পবিত্র বিধান অনুসারে হায়া-শরম মানবীয় মহৎ গুণাবলীর মধ্যে একটি প্রধান গুণ। ইহা ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই গুণকে অর্জন করা দরকার। অন্যান্য ধর্মের লোকদের অনুকরণে বা ধর্মহীনদের দেখাদেখি নির্লজ্জতা এবং বেহায়ায়ীমূলক আচরণ, চলাচলও কোনক্রমেই উচিত হইবে না। মানুষের মধ্যে ও হায়ওয়ানের মধ্যে বড় পার্থক্য এই যে, হায়ওয়ানের মধ্যে শরম নাই। আর হায়া-শরম মানুষের বিশিষ্ট অলঙ্কার। ইহা কোন প্রকারের সংস্কার বা লৌকিক প্রথা নহে। ইহা পরম সত্য, নবী-বাণী খোদার ওহী দ্বারা প্রমাণিত সত্য।

বগলের ও নাভির নীচের পশম

যে নচ্ছার জাতির ওস্তাদ শাগরেদরা এক জায়গায় উলংগ হইয়া গোসল করিতে লজ্জাবোধ করে না, যাহারা স্কুল-কলেজের বারান্দায়, অলিগলিতে বা রাস্তায় পার্কে পাশবিক ব্যভিচার করিতে লজ্জাবোধ করে না, সেই সকল সভ্যতার নিশানধারী অসভ্যদের অনুকরণে আমাদের মধ্যেরও একদল বগলের পশম লম্বা করিয়া রাখাকে সভ্যতা ও ভদ্রতা (?) বলিয়া মনে করে। ধিক! শত ধিক! এমন নোংরা সভ্যতাকে! আমাদের মহান শরী'অতের হুকুম হইতেছে এই যে, বগলের পশম উপড়াইয়া বা মুণ্ডাইয়া বগল পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে; এইরূপে নাভির নীচের পশমও মুণ্ডাইয়া বা লোমনাশক লাগাইয়া স্ত্রী-পুরুষের উভয়েরই পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে—যেন এক ধান পরিমাণ অপেক্ষাও লম্বা হইতে না পারে।

কুঅভ্যাস শুরু হইতেই বর্জন করা উচিত

কোন পাপীই একদিনে বা প্রথমেই বড় পাপী হয় না। উত্তরকালে যে বড় চোর হইয়াছে, সে হয়ত প্রথমে লোভের বশবর্তী হইয়া সামান্য একটা বরই বা একটা আম চুরি করিয়াছিল। পরে এইভাবে চুরি করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে বড় চোর হইয়াছে, ফলে ইসলামী হুকুমতের অধীন হইয়া থাকিলে সে জেলে গিয়াছে বা তাহার হাত কাটা গিয়াছে। এইরূপে বড় অত্যাচারী প্রথমেই আর বড় অত্যাচারী থাকে না, বড় ব্যভিচারী থাকে না, তবে দুনিয়াতে এমন কতক লোক আছে, যাহারা ভাল হইতেই চায় না; তাহাদিগকে কেহ ভাল করিতে পারিবে না, যাহারা ভাল হইতে চায়, তাহাদের জন্যই বলেতেছি যে, আগে থেকেই হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। ছেলেপিলেদের প্রতি তাহাদের মা-বাপ ও মুরব্বিবয়ানদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে—যাহাতে ছেলেপিলেদের ভিতর কোনরূপ কুঅভ্যাস না ঢুকিতে পারে। চুরির অভ্যাস, অত্যাচারের অভ্যাস, মিথ্যার বা পরনিন্দার অভ্যাস যাহাতে তাহাদের মধ্যে না ঢুকিতে পারে সেজন্য সর্বক্ষণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, কুসংসর্গের কারণেই কু-অভ্যাস ঢুকে। কাজেই এই কুসংসর্গ হইতে ছেলেপিলেদিগকে দূরে রাখার জন্যে সর্বদাই কড়া নজর এবং চেষ্টা রাখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া ছেলেমেয়েরা যখন যৌবনের কাছাকাছি পৌঁছে তখন ত ২৪ ঘন্টাই কড়া দৃষ্টি রাখা দরকার, যাহাতে যৌন উচ্ছৃংখলার লেশমাত্রও ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনক্রমে প্রবেশ করিতে না পারে। কারণ একদিকে যৌন উচ্ছৃংখলতার মত খারাব জিনিসও যেমন নাই, তেমনি অপর দিকে ইহার মত মজার জিনিসও আর নাই, কাজেই খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

অনেক ভাল লোকও অনেক সময় আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে কুসংসর্গে জড়িত হইয়া দুনিয়া আখেরাত বরবাদ করিয়া বসে। কোন ওস্তাদ হয়ত কোন মেধাবী বালক বা বালিকাকে প্রথমতঃ ভাল নিয়তে ভালবাসে। কিন্তু পরে কাম-রিপুর উত্তেজনাকে দমন করিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে খারাব কাজে জড়িত হইয়া পড়ে। ভাবী প্রথমতঃ হয়ত ভাল নিয়তেই ছোট দেওরকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে ও ভালবাসে। কিন্তু পরিশেষে খারাব কাজে জড়িত হইয়া পড়ে।

ভগ্নিপতি হয়ত প্রথম প্রথম ভাল নিয়তেই ছোট শালীকে ভালবাসে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে অবৈধ কাজে জড়িত হইয়া পড়ে। মামী হয়ত ছোট ভাগিনাকে ভাল নিয়তেই ভালবাসে; কিন্তু পরে অন্যায় কাজে জড়িত হইয়া পড়ে। এই ধরনের কথা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি, এবং সকল ভাইকে হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি যে, সকলেরই আগে হইতে হুঁশিয়ার হইয়া সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এই জন্যই শরীঅতের বিধান আছে যে, বালিকা ত দূরের কথা, শালী দেওর ত অনেক বড় কথা, দাড়িহীন বালক দ্বারাও কোনরূপ শারীরিক খেদমত লওয়া উচিত হইবে না; তাহাকে একাধিকবার নির্জন কামরার কাছে আসিতে দেওয়া বা তাহার দিকে নজর করাও কঠোর হারাম।

সহশিক্ষা

খৃষ্টান বর্বরতা বনাম সভ্যতার প্রভাবে আমাদের দেশে স্কুল কলেজে সহশিক্ষা প্রথা (বালক-বালিকা ও নারী-পুরুষের এক সঙ্গে পড়া) চালু হইয়া পড়িয়াছে। একদল পরানুকরণপ্রিয় লোক ইহাকে পছন্দ ও চালু করিতেছে। ইহা অতি জঘন্য প্রথা, ইহার বিষ-ফল অতি ভয়াবহ। প্রত্যেক মুসলমানেরই কঠোরভাবে ইহার বিরোধিতা করা একান্ত দরকার।

বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকার জুয়া

সহশিক্ষার ন্যায় খৃষ্টানী প্রভাবের কারণে পরানুকরণ প্রিয়তার দোষে এবং ধর্মশিক্ষার অভাবের সুযোগ লইয়া আমাদের দেশে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকারের জুয়া এবং সুদ ছড়ান হইতেছে; যাহাতে তিল তিল করিয়া ইসলামী সভ্যতাকে পরাভূত করা যায়।

গেট-এ-ওয়ার্ড (Get-e-word) নামে, হর্সরেস্ নামে, জীবন বীমা বা লাইফ ইন্স্যুরেন্স নামে প্রভৃতি জুয়া ছড়ান হইতেছে। তাহারা বলে, সুদ ছাড়া ব্যাংক চালান যায় না এবং ব্যাংক ছাড়া কারবার তথা গোটা দেশ রাষ্ট্র চালানই অসম্ভব। কিন্তু তাহাদের এ দাবী সম্পূর্ণ অমূলক ও মিথ্যা। তাহারা নিজেদের সৃজনী শক্তি না খাটাইয়া পরের দেখাদেখিই এইভাবে দেশে সুদ ছড়াইতেছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলিতেছেন, সুদ ছাড়া ব্যাংক চালান যায়। কিন্তু সে দিকে তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। অতএব, যাঁহাদের দিলে ইসলামী দরদ আছে, ইসলামী সভ্যতাকে ইসলামী বিধি-বিধানকে জিন্দা রাখার ফরযিয়াতের অনুভূতি এখনো যাঁহাদের নির্জীব হইয়া পড়ে নাই, তাঁহাদের এই ধরনের খৃষ্টানী বর্বরতার বিরোধিতা করা একান্ত দরকার।

কু-চিকিৎসা

এইরূপে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নামেও আমাদের ছেলেদিগকে ইউরোপ আমেরিকার এজেন্টগিরি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং তাহাদিগকে ডাক্তার নামে অভিহিত করিয়া তাহাদের দ্বারা জনসাধারণের শুধু যে, পয়সা লুটিয়া নিয়া তাহাদিগকে নিঃস্বই করা হইতেছে তাহা নহে; বরং তাহাদের দৈহিক স্বাস্থ্যও নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। তাহাদের মনের বল ও জ্ঞানের বল উভয়ই কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। দরিদ্র ও সরল জনসাধারণ ঔষধের অতিরিক্ত ব্যয়বহুলতার কারণে এবং ডাক্তারদের দুর্ব্যবহারের কারণে বাধ্য হইয়াই সূতা পড়া, পানি পড়া বা তাবীয তুমারের উপর নির্ভর করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে।

আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমাদের দেশীয় গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ শিক্ষা দেওয়া উচিত। হেকিমী ও কবিরাজী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত ছিল। এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এব্যাপারে তাহাদের দায়িত্বজ্ঞান যত তাড়াতাড়ি উদয় হইবে, ততই জাতির পক্ষে অধিক মঙ্গলকর হইবে।

আমাদের শরী'অতে মোকাদ্দাসার বিধান অনুযায়ী চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করা ফরযে-কেফায়া এবং রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করা সুন্নতে মোআক্কাদাহ্। কিন্তু সু-চিকিৎসা কিছুতেই হইতে পারে না, যে পর্যন্ত না চিকিৎসক যেমন একদিকে হইবেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ও শাস্ত্রে পারদর্শী, তেমনি অপর দিকে হইবেন খোদাভীরু, ধার্মিক ও সত্যবাদী, দায়িত্বজ্ঞানশীল—অন্য কথায় মানুষের সেবাই হইবে তাঁহার জীবনের ব্রত ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং তাঁহার মা'বুদ একমাত্র খোদা; অর্থের জন্য তাঁহার লালসা হইবে না বিন্দুমাত্রও।

ওয়াযের মাহ্‌ফিল

ইসলামী আদর্শ, ইসলামী আহ্‌কাম, কোরআনের আদেশ-নিষেধ ও রাসূলের সুন্নত তরীকা সাধারণভাবে প্রচার করার জন্য, সমস্ত অধঃপতন ও দুর্নীতির মূল কারণ যে আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া থাকা, আখেরাতকে ভুলিয়া থাকা ও দুনিয়ার মোহে মত্ত হইয়া যাওয়া, সেই মূল কারণকে দূর করিয়া আল্লাহ্‌র মহব্বত পয়দা করার জন্য, আখেরাতের বিচার ও হিসাবকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য এবং দুনিয়ার মায়া-মহব্বত মোহমত্ততা কমানের জন্য মাঝে মাঝে ওয়াযের মাহ্‌ফিল করার দরকার—একান্ত দরকার।

কিন্তু শুধু সুমধুর স্বর, সুন্দর ভাষা ও মার্জিত বর্ণনা পদ্ধতি হইলেই চলিবে না; বরং যিনি ওয়ায করিবেন তাঁহার নিম্নলিখিত গুণগুলির অধিকারী হইতে হইবে—(১) আঞ্চলিক ভাষার উপর আধিপত্য এবং বর্ণনা ভঙ্গীর মাধুর্য, কোরআন হাদীসে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। কোরআন হাদীসের পারদর্শী ইমামগণ কোরআন হাদীস হইতে ইজতেহাদ করিয়া যে সব মাসআলা মাসায়েল (সূত্র, ধারা উপধারা এবং তত্ত্বজ্ঞান) বাহির করিয়া ফেকাহ্, তাসাওওফ ও আক্কায়েদের কিতাব লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানে মোটামুটি অধিকারী হইতে হইবে। (২) আবার শুধু জ্ঞানের অধিকারী হইলেও চলিবে না; বরং তদনুযায়ী নিজ নিজ আকায়েদ-আ'মাল ও আখ্‌লাককেও গঠন করিতে হইবে; কথায় ও কাজে মিল থাকিতে হইবে। কুফর, শিরক ও বেদ'আত হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। নামায রোযার পূর্ণ পাবন্দ হইতে হইবে, লেবাসে ও ছুরতে-সীরাতে সুন্নতের পাবন্দ হইতে হইবে। লেনদেন পরিষ্কার রাখিতে হইবে। চালচলন আচার-ব্যবহার সুন্দর হইতে হইবে; গরীবদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না। টাকা-পয়সার প্রতি আদৌ লোভ থাকিতে পারিবে না। দ্বীনের খাতিরে বা দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য জানের, মালের বা নিজের সম্মানের ক্ষতিরও পরওয়া করা চলিবে না। দুনিয়ার জিন্দেগীর চাইতে আখেরাতের জিন্দেগীকেই সবচেয়ে বড় মনে করিতে হইবে। আল্লাহ্‌র মহব্বত, আল্লাহ্‌র ভয় এবং নম্র স্বভাব এখ্‌তিয়ার করিতে হইবে। এইরূপ আলেমের ওয়াযই ইংরেজী শিক্ষিত, আরবী শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেই শুনিবে। সকল রকম বক্তৃতার পিছনেই দৌড়ান ঠিক নহে।

ওয়াযের দ্বারা ধর্মের সাধারণ জ্ঞান লাভ হইবে এবং সাধারণভাবে দ্বীনদারী, পরহেযগারী ও ঈমানের মজবুতীও হাছিল হইবে। কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানেরই দরকার আছে, খাছভাবে একজন

খাঁটি যোগ্য নায়েবে রাসূল তালাশ করিয়া বাহির করিয়া তাঁহার কাজে নিজের ভিতরকার সব দুর্বলতার কথা গোপনে প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার ছোহ্বতে থাকিয়া তাঁহার আদর্শ চরিত্র, আদর্শ জয্বা ও আদর্শ ঈমান মোতাবেক নিজের জীবনকেও তদ্রূপ গঠন করা। আল্লাহ্র সঙ্গে মযবুত তা'আল্লোক আপনাআপনি পয়দা হয় না। শুধু কিতাব পড়িলেও হয় না বা শুধু ওয়ায শুনিলেও হয় না; বরং যোগ্য কামেল নায়েবে রাসূলের নিকট বার বার যাতায়াত করিয়া, তাঁহার কাছে থাকিয়া, বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজের ভিতরকার অবস্থাদি জানাইয়া, কিছু শয়তানের সঙ্গেও মুজাহাদা করিয়া তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী আমল করিয়াই আল্লাহ্র সঙ্গে তা'আল্লোক পয়দা করিতে হয় এবং জীবনভর গুণগুলিকেই বেশী মর্যাদা দিতে হয়। আজকাল এক রকম তা'বীযের ব্যবসায়ী পীর এবং ব্যবসায়ী ওয়ায়েয বাহির হইয়াছে, যাহারা বংশানুক্রমে আয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইহারা সুন্নতের কোন পায়রবী করে না, শরী'অতেরও কোন পরওয়া করে না। এই প্রকার ব্যবসায়ী পীরদের কাছেও যাওয়া চাই না; বরং সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকিলে ধর্মের নামে এই ধরনের ধোঁকাবাজিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই ধরনের জাল নোটই দুনিয়াতে খুব বেশী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আসল নোটের সন্ধান না করিলে, তার মর্যাদা না করিলে, সেটা হইবে ঘোর অন্যায় এবং ঘোর বোকামি। যিনি খাঁটি নায়েবে রাসূল, খাঁটি পীর হইবেন, তাঁহারও এক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ হইতে হইবে, যাহারা দ্বীনের উন্নতি চায়, নফ্সের এছলাহ্ করিতে চায়, আল্লাহ্র সঙ্গে তা'আল্লোক মযবুত করিতে চায়, দুনিয়ার মহব্বত কমাইয়া আখেরাতের কাজ কিছু করিতে চায়, আখলাকের উন্নতি ও চরিত্র গঠন করিতে চায়, ধৈর্য সহকারে তাহাদের জন্যও কিছু সময় দান করিতে হইবে। ইহা কোনরূপ নিছক দয়া নহে; বেকারের নামমাত্র কাজও নহে; বরং ইহা রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সুন্নত—অতি বড় সুন্নত। ইহা না থাকিলে লোকের তালীম তরবিয়াত হইবে কেমন করিয়া? ইসলামের সেই উন্নতির যুগে বাদশাহ্-উযির, শাসক-বিচারক, শান্তি-রক্ষক পুলিশ, বণিক, কৃষক সকলেই নিজে আলেম হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ কামেল নায়েবে রাসূলের নিকট হইতে তরবিয়াত গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের বা অন্যান্য কাজ চালাইতেন। ঐ শ্রেণীর আলেমগণ নিজেরা রাষ্ট্রীয় কাজে থাকিতেন না; বরং জনগণেরই খেদমত করিতেন।

বস্তুতঃ ইহাই নেযামে খানকাহীর, পীর-মুরীদীর বা তাসাওওফের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু পরে ধোঁকাবাজ ও দুনিয়া লোভীরা সব কিছুই বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যেহেতু দ্বীন ইসলামের হেফাযতের ভার নিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এবং যেহেতু নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেনঃ

لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ قَوَّامَةً عَلٰى اَمْرِ اللهِ لَايَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا (ابن ماجة)

[ইহার সারমর্ম এই যে, আমার উম্মতবৃন্দ হইতে ছোট হইলেও একটি দল নিশ্চয়ই হকের উপর কায়েম থাকিবে; ধোঁকাবাজদের ধোঁকাবাজিতে, দুষ্টদের টিটকারীতে বা সাহায্য বন্ধকারীদের সাহায্য বন্ধ করাতেও তাহাদের টলাইতে বা বিগ্ড়াইতে পারিবে না।] এইজন্য কিছু লোক হকের উপর নিশ্চয়ই আছে, কাজেই তালাশ করিয়া তাহাদিগকে বাহির করিতে হইবে ও তাহাদের দ্বারা কাজ নিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সত্যিকার মহৎলোক যখন সর্বদাই ছিল, যখন খাঁটি ইসলামী খেলাফত ছিল বা সমাজ ব্যবস্থা মোটামুটি ইসলামী ছিল, তখন এই সকল লোকদের মহান মর্যাদা দান করা হইত। বস্তুতঃ এই মর্যাদা দেখিয়াই পরবর্তী যুগে একদল ধোঁকাবাজ জন্মিয়াছে। ফলে

ধোঁকাবাজদের হাতে ধোঁকা খাইয়া জনসাধারণ এখন খাঁটি অখাঁটির তারতম্য না করিয়া সকলেরই অমর্যাদা করিতে শিখিয়াছে; তবে জনসাধারণ তারতম্য করিতে শিখিলে, এই ধরনের ধোঁকাবাজদের রুযি-রোযগার বা খাওয়া পরা চলিবে কি করিয়া?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, শঠতা, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা দিয়া যাহারা সরল প্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে, তাহারা গোটা জাতির তথা ইসলামের—অন্য কথায় আল্লাহ্‌র শত্রু। তাহাদের রুযি-রোযগারের চিন্তায় ব্যাপৃত হওয়া কোন মুসলমানের জন্যই জায়েয হইতে পারে না। 'আবার এই ধোঁকার ভয়ে সত্য অসত্য বা খাঁটি অখাঁটি বাছাই না করিয়া কাহারো নিকট না গেলে, যাঁহারা খাঁটি আছেন তাঁহাদের রুযির অবস্থাই বা কি হইবে? এমন প্রশ্নও হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, যাঁহারা খাঁটি তাঁহারা রুযির জন্য কোন বান্দার উপর কখনও নির্ভর করেন না! দ্বিতীয়তঃ, মুসলমনেরা কখনো এতদূর বোকা হইতে পারে না যে, ধোঁকার ভয়ে তাহারা সত্যকে এবং খাঁটিকেও বাছাই করা এবং তাহার দ্বারা উপকৃত হওয়াকে ত্যাগ করিবে। অখাঁটিকে বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে এবং যাঁহারা খাঁটি তাঁহাদের যথোচিত মর্যাদা দিতে হইবে।

ধর্ম রক্ষার জন্য কয়েক প্রকার ব্যবস্থা রহিয়াছেঃ (১) মক্‌তব, (২) মাদ্রাসা, (৩) মা'হাদ, (معهد) (৪) খানকাহী তরবিয়াত, (৫) জামে'আহ্‌, (৬) ওয়ায-নছীহতের মজলিস, (৭) তাবলীগ, (৮) তা'লীফ-তাছনীফ, (৯) তানযীম, (১০) তফসীরের মজলিস, (১১) সীরাতুন্নবীর মজলিস, (১২) দারুল-ইফ্‌তা, (১৩) দারুল-হাদীস, (১৪) রদ্দে-নাছারা, রদ্দে-কাদিয়ানী, রদ্দে-কুফর ও শেরক ও রদ্দে-কমিউনিষ্ট, (১৫) মসজিদ ইত্যাদি।

(১) মক্তব—যেখানে কায়দা, ছিপারা ও কোরআন শরীফ শুদ্ধ করিয়া পড়ান হয় এবং ধর্মের প্রাথমিক শিক্ষা বেহেশ্‌তী জেওর পর্যন্ত অর্থাৎ কলেমা, নামায, রোযা, ওযূ-গোসল, জুমু'আর খুৎবা, জানাযার তরীকা, বিবাহের খুৎবা, মোটামুটি হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, জায়েয-নাজায়েয ও বেহেশ্‌ত-দোযখের বয়ান ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) মাদ্রাসা—যেখানে কোরআন, তফ্‌সীর, হাদীস, ফেক্‌হ্‌, তাছাওওফ, আক্বা'য়েদ ইত্যাদি আরবী ভাষায় ব্যাকরণ ও মোহাবারাসহ শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৩) মা'হাদ—যেখানে তাহ্‌কীকাত (Research—গবেষণা) শিক্ষা দেওয়া হয় এবং শিক্ষক ও মোবাল্লেগদের তরবিয়াত (Training) দেওয়া হয়।

(৪) জামে'আ—যাহার অধীনে আরো অনেক মাদ্রাসা থাকে।

(৫) খানকাহ—যেখানে কোরআন হাদীসের শিক্ষাকে আমলে পরিণত করা হয় এবং তদনুযায়ী চরিত্র গঠন করা হয়।

(৬) মসজিদ—যেখানে এবাদত-বন্দেগী করা হয় এবং ইসলামী বিষয়সমূহের পরামর্শ সভা করা হয়। এই সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয। আর হুকুমত (বা সরকার) ইসলামী হইলে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারই এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যেহেতু আমাদের হুকুমত ইসলামী নয়; সেজন্য এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার কাজে মুসলমানদের যাকাত, খয়রাত ও দানের পয়সা খরচ হওয়াই সবচেয়ে বেশী জরুরী এবং সবচেয়ে অধিক নেকীর কাজ।

জায়গীর

দীর্ঘ দুইশত বৎসর যাবৎ ইসলামের পরম দুশমন ইংরেজগণ আমাদের দেশ শাসন করিয়া যে বিষফলের বীজ বপন করিয়া গিয়াছে তার মধ্যে সবচাইতে অধিক মারাত্মক ও ধ্বংসকর বিষফল হইতেছে এই যে, তাহারা ধর্মহীন কুশিক্ষার ধারা চালু করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ফলে যে মুসলমানগণ একদিন ধর্মের জন্য আখেরাতের সওয়াবের জন্য জীবনের অনেক কাজ করিতে অভ্যস্ত ছিল, সেই সওয়াবের কাজ করা এখন ভুলিয়া গিয়াছে। এখন তাহারা সর্বকাজেই দুনিয়ার হীন স্বার্থকেই খুব বড় করিয়া দেখে। তাহারা এখন বিদ্যা শিখে চাকুরীর জন্য বা পয়সা উপার্জনের জন্য। ডাক্তার গরীব রোগীকে ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দেয়, উকীল গরীব মযলুমকে পরামর্শ দেয়, শিক্ষক ছাত্রকে পড়ায়—এসব তাহারা শুধু টাকার জন্যই করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের এমন দিন ছিল, যেদিন মুসলমানেরা এইসব শুধু গরীবের উপকারের জন্য তথা আখেরাতের সওয়াবের জন্য করিতে অভ্যস্ত ছিল।

শুনিয়াছি, লণ্ডনের মহাসভ্য ব্যক্তিরা ছাত্রদিগকে বাড়ীতে জায়গীর রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা লয়, ব্যবসা করে এবং তাহাদের বলা হয় Paid guest বা টাকার অতিথি। সৌভাগ্য-বশতঃ আমাদের দেশে এখনও মেহ্মানদের কাছ থেকে বা জায়গীর ছাত্রদের কাছ থেকে, টাকা লওয়ার প্রথা চালু হয় নাই। অবশ্য যাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য বর্বরতা বনাম সভ্যতা বেশী ঢুকিয়াছে তাহারা দ্বীনি-এল্মের সাহায্যার্থে মাদ্রাসার ছাত্র জায়গীর রাখা ছাড়িয়া দিয়াছে। এই প্রথা ইসলামের আদি হইতেই চলিয়া আসিতেছে যে, কতক লোক আল্লাহ্র দ্বীনের উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য বাড়ী-ঘর ত্যাগ করিয়া বিদেশে বাহির হইয়াছে এবং সেখানে মুসলমানগণ রাসূলের এই মেহ্মানদিগকে আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশ্যে থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আজও যেসব মুসলমান খৃষ্টান সভ্যতার (!) দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, তাঁহারা তালেবে এল্ম ছাড়া ভাত খাওয়াকে আল্লাহ্র রহমত উঠিয়া যাওয়া মনে করে। কোরআন হাদীসের এল্ম তথা এল্মে দ্বীনের শিক্ষার্থী তালেবে এল্মদিগকে রাসূলের খাছ মেহ্মান মনে করিয়া শুধু সওয়াবের নিয়তেই বাড়ীতে স্থান দেওয়া, দুনিয়ার কোন স্বার্থে নহে; বরং শুধু আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশ্যেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াকে বলা হয় জায়গীর। ইহা একটি সুন্দর ব্যবস্থা, কারণ তালেবে এল্মদের থাকা-খাওয়ার মোট তিন প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে। যথা—(১) বাড়ীতে থাকিয়া খাওয়া ও পড়া, (২) বোর্ডিংয়ে থাকিয়া খাওয়া-পড়া ও (৩) জায়গীরে থাকিয়া খাইয়া পড়া। এই তিন প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে—সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে জায়গীর ব্যবস্থা। কেননা, বাড়ীতে থাকিয়া পড়িতে গেলে পড়ার মধ্যে অনেক বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়। আর বোর্ডিংয়ে থাকিতে গেলে খরচ অনেক বেশী, যাহা অনেকের পক্ষে অনেক সময় বহন করাই সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে জায়গীর থাকিলে একদিকে (১) জায়গীরওয়ালার বাড়ী দ্বীনি-এল্মের চর্চায় আলোকিত হয়। (২) জায়গীরওয়ালা দ্বীনের খেদমত করিয়া ছদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাছিল করে; অথচ যে পরিবারে ৪/৫ জন লোক আছে সেই পরিবারে একজন তালেবে এল্মের খোরাকের জন্য

পৃথক কোন ব্যয় করিতে হয় না। (৩) গরীবদের ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা শুধু এই জায়গীরের ব্যবস্থাদ্বারাই সম্ভবপর। (৪) যে তালেবে এল্‌ম জায়গীরে থাকে, তাহার এল্‌ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সেবারও অভিজ্ঞতা জন্মে এবং অনেক নৈতিক চরিত্র সে আয়ত্ত করিতে পারে।

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের বাড়ীতেই অবশ্য অবশ্য একজন তালেবে এল্‌ম রাখা একান্ত দরকার এবং নিয়ত খালেছ করিয়া একমাত্র আখেরাতের সওয়াবের নিয়তেই রাখা আবশ্যক। আজকাল ইসলামী শিক্ষা বাদ দিয়া, ইসলামী শিক্ষা লাভের ফরয তরক করিয়া যাহারা ধর্মহীন শিক্ষা লাভ করে, তাহারাও অনেকে জায়গীর খোঁজে। কিন্তু মুসলমানদের জানিয়া রাখা দরকার যে, জায়গীর রাখার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে সওয়াব হাছিল করা। আর সওয়াব হাছিল হইবে ধর্মবিদ্যা শিক্ষার্থী তালেবে এল্‌মদের সাহায্য করিলে। কিন্তু যাহারা ধর্মহীন শিক্ষা লাভ করে তাহারা টাকার জন্যই পড়ে। এই টাকার লালসা তাহাদের এত স্পষ্ট যে, ওকালতি ডাক্তারী প্রভৃতি করিবার সময় তাহারা টাকা ছাড়া কাজ করে না এবং তাহারা বলেও যে, আমরা টাকার জন্যই পড়িয়াছি এবং টাকা খরচ করিয়াই পড়িয়াছি, অতএব, আমরা টাকা ছাড়া কাজ করিতে পারিব না। এই ধরনের শিক্ষার্থীদিগকে সাহায্য করিয়া আখেরাতের সওয়াব পাওয়ার আশা করা একেবারেই বৃথা।

আজকাল ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত শিক্ষার প্রভাবে এবং তৎসঙ্গে খৃষ্টানী বর্বরতামূলক, তথাকথিত সভ্যতার তাসীরে অনেক নব্যশিক্ষিত যুবক ইসলাম ধর্মের সত্য সনাতনতা অস্বীকারপূর্বক উহা ত্যাগ করিয়া বসিতেছে এবং ইসলাম বিরোধী নাচ, গান, বাদ্য, বাজনা, থিয়েটার, সিনেমা, বেহায়ানা, বেপর্দা পভৃতি চরিত্রহীনতামূলক অনেক কাজ করিতেছে। এ সমস্ত ইসলাম বিরোধী কাজ হইতে মুসলমানদের নিজেরও বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদিগকেও বাঁচাইয়া রাখা দরকার। শুধু তাহা নহে, নিজ নিজ সমাজকেও এ সময় চরিত্রনাশক কার্য হইতে পবিত্র রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। মুসলমানদের দুনিয়াবী উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সব সময় খেয়াল রাখা দরকার, যেন তাহাদের ধর্ম নষ্ট না হয় এবং আখেরাতের মঙ্গলজনক কার্য নষ্ট না হয়।

সমাজ বন্ধন

লোকে সাধারণতঃ ভাল বা মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকে তিন কারণে—(১) খোদার ভয়ে, (২) সমাজের চাপে, (৩) আইনের ভয়ে।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার ছাহাবায় কেরাম (রাঃ) এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা দুনিয়াতে চালু করিয়াছেন, যাহাতে পরস্পর সমবেদনা, সহানুভূতি ও হামদর্দি বিদ্যমান ছিল। একজনকে মন্দ কাজ করিতে দেখিলে সকলে তাহাকে নিষেধ এবং বারণ করিত। ভাল কাজ হইতে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিলে সকলেই তাহাকে উক্ত ভাল কাজ করিবার জন্য আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিত। কেহ বিপদে পতিত হইলে সকলেই তাহার প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিত ও তাহার বিপদ মোচনে সাহায্য করিত। কেহ সম্পদশালী হইলে সকলেই তাহাতে খুশী হইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বৃটিশ শাসনের বিষফলস্বরূপ এখন আর আমাদের সমাজে সেই সুন্দর সমাজ বন্ধন নাই। ইসলাম ধর্মের প্রধান একটি ফরয এবং বড় একটি শিক্ষা হইতেছে 'আম্‌র বিল-মারূফ' ও 'নেহী আ'নিল মুন্‌কার'

অর্থাৎ, সৎকাজের আদেশ ও উৎসাহ প্রদান এবং মন্দকার্য হইতে নিবৃত্তকরণ। অথচ ইংরেজদের স্বভাব হইতেছে 'Oil your own machine' "নিজের চরকায় তেল দাও"।

সীরাতে পাক

আল্লাহ্ তা'আলা শেষ যুগে মানুষের হেদায়তের জন্য শুধু একখানি কিতাব 'আল-কোরআনুল করীম' পাঠাইয়া ক্ষান্ত হন নাই; বরং সঙ্গে সঙ্গে একজন অনুপম পূতচরিত্র মহামানবকে রাসূল বানাইয়া তাঁহার দ্বারা কোরআনের নির্দেশগুলিকে সুষ্ঠুভাবে প্রচার করার এবং উহার উদ্দেশ্যগত অর্থসমূহ পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, অন্যথায় কোরআনের ব্যাপকার্থক ভাষায় বিরূপ অর্থ করিয়া লোকে বিপথগামীও হইতে পারিত। এই কারণেই নিষ্পাপ ও পূতচরিত্র রাসূলের দ্বারা কোরআনের নির্ভুল অর্থ করাইয়া নিখুঁত আদর্শ কায়েম করিয়াছেন।

অতএব, রাসূল (দঃ)-এর জীবন চরিত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করা, শ্রবণ করা, আলোচনা করা এবং গবেষণা করা প্রত্যেকটি মানুষেরই একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ্কে ভালবাসিতে এবং তাঁহার ভালবাসা লাভ করিতে সকলেই চায়। আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার একমাত্র উপায় তাঁহার রাসূলকে ভালবাসা এবং প্রমাণস্বরূপ রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইহধামে জীবন যাপন করা। এই কথা কোরআন শরীফেও আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিয়াছেনঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ ○

"হে রাসূল! আপনি মানুষকে বলিয়া দিন—'যদি তোমরা আল্লাহ্র ভালবাসা কামনা কর, তবে আমাকে ভালবাসিয়া আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চল, ইহাতেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।"

এসম্বন্ধে হাদীস শরীফেও আছেঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

"হে মানবজাতি! তোমরা কেহই ঈমানদার বলিয়া গণ্য হইবে না, যাবৎ না তোমরা নিজেদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পুত্র, রাজা-বাদশাহ্, আমীর-ওমারা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী প্রভৃতি সমস্ত মানবজাতি অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক ভালবাসা দেখাইতে না পারিবে।" কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত, কার্যাবলী, গুণাবলী, ঈমানের দৃঢ়তা, এবাদত বন্দেগীতে খোদা-প্রেমের অনুপম ভাবাবেগ, লেন-দেন ও কাজ-কারবারের মধ্যে অতুলনীয় আমানতদারী, ওয়াদা প্রতিপালন, আচার-ব্যবহারে ভিতর এবং বাহির উভয় দিকেই নির্মলতা, স্বভাবের নম্রতা, ভদ্রতা ও উদারতা, প্রাণঘাতী শত্রুর বেলায়ও ইন্ছাফ এবং ন্যায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন সম্বন্ধে শুধু তাঁহার কথার উপদেশগুলিই নয়; বরং তাঁহার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তিনি যে সমস্ত কার্যকরী আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যে পর্যন্ত তৎসম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞানলাভ করা না যাইবে—সে পর্যন্ত তাঁহার প্রতি ভালবাসা এবং তাহার প্রকৃত অনুসরণ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং রাসূল (দঃ)-এর জীবনী আলোচনা করা একান্ত দরকার। রাসূলের জীবনী আলোচনার

মজলিসকে কেহ "সীরাতে পাকের মজলিস" বলে, কেহ মৌলুদ শরীফ বয়ানের মাহ্‌ফিল বলে, কেহ বা মাহ্‌ফিলে মিলাদ বলে, আসল উদ্দেশ্য একই—ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। ইহা অত্যন্ত জরুরী।

মুসলমানদের ঘরে ঘরে এবং দোকানে দোকানে শুধু বৎসরে এক আধবার নয়, শুধু রবিউল আউয়ালের চাঁদে নয়, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে এই পবিত্র মাহ্‌ফিলে মিলাদের অনুষ্ঠান হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সমাজের অজ্ঞতা এবং মূর্খতা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। মাহ্‌ফিলে মিলাদ সম্বন্ধে বড় বাড়াবাড়ি এবং ঝগড়া বিতর্ক হইতেছে। ঝগড়া ফাসাদের বিতর্কের বাড়াবাড়ি ত্যাগপূর্বক, এই পবিত্র মাহ্‌ফিলের অনুষ্ঠান সর্বত্র হওয়া দরকার। সংক্ষেপের চেয়েও সংক্ষেপেও এই মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হইতে পারে। হয়ত হুযূরের কর্মময় জীবন ধারা সম্পর্কীয় একখানা হাদীস পড়িয়া বুঝাইয়া দিয়া এবং দুরূদ ও সালাম পাঠ করিয়া মাহ্‌ফিল শেষ করা যাইতে পারে। সমগ্র হাদীস গ্রন্থগুলিই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জীবন চরিত, সে অনেক লম্বা। যেখানে সদাসর্বদা হাদীস পাঠ ও শ্রবণ অনুষ্ঠিত হইতেছে সদা-সর্বদা হুযূরের প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করা হইতেছে, সেখানে খাছ মিলাদের মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠানের কোন দরকার নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, যেখানে কোরআনের ও আল্লাহ্-রাসূলের আলোচনা হওয়ার সুযোগ মোটেই হয় না, সেখানে খাছ সীরাতে পাকের মজলিস বা মাহ্‌ফিলে মিলাদ নাম দিয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহা বেদ'আত হইবে—কখনও নহে। আবার কেহ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ মনে করেন, আগর বাতি জ্বালাইয়া সাজসজ্জা ও আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠান করিয়া খাড়া হইয়া দুরূদ ও সালাম না পড়িলে সেটা মৌলুদ শরীফের বয়ান হইল না—এটাও ভুল ধারণা।

প্রিয় মুসলিম ভাইগণ! আমার উপর খারাব ধারণা করিবেন না। আমি বেদআতিও নই, ওয়াহাবীও নই। আমি একজন গুনাহ্‌গার, আপনাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নগণ্য খাদেম—মুসলমান। আমি নিতান্ত ব্যথা ভরা অন্তর নিয়া আপনাদের খেদমতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি—আপনারা এই "ওয়াহাবী বেদ'আতির" ঝগড়া ও মারামারি ছাড়ুন। খবরদার! খবরদার!! উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করিবেন না। সকলেই আমরা মুসলমান। সকলেই নিজ নিজ দোষ-ত্রুটি সংশোধন কাজে ব্যাপৃত থাকুন এবং সকলে একতাবদ্ধ হইয়া ইসলামের খেদমতের কাজে এবং ইসলামের দুশ্‌মনদের প্রতিরোধ কার্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে মনোনিবেশ করুন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, ছাহাবায়ে কেরামের জীবনী, পূর্ব যুগের আম্বিয়া কেরামের, আউলিয়াগণের জীবনী অতি মাত্রায় আলোচনা করুন। তাহাই হইবে প্রকৃত মিলাদ মাহ্‌ফিল। কিন্তু অনেকে মিলাদ মাহ্‌ফিলে বিনা তহ্‌কীকে বাজে ও মিথ্যা 'মাউযূ' রেওয়ায়ত পাঠ বা আলোচনা করিয়া বাক চাতুর্য দেখাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হইতে বাহ্‌বা আদায় করিয়া থাকে। মনে রাখিবেন, শয়তান চির-সজাগ, ইসলামের শত্রু দুনিয়াতে আবহমানকাল হইতে আছে ও থাকিবে। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন, আপনাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণপূর্বক শয়তান শত্রুদল ঈমানের সর্বনাশ না ঘটায়। মাউযূ রেওয়ায়তগুলি শয়তানের প্ররোচনায় ইসলামের শত্রুদের কর্তৃক রচিত—হাদীসের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আসল দামী জিনিসের নকল খুব বেশী হইয়া থাকে। কাজেই শত্রু হইতে এবং নকল জিনিস হইতে সদা সতর্ক থাকা দরকার।

মাদ্রাসার জন্য চাঁদা গ্রহণ

মাদ্রাসা এমন একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান—যেখানে কোরআন-হাদীস শিক্ষা দেওয়া হয়। ইসলাম ধর্মের ভিত্তি যেহেতু অন্যান্য ধর্মের মত শুধু পুরাতন প্রথার উপর নয়, বরং আল্লাহ্‌র প্রেরিত সত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার কোরআন-হাদীসের উপর এবং এই কোরআন ধারাবাহিক শিক্ষা ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে না ; কাজেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান কায়েম রাখা সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয। একটি ফরয কাজে দায়িত্ব পালন ছাড়াও একটি নফল কাজ অপেক্ষা ৭০ গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের জন্য চাঁদা দিয়া সাহায্য করা সমস্ত মুসলমানের উপর একান্ত কর্তব্য।

যাবৎ ইসলামী হুকুমত কায়েম ছিল, হুকুমতের 'বায়তুল মাল' হইতে মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ বহন করা হইয়াছে। শুধু ঘর দরজা ও আসবাব-পত্রের খরচ নয়, শুধু মুদাররেসগণের খরচ নয়, শুধু কিতাব-পত্রের খরচ নয়, তালেবে এলেমদের যাবতীয় ব্যয়ভার বায়তুল মাল হইতেই বহন করা হইয়াছে। তারপর যখন খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ধূর্তামির সামনে এবং তাহাদের স্নায়ুযুদ্ধের সামনে মুসলমানগণ টিকিয়া থাকিতে না পারায় মোঘল সাম্রাজ্যের পতন হইল, তখনও মুসলমানগণ ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ওয়াক্‌ফ, যাকাত, ছদকা খয়রাতের মাল জমা করিয়া মাদ্রাসা ফান্ড গঠনপূর্বক মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ধরনের মাদ্রাসাগুলি কওমী মাদ্রাসা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই কওমী মাদ্রাসাগুলির বিশেষত্ব এই যে, এই ধরনের মাদ্রাসায় যাহারা শিক্ষা লাভ করিবে তাহাদের (১) চাকুরীর মনোবৃত্তি গঠিত হইবে না। (২) সমাজ সেবার ও ধর্ম-প্রচারের মনোভাবই উৎপন্ন হইবে। তাহারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নেকী ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে আজীবন কওমের ও ধর্মের সেবা ও খেদমত করিয়া যাইবে। (৩) তাহারা ইসলামের বিধানাবলী পূর্ণরূপে শিক্ষা লাভ করিবে। নিমমোল্লা বা নামে মাত্র পাগড়ীধারী আলেম হইবে না, পূর্ণ আলেম হইবে। (৪) তাহারা চরিত্রহীন হইবে না। তাহারা পাশ্চাত্য খৃষ্টানী প্রভাবে প্রভাবিত হইবে না। তাহারা ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান হইবে। তাহারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে এবং ইসলামী তাহ্‌যীব, তমদ্দুন ও সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

অতএব, এহেন মহান কাজের জন্য যাঁহারা চাঁদা দান করিবেন, তাঁহারা ছদকায়ে জারিয়া কায়েম করিয়া অফুরন্ত পুণ্যের অধিকারী হইবেন। আর যাহারা এ সমস্ত কওমী মাদ্রাসাগুলির জন্য খালেছ দ্বীনী-এলমের উন্নতির নিয়তে চাঁদা আদায়ের কাজ করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দাতাগণের সমপরিমাণ ছদকায়ে জারিয়া কায়েম করত মহাপুণ্যের কাজ করিবেন। ইসলামের ও দ্বীনী-এল্‌মের শত্রুরা এহেন মহৎ কাজকেও যিল্লতির কাজ, আরবী শিক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষা, আরবী মাদ্রাসার জন্য চাঁদা আদায় করা ভিক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নহে ইত্যাদি নানারূপ প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা সমাজের সরলপ্রাণ মুসলমানদের ভিতর বিরূপ আছর ঢুকাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ নিজের জন্য ভিক্ষা করা অবশ্যই যিল্লতির কাজ। কিন্তু কওমের জন্য এবং ধর্মের জন্য চাঁদা আদায় করা

যিল্লতির কাজ নহে। অবশ্য চাঁদা আদায়কারীর নিয়ত, আমল-আখলাক এবং কার্যপদ্ধতি নির্মল ও খাঁটি থাকা আবশ্যক।

দানের ফযীলত

১। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ দান কর, হে মানব সন্তান! আমিও তোমাকে দান করিব। —বোখারী ও মোছলেম

২। হযরত আয়েশার ভগ্নী হযরত আছমা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে বলিয়াছেনঃ দান করিবে, মালের হিসাব-নিকাশ করিবে না, তাহা হইলে আল্লাহ্ও তোমাকে দিতে হিসাব-নিকাশ করিবেন না। ধরিয়া রাখিবে না, তাহা হইলে আল্লাহ্ও তোমার ব্যাপারে ধরিয়া রাখিবেন না। নিজের শক্তি অনুযায়ী দান করিবে। সামান্যই হউক না কেন।

—বোখারী, মোছলেম

৩। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, যুলম-অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা, উহা কিয়ামতের দিন অন্ধকারস্বরূপ হইয়া তোমাকে গ্রাস করিবে। আর কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা, তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদিগকে কৃপণতা ধ্বংস করিয়াছে। উহা তাহাদিগকে পরস্পরের রক্ত বহাইতে এবং হারামকে হালাল করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। —মোছলেম

৪। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ দানে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়? হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যখন তুমি সুস্থ থাক, মালকে ভালবাস, দারিদ্র্যকে ভয় কর এবং তওয়াংগরীর আশা রাখ, তখনকার দানে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়; দানে বিলম্ব করিও না তাবৎ, যাবৎ তোমার প্রাণ হলকুমে পৌঁছে, আর তুমি বলিতে থাকঃ অমুককে এটা দিবে, অমুককে ওটা দিবে। অথচ এই মাল তখন অন্যের হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইবার পূর্বেই দান করিবে, যখন তুমি মালের প্রতি মোহ্তাজ থাকিবে। ইহাতে অধিক সওয়াব রহিয়াছে।

—বোখারী ও মোছলেম

৫। হযরত আবুযর গেফারী (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম, তখন তিনি খানায়ে কা'বার ছায়ার বসা ছিলেন। তখন আমাকে দেখিয়া বলিলেনঃ তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত—আমি রব্বে কা'বার কছম করিয়া বলিতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ হুযূর আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবান যাক্ঃ তাহারা কাহারা? হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যাহাদের মাল বেশী আছে তাহারা। অবশ্য যে ব্যক্তি আগে-পিছে ও ডানে-বামে দান করিবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত নহে। কিন্তু এইরূপ লোক কমই।

—বোখারী ও মোছলেম

৬। হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্রও নিকটে, বেহেশ্তেরও নিকটে এবং মানুষেরও নিকটে; আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ হইতেও দূরে, বেহেশ্ত হইতেও দূরে, মানুষ হইতেও দূরে, অথচ দোযখের নিকটে। একজন মূর্খ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট একজন এবাদতকারী কৃপণ দরবেশ হইতে নিশ্চয়ই অধিক প্রিয়। —তিরমিযী

৭। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি মউতের বিছানায় শুইয়া দান করে বা গোলাম আযাদ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজে পেট ভরিয়া খাওয়ার পর অতিরিক্ত খাদ্য অন্যকে দান করে। —নাছায়ী, দারেমী ও তিরমিযী

৮। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি হালাল রুযী হইতে একটি খেজুর পরিমাণ মালও দান করে, আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে নিজের ডান হাতে কবূল করেন এবং উহাকে তাহার জন্য বাড়াইতে থাকেন, যেভাবে কোন ব্যক্তি আপন ঘোড়ার বাচ্চাকে পরওয়ারিশ করিয়া বাড়াইতে থাকে। এমনকি তাহার সেই সামান্য দান পাহাড় পরিমাণ হইয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা হালাল ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না। —বোখারী ও মোছলেম

৯। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ দান কাহারো মালকে কমায় না। ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ্ কাহারো সম্মানকে বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস করেন না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে নিজকে ছোট মনে করে, আল্লাহ্ তাহাকে বড় করেন। —মোছলেম

১০। হযরত ফাতেমা বিন্তে কাইস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, যাকাত ব্যতীতও মালে মানুষের হক রহিয়াছে। —তিরমিযী

ওস্তাদ-ভক্তি ও ওস্তাদের খেদমত

ওস্তাদকে ভক্তি করা, ওস্তাদের সন্নিধানে থাকিয়া সর্বদা তাঁহার খেদমত করা, পিতা-মাতা প্রভৃতি মুরুব্বীয়ানকে ভক্তি করা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা, বয়ঃকনিষ্ঠ ও নিজের ছেলেমেয়েদিগকে স্নেহের চোখে দেখা এবং নম্র ব্যবহার করা ইসলামের আদর্শ। ইসলামী আদর্শ ছিল—ওস্তাদগণ শাগরিদগণ হইতে কোন বেতন বা পারিশ্রমিক না নিয়া, শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে সওয়াব লাভের নিয়তে এবং দ্বীনের ও কওমের খেদমতের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা প্রদান করিতেন। আর শাগরিদগণও ওস্তাদগণকে প্রাণের সহিত ভক্তি করিত। আজীবন নিজদিগকে ওস্তাদের কাছে ঋণী মনে করিত। যে কোন সুযোগে কায়িক বা আর্থিকভাবে ওস্তাদের কিছু খেদমত করিতে পারিলে নিজেকে মহাসৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত, ওস্তাদের খেদমতে কায়িক পরিশ্রম করাকে কোনরূপ হীনতা বা যিল্লতী মনে না করিয়া পরম গৌরবের কাজ মনে করিত। আর্থিক খেদমত করাকে ভিক্ষা বা হীনতার কাজ বলিয়া মনে স্থান দিত না, বরং শাগরিদগণ ইহাতে মনে করিত, যাহার কাছ হইতে আল্লাহ্ ও রাসূলের পরিচয় লাভ করিয়াছি, তাঁহাকে কিছু অর্থ প্রদান করা বাস্তবিকপক্ষে অর্থের সর্বাপেক্ষা অধিক সদ্ব্যবহার। ইহা শুধু প্রাচ্যদেশের পৌরাণিক প্রথা নহে, ইহাই হইতেছে ইসলামের চিরন্তন আদর্শ।

সহপাঠীদের সহিতও বয়স এবং মর্যাদানুসারে সদ্ব্যবহার এবং সহানুভূতি প্রকাশ করা ইসলামের আদর্শ। সহপাঠীদের সহিত খাঁটি ভ্রাতৃত্বভাব বজায় রাখাই ইসলামের নীতি। কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও নীতির প্রভাবে সেই পবিত্র নিঃস্বার্থ সম্পর্ক লোপ পাইয়াছে। ওস্তাদগণও বিনা বেতনে পড়ান না, ছাত্রগণ শিক্ষককে বেতনভোগী কর্মচারী বলিয়া মনে করে। সহপাঠীদের ভ্রাতৃত্বভাব, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতির পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ, রেষারেষি ভাব উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সেই ওস্তাদ ভক্তিও এখন আর নাই। ওস্তাদের খেদমত করাকে হীনতা ও যিল্লতির কাজ বলিয়া মনে করা হয়। ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব। ইহাকে বর্জন না করিলে ওস্তাদ শাগরিদের সেই চির মধুর সম্পর্ক আর ফিরিয়া আসিবে না।

ওস্তাদকে হাদিয়া ও বিনিময় প্রদান

বর্তমান যুগে টাকার কর্মচারীদের মধ্যে কিছুটা সময়ানুবর্তিতা, নিয়ামানুবর্তিতা এবং কর্তব্য জ্ঞান দেখা যায়। কিন্তু যাঁহারা আল্লাহ্র ওয়াস্তের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা, নিয়ামানুবর্তিতা,কর্তব্যপরায়ণতা শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহা ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামী আদর্শ এই যে, দুনিয়ার চেয়ে যেমন আখেরাত বড়, দুনিয়ার টাকার চেয়ে তেমনই আখেরাতের সওয়াব অনেক বড়। সবচেয়ে বড় হইল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ, আল্লাহ্র ওয়াস্তে কাজ কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই বটে। কোটি কোটি টাকার চেয়ে বিন্দুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মূল্য অনেক বেশী। টাকার কর্মচারীরা পার্থিব তুচ্ছ টাকা-পয়সা লাভের জন্য নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যপরায়ণতার সহিত কাজ করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিরূপ অমূল্য ও অনুপম রত্ন লাভের জন্য আল্লাহ্র ওয়াস্তের কাজে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক নিয়মানুবর্তী ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত নহে কি?

উজরত বা বেতন লইয়া শিক্ষা প্রদান করা এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান সহকারে শিক্ষা প্রদান করার মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য। বেতন লইয়া শিক্ষা প্রদানের কাজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজ এবং উজরত না লইয়া দ্বীনি-এলমের খেদমতের নিয়তে শিক্ষা প্রদান নিঃস্বার্থ ত্যাগের একটি উজ্জ্বল আদর্শ।

কিন্তু একজন ওস্তাদ দায়িত্ব ও নিয়মানুবর্তিতা সহকারে বিনা বেতনে কেবল আল্লাহ্র ওয়াস্তে একজনের ছেলেকে এল্ম ও আদব শিক্ষা দিলেন, আর যদি ছেলের পিতাও ওস্তাদকে হাদিয়া-স্বরূপ বেতনের চেয়েও বেশী টাকা দিলেন কিংবা একজন গ্রন্থকার আল্লাহ্র ওয়াস্তে একখানা ধর্ম-পুস্তক লিখিয়া কওমের খেদ্মতের জন্য স্বত্বত্যাগপূর্বক একজন পাব্লিশারকে দিলেন। পাব্লিশার দ্বীনী খেদমতের নিয়তে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া কিছু লাভবানও হইলেন। অতঃপর দ্বীনী খেদমতের নিয়তেই গ্রন্থকারকে হাদিয়াস্বরূপ শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে কিছু টাকা দিলেন। এতদুভয়াবস্থাতেই বৈজ্ঞানিক স্থূল দৃষ্টিতে এবং যুক্তির মাপকাঠিতে বিনিময় বা উজরত প্রদান ও আল্লাহ্র ওয়াস্তে হাদিয়াপ্রদানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। কেননা, একজনের উদ্দেশ্য হইতেছে তুচ্ছ পার্থিব টাকা পয়সা লাভ, আর অপরজনের নিয়ত হইতেছে কওমের খেদমত, দ্বীনি-এলমের প্রচার এবং মহান আল্লাহ্র তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। কিন্তু এই নিয়ত সম্পূর্ণ নির্মল ও খাঁটি হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই শ্রেণীর আল্লাহ্র ওয়াস্তের কাজে খাঁটি নিয়তের পরিচয় তখনই পাওয়া যাইবে, যখন কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কোন প্রকার ত্রুটি করিবে না এবং কোন অবস্থাতেই এই খেদমত পরিত্যাগ করিবে না। কিছু দিন আল্লাহ্র ওয়াস্তে কাজ করিয়া কাজের হক আদায়ের ত্রুটি করা বা কিছুদিন কাজ করার পর কওমের মধ্যে কদরদানী নাই বলিয়া কাজ ছাড়িয়া দিলে প্রমাণ হইয়া গেল যে, নিয়ত খাঁটি ছিল না। নিয়ত খাঁটি থাকিলে সকল অবস্থাতে

নির্ভর থাকিবে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর থাকিলে সেকাজ কেহ ত্যাগ করিতে পারে না।

আমি একথা বলিতেছি না যে, শাগরিদ পড়াইয়া বা এলম শিক্ষা দিয়া বেতন লওয়া না-জায়েয বা ধর্মগ্রন্থ লিখিয়া বইয়ের কপি বিক্রি করা না-জায়েয। জায়েয থাকা ভিন্ন কথা, আর উচ্চ মর্যাদা লাভ করা ভিন্ন কথা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই যথাযোগ্য অকৃত্রিমতা, খালেছ নিয়ত, যথাবিহিত দায়িত্ববোধ থাকা আবশ্যক; অন্যথায় উভয়বিধ অবস্থারই পরিণাম খারাপ হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষতঃ যাহারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের নামে কাজ আরম্ভ করিয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ত্রুটি করিবে এবং আমানতে খেয়ানত করিবে, তাহারা হইবে বেশী 'মুজরিম' অর্থাৎ বড় রকমের অপরাধী। কেননা, তাহারা আল্লাহ্‌র নামে ধোঁকাবাজি করিয়াছে। দুনিয়ার নামে লেন-দেনের কাজে ধোঁকাবাজি করাও পাপ। কিন্তু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের কাজে ধর্মের নামে ধোঁকাবাজি করার পাপ ইহা অপেক্ষা হাজার হাজার গুণ বড় ও বেশী।

খাদ্য সম্বন্ধীয়

শূকর খাওয়া, শরাব খাওয়া, কচ্ছপ খাওয়া ইসলাম ধর্মের বিধান মতে গুরুতর পাপ। যেমন, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, জুয়া খেলার অর্জিত পয়সা খাওয়া, চুরি, ডাকাতি বা জোর-যুলুমপূর্বক ছিনাইয়া খাওয়া বড় পাপ। হিন্দুরা কচ্ছপ খায়, খৃষ্টানরা শূকর খায়। শরাব খাওয়া তাহাদের ধর্মে বোধহয় নিষিদ্ধও নহে। কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্মে শূকর, শরাব, কচ্ছপ ও কুকুর শুধু হারামই নহে, অপবিত্রও বটে। অনুরূপ ভাবে সুদ, জুয়া, জোর-যুলুম, চুরি ডাকাতি ও মূর্তিপূজা অপবিত্র এবং হারাম। এসমস্ত হারাম দ্রব্য ভক্ষণে অন্তর এত কলুষিত, নাপাক ও অপবিত্র হইয়া পড়ে যে, পরে শত চেষ্টা করিয়াও উহাকে পবিত্র করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অন্তরের পবিত্রতা রক্ষাই মুসলমানের প্রধান কর্তব্য।

খানার মজলিস

অনেকে হিন্দুয়ানী প্রভাবে খানার মজলিসকে "ভোজসভা" বলে। কিন্তু শব্দটি ভাষার দিক হইতে শুদ্ধ বলিয়া ধরা গেলেও ইসলামী রুচি বিরুদ্ধ। দস্তরখান বিছাইয়া বিছানায় বসিয়া একত্রে খাওয়াই ইসলামী আদর্শ। খাইবার সময় খোশ আলাপ করা ইসলামী আদর্শ বিরোধী নহে। অবশ্য ঘৃণ্য বিষয়ে আলোচনা কিম্বা গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক বিষয়ের আলোচনা করা খানার মজলিসের আদবের খেলাফ। খাইবার সময় কোন খাদ্যবস্তু হাত হইতে ছুটিয়া বা নড়াচড়ার দরুন বরতন হইতে দস্তরখানে পড়িয়া গেলে উহাকে তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া খাওয়া এবং খাওয়ার শেষে বরতন পরিষ্কার করিয়া হাত চাটিয়া খাওয়া ইসলামী আদর্শ। খাদ্যদ্রব্যেরও একটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ্‌র দানের যে অমর্যাদা করে, সে অহঙ্কারী এবং অর্থ-গর্বে গর্বিত। অহঙ্কারী ও গর্বকারী আল্লাহ্‌র প্রধান শত্রু। দুঃখের বিষয়, আজকাল বরতনে কিছু খাদ্য এবং চায়ের পেয়ালায় কিছু চা অবশিষ্ট রাখিয়া দেওয়াকে ভদ্রতা বলিয়া গণ্য করা হয়। মুসলমান, সাবধান! সাবধান! আল্লাহ্‌র নেয়ামতের অপচয় করিও না।

ডাইন হাত

ডাইন হাত দিয়া খাওয়া, কেহ কোন জিনিস দিলে ডাইন হাতে লওয়া, আবার কাহাকেও কিছু দিতে হইলে ডাইন হাতে দেওয়া, যে কাজের দুইটি দিক আছে, সে কাজ শুরু করিতে ডাইন দিক হইতে শুরু করা—যেমন জুতা, খড়ম ও পায়জামা পরিতে আগে ডাইন পায়ে পরা, সাইকেল, মোটর বা যে কোন প্রকার যানবাহনে উঠিতে আগে ডাইন পা উঠান ইত্যাদি ইসলামের বিধান ও আদর্শ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ আগে বামদিক হইতে শুরু করা বিজাতীয় আদর্শ। যাহারা বিজাতীয় আদর্শের অনুকরণ করে, স্বধর্মের প্রতি আস্থা দুর্বল হওয়ার কারণেই তাহারা ইহা করে। তাহারা এজন্য আখেরাতের শাস্তি ত ভোগ করিবেই, অধিকন্তু ইহালোকেও তাহারা ইহা দ্বারা নিজেদের নীচমন্যতা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পরিচয় দিয়া থাকে। এরূপ ধর্মাভাবে দুর্বলতা ও হীনতা পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক।

দাঁড়াইয়া পেশাব করা

দাঁড়াইয়া পেশাব করার প্রথা প্রাক্-ইসলামিক যুগে আরব দেশে প্রচলিত ছিল। এখনকার তথাকথিত প্রগতির ধ্বজাবাহী অর্বাচীন যুবকগণ সেই বর্বর যুগের প্রথাকেই প্রগতি মনে করিয়া পরের অনুকরণে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শকে ত্যাগ পূর্বক দাঁড়াইয়া পেশাব করা আরম্ভ করিয়াছে। এই অন্ধ অনুকরণ ঘোর অন্যায় এবং ভীষণ পাপ। আমাদের ইসলামের সনাতন আদর্শ এই যে, বসিয়া পেশাব করিতে হইবে। কা'বা শরীফের দিকে মুখ বা পিঠ করিয়া বসিতে পারিবে না। পেশাবের পর মাটির ঢেলা কুলুখ এবং পানি দ্বারা পবিত্রতা হাছিল করিতে হইবে। যাহার শরীর ও কাপড় পবিত্র নয় তাহার মনও পবিত্র নয়।

বিভিন্ন প্রকারের জুয়া

খৃষ্টানী প্রভাবে আমাদের দেশে নানা প্রকারের জুয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শব্দগঠন প্রতিযোগিতা, ঘোড়দৌড়, লটারী, ফটকাবাজারী, জীবন-বীমা ইত্যাদি ইসলাম ধর্মীয় আদর্শের বিরোধী। বিভিন্ন রকমের জুয়া খৃষ্টান ধর্মীয় অর্থলোভীগণ আমাদের দেশে ছড়াইয়া দিয়া আমাদের অর্বাচীন যুবকদের দ্বারা হারাম কাজ করাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম হইতে দূরে সরাইয়া লইতেছে এবং দুনিয়া ও আখেরাত দোনো জাহানে তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এ সমস্ত জুয়াড়ী দল ক্রমশঃ শ্রম-বিমুখ হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে ওদিকে আখেরাতের ব্যাপারে ধর্ম বিমুখতা তথা ধর্মদ্রোহিতা ইহাদের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে; সুতরাং দুই জাহানের পক্ষেই জুয়ার পরিণাম অতীব ভয়াবহ। অতএব, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের এই সর্বনাশা জুয়ার প্রচলন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

জাতীয়তা

আমাদের ইসলামী আদর্শ অনুসারে জাতীয়তার ভিত্তি খোদা প্রেরিত ধর্মের উপর। ধর্ম বলিতে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস বা শুধু এবাদত বন্দেগী বুঝায় না। ধর্ম কথাটি শুধু এতদুভয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; বরং ধর্মবিশ্বাস ও এবাদত বন্দেগী হইতে আরম্ভ করিয়া ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ইসলামী সমর ব্যবস্থা, এমনকি আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থা পর্যন্ত যাহাকিছু আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তৎসমুদয় মিলিয়া ইসলাম ধর্ম, এবং এই ইসলাম ধর্মের পূর্ণ অনুসরণকারীগণ সমষ্টিগতভাবে মুসলিম জাতি। আঞ্চলিক রাষ্ট্রের বাউণ্ডারী, ভাষা, বর্ণ বা বংশ আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি নহে। বিশ্বব্যাপী এক মুসলিম জাতিকে ধূর্ত ও কুচক্রী খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের অর্বাচীন যুবকদের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাদিগকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অতি সত্বর এই পাশ্চাত্য বর্বরতার অন্ধ অনুকরণ প্রবণতার জোঁয়াল আমাদের কাঁধ হইতে দূরে নিক্ষেপ করা দরকার। অন্যথায় জাতির ভবিষ্যৎ অচিরেই আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ভয়াবহ পরিণাম ডাকিয়া আনিবে।

অছিয়ত

মানুষ যখন মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়, তখন প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর আশঙ্কা তাহার মনে প্রবল হইয়া থাকে। মৃত্যু এক নির্দিষ্ট সময়েই আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু সেই নির্দিষ্টকাল সম্বন্ধে মানুষের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। শৈশবেও মৃত্যু ঘটে, যৌবনকালেও মৃত্যু আসে, বৃদ্ধ বয়সে ত প্রতি মুহূর্তেই মত্যুর সম্ভাবনা মনে করিয়া কাতর হইয়া পড়ে। ফলকথা, মানুষ যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়, যখন মানুষ নিজকে পরপারের যাত্রী বলিয়া আল্লাহ্র কাছে খাঁটি দিলে তওবা করিয়া নিজের অতীত ও বর্তমান গুনাহ্র মা'ফী দৃঢ়রূপে কামনা করে, তখন তাহার সমস্ত হকূকুল এবাদ এবং হকূকুল্লাহ্ পরিষ্কার করিয়া মা'ফী চাওয়া দরকার এবং পরের দেনা, অন্যের আমানত কাহারও সঙ্গে কোন ওয়াদা করিয়া থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিয়া নির্দায় হওয়া একান্ত আবশ্যক। যদি ছেলে মরিয়া থাকে এবং অপর ছেলে জীবিত থাকার কারণে এই মৃত ছেলের পরিত্যক্ত সন্তানেরা দাদার সম্পত্তি লাভে মাহ্রূম ও বঞ্চিত হইয়া একেবারে নিঃস্ব হওয়ার বন্দোবস্ত হয় এবং এই দাদার সম্পত্তি যদি ০০০০০০ থাকে, তবে পৌত্র পৌত্রীদের জন্য ওছিয়ত করা অর্থাৎ তাহাদের জন্য সম্পত্তির এক উত্তম অংশ দান করা দাদার কর্তব্য। কোরআন শরীফে নির্দেশ আছেঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ○

অর্থাৎ, হে মুসলিমগণ! তোমাদের কাহারও দ্বারে মৃত্যু উপস্থিত হইলে, যদি তাহার সম্পত্তি থাকে, তবে তখন তাহার পিতামাতা এবং নিকট-আত্মীয়দের জন্য ওছিয়ত করা তাহার উপর ফরয করা হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, মীরাস বা ফরায়েযের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে এই ওছিয়তের বিধান নাযিল হইয়াছে। নির্দিষ্ট ওয়ারিসের জন্য নির্ধারিত ফরায়েযের বিধান নাযিল হওয়ার পর এই ওছিয়তের হুকুম মানসূখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে-সমস্ত নিকট-আত্মীয় ওয়ারিস শ্রেণীভুক্ত হইবে না, তাহাদের জন্য ওছিয়ত করা এখনও ফরয রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মৃত্যুর নিকটবর্তী লোকটির আরও যদি কোন ধর্মীয় সৎকাজের ইচ্ছা থাকিয়া থাকে, (থাকাই বাঞ্ছনীয়) তবে সেই জন্যও ওছিয়ত করিয়া যাওয়া উচিত। যদি রোযা-নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, কিংবা হজ্জ, যাকাত, মান্নৎ, কাফ্‌ফারা প্রভৃতি বাকী থাকিয়া থাকে, তবে সেগুলি আদায়ের জন্যও ওছিয়ত করিয়া যাওয়া দরকার। মসজিদ-মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় কওমী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও সম্পত্তি থাকিলে ১/৩ অংশের মধ্যে ওছিয়ত করিয়া যাওয়া উচিত।

মানুষ যখন মরিয়া যাইবে

মানুষ যখন মরিয়া যাইবে, (প্রকৃতপক্ষে মানুষ মরে না, মানুষের আত্মা অমর, শুধু কর্মফল ভোগ করার নশ্বর দেহের পরিবর্তন হয় মাত্র। সৎকর্মী-আত্মা সুফল ভোগ করিবে।) তখন তাহার বেটা-পুত্র প্রভৃতি নিকটবর্তী ওয়ারিসদের প্রতি প্রথম কর্তব্য হইবে—মৃত ব্যক্তিকে সম্মানের সহিত গোসল দেওয়া, সুগন্ধিযুক্ত কাফন পরান, সকলে মিলিয়া যথাসম্ভব তাহার হকূকুল এবাদ তথা তাহার কৃত যাবতীয় ভুল-চুক খাতা-কছুর প্রভৃতি মাফ করাইয়া লইয়া তাহার জন্য জানাযার নামাযের মধ্যে আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ ও সুপারিশ করা এবং সম্মান ও তা'যীমের সহিত গভীর মাটির নীচে দাফন করিয়া রাখা। অতঃপর দ্বিতীয় কর্তব্য—তাহার কোন ঋণ থাকিলে তাহা পরিশোধ করা। তৃতীয় কর্তব্য—সম্পত্তির ১/৩ অংশ হইতে মৃত ব্যক্তির কৃত ওছিয়তগুলি পূর্ণ করা। মোট সম্পত্তির ১/৩ অংশের চেয়ে বেশী ওছিয়ত করিয়া থাকিলে তাহা নির্ভর করিবে ওয়ারিসগণের সম্পত্তি ও অনুমতির উপর। চতুর্থ কর্তব্য ওছিয়ত পূর্ণ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিসগণের মধ্যে ফরায়েযের কোরআনী আইন অনুসারে বন্টন করিয়া দেওয়া। মৃত ব্যক্তি ওছিয়ত না করিয়া থাকিলেও তাহার সুপুত্র সাবালেগ থাকিলে সাবালেগ ওয়ারিসগণ একত্রিত হইয়া, অথবা একাকী একজন নিজ অংশ হইতে মৃত মুরুব্বির জন্য কিছু ছওয়াবরেসানী করা অতি উত্তম। মৃত্যুর পর কিছু কোরআন শরীফ পড়িয়া ফাতেহা, কুলহু-আল্লাহ্ প্রভৃতি মোবারক সূরা ও আয়াত পাঠ করিয়া বা তালেবে এলম ও গরীব মিস্‌কীনদেরে খাওয়াইয়া ও দান খয়রাত করিয়া উহার সওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহের প্রতি পৌঁছাইবার জন্য আল্লাহ্‌র তা'আলার দরবারে যে দো'আ ও প্রার্থনা করা হয়, ইহাকেই বলে—ছওয়াবরেসানী বা ফাতেহা। ফাতেহার মধ্যে কোন বেদ'আত কাজ বা কোন দুনিয়াদারীর আড়ম্বর করা বিশেষ গোনাহ্‌র কাজ। যেহেতু মৃত ব্যক্তি তাহার জমি-জমা ও অস্থাবর সম্পত্তি সবকিছু ত্যাগ করিয়া একেবারে খালি হাতে পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। অতএব, তাহাকে কিছু সাহায্য দান করা তাহার প্রত্যেক জীবিত ওয়ারিসদের উচিত। খালেছ নিয়তে নেক কাজ না হইলে আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হইবে না। আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল না হইলে, মৃত ব্যক্তি যে দেশে চলিয়া গিয়াছে, সে দেশে ছওয়াব পৌঁছাইবার শক্তি অন্য কাহারও নাই। শুধু আল্লাহ্ পাক কবূল করিলে তিনিই মেহেরবানী করিয়া উহার ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করিতে পারেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—"সাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন নিকটে একখানা ভাসমান তৃণখণ্ড পাইলেও উহার আশ্রয় অবলম্বন করিতে চায়, তদ্রূপ মৃত ব্যক্তিও কেহ সামান্য

কিছু ছওয়াব পৌঁছাইলে তাহাও পাইতে চায়। হাদীস শরীফে আরও আসিয়াছে যে, মানুষ যখন মরিয়া যায়, তখন তাহার ছওয়াব লাভের এবং আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের সমস্ত পথ বন্ধ হইয়া যায়। কেবলমাত্র তিনটি পথ খোলা থাকেঃ (১) যদি জীবনকালে নিজে কোন ছদকায়ে জারিয়ার কাজ করিয়া গিয়া থাকে কিংবা মৃত্যুকালে কোন ছদকায়ে জারিয়ার কাজের জন্য ওয়ারিসদিগকে ওছিয়ত করিয়া থাকে এবং ওয়ারিসগণ তাহা পালন করিয়া থাকে, তবে ইহার ছওয়াব লাভ করিয়া থাকিবে। ছদকায়ে জারিয়ার কাজ যথা—মাদ্রাসা, মসজিদ, পুল, রাস্তা, মুসাফিরখানা, ইন্দারা, পুকুর, টিউবওয়েল প্রভৃতি স্থায়ী জনহিতকর কাজে সাহায্য দান করা। (২) অথবা যদি দ্বীনী-এল্‌মের প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়া গিয়া থাকে। (৩) অথবা যদি কোন নেককার সন্তান রাখিয়া মরিয়া থাকে, যে সন্তান সদাসর্বদা বাপ-মায়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আয়ে মাগ্‌ফেরাত করিতে থাকে।

প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করুন। ইসলাম ধর্মের আদর্শ কত সুন্দর! কারণ, ইহা মানুষের রচিত বা প্রবর্তিত ধর্ম নহে; বরং ইহা স্বয়ং বিশ্ব-স্রষ্টা মালেকুল-মূলক আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত এবং তাঁহার হাবীব ও রাসূলের প্রবর্তিত ধর্ম। এই ধর্মের মধ্যে লোকাচারের বা মানুষের মতামতের কোন স্থান নাই। মানুষ বলিয়া থাকেঃ "ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নহে।" এই উক্তি সেই ধর্মের বেলায়ই খাটে, যে ধর্ম মানুষের রচিত। কেননা, মানুষের রচনার মধ্যে ভুল-প্রমাদের সম্ভাবনা আছে। কাজেই উহার মধ্যে মানুষের মতের খাতিরে পরিবর্তনও করা যাইতে পারে। কিন্তু সেটা ধর্ম নহে। উহা মানুষের মনগড়া কতিপয় স্বার্থমূলক নীতি মাত্র। ধর্ম উহাকেই বলে, যাহা স্বয়ং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসিয়াছে। কেননা, খোদা সর্বজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও মঙ্গলময়। তিনি মানুষের হিতাহিত বিবেচনা পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রেরিত ধর্মবিধান নিছক মানুষের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। অতঃপর কুত্রাপি ইহাতে কোন প্রকারের পরিবর্তন-পরিবর্ধন আসিতে পারে না। কাজেই মানুষের উপরোক্ত সত্য ধর্মের বেলায় সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আমাদের দেশে কোন ধর্মে রীতি আছে যে, বাপ মরিয়া গেলে বাপের মুখে ছেলে আগুন ধরাইয়া দিবে। তারপর আগুনের তাপে মৃত ব্যক্তির শব মোড় খাইতে আরম্ভ করিলে লাঠি দ্বারা পিটাইয়া তাহার হাড়-গোড় ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের ইসলাম ধর্মে মৃত ব্যক্তিকে পিটাইয়া হাড় ভাঙ্গা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র 'বে-তাযীমি' বা অসম্মান হয় এমন কোন কাজও মৃত ব্যক্তির প্রতি করা জায়েয নহে।

ফারায়েয

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে জীবিত ওয়ারিসদের জন্য কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ্ অনুযায়ী নির্ধারিত অংশ নির্ণয় করাকে 'ফারায়েয' বলে। ফারায়েযের আইন একটি অকাট্য আইন। কোরআন পাকের একটি সূরা শুধু এই আইন বর্ণনা করার জন্য খাছ করা হইয়াছে। এই সূরাটির নাম সূরাতুন-নিসা, অর্থাৎ দুর্বল, এতীম, বিধবা ও নারীদের প্রাপ্য প্রদানের আইন বর্ণনার অধ্যায়। আল্লাহ্ তা-আলা প্রথমে বলিয়াছেনঃ যাহারা এতীমের মাল আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহারা আগুন উদরস্থ করিতেছে। অতি শীঘ্র তাহারা দোযখের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফারায়েয আইনের সাধারণ সূত্রগুলি বর্ণনা করিয়াছেন—(১) বেটা বেটিদের দ্বিগুণ অংশ পাইবে। (২) শুধু বেটি থাকিলে তাহারা একাধিক হইলে ২/৩ অংশ পাইবে। (৩) শুধু এক বেটি

হইলে সে $^1/_2$ অংশ পাইবে। (৪) বেটা-বেটি থাকিলে মা-বাপের প্রত্যেকে $^1/_6$ অংশ পাইবে। বেটা বা বেটি কেহই না থাকিলে মা $^1/_3$ অংশ পাইবে। অবশিষ্ট বাপ পাইবে। কিন্তু যদি একাধিক ভাই-ভগ্নীও থাকে তদবস্থায়ও মা $^1/_6$ অংশ পাইবে। (৫) এই সমস্ত অংশ ওছিয়তপূর্ণ করার এবং ঋণ পরিশোধের পর দেওয়া হইবে। ওছিয়তপূর্ণ না করিয়া বা দেনা পরিশোধ না করিয়া ওয়ারিসদের অংশ দেওয়া যাইবে না। (৬) মৃত স্ত্রীর বেটা বা বেটি কেহ না থাকিলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে স্বামী $^1/_2$ অংশ পাইবে। আর বেটা-বেটি থাকিলে স্বামী $^1/_4$ অংশ পাইবে। (৭) নিজের ঔরসজাত কোন সন্তান রাখিয়া মরিলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে স্ত্রী $^1/_8$ অংশ এবং স্বামী নিঃসন্তান মরিলে স্ত্রী $^1/_4$ অংশ পাইবে। এইসব অংশও ওছিয়ত পূরণ এবং ঋণ পরিশোধ করার পর দেওয়া হইবে। তাহা না করিয়া কোন অংশই দেওয়া যাইবে না। (৮) মৃত ব্যক্তির বাপ বা নিজস্ব সন্তান কেহ যদি না থাকে আর মায়ের পক্ষের বৈপিত্রেয় ভাই-বোন থাকে, তবে তাহারা একজন হইলে $^1/_6$ অংশ পাইবে। একাধিক হইলে $^1/_3$ অংশ সকলে সমভাবে ভাগ করিয়া নিবে। (৯) শুধু আপন হাকীকী বোন ১ জন থাকিলে সে $^1/_2$ অংশ পাইবে। একাধিক থাকিলে $^2/_3$ অংশ পাইবে। কিন্তু যদি ভগ্নীদের সহিত ভাই থাকে, তবে ভাই ভগ্নীর দ্বিগুণ পাইবে। অন্য কেহ না থাকিয়া শুধু একজন বা একাধিক ভাই থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি ভাই পাইবে। ফারায়েযের আইন সম্পর্কে এই সাধারণ সূত্রগুলি বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, এগুলি মানুষের রচিত বিধান নহে। ইহা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা, যাহারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করিবে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা দোযখে নিক্ষেপ করিবেন এবং সেখানে তাহাদের অপমান ও লাঞ্ছনাময় ভীষণ শাস্তি হইবে। এই ধারাগুলি বর্ণনা করার পূর্বেই আবার দুইটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করিয়াছেন। (১) পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক, নিকটবর্তী জন বর্তমান থাকিলে দূরবর্তী জন অংশ পাইবে না। যেমন বাপ থাকিলে দাদা পাইবে না, ভাই পাইবে না। দাদা থাকিলে চাচা পাইবে না, চাচা থাকিলে চাচাত ভাই পাইবে না। ভাই থাকিলে ভাতিজা পাইবে না। ছেলে থাকিলে নাতি পাইবে না। মা থাকিলে দাদী বা নানী পাইবে না। হাকীকী ভাই থাকিলে বৈমাত্রেয় ভাই পাইবে না ইত্যাদি। এই মূল ধারাটির প্রভাব সমস্ত ধারাগুলির উপরেই বিস্তারিত হইবে। এই জন্য দ্বিতীয় ধারায় বলিতেছেন—(২) সম্পত্তি বণ্টন কালে লা-ওয়ারিস আত্মীয় বা এতীমগণ বা মিস্‌কীনগণ উপস্থিত হইলে সমস্ত সাবালেগা ওয়ারিস একত্রি হইয়া বা কোন একজন নিজ নিজ অংশ হইতে তাহাদিগকে কিছু খানা-পিনার ব্যবস্থা করিয়া দিবে এবং তাহাদের সঙ্গে মিষ্টি আলাপ করিয়া সদ্ব্যবহারের সহিত তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিবে। অবশ্য এতীম বা না-বালেগ ওয়ারিসের অংশ হইতে কিছু দেওয়া যাইবে না, সেইজন্য ওযর পেশ করিয়া দিবে। এই ধারাগুলি বর্ণনা করার পূর্বাহ্লেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকীদের সহিত বলিয়া দিয়াছেন যে, সাবধান! এতীমের মালের মধ্যে যেন কোনরূপে তছরুপ করা না হয়। যাহারা অক্ষম ও নিঃসহায় তাহাদের মাল তছরুফ করার পরিণাম অতীব ভয়াবহ হইবে।

এতীমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে এবং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে বার বার তাকীদ করিয়াছেন। দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় বাপ মরিয়া গেলে দাদাকে তাকীদ করা হইয়াছে, যেন তিনি মাহ্‌রূমোল মীরাস এতীম নাতিদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকালে যেন তাহাদের জন্য ওছিয়ত করিয়া যান, যাহাতে উক্ত পিতৃহীন এতীম নাতিগণ দাদার মৃত্যুর পূর্বে ও পরে নিজেদের পিতৃবিয়োগজনিত

অভাব ও নিঃস্বতা অনুভব করিতে না পারে। তাহাদের তা'লীম-তরবিয়ত, খাওয়া পরা ইত্যাদি কাজে যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় এবং দাদার মৃত্যুর পরেও যেন তাহারা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হয়। যদি দাদা সম্পত্তিহীন ও অক্ষম হয়, তবে হাদীস শরীফে আসিয়াছে—"এতীমদের পর-ওয়ারিশ করার মত কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকিলে তাহাদের লালন-পালনের দায়িত্ব হুকুমতের।"

হুকুমতকে সৎপরামর্শ

হুকুমতের কাজ—আল্লাহ্র কাজে দখল দেওয়া বা লোকের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা নহে। হুকুমতের কাজ—জনগণের স্রষ্টা বিধাতার আইনের অনুসরণে জনসাধারণের সেবা করা। মানুষের সংখ্যা কমান হুকুমতের কাজ নহে। কিম্বা ব্যক্তিগত বা দলগত পক্ষপাতিত্ব করা হুকুমতের কাজ নহে। নিজের ব্যক্তিগত খামখেয়ালীমূলক মতের বশবর্তী হইয়া কোন কাজ করাও হুকুমতের কর্তব্য নহে। হুকুমতের কর্তব্য হইল—(১) বিশ্বমানবের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত এবং তাঁহার খাছ রাসূলের মারফতে প্রচারিত যে সমস্ত বিধান কোরআন ও হাদীস শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে—তাহা লুকাইয়া না রাখিয়া এবং উহার শিক্ষা ও প্রচার বন্ধ না রাখিয়া; বরং সেই শিক্ষাকে যথাসাধ্য প্রচার করা ও চালু রাখা। (২) আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে যাবতীয় কায়িক বন্দেগী যথা নামায, রোযা প্রভৃতিকে চালু করা এবং যাহাতে গায়রুল্লাহ্র পূজা না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা। (৩) তাঁহার আর্থিক বন্দেগী যাকাতকে চালু করিয়া ধনী লোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার শিক্ষা ও বিধান প্রচারের প্রষ্ঠিানগুলিকে সাহায্য করা। (৪) জনগণের মধ্যে সৎ কাজ, সুনীতি, ইসলামী আদর্শের চালচলন ও পারস্পরিক সদ্ব্যবহার ও সদ্ভাব গড়িয়া তোলা। (৫) শরীঅত বিরুদ্ধ যাবতীয় কুকাজ, কুপ্রথা দুর্নীতি প্রভৃতি অসৎ কার্যগুলির মূল উৎপাটন করিয়া ফেলা। এই কাজগুলি ইসলামী হুকুমতের বুনিয়াদী কর্তব্য, এই কাজগুলির ভিতর দিয়াই মুসলিম জাতির পরানুকরণ প্রবণতা দূরীভূত হইয়া তাহাদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের ও ইসলামী প্রাবল্য কায়েম হইতে পারে। এই প্রেরণা শুধু হুকুমতের কাণ্ডারীগণের মনেই নহে; বরং সমস্ত মুসলিম সমাজের অন্তরে জাগরুক হওয়া একান্ত আবশ্যক।

'মুহাররাম' ও 'আশুরা'

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের তিন রকম সনের এবং তিন রকম মাসের হিসাবের বোঝা বহন করিতে হইতেছে। অথচ আমাদের দরকার আছে—মাত্র দুই রকম সনের এবং দুই রকমের মাসকে হিসাবে রাখার। (১) ইসলামী আহ্কামের অধিকাংশই নির্ধারিত হইয়াছে চাঁদের হিসাবে। রমযান শরীফের রোযা ফরয করা হইয়াছে চাঁদের হিসাবে, যাকাত ফরয করা হইয়াছে চাঁদের হিসাবে। হজ্জ ফরয করা হইয়াছে চাঁদের হিসাবে, ছেলেমেয়ের বালেগ হওয়ার বয়স গণনা করা হয় চাঁদের হিসাবে, মেয়েলোকের ইদ্দত গণনা করা হয় চাঁদের হিসাবে। এইজন্য চাঁদের হিসাবে বৎসর ও মাসের হিসাব রাখার প্রয়োজন আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নিরূপণ করা হয় সূর্যের হিসাবে, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতির তারিখ ও সময় নির্ণীত হয় সূর্যের হিসাবে। কাজেই চাঁদের মাস এবং সূর্যের মাসের হিসাব রাখাই আমাদের দরকার। সূর্যের সন বা মাসের হিসাবের জন্য দুইটি সনের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপান আছে।

একটিকে বলা হয় ঈসায়ী সন। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম একজন অতি মর্যাদাশীল পয়গম্বর বলিয়া আমরা মানি, কাজেই ঈসায়ী সন গ্রহণ করাতে আমাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় আর একটি সন আমাদের ঘাড়ে চাপান আছে, সেটাকে বাংলা সন বলা হয়। ইহার পিছনে কোনই ঐতিহাসিক পটভূমিকা নাই। অধিকন্তু বাংলা মাসগুলির তারিখ ঠিক করাও জ্যোতিষী পণ্ডিতগণের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে জনসাধারণের পক্ষে উপায়ান্তর নাই। এমন কি, কোন কোন মাস ৩২ দিনেও হইয়া থাকে। তাহা কেমন করিয়া হয়, জ্যোতিষী পণ্ডিতগণের শরণাপন্ন না হইয়া তাহার কোন কারণই আমরা বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে ঈসায়ী সনের মাসগুলির তারিখ নির্ধারিত আছে, সহজেই হিসাব রাখা যায়। আর চাঁদের মাসগুলির হিসাব সকলেই চোখে দেখিয়া এবং পূর্বমাসের হিসাব রাখিয়া ঠিক করিতে পারে। হিজরী সনের পিছনেই দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় ত্যাগের ঐতিহাসিক পটভূমিকা রহিয়াছে।

বিশেষতঃ অন্যান্য ধর্মগুলির যেমন ব্যক্তিগত বা আঞ্চলিক বা বংশগত নামে নামকরণ করা হইয়াছে, ইসলাম ধর্মের নামকরণের বেলায় তেমন কোন ব্যক্তিগত বংশগত বা অঞ্চলগত নামে নামকৃত করা হয় নাই; বরং উহার সাধারণ গুণগত নামেই নামকরণ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে হিজরী সনকেও সত্যের জন্য ঘরবাড়ী, জায়গা-জমিন, বিষয়-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যথাসর্বস্ব ত্যাগরূপ মহৎ গুণের স্মৃতিমূলক নাম রাখা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা মৃত্যুর সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া নাম রাখা হয় নাই।

হিজরী সনের প্রথম মাস 'মুহাররাম'। এই মাসের ১০ই রাত্রিকে আশুরার রাত্রি বলা হয়। এই দিনটির অনেক ফযীলত আছে। এই দিনে হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের তওবা কবূল হয়। এই দিনে হযরত ইউনুস আলাইহিস্‌সালামের কওমের তওবা কবূল হয়। এই দিনে হযরত নূহ্ আলাইহিস্‌সালামের জাহাজ মহাপ্লাবন হইতে মুক্তি লাভপূর্বক জুদী পাহাড়ে আসিয়া লাগে। এই দিনে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম জন্মলাভ করেন। এই দিনেই হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতে বাপের ঔরস ব্যতীত মাতৃগর্ভ হইতে জন্মলাভ করেন। এই সমস্ত কারণে আশুরার রাত্রির ফযীলত অনেক বেশী। এই দিনে রোযা রাখিলে ও দান-খয়রাত করিলে অশেষ নেকী ও ছওয়াব পাওয়া যায়। ইহা পূর্ব হইতেই প্রমাণিত আছে।

পরে নানার উত্তরাধিকার বা রাজত্ব অধিকারেরর জন্য নহে; ইসলাম ধর্মের নেতৃত্ব কর্তৃত্বকে ইয়াযিদ ফাসেকের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য এবং মোসলেম জাতিকে ও ইসলামী আদর্শ ও খেলাফত-তন্ত্রকে সর্বপ্রধান বেদ্'আত বংশগত রাজতন্ত্র হইতে রক্ষার জন্য আমাদের হযরতের নাতি ইমাম হোসায়েন (রাঃ) আমরণ জেহাদ করিয়া এই দিনেই শাহাদত বরণ করেন। অতএব, এই দিনে আমাদের কর্তব্য—রোযা রাখা, দান খয়রাত করা এবং আমাদের পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও আওলিয়াগণের ত্যাগের এবং আদর্শ চরিত্রের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া নিজেদের ভিতরে সেই প্রেরণা ও দ্বীনের খেদমতের জযবাকে জাগান। এই পবিত্র দিনকে তাজিয়া ইত্যাদি উৎসবের দ্বারা বা আরও অন্যান্য গর্হিত কর্মের দ্বারা অপবিত্র করা অতীব অন্যায়।

ছফর মাস

ছফর মাসের শেষ বুধবারকে 'আখেরী চাহার শম্বা' বলা হয় এবং বলা হয় যে, ছফর মাসের শেষ বুধবার হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সুস্থ বোধ করিয়া গোসলে ছেহ্‌হাত লাভ

করিয়াছিলেন। এই স্বাস্থ্যগত উক্তির কোন প্রমাণ আমি এখনও পাই নাই। অবশ্য এতটুকু প্রমাণ পাইয়াছি যে, ২৮শে ছফর বুধবার হযরত প্রথম বিমার পড়িয়াছিলেন—বিমারীতে তিনি শেষ পর্যন্ত ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

রবিউল আউয়াল শরীফ

এই পবিত্র মাসেই আমাদের হযরত আল্লাহ্র ওহীপ্রাপ্ত হইয়া আল্লাহ্র ওহীকৃত সমস্ত মানুষ পূজা, পুরোহিত পূজা, পীর পূজা, পয়গম্বর পূজা, রাজা-বাদশাহ্ পূজা, মূর্তিপূজা, মন পূজা, মনসা পূজা, কবর পূজা, জন্তু পূজা ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় গায়রুল্লাহ্র পূজা মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া পবিত্র আদর্শ অনুযায়ী একটি ভূখণ্ডকে পূর্ণ স্বাধীন নেযামে খেলাফত দান করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের কর্তব্য অন্ততঃ এই মাসটাকে আমরা হযরতের পূর্ণ জীবন-চরিত আলোচনায় এবং হযরতের জীবনের পবিত্র আদর্শ গবেষণায় কাটাই এবং আমরা যাতে তাঁহার কূলের কুলাঙ্গার না হই, সেই চেষ্টায় আমরা আজীবন লিপ্ত থাকার শপথকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া করি। মশহুর কথা এই যে, ১২ই রবিউল আউয়ালই হযরতের পয়দায়েশের তারিখও এবং এই তারিখ ওফাতের তারিখও। কিন্তু আলোচনার জন্য এই তারিখকেই সীমাবদ্ধভাবে নির্ধারিত করার কোন মানে নাই।

রবিউস্‌সানি

এই মাসের ১১ই তারিখে বিশ্ব-বিখ্যাত বড় পীর ছাহেব হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহ্মতুল্লাহ্ আলাইহি ইহধাম ত্যাগ করেন। অবতারবাদ হিন্দুদের মিথ্যা মতবাদ, ইসলামে উহার কোন স্থান নাই। অজ্ঞতাবশতঃ বা হিন্দু পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে কেহ কেহ আল্লাহ্র ওলী সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী রহ্মতুল্লাহ্ আলাইহির মাযার আযমীর শরীফকে তীর্থস্থান মনে করে বা তাঁহাকে হাজত-রওয়া মনে করিয়া তাঁহার নিকট হাজত চায়; মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী, বিপদ হরণকারী, সম্পদ দানকারী মনে করিয়া তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে—ইহা মারাত্মক ভুল শেরেকী আকীদা। হাজত-রওয়া, মানোবাঞ্ছা পূর্ণকারী, বিপদ হরণকারী, সম্পদ দানকারী এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ নাই।

হযরত বড় পীর ছাহেব সম্পর্কে অবতারবাদের ভুল ধারণা মনে পোষণ করিয়া يا خواجه عبد القادر جيلانى شيئا لله এর যপনা করিয়া ওযীফা পড়িয়া শেরেকী পাপে নিমগ্ন হয়। এহেন ভুল আকীদা বা সুন্নতের বরখেলাফ কোন কার্যক্রম হইতে পরহেয থাকিয়া এসব বুযুর্গানে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কেরাম কিরূপ সাধনা করিয়া এত বড় বুযুর্গ হইলেন এবং তাহারা ইসলামের খেদমতের জন্য কতভাবে জীবন কোরবান করিয়াছেন, সেইসব আদর্শ আমাদের স্মরণ করা দরকার। জীবনকে সেই আদর্শ অনুসারে গঠন করার চেষ্টা করা দরকার।

রজব শরীফ

রজব মাসে আমাদের হযরতের মে'রাজ হইয়াছিল। মে'রাজ শরীফের অর্থ এই যে, ইসলাম ধর্মের ভিত্তি আল্লাহ্ একজন আছেন। আল্লাহ্র বিচার সত্য। কর্মফল নেকী-বদীর ফলাফলের জন্য একটা দিন ধার্য আছে, উহাকে আখেরাত বলে। ইহা সত্য। আল্লাহ্র রাসূল সত্য, এই তিনটি বিশ্বাসের উপরই ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি স্থাপিত। এখন প্রশ্ন এই আসে যে, এই তিনটি বিশ্বাস

কি অন্ধ বিশ্বাস, না কাল্পনিক যুক্তিভিত্তিক বিশ্বাস, না বাস্তব চাক্ষুষ দেখা বিশ্বাস? উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হযরতকে সপ্ত আকাশের ঊর্ধ্বে আরশের উপর পর্যন্ত সশরীরে তুলিয়া নিয়া সবকিছু দেখাইয়া দিয়াছেন। বেহেশ্‌ত, দোযখ, আরশ, কুরসী, লওহ, কলম, কোন্ পাপের কি শাস্তি, কোন্ নেকীর কি পুরস্কার, এমনকি স্বয়ং আল্লাহ্‌কে পর্যন্ত আমাদের হযরত (দঃ) চাক্ষুষ দেখিয়া আসিয়াছেন। এমনভাবে দেখিয়াছেন যে, কোরআন শরীফ সাক্ষ্য দিতেছে— مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى যে দেখার মধ্যে এক বিন্দুও ব্যতিক্রম বা অতিক্রম হয় নাই। এই চাক্ষুষ দর্শনের নামই মে'রাজ শরীফ। এইরূপ মজবুত ভিত্তির উপর স্থাপিত ইসলাম ধর্মের ভিত্তি।

মে'রাজ শরীফকে যাহারা বিশ্বাস না করে, তাহাদের ঈমানের ভিত্তিই নড়বড়ে, টলমল। অতএব, প্রত্যেক বৎসর মে'রাজ শরীফের আলোচনা নূতনভাবে করিয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই ঈমানকে তাজা করা দরকার।

মশ্‌হুর কথা হইল— রজবের ২৭শে মে'রাজ শরীফ হইয়াছিল। মে'রাজ শরীফ ছাড়াও রজব মাসের মর্তবা আছে। বার মাসের মধ্যে চারিটি মাস অধিক মর্যাদার মাস, অর্থাৎ—'আশহোরে হোরম' যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহার্‌রাম এবং রজব। অন্যান্য মাসের চেয়ে এই চারি মাসের মর্যাদা বেশী। অতএব, এই চারি মাস নফল রোযা, নফল নামায, নফল দান-খয়রাত করিলে ছওয়াব বেশী হয় এবং গোনাহ্‌র কাজ করিলেও গোনাহ্ বেশী হয়।

শা'বান—'শবে বরাত'

শা'বান মাসের ১৫ই রাত্রে শবে বরাত। প্রকাশ থাকে যে, আমাদের ইসলামী শরীঅত অনুযায়ী রাত্রিকে আগে ও দিনকে পরে ধরা হয়। অতএব, ১৫ই রাত্রি বলিতে ১৪ই দিবাগত রাত্রি বুঝায়। এই রাত্রি একটি অতি মহান রাত্রি। এই রাত্রে রাত্রি জাগরণ করিয়া এবাদত বন্দেগী—নফল নামায, কোরআন তেলাওয়াত, দুরূদ শরীফ পাঠ, সমস্ত গোনাহ্‌র কাজ হইতে তওবা এস্তেগ্‌ফার করা, আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা দরকার এবং আপোষে হিংসা-বিদ্বেষ, মনোমালিন্য কাহারও সঙ্গে থাকিলে তাহা দূর করা দরকার। মৃত মা-বাপ, ওস্তাদ, গরীব আত্মীয়-স্বজন সকল মোমেনীন, মোমেনাত, মোসলেমীন, ও মোসলেমাতের জন্য ছওয়াব-রেসানী, কবর যিয়ারত যার যেমন তওফীক হয়, করা দরকার। তারপর দিনের বেলায় রোযা রাখা দরকার।

আগামী এক বৎসরের হায়াত, মউত, রিয্‌ক, দৌলত ইত্যাদি সম্পর্কীয় তকদীর ও কিসমত এই রাত্রিতে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে লিখিত হইয়া ফেরেশ্‌তাদের হাওলা করা হয়।

এই রাত্রিতে কোন কোন অঞ্চলে আতশবাজীর প্রথা আছে, ইহা খারাব প্রথা। এই খারাব প্রথা বর্জন করা দরকার। গরীবদের দান করিবার জন্য এবং নিজেদের খাওয়ার জন্য যার তওফীক হয় (চুরি না করিয়া, ঋণ না করিয়া, ভিক্ষা না করিয়া) হালুয়ারুটি পাকান কোন পাপের কাজ নহে। অবশ্য ইহাকে শরীঅতের অঙ্গ মনে করা ভুল।

রমযান

রমযান শরীফের পূর্ণ একমাসের রোযা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। যে রাত্রিতে প্রথম চাঁদ দেখা যায়, সেই রাত্রি হইতে পুনরায় যে রাত্রিতে ঈদের চাঁদ দেখা যাইবে সেই রাত্রি না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক রাত্রে এশার ফরয ও সুন্নত নামাযের পর দুই দুই রাকা'আত করিয়া

২০ রাকা'আত তারাবীহ্‌র নামায সুন্নতে মুআক্কাদা এবং পূর্ণ মাসের তারাবীহ্‌র নামাযের মধ্যে পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করাও সুন্নতে মুআক্কাদা। সুতরাং এই মাস প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য বড় রহ্‌মত ও বরকতের মাস। ছবর ও ধৈর্য শিক্ষার মাস। খরচের মাস। যাকাত দান করিয়া ৭০ গুণ ছওয়াব হাছিল করার মাস। এইজন্য যাকাত দানকারীরাও অধিকাংশ এই মাসেই যাকাত খয়রাত দান করিয়া থাকেন। কারণ ইহাতে ৭০ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। এই মাস বিশেষভাবে কোরআন পাঠের মাস। কোরআনের হাফেযগণ কোরআন পাঠ নিশ্চয় বেশী করিবেন। যাঁহারা নাযেরা পড়েন তাঁহাদের বেশী পড়া দরকার। যাহারা কোরআনের হাকীকতের অন্বেষণকারী, তাঁহাদেরও এই মাসেই রোযার পবিত্রতার সঙ্গে এবং আত্মার পবিত্রতার সঙ্গে কোরআনের হাকীকত (নিগূঢ় তত্ত্ব) বেশী অন্বেষণ করা দরকার। কারণ, এই মাসেই যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) উপর কোরআন প্রথম নাযিল হইয়াছে এবং তিনি সংবৎসরের অবতীর্ণ কোরআন হযরত জিব্রীলে আমীনের সঙ্গে দওর করিয়াছেন। (পরস্পর একজন আরেক জনকে কোরআনের হেফয ও মুখস্থ শুনানের নাম দওর।) আর এই মাসেই আল্লাহ্‌র রহমত বেশী নাযিল হয়। এইজন্য এই মাসে সবদিক দিয়া আত্মার পবিত্রতার সঙ্গে কোরআন চর্চা বেশী করা দরকার। কিন্তু খবরদার! কোরআন চর্চার মধ্যে নিয়ত খারাব করা এবং হীনতা মনে আনা চাই না। কিছু পয়সার লোভে টাকা চুক্তি করিয়া নিয়ত খারাব করিয়া কোরআন পড়া চাই না। কোরআন পড়া একমাত্র আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র পেয়ারা হওয়ার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু যাঁহারা তারাবীহ্‌র মধ্যে কোরআন শুনিবেন বা কোন আলেমের মজলিসে কোরআনের তফসীর শুনিবেন বা হযরতের জীবনী আলোচনা শুনিবেন, তাঁহাদের কর্তব্য—জান প্রাণ দিয়া, যথাসাধ্য মাল খরচ করিয়া ঐ হাফেয বা আলেমের মর্যাদা রক্ষা করা।

রমজান মাসের শেষ দশকে এ'তেকাফ করা খাছ লোকদের পক্ষে আল্লাহ্‌র খাছ রহ্‌মত আরও বেশী করিয়া হাছিল করার আরও একটি উপায়। অর্থাৎ, মসজিদে নির্জনে নীরবে বসিয়া আল্লাহ্‌র ধ্যান করা, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা। মসজিদের মধ্যে বাজে কথা না বলিয়া, বাজে কাজ না করিয়া আল্লাহ্‌র দুয়ারে পড়িয়া থাকিয়া খাছভাবে আল্লাহ্‌র ধ্যানে পড়িয়া থাকা, ইহারই নাম এ'তেকাফ। খাঁটি এ'তেকাফ দ্বারা সমস্ত গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়, দিল ছাফ হইয়া যায় এবং আল্লাহ্‌র নিকট খাছ দরজা হাছিল হয়।

রোযার ঈদের চাঁদ—শাওয়াল

চাঁদ সম্বন্ধে লোকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে। কেহ মনে করে, পঞ্জিকার হিসাব মতে বা অমাবস্যা-প্রতিপদের হিসাব মতে রোযা রাখিতে বা রোযা ছাড়িতে হইবে। কেহ কেহ মনে করে, বিজ্ঞানের হিসাব মতে, আবহাওয়ার হিসাব মতে, আবহাওয়া বিভাগের ঘোষণা মতে রোযা রাখিতে, রোযা ছাড়িতে ও ঈদ করিতে হইবে। এগুলি ভুল ধারণা। কেহ কেহ ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া বিমানে চড়িয়া চাঁদ দেখার চেষ্টা করেন, কেহবা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চাঁদ দেখিবার চেষ্টা করে, কেহবা দূর-দূরান্ত হইতে বেতার বা টেলিফোনযোগে খবর আনার চেষ্টা করে। এইগুলি সব বৃথা আড়ম্বর। আমাদের ইসলাম ধর্ম সর্বকালের সর্বদেশের সর্বজনের জন্য আল্লাহ্ প্রেরিত সহজ সরল সঠিক ধর্ম। এর মধ্যে এত আড়ম্বর বা এত কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করার কোনই স্থান নাই। বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞান। ধর্মের মধ্যে মানুষের জ্ঞানের দখল নাই। সুতরাং

বিজ্ঞানের সঙ্গে এবং ধর্মের সঙ্গে বিরোধ নাই। বিজ্ঞান চাঁদের জন্মতারিখ বলিতে পারে, কিন্তু চাঁদের জন্মতারিখে ঈদ করিবার আদেশ বিজ্ঞান দেয় না। পক্ষান্তরে ধর্ম চাঁদের জন্ম তারিখে নয়, বরং চাঁদ দেখার তারিখে ঈদ করিতে বলে। অতএব, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ কোথায়? অবশ্য মানুষের কল্পনার সঙ্গে এবং মানুষের মনের চাহিদার সঙ্গে ধর্মের বিরোধ আছে । এক্ষেত্রে মানুষকে , মানুষের মনকে ধর্মের অনুগত হইতে হইবে। ধর্মের সঙ্গে বিরোধ করিতে হইবে না। প্রাকৃতিকভাবে যে অঞ্চল ও সার্কেলগুলি আছে, তাহাদের কেন্দ্রে যখন বিশ্বস্তসূত্রে স্পষ্ট চোখে চাঁদ দেখা প্রমাণ হইয়া যাইবে, তখনই চাঁদ ধরা হইবে, তখনই রোযা ছাড়া যাইবে। নতুবা হাদীস শরীফে পরিষ্কার হুকুম আছে—যদি মেঘের কারণে চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে ৩০ দিন পুরা করিয়া তারপর নূতন চাঁদ ধরিতে হইবে। এখানে বিজ্ঞানের কের্দানী দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যে সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যাইবে বা ২৯শে রমযান মেঘের কারণে চাঁদ দেখা প্রমাণিত না হইলে যে সন্ধ্যায় ৩০ রোযা পুরা হইয়া যাইবে, তারপর দিন ১লা শাওয়াল ঈদের দিন ধরা হইবে। ঈদের দিন খুশীর দিন। গরীবদেরও খুশীর বন্দোবস্ত ধনীদের করিতে হইবে। ঈদের নামাযের পূর্বেই সকাল সকাল প্রত্যেক মালদার ব্যক্তি নিজের বরং নিজ পরিবারবর্গের প্রত্যেকের পক্ষ হইতে ৮০ তোলা সেরের দুই সের গমের পরিমাণ নগদ পয়সা বা অন্য খাদ্যশস্য গরীবদের দান করা উচিত। ইহাকে “ছদকায়ে ফেৎরা” বলে। ইহা মালদারের উপর ওয়াজিব। ইহা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

সকল মুসলমানের একত্র হইয়া ময়দানে গিয়া ঈদের নামায পড়া উচিত। হিংসা বিদ্বেষ, অহংকার ভুলিয়া সকল মুসলমান সমবেদনাসম্পন্ন ভাই ভাই হইয়া পরস্পর মিলামিলি কোলাকুলি করা উচিত।

এই মাসে ৬টি নফল রোযা আছে। ইহাকে ঈদের ‘শশ রোযা’ বলে। ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। ঈদের দিন বাদ দিয়া বাকী মাসের ভিরত এই ছয়টি রোযা রাখার ফযীলত ছহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

কোরবানীর ঈদ—যিলহজ্জ

মোট ১২টি চাঁদ— ১। মুহার্‌রম, ২। ছফর, ৩। রবিউল আউয়াল, ৪। রবিউস্‌সানী, ৫। জোমাদাল উলা, ৬। জোমাদাল উখরা, ৭। রজব, ৮। শা’বান, ৯। রমযান, ১০। শাওয়াল, ১১। যিলকদ, ১২। যিলহজ্জ। এইসব চাঁদ এবং এইসব মাস আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। কোন মাসেই নহুসত নাই, নহুসত নিজের কাছে। সৎকাজ করিলে, সৎ চেষ্টা করিলে নহুসত নাই। বদকাজ করিলে, নিশ্চেষ্ট থাকিলে নহুসত আছে। সৎচেষ্টা করিয়া হাছিল করিলে সব মাসেই আল্লাহ্‌র রহমতের বরকতের দরওয়াজা খোলা আছে। অবশ্য ছফর, জোমাদাল উলা এবং জোমাদাল উখরা এই তিন মাসের কোন খাছ ফযীলত শরীঅতে পাওয়া যায় নাই। যিলকদ মাসেরও কোন খাছ ফযীলত নাই; স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিলকদ মাস চারিটি পবিত্র ও মর্যাদাশীল মাসের একটি মাস। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে, যিলকদ মাসের কোনই খাছ ফযীলত নাই বা যিলকদ মাস নহুসতের মাস। ছফর মাসে আমাদের হযরত বিমার পড়িয়াছেন, তা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, এই মাস নহুসতের মাস।

চান্দ্র বৎসরের শেষ মাস যিলহজ্জ মাস। যিলহজ্জ মাস অতি পবিত্র মাস। এই মাসের ৯ই তারিখে সারা পৃথিবীর বহু মুসলমান আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হইয়া হজ্জের ফরয পালন করে। যাহারা হজ্জে শরীক হইতে পারে না তাহারা ঐদিন নফল রোযা রাখিয়া বহু নেকীর অধিকারী হয়। এমন কি, দুই বৎসরের ছগীরা গোনাহ্ মা'ফ হয়। ১০ই তারিখে ঈদের নামায পড়িতে হয় এবং আল্লাহ্র নামে গৃহপালিত পশু, গরু, ছাগল, মেষ, উট ইত্যাদি কোরবানী করিতে হয়। ৯ই তারিখের ফজর হইতে ১৩ই তারিখের আছর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর প্রত্যেক নামাযীকে একবার (৩ বারও পড়া যায়) 'তকবীরে তশরীক' বলিতে হয়। তকবীরে তশরীক আল্লাহ্র বড়ত্ব এবং আল্লাহ্র একত্ব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দেওয়া যে, আমরা আল্লাহ্র মোকাবেলায় অন্য কাহাকেও মানি না। এক আল্লাহ্কে মানি। তকবীরে তশরীক এই—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ○

তকবীরে তশ্রীকের পিছনে এবং কোরবানীর পিছনে ঐতিহাসিক পটভূমিকা এই যে, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্সালামকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পুত্র কোরবানী করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। পিতা হযরত ইবরাহীম ছুরি হাতে লইয়া প্রস্তুত এবং পুত্র ইসমাঈলও ছুরির তলে গলা রাখিয়া প্রস্তুত। এমন সময় আল্লাহ্র তরফ হইতে দ্বিতীয় আদেশ লইয়া হযরত জিবরীল 'আল্লাহু আকবর' 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন। হযরত ইসমাঈল ছুরির তল হইতে জওয়াব দিলেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর"—তুমি আমাদের খোদা নও, আমাদের খোদা আল্লাহ্। তৎপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র দ্বিতীয় আদেশ পাইয়া প্রথম আদেশকে মনছুখ মনে করিয়া আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করিলেন এবং আল্লাহ্র শোক্র করিলেন। বলিলেন—"আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ"। এই স্মৃতি রক্ষা করিয়া আল্লাহ্র যখন যে আদেশ হইবে, তখন সেই আদেশকে শিরোধার্য করিয়া নিতে হইবে। এই শপথ সজীব রাখার জন্যই বছরে বছরে নিজের জানের চেয়ে পেয়ারা পুত্রের পরিবর্তে একটি গরু, বকরী বা উট কোরবানী করিয়া নিজের নফ্সানিয়াতকে আল্লাহ্র সামনে কোরবানী করিতে হয়। ১০ই তারিখ ঈদের নামাযের পর হইতে ১২ই তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোরবানীর সময়। এর পরে বা আগে করিলে কোরবানী হইবে না। ১০ই, ১১ই, ১২ই এবং ১৩ই এই চারি দিনকে "আইয়্যামে তশরীক" বলে। এই চারিদিন রোযা রাখা হারাম।

কতিপয় ভুল ধারণা

বিবেকের বিকৃতির এই জমানায় কেহ কেহ বিবেকের বিকৃতিবশতঃ আল্লাহ্র নামে পশু কোরবানীকে কালিপূজার পাঠা বলির সমান বলিয়াছে। ইহা বক্তার মস্তিষ্কের বিকৃতি বৈ আর কিছুই নহে। কারণ, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবানী (উৎসর্গ বন্দেগী) এবং অন্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে কোরবানী এক হইতে পারে কি? আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা। তাঁহার উদ্দেশ্যে বন্দেগী, তাঁহারই উদ্দেশ্যে কোরবানী হইতে পারে। অন্য দেবদেবী—সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা না কি যে, তাহাদের নামে, তাহাদের উদ্দেশ্যে বন্দেগী (পূজা) বা কোরবানী (বলি বা উৎসর্গ) হইবে? ইহা নিছক মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা।

কেহ কেহ জিন্দা বা মুরদা কবরস্থ পীরকে গায়েব জাননেওয়ালা, মকছুদ পুরা করিয়া দেনেওয়ালা, অদৃশ্য জ্ঞাত এবং বিপদ হরণকারী, সম্পদ দানকারী মনে করে। ইহা নিছক ভুল ধারণা—ঘৃণ্য শির্‌কী আক্বীদা।

কেহ কেহ পাশ্চাত্য বর্বরতার প্রভাবে পড়িয়া অন্ধ অনুকরণের প্রতিক্রিয়াশীলতার বশবর্তী হইয়া বলে যে, পর্দা ফরয পালন করিলে নারী জাতিকে পঙ্গু হইয়া থাকিতে হইবে। নারী জাতিকে পুরুষজাতি কর্তৃক পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। নর ও নারীর সমান অধিকার থাকিবে না, ইত্যাদি। ইহা নিছক ভুল ধারণা এবং কাম-কুক্কুটদের কামভাব চরিতার্থ করিয়া নারী জাতিকে ভোগের বস্তু বানাইবার একটি ফন্দি মাত্র। পর্দা স্বয়ং আল্লাহ্ কোরআনের আয়াতের দ্বারা ফরয করিয়াছেন। কোন মৌলভী-মাওলানা ফরয করেন নাই। নারী জাতির যে কাজ সে কাজে পর্দা পালনের কারণে কোন বাধা থাকে না। নারীজাতিকে পুরুষেরা পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে না বা হিন্দু ও খৃষ্টানদের ন্যায় মুসলিম পুরুষেরা নারী জাতিকে দাসীরূপে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের সমান অধিকার হইতেও বঞ্চিত করে না। যদি কেহ ব্যক্তিগতভাবে নফ্‌সানিয়াতের বশে করে, তবে তাহাকে ইসলামী শরীঅয়তের দ্বারা শাসন করিতে হইবে। কোরআন পাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বিদ্যমান যে, নারী জাতি তাহারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে নিজেদের সৌন্দর্য্য অন্য পুরুষকে দেখাইবে না। এই নির্দেশের দার্শনিক নিগূঢ়তত্ত্বও আছে যে, লোভনীয় মূল্যবান জিনিসকে অন্যের লোলুপ দৃষ্টি থেকে আড়াল রাখা প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানশীল মানুষেরই কর্তব্য। এর জন্যই প্রত্যেক হীরা কাঞ্চন, মণি-মাণিক্যের অধিকারীকেই লোলুপ দৃষ্টি থেকে তার মূল্যবান সম্পদকে আড়ালে রাখিতে হয়। প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানশীলা নারীর কাজেই তার সতীত্বের মূল্য হীরা, কাঞ্চন, মণি-মানিক্যে থেকে অনেক বেশী। এই দায়িত্বজ্ঞানশীলতাই প্রত্যেক নারীকে বাধ্য করে তাহার সৌন্দর্য্যকে পরপুরুষ থেকে আড়লে লুকাইয়া রাখিতে। বিশেষতঃ যখন লোভনীয়তা এবং আকর্ষণ দুই তরফ থেকে হয়, তখন এই দায়িত্ব আরও শতগুণে বাড়িয়া যায়। অতএব, দেখা গেল যে, নারী নারীত্ব রক্ষার্থেই পর্দা করিতে বাধ্য। কোন পুরুষের আদেশে বা পুরুষের অত্যাচারে নয়। অবশ্য সৃষ্টিকর্তা বিধাতা আল্লাহ্ কোরআনে পাকে নারীর দায়িত্বটা নারীদেরকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এই ফরয পর্দা পালন করাতে নারীর সমান অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ, চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, সমান অধিকারের অর্থ কি? যদি সমান অধিকারের অর্থ এই হয় যে, অধিকারের পরিমাণও সমান হইবে। তবে নারী একা কেন সন্তান পেটে ধারণ করার কষ্ট বহন করিবে? পুরুষ কেন এ কষ্ট বহন করিবে না? নারীর শরীর গঠন কেন কোমল এবং পুরুষের শরীরের গঠন কেন কঠোর হইবে? কোরআনের পাতায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র বিচারে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ পুরুষ নারীর দ্বিগুণ অংশ পাইবে'—সূত্রে নারী কেন পুরুষের অর্ধেক অংশ পায়, আর اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ সূত্রে পরিবার পরিচালনার নেতৃত্ব কেন নারীকে না দিয়া নরকে দেওয়া হইয়াছে? বুঝা গেল, সমান অধিকারের অর্থ অধিকারের পরিমাণে সমান সমান নয়। যার যে পরিমাণ অধিকার বিধাতার তরফ হইতে নির্ধারিত আছে, সে সেই পরিমাণই পাইবে; কিন্তু মূল্য অধিকারে বিচারের বেলায় সবই সমান। কেহ দুই পয়সা পাইবে, কেহ দুই হাজার পাইবে। সকলেরই সমান অধিকার-এর অর্থ এই নয় যে, দুই পয়সাওয়ালাকে দুই হাজার দিতে হইবে বা দুই হাজারওয়ালাকে দুই পায়সা দিতে হইবে। না, না, সে অর্থ নয়। অর্থ এই যে, দুই পয়সাওয়ালারও বিচার পাওয়ার ঠিক ততটা অধিকার, যতটা অধিকার দুই

হাজারওয়ালার। বিচার এ নয় যে, দুই হাজারওয়ালার বিচার ত করিবেন, কিন্তু দুই পয়সাওয়ালা থাকিলে তখন বিচার হইতে গাফলতি করিবেন। তা নয় তাহাকেও সুবিচার দান করিতে হইবে ঠিক ততখানি যত্ন সহকারে যতটা যত্ন সহকারে তিনি সুবিচার করিয়া থাকেন দুই হাজারওয়ালার বেলায়।

যবাহ করিবার ফতওয়া

ইসলাম ধর্মের পবিত্র আদর্শে কোন হালাল জীব খাইতে হইলে তাহাকে গলা মোচড়াইয়া ছিঁড়িয়া খাইলে তাহা হালাল হইবে না বা মেশিনে গলা কাটিয়া খাইলে তাহা হালাল হইবে না; বরং স্বয়ং যিনি ঐ জীবের সৃষ্টিকর্তা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া بسم الله الله اكبر (বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর) বলিয়া কোন ধারাল অস্ত্রের দ্বারা জীবের গলা কাটিতে হইবে, তবেই ঐ জীব খাওয়া হালাল হইবে, নতুবা হালাল হইবে না। যেমন হালাল জীব নিজস্ব সম্পত্তি হইলে হালাল হইবে, ঘুষের বা চুরির বা জোরদখলের জিনিস হইলে হালাল হইবে না।

সালাম, মোছাফাহা, মোয়ানাকা

দুইজন মুসলমান চাই যে কোন দেশের, যে কোন সমাজের, যে কোন বর্ণের, যে কোন ভাষার হউক না কেন দুইজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে একে অন্যকে সালাম করা এবং সালামের যখন তখন জওয়াব দেওয়া ইসলামের আদর্শ। সালামের জন্য যে বাক্য নির্ধারিত হইয়াছে তাহা এই—'আস্‌সালামু আলাইকুম' আর জওয়াবের জন্য এই বাক্য নির্ধারিত—'ওয়াআলাইকুমুস্-সালাম'। এত সুন্দর বাক্য এত সুন্দর পদ্ধতি অন্য কোন ধর্ম বা জাতির মধ্যে নাই। সালামের অর্থ "আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক এবং আমি আপনাকে আমার তরফ হইতে পূর্ণ নিরাপত্তার এগ্রিমেন্ট দান করিতেছি।" দৈনিক মোলাকাতের সময় বা একদিনে কয়েকবার মোলাকাত হইলে প্রত্যেকবার মোলাকাতের সময় প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানকে হাসিমুখে সালাম করিবে। বড় যদি ছোটকে সালাম করে, তবে তাহা বড়র পক্ষে অন্যায় নহে, বরং বড়র পক্ষে তাহা সৌজন্য; কিন্তু ছোটর কর্তব্য যে, ছোটই বড়কে আগে নম্রভাবে সালাম করিবে। কিছু দীর্ঘকাল পরে মোলাকাত হইলে সালামের পর মোছাফাহাও করা উচিত। মোছাফাহা দুই হাত দিয়া করা বেশী নম্রতাব্যঞ্জক, এক হাত দিয়া মোছাফাহা করা যায়। মোছাফাহার সময় উভয়ে বলিবে— يَغْفِرُ اللهُ لِىْ وَلَكُمْ 'আল্লাহ্ আমার গোনাহ্ মাফ করিয়া দিন, আপনার গোনাহ্ও মাফ করিয়া দিন।' দীর্ঘ দিন পরে মোলাকাত হইলে সালাম ও মোছাফাহার সঙ্গে মোয়ানাকাও করা যাইতে পারে। কিন্তু সালাম, মোছাফাহা, হাসি-আলাপ বিনিময় যেমন স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে হইতে পারিবে না—নিষিদ্ধ; তেমন যদি স্বামী-স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য কোন যুবক দুইজনের মধ্যে মোয়ানাকা অর্থাৎ কোলাকুলি করিলে উত্তেজনার আশঙ্কা থাকে, তবে এমন দুইজনের মধ্যে মোয়ানাকা হওয়া চাই না। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জোড় হাত করিয়া বা মাথা নত করিয়া বা মাথা মাটিতে রাখিয়া সেবা, নমস্কার বা প্রণামপ্রণিপাত করার প্রথা আছে—ইহা মানুষের সামনে মানুষের দাসত্বব্যঞ্জক এবং শির্‌কব্যঞ্জক জঘন্য প্রথা। সালাম বলার সময় জোড় হাত করার বা মাথা নত করার আদৌ আবশ্যক নাই। অবশ্য শব্দ না শুনা গেলে বা শুনা না যাইবার আশঙ্কা থাকিলে অথবা স্বাভাবিক আদব ও নম্রতা

প্রকাশের জন্য মূল বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে হাতের দ্বারা বা মাথার দ্বারা ইশারাও করা যাইতে পারে এবং মা-বাপ ও ওস্তাদ, পীরের বা স্বামীর, শ্বশুরের প্রতি গাঢ় ভক্তি ও মহব্বত প্রদর্শের জন্য পদ-চুম্বন বা হস্তচুম্বন করিতে চাহিলে তাহাও করা যাইতে পারে। পদ চুম্বনের বেলায় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন মাথা রুকূর মত বা সজ্‌দার মত নত না হয়; এর জন্য হাতের দ্বারা পদ স্পর্শ করিয়া হাতে চুমা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রথা চালুকরণের যোগ্য প্রথা নহে। আসল সুন্নত, ইসলামী আদর্শ সালাম-মোছাফাহা পর্যন্ত, বা বুযুর্গ লোকেরা বাচ্চাদের মাথায় হাত ফিরাইয়া দেওয়া পর্যন্ত। কোন কোন সমাজে "গুডমর্ণিং" বলিয়া সালাম করার প্রথা আছে; ইহা শিরকমূলক নয় বটে, কিন্তু নাস্তিকতাব্যঞ্জক। ইহার অনুকরণে আরব দেশে صباح الخير। বলার প্রথা চালু হইতেছে। ইহা অজ্ঞাতসারে নাস্তিকতার অনুপ্রবেশ। ইসলামের আদর্শের ন্যায় সর্বদিক রক্ষাকারী সর্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শ আর নাই।

জামাআতি নেযাম

স্বদেশে, বিদেশে, গ্রামে, শহরে যে কোন স্থানে কমপক্ষে তিনজন মুসলমান থাকিলে তাহাদের মধ্যে পরস্পর জামাআতি নেযাম—অর্থাৎ একতা শৃঙ্খলা থাকার বিধান ও নির্দেশ শরীঅতে আছে। তিনজন হউক বা ততোধিক হউক, তাহাদের একজনকে ইমাম অর্থাৎ নেতা ও মুরুব্বি নির্বাচন করিয়া লওয়া কর্তব্য। নির্বাচন এল্‌ম ও তাকওয়ার গুণের মাপকাঠিতে হওয়া উচিত। অর্থ, বংশ বা বর্ণের দিক দিয়া হওয়া উচিত নয়। যাহাকে ইমাম, নেতা বা মুরুব্বি নির্বাচিত করা হইবে, তাঁহার দায়িত্ব হইবে—জামাআতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করা। জামাআতের দায়িত্ব হইবে নেতার অনুমতি লইয়া অন্যত্র যাওয়া এবং কাজ করা। আর কাজ করিয়া নেতাকে এত্তেলা বা খবর দেওয়া। এই নেযাম, এই আদর্শ (নিয়ম) আজ মুসলমান সমাজে প্রতিপালিত হয় না বলিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা আসিয়া গিয়াছে। বিশৃঙ্খলার পরিণতি দুর্বলতা। এই বিশৃঙ্খলা এবং এই দুর্বলতা দূর করিতে হইবে।

অন্যান্য খণ্ডের অনুবাদের কালে আমি খুব কম পরিবর্তন পরিবর্ধন করিয়াই শুধু মাসআলাগুলি সাজানের মধ্যে কিছু তরতীব বদলাইয়া দিয়াছি। কিন্তু ষষ্ঠ খণ্ড যেহেতু লিখিত হইয়াছিল যে দেশের এবং যে কালের সামাজিক কু-প্রথা সংশোধনের জন্য; সে দেশ এবং সে কাল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, কু-প্রথাও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই আমি নগণ্য খাদেম স্বয়ং মোছান্নেফ আল্লামার সংসর্গে ২২ বৎসর কাল এল্‌ম দুরুস্ত ও পোখতা করার উদ্দেশ্যে থাকার ফলে যাহাকিছু কোরআন-হাদীসের আলো এবং এল্‌ম ও মা'রেফাৎ তাঁহার পদধূলির বরকতে আল্লাহ্ পাক এই নগণ্য দাসকে দান করিয়াছেন, তাহার আলোতে এই খণ্ডকে বলিতে গেলে অতি অল্প মাত্রায় তাঁহার লেখা বাকী রাখিয়া অবশিষ্ট সবটুকু তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরিবর্তন করিয়া লেখা হইয়াছে। কোন বিজ্ঞ আলেম ভাই দলিলের দিক দিয়া কোন ভুল পাইলে সে ভুল আমার হইবে, মোছান্নেফ আল্লামার নহে। আমাকে আমার জীবিত অবস্থায় জানাইলে ভুল সংশোধন করিয়া দিব। আমার মৃত্যুর পর কোরআন-হাদীসে মাহের (পার্‌দর্শী) আলেমগণের কোরআন-হাদীসের আলোতে, কোরআন হাদীসের মাপকাঠিতে মাপিয়া সংশোধন এবং সমালোচনা করার অধিকার হামেশা থাকিবে।

নাচীয—**শামছুল হক**

বেহ্‌তরীন জেহীয

ভূমিকা

হযরত থানভী (রঃ) কর্তৃক লিখিত

অনুবাদঃ মাওলানা আবদুল মজীদ

এছলাহুন্নেছা নামক রেছালা প্রণয়নকালে স্ত্রীলোকদের জন্য অতি উপকারী একটি প্রবন্ধ পুরাকাজী নিবাসী, তেলাম রাজ্যের উকীল, মাদ্রাছায়ে আলীয়া দেওবন্দের সদস্য হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব কর্তৃক লিখিত আমার দৃষ্টিগোচর হয়। তদীয় পুত্র মাওলানা নজরুল হক ছাহেবের বর্ণনা মতে প্রবন্ধ লেখার মূল উদ্দেশ্যঃ মাওলানা আবদুল হক ছাহেবের প্রিয়তম কন্যা আসআদী বেগমের শরীঅত অনুযায়ী বিবাহের পর বিদায়কালে এই প্রবন্ধখানা সঙ্গে দিয়াছিলেন যেন এই হেদায়ত অনুযায়ী আমল করিয়া দুনিয়ার শান্তি এবং আখেরাতে নাজাত পাইতে পারে। তাহার একটি কপি প্রকাশ করার অনুমতিপত্রসহ আমাকে দেওয়া হয়। এদিকে এছলাহুন্নেছা রেসালাখানা ছাপা হইয়া প্রেস হইতে বাহির হইতেছিল, তখন ঐ রেসালার পরিশিষ্ট হিসাবে এই প্রবন্ধখানা সংযোজিত করিয়া দেওয়াই সমীচীন মনে হইল। প্রবন্ধের মধ্যে গুটিকয়েক বাক্য ব্যক্তিবিশেষকে সম্বোধন করিয়া লেখা। বাকী অংশ সবটুকুই সর্বসাধারণের প্রতি একান্তভাবে প্রযোজ্য। মাওলানা ছাহেব প্রবন্ধখানার নাম রাখিয়াছেন "বেহ্‌তরীন জেহীয"। দো'আ করি, আল্লাহ্ তা'আলা যেন ইহাকে সকলের জন্য উপকারী এবং সমাজ হইতে মূর্খতা দূরীভূতকারী বানাইয়া দেন।

আহ্‌কার আশরাফ আলী

৩রা রবিউস্‌সানী

১৩৩০ হিজরী

الحمد لله

বেহ্‌তরীন জেহীয

সর্বপ্রথম করুণাময় আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পাক নবীর উপর শত সহস্র দরূদ।

আমার স্নেহাস্পদ কন্যা, হৃদয়ের টুকরা! তোমার (আসআদী বেগম) নামানুসারে আল্লাহ্ তোমাকে উভয় জগতে সৌভাগ্যবতী ও নেকবখ্‌ত বানান; এই আন্তরিক মোনাজাত।

এযাবৎ তুমি মায়ের স্নেহ-মমতায় এবং দয়ালু পিতার সুকোমল ছায়াতলে প্রতিপালিত হইয়াছ। তোমার সুখ-শান্তিই ছিল তোমার পিতামাতার কাছে সর্বাধিক অগ্রগণ্য। তোমার শিক্ষা-দীক্ষা, তোমার চারিত্রিক সংশোধন ও উন্নতির একমাত্র জিম্মাদার ও দায়ী ছিলেন তোমার পিতামাতা।

আজ হইতে তুমি একটি নতুন সংসারে পা দিয়াছ, যেখানে তোমার যাবতীয় স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন, আচার-ব্যবহারের জন্য একমাত্র তুমিই দায়ী। অতএব, আমি তোমাকে কয়েকটি উপদেশ দিতেছি। যদি তুমি উহা পুরাপুরি আমল কর, তবে ইনশাআল্লাহ্ দ্বীন ও দুনিয়ায় তুমি সফলকাম হইবে।

হেদায়ত ও নছীহতসমূহ

তওহীদ ও রেসালতঃ

যাবতীয় কাজের মধ্যে আল্লাহ্‌র বন্দেগী এবং রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়রবীর স্থান সর্বাগ্রে; কাজেই এ কথাটি সদাসর্বদা অন্তরে জাগরুক রাখিবে। আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপরীত (খেলাফ) কেহ যদি কোন কাজ করিতে বলে, আদেশকারী যে কেহই হউক না কেন, কিছুতেই তাহা মানিও না। দেখ, আল্লাহ্ পাক কোরআন মজীদে মা-বাপের তাবেদারী করিতে খুব বেশী তাকীদ করিয়াছেন। এমন কি, হাদীসে বলা হইয়াছে, "সন্তানের বেহেশ্‌ত মা-বাপের পদতলে"—(হাদীস)। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যদি মা-বাপও কোন আদেশ করেন, তাহাও মানিও না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কালামে পাকে ফরমাইয়াছেনঃ

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ○

তর্জমাঃ তোমার মা-বাপ যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কোন কিছুর শরীক করিতে বল প্রয়োগ করে—যাহা তোমার জানা নাই, তবে তুমি তাহাদের ঐ হুকুম পালন করিও না। অবশ্য পার্থিব ব্যাপারে তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে থাক। আমি যে তোমার জন্য "চল্লিশ হাদীস" পুস্তিকা সংকলন করিয়াছি এবং তুমি উহা তর্জমা সহকারে মুখস্থও করিয়াছ, উহাতে এই হাদীসটি আছেঃ

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ○

"যে কাজে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নাফরমানী প্রকাশ পায়, সেই কাজে কোন মানুষেরই হুকুম মান্য করা চলিবে না। অতএব, তোমার অন্তরের অন্তঃস্থলে যখন একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ধারণা বদ্ধমূল থাকিবে, তখন তুমি আপনা হইতেই আল্লাহ্‌র আদেশসমূহের পাবন্দ থাকিবে। শরীঅতের আদেশ এবং আল্লাহ্‌র হুকুম অনেক আছে, যাহা তুমি অল্প-বিস্তর দ্বীনি পুস্তকে বিশেষতঃ বেহেশ্‌তী জেওরে পড়িয়াছ। এখানে সেগুলির পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নাই। অবশ্য তন্মধ্যে যেগুলি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, অতি সংক্ষেপে সেগুলি বর্ণিত হইতেছে।

নামাযঃ

আল্লাহ্‌র একত্ব এবং রাসূলের রেসালতের প্রতি মনের অটল বিশ্বাস স্থাপনের পর যে বিষয় সম্বন্ধে কোরআন শরীফে অতি গুরুত্ব সহকারে স্থানে স্থানে তাকীদ আসিয়াছে; তাহা হইল নামায। ইহা ইসলামের এমন সুদৃঢ় স্তম্ভ এবং অপরিহার্য ফরয যে, কোন আকেল-বালেগের জন্য উহা হইতে অব্যাহতি নাই। বাড়ীতেই থাক আর সফরেই যাও, রীতিমত নামায আদায় করিবে। অধিকাংশ মেয়েলোক নামাযের পাবন্দ হওয়া সত্ত্বেও সফরে নামাযের বেশী খেয়াল ও লক্ষ্য রাখে না। এদিকে তুমি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিও।

জাহাজ বা গাড়ীর সফরে নামায ঃ

সফরেও যেন তোমার নামায ক্বাযা হইতে না পারে। রেলগাড়ীতেই সফর কর কিংবা গরুর গাড়ীতে। গরুর গাড়ী তো তোমারই আয়ত্তে। মাঠে থামাও এবং এক পাশে গিয়া বোরখা পরিয়া অথবা বড় একটি চাদরে আবৃত হইয়া নামায পড়িয়া লও। যদি ওযূ না থাকে, তবে গরুর গাড়ীর আড়ালে বসিয়া ওযূ করিয়া লও, আর যদি রেলগাড়ীতে সফর কর, তবে মেয়েদের নির্ধারিত গাড়ীতে সফর করিও; সেই গাড়ীতে যত ভিড়ই হউক না কেন, নামায পড়িবার পাক্কা এরাদা (দৃঢ়) থাকিলে নামাযের জায়গা নিশ্চয়ই পাইবে। অনেক ষ্টেশনে রেলগাড়ী এতটুকু দাঁড়ায় যে, দুই তিন রাকা'আত নামায পড়া যায়। কেননা, শরয়ী সফরে নামায হয়ত দুই রাকা'আত, নচেৎ তিন রাকা'আত, এতটুকু অবসর অবশ্যই পাওয়া যায়। শরয়ী সফরে সুন্নত ও নফল পড়িতে না পারিলে তত বেশী দোষ নাই। কিন্তু ফরয ওয়াজিব সফরেও ছাড়িও না। আর যদি মেয়েদের জন্য নির্ধারিত গাড়ীতে আরোহণ না করিয়া থাক, তবে তোমার স্বামী কিংবা তোমার মাহরাম আত্মীয় হয়ত নিকটেই বসা থাকিবে। সে নিশ্চয়ই তোমার কাজের জিম্মাদার। মোটকথা, অটল ও দৃঢ় ইচ্ছার সম্মুখে কোন বাধা নাই। পুরুষই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক, যে নেহায়ত দৃঢ়তার সহিত নামাযের পাবন্দ, সে সফরেও নামায যেরূপেই পারে পড়িয়া লইবে। রেলগাড়ী যদিও নিজের আয়ত্তে নহে, কিন্তু নামায ক্বাযা করিবার জন্য ইহা ওযর নহে। আমি খুব সন্তুষ্ট যে, তুমি খুব ধীরে সুস্থে নামাযের আরকান পূর্ণরূপে আদায় কর। আমি দো'আ করি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নেক কাজের আরও অধিক তৌফিক দান করুন। ফরযের সাথে সাথে সুন্নতে মোআক্কাদারও পাবন্দ থাকিও। সম্ভব হইলে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নত নফল পড়িও।

তাহাজ্জুদের নামায ঃ

তাহাজ্জুদের নামাযে বহুত বড় সওয়াব। আমাদের রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় তাহাজ্জুদের নামায পড়িয়াছেন। কোন সময় রাত্রে পড়িবার সুযোগ না পাইয়া থাকিলে দিনের বেলায় পড়িয়াছেন। তাঁহার পবিত্র বিবিগণও তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। তাহাজ্জুদের সময় দো'আ কবূল এবং রহ্‌মত নাযিল হয়।

কোরআন তেলাওয়াত ঃ

কোন এক নামাযের পর কোরআন মজীদ তেলাওয়াতও করিও। ফজরের নামাযের পর তেলাওয়াতের সময় নির্ধারিত করা খুবই উত্তম। তুমি কোরআন শরীফ তর্জমাসহ পড়িয়াছ। কাজেই তেলাওয়াতের সময় তর্জমার প্রতি খেয়াল রাখিও, যেখানে বুঝে না আসে জিজ্ঞাসা করিয়া লইও। ইহা অত্যন্ত খুশীর বিষয় যে, তুমি কোরআন শরীফ পড়ার সময় প্রত্যেকটি হরফ তাহার নির্দিষ্ট স্থান হইতে উচ্চারণ কর। আ'ইন, 'হা-হোত্তী' ইহাদের নির্দিষ্ট স্থান হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অধিকাংশ মেয়েলোকের কোরআন শরীফ পড়ার মধ্যে দেখা যায় যে, মাখরাজ হইতে তাহাদের হরফ উচ্চারিত হয় না, "হা-হোত্তী"র স্থলে "হা-হাওয়ায" এবং 'আইনে'র স্থলে আলেফ অর্থাৎ হামযা বাহির হয়।

রোযা ঃ

রোযার বিষয়ে তোমাকে তাকীদ করার প্রয়োজন নাই। কেননা, নিজেই রমযান শরীফ ব্যতীত অন্যান্য নফল রোযাও রাখিয়া থাক। যেমন অন্যান্য মেয়েদেরও এইরূপ অভ্যাস। বিশেষ করিয়া রোযার ব্যাপারে মেয়েদের সাহস পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী; তবুও এতটুকু বলার প্রয়োজন

মনে করি যে, রোযাকে পাক ছাফ রাখিবে। কিন্তু সর্বাবস্থায় গীবত বা পরনিন্দা হইতে বাঁচিয়া থাকা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, গীবত অতি বড় কবীরা গোনাহ্। এবিষয়ে কোরআন শরীফ এবং হাদীসে কঠোরভাবে ভীতি ও ধমকীর উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ রোযার মধ্যে অনেক বেশী খেয়াল রাখিবে যেন কাহারও গীবত না কর। গীবত করিলে রোযার ছওয়াব নষ্ট হইয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এমন রোযার কোন পরওয়া করেন না, যে রোযায় মানুষ মিথ্যা এবং গীবতে লিপ্ত থাকে।

যাকাতঃ

যাকাত ফরয। তাহার শর্তাবলীর বিস্তারিত বিবরণ এবং সোনা-চান্দির নেছাবের পরিমাণ এবং যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ বিবরণ যাহা কোরআনে উল্লেখ আছে, সবই তোমার জানা আছে। উহার পুনরাবৃত্তির এখানে প্রয়োজন নাই। এখানে শুধু এতটুকু বলার বিষয় যে, অধিকাংশ মেয়েলোক যাকাত সম্পর্কে বেপরোয়া থাকে। প্রথমতঃ, ধনসম্পদ একটি প্রিয় বস্তু। স্বভাবতঃই অন্তর উহাকে পৃথক করিতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ অলসতা এবং উদাসীনতার দরুন যাকাত পরিশোধ করা হয় না, যাকাত আদায় করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যেসব অলংকার আমি তোমাকে দিয়াছি, তাহা নেছাব পরিমাণ হইবে। সদাসর্বদা উহার যাকাত আদায় করিও, যদি স্বামী স্ত্রীর পক্ষ হইতে যাকাত দেয়, তাহাও জায়েয। যদি কোন স্ত্রীলোক নিজের মালের যাকাত নিজস্ব সম্পত্তি হইতে আদায় করে কিন্তু স্বামী নিষেধ করে, তবে স্বামীর কথা মান্য করা চলিবে না, যেরূপ উপরে হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে— لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

এই মাসআলা শুধু তোমাকে জ্ঞাত করাইবার উদ্দেশ্যে লিখিলাম। নতুবা খোদা চাহে ত কখনও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে না; বরং শরীঅতের অন্যান্য মাসআলা ও ফরযসমূহের পাবন্দির তাকীদ আরো বেশী পরিমাণে করা হইবে। এখানে সুবিধার জন্য দশ টাকা হইতে এক হাজার টাকা পর্যন্ত কত টাকায় কত পরিমাণ যাকাত দিতে হয় তাহার একটা তালিকা লিখিয়া দিতেছিঃ

টাকার পরিমাণ	যাকাতের পরিমাণ
টাকা ১০০০·০০	টাকা ২৫·০০
টাকা ৯০০·০০	টাকা ২২·৫০
টাকা ৮০০·০০	টাকা ২০·০০
টাকা ৭০০·০০	টাকা ১৭·৫০
টাকা ৬০০·০০	টাকা ১৫·০০
টাকা ৫০০·০০	টাকা ১২·৫০
টাকা ৪০০·০০	টাকা ১০·০০
টাকা ৩০০·০০	টাকা ৭·৫০
টাকা ২০০·০০	টাকা ৫·০০
টাকা ১০০·০০	টাকা ২·৫০
টাকা ৫০·০০	টাকা ১·২৫
টাকা ২৫·০০	টাকা ·৬২
টাকা ২০·০০	টাকা ·৫০
টাকা ১০·০০	টাকা ·২৫

উপরোক্ত তালিকা দ্বারা মধ্যবর্তী অংকের যাকাত বাহির করাও সহজ হইবে। যেমন ১৫০ (দেড়শত) টাকার যাকাত জানিতে চাহিলে তালিকা হইতে ১০০ টাকার যাকাত দেখ, অতঃপর ৫০ টাকার যাকাত দেখ, একত্রে যাকাতের উভয় সংখ্যা যোগ দাও, দেড়শত টাকার যাকাত বুঝে আসিবে। তদ্রূপ ৭৫ টাকার যাকাত জানিতে চাহিলে পঞ্চাশ এবং পঁচিশ টাকার যাকাত যোগ দাও, ৭৫ টাকার যাকাত বুঝে আসিবে।

হজ্জ ঃ

হজ্জ করিবার মত সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ ফরয হয়। যাহার উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে অথচ হজ্জ করে না, এমন লোকের প্রতি হাদীসে কঠোর ধমকি ও তাম্বীহ্ উল্লেখ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির প্রতি অমুসলমান হইয়া মরিবার ধমকি দিয়াছেন। আমার জানা আছে, যে পরিমাণ অলংকারাদিতে হজ্জ ফরয হয়, সেই পরিমাণ অলংকার তোমার কাছে নাই। মেয়েলোকের কাছে শুধু রাহা খরচ থাকিলে হজ্জ ফরয হয় না। বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত আসা যাওয়া, খাওয়া খরচ ব্যতীত সঙ্গে মাহ্‌রাম ব্যক্তি বা স্বামী থাকাও শর্ত। এই মাসআলা তুমি দ্বীনি রেসালায় পড়িয়াছ। আল্লাহ্ যদি তোমাকে হজ্জ করার মত তৌফিক দেন, তবে তুমি ইতস্ততঃ না করিয়া হজ্জ আদায় করিবে।

পতিভক্তি ঃ

এখন তোমার কর্মজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনা করিব। স্ত্রীর উপর স্বামীর আদেশ পালন ফরয। হাদীস শরীফে ইহার বহুত তাকীদ আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যদি আমি কোন মানুষকে সজ্‌দা করার আদেশ করিতাম, তবে রমণীদিগকে আদেশ করিতাম যে, তাহারা যেন নিজ নিজ স্বামীকে সজ্‌দা করে। কিন্তু আমাদের শরীঅতে যেহেতু তাযীমী সজ্‌দা হারাম, এই জন্য রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কাহাকেও সজ্‌দা করার অনুমতি দেন নাই। অত্র হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া খেয়াল করা দরকার যে, শরীঅতে স্বামীর ফরমাঁবরদারীর আদেশ কত তাকীদ সহকারে করা হইয়াছে। যে নারী স্বামীর নাফরমান এবং স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট, এমন নারী আল্লাহ্‌র রহ্‌মত হইতে বহু দূর থাকিবে, যতক্ষণ সে তাহার স্বামীকে সন্তুষ্ট না করিবে। স্মরণ রাখিবে, যদি কোন স্বামী ফরয কাজ সমাধা করিলে নারায হয় তবে তৎপ্রতি পরওয়া করিবে না। কেননা لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কাহারও ফরমাঁবরদারী চলে না। এই হাদীসখানা কয়েকবার বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানেও শুধু স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য লিখিত হইল। নচেৎ খোদা চাহে ত, এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন তুমি হইবে না। যেই রমণীর মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকিবে, সেই নারীর প্রতি তাহার স্বামী কখনও অসন্তুষ্ট হইবে না। শেখ সাদী (রঃ) বোস্তাঁর একটি বয়াতে গুণ তিনটি একস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

زن خوب وفرماں بروپارسا کند مرد درویش راپادشاہ

অর্থাৎ, *'সুশ্রী' তাবেদার ও দ্বীনদার নারী,*
দরিদ্র স্বামীকে করে রাজ্যের অধিকারী।'

শেষোক্ত গুণ দুইটি মানুষের আয়ত্তে। যদি কোন রমণীর মধ্যে প্রথমোক্ত গুণটি নাও থাকে, তবে শেষোক্ত গুণ দুইটি বিদ্যমান থাকিলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুমধুর ও সুখময় হইবে। আর যদি প্রথমোক্ত গুণটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শেষোক্ত গুণ দুইটি বিদ্যমান না থাকে, তবে এমন নারী

দুনিয়াতেও বদনামের ভাগী এবং পরকালে তাহার জন্য কঠোর আযাব রহিয়াছে। যে স্ত্রীলোক স্বামীর তাবেদার না হয়, কিংবা বদমেযাজ হয়, কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে, সেই নারী সম্পর্কেও শেখ সাদী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

زن بد درسرائے مرد نیکو   همدرین عالم است دوزخ او

অর্থাৎ, *'নেক্কার স্বামী গৃহে নারী বদকার*
দোযখ দেখিবে এই বিশ্বের মাঝার।'

বাস্তব সত্য কথা এই যে, যেই সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুখের না হয়, সেই সংসার জাহান্নাম সদৃশ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাহাদের প্রতি লোকেরা হাসাহাসি করে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবন-যাত্রা দুর্বিষহ হইয়া উঠে। কোন কোন স্থানে আমি এই অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আর যেই সংসারে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সুমধুর, সেই সংসার যদিও দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের হয়, তবুও উহা ধন-ভাণ্ডার ও শাহী মহল হইতে শতগুণে উত্তম; বরং উহা বেহেশ্‌তের নমুনায় রূপায়িত হইয়া যায়।

কোন কোন সময় ইহাও সম্ভব যে, তোমার ধারণা মতে স্বামীর অসন্তুষ্টি একেবারেই অকারণ এবং এমনও হইতে পারে যে, বাস্তবে তোমার ধারণাই সত্য; এমতাবস্থায়ও অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে খুব বুদ্ধিমত্তার সহিত সহ্য করিবে। এমনকি, তোমার কথায় তো দূরের কথা, ইশারা-ইঙ্গিতেও যেন প্রকাশ না পায় যে, তাহার ক্রোধ করা অন্যায় এবং রাগ করা অমূলক ছিল। তোমার এই ধৈর্য অবশেষে এক দিন তাহাকে অবহিত করিবে যে, তাহার এই রাগ অকারণে ছিল। ইহার পরিণতি অতীব শুভ এবং তোমার প্রতি অত্যধিক দয়া ও মেহেরবানীর কারণ হইবে। এরূপ ব্যবহারে তো শত্রুও মিত্র হয়; আর স্বামী তো স্বামীই। অবশ্য এই ধৈর্য ধারণকালে এদিকে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখিও যেন, তোমার চোখ ভ্রূ-কুঞ্চিত না হয়; বরং প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকিবে। কথাবার্তায় চালচলনে কিছুতেই যেন অসন্তুষ্টির ভাব ফুটিয়া না উঠে। স্বামীর সহিত কথাবার্তা বলার সময় তাঁহার মর্যাদার ও মর্তবার প্রতি খুব খেয়াল রাখিও। মনখোলা কথাবার্তা বলার সময়ও এদিকে লক্ষ্য রাখিও। সম্বোধনে এমন শব্দ কিছুতেই ব্যবহার করিও না, যদ্দ্বারা বেআদবি বুঝে আসে। স্বামী কোন কথা বলিলে প্রথমে খুব মন দিয়া শুন, তারপর আদব সহকারে যথাযথ উত্তর দাও। উত্তর অতি উচ্চস্বরেও দিও না, আবার এত নিম্নস্বরেও দিও না যে, আওয়ায শুনা না যায়। স্বামী যদি কোন ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হন কিংবা ভুল বুঝিয়া থাকেন, তবে ঐ ঘটনা সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি অতি আদব ও ভক্তি সহকারে খণ্ডন করিতে চেষ্টা কর। এমন শব্দ প্রয়োগ করিও না যাহাতে স্বামীর প্রতি ঐ ব্যাপারে অজ্ঞতার কটাক্ষ হয়। আর যদি মানবতা সুলভ দুর্বলতার কারণে তোমার দ্বারা কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হইয়া যায়, অথবা কোন কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া পড়ে, তবে উহা স্বীকার করিয়া মাফ চাহিয়া লও, ইহার ফল হইবে অতীব শুভ। স্বামীর কাছে যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় দ্বীনি মাসআলা বিষয়কই হউক কিংবা সাংসারিক কোন কথা হউক, তবে উহা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা কর এবং ভালরূপে বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হও।

درطلب کردن حقیقت کار   ازخدا شرم دار وشرم او مدار

অর্থাৎ, কোন বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা জানিবার বাসনা হইলে লজ্জা করিবে না, আল্লাহ্‌র সহিত লজ্জা করিবে, যেন গোনাহ্‌ না হয়।

স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতাঃ

স্ত্রীলোকের সচরাচর অভ্যাস, তাহারা স্বামীর না-শুক্‌রি করে; এই অভ্যাস অতি জঘন্য। স্বামী কিংবা শ্বশুরের পক্ষ হইতে যাহাকিছু খাদ্য-দ্রব্য পাও, উহা কৃতজ্ঞতা সহকারে কবূল করা কর্তব্য। যত সামান্য ও নগণ্যই হউক না কেন, উহার প্রতিও শোক্‌র করা ওয়াজিব। লক্ষ লক্ষ লোক এরূপ আছে যাহারা তোমার মত খাইতে বা পরিতে পায় না এবং তোমার মত আরামেও তাহারা নাই। খাওয়া, পরা, ধন-দৌলতের কোনটিরই লোভ করিও না। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা, উহাতে শক্ত গোনাহ্‌ ব্যতীত মানুষ নিজে নিজেই আযাবে লিপ্ত থাকে। পার্থিব ও বৈষয়িক ব্যাপারে হামেশা নিজের চেয়ে হীন অবস্থাসম্পন্নদের প্রতি দৃষ্টি রাখ এবং দ্বীনের কাজে সব সময় যাহারা তোমার ঊর্ধ্বে সে দিকে নজর রাখ। এরূপ করিলে তুমি দুনিয়াতে সুখী হইবে এবং নেক কাজের তৌফিক পাইবে।

শ্বশুর বাড়ীর লোকদের সহিত আচার-ব্যবহারঃ

বড়দের সহিত ব্যবহারঃ

নিজের স্নেহময়ী মাতার ন্যায় প্রত্যেক কাজে শাশুড়ীর আদব করিও এবং সর্বাবস্থায় তাঁহার সন্তুষ্টি অগ্রগণ্য মনে করিও। তোমার যতই কষ্ট বা আরাম হউক না কেন, কিন্তু তাঁহার মর্জির বিপরীত এক পা-ও আগে বাড়াইও না। মুখে এমন কোন কথা উচ্চারণ করিও না, যাহাতে তাঁহার কষ্ট হয়। তাঁহার সাথে যখন কথা বল কিম্বা তাঁহাকে যখন সম্বোধন কর, তখন নিজের সমকক্ষদের সাথে যেইরূপ সম্বোধন কর সেইরূপ করিও না; বরং মুরব্বীদের জন্য যে শব্দ প্রয়োগ করা উচিত তাহাই ব্যবহার কর। তোমার শাশুড়ী যদি কোন কাজে তোমাকে তাম্বীহ্‌ করেন, তবে উহা নীরবে শুন; যদিও মনের বিপরীত এবং কটু কথাও বলেন (যাহা আশা করা যায় না), তবুও সুস্বাদু শরবতের ন্যায় অনায়াসে পান কর (সহ্য কর)। খবরদার! কস্মিনকালেও কঠোরভাবে প্রতি-উত্তর করিও না। নিজের মায়ের সমতুল্য তাঁহার খেদমত কর। তিনি যদি অন্য কাহাকেও কোন কাজের আদেশ করেন, তৎক্ষণাৎ সে কাজ তুমি নিজেই করিয়া ফেল। মেহেরবান পিতার ন্যায় শ্বশুরের তা'যীম ও শ্রদ্ধা কর। শাশুড়ীর সহিত কথা-বার্তা বলার যে আদব কায়দা লিখিয়াছি, শ্বশুরের বেলায়ও সে দিকে লক্ষ্য রাখ। তোমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, "তোমার শ্বশুর কোথায় গেছেন?" তদুত্তরে বল যে, "অমুক স্থানে তশরীফ নিয়া গেছেন।" যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "অমুক বিষয়ে তোমার শ্বশুর কি বলিয়াছেন?" তদুত্তরে তুমি বল যে "তিনি এরূপ ফরমাইয়াছেন।" তাঁহাকে আরাম পৌঁছানের এবং তাঁহার খেদমতের যথাসাধ্য চেষ্টা কর। কোন উৎসবে যোগদান করিতে হইলে কিংবা কোন বান্ধবীর সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে নিজের শ্বশুর ও স্বামীর নিকট হইতে অনুমতি লও। তাঁহারা যদি উপস্থিত না থাকেন, তবে শাশুড়ীর কাছে অনুমতি চাও। যদি অনুমতি দেন, তবে যাও, নতুবা যাইও না। যদি কোন উৎসবে যাইতে বলেন, তোমার মন না চাহিলেও যাও। কেননা, খোদা না করুন ইহা সম্ভব নহে যে, তোমাকে এমন স্থানে যাইতে বলিবেন, যেখানে শরীঅত বিরোধী কোন কাজ হয়। যে বাড়ীতে বা মজলিসে শরীঅত বিরোধী কাজ হয়, তথায় যাওয়া নিষেধ।

শ্বশুর বাড়ীর কোন মহিলা যদি বয়সে তোমার চেয়ে বড় হয়, যেমন স্বামীর বড় ভাইর বিবি; তাঁহার সহিত কথাবার্তা উঠা-বসায় তাঁহার মর্তবার প্রতি লক্ষ্য রাখিও এবং তাঁহার সহিত দুধ-মিশ্রির মত এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিও যেন উভয়ে সহোদরা ভগ্নীদ্বয়, একজন বড়

ও একজন ছোট। যদি তুমি এমন ব্যবহার কর, তবে অপর পক্ষও তোমার সাথে এইরূপই ব্যবহার করিবে। আর যদি সে বয়সে ও মর্তবায় তোমার চেয়ে ছোট হয়, তবে তাহার সাথে স্নেহ ও মহব্বত সুলভ ব্যবহার কর এবং তাহাকে অতি নম্র ও শান্তভাবে ভাল ভাল কথা শিক্ষা দিতে থাক। সে কোন কাজ করিতে আরম্ভ করিলে তুমি নিজে উদ্যোগী হইয়া তাহার সহায়ক হইয়া ঐ কাজ সমাধা কর। অনুরূপ স্বামীর ভগ্নী, ভাগিনী ইত্যাদির সহিত যার যার মর্তবা অনুযায়ী সম্ভ্রম ও নম্র ব্যবহার কর, কিন্তু ইহাতেও মধ্যপন্থার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখিও। কেননা, মধ্যপন্থায় অতীব নম্রতা ও সম্ভ্রম ব্যবহার সদাসর্বদা রক্ষা করিয়া চলা সু-কঠিন। নিজের বাড়ীতে বিশেষ কোন উৎসব উপলক্ষে যখন মেয়েদের সহিত একত্রিত হও, তখন কাহারও সম্পর্কে তাহার অগোচরে এমন কোন কথা বলিও না যে, এই কথা তাহার কর্ণগোচর হইলে সে ইহা খারাব মনে করিবে; ইহাকেই গীবত বলে। গীবত করার গোনাহ্ অতি কঠোর। ইহা সম্পর্কে আগেও আমি রোযার বয়ানে কিছু বর্ণনা করিয়াছি। এখানে এই কথাটা শুধু উল্লেখযোগ্য যে, কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আমি তো কোন মিছা কথা বলিতেছি না; যাহা বলিতেছি, তাহা তো অমুকের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

স্মরণ রাখিও, ইহা নফ্‌সের একটি ধোঁকা। কাহারও কোন দোষ বর্ণনা করিলে যদি সে দোষ তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবেই তো উহাকে গীবত বলে, বাস্তব দোষ বর্ণনার নামই গীবত। আর যদি ঐ দোষ তাহার মধ্যে না থাকে, তবে তো দ্বিগুণ গোনাহ্ হয়। এই প্রকার গীবতের নাম তোহ্‌মত।

ছোটদের প্রতি ব্যবহারঃ

বাড়ীতে যেসব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে, তোমার শ্বশুরেরই হউক বা বাড়ীতে অবস্থান-কারী অন্য কোন আত্মীয়েরই হউক, তাহাদের সাথে অতিশয় স্নেহমমতা সুলভ ব্যবহার কর।

হাদীস শরীফে আছেঃ

عن ابن عباس رض قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْكَبِيْرَنَا – رواه ترمذى مشكوة

'যে ব্যক্তি বড়দের আদব করে না ও ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।' আমাদের রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদিগকে বড় ভালবাসিতেন। এমনকি একবার একটি ছোট শিশু তাঁহার কোলে পেশাবও করিয়াছিল। —মেশকাত

কোন কোন স্ত্রীলোক যাহারা শিশুদিগকে স্নেহ করে, তাহারা ছেলেপিলেকে কাছে আসিবার জন্য এই বাহানা করিয়া ডাকে যে, আস, আমি তোমাকে একটি বস্তু দিব, অথচ কিছু দেওয়ার ইচ্ছা নাই। শুধু ডাকিয়া আনাই উদ্দেশ্য; কিন্তু এরূপ বলা এক প্রকার মিথ্যা। কখনও এরূপ করিও না।

একদা রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে একজন স্ত্রীলোক শিশুকে কিছু দিবে বলিয়া ডাকিল, কিন্তু সে মিছামিছি প্ররোচনা দেয় নাই; বরং শিশুকে কোন কিছু দিয়াছিল। রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তুমি ইহাকে কিছু না দিতে, তবে মিথ্যা হইত। —আবু দাউদ, বায়হাকী

চাকর চাকরাণীর সহিত ব্যবহার ঃ

বাড়ীতে যদি কান চাকরাণী থাকে, তবে তাহার দ্বারা তাহার সাধ্যাতীত কাজ লইও না। কোন কাজ তাহার কষ্টসাধ্য হইলে ঐ কাজে নিজের সহায়তা করা কর্তব্য। তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিও না। সে রোগাক্রান্ত হইলে কিংবা কোন কষ্টে পতিত হইলে তাহাকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিও । চাকরাণীদের সাথে তোমার মাতার ব্যবহার তুমি দেখিয়াছ। কোন চাকরাণীর মাথায় একটু ব্যথা অনুভব হইলে কাজের ফরমাইশ তাহাকে না দিয়া তোমার মা নিজেই সেই কাজ করিয়াছে। অবশ্য এরূপও করা চাই না, যাহতে চাকর-চাকরাণীরা একেবারে আরামপ্রিয় ও কামচোরা হইয়া যায়। চাকরাণীদেরকে নিষ্কর্মা করিয়া রাখা বাস্তবে ইহা তাহাদের সহিত শত্রুতা করা। কেননা, সে অন্যত্র যেখানেই যাইবে, সর্বদা গৃহকর্ত্রীর গালমন্দ শুনিবে। খাওয়া-দাওয়ার কোন উৎকৃষ্ট বস্তু তোহ্ফা স্বরূপ কোথাও হইতে আসিলে, উহা হইতে চাকরাণীদের কিছু কিছু দেওয়া উচিত। তোমার মাতার ব্যবহার তুমি নিজ চক্ষেই দেখিয়াছ যে, জিনিস যত অল্পই হউক না কেন, তবুও চাকরাণীর একটা অংশ রাখা হইত। তোমার মাতার এই আচরণ দেখিয়া মনে মনে ভারী আনন্দিত হইতাম যে, সৃষ্টিগতভাবে তোমাদের মধ্যে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার গুণ বিদ্যমান আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এই সৎগুণে আরো উন্নতি দিন। নিজ স্বামী এবং বাড়ীর অন্যান্য মেয়েলোকদের সহিত এই ব্যবহার করিতে থাকিও।

মেহ্মানদারী ঃ

যেসব মহিলা অন্দর মহলে এবং পুরুষ বহির্বাটীতে মেহ্মান হইয়া আসে, স্বামীর মর্জি অনুযায়ী উদার মনে তাহাদের মেহ্মানদারী করা কর্তব্য। মেহমানদের খাতিরে নিজেদের স্বাভাবিক খাদ্যের চেয়ে একটু জাঁকজমকপূর্ণ খানার ব্যবস্থা করা জায়েয আছে; কিন্তু অপব্যয়ের সীমায় যেন না পৌঁছে। আর যদি কোন মেহ্মান মোত্তাকী, আল্লাহ্র নেকবান্দা হয়; তবে তাহার মেহ্মানদারীকে বরকতের কারণ এবং সৌভাগ্য মনে করা চাই। যে কোন মেহ্মানই হউক না কেন, কখনও সংকীর্ণমনা হওয়া উচিত নহে। আমাদের রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরকেও মেহ্মানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যদি মেহ্মানের খাতিরদারি এবং তাহাকে আরো মেহ্মান রাখিবার জন্য আরজু বা অনুরোধ করায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মেহ্মানের ক্ষতি হয় এরূপ পীড়াপীড়ি ভাল নয়। মেহ্মান কোন দরকারী কাজের জন্য বিদায় হইতে চায়, তবে মেজবান তাঁহাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দোহাই দেওয়া অতি অন্যায়। বস্তুতঃ ইহা কিছুতেই ভাল কাজ নহে যে, বাড়ীওয়ালার আবদার ও পীড়া-পীড়িতে মেহ্মান অসন্তুষ্ট হয় ও তাঁহার ক্ষতি হয়। হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ ছাহেব গাঙ্গুহী (কুদ্দিসা ছিররুহু) এমন পীড়াপীড়ি কখনও পছন্দ করিতেন না।

মেহ্মানের খাতিরদারী, খেদমত-গোযারী যাহাকিছু করা হয়, তজ্জন্য অর্থাৎ মেহ্মানদারী করিয়া মেহ্মানের প্রতি এহ্ছান করিতেছ, কখনো একথা মনে করিও না; বরং মেহ্মানই তোমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছে যে, তাহার নিজের নির্ধারিত খাদ্য তোমার এখানে আসিয়া খাইয়াছে এবং তোমাকে সওয়াবের ভাগী করিয়াছে।

شکر بجا ارکہ مہمان تو روزئےخود میخورد برخوان تو

অর্থ—শুক্রগুযারী কর যে, তোমার মেহ্মান তোমার দস্তরখানায় বসিয়া তাহার নিজের জীবিকাই খায়।

এইরূপে যদি কাহারও প্রতি কোন এহ্‌ছান করিয়া থাক, তবে কোন সময় সে এহ্‌ছান উল্লেখ করিয়া তাহার মনে আঘাত দিও না। পবিত্র কোরআন শরীফ হইতে প্রমাণিত আছে যে, এহ্‌ছান জিতাইলে (খোঁটা দিলে) সদ্ব্যবহার করার ছওয়াব বাতিল হইয়া যায়। দান-এহ্‌ছান শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হওয়া চাই।

সাধারণ আচার ব্যবহার ঃ

সংসারের কাঠামো দৃঢ় ও মজবুত করার জন্য এবং উহাকে উন্নত ও ঊর্ধ্বগামী বানাইবার জন্য এবং উহার রওনক বৃদ্ধির জন্য বাটীস্থ লোকদের উপরোল্লিখিত গুণাবলী অর্থাৎ সুন্দর আচার-ব্যবহার, উৎকৃষ্ট লেনদেন, সৎস্বভাব ইত্যাদির সাথে সাথে সংসার ও গৃহস্থালীর উত্তম ব্যবস্থাপনা ও সুনিয়মতান্ত্রিক সংস্থা একটি নেহায়েত জরুরী জিনিস। সংসারের ব্যবস্থাপনা যদি যথাযথ ও সঠিক না হয়, তবে বিত্ত ও সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও বাড়ীতে কষ্ট ও অমঙ্গল নামিয়া আসিতে আমি স্বচক্ষে অনেক ধনী লোকের বাড়ীতে দেখিয়াছি।

গৃহকর্মের সুব্যবস্থা ঃ

বাড়ীর মেয়েলোকদের মধ্যে সংসারে সুব্যবস্থার যথাবিহিত নিয়ম-পদ্ধতির জ্ঞানের অভাবে তাহাদের বাড়ীর অবস্থা কপর্দকহীন কাঙ্গালদের চেয়েও নিকৃষ্ট। ঘর-সংসারের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ব্যয়ের পরিমাণ ও তাহার স্থানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে ; ব্যয়ে স্থানবিশেষে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে। আয়ের চেয়ে ব্যয় যেন বেশী না হয়। আবার ব্যয়ের মাত্রা কমাইয়া কৃপণও সাজিও না। কোরআন পাকে কৃপণতা এবং অপব্যয় এতদুভয়ের দোষ ও অপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। টাকা পয়সার এতদূর মায়া মহব্বত যে, পয়সা পয়সা করিয়া জমা করার ফিকিরে পড়িয়া নিরানব্বই পাল্লায় গিয়া পড়ে। ইহা অতীব দূষণীয়। তাহা ছাড়া ইহাতে জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হইয়া পড়ে। অবশ্য মধ্যবর্তিতা এমন পন্থা যে, উহাতে মানুষকে কেহ কৃপণও বলে না, অপব্যয়ীও না। প্রয়োজনের সময় তাহার কোন কাজ আটকাইয়া থাকে না। টাকা পয়সা যাহার হাতে ব্যয় হয় ব্যয়ের স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাহারই কাজ। তাহার খেয়াল করা উচিত কোন্ জায়গায় কি পরিমাণ খরচ করা কর্তব্য। এ সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয় বিস্তারিত লেখা দুষ্কর। স্বামীর অনুমতিক্রমে যদি দৈনন্দিন খরচের হিসাব লিখিয়া রাখ এবং প্রত্যহ কিংবা সপ্তাহে একবার ঐ হিসাব স্বামীকে দেখাও, তবে ইহা খুবই স্বস্তি বিষয়ক ও আস্থার কারণ। হিসাব এমন উত্তম জিনিস যে, দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের উপকারী। ডাল, চাউল, আনাজ ইত্যাদি যাহাকিছু বাড়ীতে আসে, মাপিয়া ওজন করিয়া রাখিবে। এইরূপে টাকা-পয়সাও গণিয়া রাখিবে। কোন লোককে কর্জ দিলে কিংবা ধার লইলে তাহাও লিখিয়া রাখিবে এবং উসুল হইলে বা কর্জ শোধ করিলে তাহাও লিখিয়া রাখিবে।

এমন কি, লিখা ব্যতীত ধোপার কাছেও কাপড় দিও না। সর্বাপেক্ষা উত্তম কথা এই যে, তোমার কাছে যাহাকিছু কাপড়-চোপড় টাকা-পয়সা অলংকারাদি আছে, সবই লিখিয়া রাখিবে। ইহা অত্যন্ত কাজের কথা।

ঘরের আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখা ঃ

ঘরের জিনিসপত্রগুলি স্ব স্ব স্থানে গোছাইয়া রাখাও সাংসারিক সুব্যবস্থার অন্যতম কাজ। যে জিনিস যেখানে রাখার যোগ্য তাহা সেখানে রাখাও সঙ্গত। বিছানাপত্র, চৌকি, পালঙ্ক যথাস্থানে রাখিয়া দাও। প্রয়োজনবোধে কোন জিনিস রক্ষিত স্থান হইতে বাহির করিলে পরে কাজ শেষে

আবার সেই বস্তু সেখানেই রাখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এরূপে দৈনন্দিন ব্যবহারিক থালা-বাসন এবং নিত্যপ্রয়োজীয় অন্যান্য জিনিসপত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। এমন যেন না হয় যে, লোটা একস্থানে গড়াগড়ি খাইতেছে, রেকাবি অন্যস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, ডেকচি আধোয়া অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। মাছির ঝাঁক বিন্‌বিন্‌ করিতেছে। এদিকে পানির কলসীর মুখ খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। কিনারে দাঁড়াইয়া কাক পানি পান করিতেছে এবং পায়খানা করিয়া নষ্ট করিতেছে।

কাপড়গুলি সব সময় ভাঁজ করিয়া রাখিও। এমন যেন না হয় যে, কাপড়-চোপড় এদিকে-ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে; যদি পশমী বা রেশমী কাপড় হয়, তবে সদাসর্বদা তাহার তত্ত্বাবধান করা কর্তব্য। বিশেষতঃ বৃষ্টি-বাদলের দিনে একটু বেশী খেয়াল রাখিও। কেননা, ঐ মওছুমে কাপড়ে পোকা লাগিয়া যায়। যদিও সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে সুব্যবস্থা সুশৃংখলার শক্তি বিদ্যমান, তবুও কোশেশ ও চেষ্টার যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে একথা অস্বীকার করার যো নাই। বাড়ীতে প্রতিভাবান বুদ্ধিমতী যে বেগম ছাহেবা রহিয়াছেন, সদাসর্বদা তাঁহার কাছ থেকে ঘর-সংসারের সুব্যবস্থাপনা ও শৃংখলার রীতি-নীতি শিক্ষা করিতে থাক এবং খুব লক্ষ্য করিয়া তাহার এন্তেজাম লক্ষ্য কর, অতঃপর উহার অনুসরণ কর।

এখন এই কথাগুলি শেষ করিতেছি এবং পুনরায় তোমাকে এই নছীহত করিতেছি, যদি তুমি এই হেদায়ত অনুযায়ী আমল কর, তবে ইন্‌শাআল্লাহ্ তুমি দোনোজাহানে সফলকাম হইবে এবং দুনিয়াতে এত সুখ-শান্তিতে বাস করিবে যে, তোমার বাড়ী বেহেশ্‌তে রূপায়িত হইবে। তোমার জন্য আমার এই নছীহতনামা বিবাহ খুশীর অতি উত্তম পিতৃদান। তুমি ইহাকে প্রতি সপ্তাহে ২/৩ বার করিয়া পড়িও ২/৩ বার সম্ভব না হইলে অন্ততঃ একবার অবশ্যই পড়িবে। আমি আল্লাহ্‌র দরগাহে কায়মনোবাক্যে দো'আ করিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বরকত দান করেন। আমি তোমাকে শামিল করিয়া এই দো'আ করিঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

অর্থ—হে আমাদের রব্ব! দুনিয়াতে আমাদিগকে উত্তম বস্তু (এবাদত বন্দেগী হালাল রুজী ইত্যাদি) দান করুন এবং আখেরাতেও, আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।

আমরা তোমার কাছে শুধু এতটুকু চাই যে, যতদিন আমরা তোমার পিতা মাতা জীবিত থাকি আমাদের জন্য ঈমানের ছালামতি এবং ঈমানের সাথে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার জন্য দো'আ করিতে থাকিবে এবং এই জাহান হইতে বিদায় হওয়ার পর আমাদিগকে দো'আয়ে মাগ্‌ফেরাতের সাথে স্মরণ করিও।

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله خير الخلائق محمد واصحابه اجمعين ـ

॥ ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

সপ্তম খণ্ড

ওযূ ইত্যাদি

১। সময় বিশেষে কিছু কষ্ট হইলেও ওযূ ভালমত করিবে।

২। নূতন ওযূ করিলে বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়।

৩। পায়খানা বা পেশাব করিবার সময় কেবলার দিকে পিঠ বা মুখ দিয়া বসিও না।

৪। সাবধান থাকিও যেন পেশাবের ছিঁটা কাপড়ে বা গায়ে না লাগে; কেননা, এ বিষয়ে সতর্ক না থাকিলে কবর আযাব হয়।

৫। কোন গর্তের মধ্যে পেশাব করিও না, হয়ত সাপ-বিচ্ছু থাকিতে পারে।

৬। গোসল করিবার জায়গায় পেশাব করিও না।

৭। পেশাব পায়খানার সময় কথা বলিও না।

৮। ঘুম হইতে উঠিয়া হাত ভালরূপে না ধুইয়া (লোটা বদনা প্রভৃতির) পানির মধ্যে হাত দিও না।

৯। রৌদ্রে থাকিয়া যে পানি গরম হইয়া গিয়াছে, সে পানি ব্যবহার করিও না, (শ্বেত কুষ্ঠ) রোগ জন্মিতে পারে।

নামায

১। নামায সময় মত পড়িবে। রুকূ, সজ্‌দা খুব ভাল করিয়া করিবে, খুব মেনোযোগ ও ভক্তির সহিত নামায পড়িবে।

২। ছেলে-মেয়ে সাত বৎসরের হইলে তাহাদের নামায পড়িতে বলিবে, দশ বৎসরের হওয়া সত্ত্বেও যদি নামায না পড়িতে চায়, তবে মারিয়া পিটিয়া নামায পড়াইবে।

৩। যে কাপড়ে বা যে জায়গায় এ রকম ফুল পাতা আঁকা আছে যে, তাহার দিকে হয়ত মন যাইতে পারে, তাহাতে নামায পড়া চাই না।

৪। খোলা ময়দানে নামায পড়িবার সময় সামনে কিছু আড় থাকা চাই; যদি আড় কিছু না থাকে, তবে লাঠি বা অন্য কোন উঁচু জিনিস সামনে খাড়া করিয়া উহাকে ডান বা বাম ভ্রূর বরাবর রাখিয়া নামায পড়িবে।

৫। ফরয পড়িয়া সে জায়গা হইতে কিঞ্চিত সরিয়াই সুন্নত বা নফল পড়া ভাল।

৬। নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দেখিও না, ঊর্ধ্ব দিকেও নযর উঠাইও না, আর হাই আসিলে যাথাসাধ্য চাপিয়া রাখিবে।

৭। পেশাব-পায়খানার জোর থাকিলে প্রথমে পেশাব-পায়খানা শেষ করিয়া পরে নামায পড়িবে।

৮। কোন ওযীফা বা কোন নফল এবাদত শুরু করিতে হইলে যে পরিমাণ সর্বদা চালাইতে পারিবে, সেই পরিমাণ শুরু করিবে।

মৃত্যু ও বিপদের সময়

১। পুরাতন কোন কষ্টের কথা মনে উঠিলে اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্‌রই এবং তাঁহারই কাছে আমাদিগকেও যাইতে হইবে) পড়িয়া লও, তবে যেমন ছওয়াব প্রথমে পাইয়াছ আবার সেই রকম ছওয়াব পাইবে।

২। অতি সামান্য কষ্টের কথাই হউক না কেন তাহাতেও যদি— اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়, তবে ছওয়াব পাইবে।

যাকাত খয়রাত

১। যে অভাবগ্রস্ত লোক নিজের মান-সম্মান বাঁচাইয়া ঘরে বসিয়া থাকে, অন্যের দুয়ারে হাত পাতিতে লজ্জাবোধ করে, সে-সব লোকদেরই যাকাত দেওয়া উচিত।

২। অল্প বলিয়া দিতে লজ্জাবোধ করিও না, যখন যে রকম জুটে সে রকমই দান করিতে থাকিবে।

৩। অনেকে ভাবে যে, যাকাত পরিশোধ করিয়া দিলে অন্যান্য দান-খয়রাতের আর কি দরকার? এরূপ মনে করা ভুল। সুযোগ অনুসারে সাধ্যমত খয়রাত করিতে থাকা উচিত।

৪। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনকে দান করাতে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ হয়—(১) দান করা এক ছওয়াব, (২) আর নিজের আত্মীয়দের উপকার করা আর এক ছওয়াব।

৫। দরিদ্র প্রতিবেশীদের যথাসাধ্য তত্ত্বাবধান করিতে থাকিবে।

৬। স্ত্রীর জন্য স্বামীর সম্পত্তি হইতে এত পরিমাণ দান করা ঠিক নয়, যাহাতে স্বামী অসন্তুষ্ট হইতে পারেন।

রোযা

১। রোযা রাখিয়া অযথা কথা বলিও না, কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না, আর কাহারও গীবত করা ত অতীব অন্যায় এবং গোনাহ্‌র কাজ।

২। স্বামী বাড়ী থাকিলে স্ত্রীকে নফল রোযা রাখিতে স্বামীর অনুমতি লইতে হইবে।

৩। রমযান শরীফের যখন মাত্র দশ দিন অবশিষ্ট থাকে, তখন হইতে বেশী করিয়া এবাদত করা চাই।

কাহারও সম্বন্ধে তাহার অসাক্ষাতে এমন কোন কথা বলা, যাহাতে তাহার মনে কষ্ট হয়, তাহাকে 'গীবত' বলে।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত

১। কোরআন শরীফ যদি ভালরূপে চলিয়া না পড়িতে পার, তবে বিরক্ত হইয়া ছাড়িয়া দিও না, পড়িতে থাক; এরূপ ব্যক্তিকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হয়।

২। কোরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাইও না, রোজ পড়িতে থাক; অন্যথায় শক্ত গোনাহ্ হইবে।

৩। কোরআন শরীফ খুব মনোযোগ ও ভক্তির সহিত পড়িবে; আর আল্লাহ্ তা'আলার ভয় ও মনে জাগরিত রাখিয়া পাঠ করিবে।

দো'আ ও যিক্‌র

১। দো'আ করিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেঃ

(ক) খুব মনোযোগ ও নেহায়েত কাতর স্বরে দো'আ করিবে।

(খ) কোন গোনাহ্‌র কাজের জন্য দো'আ করিবে না।

(গ) যে কাজের জন্য দো'আ করিতেছ, তাহা পুরা হইতে দেরী হইলে বিরক্ত হইয়া দো'আ করা ছাড়িয়া দিও না।

(ঘ) দো'আ করার সময় মনে গাঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, আমার দো'আ আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবানী করিয়া নিশ্চয় কবূল করিবেন।

২। রাগের বশে নিজের সন্তান-সন্ততির বা ধন-সম্পত্তির জন্য বদ দো'আ করিও না। কেননা, হয়ত কবূল হইয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে পরে অনুতাপ করিবে।

৩। যেখানে বসিয়া দুনিয়ার কারবার কর বা দুনিয়ার কথাবার্তা বল, সেখানে কিছু আল্লাহ্-রাসূলের যিক্‌রও করিয়া লইবে, নতুবা ঐ সব দুনিয়াদারী বিপদের কারণ হইতে পারে।

৪। খুব বেশী করিয়া অধিকাংশ সময় এস্তেগ্‌ফার করিবে, ইহাতে অনেক মুশকিল আসান হয় এবং রুযীতে বরকত হয়।

৫। নফ্‌স বা শয়তানের ধোঁকায় দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কোন গোনাহ্ হইয়া যায়, তবে তওবা করিতে দেরী করিও না। যদি আবার ঘটনাক্রমে হইয়া পড়ে, তবে আবার তওবা করিবে। ইহা মনে করিও না যে, যখন তওবা ঠিক থাকে না, ভঙ্গ হইয়া যায় তখন আর তওবা করিয়া লাভ কি? বরং বারবার তওবা করিতে থাকিবে।

৬। অনেক দো'আ আছে যাহা বিশেষ সময়ে পড়িতে পারিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ঘুমাইবার সময় এই দো'আ পড়িবেঃ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

'হে খোদা! তোমার নামেই আমি মৃত্যুরূপ নিদ্রায় অভিভূত হই। আবার তোমারই নামের বরকতে জীবনরূপ জাগরণ প্রাপ্ত হই।'

ঘুম হইত উঠিয়া এই দো'আ পড়িবেঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমাদের মৃত্যুর (নিদ্রাও এক প্রকার মৃত্যু) পর জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহারই কাছে সকলের যাইতে হইবে।'

সকাল বেলায় এই দো'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ـ

আয় আল্লাহ্! আপনারই কৃপায় আমরা সকাল বেলায় জীবন ধারণ করি, আপনারই অনুগ্রহে আমরা বিকাল বেলায় জীবন ধারণ করি, আপনারই কৃপায় জীবন প্রাপ্ত হই, আপনাকে স্মরণ করিয়াই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি এবং আপনারই কাছে আবার সকলের উপস্থিত হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় এই দো'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ـ

অর্থ একই, কিন্তু একটা শব্দ আগে-পিছে আছে।

খানা খাইয়া এই দো'আ পড়িবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَفَانَا وَاٰوَانَا ـ

অর্থাৎ, 'শোক্র সেই আল্লাহ্ তা'আলার যিনি আমাদের খাওয়াইয়াছেন এবং (পানি প্রভৃতি) পান করাইয়াছেন এবং যিনি আমাদিগকে মুসলমান করিয়াছেন এবং বিপদ-আপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং (বাস করিতে ঘর-বাড়ী দান করিয়া) আশ্রয় দান করিয়াছেন।'

ফজর এবং মাগরেবের নামাযের পর এই দো'আ সাতবার পড়িবেঃ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ, আয় আল্লাহ্! আমাকে দোযখ হইতে বাঁচাও।" এবং পরবর্তী দো'আ তিনবার পড়িবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

অর্থাৎ, (সেই মহান) আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিয়াছি, যাঁহার নামের সঙ্গে আসমানে হউক বা জমীনে হউক, কোথাও কাহারও কোন ক্ষতি হইতে পারে না, এবং তিনি সব কথাই (আমার কাতর প্রর্থনাও) শুনেন এবং সব কিছুই (আমার হীন অবস্থাও) জানেন।

ঘোড়া বা অন্য কিছুতে চড়িতে হইলে, এই দো'আ পড়িবেঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

অর্থাৎ, 'পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি আমি সেই খোদার, যিনি আমাদের জন্য ইহাকে বশীভূত করিয়া দিয়াছেন; অথচ আমাদের ইহার উপর কোনই শক্তি ছিল না। আর আমাকে স্বীয় প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

কাহারও বাড়ীতে কিছু খাইলে, এ দো'আও পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ـ

অর্থাৎ, 'আয় আল্লাহ্! ইহাদের যাহাকিছু (ধন-দৌলত) দান করিয়াছ, তাহাতে আরও বরকত (উন্নতি) দাও এবং তাহাদের গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও এবং তাহাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ-দৃষ্টি কর।'

নূতন চাঁদ দেখিয়া এই দো'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ ـ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, 'আয় আল্লাহ্! এই চাঁদ (মাস) ভরিয়া আমাদের শান্তি এবং ঈমানের সঙ্গে রাখিও এবং নিরাপদ ও ইসলামে মজবুত রাখিও। হে চাঁদ! (তুই ভাল-মন্দ কিছুই করিতে পারিস না,) তোর আর আমার উভয়েরই সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা একই আল্লাহ্।

কোন বিপদগ্রস্তকে দেখিলে এই দো'আ পড়িবে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ـ

অর্থাৎ, 'শোক্র সেই (দয়াময়) আল্লাহ্ তা'আলার, যে মুছীবত তুমি ভোগ করিতেছ, তাহা হইতে যিনি আমাকে নিরাপদে রাখিয়াছেন এবং আমাকে স্বীয় বহুসংখ্যক সৃষ্ট জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (আশরাফুল মখলুকাতরূপে সৃষ্টি) করিয়াছেন।'

তোমার নিকট যদি কেহ বিদায় হইতে আসে, তবে এইরূপ বলঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ ○

অর্থাৎ, 'তোমার দ্বীন (ধর্ম-কর্ম), আমানত (বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্ততা) এবং খাতেমা অর্থাৎ, প্রত্যেক কাজের পরিণাম (যেন ভাল হয়) সবই আল্লাহ্ তা'আলার উপর সোপর্দ করিতেছি।'

নূতন বিবাহিত বর-কনেকে মোবারকবাদ দিতে হইলে এই বলিয়া দাওঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ ـ

'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উভয়ের কাজে বরকত দেউক এবং তোমাদের উভয়ের উপর বরকত নাযিল করুক এবং তোমাদের উভয়কে ভালভাবে মিল-মহব্বতে রাখুক।"

কোন বিপদাপদ আসিলে এই দো'আ পড়ঃ يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ○

"হে আল্লাহ্! তুমিই প্রকৃত জীবনধারী এবং সকলের রক্ষাকারী। আমি তোমারই দয়ার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর এবং ঘুমাইবার সময় এই দো'আটি তিনবার পড়িবেঃ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

"আমি সেই দয়াময়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—যিনি ব্যতীত অন্য কেহই এবাদতের যোগ্য নহে; তিনিই প্রকৃত জীবনধারী এবং (সকলের) রক্ষাকারী এবং তাঁহারই সমীপে আমি তওবা (প্রত্যাবর্তন) করিতেছি।" এবং একবার এই দো'আ পড়িবেঃ

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত করা যাইবে না, তিনি একক, অন্য কেহই তাঁহার শরীক নাই। তাঁহারই যাবতীয় সাম্রাজ্য, তাঁহারই যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনিই সর্বশক্তিমান।"

سُبْحَانَ اللّٰهِ (আল্লাহ্ পবিত্র) ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য) ৩৩ বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বড়) ৩৪ বার এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ সূরাদ্বয় এক একবার এবং আয়াতুল কুরসী একবার এবং সকাল বেলায় সূরা-ইয়াসীন একবার, মাগরেবের পর সূরা-ওয়াক্বেয়া একবার, এশার পর সূরা-মুল্‌ক একবার আর শুক্রবারে সূরা-কাহ্‌ফ একবার পড়িবে।* ঘুমাইবার সময় সূরা-আলে ইমরানের শেষে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়িবে। রোজ যতটুকু পার কোরআন তেলাওয়াত করিবে।** মনে

টিকা

* এইরূপ পড়িতে পারিলে দরিদ্রতা দূর হয়। রোজ কোরআন মজীদ হইতে কমপক্ষে ১০ আয়াত তেলাওয়াত করিয়া লওয়া চাই। কেননা, হাদীস শরীফে আছে, যে দশ আয়াত তেলাওয়াত করে, তাহাকেও তেলাওয়াত কারীদের মধ্যে শামিল করা হয়।

** চিন্তা করিয়া দেখ, শরীঅত তোমাকে কেমন ভাবে সব কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার দিকে পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছে, মনে রাখিও ইহাই ধর্মের মূল।

রাখিও যে, যাহা কিছু পড়িতে বলা হইল, পড়িতে পারিলে ছওয়াব আছে, না পড়িলে কোন গোনাহ্ নাই।

কসম এবং মান্নত

১। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুরই কসম খাইতে নাই; অনেকে নিজের মাথার বা চক্ষের বা ছেলে-মেয়ের কসম খাইয়া থাকে, ইহাতে কবীরা গোনাহ্ হয়। যদি ভুলবশতঃ কখনও মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ (তওবা করিয়া) কলেমা পড়িয়া লও।

২। এরকম কসম খাইও না যে, 'যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে যেন আমি বে-ঈমান হইয়া যাই'; যদিও সত্য কথা হয় (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

৩। রাগ বা অন্য কোন কারণবশতঃ যদি এরকম কসম খাইয়া থাক যে, তাহা পূর্ণ করা গোনাহ্র কাজ, তবে সে কসম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার কাফ্ফারা দিয়া দিবে। যেমন, এই রকম কসম খাওয়া যে, 'আমি আমার মা-বাপের সঙ্গে কথা বলিব না' বা এই রকম অন্য কোন কসম খাইল।

কারবার (আদান-প্রদান) ভালরূপে করা

১। টাকা-পয়সার এত লোভ করিও না যে, হালাল হারামেরও খেয়াল না থাকে। আর আল্লাহ্ তা'আলা যদি হালাল পয়সা দান করেন, তবে তাহা অযথা উড়াইয়া দিও না; একটু চিন্তা করিয়া খরচ করিও। বাস্তবিকই যেখানে একান্ত আবশ্যক সেখানেই খরচ করিও।

২। কেহ বিপদে পড়িয়া যদি কোন জিনিস বিক্রয় করিতে আসে, তবে ঠেকা বলিয়া সুযোগ পাইয়া তাহাকে ঠকাইও না, তাহার জিনিসের দাম কম করিও না; বরং পারিলে তাহার কিছু সাহায্য কর, না হয় ত অন্ততঃ উচিত মূল্যে তাহার জিনিসটি খরিদ করিয়া লও।

৩। তোমার যদি কাহারও নিকট কিছু পাওনা থাকে, আর সে গরীব হয়, তবে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিও না, তাহাকে সময় দাও; বরং যদি সম্ভব হয় কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দাও।

৪। যদি তোমার নিকট কাহারও কিছু পাওনা থাকে আর তোমার দিবার ক্ষমতা আছে, তবে (তৎক্ষণাৎ দিয়া দাও, টালবহানা করিও না। কেননা, হাতে থাকিতে (টালবাহানা) করা বড়ই অন্যায়।

৫। যাহাতে ধার না লইতে হয়, সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। একান্ত ঠেকাবশতঃ যদি লইতেই হয়, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইও না। সর্বদা পরিশোধ করিবার চিন্তায় ও চেষ্টায় থাকিও। আর যাহার নিকট হইতে ধার লইয়াছ, সে যদি তোমাকে কিছু বলে, তবে তাহার প্রতিউত্তর করিও না, অসন্তুষ্ট হইও না, ছবর করিও।

৬। হাসি-ঠাট্টা করিয়া কাহারও জিনিস এরূপভাবে সরাইয়া লুকাইয়া রাখা (যাহাতে সে পেরেশান হইতে পারে) বড়ই অন্যায় কথা।

৭। মযদুরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইয়া তাহার মযদুরী দিতে দেরী করিও না, বা তাহার মযদুরী কম দিতে চেষ্টা করিও না।

৮। দুর্ভিক্ষের সময় অনেক বিপদগ্রস্ত লোক নিজের বা পরের যে সন্তান বেচিয়া ফেলে, তাহাদের গোলাম বা বান্দী বানান হারাম।

৯। পাক করিবার জন্য একটু আগুন বা নিমক দিলে এত ছওয়াব পাওয়া যায় যেন সম্পূর্ণ ভাত সালন দান করিয়াছে।

১০। পানি পান করাইলে বড়ই ছওয়াব পাওয়া যায়। যেখানে প্রচুর পরিমাণে পানি পাওয়া যায়, সেখানে ত যেমন একটা গোলাম আযাদ করিয়া দিল; আর যেখানে কম পাওয়া যায়, সেখানে ত যেমন একজন মৃতকে জীবন দান করিল।

১১। তোমার নিকট যদি কাহারও কিছু পাওনা থাকে বা কাহারও কিছু আমানতি জিনিস রাখা থাকে, তবে অন্য দুই চারিজন বিশ্বস্ত লোককে জানাইয়া রাখ অথবা কোন কাগজে লিখিয়া বা লিখাইয়া রাখ। কেননা, মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট নাই; হয়ত হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া যাইতে পারে, আর তুমি পরের দায়িক থাকিয়া মরিতে পার।

বিবাহ

১। ছেলে-মেয়ের বিবাহের সময় এই বিষয়ে বেশী খেয়াল রাখিবে, যেন কোন দ্বীনদার ধার্মিকের সঙ্গে হয়। দুনিয়ার শান-শওকত বা মালদারীর বেশী খেয়াল করিও না। বিশেষতঃ আজকালকার যমানায় ধনীর ছেলেরা ইংরাজী পড়িয়া অনেকে ঈমান হারাইয়া বসিয়াছে। এ রকম স্থলে বিবাহই দুরুস্ত হয় না, চিরজীবন যিনা করার গোনাহ্ হইতে থাকে।

২। মেয়েদের অভ্যাস আছে যে, তাহারা অনেকে স্বামীর নিকট অন্য মেয়েলোকের রূপ-গুণ বর্ণনা করিয়া থাকে। এরূপ করা অসঙ্গত। খোদা না করুন, যদি স্বামীর মন সেই দিকে চলিয়া যায় তবে (বড়ই বিপদের আশঙ্কা,) নিজেই কাঁদিয়া কাটাইবে।

৩। কোন জায়গায় যদি অন্য জায়গা হইতে বিবাহের পয়গাম আসিয়া থাকে, আর কিছু কিছু মতও দেখা যায়, তবে তুমি সেখানে নিজের কাহারও জন্য বিবাহের কথা উত্থাপন করিও না। হাঁ, যদি সে ছাড়িয়া যায় বা ঘরওয়ালা অস্বীকার করে, তবে অবশ্য বলিতে পার।

৪। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেসব বিশেষ বিশেষ কাজ বা কথা হয়, তাহা অন্য কাহারও কাছে বলাকে আল্লাহ্-তা'আলা বড়ই না-পছন্দ করেন, প্রায়ই দেখা যায় যাহাদের নূতন বিবাহ হয়, তাহারা এ বিষয়ে খেয়াল রাখে না, তাহা বড়ই অন্যায়।

৫। বিবাহের নিমিত্ত যদি তোমার কাছে কেহ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, আর সে স্থানে কিছু দোষ থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিত। এমন গীবত না-জায়েয নহে; অবশ্য বিনা দরকারে কাহারও আয়েব বাহির করা চাই না।

৬। স্বামীর নিকট থাকা সত্ত্বেও যদি স্ত্রীর আবশ্যক পরিমাণ (খাওয়া পরার) খরচ না দেয়, তবে স্বামীর অগোচরে নেওয়া জায়েয আছে, কিন্তু কোন বাহুল্য খরচের জন্য নহে (নিজের বা নিজের শিশু-সন্তানের জরুরী খরচের জন্য নিতে পারে)।

কাহাকেও কষ্ট দেওয়া

১। চিকিৎসা শাস্ত্র যে ভালরূপ পড়ে নাই তাহার পক্ষে এরকম কোন ঔষধ কোন রোগীকে দেওয়া, যাহাতে ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে, জায়েয নহে। যদি এরূপ করে গোনাহ্ হইবে।

২। কোন অস্ত্রের দ্বারা ঠাট্টা করিয়া কাহাকেও ভয় দেখান চাই না। কেননা, হয়ত হাত হইতে ছুটিয়া গিয়া আঘাত লাগিতে পারে।

৩। ছুরি, চাকু খোলা অবস্থায় কাহারও হাতে দিবে না, হয় বন্ধ করিয়া দাও না হয় কোন জায়গায় রাখিয়া দাও, সে নিজেই উঠাইয়া নিবে।

৪। কুকুর বিড়ালকে বন্ধ রাখিয়া পানাহারে কষ্ট দেওয়া বড়ই গোনাহ্।

৫। গোনাহ্গারদের অনর্থক লা'ন্‌তা'ন করা চাই না, ইহা অন্যায় কথা। অবশ্য তাহার জন্য নরমভাবে কিছু নছীহতের কথা বলিতে পার।

৬। বিনা অপরাধে কাহারও প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করা—যাহাতে সে ভীত হইতে পারে—জায়েয নহে। দেখ, যখন একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পর্যন্ত জায়েয নহে, তখন ঠাট্টা করিয়া কোথাও পলাইয়া থাকিয়া কাহাকেও হঠাৎ ভয় দেখান কত বড় অন্যায় হইবে।

৭। যবাহ্ করার সময় অস্ত্রে খুব ধার দিয়া লইবে, জানোয়ারকে অযথা কষ্ট দিবে না।

৮। ঘোড়ায় চড়িয়া কোথাও যাইতে হইলে (বা অন্য কোন জীব দ্বারা কোন কাজ লইতে হইলে) ঘোড়াকে (বা সে জীবকে) কষ্ট দিও না। এত বোঝা তাহার উপর চাপাইও না বা এত দ্রুত তাহাকে দৌড়াইও না, যাহাতে তাহার কষ্ট হইতে পারে। আর গন্তব্য স্থলে পৌঁছা মাত্রই তাহার খাওয়া-পিয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।

খাওয়ার কু-অভ্যাস দূর করা

১। বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া খাওয়া শুরু করিবে। ডান হাত দিয়া খাইবে। (কয়েক জনে এক সঙ্গে খাইতে হইলে) নিজের সামনে থেকে খাইবে; অবশ্য কয়েক রকমের জিনিস যদি এক বর্তনে থাকে, তবে যে জিনিস খাইতে রুচি হয়—উঠাইয়া লইতে পার।

২। খাওয়ার সময় আঙ্গুল চাটিয়া খাইবে। আর বর্তন খালি হইয়া গেলে তাহা ছাফ করিয়া খাইবে।

৩। খাইবার সময় খাওয়ার জিনিস যদি নীচে পড়িয়া যায়, তাহা উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া খাইতে ঘৃণা বোধ করিবে না।

৪। খেজুর, আঙ্গুর বা ফুট, তরমুজের টুকরা ইত্যাদি জিনিস কয়েক জনে এক সঙ্গে খাইতে হইলে একটি বা এক এক টুকরা করিয়া উঠাইবে, দুই তিনটি এক সঙ্গে উঠাইবে না।

৫। পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি কোন দুর্গন্ধ বিশিষ্ট জিনিস খাইয়া কোন মজলিসে যাইতে হইলে প্রথমে মুখ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইবে, যেন কোনরূপ দুর্গন্ধ না থাকে।

৬। প্রত্যহ পাকাইবার সময় চাউল, ডাল ইত্যাদি জিনিস মাপিয়া লইবে, আন্দাজি খাইতে থাকিবে না।

৭। যে কোন হালাল জিনিস খাইয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র করিবে।

৮। খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধুইবে ও কুল্লি করিবে।

৯। খুব গরম ভাত, ছালন ইত্যাদি খাইবে না। (হাঁ, যদি এরকম কোন জিনিস হয় যে, গরম গরম না খাইলে তাহার স্বাদ থাকে না, তবে তাহাতে ক্ষতি নাই।)

১০। মেহ্‌মানের খুব খাতির করা চাই। আর যদি তুমি কোথাও মেহ্‌মান হও, তবে তথায় এত বেশী দেরী করিও না, যাহাতে তাহাদের বিরক্তি বোধ হইতে পারে!

১১। এক সঙ্গে খাওয়াতে বরকত হয়।

১২। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে প্রথমে দস্তরখান উঠাইয়া দিবে, পরে নিজে উঠিবে। দস্তরখান না উঠাইয়া নিজে উঠিয়া গেলে বে-আদবী হয়। যদি কয়েকজন এক সঙ্গে খাইতে বস, আর অন্যান্যের খাওয়া শেষ হইবার পূর্বেই তোমার খাওয়া শেষ হইয়া যায়, তবে একা একা উঠিয়া যাইও না; অল্প অল্প খাইতে থাক, নতুবা তোমার সাথীরা লজ্জায় পড়িয়া ক্ষুধার্ত থাকিয়া যাইতে পারে। যদি একান্ত দরকার হয়, তবে ওযর পেশ করিয়া উঠিতে পার।

১৩। মেহ্‌মানকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া সুন্নত।

১৪। পানি এক শ্বাসে পান করিবে না, তিন শ্বাসে পান করিবে, আর শ্বাস ফেলিবার সময় পাত্রকে মুখ হইতে সরাইয়া দিবে, যেন পানিতে শ্বাস না লাগে। পানি পান করিবার সময় “বিস্‌মিল্লাহ্‌” বলিয়া পান করিবে। পান শেষ করিয়া “আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌” পড়িবে।

১৫। যে-সব বর্তন (পাত্র) এরকম যে, হয়ত হঠাৎ অনেকটা পানি আসিয়া যাইতে পারে বা এরকম যে, তাহার ভিতরকার অবস্থা জানা যাইতে পারে না, হয়ত ভিতরে কোন পোকা বা কাঁটা থাকিতে পারে, সেরকম বর্তনে মুখ লাগাইয়া পানি পান করিও না।

১৬। বিনা প্রয়োজনে দাঁড়াইয়া পানি পান করিও না। (যদি একান্ত ঠেকা হয়, সে ভিন্ন কথা)।

১৭। পানি পান করিয়া যদি অন্যকে দিতে হয়, তবে যে তোমার ডান দিকে আছে তাহাকে প্রথমে দাও, সে তাহার ডান দিকে যে আছে তাহাকে দিবে। এরূপে যদি অন্য কোন বস্তু ভাগ করিয়া দিতে হয়, যেমন পান, আতর, মিঠাই সকলেরই এই হুকুম।

১৮। বর্তনের মুখ যদি কিছু ভাঙ্গা হয়, তবে ভাঙ্গা দিকে পানি পান করিও না।

১৯। সন্ধ্যার সময় ছেলে-মেয়েদের বাহিরে থাকিতে দিও না। রাত্রে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া দরজা বন্ধ করিবে। বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া থাল, বাসন, হাড়ি-পাতিল ঢাকিয়া রাখিবে; ঘুমাইবার সময় বাতি নিবাইয়া রাখিবে এবং চুলার আগুনও নিবাইয়া ফেলিবে বা ভালরূপে ঢাকিয়া রাখিবে।

২০। কোন খাওয়ার জিনিস কোথাও পাঠাইলে ঢাকিয়া পাঠাইবে।

কাপড় ইত্যাদি পরা

১। একখানা জুতা পরিয়া হাঁটিও না। চাদর এরকমভাবে গায়ে দিও না, যাহাতে জল্‌দি হাত বাহির করিতে বা হাঁটিতে কষ্ট হইতে পারে।

২। কাপড় পরার সময় ডান দিক দিয়া এবং খোলার সময় বাম দিক দিয়া শুরু করিবে। যেমন, কোরতার ডান আস্তিন প্রথমে পরিবে, পায়জামার ডান পা প্রথমে পরিবে এবং খোলার সময় বাম আস্তিন এবং বাম পা প্রথমে খুলিবে।

৩। নূতন কাপড় পরিয়া এই দো'আ পড়িবে, ইহাতে গুনাহ্‌ মাফ হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَاقُوَّةٍ ○

অর্থাৎ, শোক্‌র সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমার কোন ক্ষমতা, কোন শক্তি না থাকা সত্ত্বেও আমাকে ইহা পরিধানের নিয়ামত দান করিয়াছেন।

৪। এরকম কাপড় পরিও না, যাহাতে রীতিমত পর্দা হয় না।

৫। যে সব লোক নানারকম মূল্যবান যেওর, কাপড় ব্যবহার করে, তাহাদের কাছে বেশী বসিও না; হয়ত বৃথা তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতে পারে।

৬। কাপড় তালি লাগানকে অপমানজনক মনে করিও না।

৭। অতি শান-শওকতের কাপড়ও পরিও না বা একেবারে ময়লা কাপড়ও পরিও না। মধ্যম রকমের কাপড় পরিবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে।

৮। চুলের যত্ন করা দরকার (তৈল দিয়া কাঙ্গি করিবে), কিন্তু তাই বলিয়া সব সময় এই খেয়ালেই লাগিয়া থাকা চাই না। (মেয়েলোকের জন্য) হাতে মেহেদী লাগাইয়া রাখা ভাল।

৯। সুরমা উভয় চোখেই তিন তিনবার করিয়া লাগাইবে।

১০। ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

রোগের চিকিৎসা

১। রোগীকে খাওয়ার জন্য বেশী জোর-যবরদস্তি করা চাই না।

২। কোন অসুখ হইলে যে সব জিনিসে অপকার করে, তাহা খাইবে না ; সতর্ক হইয়া চলিবে।

৩। যে সব তাবীয বা মন্ত্র-তন্ত্র শরীঅতের খেলাফ, সে সব কখনও ব্যবহার করিবে না।

৪। যদি কাহারও উপর কাহারও নযর লাগে, তবে যাহার নযর লাগার সন্দেহ্ হয়, তাহার মুখ, কনুই সমেত উভয় হাত, উভয় পা, উভয় হাঁটু এবং আবদস্ত করার জায়গাকে ধোয়াইয়া সেই পানি যদি যে ব্যক্তির উপর নযর লাগিয়াছে তাহার মাথার উপর ঢালিয়া দিতে পার, তবে খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

৫। যে সব রোগ দেখিলে সাধারণতঃ লোকের স্বাভাবিকভাবে ঘৃণা জন্মে যেমন, পাঁচড়া, কুষ্ঠ, বসন্ত ইত্যাদি—সে সব রোগীদের নিজেরই দূরে দূরে থাকা ভাল। তাহা হইলে কাহারও কষ্ট হইবে না, নিজেও অন্যান্যের ঘৃণায় পতিত হইবে না।

স্বপ্ন

১। যদি খারাপ কোন স্বপ্ন দেখ, তবে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেল এবং তিনবার—

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

অর্থাৎ, "শয়তান মরদুদ হইতে (রক্ষা পাইবার জন্য) আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। (অতএব, হে আল্লাহ্! আমাকে শয়তানের হাত হইতে বাঁচাও।)" পড় এবং পাশ বদলিয়া শোও, আর অন্য কাহারও কাছে এই স্বপ্ন বলিও না।

২। যদি স্বপ্নের কথা কাহারও কাছে বলিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রকৃত জ্ঞানী লোকের কাছে বলিবে বা এ রকম কোন লোকের কাছে বলিবে, যে তোমাকে দিলের সহিত ভালবাসে এবং তোমার জন্য বুরা তা'বীর না করে, তবে খোদা চাহে ত কোন ক্ষতি হইবে না।

সালাম

১। পরস্পর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আস্‌সালামু আলাইকুম) বলিয়া সালাম করিবে এবং وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ (ওয়ালাইকুমুস্‌সালাম) বলিয়া জওয়াব দিবে। ইহা ছাড়া অন্য যত রকমের সালামের প্রচলন আছে, সবই অযথা ও সুন্নতের খেলাফ।

২। যে-ব্যক্তি প্রথমে সালাম করে, সে-ই বেশী সওয়াব পায়।

৩। যদি কেহ অন্য কাহারও সালাম তোমার নিকট পৌঁছায়, তবে عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ (আলাইহিম ওয়াআলাইকুমুস্‌সালাম) বলিয়া জাওয়াব দিবে।

৪। কয়েক জনের মধ্যে হইতে একজনে সালাম করিলেও সবের তরফ হইতেই আদায় হইয়া যাইবে। এইরূপে সমস্ত মজলিসের মধ্যে মাত্র একজনে জওয়াব দিলেও সবের তরফ হইতেই আদায় হইয়া যাইবে।

হাঁটা, বসা, শোয়া ইত্যাদি

১। সাজিয়া-গুজিয়া গর্বিতভাবে চলিবে না।

২। উল্‌টাভাবে অর্থাৎ উপুড় হইয়া শুইবে না।

৩। এমন জায়গায় ঘুমাইবে না, যেখান হইতে গড়াইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। হয়ত ঘুমের মধ্যে গড়াইয়া পড়িয়া যাইতে পার।

৪। কিছু অংশ ছায়ায় কিছু অংশ রৌদ্রে—এরকমভাবে বসিও না ও শুইও না।

৫। কোন ঠেকাবশতঃ যদি মেয়ে লোককে রাস্তায় বাহির হইতে হয়, তবে রাস্তার এক পার্শ্ব দিয়া চলিবে। কেননা, রাস্তার মাঝখান দিয়া হাঁটা মেয়েলোকের জন্য বড়ই বে-হায়ায়ীর কথা।

অন্যের সঙ্গে বসা

১। কাহাকেও তাহার জায়গা হইতে উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে বসিও না।

২। মজলিসের মধ্য হইতে যদি কেহ উঠিয়া কোন কাজে যায় এবং ভাবে বুঝা যায় যে, সে আবার আসিয়া বসিবে, তবে তাহার জায়গায় অন্য কাহারও বসা চাই না, সে জায়গা তাহারই হক্।

৩। দুইজন লোক এক জায়গায় কাছে কাছে বসিয়া আছে, তুমি গিয়া তাহাদের উভয়ের মাঝখানে বসিও না, অবশ্য যদি তাহারা উভয়ে খুশী হইয়া বসাইয়া লয়, তবে ক্ষতি নাই।

৪। তোমার সঙ্গে যদি কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসে, তবে তাহাকে দেখিয়া একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিবে। তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিবে যে, তাহাকে সমাদর করা হইয়াছে।

৫। নিজে সাজিয়া বড় হইয়া বসিও না। যেখানে জায়গা পাওয়া যায়, গরীবদের মত তথায় বসিয়া পড়।

৬। হাঁচি আসিলে মুখের উপর হাত বা কাপড় রাখিয়া দিবে এবং বেশী শব্দ হইতে দিবে না।

৭। হাইকে যথাসাধ্য থামাইয়া রাখিবে, একান্ত না থামিলে মুখ চাপিয়া লইবে।

৮। উচ্চস্বরে খিলখিল করিয়া হাসিও না।

৯। মজলিসের মধ্যে বড় মানুষীভাবে গাল ফুলাইয়া বসিও না, মিস্‌কীনের ন্যায় বস। যদি কোন কাজের কথা থাকে তাহাও বলিতে পার; অবশ্য যে কথায় গোনাহ্ হয়, সে সব কথা বলিও না।

১০। মজলিসের মধ্যে পা ছড়াইয়া বসিও না।

কথা

১। চিন্তা না করিয়া কোন কথাই বলিবে না। খুব চিন্তা করিয়া যখন দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া যায় যে, এ কথায় কোন প্রকারেই দোষ নাই, তখনই সে কথা বলিবে।

২। কাহাকেও বে-ঈমান বলা বা এই রকম বলা যে, অমুকের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত হউক বা আল্লাহ্ তা'আলার গযব নাযিল হউক বা দোযখ নছীব হউক, তাহা কোন গরু বাছুরকে বা কোন মানুষকেই বলুক, ইহা বড়ই গোনাহ্র কাজ। এইরূপ যাহাকে বলা হয়, সে যদি সে রকম না হয়, যে বলে তাহারই উপর বর্তিয়া থাকে।

৩। কেহ যদি তোমাকে অন্যায়ভাবে কোন কথা বলে, তবে তুমিও ঠিক ততটুকু পরিমাণ তাহাকে বলিতে পার, কিন্তু বিন্দুমাত্র বেশী হইলেই তুমি গোনাহ্গার হইবে। (অতএব, মাফ করিয়া দেওয়া প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা ভাল। কারণ, সম্পূর্ণ ঠিক ঠিক প্রতিশোধ লওয়া প্রায় অসম্ভব।)

৪। দুমুখো কথা বলিও না। অর্থাৎ, প্রত্যেকেরই সম্মুখে তাহার মন রক্ষা করিয়া তাহার পছন্দ মত কথা বলিবে না।

৫। চোগলখোরী করিবে না। আর অন্য কেহ যদি তোমার কাছে অন্য কাহারও সম্বন্ধে চোগলখোরী করিতে চায়, তাহাও শুনিবে না।

৬। মিথ্যা কিছুতেই বলিবে না।

৭। খোশামোদের জন্য কাহারও সাক্ষাতে তাহার প্রশংসা করিও না। আর অসাক্ষাতেও যোগ্যতার চেয়ে বেশী তা'রীফ করিও না।

৮। কাহারও গীবত কখনও করিবে না। কাহারও অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে এরকম কোন কথা বলা, যাহাতে তাহার মনে ব্যথা লাগে, তাহা সত্যই হউক না কেন, 'ইহাকেই বলে গীবত'। আর যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহাকে বলে, 'বোহ্তান,' সে আরও বড় গোনাহ্।

৯। কাহারও সহিত তর্কবিতর্ক করিবে না। নিজের কথাকেই উপরে রাখিতে চেষ্টা করিবে না।

১০। বেশী হাসিও না। বেশী হাসিলে দিল মরিয়া যায়।

১১। যদি কাহারও গীবত করিয়া থাক, তবে তাহার নিকট হইতে মাফ করাইয়া লওয়া দরকার। যদি না পার, তবে তাহার জন্য এস্তেগ্ফার অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই দো'আ করিতে থাক, যেন তাহাকে মাফ করিয়া দেন। তাহা হইলে আশা করা যায় যে, কিয়ামতের দিন সেও তোমাকে মাফ করিয়া দিবে।

১২। মিথ্যা ওয়াদা করিও না, ওয়াদা করিয়া খেলাফ করিও না।

১৩। কাহারও সহিত এরূপভাবে হাসিঠাট্টা করিও না, যাহাতে সে মনে কষ্ট পাইতে পারে বা লজ্জিত হয়।

১৪। নিজের কোন জিনিস বা নিজের কোন গুণের উপর বড়াই করিও না।

১৫। কবিতা পাঠে তত মত্ত হইও না। হাঁ, যদি শরীঅতের খেলাফ কোন কথা না থাকে, তবে মাঝে মাঝে কোন নছীহত বা দো'আর কবিতা আস্তে আস্তে পড়াতে কোন ক্ষতি নাই।

১৬। না জানিয়া শুনিয়া কথা কহিও না ; কেননা, প্রায়ই এরকম কথা মিথ্যা হইয়া থাকে।

বিবিধ

১। চিঠি লিখিয়া তাহার উপর কিছু ধুলা ছড়াইয়া দাও ; ইহাতে যে কাজের জন্য চিঠি লিখিয়াছ সে কাজ খোদা চাহে ত সহজে হইয়া যাইবে।

২। জামানাকে মন্দ বলিও না, এবিষয়ে লোকেরা খেয়াল করে না, সাধারণতঃ বলিয়া থাকে, সময়টা বড়ই খারাপ। এইরূপ বলা অনুচিত।

৩। চাবাইয়া চাবাইয়া কথা বলিও না বা অনেক লম্বা চওড়া এবং বাড়াইয়া কথা বলিও না, যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই বলিবে।

৪। কেহ্ যদি গান করিতে থাকে, সে দিকে কান লাগাইও না।

৫। কাহারও কোন খারাপ অবস্থা বা কথার অনুকরণ ও ব্যঙ্গ করিও না।

৬। কাহারও মধ্যে কোন দোষ দেখিলে তাহা ঢাকিয়া রাখা উচিত, গাহিয়া বেড়ান উচিত নয়। হাঁ, যদি কোন জরুরতবশতঃ যাহের করিতে হয়, তবে ক্ষতি নাই। যেমন, এক ব্যক্তির মধ্যে কোন আয়েব আছে, যদি তুমি সে আয়েব যাহের না কর, তবে হয়ত অন্য লোক ধোঁকা খাইবে। এইরূপ অবস্থায় তাহার আয়েব যাহের করিয়া দেওয়া ভাল; বরং তাহাতে ছওয়াব পাওয়া যাইবে। আবার কোন কোন সময় আয়েব যাহের করা ওয়াজিবও হইয়া পড়ে।

৭। যে কোন কাজ কর, প্রথমে খুব ভালরূপে চিন্তা করিয়া, পরিণাম ভাবিয়া শান্তির সহিত করিবে। কেননা, তাড়াতাড়ি করাতে প্রায়ই কাজ খারাব হয়।

৮। তোমার কাছে যদি কেহ কোন পরামর্শ চায়, তবে তোমার কাছে যাহা ভাল মনে হয়, সেই পরামর্শই তাহাকে দাও।

৯। যাহাদের সঙ্গে উঠা-বসা কর তাহাদের নিকট হইতে নিজের খাতা-কছুর মাফ করাইয়া লও; নতুবা কিয়ামতের দিন বড় বিপদ হইতে পারে।

১০। পার্শ্ববর্তী লোকদেরও ভাল কাজ করিতে এবং মন্দ কাজ ছাড়িতে উপদেশ দিতে থাক। হাঁ, যদি একেবারে আশাই না থাকে যে, তাহারা শুনিবে বা এই ভয় হয় যে, হয়ত তোমাকে কষ্টও দিতে পারে, তবে অবশ্য চুপ থাকা জায়েয আছে; কিন্তু মনে মনে সেই কাজকে মন্দ জানিতে থাকিবে, আর নেহায়েত ঠেকা না হইলে এই রকম লোকদের সঙ্গে উঠা-বসা করিবে না।

মনের সংশোধন ও লোভের প্রতিকার

বেশী খাওয়ার কারণে অনেক গোনাহ্ হয়। অতএব, খাওয়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি পালন করিয়া চলিবে।

(১) সব সময় মজাদার খানা খাওয়ার পাবন্দী করিও না। (হাঁ মাঝে মাঝে কখনও যদি হয় ক্ষতি নাই।) (২) হারাম রুযী হইতে দূরে থাকিবে। (৩) পেটকে খুব বেশী ভরিবে না; বরং দুই-চার লোকমার ক্ষুধা থাকিতে খাওয়া শেষ করিবে।

পরিমাণের চেয়ে কিছু কম খাওয়ার অভ্যাস করিলে নিম্নলিখিত উপকার পাইবেঃ (১) দিল ভাল থাকিবে, আর দিল ভাল থাকিলে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যখন আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত দেখিতে পাইবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মহব্বত পয়দা হইবে। (২) দিল নরম থাকিবে। দিল নরম হইলে দো'আ এবং যিক্‌রে খুব মজা পাইবে। (৩) নফ্‌সের ছরকাশী ও বড়াই ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। (৪) এইরূপ করাতে নফ্‌সের কিছু কষ্ট হইবে, তখন কষ্ট দেখিয়া আল্লাহ্‌র আযাবের কথা মনে উঠিবে। অতএব, ক্রমশঃ গোনাহ্‌র কাজ ত্যাগ করিতে শিখিবে। (৫) গোনাহ্ করার ইচ্ছা তত থাকিবে না, ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। (৬) শরীর ভাল থাকিবে, অলসতা বোধ হইবে না, ঘুমও কম হইবে, তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য এবাদতে আলস্য বোধ হইবে না। যাহারা খাইতে পায় না সেইসব দরিদ্রের প্রতি দয়া আসিবে, বরং প্রত্যেকের প্রতিই দয়ার সৃষ্টি হইবে।

বেশী কথা বলার দোষ

বেশী কথা বলাও এটি বড় রোগ, নফ্সও বেশী কথা বলিতে ভালবাসে, অথচ এই বেশী কথা বলার দরুনই মানুষ শত শত গোনাহ্তে লিপ্ত হয়; যেমন—(১) মিথ্যা বলা, (২) কাহারো গীবত করা, (৩) কাহাকেও অভিশাপ দেওয়া, (৪) নিজের বড়াই করা, (৫) অযথা কাহারও সহিত তর্ক বাধাইয়া দেওয়া, (৬) বড় লোকের খোশামোদ করা, (৭) কাহারও সহিত হাসিঠাট্টা করিতে গিয়া এরকম কথা বলা, যাহাতে সে মনে কষ্ট পায়। এইসব গোনাহ্ হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় মুখ বন্ধ করিয়া থাকা অর্থাৎ মুখ সামলাইয়া কথা বলা। আর মুখ বন্ধ রাখার উপায় এই যে, যখন কোন কথা মুখ দিয়া বাহির করার ইচ্ছা হয় তৎক্ষণাৎ তাহা না বলা; বরং চিন্তা করিয়া দেখা, কথাটি বলিলে কোন গোনাহ্ হইবে কি ছওয়াব হইবে, বা ছওয়াবও হইবে না, গোনাহ্ও হইবে না। যদি তাহাতে অল্প কিংবা বেশী গোনাহ্ হয়, তবে সে কথা কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিবে না, মুখকে সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া লইবে। আর যদি ভিতর হইতে নফ্স তাহা বলিবার জন্য তাগাদা করে, তবে তাহাকে এই রকমভাবে বুঝাও যে, এখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া অল্প একটু কষ্ট সহ্য করা সহজ; কিন্তু পরকালে দোযখের আযাব বড় ভয়ঙ্কর (এবং বহু কালব্যাপী) হইবে।

যদি দেখ যে, এইরূপ কথা বলিলে ছওয়াব হইবে, তবে বলিয়া দিবে। আর যদি দেখ যে, এরূপ কথাতে ছওয়াবও নাই গোনাহ্ও নাই, তবেও তাহা বলিবে না। যদি একান্ত না বলিয়া থাকিতে না পার, তবে অল্প বলিয়া চুপ হইয়া থাকিবে। প্রত্যেক কথাই এই রকম চিন্তা করিয়া বলিতে থাক। খোদা চাহে ত অল্প দিনের মধ্যেই মন্দ কথা বলিতে নিজেরই ঘৃণাবোধ হইতে থাকিবে। মুখ সামলাইয়া রাখিবার ইহাও এক উপায় যে, একান্ত জরুরত না হইলে কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবে না। একা একা থাকিলে বেহুদা কথা বলিতে পারিবে না।

রাগ দমনের পন্থা

রাগ হইলে বুদ্ধি ঠিক থাকে না, আর পরিণাম চিন্তা করিবারও খেয়াল থাকে না। কাজেই মুখ দিয়াও নানারূপ অন্যায় কথা বাহির হইয়া যায়, বা অনেক সময় অনেক অন্যায় কাজও করিয়া ফেলে। অতএব, এহেন দুশমনকে দমন করা চাই। দমন করিবার উপায় এই—সর্বপ্রথমে যাহার উপর রাগ হইাছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সম্মুখ হইতে সরাইয়া দাও। আর যদি সে না যায় তবে নিজেই তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া যাও। তারপর চিন্তা করিয়া দেখ যে, তোমার নিকট সে যতটুকু অপরাধী, তার চেয়ে ত তুমিই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বেশী অপরাধী। আবার তুমি যেমন চাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন, সেই রকমেই তোমারও তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়া উচিত। মুখে আউযুবিল্লাহ্ কয়েকবার পড়িবে এবং পানি পান করিবে বা ওযূ করিবে। এইরূপ করিলে ক্রমশঃ রাগ চলিয়া যাইবে। তারপর যখন বুদ্ধি ঠিক হয়, তখন তাহার অপরাধ দেখিয়া যদি শাস্তি দেওয়াই সঙ্গত বোধ হয় অর্থাৎ শাস্তিতে অপরাধীর উপকার হইবে মনে হয়। যেমন নিজের সন্তান, কেননা তাহাদের চরিত্র সংশোধন করা একান্ত আবশ্যক, বা

অপরাধী অন্য কাহারও উপর অত্যাচার করিয়াছে, এখন তাহার প্রতিশোধ লওয়া উচিত; তবে প্রথমে চিন্তা করিয়া দেখ যে, কতটুকু অপরাধ এবং সে অনুপাতে কত পরিমাণ শাস্তি হওয়া দরকার? এবিষয়ে শরীঅত অনুযায়ী যখন নিঃসন্দেহভাবে ব্যবস্থা মাথায় আসিয়া যায়, তখন অবশ্য সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পার। এইরূপে কিছু দিন পর্যন্ত রাগকে দমন করিতে থাকিলে পরে আর তত জোর থাকিবে না; ক্রমশঃ তোমারই কাবু হইয়া যাইবে। রাগের কারণেই মনের মলিনতা অর্থাৎ কীনা হইয়া থাকে; রাগের সংশোধন হইয়া গেলে পরে কীনারও সংশোধন হইয়া যাইবে, মনের মলিনতাও দূর হইয়া যাইবে।

হাসাদ, হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা

কাহারও ভালভাবে খাইতে পরিতে, সুখে জীবন-যাপন করিতে দেখিয়া বা কাহারও মান-সম্মান, এলম-লেয়াক্বত দেখিয়া যে এক প্রকার মনঃকষ্ট উপস্থিত হয় এবং আকাঙ্ক্ষা হয় যে, এই সব তাহার না থাকুক বা চলিয়া যাউক, তবে মন সন্তুষ্ট হয়, ইহাকেই বলে হাসাদ বা হিংসা অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা। হাসাদ বড়ই খারাপ জিনিস। ইহাতে যেমন একদিকে গোনাহ্ হয়, তেমনই এরকম জীবনে কখনো শান্তি পায় না। চিরকাল কষ্টেই কাল যাপন করে। দ্বীন এবং দুনিয়া উভয়ই পণ্ড হয়। হাসাদ যখন এতদূর অনিষ্টকর, কাজেই তাহা হইতে মুক্তি পাইবার পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। মুক্তি পাইবার উপায় এই যে, প্রথমে চিন্তা করিয়া দেখ যে, হাসাদ করিলে তাহার কোনই ক্ষতি নাই, তোমারই ক্ষতি হইতেছে এবং তুমিই কষ্ট ভোগ করিতেছ। তোমার ক্ষতি এই যে, হাসাদ করার কারণে তোমার সমস্ত নেকী বরবাদ হইতেছে। কেননা, হাদীস শরীফে আছে যে, যেরূপ আগুন কাষ্ঠকে খাইয়া (জ্বালাইয়া) ফেলে, ঠিক সেইরূপ হাসাদ মানুষের নেকীকে খাইয়া ফেলে। (মতলব এই যে, তুমি যদি কাহারও প্রতি হাসাদ কর, তবে কিয়ামতের দিন তোমার নেকী তাহাকে দেওয়া হইবে; আর তুমি খালি হাত থাকিয়া যাইবে। অতএব, তোমার সেই পরিমাণ সৎকাজ বরবাদ যাইবে) ইহার কারণ এই যে, হাসাদকারী স্পষ্টভাবে না বলিলেও পরোক্ষভাবে বলিতে চায় যে, (নাউযুবিলাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা অন্যায় করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এ ধন-সম্পত্তির যোগ্য ছিল না অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করা হইয়াছে, তা যেন আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মোকাবেলা করা হয় (তওবা)। ভাবিয়া দেখ, কত বড় গোনাহ্! আর কষ্ট ত স্পষ্টই দেখা যায় যে, হাসাদকারী সর্বদাই অশান্তিতে বাস করে, জীবন ভরিয়া কখনও সুখ পায় না। আর যাহার উপর হাসাদ করা হয় তাহার কোন ক্ষতি নাই। কেননা, হাসাদের কারণে তাহার ধন-সম্পত্তি কিছুতেই কম হইতে পারে না, বরং তাহার লাভ। কেননা, সে হাসাদকারীর নেকী পাইতে থাকিবে। এই রকমভাবে খুব চিন্তা করিয়া তারপর যাহার উপর হাসাদ হইয়াছে, নিজ মুখে লোক সমাজে তাহার তারীফ এবং প্রশংসা করিবার জন্য নিজের মনকে জোর জবরদস্তি বাধ্য করিবে এবং বলিবে যে, আল্লাহ্র শোক্র যে, তাহার কাছে এমন এমন নেয়ামত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আরও দ্বিগুণ চতুর্গুণ দান করুন। আর যদি তাহার সঙ্গে কখনও দেখা হয়, তবে তাহার প্রতি নেহায়েত ভক্তি প্রদর্শন করিবে (মন যদিও করিতে চায় না, তবুও জোর জবরদস্তি করিবে) এবং তাহার সহিত নেহায়েত নম্র ব্যবহার করিবে। প্রথমে প্রথমে এইরূপ ব্যবহার করিতে নফ্সের বড়ই কষ্ট হইবে, কিন্তু ক্রমশঃ খোদার ফযলে কষ্ট কম হইতে থাকিবে, নফ্সের দুষ্টামি হ্রাস পাইতে থাকিবে, হাসাদও চলিয়া যাইবে। এই হইল হাসাদ রোগের চিকিৎসা।

দুনিয়া এবং অর্থ লোভ ও তাহার প্রতিকার

টাকা-পয়সার লোভ এত বড় খারাপ জিনিস যে, একবার ঢুকিলে আর আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইয়াদ থাকিতে পারে না। কেননা সে ত সব সময়ই চিন্তা করিবে যে, টাকা কেমন করিয়া আসিবে, টাকা কেমন করিয়া জমা হইবে? এমতাবস্থায় কখন এবং কেমন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করিবে? আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মহব্বত করিতে গেলে যে কাজের ক্ষতি হয় তাহাই বা করিবে কেন? সে ত শুধু এই চিন্তায় জীবন নষ্ট করিবে যে, কাপড় এই রকম হওয়া চাই, অন্যান্য আসবাব-পত্র এই রকম হওয়া চাই, বাড়ী-ঘর ও বাগ-বাগিচার এই রকম সুবন্দোবস্ত করা চাই ইত্যাদি। বল ত দেখি, এত জঞ্জাল যার মধ্যে সব সময় ভরা থাকে, তার মনে কি আর একবারও আল্লাহ্র কথা জাগিতে পারে? অর্থের লোভের আর এক দোষ এই যে, যাহার মনের মধ্যে অর্থের লোভ একবার বসিয়া যায়, সে কিছুতেই আল্লাহ্র কাছে যাইতে অর্থাৎ মরিতে চায় না; বরং তাহা বড়ই কষ্টকর বলিয়া মনে করে। কেননা, সে জানে যে, মরা মাত্রই তাহার এই ভোগ বিলাস, এইসব আরাম-আয়েশের লেশমাত্রও থাকিবে না। আবার কখনও এরকম হয় যে, মরার অব্যবহিত পূর্বে দুনিয়াকে বর্জন করা তাহার নিকট বড়ই কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। আর যখন জানিতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তাহাকে দুনিয়া হইতে ছাড়াইতেছেন, তখন (তওবা, তওবা) আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাগান্বিত হইয়া ঈমান হারায় এবং কুফরী হালাতে মরে। "নাউযুবিল্লাহি মিন যালেক।" আর এক দোষ এই যে, অর্থের লোভে পড়িয়া যখন অর্থ সংগ্রহ করাতে লাগিয়া যায়, তখন আর হালাল, হারাম, হক, না-হক্ ও সত্য-মিথ্যার খেয়াল থাকে না। টাকা পাইলেই হইল—ধোঁকাবাজি করিয়াই হউক বা সুদ, ঘুষ খাইয়া হউক, যে রকমেই পারে ধনাগারের উন্নতি করিতে পারিলেই হইল; এইসব কারণেই হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, দুনিয়ার মায়াই সর্বপ্রকার পাপের মূল।

যখন লোভ এত মারাত্মক জিনিস, তখন ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য। মনকে এহেন অপবিত্র জিনিস হইতে পবিত্র করা যারপর নাই আবশ্যক। তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় এই যে, প্রথমে ত মৃত্যুকে খুব বেশী করিয়া স্মরণ করা চাই, এবং সব সময় এই চিন্তা করা চাই যে, এইসব একদিন ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তবে ইহাতে মনোনিবেশ করিয়া কি লাভ? বরং যতই মনের আকর্ষণ এইসব জিনিস-পত্রের দিকে বেশী হইবে তাহা ছাড়িবার সময় ততই অধিক কষ্ট হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই করা চাই যে, অধিক লোকের সহিত দুস্তি-মহব্বত, আলাপ-পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎ লেনদেন করা চাই না, আসবাব-পত্র জায়গা-জমিও জরুরতের চেয়ে বেশী সংগ্রহ করা চাই না। কারবার, ব্যবসায়-বাণিজ্যও অনেক বেশী বিস্তৃত করা চাই না, যে পরিমাণ হইলে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়—তাহা অপেক্ষা বেশী বাড়ান চাই না। ফলকথা এই যে, সব সামানই সংক্ষেপ রাখা উচিত। তৃতীয়তঃ, এই করা চাই যে, অযথা অপব্যয় করা চাই না। কেননা, বেহুদা খরচ করিলে আয় বৃদ্ধি করারও লোভ জন্মে, আর এই লোভেই সমস্ত দোষের উৎপত্তি হয়। চতুর্থতঃ, মোটা খাওয়া-পরার অভ্যাস করা চাই;

পঞ্চমতঃ, দরিদ্রদের সহিত সব সময় উঠা-বসা করিবে, ধনীদের সংসর্গে যাইবে না। কারণ তাহাতে নানা প্রকার বড় মানুষির খেয়াল দেমাগের মধ্যে ঢুকে। ষষ্ঠতঃ, যে সব বুযুর্গেরা দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের জিবনী মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে। সপ্তমতঃ, যে জিনিসের সঙ্গে মনের খুব বেশী তা'আল্লুক হয়, তাহা হয় কাহাকেও দিয়া দিবে, না হয় বেচিয়া ফেলিবে। এই সব তদবীর করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ দিল হইতে দুনিয়ার মহব্বত দূর হইয়া যাইবে এবং যে সমস্ত বড় বড় দুরাশা মনকে আলোড়িত করিতে থাকে, যথা—এই রকমভাবে টাকা সংগ্রহ করিব, ছেলেপিলের জন্য এত টাকা এবং এত জায়গা-জমিন রাখিয়া যাইব। (ছেলেমেয়েকে এই রকম বড় ঘরে বিবাহ দিব, সে সবও ক্রমশঃ ইন্‌শাআল্লাহ্ মন হইতে দূরীভূত হইতে থাকিবে। এই হইল সর্বাপেক্ষা বড় রোগ—দুনিয়ার মহব্বতের মহৌষধ।) দুনিয়ার মহব্বত যখন চলিয়া যাইবে এইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিজে নিজেই দূর হইয়া যাইবে।

কৃপণতার অপকারিতা ও তাহার প্রতিকার

কৃপণতা এত বড় খারাপ জিনিস যে, অনেকগুলি ফরয ও ওয়াজিব ইহার কারণে আদায় হয় না। যেমন—যাকাত দেওয়া, কোরবানী করা, অভাবগ্রস্তের সাহায্য করা, নিজের দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের উপকার করা। এই সব নেক কাজ হইতে বঞ্চিত থাকা এবং এই সমস্ত পাপের বোঝা কাঁধে লওয়া সবই একমাত্র বখিলীর কারণে। এইত হইল দ্বীনের নোকছান। আর দুনিয়ার নোকছানও অনেক আছে। তাহা এই যে, বখীলকে সকলেই ঘৃণা করে, এর চেয়ে নোকছান আর কি হইতে পারে? এ দুরন্ত রোগের চিকিৎসা এই যে, প্রথমতঃ ধন-সম্পত্তির ও দুনিয়ার লালসাকে মন হইতে বাহির করিয়া দিবে, যখন মালের মহব্বত না থাকিবে, তখন কৃপণতা থাকিতেই পারে না; (কেননা, মালের মহব্বতের কারণেই লোক বখিলী করে।) দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থা যে, যে সব জিনিস একান্ত আবশ্যকীয় নয় তাহা কাহাকেও দিয়া ফেলিবে, যদিও মনে না চায় এবং কষ্ট হয় তবুও দিয়া ফেলিবে। তাহাতে কষ্ট হইলে একটু হিম্মত করিয়া কষ্ট সহ্য করিয়া লও। যাবৎ বখিলী মনের মধ্যে থাকে তাবৎ এই রকমই করিতে থাকিবে।

প্রশংসা ও যশের আকাঙ্ক্ষার অপকারিতা ও তাহার প্রতিকার

সুখ্যাতির লোভ মনের মধ্যে পড়িলে পরে অন্যের সুখ্যাতি প্রশংসা দেখিয়া মনে আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং হাসাদ পয়দা হয়। আর হাসাদের অপকারিতা উপরেই জানিয়াছ। তা ছাড়া অন্যের অপমান বা পরাজয়ের কথা শুনিয়া মনে আনন্দ জন্মে। অন্যের মন্দ চাওয়া বা মন্দ দেখিয়া আনন্দিত হওয়াও বড়ই গোনাহ্‌র কাজ। ইহাও এক খারাবী যে, অনেক সময় নাজায়েয উপায়ে সুখ্যাতি অর্জন করার চেষ্টা করা হয়। যেমন, বিবাহ শাদীতে সুনামের জন্য অযথা নানারূপ অপব্যয় করা হয়, আর এই অপব্যয়ের মাল অনেক সময় ঘুষ লইয়া খরচ করা হয়, বা সুদী করিয়া লওয়া হয়। এ সমস্ত গোনাহ্ কেবল নামের লোভের কারণে হয়; আর এতে দুনিয়ার নোকছান এই যে, যাহার নাম বেশী হয়, তাহার অনেক লোক শত্রু হইয়া পড়ে এবং নানারূপ কষ্ট দিবার জন্য চেষ্টা করে। এ রোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় এই যে, প্রথমে চিন্তা কর যে, তুমি যাহাদের নিকট ভাল হইতে চাও তাহারাও থাকিবে না, তুমিও থাকিবে না, দু'দিন পর সকলেরই

চলিয়া যাইতে হইবে, তখন এমন অসাড় জিনিসে মন লাগান নির্বুদ্ধিতা নয় কি? দ্বিতীয় এলাজ এই যে, এমন কোন কাজ করা, যাহা শরীঅতের খেলাফ নয়, কিন্তু লোকসমক্ষে তাহার কারণে লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হয়। যেমন, বাড়ীর কোন নগণ্য জিনিস বিক্রি করা, তাতে দুর্নাম খুব হয়, কিন্তু শরীঅত অনুযায়ী সম্পূর্ণ জায়েয।

অহঙ্কার ও তাহার প্রতিকার

এল্ম, এবাদত, দিয়ানতদারী, দ্বীনদারী, হাছব, ধনদৌলত, চিজ-আসবাব, মান-সম্মান, বিদ্যা-বুদ্ধি ইত্যাদি কোন গুণে নিজকে বড় মনে করিয়া অন্যকে ক্ষুদ্র এবং হেয় মনে করাকে গরুরী, অহঙ্কার এবং তাকাব্বুর বলে। ইহা বড়ই সাংঘাতিক রোগ, বরং তামাম রোগের মূল এবং অতি বড় গোনাহ্। হাদীস শরীফে আছে, যাহার মনের মধ্যে বিন্দুমাত্রও অহঙ্কার থাকিবে, সে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না। এ ত গেল আখেরাত এবং দ্বীনের খারাবী। এ ছাড়া দুনিয়াতে যদিও সাক্ষাতে ভয়ে কেহ কিছু না বলে বরং সম্মান করে কিন্তু মনে মনে সকলেই অহঙ্কারীকে বড়ই ঘৃণা করিয়া থাকে এবং সুযোগে শত্রুতা করিয়া প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। আর এক খারাবী এই যে, এ রকম অহঙ্কারী লোক কাহারও নছীহত কবূল করে না। কেহ সৎপরামর্শ দিলে তাহাও গ্রহণ করে না; বরং খারাপ মনে করে এবং নছীহতকারীকে কষ্ট দিতে চায়। এহেন মারাত্মক রোগের অমোঘ ঔষধ এই যে, তুমি কি? এবং কে? একবার ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। চিন্তা করিয়া দেখ যে, তুমি ত সেই মাটিই যাকে দিবারাত্রি লোকে পদদলিত করিতে থাকে, তোমার মূল ত সেই এক বিন্দু দুর্গন্ধময় অপবিত্র পানিই, যাহা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া বাহির হইয়া থাকে। এক্ষণে যদি তোমার মধ্যে কোন গুণ, কোন কামাল আসিয়া থাকে তাহা তোমার বাহুবলে অর্জিত নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তোমাকে দান করিয়াছেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন এই ক্ষণেই সবই কাড়িয়া নিতে পারেন এবং তোমাকে সম্পূর্ণভাবে সর্বগুণহীন করিয়া দিতে পারেন এবং এতদ-সত্ত্বেও কোন সামান্য কামালিয়াতের উপর ফখর করা আহ্মকী নয় কি? ইহা তো গেল নিজের স্বরূপ এবং "নিজে কিছু না হওয়ার"র চিন্তা করার কথা। এ ছাড়া আরও চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কত বড়! সমস্ত কামাল ত তাঁহার মধ্যে কত অসীম ও অনন্ত পরিমাণে বিদ্যমান! আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে নিজের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যাইবে; কামালিয়াত ত অনেক দূরের কথা। এতদ্ব্যতীত যাহাকে তুমি ক্ষুদ্র এবং হেয় বলিয়া মনে কর, তাহার সহিত জোর-জবরদস্তি নম্র ব্যবহার করিবে এবং তাহাকে সম্মান করিবে; তাহা হইলে অহঙ্কার নিজেই চলিয়া যাইবে। আর যদি কিছু না হয়, যদি এতটুকু করিতে পার যে, কোন সামান্য লোককে দেখিয়া প্রথমেই তাহাকে সালাম কর, তবেও নফ্সের মধ্যে অনেক আজিযী আসিয়া যাইবে এবং ক্রমশঃ দাম্ভিকতার স্থলে নম্রতা স্থান পাইতে থাকিবে।

আত্মগর্ব ও তাহার প্রতিকার

যদিও অন্য কাউকে হেয় মনে না হয়, কিন্তু নিজেকেই নিজে ভাল মনে করা বা নিজের কোন জিনিসের উপর গর্বিত হওয়া, যেমন ভাল কোন কাপড় পরিয়া গর্ব-ভরে চলা ইহাও বড়ই খারাপ। হাদীস শরীফে আছে— এই দোষ লোকের দ্বীনকে বরবাদ করিয়া ফেলে। তাছাড়া যে নিজেকে ভাল বলিয়া মনে করে সে নিজের দোষ-ত্রুটি কখনও এছলাহ করিতে পারে না। কেননা, যে

প্রথম হইতেই নিজেকে দোষ ত্রুটিশূন্য মনে করিয়া বসিয়াছে সে ত কখনো চিন্তাও করিবে না যে, তাহার মধ্যে কোন দোষ আছে। (আর চিন্তাই সমস্ত এছ্‌লাহের মূল।)

নিজের দোষ এবং আয়েবগুলি এক এক করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ (এবং সংশোধনে তৎপর হও) এবং মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাও যে, যদি তোমার মধ্যে কোন গুণ থাকিয়া থাকে, তবে তাহা আল্লাহ্‌ তা'আলারই দান, তোমার কিছুই নয়। এই চিন্তা করিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলার শোক্‌র কর এবং দো'আ কর যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন তোমাকে এই নেয়ামত হইতে মাহ্‌রূম না করেন। (এইরূপে চিন্তা করিতে থাক এবং এরূপে হিম্মতের সঙ্গে কাজ করিতে থাকাই এই রোগ হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায়।)

রিয়াকারীর দোষ ও তাহার প্রতিকার

(কোন কাজ লোক দেখানের জন্য করাকে রিয়া বলে। রিয়া অতি বড় গোনাহ্‌। এমন কি, কিয়ামতের দিন রিয়ার কারণে অনেক নেক আমলের সওয়াবের পরিবর্তে উল্টা আযাব মিলিবে।) রিয়া নানা প্রকার হয়, কোন সময় ত নিজের মুখেই বলিয়া ফেলে। যেমন কেহ বলে যে, আমি এত পরিমাণ কোরআন শরীফ পড়িয়াছি বা আমি রাত্রে উঠিয়া থাকি। কখনো অন্য কথার প্রসংগে বলা হয়, যেমন কোন মজলিসে বন্ধুদের মধ্যে কথা হইতেছিল, একজনে বলিয়া উঠিল, না এ সবই মিথ্যা কথা, "আমাদের কাফেলার সঙ্গে এই এই রকম ভাল ব্যবহার করিয়াছিল;" এখানে কথা প্রসঙ্গে সে জানাইয়া দিল যে, সেও হজ্জ করিয়াছে। কখনো কোন কাজ করায় রিয়া হয়, কেহ মানুষকে দেখাইবার জন্য হাতে তসবীহ্‌ লইয়া আসিয়া লোকসমক্ষে বসিয়া যায়। কখনো কাজটাকে একটু আরও ভাল করিয়া করায় রিয়া হয়; যেমন কোরআন শরীফ ত সব সময়ই পড়িয়া থাকে, কিন্তু দশজন লোকের মধ্যে মুখ বানাইয়া পড়ে। কখনো বা আকারে প্রকারে রিয়া হয়, যেমন চক্ষু বন্ধ করিয়া ঘাড় নোয়াইয়া বসিয়া থাকে, লোকে ভাবিবে যে, বড়ই দরবেশ, সব সময় আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকেন, রাত্রে ঘুমান নাই তাই চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে। এইরূপে এই রিয়া রোগ আরও কয়েক প্রকারের হয়। যেই ভাবেই হউক রিয়া বড়ই সাঙ্ঘাতিক রোগ। পূর্বে সুখ্যাতি আকাঙ্ক্ষার যে সব এলাজ লেখা হইয়াছে, তাহাই এই রোগেরও এলাজ। কেননা, লোক দেখাইবার জন্য যে সব কাজ লোকে করে তাহাও এই জন্যই করিয়া থাকে যে, লোকে ভাল বলিবে, প্রশংসা করিবে, সুনাম রটিবে। (তাই উভয় প্রকার রোগের এই এলাজ।)

কয়েকটি জরুরী কথা

উল্লিখিত ত্রুটিসমূহের যে সব এলাজ এ পর্যন্ত লেখা হইয়াছে তাহা দুই চারি বার আমল করিলেই যে সেসব দোষ হইতে মুক্তি পাওয়া গেল তাহাও নহে; বরং বহুকালব্যাপী, (এমন কি সারা জীবনব্যাপী) এই ভাবেই আমল করিতে থাকিবে। (এক মুহূর্তও গাফেল হইলে চলিবে না, নফ্‌সের কোন বিশ্বাস নাই, নফ্‌স বড়ই দুষ্ট, নফ্‌সের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিত হইয়া যাওয়া নির্বুদ্ধিতা মাত্র! কখনো যদি ভুল হইয়া যায়, তবে মনে মনে নেহায়েত আফসোস এবং আক্ষেপ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইবে। এইরূপ করিতে করিতে আল্লাহ্‌ চাহে ত একদিন নফ্‌সের দুষ্টামি শেষ হইতে পারে। উদহরণস্বরূপ যেমন রাগকে দুই চারিবার দমন করিয়া বুঝিবে না যে, এই রিপু হইতে মুক্তি পাইয়াছ, বা দুই চারিবার যদি রাগ না আসে, তবে ধোঁকা খাইবে

না যে, তোমার নফ্‌সের বোধ হয় এছলাহ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; বরং নফ্‌সের শত্রুতা হইতে আমরণ সতর্ক থাকিতে হইবে। হাঁ, ইহা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ যে, প্রথম প্রতিবন্ধকতা করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হয় বটে; কিন্তু ক্রমশঃ এই কষ্টের লাঘব হয়।

আরও জরুরী একটা কথা

নফ্‌সের মধ্যে যে দুষ্টামি ও দোষ আছে এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা যেসব গোনাহ্ হয়, এ সবের জন্য এক সহজ ঔষধও আছে। তাহা হইল এই যে, যখনই নফ্‌স কোন দুষ্টামি করে বা গোনাহ্ হয়, তখনই নফ্‌সকে কিছু শাস্তি দান কর। আর সাধারণতঃ দুই প্রকার শাস্তিই সহজসাধ্য। (১) যখনই কোন অন্যায় কাজ কর, তখনই নিজের অবস্থানুসারে আনা দু'আনা বা টাকা দু'টাকা জরিমানা করিয়া তাহা গরীবকে দাও। আবার যদি সেই কাজ কর, আবার জরিমানা দাও। (২) কোন অন্যায় কাজ করিয়া বসিলে দুই-এক ওয়াক্ত নফ্‌সকে না খাওয়াইয়া রাখ। আশা করা যায় যে, যদি কেহ এইরূপ শস্তির বিধান করিতে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মুক্তি দান করিতে পারেন।

এপর্যন্ত মানুষের মধ্যে যেসব দোষ সাধারণতঃ দেখা যায়, তাহার সংশোধনের বয়ান ছিল, এক্ষণে যে সব কাজে মানুষের মন নূরে আলোকিত এবং সুসজ্জিত হয় তাহার বয়ান করা হইবে!

তওবা এবং তাহার প্রণালী

তওবা এমন ভাল কাজ যে, ইহা দ্বারা সমস্ত গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়। যে নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং দেখে যে, অনবরত আমার দ্বারা কোন না কোন গোনাহ্ হইতেই থাকে, সে নিশ্চয়ই সব সময়ের জন্য তওবাকে জরুরী মনে করিবে। তওবার ভাব মনের মধ্যে জাগাইবার উপায় এই যে, কোরআন হাদীসে গোনাহ্‌র কারণে যে সমস্ত আযাবের কথা বলা হইয়াছে, সে সব স্মরণ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। যখন ভালরূপ চিন্তা করিবে তখন নিশ্চয়ই মন গলিয়া যাইবে এবং মনে এক প্রকার অনুতাপ ও লজ্জার ভাব উদয় হইবে। যখন মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইবে, তখন মুখেও স্বীকার করিয়া লইবে এবং যেসব নামায, রোযা ইত্যাদি ছুটিয়া গিয়াছে সে সব ক্বাযা করিয়া লইবে; আর যদি কোন মানুষের কোন হক নষ্ট করিয়া থাক তবে তাহার নিকট হইতে মাফ করাইয়া লইবে বা পরিশোধ করিয়া দিবে। আর যদি এছাড়া অন্য কোন গোনাহ্ হইয়া থাকে, তবে মনে মনে খুব দুঃখিত হইবে এবং যথাসাধ্য কাতরস্বরে করজোড়ে ও নম্রভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাফ চাহিবে (এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে যে, এমন আর কখনো করিব না!) এই হইল আসল তওবা।

আল্লাহ্ তা'আলার ভয়

আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলিয়াছেনঃ আমার ভয় মনে জাগাইয়া রাখ, আল্লাহ্ তা'আলার ভয় এমন উত্তম জিনিস যে, ইহা যদি মানুষের মধ্যে থাকে, তবে গোনাহ্ হইতে পারে না। তওবার প্রণালীই ইহার প্রতিকারের তরীকা, আল্লাহ্ তা'আলার সেই ভীষণ আযাবের কথা চিন্তা করিয়া দেখ এবং স্মরণ কর।

আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আশা রাখা

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, তোমরা আমার রহমত ও অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না। এই আশা এমন ভাল জিনিস যে, ইহাতে সৎকাজে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং তওবা করিবার হিম্মত জন্মে। আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আশা মনের ভিতর জন্মাইবার উপায় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ও অপার রহমতের কথা মনে করিয়া চিন্তা করিবে।

ছবর

নফ্‌সকে দ্বীনের কাজের পাবন্দ রাখা এবং শরীঅতের খেলাফ কোন কাজ করিতে না দেওয়াকে ছবর বলে। বছর কয়েক প্রকার।

প্রথম প্রকার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মান-সম্মান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, চাকর-নকর, গাড়ী-ঘোড়া, আওলাদ-ফরযন্দ, দালান-কোঠা ইত্যাদি সব রকমেরই নেয়ামত দান করিয়াছেন। এ অবস্থায় ছবর এই যে, এইসব পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলিয়া যাইও না, অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিও না, গরীব-গোরাবাকে হীন মনে করিও না, তাহাদের সঙ্গে যথাসম্ভব সদয় ব্যবহার করিও এবং সাধ্যমত তাহাদের খেদমত করিতে থাকিও।

দ্বিতীয়—এবাদতের সময় ছবর। এবাদত করিতে অনেক সময় নফ্‌স আলস্য করে; যেমন, নামাযের জন্য জাগিতে বা জমা'আতে নামায পড়িতে যাইতে নফ্‌স অলসতা করিয়া থাকে বা কোন সময় কৃপণতাও করে; যেমন, দান-খয়রাত করিবার বা যাকাত দিবার সময় নফ্‌স বখিলী করিয়া থাকে, এইরূপ স্থলে তিন প্রকার ছবরের দরকার। প্রথম, এবাদত শুরু করিবার পূর্বে নিয়ত খুব খালেছ করিয়া লইবে, শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তেই করিবে, অন্য কোন নফ্‌সানী গরযে করিবে না। দ্বিতীয়, এবাদতের সময় উৎসাহ ভঙ্গ হইলে চলিবে না, পূর্ণ উৎসাহ এবং হিম্মতের সহিত এবাদত যেমনভাবে করা চাই তেমনভাবে করিবে। এবাদতের হক আদায় করিবে। তৃতীয়, এবাদত করিয়া অন্য কাহাকেও বলিবে না।

তৃতীয়—গোনাহ্‌র সময়ের ছবর। গোনাহ্‌র সময়ের ছবর এই যে, নফ্‌সকে গোনাহ্ হইতে যে রকমেই হয় নিরাপদ রাখিবে।

চতুর্থ—যে সময় কেহ কোন রকম কষ্ট দেয় সেই সময়ের ছবর। এরকম সময়ের ছবর হইল এই যে, যে রকম কষ্টই হউক না কেন, যে রকম মন্দই বলুক না কেন, তুমি কোনরূপ প্রতিশোধ লইও না।

পঞ্চম—যে সময় কোন বিপদ-আপদ আসিয়া পড়ে, কোন রোগ পীড়া হয় বা টাকা-পয়সার কোন রকম সাংঘাতিক ক্ষতি হইয়া যায় বা খাওয়া-পরার কষ্ট হয় বা কোন আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু ঘটে, সেই সময়ের ছবর। এরকম সময়ের ছবর এই যে, এরকম সময় শরীঅতের খেলাফ কোন কথা মুখ দিয়া বাহির করিও না বা বয়ান করিয়া ক্রন্দন করিও না। এই সব প্রকার ছবরই হাছেল

করিবার উপায় এই যে, এই রকম স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা যে সব ছওয়াবের ওয়াদা করিয়াছেন সেই সব স্মরণ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবে এবং মনে মনে এই বিশ্বাস করিবে যে, এ সব আমারই কোন না কোন মঙ্গলের জন্য হইতেছে, যদিও আমি বুঝিতে পারিতেছি না এবং একথা মনকে বুঝাইবে যে, যদিও আমি ছবর না করি, তবে তক্দীরে যা আছে তাহা ত হইবেই, মিছামিছি কেন বে-ছবরী করিয়া ছওয়াব হারাইব?

শোক্র

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনন্ত অনুগ্রহ দেখিয়া মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া তাঁহার প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি জমান এবং মনে মনে এরূপ ভাবের উদয় হওয়া যে, যে-জন (অযাচিতভাবে) আমাকে এইসব সামগ্রী দান করিয়াছেন (সে জনের এবাদত না করিয়া কেমন করিয়া পারা যায়? অতএব,) প্রাণপণে তাঁহার এবাদত করা চাই এবং নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাকা চাই। কেননা, এহেন উপকারী জনের আদেশ অমান্য করা বড়ই লজ্জার কথা। ইহাকেই শোক্র বলে। মানুষের উপর অনবরত আল্লাহ্র অসীম অনন্ত নেয়ামতরাশি বর্ষিত হইতেছে, এমনকি যদি কোন মুছীবতও আসে, তবে তাহাতেও মানুষের অসংখ্য মঙ্গল নিহিত থাকে। (কেননা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করিলে তাহাতে অনেক ছওয়াবও পাওয়া যায় এবং নফ্সের এছলাহ্ও হয়,) কাজেই তাহাও নেয়ামতই। অতএব, যখন দেখা গেল যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ আমাদের উপর অনবরত বর্ষিত হইতেছে, তখন আল্লাহ্র সঙ্গে অগাধ মহব্বত এবং প্রগাঢ় ভক্তি অনবরত থাকা চাই এবং আল্লাহ্র হুকুমগুলি পালন এবং বিন্দুমাত্র আদেশও যেন লঙ্ঘন না হয় সে জন্য সতত তৎপর থাকা চাই।

শোক্র হাছেল করিবার উপায় এই যে, কিছুক্ষণ নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্র নেয়ামত ও অনুগ্রহরাশি চিন্তা করিবে (এবং এই উপায়ে আল্লাহ্র মহব্বত বর্ধিত করিতে চেষ্টা করিবে)।

কতকগুলি উপদেশ—(পরিবর্ধিত)

খোদার ভয় দেলে রাখ। পাপ কাজ করিও না। ওযূ করিয়া নামায পড়। নামাযী মানুষ আল্লাহ্র পেয়ারা হয়। বেনামাযী আল্লাহ্র রহ্মত হইতে দূরে থাকে। গরীবের বদদোআ লইও না। গরীবকে তুচ্ছ বা অত্যাচার করিও না। অযথা কোন জীবজন্তুকে কষ্ট দিও না। বিড়াল কুকুর বা গরু বাছুরকে অযথা মারিও না বা গৃহপালিত পশু-পক্ষীকে অনাহারে কষ্ট দিও না। মা-বাপের কথা শুন। মা-বাপের প্রহারকে গৌরব মনে কর। প্রাণের সহিত মা-বাপের খেদমত কর। বেহেশ্ত মা-বাপের পায়ের তলে। মা-বাপের কথার পাল্টা জওয়াব দিও না। মা-বাপ রাগ করিয়া কোন কথা বলিলে বা তিরস্কার করিলে চুপ করিয়া তাহা সহ্য কর। কোন বিষয়ে মা বাপের মনে কষ্ট দিও না। মা, বাপ, ওস্তাদ, পীর এই চারিজনকে প্রাণের সহিত ভক্তি কর। মুরব্বিদের সামনে আদব-তমীযের সাথে থাক। ছোটদের স্নেহ কর। বড়দের ভক্তি কর; আলেমদের সম্মান কর; কাহাকেও তুচ্ছ করিও না। ছোট ভাই-বোনদের সহিত বা পাড়া-প্রতিবেশীদের সহিত ঝগড়া-কলহ বা মারামারি করিও না। যাহার মধ্যে নম্রতা গুণ আছে, তাহাকে সকলে ভালবাসে। অহঙ্কারীকে সকলেই ঘৃণা করে। পরের দোষ দেখিও না। পানির গ্লাস এবং চা'এর পেয়ালা ডান হাতে ধরিয়া পানি এবং চা পান কর। বাম হাতে খাওয়া-পিয়া শয়তানের কাজ। তিন শ্বাসে পান কর। ভাত সালুন কিছু ঠাণ্ডা করিয়া খাও। বেশী গরম খাওয়াতে বরকত থাকে না। মিথ্যা কথা বলিও না।

সদা সত্য কথা বলিবে। মিথ্যা বলা মহাপাপ। সকাল বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া আউযুবিল্লাহ্‌ বিসমিল্লাহ্‌ এবং লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ কলেমা পড়িবে এবং মুরব্বিদের সালাম করিবে। ফজরের নামায পড়িয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিবে। ছবক ভালমত ইয়াদ করিবে। বার বার কছম খাইবে না। নিজের বই, কিতাব, দোয়াত, কলম, নিজের কাপড়, বিছানা-পত্র নিজেই যত্ন করিয়া রাখিবে, যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিবে না। কাহাকেও ঠাট্টা করিবে না বা কাহাকেও ভেঙ্গাইবে না। নাক বাম হাত দিয়া ছাফ করিবে। জুতা পরিবার সময় আগে ডাইন পায়ে পরিবে পরে বাম পায়ে পরিবে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পেশাব করিও না। পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হইয়া পেশাব পায়খানা করিতে বসিও না। কাহাকে খাইতে দেখিলে তথায় যাইয়া বসিও না। পরিশ্রমী হও। অলস হইও না। অপব্যয় করিও না। বিলাসিতা করিও না। কৃষি কাজকে ঘৃণা করিও না। —অনুবাদক

তাওয়াক্কুল

[আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা]

প্রত্যেক মুসলমানেরই ঈমান (অকাট্য বিশ্বাস) আছে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে দুনিয়াতে লাভ-লোকসান বা উপকার অপকারের কোন কিছুই হইতে পারে না। (ইহাই তক্‌দীরের উপর ঈমান আনার সারমর্ম। শরীঅতে যেমন তক্‌দীরের উপর ঈমান রাখার হুকুম আছে তেমনই তদ্‌বীর করারও হুকুম আছে। তক্‌দীরের উপর মজবুত ঈমান এবং পূর্ণ বিশ্বাস ত রাখিতেই হইবে, তারপর সংসার জীবন যাত্রার পথে দৈনন্দিন যত ঘটনা সামনে আসিবে, প্রত্যেক ঘটনার যথারীতি তদ্‌বীরও করিতে হইবে।) কিন্তু, যেমন বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না, তদ্রূপ প্রত্যেক কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেক চেষ্টার ফলের জন্য, প্রত্যেক তদ্‌বীরের কামিয়াবীর জন্য ভরসা রাখিতে হইবে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের উপর। ইহাকেই বলে তাওয়াক্কুল। নতুবা তদ্‌বীর না করিয়া হাত-পা গুটাইয়া অকর্মা হইয়া বসিয়া থাকা বা চেষ্টা না করিয়া ফলের আশা করা শরীঅতের বিধান নহে। নিয়ম মত চেষ্টা ও তদ্‌বীর করিতে হইবে। এক খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কোন আশা করিবে না বা অন্য কাহারও ভয়ে ভীত হইবে না; ভয় শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ্‌ না-রায না হইয়া যান, আল্লাহ্‌ না-রায হইলে সর্বনাশ। ইহাকেই বলে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। (তাওয়াক্কুল ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হয় না।)

তাওয়াক্কুল শিক্ষা এবং হাছেল করিবার উপায় এই যে, কিছুক্ষণ সময় নির্ধারিত করিয়া চিন্তা (মোরাকাবা) করিবে যে, আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ্‌ দয়াময়, আল্লাহ্‌ মঙ্গলময়, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অন্য কাহারও কিছু করিবার ক্ষমতা নাই।

আল্লাহ্‌র সঙ্গে মহব্বত পয়দা করার নিয়ম

[আল্লাহ্‌কে ভালবাসা এবং ভক্তি করা]

আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রাণের টান থাকা, আল্লাহ্‌র কথা শুনিয়া প্রাণ গলিয়া যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র কার্য-কলাপ দেখিয়া মুগ্ধ হওয়াকে বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত। ইহা প্রত্যেক মুসলমানের বরং প্রত্যেক মানুষেরই স্বাভাবিক ধর্ম। আল্লাহ্‌র ন্যায় এমন দয়ালু, মহান এবং মহোপকারী জন আর কে আছে?

আল্লাহ্‌র সঙ্গে মহব্বত করিবার সহজ উপায় এই যে, আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম খুব বেশী করিয়া যিক্‌র করিবে। আল্লাহ্‌ যে তোমাকে কত ভালবাসেন (আর সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তিনি যে তোমার উপকার করেন, কত অসংখ্য অগণ্য নেয়ামতরাশি যে তুমি তাঁহার বিনা পয়সায় বিনা যাচ্ঞায় অনবরত ভোগ করিতেছ) এবং তিনি যে কত মহান, কত উদার, কত দয়ালু এই সব কথা দৈনিক কতক্ষণ নির্জনে বসিয়া গভীরভাবে চিন্তা (মোরাকাবা) করিবে। এই উপায়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত বাড়িবে।

রেযা-বিলক্কাযা

[আল্লাহ্‌র হুকুমে রাযী থাকা]

আল্লাহ্‌ ভাল এবং আল্লাহ্‌র সব কাজই ভাল, একথা বিশ্বাস করা, স্বীকার করা এবং প্রকাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরই ফরয। তুমি নিজে বিপদ টানিয়া আনিও না; নতুবা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যদি কোন বিপদ আসে বা কোন কঠিন আদেশ তোমার প্রতি হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহাতে তোমার মঙ্গল নিহিত আছে। কাজেই এরূপ সময়ে অস্থির হইও না, ঘাবড়াইয়া পেরেশান হইও না, মনের মধ্যে বা মুখের কথায় কোন শেকায়েত এ'তেরায বা প্রতিবাদ করিও না, বেজার হইও না; রাযী থাকিও। কারণ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যে বিপদ আসিবে তাহাতে তোমার গোনাহ্‌ মাফ হইবে, তোমার দর্জা বুলন্দ হইবে, ছওয়াব হাছেল হইবে, জ্ঞান ও মা'রেফাৎ বাড়িবে ইত্যাদি; তোমার অনেক প্রকার ফায়েদা তাহাতে নিহিত থাকে। এই সব ফায়েদার কথা চিন্তা করিবে এবং আল্লাহ্‌ যে একটুও মন্দ বা বিন্দুমাত্রও নিষ্ঠুর নন তিনি যে পরম দয়ালু পূর্ণ মঙ্গলময় এইসব কথা চিন্তা করিবে। তাহা হইলে সহজেই রেযা-বিলক্কাযা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমে রাযী থাকার মর্তবা হাছেল হইবে।

ছেদক ও এখলাছ হাছেল করিবার নিয়ম

[দেল খাঁটি করা এবং নিয়ত খালেছ করা]

দ্বীনের কাজে দুনিয়ার কোন গরযের নিয়ত রাখা চাই না। লোকের কাছে 'আদরণীয় বা সম্মানী হইব' এধারণাও করা চাই না এমন কি রোযা রাখিলে পেটের অসুখ সারে বা নামায পড়িলে ব্যায়াম হয় বা হজ্জ করিলে বহু দেশ দেখা যায়, যাকাত দিলে লোক হাত হয়, এইসব নিয়তও করা চাই না। এ সব বিষয় এবাদতের মধ্যে নিশ্চয় আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য ও নিয়ত হওয়া চাই—শুধু আল্লাহ্‌কে রাযী করা, আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়পাত্র হওয়া। তাছাড়া দুনিয়ার এইসব উপকারিতার নিয়ত কখনও করা চাই না; নতুবা নিয়ত খাঁটি ও খালেছ না হইলে কোন এবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায় না।

নিয়ত খালেছ করার উপায় এই যে, এবাদত করিবার পূর্বে কিছু চিন্তা করিয়া লইবে; দেলের মধ্য হইতে অন্যান্য বাজে উদ্দেশ্য সব দূরে নিক্ষেপ করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যের কথা দেলে স্থান দিবে। কতক দিন এইরূপে চেষ্টা করিলে সব আয়ত্তে আসিবে, তখন একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিলে কষ্টবোধ হইবে।

মোরাকাবা (আল্লাহ্‌র ধ্যান) হাছেল করিবার নিয়ম

[আল্লাহ্‌র খেয়াল সদাসর্বদা মনে রাখা]

সব সময় দেলের মধ্যে এই খেয়াল রাখিবে যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখিতেছেন, আমি যাহাকিছু করিতেছি, যাহাকিছু কথা বলিতেছি, যা কিছু মনে মনে চিন্তা করিতেছি, সবই আল্লাহ্ দেখিতেছেন। যদি কোন কু-কাজ করি বা কু-কথা মনে কল্পনা করি, তাহা দেখিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন এবং দুনিয়াতেই শাস্তি দিবেন, না হয় আখেরাতে কিয়ামতের দিন ত শাস্তি দিবেনই। দ্বিতীয়তঃ, এবাদতের সময় (নামায পড়ার সময়, যেকের করার সময়, যাকাত খয়রাত দেওয়ার সময়, রোযা রাখার সময়) এই খেয়াল সব সময় মনে রাখিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা দেখিতেছেন; অতএব, এইসব কাজ ভক্তি ও মনোযোগের সহিত করিতে হইবে। (ইহাতে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হইয়া অনেক পুরস্কার দিবেন, আর যদি অভক্তির সঙ্গে করি বা অলসতা করি, তবে তাঁহার নিকট গোপন কোন কিছুই থাকিবে না, তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। এই চিন্তাটি গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিতে হইবে।) অনবরত চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্‌র খেয়াল এত বাড়িয়া যাইবে যে, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। আল্লাহ্‌র মতের বিরুদ্ধে কোন কল্পনা মনে আসিলেও মনে ব্যথা লাগিবে। (এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়া গেলে মনে যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। আল্লাহ্‌র ধ্যান (মোরাকাবা) অমূল্য রত্ন। সকলেরই ইহা হাছেল করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা দরকার। ইহা হাছেল করিবার সময় প্রথম প্রথম একটু কষ্ট করিতে হয়, পরে সহজ ও মধুর হইয়া যায়। প্রথম প্রথম মনে থাকিতে চায় না, বার বার মনকে জোর করিয়া টানিয়া আনিতে হয়। মনে না থাকিলেও মুখে অনবরত আল্লাহ্‌র যেকের করিতে হয়, আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সংসর্গের বরকতে ক্রমান্বয়ে মন এমন মজিয়া যায় যে, মুহূর্তের তরেও গাফলত সহ্য হয় না।)

কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে হুযূরে ক্বাল্‌ব হাছেল করার নিয়ত

তোমাকে যদি তোমার ওস্তাদ পীর বা অন্য কোন বড় লোক আদেশ করেন যে, আমাকে কিছু কোরআন শরীফ পড়িয়া শুনাও, তখন তুমি সুন্দর করিয়া পড়িবে এবং যাহাতে একটি যের-যবরও ভুল না যায় এবং একটুও মন এদিক-ওদিক না যায় সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। তদ্রূপ কোরআন শরীফ যখন পড়িতে বস, তখন কিছুক্ষণ এই চিন্তা করিয়া লও যে, আল্লাহ্ সকলের বড়, সকল বাদশাহ্‌র বাদশাহ্; তিনি তাঁহার কালাম আমার দ্বারা পড়াইয়া শুনিতে চাহিতেছেন। যদি আমি সুন্দর করিয়া নির্ভুলভাবে মন লাগাইয়া পড়ি, তবে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, নতুবা ভুল পড়িলে বা অভক্তি ও অমনোযোগিতার সহিত পড়িলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন এইরূপ চিন্তা করিয়া তারপর পড়া শুরু করিবে এবং খুব ভক্তির সহিত একটুও ভুল না হয় সেইভাবে পড়িবে। যদি কতক্ষণ পড়িলে এই চিন্তা না থাকে, অমনোযোগিতা আসিয়া যায়, তখন পড়া বন্ধ করিয়া কতক্ষণ

আবার ঐরূপ চিন্তা তাজা করিয়া লইবে। কতক দিন এইরূপ মশ্‌ক করিলে, পরে ঐ চিন্তা খুব গাঢ় হইয়া যাইবে এবং ভুলও হইবে না। মনও লাগিবে, ভক্তি ও মহব্বত বাড়িবে।

নামাযে হুযূরে ক্বাল্‌ব হাছেলের নিয়ম

নামাযের মধ্যে হুযূরে ক্বালব জরুরী। হুযূরে ক্বালবের অর্থ দেল হাযির করা। হুযূরে ক্বালব হাছেল করার সহজ তরীকা এইঃ (এতটুকু কথা স্মরণ রাখিবে যে, নামাযের মধ্যে যাহাকিছু পড় এবং যাহাকিছু কর, তাহা যেন বে-খেয়ালীর সঙ্গে না হয়; বরং) প্রত্যেক লফ্‌য খেয়ালের সঙ্গে পড়িবে এবং প্রত্যেক কাজ খেয়ালের সঙ্গে করিবে। নামাযের মধ্যে যখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলিয়া দাঁড়াও তখন চিন্তা করিয়া খেয়াল করিয়া দাঁড়াইবে যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখিতেছেন, আমি আল্লাহ্‌র সামনে ভক্তিভরে নতশিরে তাঁহার দাসত্বের জন্য দণ্ডায়মান হইতেছি। তারপর যখন سُبْحَانَكَ পড় তখন যদি অর্থ বুঝ, তবে ত প্রত্যেক লফ্‌যে অর্থের দিকেও খেয়াল রাখিবে, নতুবা শুধু লফ্‌যের দিকেই খেয়াল রাখিবে যে, আমি سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ পড়িতেছি, আমি وَبِحَمْدِكَ পড়িতেছি, এই আমি وَتَبَارَكَ اسْمُكَ পড়িতেছি, (যেমন প্রত্যেকটি লফ্‌য আমি অন্তরের আন্তরিক ভক্তির সহিত মুখে উচ্চারণ করিয়া মহান আল্লাহ্‌র সামনে নযরানা স্বরূপ পেশ করিতেছি। যদি আন্তরিক ভক্তির সহিত পেশ না করি, অমনোযোগিতার সহিত পড়ি তবে তিনি ভীষণ রাগ হইবেন, আর ভক্তি ও মনোযোগ দেখিলে তিনি মহা সন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ প্রত্যেক লফ্‌যের জন্য পৃথক ও নূতনভাবে খেয়াল করিয়া লইবে। তারপর যখন আলহামদু সূরা পড়, তাহাতেও এইরূপ প্রত্যেক লফ্‌যের দিকে পৃথক ও নূতনভাবে খেয়াল করিয়া পড়িবে। তারপর যখন অন্য কোন সূরা পড়িবে সে সূরাও এইরূপভাবে পড়িবে। তারপর যখন রুকূতে যাইবে তখন খেয়াল করিবে যে, আমি আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করিয়া আল্লাহ্‌র সামনে দাসত্ব প্রকাশ করিতেছি, ভক্তির পরিচয় দিতেছি। তারপর যখন سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ পড়িবে, তখনও উপরোক্তরূপে খেয়াল রাখিয়া পড়িবে। মোট কথা, নামাযের যে শব্দ মুখ হইতে বাহির করিবে, খেয়ালও ঐ দিকে রাখিবে। যখন সজ্‌দায় যাইবে তখন খেয়াল করিবে যে, আমি আল্লাহ্‌র সামনে মাথা মাটিতে রাখিয়া আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটা করিতেছি। এইরূপে শেষ পর্যন্ত এইরূপ খেয়ালের সঙ্গে নামায শেষ করিবে। শুধু গড়গড় করিয়া মুখস্থ পড়িয়া যাইবে না। যদি কোন সময় খেয়াল একটু এদিক-ওদিক চলিয়া যায়, তবে পুনরায় জোর করিয়া দেলকে টানিয়া আনিবে এবং নূতন ভাবে খেয়াল জমাইতে থাকিবে। এইরূপে কিছু দিন অভ্যাস করিলে পরে আর দেল তত এদিক-ওদিক যাইবে না।

এইরূপে সহজেই হুযূরে ক্বাল্‌বের মর্তবা হাছিল হইবে। অনবরত এইরূপ করিতে পারিলে দেখিবে যে, নামাযের মত মজার জিনিস আর নাই।

মুরীদ হওয়ার ফায়েদার কথা

(প্রত্যেক মুসলমানেরই খাঁটি নায়েবে রাসূল পীর তালাশ করিয়া তাঁহার কাছে মুরীদ হওয়ার দরকার।) মুরীদ হওয়ার মধ্যে অনেক ফায়েদা আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি ফায়েদা এখানে লিখিতেছি।

প্রথম ফায়েদা—উপরে যে ক্বালব ছাফ করার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পীরে কামেলের সংসর্গ ও সদুপদেশ ব্যতিরেকে নিজে নিজে শুধু কিতাব দেখিয়া হাছেল করা অতি দুষ্কর। নিজে

নিজে কিতাবের অর্থ বুঝিতে অনেক ভুল হয়। (তারপর আমল করিবার সময় অনেক ভুল হয়। অনেক সময় দুষ্ট নফ্‌সের সহিত সংগ্রাম করিয়া একা একা জয়লাভ করা যায় না। নফ্‌স দুষ্টামি করিয়া অনেক সময় ভুল অর্থ বুঝাইয়া বা অলসতা করিয়া এখন না তখন করিয়া টালবাহানা করে বা একটু কঠিন কাজ দেখিলেই কামচোরাপনা করিতে থাকে, বা যেখানে প্রশংসা সুখ্যাতি দেখে সেখানে ত কাজ করে, আর যেখানে এইসব দেখে না সেখানে কাজ করিতে চায় না।) পীরে কামেলের উপদেশে এবং সাহায্যে নফ্‌সের (এইসব) দুষ্টামি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ফায়েদা—পীরে কামেলের সংসর্গে থাকিলে ও তাঁহার মুখে শুনিলে যেমন তা'ছীর হয়, কিতাব পড়াতে তেমন তাছীর হয় না। কারণ কামেল লোকের নূরানী ক্বাল্‌বেরও তা'ছীর পড়ে, তাঁহার দো'আরও বরকত লাভ হয়। এই ভয়ও আছে যে, যদি কোন নেক কাজে অবহেলা করে বা কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলে, তবে পীর ছাহেব অসন্তুষ্ট হইবেন, তাঁহার নিকট শরমেন্দা হইতে হইবে।

তৃতীয় ফায়েদা—কামেল পীরের সংসর্গে থাকিলে তাঁহার সঙ্গে খুব মহব্বত ও ভক্তি পয়দা হয়। কাজেই তাঁহার প্রত্যেক কাজেই অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে আপনা হইতে মন চায়।

চতুর্থ ফায়েদা—পীর ছাহেব কোন নছীহতের কথা বাতাইবার সময় কটুকথা বলিলে বা তিরস্কার করিলেও তাহা খারাপ লাগে না; কাজেই নছীহতের উপর আমল করিবার জন্য আরও বেশী চেষ্টা করে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অনেক ফায়েদা আছে। আল্লাহ্ পাক যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহারই ফায়েদা হাছেল হয়, এবং হাছেল হওয়ার পরই তাহা অনুভব করিতে পারে। (এবং এত ফায়েদা দেখে যে, নিজের জীবন পর্যন্ত পীরের পায়ে কোরবান করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। মোট কথা, যার উছিলায় আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়, সে যে কতখানি প্রাণাধিক-প্রিয় হয়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।)

পীরে-কামেলের শর্ত

যখন কোন পীরের কাছে মুরীদ হইতে ইচ্ছা কর, তখন সেই পীরের মধ্যে এই শর্তগুলি পাওয়া যায় কি না খুব ভাল ভাবে তাহকীক করিয়া লইবে। যদি শর্তগুলি না পাওয়া যায়, তবে মুরীদ হইও না। (উপযুক্ত পীর না হইলে আলেমের কাছে শুনিয়া শুনিয়া শরীঅতের হুকুমগুলি পালন করিতে থাকিবে। এইভাবে সারা-জীবন তালাশ করা সত্ত্বেও উপযুক্ত পীর না পাওয়ার কারণে মুরীদ না হইতে পারিলে কোন গোনাহ্ হইবে না! কিন্তু তালাশ করিতে থাকিবে।)

পীরে কামেলের **প্রথম শর্তঃ** শরীঅতের মাসআলাসমূহ পীরের অবগত হওয়া দরকার। শরীঅত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ না হওয়া চাই।

দ্বিতীয় শর্তঃ তাঁহার মধ্যে শরার বরখেলাফ আকীদা বা আমল না থাকা চাই। এই কিতাবে যে সমস্ত আকায়েদ এবং আমলের কথা লেখা হইয়াছে এবং সুন্নত তরীকা অনুসারে ক্বল্‌ব ছাফ করার যে তরীকা বাতান হইয়াছে, পীর সেগুলির অনুযায়ী হওয়া চাই।

তৃতীয় শর্তঃ যিনি (খাঁটি পীর হইবেন তিনি) অর্থ উপার্জনের জন্য মুরীদ করেন না। (অর্থাৎ পীরী-মুরীদীকে তিনি দুনিয়ার ব্যবসা স্বরূপ করিবেন না, খালেছ নিয়তে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে লোকদিগকে আল্লাহ্‌র রাস্তা বাতাইবেন, আল্লাহ্‌র দিকে ডাকিবেন, আল্লাহ্‌র দ্বীন জারি করিবেন।)

চতুর্থ শর্তঃ পীর ছাহেবের এমন কোন কামেল পীরের নিকট মুরীদ হওয়া চাই (তাঁহার ছোহ্‌বতে থাকিয়া নফ্‌সের এছ্‌লাহ্‌ করান চাই এবং তরীকত শিক্ষা করা চাই) যাঁহাকে সমসাময়িক আলেমগণ এবং দ্বীনদার জ্ঞানী লোকগণ কামেল পীর বলিয়া মনে করেন।

পঞ্চম শর্তঃ এই পীর ছাহেবকেও (আকায়েদ, আমল, আখলাখ এবং জীবন যাত্রার ধারা সুন্নতের মোয়াফেক হওয়া চাই; তা-ছাড়া) সমসাময়িক দ্বীনদার আলেমগণও যেন ভাল বলেন।

ষষ্ঠ শর্তঃ পীর ছাহেবের তালীম-তলক্কীনের মধ্যে এমন আছর দেখা যাওয়া চাই যে, যাহাতে লোকের মধ্যে দ্বীনের মহব্বত এবং আখেরাতের শওক পয়দা হয়। (দুনিয়ার রং-তামাশা, নাম-নকশা, জাঁকজমক, অর্থলিপ্সা এবং শান-শওকতের আকাঙ্ক্ষা কম হইতে থাকে।) পীরের মুরীদানদের অবস্থা দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। দশজন মুরীদের মধ্যে যদি ৫/৬ জনের অবস্থা এইরূপ দুরুস্ত হয়, তবেই বুঝিবে যে, তিনি খাঁটি পীর। দুই একজনের অবস্থা যদি দুরুস্ত না হয়, তাহাতে পীরের উপর সন্দেহ করিবে না। (তাহা মুরীদেরই চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি বুঝিতে হইবে।) বুযুর্গদের ছোহ্‌বতে বসিলে যে ফয়েয ও বরকত হাছেলের কথা বলা হয়, ইহাই সেই ফয়েয ও বরকত। নতুবা, সে মুখ দিয়া যাহা বলিয়া দেয় তাই হইয়া যায়। একটু ফুঁক দিয়া দিলেই রোগ সারিয়া যায়, যে কাজের জন্য যে তাবীয দেয় সে কাজ সফল হইয়া যায়, তাহার তাওয়াজ্জুহ দেওয়াতে লোক একেবারে বেহুশ হইয়া যায়, তাহার ফয়েযের চোটে লোকে লাফালাফি বা ছট্‌ফট করিতে থাকে; এইরূপ তাছীর যাদুকরেরাও করিতে পারে। কাজেই কোন লোকের মধ্যে যদি এই সব তাছীর দেখ, তবে তাহাতে ধোঁকা খাইও না। (আসল জিনিস শরীঅত এবং সুন্নতের পায়রবী, ভিতরে বাহিরে তাহাই দেখিবে।)

সপ্তম শর্তঃ ঐ পীর ছাহেব এমন হওয়া দরকার যে, সকলকেই যেন তিনি নছীহত করেন এবং দ্বীনের কথা বাতান; খারাপ কাজ করিতে দেখিলে বা শুনিলে যেন নিষেধ করেন এবং শরীঅতের হুকুমগুলি পালন করিতে আদেশ করেন। কাহারও সম্পত্তি বা সম্মানের চাপে বা লোভে পড়িয়া যেন তিনি শরীঅতের হুকুম বাতাইতে ত্রুটি না করেন।

এই শর্তসমূহ যে পীরের মধ্যে পাওয়া যাইবে, দ্বীনকে দুরুস্ত করার জন্য খাঁটি নিয়তে তাঁহার কাছে মুরীদ হইবে (এবং রীতিমত তাঁহার কাছে যাতায়াত করিয়া, তাঁহার ছোহ্‌বতে বসিয়া, তাঁহার আদেশ উপদেশ পালন করিয়া, নিজের নফ্‌সের এছ্‌লাহ্‌ এবং দ্বীনের উন্নতি করিবে, তাহাতে ত্রুটি করিবে না)। মেয়ে-লোকের মুরীদ হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, যদি অবিবাহিতা হয়, তবে মা-বাপের এজাযত লইবে; বিবাহিতা হইলে স্বামীর এজাযত লইবে। যদি কোন কারণবশতঃ তাঁহারা এজাযত না দেন, তবে তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে মুরীদ হইবে না। কারণ, মুরীদ হওয়া ফরয নয়, শরীঅতের পায়রবী করা ফরয। মুরীদ না হইয়াও যদি শরীঅতের পায়রবী রীতিমত করিতে থাকে এবং সুন্নতের পায়রবী করিতে থাকে, তবে তাহাতে গোনাহ্‌গার হইবে না। কাজেই মা-বাপের বা স্বামীর হুকুম অমান্য করিয়া মুরীদ হইবে না, শরীঅতের পায়রবী এবং সুন্নতের পায়রবী করিতে থাকিবে (যখন তাঁহারা অনুমতি দেন তখন মুরীদ হইবে)।

পীরী-মুরীদী সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ

১। উপদেশঃ পীরকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিবে। নফ্‌সের এছ্‌লাহ সম্বন্ধে তিনি যে আদেশ-উপদেশ দিবেন তাহা কিছুতেই অমান্য করিবে না, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহা পালন

করিবে। আল্লাহ্‌র যেকের নিজের পীরের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া লইবে। নিজের নফ্‌সের এছ্‌লাহের জন্য নিজের পীরকে সবচেয়ে বড় মনে করিবে। (কিন্তু অন্যান্য বুযুর্গদের বা তাঁহাদের মুরীদদের মন্দ জানিবে না বা মন্দ বলিবে না।)

২। **উপদেশঃ** নফ্‌সের এছ্‌লাহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি পীর ছাহেবের এন্তেকাল হইয়া যায়, তবে উপরোক্ত শর্ত অনুসারে অন্য কোন কামেল পীরের আশ্রয় লইয়া তাঁহার নিকট তা'লীম হাছিল করিবে। (যদি উপরোক্ত শর্তসমূহ না থাকে, তবে শুধু পীরের ছেলে বা জামাই বা পীরের ভাই বলিয়া তাহাকে পীর বানাইবে না। আসল জিনিস হইল পীরের মধ্যে উপরোক্ত শর্তসমূহ ও গুণগুলি থাকা। ঐ গুণগুলি ব্যতীত পীরের ছেলে হইলেও তাহাকে পীর বলা যাইবে না।

৩। **উপদেশঃ** তাছাওওফের কোন কিতাবে কোন ওযীফা দেখিলে বা কোন আলেমের মুখে কোন ওযীফার কথা শুনিলে, তাহা নিজের পীরের কাছে বলিবে। তিনি যদি এজাযত দেন, তবে আমল করিবে, নতুবা করিবে না। এইরূপে দেলের কোন কথা বা কোন এরাদা নিজের পীরের নিকট গোপন করিবে না, যাহাকিছু দেলের অবস্থা হয়—ভাল বা মন্দ পীরকে জানাইবে এবং যাহাকিছু ইচ্ছা বা এরাদা হয় তাহাও পীরের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। (জিজ্ঞাসা করার পর তিনি যেরূপ বলেন সেইরূপ করিবে। কোন কথাই গোপন করিবে না এবং কোন কথাই অমান্য করিবে না।)

৪। **উপদেশঃ** মেয়েলোক নিজের পীরকেও দেখা দিবে না এবং মুরীদ হইবার সময় পীরের হাতে হাত দিবে না, পর্দার আড়ালে থাকিয়া রুমাল, পাগড়ী বা চাদর ধরিয়া অথবা শুধু মৌখিক অঙ্গীকার করিয়া মুরীদ হইবে। শুধু মৌখিক অঙ্গীকার করিয়া মুরীদ হইলে তাহাও দুরুস্ত আছে।

৫। **উপদেশঃ** যদি কেহ কোন শরার খেলাফ পীরের কাছে মুরীদ হইয়া বসে, অথবা পীর আগে ভাল ছিল পরে বিগড়াইয়া যায়, তবে ঐ পীরকে ছাড়িয়া দিয়া অন্য কোন ভাল পীরের কাছে মুরীদ হইতে হইবে। যদি কচিৎ কোন কাজ শরীঅতের খেলাফ হইয়া পড়ে এবং সতর্ক করার পর অথবা নিজেই সতর্ক হইয়া যখন তখন তওবা করিয়া লয়, তবে সে কারণে আকীদা খারাব করিবে না। কারণ, পীরও ত মানুষ, তাঁহারও ভুল-চুক হইতে পারে। কাজেই সামান্য সামান্য কারণে দেল খারাব করিবে না। অবশ্য যদি শরার বরখেলাফ বা সুন্নতের খেলাফ কাজের উপর জিদ করিয়া জমিয়া থাকে, তবে সে পীরের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করিবে।

৬। **উপদেশঃ** আমাদের সব সময়কার সব অবস্থা (মনের কথা দেলের ভেদ) পীর জানিতে পারে এইরূপ ধারণা রাখা (শেরেকী) গোনাহ্‌।

৭। **উপদেশঃ** কোন কোন ফকিরী বা মা'রফতির দাবীদার লোক অনেক সময় অনেক কথা শরার বরখেলাফ বলিয়া থাকে বা কিতাবে লিখিয়া থাকে। খবরদার! ঐ সব লোকের কাছেও যাইবে না বা ঐ সব কিতাবও দেখিবে না। অনেক কবি বা শায়েরও কবিতায় বা শায়েরীর মধ্যে কোন কোন কথা শরার বরখেলাফ বলিয়া ফেলে। তাহাদের কবিতা বা পুঁথি কখনও পড়িবে না।

৮। **উপদেশঃ** কোন কোন বেদআতী ফকীর মা'রফতির দাবী করে এবং বলিয়া থাকে যে, (মৌলবীরা মা'রফতির ভেদের কথা কি জানে?) শরীঅতের রাস্তা ভিন্ন তরীকতের (মা'রফতের) রাস্তা ভিন্ন। এইরকম কথা যে বলে তাহাকে মিথ্যুক এবং ধোঁকাবাজ মনে করা ফরয এবং তাহার সংসর্গে কখনও যাইবে না (ক্ষমতা থাকিলে তাহাদিগকে শাসন করাও দরকার)।

৯। **উপদেশঃ** পীর যদি শরীঅতের খেলাফ বা সুন্নতের খেলাফ কোন কিছু বাতায়, তবে তাহার উপদেশ মত আমল করা জায়েয নহে, আর পীর যদি ঐ খেলাফে শরা কাজ করার উপর (আলেমদের সতর্ক করা সত্ত্বেও) হঠ করিতে থাকে, তবে সে পীরের উপযুক্ত নয়; তাহাকে মানিবে না।

১০। **উপদেশঃ** আল্লাহ্‌র যেকেরের বরকতে যদি দেলের মধ্যে কোন ভাল হালাত পয়দা হয় বা ভাল খোয়াব নজরে আসে বা জাগ্রত অবস্থায় কোন গায়েবী আওয়াজ শুনা যায় বা কোন আলো বা নূর দেখা যায়, তবে সেইসব কথা নিজের পীর ব্যতীত অন্য কাহারও কাছে বলিবে না।

এইরূপে নিজের ওযীফার কথা বা নিজের বন্দেগী (—এশরাক, তাহাজ্জুদ, বার-তসবীহ্ যেকের) ইত্যাদির কথাও নিজের পীর ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট বলা উচিত নয়। কারণ তাহাতে বরকত নষ্ট হইয়া যায়।

১১। **উপদেশঃ** পীর কোন ওযীফা বা যেকের বাতাইলে তাহাতে যদি কিছুকাল পর্যন্ত কোন ফায়েদা বা তাছীর অনুভব না হয়, তবে সে কারণে পীরের উপর আকীদা নষ্ট করিবে না। কেননা, সবচেয়ে বড় ফায়েদা এই যে, আল্লাহ্‌র নাম লওয়ার এরাদা দেলের মধ্যে পয়দা হইতে থাকে এবং এই নেক কাম করার তৌফীক আল্লাহ্ তা'আলা দান করিয়াছেন, (এইরূপ খেয়াল কখনও দেলে পোষণ করিবে না যে, ভাল ভাল খোয়াব কেন দেখি না, রাসূলুল্লাহ্‌র বা বুযুর্গানে দ্বীনের যেয়ারত খোয়াবের মধ্যে কেন হয় না, গায়েবের খবর কেন জানিতে পারি না, কাশফ কেন হয় না, কারামত কেন যাহের হয় না, খুব কান্না কেন আসে না, এবাদতের মধ্যে একেবারে বেহুস কেন হইয়া যাই না, অছঅছা আমার একেবারে বন্ধ কেন হইয়া যায় না।) কেননা, এইসব জিনিস (কাহারও হয় না, আবার একই লোকেরও) কখনও হয়, কখনও হয় না। কাজেই যদি কাহারও হয়, তবে তাহার (ফখর করা চাই না) আল্লাহ্‌র শোক্‌র করা চাই, আর যাহার মোটেই না হয় বা হইয়া বন্ধ হইয়া যায় বা বেশী হইয়া পরে কম হইয়া যায়, তাহার এই কারণে পেরেশান হওয়া ও আফসোস করা চাই না। অবশ্য যদি খোদা না করুন সুন্নতের পায়রবী বা শরার পাবন্দির মধ্যে ত্রুটি হয় বা আলস্য করে বা গোনাহ্‌র কাজ হয়, তবে তাহা আক্ষেপ এবং পেরেশানির বিষয় বটে। যদি কখনও খোদা নাখাস্তা এইরূপ অবস্থা হয়, তবে অতি সত্বর হিম্মত করিয়া নফ্‌সের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তওবা এস্তেগ্‌ফার করিয়া হালাত দুরুস্ত করিয়া লওয়া দরকার এবং পীরকে জানাইবে, পীর ছাহেব যেরূপ বাতান তদনুযায়ী আমল করা দরকার।

১২। **উপদেশঃ** (নিজের পীরকে ভাল এবং বড় জানিবে একথা সত্য, কিন্তু খবরদার!) অন্যান্য পীর ছাহেবের বা অন্যান্য তরীকাকে কখনও মন্দ জানিবে না, বা অন্য কোন পীরের বা অন্য কোন তরীকার মুরীদানের সঙ্গে এরূপ আলাপ-আলোচনা করিবে না যে, তোমাদের পীরের চেয়ে আমাদের পীর ভাল বা তোমাদের তরীকার চেয়ে আমাদের তরীকা ভাল; এইসব বেহুদা কথায় দেল অন্ধকার হইয়া যায়। (খবরদার! এমন কথা কখনও জবানে আনিবে না; নিজের পীরের বা নিজের তরীকার প্রশংসা ত করা উচিত, কিন্তু প্রশংসা এমন হওয়া চাই না যাহাতে অন্যের প্রতি কটাক্ষ বা দোষারোপ হয়।)

১৩। **উপদেশঃ** (পীর-ভাইদের সঙ্গে গাঢ় মহব্বত রাখা দরকার।) যদি কোন পীর ভাইয়ের তরক্কী বেশী দেখা যায় বা পীরের তাওয়াজ্জুহ (নেক দৃষ্টি) কাহারও দিকে বেশী দেখা যায় তবে খবরদার! সেজন্য মনে কোন গ্লানি আনিবে না বা হিংসা করিবে না। (বরং এই মনে করিবে যে,

সে কাজে ভাল করিতেছে বলিয়াই ফল বেশী পাইতেছে; আমার এইরূপ ঐকান্তিক চেষ্টার সহিত কাজ ভাল করা দরকার)।

নিম্নের উপদেশগুলি হামেশা পালন করিবে

১। আবশ্যক পরিমাণ এলমে-দ্বীন প্রত্যেকেরই হাছেল করা দরকার, তাহা কিতাব পড়িয়া হাছেল করুক বা (আলেমদের ছোহ্‌বতে থাকিয়া) জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া হাছেল করুক—(অনবরত ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধি করা দরকার।)

২। সমস্ত গোনাহ্‌ হইতে বাঁচিয়া থাকা দরকার।

৩। যদি কোন সময় কোন গোনাহ্‌র কাজ হইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ তওবা করিবে।

৪। কাহারও কোন হক নষ্ট করিবে না। শরীকী অংশ বা দেনা রাখিবে না।) কাহাকেও কোন কথা বা কোন ব্যবহারে মনে কষ্ট দিবে না। কাহারও নিন্দাবাদ বা গীবত-শেকায়েত করিবে না।

৫। অর্থ-লোভ ও নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা রাখিবে না। (বিলাসিতা ও অলসতা বর্জন করিবে, কাজ করিতে আলস্য বা লজ্জাবোধ করিবে না।) ভাল খাওয়া-পরা, ভাল আসবাবপত্র যোগাড় করার চিন্তায় পড়িবে না।

৬। যদি কোন কথায় বা কাজে ভুল হইয়া যায় এবং পরে (নিজের ভুল বুঝে আসে বা) অন্য কেহ ভুল ধরিয়া দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ ভুল স্বীকার করিয়া লইবে এবং ক্ষমা চাহিবে ও তওবা করিবে।

৭। বিনা জরুরতে সফর (বিদেশ ভ্রমণ) করিবে না, (জরুরত—যেমন তেজারতের জরুরত, তলবে এলমির জরুরত, হজ্জের জরুরত, জেহাদ বা তবলীগের জরুরত ইত্যাদি।) কারণ, সফরের মধ্যে সব কাজ ঠিকমত করা যায় না; অনেক নেক কাজ ছুটিয়া যায় এবং ওযীফা ছুটিয়া যায়। (আজকাল সফরের মধ্যে চক্ষু বাঁচাইয়া রাখার এবং পর্দার হেফাযতের খাছ করিয়া ব্যবস্থা করা দরকার। অনেক সময় অনেক ফাহেশা কথা বেহুদা লোকেরা লিখিয়া রাখে বা ফাহেশা ছবি লটকাইয়া রাখে, সে সব হইতে চক্ষুকে এবং মনকে বাঁচাইয়া রাখা একান্ত দরকার।)

৮। বেশী হাসিবে না, বেশী কথা বলিবে না; বিশেষতঃ মেয়েলোকেরা গায়ের মাহ্‌রাম লোকের সঙ্গে হাসি-চাতুরি ত করিবেই না, জরুরী কথা ছাড়া অতিরিক্ত বাজে কথাও বলিবে না।

৯। কাহারও সহিত ঝগড়া-কলহ বা তর্কবিতর্ক করিবে না।

১০। প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক কথায় শরীঅতের পাবন্দি এবং সুন্নতের পায়রবির খেয়াল রাখিবে।

১১। (নামায, রোযা এবং অন্যান্য) এবাদতের মধ্যে কখনও অলস্য (বা অবহেলা) করিবে না।

১২। (বিনা জরুরতে লোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিবে না। জরুরত মত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আবার নিজের কাজে লিপ্ত হইবে।) অধিকাংশ সময় নির্জনে থাকিবে। (একাকী খোদার ধ্যানে থাকাকেই বেশী ভালবাসিবে। অন্ততঃ দৈনিক কিছু সময় একাকী নির্জনে বসিয়া খোদার ধ্যান এবং খোদার যেকেরের জন্য অবশ্যই নির্ধারিত করিয়া রাখিবে)।

১৩। যখন অন্য লোকের সঙ্গে মিলিয়া থাকার বা চলার দরকার পড়ে, তখন সকলের সামনেই নিজকে ছোট মনে করিয়া নম্রভাবে সকলের খেদমত করিবে। নিজেকে অন্যের চেয়ে

বড় বানাইয়া রাখিবে না (বা অন্যের দ্বারা খেদমত পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিবে না; বরং অন্য সকলেরই খেদমত করিবার চেষ্টা করিবে)।

১৪। বড় লোকদের সঙ্গে মেলামেশা কম করিবে (গরীবদের সঙ্গে মিল-মহব্বত বেশী রাখিবে)।

১৫। যে লোক দ্বীনের খেলাফ চলে, (বিশেষতঃ ধর্মের বিরুদ্ধে যে লোক কোন কথা বলে,) তাহা হইতে দূরে থাকিবে।

১৬। পরের দোষ দেখিবে না, নিজের দোষ দেখিবে এবং নিজের দোষ ধরিয়া তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে। কাহারও উপর বদগোমানী করিবে না; অর্থাৎ কাহারও প্রতি খারাব ধারণা করিবে না।

১৭। নামায মোস্তাহাব ওয়াক্তে নিয়মিত পাবন্দির সহিত আন্তরিক ভক্তি ও মনোযোগের সঙ্গে পড়িবে। (মেয়েলোকেরা প্রত্যেক নামায আউয়াল ওয়াক্তে ঘরের আন্দর কুঠরিতে পড়িবে এবং পুরুষেরা জমা'আতে হাযির হইয়া পাঞ্জেগানা নামায রীতিমত আদায় করিবে।)

১৮। আল্লাহ্‌র যেকের হইতে এক মুহূর্তও গাফেল থাকিবে না; যদি সব সময় দেলকে হাযির রাখিতে না পার, তবুও জবানী যেকের সব সময় জারি রাখিবে।

১৯। আল্লাহ্‌র যেকেরে যদি স্বাদ পাওয়া যায়, দেল সন্তুষ্ট হয়, তবে আল্লাহ্‌র শুক্‌র আদায় করিবে। (নামাযে মজা না লাগিলে ঘাবড়াইয়া ছাড়িয়া দিবে না।)

২০। মিষ্ট ভাষায় নম্রভাবে নরম কথা বলিবে (কর্কশ ভাষা বা কটু কথা বলিবে না।)

২১। প্রত্যেক কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিবে। সেই নিয়ম মত সময়ের সদ্ব্যবহার করিবে। (অনিয়ম বা সময় নষ্ট করিবে না।)

২২। যদি কোন বিপদ-আপদ আসে, (রোগ-পীড়া আসে, বা শত্রুরা শত্রুতা করে বা কাজ কারবারে নোকছান হইয়া যায়, বা অভাব-অভিযোগ আসিয়া পড়ে বা বাজে কথা উঠে) অস্থির হইবে না, ঘাবড়াইবে না। সবই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে এবং মনে করিবে যে, ইহাতে আমি সওয়াব পাইব। (আল্লাহ্‌কে আরও বেশী ভালবাসিবে। খবরদার! যেন আল্লাহ্‌র উপর কোন প্রতিবাদ দেলে না আসে। মনে করিবে যে, এই সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলে অনেক সওয়াব মিলিবে এবং দর্জা বুলন্দ হইবে। খবরদার! এ কখনও মনে করিবে না যে, আমি ত আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলিতে চাই, অথচ এসব বাধা কেন আসে; এইরূপ চিন্তা করা বড়ই খারাপ। মনে রাখিবে, বাধা-বিঘ্নের দ্বারাই ত আল্লাহ্‌র রাস্তা মধুর এবং মূল্যবান হয়।)

২৩। (যাহা দুনিয়ার জরুরী কাজ তাহা ত নিশ্চয়ই করিবে, তাহাতে আলস্য বা অবহেলা করিবে না, কিন্তু) সব সময় দুনিয়ার চর্চা, দুনিয়ার আলোচনা করিবে না, অধিকাংশ সময় দেল আল্লাহ্‌র দিকে রুজু রাখিবে। এমন কি, কাজ করিবার সময় যাতে দেল গাফেল না হয় সেজন্য চেষ্টা করিবে।

২৪। লোকের উপকার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে—তাহা দ্বীনের উপকার হউক বা দুনিয়ার উপকার হউক (বা তাহারা আপন হউক বা পর হউক, মিত্র হউক বা শত্রু হউক,) প্রত্যেকেরই উপকার করিতে চেষ্টা করিবে।)

২৫। খাওয়া-পিয়া এত কম করিবে না যে, শরীর দুর্বল বা স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়। আবার এত বেশী খাইবে না, যাহাতে (লোভ রিপু বর্ধিত হয় বা) শরীরে অলসতা আসিয়া যায়। (ক্ষুধা লাগিলে খাইবে, বিনা ক্ষুধায় খাইতে বসিবে না এবং কিছু ক্ষুধা বাকী রাখিয়া খাওয়া শেষ করিবে।)

২৬। এক খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কিছু আশা রাখিবে না। এ খেয়াল করিবে না যে, অমুকে আমার সাহায্য করিয়া দিবে, অমুকে আমার সেবা-শুশ্রূষা করিবে। (নজর কখনও মানুষের উপর রাখিবে না। নজর একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর রাখিবে।

২৭। হামেশা খোদার তালাশে বে-কারার থাকিবে। (খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় কখনও ক্ষান্ত হইয়া বা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না।)

২৮। অতি সামান্য নেয়ামত হইলেও তাহার শুক্‌র আদায় করিবে। (এইরূপে কোন লোক সামান্য কোন উপকার করিলেও আজীবন তাহা স্মরণ রাখিবে এবং সেজন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।) অভাব-অভিযোগ আসিলে তাহাতে মনে কষ্ট আনিবে না। (তাহা হ্রাস করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু ফলবতী না হইলে সেজন্য চেষ্টা ছাড়িবে না বা ঘাবড়াইবে না। যদি কেহ তোমার কোন ক্ষতি করে বা তোমাকে কোন কষ্ট দেয়, তবে তুমি মনে কোন দুঃখ রাখিও না।)

২৯। তোমার অধীনে যাহারা কাজ করে, তাহাদের ভুল-ত্রুটি (অধিকাংশ) মাফ করিয়া দিবে। (তাহাদের প্রতি দয়া ও স্নেহ দেখাইবে।)

৩০। কাহারও কোন আয়েব দেখিলে তাহা ঢাকিয়া রাখিবে। (অন্যের কাছে প্রকাশ করিবে না। যদি পার—গোপনে খায়ের-খাহির সাথে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবে; নতুবা চুপ করিয়া মনের কথা মনেই হজম করিবে।) কিন্তু যদি জানিতে পার যে, কেহ হয়ত গোপনে অন্য কাহারও কোন ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেছে, তবে যাহার ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেছে, গোপনে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।

৩১। মেহমান, মোছাফির ও গরীব-দুঃখী এবং আলেম, (তালেব-এল্‌ম,) পীর-বুযুর্গগণের খেদমত করিবে। (পুরুষেরা ত সব রকমের খেদমতই করিতে পারে; মেয়েলোকেরা আর্থিক খেদমত করিতে বা ভাত-পথ্য পাকাইয়া দিতে পারে বা পর্দায় থাকিয়া কাপড় ধুইয়া দিতে পারে বা কোন বৃদ্ধা মেয়েলোক বা না-বালেগ হইলে রোগীর সেবা-শুশ্রূষাও করিতে পারে। এইসব খেদমতে অনেক ছওয়াব পাওয়া যায় এবং অনেক মর্তবা পাওয়া যায়।)

৩২। (কুসংসর্গ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে,) সৎসংসর্গ অবলম্বন করিবে।

৩৩। খোদার ভয় সদাসর্বদা অন্তঃকরণে জাগরিত রাখিবে।

৩৪। মৃত্যুকে স্মরণ করিবে।

৩৫। প্রত্যহ কিছু সময় নির্দিষ্ট করিয়া নির্জনে বসিয়া সমস্ত দিনের হিসাব নিজের নফ্‌সের নিকট হইতে লইবে। যে সব নেক কাজ দেখিবে তাহার জন্য আল্লাহ্‌র শুক্‌র করিবে, এবং যে সব অন্যায়-ত্রুটি বা গোনাহ্‌র কাজ দেখিবে, সে জন্য নফ্‌সকে তাম্বীহ্ করিবে এবং খোদার কাছে লজ্জিত হইয়া তওবা এস্তেগ্‌ফার করিবে।

৩৬। কখনও মিথ্যা বলিবে না। (সদা সত্য কথা বলিবে।)

৩৭। খেলাফে-শরা মাহ্‌ফিলে কখনও যাইবে না।

৩৮। হায়া-শরম রাখিয়া চলিবে, (দয়া-মায়া রাখিবে, পাতলামী করিবে না,) গম্ভীর ও চিন্তাশীল হইয়া থাকিবে (প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধেই চিন্তা করিয়া তাহা হইতে কিছু নছীহত হাছেল করিতে চেষ্টা করিবে।)

৩৯। (নিজের তাক্ওয়া-পরহেযগারী বা এল্ম লিয়াকত বা রূপ-গুণের কারণে) কখনও ফখর বা গরুরী করিবে না যে, আমি এই সব গুণের অধিকারী। (এই মনে করিবে যে, এই সব আল্লাহ্র দান; আমি নালায়েককে তিনি দয়া করিয়া দান করিয়াছেন। আমি যদি ফখর করি বা নিজস্ব বলিয়া দাবী করি, তবে তিঁনি ইচ্ছা করিলে যে কোন মুহূর্তে এসব ছিনাইয়া লইয়া যাইতে পারে; অতএব, আমার আরও অধিক নম্র এবং দয়ালু হওয়া দরকার।)

৪০। হামেশা আল্লাহ্র কাছে কাকুতি-মিনতি করিয়া দো'আ চাহিতে থাকিবে যে, আয় আল্লাহ্! যতদিন দুনিয়াতে রাখ ততদিন হক রাস্তার উপর, দ্বীনের রাস্তার উপর, রাসূলের তরীকার উপর কায়েম রাখিও (এবং যখন মৃত্যু দাও ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দিও)।

কতকগুলি হাদীস

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ-নিঃসৃত পবিত্র বাণী শুনিলে প্রত্যেক মুসলমানেরই মন গলিয়া যায় এবং মন গলিয়া যাওয়া উচিত। এই কারণে নেক কাজের ছওয়াবের কথা এবং বদ কাজের আযাবের কথা হাদীস শরীফ হইতে উল্লেখ করা হইতেছে।

নিয়ত খালেছ করা

১। **হাদীসঃ** এক ব্যক্তি উচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঈমান কি বস্তু? হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ নিয়ত খালেছ রাখ। খালেছ নিয়তে নেক কাজ করাই ঈমানের রূহ্ (প্রাণ)। (অতএব, প্রত্যেক নেক কাজের শুরুতে চিন্তা করিয়া, দেলটাকে খুব খাঁটি এবং নিয়তকে খুব খালছ করিয়া লইবে।) খালেছ নিয়তের অর্থ, প্রত্যেক কাজই আল্লাহ্র ওয়াস্তে করিবে। (যে সব কাজে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, সেই সব কাজ অন্য কোন উদ্দেশ্যে না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা।)

২। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"নেক কাজের ছওয়াব শুধু নিয়তের বরকতেই হইয়া থাকে।" অর্থাৎ, নিয়ত খালেছ হইলে, তবেই নেক কাজের পূর্ণ ছওয়াব পাওয়া যায়, নচেৎ নহে।

রিয়াকারী বর্জন

(যে কোন কাজ করিবে, খালেছ নিয়তে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করিবে, নামের জন্য বা লোকের নিকট সম্মান বা প্রশংসা লাভের জন্য কোন কাজ করিবে না।)

৩। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে কেহ নামের জন্য কোন কাজ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে তাহার দোষ শুনাইবে এবং যে লোককে দেখাইবার জন্য কোন কাজ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে তাহার আয়েব দেখাইবেন।

৪। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, লোক দেখানের নিয়তে সামান্য কাজ করাও এক প্রকার শিরক।

কোরআন হাদীসের নির্দেশানুযায়ী চলা

৫। **হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِاَةِ شَهِيْدٍ ○

অর্থাৎ, "আমার উম্মতের মধ্যে যখন ধর্মের অবনতি শুরু হইবে, তখন যে ব্যক্তি আমার সুন্নত তরীকাকে শক্ত করিয়া ধরিবে, সে একশত শহীদের ছওয়াব পাইবে।"

৬। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا اِذَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّتِىْ ○

অর্থাৎ, "আমি তোমাদের মধ্যে এমন দুটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, যদি সেই দুইটি জিনিসকে তোমরা শক্ত করিয়া আঁক্‌ড়িয়া থাক, তবে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব অর্থাৎ কোরআন-মজীদ, দ্বিতীয়টি আমার সুন্নত অর্থাৎ হাদীস শরীফ।"

নেককাজের পথ আবিষ্কার ও বদকাজের ভিত্তি স্থাপন

৭। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজের ভিত্তি স্থাপন করিবে, তারপর তার দেখাদেখি যত লোক ঐ সৎ কাজটি করিবে, সমস্তের ছওয়াবের সমষ্টির পরিমাণ ছওয়াব যে ব্যক্তি প্রথম পথ দেখাইয়াছে সেই ব্যক্তি পাইবে, কিন্তু তাহাদের ছওয়াব কম হইবে না এবং যে ব্যক্তি একটি বদ কাজের ভিত্তি স্থাপন করিবে, তাহার নিজের গোনাহ্ তো হইবেই, পরন্তু তারপর যত লোক ঐ বদ-কাজটি করিবে, সমস্তের সমষ্টির পরিমাণ গোনাহ্ (প্রথম যে পথ দেখাইয়াছে) তাহার হইবে, কিন্তু তাহাদের গোনাহ্ কম হইবে না।

উদাহরণ স্বরূপ যেমন—যদি কেহ নিজ সন্তানের বিবাহ-শাদীতে শরীঅত বিরোধী রছম রেওয়াজ ত্যাগ করে, (একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে বা মাদ্রাসার সাহায্য করে বা ধর্মপ্রচারের অর্থাৎ তাবলীগের তরীকা জারি করে) বা বিধবা বিবাহ প্রথা যেখানে নাই, সেখানে ঐ প্রথা জারি করে (বা মেয়েলোকেরা যে হিন্দুয়ানী পোশাক ধুতি-শাড়ী পরে, এই হিন্দুয়ানী পোশাক ছাড়িয়া সুন্নতী লেবাস কোর্তা, পায়জামা প্রথা জারি করে,) তবে পরে যত লোকে ঐ সব নেক কাজ করিবে, সকলের সমষ্টিতে যত ছওয়াব পাইবে, প্রথম ব্যক্তি সর্বদা তাহার সমান ছওয়াব পাইবে। (কিন্তু ঐ প্রথম ব্যক্তিকে পরের ঐ সব লোকের ছওয়াব কাটিয়া আনিয়া দেওয়া হইবে না, তাহাদের ছওয়াব ঠিকই থাকিবে; আল্লাহ্ পাক প্রথম ব্যক্তিকে নিজের তরফ হইতে পৃথকভাবে তত ছওয়াব দান করিবেন। এইরূপে যে ইসলামের পর্দা ভঙ্গ করিয়া এই পাপ-রীতি জারি করিয়াছে, পরে যত লোকে পর্দা ভঙ্গ করিবে সকলের সমান গোনাহ্ ঐ প্রমথ ব্যক্তির হইবে, বা গরীবদের উৎপীড়নের বা কর বাড়ানের বা কুশিক্ষা প্রচারের কাজ প্রথম যে করিয়াছে, পরে যতকাল ঐ প্রথা জারি থাকিবে সকলের সমান পাপ ঐ প্রথম ব্যক্তির হইবে। —অনুবাদক)

এল্‌মে দ্বীন বা ধর্ম-জ্ঞান শিক্ষা করা

৮। **হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ○

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র ভালবাসার আলামত এই যে, আল্লাহ্ যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে দ্বীনের সমঝ অর্থাৎ, ধর্মজ্ঞান দান করেন। অর্থাৎ সে শরয়ী মাসআলা অন্বেষণ করে এবং তৎপ্রতি তাহার আগ্রহ পয়দা হয়।

ধর্মের কথা গোপন করা

৯। **হাদীসঃ** যে ব্যক্তি ধর্মের কোন কথা জানে অথচ তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও (দরকার পড়া সত্ত্বেও) সে তাহা প্রকাশ করে না (বা শিক্ষা দেয় না), লুকাইয়া রাখে, তাহার মুখে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরান হইবে। ধর্মের বাণী যাহা জানা আছে তাহা শিক্ষা দিতে কখনও কার্পণ্য বা আলস্য করিবে না। (অবশ্য না জানিয়া আন্দাজিও বলা চাই না। জানিয়া না বলাতে যেমন পাপ, না জানিয়া আন্দাজি বলাতে তার চেয়ে শক্ত পাপ)।

মাসআলা জানিয়া আমল না করা

১০। **হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, এল্‌ম শিখিয়া যদি তদনুযায়ী আমল না করে, তবে সে এল্‌ম তাহার জন্য আযাবের কারণ হইবে। অতএব, খবদার! দেশাচার লোকাচারের খাতিরে বিবির খাতিরে , মা-বাপ, ভাই বেরাদারের খাতিরে, অথবা শয়তান বা নফ্‌সের ধোঁকায় পড়িয়া কখনও শরীঅতের হুকুম জানা সত্ত্বেও তাহার উল্টা কাজ করিবে না।

পেশাব হইতে সতর্ক থাকা

১১। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, (হে আমার উম্মতগণ! পেশাবের ছিঁটা এবং ফোঁটা হইতে খুব বেশী সতর্ক থাকিবে। কেননা, অধিকাংশ কবর আযাব পেশাবেরই কারণে হইয়া থাকে। (বসিয়া পেশাব করিবে, দাঁড়াইয়া পেশাব করিবে না। যাহাতে কাপড়ে বা শরীরে ছিঁটা না আসিতে পারে, সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিব। পেশাব করিয়া আসার পর যাহাতে পরে ফোঁটা না ঝরিতে পারে, তজ্জন্য কিছুক্ষণ বসিয়া দেরী করিবে। তারপর মেয়েলোকেরা শুধু পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে এবং পুরুষেরা ঢিলা কুলুখ লইয়া কিছুকাল পর্যন্ত টহলিবে, যাহাতে ফোঁটা আসা ভালরূপে বন্ধ হইয়া যায়, তারপর পানির দ্বারা ধুইবে। পুরুষেরা পেশাবের পর কুলুখ না লইলে ফোঁটা আসিয়া কাপড় ও শরীর নাপাক হইয়া নামায নষ্ট হইবার এবং কবর আযাব হইবার প্রবল আশঙ্কা আছে; কাজেই প্রত্যেক পুরুষই কুলুখ অবশ্যই লইবে, ইহাতে আলস্য বা অবহেলা করিবে না।)

ওযূ-গোসল ভাল করিয়া করা

১২। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, কষ্টের সময় ভালমত ওযূ করিলে গোনাহ্ ধুইয়া যায়। বিশেষতঃ যখন শীতের কারণে অথবা আলস্যের কারণে ওযূ (গোসল) করিতে কষ্ট বোধ হয়, তখন (একটি পশমও যাতে শুষ্ক না থাকে তদ্রূপ যত্নের সহিত পূর্ণরূপে ওযূ (গোসল) করাতে আরও অনেক ছগীরা গোনাহ্ মাফ হয়। (যাহার ছগীরা গোনাহ্ না থাকে, তাহার দর্জা বুলন্দ হয়।)

মেসওয়াক করা

১৩। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, মেসওয়াক করিয়া দাঁত মুখ পরিষ্কার করিয়া ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িলে, তাহা বিনা মেসওয়াকের সত্তর রাকা'আতের চেয়েও আফযাল হয়।

ওযূতে ভালরূপে পানি না পৌঁছান

১৪। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) একদিন দেখিলেন যে, কতক লোক ওযূ করিয়াছে, কিন্তু পায়ের গোড়ালির দিক কিছু শুক্‌না রহিয়া গিয়াছে, তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, পায়ের গোড়ালি শুষ্ক

থাকার দরুন দোযখের আযাব অতি ভীষণ হইবে। অতএব, হুঁশিয়ার! মেয়েলোকের হাতে আংটি থাকিলে নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার নীচে পানি পৌঁছাইবে। (গোছলের সময় কানে নাকে বালি, থাকিলে তাহার নীচে লক্ষ্য করিয়া পানি পৌঁছাইবে। শীতের সময় পা শুকাইয়া যায়, প্রায়ই পায়ের তলার দিকে গোড়ালির দিকে একটু বে-খেয়াল হইলেই শুক্‌না থাকিয়া যায়; সকলেই এইসব জায়গায় বিশেষ খেয়াল করিয়া পানি পৌঁছাইবে। (একটা পশমের গোড়াও যেন শুকনা না থাকিতে পারে, নতুবা ওযূ-গোসল হইবে না।) কোন কোন স্ত্রী লোক শুধু চেহারার সম্মুখ ভাগ ধোয়, কানের লতী পর্যন্ত ধোয় না, এইসব বিষয়ের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখিবে।

নামাযের জন্য মেয়েলোকদের বাহিরে যাওয়া

১৫। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, মেয়েলোকদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মসজিদ তাহাদের ঘরের আন্দর কোঠা। এই হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল যে, মেয়েলোকদের জন্য মসজিদে গিয়া নামায পড়া ভাল নহে। ইহাও বুঝা গেল যে, যখন নামাযের ন্যায় শ্রেষ্ঠ এবাদতের জন্য (এবং ২৭ গুণ ছওয়াবের জন্য) ঘর হইতে বাহির হওয়া মেয়েলোকদের জন্য পছন্দনীয় নহে, তখন শুধু দেশ রেওয়াজের খাতিরে, অথবা শুধু মিলা-মিশার জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়া মেয়েদের জন্য কত বড় অন্যায় হইবে।

নামাযের পাবন্দি

১৬। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামযের মেছাল এইরূপ, যেন কাহারো বাড়ীর সম্মুখে একটি নহর বা নদী প্রবাহিত আছে, সে দৈনিক পাঁচবার ঐ নদীতে গোসল করিলে, অর্থাৎ এমতাস্থায় তাহার শরীরে যেমন বিন্দুমাত্রও ময়লা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাবন্দির সহিত পড়িবে, তাহারও সমস্ত গোনাহ্ ধুইয়া যাইবে। (অতএব, খুব যত্ন করিয়া খুব পাবন্দির সহিত পাঞ্জেগানা নামায আদায় করিবে; সামান্য সামান্য কারণে কখনও নামায ক্বাযা করিবে না।)

১৭। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট হইতে সর্বপ্রথম হিসাব লওয়া হইবে নামাযের। (যদি নামাযের হিসাবে পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়, তবে আশা করা যায় যে, অন্যান্য বিষয়েও উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি নামাযের হিসাবেই উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তবে সর্বনাশ।)

আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া

১৮। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়িলে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত খুশী হন। মেয়েলোকদের ত জমা'আত নাই, তাহারা দেরী করিবে কেন? (পুরুষদের জমা'আতের কারণে হয়ত কোন ওয়াক্ত কিছু দেরী হইতে পারে; কিন্তু মেয়েদের কোন ওয়াক্তেই দেরী করা উচিত নয়। সুতরাং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়িবে।)

ভালরূপে নামায না পড়া

১৯। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অভক্তি ও অযত্নের সহিত নামায পড়িবে, অর্থাৎ উত্তম ওয়াক্তে নামায পড়ে না, ওযূ ভালরূপে করে না, (রুকূ সজ্‌দা, ক্বওমা-জলসা খুশু খুযু) ভালরূপে আদায় করে না, তাহার নামায ছিয়াহ (অন্ধকার) কাল বর্ণ ধারণ করে এবং ঐ নামায খোদার দরবারে ঐ নামাযীকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলে যে, তুই যেমন আমাকে বরবাদ করিলে, তোকেও যেন খোদা সেইরূপে বরবাদ করেন।" অতঃপর যখন নামায স্বীয়

স্বীয় নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়, যেখানে আল্লাহ্‌র মঞ্জুরী হয়, তখন ঐ নামাযকে পুরাতন নেকড়ার ন্যায় পেঁচাইয়া ঐ নামাযীর মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারা হয় অর্থাৎ, দরবারে কবূল হয় না।

হে মুসলিম ভ্রাতা-ভগিনীগণ! নামায যখন পড়েন, এবং (সবচেয়ে বড় কর্তব্য ইহাই যে,) ছওয়াবের জন্য নামায পড়েন, এমনভাবে কেন পড়েন যে উল্টা (ছওয়াবের পরিবর্তে) গোনাহ্ হয়। (যে ছওয়াব অন্য কাউকে দিবেন না, যে ছওয়াবের দ্বারা নিজের ঘর আবাদ হইবে, তখন অভক্তির সঙ্গে কেন পড়েন? ভক্তির সঙ্গে, মনোযোগের সঙ্গে, মহব্বতের সঙ্গে নামায পড়ুন। নিশ্চয় জানিবেন, নামাযের ন্যায় মূল্যবান রত্ন আর নাই; দুনিয়ার সব কিছুতেও দুই রাকা'আত নামাযের সমান কাজ দিতে পারে না।)

নামাযে এদিক-ওদিক তাকান

২০। **হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নামাযের মধ্যে তোমরা উপরের দিকে তাকাইবে না; (উহা নামাযের শানে এবং আল্লাহ্‌র শানে বে-আদবী। আল্লাহ্‌র শানে বে-আদবী করিতে) অন্তঃকরণে ভয় হওয়া চাই যে, (আল্লাহ্ কত বড় ক্ষমতাশালী,) ইহা করিলে আল্লাহ্ ঐ চক্ষুকে ছিনাইয়াও নিতে পারেন।

২১। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক তাকায়, তাহার নামায কবূল হয় না, তাহার নামায তাহারই চেহারার উপর ছুঁড়িয়া মারা হয়।

নামাযের সামনে দিয়া যাওয়া (পাপ)

২২। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, নামাযের সামনে দিয়া যাওয়া যে কত বড় পাপ, তাহা যদি কেহ বুঝিত, তবে চল্লিশ বৎসরও ঐ জায়গায় তার জন্য দাঁড়াইয়া থাকা সহজ হইত, তবুও নামাযের সামনে দিয়া যাইত না।

মাসআলাঃ নামাযীর সামনে যদি এক হাত উঁচা কোন জিনিস রাখা থাকে, তবে তাহার সামনে দিয়া যাওয়া দুরুস্ত আছে।

জানিয়া বুঝিয়া নামায ক্বাযা করা (মহাপাপ)

২৩। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি (জানিয়া বুঝিয়া) নামায ছাড়িয়া দিবে, সে যখন আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইবে, তখন আল্লাহ্ তাহার উপর ভীষণ রাগান্বিত হইবেন।

করযে হাসানা দেওয়া

২৪। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আমি যখন মে'রাজে গিয়াছিলাম, তখন বেহেশ্‌তের দরজার উপর লেখা দেখিয়াছি যে, খয়রাতের ছওয়াব দশগুণ, আর করযে-হাসানা বা ধার দেওয়ার ছওয়াব আঠার গুণ।

গরীব দেনাদারকে সময় দেওয়া

২৫। **হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কোন গরীব অভাবী লোককে করযে হাসানা দিলে (বা বাকী দিলে) যাবৎ ওয়াদা পার না হয়, তাবৎ দৈনিক ঐ পরিমাণ টাকা দান করার ছওয়াব পাওয়া যায়। আর যখন ওয়াদার তারিখ আসে আর সে গরীব তারিখ মত দেনা না দিতে পারিয়া সময় (মোহলত) চায় এবং পাওনাদার সময় দেয়, তখন হইতে দৈনিক ঐ টাকার দ্বিগুণ টাকা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করিলে যে ছওয়াব পাওয়া যাইত, সেই পরিমাণ ছওয়াব পাইবে।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার ছওয়াব

২৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের একটি মাত্র হরফ পাঠ করিবে, সে একটি নেকী পাইবে; আর রহমান ও রহীম আল্লাহ্‌র দরবারে মু'মিন বান্দার নেকীর জন্য নিয়ম এই যে, এক নেকীতে দশ নেকী দিবেন। (কাজেই একটি হরফ কেহ ভক্তির সঙ্গে পাঠ করিলে সে দশটি নেকী পাইবে।) হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি এই বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম', এক হরফ, বরং 'আলিফ' এক হরফ, 'লাম' এক হরফ, 'মীম' এক হরফ। অতএব, কেহ শুধু 'আলিফ-লাম-মীম' (এইটুকু ভক্তির সহিত) তেলাওয়াত করিলে এই হিসাবে সে ৩০ নেকী পাইবে।

অভিশাপ বা বদদো'আ দেওয়া

২৭। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, (খবরদার,!) তোমরা কখনো (রাগের বশে) নিজকে নিজে বদদো'আ (অভিশাপ) দিও না, নিজের সন্তানদিগকেও (কখনো বদদো'আ দিও) না, নিজের চাকর-নওকরকেও (কখনো বদদো'আ দিও) না, নিজের গরু, ঘোড়া, মাল-আসবাবকেও (কখনো বদদো'আ দিও) না। কেননা, অনেক সময় দো'আ কবূলিয়াতের সময় হয়, সে সময় বদদো'আ দিলে বদদো'আও কবূল হইয়া যাইতে পারে। (তাহা হইলে পরে নিজেরই আফসোস করিতে হইবে।)

হারাম মাল কামাই করা ও খাওয়া পরা

২৮। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ جِسْمٌ غُذِىَ بِالْحَرَامِ "হারামের দ্বারা (সুদ, ঘুষ, চুরি, লুট, যুলুম, ইত্যাদির পয়সার দ্বারা) শরীরের যে অংশটুকু পয়দা হইয়াছে, তাহা কখনও বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না। (তাহা দোযখের আগুনে দগ্ধ হইবারই উপযুক্ত।)

২৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি দশ দেরহাম দ্বারা একটি কাপড় তৈয়ার করিল, তন্মধ্যে তাহার এক দেরহাম পরিমাণও যদি হারামের হয়, তবে যাবৎ ঐ কাপড় তাহার গায়ে থাকিবে তাবৎ তাহার কোন নামায (বা দো'আ) আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করিবেন না। (এক দেরহাম চারি আনা হইতে কিছু বেশী।)

ধোঁকা দেওয়া (মহাপাপ)

৩০। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ধোঁকা দিবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, সে আমার উম্মত হইতে খারেজ। ক্রয়-বিক্রয়, (মামলা-মকদ্দমা, শাদী-বিবাহ, পীরী-মুরীদী) প্রভৃতির মধ্যে যে কোন প্রকারের ধোঁকা হউক না কেন, ধোকা দেওয়া মহাপাপ।

করয লওয়া

৩১। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি দেনাদার থাকিয়া মরিয়া যাইবে, তাহার দেনা কিয়ামতের মাঠে নেকীর দ্বারা পরিশোধ করা হইবে। যেখানে দীনারও থাকিবে না, দেরহামও থাকিবে না। (একটি দীনার দশ দেরহামের মূল্যের সমান।)

৩২। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, ঠেকাবশতঃ যদি কেহ ধার করে এবং সেই ধার পরিশোধ করার জন্য তাহার আপ্রাণ চিন্তা ও চেষ্টা থাকে, অথচ পরিশোধ করিতে না পারিয়া ঐ চিন্তা লইয়া মরিয়া যায়, তবে আল্লাহ্ বলেন যে, আল্লাহ্ তাহার সাহায্য করিবেন। অর্থাৎ স্বয়ং তাহার দেনা পরিশোধের কোন ছুরত করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তির দেনা পরিশোধ করার জন্য ঐরূপ চিন্তা ও চেষ্টা না থাকিবে, সে যদি দেনা পরিশোধ না করিয়া মরিয়া যায়,

তবে তাহার দেনার পরিবর্তে তাহার নেকী লইয়া যাওয়া হবে। ঐ দিন দীনার-দেরহাম কিছুই মওজুদ থাকিবে না।

সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও দেনা পরিশোধ না করা (বড়ই গোনাহ্)

৩৩। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও দেনা পরিশোধ না করিয়া টালবাহানা করা যুলম। অনেকের কু-অভ্যাস থাকে যে, হাতে পয়সা থাকা সত্ত্বেও দুই চার দিন ঘুরাইয়া দেয় বা মযদুরের মযদুরি এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টা দেরী করিতে পারিলে আর যখন তখন দেয় না; সব খরচ চালায়, কিন্তু দেনাদারের দেনা পরিশোধের বেলায় এখন না তখন করিতে থাকে। (এইরূপ কু-অভ্যাস বড়ই খারাপ; কাজেই তাহা পরিত্যাগ করা দরকার।)

সুদ লওয়া ও দেওয়া গোনাহ্

৩৪। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সুদ যে খায় তার উপরও লা'নত এবং যে সুদ দেয় তার উপরও লা'নত।

পরের জমি গছব করিয়া লওয়া (মহাপাপ)

৩৫। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও পরের জমি গছব করিয়া লইবে (তাহাকে কিয়ামতের দিন ভীষণ শাস্তি দেওয়া হইবে।) সাত তবক জমিনের হার (গলবেড়ী) বানাইয়া তাহার গলায় দেওয়া হইবে।

মজুরি সঙ্গে সঙ্গে দিবে একটুও দেরী করিবে না

৩৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, মযদুরের গায়ের ঘাম শুকাইবার পূর্বে তাহার মজুরি দিয়া দিবে।

৩৭। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, স্বয়ং আমি কিয়ামতের মাঠে তিন ব্যক্তির পক্ষে ফরিয়াদী হইব; সেই তিন জনের মধ্যে ঐ ব্যক্তিও আছে যাহার দ্বারা কাজ লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার মজুরি দেয় নাই।

সন্তান মারা গেলে

৩৮। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি ঈমানদার হয় এবং তাহাদের তিনটি সন্তান (নাবালেগ অবস্থায়) মারা যায়, তবে তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ রহ্মতে বেহেশ্ত দান করিবেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি কাহারও দুইটি সন্তান মারা যায়। (তাহার কি হইবে?) হুযূর (দঃ) বলিলেন, যাহার দুইটি সন্তান মারা যাইবে তাহারও এই ছওয়াব। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, যদি কাহারও একটি সন্তান মারা যায়? (তাহার কি ছওয়াব হইবে?) হুযূর (দঃ) বলিলেন, যাহার একটি সন্তান মারা যাইবে (এবং ছবর করিবে) তাহারও এইরূপ ছওয়াব। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ্র কসম খাইয়া বলিতেছি, যে আল্লাহ্র হাতে আমার জান—যে মেয়েলোকের গর্ভপাত হইয়া সন্তান মারা যাইবে, যদি সে আল্লাহ্র দিকে চাহিয়া ছবর করে, তবে সেই সন্তান তাহার মাকে তাহার নাড়ীর নার দ্বারা পেঁচাইয়া বেহেশ্তে লইয়া যাইবে।

মেয়েলোকের পর্দা করা জরুরী

[**হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ ـ (بيهقى)

অর্থ—"যে দেখিবে এবং যে দেখা দিবে, উভয়ের উপর আল্লাহ্র লা'নত।"]

আতর সুগন্ধি লাগাইয়া পরপুরুষের সামনে যাওয়া

৩৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "যে মেয়েলোক সুগন্ধি লাগাইয়া (অথবা বেশভূষা দেখাইয়া) বেগানা পুরুষদের কাছ দিয়া যাতায়াত করিবে, সে এমন, অর্থাৎ বদকার। দেওর, ভাসুর, ভগ্নিপতি, চাচাত ভাই, মামাত ভাই, ভাসুর-পুত, দেওর-পুত, ফুফাত ভাই, খালাত ভাই ইত্যাদিও গায়র মাহ্রাম এবং বেগানা; কাজেই তাহাদের সামনে বা কাছ দিয়াও সুগন্ধি লাগাইয়া বা সুসজ্জিতা বেশে যাওয়া-আসা করা চাই না। (অবশ্য সুগন্ধি না লাগাইয়া ময়লা বিবর্ণ কাপড় দ্বারা আপাদমস্তক ঢাকিয়া দরকারবশতঃ যাতায়াত করা যাইতে পারে।)

মেয়েলোকের পাতলা কাপড় পরা

৪০। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ কোন কোন মেয়েলোক নামে কাপড় পরে, কিন্তু কাপড় পাতলা হওয়ার দরুন প্রকৃত প্রস্তাবে উলঙ্গ থাকে, তাহারা বেহেশ্তে যাইতে পারিবে না এবং বেহেশ্তের ঘ্রাণও তাহারা পাইবে না।

মেয়েলোকের পুরুষের ছুরত বানান বা কাপড় পরা

৪১। হাদীসঃ যে মেয়েলোক পুরুষের (ন্যায়) কাপড় পরিবে (বা ছুরত বানাইবে), তাহার উপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করিয়াছেন।

[**হাদীসঃ** لَعَنَ اللّٰهُ الْمُجَمِّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ يَتَّخِذْنَ شُعُوْرَهُنَّ جُمَّةً ○

"হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে সমস্ত মেয়েলোক পুরুষের বাবরীর মত কান বা কাঁধ পর্যন্ত (লম্বা) চুল রাখিবে, তাহাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত।"

وَاَمَّا النِّسَاءُ فَاِنَّهُنَّ يُرْسِلْنَ اَشْعَارَ هُنَّ لَايَتَّخِذْنَ جُمَّةً ○

অর্থাৎ—মেয়েলোকদের চুল লম্বা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। পুরুষদের বাবরীর মত চুল রাখা তাহাদের উচিত নহে। (এবং মেয়েলোকদের মত পুরুষদের চুল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে; পুরুষ কান কিংবা কাঁধ পর্যন্ত বাবরী রাখিতে পারে বেশী নয়।)]

শান দেখাইবার জন্য কাপড় পরা

৪২। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নামের জন্য এবং নিজের শান দেখাইবার জন্য পোশাক পরিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে অপমানের পোশাক পরাইয়া তাহাতে দোযখের আগুন লাগাইয়া দিবেন।

কাহারও উপর যুল্ম (অত্যাচার) করা

৪৩। হাদীসঃ হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দিন মজলিসের মধ্যে বলিলেন, তোমরা বলিতে পার গরীব কে? সকলে বলিল, আমরা গরীব তাহাকে বলি, যাহার টাকা-পয়সা, বিষয় সম্পত্তি নাই। হযরত বলিলেন, (আমার সে উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য এইঃ) আমার উম্মতের মধ্যে বড় গরীব সে-ই, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত, সবকিছু লইয়া উপস্থিত হইবে, কিন্তু হয়ত সে কাহাকেও গালিমন্দ (গীবত) করিয়াছিল, কাহারো উপর মিথ্যা তোহ্মত লাগাইয়াছিল, কাহারো হক নষ্ট করিয়াছিল, কাহারো মাল আত্মসাৎ করিয়াছিল, কাহাকেও হত্যা করিয়াছিল, কাহাকেও অন্যায়ভাবে মারিয়াছিল ইত্যাদি, এইসব কারণে তাহার নেকীসমূহ ঐ সব হকদারকে দিয়া দেওয়া হইবে; তাহাতেও যদি হকদারদের হক সকল আদায় না হয়, তবে অর্থাৎ নেকী যখন না থাকিবে তখন ঐ সব হকদারের গোনাহ্ উহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে দোযখের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে—এই হইল বড় গরীব।

দয়া ও রহম করা

৪৪। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়া সে পাইবে না, যে মানুষের উপর দয়া ও রহম করে না।

সৎকাজে আদেশ করা বদকাজে নিষেধ করা

৪৫। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেহ শরীঅতের খেলাফ কোন কাজ দেখিবে, তাহার নিজ হাতে সেই কাজে বাধা প্রদান করিয়া তাহা বন্ধ করা উচিত। যদি এতদূর ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখে নিষেধ করিবে। যদি এতটুকু ক্ষমতাও না থাকে, অন্ততঃ ঐ বদকাজকে দেলের সহিত অস্বীকার এবং ঘৃণা করিবে। ইহা ঈমানের সর্ব-নিম্নস্তর। (হে মুসলিম ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! যাহাদের উপর জোর চলে, যেমন নিজেদের ছেলে-মেয়ে, চাকর-নওকর ইত্যাদি, তাহাদেরে জোরপূর্বক নামায, রোযা, পর্দা, সত্য কথা, সদ্ব্যবহার, ইসলামী আদব-কায়দা ইত্যাদি শিক্ষা দাও এবং ইহার অভ্যাস করাও। যদি তাহাদের কাছে ফটো, ছবি বা মাটির বা চীনা মাটির মূর্তি দেখ, বা বেহুদা পুঁথি-পুস্তক দেখ, তবে তাহা ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জ্বলাইয়া ফেল এবং আতশবাজি, ঘুড়ি, রেস, বায়স্কোপ, হিন্দুর পর্বের মিঠাই সামগ্রী ইত্যাদির জন্য পয়সা দিও না।

মুসলমানের দোষ ঢাকিয়া রাখা

৪৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের আয়েব ঢাকিয়া রাখিবে, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তাহার আয়েব ঢাকিয়া রাখিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের আয়েব ফাঁস করিয়া দিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহার আয়েব ফাঁস করিয়া দিবেন। এমন কি, সে নিজের বাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকিলেও অপমানিত হইবে।

কাহারও অপমান অনিষ্ট দেখিয়া খুশী হওয়া

৪৭। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, খবরদার! তোমরা কেহ অন্য মুসলমান ভাইয়ের বিপদ (অপমান বা অনিষ্ট) দেখিয়া খুশী হইও না। কেননা, হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর রহম করিয়া তাহাকে ঐ বিপদ হইতে মুক্তি দিয়া তোমাকে ঐ বিপদের মধ্যে গ্রেপ্তার করিয়া দিতে পারেন। (কাজেই হুঁশিয়ার থাকা দরকার।)

কোন গোনাহ্‌র কারণে তা'না বা খোঁটা দেওয়া

৪৮। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও কোন গোনাহ্‌র (বা দোষের) কাজের জন্য তা'না বা খোঁটা দিবে, সে নিশ্চয়ই সেই গোনাহ্ বা দোষের কাজের মধ্যে গ্রেপ্তার হইবেই হইবে। যে পর্যন্ত সেই গোনাহ্ বা দোষের কাজের মধ্যে গ্রেপ্তার না হইবে, সে পর্যন্ত তার মৃত্যু আসিবে না। (হাদীসের অর্থ এই যে, যদি কেহ কোন পাপের কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকে এবং পরে তওবা করে, তবে সেই তওবাকৃত পাপের কারণে তাহাকে তা'না বা খোঁটা দেওয়া ঘোর অন্যায়। আর যদি তওবা না করিয়া থাকে, তবে খায়েরখাহির সহিত তাকে নছীহত বা তাম্বীহ্ ত করা যাইবে কিন্তু তবুও তাকে শরম দেওয়ার জন্য বা তাহার অপমান করার জন্য বা নিজের বাহাদুরী বা গৌরব দেখাইবার জন্য বলাবলি করা অন্যায়।)

ছগীরা (ছোট ছোট) গোনাহ্ করা

৪৯। হদীসঃ হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি আয়েশা (রাঃ) কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, হে আয়েশা! ছোট ছোট গোনাহ্ হইতেও তুমি নিজেকে বহুত (চেষ্টা এবং

লক্ষ্য করিয়া) বাঁচাইতে থাকিবে। কেননা, এইসব ছোট ছোট গোনাহ্‌রও সওয়াল-জওয়াব হইবে, তাহা ফেরেশ্‌তারা লিখিতেছেন এবং তাহার হিসাব হইবে। ছোট ছোট গোনাহ্‌র কারণেও শাস্তি হইবার আশঙ্কা আছে।

মা-বাপকে সন্তুষ্ট রাখা

৫০। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্‌র খুশী মা-বাপের খুশীর মধ্যে অর্থাৎ মা-বাপ যে ছেলেমেয়ের উপর সন্তুষ্ট, আল্লাহ্ তাহার উপর সন্তুষ্ট এবং যাহার উপর মা-বাপ অসন্তুষ্ট, আল্লাহ্ তাহার উপর অসন্তুষ্ট।

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা

৫১। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেক শুক্রবারের রাত্রে অর্থাৎ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে সমস্ত লোকের আমল- আখলাক, এবাদত-বন্দেগী আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি (নিজের ভাই-বেরাদরের সঙ্গে বা) আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে, তাহার কোন এবাদত-বন্দেগী কবূল হয় না।

পিতৃহীন (এতীমের) লালন-পালন করা

৫২। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এতীম বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণ-পোষণ এবং লালন-পালনের ভার (তাহাদের সম্পত্তি গ্রাসের জন্য নহে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে খালেছ নিয়তে) গ্রহণ করিবে, শাহাদত অঙ্গুলি ও মধ্যমা আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়া বলিয়াছেন যে, সে এবং আমি এইরূপ একত্রে বেহেশ্‌তে থাকিব।

৫৩। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন এতীম বাচ্চার মাথার উপর শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দয়া পরবশ হইয়া হাত বুলাইয়া দিবে, তাহার হাতের নীচে যত চুল পড়িবে তত পরিমাণ নেকী সে পাইবে। আর যদি কাহারও আশ্রয়ে এতীম ছেলেমেয়ে থাকে এবং তাহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, তবে আমি এবং সে বেহেশ্‌তে এভাবে থাকিব যেমন শাহাদত আঙ্গুলি এবং মধ্যমা অঙ্গুলি নিকট নিকট। (এতীম ছেলে-মেয়ের রক্ষক মা হউক, বা চাচা হউক, বা মামু বা নানা হউক, বা অন্য কেহ হউক, তাহাদের সকলেই এই ছওয়াবের আশায় এতীমের খেদমত করা উচিত। কিন্তু খবরদার! এতীমের এক পাই পয়সাও যেন আত্মসাৎ না হয়; নতুবা সর্বনাশ! কোরআন শরীফে আছে, "যাহারা এতীমের মাল খায়, তাহারা দোযখের আগুনই খায়।" খবরদার! হুঁশিয়ার!!

পাড়া-প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া

৫৪। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের পাড়া-প্রতিবেশীকে (পার্শ্ববর্তী লোককে) কষ্ট দেয়; সে আমাকে কষ্ট দেয়; আর যে আমাকে কষ্ট দেয় সে স্বয়ং খোদা তা'আলাকে কষ্ট দেয়; যে নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করে সে স্বয়ং আমার সঙ্গে ঝগড়া করে; আর যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, সে স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে ঝগড়া করে। (পাড়া-প্রতিবেশীর হক খুব বেশী; সামান্য সামান্য কারণে তাহাদের সহিত ঝগড়া-কলহ করা, কাউকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া বড়ই অন্যায়। (ছবর করা দরকার; নতুবা উপায় নাই।)

কোন মুসলমানের কোন কাজ করিয়া দেওয়া

৫৫। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের কোন কাজে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাহায্য করিয়া দিবে এবং তাহার উপকার করিয়া দিবে স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক তাহার কাজ করিয়া দিবেন এবং তাহার সাহায্য ও উপকার করিবেন।

লজ্জাশীলতা এবং নির্লজ্জতা

৫৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, লজ্জা প্রবণতা এবং হায়া-শরম ঈমানের একটি প্রধান অঙ্গ। ঈমান মানুষকে বেহেশ্‌তে পৌঁছাইবে। বেহায়ায়ী অর্থাৎ নির্লজ্জতা বদ-খাছলতির আলামত; বদ-খাছলতী মানুষকে দোযখে পৌঁছায়। কিন্তু দ্বীনের কার্যে কখনও লজ্জা করিও না, যেমন বিবাহ-শাদীর সময় কিংবা সফরে মেয়েলোকেরা নামায পড়ে না। এমন লজ্জা নির্লজ্জতার চেয়ে নিকৃষ্ট। (লজ্জা প্রবণতা এবং হায়া-শরমের অর্থ এই যে, শরীঅত-বিরুদ্ধ কাজ করিতে, খোদার হুকুম এবং তরীকার বিরুদ্ধে কাজ করিতে লজ্জা বোধ করা চাই। যেমন মেয়েলোকের জন্য পরপুরুষকে দেখা দেওয়া লজ্জার কথা, মিথ্যা বলা, ঝগড়া করা, গালি দেওয়া, ফাহেশা কথা বলা, নিজের অভাব পরের কাছে জানান, ছতর খোলা, মজলিসের মধ্যে বাতকর্ম করা, মেহমানের যত্ন ও সম্মান না করা, মুরুব্বীকে ভক্তি না করা, ভিক্ষা বা চুরি করা, ইত্যাদি বে-হায়ায়ীর কাজ; নতুবা মাসআলার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জাবোধ করা, নামায পড়িতে লজ্জাবোধ করা, দাড়ী রাখিতে লজ্জাবোধ করা, মেয়েলোকের নৌকার সফরে বা গাড়ীর সফরে বা নূতন বিবাহকালে নামায পড়িতে লজ্জা বোধ করা, নিজের জাতীয় পোশাক পরিতে বা জাতীয় কথা বলিতে লজ্জা বোধ করা, এসব লজ্জার বিষয় নহে, মনের দুর্বলতা বা আত্মার সঙ্কোচ, কাজেই ইহা বড়ই দূষণীয়।)

ভাল স্বভাব এবং মন্দ স্বভাব

৫৭। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, মানুষের ভাল স্বভাব এবং সদ্ব্যবহার মানুষের পাপসমূহকে এমন ভাবে গলাইয়া (দূর করিয়া) দেয়, যেমন পানি নিমককে গলাইয়া (নিমকের রূপকে দূর করিয়া) দেয়। এইরূপ মানুষের মন্দ স্বভাব এবং অসদ্ব্যবহার মানুষের এবাদত-বন্দেগীকে এমন ভাবে নষ্ট করিয়া দেয়, যেরূপ সিরকা মধুকে নষ্ট করিয়া দেয়।

৫৮। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়পাত্র এবং কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী আমার নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হইবে, যাহার স্বভাব-চরিত্র ভাল (এবং লোকের সহিত ব্যবহার মধুর) হইবে; আর আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় এবং কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী দূরবর্তী সেই ব্যক্তি হইবে, যাহার স্বভাব মন্দ (এবং ব্যবহার কর্কশ ও কটু) হইবে।

কোমল এবং কঠোর ব্যবহার

৫৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ স্বয়ং দয়াবান এবং যাহারা দয়াবশতঃ লোকের বরং সমস্ত জীবের সঙ্গে নরম ও কোমল ব্যবহার করে, কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার করে না, তিনি তাহাদিগকে পছন্দ করেন। আল্লাহ্‌ পাক স্নেহে, নরম ও কোমল ব্যবহারে যে সমস্ত নিয়ামত দান করেন, কঠোর বা নির্মম ব্যবহারে তাহা দান করেন না।

৬০। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যাহার স্বভাবে এবং ব্যবহারে নরমী ও স্নেহ নাই, সে সমস্ত লোক ভালাই এবং কল্যাণ হইতে বঞ্চিত।

কাহারও ঘরে বা বাড়ীতে উঁকি মারা

৬১। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বিনা এজাযতে (কাহারও বাড়ীতে বা ঘরে প্রবেশ করা কোরআনে নিষেধ, তদ্রূপ বিনা এজাযতে) কাহারও ঘরে বা বাড়ীতে উঁকি মারিয়া দেখিও না। যে এইরূপ করিল, সে যেন ঢুকিয়া পড়িল।

ফায়দা ঃ অনেক জায়গায় অনেক কু-প্রথা প্রচলিত আছে যে, মেয়েলোকেরা দুলহা-দুলহানকে বাসর ঘরে দিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখে, ইহা ভারি নির্লজ্জতার কথা এবং ভারী গোনাহ্‌র কাজ। বাস্তবে উঁকি মারিয়া দেখা এবং দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়া ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি ? (হাদীস শরীফে এতদূর পর্যন্ত আছে যে, এইরূপ উঁকি যে মারে তাহার চক্ষু ফুঁড়িয়া দিলেও তার কোন দাদফরিয়াদ নাই।) মুখে কথা বলিয়া আওয়াজ দিয়া এজাযত লইবে।

বিনা এজাযতে কাহারও গোপনীয় কথায় কান দেওয়া

৬২। হাদীস ঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকের কানেকানের কথা শুনিবে, অথচ তাহাকে শুনানের ইচ্ছা তাহাদের নাই, কিয়ামতের দিন তাহার উভয় কানে গলিত সীসা ঢালা হইবে।

রাগ করা

৬৩। হাদীস ঃ একজন লোক হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, হুযূর! আমাকে এমন কোন কাজ বাতাইয়া দেন যদ্দ্বারা আমি সহজে বেহেশ্‌তে যাইতে পারি। হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, রাগ দমন করিতে পারিলে তোমার জন্য বেহেশ্‌ত। (তুমি রাগ-রিপুকে দমন করিবে, তা' হইলেই তুমি সহজে বেহেশ্‌তে যাইতে পাইবে। রোগ বিশেষে রোগীকে ঔষধ বাতান হয়। এই লোকটির যে রোগ ছিল সেই রোগের ঔষধই রূহানী তবীব খোদার হাবীব দান করিয়াছেন।)

কথা বলা ত্যাগ করা

৬৪। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, (ঝগড়া-বিবাদ বা রাগ গোস্বাবশতঃ) কোন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলা ত্যাগ করা (মনে চাহিলে) কোন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশী হালাল নহে। যে তিন দিনের বেশী কথা বলা ত্যাগ করিয়া সেই অবস্থায় মারা যাইবে, সে দোযখী হইবে। (ধর্মীয় কারণে কথাবার্তা ত্যাগ করা জায়েয আছে।)

কোন মুসলমানকে বে-ঈমান বলা ও অভিশাপ দেওয়া

৬৫। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বলিবে, "ওরে কাফের" বা "ওরে বে-ঈমান", তাহার এত পরিমাণ গোনাহ্ হইবে, ঐ মুসলমানকে প্রাণে বধ করিলে যে পরিমাণ গোনাহ্ হইত।

৬৬। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কোন মুসলমানকে লা'নত দেওয়া (বা বদদো'আ ও অভিশাপ দেওয়া) এমন গোনাহ্, যেমন ঐ মুসলমানকে জানে মারিয়া ফেলা গোনাহ্।

৬৭। হাদীস ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন কোন লোক কোন মুসলমানকে (অভিশাপ) লা'নত (বা বদ-দো'আ) দেয়, তখন উহা প্রথমে আকাশের দিকে যায়; আকাশের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, পরে জমিনের দিকে আসে, জমিনের দরজাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর উহা ডানে বামে ঘুরিয়া ফিরে। যাহাকে লা'নত দেওয়া হইয়া থাকে তাহার কাছে যায়। যদি সে লা'নতের উপযুক্ত হয়, তবে ত তাহারই উপর পড়ে, নতুবা যে লা'নত করিয়াছে তাহার

উপর আসিয়া পড়ে। **ফায়দাঃ** কোন কোন স্ত্রীলোকের সামান্য কারণে অভিশাপ বা বদদো'আ দেওয়ার অভ্যাস আছে। সেই অভ্যাস ত্যাগ করা দরকার।

কোন মুসলমানকে (অনর্থক) ভয় দেখান

৬৮। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কোন মুসলমানকে অনর্থক ভয় দেখান কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নহে।

৬৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যদি কোন মুসলমানের দিকে না-হক এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে যে, সে ডরাইয়া যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন (উহার শাস্তি স্বরূপ) তাহাকে ভয় দেখাইবেন। **ফায়দাঃ** ন্যায্য কারণে ভয় দেখান দুরুস্ত আছে বটে, কিন্তু অকারণে ভয় দেখান দুরুস্ত নহে।

মুসলমানের ওযর কবূল করিয়া লওয়া

৭০। হাদীসঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যদি কোন মুসলমান ভাই ভুলবশতঃ কোন অন্যায় করিয়া পরে ওযর-খাহি করে এবং মাফ চায়, তবে তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া উচিত। যে মাফ চাওয়া সত্ত্বেও মাফ করিবে না, সে হাওযে-কওছারের কিনারায় আমার কাছে আসিতে পারিবে না।

চোগলখুরী ও গীবত করা বড় গোনাহ্

৭১। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "চোগলখোর বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না।" (একজনের কথা আর একজনের কাছে এমনভাবে বলা যাহাতে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে "চোগলখুরী" বলে!)

৭২। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমান ভাইয়ের গোশ্‌ত খাইবে (অর্থাৎ গীবত করিবে,) কিয়ামতের দিন তাহাকে মরা মানুষের গোশ্‌ত খাইতে দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে, তুমি জিন্দালোকের গোশ্‌ত খাইয়াছ এখন মুর্দাকেও খাও। সে খাইতে চাহিবে না, শোরগোল করিবে, নাক-মুখ সিটকাইবে, তবুও তাকে ঐ মরার গোশ্‌ত খাইতে বাধ্য করা হইবে।

কাহারও উপর মিথ্যা দোষারোপ করা

৭৩। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিবে, (অর্থাৎ যে কাজ সে করে নাই, যে কথা সে বলে নাই, তাহা মিছামিছি তাহার উপর তোহ্‌মত লাগাইবে,) তাহাকে দোযখের মধ্যে এমন জায়গায় রাখা হইবে যেখানে দোযখীদের শরীর পচিয়া গলিয়া তাহাদের রক্ত-পূঁজ বহিয়া গিয়া জমা হইবে। অবশ্য যদি তওবা করে এবং ঐ লোকের নিকট হইতেও মাফ চাহিয়া লয়, তবে ঐ শাস্তি মাফ হইবে; নতুবা আর কোন উপায় নাই।

কথা কম বলা (ভাল)

৭৪। হাদীসঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, চুপ থাকিলে অনেক আপদ-বিপদ হইতে বাঁচা যায়।

৭৫। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, এক আল্লাহ্‌র যেকের ব্যতিরেকে অন্য বাজে কথা কম বলার অভ্যাস কর। কেননা, আল্লাহ্‌র যেকের ছাড়া অন্য কথা বেশী বলাতে দেল শক্ত হইয়া যায়। যার দেল শক্ত, সে খোদা হইতে সবচেয়ে বেশী দূরে থাকিবে।

নম্র ব্যবহার

[অহঙ্কারে পতন ও মহাপাপ, নম্রতায় উন্নতি]

৭৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্‌ তাহার মরতবা বাড়াইয়া দেন। আর যে অহঙ্কার করে, আল্লাহ্‌ তার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেন অর্থাৎ অপদস্থ করেন।

অহঙ্কার করা

৭৭। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যাহার দেলে এক সরিষা পরিমাণ অহঙ্কার থাকিবে, সে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না।

সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলা বড় দোষ

৭৮। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সদা সত্য কথা বলার অভ্যাস করিবে; কেননা, সত্যই সততার মূল এবং সত্য ও সৎ এই দুই-ই বেহেশ্‌তে লইয়া যায়। মিথ্যা কথা কখনও বলিবে না। কেননা, মিথ্যাই পাপের মূল এবং মিথ্যা ও পাপ এই দুই-ই দোযখে লইয়া যায়।

দুমুখো মানুষ (ভাল নহে)

৭৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "দুনিয়াতে যে দুমুখোপনা করিবে, কিয়ামতের দিন তাহার দুইটি আগুনের জিহ্বা হইবে।" দুমুখোপনার অর্থ এই যে, (আ'মল ঈমান ঠিক নাই, হক না-হক বিচার করে না,) যাহার কাছে যায়, (তার থেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য) তাহার মন যোগাইয়া কথা বলে। (এইরূপ স্বভাব বড়ই খারাপ।)

এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের কসম খাওয়া

৮০। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাহারও কসম খাইবে, সে কুফরী ও শেরেকী গোনাহ্‌র মধ্যে লিপ্ত হইল। যেমন কাহারও অভ্যাস যে, এরূপ কসম খায় তোমার জানের কসম, আপন চক্ষুর কসম, নিজের ছেলের কসম, এ সকল নিষেধ। এক হাদীসে আছে, এরূপ কসম যদি মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ কলেমা পড়িয়া লইবে। (বিনা জরুরতে কসম খাওয়াই ভাল নহে। যদি জরুরতবশতঃ কসম খাইতে হয়, তবে আল্লাহ্‌র কসম খাওয়া যায়, তা-ছাড়া অন্য কোন কিছুর কিরা কাটা বা কসম খাওয়া জায়েয নহে। যেমন অনেকের অভ্যাস আছে, "ছেলের মাথা খাই।" নবীর কসম ইত্যাদি বলে, এরূপ বলা কঠিন গোনাহ্‌।)

ঈমানের কসম খাওয়া

অর্থাৎ এরূপ বলিবে না যে, যদি এইরূপ না হয়, তবে যেন ঈমান নছীব না হয়।

৮১। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কসম খায় যে, যদি এই কথা সত্য না হয় বা এইরূপ না হয়, তবে যেন ঈমান নছীব না হয়, (বা কলেমা যেন নছীব না হয় বা শাফা'আত যেন নছীব না হয় বা বেহেশ্‌ত যেন নছীব না হয়, দোযখ যেন নছীব হয়। এরূপ কসম সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কখনও খাওয়া চাই না। যদি কাহারও এরূপ অভ্যাস থাকিয়া থাকে, তবে সে অভ্যাস প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অতি সত্বর পরিবর্তন করা দরকার। কেননা, যদি কেহ এরূপ কসম করে, তবে তাহার ঈমান কোন প্রকারেই সালামত থাকিবে না।) যদি মিথ্যা হয়, তবে ত ঈমান যাইবেই, আর যদি সত্য হয়, তবু ঈমান সালামত থাকিবে না।

রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়া

৮২। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, এক ব্যক্তি পথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। পথে একখানা কাঁটার ডাল দেখিতে পাইল। সে উহা পথ হইতে সরাইয়া ফেলিল। আল্লাহ্ পাক তাহার এই আমলটুকু খুব পছন্দ করিলেন এবং (ইহার পারিতোষিক এই দিলেন যে,) তাহার সব গোনাহ্ খাতা মাফ করিয়া (দিয়া তাহাকে বেহেশ্‌তে দিয়া) দিলেন। ইহাতে বুঝা গেল, এমন জিনিস পথে ফেলিয়া রাখা বড় অন্যায়। কোন কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়েলোকদের অভ্যাস, বারান্দায় পিঁড়ি পাতিয়া বসে, অতঃপর সে ত উঠিয়া গেল, পিঁড়ি সেখানেই রহিয়া গেল। কোন সময় চলিবার সময় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া হাত মুখ ভাঙ্গে। এভাবে পথে কোন বরতন রাখিয়া দেওয়া, চৌকি, কাঠ কিম্বা পাটা ফেলিয়া রাখা অন্যায়।

ওয়াদা ঠিক রাখা, আমানত পুরা না করা

৮৩। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

لَآاِيْمَانَ لِمَنْ لَّآاَمَانَةَ لَهٗ وَلَادِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهٗ ○

যাহার মধ্যে আমানতের হেফাযত নাই তাহার ঈমান নাই, আর যাহার মুখের কথা (ওয়াদা অঙ্গীকার) ঠিক নাই তাহার ধর্ম নাই।

জ্যোতিষী দ্বারা ভাগ্য গণনা করান

৮৪। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে যাইবে এবং তাহার কাছে গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাহার কথা বিশ্বাস করিবে, (তাহার এত বড় গোনাহ্ যে, তওবা না করিলে) তাহার ৪০ দিনের নামায কবূল হইবে না। (অনেকের এইরূপ অভ্যাস আছে যে, কোন মাল হারাইলে কোন গণক ঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করে।) বা কাহারো উপর জ্বিনের আছর হইলে তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করে এবং আমার স্বামীর চাকুরী কবে হইবে, আমার ছেলে কবে আসিবে, (ছেলে হইবে না মেয়ে হইবে, ভাগ্য ভাল কি মন্দ, রোগ সারিবে কি না সারিবে, মালটা কোথায় কি ভাবে আছে ইত্যাদি) এইসব কথাই শরীঅতের বরখেলাফ এবং কবীরা গোনাহ্ (এরূপ কাজ করা চাই না)।

কুকুর পালা, ফটো বা ছবি রাখা

৮৫। হাদীসঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে, সে ঘরে রহ্‌মতের ফেরেশ্‌তা আসে না। ছেলেপিলেদের খেলনার মধ্যেও যদি কোন জানদারের মূর্তি থাকে, তাহাও জায়েয নহে।

বিনা ওযরে উপুড় হইয়া শয়ন করা

৮৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) এক দিন হাঁটিয়া যাইতেছিলেন, একজন লোককে দেখিলেন যে, উপুড় হইয়া শুইয়া আছে; হযরত (দঃ) তাহাকে পায়ের দ্বারা ঠেলা দিয়া বলিলেন, এরূপ শয়ন করা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

কিছু রৌদ্রে কিছু ছায়ায় শোয়া বা বসা

৮৭। হাদীসঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু ছায়ায় এবং কিছু রৌদ্রে বসিতে নিষেধ করিয়াছেন।

কুলক্ষণ বা কুযাত্রা মানা

৮৮। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কুলক্ষণ বা কুযাত্রা মানা শেরেক।

৮৯। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যাদু টোনা করা শেরেক।

দুনিয়ার লোভ করা

৯০। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দুনিয়ার লোভ না করাতে রূহের (আত্মার)-ও শান্তি এবং শরীরের (স্বাস্থ্যের)-ও আরাম।

৯১। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যদি বকরীর পালের মধ্যে দুইটি ক্ষুধার্থ বাঘ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা যেমন বকরীর সর্বনাশ করে, মানুষের অর্থ-লিপ্সা এবং যশঃলিপ্সা তাহার ঈমানকে তদধিক সর্বনাশ ও ধ্বংস করে।

মৃত্যুকে স্মরণ করা

৯২। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা সর্বস্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে খুব বেশী স্মরণ করিবে। (তাহা হইলে সমস্ত বিলাসিতার মূলোচ্ছেদ সহজেই হইয়া যাইবে।)

৯৩। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সকাল বেলায় সন্ধ্যার চিন্তা করিও না এবং সন্ধ্যা বেলায় সকাল বেলার চিন্তা করিও না (কি জানি, হয়ত মৃত্যু আসিয়া পড়িতে পারে, অনর্থক চিন্তা করিয়া লাভ কি?) তোমরা রোগাক্রান্ত হইবার পূর্বে স্বাস্থ্যের কদর কর, (অর্থাৎ, স্বাস্থ্যের দ্বারা কাজ লও। কেননা, প্রতি মুহূর্তেই মানব দেহ রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে।) মৃত্যু আসিবার পূর্বে জীবনের মূল্যবান সময়ের কদর কর। (অর্থাৎ কোন্ মুহূর্তে মৃত্যু আসিয়া পড়িবে কিছুই জানা নাই। অতএব, জীবনের মূল্যবান সময়গুলি নষ্ট করিও না, সময়ের সদ্ব্যবহার কর।) মৃত্যু এবং রোগের সময় কিছুই করা সম্ভব নহে।

বিপদে ও বালা-মুছিবতে ছবর

৯৪। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু অহালাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মুসলমানদের দুনিয়াতে যাহাকিছু দুঃখ-কষ্ট বিপদ-বিমারী বা শোক-তাপ পৌঁছে, এমন কি (কোন জিনিস হারাইলে বা রুযির অভাব হইলে, বাল-বাচ্চার কারণে) যে কছি চিন্তা পেরেশানী আসে, তাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।

রোগীর সেবা-শুশ্রূষা

৯৫। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, একজন মুসলমান যদি অন্য মুসলমান রোগীর সেবা-শুশ্রূষা বা খবরবার্তা লওয়ার জন্য প্রাতে যায়, তবে প্রাতঃ কাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা দিন তাহার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা নেক দো'আ করিতে থাকে। আর যদি সন্ধ্যায় যায়, তবে সারা রাত ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা তাহার জন্য দো'আ করিতে থাকে।

মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন

৯৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুর্দাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গোসল দিবে, তাহার সমস্ত ছগীরা গোনাহ্ এভাবে মাফ হইয়া যাইবে, যেমন সে সদ্য মা'র পেট হইতে জন্মাইয়াছে। আর যে ব্যক্তি কোন মুর্দাকে কাফন দান করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌তের জোড়া পোশাক দান করিবেন। আর যে ব্যক্তি শোকসন্তপ্ত লোকের প্রবোধ ও সান্ত্বনা দান করিবে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে পরহেযগারীর লেবাস দান করিবেন এবং তাহার রূহের উপর রহ্‌মত নাযিল করিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন শোকসন্তপ্ত বা বিপদগ্রস্তকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দান করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বেহেশ্‌তের মধ্যে এমন পোশাক দান করিবেন, যাহার মূল্য সমস্ত দুনিয়ার (ধন-রত্নের) মূল্যের চেয়েও বেশী।

[**হাদীস** ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি খাঁটি দেলে খালেছ নিয়তে কোন মুসলমানের জানাযার পিছে পিছে যাইবে এবং শুধু জানাযার নামায পড়িয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, সে এক ক্বীরাত সওয়াব পাইবে এবং যে জানাযার নামায পড়িয়া মুর্দাকে দাফন করিয়া অর্থাৎ মাটি দিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, সে দুই ক্বীরাত সওয়াব পাইবে। এক ক্বীরাত ওহোদ পাহাড়ের সমান।

হাদীস ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে মুসলমানের জানাযার জন্য ৪০ জন এমন মু'মিন লোক যাহারা আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করে না, দাঁড়াইয়া আল্লাহ্র নিকট সুপারিশের জন্য দো'আ মাগফেরাত করিবে—অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, একশত মুসলমানের একটি দল যাহার জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট সুপারিশ করিবে, আল্লাহ্ পাক তাহাদের সুপারিশ মঞ্জুর করিবেন।]

চিল্লাইয়া ক্রন্দন করা

৯৭। **হাদীস** ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে মেয়েলোক চীৎকার করিয়া (বিনাইয়া বিনাইয়া) ক্রন্দন করিবে এবং যে মেয়েলোক তাহা শ্রবণ করার মধ্যে শরীক থাকিবে, তাহাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত। (আল্লাহ্র ওয়াস্তে এগুলি ছাড়িয়া দিন।)

এতীমের মাল খাওয়া

৯৮। **হাদীস** ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের দিন কিছুসংখ্যক লোক এমন অবস্থায় কবর হইতে উঠিবে যে, তাহাদের মুখ হইতে আগুনের শিখা বাহির হইতে থাকিবে। মজলিসের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর তাহারা কোন শ্রেণীর লোক? হুযূর বলিলেন, তোমরা কি শুন নাই যে, আল্লাহ্ পাক কোরআন মজীদের মধ্যে ফরমাইয়াছেন, যাহারা এতীমের মাল না-হকভাবে খায়, তাহারা আস্ত আগুন পেটের মধ্যে ভরিতেছে। (আজকাল লোকের এমন কু-অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, মানুষ মরিয়া গেলে শরীঅতের হুকুমের তথা আল্লাহ্র আইনের কোন ধার ধারে না; "জোর যার মল্লুক তার" কু-প্রথা অনুযায়ী যালেম সাজিয়া খোদার গযবের তলে পড়িয়া এতীমের ও দুর্বলদের হকের কোন পরওয়া না করিয়া, যার হাতে যা পড়ে সে তাই দখল করে। খবরদার! এরূপ করা চাই না। এতীম কিংবা দুর্বলদের হক নষ্ট করিবে না। তাহাদের ফরিয়াদি স্বয়ং রাব্বুল আ'লামীন আহ্কামুল হাকেমীন হইবেন। এতীম, বিধবা ও দুর্বলদের সম্পত্তি দখল করিয়া নেওয়া ত অনেক বড় যুলুমের কথা, এমন কি শরিকী মাল হইতে এতীমের অংশ উঠাইয়া না রাখিয়া এবং দুর্বল শরীকের আন্তরিক এজাযত না লইয়া, খয়রাত-যিয়াফত করাও দুরুস্ত নহে।)

কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ

৯৯। **হাদীস** ঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক লোকের নিকট চারিটি প্রশ্ন করা হইবে। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কাহাকেও পা নাড়িতে দেওয়া হইবে না। প্রথম প্রশ্ন এই যে, জীবনটা (বয়সটা) কি কাজে কাটাইয়াছ? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শরীঅতের হুকুম সম্বন্ধে যে জ্ঞান (ও এল্ম) তোমাকে দান করা হইয়াছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করিয়াছ বা আমল করিয়াছ কি না? তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি কি উপায়ে উপার্জন করিয়াছ—হালাল উপায়ে, না হারাম উপায়ে এবং টাকা-পয়সা কোথায় কি কাজে

কিভাবে ব্যয় করিয়াছ, সৎকাজে না অসৎ কাজে? ৪র্থ প্রশ্ন এই যে, যৌবনে সুষ্ঠু শরীরটা কি কাজে খাটাইয়াছ, কি কাজে শক্তিগুলি ব্যয় করিয়াছ—নফ্‌সের তাবেদারীর কাজে, না খোদার হুকুমের তাবেদারীর কাজে?

১০০। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের মাঠে সকলের সকল হক (দেনা-পাওনা তিল তিল হিসাব করিয়া) পরিশোধ করা হইবে, এমন কি শিংওয়ালা বকরী (জীব) যদি শিংহীন বকরীকে (জীবকে না-হক) গুঁতাইয়া থাকে ও কষ্ট দিয়া থাকে, তাহারও প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

বেহেশ্‌ত ও দোযখের কথা

১০১। হাদীসঃ হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ওয়াযের মজলিসে বলিয়াছেনঃ দেখ, অতি বড় দুইটি জিনিস আছে। খবরদার? তোমরা সেই দুইটি জিনিসের কথা কখনও ভুলিও না, তাহা বেহেশ্‌ত এবং দোযখ। এই দুইটির কথা বলিয়া হুযূর অনেক রোদন করিলেন। এমন কি, হুযূরের মুখমণ্ডলের দাড়ি মোবারক চোখের পানিতে ভিজিয়া গেল। তারপর আবার বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলিতেছি, যে আল্লাহ্‌র মুঠার মধ্যে আমার জান—আখেরাতের বিষয়সমূহ যাহা আমি যেরূপ জানি (যাহা আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে), তাহা যদি তোমরা (তদ্রূপ) জানিতে, তবে তোমরা ঘরে বাস করিতে না; বরং কাঁদিতে কাঁদিতে মাঠে-ময়দানে বাহির হইয়া মাথায় মাটি ও ধূলা মাখিয়া বেড়াইতে।

[**হাদীসঃ** হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তিনটি খাছলতের কথা আমি তোমাদের নিকট কসম খাইয়া বলিতেছি, (তোমরা অবিশ্বাস করিয়া অবহেলা করিও না। বিশ্বাস করিয়া আমল করিও; ফায়েদা পাইবে।) (১) দানে কখনও ধন কমে না। (২) একজনে অন্যায় করিলে তাহা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ছবর করিবে। এই ছবর করায় সম্মান বাড়িবে, কমিবে না। (৩) যাচ্ঞা বা ভিক্ষার দরজা যে খুলিবে, পরের কাছে মোহ্‌তাজী যে করিবে, তাহার দরিদ্রতা ও অভাব কখনও ঘুচিবে না।]

মুসলিম ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! এখানে মাত্র ১০১টি হাদীস আমরা উল্লেখ করিলাম। এই হাদীসগুলি সকলের মুখস্থ করিয়া নিজে আমল করিলে এবং অন্যান্য মুসলমান ভাই-বোনকে শুনাইলে অনেক ছওয়াব ও অনেক মর্তবা পাইবে। হাদীস শরীফে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, 'যে ব্যক্তি মাত্র চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করিয়া আমার উম্মতকে পৌঁছাইবে, তাহাকে হাকিকী আলেম সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া কিয়ামতের দিন উঠান হইবে।' অতএব, প্রত্যেক মুসলমানেরই এই হাদীসগুলি মুখস্থ করিয়া নিজে আমল করা উচিত এবং বাড়ীস্থ ও পার্শ্ববর্তী মুসলমান ভাই-বোনকে শুনান উচিত।

কিয়ামতের আলামত

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত হাদীস শরীফে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেঃ লোকেরা ওয়াক্‌ফ ইত্যাদি খোদায়ী মালকে নিজের মালের মত মনে করিয়া ভক্ষণ করিবে। যাকাত দেওয়াকে দণ্ড-স্বরূপ মনে করিবে। পরের আমানতের মালকে নিজের মালের মত মনে করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে। পুরুষ স্ত্রীর তাবেদারী করিবে। মাতার নাফরমানী করিবে, বাপকে পর মনে করিবে। অন্যান্য বন্ধুদেরে আপন মনে করিবে। দ্বীনের এলমকে দুনিয়ার অর্থ উপার্জনের জন্য শিক্ষা

করিবে। যাহারা বদ লোক, অর্থাৎ যাহারা লোভী, স্বার্থপর, দুশ্চরিত্র এবং অভদ্র, তাহারা রাজত্ব ও সরদারী করিবে। যে ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত নয়, অর্থাৎ সততা ও ত্যাগের দিক দিয়া যে কাজের যোগ্যতা যার মধ্যে নাই, তাহার উপর সেই কাজের ভার দেওয়া হইবে। লোকেরা যুলুমের ভয়ে যালেমের তাযীম করিবে। লোকেরা নেশা পানে মত্ত হইবে, নেশা পানকে লজ্জাজনক বলিয়াও মনে করিবে না। নাচ-গানের প্রথা অনেক বেশী প্রচলিত হইবে। ঢোল, তবলা ও সারিঙ্গি ইত্যাদি বাদ্যবাজনার প্রচলন খুব বেশী হইবে। পরবর্তী লোকেরা (ধর্মহীনতার কারণে এবং ধর্ম জ্ঞানের অভাবে) পূর্ববর্তী নেক লোকদের (বোকা, ভুলপন্থী ইত্যাদি বলিয়া) মন্দ বলিবে।

(এইসব পাপই দুনিয়া ধ্বংসের কারণ হইবে। এই জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্কবাণী দান করিয়া গিয়াছেন যে, এইসব পাপের স্রোত বহাইয়া তোমরা দুনিয়ার ধ্বংস টানিয়া আনিও না। এইসব পাপ (সংক্রামক ব্যাধি) যাতে ব্যাপক না হইতে পারে, তজ্জন্য সমষ্টিগতভাবে প্রাণপণে চেষ্টা করা দরকার।)

হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন এইসব আলামত পাওয়া যাইবে অর্থাৎ উপরোক্ত পাপ যখন ব্যাপক হইবে, তখন দুনিয়ার ধ্বংস নিকটবর্তী হইবে। তখন আগুনে-বাতাস প্রবাহিত হইবে। কিছু লোক পৃথিবী গর্ভে ধসিত হইবে। আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষিত হইবে। কিছু লোকের আকৃতি (প্রকৃতি) পরিবর্তিত হইয়া যাইবে; মানুষ শূকর, কুকুর হইয়া যাইবে। এইরূপ আরও অনেক বিপদ-আপদ বলা-মুছীবত এমনভাবে পর পর লাগাতর আসিতে থাকিবে, যেমন তস্‌বীহর সূতা ছিঁড়িয়া গেলে তস্‌বীহর দানাগুলি একের পর এক পর পর দ্রুত খসিয়া পড়িতে থাকে।

এইসব আলামতও হইবেঃ দ্বীনের এল্‌ম, ধর্মীয় জ্ঞানের মানুষের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। মিথ্যা বলাকে বুদ্ধিমত্তা বলিয়া মনে করা হইবে। আমানতের হেফাযতের খেয়াল লোকের দেলে থাকিবে না। হায়া-শরম লোকের মধ্যে থাকিবে না। সব দিকে কাফিরদের প্রভাব বেশী হইবে। মিথ্যা ও অন্যায় আইন-কানুন জারি হইবে।

যখন এইসব আলামত পুরা হইয়া সারিবে, তখন সবদেশে নাছারাদের রাজত্ব (ও প্রভাব) হইবে। এই সময় আবু সুফিয়ানের বংশধরের একজন লোক শাম দেশে বাদশাহ্ হইবে। সে সৈয়দ বংশের অনেককে হত্যা করিবে। সিরিয়া এবং মিসরে তাহার আইন কানুন প্রবর্তিত হইবে।

এই সময় রূমের মুসলমান বাদশাহর সঙ্গে, নাছারাদের একদলের সঙ্গে যুদ্ধ এবং একদলের সঙ্গে সন্ধি হইবে। শত্রু পক্ষ কুস্তুন্তুনিয়া জয় করিবে এবং তথায় তাহাদের আমল-দখল ও আইন-শাসন জারি হইবে। ঐ বাদশাহ্ নিজ রাজ্য শাম (সিরিয়া) ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। পরে আবার মুসলিম শক্তি খৃষ্টান শক্তির মিত্রপক্ষের সঙ্গে মিলিয়া শত্রুপক্ষের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া মুসলিম শক্তি জয়লাভ করিবে। এই যুদ্ধে জয়লাভের কয়েক দিন পর খৃষ্টান পক্ষের একজন লোক একজন মুসলমানের সামনে বলিবে যে, আমাদের ক্রুশের কল্যাণে এই যুদ্ধে জয় হইয়াছে! এই সামান্য কথার বাড়াবাড়িতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। এমনকি এই যুদ্ধে মুসলমান বাদশাহ্ শহীদ হইয়া যাইবেন এবং শাম দেশেও নাছারাদের রাজত্ব কায়েম হইয়া যাইবে। এই নাছারাদের (মিত্র) দল ঐ (শত্রু) দলের সহিত মিশিয়া যাইবে। অবশিষ্ট মুসলিম যোদ্ধা-দল মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিবে। খয়বরের নিকট পর্যন্ত নাছারাদের আমলদারী হইবে।

এমন সময় মুসলমানগণ পরস্পর আলোচনা করিবেন যে, এখন ইমাম মেহ্‌দীকে তালাশ করা উচিত, যেন এই মুছীবত হইতে নাজাত পাওয়া যায়। (নতুবা এইসব বিপদ থেকে বাঁচার আর

কোন উপায় বুঝে আসে না।) এই সময় ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিসসালাম মদীনা শরীফে অবস্থান করিবেন। লোকেরা তাঁহাকে বাদশাহ্‌ বানাইয়া বায়আত করিয়া তাঁহাকে বাদশাহী করিবার জন্য মজবুর না করে, এই ভয়ে তিনি মদীনা শরীফ পরিত্যাগ করিয়া মক্কা শরীফ চলিয়া যাইবেন। এই সময় সমস্ত আউলিয়া আবদাল ইমাম মেহ্‌দীর অন্বেষণে থাকিবেন। ইত্যবসরে সুযোগ বুঝিয়া অনেক শয়তান-প্রকৃতির লোকেরা মেহ্‌দী হওয়ার মিথ্যা দাবীও করিবে। শেষ সারকথা এই যে, হাকীকী ইমাম মেহ্‌দী একদিন বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের তওয়াফ করিতে থাকিবেন। যখন হাজরে আছওয়াদ এবং মকামে ইব্‌রাহীমের মাঝখানে হইবেন, তখন কিছু সংখ্যক নেক লোক ইমাম মেহ্‌দীকে চিনিয়া ফেলিবেন এবং তাঁহাকে ধরিয়া জোর-জবরদস্তিতে সকলে বায়আত করিয়া তাঁহাকে বাদশাহ্‌ বানাইবেন। ঐ বায়আতের সময় আসমান হইতে একটি গায়েবী আওয়াজ আসিবে, 'ইনিই আল্লাহ্‌র খলীফা মেহ্‌দী।' এই আওয়াজ সেখানে যত লোক উপস্থিত থাকিবে, সকলেই শুনিতে পাইবে।

ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালামের জাহির হওয়ার পর হইতে কিয়ামতের বড় বড় আলামত জাহির হওয়া শুরু হইবে।

অতঃপর যখন ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালামের জহুরের কথা এবং তাঁহার বাদশাহাতের বায়আতের কথা মশহুর হইয়া যাইবে, তখন মদীনা শরীফে যা কিছু মুসলমানের অবশিষ্ট সৈন্য বাকী ছিল, তাহারা মক্কা শরীফ চলিয়া আসিবে। শাম দেশের, এরাকের এবং ইয়ামনের যত আবদাল আউলিয়া থাকিবেন, তাঁহারাও তাঁহার খেদমতে হাজির হইবেন। এতদ্ব্যতীত আরও আরব-সৈন্য যথেষ্ট পরিমাণে একত্রিত হইবে। এই সংবাদ যখন সমস্ত মুসলিম জাহানে মশহুর হইয়া যাইবে, তখন খোরাসানের দিক হইতে একজন নেতা এক বৃহৎ সৈন্য দল লইয়া ইমামের সাহায্যার্থে অভিযান করিবেন। সেই সৈন্য দলের অগ্রণী দলের কমাণ্ডারের নাম হইবে মনছুর। এই সৈন্যদল পথিমধ্যেবহু সংখ্যক ধর্মদ্রোহীদের নিপাত করিতে করিতে যাইবেন।

উপরে যে লোকটির কথা বলা হইয়াছে যে, আবু সুফিয়ানের বংশধরের একজন লোক শাম দেশের বাদশাহ্‌ হইবে এবং সাইয়্যেদদের বাছিয়া বাছিয়া কতল করিবে। যেহেতু ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালামও সাইয়্যেদ, কাজেই তাঁহার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিবার জন্য সে একদল সৈন্য পাঠাইবে। এই সৈন্যদল যখন মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফের মাঝখানে এক ময়দানে এক পাহাড়ের কাছে উপস্থিত হইবে, তখন ঐ সম্পূর্ণ লশকর ভূ-গর্ভে ধসিয়া হালাক হইয়া যাইবে। ঐ সারা লশকরের মধ্যে হইতে মাত্র দুইজন লোক বাঁচিয়া থাকিবে, একজন যাইয়া ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালামকে সংবাদ পৌঁছাইবে। আর একজন ঐ শাম দেশস্থ সুফিয়ানী বাদশাহ্‌কে সংবাদ পৌঁছাইবে। ইত্যবসরে নাছারার দল একতাবদ্ধ হইয়া সৈন্যদল সংগ্রহ করিবে এবং মুসলিম শক্তির সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে। ঐ সৈন্য দল এত বড় হইবে যে, ৮০ টি ঝাণ্ডা হইবে। প্রত্যেক ঝাণ্ডার নীচে বার হাজার সৈন্য হইবে। অতএব, সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা নয় লক্ষ ষাট হাজার হইবে।

ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালাম মক্কা শরীফ হইতে মদীনা শরীফ যাইবেন। তথায় হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফ যেয়ারত করিয়া শাম দেশের দিকে অভিযান করিবেন। তিনি যখন দামেশক পর্যন্ত পৌঁছিবেন, তখন খৃষ্টান শক্তির সৈন্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িবে। ঐ যুদ্ধে ইমাম সাহেবের সৈন্যদল তিন ভাগ হইয়া যাইবে। এক ভাগ ভাগিয়া যাইবে। এক ভাগ শহীদ হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট এক ভাগ জয়লাভ করিবে।

এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, চারিদিন যুদ্ধ হইবে। ইমাম সাহেবের লশকরের মুসলমানগণ প্রথম দিন এই কসম খাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবেন যে, "জয় না করিয়া ফিরিব না। (হয় জয় না হয় ক্ষয় অর্থাৎ হয় যুদ্ধে জয় করিয়া আসিব, নয় জীবন খোদার রাস্তায় দিয়া দিব।) অতঃপর ঐ দিনকার প্রায় সমস্ত মুসলমান শহীদ হইয়া যাইবে। অল্প কিছু লোক বাঁচিয়া থাকিবে। তাহাদের লইয়া ইমাম সাহেব লশকরের সঙ্গে মিলিবেন। দ্বিতীয় দিন পুনরায় লশকরের যে অংশ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে তাহারা ঐভাবে কসম খাইয়া যাইবে এবং প্রায় সবাই শহীদ হইয়া যাইবে। অল্পকিছু সৈন্য বাঁচিয়া থাকিবে। তৃতীয় দিন পুনরায় ঐরূপ হইবে। চতুর্থ দিন যে অল্প সংখ্যক মুসলমান সৈন্য থাকিবে, তাহারাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের হাতে ফতেহ দিবেন। এই যুদ্ধে হারিয়া যাওয়ার পর কাফিরদের আর রাজত্ব করিবার ক্ষমতা বা সাহস থাকিবে না। অতঃপর ইমাম সাহেব দেশের শান্তি, শাসন ও শৃঙ্খলার বন্দোবস্ত করিবেন। চতুর্দিকে সৈন্যদল প্রেরণ করিবেন। স্বয়ং নিজে এন্তেজামের কাজ শেষ করিয়া কুস্তুন্তনিয়া জয় করিবার জন্য অভিযান করিবেন। তিনি যখন রূমের দরিয়ার কিনারায় পৌঁছিবেন, তখন এছ্হাক বংশীয় সত্তর হাজার সৈন্যের একদল লশকর জাহাজে করিয়া ঐ শহর জয় করিবার জন্য পাঠাইবেন। ঐ সৈন্যদল যখন শহরপানার প্রাচীরের কাছে পৌঁছিবে, তখন "আল্লাহু আকবর—আল্লাহু আকবর" না'রায়ে তক্বীরের বরকতে শহরপানার সামনের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং মুসলিম সেনাবাহিনী শহরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া কাফির যোদ্ধা দলকে কতল করিবে এবং শহর জয় করিবে। ইমাম সাহেব তথায় পূর্ণ শান্তি ও শাসন স্থাপন করিবেন। ইমাম সাহেবের বায়আতে খেলাফত হইতে এই পর্যন্ত ৬ বৎসর কিংবা ৭ বৎসর সময় লাগিবে।

দাজ্জালের ফেৎনা

[দাজ্জালের ফেৎনা অতি বড় ভীষণ ফেৎনা। সে অতি সুশ্রীমান পুরুষ হইবে, এবং ধ্যান-মগ্নরূপ ধারণ করিবে। লোকেরা বৃষ্টি চাহিলে বৃষ্টি বর্ষণ দেখাইবে। শয়তানের দল তাহার তাবেদার থাকিবে। কাজেই মৃতকে পর্যন্ত জীবিত করিয়া দেখাইবে, কৃত্রিম বেহেশ্ত দোযখ তাহার হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার বেহেশ্ত হইবে দোযখ এবং তাহার দোযখ হইবে বেহেশ্ত। ধনাগার তাহার সঙ্গে হইবে। যাহারা তাহাকে মান্য করিবে, তাহাদের স্বাস্থ্য সম্পত্তি অনেক বাড়িয়া যাইবে, আর যাহারা তাহাকে অমান্য করিবে, তাহাদের স্বাস্থ্য সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ আরও অনেক অলৌকিক কাণ্ড সেই পাপিষ্ঠ দুরাচার দেখাইবে। তাহা দেখিয়া কাঁচা ঈমানের স্বল্প-বুদ্ধির লোকেরা দলে দলে তাহার দলভুক্ত হইয়া জাহান্নামী হইবে। ভীষণ ফেৎনা, ভীষণ পরীক্ষা ও ভীষণ ধোঁকা হইবে। ঈমান যাহার পাক্কা,-সে নিশ্চয়ই বাঁচিয়া থাকিবে। হাদীস শরীফে এই দো'আ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে— اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ "হে আল্লাহ্! আমা-দিগকে দাজ্জালের ফেৎনা হইতে বাঁচাও।"

হযরত (দঃ) আমাদিগকে বারবার সতর্ক করিয়া গিয়াছেন—খবরদার! তোমরা দাজ্জালের ধোঁকায় পড়িও না। কৃত্রিম অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া ভুলিও না, নিশ্চয় জানিও—আল্লাহ্ নিরাকার, নির্বিকার, পাক-পবিত্র। দাজ্জালের এক চোখ কানা, এক চোখ টেরা। কিন্তু লোকের ঈমানের পরীক্ষার জন্য তাকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইবে। —অনুবাদক]

ইমাম সাহেব ঐ স্থানের শান্তি স্থাপন ও শৃঙ্খলার এন্তেজামের কাজে লিপ্ত থাকিবেন; এমন সময় হঠাৎ এক মিথ্যা খবর প্রচারিত হইবে যে, তোমরা ত এখানে বসিয়া আছ, অথচ শাম দেশে 'দাজ্জাল' আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়া তোমাদের খেলাফতের বংশের ধ্বংস সাধন করিতেছে। ইমাম সাহেব এই খবর পাইয়া শাম অভিমুখে রওয়ানা হইবেন। খবরের তাহ্‌কীকের জন্য নয়জন কিংবা পাঁচজন লোকের একটি ক্ষুদ্র অফ্‌দ (ডেপুটেশন) পাঠাইবেন। ঐ অফ্‌দের মধ্য হইতে একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিবে যে, ঐ খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখনও দাজ্জাল বাহির হয় নাই। ইমাম সাহেব এই খবর পাইয়া কিছু নিশ্চিন্ত হইবেন এবং অভিযানের জন্য তাড়াহুড়া না করিয়া পথিমধ্যে সমস্ত শহরে শান্তি শৃঙ্খলা কেমন হইয়াছে না হইয়াছে তাহা তদন্ত ও তাহ্‌কীক করিতে করিতে গিয়া নির্বিঘ্নে শাম দেশে পৌঁছিবেন।

তথায় যাওয়ার অল্পদিন পরেই দাজ্জাল বাহির হইবে। দাজ্জালের অভ্যুত্থান ইয়াহুদ সম্প্রদায় হইতে হইবে; শাম এবং এরাকের মাঝখানে তাহার অভ্যুত্থান হইবে। প্রথমে সে নবুওওতের দাবী করিবে। তারপর ইস্পাহানে যাইবে, তথায় ৭০ হাজার ইয়াহুদী তার তাবেদার হইবে। তখন সে খোদায়ী দাবী করিবে। এইরূপে অনেক দেশ জয় করিতে করিতে ইয়ামনের সীমানায় পৌঁছিবে। প্রত্যেক দেশ হইতেই যথেষ্ট সংখ্যক ধর্মভ্রষ্ট লোক তাহার দলভুক্ত হইবে। এমন কি মক্কা শরীফের সীমায়ও সে পৌঁছিবে। কিন্তু মক্কা শরীফের হেফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহাদের কারণে শহরের ভিতর ঢুকিতে পারিবে না। তখন মক্কা শরীফ হইতে মদীনা শরীফের দিকে যাইবে। তথায়ও খোদার রহমতে ও খোদার কুদরতে ফেরেশ্‌তা প্রহরী নিযুক্ত থাকিবে। কাজেই মদীনা শরীফের শহরের ভিতরও ঐ খবীস ঢুকিতে পারিবে না। কিন্তু মদীনা শরীফে তিনবার ভূমিকম্প হইবে। সেই কারণে যতলোক কাঁচা ঈমানের থাকিবে, তাহারা মদীনা শরীফের শহর হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে। তথায় গিয়া দাজ্জালের ধোঁকার জালে পতিত হইবে। ঐ সময় মদীনা শরীফের একজন বুযুর্গ দাজ্জালের সঙ্গে খুব তর্কবিতর্ক, বাহাছ-মোবাহাছা করিবেন। দাজ্জাল যুক্তিসংগত উত্তর না দিতে পারিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কতল করিয়া ফেলিবে, পুনর্বার তাঁহাকে জীবিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে— কেমন, এখন তো আমাকে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে? তখন বুযুর্গ বলিবেন, কখনও না; এখন ত আমার আরও একীন বেশী হইয়াছে যে, তুই দাজ্জাল। দাজ্জাল তখন ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় কতল করার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহার সব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে; তাঁহাকে আর মারিতে পারিবে না। কষ্ট দিবে অবশ্য, প্রাণে বধ আর করিতে পারিবে না।

দাজ্জাল তথা হইতে শাম দেশ অভিমুখে অভিযান করিবে। যখন দামেশকের নিকটবর্তী পৌঁছিবে, ইমাম মেহ্‌দী আলাইহিস্‌সালাম তখন পূর্বেই তথায় পৌঁছিয়া যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিবেন। একদিন আছরের সময় মোয়ায্‌যিন আযান দিবেন। সমস্ত মুছল্লি নামাযের তৈয়ারি করিবে, এমন সময় হঠাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম দুইজন ফেরেশ্‌তার কাঁধের উপর ভর দিয়া আসমান হইতে অবতীর্ণ হইবেন। দামেশকের মসজিদের পূর্ব দিকের মিনারার উপর আসিয়া দাঁড়াইবেন। তথা হইতে সিঁড়ি লাগাইয়া নীচে নামিবেন। ইমাম সাহেব যুদ্ধের সমস্ত ভার, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করিতে চাহিবেন। কিন্তু তিনি বলিবেন, ভার তো সব আপনার উপরই থাকিবে; আমি শুধু দাজ্জালকে বধ করিবার জন্য আসিয়াছি, সেই ভার আমার উপর থাকিবে। পরদিন সকাল বেলায় ইমাম সাহেব লশকর সাজাইবেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম একটি ঘোড়ায়

সওয়ার হইয়া একটি নেজা (বল্লম) হাতে লইয়া দাজ্জালের দিকে ধাবিত হইবেন। অন্যান্য মুসলমান সৈন্যগণ দাজ্জালের সৈন্যের উপর আক্রমণ করিবে। ভীষণ যুদ্ধ হইবে। ঐ সময় হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের নিঃশ্বাসের মধ্যে এমন তাছির হইবে যে, যতদূর দৃষ্টি যাইবে ততদূর শ্বাস যাইবে এবং যে কোন কাফিরের গায়ে ঐ শ্বাসের একটু বাতাস লাগিবে, সে তৎক্ষণাৎ হালাক হইয়া যাইবে। দাজ্জাল হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামকে দেখিয়া ভাগিবে। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম পশ্চাদ্ধাবণ করিয়া "বাবে লোদ" নামক স্থানে গিয়া তাহাকে বধ করিবেন। ওদিকে মুসলিম সৈন্যবাহিনী দাজ্জালের সৈন্যগণকে বধ করিবে।

অতপর হজরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম যত জায়গায় দাজ্জাল অশান্তি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, সেই সব স্থানে গিয়া গিয়া জনসাধারণকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিবেন।

সারা দুনিয়ায় মুসলমান

এই সময় দুনিয়াতে কোন কাফির থাকিবে না, সব মুসলমান হইয়া যাইবে। কিছুদিন পর হযরত ইমাম মেহদী আলাইহিস্‌সালামের এন্তেকাল হইয়া যাইবে। সমস্ত মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের উপর আসিবে।

ইয়াজুজ মাজুজের ফেৎনা

দাজ্জালের ফেৎনার পর আসিবে ইয়াজুজ মাজুজের ফেৎনা। ইয়াজুজ মাজুজ অতি ভীষণ অত্যাচারী মানুষ। তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী হইবে, উভয়াঞ্চলের শেষ সীমার পর সপ্ত দেশের বাহিরে সেখানকার সমুদ্রগুলি অত্যধিক ঠাণ্ডার কারণে এত জমাট যে, জাহাজ চলাচল করিতে পারে না, তথায় তাহাদের বাসস্থান অর্থাৎ ছদ্দে সেকান্দরির (সেকান্দর বাদশাহ্‌র দেওয়ালের) পরপার হইতে তাহারা আসিবে। সমস্ত পৃথিবীতে তাহারা ভীষণ উৎপাত শুরু করিবে। (তাহাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার কাহারও ক্ষমতা থাকিবে না। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে মুসলমানদেরকে কোহে তূরে লইয়া যাইবেন। অবশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতে তাহাদের ধ্বংস করিয়া দিবেন। অতঃপর ঈসা আলাইহিস্‌সালাম পাহাড় হইতে বাহিরে আসিবেন। তিনি ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব পরিচালনা করার পর এন্তেকাল ফরমাইবেন। তাঁহাকে আমাদের হযরতের রওজা শরীফের মধ্যে নবী (দঃ)-এর কবরের পার্শ্বেই দাফন করা হইবে।

হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের ওফাতের পর, জাহ্‌জাহ্ নামক কাহ্‌তান বংশীয় ইয়ামনবাসী একজন লোক তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। অতি ন্যায়পরায়ণতার সহিত তিনি রাজত্ব করিবেন। তাঁহার পর তাঁহার বংশীয় আরও কয়েকজন লোক বাদশাহ্ হইবেন।

আকাশের ধুঁয়া

তারপর ক্রমান্বয়ে দ্বীনদারী এবং ধর্মের কথা কম হইয়া যাইবে এবং চতুর্দিকে অধর্ম এবং বদ-দ্বীন ও বে-দ্বীনি শুরু হইয়া যাইবে। এই সময় আকাশে এক প্রকার ধুঁয়ার মত দেখা দিবে। এই ধুঁয়া পৃথিবীতে আসিবে। মুমিন মুসলমানগণের তাহাতে এক প্রকার সর্দির মত ভাব হইবে। কাফিরেরা বেহুঁশ হইয়া যাইবে। ৪০ দিন পর ধুঁয়া পরিষ্কার হইবে।

পশ্চিম দিকে সূর্য উদয়

এই সময়ের নিকটবর্তী একদিন হঠাৎ বকরা ঈদের চাঁদের ১০ তারিখের পর একটি রাত এত লম্বা হইবে যে, লোকের দেল অস্থির হইয়া উঠিবে, ছেলেদের ঘুমাইতে ঘুমাইতে ত্যক্ত ধরিয়া যাইবে। গবাদিপশু বাহিরে যাইয়া ভক্ষণ করিবার জন্য চিল্লাইতে থাকিবে, তবুও রাত্রি প্রভাত হইবে না। সমস্ত লোক পেরেশন হইয়া যাইবে। যখন তিন রাতের পরিমাণ সময় অতিবাহিত হইবে, তখন সূর্য সামান্য কিছু গ্রহণের আলোর মত আলো লইয়া পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে, যখন পশ্চিম দিক দিয়া সূর্য উদয় হইবে, তখন আর কাহারও ঈমান বা তওবা কবূল হইবে না। সূর্য সাধারণতঃ দুপুরের পূর্ববর্তী সময়ে যেখানে থাকে সেই পর্যন্ত উঠিয়া আল্লাহ্‌র হুকুমে আবার পশ্চিম দিকেই গিয়া অস্ত যাইবে। ইহার পর আবার রীতিমত সূর্য পূর্বের নিয়ম মত পূর্বদিকে উদয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যাইবে এবং আলো-উত্তাপও দস্তুর মত হইবে।

দাব্বাতুল আরদ (অদ্ভূত জন্তু)

ইহার কিছুদিন পর ভূমিকম্পে মক্কা শরীফের ছাফা পাহাড় ফাটিয়া যাইবে। তথা হইতে আশ্চর্য ছুরতের এক অদ্ভূত জন্তু বাহির হইবে। সে মানুষের সঙ্গে কথা কহিবে। অতি দ্রুতবেগে চলিয়া সারা পৃথিবী ঘুরিয়া আসিবে। হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামের 'আছা' (লাঠি) দ্বারা মু'মিনগণের কপালে একটি নূরানী রেখা টানিয়া দিবে। তাহাতে মুমিনগণের চেহারা উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। বেঈমানগণের নাকের অথবা গর্দানের উপর হযরত সোলায়মান আলাইহিস্‌সালামের আংটির দ্বারা সীলমোহর করিয়া দিবে। তাহাতে তাহাদের সম্পূর্ণ চেহারা মলিন হইয়া যাইবে। এসমস্ত কাজ করিয়া সে গায়েব হইয়া যাইবে। "দাব্বাতুল আরদ" একটি অদ্ভূত জন্তু হইবে। উহা ৬০ হাত লম্বা হইবে। চার পা হইবে এবং সর্বশরীরে হলুদ বর্ণের পশম হইবে! দুইটি বাহু হইবে। এত দ্রুতবেগে চলিবে যে, পাখিও তার মত চলিতে পারিবে না। মানুষের মত মুখ হইবে। মাথা হইবে গরুর মাথার ন্যায় এবং শিং হইবে গরুর শিং এর মত। শূকরের চোখের মত চোখ হইবে, গর্দান ও উরু উটের ন্যায় হইবে, বন্য হাতীর কানের মত কান, বাঘের রং-এর মত রং এবং বাঘের ছিনার মত ছিনা হইবে। লেজ হইবে দুম্বার লেজের ন্যায়।

সারা দুনিয়ায় কাফের,
বায়তুল্লাহ্ শহীদ এবং কিয়ামত

দাব্বাতুল আরদের গায়েব হওয়ার পর দক্ষিণ দিক হইতে নেহায়েত আরামদায়ক একটি বাতাস আসিবে। ঐ বাতাসে সমস্ত ঈমানদারগণের বগলে কিছু অসুখ হইবে। তাহাতে সমস্ত মুসলমান মরিয়া যাইবে। সারা দুনিয়ার উপর হাবশী কাফিরদের রাজত্ব এবং তাহাদের একনায়কত্ব চলিবে। তাহারা বায়তুল্লাহ্ শরীফকে শহীদ করিয়া ফেলিবে হজ্জ বন্ধ হইয়া যাইবে। কোরআন শরীফ লোকের দেল হইতে এবং কাগজ হইতে উঠিয়া যাইবে। খোদার ভয় এবং লোকের লজ্জা

একেবারে উঠিয়া যাইবে। একজন লোকও 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করার বা আল্লাহ্ নাম লওয়ার থাকিবে না। এই সময় শামদেশে সব জিনিস খুব সস্তা ও সুলভ হইবে। উটে চড়িয়া ও পায়ে হাঁটিয়া লোকেরা সেই দিকে যাইতে থাকিবে। যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদেরও একটি আগুন আসিয়া ঐদিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে। কারণ, ঐ শাম দেশেই ক্বিয়ামতের কেন্দ্র হইবে। এই কাজ করিয়া ঐ আগুন গায়েব হইয়া যাইবে। এই সময় দুনিয়ার খুব উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইবে। তিন চারি বৎসর এই অবস্থায় অতিবাহিত হইবে। একদিন ১০ই মোহররম শুক্রবার সকালে সমস্ত লোক নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকিবে। হঠাৎ এমন সময় সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে। প্রথম প্রথম হাল্কা আওয়াজ হইবে। পরে ঐ আওয়াজ এত কঠোর ও ভীষণ হইবে যে, তাহার হয়বতে সমস্ত লোক মরিয়া যাইবে, জমিন ও আসমান ফাটিয়া যাইবে, দুনিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাইবে। সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হওয়ার সময় হইতে সিঙ্গায় ফুঁকের সময় পর্যন্ত, এক শত বিশ বৎসরের জমানা হইবে। এইখান হইতে কিয়ামতের দিন শুরু।

খাছ কিয়ামতের কথা

আল্লাহ্র আদেশে যখন ইস্রাফীল আলাইহিস্সালাম সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, তখন সমস্ত দুনিয়া ফানা (ধ্বংস) হইয়া যাইবে। চল্লিশ বৎসর এই শূন্য ও খালি অবস্থায় থাকিবে! তারপর আবার আল্লাহ্র আদেশে ইস্রাফীল আলাইহিস্সালাম দ্বিতীয় বার সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। ঐ ফুঁকে জমিন আসমান পুনরায় সৃষ্টি হইবে এবং আদিকাল হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লোক কবর হইতে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে। সকলেই হাশরের ময়দানে সমবেত হইবে। সূর্য অনেক নিকটবর্তী আসিবে। তাহার উত্তাপে লোকের মস্তিষ্ক টগ্বগ করিয়া উতলাইতে থাকিবে। লোকের পাপের পরিমাণ পছিনা (ঘাম) হইবে। কাহারও হাঁটু সমান, কাহারও বুক সামান, কাহারও গলা সমান ইত্যাদি। ঐ ময়দানে লোকে লোকারণ্য থাকিবে। কোটি কোটি লোক সব ক্ষুধায়, পিপাসায় দাঁড়াইয়া অতি অস্থির অবস্থায় ছটফট করিতে থাকিবে।

যাহারা নেক লোক হইবেন, তাঁহাদের জন্য ঐ জমিনের মাটি ময়দা হইয়া যাইবে, তদ্দ্বারা তাঁহারা ক্ষুধা নিবারণ করিবেন। পিপাসা নিবারণের জন্য তাঁহারা 'হাওযে কাওছরের' কাছে যাইবেন। (যাহাদের ভাগ্যে আছে তাঁহারা সেই অতি মধুর শরবৎ পান করিবেন।)

বড় শাফা'আত,
হিসাব শুরুর সুপারিশ

যখন সকলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘাবড়াইয়া অস্থির হইয়া যাইবে, তখন সকলে পরামর্শ করিয়া সুপারিশের জন্য প্রথমে হযতর আদম আলাইহিস্সালামের কাছে যাইবে। তিনি সুপারিশ করিতে অস্বীকার করিলে তারপর সকলে হযরত নূহ আলাইহিস্সালামের কাছে যাইবে। তিনি অস্বীকার করিলে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালামের কাছে যাইবে। তিনি অস্বীকার করিলে হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের কাছে যাইবে। তিনি অস্বীকার করিলে (লোকেরা শুধু এতটুকু কথার সুপারিশ চাইবে যে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অসহ্য হইয়া গিয়াছে, অন্ততঃ আমাদের হিসাবই শুরু হইয়া যাউক। কিন্তু খোদার গযব ও জালাল ঐদিন এত বেশী হইবে যে, সমস্ত উলুলআয্ম পয়গম্বর পর্যন্ত

ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিবেন, আমাদের কথা বলার সাহস হয় না।) অবশেষে আমাদের হযরত খাতামুন্নাবিয়ীন সাইয়্যেদুল মুরসালীনের খেদমতে সকলে হাযির হইয়া ঐ সুপারিশের দরখাস্ত করিবে। আমাদের হুযূর আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে আবেদন মঞ্জুর করিবেন। ঐ সময় হুযূর "মকামে মাহমুদে" (সর্বোচ্চ মকামে) পৌঁছিয়া আল্লাহ্‌র সামনে সজ্‌দায় পড়িয়া আল্লাহ্‌র অসংখ্য প্রশংসা করিবেন এবং শাফা'অত (সুপারিশ) করিবেন। আল্লাহ্ সুপারিশ মঞ্জুর করিবেন। বলিবেন, হে আমার পেয়ারা! আপনি সজ্‌দা হইতে মাথা উঠান, আপনার সুপারিশ আমি কবূল করিলাম, আপনার দরখাস্ত আমি মঞ্জুর করিলাম। এখনই আমি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি করিয়া সারা পৃথিবীর হিসাব কিতাব করিয়া দিতেছি। ইহাকেই বলে "শাফা'আতে কোব্‌রা" অর্থাৎ সর্বজগতের জন্য সবচেয়ে বড় শাফা'আত।

কিয়ামতের হিসাব নিকাশ

প্রথমে আসমান হইতে অসংখ্য ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হইবে এবং চতুর্দিক দিয়া সমস্ত লোকদেরকে ঘেরাও করিয়া রাখিবে। তারপর আল্লাহ্‌র আরশ অবতীর্ণ হইবে। তথায় আল্লাহ্‌র খাছ তজল্লী হইবে। হিসাব-নিকাশ শুরু হইবে। আমলনামা উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ঈমানদারের আমলনামা ডান হাতে আসিবে। বে-ঈমানদের বাম হাতে আমলনামা আপনা-আপনিই আসিবে। আমলের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মাপযন্ত্র (মীযান) খাড়া করা হইবে। ঐ মাপযন্ত্রের দ্বারা তিল তিল করিয়া সকলের নেকী-বদী (পাপ-পুণ্য) মালুম হইয়া যাইবে। অতঃপর পুলছেরাতের উপর দিয়া যাইবার হুকুম হইবে। যাহাদের নেকীর ভাগ বেশী হইবে, তাহারা পুলছেরাত পার হইয়া বেহেশ্‌তে গিয়া পৌঁছিবে। (যার যার নেকী অনুসারে) কেহ বিদ্যুৎ গতিতে যাইবে, কেহ ঘোড়ার মত দ্রুত যাইবে, কেহ হামাগুড়ি দিয়া দীর্ঘকাল পর যাইবে।

(এক রেওয়ায়তে আছে যে, পুলছেরাত তিন বৎসরের পথ হইবে। ওয়াল্লাহু আ'লামু।) যাহাদের গোনাহ্‌র ভাগ বেশী হইবে, তাহাদের গোনাহ্ যদি আল্লাহ্ দয়া করিয়া মাফ না করিয়া দেন, তবে তাহারা দোযখের মধ্যে পড়িয়া যাইবে। যাহাদের নেকী-বদী সমান সমান হইবে, তাহারা বেহেশ্‌ত-দোযখের মাঝখানে আ'রাফ নামক একটি স্থান আছে, তথায় থাকিয়া যাইবে; বেহেশ্‌তে পৌঁছিতে পারিবে না।

অন্যান্য শাফা'আত

তারপর আমাদের হযরত পয়গম্বর ছাহেব এবং অন্যান্য পয়গম্বরগণ এবং আলেম, ওলী, শহীদ, হাফেয এবং অন্যান্য ছালেহীন নেক লোকগণ গোনাহ্‌গারদের বখ্‌শাইবার জন্য শাফা'আত করিবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সেই সব শাফা'আত মঞ্জুর করিবেন। এমন কি, যাহার দেলের মধ্যে বিন্দু পরিমাণও ঈমান থাকিবে, তাহাকেও দোযখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশ্‌তে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। যাহারা আ'রাফে ছিল অবশেষে তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। দোযখে শুধু তাহারাই থাকিবে, যাহারা কাফির এবং মুশরিক। কাফির এবং মুশরিকগণের কখনও দোযখ হইতে মুক্তি নছীব হইবে না। যখন সমস্ত বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে এবং দোযখী দোযখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়া যাইবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা "মওতকে একটি ভেড়ার ছুরতে বেহেশ্‌ত-দোযখের মাঝখানে আনাইয়া সমস্ত বেহেশ্‌তী এবং দোযখীদের দেখাইয়া যবাহ্ করাইয়া

দিবেন। তৎপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করাইয়া দিবেন যে, এখন আর কাহারও মওত নাই। বেহেশ্‌তবাসীদেরও মৃত্যু নাই, তাহারাও চিরস্থায়ী বেহেশ্‌তী এবং দোযখবাসীদেরও মৃত্যু নাই, তাহারাও চিরস্থায়ী দোযখী। সেই সময় বেহেশ্‌তীদের খুশীর সীমা থাকিবে না এবং দোযখীদের দুঃখ ও কষ্টের সীমা থাকিবে না।

বেহেশ্‌তের নেয়ামতের বর্ণনা

১। হাদীসঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহা কেহ চোখেও দেখে নাই; কানেও শুনে নাই এবং কাহারও কল্পনায়ও তাহা আসিতে পারে না।

২। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তের অট্টালিকায় একখানা ইট হইবে রূপার, একখানা ইট হইবে সোনার, এবং ইটে ইটে মিলাইবার গারা হইবে খালেছ মেশকের (কস্তুরীর) এবং বেহেশ্‌তের বাড়ীর উঠানের ও বাগবাগিচার কঙ্করগুলি হইবে খাঁটি মোতি ও ইয়াকুতের এবং তথাকার মাটি হইবে জাফরান। যে একবার বেহেশ্‌তে পৌঁছিবে, সে চির-সুখে ও চির-শান্তিতে কাল যাপন করিবে, আদৌ কোনরূপ দুঃখ কষ্ট তথায় হইবে না। তথায় চিরকাল ঐরূপ সুখে এবং শান্তিতে থাকিবে। তথায় মৃত্যু নাই, তথায় কাপড় ময়লা হইবে না, তথায় চির যৌবন হইবে। (কখনো বার্ধক্য বা দৌর্বল্য বা রোগ-শোক বা বিন্দুমাত্র কষ্ট-ক্লেশ বা ক্লান্তি, দুর্গন্ধ বেহেশ্‌তবাসীদের স্পর্শও করিতে পারিবে না। পেশাব-পায়খানার কষ্টও হইবে না, হায়েয-নেফাসের কষ্টও হইবে না।)

৩। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তের মধ্যে দুইটি বাগ এমন হবে যে, তাহার সমস্ত সামান থাল-বাটী, ঘড়া-ঘটী, পালঙ্ক-কুরসী ইত্যাদি সব চান্দি-রূপার হইবে। আর দুইটি বাগ এমন হইবে যে, তথাকার সমস্ত সামান থাল-বাটী, ঘড়া, পালঙ্ক-কুরসী ইত্যাদি সব সোনার হইবে।

৪। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তের মধ্যে পর পর উপর নীচে এক শতটি স্তর হইবে। প্রত্যেক নীচের স্তর হইতে উপরের স্তরের দূরত্ব এতখানি, যতখানি জমীন হইতে প্রথম আসমানের দূরত্ব, অর্থাৎ পাঁচ শত বৎসরের পথ। বেহেশ্‌তের সমস্ত স্তরের মধ্যে বড় স্তরের নাম ফিরদাউস। জান্নাতুল ফিরদাউস হইতেই বেহশ্‌তের চারিটি নহর জারি হইয়াছে। একটি নহর দুধের, একটি নহর মধুর, একটি নহর শরাবান-তহুরার (পবিত্র মদিরার), একটি নহর নির্মল পানির। ফিরদাউসের উপরে আর বেহেশ্‌ত নাই। ফিরদাউসের উপর খোদার আরশ। হযরত (দঃ) আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমরা (আশা ছোট করিও না, পস্ত-হিম্মত হইও না,) আল্লাহ্‌র কাছে যখন চাহিবে, জান্নাতুল ফিরদাউস চাহিবে। হযরত (দঃ) ইহাও ফরমাইয়াছেন, জান্নাতুল ফিরদাউসের পরিসর এত প্রশস্ত যে, তাহার এক এক দরজা এত বড় হইবে যে, সারা দুনিয়ার লোকেরও তথায় অতি সহজে সঙ্কুলান হইতে পারিবে; বরং সারা দুনিয়ার লোকেও ভরিবে না।

৫। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তের বাগিচার মধ্যে যত গাছ হইবে তাহার কাণ্ড ও গুড়ি হইবে সোনার।

৬। হাদীসঃ হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, সর্বপ্রথমে যে দল বেহেশ্‌তে যাইবে, তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তারপর যে দল যাইবে তাহাদের চেহারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত চমকিলা হইবে। বেহেশ্‌তে না পেশাবের হাজত হইবে, না পায়খানার হাজত হইবে,

না থুথু হইবে, না কাশ থুথু হইবে, না নাকের শ্লেষ্মা হইবে। বেহেশ্‌তের কাঙ্গি হইবে সোনার এবং গায়ের ঘামের সুগন্ধি হইবে মেশ্‌ক কস্তুরীর। মজলিসের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর! (যখন পেশাব পায়খানা হইবে না,) তবে খানা-পানি কোথায় যাইবে? হযরত (দঃ) উত্তর করিলেন, একটি ঢেকুর আসিবে, যাহার খোশবু হইবে মেশ্‌ক কস্তুরীর মত, তাহাতেই সমস্ত খানাপানি হজম হইয়া যাইবে। (বেহেশ্‌তবাসীদের পোশাক হইবে রেশমের এবং তাহাদের খেদমতগার হইবে হূর ও গেলমান। হূর অরূপ রূপবতী সমবয়স্কা প্রাণপ্রিয়া যুবতী। গেলমান মাণিকের মত সুন্দর সুন্দর বালক। তাহারা চিরকাল বালকই থাকিবে এবং খেদমত করিবে। বেহেশ্‌তবাসীদের গ্লাস হইবে রূপার, কিন্তু সে রূপা কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ। সোনার খাটে আরাম করিবে; যখন যে মেওয়া খাইতে মনে চাহিবে, আপনাআপনি মেওয়ার গুচ্ছসহ ডাল বাঁকিয়া যাইবে। তথায় শীত বা গরমের কষ্ট আদৌ হইবে না। সূর্যের আলোর চেয়ে বেশী আলো হইবে, কিন্তু গরম হইবে না।)

৭। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, বেহেশ্‌তের মধ্যে সকলের নিম্ন শ্রেণীর যে ব্যক্তি হইবে তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাকে যদি দুনিয়ার কোন রাজা বাদশাহ্‌র রাজত্বের সমান দেই, তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট কি না? সে বলিবে, ইয়া রাব্বুল আলামীন। আমি সন্তুষ্ট আছি। (আমি ত এরও উপযুক্ত নই।) তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বলিবেন, যাও, তোমাকে তাহার পাঁচগুণ দিলাম। সে বলিল, ইয়া রাব্বুল আলামীন! আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, যাও, উহাও দিলাম এবং আরও উহার দশগুণ দিলাম এবং তা-ছাড়া আরও যে কোন সময় যে কোন জিনিস তোমার মনে চাহিবে বা তোমার চোখে যাহাতে শান্তি হইবে, তুমি তাহা নিতে পারিবে।

৮। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌তবাসীদের কাছে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ কি না? তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে কি না? প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের সাধ মিটিয়াছে কি না? সকলে সমস্বরে বলিবে, ইয়া রাব্বাল আলামীন! হে আমাদের প্রভু! আমরা কেমনে সন্তুষ্ট না হইয়া পারি? আপনি ত আমাদের এত দান করিয়াছেন, যাহা আজ পর্যন্ত কাহাকেও দান করেন নাই। তখন আল্লাহ্ পাক বলিবেন, আমি তোমাদিগকে এমন জিনিস দান করিব, যাহা এই সব হইতে উত্তম। সকলে সমস্বরে আরয করিবে, হে আমাদের প্রভু! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কি হইতে পারে? (তাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে।) তখন আল্লাহ্ পাক বলিবেন, এর চেয়ে উত্তম জিনিস এই যে, আমি তোমাদের সুসংবাদ শুনাইয়া দিতেছি যে, আমি চিরতরে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইলাম, আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট বা নারায হইব না।

৯। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন সমস্ত বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে যাইয়া সারিবে, তখন আল্লাহ্ পাক তাহাদের বলিবেন, তোমরা কি আরও কিছু বেশী চাও? সকলে বলিবে, (ইয়া আল্লাহ্, রাব্বাল আলামীন!) আপনি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন, আমাদেরকে (চিরশান্তি নিকেতন) বেহেশ্‌ত দান করিয়াছেন, আমাদের দোযখ লইতে নাজাত দিয়াছেন, আর আমরা কি চাহিব? সেই সময় আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহু পর্দা উঠাইয়া দিবেন এবং স্বীয় দীদারে মোবারক বেহেশ্‌তবাসীদের নছীব করিবেন। বেহেশ্‌তবাসীরা অনুভব করিবে যে, এর চেয়ে (দীদার মোবারকের চেয়ে) বড় নেয়ামত, শান্তির জিনিস ও উপাদেয় সামগ্রী আর নাই।

দোযখের আযাবের বর্ণনা

১। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দোযখের আগুনকে হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার রং লাল হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার রং সাদা হইয়া গিয়াছিল। তারপর আবার এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার রং ঘোর কাল হইয়া সম্পূর্ণ অন্ধকার অবস্থায় আছে।

২। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দুনিয়ার আগুন দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ, এবং দোযখের আগুন দুনিয়ার আগুনের সত্তর গুণ বেশী তেজ।

৩। **হাদীসঃ** হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, দোযখের গর্ত এত গভীর যে, যদি একখানা ভারী পাথর দোযখের মুখ থেকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহার তলায় পৌঁছিতে সত্তর বৎসর লাগিবে।

৪। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দোযখ এত বড় বিশাল ও প্রকাণ্ড হইবে যে, কিয়ামতের দিন যখন দোযখকে সর্বসমক্ষে টানিয়া আনা হইবে, তখন তাহাতে সত্তর হাজার রশি লাগান হইবে, প্রত্যেক রশিকে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা ধরিয়া টানিবে।

৫। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দোযখের মধ্যে সবচেয়ে কম আযাব যাহার হইবে, তাহার পায়ে শুধু দোযখের আগুনের দুইখানা জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাতেই তাহার মগজ ডেগের ফুটন্ত পানির মত টগ্‌বগ করিতে থাকিবে এবং সে মনে করিবে যে, আমার চেয়ে বেশী কষ্ট আর কাহারও নাই।

৬। **হাদীসঃ** হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, দোযখের মধ্যে এত বড় বড় সাপ আছে যে, দেখিতে উটের মত। তাহার বিষ এত তেজ যে, একবার যদি দংশন করে, তবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাহার বিষের লহর উঠিতে থাকিবে। দোযখের মধ্যে বিচ্ছু এত বড় বড় যে, পালান কষা খচ্চরের মত। তাহার বিষ এত তীব্র যে, একবার যদি হুল ফুটায়, তবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাহার বিষের ক্রিয়া থাকিবে।

৭। **হাদীসঃ** একবার হযরত (দঃ) নামায শেষ করিয়া মিম্বরের উপর চড়িয়া বলিতে লাগিলেন, আজ এই নামাযের মধ্যে বেহেশ্‌ত এবং দোযখের হু-বহু নক্‌শা আমি দেখিয়াছি। বেহেশ্‌তের মত সুন্দর আরামের জিনিস আমি দেখি নাই এবং দোযখের মত ভীষণ কষ্টদায়ক জিনিসও আমি দেখি নাই।

(কোরআন শরীফে আছে—দোযখের ভীষণ আযাব আরও ভীষণতর হওয়ার কারণ এই যে, দুনিয়ার কষ্টে মানুষের প্রাণ-পাখী উড়িয়া বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু দোযখের মধ্যে কাহারও মৃত্যু নাই। যতবার খাল-চামড়া আগুনে পুড়িয়া পচিয়া গলিয়া যাইবে, ততবারই পুনরায় নূতন খাল-চামড়া হইবে, যাহাতে আবারও যন্ত্রণা স্থায়ী ও ভীষণ হইতে ভীষণ হইতে পারে। কোরআন শরীফে অন্য এক আয়াতে আছে—দোযখবাসীদের দোযখের আগুনের কাপড় পরান হইবে। মাথার উপরে এমন টগ্‌বগ্ করা ফুটন্ত গরম পানি ঢালা হইবে যে, তাহাতে তাহাদের সর্বশরীরে

খাল-চামড়া এবং পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী গলিয়া খসিয়া পড়িবে এবং তাহাদের (তপ্ত) লৌহের মুগুর দ্বারা পিটান হইবে। দোযখবাসীরা যখন পিপাসায় ছটফট করিয়া পানি খাইতে চাহিবে তখন তাহাদের 'হামীম ও গাচ্ছাক' দেওয়া হইবে, তাহাতে তাহাদের মুখের গোশ্‌ত খসিয়া পড়িবে এবং এক কাতরা পেটের মধ্যে পড়িলে পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী পর্যন্ত খসিয়া পড়িবে। টগ্‌বগ্‌ করে এমন উত্তপ্ত পানিকে "হামীম" বলে এবং দোযখবাসীদের পচাগলা শরীর হইতে যেসব উত্তপ্ত পুঁজ বাহির হইয়া জমা হইবে, তাহাকে "গাচ্ছাক" বলে।)

যে কাজ না করিলে ঈমান অপূর্ণ থাকিয়া যায়
ঈমানের শাখা-প্রশাখার বয়ান

(ঈমানের শাখা-প্রশাখা (ফুল পাতা) যদি ঠিক না থাকে, তবে ঈমান নাকেছ থাকিয়া যায়।) হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তরের চেয়ে বেশী। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান শাখা কলেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' এবং সবচেয়ে ছোট শাখা রাস্তা হইতে ইট-পাটকেল কাঁটা ইত্যাদি কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া ফেলা। আর হায়া-শরম অর্থাৎ লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি প্রধান শাখা।

এই হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানের সমস্ত শাখাগুলি যার মধ্যে থাকিবে, সে পুরা মুসলমান হইবে। আর যা'র মধ্যে কোন শাখা থাকিবে, কোন শাখা থাকিবে না, সে (পুরা মুসলমান হইবে না) অপূর্ণ মুসলমান হইবে। সকলেই একথা জানে যে, পুরা মুসলমান হওয়া জরুরী। (অপূর্ণ মুসলমান হইলে মক্‌ছুদ হাছেল হইবে না।) কাজেই সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা দরকার, যাহাতে ঈমানের একটি শাখাও নাকেছ না থাকে, এই জন্য আমরা ঈমানের সেই সমস্ত শাখাগুলি সংক্ষেপে লিখিয়া দিতেছি। ঈমানের মোট শাখা ৭৭টি, তন্মধ্যে ৩০টি কাজ দেলের দ্বারা আদায় করিতে হয়। (৭টি কাজ যবানের দ্বারা সমাধা করিতে হয় এবং ৪০টি কাজ হাত-পা ইত্যাদি সর্বশরীরের দ্বারা করিতে হয়।)

(১) আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর ঈমান আনা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ স্বয়ং সর্বশক্তিমান, সর্বস্রষ্টা, অনাদি অনন্ত, চিরকাল আছেন, চিরকাল থাকিবেন। তাঁহার কোন সৃষ্টিকর্তা নাই। তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, ইহা ইয়াক্বীন দেলে বিশ্বাস করিতে হইবে)।

(২) ইহা বিশ্বাস করা যে, অন্যান্য সব জিনিসের কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, এক আল্লাহ্‌ই সবকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অস্তিত্ব দান করিয়াছেন। (৩) ফেরেশ্‌তাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা। (৪) ইহা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যত কিতাব পয়গম্বরদের উপর নাযিল করিয়াছেন, সব সত্য; অবশ্য বর্তমানে কোরআনে পাক ব্যতীত অন্যান্য কিতাবের হুকুম বিদ্যমান নাই। (৫) ইহা বিশ্বাস করা যে, সকল পয়গম্বর সত্য, অবশ্য এখন শুধু রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপর চলার আদেশ বিদ্যমান। (৬) জগতে যাহাকিছু হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, সবই আল্লাহ্‌ আদিকাল হইতে জানেন এবং তাঁহার জানার উল্টা বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হইতে পারে না। একথা ইয়াক্বীন দেলে বিশ্বাস করা। (ইহাকে বলে তক্‌দীরে বিশ্বাস।) (৭) কিয়ামত নিশ্চয়ই হইবে, (পাপ-পুণ্যের বিচার হইবে, পুনরায় সকলের জীবিত হইয়া সমস্ত জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব দিতে হইবে। পাপের শাস্তি দোযখে, পুণ্যের পুরস্কার বেহেশ্‌তে

দেওয়া হইবে,) একথা ইয়াক্বীন দেলে বিশ্বাস করা। (৮) বেহেশ্ত আছে, একথা ইয়াক্বীন দেলে বিশ্বাস করিতে হইবে। (৯) দোযখ আছে, একথা পূর্ণ বিশ্বাস করা। (১০) আল্লাহ্র প্রতি (গাঢ় ভক্তি এবং অকৃত্রিম) ভালবাসা রাখা। (১১) আল্লাহ্র রাসূলের সঙ্গে (আন্তরিক ভক্তি ও) ভালবাসা রাখা। (১২) কাহারও সহিত দুশমনি বা দোস্তি রাখিলে শুধু আল্লাহ্র জন্যই রাখা। (১৩) প্রত্যেক কাজের নিয়ত শুধু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা। (১৪) কোন গোনাহ্র কাজ হইয়া গেলে, তার জন্য অন্তরে কষ্ট অনুভব করিয়া অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র কাছে তওবা এস্তেগ্ফার করা। (১৫) আল্লাহ্কে ভয় করা। (১৬) আল্লাহ্র রহমতের আশা সর্বদা রাখা। (নিরাশও হইয়া যাইবে না, নির্ভীকও হইয়া যাইবে না।) (১৭) মন্দ কাজ করিতে (অর্থাৎ, আল্লাহ্র রাসূলের নীতিবিরুদ্ধ কাজে) লজ্জা করা। (১৮) আল্লাহ্র নেয়ামতের শোকর করা। (১৯) অঙ্গীকার পূর্ণ করা। (২০) (আল্লাহ্র তরফ হইতে কোন বালা-মুছীবত রোগ-শোক বা বিপদ-আপদ আসিলে) ধৈর্য ধারণ ও ছবর করা। (২১) নিজেকে অপর হইতে ছোট মনে করা। (২২) সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া (রহম) করা। (২৩) খোদার তরফ হইতে যাহাকিছু হয়, তাহাতে আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকা। (২৪) প্রত্যেক চেষ্টার ফল যে আল্লাহ্র হাতে ইহা বিশ্বাস করিয়া প্রত্যেক ফলের জন্য আল্লাহ্র উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) করা। (২৫) (নিজের গুণগুলিকে খোদার দান মনে করিতে হইবে,) নিজের গুণে নিজে গর্বিত না হওয়া। (২৬) কাহারও সহিত কপটতা বা মনোমালিন্য না রাখা। (২৭) কাহারও সহিত হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা। (২৮) রাগ না করা। (২৯) কাহারও অহিত কামনা না করা। (৩০) দুনিয়ার (ধন, দৌলত বা দুনিয়ার প্রভুত্ব-প্রিয়তার) সঙ্গে মহব্বত না রাখা।

ঈমানের যে সাতটি কাজ যবানের দ্বারা সমাধা হয়, তাহা এই—(৩১) কলেমা মুখে পড়া (মুখে স্বীকার করা)। (৩২) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। (৩৩) এল্মে দ্বীন শিক্ষা করা। (৩৪) ধর্ম-বিদ্যা, ধর্ম-জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। (৩৫) (আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া এবং আখেরাতের মাকছুদগুলির জন্য) দো'আ (প্রার্থনা) করা। (৩৬) আল্লাহ্র যেকের করা। (৩৭) বেহুদা কথা হইতে এবং গোনাহ্র কথা হইতে যেমন, মিথ্যা, পরনিন্দা, গালি, বদ দো'আ করা, লা'নত দেওয়া, অভিশাপ দেওয়া, গান গাওয়া ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকা।

ঈমানের যে ৪০টি কাজ হাত-পা ইত্যাদি শরীরের দ্বারা আদায় হয়, তাহা এই—(৩৮) ওযূ-গোসল করা, কাপড় পাক-ছাফ রাখা। (৩৯) নামাযের পাবন্দ থাকা। (৪০) মালের যাকাত ও ছদকা-ফেৎরা দেওয়া। (৪১) রমযান মাসের রোযা রাখা। (৪২) হজ্জ করা। (৪৩) রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করা। (৪৪) যে সংসর্গে বা যে দেশে থাকিয়া ঈমান রক্ষা ও ইসলাম ধর্ম পালন করা যায় না, সেই সংসর্গ এবং সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া হিজরত করা। (৪৫) আল্লাহ্র নামে মান্নত মানিলে তাহা পুরা করা। (৪৬) আল্লাহ্র নাম লইয়া কোন কাজের জন্য কসম করিলে যদি সেই কাজ গোনাহ্র কাজ না হয়, তবে তাহা পূর্ণ করা। (৪৭) আল্লাহ্র নামে কসম খাইয়া ভঙ্গ করিলে তাহার কাফ্ফারা দেওয়া। (৪৮) ছতর ঢাকিয়া রাখা। (পুরুষের ছতর নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত। স্ত্রীলোকের ছতর মাথা হইতে পা পর্যন্ত।) (৪৯) কোরবানী করা। (৫০) মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন করা। (৫১) ঋণ পরিশোধ করা। (৫২) কাজ-কারবারে ধোঁকা, (শরার বরখেলাফ কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকা, কম মাপিয়া দেওয়া, বেশী মাপিয়া আনা, ঘুষ খাওয়া, সুদ খাওয়া ইত্যাদি) হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। (৫৩) সত্য সাক্ষ্য গোপন না করা।

(৫৪) কাম রিপু প্রবল হইলে বিবাহ করা। (৫৫) অধীনস্থ চাকর-নওকর, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতির হক আদায় করা। (৫৬) মা-বাপকে শান্তিতে রাখা। (৫৭) সন্তানের লালন-পালন করা। (তাহাদের আদব-কায়দা, ধর্ম-জ্ঞান এবং হালালভাবে দুনিয়ার জীবন যাপনের সদুপায় শিক্ষা দেওয়া।) (৫৮) ভাই-বেরাদর, বোন-ভাগ্নে, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদির সঙ্গে অসদ্ব্যবহার না করা। (৫৯) (চাকর-নওকর হইলে) মনিবের তাবেদারী করা। (৬০) ন্যায়-বিচার করা। (৬১) মুসলমানদের একতা ভঙ্গ না করা। (মোবাহ্ কাজের মধ্যে জমা'আত ছাড়িয়া একতা ভাঙ্গিয়া ভিন্ন থাকা বা আলাদা দল বানান যাইবে না।) (৬২) মুসলমান বাদশাহ্ এবং মুসলমান আমীরের (দলের নেতার) আদেশ পালন করা। অবশ্য আমীরের আদেশ (খোদা না-খাস্তা) যদি শরীঅতের হুকুমের বিপরীত হয়, সে আদেশ পালন করিবে না। (৬৩) ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেওয়া। (৬৪) সৎ কাজে সাহায্য করা। (৬৫) সৎ কাজে আদেশ, বদ কাজে নিষেধ করা। (৬৬) ইসলামী হুকুমত কায়েম হইলে শরীঅত অনুযায়ী শাস্তি বিধান করা। (প্রজা বিধর্মী হইলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা যাইবে না। কেহ চুরি করিলে তাহার হাত কাটিয়া দিতে হইবে, যেনা করিলে ছঙ্গেছার করিতে অথবা একশত কোড়া লাগাইতে হইবে। মিথ্যা তোহ্‌মত লাগালে ৮০ কোড়া লাগাইতে হইবে। মদ্যপান করিলে ৮০ কোড়া লাগাইতে হইবে। ডাকাতি করিলে তাহার হাত-পা কাটিয়া দিতে হইবে। খুনের বদলে খুন কেছাছ করিতে হইবে। মিথ্যা সাক্ষী গ্রহণ করা যাইবে না, ঘুষ খাওয়া বা পক্ষপাতিত্ব করা যাইবে না ইত্যাদি।) (৬৭) প্রয়োজন হইলে ইসলামের শত্রুর সহিত সংগ্রাম করা। (৬৮) কাহারও আমানত কাছে থাকিলে (রীতিমত তাহার হেফাযত করিতে হইবে এবং) সময়মত তাহার জিনিস তাহাকে ফেরত দেওয়া। (৬৯) অভাবগ্রস্ত লোক ধার চাহিলে তাহাকে ধার দেওয়া। (৭০) পড়শীর সম্মান ও সহানুভূতি করা। (কোন পড়শী কষ্ট দিলে তাহা সহ্য করিতে হইবে, তাহার বিপদ-মুছীবতের সময় তাহার সাহায্য ও সমবেদনা প্রকাশ করিতে হইবে) (৭১) হালাল উপায়ে হালাল রুজি উপার্জন করা। (৭২) শরীঅতের বিধি অনুযায়ী খরচ করা। (৭৩) মুসলমান ভাইকে দেখিলে চেনা হউক বা অচেনা হউক তাহাকে 'আস্‌সালামুআলাইকুম' বলিয়া সালাম করা; কোন মুসলমান সালাম করিলে "ওয়াআলাইকুমুস্-সালাম" বলিয়া তাহার জওয়াব দেওয়া। (৭৪) কেহ হাঁচি দিয়া 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলিলে 'ইয়ারহামো কাল্লাহ্' বলিয়া তাহার জওয়াব দেওয়া। (৭৫) অনর্থক কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া। (৭৬) খেলাফে শরা খেলা বা রং-তামাশা হইতে বাঁচিয়া থাকা। (৭৭) রাস্তার মধ্যে কোন কাঁটা বা ইট পাথর ইত্যাদি কোন কষ্টদায়ক জিনিস থাকিলে তাহা সরাইয়া ফেলা। (এই সাতাত্তর প্রকার কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারিলে ইন্‌শাহ-আল্লাহ্ তার ঈমান পূর্ণ হইবে। নতুবা ইহার কোন একটি কাজ বাকী থাকিলে ঈমান নাকেছ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ থাকিবে।) [যদি পৃথক পৃথকভাবে সকল বিষয়ের ছওয়াব জানিবার বাসনা হয়, তবে ফুরুউল ঈমান নামক কিতাব দেখুন।]

স্বীয় নফ্‌স ও সাধারণ লোকদের অপকারিতা

উপরে যে সব নেক কাজের এবং উহার ছওয়াবের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে বাস্তবিকই তাহা শুনিয়া প্রত্যেকেরই মনে চায় ভাল হইতে, ভাল কাজ করিতে এবং বেহেশ্‌তে যাওয়ার পথ করিতে এবং যে মন্দ কাজের কথা এবং তাহার গোনাহ্ ও আযাবের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে,

তাহাও শুনিয়া প্রত্যেকেরই মনে চায়, মন্দ কাজ ছাড়িয়া গোনাহ্র থেকে বাঁচিয়া দোযখের আযাব হইতে মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে। কিন্তু মানুষের "ভাল হওয়ার এবং মন্দ না থাকার" ইচ্ছায় বাধা দেয় প্রধানতঃ দুই প্রকার শত্রু। এক ত সব সময়কার সাথী দুষ্ট নফ্স এবং প্রবঞ্চনাকারী শয়তান। নফ্স নেক কাজ করিতে নানারূপ ওযর-বাহানা এবং আলস্য আনিতে থাকে, বদকাজ করিতে নানারূপ প্রলোভন ও ওযর-আপত্তি দেখায়, আবার আযাবের কথার উত্তরে এ কথাও বলে যে, খোদা গাফুরুর রাহীম, গোনাহ্ করিয়া শেষে তওবা করিয়া নিব। শয়তান নফ্সের এইসব কুমন্ত্রণায় "দাদা দিল দাঁড়াইয়া, সে দিল বাড়াইয়া"-এর কাজ দেয়। দ্বিতীয়, বাধা প্রদানকারী হয় স্ত্রী-পুত্র, মা-বাপ, শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি জনসাধারণ। তাহারা নানা কৌশলে ছলে-বলে বেহেশ্ত থেকে দূরে নিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবার অপ্রত্যক্ষ চেষ্টা করে। কোন কোন গোনাহ্র কাজ হয় এইসব লোকের সংসর্গ দোষে এবং কোন কোন গোনাহ্র কাজ হয় তাহাদের মন যোগানের কারণে, কোন কোন গোনাহ্র কাজ হয় তাহাদের সামনে হালকা ও অসম্মানী না হইতে হয় এই ভয়ে, কোন কোন গোনাহ্র কাজ হয়, তাহাদের সঙ্গী না থাকিলে তাহারা কষ্ট দিবে এই ভয়ে, (এবং কোন কোন গোনাহ্র কাজ হয় এত অপ্রত্যক্ষ, শত্রুতা সত্ত্বেও তাহাদের যে হক আদায় করিতে হইবে, তাহা আদায় না করাতে।) কোন কোন গোনাহ্র কাজ হয় তাহারা কষ্ট দেয় সেই দুঃখে এবং চিন্তায় সময় নষ্ট হয় তাহাতে এবং তাহাদের গীবৎ শেকায়েত মনে অথবা মুখে প্রকাশ পায় তাহাতে এবং তাহার প্রতিশোধ কি প্রকারে লওয়া যায় তাহার চিন্তায়।

মোটকথা, নফ্সের তাবেদারী করাই হইল সমস্ত গোনাহ্র মূল এবং লোকের থেকে অনেক কিছু আশা করা হয়, সেই কারণেই সমস্ত অশান্তি আসে। অতএব, প্রত্যেক মানুষের উপরই দুইটি কঠোর কর্তব্য হয়। একটি এই, যে প্রকারে হউক নিজের নফ্সকে দমন করিতে হইবে। চাই তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়াই হউক বা তাহাকে ভয় দেখাইয়া, ধমক দিয়া বা যেভাবেই হউক দ্বীনের পথে তাহাকে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। (নফ্সের তাবেদারী করা যাইবে না।) দ্বিতীয় কর্তব্য এই যে, মানুষের সঙ্গে এই প্রকারের বেশী তা'আল্লুক করা চাই না যে, তাহার থেকে আমি কিছু পাইবার আশা করি। আর ভ্রূক্ষেপও করা চাই না যে, অমুক আমাকে ভাল বলিবে কিংবা মন্দ বলিবে। এইজন্য এই দুইটি বিষয়কে পৃথক পৃথকভাবে লেখা হইতেছে। (অবশ্য প্রত্যেক মানুষের হক আদায় করিতে হইবে। প্রত্যেকের কষ্ট দূর করিতে এবং ভালাই করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু নিজের হক তাদের কাছ থেকে আদায় করিতে চাহিবে না বা তাহাদের থেকে কোন ভালাইরও আশা করিবে না এবং তারা যে তোমাকে কষ্ট দিবে না, সাহায্য করিবে সে আশাও করিবে না।)

নিজ নফ্সের সঙ্গে ব্যবহার

নিয়ম মত দৈনিক কিছু সময় সকাল বেলায় ফজরের পর এবং কিছু সময় মাগরেবের পর অথবা এশার পর ধার্য করিয়া তাহাতে একা বসিয়া দেলকে অন্যান্য চিন্তা-ভাবনা ও খেয়াল হইতে খালি করিয়া নিজের নফ্সের সঙ্গে এইরূপে কথোপকথন করিবে—হে নফ্স! তুই দুনিয়াতে আসিয়াছিস বেপার করিতে। আল্লাহ্ তা'আলা তোকে বড় একটি মূলধন দিয়া দুনিয়াতে বেপার

করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। তোর মূলধন তোর জীবনের অমূল্য সময়গুলি। যদি বেপার করিয়া যাইতে পারিস, অর্থাৎ যদি জীবনের সময়গুলি নেক কাজে এবং ভাল কাজে খরচ করিতে পারিস, দোযখের ভীষণ আযাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বেহেশ্‌তের অফুরন্ত সুখ ভোগ করিতে পারিবি। যদি জীবনের সময়গুলি ব্যয় করিয়া কোন নেকী খরিদ না করিস, বরং মন্দ কাজে, গোনাহ্‌র কাজে, অকাজে বা আলসেমী করিয়া, বাবুগিরি বিলাসিতা করিয়া জীবনের অমূল্য সময়-রত্নগুলি খরচ করিস, তবে পুঁজি ত হারাইলিই, লাভও কিছু করিলি না। উল্‌টা আরও দোযখের শাস্তির উপযুক্ত হইলি। তোর জীবনের এই সময়গুলি এত মূল্যবান যে, এক এক মিনিট এবং এক এক শ্বাস লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও তুই কিনিতে পারিবি না। কারণ, টাকা হারাইয়া গেলে তাহা চেষ্টা করিয়া পুনরায় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সময় যাহা চলিয়া যায়, তাহা কোটি কোটি টাকা দিলেও আর ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। (তা-ছাড়া জীবনের সময়গুলির সদ্ব্যবহার করিলে তাহা দ্বারা যত বড় জিনিস ক্রয় করা যায় অর্থাৎ চিরস্থায়ী সুখের স্থান বেহেশ্‌তে এবং খোদার দীদার ও খোদার সন্তুষ্টি, কোটি কোটি টাকার দ্বারাও সেই জিনিস কিছুতেই ক্রয় করার শক্তি কাহারও নাই। অতএব, হে নফ্‌স! এই মূল্যবান সময়রত্নের এখনই তুই কদর কর। ফুরাইয়া গেলে, চলিয়া গেলে আর পাইবি না। আল্লাহ্‌র শোকর কর যে, এখনও তোর মৃত্যু আসে নাই। মৃত্যু আসিলেই আর কিছু করার ক্ষমতা থাকিবে না। মনে কর যে, যখন তোর মৃত্যু আসিবে, তখন যদি মাত্র একদিন সময় পাস, তবে তুই কি করিবি? ঐ একটা দিন কি ভাবে কাটাইবি? নিশ্চয়ই প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছা যে, মৃত্যুর সময় যদি মাত্র একটি দিন পায়, তবে সেই দিন খাঁটিভাবে তওবা করিবে, আল্লাহ্‌র কাছে পাক্কা ওয়াদা করিবে যে, আর কখনও পাপ কাজের কাছেও যাইব না এবং সমস্তটা দিন শুধু আল্লাহ্‌র যেকের এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের তাবেদারিতে কাটাইবে। যখন মৃত্যুর সময় একটা দিন পাইলে তোর এই অবস্থা হইবে তখন আজকার এই দিনটাকে সেইরূপই মনে কর, যেন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এই একটা দিন চাহিয়া নিয়াছিস। অতএব, এই দিনটার মধ্যে খুব লক্ষ্য রাখিবি যেন কোন গোনাহ্‌র কাজ না হয়, কোন অন্যায় কাজ না হয়, আল্লাহ্‌র কোন একটা হুকুম পালন করিতে ছুটিয়া না যায়। আল্লাহ্‌র কথা (যেকের) কোন সময় ভুল না হয়। আজকার দিন এইভাবে অতিবাহিত করিয়া আবার যদি আর একদিন হায়াত পাও, তবে দ্বিতীয় দিনও এইরূপই করিবে। সারা জীবনটি এই ভাবেই হিসাব করিয়া নফ্‌সকে বুঝাইয়া তার দ্বারা কর্তব্য কাজ, নেক কাজ করাইয়া নিবে এবং বদ কাজ ও অলসতা হইতে ফিরাইয়া রাখিবে।

নফ্‌সকে ইহাও বুঝাইবে যে, হে নফ্‌স! কখনো শয়তানের এই ধোঁকায় পড়িবি না যে, খোদা মাফ করিয়া দিবেন। কেননা, তুই কেমন করিয়া জানিলি যে, আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই মাফ করিয়া দিবেন। শাস্তি দিবেন না। তিনি কি শাস্তি দিতে পারেন না? যদি মাফ না করিয়া শাস্তিই দেন, তখন তোর কি উপায় থাকিবে? (দ্বিতীয়তঃ তাঁহার দয়া এবং তাঁহার মাফ পাইবার জন্য প্রধান শর্ত হইল তাঁহার ফরমাঁবরদারী এবং তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য আজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করা, তাহা যে না করিবে সে কেমন করিয়া মাফির এবং দয়ার আশা করিতে পারে? তৃতীয়তঃ) মানিয়া নিলাম যে, তিনি মাফই করিয়া দিলেন তবুও ত যারা বদকাজ ছাড়িয়া নেক কাজ করিবে তারা যে সব পুরস্কার এন্‌আম এক্‌রাম পাইবে তাহা তো তোর ভাগ্যে জুটিবে না। যখন তুই নিজ চোখে সেই সব নেয়ামত দেখিবি তখন তোর কষ্ট হইবে না কি? এইরূপ কথোপকথনের পর নফ্‌স জিজ্ঞাসা করে যে, আচ্ছা! তবে আমি কি করিব এবং কি উপায়ে চেষ্টা করিব? তাহার উত্তরে এইরূপ

বলিবে—যে সব জিনিস তোর থেকে এক দিন (মৃত্যুকালে) নিশ্চয়ই ছুটিবেই ছুটিবে, অর্থাৎ যে-সব বদ-অভ্যাস এবং দুনিয়ার মহব্বত শান-শওকত বাবুগিরি মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করিতেই হইবে, তাহা তুই এখনই ছাড়িয়া দে। আর যে আল্লাহ্‌র কাছে না যাইয়া কিছুতেই উপায় নাই এবং আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা ছাড়াও অন্য কোন আশ্রয় নাই সেই আল্লাহকে এখন থেকেই শক্ত করিয়া ধর। আল্লাহ্‌র পথ অবলম্বন কর, আল্লাহ্‌র কথা সব সময় স্মরণ রাখ, আল্লাহ্‌র হুকুমের তাবেদাবী শুরু কর। আল্লাহ্‌র যেকের থেকে কখনো গাফেল থাকিস না। খোদার হুকুমের তাবেদারী যে কেমন করিয়া করিতে হইবে এবং খোদা কি কি উপায়ে সন্তুষ্ট হইবেন তাহাই বিস্তৃতভাবে খুব খুলিয়া খুলিয়া এই কিতাবে লেখা হইয়াছে, সেই অনুযায়ী জীবনকে গঠিত করিতে চেষ্টা কর। কিছুদিন একটু কষ্ট করিয়া আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের পরামর্শ নিয়া চেষ্টা করিলে দেলের মধ্যে ভাল অভ্যাস জমিয়া দাঁড়াইবে এবং মন্দ অভ্যাসগুলি ক্রমান্বয়ে সব ছুটিয়া যাইবে। (এমন কি শেষে মন্দ কাজের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা এবং নেক কাজের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আগ্রহ জন্মিবে।)

নিজের নফ্‌সকে এইভাবেও বুঝাও—নফ্‌স! তুই দুনিয়াতে আসিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিস। রোগ যদি তুই বদ-পরহেযী করিয়া, কুপথ্য খাইয়া বাড়াইয়া ফেলিস বা তিক্ত ঔষধ না খাওয়ার দরুন রোগ বাড়িয়া যায়, তবে তোর বেহেশ্‌তে যাওয়া দুষ্কর। কাজেই রোগীর যেমন বাছিয়া খাইতে হয়, মজার জিনিস খাওয়া যায় না, তিতা ঔষধ খাইতে হয়, তোরও সেইরূপ বাছিয়া খাইতে হইবে, তিতা ঔষধ খাইতে হইবে। কি কি কুপথ্য, কি কি বাছিয়া চলিতে হইবে, তাহা সব আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল বাতাইয়া দিয়াছেন। কোরআন হাদীসে সব মওজুদ আছে। হক্কানী নায়েবে রাসূলগণ তাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সারা জীবন গোনাহ্‌র কাজগুলির থেকে পরহেয করিয়া চলিতে হইবে। যদিও গোনাহ্‌র কাজে মজা লাগে, তবুও সে মজা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কয়েকটা দিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে এবং যদি এবাদত বন্দেগী করা এবং আল্লাহ্‌র হুকুমগুলি পালন করা তিতা ঔষধ পানের মত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়, তবুও সেগুলি আজীবন পালন করিতে হইবে। হে নফ্‌স! একটু চিন্তা কর, জীবনের যার মায়া আছে, সে যদি কোন রোগে পড়ে, আর হেকিম যদি তাকে বলে যে, অমুক মজাদার জিনিস খাইলে রোগের ভারী ক্ষতি হইবে এবং অমুক তিতা ঔষধ খাইলে তোমার রোগ সারিয়া যাইবে, তবে সে কি করিবে? নিশ্চয়ই সে সেই তিতা ঔষধ খাইবে এবং সে মজাদার জিনিস যাতে তার সামনেও না আসিতে পারে, সেই চেষ্টা সে করিবে। কারণ জীবনের মায়া প্রত্যেকেরই আছে। তোর কি তবে বেহেশ্‌তের সুখের সাধ নাই? দোযখের আযাবের ভয় কি তোর নাই? অতএব, যদি গোনাহ্‌র কাজগুলি শত মজাদারও হয় এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের হুকুমের কাজগুলি এবং এবাদত বন্দেগীগুলি শত কটু-তিতাও হয়, তবুও আল্লাহ্‌র উপর যখন ঈমান আছে—রাসূলের উপর যখন ঈমান আছে এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল সত্য সংবাদ দিয়াছেন যে, গোনাহ্‌র কাজে মজা থাকিলেও ক্ষতি অনিবার্য এবং নেক কাজে কষ্ট হইলেও তাহার লাভ অবশ্যম্ভাবী এবং সেই ক্ষতি এবং লাভও ক্ষণস্থায়ী বা দুই এক দিনের নয়, সে ক্ষতি চিরস্থায়ী, তাহার নাম দোযখ, আর সে লাভও চিরস্থায়ী, তাহার নাম বেহেশ্‌ত। আশ্চর্যের বিষয়, হে নফ্‌স! সামান্য একজন হেকিমের কথায় বিশ্বাস করিয়াই তার কথা পালন করিস, আর খোদার রাসূলের উপর ঈমান রাখা সত্ত্বেও খোদা ও রাসূলের কথা পালন করিলি না। আফসোস! আফসোস! এখনও কাম চোরাপানা

করিস? বেহেশ্‌তের চিরস্থায়ী নির্মল সুখের অতটুকু কদরও তোর কাছে নাই, দুনিয়া সামান্য কয়দিনের সুখের? দোযখের চিরস্থায়ী ভীষণ কষ্টের কি অতদূর ভয়ও তোর নাই এবং তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ততখানি চেষ্টা করাও কি তোর উচিত নয়? যতটুকু দুনিয়ার সামান্য কষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য করিয়া থাকিস? এখনও গাফলতি ছাড়, আর গাফেল থাকিস না, এখনও সতর্ক হও। এখনও সাবধান হও।

নিজের নফ্‌সকে এভাবে বুঝাইবে—হে নফ্‌স! তুই এই দুনিয়াতে একজন বিদেশী পরবাসী মুসাফির। পরবাসে কি পুরা আরাম পাওয়া যায়? কখনো নয়, বিদেশ পরবাসে নানারকম কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিন্তু বিদেশে যারা যায়, তারা এই আশায় সব কষ্ট স্বীকার ও সহ্য করে যে, এখানে দুইদিন একটু কষ্ট করিলে বাড়ীতে গিয়া কিছু বেশী দিন আরামে থাকা যাইবে। যদি কোন বে-অকুফ নাদান ঐ কষ্ট সহ্য না করিয়া বিদেশেই সম্পূর্ণ আরামের বন্দোবস্ত করিয়া সেখানেই ঘর বানাইয়া লয়, তবে তার ভাগ্যে কি বাড়ীর অরাম জুটিবে? কস্মিণকালেও নয়। এইরূপে যতদিন দুনিয়াতে থাকিতে হইবে, ঐরূপ কষ্টই সহ্য করিয়া যাইতে হইবে, তবেই আসল বাড়ীতে পৌঁছিয়া আরাম পাইবার আশা করা যাইবে, নতুবা সব হারাইতে হইবে। "কর না সুখের আশ, পর না দুঃখের ফাঁস।" জীবনের উদ্দেশ্য তা' নয়। এবাদত বন্দেগী করার মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের হুকুমগুলি পালনের মধ্যেও কষ্ট আছে এবং গোনাহ্‌র কাজগুলি ছাড়ার মধ্যেও কষ্ট আছে। তা-ছাড়া আরও অনেক কষ্ট দুনিয়াতে সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু দুনিয়া আমাদের স্থায়ী বাড়ী নয়। আমাদের স্থায়ী বাড়ী বেহেশ্‌তে। একবার যদি বেহেশ্‌তে কোন রকমে কষ্ট-ক্লেশ করিয়া পৌঁছিতে পারি, সব কষ্ট শেষ হইয়া যাইবে। অতএব, এইখানকার দুই দিনকার সব রকমের কষ্টই নীরবে সহ্য করা দরকার এবং বেহেশ্‌ত হাছিল করার জন্য যতই পরিশ্রম কষ্ট করার দরকার হউক না কেন, হাস্যবদনে হৃষ্টচিত্তে সে সব মাথা পাতিয়া লওয়া দরকার।

সারকথা এই যে, এইভাবে নানা উপায়ে বুঝাইয়া নফ্‌সকে সোজা পথে রাখা দরকার। দৈনিক এইভাবে বুঝান দরকার। স্মরণ রাখিও, তুমি নিজে যদি এইরূপে চেষ্টা করিয়া নিজের ভালাইপনা নিজে না কর, তবে অন্য কেউ কি করিয়া দিবে? সে আশা সুদূর পরাহত। আমরা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে, আল্লাহ্‌র রাসূলের তরফ হইতে, তোমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে তোমারই হিতের জন্য এই কথাগুলি বলিলাম। এখন তুমি জান আর তোমার কাম জানে। (আল্লাহ্‌কে সোপর্দ, আল্লাহ্‌র হাওলা।)

জনগণের সঙ্গে ব্যবহার ও গোনাহ্ হইতে আত্মরক্ষা

সমাজে মানুষ তিন প্রকার। এক প্রকার যাহাদের সঙ্গে দোস্তি মহব্বত, বরং আত্মীয়তা আছে। দ্বিতীয় প্রকার যাহাদের সঙ্গে শুধু চিনা-জানা আছে। খাছ কোন তা'আল্লুক দোস্তি-মহব্বত বা আত্মীয়তার কোন তা'আল্লুক নাই। তৃতীয়, যাহাদের সঙ্গে চিন-পরিচয় নাই সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনে রাখিবে, এই তিন প্রকারের লোকের সঙ্গে তিন রকমের ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রথম প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার

যে সব লোকের সঙ্গে চিন-পরিচয় নাই, তাহাদের সঙ্গে চলা-ফেরা, ওঠা-বসার ঘটনা ঘটিলে, তাহারা যে সব বৃথা গল্প-গুজব করিবে অথবা বেহুদা খবরাখবর বর্ণনা করিবে সে সবের দিকে আদৌ কর্ণপাত করিবে না, একেবারে বধিরের মত হইয়া যাইবে, কোন কথার উত্তর দিবে না, কান লাগাইয়া শুনিবেও না, তাহাদের সঙ্গে অনর্থক কোন তা'আল্লুকও পয়দা করিবে না বা তাহাদের থেকে কোনরূপ উপকার বা সাহায্যের আশাও করিবে না। এমনি তাদের মধ্যে যদি কেহ কোন বিপদে পড়ে, তবে যথাসাধ্য তাহার সাহায্য করিয়া দিবে। কোন দরকারী কথা জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীরতার সহিত তাহার সদুত্তর দিয়া দিবে। কিন্তু নিজে কোন তা'আল্লুক পয়দা করিবে না, সওয়াল ত করিবেই না। আর যদি তাহাদের মধ্যে কোন শরার বরখেলাফ কাজ দেখ, তবে নম্রভাবে মিষ্ট ভাষায় তাহাদের বুঝাইয়া দিবে।

দ্বিতীয় প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার

যাহাদের সঙ্গে দুস্তি-মহব্বত এবং আত্মীয়তার তা'আল্লুক, তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায় এদিকে লক্ষ্য রাখিবে যে, প্রথম দুস্তি-মহব্বত এবং আত্মীয়তা করিবার সময় খুব তাহকীক করিয়া লইবে। সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা, দুস্তি-মহব্বত করিবে না। দুস্তি করিবার জন্য পাঁচটি শর্ত। প্রথম শর্ত এই যে, সে জ্ঞানী লোক হওয়া চাই। কেননা, নির্বোধ লোকের বিশ্বাস নাই। নির্বোধ লোক দুস্তি রক্ষা করিতে জানে না। তা-ছাড়া নির্বুদ্ধিতার কারণে অনেক সময় করিতে চাইবে ভাল, হইয়া যাইবে মন্দ।

এক ব্যক্তি ভাল্লুকের সঙ্গে দুস্তি করিয়াছিল। যখন সে ঘুমাইত তখন ভাল্লুক তাহাকে পাখা করিয়া তাহার মাছি তাড়াইত। একদিন একটি মাছি তাহার মুখের উপর আসিয়া বসিয়াছে। একবার তাড়াইয়াছে, দুইবার তাড়াইয়াছে। মাছি যখন তবুও মানে নাই, তখন ভাল্লুকের রাগ আসিয়াছে। ভাল্লুক রাগান্বিত হইয়া বড় একখানা পাথর আনিয়া মাছিকে মারিয়াছে। মাছি ত পালাইয়াছে, কিন্তু লোকটির জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। দেখ, ভাল্লুক করিতে চাহিয়াছিল ত হিত, কিন্তু তার নির্বুদ্ধিতার কারণে হইয়া গেল কত বড় অহিত।

দ্বিতীয় শর্ত—ঐ লোক নিঃস্বার্থ হওয়া চাই এবং তাহার স্বভাব চরিত্রও ভাল হওয়া চাই। কোন স্বার্থ বা গরযের বশীভূত হইয়া যেন দুস্তি না করে বা সামান্য সামান্য কারণে যেন রাগিয়া টং না হয়। রাগের সময় যেন মেজায ঠিক থাকে, হুশ হারা না হইয়া যায়। নিজের স্বার্থে একটু ব্যাঘাত দেখিলে বা সামান্য একটু কষ্ট হইলেই যেন তাহাতে ধৈর্যহীন হইয়া মোড় না বদলাইয়া ফেলে। তৃতীয় শর্ত এই যে, ঐ লোক যেন দ্বীনদার হয়। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র হক আদায় করে না, সে তোমার দুস্তির হক কি আদায় করিবে? দ্বিতীয় কথা এই যে, ধর্মহীন লোকের সঙ্গে যদি তুমি দুস্তি কর, তবে বারবার

তাহাকে ধর্মবিরুদ্ধ কাজ এবং গোনাহ্‌র কাজ করিতে দেখিয়া যদি ছবর না কর তবেও দুস্তি থাকিবে না। আর যদি ছবর কর, তবে বারবার দেখিতে দেখিতে কিছুদিন পরে তোমারও ঐ গোনাহ্‌র প্রতি আগের মত ঘৃণা থাকিবে না, শেষে হয়ত তুমিও ক্রমান্বয়ে ঐ গোনাহে লিপ্ত হইয়া পড়িতে পার। তৃতীয় অপকারিতা এই যে, তাহার মন্দ সংশ্রবের প্রতিক্রিয়া তোমার উপরও পড়িতে পারে এবং এইরূপ পাপ তোমার দ্বারাও সংঘটিত হইতে পারে। আরো একটি শর্ত এই যে, কুসংসর্গ হইতে বহুত পরহেয করা দরকার। ধর্মহীন বে-নামাযী, বে-রোযা, বে-পর্দা, খেলোয়াড় (খেলাফে শরা) লোকের সংসর্গের চেয়ে কু-সংসর্গ আর কি হইবে? চতুর্থ শর্ত এই যে, ঐ লোক দুনিয়ার লোভী না হওয়া চাই। কেননা, লোভী লোকের সংসর্গে যে বসিবে তার মধ্যেও ঐ রোগ ঢুকিবে। দুনিয়ার লোভী হওয়ার আলামত এই যে, প্রায়ই ভাল কাপড়, ভাল পোশাক, ভাল খোরাক, ভাল জিনিস, ভাল সামানের চিন্তা ও চর্চায় থাকে যে, কেমন করিয়া বাড়ীখানা ফিটফাট করিবে, কেমন করিয়া ঘর-দুয়ার সুন্দর করিবে, কেমন করিয়া সুন্দর সুন্দর রেকাবি, সুন্দর সুন্দর পেয়ালা, সুন্দর সুন্দর বিছানা-বালিশ, সুন্দর সুন্দর খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি যোগাড় করিবে, সুন্দর কাচারি বান্ধিবে—এই চিন্তায়ই তার অধিকাংশ সময় যায়। এমন লোকের সঙ্গে যদি তুমি উঠা-বসা কর, তবে তোমার ভালাই নাই, তোমার মধ্যে ঐ রোগ ঢুকিবে। আর যদি তুমি এমন লোকের সঙ্গে দুস্তি কর যে, দুনিয়ার বাড়ী যে, স্থায়ী বাড়ী নহে, দুনিয়ার মান-সম্মান, নাম-যশ যে, কোন মূল্যের জিনিস নহে, ইহা তাহার সব সময় খেয়াল থাকে। দুনিয়া অস্থায়ী ক্ষণস্থায়ী মোসাফিরখানা কাজেই কোন রকমে মোটা খাইয়া মোটা পরিয়া এখানকার কয়টা দিন কোন রকম-সকমে কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল। এই যার ভাব তার সংসর্গে থাকিলে আল্লাহ্ চাহে ত যাহাকিছু দুনিয়ার লোভের রোগ আছে, তাহা দূর হইয়া যাইবার আশা করা যায়। পঞ্চম শর্ত এই যে, ঐ লোক যেন মিথ্যাবাদী না হয়। কেননা, মিথ্যাবাদীর কোন বিশ্বাস নাই। খোদা জানে, মিথ্যাবাদীর কোন মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া কোন সময় তুমি কোন্ বিপদে পড়িয়া বস।

কাজেই দুস্তি-মহব্বত ও আত্মীয়তা করিবার আগে এই পাঁচটি শর্ত অবশ্য অবশ্য দেখিয়া লইবে। কিন্তু যখন পাঁচটি শর্ত পাওয়ার পর কাহারও সহিত আত্মীয়তা বা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুস্তি কর, তখন তাহার হক্ও চিরজীবন রীতিমত আদায় করিতে থাকিবে দুস্তির হক এইঃ—(১) তাহার বিপদের সময় অবশ্য অবশ্য প্রাণপণে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। (২) তাহার ঠেকা ও বিপদের সময় কাজে আসিবে। (৩) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যদি তৌফীক দিয়া থাকেন, তবে তাহার আর্থিক সাহায্যও করিবে। (৪) তাহার ভেদের কথা কাহারও নিকট যাহের করিবে না। (৫) যদি কেহ তাহাকে কিছু মন্দ বলে, (তুমি যদি বিনা ফেৎনা-ফাসাদে তাহার প্রতি-উত্তর ও প্রতিকার করিতে পার ত কর, নতুবা) তাহাকে সে কথার খবর দিও না। (৬) সে যখন কোন কথা বলে, কান লাগাইয়া মনোযোগের সহিত তাহা শুন (এবং তাহার সদুত্তর, সৎ পরামর্শ দান কর এবং পালন কর)। (৭) যদি তাহার মধ্যে কোন আয়েব দেখ, তবে নেহায়েত খায়েরখাহির সঙ্গে নরম ভাষায় গোপনভাবে তাহাকে বলিয়া বুঝাইয়া দাও। (৮) যদি তাহার কোন কথা ভুল-চুক হইয়া যায়, তবে তাহা ধরিয়া বসিয়া থাকিও না। মাফ করিয়া বা বলিয়া-কহিয়া দেল ছাফ করিয়া লও। (৯) তাহার দোনো জাহানের ভাল ও উন্নতির জন্য হামেশা দো'আ করিতে থাকিও।

তৃতীয় প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার

যাহাদের সঙ্গে শুধু চিন-পরিচয় আছে তাহাদের দ্বারাই ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বেশী। কেননা, যাহারা খাঁটি দোস্ত, খাঁটি আত্মীয়, তাহারা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আর যাহাদের সঙ্গে চিন-পরিচয় নাই তাহারা হিতকামীও না, অহিতকামীও না। কিন্তু যাহারা মাঝামাঝি তাহাদের দ্বারাই ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশী, কাজেই খুব সতর্ক থাকিতে হইবে। খামাখা কাহারো সঙ্গে মিল-মোলাকাত জন্মাইবে না। কাহারও অর্থ-বিত্ত দেখিয়া লোভ করিবে না, বা তাহার সহিত কিছু মিল-মোলাকাত থাকিলে কোন সময় হয়ত উপকার হইতে পারে, এই আশায় কাহারো সঙ্গে মিল-মোলাকাত পয়দা করিও না। অনেক মানুষ এমন আছে, যাহারা উপরে খুব দুস্তি এবং খায়েরখাহী দেখায় এবং মিঠা কথা বলে, কিন্তু তাহাদের ভিতরটা দুস্তি-মহব্বত থেকে খালি, খল ও কপটতায় ভরা, তাহারা উপরে দুস্তি দেখাইয়া ভিতরে ভিতরে তোমার আয়েব তালাশ করে এবং বদনাম দুর্নাম করার চেষ্টায় থাকে। এই শ্রেণীর লোকের থেকে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। কাহারো সঙ্গে বদ-আখলাকী করিও না বা রুঠা, অভদ্র, নির্দয় ব্যবহার করিও না। সকলের সঙ্গে ভদ্র নম্র এবং সদয় ব্যবহার করিও, কিন্তু কাজের বেলায় হুঁশিয়ার থাকিও। তাহাদের থেকে কিছু পাওয়ার আশা করিও না। পাওয়ার নিয়তে কিছু করিও না, যদি কিছু কর, তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করিও। তাহারা যেন পেঁচে না ফেলাইতে পারে খুব সতর্ক থাকিও, আর তাহাদের প্রলোভনে প্রলুব্ধও হইও না এবং উস্কানিতেও ক্ষেপিও না।

যদি কেহ তোমার সম্মান করে বা তা'রীফ প্রশংসা করে বা খাতের-তাওয়াযু করে এবং ভালবাসা দেখায়, খবরদার তাহার ধোঁকায় পড়িও না। কেননা, এই যমানাতে যাহের-বাতেন তথা ভিতর-বাহির এক রকমের খাঁটি, নিঃস্বার্থ লোক খুব কমই আছে। কাহাকেও ষোল আনা বিশ্বাস করা যায় না। হয়ত স্বার্থ সিদ্ধির কোন উদ্দেশ্য আছে; কাজেই খবরদার ধোকায় পড়িয়া হাতের পেঁচ কখনো ছাড়িবে না।

যদি কেহ তোমার গীবৎ-শেকায়েত বা নিন্দা মন্দ করে, তবে তাহাতে রাগান্বিত হইও না বা আশ্চর্যান্বিত হইও না যে, এমন মানুষ এমন কাজ করিবে! না এ-তো কখনো ভাবি নাই। হাতে ধরিয়া যাহাকে পালিয়াছি-পুষিয়াছি, খাওয়াইয়াছি-পরাইয়াছি, সে যে এমন নেমকহারামি করিবে তা কখনও ভাবি নাই। যার এত উপকার করিয়াছি সে যে সব ভুলিয়া আমার বিরুদ্ধে এমন কথা বলিবে, এ তো কখনো ভাবি নাই। আমি যে তার মুরুব্বি সে এই খেয়ালটুকুও করিল না। আগেও এইসব আশা করিবে না এবং পরেও তাআজ্জুব করিবে না বা রাগ করিবে না। কেননা, একে ত এ যমানার লোকের ভাবও অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। তা-ছাড়া তুমিও চিন্তা করিয়া দেখ, তুমিও ত সব সময় সকলের সঙ্গে সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে এক রকম ব্যবহার করিতে পার না। সামনে এক রকম ব্যবহার হয়, অসাক্ষাতে আর এক রকম ব্যবহার হয়। চিন্তা করিয়া দেখ, তুমিও ত তোমার উপকারী মুরুব্বিদের ষোল আনা হক আদায় কর নাই।

ফলকথা এই যে, কাহারো নিকট হইতে কোন প্রকার ভালাই এবং লাভের আশা পরিত্যাগ কর। কাহারো থেকে আর্থিক বা কায়িক উপকার ও খেদমত পাওয়ার আশা করিও না। কাহারো থেকে সম্মান ও খাতির পাওয়ারও আশা করিও না। কাহারো থেকে মহব্বত ও ভালবাসা পাওয়ারও আশা করিও না। কারণ, আশাই সব কষ্টের মূল। অতএব, যখন আশাই রাখিবে না তখন কাহারও খারাপ ব্যবহারেও কষ্ট হইবে না, সামান্য উপকার করিলেও তাহা অনেক বেশী বলিয়া বোধ হইবে।

কিন্তু অন্যের থেকে ভালাইর আশা রাখিবে না বলিয়া তুমি যে অন্যের ভালাই না করিবে, তাহা কিন্তু করিও না। তুমি লোকের ভালাই করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা আজীবন করিতে থাকিও, কিন্তু খালেছ নিয়তে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করিও এবং এক দুইবার করিয়া কোন ফল দর্শিল না বলিয়া ছাড়িয়া দিও না, বা উপকার করিলে আরও অপকার বেশী করে এ বলিয়াও লোকের উপকার করা ছাড়িও না। যেটুকু করিবে তাহা আল্লাহ্‌র কাছে পাইবে এই আশায় করিও। কেহ উপকার করুক বা অপকার করুক, তোমার উপকারের ফলে, তোমার বশে, তোমার পক্ষে থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু তুমি যেটুকু পারিবে লোকের উপকার করিতে কখনো ত্রুটি করিও না।

কাহারও কোন দ্বীনের বা দুনিয়ার ভালাইর কথা যদি তোমার বুঝে আসে, তবে উহা তাহাকে বাতাইতে তুমি কখনো বখীলি করিও না। যদি কেহ তোমার বিন্দুমাত্র উপকারও করে তাহা কখনো ভুলিও না, জীবন ভর ইয়াদ রাখিও, তাহার শুক্‌রিয়া আদায় করিও, আল্লাহ্‌র কাছে তাহার জন্য দো'আ করিও। যথাসম্ভব তাহার উপকারের প্রত্যুপকার করিও। আসল নেয়ামত আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে মনে করিয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র করিও। মানুষের ভক্ত বেশী হইও না, মানুষের উপর নজর রাখিও না, আল্লাহ্‌র উপর নজর রাখিও এবং আল্লাহ্‌র দান মনে করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি বেশী করিও। যদিও কেহ কোন কষ্ট দেয় বা ক্ষতি করে, তবে তাহাতে তাহার প্রতি মনে কীনা বা খল বা প্রতিশোধের চিন্তা রাখিয়া অনর্থক নিজের দেল খারাপ করিও না এবং প্রতিশোধ নিতে যাইয়া আরও বেশী ক্ষতির তলে পড়িও না। মনে করিও, হয়ত আমি আল্লাহ্‌র দরবারে গোনাহ্ করিয়াছি সেই গোনাহ্‌র শাস্তি এবং গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হইতেছে। ছবর করিও এবং আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করিয়া তওবা করিও ও ক্ষমা চাহিও। কোন লোকের সঙ্গে শত্রুতা বা হিংসা মনে পোষণ করিও না।

সারকথা এই যে, এক আল্লাহ্‌র সঙ্গে তা'আল্লুক রাখিবে, আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের আশা রাখিবে, আল্লাহ্‌র গযব ও আযাবের ভয় দেলে রাখিবে, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির পরোয়া করিবে। তা-ছাড়া মানুষের থেকে কোন ভালাইর আশাও করিও না, বা মানুষের ভয়ে ভীত হইয়া হক পথও ছাড়িও না। হামেশা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ রাখিও এবং ভিতরে-বাহিরে আল্লাহ্‌র হুকুমের এবং রাসূলের তরীকার তাবেদারী করিও।

অন্তর পরিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা

১। হাদীসঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى اَجْسَادِكُمْ وَ لَآ اِلَى صُوَرِكُمْ وَ لٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ ـ رواه مسلم

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তোমাদের দেহ (-এর সৌন্দর্য) ও আকৃতি দেখেন না। (মনে করিও না যে, যখন প্রকাশ্য কাজগুলি যাহা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়, মনে একাগ্রতা না থাকিলে তাহা কবূল হয় না, এমন কি কবূল হওয়ার কোন পথই নাই; সুতরাং দেলের কাজগুলিও কবূল হইবে না। কেননা, আল্লাহ্ পাক বলেন,) আল্লাহ্ পাক দেখেন তোমাদের অন্তর। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এমন কাজগুলি কবূল করেন না, যাহা শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল দেখায় অথচ এখলাছ এবং একাগ্রতাশূন্য হয়। যেমন, কেহ এবাদত করিতেছে এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবাদতে লিপ্ত আছে কিন্তু অন্তর অন্যমনস্ক। দেলে অনুভব হইতেছে না যে, সে আল্লাহ্র সমক্ষে দাঁড়ান আছে, না অন্য কোন কাজ করিতেছে। এ ধরনের কাজগুলি কবূল হয় না।

অবশ্য কোরআন এবং হাদীস হইতে প্রমাণিত আছে যে, বাহ্যিক কাজের সহিত একাগ্রতা ও এখলাছ বর্তমান থাকিলেই উহার মূল্য আছে। কেননা, আল্লাহ্র দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল হইল অন্তর। বাহ্যিক ডাক্তারীর মতে অন্তর যেমন দেহের রাজা, তেমনিভাবে রূহানী এবং বাতেনী দিক দিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাদশাহ্ হইল অন্তর। অন্তরের অবস্থা সঠিক ও সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত উদ্দেশ্য সফল হওয়ার এবং মুক্তির সন্ধান পাওয়ার কোনই আশা করা যায় না। মনে করুন, বাহ্যতঃ কেহ মুসলমান হইল কিন্তু অন্তরে মুসলমান হয় নাই, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে তাহার মুসলমান হওয়ার কোনই মূল্য নাই। এইরূপে যদি মানুষকে দেখাইবার জন্য কিম্বা অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্যে নামায পড়ে এবং ছদকা-খয়রাত ইত্যাদি এবাদত করে, তবে উহা কোন পর্যায়েই গণ্য হইবে না। কাজেই জানা গেল যে, উভয় জাহানের সফলতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে গ্রহণীয় হওয়ার মাপকাঠি শুধু আত্মার সংশোধন। লোকেরা আজকাল আত্মার ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন। তাহারা শুধু বাহ্যিক আমল কমবেশী কিছু করে এবং জ্ঞানও অর্জন করে কিন্তু আভ্যন্তরীণ সুস্থতা এবং অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও সংশোধনের বিন্দুমাত্রও চিন্তা করে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাহাদের ধারণা—আত্মার সংশোধন, রিয়া (লোক দেখান কাজ,) শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদির প্রতিকার এবং উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার কোনই প্রয়োজন নাই। শুধু বাহ্যিক কাজগুলিকেই ওয়াজিব ও করণীয় মনে করে এবং উহাকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট বলিয়া মনে করে, অথচ আসল উদ্দেশ্য যে আত্মার সংশোধন অত্র হাদীস দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল। আর বাহ্যিক কার্যগুলি হইল আত্মসংশোধিত হওয়ার উপায়। বিশেষতঃ যাহের-বাতেনের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে এমন একটা যোগাযোগ রহিয়াছে যে, বাহ্যিক অবস্থায় সংশোধন ব্যতীত বাতেনী অবস্থা সংশোধিত হয় না। আবার বাহ্যিক আমলসমূহের উপর পাবন্দী না করিলে বাতেনী সংশোধন স্থায়ী হয় না। যখন বাতেনী অবস্থা সংশোধিত হইয়া যায়, তখন বাহ্যিক আমলগুলি খুব ভালভাবে আদায় হইতে থাকে।

কোন নির্বোধ যেন এরূপ মনে না করে যে, বাহ্যিক আমলের প্রয়োজন শুধু আত্মা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত। আত্মা সংশোধিত হইয়া গেলে আর বাহ্যিক আমলের প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হইলে বাহ্যিক আমল করিবে নচেৎ না করিবে, ইহা কুফরী আক্বীদা। কারণ যখন আত্মা সংশোধিত হইয়া যাইবে, তখন যথাসাধ্য সব সময় আল্লাহ্ তা'আলার বন্দেগীতে ব্যস্ত থাকিবে এবং ইহাই আত্মা সংশোধিত হওয়ার নিদর্শন। কেননা, আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যই হইল আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত এবং তাঁহার শোক্র গোযারী করা। পরোয়ারদেগারের নাফরমানী এবং না-শোক্রী না করা। আর নামায

রোযা ইত্যাদি স্পষ্টই আল্লাহ্‌র এবাদত। কাজেই যখন এই এবাদতসমূহ ত্যাগ করা হইল, তখন ত আর আত্মা সংশোধিত হইল না। যদি আত্মা সংশোধিত হইত, তবে হামেশা দিন-রাত আল্লাহ্‌র নবীদের মত আল্লাহ্‌র এবাদতে নিশ্চয়ই মশগুল থাকিত।

নাউযুবিল্লাহ্! কোন নির্বোধ ও আহমকের দেলে এই ওছ্‌ওছা আসিতে পারে যে, কাহারও দেল জনাব হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের চেয়েও বেশী পরিষ্কার ও নেক, তাহার বাহ্যিক এবাদতের প্রয়োজন নাই।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সর্বগুণে গুণান্বিত এবং নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এত অধিক পরিমাণ বাহ্যিক আমলে লিপ্ত থাকিতেন যে, যাহারা উহা দেখিত তাহাদের মনে দয়ার সঞ্চার হইত। আজীবন তাঁহার অবস্থা এরূপই ছিল। হুযূরের (দঃ) এই অবস্থা হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এবং ইহা সর্বজনবিদিত।

মুসলমানগণ! ভালরূপে বুঝিয়া লও, যেরূপ বাহ্যিক আমল যথাঃ—রোযা, নামায ইত্যাদি আদায় করা এবং উহা আদায়ের প্রণালী তরীকা জ্ঞাত হওয়া ওয়াজিব; তেমনিভাবে, বাতেনী আমলসমূহ যেমন রোযা, নামাযকে রিয়া বা লোক দেখানো ইত্যাদি হইতে বাঁচাইয়া রাখা কিম্বা হিংসা-বিদ্বেষ ক্রোধ ইত্যাদি হইতে আত্মাকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আত্মার আ'মলের তরীকা জানিয়া লওয়াও ওয়াজিব। তন্মধ্যে কোন কোন আ'মল তো শুধু দেলের সাথে যোগাযোগ রাখে, যেমন—গোনাহ্‌র ইচ্ছা করা, বিদ্বেষ রাখা, হিংসা করা, এখলাছ পয়দা করা। আর কোন কোন কাজে দেল এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও শরীক আছে; যেমন—নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ছদকা ইত্যাদি। ইমাম গায্‌যালী (রঃ) ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন এই মতকে সমর্থন করিয়াছেন।

২। হাদীসঃ

رَكْعَتَانِ مِنْ رَّجُلٍ وَّرِعٍ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ رَكْعَةٍ مِّنْ مُّخْلِطٍ ○

অর্থাৎ—এমন পরহেযগার ব্যক্তি, যে সন্দেহের বস্তু হইতেও বাঁচিয়া থাকে, তাঁহার দুই রাকা'আত নামায ঐ ব্যক্তির হাজার রাকা'আত নামাযের চেয়েও উত্তম, যে সন্দেহের বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকে না।

ইহা স্পষ্ট কথা যে, এই ফযীলত আত্মার পরিচ্ছন্নতা এবং বাতেনী সংশোধন ব্যতীত হাছিল হওয়া সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি বাতেনী ব্যাধিসমূহ হইতে মুক্ত নহে, সে তো ওয়াজিব কাজগুলিও ঠিকমত আদায় করিতে পারে না এবং হারাম কাজগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকারও ক্ষমতা রাখে না। সে আবার সন্দেহের জিনিসগুলি হইতে কি ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে?

আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে এই ফযীলত দান করেন, সে খোদা ভীরুতা এবং আত্মার পরিচ্ছনতার সহিত যাহাকিছু এবাদত-বন্দেগী করিবে তাহা নিয়মানুযায়ী হইবে এবং গ্রহণীয় হইবে, যদিও তাহা অল্প পরিমাণেই হউক না কেন। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানের যাহের-বাতেনকে পূর্ণরূপে সংশোধন করিয়া লওয়া একান্ত কর্তব্য। কেননা, ইহাই শুধু পরিত্রাণ বা নাজাতের উপায়। আত্মার সংশোধন ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আমলসমূহকে নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করা উচিত নহে।

আচ্ছা ধরুন, যদি কেহ অনেক বেশী বেশী নামায পড়ে; কিন্তু নিয়ত এই যে, লোকে আমাকে বুযুর্গ মনে করুক, আমার প্রশংসা করুক। এমতাবস্থায় সে কি আযাব হইতে বাঁচিতে পারিবে?

অথবা নামায তো এমন জিনিস যে, যদি কেহ উহাকে নিয়মানুযায়ী এবং খাঁটি নিয়তে শুধু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আদায় করে, তবে নামায না পড়িলে যে আযাব হইবে, তাহা হইতেও বাঁচিয়া থাকিবে এবং ছওয়াবও পাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—সেই হতভাগা তো লোক দেখানো ব্যাধির জন্য এবং প্রশংসার মোহে ঐ নামাযকে বরবাদ করিয়া দিল। অতএব, এই সকল ব্যাধির প্রতিকার করা উচিত, নতুবা অচিরেই সর্বনাশে পতিত হইবে। কেননা, রোগ যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে অথচ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা থাকিবে না, তখন ধ্বংস তাহার অনিবার্য।

বল দেখি, যদি তুমি রোগাক্রান্ত হও এবং তোমার শরীর অসুস্থ হয় তখন কি তুমি ইহা পছন্দ করিবে যে, তুমি পীড়িত থাক এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা না করিয়া বসিয়া থাক আর সেই রোগ তোমাকে ধ্বংস করুক? কিছুতেই তুমি ইহা পছন্দ করিবে না, অথচ এই রোগে যে কষ্ট হইবে,তাহা হইবে শুধু এই দুনিয়াতে কয়েক দিনের দৈহিক কষ্ট। কাজেই যখন তুমি সামান্য কষ্ট পছন্দ কর না, তখন আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহে আক্রান্ত থাকা, যাহার কারণে এমন স্থানে দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, যেখানে অনন্তকাল থাকিতে হইবে, ইহা পছন্দ করা সরল বিবেকের একেবারেই পরিপন্থী। অতএব, প্রত্যেক মানুষের একান্ত কর্তব্য যে, দেহ, অন্তর, যাহের বাতেন প্রত্যেকটিকে ভালরূপে সংশোধন করিয়া লওয়া এবং সুস্থ বিবেক দ্বারা চিন্তা করিয়া দোনো জাহানের সফলতাকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করা। জনৈক কবি বলেনঃ

বেকার শুধু সেই দেশ, নাহি যেথা দ্বীনের কোশেশ,
হেথার তরে করেছ সবই হোথার তরে কর কিছু কম বেশ।

৩। হাদীসঃ

عن النعمان بن بشير مرفوعا فِى حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ ـ اَلَا وَ اِنَّ فِى الْجَسَدِمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَ هِىَ الْقَلْبُ ـ

অর্থাৎ, নোমান ইবনে বশীর হইতে এক মরফু' হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ শরীরে এক টুকরা (মাংস পিণ্ড) আছে, যখন উহা সুস্থ থাকে তখন সম্পূর্ণ দেহ ঠিক থাকে, আর যখন উহা খারাব হইয়া যায়, তখন সমস্ত দেহ খারাব (বরবাদ) হইয়া যায়। জানিয়া রাখ, ঐ টুকরাটি হইল হৃৎপিণ্ড। এই হাদীসখানা বোখারী ও মুসলিম (রঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন। এই হাদীসের মর্ম এই যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংশোধন এবং খোদা তা'আলার বন্দেগী দেলের সংশোধনের উপর নির্ভর করে। কেননা, দেল শরীরের রাজা, রাজা সৎ ও দ্বীনদার না হইলে প্রজা সাধারণের নেক ও দ্বীনদার হওয়া সম্ভব নহে। অতএব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেক কাজ ঐ সময়েই করিবে যখন অন্তর নেক হইবে। কাজেই দেল সংশোধনে যত্নবান হওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হইল। কেননা, আল্লাহ্র বন্দেগী ওয়াজিব চাই সেই বন্দিগীর যোগাযোগ শুধু দেলের সাথে হউক কিংবা উহাতে দেলের সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগাযোগ হউক। আর এবাদত সঠিক এবং কবূল হওয়া দেলের সংশোধনের উপর নির্ভর করে; সুতরাং দেলের সংশোধন করা ওয়াজিব। ক্ষুধিত অবস্থায় নামায পড়িলে মন পেরেশান থাকিবে। কাজেই এমতাবস্থায় নামায পড়া শরীঅত মতে মকরূহ। সুতরাং আগে খানা খাইয়া পরে নামায পড়িবে। কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত যেন শেষ হইয়া না যায়। ইহাতে হেকমত এই যে, এবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে হাজিরী দেওয়া এবং নিজের দাসত্ব এইরূপে প্রকাশ করা যে, যাহের ও বাতেন তাঁহার

কাজে মশগুল থাকে এবং যতদূর সম্ভব এক আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন কিছুর দিকে মন যেন না যায়। আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদিও বাহ্যিক দেহ নামাযে লিপ্ত থাকিবে বটে, কিন্তু চাহিবে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করিয়া খানা খাওয়ার জন্য। অতএব, আল্লাহ্‌র দরবারে যেভাবে উপস্থিত হওয়া দরকার উহাতে ক্ষতি সাধিত হইবে অনেক। এ কারণে এমন অবস্থায় নামায পড়া মকরূহ বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার আসল দৃষ্টিস্থল হইল মানুষের অন্তর। পবিত্র শরীঅত উহার সংশোধনের অতি বড় ব্যবস্থা করিয়াছে। বুযুর্গানে দ্বীন আত্মার সংশোধনের জন্য বহু বৎসর পর্যন্ত সাধনা, মোজাহাদা, রিয়াযত ও সংযম অভ্যাস করিয়াছেন। এই বিষয়ের ভুরি ভুরি কিতাব বিদ্যমান আছে। অত্র হাদীস দ্বারা আত্মা সংশোধনের ব্যাপারে খুব বেশী তাকীদ ও তাম্বীহ প্রমাণিত হইতেছে। কেননা, বন্দেগীর সৌন্দর্য, গুণ গরিমা আত্মার উপর নির্ভর করে।

৪। হাদীসঃ

عن ابن عباس (رض) مَرْفُوْعًا قَالَ رَكْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَّ الْقَلْبُ سَاءٍ ـ

(فی کنز العمال)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, একাগ্রতার সহিত মধ্যম ধরনের দুই রাকা'আত নামায পড়া, অন্যমনস্ক অবস্থায় সারা রাত্র নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। এই হাদীসের মর্ম এই যে, যদি কেহ দুই রাকা'আত নামায মধ্য পন্থায় আদায় করে, নামাযের যাবতীয় ফরয ওয়াজিব ও সুন্নত কাজগুলি হুযূরে কাল্‌ব ও দেলের একাগ্রতার সহিত আদায় করে, যদিও উহাতে লম্বা লম্বা কেরাআত ইত্যাদি না করে, এই প্রকারের দুই রাকা'আত নামায অন্যমনস্কভাবে সারা রাত্রি নামায পড়ার চেয়ে অতি উত্তম এবং মকবুল।

এই হাদীস দ্বারা অন্তরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার অত্যধিক তাকীদ বুঝা যাইতেছে। কারণ মানুষ শুধু দেখে যে, কাজটা কেমন হইল ; কাজ কি পরিমাণ হইতেছে ইহা কেহ দেখে না। কাজ যদিও সামান্য এবং অল্পও হয়, কিন্তু হয় নিয়মানুযায়ী উত্তমরূপে, তবে উহা আল্লাহ্‌র সমীপে সমাদৃত এবং মকবুল হইয়া থাকে। আর যদি কাজ অনেক কিছু হয় কিন্তু কায়দা কানুন ছাড়া অন্যমনস্কভাবে হয়, তবে উহা অপছন্দনীয়। ভালরূপে বুঝিয়া লও।

হিত বাণী সবায় আমি করিলাম দান,
কেটেছে একাজে মোর ক্ষুদ্র জীবনখান,
হতে না পারে কারো হৃদে কর্মের অভিলাষ,
পৌঁছাইলে কিন্তু ওহী বাণী নবীগণ খালাস।

সাধারণ মেয়েলোকদের প্রতি নছীহত

শেরেকী বিষয়সমূহের কাছেও যাইবে না, সন্তান হইবার জন্য বা জীবিত থাকার জন্য যাদু-টোনা করিবে না, ভাগ্য গণনা করাইবে না, পীর ওলীদের ফাতেহা-নিয়ায করিবে না, বুযুর্গদের নামে মান্নত করিবে না, শবেবরাত, মোহররম আরফা ইত্যাদিতে এবং তাবাররুকের রুটি (এক জাতীয় রছম) ও তেরাতেজীতে (ছফর মাসের প্রথম তের দিন যখন রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পীড়িত ছিলেন, তাই এই দিনগুলিকে অশুভ মনে করা হয়) ঘুমনী ইত্যাদি

কিছুই করিবে না। শরীঅতে যাদের হইতে পর্দা করিবার হুকুম, চাই সে পীর হউক বা যতই নিকটবর্তীয় হউক না কেন, যেমন ভাসুর পুত্র কিম্বা খালু, ফুফা, মামাত ভাই, ভগ্নিপতি, নন্দাই, ধর্ম-ভাই, ধর্ম-বাপ, এই সকল হইতে বেশী রকম পর্দা করিবে। শরীঅতের রবখেলাফ পোশাক পরিবে না, যেমন কলিদার পায়জামা, এমন জামা যাহাতে পেট, পিঠ, হাতের কব্জি বা বাহু খোলা থাকে কিংবা এমন পাতলা কাপড় যাহাতে শরীর বা মাথার চুল দেখা যায়। মোটা কাপড় দ্বারা লম্বা হাতার লম্বা জামা ও ওড়না তৈয়ার কর। আর সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে মাথা হইতে কাপড় যেন সরিয়া না যায়। অবশ্য যদি বাড়ীতে শুধু মেয়েলোক থাকে কিংবা নিজের বাপ, সহোদর ভাই ইত্যাদি ছাড়া অন্য কেহ না থাকে, তবে মাথার কাপড় খুলিয়া গেলে তাতে ভয়ের কারণ নাই। কাহাকেও উঁকিঝুকি মারিয়া দেখিও না। বিবাহ-শাদী, ছেলের মাথা মুড়ানী, (জন্মের সপ্তম দিবেস সন্তানের মাথার চুল মুণ্ডানকালে ধুমধাম করা।) চিল্লা, (প্রসূতির ৪০ দিনের দিন গোসলের সময় ধুমধাম করা।) প্রসবের ষষ্ঠ দিনের ষষ্ঠি (রসম), খৎনা, আকীকা শাদীর পয়গাম, চৌথি—পাত্র পক্ষ হইতে পাত্রীর বাড়ীর কাপড়, আতর, মেন্দি ইত্যাদি পাঠাইবার দিন যাবতীয় রসুমের মধ্যে কোথাও যাইবে না। উপরোক্ত কাজে নিজের বাড়ীতেও কাহাকেও ডাকিবে না। নামের জন্য কোন কাজ করিও না, খোঁটা, বদদো'আ, পরনিন্দা ও অভিশাপ হইতে জবান বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া রাখ, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আউয়াল ওয়াক্তে পড় মন, লাগাইয়া ধীরে ধীরে নামায পড়, রুকূ-সজ্‌দা ভালরূপে কর। মাসিক নাপাকী হইতে যখন পাক হও তখন খুব খেয়াল রাখিও, খুন বন্ধ হইবার পর যেন কোন ওয়াক্তের নামায ছুটিয়া না যায়। যদি তোমার কাছে অলংকারাদি, সোনা বা রূপার চেইন, কাপড়ের জরী ইত্যাদি থাকে, তবে হিসাব করিয়া যাকাত আদায় করিও। বেহেশ্‌তী জেওর পড়িতে থাকিও কিংবা অন্যের কাছে শুনিতে থাকিও এবং তদনুযায়ী চলিও। স্বামীর তাবেদারি করিও, তাহার মাল গোপনে খরচ করিও না, গান শুনিও না। যদি কোরআন শরীফ পড়িতে পার তবে দৈনিক কোরআন শরীফ তেলাওয়াত কর। যদি কোন বই-পুস্তক পড়িবার জন্য কিংবা দেখিবার জন্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়, তবে প্রথমে কোন পরহেযগার আলেমকে দেখাও। যদি তিনি সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলেন, তবে খরিদ কর, নচেৎ ক্রয় করিও না। যেখানে রসম-রেওয়াজের মিষ্টি বিতরণ হয় সেখানে যাইও না এবং বিতরণ কাজে শরীক হইও না।

খাছ যাহারা মুরীদ হইবে তাহাদের প্রতি নছীহত

উপরের নছীহতগুলি রীতিমত পালন করিবে। প্রত্যেক বিষয়ে সুন্নতের পায়রবী করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। সুন্নতের পায়রবীতে দেলের মধ্যে নূর পয়দা হয়। তোমার মতের বিরুদ্ধে বা মনের বিরুদ্ধে যদি কেহ কোন কথা বলে বা কোন কাজ করে, তবে তাহাতে রাগান্বিত না হইয়া ধৈর্য (ছবর) ধারণ করিবে। চিন্তা না করিয়া হঠাৎ কোন কথা বলা শুরু করিও না, বিশেষতঃ রাগের সময় ত কথা বলিবেই না। কখনো পরহেযগারীর, এবাদত-বন্দেগীর বা এলেম-লিয়াকতের ফখর (গর্ব) করিও না। যে কোন কথা বলিতে হইবে, আগে ভাল মত চিন্তা করিয়া লইবে, যখন খুব এতমিনান হইয়া যাইবে যে, এ কথায় কোন খারাবি নাই; বরং দ্বীনের বা দুনিয়ার জরুরত বা লাভ আছে, তখন বলিবে নতুবা বলিবে না। কোন মন্দ লোককেও মন্দ বলিও না।

(খেলাফে শরা ফকীরের কাছে কখনো যাইও না বা তাহাদের কথা কখনো শুনিও না বা যদি তাহার তা'বিযে কাজ হয়, তবুও তাহার দ্বারা তাবিয-তুমারের কোন তদবীর করাইও না।) কোন মুসলমান যদি গোনাহ্গার বা ছোট কওমের হয়, তবুও তাহাকে হেকারতের (ঘৃণার) চোখে দেখিও না। মানের লোভ যশের লোভ করিও না। তাবিয-তুমারের বা সূতা পড়া, পানি পড়ার ব্যবসা কখনো করিও না। যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে যাহারা সর্বদা আল্লাহ্র যেক্র করে, তাহাদের সঙ্গে থাকিবে। কারণ আল্লাহ্র যেকরকারীদের সংসর্গে থাকিলে দেলের মধ্যে নূর, হিম্মত এবং শওক পয়দা হয়। দুনিয়ার ঝামেলা বেশী বাড়াইবে না, বিনা জরুরতের অসবাবপত্র কিনিবে না। বিনা জরুরতে বেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিবে না। অধিকাংশ সময় একা একা থাকিয়া আল্লাহ্র যেকরের ধ্যান রাখিতে চেষ্টা করিবে। দরকারবশতঃ লোকের সঙ্গে যখন মেলামেশা কর, তখন খুব ভদ্রতা এবং নম্রতার সহিত মিলিবে মিশিবে। রুঠা বা কর্কশ কথা কাউকে বলিবে না। চিন-পরিচয়ের লোক যারা, তারা কিন্তু অনেক সময় নষ্ট করে। খুব সতর্ক থাকিবে যাতে জীবনের সময় নষ্ট না হয়, সময়গুলি যেন কাজে খাটে। যেকের-শোগল বা মোরাকাবা করার কারণে দেলের মধ্যে যদি কোন হালত পয়দা হয়, তবে তাহা এক পীর ব্যতীত অন্য কাহারো কাছে বলিবে না। অনর্থক জেদ হঠ করিও না, এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিও। যদি কোন কথায় তোমার ভুল হইয়া থাকে, তবে বুঝে আসা মাত্র বা অন্য কেহ সতর্ক করিলে তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল স্বীকার করিয়া লইবে, অনর্থক তর্ক করিয়া জিতিতে চাহিও না। সব কাজে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখিবে, সব সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ রাখিবে আল্লাহ্র রহমতের আশা রাখিবে, আল্লাহ্র গযবের ভয় রাখিবে, যখন যে বিষয় অভাব বা দরকার হয় আল্লাহ্র কাছে চাহিবে। যদি তিনি দয়া করিয়া দেন, তবে শোক্র করিবে। যদি না দেন ছবর করিবে। সব সময় দ্বীনের উপর হামেশা কায়েম থাকার জন্য এবং খাতেমা বিল-খায়ের অর্থাৎ ঈমানের সঙ্গে মউতের জন্য আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি, কাকুতিমিনতি করিয়া দো'আ চাহিতে থাকিবে। আল্লাহ্ সকল মুসলমানকে নেক আমল করিবার তওফীক দান করুন। আমিন!

॥ দ্বিতীয় জিল্‌দ সমাপ্ত ॥

১ম-২য় এবং ৩য় ভলিউম

৩য় ভলিউম

বেহেশ্তী জেওর

১ম-২য় এবং ৩য় ভলিউম

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে ফকীহ্ বানাইয়া দেন।

বঙ্গানুবাদ

বেহেশ্তী জেওর

৮ম, ৯ম, ও ১০ম খণ্ড

[তৃতীয় ভলিউম]

লেখক
কুত্বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশ্তী (রঃ)

অনুবাদক
হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

আরয

হাম্‌দ ও ছালাতের পর বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট অধীনের বিনীত আরয এই যে, মুজাদ্দেদে যমান, কুত্‌বে দাওরান, পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রহ্‌মতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় সম্পূর্ণ জীবনটি ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন কিতাব ১০/১২ জিল্‌দেরও আছে। কিন্তু এইসব কিতাবের কপি রাইট তিনি রাখেন নাই বা কোন একখানি কিতাব হইতে বিনিময় স্বরূপ একটি পয়সাও তিনি উপার্জন করেন নাই। শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দ্বীন ইসলামের খেদমতে ও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত কিতাবের মধ্যে ১১ জিল্‌দে সমাপ্ত বেহেশ্‌তী জেওর একখানা বিশেষ যরূরী কিতাব। সমগ্র পাক-ভারতের কোন ঘর বোধ হয় বেহেশ্‌তী জেওর হইতে খালি নাই এবং এমন মুসলমান হয়ত খুব বিরল, যে বেহেশ্‌তী জেওরের নাম শুনে নাই। বেহেশ্‌তী জেওর আসলে লেখা হইয়াছিল শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য; কিন্তু কিতাবখানা এত সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও এত ব্যাপক হইয়াছে যে, পুরুষেরা এমন কি আলেমগণও এই কিতাবখানা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা পাইতেছেন।

বহুদিন যাবৎ এই আহ্‌কারের ইচ্ছা ছিল যে, কিতাবখানার মর্ম বাংলা ভাষায় লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলিম ভাই-ভগ্নীদিগের ইহ-পরকালের উপকারের পথ করিয়া দেই এবং নিজের জন্যও আখেরাতের নাজাতের কিছু উছীলা করি; কিন্তু কিতাব অনেক বড়, নিজের স্বাস্থ্য ও শরীর অতি খারাপ, শক্তিহীন; তাই এত বড় বিরাট কাজ অতি শীঘ্র ভাগ্যে জুটিয়া উঠে নাই। এখন আল্লাহ্‌ পাকের মেহেরবানীতে মুসলিম সমাজের খেদমতে ইহা পেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। মক্কা শরীফের হাতীমে বসিয়া এবং মদীনা শরীফের রওযায়ে-আক্বদাসে বসিয়াও কিছু লিখিয়াছি। 'আল্লাহ্‌ পাক এই কিতাবখানা কবূল করুন এই আমার দো'আ এবং আশা করি, প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণও দো'আ করিতে ভুলিবেন না। এই পুস্তকে আমার বা আমার ওয়ারিশানের কোন স্বত্ব নাই ও থাকিবে না।

মূল কিতাবে প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গেই উহার দলীল এবং হাওয়ালা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উর্দু বেহেশ্‌তী জেওর কিতাব সব জায়গায়ই পাওয়া যায় এবং উর্দু ভাষাও প্রায় লোকেই বুঝে, এই কারণে আমি দলীল বা হাওয়ালার উল্লেখ করি নাই। যদি আবশ্যক বোধ হয়, পরবর্তী সংস্করণে দলীল ও হাওয়ালা দেওয়া হইবে। আমি একেবারে শব্দে শব্দে অনুবাদ করি নাই, খোলাছা মতলব লইয়া মূল কথাটি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছি। দুই একটি মাসআলা আমাদের দেশে গায়ের যরূরী মনে করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং কিছু মাসআলা যরূরত মনে করিয়া অন্য কিতাব হইতে সংযোজিত করিয়াছি। তা'ছাড়া বেহেশ্‌তী গওহরের সমস্ত মাসআলা বেহেশ্‌তী জেওরের মধ্যেই বিভিন্ন খণ্ডে ঢুকাইয়া দিয়াছি। কাহারও সন্দেহ হইতে পারে বিধায় বিষয়টি জানাইয়া দিলাম।

আরযগুযার
শামসুল হক
৩১/৭/৮৬ হিজরী

■ সূচী-পত্র ■

বিষয়	পৃষ্ঠা
অষ্টম খণ্ড	
রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু	১
রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর চারি কন্যা, পাঁচ পুত্র	২
রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আদত-আখ্লাক	৩
আম্বিয়াগণের নেক বিবিদের কাহিনী	
হযরত হাওয়া (আঃ),	
হযরত সারা (আঃ)	৫
হযরত হাজেরা (আঃ)	৬
হযরত ইসমাঈলের বিবির কাহিনী	৭
বাদশাহ নমরুদের কন্যা	৮
আইয়ূব নবীর স্ত্রী বিবি রহীমা,	
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর খালা	৯
হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা,	
হযরত মূসা (আঃ)-এর ভগ্নী	১০
হযরত মূসা (আঃ)-এর বিবি ছফুরা	১১
হযরত বিবি আছিয়া,	
ফেরআউনের কন্যা ও বাঁদী	১২
হযরত মূসার এক বৃদ্ধা লস্কর	১৩
হাইসূরের ভগ্নী, হযরত বিলকিস	১৪
বনি-ইস্রায়ীলের এক দাসী	১৫
বনি-ইস্রায়ীলের এক বুদ্ধিমতী নারী,	
হযরত বিবি মরইয়ম	১৬
হযরত খাদিজা, হযরত সওদা, হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা	১৭
হযরত হাফ্সা, হযরত যয়নব বিন্তে জাহাশ	১৮
হযরত যোয়ায়রিয়াহ	১৯
হযরত মায়মুনাহ্, হযরত সফিয়া	২০
হযরত যয়নব, হযরত রোকেয়া,	
হযরত উম্মে কুলসুম, হযরত ফাতেমা (রাঃ)	২১
হযরত হালিমা সাআদিয়া, হযরত উম্মে সলিম	২২
হযরত উম্মে হারাম, হযরত আবু হুরায়রার মাতা	২৩
ইমাম রবিয়া তুর্রার মাতা, হযরত ফাতেমা নিশাপুরী	২৪
হযরত রবিয়া বিন্তে ইসমাঈল, হযরত মায়মুনা সওদা	২৫
হযরত ছারি সাক্বাতির মুরীদ, হযরত তোহ্ফা	২৬
শাহ ইবনে-সোজা কারমানির কন্যা	২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
নেক বিবিগণের তারীফে কোরআন ও হাদীস	২৮
সংশোধনমূলক কাহিনী	৩২
ওয়ায়েলার কাহিনী, হযরত লূত (আঃ)-এর বিবি, কাফের আওরত ছদুফের কাহিনী	৩৩
আরবিলের কাহিনী	৩৪
নায়েলার কাহিনী, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর হত্যাকারিণী	৩৫
মহান আবেদের বিবির কাহিনী, হযরত জুরীহের তোহমতকারিণী আওরত	৩৬
বনি-ইস্রায়ীলের নির্দয় আওরত, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের এক আওরত	৩৭
বনি-ইস্রায়ীলের ঠগবাজ আওরত, যায়দা বিন্‌তে আশআবের কাহিনী	৩৮
বিবি যুলেখার কাহিনী, কারূণের ধোঁকাবাজ আওরত	৩৯
গোনাহ স্বীকারকারিণী আওরত, রাসূলে মাকবুলের পাক শামায়েল	৪০
নবম খণ্ড	
স্বাস্থ্যই সুখের মূল	৪৯
খাদ্য	৫১
গম	৫২
মাংস বর্গ, পাখী	৫৩
মাছ বর্গ	৫৪
ডাইল বর্গ, তরকারী	৫৫
শাক বর্গ	৫৬
তৈল বর্গ, ঘৃত বর্গ, দুগ্ধ বর্গ	৫৭
অবস্থাভেদে দুগ্ধের গুণাগুণ, গুড়বর্গ	৫৮
ফল বর্গ	৫৯
মোছলেহাত বর্গ	৬১
লবণ বর্গ, মধু বর্গ	৬২
অন্ন বর্গ, মিষ্টান্ন বর্গ, পরিশ্রম	৬৩
বিশ্রাম, চিত্ত বিনোদন, ক্রন্দন	৬৪
নিদ্রা, নিদ্রার সময়	৬৫
নিদ্রার নিয়ম, নিদ্রার সময় সাবধানতা, পানি	৬৬
অধঃগতি, সংযম	৬৭
সমাধান	৬৮
সাবধানতা	৬৯
বিশেষ সতর্কীকরণ	৭০
শিরঃ পীড়া	৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাথা বেদনার চিকিৎসা, তদবীর	৭২
প্রতিশ্যায় সর্দি, তদবীর, উন্মাদ	৭৪
উন্মাদ রোগে রস প্রয়োগ	৭৫
স্বল্প ব্যয়ে উন্মাদ চিকিৎসার তদবীর	৭৭
মৃগী,	
তদবীর	৭৮
চুল, চক্ষু রোগ	৭৯
চক্ষু উঠা	৮০
দৃষ্টিশক্তি হীনতা, তদবীর	৮১
কর্ণ রোগ	৮২
নাসিকা রোগ, তদবীর, সর্দি, জিহ্বা	৮৩
দন্ত রোগ, মুখের দুর্গন্ধি, গণ্ডমালা ও গলগণ্ড	৮৪
বক্ষ, চন্দনাদ্য তৈল প্রস্তুত প্রণালী	৮৫
রাজ যক্ষ্মা, যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ	৮৬
তদবীর, হৃদ রোগ	৮৭
তদবীর	৮৮
পথ্যাপথ্য, জঠর পীড়া	৮৯
অগ্নিমান্দ্য	৯০
অতিসার, প্রবাহিকা	৯১
তদবীর	৯২
শূল বা নিদারুণ বেদনা	৯৩
তদবীর, শোথ ও জলোদরী	৯৪
তদবীর, ক্রিমি, প্লীহা-যকৃত	৯৫
পাণ্ডু, কামলা, হলিমক, তদবীর	৯৬
গুর্দা, মূত্রাশয়	৯৮
তদবীর	৯৯
পাথরী	১০০
তদবীর, জরায়ু	১০১
অধিক রক্তস্রাব, তদবীর	১০২
শ্বেত প্রদর, তদবীর	১০৩
গর্ভ	১০৪
গর্ভবতীর সাবধানতা, গর্ভবতীর রক্তস্রাব, গর্ভবতীর অকাল বেদনা	১০৫
তদবীর	১০৭
জন্ম নিয়ন্ত্রণ	১০৮
গর্ভবতীর পেটে সন্তান গোজ মারিয়া থাকিলে তাহার চিকিৎসা	১১২
গর্ভে সন্তানের অস্থিরতা	১১২
প্রসব বেদনা, গর্ভে মরা সন্তান ও ফুল বাহির করিবার উপায়	১১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
তদবীর	১১৪
প্রসূতির পথ্যাপথ্য, যৌন ব্যাধি (প্রমেহ), চিকিৎসা	১১৬
রস প্রয়োগ, পথ্যাপথ্য, প্রমেহ রোগ চিকিৎসায় সতর্কীকরণ	১১৭
ধ্বজভঙ্গ, চিকিৎসা	১১৮
প্রস্তুত প্রণালী, লিঙ্গ ব্যাধি	১২১
গণোরিয়া, চিকিৎসা, গর্মি (সিফলিস), চিকিৎসা	১২২
তদবীর	১২৩
যোনি ব্যাধি, চিকিৎসা, বাজীকরণ ও সতর্কীকরণ, স্বপ্নদোষ	১২৪
তদবীর, কোষ ব্যাধি, একশিরা কুরণ্ড ও অন্ত্র বৃদ্ধি, চিকিৎসা	১২৫
গুহ্যদ্বার ব্যাধি	১২৬
চিকিৎসা, তদবীর	১২৭
ভগন্দর, তদবীর	১২৮
অর্শ ও ভগন্দরের পথ্যাপথ্য, বাগী, শ্লীপদ (গোদ)	১২৯
তদবীর, গোড়শূল	১৩০
সর্বাঙ্গীন, ফোঁড়া ও ব্রণ	১৩১
নালী ঘা	১৩২
জ্বর, বাত জ্বর	১৩৩
চিকিৎসা, দ্বিদোষজ জ্বর, চিকিৎসা, পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বর	১৩৪
বাত শ্লেষ্মা জ্বর, চিকিৎসা, ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক জ্বর	১৩৫
কর্ণমূল জাত শোথ, চিকিৎসা, বিষম জ্বর ও জীর্ণ জ্বর চিকিৎসা	১৩৬
পালা জ্বর, তদবীর, গরম লাগা জ্বর	১৩৭
জ্বরের পথ্যাপথ্য	১৩৯
অগ্নিদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা, দাদ, কাওর চিকিৎসা, খোস চুলকনা, মুখের মোচতা	১৪০
পিট চাল, তদবীর, আঘাত, শ্বিত্র রোগ (পাতরী), চিকিৎসা, বিষ চিকিৎসা	১৪১
স্থাবর বিষ চিকিৎসা, জঙ্গম বিষ চিকিৎসা, তদবীর	১৪২
কুকুরের বিষ	১৪৩
জলাতঙ্ক, বাল্য রোগ, হেরযে আবী দোজানা	১৪৪
স্তন্য-দুগ্ধ নষ্ট হইবার তিনটি কারণ, উম্মুছ-ছিবইয়ান	১৪৬
শিশুর ক্রন্দন, শিশুর কর্ণ রোগ, তদবীর	১৪৭
শয্যা-মূত্র, শিশুর জ্বর, কলেরা, বসন্ত	১৪৮
প্লেগ	১৪৯
বেদনা-শূল বেদনা	১৫১
স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য	১৫২
জ্বর, শোথ ফোঁড়া, সাপ, বিচ্ছু, বোলতা দংশন, বদ নজর, বসন্ত, সর্বপ্রকার ব্যাধিতে	১৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
অভাব-অনটন দূর করণার্থে, মুশকিল, জ্বীন	১৫৪
পরীক্ষা ও জ্বীন হাজির	১৫৫
বন্ধন	১৫৭
শাস্তি	১৫৮
বন্ধ	১৬৬
বাড়ী বন্ধ, বাড়ী বন্ধের নিয়ম নিম্নরূপ	১৬৯
জ্বীন ও ইনসানের যাদু	১৭১
আমেলের কর্তব্য	১৭৩
অবৈধ প্রণয় বিচ্ছেদ, হারানো বস্তু প্রাপ্তির জন্য	১৭৪
চুরি	১৭৫
পলাতক মানুষ হাযির করিবার তদবীর	১৭৬
দশম খণ্ড	
নিরাপদে থাকার কতিপয় নীতিকথা	১৭৮
কতিপয় শালীনতাহীন ও ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস— যাহা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট হয়	১৮৩
শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতার কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ	১৮৭
শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে সাবধানতা	১৯৪
কতিপয় জরুরী উপদেশ	১৯৬
অর্থ উপার্জনের এবং হস্ত শিল্পের কতিপয় গুণাবলীর কথা	২০১
কতিপয় আম্বিয়া (আঃ) ও বুযুর্গ যাঁহারা স্বহস্তে জীবিকা উপার্জন করিতেন	২০২
জীবিকা অর্জনের কতিপয় সহজ উপায়, সাবান প্রস্তুত প্রণালী	২০৩
সাবান প্রস্তুতের আধুনিক পদ্ধতি	২০৫
সাবানের উপাদানের তালিকা, প্রস্তুতের নিয়ম, কাপড়ে ছাপা রং করিবার নিয়ম	২০৬
লেখার কালি প্রস্তুত প্রণালী, ইংরেজী কালি তৈয়ার করিবার নিয়ম, কাঠের আসবাব-পত্র বার্নিস করার নিয়ম, বাসন-পত্র কালাই করার নিয়ম, তামা-পিতল ঝালাই করার নিয়ম	২০৭
তামাক প্রস্তুতের নিয়ম, খোশবুদার তামাক প্রস্তুতের নিয়ম, সহজ পাচ্য সুজির রুটি প্রস্তুতের নিয়ম, গোশ্‌ত পাকাইবার নিয়ম যাহা ছয় মাসেও খারাপ হয় না	২০৮
গোস্‌ত পাকানের ২য় নিয়ম, বিস্কুট পাউরুটি প্রস্তুত প্রণালী	২০৯
পাউরুটি প্রস্তুত করার নিয়ম	২১০
নানখাতায়ী প্রস্তুত করিবার নিয়ম, মিঠা বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম, নিমকী বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম	২১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমের আচার তৈয়ার করার নিয়ম,	
চাস্‌নিদার আচার তৈয়ার করার নিয়ম,	
শালগমের আচার, নবরত্ন চাট্‌নী তৈয়ার করার নিয়ম,	
মোরব্বা প্রস্তুতের নিয়ম	২১২
নিমক পানির আম প্রস্তুত প্রণালী,	
লেবুর আচার তৈয়ার করার নিয়ম,	
কাপড় রংগাইবার নিয়ম, হলুদ রং	২১৩
সোনালী আভা রং, সোনালী রং করার অন্য নিয়ম,	
গ্রীন বা সবুজ রং করার নিয়ম,	
সবুজ বা গ্রীন রং করার ২য় প্রণালী,	
বেগুনী রং প্রস্তুত প্রণালী, লাল-আভা পাকা গাড় বেগুনী রং	২১৪
চকলেট রং, বাদামী বা হালকা জরদ রং, লাল পাকা রং	২১৫
পেস্তা রং, পেস্তা রংয়ের দ্বিতীয় নিয়ম, নীল রং, খাদ্য অধ্যায়	২১৬
ভিটামিন বা খাদ্য-প্রাণ	২১৭
স্বাস্থ্যের উপর ভিটামিনের প্রভাব ও	
ভিটামিনের উপকারিতার তালিকা	২১৮
কোন্ খাদ্যে কতগুণ ভিটামিন আছে তাহার তালিকা	২১৯
দ্রব্য গুণ	২২৩
তরি-তরকারি	২২৪
দেশী ফল-ফলাদির গুণাগুণ	২২৫
মসল্লাদির গুণাগুণ	২২৭
হিসাব-পত্র লিখার নিয়ম, হিসাবের নমুনা	২২৯
পোষ্ট এবং টেলিগ্রাম অফিসের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী	২৩১
বুক-পোষ্টের নিয়ম	২৩৩
বীমা বা ইন্‌সিওরের নিয়ম	২৩৪
ভি, পি-এর নিয়ম, মণিঅর্ডারের নিয়ম, টেলিগ্রামের নিয়ম	২৩৫
পাসপোর্ট ও ভিসা	২৩৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বেহেশ্‌তী জেওর

অষ্টম খণ্ড

□

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু

রাসূলে করীমের মোবারক নাম মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ্। তাঁহার পিতার পিতার নাম আবদুল মুত্তালিব, তাঁহার পিতার নাম হাশেম, হাশেমের পিতা আব্‌দে মনাফ।

রাসূলে করীমের মাতা আমেনা। আমেনা ছিলেন অহবের কন্যা। অহবের পিতা আব্‌দে মনাফ। তাহার পিতা যোহরা। উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীমের পিতৃকুলের এবং মাতৃকুলের আব্‌দে মনাফ একই জন নহেন—ভিন্ন ব্যক্তি।

কাফের বাদশাহ্ আবরাহা যে বৎসর হস্তী সহকারে খানায়ে কা'বা ধ্বংস করিতে আসে—সেই সালের বারই রবিউল আউয়াল নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হন। সেদিনটি ছিল সোমবার। জন্মের কয়েক মাস পর হইতে শিশু নবী ধাত্রী গৃহে লালিত-পালিত হন। পাঁচ বৎসর বয়সে ধাই-মা হালিমা তাঁহাকে মাতা আমেনার গৃহে ফিরাইয়া দেন। ছয় বৎসর বয়সে মাতা আমেনা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আপন মাতুলালয় মদীনার বনী-নাজ্জারে গমন করেন। ফিরিবার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে এন্তেকাল করেন। সঙ্গীয়া দাসী উম্মে আয়মন বালক নবীকে সঙ্গে করিয়া মক্কায় পৌঁছেন।

পিতা আবদুল্লাহ্ নবী করীমকে মাতৃগর্ভে রাখিয়াই এন্তেকাল করেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর দাদার লালন-পালনে তিনি বড় হইতেছিলেন। আল্লাহ্‌র মহিমা অপার—মানুষের বুঝা ভার। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দাদা আবদুল মুত্তালিবও ইহধাম ছাড়িয়া গেলেন। এইবার তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার চাচা আবু তালিব আপন কাঁধে তুলিয়া নিলেন।

একবারের এক ঘটনা। নবীকে সঙ্গে করিয়া চাচা আবু তালিব সিরিয়া তেজারতে চলিলেন। পথিমধ্যে নাছারা ধর্ম যাজক 'বুহাইরার' সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। বুহাইরা আবু তালিবকে বলিল—খবরদার! এই বালককে হেফাযত কর। এই বালকই ভাবী নবী, আখেরী পয়গম্বর। এতদ্‌শ্রবণে আবু তালিব বিস্মিত ও চম্‌কিত হইলেন—আনন্দে অবিভূত হইলেন। বুহাইরার পরামর্শে তিনি বালক নবীকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন।

বালক নবী যুবক হইয়াছেন। বিবি খাদিজার মাল লইয়া তেজারতে চলিয়াছেন। পথে বিজ্ঞ-সাধু ব্যক্তি 'নস্তূরা' তাঁহাকে নবী হওয়ার সুসংবাদ দিল। তেজারত শেষে তিনি মক্কায় ফিরিলেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধা তাহেরা সচ্চরিত্রা বিবি খাদিজার সহিত তাঁহার শাদী-মোবারক সুসম্পন্ন হইল। এই সময় নবী করীমের বয়স পঁচিশ বৎসর, বিবি খাদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর।

রাসূলুল্লাহ্ চল্লিশ বৎসর বয়সে নুবুওত প্রাপ্ত হন। তিপ্পান্ন বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি মে'রাজ শরীফ গমন করেন। তিনি নুবুওত লাভের সুদীর্ঘ তের বৎসর কাল মাতৃভূমি মক্কাতেই ইসলাম প্রচার কার্যে রত থাকেন। অতঃপর কাফেরদের অত্যাচার উৎপীড়নের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে মদীনা মনাওয়ারায় হিজরত করেন। তাঁহার মদীনা আগমনের দ্বিতীয় বৎসরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রথম জেহাদ জংগে বদর অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে ছোট বড় বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশটি উল্লেখযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জীবনে মোট এগারটি শাদী করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই দুইজন স্ত্রী এন্তেকাল করেন। একজন হযরত খাদিজা (রাঃ), দ্বিতীয়জন যয়নব বিন্‌তে খোযায়মা (রাঃ) বাকী নয়জনকে রাখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জান্নাতী হন।

১। হযরত সওদা রাযিআল্লাহু আনহা
২। হযরত আয়শা রাযিআল্লাহু আনহা
৩। হযরত হাফছা রাযিআল্লাহু আনহা
৪। হযরত উম্মে হাবিবা রাযিআল্লাহু আনহা
৫। হযরত উম্মে সালমা রাযিআল্লাহু আনহা
৬। হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহাশ রাযিআল্লাহু আনহা
৭। হযরত জোয়ায়রিয়া রাযিআল্লাহু আনহা
৮। হযরত মায়মুনা রাযিআল্লাহু আনহা
৯। হযরত সাফিয়া রাযিআল্লাহু আনহা

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর চারি কন্যা ঃ

১। হযরত যয়নব রাযিআল্লাহু আনহা
২। হযরত রোকেয়া রাযিআল্লাহু আনহা
৩। হযরত উম্মে কুলসুম রাযিআল্লাহু আনহা
৪। হযরত ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা

পাঁচ পুত্র ঃ

তাঁহাদের সকলেই বাল্যকালে এন্তেকাল করেন। একমাত্র হযরত বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর গর্ভেই জন্ম নিয়াছিলেন চারিজন। তাঁহার হইতেছেন—

১। হযরত কাসেম রাযিআল্লাহু আনহু
২। হযরত আবদুল্লাহ্ রাযিআল্লাহু আনহু
৩। হযরত তৈয়্যব রাযিআল্লাহু আনহু
৪। হযরত তাহের রাযিআল্লাহু আনহু

পঞ্চম পুত্র হযরত ইব্‌রাহীম (রাঃ) জন্ম নিয়াছিলেন হযরত মারিয়ার গর্ভে। মক্কা শরীফে তিনি জন্ম নিয়া শৈশবাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ নুবুওতের পর মক্কা শরীফে পয়দা হইয়া বাল্যেই এন্তেকাল করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ নুবুওতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং নুবুওতের পূর্বেই এন্তেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর তেষট্টি বৎসরের জেন্দেগীর দশ বৎসরকাল মদীনা মনাওয়ারায় ইসলাম প্রচার কার্যে অতিবাহিত করেন। ছফর মাসের দুইদিন বাকী থাকিতে (বুধবার) তিনি রোগ শয্যায় শায়িত হন। ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার চাশ্‌তের ওয়াক্তে তিনি ওফাত পান।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণের মধ্যে হযরত যয়নব (রাঃ)-এর গর্ভে এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হয়। তাঁহাদের নাম মোবারক আলী ও উমামা। হযরত রোকেয়া (রাঃ)-এর গর্ভে আবদুল্লাহ্‌র জন্ম হয়। কিন্তু ছয় বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) নিঃসন্তান। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গর্ভে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের জন্ম। তাঁহাদের বংশধরগণ দ্বারাই দুনিয়াতে নবী বংশ জারি আছে। কিন্তু দৈহিক বংশের চেয়ে রূহানী বংশের সংখ্যাই অধিক।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আদত-আখ্‌লাক

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ছিলেন দয়ার দরিয়া। প্রার্থীকে কখনো তিনি বিমুখ করিতেন না। কিছু না কিছু তিনি প্রার্থীকে দান করিতেনই। তৎক্ষণাৎ দান করিতে না পারিলে অন্য সময়ে দান করিবার ওয়াদা করিতেন। সদা সত্য কথা বলিতেন। মিথ্যাকে তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না—সর্বদা ঘৃণা করিতেন। নম্রতা ও কোমলতায় ছিল তাঁহার দেল ভরপুর। ধীর, স্থির, শান্তভাবে কথা বলা ছিল তাঁহার আদত। কটু কথা তিনি কখনও বলিতেন না। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্‌র চরিত্রে অসাধারণ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি চিরদিন ছিলেন সরল, মুক্ত উদার, সুন্দর, কল্যাণময়। স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট-তকলিফ না হয়, সেদিকে তিনি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। রাত্রিতে ঘরের বাহির হইতে নিঃশব্দে জুতা পায়ে দিয়া নীরবে দরওয়াজা খুলিয়া বাহির হইতেন। বাহিরের যরুরত পুরা করিয়া আস্তে আস্তে নীরবে ঘরে প্রবেশ করিতেন। কাহারো ঘুম নষ্ট করিয়া কষ্ট দিতেন না। হাঁটিবার সময় দৃষ্টি নীচের দিকে রাখিতেন। সঙ্গীদের সহিত চলিবার সময় পিছনে চলিতেন। কাহারো সাক্ষাতে তিনি আগে সালাম করিতেন। বসিবারকালে খুব আজেযীর সহিত বসিতেন। আহার করিবার সময় নেহায়েত তা'যীমের সহিত আহার করিতেন। কখনও পেট পুরিয়া খাইতেন না। সুস্বাদ বিলাস দ্রব্য আহার করা পছন্দ করিতেন না। হামেশা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাকিতেন। এই জন্যই অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন। বেলা-যরুরত কথা কহিতেন না। যাহা বলিতেন তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতেন—যাহাতে কথা বুঝিতে কাহারও কষ্ট না হয়। কথাকে খুব লম্বা ও খুব খাট করিয়া বলিতেন না। ব্যবহার ও কথাবার্তায় খুব নম্রতা প্রকাশ পাইত। তাঁহার খেদমতে কেহ হাজের হইলে তাহার যথার্থ সম্মান করিতেন এবং তাহার বক্তব্য খুব আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। শরীঅত বিরোধী কথা বলিতে শুনিলে উহাতে বাধা দিতেন, অথবা নিজে দূরে সরিয়া পড়িতেন। অতি নগণ্য বস্তুকেও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম নেয়মাত বলিয়া গণ্য করিতেন। কোন নেয়ামতকেই তিনি মন্দ বলিতেন না। এমন উক্তিও করিতেন না যে, উহার স্বাদ বা গন্ধ ভাল নয়। অগত্যা কোন চীজ নিজের মোয়াফেক না হইলে উহা খাইতেন না বা তারীফ করিতেন না। কোন জিনিসের কোন দোষ খুঁজিয়া বাহির করিতেন না। কোন বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। কোন লোকসান কাহারও দ্বারা হইলে বা কোন কাজকে কেহ বিগড়াইয়া ফেলিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল হুযূর (দঃ)-এর খেদমতে রহিয়াছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যাহাকিছু করিয়াছি সেই সম্পর্কে তিনি

কোনদিন এমন বলেন নাই যে, ইহা কেন করিয়াছ বা ইহা কেন কর নাই? কিন্তু শরীঅতের সীমা লঙ্ঘন করিলে তখন রাসূলুল্লাহ্‌র রাগকে কিছুই দমাইয়া রাখিতে পারিত না। নিজস্ব স্বার্থের জন্য তিনি কখনও রাগ করিতেন না। তিনি যাহার প্রতি রাগ হইতেন, তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেন মাত্র—ভালমন্দ কিছুই বলিতেন না। কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার লজ্জা অবিবাহিতা মেয়ের চাইতেও বেশী ছিল।

প্রয়োজন বোধে মৃদু হাস্য করিতেন। উচ্চৈঃস্বরের হাসিকে তিনি পছন্দ করিতেন না। সকলের সহিত মিল-মহব্বত বজায় রাখিয়া চলিতেন। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কখনও নিজকে বড় মনে করিতেন না। মাঝে মাঝে সত্য কথার মাধ্যমে হাসি মযাক করিতেন। নফল এবাদত নামায এত অধিক পড়িতেন যে, দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার কদম মোবারক ফুলিয়া ফাটিয়া যাইত। কোরআন শরীফ পড়িবার ও শুনিবারকালে আল্লাহ্‌র মহব্বতে ও ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতেন। সঙ্গী-সাথীগণকে প্রশংসায় লিপ্ত হইতে নিষেধ করিতেন। দীনহীন লোকের ডাকে সাড়া দিতেও বিলম্ব করিতেন না। রোগী চাই সে গরীব হউক, চাই সে আমীর হউক তাহার হাল হকিকত জিজ্ঞাসা করিতেন। ধনী-গরীব সবার জানাযায়ই তিনি শরীক থাকিতেন। কোন গোলাম বা বান্দীর দাওয়াতকেও তিনি সাগ্রহে কবূল ফরমাইতেন। তাঁহার আচার-ব্যবহারে কখনও এইরূপ প্রকাশ পাইত না যাহাতে কেহ নিরাশ হয় বা ঘাবড়াইয়া যায়।

যালেম দুশ্‌মনের যুলুম হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি সর্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। অথচ দুশমনের সহিত অতি নম্র, ভদ্র ব্যবহার করিতেন এবং হাসি মুখে কথাবার্তা কহিতেন। বসিবার সময়, দাঁড়াইবার সময় সর্বাবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ রাখিতেন। কোন মহফিলে হাজের হইলে সর্ব-সাধারণের আসনেই উপবেশন করিতেন। জনসাধারণকে রাখিয়া কখনও উচ্চাসনে উপবেশন করিতেন না। কতিপয় লোকের সহিত কথা বলিবার সময় সকলের প্রতি সমভাবেই দৃষ্টি করিতেন। প্রত্যেকের সহিতই এমন দিলখোলা ব্যবহার করিতেন, যাহাতে সকলেই ভাবিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকেই বেশী মহব্বত করেন। কেহ তাঁহার খেদমতে বসিলে বা কথা বলিতে লাগিলে, কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা সে ব্যক্তি না উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। অধিকাংশ গৃহস্থালী কার্য তিনি স্বহস্তে সমাধা করিতেন। যাবতীয় কার্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেন। অতি সাধারণের সহিতও তিনি বড়ই নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত মিশিতেন। কাহারও দ্বারা কোন অনিষ্ট সাধিত হইলেও তিনি মুখের উপর ধমকি দিতেন না। ঝগড়া, ফাসাদ ও শোরগোলকে তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। কেহ মন্দ ব্যবহার করিলে তিনি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন এবং তাহার অপরাধ মার্জনা করিতেন। কোন খাদেমা, গোলাম বা স্ত্রীলোক এমন কি কোন জানোয়ারকেও তিনি স্বহস্তে প্রহার করিতেন না। অবশ্য শরীঅতের হুকুম মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা সেটা পৃথক কথা। কোন যালেমের যুলুমের বদলা তিনি নিতেন না। তাঁহার চেহারা মেবারকে সদা হাসি ফুটিয়া থাকিত। কিন্তু দেল সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন থাকিত। বেফিকির কোন কথাই কহিতেন না। তাড়াতাড়ি কাহারও কুৎসা করিতেন না। কোন বিষয়ে কৃপণতা করিতেন না। তর্ক-বিতর্কে বা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়াকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। অহঙ্কার বা গর্বের লেশমাত্রও তাঁহার ভিতর ছিল না। প্রয়োজনীয় ও উপকারী কথা ব্যতীত একটি বৃথা কথাও বলিতেন না। মেহমান ও অতিথিগণের যথাসাধ্য খেদমত করিতেন। কাহারও বে-তমিযিকে তিনি সহ্য করিতেন না। কাহাকেও তাঁহার তারিফ বা প্রশংসা করিতে দিতেন না।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মোবারক আদত-আখ্লাক সম্পর্কে বহু কিছু লিখিত রহিয়াছে। এখানে সংক্ষেপে যাহা বর্ণনা করা হইল, ইহার উপর বা-আমল হইতে পারিলেও যথেষ্ট।

আম্বিয়াগণের নেক বিবিদের কাহিনী

হযরত হাওয়া (আঃ)

বিবি হাওয়া (আঃ) আদি মানব হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী এবং মানব জাতির মাতা। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম কুদরতে বিবি হাওয়াকে আদি পিতা আদমের (আঃ) বাম পাঁজরের হাড্ডি হইতে পয়দা করিয়াছেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাসস্থান হইয়াছিল বেহেশ্তের বাগিচা। সেখানে একটি বৃক্ষের ফল আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইবলীসের চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহারা উক্ত ফল ভক্ষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে এই নাফরমানীর দরুন এই মরজগতে পাঠাইয়া দেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া কান্দাকাটি করিতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা নেহায়েত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে মার্জনা করেন। দুনিয়াতে আসার সময় তাঁহারা একে অপর হইতে নিখোঁজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুনরায় আল্লাহ্র কৃপায় তাঁহারা একত্রে মিলিত হন। ইহার পর তাঁহাদের ঘরে বহু সংখ্যক সন্তান-সন্ততি জন্ম হয়।

শরীঅতের খেলাফ কোন কাজ হইয়া গেলে সেই ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কান্নাকাটা করা চাই ভবিষ্যতের জন্য তওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া মাফ করিতে পারেন। এখান হইতে আমরা প্রধানতঃ এই শিক্ষাই পাই।

হযরত সারা (আঃ)

বিবি সারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-স্ত্রী এবং হযরত ইসহাক (আঃ)-এর মাতা। ফেরেশ্তাগণ হযরত সারাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, "আপনি আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত স্বরূপ।" তাঁহার ঐশীপ্রেম ও দো'আ কবূল হওয়ার কথা কোরআন মজীদে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীস শরীফে আছে—একদা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শামদেশে হিজরত করিতেছিলেন। বিবি সারা ছিলেন তাঁহার সঙ্গীনী। তাঁহারা পথ চলিতে চলিতে এক যালেম বাদশাহের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। এক নাদান গোপনে বাদশাহ্কে জানাইল যে, আপনার রাজ্যে এক সুন্দরী রমণী আগমন করিয়াছে। ঘটনাচক্রে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে রাজ দরবারে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলঃ তোমার সঙ্গী রমণীটি কে? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ সে আমার ভগ্নী। (হযরত ইব্রাহীম [আঃ] এখানে বিবি সারাকে স্বীয় স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন না, যেহেতু ইব্রাহীম [আঃ]-কে স্বামী বলিয়া জানিতে পারিলে যালেম বাদশাহ্ তাঁহাকে কতল করিয়া ফেলিবার সম্ভাবনাই বেশী ছিল।) বাদশাহের সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিয়া ইব্রাহীম (আঃ) বিবি সারাকে বলিলেনঃ দেখ তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিও না। যেহেতু দীনী সম্পর্কে তুমি আমার ভগ্নীই হও। ইহার পর বাদশাহ্ বিবি সারাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি বাদশাহের দরবারে হাজির হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, বাদশাহের মতলব মোটেই ভাল নয়। তাই তিনি ওযূ করিয়া নামায পড়িলেন এবং দো'আর জন্য দরবারে এলাহীতে হাত উঠাইলেন। প্রার্থনা জানাইলেন, আয় আল্লাহ্! হে পরওয়ারদেগার বেনিয়ায! সত্য সত্যই আমি যদি তোমার প্রেরিত পয়গম্বরের উপর বিশ্বাসী হইয়া থাকি, ঈমান আনিয়া থাকি এবং অদ্যাবধি আমার সতীত্বকে বজায়

রাখিয়া থাকি, তবে এই যালেম বাদশাহ্‌কে আমার উপর গালেব করিয়া দিও না। দো'আ করার সঙ্গে সঙ্গেই যালেম বাদশাহ্‌র হাত, পা, এমন-কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনি পঙ্গু হইয়া পড়িল যে, অত্যাচার যুলুম তো দূরের কথা, সে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার অবস্থা মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। বিবি সারা ভাবিলেন, এমতাবস্থায় যদি বাদশাহ্ মারা যায়, তবে জনগণ অবশ্যই বলিবে যে, এই রমণীই বাদশাহ্‌র হত্যাকারিণী। তাই তিনি (সারা) বাদশাহের নিমিত্ত নেক (খায়রের) দো'আ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হইয়া গেল। পুনরায় বাদশাহের মাথায় বদ খেয়াল চাপিল। বাধ্য হইয়া বিবি সারা আবার বদ দো'আ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্বাবস্থাই ঘটিল। এইবার বাদশাহ্ কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া খুব কান্নাকাটা করিতে লাগিল। বিবি সারার দয়ার দরিয়ায় বান ডাকিল। তিনি দো'আ করিলেন, বাদশাহ্ ভাল হইয়া গেল। এইরূপে সে তিনবার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিবারই তাহা ভঙ্গ করিল। অবশেষে বাদশাহ্ বলিয়া ফেলিল—আপনি এখানে কি মুছিবত নিয়া আসিয়াছেন, আপনি দয়া করিয়া এখান হইতে বিদায় হউন। বাদশাহ্ পূর্বাহ্নেই বিবি হাজেরাকে বাঁদী বানাইয়া রাখিয়াছিল। এবার তাঁহাকে খেদমতের নিমিত্ত বিবি সারার হাওলা করিয়া দিল। বিবি হাজেরার ইজ্জত আবরু আল্লাহ্ তা'আলা হেফাযত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিবি সারা তাঁহাকে স্বীয় স্বামী হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে প্রদান করিলেন।

উপরোক্ত কাহিনী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নামাযের পরের দো'আ কবূল হইয়া থাকে। তাই প্রত্যেকের উচিত কোন মুছিবতে লিপ্ত হইয়া পড়িলে খাঁটি দেলে তওবা করিয়া নফল নামায আদায় করত দো'আয় মশগুল হওয়া।

হযরত হাজেরা (আঃ)

বিবি হাজেরা হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ্‌র সহধর্মিণী ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা। হযরত ইসমাঈল (আঃ) তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। এই সময় আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হইলঃ তিনি হযরত ইসমাঈলের সন্তান-সন্ততিগণের মাধ্যমে দিগন্ত বিস্তৃত মরুময় মক্কাভূমিকে বস্তিতে পরিণত করিবেন। তাই তিনি প্রিয় নবী হযরত ইব্‌রাহীমকে হুকুম করিলেন বিবি হাজেরা ও তাঁহার দুধের সন্তানকে ভয়াবহ মরু ময়দানে ছাড়িয়া আসিতে। হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ্ আল্লাহ্‌র আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন। ছাড়িয়া আসিলেন বিবি হাজেরাকে তাঁহার দুধের সন্তানসহ নির্জন মরু-ময়দানে। রাখিয়া আসিলেন তাঁহাদের জন্য এক মশক পানি ও এক থলি খোরমা। আসিবার সময় বিবি হাজেরা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ওহে খালীলুল্লাহ্! আমার প্রাণের স্বামী, আমাদিগকে একাকী কোথায় ছাড়িয়া যাইতেছেন? উত্তরে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) নিরুত্তর রহিলেন। বিবি হাজেরা কাতর স্বরে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তবে ইহা কি আল্লাহ্‌র আদেশ? খালীলুল্লাহ্ বলিলেনঃ হাঁ! এইবার সহাস্যে উৎফুল্ল হৃদয়ে বিবি হাজেরা বলিয়া উঠিলেন, তবে আর কি চাই? করুণাময়ের আদেশ; তাই আর কোন চিন্তা নাই; তিনি নিশ্চয়ই নিখিল মানবের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। ইহার পর বিবি হাজেরা সেখানে প্রশান্ত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। খোরমা খাইয়া পানি পান করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ছেলেকে স্তনের দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। অবশেষে এমন একদিন উপস্থিত হইল যখন খোরমা ও পানি সবই ফুরাইয়া গেল। স্তনও দুগ্ধহীন হইয়া পড়িল। উভয়ের ক্ষুধা ও পিপাসা চরমে পৌঁছিল। পিপাসার তাড়নায় মরুভূমির উত্তাপে দুধের শিশু ছট্‌ফট্ করিতে

লাগিল। মা ও ছেলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিল। পানির সন্ধানে মাতা দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ছাফা পাহাড়ে চড়িয়া চতুর্দিকে পানি তালাশ করিলেন। কোথাও পানির লেশমাত্র দেখিতে পাইলেন না। সেখান হইতে নামিয়া মারওয়া পাহাড় পানে দৌড়িয়া ছুটিলেন। পাহাড়ের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে পানি তালাশ করিলেন। কোথাও একবিন্দু পানির সন্ধান পাইলেন না। উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা নীচা ছিল। যতক্ষণ সমভূমিতে চলিতেন, তখন চাতক পাখীর ন্যায় অনিমেষ নেত্রে ছেলের দিকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেন। কিন্তু নিম্নস্থানে অবতরণ করিলে আর ছেলেকে দেখা যাইত না। তাই তিনি ঐ স্থানটুকু বেগে দৌড়াইয়া অতিক্রম করিতেন। এইভাবে বিবি হাজেরা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে চড়িয়া কয়েকবার পানির সন্ধান করিলেন। বর্তমানে উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। বিবি হাজেরার এই দৌড়ান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এত পছন্দনীয় হইল যে, তিনি হাজীদের জন্য উক্ত স্থানে সাতবার দৌড়ান এবাদতে পরিণত করিয়া দিলেন।

অবশেষে বিবি হাজেরা মারওয়া পাহাড়ে চড়িয়া এক গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। পুনরায় ঐ আওয়াজ অস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেনঃ আমি আওয়াজ শুনিতে পাইতেছি, যদি কেহ এমন বিপদের সময় সাহায্য করিতে চায়, তবে আগাইয়া আসিতে পারে। তৎক্ষণাৎ বর্তমান যমযম কূয়ার জায়গায় ফেরেশ্‌তা দেখা গেল। ফেরেশ্‌তা তাঁহার বাজু দ্বারা মাটিতে আঘাত করায় পানি উথালিয়া উঠিতে লাগিল। বিবি হাজেরা মাটির বাঁধে পানি আটকাইয়া ফেলিলেন। নিজে পানি পান করিলেন, ছেলেকে পান করাইলেন, মশক ভরিয়া পানি রাখিলেন। ফেরেশ্‌তা বলিলেনঃ আপনি চিন্তা করিবেন না। এখানে খোদার ঘর 'খানায়ে কা'বা' রহিয়াছে। এই ছেলেই তাঁহার পিতার সহিত মিলিয়া এই ঘরের মেরামত করিবেন। এই ভয়াবহ নির্জন মরু-ময়দান আবাদী জমিতে পরিণত হইবে। দেখিতে দেখিতে সকলই বাস্তবায়িত হইতে লাগিল। এক মরু কফেলা পানির সন্ধান পাইয়া সেখানে বসিত স্থাপন করিল। যথাসময়ে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হইল। আল্লাহ্‌র আদেশ পাইয়া হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে মিলিয়া খানায়ে কা'বা নির্মাণ করিলেন। যমযমের পানি ঐ সময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরে তাহা কূয়ার আকার ধারণ করে।

বিবি হাজেরার বিশ্বাস ও ভরসা আল্লাহ্‌র উপর ছিল অপরিমেয়। তাই 'মরুময় ময়দানে অবস্থান করা, আল্লাহ্‌র হুকুম জানিতে পারিয়া তিনি একেবারে শান্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে এই ভরসার বদলে কত নেয়ামতই না জাহের হইল। তাঁহার মামুলী দৌড়াদৌড়িই হাজীদের জন্য এবাদতে পরিণত হইয়া গেল। মকবুল বান্দার অতি সাধারণ কার্যগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহার শত শত নযীর ইতিহাসে বিদ্যমান। অতএব, সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্মল আস্থা ও ভরসা রাখা চাই।

হযরত ইসমাঈলের বিবির কাহিনী

খানায়ে কা'বা নির্মাণের পর হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ আরও দুইবার মক্কায় আগমন করেন। কিন্তু একবারও পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই। প্রথম বার আসিয়া হযরত ইসমাঈলের বিবিকে বাড়ীতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কি অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছ? উত্তরে বিবি বলিলেনঃ আমরা অত্যন্ত মুছিবতের ভিতর কালযাপন করিতেছি।

অতঃপর হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ বলিলেনঃ আচ্ছা তোমার স্বামী (হযরত ইসমাঈল) বাড়ী আসিলে আমার সালাম বলিও এবং ইহাও বলিও যে, তিনি (খালীলুল্লাহ) বলিয়াছেন, আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলাইয়া ফেলিতে। কিছুদিন পর হযরত ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী আসিলেন, বিবির নিকট হইতে বিস্তারিত খবর অবগত হইলেন।

অতঃপর হযরত ইসমাঈল (আঃ) বলিলেনঃ উক্ত আগন্তুক আমার পিতা এবং চৌকাঠ তুমি নিজে। তিনি এই কথাই বলিয়াছেন যে, আমি যেন তোমাকে পরিত্যাগ করি। ইহার পর হযরত ইসমাঈল এই বিবিকে তালাক দিয়া অন্য এক বিবাহ করিলেন।

নব-বধূকে বাড়ী রাখিয়া তিনি পুনরায় বিদেশে বাহির হইলেন। ইতিমধ্যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আগমন করিলেন। নব-বধূকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কি অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছ? বিবি উত্তর করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার শোকর যে, আমরা সুখেই কালযাপন করিতেছি। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম তাহার জন্য দো'আ করিলেন এবং বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম জানাইও, ইহাও বলিও যে, সে যেন তাহার ঘরের চৌকাঠ ঠিকই রাখে। অল্পদিন পরেই হযরত ইসমাঈল বাড়ী আসিলেন এবং যাবতীয় বিষয় অবগত হইলেন। তৎপর বলিলেন, উক্ত আগন্তুক আমার পিতা এবং উক্ত চৌকাঠ তুমি নিজেই। অর্থাৎ, তিনি বলিয়াছেন, তোমাকে আমার নিকট রাখিতে। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় ইহাই যে, প্রথমা বিবির না-শুকরির কারণে এক নবীর অসন্তুষ্টির দরুন অন্য নবী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়া বিবি শুকরগোযার হওয়ার পরিণামে এক নবীর সন্তুষ্টি ও দো'আর বরকতে অন্য নবী তাহাকে স্ত্রীরূপে রাখা মোনাসেব মনে করিলেন। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহ্-বিশ্বাসী মানুষের কর্তব্য সর্বাবস্থায়ই ধৈর্য সহকারে রাযী থাকিয়া আল্লাহ্ তা'আলার শোকর গোযার হওয়া। ইহাই অতি উত্তম পন্থা।

বাদশাহ্ নম্‌রুদের কন্যা

যে নমরুদ হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার এক কন্যার নাম রেয়'যা। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে ভীষণ অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল। শত শত লোক উহা দেখিবার জন্য ভিড় করিল। নমরুদের কন্যাও একটি উঁচুস্থানে চড়িয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। সে দেখিল, এই ভীষণ প্রজ্বলিত অগ্নি হযরত ইব্‌রাহীমের লোমও স্পর্শ করিতেছে না। তৎক্ষণাৎ সে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলঃ ওহে ইব্‌রাহীম! তোমাকে অগ্নি কেন জ্বালাইতেছে না? উত্তরে খালীলুল্লাহ্ বলিলেনঃ ঈমানের বরকতেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিতেছেন। তখন রেয়'যা বলিয়া উঠিলঃ আপনার অনুমতি পাইলে এক্ষুণি আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালাম বলিলেন, তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ্' বলিয়া এখানে চলিয়া আস। তৎক্ষণাৎ সে কলেমা পড়িয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল, অগ্নি তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। রেয়'যা অগ্নি হইতে বাহির হইয়া তাহার বাবা নমরুদকে ভাল-মন্দ অনেক কিছুই বলিলেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া নমরুদ তাঁহার উপর অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন করিল। কিন্তু সকল উৎপীড়ন নির্যাতন তাঁহার অটল ঈমানের মোকাবেলায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নমরুদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অধিকন্তু তাহার আদরণীয় মেয়েকেও সে হারাইল। সুবহানাল্লাহ্! কত নির্ভীক সাহসী মেয়েটি। অকথ্য নির্যাতন, অসহনীয় উৎপীড়ন

সকলই পরাভূত হইল তাঁহার ঈমানের সামনে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এহেন বিশ্বাসী ধর্মপরায়ণ হওয়া যাহার নিকট শত বাধা-বিপত্তি পদদলিত নিষ্পেষিত হয় অনায়াসে।

আইয়ূব নবীর স্ত্রী বিবি রহীমা

বিবি রহীমা নবী আইয়ূব (আঃ)-এর বিবি। একদা নবীর তামাম দেহ দুর্গন্ধময় ঘায়ের দরুন ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। তখন সমস্ত চাকর-চাকরাণী, দাস-দাসী নবীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সেই ভয়াবহ সংকটকালেও বিবি রহীমা স্বামীকে ছাড়িয়া যান নাই। সর্বদা স্বামীর খেদমতে মশগুল থাকেন। ঘটনাচক্রে একবার তিনি নির্দিষ্ট সময়ে স্বামীর খেদমতে হাজির হইতে পারেন নাই। ইহার মূলেও ছিল ইবলিসের কারসাজি। ইবলীস্ মানুষের আকৃতিতে আসিয়া আইয়ূব নবীর নিকট মিথ্যা তোহ্মত লাগাইয়াছিল। ফলে নবী রাগান্বিত হইয়া কসম খাইয়াছিলেন যে, তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া বিবি রহীমাকে একশত দোর্রা মারিবেন। অতঃপর নবী সুস্থ হইয়া উক্ত ওয়াদা পুরা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এমন সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযেল করিলেন, হে নবী! আপনি শত শলা বিশিষ্ট একটি ঝাড়ু লইয়া তাঁহাকে মাত্র একবার প্রহার করুন, তবেই আপনার কসম পুরা হইবে।

হযরত বিবি রহীমা নারী জাতির আদর্শ। তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীকা। নবীর ভীষণ বিপদের সময় যখন সকল বাঁদী-দাসী তাঁহার সাহচর্য ত্যাগ করিল, অন্যান্য বিবিগণ নবীকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, সেই মুহূর্তে বিবি রহীমা স্বামীর সেবায় নিমগ্না রহিলেন। এই নির্মল স্বামী-ভক্তি, খেদমত ও ছবর এখ্তেয়ার করার দরুন বিবি রহীমাকে ভীষণ শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া নিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁহার সুপারিশ কোরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর খালা

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালামের কাহিনী কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যখন মিসরের বাদশাহ্ তখন একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাম তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন। ইহার পর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্সালামের অন্ধ চোখের উপর ঢালিয়া দিবার জন্য তাঁহার একখানা জামা ভ্রাতাগণের নিকট অর্পণ করেন। (উল্লেখযোগ্য যে, পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম পুত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস্-সালামকে হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।) আরও বলিলেন, তাহাদিগকে সপরিবারে তাঁহার নিকট চলিয়া আসিতে।

ইউসুফ (আঃ) ভ্রাতাগণকে বিদায় করিলেন। উক্ত জামার বরকতে পিতা ইয়াকুবের অন্ধ চক্ষু ভাল হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা সকলেই সপরিবারে মিসরে পৌঁছিয়া হযরত ইউসুফের সহিত মিলিত হইলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতা ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁহার খালাকে সম্মানার্থে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ভ্রাতাগণ তাঁহার সম্মানার্থে সজ্দা করিল। সেই জমানায় সালামের পরিবর্তে সজ্দার প্রচলন ছিল। এই যমানায় সজ্দা করা না জায়েয—বিলকুল হারাম। ইউসুফ (আঃ)-এর মাতার এন্তেকাল হইলে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁহার খালাকে বিবাহ করেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, তিনিই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা এবং তাঁহার নাম রাহেলা। ইউসুফ (আঃ) বলিয়াছেন, এই ঘটনাই আমার বাল্যকালীন খাবের তাবির। তিনি খাবে দেখিয়া-ছিলেন, চন্দ্র-সূর্য এবং এগারটি নক্ষত্র তাঁহাকে সজ্দা করিতেছে।

এখানে চিন্তার খোরাক ইহাই যে অবলা একজন নারী তিনিও কত বড় বোযুর্গী হাছেল করিয়াছিলেন। এত বড় একজন পয়গম্বরও তাঁহাকে শান-শওকতের সহিত অভিনন্দিত করিলেন, সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা

তাঁহার মোবারক নাম ইউখান্দ। সেই যমানার পণ্ডিতগণ ফেরআউনকে আতঙ্কিত করিয়াছিল যে, বনি-ইস্‌রায়ীল কওমে এক ছেলের জন্ম হইবে। আর সেই ছেলেই তোমার এই সোনার বাদশাহী ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী ফেরআউনকে ভীষণ সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। সে সমস্ত রাজকীয় লোকদের হুকুম করিল, বনি-ইস্‌রায়ীল কওমের ছেলে সন্তানদিগকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিয়া ফেলিতে। হুকুম পালনার্থে বনি-ইস্‌রায়ীলের হাজার হাজার মাছুম ছেলে সন্তানকে হত্যা করা হইল। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড কালের পর কাল, দিনের পর দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল। কোন সন্তানকেই এই চরম নিষ্ঠুরতা হইতে রক্ষা করা কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঠিক এই ভয়াবহ মুহূর্তে হযরত মূসা (আঃ) জন্ম নিলেন বনি-ইস্‌রায়ীল কওমে। হযরত মূসার মাতার নিকট আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে এল্‌হাম হইলঃ তুমি নিশ্চিন্তে ছেলেকে স্তন্য পান করাইতে থাক। যখন আশংকা হয় যে, ছেলের জন্ম সংবাদ শীঘ্রই প্রচার হইয়া যাইবে, ফলে ফেরআউনের লোক আসিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে, তখন তুমি ছেলেকে সিন্দুকে ভরিয়া দরিয়ায় ভাসাইয়া দিও। ইহার পর ছেলেকে পুনরায় তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া আমার দায়িত্বে রহিল। একদিন সত্য সত্যই মাতা মূসা (আঃ)-কে সিন্দুকে ভরিয়া অসীম অতল সাগরে ভাসাইয়া দিলেন। অবশেষে দেখা গেল, আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় ওয়াদা যথাযথ পুরা করিলেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য ইহাই যে, অবলা একজন নারী—কিন্তু তাঁহার ঐশীপ্রেম ও আত্মবিশ্বাস কত প্রবল! আল্লাহ্‌র আদেশ রক্ষার্থ সদ্যপ্রসূত দুগ্ধপোষ্য শিশুকে সিন্দুকে ভরিয়া তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ বিশাল সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলাও বান্দার কৃতকার্যে সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দান করিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর ভগ্নী

মূসা (আঃ)-এর ভগ্নীর নাম নিয়া মতভেদ আছে। অনেকের মতে মরইয়ম—আবার কাহারো মতে কুলসুম। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পাইয়া হযরত মূসার মাতা মূসা (আঃ)-কে সিন্দুকে ভরিয়া সাগরে ভাসাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মরইয়মকে নির্দেশ দিলেন সিন্দুক ভাসিয়া কোথায় যায়, অবশেষে কি হয় তাহা দেখিবার জন্য।

সিন্দুকটি সাগরে ভাসিতে ভাসিতে ঢেউয়ের তালে তালে নাচিতে নাচিতে যালেম বাদশাহ্ ফেরআউনের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। ফেরআউনের লোকেরা কৌতূহলী মনে সিন্দুক উঠাইয়া খুলিয়া ফেলিল। উহাতে তাহারা সুন্দর ফুট্‌ফুটে সোনালী চেহারার এক ছেলে দেখিতে পাইল। ছেলেটিকে নিয়া তাহারা ফেরআউনের সামনে হাজির করিল। নিষ্ঠুর যালেম ফেরআউন ছেলেটিকে কতল করার ইচ্ছাই প্রকাশ করিল। কিন্তু ফেরআউনের নেকবখত বিবি ছেলেকে কতল করিতে দিলেন না। তাঁহার মাতৃ সুলভ সস্নেহে ছেলেকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বাধ্য হইয়া ফেরআউনও রাজী হইয়া গেল। কিন্তু ছেলেকে দুধ পান করানোর দারুণ সমস্যা দেখা দিল। ছেলে কাহারো স্তন্য পান করিতে চাহে না। সকলেই এই ব্যাপারে নিরাশ হইয়া

পড়িল। সকলেই মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল কি করা যায়? এই সময় মরইয়ম (মূসার ভগ্নী) তথায় উপস্থিত হইলেন। আল্লাহ্র রহমতে তাঁহার মাথায় এক চূড়ান্ত বুদ্ধি হাজির হইল। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট এমন একজন দুধ-মায়ের সন্ধান দিতে পারি, যাঁহার দুধ অতি উত্তম এবং তিনি সন্তান পালনেও বিশেষ পারদর্শী। এই বলিয়া তিনি মূসা (আঃ)-এর মাতার নাম বলিয়া দিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইল। ছেলে তাঁহারই দুধ পান করিতে লাগিল। অতঃপর ছেলের লালন-পালন মূসা (আঃ)-এর মাতার উপরই অর্পণ করা হইল। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পূর্বকৃত ওয়াদা পুরা করিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর ভগ্নী অত্যন্ত বুদ্ধিমতি নারী ছিলেন। তাই তিনি অতি সুষ্ঠু কৌশলে, তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে অত্যন্ত নিরাপদে ছেলের দুধ-মার স্থলে প্রকৃত মাতাকেই নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন। দুশমনেরা উপস্থিত থাকিয়াও কোন কিছু টের পাইল না। অতএব, দেখা যাইতেছে আক্কল অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। আর সুবুদ্ধি বলে কাজ করিতে পারিলে উহার পরিণাম অতি উত্তম।

হযরত মূসা (আঃ)-এর বিবি ছফুরা

বিবি ছফুরা হযরত মূসা (আঃ)-এর স্ত্রী হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা। একবার হযরত মূসার হাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে মিসর শহরের এক যালেম কাফের মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ ফেরআউনের নিকট পৌঁছিল। ফেরআউন হুকুম করিল মূসা (আঃ)-কে কতল করিবার জন্য। হযরত মূসা ইহা জানিতে পারিয়া গোপনে 'মাদায়েন' শহরে রওয়ানা করিলেন। পথ চলিতে চলিতে একটি কূপের নিকটবর্তী হইলেন। দেখিলেন, বহু সংখ্যক রাখাল কূপ হইতে পানি উঠাইয়া প্রত্যেকেই আপন আপন বকরীদলকে পানি পান করাইতেছে। আর কূপ হইতে অনতিদূরেই দুইটি মেয়ে তাহাদের বকরীগুলিকে পানি পান করাইবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভিড়ের জন্য তাহারা কূপের নিকটেই আসিতে পারিতেছে না। মূসা (আঃ) তাহাদের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল, 'আমাদের গৃহস্থালী কার্য করিবার মত কোন পুরুষ লোক নাই। তাই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সমস্ত কার্য করিতে হয়। যেহেতু আমরা মেয়ে মানুষ; তাই অপেক্ষা করিতেছি—পুরুষগণ চলিয়া গেলে পর আমরা আমাদের বকরীদলকে পানি পান করাইব।'

মেয়ে দুইটির এই দুর্দশা দেখিয়া মূসা (আঃ)-এর মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি কূপ হইতে পানি উঠাইয়া তাহাদের বকরীগুলিকে পানি পান করাইলেন। ইহার পর মেয়ে দুইটি এই ঘটনা পিতার নিকট খুলিয়া বলিল। তাঁহাদের পিতা হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বড় মেয়েকে বলিলেন, মূসা (আঃ)-কে ডাকিবার জন্য। পিতার আদেশে বড় মেয়েটি লজ্জাবনতা হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে আসিলেন। হযরত মূসা (আঃ) খবর পাইয়া হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি হযরত মূসার ঘটনা শুনিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, বাবা! এখন তুমি যালেম বাদশার রাজ্যের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছ। এখন সে আর কিছুই করিতে পারিবে না। আর আমি আমার এই মেয়ের যে-কোন একজনকে তোমার নিকট বিবাহ দিব। কিন্তু শর্ত থাকিবে যে, আট কিম্বা দশ বৎসর পর্যন্ত তুমি আমার বকরী চরাইবে। ইহাতে হযরত মূসা (আঃ) রাজী হইয়া গেলেন।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বড় কন্যার সহিত হযরত মূসার শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হইল। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি বিবিকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে চলিলেন। পথিমধ্যে প্রবল শীত অনুভূত হওয়ায়

তাঁহারা অগ্নির প্রয়োজন মনে করিলেন। দূর হইতে তূর পাহাড়ে অগ্নি দেখিতে পাইলেন। নিকটবর্তী হইয়া বুঝিতে পারিলেন উহা অগ্নি নহে—আল্লাহ্‌র নূর। এইখান হইতেই তিনি নুবুওত লাভ করিয়াছিলেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, একজন নবীর মেয়ে হইয়া তাঁহারা স্বহস্তে গৃহস্থালী কার্য করিত অথচ তাঁহাদের যথার্থ মেয়েলী লজ্জা শরম বাকী রাখিত। এই যমানায় পর্দা-পুশিদার হুকুম যেমনি কঠোর, গৃহস্থালী কার্য করার প্রয়োজনও তেমনি অধিক। কিন্তু হালে দেখা যায় নারিগণ গৃহস্থালী কার্যে যেমনি অলস, ঠিক তেমনি নিস্তেজ। পক্ষান্তরে বে-পর্দা, বেহায়া ও নির্লজ্জতার কার্যে বেশ তৎপর। ইহা কিয়ামতের আলামত বৈ কি?

হযরত বিবি আছিয়া

খোদায়ী দাবীদার ফেরআউনের বিবি ছিলেন হযরত আছিয়া। আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের নেশানা বে-এন্তেহা। ফেরআউন শয়তান, আর তাহারই বিবি অলীআল্লাহ্। হযরত আছিয়ার প্রশংসা কোরআন পাকে করা হইয়াছে। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যলাভ করিয়াছে। কিন্তু আওরতদের মধ্য হইতে মাত্র দুইজন পূর্ণ কামালিয়াত হাছেল করিয়াছে—বিবি মরইয়ম ও বিবি আছিয়া। যালেম ফেরআউনের কবল হইতে বিবি আছিয়াই হযরত মূসাকে বাল্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। হযরত মূসাকে লালন-পালন করিবারকালেই তাঁহার মনে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়াছিল।

পূর্ণ বয়সে হযরত মূসা (আঃ) নুবুওত প্রাপ্ত হইলেন। এই খবর বিবি আছিয়ার নিকট পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার উপর ঈমান আনিলেন। বিবি আছিয়ার ঈমান আনার সংবাদ ঘটনাচক্রে ফেরআউনের কর্ণগোচর হইল। ফেরআউন সংবাদ পাইয়া দুঃখিত ও ক্রোধান্বিত হইল। অবশেষে সে হযরত আছিয়ার উপর অকথ্য উৎপীড়ন ও নির্যাতন চালাইল। সেই অসহ্য যাতনায়ই বিবি আছিয়া ইহদুনিয়া ত্যাগ করিলেন। তবুও আল্লাহ্‌র বিশ্বাসে ঐশী প্রেমের অচল-অটল রহিলেন।

ঈমান অতুলনীয় অমূল্য স্বর্গীয় বস্তু। হযরত আছিয়া কেমন অটল ঈমানের অধিকারিণী তাহা অনুধাবনীয়। ফেরআউন মিসরাধিপতি। বিবি আছিয়া তাহারই প্রিয়তমা মহিষী। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ফেরআউন অজস্র ধন-সম্পদ তাঁহার পায়ে লুটাইয়া দিত। তথাপি ঈমানের ব্যাপারে আসিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে একদণ্ডও ভাবিলেন না। মিসরাধিপতি স্বামীকে ভুলিলেন, সমস্ত আরাম-আয়েশ জলাঞ্জলি দিলেন, প্রাণ দিলেন, তবু ঈমান ছাড়িলেন না। প্রত্যেক আদর্শ মুসলমানের ইহাই পরিচয়।

ফেরআউনের কন্যা ও বাঁদী

ফেরআউন-কন্যার ছিল এক বাঁদী। তাহার যাবতীয় খেদমতের ভার উক্ত বাঁদীর উপরই ন্যস্ত ছিল। সে গোপনে আল্লাহ্‌র নবী হযরত মূসার উপর ঈমান রাখিত। ফেরআউনের ভয়ে সে তাহা কখনো প্রকাশ করিত না। একদা সে শাহজাদীর চুল আঁচড়াইতেছিল। এমন সময় তাহার হাত হইতে চিরুণী মাটিতে পড়িয়া যায়। মাটি হইতে উহা উঠাইবার সময় বিসমিল্লাহ্ বলিল। শাহজাদী ইহা শুনিয়া চমকিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলঃ তুই কি বলিলি, ইহা কাহার নাম? উত্তরে বাঁদী বলিলঃ আমি তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়াছি যিনি এই নিখিলের স্রষ্টা। তোমার পিতার সৃষ্টিকর্তা এবং বাদশাহীদাতা। বাদশাহ্‌জাদী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতার চেয়েও কি কেহ বড় আছেন?

অতঃপর শাহজাদী দৌড়াইয়া গিয়া পিতা ফেরআউনের নিকট সব ঘটনা খুলিয়া বলিল। ফেরআউন বাঁদীকে ডাকিয়া পাঠাইল। বাঁদী নির্ভয়ে ফেরআউনের সামনে হাজির হইল। ফেরআউন তাঁহাকে দেখিয়াই ক্রোধে জ্বলিয়া গেল। তাঁহাকে ভয় দেখাইল, গালিগালাজ করিল। বাঁদী হাসি-মুখে বলিয়া দিলঃ আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, আমি কিছুতেই ঈমান ত্যাগ করিব না। ইহাতে বাঁদীর উপর অগ্নি-বৃষ্টি বর্ষণ করা হইল। কিন্তু সে ঈমান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল না। তারপর তাহার কোলের শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষপ করা হইল। শিশুটি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় বলিয়া গেল—আম্মা, ইমান নষ্ট করিবেন না। ইহার পর বাঁদীকে হাত বাঁধিয়া অগ্নিতে ফেলান হইল। সে জান দিল, কলিজার টুক্‌রা শিশুকে হারাইল, তবু ঈমানের মায়া ছাড়িল না।

এহেন ঘটনা হইতে শিখিবার অনেক কিছু আছে। মোটকথা, ঈমান অমূল্য রত্ন। শতবাধা-বিপত্তিকে পদদলিত করিয়া, জান কোরবান দিয়াও ইমানকে রক্ষা করা চাই। ইহাই মুসলমানের একমাত্র সম্বল।

হযরত মূসার এক বৃদ্ধা লস্কর

মিসরাধিপতি ফেরআউন খোদায়ী দাবী করিল। যাহারা তাহাকে খোদা বলিয়া মানিল তাহারা নিশ্চিন্ত রহিল। আর যাহারা মানিল না সে তাহাদের উপর অসহনীয় উৎপীড়ন নির্যাতন চালাইল। ফলে, খোদা-বিশ্বাসী হযরত মূসা নবীর অনুসারীদের কষ্টের আর সীমা রহিল না। শেষে একদিন হযরত মূসা বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইলেন। যালেম ফেরআউনের কবল হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় ভক্তবৃন্দকে নিয়া দেশ ত্যাগ করিতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন।

আল্লাহ্‌র আদেশ পাইয়া হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম আর কাল বিলম্ব করিলেন না। সঙ্গী সাথী, ভক্তবৃন্দ সকলকে লইয়া তিনি অচেনা পথের যাত্রী হইলেন। পথ চলিতে চলিতে লোহিত সাগর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখন দরিয়া পার হওয়ার ভীষণ সমস্যা দেখা দিল। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোন পথই খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে মূসা আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন, কে আছ, যে ইহার ভেদ আমাকে বলিতে পার? এক বৃদ্ধা হাজির হইয়া বলিতে লাগিলঃ হযরত ইউসুফ আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় এন্তেকালের সময় তাঁহার বংশধরগণকে বলিয়াছিলেনঃ যদি তোমরা কোন সময় মিসর দেশ ত্যাগ করিয়া যাও, তবে আমার কবরকেও তোমাদের সহিত লইয়া যাইও, নচেৎ তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজিয়া পাইবে না। মূসা আলাইহিস্‌সালাম বৃদ্ধাকে কবরের স্থান নির্দেশ করিতে বলিলেন। বৃদ্ধা বলিলঃ হে নবী! আপনি আমাকে একটি স্বীকারুক্তি প্রদান করিলেই আমি কবরের সন্ধান দান করিব। মূসা (আঃ) বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমার সেই স্বীকারুক্তি কি? বৃদ্ধা আরয করিলঃ আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হউক এবং বেহেশ্‌তে আপনার নিকট আমার স্থানলাভ ঘটুক। মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠাইয়া মুনাজাত করিলেনঃ এলাহী! এই ব্যাপারে আমার তো কোন কিছু করিবার নাই। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আশ্বাস বাণী আসিল, হে মূসা! আপনি স্বীকার করুন; আমি উহা পূর্ণ করিব। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) বৃদ্ধাকে এই আশ্বাস-বাণী শুনাইলেন! বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হইয়া কবরের ঠিকানা বলিয়া দিল। উহা দরিয়ার মাঝখানে ছিল। কবর বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাও মিলিয়া গেল।

এই ঘটনা হইতে বুঝা গেল, এই বৃদ্ধা কত বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি এখানে দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদের লোভ করিলেন না। তিনি সবকিছু ভুলিয়া চাহিলেন আখেরাতের উন্নতি ও শান্তি। যেহেতু দুনিয়ার আরাম আয়েশ নছিব পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে মিলিয়া যায়। তাই ক্ষণস্থায়ী দুই দিনের দুনিয়ার লোভ-লালসা জলাঞ্জলি দিয়া চিরস্থায়ী চির-শান্তিময় আলমে আখেরাতের উন্নতি বিধান ও শান্তি কামনা করাই মুসলমানের কাজ।

হাইসূরের ভগ্নী

কোরআন শরীফে হযরত মূসা ও হযরত খিযির (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে খিযির (আঃ) এক ছোট শিশুকে মারিয়া ফেলেন। হযরত মূসা (আঃ) পেরেশান হইয়া খিযির (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, এই নিষ্পাপ শিশুটি কি অন্যায় করিল, যদ্দরুন আপনি তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন? উত্তরে হযরত খিযির (আঃ) বলিলেন, এই শিশুটি বয়স্ক হইলে কাফের হইত। তাহার মা-বাপ উভয়েই ঈমানদার লোক। ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে ছেলের মহব্বতে পড়িয়া ঐ ঈমানদার মা-বাপেরও কাফের হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই এই শিশুকে হত্যা করার মধ্যে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা এখন উক্ত ছেলের পরিবর্তে এক মেয়ে দান করিবেন। সে হইবে সকল খারাবী হইতে পাক-পবিত্র এবং মা-বাপের জন্য মঙ্গলজনক। এই সম্পর্কে অনেক কিতাবে লিখিত রহিয়াছে যে, উক্ত মা-বাপের ঘরেই এক মেয়ের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এক পয়গাম্বরের সহিত এবং তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে সত্তর জন হইয়াছিলেন পয়গাম্বর। উক্ত ছেলের নাম ছিল হাইসূর। আর এই নেক্‌কার মেয়ে ছিলেন হাইসূরেরই ভগ্নী।

সোবহানাল্লাহ্! মেয়েটি কত বড় বুযুর্গ ছিলেন। যাঁহার বংশধরগণের মধ্যে সত্তর জন পয়গাম্বর হইয়াছিলেন। আর তাঁহার তারিফ কোরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিশ্বাসী ঈমানদার লোকের কর্তব্য যাবতীয় গোনাহের কাজ হইতে পরহেয করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দি হাছেল করিয়া ইহজীবন ও পরজীবনকে সার্থক করিয়া তোলা।

হযরত বিলকিস

বিলকিস ছিলেন 'সাবা' রাজ্যের বাদশাহ্। হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে এক হুদহুদ জানোয়ার খবর দিল, সে এক স্ত্রী বাদশাহ্‌কে দেখিয়াছে যে, সে সূর্য পূজা করিয়া থাকে।

হযরত সোলায়মান (আঃ) উক্ত স্ত্রী বাদশাহ্‌র নিকট পত্র লিখিলেন। উক্ত জানোয়ারের মারফতই তিনি পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখা ছিল, তোমরা অনায়াসে মুসলমান হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।

যথাসময়ে বাদশাহ্‌র নিকট পত্র পৌঁছিল। পত্র পাইয়া বাদশাহ্ উজির সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে বাদশাহ্ স্থির করিল, প্রথমতঃ তাঁহার খেদমতে যৌতুক উপঢৌকন পেশ করা হউক। উপঢৌকন গ্রহণ করিলে বুঝিব তিনি দুনিয়াদার বাদশাহ্, অন্যথায় বুঝা যাইবে তিনি সত্য পয়গাম্বর। যথসময়ে উপঢৌকন হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট পৌঁছিল। তিনি উপঢৌকন গ্রহণ করিলেন না এবং জানাইয়া দিলেনঃ অনতিবিলম্বে ইসলাম কবূল না করিলে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইব।

এই সংবাদ যখন হযরত বিলকিসের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিলেন ইহা ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারী আল্লাহ্‌র সত্য পয়গাম্বরের উক্তি। অতঃপর তিনি ইস্‌লাম

কবূল করিবার জন্য স্বীয় শহর হইতে বহির্গত হইলেন। ইতিমধ্যে হযরত সোলায়মান (আঃ) হযরত বিলকিসের শাহী-তখ্তখানি তাহার দরবারে আনিয়া রাখিলেন। শাহীতখ্তের মোতী ও জওহরসমূহ উঠাইয়া অন্যভাবে লাগান হইল।

এদিকে হযরত বিলকিস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোলায়মান (আঃ) তাহার বুদ্ধি-জ্ঞান পরীক্ষা নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা দেখ তো, (বিলকিসের সিংহাসনের প্রতি ইশারা করিয়া) ইহা কাহার সিংহাসন? বিলকিস উত্তর করিলেনঃ ইহা তো আমার বলিয়াই মনে হয় কিন্তু ছুরত সামান্য পরিবর্তিত দেখা যায়। ইহাতে তিনি বুদ্ধিমান ও চালাক-চতুর বলিয়াই সাব্যস্ত হইলেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ) স্বীয় খোদা-প্রদত্ত শাহী-তখ্তের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি একটি পানিপূর্ণ হাউযে কাঁচের ফরস বিছাইতে আদেশ করিলেন। তাহাই করা হইল। অতঃপর হযরত সোলায়মান (আঃ) হাউযের অপর পারে গিয়া বসিলেন। যেখানে যাইতে হাউয অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। তিনি বিলকিসকে তথায় আগমন করিতে বলিলেন। বিলকিস হাউযের কিনারায় গিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। যেহেতু হাউযের উপর কাঁচ নজরে আসিতেছিল না। অবশেষে যখন তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, হাউযের উপর কাঁচের ফরস বিছান হইয়াছে, তখন তিনি নির্বিঘ্নে উহার উপর দিয়া চলিয়া আসিলেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সামান্য দুইটি মোজেযা দেখার পরই তাহার মাথা হইতে সমস্ত গর্ব-অহঙ্কার বিদায় হইল। আনত মস্তকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হইলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ থাকা বশতঃই তিনি এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অনেকের মতে তিনি সমগ্র জাহানের বাদশাহ্ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রিয়তমা মহিষী হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করিয়াছিলেন।

বনি-ইস্রায়ীলের এক দাসী

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, বনি-ইস্রায়ীল কওমের একজন স্ত্রীলোক এক শিশুকে দুধ পান করাইতেছিল। এই সময় বহু শান-শওকতের সহিত এক আরোহী ঐ পথ দিয়া অতিক্রম করিল। আরোহীকে দেখিয়া মা দো'আ করিল, ইয়া আল্লাহ্! আমার ছেলেকে এই রকম বড় শান-শওকতদার বানাইয়া দাও। ইহা শুনিয়া ছেলে স্তন্য পান বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলঃ আল্লাহ্ আমাকে এইরূপ বানাইও না।

কিছুক্ষণ পর একদল লোক এক বাঁদীকে চোর মনে করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া মা বলিল, আল্লাহ্ আমার ছেলেকে এমন বানাইও না। ছেলে দুগ্ধ পান বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলঃ ইহা আল্লাহ্! আমাকে এমনই বানাইয়া দাও।

ছেলের মা ছেলের কথার কোন ভেদ খুঁজিয়া পাইল না। ছেলেকে ধম্‌কি দিয়া বলিয়া উঠিলঃ এ কেমন কথা! উত্তরে ছেলে বলিল, উক্ত আরোহী একজন অত্যাচারী যালেম। আর এই বাঁদী নির্দোষ মযলুম। আল্লাহ্ মযলুমের সাহায্যকারী দোস্ত।

বিষয়টি বড়ই প্রণিধানযোগ্য। উক্ত আরোহী সাধারণ সমক্ষে সম্মানের পাত্র কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঘৃণেয় ও নিকৃষ্ট। আর এই বাঁদী সাধারণ সমক্ষে অপমানিত লাঞ্ছিত, কিন্তু আল্লাহ্র দরবারে মকবুল ও সম্মানিত। সাধারণতঃ গরীব দুর্বলের উপর সামান্য সন্দেহ করিয়াই যা-তা ব্যবহার করা হয়। অথচ তাহা করা উচিত নয়। বস্তুতঃ সে নির্দোষ, আল্লাহ্র মকবুল বান্দা।

বনি-ইস্রায়ীলের এক বুদ্ধিমতী নারী

মুহাম্মদ ইব্‌নে-কা'ব হইতে বর্ণিত, বনি-ইস্রায়ীল কওমে এক ব্যক্তি বড় আলেম ও আবেদ ছিলেন। বিবির সঙ্গে তাহার খুব মহব্বত ছিল। একদা আকস্মিকভাবে বিবির মৃত্যু হইল। ইহাতে স্বামীর মনে এত কষ্ট হইল যে, তিনি দরওয়াজা বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া পড়িলেন। জনগণের সহিত মেলা-মেশা ত্যাগ করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া একজন মেয়েলোক তাহার নিকট হাজির হইল। সে বাড়ীর অপরাপর লোকদের নিকট আরয করিল যে, আমি আলেম ছাহেবের নিকট একটি মাসআলা জানিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া সে আলেম ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সাক্ষাতের অনুমতি পাইল।

আলেমের সম্মুখীন হইয়া স্ত্রীলোকটি আরয করিলঃ হুযূর! আমি আমার প্রতিবেশীর নিকট হইতে অলঙ্কার চাহিয়া নিয়া বহুদিন যাবৎ উহা পরিয়া আসিতেছি। এখন সে উহা ফেরত নিতে চাহে। উহা কি তাহাকে ফেরত দিতে হইবে? আলেম ব্যক্তি বলিলেনঃ বেশক, উহা ফেরত দিতে হইবে। স্ত্রীলোকিট বলিলঃ আমি তো উহা এক যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, এখন উহা কিরূপে ফেরত দিব? ইহাতে আলেম বলিলেনঃ এখন তো উহা আরও সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত; যেহেতু এত দিন সে রেয়াআত করিয়া তোমার নিকট রাখিয়াছে।

অতঃপর স্ত্রীলোকটি আলেমকে বলিলেনঃ আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। তবে আপনি কেন চিন্তা করিতেছেন? আল্লাহ্ তা'আলা একটি জিনিস আপনার নিকট এত দিন রাখিয়াছিলেন, এখন নিয়া গেলেন। সে-জন্য চিন্তা করিবার কি আছে? ইহাতে আলেমের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেল। তাঁহার আর চিন্তা রহিল না। আওরতের নীতিবাক্যে তিনি বড়ই উপকৃত হইলেন। সকলেই আওরতের বুদ্ধির তারিফ করিতে লাগিল।

হযরত বিবি মরইয়ম

বিবি মরইয়মের জন্মের পূর্বে তাঁহার মাতা মান্নত করিয়াছিলেন—তাহার পেটের সন্তানকে তিনি মস্‌জিদের খেদমতের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। ইহার পর হযরত মরইয়মের জন্ম হইল। তাঁহার মাতা স্বীয় মান্নত পুরা করিবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দেসে উপস্থিত হইলেন। সমবেত বুযুর্গগণের নিকট আরয করিলেনঃ এই মেয়েটি মান্নতের, ইহাকে রাখুন।

সকলেই মেয়েটির অপূর্ব আকৃতি-প্রকৃতি ও রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মেয়েটির লালন-পালন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। তন্মধ্যে হযরত যাকারিয়া (আঃ)-ও ছিলেন। তিনি সম্পর্কে বিবি মরইয়মের খালু হইতেন। বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল মেয়ের লালন-পালন করিবেন হযরত যাকারিয়া (আঃ)। অল্পদিনেই যথাযথ আদর যত্নে তিনি বাড়িয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে শেয়ানা হইয়া গেলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বিবি মরইয়মকে কোরআন পাকে 'ওলী' ফরমাইয়াছেন। অনেক সময় গায়েব হইতে তাঁহার নিকট সুস্বাদু ফল-মূল আসিত। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্‌সালাম এইসব সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে, তিনি উত্তরে বলিতেনঃ এই সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। মোটকথা, বিবি মরইয়মের তামাম জেন্দেগীই অলৌকিক। এমনকি পরিণত বয়সে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতেই গর্ভবতী হন বিনা স্বামীতে। আর এই সন্তানই হইলেন হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম।

বিনা স্বামীতে সন্তান লাভ হওয়ায় জন-সাধারণ সতী সাধ্বী বিবি মরইয়মকে গালিগালাজ করিতে লাগিল। নানা জনে নানা তোহ্মত লাগাইতে লাগিল। আল্লাহ্ তা'আলা বিবি মরইয়মের সন্তান হযরত ঈসা (আঃ)-কে জন্মের পরক্ষণেই কথা কহিবার শক্তি দান করেন। সদ্য-প্রসূত শিশুর মুখে স্পষ্ট কথা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার বিনা বাপে জন্ম হওয়া, একমাত্র সর্বশক্তিমানের অসীম কুদরত। বস্তুতঃ বিবি মরইয়ম নির্দোষ নিষ্কলুষ সতী নারী। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হুযূরে আকরাম (দঃ) বলিয়াছেন, নারী জাতির মধ্যে মাত্র দুইজন কামেল বুযুর্গ আছেন একজন বিবি মরইয়ম, অন্যজন বিবি আছিয়া।

হযরত খাদিজা

বিবি খাদিজা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী। পঁচিশ বৎসর বয়সে ইতিহাস প্রসিদ্ধা; সচ্চরিত্রা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যপরায়ণা চল্লিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা খাদিজার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বিবাহ হয়। সকলেই বিবি খাদিজাকে 'তাহেরা' অর্থাৎ পবিত্রা বলিয়া ডাকিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি খাদিজাকে বলিলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে হযরত জিব্রায়ীল আমীন আপনার নিকট সালাম নিয়া আসিয়াছেন। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, নারী জাতির মধ্যে চারিজন সর্বশ্রেষ্ঠা;—(১) হযরত মরইয়ম। (২) হযরত আছিয়া। (৩) হযরত খাদিজা। (৪) হযরত ফাতেমা।

ইস্‌লামের আবির্ভাবের প্রারম্ভেই সর্বপ্রথম মুসলমান হন বিবি খাদিজা। সেই সময় ইস্‌লাম প্রচার করিতে গিয়া কাফেরদের গালিগালাজ, অত্যাচার-উৎপীড়নে রাসূলুল্লাহ্ যখন পেরেশান হইয়া পড়িতেন, তখন বিবি খাদিজা তাঁহাকে পূর্ণ সান্ত্বনা দান করিতে সক্ষম হইতেন। বিবি খাদিজা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমনি মনে-প্রাণে ভালবাসিতেন, রাসূলুল্লাহ্ও বিবি খাদিজাকে ঠিক তেমনি ভালবাসিতেন।

হযরত সওদা

হযরত সওদা ছিলেন নবী-করীমের বিবিগণের অন্যতমা। তিনি তাঁহার ভাগের বাসর রাত্রিগুলি হযরত আয়েশাকে দিয়া দিয়াছিলেন। হযরত আয়েশা বলেনঃ একমাত্র হযরত সওদা ব্যতীত অন্য কোন আওরতকে দেখিয়া আমার আগ্রহ জাগে নাই যে, আমি তাহার মত হই। হযরত সওদাকে দেখিলে আমি মনে মনে আরযু করিতাম, আমি যদি তাঁহার মত হইতাম।

আমাদের দেশী কথায় হযরত আয়েশা হযরত সওদার সতীন। হালে এক সতীন অন্য সতীনের সম্পর্ক হয়—সাপ বেজীর সম্পর্ক। আর সামান্য কারণে একে অপরের জানী দুশ্‌মন হইয়া দাঁড়ায়। এখানে দেখা যায়, হযরত সওদা হযরত আয়েশাকে স্বীয় বাসর রাত্রিগুলি দিয়া দিয়াছেন। আর হযরত আয়েশা সাদা দিলে, মুক্ত প্রাণে স্বীয় সতীনের তারিফ করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহাই হইল ইসলামের সনাতন আদর্শ। এই বাস্তব আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া সকল মুসলমানেরই সচেতন হওয়া উচিত।

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা

হযরত আয়েশা রাসূলুল্লাহ্‌র প্রিয়তমা সহধর্মিণী অতি অল্প বয়সেই তিনি বিবাহিতা হন। তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল তীব্র, অত্যন্ত প্রখর। হযরতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবিগণ তাঁহার নিকট মাসআলা শিক্ষা করিতেন। তাঁহার মোবারক আখলাক চরিত্র মহান গুণাবলীতে পরিপূর্ণ।

একদা জনৈক ছাহাবী মহানবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার সহিত আপনার বেশী মহব্বত? হযরত (দঃ) উত্তরে বলিলেন, আয়েশার সহিত এবং আবু বকরের সহিত।

হযরত আয়েশা নারী জগতের শীর্ষস্থানীয়া। তিনি নারী হইয়াও কত বড় জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। বড় বড় আলেম ছাহাবিগণ তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। মোটকথা, এল্‌ম হাছেল করিতে হইলে আত্মগর্ব ও লজ্জা ত্যাগ করিতে হয়। চাই এল্‌ম বয়োকনিষ্ঠের নিকট থাক বা নারীর নিকট থাক, উহা হাছেল করিতে লজ্জা করা উচিত নয়।

হযরত হাফ্‌সা

নবী করীমের নেক বিবিগণের মধ্যে হাফ্‌সা একজন। একদা কোন কারণে নবী করীম রাগ করিয়া হযরত হাফ্‌সাকে তালাক দেন। তৎক্ষণাৎ জিব্রায়ীল আমিন আসিয়া নবীর নিকট সুপারিশ করিলেন, হে নবী! আপনি হযরত হাফ্‌সার তালাক ফিরাইয়া লউন। যেহেতু তিনি দিনের বেলা রোযা থাকেন এবং রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া নামায আদায় করেন। এছাড়া তিনি দানে মুক্ত হস্ত। হযরত হাফ্‌সা স্বীয় ভাইকে অছিয়ত করিয়া যান, তাঁহার ভূ-সম্পত্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ওয়াক্‌ফ করিয়া উহার যথাযথ বন্দোবস্ত করিতে।

হযরত হাফ্‌সা একজন খোদাভক্তা, এবাদত প্রিয়া, মুক্তমনা ও দানশীলা নারী ছিলেন। এই সমস্তের বদৌলতেই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে তাঁহার তালাক ফিরাইয়া লওয়ার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছিল। হযরত হাফ্‌সার ন্যায় দীনদারী এখতেয়ার করা সকলেরই কর্তব্য।

হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহাশ

হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহাশ নবী করীমের বিবি। হযরত যায়েদ একজন ছাহাবী। নবী করীম তাঁহাকে পোষ্যপুত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত যায়েদ বয়স্ক হইলেন। নবী করীম তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। হযরত যয়নবের জন্য তাঁহার ভাইয়ের নিকট পয়গাম পাঠাইলেন। কিন্তু হযরত যায়েদের হিসাবে তাঁহারা নিজদিগকে খান্দানী মনে করিতেন। তাই বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা "ওহী" প্রত্যাদেশ নাযেল করিলেন। "পয়গাম্বরের নির্বাচনের পর কোন মুসলমানের কোন ওযর থাকা উচিত নয়।" ইহার পর উভয়েই এই বিবাহে সম্মতি জানাইলেন। যথারীতি বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর সদভাব দেখা গেল না। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবী করীম অনেক বুঝাইলেন, নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন, বিবাহের পূর্বেই ইহাতে ভাই-বোন অসম্মত ছিল। কেবলমাত্র আমার ইচ্ছার উপর উভয়ে রাযী হইয়াছিল। এখন যদি তালাক দিয়া দেয়, তাহা হইলে উভয়ের মনে আর দুঃখের সীমা থাকিবে না।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্থির করিলেন, সকল সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত তিনি স্বয়ং হযরত যয়নবকে বিবাহ করিবেন। ইহাতে উভয়েই সান্ত্বনা লাভ করিবে; কিন্তু বেঈমান লোকেরা অবশ্যই তোহ্‌মত লাগাইবে। তাহারা বলিবে যে, নবী স্বীয় পুত্র-বধূকে বিবাহ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই হযরত যায়েদ তাঁহাকে তালাক দিয়া দিলেন।

ইদ্দত পুরা হইয়া গেল। নবী করীম স্বয়ং বিবাহের পয়গাম দিলেন। ওযূ করিয়া নামায আদায় করত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুনাজাত করিলেন। আয় আল্লাহ্! আমি নিজ বুদ্ধিতে কোন কাজ

করি না, কেবল আপনার আদেশেই করিয়া থাকি। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় রাসূলের উপর "ওহী" নাযিল করিলেন, "আমি তাঁহার বিবাহ আপনার সহিত করিয়া দিলাম।" রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যয়নবকে এই আয়াত শুনাইয়া দিলেন। হযরত যয়নব অন্যান্য বিবিগণের সহিত ফখর করিয়া বলিতেন, দেখ! তোমাদের বিবাহ মা-বাপের দ্বারা হয়, আর আমার বিবাহ আল্লাহ্ তা'আলা করাইলেন। এই সময় হইতেই নারীদের পর্দার হুকুম জারি হয়। হযরত যয়নব খুব দানশীলা নারী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল অত্যন্ত নরম, দয়ায় পরিপূর্ণ।

একবারের এক ঘটনা। হযরতের সকল বিবিগণই মিলিতভাবে হযরতের নিকট আরয করিলেন, আপনার পর কোন্ বিবি সর্ব-প্রথম আপনার সহিত মিলিত হইবেন। উত্তরে হযরত বলিলেন, যাহার হাত অধিক লম্বা। এই কথা শুনিয়া সকলেই হাত মাপিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখা গেল, হযরত সওদার হাত অধিক লম্বা। হযরতের মৃত্যুর পর দেখা গেল, হযরত যয়নব মরিলেন সকলের আগে এবং হযরত সওদা মরিলেন সর্বশেষে। ফলে সকলেই বুঝিলেন, সাখাওতির, এ'তেবারেই (দানের হিসাবে) হাত লম্বা হয়।

হযরত যায়েদ তখন বুঝিতে পারিলেন, হযরত যয়নব হযরতের কত প্রিয়া ছিলেন। হযরত আয়েশা বলেনঃ আমি হযরত যয়নব হইতে উৎকৃষ্টা কোন আওরত দেখি নাই। নবী করীম (দঃ) বলেনঃ (হযরত) যয়নবের ন্যায় নম্র স্বাভাব এবং আল্লাহ্র সামনে অনুনয়বিনয়কারিণী আওরত আমি দেখি নাই।

হযরত যোয়ায়রিয়াহ

হযরত যোয়ায়রিয়াহ নবী করীম (দঃ)-এর বিবিদের অন্যতমা। বিখ্যাত বনি-মোস্তলকের জেহাদের সময় কাফেরদের শহর হইতে মুসলমানগণের হস্তে বন্দিনী হন। গনিমত (যুদ্ধলব্ধ মাল) বণ্টনের সময় তিনি জনৈক ছাহাবীর হিসসায় পড়েন। অনেকের মতে উক্ত ছাহাবীর নাম ছাহেবত-ইব্নে-কায়েস।

বন্দিনী যোয়ায়রিয়াহ মালিকের নিকট প্রস্তাব করিলেন, আমি আপনাকে এই পরিমাণ টাকা দিব আপনি আমাকে আযাদ করিয়া দিন। ইহাতে ছাহাবী রাযী হইলেন। অতঃপর যোয়ায়রিয়াহ কিছু টাকা সাহায্য পাওয়ার আশায় নবী করীমের নিকট গেলেন। তিনি যোয়ায়রিয়ার দীনদারী, পরহেযগারী ও হোস্নে আখলাক দর্শনে বলিলেন, তুমি যদি আমার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে রাযী হও, তবে আমি যাবতীয় টাকা শোধ করিয়া তোমাকে আযাদ করিয়া লইব। ইহাতে তিনি মনেপ্রাণে সম্মতি জানাইলেন। মোটকথা, শুভ শাদী মোবারক সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহ সংবাদ ক্রমে চতুর্দিকে প্রচার হইয়া গেল। মুসলমানদের হস্তে হযরত যোয়ায়রিয়ার খান্দানের যত লোক বন্দী ছিল, সকলেই মুক্তি লাভ করিল। যেহেতু মুসলমানগণ ভাবিলেন, এই খান্দানের সহিত রাসূলুল্লাহ্র আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব, কিছুতেই আর তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা সঙ্গত হইবে না। তাহাদিগকে গোলাম বানাইয়া রাখিলে বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্র সহিতই বে-আদবী করা হইবে।

হযরত আয়েশা বলেনঃ এমন কোন দীনদার পরহেযগার, মোত্তাকী আওরতের কথা আমার জানা নাই, যাহার দীনদারী ও পরহেযগারীর বদৌলতে স্বগোত্রীয়গণ এত অধিক সৌভাগ্যশালী হইতে পারিয়াছে।

সোবহানাল্লাহ্! দীনদারী পরহেযগারী কত বড় দৌলত। যাহার উছিলায় দুনিয়া আখেরাতের উভয় স্থানেই নাজাত পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের নাজাত নয়। এই ঘটনা হইতে জানা গেল, সমগ্র কওমও নাজাত পাইতে পারে।

হযরত মায়মুনাহ

হযরত মায়মুনাহ নবী করীমের প্রিয়তমা মহিষী। জনৈক প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বলেন, একদা হযরতের নিকট তিনি আরয করেনঃ আমি আপনাকে আমার জান বখশিশ করিলাম অর্থাৎ, বিনা-মহরে আপনার পতিত্ব আমি বরণ করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহাকে কবূল করিলেন। বিনা-মহরে বিবাহ—ইহা কেবল রাসূলুল্লাহ্রই বৈশিষ্ট্য।

অপর এক সুপ্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার বলেনঃ যে আয়াতে এহেন বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে উহা এই সময়ই নাযেল হয়। হযরত মায়মুনাহ্র প্রথম স্বামীর নাম হাবিতীব।

হযরত মায়মুনাহ কত দীনদার, ঈমানদার আওরত ছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতকে চরম ও পরম এবাদত জ্ঞান করিতেন। তাই তিনি রাসূল (দঃ)-এর সহিত বিনা-মহরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হইতে এমন উদগ্রীবা ছিলেন। হালে মুসলিম কওমে উম্মতে-মোহাম্মদীর মধ্যে বিবাহের মহর নিয়া এত বাড়াবাড়ি হয় যে, উহা বড়ই দুঃখজনক।

হযরত সফিয়া

হযরত সফিয়া নবী করীমের বিবি। খয়বরের জেহাদে তিনি মুসলমানদের হস্তে বন্দিনী হন। তিনি এক ছাহাবীর বাঁদীরূপে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাঁহাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করেন। তিনি হযরত হারুণ (আঃ)-এর খান্দানের লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা হইতে তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ও সহনশীলতার পরিচয় মিলে।

হযরত সফিয়ার এক বাঁদী একদা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট নালিশ করিল। সে চোগলখুরী করিয়া বলিল, শনিবারের সহিত এখনও তাহার মহব্বত বর্তমান। শনিবার ইহুদীদের নিকট মহা সম্মানিত ও পবিত্র দিন। অর্থাৎ, হযরত সফিয়া এখনও পুরা মুসলমান হন নাই। ইহুদী মযহাবের প্রভাব এখনও তাঁহার উপর বাকী রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এখনও ইহুদীদের সহিত তাঁহার আদান-প্রদান রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সফিয়াকে ডাকাইয়া এইসব বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হযরত সফিয়া বলিলেনঃ প্রথম কথাটি বিলকুল (ডাহা) মিথ্যা। যেহেতু আমি মুসলমান হইয়াছি। আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা শুক্রবার দিয়াছেন, তাই এখন শনিবারের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নাই। আর দ্বিতীয় কথাটি সত্য। যেহেতু ঐসব লোক আমার অত্মীয় ছিল। তাহাদের সহিত নেক ব্যবহার করা শরীঅত বিরোধী নয়।

অতঃপর বাঁদীকে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাকে মিথ্যা চোগলী খাইতে কে বলিয়াছে? সে উত্তর করিলঃ ইবলীস্ শয়তান। ইহার পর হযরত সফিয়া উক্ত বাঁদীকে আযাদ করিয়া দিলেন। কোন জোর জবরদস্তি বা গালিগালাজ করিলেন না।

এই ঘটনা হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি যে, কোন চাকর-চাকরাণী কোন অন্যায় কাজ করিলে উহা যদি অসহ্য হয়, তবে তাহার উপর জোর যুলুম না করিয়া, গালাগালি না করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

হযরত যয়নব

হযরত যয়নব নবী করীমের আদরণীয়া কন্যা। তাঁহার স্বামী ছিলেন হযরত আবুল আছ ইবনে-রবি। হযরত যয়নব ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্বামীকে ত্যাগ করিয়া মদিনায় হিজরত করেন। যেহেতু তাঁহার স্বামী ঐ সময় ইসলাম কবূল করেন নাই। অল্পদিন পরেই তাঁহার স্বামী যখন ইসলাম কবূল করিয়া মদিনায় চলিয়া আসেন, তখন নবী করীম পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থাপন করেন। কিন্তু স্বামী আবুল আছ ইবনে-রবি মদিনায় হিজরতকালে পথিমধ্যে কাফেরদল কর্তৃক আক্রান্ত হন যাহার ফলে তিনি অল্পদিন পরেই এন্তেকাল করেন।

ইসলাম চির সত্য সনাতন ধর্ম। যেখানে কোন অন্যায় অপবিত্রতার সংশ্রব নাই। নাই কোন আত্মীয়তা সম্পর্কের দোহাই। ইহাই শিক্ষা দিলেন হযরত যয়নব নিখিল উম্মতে-মোহাম্মদীকে। নিরীহ অবলা নারী হইয়াও সত্য সনাতন দীনের মহব্বতে নির্মল বিশ্বাসের প্রবল শক্তিতে তিনি প্রাণপ্রিয় স্বামী ও মাতৃভূমি ছাড়িয়া গেলেন। রিক্ত হস্তে আল্লাহ্ ও রাসূলকে সম্বল করিয়া চলিলেন।

হযরত রোকেয়া

হযরত রোকেয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণপ্রিয়া কন্যা। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় উৎবা ইবনে আবি-লাহাবের সহিত। যে আবু-লাহাবের উপর অভিসম্পাত করা হইয়াছে সূরায়ে তাব্বত ইয়াদার··· মাধ্যমে। তাহারা পিতা-পুত্র কেহই মুসলমান হয় নাই এবং পিতার পরামর্শে পুত্র হযরত রোকেয়াকে ত্যাগ করে।

পরবর্তীকালে হযরত ওস্‌মান গণীর সহিত হযরত রোকেয়ার বিবাহ হয়। জংগে বদরের সময় হযরত রোকেয়া বিমার ছিলেন। নবী করীম জেহাদে যাওয়ার সময় তাঁহার তিমারদারীর (সেবাশুশ্রূষার) জন্য হযরত ওসমানকে ঘরে রাখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, তোমরাও মোজাহেদীনদের সমান সওয়াবের ভাগী হইবে। বস্তুতঃ তাঁহাদিগকেও গনিমতের মালের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু নবী করীম যুদ্ধ শেষ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেই হযরত রোকেয়া এন্তেকাল করিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় যে, হযরত রোকেয়া কত বড় ধার্মিকা নারী ছিলেন। তাঁহার খেদমত করাতেও জেহাদের সওয়াব হাছেল হইল। ইহা তাঁহার অসীম বুযুর্গীরই নিশানা।

হযরত উম্মে কুলসুম

হযরত উম্মে কুলসুম হযরতের কন্যাগণের অন্যতম। তাঁহার প্রথম শাদী হয় আবু লাহাবের অপর এক পুত্রের সহিত। ইতিমধ্যে নবী করীম নুবুওত প্রাপ্ত হইলেন। হযরত উম্মে কুলসুম ইসলাম কবূল করিলেন কিন্তু আবু-লাহাব বা তাহার পুত্র কেহই ইসলাম গ্রহণ করিল না। ফলে হযরত উম্মে কুলসুম পরিত্যাজ্যা হইলেন। হযরত রোকেয়ার এন্তেকাল হইলে হযরত ওসমান গণীর সহিত তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ধার্মিকা, সরল প্রাণা, নম্র ও বিনয়ী স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণ ছিল অসামান্য।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)

নবী করীমের সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতেমা। কিন্তু মর্তবার দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠা। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহাকে কলিজার টুক্‌রা বলিয়া থাকিতেন। এছাড়া তিনি তাঁহাকে সারা নারী-জাহানের সরদার বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেনঃ যে কথায় মা ফাতেমার প্রাণে কষ্ট হয়, সে কথায় আমার

প্রাণেও কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে বিমারীতে এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন, হযরত ফাতেমাও সেই বিমারীতে এন্তেকাল করিবে। ইহা রাসূলুল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী। ইহা শুনিয়া হযরত ফাতেমা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মা! চিন্তা করিও না। তোমার জন্য দুইটি সুসংবাদ। প্রথমতঃ, তুমি শীঘ্রই আমার নিকট চলিয়া আসিবে। দ্বিতীয়তঃ, বেহেশ্‌তী সকল আওরতের সরদার তুমি হইবে। হযরত আলীর (রাঃ) সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

হযরত হালিমা সাআদিয়া

হযরত হালিমা সাআদিয়া নবী করীমকে শৈশবে দুধ পান করাইয়াছিলেন। আদর-যত্নে লালন-পালন করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন তায়েফের জেহাদে যান, তখন হযরত হালিমা স্বীয় স্বামী ও ছেলেকে নিয়া রাসূলুল্লাহ্‌র খেদমতে হাজির হন। নবী করীম তখন মদিনা মোনাওয়ারার বাদশাহ্। তিনি স্বীয় দুধ-মাতার সম্মানার্থে আপন চাদর বিছাইয়া তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। সুবিশাল রাজ্যের বাদশাহ হইয়াও তিনি দুধ-মাতার সম্মানে ত্রুটি করিলেন না; বরং নেহায়েত অনুনয় বিনয় সহকারে তাঁহার তাযিম করিলেন। আপন বাদশাহী বা মর্যাদা কিছুই তাঁহাকে দীন-হীন জীর্ণ পোশাক পরিহিতা নারীর সম্মান করা হইতে বিরত রাখিতে সক্ষম হইল না। এই তো নবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

হযরত উম্মে সলিম

হযরত উম্মে সলিম জনৈকা ছাহাবিয়া। তাঁহার স্বামী আবু-তাল্‌হা বিশিষ্ট ছাহাবী। রাসূলুল্লাহ্‌র খাছ খাদেম, হযরত আনাস তাঁহার পুত্র। কোন এক সূত্রে তিনি হুযূরে আকরামের খালা। তাঁহার ভাই নবী করীমের সহিত জেহাদে যোগদান করিয়া শহীদ হন। এইসব কারণে নবী করীম তাঁহার সহিত বিশেষ মহব্বত রাখিতেন। সময় সময় তিনি তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইতেন। নবী করীম (দঃ) একবার তাঁহাকে বেহেশ্‌তেও দেখিয়াছেন।

তাঁহার জীবনের বহু আজীব ঘটনা আছে। একদা তাঁহার এক ছেলে বিমার হইয়া মারা যায়। তখন রাত্রি। তিনি ভাবিলেন, যদি এই সময় এই সংবাদ স্বামীকে জানাই, তবে হয়ত তিনি পানাহার ত্যাগ করিয়া অস্থির হইয়া পড়িবেন। তাই বুদ্ধিমতী সহনশীলা উম্মে সলিম ছেলের মৃত্যু সংবাদ কাহাকেও জানাইলেন না। স্বামী কার্যব্যাপদেশে বাহিরে ছিলেন। গৃহে আসিয়া একবার মাত্র ছেলের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হযরত উম্মে সলিম বলিলেনঃ ছেলে আরামেই আছে। কথাটি কিন্তু মোটেই মিথ্যা হয় নাই। যেহেতু মুসলমানের জন্য মৃত্যুই আরামদায়ক।

হযরত উম্মে সলিম অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি খানা খাইয়া শেষ করিলেন। স্বামী-স্ত্রীর মিলনও হইল। সমস্ত কাজ সমাধা হইয়া গেলে স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, কাহারো নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখিয়া পুনরায় যদি উহা নিতে চায়, তবে কি উহা ফেরত দিতে অস্বীকার করিতে পারে? উত্তরে স্বামী বলিলেনঃ না। তখন তিনি আরয করিলেনঃ তবে কোন চিন্তা করিবেন না, ছেলের জন্য ছবর এখ্‌তেয়ার করুন। ইহাতে স্বামী রাগান্বিত হইয়া বলিল, তখনই কেন আমাকে খবর দিলে না?

হযরত উম্মে সলিম এই কাহিনী নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করিলেন। তিনি অত্যন্ত খুশী হইয়া দো'আ করিলেন—যাহার ফলে উক্ত রাত্রেই তিনি গর্ভবতী হইলেন। তৎপর এক

ছেলের জন্ম হয়। তাঁহার নাম রাখেন আবদুল্লাহ্। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণের অনেকেই বড় বড় আলেম হইয়াছিলেন।

হযরত উম্মে সলিমের এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায় যে, ছবর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কত পছন্দনীয় এবং উহার পরিণাম কত সুখের ও কত সার্থক।

হযরত উম্মে হারাম

হযরত উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ্র খালা—হযরত উম্মে সলিমের ভগ্নী। নবী করীম প্রায়ই তাঁহার বাড়ী তশ্রীফ রাখিতেন। একদা তিনি সেখানে দাওয়াত খাইলেন। তারপর বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ হাসিতে হাসিতে ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন। উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট তাঁহার এই হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হযরত বলিলেনঃ আমি স্বপ্ন দেখিলাম, আমার উম্মতগণের একদল জাহাজে সওয়ার হইয়া জেহাদে যাইতেছে। সাজ সরঞ্জামে তাঁহাদিগকে আমীর বাদশাহের মত মনে হইল। ইহা শুনিয়া উম্মে হারাম (রাঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দো'আ করুন, আমি যেন ঐ দলভুক্ত হইতে পারি। হযরত (দঃ) দো'আ করিলেন এবং পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আবার হাসিমুখে ঘুম হইতে জাগিলেন। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত দলের ন্যায় আরও একটি দলের কথা বলিলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) এইবারও আরয করিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দো'আ করুন, আমি যেন এই দলেরও একজন হইতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ না, তুমি প্রথমোক্ত দলে থাকিবে।

হযরত উম্মে হারামের স্বামী ওবায়দা (রাঃ)। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া এক সামুদ্রিক অভিযানে গমন করেন। এই সময়েই রাসূলুল্লাহ্র ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়। তাঁহারা নির্বিঘ্নে সমুদ্র অতিক্রম করেন। তারপর সওয়ারীতে আরোহণ করিবার সময় হঠাৎ ভূ-পতিত হইয়া হযরত উম্মে হারাম শাহাদত বরণ করেন।

সোবহানাল্লাহ্! হযরত উম্মে হারাম কত বড় সাহসী, নির্ভীক, বাহাদুর ও দীনদার আওরত ছিলেন। তাঁহার ঈমানের জয্বা কত তীব্র বেগবান ছিল। রাসূলুল্লাহ্র নিকট যতবার তিনি জেহাদের কথা শুনিতেন, ততবারই জেহাদে যোগদানের প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

হযরত আবু হুরায়রার মাতা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ছাহাবী। প্রথমতঃ, তাঁহার মাতা ছিলেন বেদীন। হযরত আবু হুরায়রা তাঁহার মাতার নিকট সর্বদা দীন ইসলামের কথাবার্তা কহিতেন। দীন ইসলামের মহত্ত্বই তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু একদিন তাঁহার মাতা ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলিলেন, যাহাতে হযরত আবু হুরায়রার মনে খুব দুঃখ হইল।

হযরত আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া সব ঘটনা বলিলেন এবং দো'আ করিতে বলিলেন। রাসূলুল্লাহ্ দো'আ করিলেন—আয় আল্লাহ্! আবু হুরায়রার মাতাকে তুমি হেদায়ত কর। ইহার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ী আসিয়া তিনি দেখিলেন ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া কে যেন গোছল করিতেছেন। গোছল শেষ করিয়া তাঁহার মাতা দরওয়াজা খুলিলেন এবং পড়িলেন—আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু····। হযরত আবু হুরায়রা খুশীতে কাঁদিতে লাগিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দরবারে

হাজির হইয়া সব ঘটনা আরয করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করিলেন।

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্‌কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ও আমার মাতার জন্য দো'আ করুন, যেন আমাদের সহিত সমস্ত মুসলমানের এবং সমস্ত মুসলমানের সহিত আমাদের মহব্বত পয়দা হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উক্ত দো'আই করিলেন।

ইমাম রবিয়া তুর্রার মাতা

ইমাম রবিয়া তুর্রা মস্ত বড় আলেম ছিলেন। ইমাম মালেক এবং হাসান বস্‌রী (রাঃ) যাঁহারা দুনিয়ার চাঁদ সূর্যের চেয়েও মশ্‌হুর আলেম তাঁহারা তাঁহার শাগরেদ। তাঁহার পিতার নাম ফিরোজ।

বনি-উমাইয়া বংশের খেলাফতকালে এই ফিরোজ তাহাদের সেনাদলভুক্ত ছিলেন। একবার তিনি স্ত্রীর নিকট ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া জমা রাখিয়া বিদেশে চলিয়া যান। ইমাম রবিয়া ঐ সময় মাতৃগর্ভে, ফিরোজ এইবারে সাতাইশ বৎসরকাল বিদেশে কাটাইয়া আসেন।

এদিকে ইমাম রবিয়া যথাসময় ভূমিষ্ঠ হন। পরিণত বয়সে তাঁহার মাতা তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে দেন। এই সুদীর্ঘ সাতাইশ বৎসরের মধ্যে ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া খরচে ইমাম রবিয়ার বুদ্ধিমতী মাতা তাঁহাকে মহান আলেম করিয়া তুলিলেন।

অবশেষে একদিন ফিরোজ বাড়ী ফিরিয়া আসেন। স্ত্রীকে ত্রিশ হাজার আশরাফিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে স্ত্রী বলেনঃ আশরাফিয়াগুলি অতি যত্নেই রহিয়াছে। ফিরোজ দেখিলেন, তাহার ছেলে ইমাম রবিয়া মস্‌জিদে বসিয়া হাদীস শুনাইতেছেন। তিনি স্বীয় ছেলেকে কওমের ইমামরূপে দেখিতে পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়া স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। স্ত্রী তাহাকে বলিলেনঃ আচ্ছা ছেলের এই নিয়ামত বেশী পছন্দনীয়, না ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া? অতঃপর স্ত্রী আরও বলিলেন, আমি বিগত সাতাইশ বৎসরে উক্ত ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া খরচ করিয়া ছেলেকে এলেম হাছেল করাইয়াছি। ফিরোজ বলিলেনঃ নিঃসন্দেহ, আমি তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী স্ত্রী পাইয়া সুখী হইয়াছি এবং আমার এই আশরাফিয়া খরচ করা সার্থক হইয়াছে। আর আমরা এমন ছেলের মাতাপিতা হইতে পারিয়া ধন্য হইয়াছি।

হযরত ফাতেমা নিশাপুরী

হযরত ফাতেমা নিশাপুরী ছিলেন একজন মস্তবড় বুযুর্গ। হযরত জুন্নুন মিস্‌রী বলেন, তাহার নিকট হইতে আমি বহু কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তিনি বলিতেন, যে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে থাকে না, সে কোন গোনাহ হইতে বাঁচিতে পারে না। যে সদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে থাকে, সে কখনো বেহুদা কথা বলিতে পারে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা হইতে নির্লজ্জ হইতে পারে না।

ইমাম আযম ছাহেব বলেন, আমি হযরত ফাতেমা নিশাপুরীর সমকক্ষ কোন আওরতই দেখি না। তাঁহার নিকট যে-কেহ আজগুবি কোন সংবাদ নিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিত, তিনি পূর্ব হইতেই উহা জানেন। ওমরাহের পথে মক্কা মোয়ায্‌যমায় তিনি এন্তেকাল করেন।

আল্লাহু আকবর, কত বড় মর্তবার আওরত ছিলেন তিনি। জুন্নুন মিস্‌রী এবং ইমাম আযমের মত বুযুর্গ অলীআল্লাহ্‌গণকেও চমকিত করিত তাঁহার বুযুর্গী। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হামেশা তাঁহার নিকট কাশফ্ হইত। আর সদা-সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন বলিয়াই তাঁহার এন্তেকাল ওমরাহের পথে মক্কা মোয়ায্‌যমায় সংঘটিত হইয়াছিল।

হযরত রবিয়া বিন্তে ইসমাঈল

হযরত রবিয়া বিন্তে ইসমাঈল সারারাত্রি এবাদতে কাটাইতেন এবং সারাদিন রোযা রাখিতেন। তিনি বলিতেন, আমি যখন আযান শুনি, তখন কেয়ামতের দিনের ফুৎকারকারী ফেরেশ্‌তার কথা স্মরণ হয়। যখন গরম অনুভব করি, তখন হাশরের মাঠের সূর্যোত্তাপের কথা মনে পড়ে।

তিনি আরও বলিতেন; আমি যখন নামাযে দাঁড়াই, তখন গায়েব হইতে আমার দোষ-ত্রুটি বলিয়া দেওয়া হয়; যাহাতে আমি অপরের দোষ-ত্রুটি দেখিতে না পাই এবং চলাফেরা করিবার সময় আমি বেহেশ্‌ত ও দোযখ দেখিতে পাই।

বস্তুত এইরূপ এবাদতকেই এবাদত বলা হয়। সর্বদা নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেই আর অপরের দোষ-ত্রুটি দেখা যায় না। আর অপরের দোষ-ত্রুটি না খোঁজাই বুযুর্গীর আলামত। দুঃখের বিষয় আজ মুসলিম কওম ইসলামের পূত পবিত্র আদর্শ ভুলিয়া কেহই অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া হিংসা-হাছাদে পড়িয়া রসাতলে যাইতেছে। যাহার ফলে কওমের একতা ভ্রাতৃত্ব চিরতরে লোপ পাইতেছে। নিজেরা দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়ার চেষ্টা না করিয়া দীন-দুনিয়া বরবাদ করিয়া অশান্তি ঘটাইতেছে।

হযরত মায়মুনা সওদা

হযরত মায়মুনা সওদা একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেন, আমি একদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দরখাস্ত করি যে, আয় আল্লাহ্! আমার বেহেশ্‌তী সাথীকে দেখাইয়া দিন! আদেশ হইলঃ তোমার বেহেশ্‌তী সাথীর নাম মায়মুনা সওদা। সে কুফাবাসী অমুক খান্দানের।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেনঃ আমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভে রওয়ানা করিলাম। যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। জনগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি এক দেওয়ানী আওরত, সারাদিন বকরী চরানই তাহার কাজ। তারপর আমি চারণ ভূমিতে গমন করিলাম। দেখিতে পাইলাম হযরত মায়মুনা সওদা নামায পড়িতেছেন। আর তাঁহার বকরীর দলের সহিত এক জায়গায়ই কতিপয় বাঘ বিচরণ করিতেছে।

ইতিমধ্যে হযরত মায়মুনা সওদা নামায শেষ করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ হে আবদুল ওয়াহেদ! এখন চলিয়া যাও; তোমার সহিত বেহেশ্‌তে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা রহিয়াছে। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কি করিয়া আমার নাম জানিলেন? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ তোমার কি জানা নাই যে, প্রথমেই সেখানে উভয় রূহের মহব্বত পয়দা হইয়া গিয়াছে? পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার যে, আপনার বকরী ও বাঘ একই জায়গায় চরিতেছে? তিনি বলিলেন, আমি আমার প্রভুর সহিত মোয়ামালা দুরুস্ত করিয়া নিয়াছি; ফলে আমার প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা আমার বকরী ও বাঘের মধ্যের মোয়ামালা ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

সোবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ রাসূলের এতাআত করিয়া তিনি কত বড় বুযুর্গ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অহরহ কাশ্‌ফ হইত এবং কারামত যাহের হইত। এমন কি, জন্মের পূর্বের মোয়ামালাত-গুলিও স্পষ্ট তাঁহার ইয়াদ ছিল। আর সাধারণ মানুষ তাঁহাকে দেওয়ানী জ্ঞান করিত। বহু বুযুর্গানের হালাত এইরূপই হইয়া থাকে।

হযরত ছারি সাক্কাতির মুরীদ

হযরত ছারি সাক্কাতির জনৈক খাদেম বলেনঃ আমাদের শায়খের ছিলেন এক মুরীদানী। তাঁহার এক ছেলে মক্তবে লেখাপড়া করিত। একদিন ছেলের ওস্তাদ ছেলেকে কোন কাজে পাঠাইলেন। ছেলে ওস্তাদের আদেশ পালন করিতে গিয়া পানিতে ডুবিয়া মরিল।

ওস্তাদ এই সংবাদ অবগত হইয়া ছেলের মাতার নিকট গেলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ছবর এখ্‌তেয়ারের নছীহত করিতে লাগিলেন। মুরীদানী ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাকে কেন ছবরের নছীহত করিতেছেন? ওস্তাদ বলিলেন আপনার ছেলে পানিতে ডুবিয়া মরিয়াছে। মুরীদানী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার ছেলে কখনও পানিতে ডুবিয়া মরিতে পারে না। এই বলিয়া তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া ছেলেকে ডাক দিলেন। ছেলে মাতার ডাকে সাড়া দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ওস্তাদ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন। মাতা ছেলেকে নিয়া ঘরে ফিরিলেন।

এই কাহিনী পরে হযরত ছারি সাক্কাতি ও হযরত জুনায়েদ (রঃ)-এর নিকট পেশ করা হইল। তাঁহারা বলিলেন, ইহা উক্ত আওরতের একটি বৈশিষ্ট্য যে, কোন মুছিবতের পূর্বেই তাহাকে গায়েব হইতে জানান হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা তাঁহাকে জানান হয় নাই—তাই এইরূপ হইয়াছে।

হযরত তোহ্‌ফা

হযরত ছারি সাক্কাতি বলেনঃ একদা আমি কয়েদখানায় গেলাম। সেখানে দেখিতে পাইলাম, একটি মেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় এশ্‌কের কবিতা আবৃত্তি করিতেছে এবং কাঁদিতেছে। দারোয়ানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সে পাগলী। মেয়েটি ইহা শুনিয়া আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল এবং বলিলঃ আমি পাগল নহি—আমি আশেক।

অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কাহার আশেক? উত্তরে মেয়েটি বলিলঃ যিনি আমাকে যাবতীয় নেয়ামত দান করিয়াছেন। যিনি সর্বদা আমার নিকট হাজির নাজির, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার।

ইত্যবসরে মেয়েটির মালিক আসিয়া হাজের হইল। সে দারোগার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোহ্‌ফা কোথায় আছে? দারোগা ছাহেব বলিয়া দিলেন, সে কয়েদখানার ভিতর আছে; হযরত ছারি সাক্কাতি তাহার সহিত কথা বলিতেছেন।

হযরত ছারি সাক্কাতি বলেনঃ মালিক ভিতরে আসিয়া আমাকে সম্মান প্রদর্শন করিলে আমি বলিলামঃ এই মেয়েটি আমার চাইতে বেশী সম্মানী। আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটিকে এত হীন অবস্থায় রাখিয়াছ কেন? সে উত্তর করিলঃ আমি তাহাকে বহু মূল্যে ক্রীতদাসীরূপে ক্রয় করিয়াছি। আমার ইচ্ছা ছিল তাহাকে অতি লাভে বিক্রয় করিব। কিন্তু সে রাতদিন ক্রন্দন করিয়া পানাহার বন্ধ করিয়া এমন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে এখন আসল দামে বিক্রি করাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

হযরত ছারি সাক্কাতি বলেনঃ আমি তাঁহাকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সে বলিল, আপনি দরবেশ, আপনি এত টাকা কোথায় পাইবেন? অতঃপর আমি বাড়ী ফিরিয়া সারারাত্রি কান্নাকাটি করিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করিতে লাগিলাম। হঠাৎ দরওয়াজায় খট্ খট্ আওয়াজ হইল। দরওয়াজা খুলিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি বহু টাকা-পয়সা সংগে নিয়া উপস্থিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কে? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ "আমি আহমদ ইবনে মোসান্না।

এই টাকাগুলি আপনার নিকট অর্পণ করিবার জন্য স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হইয়াছি।" টাকাগুলি আমি কবূল করিলাম।

রাত্রি ভোর হইতেই আমি খুশী মনে কয়েদখানায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ক্রীতদাসীর মালিকও কাঁদিতে কাঁদিতে কয়েদখানায় হাজির। বলিলামঃ হে মালিক! আপনি দুঃখ করিবেন না, আমি টাকা নিয়া আসিয়াছি। দাসীকে দ্বিগুণ মূল্যে খরিদ করিব। মালিক বলিল, আমি স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছি এই দাসীকে আযাদ করিয়া দিবার জন্য, তাই এই দাসীকে আল্লাহ্র রাস্তায় আযাদ করিয়া দিলাম। দাসী তোহ্ফা আযাদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। আমিও সমস্ত টাকা-পয়সা আল্লাহ্র রাহে দান করিলাম।

তারপর আমরাও তোহ্ফার পিছনে পিছনে ছুটিলাম। কতদূর যাওয়ার পর তোহ্ফাকে হারাইয়া ফেলিলাম। সে কোথায় বিলীন হইল তাহা ভাবিতেও পারিলাম না। পথিমধ্যে আহমদ ইবনে-মোসান্নার মৃত্যু হইল। চলিতে চলিতে আমি ও মালিক মক্কায় পৌঁছিলাম। কা'বা শরীফের তাওয়াফ করাকালে এক চিত্তাকর্ষক আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আমরা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কে? উত্তর হইলঃ সোব্হানাল্লাহ্! আপনারা এত শীঘ্রই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন? আমি তোহ্ফা।

হযরত ছারি সাক্বাতি বলেনঃ আমি আরয করিলাম, আহ্মদ ইব্নে-মোসান্নার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বলিলেন, তাঁহার অনেক বুলন্দ মর্তবা হাছেল হইয়াছে। অতঃপর বলিলাম, আপনার মালিকও আমার সাথে রহিয়াছেন। এই বলিয়াই তাকাইয়া দেখি তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তোহ্ফার মৃত্যু অবস্থা দর্শনে উক্ত মালিকও এন্তেকাল করিলেন। আমি উভয়ের কাফন-দাফন সমাধা করিয়া স্বগৃহে ফিরিলাম।

শাহ্ ইব্নে শুজা কারমানির কন্যা

শাহ্ ইব্নে শুজা কারমানী এক সুবিশাল রাজ্যের বাদশাহ্ ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বাদশাহী পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করেন। তাঁহার ছিল এক পরমা সুন্দরী কন্যা। অন্য রাজ্যের এক বাদশাহ্ কন্যার বিবাহের পয়গাম দেন। কিন্তু তিনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

কিছুদিন পর শাহ্ ইব্নে শুজা কারমানি জনৈক যুবকের নামায আদায় করার তরীকায় মুগ্ধ হয় এবং তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। যুবক কন্যাকে লইয়া নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

কন্যা স্বামীর বাড়ী গিয়া দেখিলেন, একটি শুক্না রুটি রহিয়াছে। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহা কি? স্বামী যুবক উত্তর করিলেনঃ সারাদিন রোযা রাখিয়াছি এফ্তার করার জন্য এই রুটি রাখিয়াছি। ইহা শুনিয়াই কন্যা আপন পিতার বাড়ীর দিকে রওয়ানা করিলেন। যুবক বলিলেন, আমি পূর্বাহ্ণেই ধারণা করিয়াছিলাম—বাদশাহ্যাদী কি করিয়া আমার বাড়ী কাল যাপন করিবে?

কন্যা বলিলেনঃ কিন্তু, না। আব্বা বলিয়াছেন, তোমার বিবাহ এক দরবেশ যুবকের সহিত দিয়াছি। ইহা শুনিয়া আমি যারপর নাই খুশী হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার স্বামী দরবেশ নয়; যদি দরবেশ হইবে, তবে কেন ঘরে রুটি জমা রাখিবে? তৎক্ষণাৎ যুবক রুটিটি খয়রাত করিলেন। ফলে কন্যা সন্তুষ্ট চিত্তে যুবকের সহিত ঘর করিতে লাগিলেন।

ওলী, দরবেশগণের জীবনের ছবি ইহাই, যাহা এই ঘটনায় দেখা গেল। আল্লাহ্ তা'আলার উপর যাঁহাদের ভরসা এমনি চরম ও পরম তাঁহারাই ওলীআল্লাহ্।

নেক বিবিগণের তারীফে কোরআন ও হাদীস

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে আওরত নামায পড়ে, রোযা রাখে, গোনাহ্ ও সওয়াবের কাজের তমীজ করিয়া চলে, হাদীস ও কোরআনের আহ্কামের তাবেদারী করে, যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, মিথ্যা বলে না, আমানতের খেয়ানত করে না, স্বীয় সতীত্ব বজায় রাখে, বে-পর্দা হয় না, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে না, লজ্জা-শরম বাকী রাখে, কাহারো সহিত হাসি মযাক করে না, আল্লাহ্ তা'আলাকে সদা ইয়াদ রাখে, স্বামীর খেদমত প্রাণপণে করে, তাঁহার জন্য খোশখবরী। তিনি পরকালে অফুরন্ত নেয়ামত সামগ্রীর অধিকারিণী হন। চিরশান্তিময় বেহেশ্তের দরওয়াজা তাঁহার জন্য খোলা থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, নেক আওরতগণের মধ্যে এই গুণসমূহ পাওয়া যায়—খোদা পরুস্তি, শরীঅতের পাবন্দ, সতী-সাধ্বী, খেলাফে শারাহ্ কাজে তওবাকারিণী এবং ইবাদতে লিপ্তা।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ এইরূপ স্ত্রীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হউক, যে নিজে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং তাহাজ্জুদ পড়িবার জন্য স্বামীকে জাগাইয়া দেয়। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যে আওরত কুমারী অবস্থায়, গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে অথবা হায়েয-নেফাসের সময় মৃত্যু বরণ করে সে শাহাদৎপ্রাপ্ত হয়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে মাতার তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে, সে বেহেশ্তী। বর্ণিত আছে, জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেনঃ যাহার দুইজনই মারা যায়? রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন, তাহারও এই সওয়াব মিলিবে।

হাদীস—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে আওরতের হামল পড়িয়া যায় সে সওয়াবের আশায় যদি ছবর এখতেয়ার করে, তবে ঐ সন্তান পরকালে স্বীয় মাতাকে টানিয়া বেহেশ্তে লইয়া যাইবে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন নেককার স্ত্রী। যে স্ত্রীকে দেখামাত্র স্বামীর মন শান্তিতে ভরিয়া যায় এবং স্বামীর আদেশ পাওয়ামাত্র তাহা পালনে প্রাণপণ চেষ্টা করে। আর স্বামীর প্রবাসকালে স্ত্রী (স্বীয়) ইজ্জত আব্রুর হেফাযত করে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আরবীয় রমণীরা দুইটি ভাল কার্যে অভ্যস্ত। প্রথমতঃ সন্তানের উপর খুব মহব্বত রাখে, দ্বিতীয়তঃ স্বামীর মালের হেফাযত করে। আফসোসের বিষয়! আমাদের দেশী রমণীরা স্বামীর মালের হেফাযতের দিকে মোটেই খেয়াল করে না। স্বামীর আমানতের হেফাযত করিতে তাহারা একান্তই অলস। এই অলসতার দরুনই তাহারা খায়েন সাজিয়া ইহ্কাল ও পরকাল বরবাদ করিতেছে। যাহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। দ্বিতীয় কথা হইতেছে—সন্তানের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি মাতা যেমন সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখে—তাহার চেয়ে বেশী সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখা উচিত সন্তানের চরিত্র গঠনের প্রতি। যেহেতু শিশুদের চরিত্র প্রথম থাকে নিষ্কলুষ, পবিত্র ও কোমল। এই সময়টা অতিবাহিত হয় মাতার কোলেই। এই সময়ে মাতা শিশুকে যেমন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিবেন, ঠিক তেমনি গড়িয়া উঠিবে। কাজেই শিশুকে আদর্শ চরিত্রবান করিয়া তোলার দায়িত্ব মাতারই।

হাদীস—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমরা কুমারীকে বিবাহ করিবে; যেহেতু তাহার বোলচাল স্বভাবতঃ নম্র হয়। অর্থাৎ, লজ্জাশীলা হওয়ার কারণে তাহারা মুখ খুলিয়া কথা বলিতে অক্ষম হয়। তোমরা তাহাদিগকে সামান্য খরচে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে, লজ্জা-হায়া অতি মূল্যবান সম্পদ। ইহাতে কেবল কুমারীকে বিবাহ করার আদেশ হইল না। এক ছাহাবী এক বিধবা আওরত বিবাহ করার কারণে হযরত তাহার জন্য খাছ দো'আ করিয়াছিলেন।

হাদীস—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে রমণী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে, স্বীয় মান-সম্মানের হেফাযত করে এবং স্বামীর তাবেদারী করে, এইরূপ রমণী বেহেশ্‌তের যে দরওয়াজায় ইচ্ছা প্রবেশ করিবে। মোটকথা, দীনের যাবতীয় জরুরী আহকামের পা-বন্দ হওয়ার পর, খুব কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্রমসাধ্য এবাদত করার প্রয়োজন পড়ে না। শ্রমসাধ্য এবাদতের দ্বারা যে মর্তবা লাভ হয়, উহা স্বামী ও সন্তান-সন্ততির খেদমতের দ্বারা হাছেল করা যায়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্বামীর সন্তুষ্টির হালতে যে স্ত্রীর মৃত্যু হইবে, সে বেহশ্‌তী। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যাঁহার চারিটি বস্তু হাছেল হইয়াছে, সে দুনোজাহানের দৌলত হাছেল করিয়াছে। প্রথম, নিয়ামতের শোকর আদায় করা; দ্বিতীয়, জিহ্বা দ্বারা সদা আল্লাহ্‌র যিকির করা; তৃতীয়, বালা-মছিবতে ছবর এখতেয়ার করা; চতুর্থ, স্বীয় সতীত্ব ও স্বামীর মালের হেফাযত করা এবং ধোঁকা না দেওয়া।

একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক রমণী খুব বেশী নফল নামায পড়ে, নফল রোযা রাখে এবং খয়রাত করে; কিন্তু তাহার জিহ্বা দ্বারা পড়শীদের কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ সে দোযখী। ঐ ব্যক্তি পুনঃ আরয করিল, এক রমণী নফল নামায ও নফল রোযা বেশী রাখে না, সামান্য পনিরের টুকরা খয়রাত করিয়া থাকে অথচ তাহার দ্বারা পড়শীদের কোন কষ্ট হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ সে বেহেশ্‌তী।

জনৈক আওরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। একটি সন্তান তাহার কোলে ছিল, আর একটি তাহার অঙ্গুলি ধরিয়া হাঁটিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ ফরামাইয়াছিলেন, এইসব আওরত প্রথমতঃ গর্ভে সন্তান ধারণ করে, তারপর প্রসব করে এবং অতি যত্নের সহিত লালন-পালন করে। যদি তাহারা স্বামীর মনের সন্তুষ্টি হাছেল করিতে পারিত, তবে বেহেশ্‌তী হইত।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ (আওরতদের প্রতি) তোমরা কি ইহাতে রাযী নও যে, (অর্থাৎ, রাযী থাকা উচিত) যখন তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় স্বামীর উছিলায় গর্ভবতী হয় এবং স্বামী তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে এই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হয়, যেই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে আল্লাহ্‌র রাহের রোযাদার এবং বিনিদ্র রজনীর এবাদতকারী। আর যখন তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, তখন তাহার শান্তি ও আরামের জন্য যে-সব সামান পরপারে মওজুদ করা হয়—সে সম্বন্ধে আকাশ ও মর্ত্যবাসী কোন ধারণাই করিতে পারে না। সন্তান প্রসব হইলে পর তাহার স্তন হইতে এমন একটি দুগ্ধের ফোঁটাও বাহির হয় না, যাহার পরিবর্তে কোন নেকী মিলে না। আর সন্তানের জন্য যদি তাহার রাত্রি জাগিতে হয়, তবে সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ৭০টি গোলাম আযাদ করার সওয়াব হাছেল করিয়া থাকে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ রমণী যদি তাহার স্বামীর সংসার হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামীর এজাযতে খরচ করে, তবে সেও সওয়াবের ভাগী হয়। রমণী সওয়াবের ভাগী হয় খয়রাত করার উছিলায়, আর স্বামী সওয়াব পায় মাল উপার্জন করার কারণে। ইহা ছাড়া খয়রাত কবূলকারীও সওয়াব পায়—অথচ কাহারো ভাগ হইতে সওয়াব কমে না।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ দেখ রমণীগণ! তোমরা জেহাদের সওয়াব হাছেল করিতে পারিবে হজ্জের দ্বারাই। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আওরতদের এবাদতকে কত সহজ করিয়া দিয়াছেন। জেহাদ শরীঅতের সর্বাপেক্ষা কঠিন এবাদত। আর সেই এবাদতের ফযীলত রমণীগণ হাছেল করিবেন হজ্জ সমাপন করিয়া। সোব্হানাল্লাহ্! কত বড় খোশ-নছীব।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ রমণীদের জন্য জেহাদ নাই, জুমু'আ নাই, এমনকি জানাযার নামাযও নাই (অর্থাৎ, জানাযায় তাহাদিগকে শরীক হইতে হয় না।) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আপন বিবিগণকে লইয়া হজ্জ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, এই হজ্জ করিবার পর বাড়ীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও (অর্থাৎ, বেলা জরুরত সফরে বাহির হইও না।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্ত্রীলোক পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। যেহেতু বিবি হাওয়া হযরত আদম (আঃ)-এর পাঁজর হইতে সৃষ্ট (ইহা একটি মশহুর কাহিনী।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা রমণীদের জন্য (رشك) এর বদলে জেহাদের সওয়াব দান করেন। যে আওরাত ঈমান ও সওয়াব তলবের উদ্দেশ্যে (رشك, অর্থাৎ, স্বামীর অন্য এক স্ত্রীর পানি গ্রহণে) ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাহাকে শহীদের মর্তবা দান করেন।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আপন স্ত্রীর সহিত প্রেম ও দাম্পত্য সুলভ ব্যবহার করিয়া স্ত্রীর সন্তুষ্টি হাছেল করাতেও ছদকার সওয়াব মিলে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আওরতদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠা যে স্বামীর দৃষ্টিকে সান্ত্বনা দিতে পারে এবং স্বামীর হুকুমের তাবেদার হয়। এ ছাড়া স্বামীর জান ও মালের হেফাযত করে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ পায়জামা পরিধানকারিণী আওরতের উপর আল্লাহ্র মেহেরবাণী হউক (অর্থাৎ, পর্দানশীন আওরতগণের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ বদকার আওরতের "বদী" হাজার পুরুষের বদীর সমান এবং নেককার আওরতের "নেকী" সত্তর আওলিয়ার নেকীর সমান।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে আওরত আপন গৃহস্থালী কার্য স্বহস্তে সম্পন্ন করে, সে জেহাদের সওয়াব লাভ করিবে (ইন্‌শাল্লাহ্)। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেনঃ বিবিগণের মধ্যে সে-ই উত্তম যে স্বীয় সতীত্ব বজায় রাখে এবং স্বামীর আশেক হয়।

হাদীস—জনৈক পুরুষ রাসূলুল্লাহ্র খেদমতে আরয করিলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন আমার স্ত্রীর নিকট গমন করি, তখন সে বলেঃ মারহাবা আমার সরদারের এবং বাড়ীর সরদারের। আর সে আমাকে যখন চিন্তিত দেখে তখন বলেঃ দুনিয়া নিয়া আবার কিসের চিন্তা—তোমার আখেরাত তো দুরুস্ত হইয়াছে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ বলিলেনঃ তাঁহাকে খোশ-খবরী দাও যে, সে এবাদতকারিণীদের একজন এবং সে মোজাহেদগণের অর্ধেক সওয়াব হাছেল করিয়া থাকে।

হাদীস—আস্‌মা বিনতে-এজীদ নেছারিয়া বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্র খেদমতের আরয করিলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আওরতকুলের ফরিয়াদ নিয়া হাজির হইয়াছি। পুরুষগণ জুমু'আর নামায, জমা'আত রোগীর সেবা-শুশ্রূষা, জানাযা নামায, হজ্জ-ওমরা ও ইসলামী রাষ্ট্রের

সীমানা রক্ষক হিসাবে আমাদের হইতে প্রধান্য হাছেল করিয়াছে। উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আওরতগণকে জানাইয়া দাও যে, এই পরিমাণ প্রাধান্যের সওয়াব তাহাদের জন্য স্বামীর খেদমত, স্বামীর হক আদায়, স্বামীর তাবেদারী ও তাঁহার দেলের সন্তুষ্টি হাছেল করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আওরতগণ সন্তান প্রসব করা হইতে সন্তানকে দুধ পান করান পর্যন্ত এমন সওয়াব হাছেল করে, যেমন সওয়াব হাছেল করিয়া থাকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানারক্ষী সেনাদল। আর এই সময়ের মধ্যে যদি সন্তানের মাতার মৃত্যু হয়, তবে সে শহীদী-দরজা প্রাপ্ত হয়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে রমণীকুল! স্মরণ রাখ, তোমরা যাহারা নেক্কার তাহারা সবার আগে বেহেশ্‌তে দাখেল হইবে। তাহাদিগকে স্নান করাইয়া খুশ্‌বু মাখিয়া প্রত্যেকের স্বামীর হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হইবে। লাল ও জরদ রঙ্গের সওয়ারীর উপর তাহাদের সহিত উপবিষ্ট মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে ছেলে-মেয়ে থাকিবে।

হাদীস—হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে আওরত স্বামীর প্রবাসকালে স্বীয় সতীত্ব বজায় রাখে এবং বিলাস সৌন্দর্যদ্রব্য পরিহার করিয়া চলে, সে বেহেশ্‌তে তাহার স্বামীর সহিত বাস করিবে। তাহার স্বামী যদি বেহেশ্‌তী না হয়, (অর্থাৎ, ঈমানের সহিত তাহার মৃত্যু না হয়) তবে তাহার বিবাহ্ কোন এক শহীদের সহিত আল্লাহ্ তা'আলা সম্পাদন করিবেন।

হাদীস—হাকীম ইবনে-মাবিয়া স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে প্রশ্ন করিলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের উপর আমাদের বিবির কি হক আছে? উত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেনঃ যখন তুমি পানাহার কর, তখন তাহাকেও পানাহার করাও। তুমি যখন পরিধান কর, তাহাকেও তখন পরিধান করাও। তাহার উপর যুলুম করিও না।

হাদীস—হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যাহার আখলাক-চরিত্র ভাল সে-ই পূর্ণ ঈমানদার। ঐ ব্যক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট যে স্বীয় বিবির নিকট পছন্দনীয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যে স্ত্রীলোক স্বামীর কথার তাবেদারী করে না তাহাকে প্রথমতঃ উত্তম নছীহত কর। তারপর তাহার সহিত উঠা-বসা শোয়া পরিত্যাগ কর। এইবার যদি মানে (অর্থাৎ তোমার কথার তাবেদারী করে,) তবে আর বাড়াবাড়ি করিও না।

রমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ তোমরা চলিবার সময় পা মাটিতে জোরে মারিও না। (পরপুরুষকে জেওরের ঝনঝনানী শব্দ শুনাইও না।) অত্র আয়াতের মারফত আওরতের কথাবার্তার আওয়াজকে হেফাযত করার জন্য এবং পর্দা-পুশিদার জন্য তাকীদ করা হইয়াছে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে রমণীগণ! তোমাদের অধিকাংশকেই আমি দোযখী দেখিতেছি। কতিপয় আওরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ইহার কারণ কি? রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র গযবের কথা অধিক বলিয়া থাক (অর্থাৎ বল, অমুকের উপর আল্লাহ্‌র গযব নাযেল হউক) এবং স্বামীর নাফরমানি খুব বেশী কর। স্বামী প্রদত্ত চীজকে না-পছন্দ কর। একদা জনৈক আওরত বিমারীকে খারাপ বলিল। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার কথায় বাধা প্রদান করিয়া বলিলেনঃ ওহে অজ্ঞান। বিমারীকে খারাপ বলিও না; যেহেতু উহা দ্বারা গোনাহ্ মাফ হয়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনকারিণী আওরতকে কিয়ামতের দিন ধারাল কাঁটাবিশিষ্ট অগ্নির কোর্তা পরিহিত অবস্থায় উঠান হইবে। কাঁটাগুলি তাহার শরীরে বিঁধিতে থাকিবে। আর আগুনে শরীরের চামড়া পুড়িতে থাকিবে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ এক আওরত বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়া অনাহারে মারিয়াছিল। সে জন্য তাহাকে কঠিন আযাব দেওয়া হইয়াছিল।

হাদীস—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ এক আওরত অপর আওরতের সহিত সাক্ষাৎ করার পর স্বীয় স্বামীর নিকট এমন বর্ণনা যেন না দেয়, যাহাতে স্বামীর চোখে অপর আওরতের ছবি ভাসিয়া উঠে।

হাদীস—একদা রাসূলুল্লাহ্‌র দুই বিবি তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় এক নাবিনা (অন্ধ) ছাহাবী আসিলেন। হযরত (দঃ) উভয় বিবিকেই পর্দার আড়ালে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ সে ত অন্ধলোক। তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেনঃ সে অন্ধ হইলেও তোমরা ত অন্ধ নও।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে স্ত্রী পরহেযগার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত স্বামীর বেহেশ্‌তী হুরগণ বলিতে থাকেঃ তুমি (স্ত্রীলোক) অভিশপ্ত হও। সে তোমার মেহ্‌মান—সে অতি শীঘ্রই আমাদের নিকট চলিয়া আসিবে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমি কখনো এইরূপ দোযখী আওরত দেখি নাই, অর্থাৎ, আমার যমানার পর এইরূপ আওরত পয়দা হইবে—যাহারা কাপড় পরিধান করিলেও উলঙ্গের মতই মনে হইবে। তাহারা খুব সাজিয়া রং ঢং করিয়া শরীরকে হেলাইয়া দুলাইয়া চলিবে এবং মাথার চুলকে নকল চুলের সহিত জড়াইয়া রাখিবে। যাহাতে বেশী চুল বলিয়া ভ্রম জন্মিবে। এইরূপ আওরতগণের নছীবে বেহেশ্‌তের খোশবুও মিলিবে না।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে স্ত্রীলোক পর পুরুষকে বা আওরতকে দেখাইবার জন্য অলংকার ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

হাদীস—হযরত (দঃ) একদা সফরে ছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, এক আওরত বোঝা বহনকারিণী এক উটনীকে লা'নত করিতেছে। হযরত (দঃ) সঙ্গীগণকে বলিলেনঃ উটনীটি যখন আওরতের লা'নতের যোগ্য, তখন বোঝাগুলিকে উটনীর পিঠ হইতে নামাইয়া ফেল। আর আওরতকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও।

সংশোধনমূলক কাহিনী

হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের যমানায় এনাক্ব নাম্নী এক আওরত ছিল। সর্বপ্রথমে সে যেনা করিয়া তাহার চরিত্রকে কলঙ্কিত করে। তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার বদকার্য হইতে হাতীর মত বড় বড় সাপ ও গাধার মত বড় বড় শকুন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে উহারা এনাক্ব নাম্নী আওরতকে খাইয়া ফেলিয়াছিল। মোটকথা, বদকার্যের নতিজা এমনি ভীষণ হইয়া থাকে।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, কোথায় এই যমানায় তো কাহাকেও তেমন শাস্তি ভোগ করিতে দেখি না! কিন্তু ইহাকে একমাত্র আখেরী নবীর উছিলা-ই বলিতে হইবে। রহ্‌মাতুল্লিল আলামীন আখেরী নবীর তোফায়েলে যদিও আমরা ইহকালে ঐরূপ ধ্বংসাত্মক

আযাবে পতিত হইতেছি না, তথাপি গোনাহের কার্যের জন্য আখেরাতে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, নিঃসন্দেহ।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, জবান, দেল ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও যেনা হইয়া থাকে। যেমন পর পুরুষের দর্শন করা চোখের যেনা, পর পুরুষের কথা শ্রবণ করা কানের যেনা। পর পুরুষের সহিত হাত মিলান, কাঁধে হাত রাখা, হাতের যেনা। পর পুরুষের বাড়ী চলাফেরা করা পায়ের যেনা। পর পুরুষের সহিত কথাবার্তা বলা জবানের যেনা। পর পুরুষের সহিত কথা বলিয়া বা কথা শুনিয়া মনে আনন্দ লাভ করা দেলের যেনা। এমনিভাবে সামান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হাজারো বদকার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাই এই সব গোনাহ্ হইতে বাঁচিবার জন্য সদা সতর্ক থাকা উচিত।

ওয়ায়েলার কাহিনী

এই আওরত হযরত নূহ নবীর বিবি। সে ছিল বেঈমান। হযরত নূহ আলাইহিস্সালামের যমানায় যখন প্লাবন শুরু হইল, তখন নূহ (আঃ) ঈমানদার লোকগণসহ বিশাল কিশ্তীতে উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার এক বেঈমান পুত্র ও এই বিবিকে কতভাবে বুঝাইয়া ঈমান আনাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঐ বদ-নছীবরা কিছুতেই ঈমান আনিল না; বরং প্লাবনে বিশ্বাস না করিয়া হযরত নূহ (আঃ)-কে টিট্কারী দিতে লাগিল। অবশেষে প্রবল প্লাবনে সারা দুনিয়া ভাসিয়া গেল। তাহারাও পানিতে ডুবিয়া মরিল।

এই সম্পর্কে কোরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আওরত নবীর বিবি হইয়াও আল্লাহ্র গযব হইতে বাঁচিতে পারিল না। সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইল। ইহাতে বুঝা যায়, কাহারো বাপ-ভাই বুযুর্গ থাকিলেও তাহার কোন ফায়েদা নাই, তাহাকে তাহার কর্মফল ভোগ করিতেই হয়।

হযরত লূত (আঃ)-এর বিবি

এই আওরত কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাহায্য করিত। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলেন, হযরত লূতের কওমের কাফেরদিগকে ধ্বংস করিতে। তিনি লূত (আঃ)-কে আদেশ করিলেন, ঈমানদার লোকদের নিয়া রাতারাতি বস্তির বাহির হইয়া যাইতে। আরও আদেশ করিলেন, যাইবার সময় পিছন দিকে না তাকাইতে।

এদিকে ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ্র আদেশে ছোবহে-ছাদেক হইতে না হইতে উক্ত কওমের উপর আযাব শুরু করিয়া দিলেন। হযরত লূত (আঃ) ঈমানদার লোকগণকে নিয়া রওয়ানা করিলেন। তাঁহাদের পিছনে পিছনে উক্ত কাফের আওরতও চলিল। বেঈমান লোকদের উপর পাথরের বৃষ্টি হইতে লাগিল। এই আওরত কার্যতঃ বেঈমান কাফেরদের মতই ছিল। তাই পিছনদিকে ফিরিয়া তাকাইল। তৎক্ষণাৎ একটি পাথর ছুটিয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে ধ্বংস করিল।

এই বদবখ্ত আওরতের উল্লেখ কোরআনে আছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর বিবির কাহিনীর সহিত ইহারও উল্লেখ হইয়াছে। উহার মতই সে পয়গম্বরের বিবি হইয়াও ধ্বংস হইল, দোযখী হইল। কারণ সে সত্য পথের পথিক ছিল না।

কাফের আওরত ছদুফের কাহিনী

হযরত ছালেহ্ (আঃ)-এর যমানার কথা। এই কাফের আওরতের আচার-ব্যবহার চাল-চলন অত্যন্ত খারাপ ছিল। ইহার মতই আর এক আওরত ছিল। তাহার ছিল বহুসংখ্যক বকরী। সমগ্র বস্তিতে একটি মাত্র কূয়া ছিল। সেই কূয়া হইতেই সমস্ত জানোয়ার পানি পান করিত।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ছালেহ্ আলাইহিস্‌সালামকে বহু মো'জেযা দান করিয়াছিলেন। হযরত ছালেহ্ (আঃ) একবার মো'জেযা বলে শক্ত পাথর হইতে বিরাট আকৃতির উটনী বাহির করিয়াছিলেন। এই উটনী উক্ত কূয়া হইতে পানি পান করিত। উহা একদিন পর পর এত পানি পান করিত যে, কূয়া একেবারে শুকাইয়া ফেলিত। ফলে উটনী যেদিন পানি পান করিত ঐদিন আর অন্য কোন জানোয়ার পানি পান করিতে পারিত না। তাই উক্ত আওরতদ্বয় দুষ্ট দুইজন পুরুষকে বলিল, এই উটনীর কারণে আমাদের জানোয়ারগুলি একদিন পর পর পানি পান করিতে পারে, ইহাতে খুব অসুবিধা হয়। তোমরা যদি এই অসুবিধা দূর করিয়া দাও, তবে আমরাও তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব।

তারপর বদবখ্‌ত পুরুষ দুইটি লোভে পড়িয়া তলোয়ার হাতে উটনীর আগমন পথে অপেক্ষা করিতে লাগিল। উটনী আসা মাত্র তাহারা তলোয়ার হস্তে আক্রমণ করিয়া উটনীকে মারিয়া ফেলিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সারা কওমের উপর আযাব নাযিল করিলেন। হযরত জীব্‌রায়ীল আমীন এমনি বিকট ও ভয়ংকর আওয়াজ করিলেন যাহাতে সমস্ত বেঈমান লোক মরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে অগ্নি-বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া সমস্ত মৃতদেহ পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দিল।

নাউযুবিল্লাহ্! দুইটি বদ আওরতের কারসাজির দরুন সমস্ত কওমের উপর আযাব নামিয়া আসিল। তাই সর্বদা এইসব গোনাহ্‌গারদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকা উচিত।

আরবিলের কাহিনী

হযরত ইলিয়াস নবীর যমানার কাহিনী। এই আরবিল ছিল যালেম বাদশাহের বেগম। সে নিজেও ছিল বড়ই নির্দয়, বেরহম আওরত। বহু পয়গম্বর ও ওলিআল্লাহ্‌কে সে যুলুম করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

আরবিলের প্রতিবেশীনী ছিল এক নেকবখ্‌ত আওরত। তাহার ছিল মনোরম তরুতাজা এক বাগিচা। একদা আরবিলের লোভ হইল যেমন করিয়াই হউক কৌশলে বাগিচাটি হস্তগত করিতেই হইবে। আর বাগিচা হস্তগত করিতে হইলে উক্ত আওরতকেও জীবনে মারিয়া ফেলিতে হইবে। এখন তাহাকে হত্যা করিবার উপায় কি?

ঘটনাচক্রে বাদশাহ্ একবার বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইল। রাজ্যভার ছাড়িয়া গেল বেগমের হাতে। সুযোগ বুঝিয়া বেগম আরবিল বাগিচার মালিনীকে হত্যা করার ফন্দী আঁটিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দুইজন লোক ঠিক করিল। বাগের মালিনীকে রাজ দরবারে ডাকিয়া পাঠাইল। জিজ্ঞাসা করিলঃ কি হে! তুমি নাকি বাদশাহর বদনাম করিয়াছ? গালিগালাজ করিয়াছ? আওরতটি বিস্মিত হইয়া অস্বীকার করিল। বেগম মিথ্যাবাদী নকল সাক্ষ্যদাতাদ্বয়কে হাজির করিল। তাহারা বলিলঃ হাঁ, সত্যই সে বাদশাহ্‌র বদনাম ও গালিগালাজ করিয়াছে। অতঃপর বেগম আওরতটিকে কতল করিয়া বাগিচাটি স্বীয় মালিকানাভুক্ত করিয়া লইল।

কিছুদিন পর বাদশাহ সফর শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর নিকট ওহী নাযিল করিলেন। "হে নবী! বাদশাহ্‌কে বলিয়া দিন, তাহার বেগম এক নির্দোষ বান্দাকে হত্যা করিয়া তাহার বাগিচা দখল করিয়া লইয়াছে। বাদশাহ যদি উক্ত বাগিচা তাহার ওয়ারিশদেরকে ফিরাইয়া দেয় এবং উভয়ে মিলিয়া তওবা করে, তবে রক্ষা, নতুবা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিব।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) এই সংবাদ বাদশাহ্কে প্রাদন করিলেন। বাদশাহ্ বেগম উভয়েই এই সংবাদে কর্ণপাত করিল না, বরং হযরত ইলিয়াসের দুশ্মন সাজিল। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইলিয়াসকে রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি রাজ্য ছাড়িয়া গেলেন।

কিছুদিন পরেই যালেম বাদশাহ্র এক আদরের ছেলে ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। এই দুঃখে বাদশাহ ও বেগম একেবারে মর্মাহত হইয়া গেল। কয়দিন পরই আবার এক প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ্ আসিয়া তাহার রাজ্য ছিনাইয়া নিল এবং তাহাকে সবংশে নিহত করিল। এইভাবে যালেম বাদশাহ্র সকল গর্ব অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল এবং সে সমূলে ধ্বংস হইল।

যুলুমের প্রতিফল, যালেমের গর্ব ও অহঙ্কারের উপযুক্ত শাস্তি নিয়তির বুকে চিরকালই হইয়া থাকে। ইহার নতীজা বড়ই ভয়ানক ও মর্মান্তিক। অহঙ্কারী ও অত্যাচারী মানব জাতির কলঙ্ক—ইবলীস্।

নায়েলার কাহিনী

আরবের এক গোত্রের নাম জিরহাম। হযরত ইসমাঈলের আর্বিভাবের পর হইতেই আরবের অধিবাসী এই গোত্রের সৃষ্টি। এই গোত্রেরই এক আওরতের নাম নায়েলা। একদা সে পবিত্র কা'বা শরীফে এক পুরুষের সহিত যেনা কার্যে লিপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার গযবে উহারা দুইটি পাথরে পরিণত হইয়া যায়। পুরুষটির নাম ছিল আসফ। পরবর্তীকালে জনগণ উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে রাখিয়া দেয়। আর জাহেল লোকেরা পাথরদ্বয়কে পূজা করিতে শুরু করে। আখেরী নবী উক্ত পাথরদ্বয়কে অন্যত্র ফেলিয়া দেন। ফলে জনসাধারণ উক্ত পাথর পূজার পাপ হইতে রেহাই পায়।

যুগে যুগে দেখা গিয়াছে, কাবা ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করিতে যে বদবখতই চেষ্টা করিয়াছে এমনিভাবে ধ্বংস হইয়াছে। জাহান্নামের কঠিন প্রজ্বলিত অগ্নিই তাহার নছীব হইয়াছে।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর হত্যাকারিণী

হযর ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর যমানা। এক ছিল বাদশাহ্। আর বেগমের ছিল পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত এক কন্যা। বেগমের বৃদ্ধাবস্থা সমাগত। এই সময় তাহার খেয়াল হইল, এখন আমার বৃদ্ধাবস্থা, নাজানি বাদশাহ্র মন অন্য কাহারো দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

বৃদ্ধা বেগম এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভীষণ চিন্তায় পড়িল। অবশেষে ঠিক করিল তাহার যুবতী কন্যাকেই বাদশাহর অর্ধাঙ্গিনী বানাইতে হইবে; সে যে কোন প্রকারেই হউক। বেগম রাত-দিন এই সুযোগই তালাশ করিতে লাগিল। অতঃপর একদিন বাদশাহ্কে ও কন্যাকে নানা কৌশলে বুঝাইতে লাগিল। কন্যাও ছিল পরমা সুন্দরী। ক্রমে ক্রমে উভয় বদবখ্তই রাজী হইয়া গেল।

এই সংবাদ হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস্সালাম জানিতে পারিলেন। তিনি বাদশাহ ও বেগমকে বুঝাইলেন। উপদেশ দিলেন যে, বাদশাহ্ ও এই কন্যার মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান হারাম হইবে। কাজেই তোমরা ইহা করিও না। বেগম ইহাতে ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-কে হত্যা করিল। হযরতের ছের মোবারক হইতে অবিরাম রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইল। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইল না।

অবশেষে বাদশাহ বাধ্য হইয়া সেকালীন আলেমগণের নিকট পরামর্শ চাহিল। আলেমগণ বলিলেন, হযরতের হত্যাকারিনীকে হত্যা করার পূর্বে এই রক্তধারা বন্ধ হইবে না। এদিকে এক

আদেল বাদশাহ্ ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদের উপর হামলা করিল। যাহার ফলে সত্তর হাজার কাফেরসহ বাদশাহ্‌কে সবংশে নিহত করিল। তারপর হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর ছের মোবারকের রক্তস্রোত বন্ধ হইল।

নফসানী খাহেশে পড়িয়াই বাদশাহ্ ও বেগম সবংশ নিপাত হইল। আরও সত্তর হাজার কাফের মারিল। পরন্তু কাহারো আশা পূর্ণ হইল না। নফ্‌স মানুষকে চিরকালই এমনি বিপদের সম্মুখীন করিয়া থাকে। তাই নফ্‌সের খাহেশে কোন কাজ করা উচিত নয়। যেহেতু আল্লাহ্‌র গযব যখন নামিয়া আসে তখন প্রতিবেশীকেও সেই আযাবে লিপ্ত হইতে হয়।

মহান আবেদের বিবির কাহিনী

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম কুদরত বলে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠাইয়া নিয়াছেন। তাঁহার যমানায় ছিল এক যাহেদ আবেদ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার গায়ে খুব শক্তি দান করিয়াছিলেন। সে যমানার বাদশাহ্ ছিল যালেম। সে ছিল উক্ত আবেদের দুশ্‌মন।

একদা বাদশাহ আবেদের বিবিকে প্রলোভ দিল যে, তোমার স্বামীকে যদি গ্রেপ্তার করিয়া আমাদের হাতে সোপর্দ করিতে পার, তবে আমি তোমাকে বেগমরূপে বরণ করিব। ইহাতে বদবখত বিবি লোভে পড়িয়া রাযী হইল। নিদ্রাবস্থায় নেক্‌কার স্বামীর হাত-পা বাঁধিয়া বাদশাহ্‌র হাওয়ালা করিয়া দিল।

এই নেক্‌কার আবেদ স্বামীর নাম শামছুন। বাদশাহ্ তাহাকে রাজ দরবারে হাজির করিবার হুকুম করিল। তাঁহার উপর নানা অত্যাচার করার পর তাঁহাকে শূলে চড়াইবার হুকুম করিল। যথাসময়ে শূলে চড়াইবার বন্দোবস্ত হইল। বহু রাজ-কর্মচারী তামাশা দেখিতে আসিল।

মহান আবেদ শামছুন এদিকে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করিলেন। ফলে বাদশাহ্‌র শাহী মহল ধ্বসিয়া পড়িয়া বাদশাহ্ মহলের নীচে চাপা পড়িল। সকলেই বাদশাহ্‌র উদ্ধার কার্যে মশ্‌গুল হইল। আবেদ শামছুন নির্বিঘ্নে বাড়ী ফিরিলেন এবং মোনাফেক বিবিকে তালাক দিলেন। বদবখ্‌ত আওরত ক্ষণস্থায়ী লোভের মোহে পড়িয়া দুনো জাহানের দৌলত নেক্‌কার স্বামীর সঙ্গ হারাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার যাবতীয় আশা-ভরসাও তাসের ঘরের মত উড়িয়া গেল। মোনাফেকীর উপযুক্ত সাজা পাইল।

হযরত জুরীহের তোহ্‌মতকারিণী আওরত

রাসূলে করীমের পূর্ববর্তী যমানায় এক বুযুর্গ ছিলেন। তাঁহার মোবারক নাম হযরত জুরীহ। অতি অল্প বয়সেই তিনি আল্লাহ্‌র এবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং জনগণ হইতে পৃথক হইয়া নির্জন জঙ্গলে গমন করেন। সেখানে তিনি একটি এবাদতখানা বানাইয়া এবাদতে মশ্‌গুল হন।

একদিন তিনি নফল নামায পড়িতেছেন। এমন সময় তাঁহার মাতা তাঁহাকে ডাকিলেন। তিনি নামাযে ছিলেন বলিয়া ডাকে সাড়া দিলেন না। ইহাতে মাতা রাগ হইয়া ছেলেকে বদদো'আ দিলেন—'ইয়া আল্লাহ্! সে আমার ডাকে সাড়া দেয় নাই, অতএব, তাঁহাকে তুমি যেনাকারী আওরতের তোহমত লাগাইও।'

যেহেতু মা-বাপের হক সব চাইতে বেশী। তাই শরীঅতে এই মাসআলাহ্ রহিয়াছে যে, নফল নামায ছাড়িয়া মা-বাপের ডাকে সাড়া দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু এই মাসআলাটি হযরত জুরীহ জানিতেন না; তাই তিনি মাতার ডাকে সাড়া দেন নাই। সুতরাং মাতার দো'আ আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হইয়াছিল।

হিংসুকের দল শীঘ্রই হযরত জুরীহের পিছনে লাগিয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে অপমানিত করার জন্য এক যেনাকারিণীকে ঠিক করিল। বলিল, যখন তোমার সন্তান গর্ভে থাকিবে, তখন তুমি সকলের নিকট বলিবে, ইহা একমাত্র জুরীহের কার্য। কমবখ্‌ত আওরত তাহাই করিল।

এইবার হিংসুকের দল হযরত জুরীহের নিকট গমন করিল। বলিল, কি হে! তুমি না এত আবেদ জাহেদ, তবে কেন এই আওরত তোমার নামে কুৎসা রটনা করিতেছে? এই বলিয়া তাহারা হযরত জুরীহের এবাদতখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে আওরতটি একটি সন্তান প্রসব করিল। হযরত জুরীহ্ সদ্যপ্রসূত শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতা কে? খোদার মহিমা অপার, সৃষ্টের বুঝা ভার! শিশুর মুখে কথা ফুটিয়া উঠিল। স্পষ্টভাবে এক রাখালের নাম বলিয়া দিল, যে ঐ হিংসুক-দলেরই একজন।

হযরত জুরীহের কারামত দর্শনে হিংসুকের দল তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল এবং তাঁহার এবাদতখানাকে স্বর্ণে তৈরী করিয়া দিতে চাহিল। হযরত জুরীহ্ বলিলেন, না, আগে যেমন ছিল, তেমনি বানাইয়া দাও। আমার নিকট মাটির ঘরই পছন্দনীয়। অতঃপর হযরত জুরীহ্ আপন মনে এবাদত করিতে লাগিলেন। হিংসুকেরা হিংসার অনলে দগ্ধ হইল। কিন্তু মাতার ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে এই পেরেশানী উঠাইতে হইল। কাহাকেও বদদো'আ করিতে নাই। যেহেতু বদদো'আ করার মধ্যে কোনই মুছলেহাত নাই।

বনি-ইস্রায়ীলের নির্দয় আওরত

ছহীহ্ বোখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বনি-ইস্রায়ীলের এক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই কওমের এক আওরত এক বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখে। উহাকে কিছুই পানাহার করিতে দেয় নাই। কিংবা উহাকে ছাড়েও নাই, যাহাতে সে চতুর্দিক বিচরণ করিয়া আহারের সংস্থান করিতে পারে। এইভাবে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া বিড়ালটি মারা যায়।

এই নিষ্ঠুর দয়াহীন কার্যের দরুন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আওরতকে দোযখে নিক্ষেপ করেন। এক রেওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) দেখিয়াছেন, উক্ত বিড়ালটি দোযখে আওরতটির বুকের উপর বসিয়া স্বীয় নখ দ্বারা তাহার বুক চিরিতেছে, নখের দ্বারা আঁচড় কাটিতেছে। মোটকথা, জীব-জানোয়ার এক কথায় কাহারও উপর বে-রহমী করা উচিত নয়। যেহেতু বে-রহমীর শাস্তিও আল্লাহ্ তা'আলা বে-রহমীর সহিতই দিয়া থাকেন। অতএব, সকলের প্রতি সদা সদয় হওয়া আবশ্যক।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের এক আওরত

হযরত ওসমান গণী রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেনঃ এক ব্যক্তি ছিল খুব বড় আবেদ। আর এক আওরত ছিল ভয়ানক দুষ্ট। আওরতটি একদা এক বাঁদীকে আবেদের বাড়ী পাঠাইল। সে আসিয়া আবেদকে বলিল, আপনি দয়া করিয়া আমাদের বাড়ী চলুন। টাকা-পয়সা মস্ত বড় একটি লেনদেন আছে, উহাতে আপনি সাক্ষী থাকিবেন। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য হওয়া বড়ই সওয়াবের কাজ। অতএব, শীঘ্রই চলুন।

আবেদ কিছুতেই বাঁদীর কথা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি রওয়ানা হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, খুব মজবুত একটি ঘর। তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে বাঁদী দুষ্ট আওরতের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত দরওয়াজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিল। আবেদ দেখিলেন, ঘরের মধ্যে উক্ত আওরত শরাব হাতে বসিয়া আছে এবং তাহার পার্শ্বে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া আছে।

আওরত আবেদকে দেখিয়া বলিলঃ এখন তুমি আমার হাতে আসিয়াছ। এখন বাধ্য হইয়া তোমাকে যে কোন একটি খারাব কাজ করিতেই হইবে, নতুবা আমি তোমাকে জানে শেষ করিয়া ফেলিব। তুমি এখন আমার সহিত যেনা কর; অথবা এই ছেলেটিকে হত্যা কর, কিংবা এই শরাব পান কর। একটা তোমাকে করিতেই হইবে নতুবা রক্ষা নাই।

আবেদ ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কোন উপায়ান্তর খুঁজিয়া না পাইয়া শরাব পান করাই এখতেয়ার করিলেন। শরাব পান করার পরই মস্তির হালতে অপর দুইটি খারবীও করিয়া ফেলিলেন। দুষ্ট আওরতের উদ্দেশ্য সফল হইল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল আবেদের পরহেযগারী নষ্ট করা।

চিন্তা করিলে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, যত বড় বড় গোনাহের সূচনা ছোট গোনাহ হইতেই। কাজেই গোনাহ ছোট হউক, বড় হউক একদিক দিয়া সকলই সমান। পরহেযগারী বড় সম্পদ। ইহাকে বজায় রাখিতে জীবনপণ চেষ্টা করা উচিত। উপরোক্ত স্বতঃসিদ্ধটি প্রত্যেক গোনাহেই প্রযোজ্য।

বনি-ইস্রায়ীলের ঠগবাজ আওরত

হযরত মূসা পয়গম্বর এক পানিপূর্ণ হাউযে দো'আ পড়িয়া ফুঁক দিয়াছিলেন। যার ফলে কোন বদকার আওরত ঐ হাউযের পানি পান করিলে তাহার চেহারা কুশ্রী হইয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিত। হযরত মূসা (আঃ)-এর যমানার পরও ঐ হাউযের উক্ত প্রতিক্রিয়া বাকী ছিল।

এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হন। বস্তুতঃ সন্দেহ সত্যই ছিল। তিনি কাজীর দরবারে বিচার প্রার্থী হন। কাজী ছাহেব উক্ত হাউযের পানির উপরই ফায়সালা করেন। ঐ স্ত্রীলোকটিকে পানি পান করানোর দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা হইল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির একটি ভগ্নী ছিল। সে দেখিতে ঠিক তাহারই মত। স্ত্রীলোকটি চালাকি করিয়া নিজের পরিবর্তে তাহার ভগ্নীকে পাঠাইল। তাহার ভগ্নী ছিল নেককার তাই হাউযের পানি পান করাতে তাঁহার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইল না। সকলেই বাড়ী ফিরিল।

ভগ্নীটি বাড়ী গিয়া যখন কথা বলিতে লাগিল, তখন তাঁহার মুখের শ্বাস লাগিয়াই ধোঁকাবাজ আওরতটি কুশ্রী চেহারা ধারণ করতঃ মারা গেল। মোটকথা, ধোঁকাবাজী ঠগবাজীর সাজা চিরকালই নির্ধারিত। তাই কখনো কোন অবস্থাতেই ধোঁকাবাজী করিতে নাই। উহার পরিণাম নেহাত জঘণ্য।

যায়দা বিন্‌তে আশ্‌আবের কাহিনী

যায়দা বিন্‌তে আশ্‌আব হাসানের বিবি। এযীদ ইবনে মোয়াবিয়া হযরত হাসানের দুশ্‌মন। সে চক্রান্ত করিয়া এই আওরতের দ্বারা হযরত ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগ করে এবং আওরতকে ওয়াদা দিয়াছিল ইমাম হাসানের মৃত্যুর পর তাহাকে স্বীয় মহিষীরূপে বরণ করিবে।

যায়দা লোভে পড়িয়া ইমাম হাসানকে বিষ খাওয়াইল। বিষের প্রতিক্রিয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত চলিল। অবশেষে ইমাম এন্তেকাল করিলেন। এবার যায়দা এযীদকে তাহার ওয়াদার কথা স্মরণ করাইল। কিন্তু এযীদ কিছুতেই তাহাকে বরণ করিল না। ফলে বদবখ্‌ত যায়েদা একূল-ওকূল সবই হারাইল। মোনাফেকীর অগ্নিতে সে চিরতরে জ্বলিতে লাগিল। এইভাবে সে সামান্য তুচ্ছ যালেম বাদশাহ্‌র বেগম হইবার আশায় দীন দুনিয়া খোয়াইল। তাই প্রবাদ প্রচলিত আছে—লোভে পাপ, পাপে বিনাশ।

বিবি যুলেখার কাহিনী

বিবি যুলেখার প্রথম শাদী হয় মিসরের উজিরের সহিত। একদা উজীর হযরত ইউসুফকে ক্রীতদাসরূপে খরিদ করিয়া বিবি যুলেখার হস্তে অর্পণ করে। কিছুদিন লালন-পালন করিবার পর বিবি যুলেখা হযরত ইউসুফের উপর আশেক হইয়া পড়ে। ইহা জানিতে পারিয়া উজীর মুছলেহাত ভাবিয়া হযরত ইউসুফকে কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখেন।

এক যুগ পর মিসরের বাদশাহ্ হযরত ইউসুফকে কয়েদখানা হইতে মুক্তি দেন। তখন হযরত ইউসুফ বাদশাহ্কে বলিয়াছিলেন, উজীরের পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুনঃ কাহার অন্যায়। বাদশাহ্র প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়াছিলেন যুলেখা। তিনি বলিয়াছিলেন, ইউসুফ সম্পূর্ণ পাক পবিত্র, যত অন্যায় সবই আমার ভুল মাত্র।

পরবর্তীকালে হযরত ইউসুফ যখন মিসরের বাদশাহ্ তখন উক্ত উজীরের এন্তেকাল হইয়াছে। ইহার পর হযরত ইউসুফ, বিবি যুলেখাকে স্ত্রীরূপে বরণ করেন। ইহাকে একমাত্র সত্য কথার অমৃতময় ফলই বলিতে হইবে। বিবি যুলেখার সত্য কথা বলার দরুন এবং মিথ্যা তোহ্মত না লাগানোর বদৌলতেই তিনি পরিশেষে একদিকে বাদশাহ্র পত্নী অন্যদিকে নবীর নেক বিবি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সত্য চিরজয়ী; উহার জয় সুনিশ্চিত অবধারিত।

কারূণের ধোঁকাবাজ আওরত

হযরত মূসা পয়গম্বরের জমানায় কারূণ এক মালদার ব্যক্তি ছিল। হযরত মূসা (আঃ) তাহাকে যাকাত আদায় করিতে বলেন। ইহাতে সে দেখিল তাহার অনেক মাল কমিয়া যাইবে। সে ছিল কৃপণের একশেষ। অসংখ্য অগণিত ধন-মাল হইতে একটি পয়সা খরচ হইতে দেখিলেও সে পেরেশান হইয়া পড়িত। জানের চেয়েও ধন ছিল তার নিকট প্রিয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর কথা শুনামাত্র সে তাঁহাকে মালী এমনকি জানী দুশ্মন ঠাওরাইল।

তারপর সে এক দুষ্ট আওরতকে বহু টাকা-পয়সা দিয়া বাধ্য করিল। তাহাকে বলিল, তুমি কেবল মূসা আলাইহিস্সালামের নামে রটনা করিবে যে, সে তোমার সহিত যেনা করিয়াছে। (নাউযুবিল্লাহ্!) লোভে পড়িয়া আওরত রাযী হইল।

একদা হযরত মূসা (আঃ) এক বিরাট মাহ্ফিলে ওয়ায করিতেছিলেন। তিনি যখন ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি যেনা করে তাহার এই শাস্তি, তৎক্ষণাৎ কমবখ্ত কারূণ বলিলঃ যদি আপনি এমন কাজ করেন, তবে কি শাস্তি? হযরত মূসা (আঃ) বলিলেনঃ আমারও ঐ শাস্তিই। তখন সে বলিল, অমুক আওরত বলে যে, আপনি তাহার সহিত এই কাজ করিয়াছেন। উক্ত আওরত সেখানেই উপস্থিত ছিল। হযরত মূসা (আঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে? সত্য সত্য বল। আওরতের দেলে হঠাৎ আল্লাহ্র ভয় জাগ্রত হইল। সে বলিয়া উঠিলঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ্! আপনি নিশ্চয়ই পাক পবিত্র। সে আমাকে বহু ধন-সম্পদ দিয়া রাযী করাইয়াছিল যে, আমি আপনার নামে মিথ্যা তোহ্মত লাগাই। এখন আমি তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গেলাম।

এই ঘটনায় হযরত মূসা (আঃ)-এর দেলে খুব কষ্ট লাগিল। তিনি কারূণের জন্য বদদো'আ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীর ফরিয়াদ কবূল ফরমাইলেন। কারূণ তাহার সীমাহীন ধন-সম্পদ মালমাত্তাসহ মাটিতে গাড়িয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে তাহার সকল অহঙ্কার ও গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। আওরতটি ধন-মালের লোভে পড়িয়া প্রথমতঃ ভ্রান্ত পথে ছিল। পরে বুদ্ধি বলে সত্য কথা বলিয়া দুনো জাহানের নাজাত হাছেল করিল।

গোনাহ্ স্বীকারকারিণী আওরত

একদা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে এক আওরত হাজির হইল। সে শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া যেনা করিয়াছিল। শরীঅতে হুকুম রহিয়াছে, যেনাকারীকে পাথরের আঘাতে মারিয়া ফেলার। উক্ত আওরত এই হুকুম জানিত। তবুও সে নিজকে এই পাপ হইতে ইহ দুনিয়াতেই পাক করিবার ইচ্ছা করিল।

তাই সে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট নিজ মুখে তাহার স্বকীয় পাপের কাহিনী বর্ণনা করিল। হযরত বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না যে, এরূপ সত্যবাদিনী যেনা করিতে পারে। তাই তিনি বলিলেনঃ না, তুমি যেনা কর নাই। কিন্তু আওরতটি তিনবার যখন স্বীকার করিল, তখন হযরত (দঃ) বলিলেনঃ আচ্ছা যাও, এখন তোমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে, পরে আসিও।

সন্তান প্রসব করার পর আওরতটি আসিয়া পুনরায় হযরতের নিকট হাজির হইল। অর্থাৎ সে প্রায় মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল নিজকে শরীঅতের শাস্তির দ্বারা পাক ছাফ করার জন্য। এইবার হযরত তাহাকে শাস্তি প্রদান করিলেন। সে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিল।

আওরতের মৃত্যুর পর জনৈক ব্যক্তি তাহার কুৎসা করিতেছিল। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ খবরদার! তাহার সম্পর্কে কিছু বলিও না; যেহেতু তাহার তওবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সত্তর গোনাহ্‌গারের তওবার সমান হইয়াছে। সে আল্লাহ্‌র ভয়েই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া জীবন দিয়া দিয়াছে। আল্লাহ্ আমাদিগকে গোনাহ্ হইতে দূরে থাকিবার এবং তওবা করিবার তৌফীক দিন।

রাসূলে মাক্‌বূলের পাক শামায়েল

[অর্থাৎ চাল-চলন]

১। বায়হাক্বী হযরত বরা ইবনে-আযেব হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) ছিলেন সৌন্দর্য্যের আকর। আখলাক চরিত্রে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অতি লম্বাও ছিলেন না বা অতি খাটও ছিলেন না অর্থাৎ মধ্যম কদ ছিলেন।

২। ইবনে-সাআদ ইসমাঈল ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) সবচেয়ে সহ্যগীর, সহনশীল ছিলেন। যে কেহ যে কোন কষ্ট দিলেও তিনি তাহা সহ্য করিতেন।

৩। ইমাম তিরমিযী হিন্দ ইবনে-আবি হালা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, চলিবার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে পায়ে এরূপ ভর রাখিয়া চলিতেন, যাহাতে মনে হইত, তিনি যেন শক্তভাবে মাটিতে পা রাখিতেছেন এবং উঠাইতেছেন। কদম মোবারক এমনভাবে চালাইতেন যে, দেখিলে মনে হইত যেন তিনি কোন উঁচু জায়গা হইতে নিম্নদিকে নামিতেছেন। পা খুব আজিযির সহিত বাড়াইতেন। পার্শ্বের কোন কিছু দেখিতে হইলে পুরাপুরি ঘুরিয়া দেখিতেন (অর্থাৎ আড় চোখে চাহিতেন না।) দৃষ্টি প্রায় সর্বদাই জমিনের দিকে রাখিতেন। উপর দিকে আসমানের দিকে খুব কম নজর করিতেন। সাধারণতঃ তিনি নীচা চোখে নজর করিতেন (অর্থাৎ, বেহায়ার মত চোখ উল্টাইয়া দেখিতেন না।) কাহারো সাক্ষাৎ ঘটিলে আগেই তিনি সালাম করিতেন।

৪। ইমাম আবু দাউদ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কথা বলিবার সময় ধীরে ধীরে কহিতেন। যাহাতে শ্রবণকারী স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে। এত অধিক ধীরে

কহিতেন না, যাহাতে শ্রবণকারী বিরক্ত হইয়া পড়ে। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, হযরত (দঃ) প্রত্যেক কথাকে তিনবার বলিতেন।

মোটকথা, হযরত কথা বলিতেন নেহায়ত উত্তম তরিকায়। যেখানে যেভাবে বলিতে হয়, সে ভাবেই বলিতেন। যেখানে বুদ্ধিমান লোক থাকে সেখানে এক কথা বার বার বলা ঠিক নয়। এইরূপে যেখানে বোকা লোক থাকে সেখানে একবার বলিলে তাহারা বুঝিতে পারে না। আবার যেখানে অল্প বুদ্ধিমান থাকে সেখানে দুইবার বলিলে বুঝিতে পারে। যেখানে হরেক রকম লোক থাকে সেখানে তিনবার বলাই মোনাসেব। যেহেতু কাহারো বুঝে আসিবে একবারে, কাহারো দুইবারে, কাহারো তিনবারে। যদি কেহ তিনবারেও না বুঝে, তবে তাহাকে আরও বলা চাই। এক কথায় কাহারো সহিত কর্কশ বা কটু ব্যবহার করা চাই না। সবার সহিত ভাল ব্যবহার করা এবং ভাল ব্যবহার শিক্ষা দেওয়াই ছিল নবীজীর একমাত্র উদ্দেশ্য। সকলের সহিত ভাল ব্যবহার করায় অভ্যস্ত হওয়া কামালিয়াতের নিশানা এবং ইহা একটি মহান দৌলত।

৫। ইমাম আবু-দাউদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কথাবার্তা পরিষ্কার ও স্পষ্ট শুনাইত। যে কেহ শুনিয়া বুঝিতে পারিত।

৬। বায়হাক্বি হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, সমস্ত বদ-অভ্যাস হইতে মিথ্যাকে হযরত (দঃ) অধিক ঘৃণা করিতেন এবং মিথ্যাকে তিনি মোটেই সহ্য করিতেন না।

৭। বায়হাক্বি ও ইমাম আবু-দাউদ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, সমস্ত কাপড়ের মধ্যে হযরত ইয়ামনি চাদরকে অধিক ভালবাসিতেন। অনেকেই মন্তব্য করেন, এই চাদর সাদাসিধা এবং কম ময়লা হওয়ার দরুনই হয়তো হযরতের নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। সোব্হানাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) দুনিয়াতে নিজকে দু'দিনের মুসাফের মনে করিয়াছেন। তাই তো, দুনিয়ার শান-শওকতের দিকে তাঁহার খেয়াল ছিল না, পরন্তু শান-শওকতকে তিনি পছন্দও করেন নাই। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইহাই একমাত্র আদর্শ। জরুরত পরিমাণ পোশাক—অর্থাৎ, ছতর ঢাকার পরিমাণ পোশাক হইলেই সেদিকে আর খেয়াল না করিয়া পরকালের চিন্তা করা এবং জিনতের দিকে নজর না করাই ওলি-আল্লাহ্গণের আদত।

৮। ইমাম বোখারী ও ইমাম ইবনে-মাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঐ এবাদতকেই বেশী পছন্দ করিতেন, যাহা প্রত্যহ নিয়মিত করা হয়। (অর্থাৎ, এমন নফল এবাদত তিনি পছন্দ করিতেন যাহা অল্প হইলেও প্রত্যহ নিয়মিত করা হয়। পক্ষান্তরে যাহা বেশী এবাদত অথচ উহা নিয়মিত নয়; এরূপ এবাদতকে তিনি অধিক পছন্দ করিতেন না।।

৯। ইবনে-আছুন্না হাসান লাগিরাহ্ মোজাহেদ হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের (দঃ) নিকট বকরীর সম্মুখ ভাগের গোশ্তই বেশী পছন্দনীয় ছিল।

১০। হাকেম এবং আরও অনেকে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মিঠা ঠাণ্ডা পানিই হযরত (দঃ) অধিক পছন্দ করিতেন। আবু নয়ীম হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে দুধই হযরতের (দঃ) অধিক প্রিয় ছিল।

১১। ইবনে-আছুন্না ও আবু নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মধূর শরবতই হযরত বেশী পছন্দ করিতেন।

১২। আবু নয়ীম হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে নকল করেন, হযরতের (দঃ) নিকট সবচেয়ে প্রিয় সালুন (ব্যঞ্জন) ছিরকাহ্।

১৩। ইমাম মোসলেম হযরত আনাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর্ম বেশী নির্গত হইত। আযিযি কিতাবে আছে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সলিম হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ-নির্গত ঘর্ম জমা করিতেন এবং অন্য খোশবুর সহিত মিশাইয়া লইতেন। যাহাতে খোশবুর ঘ্রাণ দ্বিগুণ হইয়া যাইত। যেহেতু হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ-নির্গত ঘর্ম উৎকৃষ্ট খোশবুর চেয়েও খোশবু ছিল।

১৪। ইমাম মোসলেম হযরত জাবের (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরতের দাড়ি মোবারক খুব ঘন ছিল। ইবনে-আদি হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, ফলের মধ্যে ভিজা খোরমা ও খরবুজা হযরতের নিকট অধিক প্রিয় ছিল।

১৫। ইমাম আহমদ ও ইমাম নাসায়ী হযরত আবু আরুদ হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত যখন নামাযে ইমামত করিতেন, তখন নামায নেহায়েত মোখ্‌তছর অর্থাৎ, শর্টকাট করিয়া পড়াইতেন। আর যখন একাকী নামায আদায় ফরমাইতেন, তখন খুব লম্বা নামায পড়িতেন। জমা'আতে নামায আদায় করিবার সময় তিনি মোক্তাদিদের রেআয়ত করিয়া নামাযকে মোখ্‌তছর করিতেন। যেহেতু মোক্তাদিদের মধ্যে বহু কমজোর বৃদ্ধ, মা'জুর লোকও থাকেন। একাকী পড়িবার সময় লম্বা পড়ার অর্থ—নামায ছিল হযরতের চোখের (ٹھنڈک) শান্তিদায়ক। নামায পড়িতেই তিনি শান্তি লাভ করিতেন। আর ইহার চেয়ে বড় আনন্দের জিনিস আর কি-ইবা হইবে। যেহেতু নামাযই স্বীয় মাহবুব খোদার সামনে দাঁড়াইয়া এল্‌তেজা করার প্রকৃষ্ট মওকা।

১৬। ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-বশির (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাহারো ঘরে যাইতেন, তখন প্রথমেই তিনি দরওয়াজার সামনে খাড়া না হইয়া ডানদিকের থামের কাছে দাঁড়াইয়া আস্‌সালামু আলাইকুম বলিতেন। (ইহাই সুন্নত তরীকা, যেহেতু পর্দা-পুশিদা রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা বড়ই সহায়ক। কাহারো ঘরে প্রবেশ করিবার সময় দরওয়াজার ডান বা বাম দিকে দাঁড়াইয়া সালাম দেওয়া উচিত। প্রথমবারের সালামের জবাব না দিলে, দ্বিতীয়বার সালাম বলা কর্তব্য। আর দরওয়াজা যদি বন্ধ থাকে, তবে সামনে দাঁড়ানোতে কোন ক্ষতি নাই।

১৭। হযরত ইবনে-স'আদ হযরত এক্‌রামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদত শরীফ ছিল যে, কোন লোক তাঁহার সামনে আসিলে তিনি যদি লোকটির হাসিমাখা মুখ দেখিতেন, তবে তাহার হাতখানি স্বীয় হাতের মধ্যে উঠাইয়া নিতেন। অর্থাৎ, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিতেন যাহাতে তাঁহার সহিত লোকটির মহব্বত পয়দা হইয়া যায়।

১৮। ইবনে-মানদাহ্ হযরত উতবা ইব্‌নে-আবদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, যে ব্যক্তি হযরতের খেদমতে আগমন করিতেন, তাহার নাম যদি ভাল না হইত অর্থাৎ হযরতের পছন্দনীয় না হইত, তবে তিনি তাহার নাম বদলাইয়া রাখিতেন।

১৯। ইমাম আহমদ এবং আরও অনেকের দ্বারা বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যদি কেহ আপন মালের যাকাত লইয়া হাজির হইত (অর্থাৎ, যথাস্থানে খরচ করিবার জন্য হযরতের খেদমতে পেশ করিত) তখন তিনি তাহার জন্য দো'আ করিতেনঃ "আল্লাহ্! অমুকের উপর রহমত নাজেল কর।"

২০। হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত যখন খুশী হইতেন খোশ হালে থাকিতেন, তখন বলিতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ আবার যখন না-গাওয়ারী পেশ আসিত, তখন বলিতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

২১। ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইবনে-মাজা হযরত ইবনে-মাসঊদ (রাঃ) হইতে বলেন, জেহাদের গনিমতরূপে হযরতের হিস্সায় যখন বাঁদী কিংবা গোলাম আসিত, তখন হযরত বিবিগণের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিতেন যাহাতে কাহারো ভাগে বেশ কম হইয়া বিবাদের সৃষ্টি না হয়। (আমাদেরও তাই করা কর্তব্য) কোন জিনিস বন্টন করিবার সময় কোন নফ্সানী খাহেশ নিয়া বেশ কম করিয়া বন্টন করা উচিত নয়। যেহেতু ইহাতে হক নষ্ট করা হয়। হক নষ্ট করার পরিণাম বড়ই ভীষণ।

২২। খতিব হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের নিকট যখন খানা হাজির করা হইত (অন্যান্য লোক যদি হযরতের সহিত মওজুদ হইত) তখন তিনি স্বীয় সম্মুখভাগ হইতে আহার করিতেন। যদি খোরমা হাজির করা হইত, তবে তিনি সব দিক হইতেই তানাওল ফরমাইতেন।

২৩। ইবনে-আছুন্না হযরত আনাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরতের খেদমতে যদি কোন পাকা ফল হাজের করা হইত, তবে তিনি হাতে নিয়া প্রথমে স্বীয় নয়নযুগলে বুলাইতেন, পরে ওষ্ঠ মোবারকে লাগাইতেন এবং বলিতেনঃ اَللّٰهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهٗ فَاَرِنَا اٰخِرَهٗ অতঃপর নিকটস্থ শিশুগণকে দিয়া দিতেন।

২৪। ইবনে-আসাকের হযরত সালেম ইবনে-আবদুল্লাহ্ ইবনে-ওমর এবং হযরত কাসেম-ইবনে-মুহাম্মদ হইতে বলেন, হযরতের খেদমতে যখন কোন খোশ্বুদার তৈল ইত্যাদির পাত্র হাজির করা হইত, তখন হযরত (দঃ) উহাতে অঙ্গুলি ভিজাইয়া লইতেন এবং যেখানে লাগানোর প্রয়োজন অঙ্গুলি হইতে লাগাইতেন। [অর্থাৎ, এই তরিকায় (নিয়মে) তিনি খোশবু এস্তেমাল (ব্যবহার) করিতেন]।

২৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) মাথায় তৈল লাগাইবার সময় বাম হাতে তৈল লইয়া প্রথমে ভ্রূ-যুগলে, তারপর চোখে এবং শেষে মাথায় লাগাইতেন। অন্য রেওয়ায়তে আছে, হযরত যখন দাড়িতে তৈল লাগাইতে এরাদা করিতেন, তখন হাতে তৈল লইয়া প্রথমে দুই চোখের উপর তৎপরে দাড়িতে লাগাইতেন।

২৬। তবরাণী (রঃ) হযরত উম্মুল মোমেনীন হাফছা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, শুইবারকালে হযরত ডানকাতে শুইতেন এবং স্বীয় ডান হাত ডান গণ্ডের নীচে রাখিতেন।

২৭। ইমাম তিরমিযী হযরত জাবের (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব পায়খানায় যাইবার সময় আগেই (অর্থাৎ, প্রস্রাব পায়খানা করার স্থানে পৌঁছার পূর্বে) ছতর খুলিতেন না। যেহেতু ছতর ঢাকা ফরয; উহা বেলা-জরুরত খোলা নিষেধ। এই জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ জরুরতে যথাস্থানে খুলিতেন।

২৮। ইমাম আবু দাউদ, নাসায়ী এবং ইবনে-মাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত যখন জুনুবের হালতে ঘুমাইতে ইচ্ছা করিতেন, তখন তিনি ওযূ করিয়া নিতেন।

আর ঐ অবস্থায়ই যদি কোন কিছু খাইবার এরাদা করিতেন, তবে দুনো হাত কব্জা পর্যন্ত ধুইয়া নিতেন। হায়েয নেফাস হইতে পাক হইলে পর আওরতদের জন্য ইহাই সুন্নত

২৯। ইমাম আবু দাউদ ও হাকেম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-এজীদ (রাঃ) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) লস্করদিগকে রোখছত করিবার সময় এই দো'আ পড়িতেন—

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَ أَمَانَتَكُمْ وَ خَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ

(কাহাকেও রোখছত করিবার সময় এই দো'আ পড়া উত্তম)।

৩০। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) নয়া কাপড় সাধারণতঃ জুমু'আর দিন হইতে ব্যবহার শুরু করিতেন।

৩১। হাকিম তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-কাআব (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) মেসওয়াক করা শেষ করিয়া উহা বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে প্রদান করিতেন। আর পানি পান শেষ করিয়া অতিরিক্ত পানি ডান পার্শ্বের লোককে প্রদান করিতেন। এই দুনো বস্তু প্রদান করা হযরতের ছাখাওয়াতি এবং সাধারণকে বরকত পৌঁছানো। হযরতের এরাদাও ইহাই ছিল।

৩২। ইবনেস্‌সিনি এবং তবরাণী হযরত ওসমান ইবনে-আবুল আছ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, যখন উত্তরী হাওয়া (অর্থাৎ ঝড়-তুফান) প্রবাহিত হইত, তখন হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো'আ পড়িতেনঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَآ اَرْسَلْتَ فِيْهَا ইহার অর্থ—ইয়া আল্লাহ্! আমি ইহার (হাওয়া ঝড়ের) খারাবী হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কবি—যে খারাবী আপনি ইহার সহিত পাঠাইয়াছেন।

৩৩। ইমাম আহমদ এবং হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত যদি স্বীয় পরিবারবর্গের কাহারো সম্বন্ধে জানিতেন যে, সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তবে তাহার সহিত কথাবার্তা, উঠাবসা সবকিছু পরিত্যাগ করিতেন। তাহার প্রতি পুরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন। পুনরায় যখন সে তওবা করিয়া লইত তখন তাহার সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতেন। পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন। প্রত্যেক গোনাহ্‌গারের সহিত হযরত (দঃ) এইরূপ ব্যবহার করিতেন।

৩৪। সিরাযী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন চিন্তিত হইতেন, তখন দাড়ি মোবারক হাতে ধরিয়া উহার প্রতি নজর করিতেন।

৩৫। ইবনেস্‌সিনি এবং নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে এবং আবু নয়ীম আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে নকল করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত হইলে দাড়ি মোবারক বার বার হাতে স্পর্শ করিতে থাকিতেন।

৩৬। ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখে সুরমা লাগাইবার সময় তিন তিন বার লাগাইতেন।

৩৭। ইমাম আহমদ এবং ইমাম মোসলেম হযরত আনাস ইবনে-মালেক (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, খানা খাওয়ার পর হযরত যে তিন অঙ্গুলির দ্বারা আহার করিতেন, তাহা খুব ভালভাবে চাটিয়া খাইতেন যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের অপব্যবহার না হয়।

৩৮। ইমাম তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বলেন, হযরতের নিকট যখন কোন মুশ্‌কিল সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি ছের মোবারক আসমানের দিকে উঠাইতেন এবং পড়িতেন— سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

৩৯। ইমাম আবু দাউদ এবং ইবনে-মাজা হযরত আবু মূসা আশ্‌'আরী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছাহাবীদের কাহাকেও কোন কাজে পাঠাইতেন, তখন নছীহত করিতেন—সকলের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে, নম্র ও ভদ্রভাবে কথা বলিবে, কাহকেও ঘৃণা করিবে না, শরীঅতের হুকুমের পা-বন্দ থাকিবে, সকলের উপর এহ্‌সান করিবে, কখনও যুলুম করিবে না।

৪০। ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিযী হযরত ছখর ইবনে-ওদায়া (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোথাও লস্কর পাঠাইতে হইলে দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাইতেন। যেহেতু দিনের প্রথম ভাগ বিশেষ বরকতের।

৪১। ইমাম আবু দাউদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) কাহাকেও নছীহত করিবার সময় এইরূপ বলিতেন না যে, তুমি কেন এমন খারাপ বল বা এমন খারাপ কাজ কর ? বরং এইরূপ বলিতেন—মানুষের কি হাল হইয়া গেল যে, তাহারা এইরূপ খারাপ বলা ও করা শুরু করিয়া দিয়াছে। সুব্‌হানাল্লাহ্! হযরত (দঃ) প্রত্যেকটি কার্যই সুবুদ্ধির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিতেন। এই তরীকায় নছীহত করাতে দুইটি ফায়েদা আছে, প্রথমতঃ যাহাকে নছীহত করা হয় সে মনে কোন কষ্ট পায় না; বিরক্ত হয় না। নছীহতকারীর প্রতি তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা অচল অটল থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সে নছীহত কবূল করিয়া দুরুস্ত হইয়া যায়।

৪২। আবু নয়ীম হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত সকালে আহার করিলে বিকালে আহার করিতেন না। আবার বিকালে আহার করিলে সকালে আহার করিতেন না। অর্থাৎ হযরত (দঃ) সারাদিনে একবেলা আহার করিতেন।

৪৩। ইমাম ইবনে-মাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, ওযূ করার পর হযরত দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করিতেন (কিন্তু মাকরূহ্ ওয়াক্তে নয়।) তৎপর (ফরয পড়িবার জন্য মসজিদে তশ্‌রীফ নিতেন।)

৪৪। খতীব এবং ইবনে-আসাকের হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, শীতকাল আসিলে হযরত শুক্রবার হইতে ভিতর বাড়ী অবস্থান শুরু করিতেন। আবার গ্রীষ্মকাল আসিলে শুক্রবার হইতে বাহির বাড়ী অবস্থান শুরু করিতেন। নয়া কাপড় তিনি শুক্রবার হইতেই পরিধান করা শুরু করিতেন এবং আল্লাহর শোক্‌রিয়া আদায় করিতেন। আর পুরাতন কাপড় কোন অভাবীকে দান করিতেন।

৪৫। বায়হাক্বী এবং খতীব হযরত মুহম্মদ ইবনে-আলী (রাঃ) হইতে বলেন, হযরতের নিকট সকালে কোন মালমাত্তা আসিলে দুপুরের পূর্বে যথাস্থানে খরচ করিয়া ফেলিতেন এবং দুপুরের পরে আসিলে রাত্রের পূর্বেই খরচ করিয়া ফেলিতেন।

৪৬। মুহাদ্দিস বগুবী জয়ীফ সনদে রেওয়ায়ত করেন, খুব বেশী হাসি পাইলে হযরত (দঃ) মুখের উপর হাত মোবারক রাখিতেন। ছহীহ্ সনদে অনেক স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে হযরত (দঃ) সাধরণতঃ মুচ্‌কি হাসি হাসিতেন।

৪৭। ইবনেস্‌সিনি হযরত আবু এমামা (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) মজলিস হইতে উঠিবারকালে দশ হইতে পনর বার এস্তেগ্‌ফার পড়িতেন। অন্য এক হাদীসে আছে, সেই এস্তেগ্‌ফার এই— أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ ○

৪৮। ইমাম আবু দাউদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-সালাম (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বসিয়া কথা বলিতে থাকিতেন, তখন তিনি ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাইতেন।

৪৯। ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু দাউদ হযরত খদিজা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত (দঃ) যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তখন তিনি নফল নামাযে লিপ্ত হইতেন।

৫০। ইবনেস্‌সিনি হযরত ছায়ীদ ইব্‌নে-হাকীম (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, কোন বস্তু যদি হযরতের নিকট উত্তম দেখা যাইত, তবে তিনি স্বীয় নজর লাগা হইতে বাঁচিবার জন্য এই দোআ পড়িতেন, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ فَلَاتَضُرُّهُ বস্তুতঃ তো হযরতের নজর লাগায় উক্ত বস্তুতে বরকত পয়দা হইত। তবুও তিনি স্বীয় উম্মতগণকে শিক্ষা দিবার জন্য এই দো'আ পড়িয়া থাকিতেন।

৫১। ইব্‌নে সাআদ হযরত মুজাহেদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত (দঃ) কোন আওরতের নিকট বিবাহের পয়গাম দিলে, সে যদি উহা কবূল না করিত, তবে তিনি আর দ্বিতীয়বার পয়গাম দিতেন না। একবার হযরত (দঃ) জনৈক আওরতের নিকট বিবাহের প্রস্তাবে করিলেন, সে উহা কবূল করিল না। হযরত (দঃ) অন্য একজনকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। তৎপর পূর্বোক্ত আওরত হযরতের বিবাহে আবদ্ধা হওয়ার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাকে হযরত (দঃ) জানাইলেন যে, এখন আর তাঁহার বিবাহের জরুরত নাই।

৫২। ইব্‌নে-সাআদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে নকল করেন, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় নেক বিবিগণের সহিত দাম্পত্যসুলভ ব্যবহার করিতেন, তখন হযরত (দঃ)-কে হাসি-খুশী, খুব নম্র স্বভাবের দেখাইত।

৫৩। ইব্‌নে-সাআদ হযরত যায়েদ ইব্‌নে-ছালেহ (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) পায়খানায় যাইবার সময় মাথা ঢাকিয়া জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন।

৫৪। ইমাম বুখারী হযরত ইব্‌নে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) যখন কোন রোগীর নিকট যাইতেন, তখন বলিতেন, لَابَأْسَ طَهُوْرٌ وَّ لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

৫৫। তব্‌রানী হযরত আবু আইয়ূব আনছারী হইতে রেওয়ায়ত করেন, দো'আ করিবার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম নিজের জন্য দো'আ করিতেন। (পরে আপরাপর সকলের নিমিত্ত)।

৫৬। ইমাম নাসায়ী হযরত ছো'বান (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোন ভয়ের সম্মুখীন হইলে এই দো'আ পড়িতেন, اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

৫৭। ইব্‌নে-মানদাহ্ হযরত সোহায়েল (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোন কাজে রাযী হইলে চুপ করিয়া থাকিতেন।

৫৮। আবু নয়ীম হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত (দঃ)-এর নেকবিবিগণের মধ্যে কাহরো চক্ষের বিমার হইলে তিনি তাঁহার সহিত চোখ ভাল না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করিতেন না।

৫৯। ইব্‌নে-মালেক এবং ইব্‌নে-সাআদ রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জানাযায় শরীক হইতেন, তখন তিনি খুব নীরব হইয়া পড়িতেন এবং দিলে দিলে স্বীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ করিতেন। (যেহেতু জানাযা ইব্‌রত হাছিল করার মওকা তাই ইহা দেখিয়া মৃত্যুর ও কবরের আযাবের ভয়ে ভীত হওয়া উচিত।)

৬০। ইমাম আবু দাউদ, হাকীম এবং ইমাম তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন—রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাঁচি দিবারকালে মুখের উপর হাত অথবা কাপড় রাখিতেন এবং আওয়াজকে ছোট করিতে কোশেশ করিতেন।

৬১। ইমাম মুসলেম এবং ইমাম আবু দাউদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোন নেক আমল করিলে উহা সর্বদা করার অভ্যাস করিতেন।

৬২। ইব্নে-আবিদ্দুনিয়া হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে নকল করেন, দাঁড়ান অবস্থায় হযরতের রাগ উঠিলে তিনি বসিয়া পড়িতেন। বসা অবস্থায় রাগ উঠিলে তিনি শুইয়া পড়িতেন। (অর্থাৎ, হালত পরিবর্তিত হইলে রাগ দমিতে থাকে।)

৬৩। ইমাম আবু দাউদ হযরত ওসমান গণী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিবার পর হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তদীয় সঙ্গী সাথিগণ কতক্ষণের জন্য সেখানে থামিয়া যাইতেন। হযরত সঙ্গীগণকে বলিতেন, তোমরা মৃত ব্যক্তির মাগ্ফেরাতের জন্য এবং তাহার ছাবেত কদমীর জন্য দো'আ কর। যেহেতু এই সময় মুন্কার নকীর ফেরেশ্তা মৃত ব্যক্তির নিকট ছওয়াল করিয়া থাকে।

৬৪। ইমাম তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা পরিধান করিবার সময় ডান দিক হইতে শুরু করিতেন (অর্থাৎ, প্রথম ডান হাত আস্তিনে প্রবেশ করাইতেন)।

৬৫। ইবনে-সাআদ হযরত আনাস ইবনে-মালেক (রাঃ) হইতে নকল করেন, ছাহাবীদের মধ্য হইতে যদি কেহ হযরতের সাক্ষাতে আসিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইতেন, তবে হযরতও সে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে থাকিতেন। কোন ছাহাবী হযরতের সহিত মোলাকাত মোছাফাহা করার পর সে স্বইচ্ছায় হাত না ছাড়া পর্যন্ত হযরত কিছুতেই হাত টানিয়া আনিতেন না। হযরত (দঃ) কখনও স্বীয় চেহারা মোবারক ফিরাইয়া নিতেন না যে পর্যন্ত কোন ছাহাবী স্বীয় চেহারা হযরতের দিক হইতে ফিরাইয়া না নিতেন। কোন ছাহাবী হযরতের কানের নিকটবর্তী হইলে (অর্থাৎ গোপন কথা বলার জন্য) হযরতও স্বীয় কান বাড়াইয়া দিতেন। ছাহাবী যে পর্যন্ত ফারেগ না হইতেন, হযরত (দঃ)-ও সে পর্যন্ত স্বীয় কান সরাইয়া নিতেন না।

৬৬। ইমাম নাসায়ী হযরত খদিজা (রাঃ) হইতে বলেন, ছাহাবীগণের যে কেহ হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে হযরত (দঃ) তাঁহাদের সহিত মোছাফাহা করিতেন এবং দো'আ করিতেন।

৬৭। তব্রানী হযরত জুনদুব (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, ছাহাবীগণের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই মোসাফাহা করিতেন না (অর্থাৎ, আগে সালাম করিতেন এবং পরে মোছাফাহা করিতেন)।

৬৮। ইবনেস্সিনি জনৈক আনছারীর বাঁদী হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) যখন কাহাকেও ডাকিবার এরাদা করিতেন, অথচ তাহার নাম জানা না থাকিত, তখন তিনি 'ইয়া ইবনে-আবদুল্লাহ্' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। (অর্থাৎ, হে আল্লাহ্র বান্দার বেটা।)

৬৯। হাকীম হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, চলিবার সময় হযরত এদিক সেদিক তাকাইতেন না (অর্থাৎ, নজর স্বভাবতঃ নীচের দিকে রাখিতেন।)

৭০। ইমাম আবু দাউদ হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের বিছানা কাফনের মত হইত (অর্থাৎ, কাফনের কাপড়ের মত সাধারণ কাপড়ের হইত)। শোবার সময়

তাঁহার ছের মোবারক মসজিদের দিকে থাকিত (অর্থাৎ, মসজিদে নববীর দিকে মাথা রাখিয়া তিনি শয়ন করিতেন)।

৭১। ইমাম তিরমিযী হইতে বর্ণিত—হযরতের বিছানা চটের বিছানা ছিল।

৭২। হাকীম হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের কোর্তা টাখ্‌নার উপর পর্যন্ত ছিল (অর্থাৎ, নেছ্‌ফ সাক, হাঁটুর নামা,টাখনার উপর পর্যন্ত) আর তাঁহার কোর্তার আস্তিন হাতের গিরা কিংবা হাতের অঙ্গুলি, পর্যন্ত লম্বা ছিল।

৭৩। ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইবনে মাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরতের বালিশ চামড়ার ছিল—যাহার মধ্যে খেজুর গাছের আঁশ ভরা ছিল।

৭৪। তব্‌রানী নো'মান ইব্‌নে-বশীর (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) পেট পুরিয়া খাইবার জন্য সাধারণ খেজুরও পাইতেন না। (আস্‌মান জমিনের সমস্তই রাসূলুল্লাহ্‌র বাধ্যগত ছিল। সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁহার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিত। কিন্তু তিনি যাবতীয় চিজ বস্তুকে আখেরাতের মোকাবেলায় তুচ্ছ মনে করিতেন। তাই তিনি ইচ্ছাকৃতই ফকিরী, দরবেশীকে এখ্‌তেয়ার করিয়াছিলেন। ধন-সম্পদ যাহাকিছু হস্তগত হইত তৎসমুদয়ই আল্লাহ্‌র রাহে দান করিতেন।)

৭৫। ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, আগামী দিনের জন্য হযরত কিছুই জমা রাখিতেন না।

৭৬। তব্‌রানী হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের চলার পথ হইতে কখনো সর্বসাধারণকে সরাইয়া দেওয়া হইত না।

৭৭। ইব্‌নে-সাআদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে নকল করেন, তিন দিনের কমে রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) কোরআন খতম করিতেন না।

৭৮। ইবনে-সাআদ হযরত মুহাম্মদ ইবনে-হানাফিয়াহ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, শরীঅতের মোয়াফেক কোন কাজে হযরত বাধা দিতেন না। হযরতের নিকট সওয়াল করা হইলে, তিনি জওয়াব দেওয়া মোনাসেব মনে করিলে বলিতেন—হাঁ। অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করিতেন।

॥ অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

নবম খণ্ড

□

স্বাস্থ্যই সুখের মূল

কথাটি সত্য। কারণ, সুস্থ শরীর, সবল দেহ এবং পুলকিত মন যাহাদের তাহারাই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের সমস্ত চাহিদা মিটাইয়া নশ্বর জীবনের প্রকৃত শান্তি অনুভব করিতে পারে।

অনুরূপভাবে তাহারাই খোদার এবাদত-বন্দেগী এবং পুণ্যের কাজ করিয়া চিরস্থায়ী ও চিরশান্তির জীবনযাত্রার পথ সুগম করিতে সক্ষম হয়।

প্রকৃতপক্ষে যাহাদের স্বাস্থ্য ও মন ভাল তাহারা দুনিয়া এবং আখেরাতের কাজ করিতে পারে এবং তাহারাই এবাদতের প্রকৃত স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। বর্তমান যুগের অবহেলিত মুসলিম জনগণের স্বাস্থ্য ও সমাজের অবনতির প্রতিকারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী যত প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা চলিতেছে তাহাদের এই সমাজ সেবার কাজে শরীক হইবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকাখানা লিখা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মুসলিম সমাজের একটি প্রাণীরও যদি কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হয়, তবে উহাই একমাত্র কামনা।

অত্র পুস্তকখানা প্রণয়নে আমার কৃতিত্বের কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, ইহা হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থান্‌ভী (রঃ) ছাহেবের লিখিত বেহেশ্‌তী জেওর-এর নবম খণ্ডের অনুবাদ। অবশ্য সর্বসাধারণের সুবিধার্থে উহার তরতীব পরিবর্তন করিয়া সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। হাকীমী উপাদানে গঠিত দুষ্প্রাপ্য ঔষধসমূহের স্থলে দেশীয় সহজলভ্য কবিরাজী পরীক্ষিত ঔষধগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছি।

অনুবাদকালে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, যাহাতে শরীরের এক একটি অঙ্গ উল্লেখ করত উহার ব্যাধি ও ব্যাধির কারণ এবং লক্ষণ উল্লেখ করা হয়। অতঃপর উহার প্রতিকারার্থে প্রথম নিয়ম পালনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তারপর যথাক্রমে বিশেষ দ্রব্য—পাচন ও বনজ পদার্থে গঠিত ঔষধ এবং অবশেষে ধাতব দ্রব্যাদি দ্বারা গঠিত ঔষধের কথা উল্লেখ করিয়া শেষ করা হইয়াছে এবং ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার নিয়ম উল্লেখ করত রূহানী চিকিৎসার কথা প্রত্যেক চ্যাপ্টারের সহিত যোগ করা হইয়াছে। অবশেষে প্রত্যেকটি রোগের সুপথ্য ও কুপথ্যের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক যেমন বনজ ও ধাতব পদার্থের ভিতর রোগ প্রতিকারের ক্ষমতা দিয়াছেন ঠিক তদ্রূপভাবে তার কালামের ভিতরও দৈহিক, মানসিক ও উপসার্গিক রোগ প্রতিকারের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন। তাহা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কোন সুধী ব্যক্তির আদৌ হইতে পারে না।

শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা এবং উপরি রোগের চিকিৎসায় শুধুমাত্র নবম খণ্ডের উপর নির্ভর করা হয় নাই; বরং বাংলা, আরবী, ফারসী, উর্‌দু, হাকীমী, কবিরাজী, বহু বই ও কিতাবের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ জিন ও যাদু এবং সর্প দংশন চিকিৎসায় মানুষ-ওস্তাদ ছাড়াও বহু জিন ওস্তাদ হইতে প্রাপ্ত বহু চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমি নগণ্য অত্র পুস্তিকায় জিন রোগ চিকিৎসার যতটুকু উল্লেখ করিয়াছি বইয়ের মারফৎ তাহার এজাযত ঐ সমস্ত ভাইদেরকে দিতেছি যাহারা অন্ততঃ জমা'আতে পান্‌জম পড়িয়াছেন, কোনও হক্কানী পীরের সহিত যোগাযোগের পর নেছবৎ হাছেল করিয়া এজাযত লাভ করিয়াছেন।

বায়ু—আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জীবের প্রতি যে কত বড় দয়ালু তাহা সম্যক উপলব্ধি করা সসীম জীব-জানওয়ারের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ পাকের দান করা নেয়ামতসমূহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকিলে মানুষ বিস্মিত হইয়া আত্মভোলা পর্যন্ত হইয়া যায়।

জীব-জানওয়ারের জন্য যে বস্তু যতই অধিকতর জরুরী; দয়াময় খোদা তাহা ততই পর্যাপ্ত পরিমাণ তৈরী করিয়া এমনভাবে রাখিয়া দিয়াছেন যে, তাহা ভক্ষণ, সেবন ও ব্যবহার করিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না। পয়সাও খরচ হয় না। ধরা যাক বায়ু—

অন্যান্য বিষয়বস্তু, খাদ্য খাদক প্রভৃতি না হইলে জীব যথেষ্ট সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বাতাস না হইলে সাধারণতঃ কোন জীব কিছুক্ষণের জন্যও বাঁচিতে পারে না। এই মহামূল্যবান বাতাস, চল্‌তি বাতাস ছাড়াও এত পরিমাণ সৃষ্টি করিয়া এমনভাবে বিরাজিত করিয়া দিয়াছেন যে, জীব যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই সে এই মহামূল্যবান বাতাসে ডুবিয়া রহিয়াছে, ভক্ষণ করিতেছে ও প্রাণ বাঁচাইতেছে। এই নিশ্চল বায়ুকেই কোরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে— وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا নিশ্চল, নির্মল বায়ু কর্তৃক যেমন প্রাণ রক্ষা পায় ঠিক তেমন করিয়া নিশ্চল অনির্মল এবং সচল অনির্মল বায়ু দ্বারা কোন কোন সময় প্রাণহানি পর্যন্ত হইয়া থাকে। আবার সচল বায়ু যে বস্তুর উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তাহার ক্রিয়া এবং আছরটিও অনেক সময় বহন করিয়া জীব-জানওয়ারের নিকট পৌঁছাইয়া থাকে। এজন্যই বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হাওয়ায় বিভিন্ন ক্রিয়া থাকিয়া যায়।

পূর্ব দিকের বাতাস জখম ও ভগ্ন স্থানে লাগিলে ক্ষতি হইয়া থাকে। দুর্বল শরীরে অলসতা আনয়ন করে। কাজেই পূর্ব দিকের প্রবাহিত বাতাস থেকে জখম ভগ্ন স্থান এবং দুর্বল মানুষকে হেফাযতে রাখিবে। শরীরে কাপড় রাখিবে। এই সময় জুলাপ ব্যবহার করিতে হইলে রোগীকে সাবধানে রাখিবে। সবল শরীরেও খুব বেশী বাতাস লাগিলে সর্দি ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া থাকে। কাজেই সাবধানতা অবলম্বন করিবে।

দক্ষিণ দিকের বাতাস স্বভাবতঃ গরম হইয়া থাকে। দক্ষিণ দিকের বাতাস প্রবহনকালে শরীরের লোমকূপসমূহ খুলিয়া যায় এবং অতি সহজেই বায়ু শরীরের ভিতর ঢুকিয়া থাকে। দুর্বল মানুষের ভিতর ঐরূপ প্রবল বাতাস প্রবেশ করিলে ব্যাধির পুনরাক্রমণের বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই দক্ষিণ দিকের হাওয়া প্রবাহিতকালে সদ্য রোগারোগ্য ব্যক্তিকে সাবধানে রাখিবে। বাড়ীর চতুর্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। কখনও আবর্জনা ও ময়লা জমিতে দিবে না। বাড়ীর ভিতর ঘরের চতুষ্পার্শ্বে এবং কামরাসমূহের ভিতর বাহির খুব পরিষ্কার ও খোলা রাখিবে। বাড়ীঘর ইত্যাদি ভালভাবে পরিষ্কার রাখা ঈমানের অঙ্গ বিশেষ।

ঘরের ভিতর স্থানে স্থানে যাহাতে কাদা কিচড় হইতে পারে এমন কোন কাজ করিবে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে যেখানে সেখানে বাহ্য করাইবে না। নির্দিষ্ট স্থানে এমনভাবে মলমূত্র ত্যাগ করাইবে যাহাতে ঘরের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়। ঘর স্যাঁতসেঁতে হইলে, কাদা কিচড় থাকিলে হাওয়া নষ্ট হইয়া নানা প্রকার রোগ উৎপাদন করিতে পারে। গোসলখানা, পেশাবখানা, থালা বাটী ধৌত করিবার স্থান পৃথক করিয়া লইবে। মাঝে মাঝে দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া প্রত্যেক কামরার ভিতর ধুপ, আগরবাতি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যাদির ধুঁয়া খুব ভালভাবে দিবে। ইহাতে হাওয়ার বিষ ক্রিয়াদি নষ্ট হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির সিজনে খুব ঘন ঘন, ভালভাবে সুগন্ধি জ্বালাইবে।

রুদ্ধকক্ষে কখনও বাতি, মোমবাতি বিশেষতঃ আগরবাতি জ্বলাইয়া ঘুমাইবে না। কারণ এরূপ করিলে নানাবিধ ব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে। নানা প্রকার চক্ষু রোগ হইতে পারে।

ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক সময় ইঁদুর প্রভৃতি কর্তৃক অন্য বাড়ী থেকে অগ্নি সংযোগ হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব, কস্মিনকালেও খোলা বাতি রাখিয়া ঘুমাইবে না। ইহা হাদীসে নিষেধ করা হইয়াছে। রান্না ঘর থেকে যাহাতে ধুঁয়া অন্যপথে বাহির হইতে পারে এবং রান্নাকারীর গায়ে না লাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। রুদ্ধকক্ষে, আবদ্ধ ঘরে আগুন ও ধুঁয়া জ্বালাইয়া কখনও সেখানে বসিয়া থাকিবে না। ইহাতে হঠাৎ মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

পর্দার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঘরের জানালা দরজা এমনভাবে খুলিয়া রাখিবে যাহাতে মুক্ত বায়ু গমনাগমন করিতে পারে।

কচি কচি শিশু-সন্তানকে সর্বদা হেফাযত করিবে যাহাতে খুব ঠাণ্ডা বা গরম বাতাস লাগিতে না পারে।

শীতকালে কখনও শীত লাগাইবে না। কারণ অতিরিক্ত শীত লাগিলে হাঁপানি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইবার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে।

হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া গেলে চা পান করিয়া লইবে। কিংবা ২ তোলা মধু ও ৫ মাসা কালাজিরা খাইবে। ইহাতে শীতের দুষ্ক্রিয়া হইতে নিরাপদে থাকা যাইতে পারে।

খাদ্য

বহু বই পুস্তক পড়িয়াছি। বিভিন্ন সমাজ চিন্তাবিদদের লিটারেচারও দেখিয়াছি। বিভিন্ন চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা হইতে এবং বহু চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণ দুইটি। যথা—আহারের ব্যতিক্রম ও অসংযম, আবার স্বাস্থ্যোন্নতি না হওয়ার কারণও দুইটি। যথা—পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্যের অভাব এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকা।

আমাদের দেশের অধিকাংশ চিকিৎসকগণ প্রায়ই রোগীর দায়িত্ব না নিয়া শুধু নিজের ব্যবসা চালাইয়া যান এবং ২/৩ দিনের চিকিৎসা করিয়া ক্ষান্ত হন। অথচ চিকিৎসা একটি পূর্ণ জীবনের দায়িত্ব। এই দায়িত্ববিহীন চিকিৎসার পরিণাম কতদূর ক্ষতিকর তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সমাজের চিন্তাবিদরাই সম্যক উপলব্ধি করিতেছেন। দেশীয় চিকিৎসার সম্প্রসারণ ও চিকিৎসকদের মধ্যে যত দিন রোগীর জীবনের দায়িত্বজ্ঞান পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ না করিবে ততদিন অবহেলিত বাঙ্গালীর জীবনে ও সমাজের উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। পাঠক পাঠিকা মনে

রাখিবেন, আহারাদি কেবলমাত্র শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্যই। উদর পূর্ণ কিংবা চক্ষু ও জিহ্বার তৃপ্তি মিটাইবার জন্য নহে।

জন্মের পর হইতেই শিশুকে নিয়মিত আহারে অভ্যস্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবে। নিয়মিতভাবে প্রত্যহ যথা সময় স্বাস্থ্যোপযোগী আহার করিবে। অক্ষুধায় বা দুষ্ট ক্ষুধায় কখনও আহার করিবে না।

পূর্ণভোজন অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য সম্যক পরিপাক হইবার পূর্বে কিছুতেই কোন খাদ্য ভক্ষণ করিবে না। কারণ পূর্ণভোজনটি সর্ববিধ রোগের আকর। সর্বদা কিছু ক্ষুধা থাকিতে খাওয়া শেষ করিবে। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে না।

কদাচিৎ খাওয়া বেশী হইয়া গেলে পরবর্তী ভোজন সন্ধ্যায় আর খাইবে না।

খাবার খাইতে খুব তাড়াহুড়া করিয়া কখনও আহার করিবে না। ইহাতে যেমন হযমের কাজে ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে তেমনি অনেক সময় মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। খুব ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইবে। আল্লাহ্ পাক জিহ্বার তলদেশে ২টি ঝরণা দিয়াছেন। চর্বণকালে উহা হইতে নিঃসৃত তরল লালাময় পানি বাহির হইয়া থাকে। ঐ পানি চর্বিত দ্রব্যের সহিত মিশিয়া গেলে খুব ভাল হজম হইয়া থাকে। আবার এত ধীরে ধীরেও আহার করিবে না যাহাতে খাদ্য দ্রব্যাদি বরতনেই শুকাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

সর্বদা নিজের হজম শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যে পরিমাণ এবং যে সব খাদ্য হজম করা সম্ভব হইবে ঠিক তাহাই ভক্ষণ করিবে। যাহা হজম করা সম্ভব নয় তাহা হাজার উত্তম উপাদেয় হইলেও ভক্ষণ করিবে না এবং যে কোন লোকে সুপারিশ করুক না কেন সর্বদা আত্মরক্ষা অগ্রগণ্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। আহারের মাঝে মাঝে সামান্য পানি পান করিলে হজম ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

কোন্ বস্তু কোন্ মওসুমে স্বাস্থ্যের উপযোগী ও অনুপযোগী হইয়া থাকে তাহা আমরা পরে উল্লেখ করিব।

আমরা নিত্যনৈমিত্তিক বিভিন্ন খাদ্য-খাদকের গুণাগুণও উল্লেখ করিব যাহাতে সর্বসাধারণের খাদ্যদ্রব্যের মোটামুটি ধারণা জন্মিতে পারে।

সুসিদ্ধ ভাত বাঙ্গালীর একটি চরম খাদ্য। কিন্তু অন্ন ভাল সিদ্ধ না হইলে অতি সহজেই পেটে পীড়া এসে উপস্থিত হয়।

নূতন আউসের ভাত গুরুপাক। দুর্বল ও রোগারোগ্য ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর।

নূতন আমন ও বোরো অপেক্ষাকৃত একটু লঘু।

সর্বপ্রকার পুরাতন চাউল লঘু পাক। কিন্তু এত পুরাতন হওয়া চাই না যাহা শুকাইয়া সারপদার্থ কিছুই রাখে না। ঢেকি ছাঁটা চাউল পুষ্টিকর ও বেরিবেরি নাশক। কলে ছাঁটা চাউল পুষ্টিকর নহে। কারণ কলের ছাঁটায় চাউলের উপরিভাগের লাল আভাযুক্ত হাল্‌কা কুঁড়াটা নিক্ষেপিত হইয়া স্বাস্থ্যের অনুপযুক্ত হইয়া থাকে এবং বেরিবেরি রোগ পয়দা হইয়া থাকে। তাই বলিয়া গাঢ় কুঁড়াযুক্ত চাউলের ভাত খাইবে না। ভাতের মাড় গালিয়া ফেলিবে না। কারণ ইহাতে মাড়ের সহিত উহার সারাংশ বাহির হইয়া যায়।

গম

গম পৃথিবীর সব দেশের লোকের জন্য একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। সম্প্রতি বাঙ্গালী ভাই-বোনেরাও ইহা খাইতে বেশ অভ্যস্ত হইয়াছে। ইহা বড়ই আনন্দের কথা। কারণ তাহারা ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা অতীব সুখের কথা।

তাছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জ্বালাইয়া পোড়াইয়া এতদ্দেশে যে কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যের ঘাট্‌তি এনে দিয়াছে তাহা পূর্ণ করা সহজ নয়। অবশ্য বাঙ্গালীরা বেশ কিছুদিন গম ব্যবহার করিলে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে আশা করা যায় এই বিরাট খাদ্য ঘাট্‌তি এলাকা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে পারে এবং বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যোন্নতিও হইবে। বিশেষ করে গম উৎপাদনের কাজ শুরু হইলে ত প্রতি বৎসর একটি জমীনে আউস, আমন ও গম এই তিনটি ফসল উৎপন্ন হইয়া খাদ্য ঘাট্‌তি দূর করিতে পারে। পরিষ্কৃত যাঁতায় পেষা আটাই উত্তম। কলে ও মেশিনে পিষিলে স্বল্পগুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

গম মধুর রস, শীতবীর্য, বাতপিত্ত নাশক, গুরু, নূতন গম কফ বর্ধক, শুক্র বর্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, ভগ্ন সন্ধানকারক, পুষ্টিকারক, বর্ণ প্রসাধক, ব্রণ রোগে হিতকর। শরীরের স্থিরতা সম্পাদক।

যব—অগ্নিবর্ধক, স্বর প্রসাধক, বল ও মেধাকারক, গুরু, বায়ু ও মলের অতিশয় বর্ধক, বর্ণ প্রসাধক, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক, কণ্ঠরোগ, চর্মরোগ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মেদ, শ্বাস-কাশ, রক্ত দোষে হিতকর, তৃষ্ণা নাশক। ইহার ছাতুই ব্যবহার্য।

মাংস বর্গ

গরুর গোশ্‌ত খুব মজাদার হইলেও অন্যান্য গোশ্‌ত অপেক্ষা স্বল্প গুণ বিশিষ্ট। বিশেষতঃ গরুর গোশ্‌ত রক্ত খুব গাঢ় করিয়া দেয়। ফলে রক্ত অতি সূক্ষ্ম ধমনীসকল দিয়া যথাযথ প্রবাহিত হইতে না পারায় অনেক সময় চর্মরোগ দেখা দিয়া থাকে। কাজেই গরুর গোশ্‌ত অনবরত ভক্ষণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়।

খাসী ও বকরীর গোশ্‌ত কফজনক, গুরু, শ্রোতশুদ্ধিকারক, বলপ্রদ, শরীরের মাংস বর্ধক ও পিত্তনাশক। কচি ছাগলের গোশ্‌ত অত্যন্ত লঘু, হৃদ্য, সুখপ্রদ অত্যন্ত বলদায়ক। বৃদ্ধ ছাগলের গোশ্‌ত বাতজনক ও গুরু। কাজেই উহা প্রায় পরিত্যাজ্য। যাবতীয় ছাগলের মগজ শির রোগে হিতকর।

ভেড়ার গোশ্‌ত—পুষ্টিকারক, পিত্ত শ্লেষ্মাবর্ধক ও গুরু। খাসী ভেড়ার গোশ্‌ত কিঞ্চিৎ লঘু।

হরিণ—মূত্ররোধক, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুর রস, সান্নিপাত নাশক, শীতবীর্য।

খরগোস—শীতবীর্য, লঘু, রুক্ষ, অগ্নিকারক, কফপিত্ত ও সর্বপ্রকার বায়ু বিকৃতি, জ্বর, অতিসার, রক্তদুষ্টি ও শ্বাস রোগ নাশক, কোষ্ঠ পরিষ্কারক।

দুম্বা—হৃদ্য, শুক্রজনক, শ্রম নাশক, কিঞ্চিৎ পিত্ত বর্ধক বাত ব্যাধি নাশক।

পাখী

বটের—অগ্নিকারক, রুচিকারক, শুক্র বর্ধক, বলকর এবং ইহা জ্বর ও ত্রিদোষ নাশক।

হোড়েল—রুক্ষ, উষ্ণ, রক্তপিত্ত শান্তিকর, কফ, ঘর্মকারক স্বর বিশুদ্ধিকারক, স্বল্প বায়ুকারক।

বাবুই ও চড়ুই—শীতবীর্য, মধুর রস, শুক্রজনক, কফকারক, সান্নিপাত প্রশমক। গৃহ-চড়ুই অত্যন্ত শুক্র বর্ধক।

কুকুড়া—যাবতীয় কুক্কুট (মুরগী ও মোরগ) পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ বীর্য, বায়ুনাশক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, শুক্র বর্ধক কিন্তু অর্শ ও ক্রিমি রোগে অহিতকর।

কবুতর—গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত নাশক, বাতঘ্ন, মল সংগ্রাহক, শীতবীর্য ও বীর্য বর্ধক। মজাদার হইলেও আয়ুর্বেদ মতে সরিষার তৈলে ভাজিয়া খাওয়া নিষিদ্ধ।

হাঁস—বড় ছোট সর্বপ্রকার হাঁসের গোশ্‌ত ও ডিম অত্যন্ত গরম, বাত ও কফ বর্ধক। মুরগী ও যাবতীয় পক্ষীর ডিম অত্যন্ত শুক্র বর্ধক।

যে কোন গোশ্‌তই হউক টাট্‌কা হওয়া উচিত। বাসী গোশ্‌ত পরিত্যাজ্য।

মাছ বর্গ

বড় মাছ—গুরু, শুক্র জনক ও মলরোধক।

ক্ষুদ্র মাছ—লঘু, মল সংগ্রাহক ও পেটের পীড়ায় হিতকর।

রুই—যাবতীয় মাছের মধ্যে রুই মাছই শ্রেষ্ঠ। ইহা শুক্রবর্ধক, বাতঘ্ন। রুই-এর মুণ্ড ঊর্ধ্বজাত রোগে হিতকর।

কাত্‌লা মাছ—গুরু, মধুর রস, উষ্ণ বীর্য। ইহা ত্রিদোষ নাশক।

মিরগেল মাছ—রুই মাছের তুল্য গুণ বিশিষ্ট।

বোয়াল মাছ—শ্লেষ্মাকর, বলবর্ধক। ইহা দ্বারা রক্ত ও পিত্ত দূষিত এবং কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়।

শিংগী মাছ (জিয়ল)—বাত শান্তিকারক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মা প্রকোপক, লঘু ও রুচিকারক।

ইলিস মাছ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, মুখরোচক, অগ্নি বর্ধক, পিত্ত নাশক, কফ কারক, কিঞ্চিৎ লঘু, শুক্রকর ও বায়ু নাশক। কিন্তু আমজনিত উদরে বিষতুল্য।

ভেট্‌কি মাছ—শুক্রজনক, শ্লেষ্মাকর, গুরু, আমবাতজনক, রুচিকারক, বায়ু ও পিত্ত নাশক।

রিঠা বা গাগর মাছ—কিঞ্চিৎ পিত্তবর্ধক, বাত নাশক, কফ প্রকোপক।

কই মাছ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, কফ প্রশমক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ু নাশক ও অগ্নিবর্ধক ও লঘু।

বাইন মাছ—গুরু, শুক্রবর্ধক, রক্তপিত্ত নাশক।

আইড় মাছ—গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকোপক। আইড় মাছ ও বোয়াল মাছ, খুজ্‌লি-পাঁচড়া ও কুষ্ঠ রোগে পরিত্যাজ্য।

মাগুর মাছ—মল সংগ্রাহক, শুক্রকারক, গুরু।

টেংরা মাছ—লঘু, কফ নাশক ও অগ্নিদীপক।

পুঁটি মাছ—শুক্রজনক, কফ ও বাতনাশক, মুখরোচক। মুখ ও কণ্ঠ ক্ষতনাশক। তাজা বড় পুঁটি (সরপুঁটি) ঘৃত ভাজিয়া খাইলে ক্ষয় নিবারণ হয়।

খলিসা মাছ—লঘু ও সুপথ্য।

চিতল মাছ—গুরু, মধুর রস, শুক্রজনক ও বলপ্রদ।

বেলে মাছ—কষায়, মধুর রস, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, বলবর্ধক, স্নিগ্ধ, লঘু ও মল সংগ্রাহক রুচীকর। বায়ু রোগে হিতকর।

শোল মাছ—মধুর রস, মল সংগ্রাহক, গুরু, রক্তপিত্ত নাশক।

গজার বা গজাল মাছ—শোল মাছ অপেক্ষা গুরু।

চিংড়ী মাছ—গুরু, মল সংগ্রাহক, বলবর্ধক, শুক্রজনক, রুচিকর, কফ ও বাতবর্ধক এবং ইহা মেদ, পিত্ত ও রক্ত দোষনাশক।

দলি মাছ—গুরুপাক, বলকারক ও শুক্রবর্ধক।

শুট্‌কী মাছ—নূতন শুট্‌কী মাছ বলকর, মলবদ্ধতাকারক।

পোড়া মাছ—পুষ্টিকারক, বলবর্ধক, গুণে শ্রেষ্ঠ।

ডাইল বর্গ

মুগ—লঘু, মল সংগ্রাহক, কফ ও পিত্তকারক, শীতবীর্য, মধুর রস, অল্প বায়ুবর্ধক, চক্ষুর হিতকর ও জ্বর নিবারক।

মাষ কলায়—গুরু, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বায়ু নাশক, উষ্ণবীর্য, মলমূত্র নিঃসারক, তৃপ্তিকর, বলকারক, শুক্রবর্ধক, স্তন্যবর্ধক, মেদোজনক ও পিত্তবর্ধক এবং ইহা অর্শোবলি, অর্দ্দিত শ্বাস ও পরিণাম শূল নাশক।

মসুর (মুশুড়ি)—মল সংগ্রাহক, শীতবীর্য, লঘু, রুক্ষ, বাতকর এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও জ্বরনাশক। গ্রহণি রোগ মাত্রেই উহা নেহায়েৎ ক্ষতিকর।

ছোলা—শীতবীর্য, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী ও বাতজনক। দুধ অপেক্ষা ছোলার ভিতর নয় গুণ ভিটামিন বেশী।

খোসাযুক্ত ও পরিষ্কৃত ছোলা রাত্রে ভিজাইয়া সকালে ২/১টি করিয়া ছোলা ভালরূপে চিবাইয়া খাওয়ার পর ঐ পানিটুকু কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিলে এবং নিয়মিত ব্যায়াম ও পরিশ্রম করিলে শরীর স্থূল ও মজবুত হইয়া থাকে। রমণী গমনে অদম্য শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। হজম শক্তি ভাল হইলে ধ্বজভঙ্গ রোগীও মাতঙ্গের ন্যায় শক্তিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু হজম শক্তি ভাল না হইলে ইহা ভক্ষণ করিবে না।

শুক্‌না ভাজা ছোলা একটি অখাদ্যই বটে। কারণ উহাতে বাত প্রকোপিত হয়, কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়। সিদ্ধ ছোলা পিত্ত ও কফনাশক।

মটর—রুক্ষ, শীতবীর্য, আমদোষজনক এবং পিত্ত দাহ ও কফ বিনাশক।

খেসারী—কিছু সামান্য গুণ থাকিলেও মনে হয় খোদা উহা ঘোড়ারই খাদ্য হিসাবে পয়দা করিয়াছেন, মানবের জন্য নয়। কারণ খেসারী ডাইল অতিশয় বায়ুবর্ধক এমন কি মানুষকে খঞ্জ ও পঙ্গু করিয়া দিয়া থাকে। সমস্ত ডাইলের মধ্যে খেসারী ডাইলই নিকৃষ্ট। প্রত্যেকের জন্যই খেসারীর ডাইল অবশ্য-বর্জনীয়।

তরকারী

উচ্ছে ও করেলা—শীতবীর্য, ভেদক, লঘু ও তিক্তরসা ইহা জ্বর, কফ, পিত্তরক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমিনাশক। অগ্নিদীপক সদ্য জ্বর রোগারোগ্য ব্যক্তির ইহা ভাল তরকারী।

ধুধুল—ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

ঝিঙ্গে—অগ্নিদীপক, পিত্তনাশক, ইহা শ্বাস, জ্বর, কাশ ও ক্রিমি নিবারক। সবের জন্যই ভাল তরকারী।

পটোল—পাচক, হৃদ্য, লঘু, শুক্রকারক, অগ্নিদীপক। ইহা কাশ, রক্তদোষ, জ্বর ও ক্রিমিনাশক। ত্রিদোষ নাশক বলিয়া ইহা একটি উত্তম তরকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

শীম—গুরু, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মা বর্ধক ও বাত পিত্তনাশক।

সজিনা ডাটা—অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম বিনাশক।

বেগুন—অগ্নিদীপক, উষ্ণবীর্য, শুক্রজনক, লঘু। ইহা জ্বর, বায়ু ও শ্লেষ্মা বিনাশক খোস-পাঁচড়া ও চুলকানি রোগে বেগুন পরিত্যাগ করিবে।

ঢেঁড়শ—রুচিকর, ভেদক, পিত্ত শ্লেষ্মানাশক, বাতবর্ধক, মূত্রজনক ও অশ্মরী (পাথরী) প্রশমক, শুক্রবর্ধক।

কাকরোল—কুষ্ঠ, অরুচি, শ্বাস, কাশ, জ্বর নাশক ও অগ্নিদীপক।

ভূঁই কুমড়া—স্নিগ্ধ পুষ্টিকারক, স্বরবর্ধক, মূত্রকারক, গুরুপাক, স্তন্য, শুক্র ও বলবর্ধক, জীবনী শক্তিবর্ধক ও রসায়ন। ইহা পিত্তদোষ, রক্ত দুষ্টি, বায়ু বিকৃতি ও দাহ নষ্ট করে। মিষ্টিকুমড়া পেটের পীড়ায় অখাদ্য ও পরিত্যাজ্য।

ওল—কফ, অর্শ, প্লীহা গুল্ম বিনাশক। অর্শের সুপথ্য।

গোল আলু—শীতবীর্য, বিষ্টম্ভী, গুরু, মল-মূত্র নিবারক, রক্ত পিত্তনাশক, বলকারক, শুক্রজনক, স্তন্যবর্ধক।

মূলা—রুচিকর, লঘু, পাচক, ত্রিদোষ নাশক ও স্বর প্রসাধক। জ্বর, শ্বাস, নাসিকা, রোগ, কণ্ঠরোগ ও নেত্র রোগের সুপথ্য। মূলা কামলা রোগের মহৌষধ।

গাজর—তরকারীর মধ্যে উৎকৃষ্ট, উষ্ণ বীর্য, অগ্নিদীপক, লঘু, মল সংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, অর্শ, গ্রহণী, কফ বায়ু বিনাশক।

ঠেটে কলা—(কাঁচা)—গুরু, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্ধক।

আনাজী কলা—সবের পক্ষে সুখাদ্য।

থোড়—রুচিকর, অগ্নিবর্ধক এবং যোনীদোষ নাশক।

মান কচু—লঘু, শোথনাশক, শীতবীর্য।

লাউ (কদু)—লঘু তরকারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভিটামিনযুক্ত। বহু রোগের প্রতিষেধক। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ বলিয়া থাকেন, কদু পেটে থাকিতে কলেরা আক্রমণ করিতে পারে না। সত্যই রাসূলে পাক যাহা আমল করিয়াছেন যুগে যুগে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাহার বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন, কিন্তু উহার আজায়েব শেষ হইবে না।

শাক বর্গ

পুঁই শাক—শীতবীর্য, স্নিগ্ধ শ্লেষ্মাকর, বায়ু ও পিত্তনাশক, কণ্ঠের অহিতকর নিদ্রাজনক, শুক্রবর্ধক বলকর, সুপথ্য ও গুরু। পেটের পীড়া, গলগণ্ড ও একশিরা এবং কুরন্তে বর্জনীয়।

পুঁদীনা—অগ্নিদীপক, মুখের জড়তা নাশক, কফ ও বায়ু নিবারক, বলকর, বমি ও অরুচি নিবারক। ইহার চাট্‌নি খুব মজাদার ও উপকারী।

কাটানটে শাক—লঘু, মল-মূত্র প্রবর্তক, রুচিকর, অগ্নিদীপক, বিষ বিনাশক।

পালং শাক—বাতজনক, শ্লেষ্মাকর, ভেদক, গুরু, বিষ্টম্ভী। শ্বাস রক্তপিত্ত ও বিষদোষ বিনাশক।

পাট শাক—বাত প্রকোপক, বিষ্টম্ভী, রক্তপিত্তনাশক।

কল্‌মী শাক—স্তন্য দুগ্ধ বর্ধক, শুক্রবর্ধক ও মধুর রস। পেটের পীড়ায় সুপথ্য নহে। দৃষ্টি-শক্তি বর্ধক।

হেলেঞ্চা শাক—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক।

মূলা শাক—মূলার নূতন পাতা পাচক, লঘু, রুচিকর, উষ্ণবীর্য। ইহা তৈলে ভাল পাক হইলে ত্রিদোশ নাশক হইয়া থাকে। আর পাক ভাল না হইলে কফ ও পিত্তবর্ধক হইয়া থাকে।

মটর শাক—ভেদক, লঘু তিক্ত ও ত্রিদোষ নাশক। আমবাতে খুব উপকারী।

সরিষা শাক—শাক বর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; কারণ উহা ক্ষারযুক্ত লবণ-কটু মধুর রস, মল-মূত্র বর্ধক, গুরু বিদাহি, উষ্ণবীর্য, ত্রিদোষজনক।

তৈল বর্গ

তিল তৈল—গুরু, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক, বলকারক, বর্ণ প্রসাধক, বাতঘ্ন, কফ নাশক, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্তজনক, মল-মূত্র রোধক, গর্ভাশয়ের শোধক, অগ্নিদীপ্তকর, বুদ্ধিপ্রদ, মেধাজনক, ব্রনঘ্ন, মেহনাশক, কর্ণশূল, যোনিশূল বিনাশক।

সরিষার তৈল—অগ্নিদীপ্তকারক, লঘু। ইহা মেদ, কফ, বায়ু, অর্শ, শিররোগ বর্ণরোগ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র ও দুষ্ট ব্রণ নাশক।

নারিকেল তৈল—গুরুপাক, ক্ষীণ ধাতুসমূহের পুষ্টিকারক ও বাতপিত্ত প্রশমক। ইহা নষ্ট শুক্র, প্রমেহ, শ্বাস, কাশ, যক্ষ্মা, স্মরণশক্তির হীনতা ও ক্ষত রোগে প্রশস্ত।

মসিনা তৈল—অগ্নি গুণবহুল, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, কফ ও পিত্তবর্ধক, চক্ষু ক্ষতিকর, বলজনক, বায়ুনাশক, ত্বক দোষ নাশক, মলবর্ধক।

ভেরেণ্ডার তৈল (Castor oil)—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপ্তকারক, গুরু, স্থিত সম্পাদক, বয়ঃস্থাপক, মেধাজনক, কান্তি ও বলপ্রদ, যোনী ও শুক্রশোধক। ইহা বিষম জ্বর, হৃদ রোগ, পৃষ্ঠ ও গুহ্যাদিগত শূল, গুল্ম, শোথ বিনাশক।

বাদাম তৈল—বাজীকারক, বায়ুপিত্ত নাশক, দাহঘ্ন, লাবণ্যবর্ধক, শিররোগ ও মেহ নাশক।

গার্জন তৈল—কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষদোষ এবং ক্ষত বিনাশক।

ঘৃত বর্গ

ঘৃত মানব জীবনের পক্ষে বিশেষ উপকারী খাদ্য। ঘৃত রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, অগ্নির দীপক, কান্তিজনক ও জোধাতু বর্ধক, তেজস্কর, লাবণ্য বর্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বর বর্ধক, স্মৃতি-কারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, বলকারক, গুরু। ইহা বিষ, বায়ু, জ্বর উন্মাদ শূল, ব্রণ, ক্ষয় ও রক্ত দোষনাশক।

মহিষা ঘৃত—লঘুপাক, সর্ব রোগনাশক, অস্থিবর্ধক, চক্ষুর হিতকর, অগ্নিবর্ধক। ইহা অশ্মরী, শর্করা ও বাত বিনষ্ট করে।

দুগ্ধ বর্গ

পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সমস্ত লোকই দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। এই বিশ্ব চরাচরে দুগ্ধের ন্যায় দ্বিতীয়টি আর নাই। ইহা একাধারে সুপথ্য ও ঔষধ।

অন্যান্য খাদ্য না খাইয়া কেবলমাত্র দুগ্ধ সেবন করিয়া মানুষ জীবিত ও সুস্থ থাকিতে পারে। কিন্তু হতভাগা মুসলমান এই দুধ বিক্রি করে পচা মাছ খরিদ করিয়া ভক্ষণ করে। নানাবিধ ক্ষতিকর, গুণহীন এমন কি তামাক বিড়ি খরিদ করিয়া থাকে। ইহা জাতির পক্ষে একটি কেলেঙ্কারীই বটে। সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দৈনিক কম পক্ষে একবার কিছু দুধ পান করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে।

দুগ্ধ—সুমধুর, স্নিগ্ধ, সারক, বাত পিত্তঘ্ন সদ্য শুক্রকর, শীতল, বলকারক, মেধাবর্ধক, শ্রেষ্ঠ বাজীকর, রসায়ন, ও রজঃবর্ধক। বিশেষ কোন পেটের পীড়া না থাকিলে দুধ পান করিতে দিবে।

গো-দুগ্ধ—সমস্ত দুধের মধ্যে গো-দুগ্ধই উত্তম। কিন্তু কোন সময় উহা শীতল হইলে পান করিবে না।

মহিষের দুগ্ধ—গো-দুগ্ধ হইতে উহা মধুর রস, স্নিগ্ধ, শুক্রকারক, গুরু, নিদ্রাকারক, ক্ষুধা-বর্ধক ও শীতবীর্য।

ছাগ দুগ্ধ—লঘু, মল সংগ্রাহক। ইহা রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়, কাশ ও জ্বরনাশক।

ভেড়ী দুগ্ধ—অশ্মরী (পাথরী) নাশক, চুলের হিতকর, গুরু, শুক্রবর্ধক, পিত্ত কফকারক।

অবস্থাভেদে দুগ্ধের গুণাগুণ

স্বাস্থ্য সম্পন্ন উৎকৃষ্ট গাভীর দুগ্ধ দোহনকালে স্বভাবতঃ যে গরম থাকে; (বানকাড়া গরম দুধ) তাহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলা হয়। ইহা লঘু, সুপথ্য, রসায়ন, ত্রিদোষ নাশক, নিয়মিত সেবন করিলে পাগল পর্যন্ত ভাল হইয়া থাকে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ দোষ বৈষম্যের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বটে।

দোহনকালে মহিষের দুধ ঠাণ্ডা করিয়া পান করিলে উপকার হয়। উপরোক্ত নিয়মে গরু ও মহিষের দুধ ছাড়া অন্য কোন কিছুর দুধ সেবন করিবে না। সমপরিমাণ দুধ ও পানি জ্বাল দিয়া দুগ্ধবিশেষ থাকিতে নামাইলে উহা অত্যন্ত লঘু হইয়া থাকে। দুধের সহিত লবণ কিংবা অম্ল একত্রে ভক্ষণ করিবে না। চিনি ও মিশ্রি সংযুক্ত দুগ্ধ শুক্রজনক, ত্রিদোষ নাশক। ইক্ষুগুড় মিশ্রিত দুগ্ধ মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মাবর্ধক। না দুধ, না দই এই ছ্যাকরা দুগ্ধ বিষ তুল্য। কখনও উহা পান করিবে না। অন্য কাহাকেও পান করিতে দিবে না।

দুগ্ধ সর—গুরু, শীতবীর্য, রতিশক্তি বর্ধক, রক্তপিত্ত নাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ এবং কফ বল ও শুক্রজনক।

দধি—উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, গুরু, মল সংগ্রাহক, রক্তপিত্ত, শোথ, মেদ ও কফবর্ধক। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীত জ্বর, বিষম জ্বর, অতিসার, অরুচিতে উপকারী ও বলবর্ধক। দধির মধ্যে গব্য দধিই শ্রেষ্ঠ।

মহিষ দধি—অতিশয় স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাকারক, বাতপিত্ত নাশক, শুক্রকারক, গুরু ও রক্ত দোষক।

ছাগ দধি—অত্যন্ত সংগ্রাহক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, অগ্নিদীপক এবং শ্বাস, কাশ, অর্শ রোগে প্রশস্ত। দধি রাত্রিতে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। একান্ত খাইতেই হইলে ঘৃত, চিনি মধু বা আমলকী ইহার কোন একটি মিশ্রিত করিয়া খাইবে। দধি কখনও গরম করিয়া খাইবে না।

ঘোল—ভাল মথিত ঘোল বায়ুপিত্ত ও কফ নাশক। অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্র বর্ধক, ইহা গ্রহণী রোগে বিশেষ হিতকর।

মাখন—গো-মাখন হিতজনক, বৃষ্য বর্ণ প্রসাধক, বলকারক, অগ্নিবর্ধক ও ধারক। স্বাস্থ্যের জন্য ইহা পরম উপকারী। বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, অর্শ শ্বাস ও কাশনাশক। বালক, বৃদ্ধ ও শিশুর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

গুড়বর্গ

ইক্ষু গুড়—শুক্রবর্ধক, গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, মূত্ররোধক, কুমেদ, কফ ও ক্রিমিবর্ধক।

পুরাতন গুড়—লঘু, হিতকর, অগ্নিবর্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, শুক্রবর্ধক, বায়ুনাশক।

গুড় আদার সহিত সেবন করিলে কফ, হরিতকীর সহিত সেবন করিলে পিত্ত, শুণ্ঠির সহিত সেবন করিলে বহুবিধ বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

খেজুরের গুড়—কিঞ্চিৎ গরম হইলেও ক্রিমিনাশক, নারিকেলের দুধের সহিত খাইলে ক্রিমি শান্তি হইয়া থাকে।

মিশ্রি—চিনির ন্যায় গুণযুক্ত। ইহা লঘু, বায়ু পিত্তনাশক, সারক।

ফল বর্গ

আম—কচি আম কষায়, অম্লরস রুচিকারক এবং বায়ু পিত্তবর্ধক।

কাঁচা আম—অত্যন্ত অম্লরস, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্ত দোষক, আম্রপেশী (আমচুর) ভেদক, কফ ও বায়ুনাশক।

পাকা আম—মধুর রস, শুক্রবর্ধক, স্নিগ্ধ, বলকর, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বাতঘ্ন, হৃদ্য, বর্ণ প্রসাধক এবং অগ্নি ও কফবর্ধক।

আমমিশ্রিত দুধ—শুক্রবর্ধক, বর্ণ প্রসাধক, মধুররস, গুরু, বায়ু পিত্তনাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকারক এবং বলবর্ধক। অম্লরস আম অধিক ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য বিষমজ্বর, রক্ত দুষ্টি ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমসত্ত্ব—তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্ত নাশক, সারক, রুচিকারক ও লঘু।

আমের বীজ—বমি, অতিসার ও হৃদয়ের দাহনাশক।

আমড়া—(কাঁচা)—বায়ু নাশক, গুরু, উষ্ণবীর্য, রুচিকারক ও সারক।

পাকা আমড়া—তৃপ্তিকারক, কফ বর্ধক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্ধক বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর, গুরু ও বলকারক। ইহা বায়ুপিত্ত ক্ষত, দাহ ক্ষয় ও রক্ত দোষনাশক।

কাঁঠাল—পাকা কাঁঠাল স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিজনক, মাংসবর্ধক, অত্যন্ত কফকর, বলকারক, শুক্রজনক এবং পিত্তবায়ু রক্তপিত্ত ক্ষত ও ভ্রণ নাশক। গুল্ম ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির জন্য অহিতকর।

কাঁঠালের বীজ—শুক্রবর্ধক, গুরু, মলরোধক ও মূত্র নিঃসারক। কাঁঠাল ভক্ষণের পর কাঁঠালের ২/১টি বীজ কাঁচা চিবাইয়া খাইলে উহা সহজে পরিপাক হইয়া যায়। অবশ্য জিহ্বা ও তালু আঠাযুক্ত হইয়া কষ্টদায়ক হইয়া থাকে কিন্তু উহার পরিবর্তে ২/১টি পাকা কলা খাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্যক পরিপাক হইয়া থাকে। ইহা পরিক্ষিত।

কলা—পাকা কলা শুক্রবর্ধক, পুষ্টিজনক, রুচিবর্ধক ও মাংসবর্ধক। দুধ কলা অত্যন্ত পুষ্টিকারক। ইহা তৃষ্ণা ও প্রমেহ নাশক।

ফুট—(বাঙ্গী) রুক্ষ, গুরু পিত্রঘ্ন, কফনাশক, ঈষৎ উষ্ণ, ধারক, বিষ্টম্ভকারক, মল নিঃসারক।

ক্ষীরাই—শুক্রবর্ধক, গুরু, বলকারক, পিপাসা ভ্রান্তি ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্ত দোষনাশক।

ডাব—ডাবের পানি শীতল, হৃদয় গ্রাহী, অগ্নি দ্বীপক, শুক্রবর্ধক, লঘু, পিপাসা নাশক, পিত্তঘ্ন এবং বস্তিদোষনাশক, শোধক। নারিকেল পিত্তজ্বর ও পিত্তজনিত রোগনাশক।

নারিকেল—গুরু, পিত্তবর্ধক, বিষ্টম্ভী ও বিদাহী (জ্বালাকর)। পাকা নারিকেল কুরিয়া উহার দুধ বাহির করতঃ ঝুনা বা পাকা দানাদার খেজুরের গুড়ের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি শান্ত হইয়া থাকে। কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, নারিকেলের মধ্যে ভিটামিন এ, বি, সি সবই বিদ্যমান আছে।

তরমুজ—অপক্ক তরমুজ ধারক, শীতল ও গুরু। পক্ক তরমুজ, ঈষৎ উষ্ণ, কিঞ্চিৎ ক্ষার বিশিষ্ট, পিত্তকারক এবং কফ ও বায়ু নাশক। তরমুজ ও খরমুজ একই আকৃতির এবং একই গুণ বিশিষ্ট অধিকন্তু উহারা মূত্রবর্ধক।

শশা—কচি শশা, লঘু, মধুর রস এবং পিপাসা, ক্লান্তি, দাহ পিত্ত ও রক্ত পিত্তনাশক।

পাকা শশা—উষ্ণবীর্য, পিত্তবর্ধক, কফ ও বায়ুনাশক।

শশা বীজ—মূত্রকারক, রুক্ষ এবং পিত্ত দোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক।

সুপারী—গুরু, শীতবীর্য, রুক্ষ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মদকারক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকর ও মুখের বিরসতানাশক।

কাঁচা সুপারী—গুরু, অগ্নি ও দৃষ্টিনাশক, কৃমিনাশক।

আতা—তৃপ্তিজনক, বল ও পুষ্টিকারক,শীতল, হৃদ্য, রক্তবর্ধক, শ্লেষ্মাজনক। ইহা বাত, পিত্ত, রক্ত দুষ্টি, দাহ তৃষ্ণা বমি ও বমনবেগ নিবারক।

পেয়ারা—(ছোট) বলকারক, হৃদয়গ্রাহী, রুচিকর ও শুক্রজনক।

পেয়ারা—(বড়) বীর্যবর্ধক, বলকারক, পুষ্টিকর, মূর্চ্ছা, জ্বর, ক্রিমি, বায়ু, তৃষ্ণা, ভ্রম ও শ্রম বিনাশক।

পেঁপে—(কাঁচা ও তাহার কষ) প্লীহা, যকৃত ও গুল্মবিনাশক। ২/১ ফোঁটা কষ কলা বা মিষ্টির সহিত পুরিয়া খালি পেটে খাইতে হয়। কাঁচা পেঁপের তরকারী অর্শ হিতকর।

পাকা পেঁপে—শীতবীর্য, রুচিকর, অগ্নিদ্বীপক, হৃদয়রোগে হিতকর রক্তপিত্তনাশক।

আনারস—অম্ল মধুর রস, ক্রিমিনাশক, সারক, বলকারক, বায়ুনাশক, রুচিজনক, শ্লেষ্মাকারক, তৃপ্তিপ্রদ ও গুরুপাক। ছোট মেয়েদেরকে খালি পেটে খাওয়াইলে ক্রিমি ক্ষেপণের ভয় রহিয়াছে।

তাল—পাকা তাল পিত্ত, রক্ত ও কফবর্ধক, বহুমূত্রজনক, তন্দ্রাকারক, শুক্রবর্ধক।

তালশাঁস—লঘু, কফবর্ধক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক।

বেল—কচি বেল ধারক, অগ্নিদীপক, আমের পাচক আম হযম করিয়া থাকে। (কটু, কষায় ও তিক্তরস) উষ্ণবীর্য, লঘু, স্নিগ্ধ, বায়ু ও কফনাশক।

পাকা বেল—গুরু, ত্রিদোষজনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, অগ্নিমান্দ্য কর। কাঁচা ও পাকা বেল আগুনে ভাল সিদ্ধ করিয়া খাইলে উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু ঘোলের সহিত উহা ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কারণ বিরুদ্ধ ভোজন।

কয়েত বেল—অপক্ক, ধারক ও লঘু।

পাকা—পিপাসা, হিক্কা, বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরু, কণ্ঠশোধক ও ধারক।

কাঁচা গাব—ধারক, বায়ুবর্ধক, শীতবীর্য ও লঘু।

পাকা গাব—গুরু, পিত্ত, প্রমেহ রক্তদোষ ও কফনাশক।

জাম—গুরুপাক, বিষ্টম্ভি, শীতবীর্য, অগ্নিদোষক, রুক্ষ, বাতজনক, কফ ও পিত্তনাশক। রক্তের সংশোধক।

কুল—শীতবীর্য, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্ধক ও পুষ্টিকারক।

চালতা—বিষ, স্ফোটক, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক, কেশের হিতকর।

কিসমিস্—মোনাক্কা ও কিস্‌মিস একই গুণবিশিষ্ট।

পাকা কিসমিস্—সারক, শীতবীর্য, চক্ষুর হিতকর, শরীরের উপকারক, গুরু, স্বর প্রসাধক, মল-মূত্র নিঃসারক, কোষ্ঠে বায়ুজনক, শুক্রবর্ধক, কফকারক, পুষ্টি ও রুচিকারক। ইহা পিপাসা, জ্বরবাত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, মেহ, দাহরোগ বিনাশক।

খেজুর—স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয় নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক ও বলকারক। ষ্টমাকের বায়ু, বমি বাতশ্লেষ্মা দোষ, জ্বর, অতিসার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাশ ও শ্বাসনাশক।

বাদাম—উষ্ণবীর্য, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্ধক, মগজ বর্ধক, গুরু।

নাশপতি—লঘু, শুক্রবর্ধক, ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত, কফ) নাশক।

টাবা লেবু—লঘু, হৃদয়গ্রাহী, কণ্ঠ, হৃদয় ও জিহ্বা শোধনকারক।

গোড়া লেবু—(জাম্বুরা) ইহা বায়ু, কফ, শূল, কাশ, বেগ, বমি, পিপাসা, আমদোষ, মুখের বিরসতা, হৃদপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমি নাশক। ম্যালেরিয়া নাশক।

কাগজী লেবু—বায়ুনাশক, অগ্নিদ্বীপক, পাচক ও লঘু। ক্রিমিনাশক, উদররোগ নাশক, ইহা বায়ুপিত্ত, কফ ও শূল রোগে হিতকর, রুচিকর, ইহা ত্রিদোষ, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয়রোগ, বাতরোগ, বিষ দুষ্টি, গলরোগে প্রযোজ্য।

কমলা লেবু—গুরু, বলকারক ও পুষ্টিজনক। বায়ু, পিত্ত, বিষ, রক্ত দোষ, অরুচি, পিপাসা ও বমি নাশক।

তেঁতুল— কাঁচা তেঁতুল গুরু, বায়ুনাশক, পিত্ত কফজনক, রক্তদুষ্টিকারক।

পাকা তেঁতুল—অগ্নিদ্বীপক, রুক্ষ, সারক ও উষ্ণবীর্য, কফ ও বায়ুনাশক, শূলবেদনা এবং আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে অতি পুরাতন তেঁতুলের শরবৎ অমৃতসম।

মোছলেহাতবর্গ

[মসল্লাদি]

আদা—গুরু, উষ্ণবীর্য, অগ্নিকারক, রুক্ষ, কফনাশক। আহারের পূর্বে কিছু আদা লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কুষ্ঠ, পাঁচড়া, পাণ্ডুরোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত জ্বরযুক্ত ব্রণ ও দাহরোগে এবং গ্রীষ্মকাল ও শরৎকালে অহিতকর। আদা পেটের পীড়ায় বিশেষ উপকারী কিন্তু অধিক ভক্ষণ করিলে জিরিয়ান দেখা দিয়া থাকে।

গোলমরীচ—অগ্নিদ্বীপক, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, পিত্তকর ও রুক্ষ। শ্বাস, শূল ও ক্রিমি নাশক।

সাদা মরিচ—গরম, অতি মাত্রায় ভক্ষণ করিলে পুরুষের ধাতু রোগ, শূলরোগ এবং মেয়েদের শ্বেতপ্রদর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চৈ—মল দ্বারের যাবতীয় রোগ বিনাশক, হজম শক্তি বৃদ্ধিকারক, গরম নহে, লঘু, বাত ও শ্লেষ্মানাশক, লঘু, শ্বাস, কাশ, পেটের পীড়া, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, শূল, ও আমবাত বিনাশক। পিপুলের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট।

যোয়ান—রুচিকর, উষ্ণ, লঘু, অগ্নিদ্বীপক, পিত্তজনক। ইহা শুক্র, শুল, বাত, শ্লেষ্মা, উদর, গুল্ম, প্লীহা ও ক্রিমি নাশক।

বনযমানী—(রাঁধুনি) অগ্নিদ্বীপক অর্থাৎ হজমশক্তি বৃদ্ধি করে, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ,বলকর ও লঘু। ইহা চক্ষু রোগ, ক্রিমি, সর্দি, হিক্কা ও মূত্রাশয় রোগ বিনাশক।

সাদা জীরা—মলসংগ্রাহক, হজমীকারক, লঘু, কিঞ্চিৎ গরম, রুচিকর, গর্ভাশয় বিশোধক, রুক্ষ, বলবর্ধক। বমি, ক্ষয়রোগ, বাতজ উদরধ্যান, কুষ্ঠ, বিষরোগ, জ্বর, অরোচক, রক্ত দুষ্টি, অতিসার, ক্রিমিরোগ ও গুল্মরোগে হিতকর।

কালাজীরা—চক্ষুর হিতকর, রুচিজনক, উষ্ণবীর্য, মলসংগ্রাহক, হজমী শক্তি বৃদ্ধিকারক, বলকর ও গর্ভাশয় বিশোধক। ইহা জীর্ণজ্বর, শোথ, শিরোরোগ, কুষ্ঠরোগ, গুল্ম, (প্লীহা), ক্রিমি, আমদোষ নিবারক।

ধনে—স্নিগ্ধ, মূত্রজনক, লঘু, হজমশক্তি বৃদ্ধিকারক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক। ইহা জ্বর তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ, ক্রিমি নিবারক।

মৌরি—যোনী শূল, অগ্নিমান্দ্য মলবদ্ধতা, ক্রিমি, শূল, কাশ, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক।

হলুদ—উষ্ণবীর্য, কফজ ও বাতজ দোষ, রক্ত দুষ্টি, কুষ্ঠ, প্রমেহ, ত্বকদোষ, ব্রণ, শোথ, কামলা, ক্রিমিনাশক।

রসুন—পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক, উষ্ণবীর্য, ভগ্নসন্ধান কারক, কণ্ঠশোধক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবর্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাধক, মেধাজনক, চক্ষের হিতকারক। হৃদরোগ, জীর্ণজ্বর, গুল্ম, অরুচি, কাশ, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফনাশক।

পিঁয়াজ—রসুনের ন্যায় গুণযুক্ত। বলকারক নাতিপিত্তজনক, বীর্যবর্ধক, গুরু। পিঁয়াজ ও মরিচ ভক্ষণ করিলে মেদা গরম হইয়া থাকে, কাজেই উহা ভক্ষণ না করাই উত্তম।

লবঙ্গ—চক্ষুর হিতকর, অগ্নির দ্বীপক, রুচিকারক, কফ, পিত্তদোষ, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমী, উদরাধ্মান, শূল, কাশ, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় রোগ আশু নিবারক।

বড় এলাচী—অগ্নি বর্ধক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য। ইহা কফ, পিত্ত রক্তদোষ, শ্বাস, তৃষ্ণা, মূত্রাশয়গত রোগ, মুখরোগ, শির রোগ, বমি ও কাশ নষ্ট করিয়া থাকে।

ছোট এলাচী—কফ, শ্বাস, কাশ, মুত্রকৃচ্ছ্র, বায়ুনাশক।

জাফরান—শিররোগ, ব্রণ, ক্রিমি বমি, ত্রিদোষনাশক।

দারুচিনি—বাতবর্ধক, পিত্তনাশক, বলকারক, শুক্তবর্ধক। ইহা তৃষ্ণা নিবারক।

তেজপত্র—উষ্ণবীর্য, লঘু। ইহা কফ, বায়ু ও অর্শ বিনাশক।

পান—উষ্ণবীর্য, লঘু, বলকারক, কামদ্দীপক, রাতকানা নিবারক।

লবণ বর্গ

সৈন্ধব লবণ—অগ্নিদ্বীপক, রুচিকারক, শুক্রবর্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং ত্রিদোষ নাশক।

সমুদ্র লবণ—ইহাকে পাঙ্গা লবণও বলে। গুরু, অগ্নিদ্বীপক, কফকারক বাতঘ্ন।

বিট্ লবণ—ক্ষারযুক্ত, উর্ধ্বগত কফ ও অধোগত বায়ুর অনুলোমকারক, অগ্নিদ্বীপক, লঘু, উষ্ণবীর্য ও রুচিকারক।

কৃষ্ণ লবণ—সচল লবণ; রুচিকারক, অগ্নিদ্বীপক বায়ুনাশক, নাতিপিত্তকর, লঘু।

খারি লবণ—পিত্তজনক, মল সংগ্রাহক, মূত্রকারক, কফ বাত নিবারক।

মধু বর্গ

মধু—কোরআনে মধুর বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। উহা বহু রোগের ঔষধও বটে।

মধু—লঘু, রুক্ষ, কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকর, অগ্নিদ্বীপক, স্বরবর্ধক, শরীরের কোমলতা সম্পাদক, স্রোতসমূহের বিশোধক, বর্ণ প্রসাধক, মেধাজনক, শুক্রবর্ধক, বিশদ গুণযুক্ত, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্ধক। ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, কাশ, রক্তপিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্রিমি, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতিসার, দাহ, ক্ষাত ও ক্ষয় রোগ নাশক।

সির্কা—আধ্মান, শোথ, অর্শ, প্রমেহ, শ্লেষ্মাজাত ব্যাধিসমূহে উপকারক, পুষ্টিকর ও বলবর্ধক।

ইক্ষু (আক)—রক্তপিত্ত নাশক, বলকারক, শুক্রবর্ধক, কফ দায়ক, গুরু, মূত্রবর্ধক, মেধাবর্ধক, দাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

চিনি—রুচিকর শুক্রবর্ধক। ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি ও জ্বর নাশক।

মিশ্রি—চিনির গুণ বিশিষ্ট বিশেষতঃ ইহা শীতল।

অন্ন বর্গ

ভাত—অগ্নিবর্ধক পথ্য তৃপ্তিজনক, রুচিকর, লঘু। হজমকাল ২ ঘণ্টা।

খিচুড়ী—শুক্রজনক, বলকর, গুরু, পিত্ত ও কফবর্ধক, মলমূত্রকারক। হজমকাল ৩ ঘণ্টা।

পায়স—পুষ্টিকারক, বলবর্ধক, বায়ুনাশক। হজমকাল ৪ ঘণ্টা।

মিষ্টান্ন বর্গ

মোহন ভোগ—পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, বলকর, বাতপিত্ত বিনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাকারক, গুরু, রুচিকর।

রাজ ভোগ—রসগল্লা, কাঁচাগল্লা, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন মোহন ভোগের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট এবং হজমের কাল প্রায় ৩ ঘণ্টা।

পরিশ্রম

অঙ্গ চালনা—ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের পর যথাক্রমে রস, রক্ত, গোশ্‌ত, অস্থি, মেদ, মজ্জা ও শুক্রে পরিণত হইয়া থাকে। উপযুক্ত অঙ্গ চালনা কর্তৃক রস ও রক্ত আভ্যন্তরীণ ধমনী দ্বারা সমস্ত শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। শারীরিক ও মানসিক ক্ষয় পূরণের জন্য সমস্ত অঙ্গ চালনার বিশেষ প্রয়োজন। উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে শরীর ও মন দিন দিন নিস্তেজ ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে এবং দেহ ও মন মজবুত ও কার্যক্ষম রাখিতে উপযুক্ত ব্যায়ামের একান্ত দরকার। দেহের রক্ষণ ও উহার ক্রমবর্ধনের জন্য আধুনিক যুগে নানা প্রকার অঙ্গ চালনার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মতে অন্যান্য অযথা ক্রীড়াদি দ্বারা সময় ও সম্পদ নষ্ট না করিয়া বরং প্রত্যেক স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটি ও মাদ্রাসাসমূহে বাধ্যতামূলকভাবে প্রচুর মিলিট্রি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হউক। অবসরপ্রাপ্ত নাগরিকদের জন্য এমনভাবে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হউক যাহার পরিণামে দেশের প্রত্যেকটি লোকই সৈনিক হইয়া যাইবে।

এই মিলিট্রি ট্রেনিং দ্বারা যেমন দেহের গঠন হইবে, ঠিক তেমন করে অতি অল্প ব্যয়ে দেশে লাখে লাখে মিলিট্রি সৈন্যের সমাবেশ হইবে। আর দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে এই মিলিট্রি ট্রেনিং গ্রহণ করিলে প্রতি পদে পদে সে আল্লাহ্‌র দরবারে নেকীও পাইবে।

অতি ক্ষুধার সময়, আহারের পর পরই ব্যায়াম প্রভৃতি প্রকট অঙ্গ চালনা করা উচিত নহে। ইহাতে হঠাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিবার আশংকা রহিয়াছে।

মোটকথা, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পরিমিত অঙ্গ চালনা স্বাস্থ্যের পক্ষে অমৃতোপম।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে—নিয়মিতভাবে পরিমিত ব্যায়ামের দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তিও বেশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

শরীরকে স্থূল, জননেন্দ্রীয়কে লৌহদণ্ডের ন্যায় মজবুত এবং রমণ কার্যে অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে নিয়মিতভাবে পরিমিত অঙ্গ চালনার সহিত অল্প ব্যয়ে নিম্নলিখিত নিয়মে উত্তম ছোলা ভক্ষণ করিবে।

হজম শক্তি ও অগ্নিবল অনুযায়ী পরিমাণ নির্ধারণ করত প্রত্যহ সন্ধ্যায় খুব ভাল ছোলা ধুইয়া পরিষ্কার করিবে এবং উহা সিক্ত হইতে পারে এতটা পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতে এক একটি করিয়া দানা ভাল ভাবে চিবাইয়া ভক্ষণ করিবে এবং ঐ ছোলা ভিজান পানিটুকুও শেষে খাঁটি মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। দুধ অপেক্ষা ছোলার ভিতর ৯ গুণ ভিটামিন বেশী।

বিশ্রাম

পরিশ্রমের পর পরিশ্রম করিতে থাকিলে এবং কিছু বিশ্রাম না করিলে শরীর নিস্তেজ ও অকর্মন্য হইয়া পড়ে। কাজেই পরিশ্রমের পর উপযুক্ত বিশ্রাম করা একান্ত দরকার। আমাদের বাংলা দেশের কৃষি কার্যরত ভাইয়েরা প্রত্যহ ভোর হইতে সারাদিন এমন কি প্রায় অর্ধরাত্র পর্যন্ত পরিশ্রমের উপর কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকে। তাঁহারা অজ্ঞতা হেতু একটু বিশ্রামও করে না এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যও ভক্ষণ করে না। ফলে ক্লান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত শরীর নিয়া কাজ চালাইয়া থাকে। কিন্তু বখিলি করিয়া ক্ষয় পূরণের নিমিত্ত ২ টি পয়সা খরচ করিয়া, ভাল খাবার না খাইয়া দিন দিন স্বাস্থ্যহানি করিতেছেন। জাতীয় জীবনে ইহা একটি কেলেঙ্কারীও বটে।

কঠোর পরিশ্রমের পর, ঘর্মাক্ত শরীরে কখনও স্নান করিবে না। খুব ঠাণ্ডা পানি, বরফ পান করিবে না। কারণ ইহাতে হাঁপানি ও নিমুনিয়া হইবার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে। খুব বেশী তৃষ্ণায় কাতর হইলে একটু লেবুর রস বা কোন উপযুক্ত জিনিস দ্বারা গলাটা ভিজাইয়া লইবে।

চিত্ত বিনোদন

মনের আনন্দ দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। আমরা উহা মোটেই অস্বীকার করিতে পারি না। অবশ্য চিত্ত বিনোদনের বিষয় বস্তু ও পন্থা নির্ণয়ে আমরা অনেকের সহিত একমত হইতে পারি না।

কারণ—চিন্তা ও চর্চা করিলে দেখা যায়, কেহ মদ ও মাগিতে আনন্দ পায়। কেহ পরের উপকার ও খোদার এবাদতে পরম আনন্দ পাইয়া থাকে। আবার মানুষ তার মন যে ধরনের গড়িতে ইচ্ছা করে তাহা সে অনায়াসে গড়িতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য মনের আনন্দ। অতএব, ছোটকাল থেকেই আমাদের মনকে গড়িতে হইবে যেন মদ, মাগি, সিনেমা, ড্রামা, বাইসকোপ, থিয়েটার, তাশ, পাশা, নাচ-গান প্রভৃতি সময় নষ্টকারক, অর্থের অপচায়ক এবং চরিত্র কলুষিতকারক কার্যকলাপ শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন করিয়া পরকাল ও ইহকাল নষ্ট না করি। উল্লেখিত বিষয়গুলি যেমন খোদার অমনোনীত কাজ ঠিক তেমন করিয়া দুনিয়াও নষ্ট করিয়া থাকে। ক্ষণেকের জন্য একটু আনন্দ হইলেও উহা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মন ও হৃদয় ভারাক্রান্ত ও অবসাদ হইয়া থাকে। সুতরাং উল্লেখিত ক্ষণস্থায়ী চিত্ত বিনোদক বিষয়গুলি চিরতরে পরিত্যাজ্য।

পক্ষান্তরে আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি নাগরিককে শৈশব থেকেই এমন মন গড়িয়া তুলিতে হইবে যেন পরের একটি উপকার করিয়া ১০ বোতল মদের আনন্দ লাভ করিতে পারে এবং খোদার এবাদত বন্দেগীর ভিতর সমগ্র দুনিয়ার রাজত্বের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে পরোপকারের মধ্যে, খোদার আনুগত্য ও বন্দেগীর মধ্যে এমন চিত্ত বিনোদন হইয়া থাকে যাহার আনন্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। অবসাদ মোটেই নাই। বাস্তবিকই যদি এই ধরনের মন একবার গঠন করা যায় তাহা হইলে দুনিয়া ও আখেরাতে বড়ই আনন্দ এবং আনন্দের স্রোতে দুনিয়ার বহু বিপদ, অশান্তি ভাসিয়া যায়। ফলে সুখে, দুঃখে সর্বক্ষণ আনন্দ হৃদয়ের উপর উদ্ভাসিতই থাকে।

ক্রন্দন

একটিই মাত্র দরখাস্ত যাহা মানুষের দরবারে গৃহীত হইয়া থাকে এবং ঐ দরখাস্তের ফেরৎও নাই। আবার আল্লাহ্‌র দরবারেও উহা কবূল। দরখাস্তকারীর এ দরখাস্তের ভিতর অন্য কোন বিষয়বস্তু না থাকিলেও উহা দ্বারা সমস্ত মনের বাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে। ঐ মহা দরখাস্তটির

নাম হইতেছে ক্রন্দন। বিজ্ঞ ও বহুদর্শী মনীষীগণ বলিয়াছেন, ক্রন্দন দ্বারা স্বাস্থ্যের বিরাট উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।

কচি কচি ছেলেমেয়েরা তাহাদের সুখ অসুখ, শান্তি অশান্তি, ক্ষুধা ও বেদনা প্রভৃতি সর্বাবস্থায় ঐ একটি কান্নার দ্বারা আবেদন করিয়া থাকে এবং উহা লালন পালনকারীদের নিকট এতই গ্রহণযোগ্য যে, শিশুদের মনের চাহিদা সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ করিয়া থাকে। শিশুদের এই কান্নার দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্য মজবুত না হইলেও পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে। কারণ জমি কিছুদিন যাবৎ প্রখর রৌদ্রে শুকাইবার পর বৃষ্টি হইলে যেমন উহা সরস হইয়া বেশী ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। ঠিক তদ্রূপ কান্না দ্বারা হৃদয় শুষ্ক করিবার সঙ্গেই যে আনন্দটুকু মনের উপর উদ্ভাসিত হয় উহা দ্বারা স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

মানুষ সক্ষম ও স্বাবলম্বী হইবার পর সে যখন এই ক্রন্দন লজ্জাকর নিষ্প্রয়োজন করিয়া লয় তখনই তাহার সর্ব প্রকার অসুবিধার ভার বহন করিতে হয়।

অতএব, প্রত্যেকটি নারী ও পুরুষের কর্তব্য হইতেছে তাহারা যেন গভীর রজনীতে নির্জনে একাকী বসিয়া খোদার গযব আযাব স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করে। তাহা হইলে যেমন তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে ঠিক তাহার তদ্রূপভাবে আখেরাতের পথও সুগম হইতে পারে।

নিদ্রা

সুনিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে অমৃতোপম। শুধু ব্যায়াম, বিশ্রাম ও পুষ্টিকর আহার বিহারের দ্বারা দেহ ও মন সতেজ থাকিতে পারে না। উপযুক্ত সুনিদ্রার অভাবে দেল ও দেমাগ দিন দিন দুর্বল ও গরম হইলে নানাবিধ প্রকট ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বিনিদ্রেয় ব্যক্তি পাগল পর্যন্ত হইয়া থাকে।

সুতরাং প্রত্যেকটি নারী ও পুরুষকে দৈনিক ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমাইতে হইবে। ইহার থেকে বেশী ঘুমাইয়া অলস ও অকর্মা হওয়া উচিত নহে। পক্ষান্তরে উহার থেকে কম ঘুমাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করাও সমীচীন হইবে না।

নিদ্রার সময়

ছেলেবেলা হইতেই নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করিতে হইবে। জজ্‌বা কিংবা স্ফূর্তি ও আমোদ-প্রমোদে নিয়ম লঙঘন করিবে না। এক দিনের জন্যও নিয়ম ভঙ্গ আদৌ ভাল নয়। অতএব, বাল্যকাল ও ছাত্রজীবন থেকেই নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস করিয়া লইবে।

সারাটি বৎসর বেহুদা গল্প-গুজব, অশ্লীল আলোচনা ও আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট করা এবং পরীক্ষার সময় সারারাত্রি জাগরণ করিয়া চক্ষু লাল করিয়া পরীক্ষা হলে প্রবেশ করা ঠিক ছাত্র বা তালেবে এল্‌মের কাজ নহে। এরূপ ছেলেদেরকে ঠিক ছাত্র বলাও ঠিক হইবে না। এরা হয়ত পাসও করিবে কিন্তু এল্‌ম্ ও বিদ্যা এদের ভাগ্যে নাই। ছাত্রজীবন বড় মূল্যবান জীবন। জীবন গড়িবার সময়ও বটে। সুতরাং নিয়মানুবর্তিতার সহিত রীতিমত পড়াশুনার কাজ করিবে। ঠিক তদনুরূপ প্রত্যহ রাত্রে ১০ বা ১১টায় ঘুমাইয়া পড়িবে এবং শেষ রাত্রে ৪ টায় গাত্রোত্থান করিয়া ওযূর সহিত আল্লাহ্‌র দরবারে হাজেরী দিবে। ২ বা ৪ রাকা'আত নফল নামায আদায় করত মনের বাসনা আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করিবে। জীবন ভর এ অভ্যাসটি অবশ্যই জারি রাখিবে। ইহা দ্বারা স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতি দিন দিন হইতে থাকিবে।

নিদ্রার নিয়ম

পেশাব পায়খানার বেগ থাকিলে উহার থেকে ফারেগ হইয়া ওযূর সহিত নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুইয়া পড়িবে। اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَحْيٰى وَ اَمُوْتُ পড়িয়া প্রথমতঃ চিৎভাবে শয়ন করিবে অতঃপর ১ বার আয়াতুল কুরছি পড়িবে। তারপর ৩ বার নিম্নোক্ত এস্তেগ্‌ফার পড়িবে।

اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

আয়াতুল কুরছি পড়িবার দরুন সারা রাত্র শয়তান থেকে নিরাপদ থাকিবে। উপরোক্ত এস্তেগফার পড়িলে সমুদ্রের ফেনাসম ছগীরা গোনাহসমূহ মাফ হইয়া যাইবে।

অতঃপর সোজাভাবে ডান পার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করত পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া বাম পার্শ্বে কেব্‌লামুখী হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে। পেশাব-পায়খানার বেগ ধারণ করিয়া চিৎ বা উপুড় হইয়া কখনও ঘুমাইবে না। ইহা স্বাস্থ্য ও শরীঅত বিধান মতে বড়ই খারাব। রাগ একটি ব্যাধিও বটে। বিশেষতঃ রাগান্বিত অবস্থায় ঘুমাইবে না। গভীর নিদ্রার ভিতর অনেক সময় নিদারুণ পিপাসা হইয়া থাকে। কিন্তু সাবধান! তখন কিছুতেই পানি পান করিবে না। ইহা সর্বরোগের একটি আকর বিশেষ। কিছুক্ষণ একটু ধৈর্য ধারণ করিলে পিপাসা বিলীন হইয়া থাকে।

নিদ্রার সময় সাবধানতা

এমন জায়গায় ঘুমাইবে না যেখানে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম নষ্ট হইতে পারে এমন কোন প্রকার কাজ বা কথা হওয়া কিছুতেই উচিত নহে। চাই সে ঘুমন্ত ব্যক্তি ছোট হউক চাই বড় হউক কিংবা বন্ধু-বান্ধবই হউক না কেন কিছুতেই তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে দিবে না। নিদ্রিত ব্যক্তিকে নেহায়েৎ দরকারবশতঃ ডাকিতে হইলে খুব ধীরে ধীরে নম্রস্বরে ডাকিবে। কিংবা হাতে পায়ে বা মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া জাগাইবে। অন্যথায় প্রবল হৃদ রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

নিজের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব বিশেষতঃ চাকর-চাকরাণীকে ঘুম হইতে জাগাইতে নির্দয় লোকেরা তাঁহাদের ঘুমের দিকে স্বাস্থ্যের দিকে মোটেই লক্ষ্য করে না। ইহা বড়ই খারাব, বড়ই নিষ্ঠুরতা।

অনেক সময় নির্ধারিত সময় ঘুম আসে না। এরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ একাকী ভ্রমণ করতঃ হাত-মুখ ধৌত করিয়া ঘুমাইবে।

পানি

দেহ ও প্রাণ রক্ষার জন্য পানি একটি নেহায়েৎ প্রয়োজনীয় বস্তু। বিশুদ্ধ পানি দ্বারা দেহের ও জীবনের মহা উপকার সাধিত হয়। পক্ষান্তরে দূষিত পানি দ্বারা নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মিতে পারে। অতএব, সর্বক্ষণের জন্য দূষিত পানি পরিত্যাগ করিবে। নির্মল পানি যদিও স্বাস্থ্যের জন্য মহা উপকারী কিন্তু আহারের পূর্বে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেশী পানি পান করিলে পাণ্ডব রোগ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। অবশ্য সূর্য উদয়ের পূর্বে সাধ্যানুযায়ী পানি পান করিলে কোন রোগের আশঙ্কা নাই বরং উহাতে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয় এবং সালসার কাজ করিয়া থাকে।

আহারের সময় মাঝে মাঝে একটু একটু পানি পান করিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। আহারান্তে বেশী পানি পান করিলে হজম শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আহার শেষ করিয়া কোন মতে মুখ ও গলাটা

পরিষ্কার করিবে। আধ ঘণ্টা পর পরিমিত পানি পান করিবে। উক্ত নিয়মটি জঠর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপকারী।

অধঃগতি

একদল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত বলিয়াছেনঃ প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু ও ক্ষরিত শুক্র বেগ ধারণ করা বড়ই কুৎসিত অভ্যাস।

পায়খানার বেগ ধারণ করিলে এবং অধঃবায়ু গতি রোধ করিলে বায়ু কর্তৃক মল ছিন্নভিন্ন হইয়া নাড়ীর পেঁচ ও সন্ধিস্থলে আট্‌কাইয়া অনেক সময় নাড়ীর ভাজ উল্‌টাইয়া গিয়া নাড়ীতে পেঁচ পড়িয়া থাকে। দূষিত মল নাড়ীর সন্ধিতে আট্‌কিয়া থাকার দরুন অনেক সময় নাড়ীতে ক্ষত; এমন কি অনেকের নাড়ী পচিয়া থাকে।

প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয়ে প্রস্রাবের তলানি জমিয়া পাথরী হইয়া থাকে।

শুক্র গতি রোধ করিলে ক্ষরিত শুক্র জমিয়া শুক্রশ্মরী বা পাথরী হইয়া প্রাণ নাশের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

অতএব, কস্মিনকালেও প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু এবং শুক্র বেগ ধারণ করিবে না। স্বাভাবিক-ভাবে যাহা বাহির হইতে চায় তাহা বাহির হইতে দিবে। জবরদস্তি তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিবে না।

সংযম

সংযম ব্যতিরেকে আত্মা এবং মানবতার উন্নতি যেমন অসম্ভব, তেমনিভাবে সংযম ছাড়া স্বাস্থ্য রক্ষাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বাস্থ্যহীনতা দেখিলে বাস্তবিকই মর্মাহত হইতে হয়। রক্ত মাংস শূন্য কঙ্কালসার জরাজীর্ণ দেহ, শৌর্যবীর্য উদ্যমহীন মন, লাবণ্য হারা মলিন মুখ দেখিতে মর্মান্তিক বেদনায় চিন্তাশীল সুধী মাত্রেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। স্বাস্থ্য ভাল না হইলে এবং মন ও মেজাজ সুস্থ না থাকিলে হাজার সাধনা করিয়াও সৎস্বভাব হাছিল করা এবং উহা রক্ষাকরা কিছুতেই সম্ভব নহে। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে খিটখিটে মেজাজ এবং খিটখিটে মেজাজের কারণে অশান্তিময় সংসার এবং অশান্তিময় পরিবারের সমষ্টিতে এক বিভীষিকাময় দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতির এই চরম দুরবস্থার আসল কারণ এবং উহার প্রতিকারের পথ কি হইতে পারে? সে জন্য দীর্ঘ কয়েকটি বৎসর বিভিন্ন জায়গায় সফর, বড় বড় সমাজ চিন্তাবিদদের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা, যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের লিখনি অধ্যয়ন এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ও বহু ডাক্তার হেকীমদের শেফাখানার; এই বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, জাতির স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণ ১। আহারের অবিচার ২। অবৈধ উপায়ে বীর্যপাত ও বৈধ উপায়ে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়। খাদ্যদ্রব্যাদি হজমের পর পাকাশয়ের রস যথাক্রমে রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা এবং সর্বশেষে শুক্র পয়দা হইয়া থাকে। এই শুক্র দ্বারাই স্বাস্থ্যের গঠন ও রক্ষণ হইয়া থাকে। শুক্রের প্রাচুর্যে স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতি সাধিত হয়। পক্ষান্তরে শুক্র তারল্য ও শুক্রাল্পতা হইলে দেহ ক্ষীণ ও মন নিস্তেজ হইয়া যায়। আবার মজার ব্যাপার হইতেছে এই মূল্যবান বস্তুটি বাহির হইবার জন্য সতত প্রস্তুত এবং বাহির হইবার সময় বড়ই আনন্দ। কিন্তু উহার পরিণাম নিরানন্দই বটে। ক্ষণস্থায়ী অতি সামান্য আনন্দ উপভোগের জন্য শুক্র নষ্ট করিয়া ভবিষ্যৎ অন্ধকার করা কিছুতেই উচিত নহে। আবু মোসলেম বৎসরে মাত্র একবারই স্ত্রী গমন করিতেন এবং বলিতেন, উহা একটি পাগলামীই বটে; বৎসরে একবার পাগলামী করাই যথেষ্ট।

মোম, তাপ না পাইলে এবং আগুনের সহিত যোগাযোগ না পাইলে এবং আগুনের সংস্পর্শে না থাকিলে কিছুতেই উহা নষ্ট হইবে না, গলিবে না। দিয়াশলাইয়ের ভিতরকার প্রত্যেকটি কাঠির সহিত বারুদ থাকে। খাপটির দুই পার্শ্বেও বারুদ রহিয়াছে কিন্তু কোন দিন তাহারা উত্তেজিত হয় না। কিন্তু যখনই তাহাদের মিলন হয় একটু ঘর্ষণও হয় তখনই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া দিতে পারে।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির রহস্য, জীব-জানওয়ারের মধ্যে যৌন উত্তেজনা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাত্র। কিন্তু মানুষের যৌন উত্তেজনার কোন নির্ধারিত সময় নাই। কাজেই মানুষ, নারী ও পুরুষ সংযমী না হইলে কি অঘটন ঘটিতে পারে সুধী মাত্রেই উহা অবগত। দুর্দম ঘুমন্ত যৌন শক্তি যৌবনের প্রারম্ভে অতি প্রবল হইয়া থাকে। এই সময়ে অশ্লীল, উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার ছবি দর্শন, নানা প্রকার কুৎসিত নাটক ও নভেল অধ্যয়ন এবং যুবক-যুবতীর অবাধ মিলন, নারীদের খোলাখুলী ভ্রমণ এবং কো-এডুকেশন দ্বারা ঐ ঘুমন্ত জননশক্তি এত উৎকট, প্রবল ও উত্তেজিত হইয়া থাকে যে, তরুণ যুবক-যুবতী অধীর ও অস্থির হইয়া পড়ে। সিনেমা ও ড্রামা নাচ-গান প্রভৃতি কর্তৃক তাহারা আর নিজকে কন্ট্রোল করিতে পারে না। বড় পরিতাপের বিষয় এই সমুদয় যৌন উত্তেজক ও উচ্ছৃঙ্খল কার্যাবলী এত বহুল পরিমাণে চালু করিয়া শেষ পর্যন্ত বেশ্যালয়ও খোলা রাখা হইয়াছে। ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী কর্তৃক নবাগত যুবক ও যুবতী যেমন তাহাদের আখেরাত বরবাদ করিতেছে তেমন করে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ইহ জগতের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। বেশ্যাগমন হেতু অনেকের জনমের মত গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি রোগ প্রকট হইয়া পড়ে। এই রোগীর সংখ্যাও আমাদের বাংলাদেশে নগণ্য নহে।

যৌবনের শ্রাবণ মাস আগত। ষোলকলায় পূর্ণশশী নবযুগের মুখে লাবণ্যের চ্ছটা উদ্ভাসিত। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার সামগ্রীসমূহ পূর্ণ আয়োজিত। অসংযত যুবক হঠাৎ কোন দুশ্চরিত্র লোকের হাতে ধরা পড়িয়া পুংমৈথুন ও হস্তমৈথুন শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে এবং ক্ষণিকের জন্য কিছু আনন্দভোগের নিমিত্ত তাহারা অপকর্ম দুইটি করিয়া জীবন বরবাদ করিতে থাকে। অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। নানাবিধ পেটের পীড়া, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, শুক্রাল্পতা, লিঙ্গবক্রতা এমন কি শেষ পর্যন্ত অনেকে দূরারোগ্য ধ্বজভঙ্গ রোগে ভুগিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত লজ্জায় অনেকে আত্মহত্যাও করিয়া জাহান্নামী হইয়া থাকে। হস্তমৈথুন অতি জঘন্য কুৎসিত অভ্যাস। ইহাতে দেহ শুক্রশূন্য হইয়া যায়। লিঙ্গের আভ্যন্তরীণ শিরা রগ ছিড়িয়া যাওয়ার দরুন সম্যক রক্ত চলাচল করিতে পারে না। ফলে গোড়া চিকন ও মাথা মোটা হইয়া অকেজো হইয়া থাকে।

হস্তমৈথুন ও পুংমৈথুন এত বড় পাপ যে, ঐ পাপাচারের দরুন হযরত লূত নবীর কওমের আবাস স্থান ধ্বংস করিয়া ভূমধ্যসাগরে[১] পরিণত করা হইয়াছে। কোরআন ও হাদীস মতে উহা সম্পূর্ণ হারাম। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে অবৈধ, মহাপাপ।

সমাধান

যাদের হাতে ক্ষমতা, যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের নিজেদের প্রথম যৌবনের তাড়না ভুলিয়া গিয়া কোন স্কীম করিলে তাহা চলিবে না। সমাজ দেহের রোগ ধরিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া স্কীম নিতে হইবে।

টিকাঃ ১ মতান্তরে মরুসাগর বা মৃতসাগর।

জাতির এ চরম দুর্দশা দূর করিতে হইলে অশ্লীল নাটক, নভেল, সিনেমা, ড্রামা, ছবি, উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ কুৎসিত ছবি, মেয়েদের নাচ বলড্যাঞ্চ, বেশ্যালয় একবারেই বন্ধ করিতে হইবে। নতুবা রোগের কারণ জীবিত রাখিয়া কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া সমাজদেহ রোগমুক্ত করা সম্ভবই নহে।

যৌন ও জনন শক্তিকে উত্তেজিত না করিয়া উহা সুস্থ ও শান্ত রাখিবার জন্য উপরোক্ত ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী বন্ধ করিতেই হইবে।

প্রত্যেক মহল্লায় ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়া মহল্লার প্রত্যেকটি ছাত্রকে বাধ্যতামূলকভাবে ঐ ছাত্রাবাসে থাকিতে হইবে।

সরলতা, সচ্চরিত্র, নিয়মানুবর্তিতা উদারতা সংযম প্রভৃতি ইসলামী নৈতিক শিক্ষা এবং ছাত্রদের সংরক্ষণের জন্য বহু দর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, চিন্তাবিদ, সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষ নিযুক্ত করিতে হইবে।

আমাদের সরকারী ও বেসরকারী সর্বপ্রকার চেষ্টা এজন্য খুব দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিলে আশা করা যায় অতি শীঘ্রই এতদ্দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং আদর্শ সমাজ গড়িয়া উঠিবে। আমরা এতদ্দেশের সরকারী বেসরকারী সমস্ত জ্ঞানীদের এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

সাবধানতা

সংযম ও সাবধানতা অবলম্বনের পর যদি কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তবে বিজ্ঞচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে অবহেলা করিবে না।

আমাদের দেশে তথা সারা বিশ্বে নানা প্রকার চিকিৎসা চালু আছে। হেকীম, ডাক্তার, কবিরাজ ও রুহানী চিকিৎসকের অভাব নাই। প্রত্যেকেই নিজস্ব চিকিৎসা বিজ্ঞান বিধানমতে চিকিৎসা করিবেন। অবশ্য চিকিৎসক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী হওয়া দরকার। সর্বপ্রকার চিকিৎসার মধ্যে (১) রোগীর কুপথ্য হইতে বিরত থাকিতেই হইবে। (২) প্রথমে নিয়ম পালন ও সংযমের দ্বারা রোগের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবে। (৩) সংযম ও নিয়ম পালন দ্বারা রোগ বিদূরিত না হইলে প্রথমতঃ পাচন ও বনজ পদার্থে গঠিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। (৪) উহাতে রোগারোগ্য না হইলে খনিজ ও সামুদ্রিক প্রভৃতি জমাদাত দ্বারা গঠিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে ক্ষতির আশঙ্কাও রহিয়াছে। বেহেশ্‌তী জেওর নবম খণ্ডের অনুবাদের সহিত কিছু বিভিন্ন ধরনের তদ্‌বীর ও ঔষধ উল্লেখ করিতে এজন্য বাধ্য হইয়াছি যে, অধুনা চিকিৎসকগণ সমস্ত রোগগুলিকে জড়ব্যাধি ধরিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কিন্তু বহু জায়গায় অকৃতকার্য হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে মূর্খ গ্রাম্য বে-শরা পীর ফকির ও ঠাকুরগুলি প্রায় সবগুলিকে উপরিব্যাধি ও যাদু টোনা বলিয়া কুফরী তাবীজ কবজ সূতা লতা দিয়া অধিকাংশ স্থানে সুচিকিৎসার অন্তরায় ঘটাইয়া প্রাণ নাশের কারণ হইতেছে।

অথচ সবগুলি জড় ব্যাধি নয় এবং সবগুলি উপরি ব্যাধিও নয়। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সর্বদা পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া লইবেন। রোগ নির্ণয় করাটাই কঠিন।

মানবদেহে কতকগুলি রোগ হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিকই জড়ব্যাধি যথা—কলেরা, বসন্ত, জ্বর প্রভৃতি।

অন্য আর কতকগুলি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহা সত্যই উপরিব্যাধি যথা—জীন, যাদু, বদনজর ইত্যাদি। উপরি দোষ ও ব্যাধি অর্থে আভ্যন্তরীণ যাহা জড়ব্যাধি নয়।

কখনও কখনও উপরিব্যাধির পরিণামে জড়ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন জীনের বহু রোগী শেষ পর্যন্ত শূল ও উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, অনেক সময় জীনের কারণে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যাদুর দ্বারা কলেরা, জ্বর প্রভৃতি জড়ব্যাধির আক্রমণ হইয়া থাকে।

অতএব, সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসকের সন্দেহ হইলে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। আমরা রোগ নির্ণয়ের জন্য নিম্নে একটি তদ্‌বীর উল্লেখ করিতেছি।

রোগীকে সামনে রাখিবে। স্ত্রীলোক হইলে কোন মাহ্‌রাম দ্বারা পরীক্ষা করাইবে।

আয়াতুলকুরছি, সূরা-ফাতেহা, কাফেরুন, এখলাছ, ফালাক, নাছ—এই প্রত্যেকটি ৭ বার করিয়া পড়িয়া রোগীর গায়ে ৭ বার ফুক দিবে। শেষ বারে ২/৩ বার রোগীকে দম দিয়া ২/১ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবে। জীনের দোষ হইলে রোগ খুব বাড়িয়া যাইবে। তখন জীনের চিকিৎসার সহিত শারীরিক ব্যাধিরও চিকিৎসা করিবে।

পূর্বাপেক্ষা কিছু কমিয়া গেলে এবং পূর্ণ আরোগ্য না হইলে বুঝিতে হইবে যাদু। তখন যাদুর চিকিৎসার সহিত দরকার হইলে শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসাও করিবে।

রোগের অবস্থা পূর্ববৎই থাকিলে উহা জড়ব্যাধি ধরিয়া জড়ব্যাধির চিকিৎসা করিবে।

ازمجربات عزيزيه

রোগ ছাড়া অনেক সময় অসুস্থ বোধ করিলে এবং বহুদর্শী চেহারা দেখিয়া বদ-নজর সাব্যস্ত করিলে বদ-নজর নষ্ট করিবার তদবীর করিবে। আমরা প্রত্যেকটি রোগের চিকিৎসা স্ব স্ব স্থানে করিব।

বিশেষ সতর্কীকরণ

১। ছোট খাট মা'মুলী অসুস্থতা এবং মা'মুলী রোগের চিকিৎসা নিয়ম পালন দ্বারা করিবে। চিকিৎসার্থে সর্বদা দেশজ ও বনজ পদার্থের গঠিত ঔষধ দ্বারাই করাইবে ও করিবে। সাধারণ অসুখে কখনও বড় ঔষধ ব্যবহার ভাল নয়। উহাতে অনেক সময় উপকারের স্থলে অপকার হইয়া থাকে এবং বড় ঔষধে শেষ পর্যন্ত কাজ না করিলে তারপর ছোট ছোট ঔষধ আর কাজ করিতে পারে না।

২। রোগ যত বড়ই কঠিন হউক না কেন রোগীকে কখনও হতাশ বা চিন্তাযুক্ত হইতে দিবে না। সেবা ও খেদমতগারদেরও খুব বেশী ব্যতিব্যস্ত হইবার কারণ নাই। পিতামাতার কখনও কাতর এবং খুব অধৈর্য হইতে নাই। অবশ্য সেবা ও যত্নে ত্রুটি করিতেও নাই। আমাদের বাংলা দেশে অর্থলোলুপ বহু চিকিৎসক টাকার লোভে রোগীকে এবং রোগীর মাতা-পিতা, ভাই-বোনদেরকে ভীত করিয়া থাকে। সাধারণ অসুখকেও তাহারা বিপদজনক বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা বড়ই মারাত্মক কথা, এ ধরনের অর্থলোভী চিকিৎসক ডাক্তার কবিরাজ ও হেকীমদেরকে কখনও ডাকিতে নাই। যাহারা চিকিৎসাকে শুধুমাত্র ব্যবসায় হিসাবে অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে এরূপ দয়ামায়াহীন চিকিৎসকের স্থান ৩ দিনের জন্যও অন্ততঃপক্ষে এদেশে না হওয়া উচিত। জীবনের দায়িত্ব লইয়া দয়ামায়ার সহিত যাহারা জাতির সেবা, জনগণের সেবার মত লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাদিগকেই ডাকিবে। ইহাদের দিকে আল্লাহ্‌র মদদও দ্রুত আসিতে থাকে।

কিন্তু সাবধান, কখনও চিকিৎসককে অসন্তুষ্ট করিবে না। ব্যবহারের দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবেই। পরন্তু টাকা পয়সার দ্বারাও তাহাকে সাধ্যানুযায়ী সন্তুষ্ট অবশ্যই করিবে। চিকিৎসকদেরকে ফাঁকি দেওয়া জাতি ধ্বংস করার সমঅর্থ বটে। ঘন ঘন চিকিৎসকও বদলাইবে না।

৩। ঘন ঘন জুলাপ ব্যবহার করিতে ও করাইতে নাই। কারণ ইহাতে নাড়ী দুর্বল হইয়া নানা রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। একান্ত জুলাপের প্রয়োজন হইলে সময়, স্বাস্থ্য ও জুলাপের ঔষধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পেট পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

৪। কোন ঔষধ দীর্ঘদিন ব্যবহার করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে একটু বাদ দিবে কিংবা বদলাইয়া ততগুণ বিশিষ্ট অন্য কোন ঔষধ সেবন করিবে। নতুবা একটি ঔষধ অনবরত ব্যবহার করিলে ইহা খাদ্যে পরিণত হইয়া যায় এবং রোগারোগ্য করিতে অক্ষম থাকিয়া যায়।

৫। ঔষধ তদবীর বর্ণিত নিয়ম ও পরিমাণ মত সঠিকভাবে প্রস্তুত করিবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়াদি পূর্ণ আয়ত্তের পর বহু অভিজ্ঞতা ছাড়া পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিবে না।

৬। রোগী, চিকিৎসক ও অভিভাবকের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। রোগারোগ্যের ও ফলাফলের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন। চিকিৎসক ও ঔষধ অছিলামাত্র। অতএব, খোদার দরবারে সর্বদা দো'আও করিতে থাকিবে। মুসলমান বিজ্ঞচিকিৎসকেরা রোগী দেখিতে ও ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় নিম্নোক্ত আয়াতটিও পড়িয়া উহার মর্ম উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا اِلَّامَاعَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

শিরঃ পীড়া

শিরঃ পীড়া নানা প্রকার হইয়া থাকে। সচরাচর যেসব শির রোগে মানুষ আক্রান্ত হইয়া থাকে, উহার কিঞ্চিৎ বিবরণীসহ চিকিৎসার উল্লেখ করা হইতেছে।

১। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া বাহ্য না হইলে মাথা বেদনা হইয়া থাকে, উহার প্রতিকারার্থে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া প্রত্যহ নিয়মিত পায়খানা হয়। ১ গ্লাস মিশ্রির শরবতের মধ্যে সমপরিমাণ ইসুপগুলের ভুসি ও তোখ্‌মা দানা সারারাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। প্রত্যুষে খালিপেটে উহা সেবন করিবে। ইহাতে পাকাশয়ের তীক্ষ্ণাগ্নী নিবারিত হইয়া সমস্ত দেহ সুস্থ হইয়া থাকে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয়, স্বপ্নদোষ নিবারণ হয়, মস্তিষ্ক শীতল ও ঠাণ্ডা হইয়া দিন দিন স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে থাকে। অবশ্য মাঝে মাঝে দুই চারি দিন উহা পান করা উচিত। নতুবা শরীর ফুলিবারও আশঙ্কা আছে।

২। অতিরিক্ত তরল দাস্ত, জঠর পীড়ার কারণে মস্তিষ্ক দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কাহারও মাথা বেদনাও হয়। উহার প্রতিকারার্থে হজমীকারক ঔষধ ব্যবহার অবশ্যই করিবে। হজমীকারক ঔষধ জঠর পীড়া অধ্যায়ে দেখিয়া লইবে।

৩। অসাবধানতার ফলে অনেক সময় মস্তিষ্কে শ্লেষ্মা জমিয়া এবং উহা দূষিত হইয়া থাকে। উহা সম্যক বাহির হইতে না পারিলে মাথায় প্রকট যন্ত্রণা হইলে এমন ব্যবস্থা করিবে যাহাতে দূষিত শ্লেষ্মা বাহির হইয়া যায়।

(ক) মেন্দিপাতা বাটিয়া প্রত্যহ মাথায় প্রলেপ দিলে দূষিত শ্লেষ্মা বাহির হইয়া থাকে।

(খ) ভাল সরিষার তৈল মাথায় উত্তমরূপে মালিশ করত ঠাণ্ডা পানি বেশ করিয়া ঢালিবে। ইহাতে দূষিত শ্লেষ্মা বাহির হইয়া যাইবে।

৪। মেয়েদের ঋতু বন্ধ ও স্রাব পরিষ্কার না হইবার দরুন তীব্র শির বেদনা হইয়া থাকে। উহার প্রতিকারের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিবে যাহাতে নিয়মিতভাবে স্রাব হইতে থাকে। ঋতু বন্ধ অধ্যায় দেখিয়া লইবে।

৫। অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হেতু প্রায়ই মাথা ধরা মাথা গরম এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিয়া থাকে। আস্তে আস্তে শরীর ক্ষীণ হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কখনও বিলম্ব করিবে না। বিজ্ঞ হেকীম বা কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। শুক্রক্ষয়ের কারণ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা প্রথমেই করিবে। অতঃপর ক্ষয় নিবারণার্থে চন্দনাসব ও বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস প্রয়োগ করিবে। উক্ত ঔষধের সঙ্গে যোগেন্দ্র রসও ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

যোগেন্দ্ররস প্রস্তুত প্রণালী—রসসিন্দুর ১ তোলা, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, বঙ্গ প্রত্যেক ।।০ তোলা, ঘৃত কুমারীর রসে মর্দন করিয়া এরণ্ড পত্রে বেষ্টনপূর্বক ধান্য রাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে। ২ রতি প্রমাণ বটি। অনুপান—বাতের প্রকোপে ত্রিফলার পানি ও মধু। অথবা মাখন ও মিশ্রির সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া প্রাতে ১টি বড়ী সেবন করিবে। রাত্রে দুধ পান করিবে।

৬। অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য ও স্নায়বিক দৌর্বল্যের কারণে রোগী অযথা কথাবার্তা বলিতে থাকে। উহার প্রতিকারার্থে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিতে ধারোষ্ণ দুধ প্রত্যহ সকালে পান করিতে দিবে, কিংবা হেকীমী ঔষধ اطريفل زمانى ব্যবহার করাইবে। অথবা কবিরাজী ঔষধ অভয়া মোদক দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইবে। আস্তে আস্তে শরীর সুস্থ সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবে। মাথায় ঠাণ্ডা কোন তৈল যেমন, কদুর তৈল, মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ব্যবহার করিতে দিবে। রোগীকে নিয়মিত সুনিদ্রার ব্যবস্থা করিবে।

মাথা বেদনার চিকিৎসা

১। কালজীরা বাটিয়া উহা জয়তুনের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে উহা ছাঁকিয়া ঐ তৈল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কয়েক ফোঁটা নাকের ভিতর দিলে মাথা বেদনার উপশম হইয়া থাকে।

২। পুদীনা বাটিয়া সামান্য পানিতে ভাল গরম করিয়া ললাটে (কপালে) প্রলেপ দিলে মাথা বেদনা বিদূরিত হয়।

৩। মোরগের পিত্ত মাথায় মালিশ করিলে মাথা বেদনার বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

তদ্‌বীর

৪। যাবতীয় মাথা ধরা, মাথা বেদনা, অর্ধ ভেদক মাথা ধরায় নিম্নোক্ত তাবীজটি বিশেষ উপকারী। সাদা কাগজে লিখিয়া রোগীর মাথায় ধারণ করিতে দিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

তাবীজ এইঃ 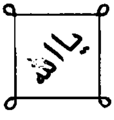

৫। ডান হাতের মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা রোগীর মাথা এবং কপালের বাম পার্শ্বের রগ এবং ঐ ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা রোগীর মাথার ডান দিকের রগ চিপিয়া ধরিয়া নিম্নোক্ত আয়াত পড়িবে। পড়া শেষ হইলে মাথায় দম দিবে এবং এরূপ ৩ বার করিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَاللهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

اَللهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ـ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ـ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَاغَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ـ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ـ يَهْدِى اللهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ـ فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ ـ اِرْتَفِعْ اَيُّهَا الْوَجْعُ بِلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ○

৬। নিম্নলিখিত আয়াত ও দো'আ লিখিয়া তাবিজরূপে মাথায় ধারণ করিতে দিবে। খোদা চাহে ত সর্বপ্রকার মাথা বেদনা রোগ আরগ্য হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ـ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا ـ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ـ لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَايُنْزِفُوْنَ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ○

৭। বসা অবস্থায় কিংবা শায়িত অবস্থায় ছিল, কিন্তু দাঁড়াইতে হঠাৎ অন্ধকার দর্শন করিলে বা পড়িয়া গেলে রোগীকে বমন করাইবে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ দৈনিক সকালে পান করিতে দিবে। যোগেন্দ্ররস এরূপ অবস্থায়ও উপকারী।

৮। উক্ত রোগে নিম্নলিখিত তাবিজটি লিখিয়া মাথায় ধারণ করিতে দিবে—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ لَّا يَنَامُ وَلَايَخَافُ وَلَايَمُوْتُ وَلَايَغْفُلُ اِشْفِ ضُرَّ عَبْدِكَ هٰذَا فَاِنَّهٗ يَخَافُ وَيَنَامُ وَيَمُوْتُ وَيَغْفُلُ اِشْفِهٖ مِنْ كُلِّ ضُرٍّ وَّ عِلَّةٍ وَّ دَاۤءٍ وَّاَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اَللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّغَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

প্রতিশ্যায় সর্দি

কারণ—শীতল পানি, শীত, তুষার, রোদন, নাক দিয়া ধূলি ও ধূম প্রবেশ, দিবা-নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অজীর্ণ কর্তৃক মস্তকের কফ ঘনীভূত হইয়া সর্দিরোগ উৎপাদন করে।

লক্ষণ—সর্দি হইবার পূর্বে মাথাভার, স্তব্ধতা, অঙ্গকুট্টন, রোমাঞ্চ, মুখ ও নাক দিয়া পানিস্রাব হইয়া থাকে। সঙ্গে জ্বর হইতে থাকে। হাঁচি, মাথা বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—মরিচ ও শুঁঠের সহিত দধি ও অম্ল ভোজন করিলে নূতন সর্দি বিদূরিত হয়। নূতন সর্দিতে কচি তেঁতুল পত্র সিদ্ধ করিয়া ঐ পানি পান করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

আহারের পরক্ষণেই সুসিদ্ধ অত্যুষ্ণ মাষকলায় লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার ও দীর্ঘকালের সর্দি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপুল, সাজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ এই সমুদয়ের নস্য লইলে সর্দি বিনষ্ট হয়।

শুঁঠ, মরিচ ও পিপুল এবং চিতামূল, তালীশ পত্র, তেঁতুল, অম্ল বেতশ, চৈ ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ তোলা। এলাচ, দারুচিনি ও তেজপত্র প্রত্যেক ২ মাষা; পুরাতন গুড় নয় তোলা ছয় মাষা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া উষ্ণ পানিসহ সেবন করিলে সর্দি, কাশি শ্বাস প্রশমিত হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

তদবীর

সর্বদা সর্দি লাগিয়াই থাকিলে সরিষার তৈল ও পানিতে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। সকাল ও দুপুরে গোসলের পূর্বে ঐ তৈল উত্তমরূপে শরীর ও মাথায় মালিশ করত পড়া পানি দিয়া স্নান করিবে। ইহাতে দূষিত কফ তরল হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। ৩৩ আয়াত জীনের রোগ চিকিৎসা অধ্যায়ে দেখিয়া লইবে।

সর্দি সর্বদা লাগিয়া থাকিলে এবং উহা শুকাইয়া গেলে ক্ষতির কোন আশঙ্কাও না থাকিলে এশার পর সহ্যমত গরম পানিতে ১ ঘন্টা দুই পা ভিজাইয়া রাখিলে সর্দি শুকাইতে বাধ্য।

উন্মাদ

সাধারণতঃ উহার মূল কারণ—অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, শুক্রহীনতা, দীর্ঘদিন প্রবল জঠর রোগ, চিরকোষ্ঠবদ্ধতা, সীমাহীন মস্তিষ্কচালনা, নিরন্তন চিন্তা, দুশ্চিন্তা, স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ এবং অতিরিক্ত শোকের দরুন কিংবা মাথা বা মস্তিষ্কে আঘাতের কারণ হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উন্মাদ রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ উহার আসল কারণ নির্ণয় করিবে। প্রচণ্ড আঘাত হেতু উন্মাদ রোগ উপস্থিত হইলে উহার চিকিৎসা প্রায় দুঃসাধ্য।

কোষ্ঠাকাঠিন্য কিংবা জঠর রোগের কারণে উন্মাদের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে দেখিবে পেটে দূষিত মল থাকিয়া গিয়াছে কি না? দূষিত মল থাকিলে অভয়া মোদকের দ্বারা ১ বার জুলাপ দিয়া অগ্নিবল অনুযায়ী, স্বাস্থ্যোপযোগী পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা রাখিয়া ঔষধ ও তদবীর ব্যবহার করাইবে। যাহাতে যথারীতি হজম ও নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় হেতু রোগের উৎপত্তি হইলে ঠাণ্ডা অথচ শুক্রবর্ধক ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার করাইবে।

অতিরিক্ত চিন্তা ও মস্তিষ্ক চালনা কর্তৃক উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চিন্তা পরিশ্রম কমাইয়া দিতেই হইবে। উপযুক্ত বিশ্রাম ও জায়েয কিছু প্রমোদের ব্যবস্থাও থাকা দরকার। উপযুক্ত পথ্য

ও আহারের ব্যবস্থার সহিত যোগেন্দ্র রস ব্যবহার করিলে সুফল হইবে। ঠাণ্ডা তৈলাদি হিমসাগর, মধ্যম নারায়ণ, মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ইত্যাদি মাথায় ব্যবহার করিতে দিবে।

শোকাগ্নির দরুনও উন্মাদের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু আসলে সেইরূপ ব্যাধি নয়। তবে মনস্তত্ত্বের দ্বারাই রোগীর মন প্রফুল্লিত করিতে হইবে। মিষ্টান্ন ও শিরনী সেবন করিতে দিবে। বুদ্ধিমান ও ভাল লোকের সংসর্গে থাকিতে দিবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আমোদ স্ফূর্তিস্থলে অধিক সময় কাটাইতে দিবে।

সন্তান প্রসবের পর স্রাব বন্ধ থাকিলে কিংবা মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার দরুন উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ; ছটাক সরিষার তৈলের মধ্যে অর্ধ তোলা কর্পূর মিশ্রিত করিবে এবং ঐ তৈলে—

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًاوَّنَذِيْرًا

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَ رْضِ وَلَافِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

৩ বার পড়িয়া দম দিবে। এই তৈল দৈনিক ৩/৪ বার তল পেটে ও কোমরে উত্তমরূপে মালিশ করিবে। বাধক বেদনায়ও এই তৈল ব্যবহার করিবে এবং জরায়ু সোজা নিম্নলিখিত তাবিজটি ধারণ করিতে দিবে। খোদা চাহে ত মুশকিল আসান হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَاعَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَايَشْكُرُوْنَ ـ اَوَلَمْ يَرَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَ رْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ اَفَلَايُؤْمِنُوْنَ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍوَّاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

উন্মাদ রোগে রস প্রয়োগ

অভয়া মোদক—পাকাশয়স্থিত দূষিত মল বাহির করিতে প্রথম দিন শেষ রাত্রে অভয়া মোদকের একটি গুলি সেবন করিবে এবং খুব করিয়া ঠাণ্ডা পানি পান করিবে। ইহাতে যথাযথ ভেদ হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে তো ভালই, নতুবা একবার একটু গরম পানি পান করিলে দূষিত মল বাহির হইয়া যাইবে। পেট পরিষ্কার হইয়া গেলে কিছুটা চিনি বা মিশ্রির শরবৎ পান করিলে আর দাস্ত হইবে না। এই জুলাপের ঔষধটার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা সেবনের পর যতই দাস্ত হউক কিন্তু রোগী দুর্বল হইবে না। অতঃপর প্রতিদিন প্রাতে ঠাণ্ডা পানিসহ পান করিলে ইহা দ্বারা উন্মাদ, বিষম জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কামলা, কাশ, ভগন্দর, হৃদরোগ, কুষ্ঠ রোগ, গুল্ম, অর্শ, গলগণ্ড, ভ্রম, বিদাহ, প্লীহা, মেহ, যক্ষ্মা, চক্ষুরোগ, বাতরোগ, উদরাধ্মান, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাথরী এবং পিঠ ও পার্শ্ব, উরু, কটী ও উদর বেদনা বিনষ্ট হয়।

অভয়া মোদক প্রস্তুত প্রণালী—হরিতকী, গোল মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুল মূল, দারুচিনি তেজপত্র এবং মুতা ইহাদের চূর্ণ এক এক ভাগ। দন্তিচূর্ণ তিনভাগ। তেউড়িচূর্ণ আট ভাগ এবং চিনি ছয় ভাগ। ইহাদের চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিবে। শ্বাঙ্গধর আমার বহু পরিক্ষিত।

ব্রাহ্মী-শাকের রস ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উন্মাদ রোগে উপকার হয়।

উন্মাদ রোগে বায়ু খুব প্রকুপিতই থাকে। কাজেই চতুর্মুখ, চিন্তামণি চতুর্মুখ, যোগেন্দ্র-রস, মকরধ্বজ তদভাবে রসসিন্দুর। এই সকল ঔষধ উন্মাদ রোগে প্রশস্ত। মধুতে মাখিয়া ত্রিফলার পানি, শত মূলীর রস, তুলসী পাতার রস বা পানের রসসহ সেব্য। চৈতসাদি ঘৃতও উন্মাদের মহৌষধ।

চিন্তামনি চতুর্মুখ প্রস্তুতপ্রণালী—রসসিন্দুর দুই তোলা, লৌহ এক তোলা, অভ্র একতোলা, স্বর্ণ অর্ধতোলা। ঘৃত কুমারীর রসে মর্দন ও এরণ্ড পত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্য রাশির মধ্যে তিনদিন রাখিবে। পরে উহা বাহির করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

চৈতস ঘৃত প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত চারি সের। ক্বাথার্থ—বেল, শ্যোনা, পারুল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি, কন্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, এরণ্ড মূল, তৈউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্বামূল (শোচমুখী) Sarseireria Beylanica ও শতমূলী প্রত্যেকটি ১৬ তোলা; পাকের পানি ৬৪ সের, শেষ ষোল সের; কল্কার্থ—রাখাল শসার মূল, ত্রিফলা, রেনুক, Piper aurantia cum দেবদারু, এলবালুক (হিন্দুস্থানে ইহাকে এলুবা ও এলুয়া বলে) শাল পানি, তগর পাদুকা, হরিদ্রা,দারু হরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীল সুদি, এলাচ, মতিষ্ঠা, দন্তিমূল, দাড়িম বীজ নাগেশ্বর, তালীশ পত্র, বৃহতি, মালতী ফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্ত চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেকটি ২ তোলা লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। (আয়ুর্বেদ প্রদ্বীপ, শ্বঙ্গধর)

যোগেন্দ্ররস প্রস্তুত প্রণালী—রসসিন্দুর ১ তোলা, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, বঙ্গ, প্রত্যেক ।।০ তোলা; ঘৃত কুমারীর রসে মর্দন করতঃ এরণ্ড পত্রে বেষ্টনপূর্বক ধান্য রাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া পরে ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

মকরধ্বজ প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণ ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা। প্রথমতঃ স্বর্ণপত্র কাঁচি দ্বারা কুচিকুচি করিয়া পারদের সহিত মাড়িবে। পরে উহা গন্ধকের সহিত উত্তমরূপে ১ দিন পর্যন্ত মাড়িবে। অনন্তর ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে। একটি বোতল টুকরা কাপড় ও কাদা (কর্দম) দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে ঐ বোতলে উহা পুরিয়া বোতলের মুখে একখণ্ড ফুল খড়ি চাপা দিবে। অনন্তর একটি হাড়ীর নিম্নে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রের উপর ঐ বোতলটি বসাইবে এবং হাড়ীর মধ্যে বালুকা ঢালিয়া বোতলের গলা পর্যন্ত পূর্ণ করিবে। তদনন্তর মৃদু অগ্নি সন্তাপে ক্রামাগত তিন দিন পাক করিবে। ইহাতে বোতলের গলদেশে অরুণ বর্ণ যে সমস্ত ঔষধাংশ সংলগ্ন হইবে তাহা বাহির করিয়া লইবে। তাহাই মকরধ্বজ।

মধ্যম নারায়ণ তৈল প্রস্তুত প্রণালী—তিল তৈল ষোল সের, কল্কার্থ-বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচ, জটামাংসী, শিলাজুত, সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল, রাস্না, শুল্‌ফা, দেবদারু, মুগালি, মাষাণি, শালপানি, চাকুলে ও তগর পাদুকা প্রত্যেক আট তোলা। ক্বাথার্থ-অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বেলমূলের ছাল, পারুলের ছাল, বৃহতি, কন্টকারী, গোক্ষুর গোরক্ষচাকুলে নিমছাল, শোনাছাল, পুনর্ণবা, গন্ধ ভাদুলে ও গণিয়ারী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮০ তোলা, ৬ মণ ষোল সের পানিতে সিদ্ধ করিয়া ১ মণ চব্বিশ সের পানি থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ এবং শতমূলীর রস ষোল সের, দুগ্ধ ১ মণ চব্বিশ সের, এই সমস্ত দ্রব্য এবং কল্কদ্রব্যসহ তৈল পাকাইবে। ইহা বায়ু-রোগের বড় ঔষধ।

স্বল্প ব্যয়ে উন্মাদ চিকিৎসার তদ্‌বীর

(১) ১ পোয়া খাঁটি সরিষার তৈল ও ১ বোতল পানিতে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম করিবে। আবার উহা পড়িয়া পুনরায় দম দিবে। প্রত্যহ সকালে ও দুপুরে ঐ তৈল রোগীর আপাদমস্তকে বেশ করিয়া মালিশ করিবে। অর্ধ ঘন্টা পর উক্ত পড়া পানি অন্যান্য পানির সহিত মিশাইয়া লইবে। অতঃপর রোগীকে বসাইয়া ঐ পানির ১৫/২০ কলস পানি তাহার মাথায় ঢালিবে। যখন রোগীর শীত শীত করিবে তখন ক্ষান্ত করিয়া মাথা ও গা মুছিয়া আর একটু তৈল মাথায় দিবে। এরূপ ২ সপ্তাহ করিবে।

(২) একটি পেঁচা জবাহ্ করিয়া মাটিতে রাখিয়া দিবে। ইচ্ছামত একটি চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইবে এবং অপরটি খোলা থাকিবে। বন্ধ চক্ষুটি তুলিবে। অনামিকা অঙ্গুলিতে মিনার মধ্যে পুরিয়া উহা ধারণ করিতে দিবে; ইহাতে খুব নিদ্রা হইবে।

(৩) নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিয়া রোগীর বালিশের মধ্যে পুরিয়া শয়ন করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ـ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ـ موم دح هيا مودح ه لاطا ـ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

(৪) ৩৩ আয়াৎ, আয়াতে শেফা এবং ৩ নং তাবিজটি লিখিয়া রোগীর গলায় ধারণ করিতে দিবে।

(৫) ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া রোগীকে (পুরুষ বা মাহরাম স্ত্রীলোক) দৈনিক দুইবার দম দিবে।

(৬) স্বাস্থ্যবতী গাভী দোহনকালে যে গরম দুধ বাহির হয় উহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলে। প্রত্যহ সকালে রোগীকে ঐ দুধ গরম থাকিতে অবশ্যই পান করাইবে।

(৭) জাফরান, কস্তুরী ও গোলাবে তৈরি কালি দ্বারা আয়াতে শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া রোগীকে সকাল ও বৈকালে সেবন করাইবে।

উল্লিখিত ৭টি তদ্‌বীর একত্রে যথানিয়মে ২/৩ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে খোদা চাহে ত রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হইবে।

স্নায়বিক দৌর্বল্যে মেজাজ গরম থাকিলে خميرۂ گاؤزبان

স্নায়বিক দৌর্বল্যে মেজাজ ঠাণ্ডা থাকিলে خميرۂ بادام

কিংবা যোগেন্দ্ররস ব্যবহার করিবে। অগ্নি বল অনুযায়ী দুধ ঘি, মাখন খাওয়াইবে। উন্মাদ রোগীর নিদ্রার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

উন্মাদের সুপথ্য—পুরাতন চাউলের ভাত, গম, মুগ, নটে শাক, বেতো শাক, ভ্রক্ষ্মী শাক, পটোল, পুরান কুমড়া, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, ঘৃত, বৃষ্টির পানি, নারিকেল, কিসমিস, কয়েত বেল, কাঁঠাল ইত্যাদি ভক্ষণ, তৈল ও ঘৃত মর্দন, স্নান, স্থির অবস্থান ও নিদ্রা বিশেষ হিতকর।

কুপথ্য—বিরুদ্ধ ভোজন, করেলা, উচ্ছে প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য, স্ত্রী সঙ্গম এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিদ্রার বেগ ধারণ নিষিদ্ধ।

মৃগী

মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কেহ বা সপ্তাহান্তর, কেহ বা মাসান্তর কেহ বা বৎসরান্তর আবার কেহ বা জীবনে একবার বেহুঁশ বা মুর্ছিত হইয়া পড়ে। কোন ২ রোগীর মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়। হাত, পা ও পিঠ বাঁকা হইয়া ধনুষ্টঙ্কার রোগীর ন্যায় খেচুনী হইয়া থাকে। রোগীর আত্মরক্ষা জ্ঞান লোপ পাইয়া যায়।

চিকিৎসা—১। নাবালেগ ছেলেমেয়ের মৃগী রোগ হইলে সিংহের কিছুটা চামড়া পশমসহ তাবীজে পুরিয়া গলায় দিলে রোগারোগ্য হইবে। কিন্তু সাবালেগ হইলে আর উহা কার্যকরী হইবে না। —হায়াতুল হায়ওয়ান

২। কুমিরের কলিজা শুকাইয়া পোড়াইবে এবং উহার ধুঁয়া রোগীকে দিলে মৃগী নিবারণ হইয়া থাকে।

৩। শৃগালের পিত্ত রোগীর নাকের কাছে রাখিয়া ফুক দিবে। উহাতে কিছুটা মগজে পৌঁছিয়া গেলে আর কোন দিন মৃগী রোগ হইবে না।

৪। শৃগালের দাঁত কমরে ধারণ করিলে মৃগী হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

তদ্‌বীর

৫। নিম্নলিখিত তাবীজটি ভোজপত্রে লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে।

ذخومرمر	بهرحوس	حلولو
بهو	وسطوس	ملوحسن
نالس	وحلود	دريارها
وامید	ملوس	بولرس
ساد ٥زرعه	عرب	ہتاد ارخلونو

৬। নিখুঁত সাদা মোরগের রক্ত দ্বারা শনিবার সকালে নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া গলায় ব্যবহার করিতে দিবে। রোগীকে ঐ মোরগের গোশ্‌ত খাইতে দিবে। হাকীমুল উম্মৎ বলিয়াছেন, রক্তের পরিবর্তে জাপরান দ্বারা লিখিবে।

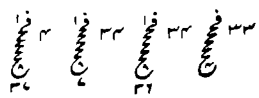

৭। নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ কাগজে লিখিবে। তাবীজরূপে গলায় ধারণ করিতে দিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم ـ رب انى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ـ رب انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين ـ رب اعوذبك من همزات الشياطين واعوذبك رب ان يحضرون ـ وصلى الله على النبى واله وسلم ـ

বিঃ দ্রঃ মৃগী রোগীকে উচ্চস্থানে আরোহণ, পানি ও আগুন থেকে খুব সতর্ক রাখিবে।

পথ্যাপথ্য—উন্মাদ রোগের ন্যায় জানিবে।

জ্ঞানের কেন্দ্র, বুদ্ধি বিবেচনা প্রভৃতি ইচ্ছা অনিচ্ছা ও ধারণ মারণ ইত্যাদি ক্ষমতার আসল মার্‌কাজ যদিও হৃদয় তথাপি মস্তিষ্ক উহার প্রধানমন্ত্রী; হৃদয় ও মস্তিষ্কের এতই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যে বিভিন্ন সময় কার্যাদিকালে সূক্ষ্ম জ্ঞানীগণও পার্থক্য করিতে পারে না যে, কর্তৃত্ব কি হৃদয়ের না মস্তিষ্কের। হৃদয়ের হাকিকত সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তবে মস্তিষ্কের ভিতরকার সৃষ্টিলীলা অবলোকন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মগজের ভিতরকার এক একটি ভাজের ও রেখার মধ্যস্থিত যে মগজ রহিয়াছে উহার দ্বারা কতই না গুণাগুণের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহার ইয়ত্তা নাই। আবার উহার কোন কোন স্থানের ব্যতিক্রমকালে নানা অসুবিধা হইয়া থাকে। অতএব, যাহাতে মস্তিষ্ক ও মগজের কোথাও কোন আঘাত লাগিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য সর্বদাই রাখিতে হইবে।

চুল

১। ৪ তোলা তিল তৈল অগ্নিতে খুব জোশ দিবে। জোশ উঠিলে উহার মধ্যে একটা জোঁক মারিয়া নিক্ষেপ করিবে। জাল দিতে থাকিবে। জোঁক ভস্ম হইলে পর নামাইয়া খুব মাড়িয়া মিশ্রিত করিবে। এই তৈল চুল শূন্য স্থানে ব্যবহার করিলে চুল ওঠা নিবারণ হইবে; চুল নূতন পয়দা হইবে। —বেহেশ্‌তী জেওর

২। মাষ কালাইয়ের ডাল ও তেঁতুল (অম্ল ফল) দ্বারা মাথা ধৌত করিলে চুল পাকা নিবারণ হয়। চুল সর্বদা কাল থাকে। নানাবিধ চুলের রোগ নিবারণ হয়। স্নায়বিক দৌর্বল্য দূর হইয়া থাকে। —বেহেশ্‌তী জেওর

৩। হস্তি-দন্ত ভস্ম সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাক মাথায়ও চুল উৎপন্ন হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৪। ডুমুর পত্রাদি দ্বারা টাক ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে কুঁচের ফলের বা মূলের অথবা জবা ফুলের কলির প্রলেপ দিলে টাকে চুল উৎপন্ন হয়। মেটে সিন্দুর লাগাইলেও টাকে চুল উৎপন্ন হয়। ভেলা, বৃহতি, কুঁচ মূল বা কুঁচদল বাটিয়া প্রলেপ দিলে টাক ভাল হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৫। প্রত্যহ স্নানের সময় মসুর ও জবা ফুল পানিতে পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে কেশের পক্কতা নিবারণ হয়। নীলোৎপল পুষ্প দুগ্ধে পেষণ করিয়া ১ মাস মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া তাহা চুলে মাখিলে চুল চিকণ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৬। গরম পানিতে হরিতাল চূর্ণ মর্দন করিয়া লোমস্থানে লেপ দিলে কিংবা লোমস্থানে কুসুম তৈল মর্দন করিলে লোমসকল উঠিয়া যায়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

চক্ষু রোগ

স্থূল দৃষ্টিতে মগজের সহিত চক্ষের যোগাযোগ আছে বলিয়া অনেকের মনে নাও হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মগজের সহিত উহার গভীর সম্পর্ক। মগজ দৃষ্টি শক্তির প্রধান উৎস।

কোন কোন সময় স্বতন্ত্রভাবে চক্ষু রোগ হইয়া থাকে। তখন শুধু চক্ষের চিকিৎসা করিলেও চলিতে পারে; কিন্তু প্রায়ই মগজের ত্রুটির দরুন চক্ষু রোগ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে চক্ষু চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে মাথারও চিকিৎসা করিতে হইবে। চক্ষু দুইটি মূল্যবান বস্তু। চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াও উহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই কখনও বিজ্ঞ ও প্রাচীন চিকিৎসক ছাড়া চক্ষের চিকিৎসা করাইবে না। আমরা নিম্নে যে ঔষধ ও তদ্‌বীরাদি উল্লেখ

করিব সম্ভব হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া উহা ব্যবহার করিবে। অবশ্য উহা দ্বারা চক্ষের ক্ষতির আশংকাও নাই।

১। প্রকুপিত পিত্তাধিক্যে চক্ষু কোটরগত লালবর্ণ হইলে ترهندى তেঁতুলবীজ পানিতে ঘষিয়া শয়নকালে কয়েক ফোঁটা চক্ষের ভিতর দিবে এবং কিছুটা চক্ষের উপর মালিশ করিবে। এরূপ ২/৩ দিন করিলে আরোগ্য হইবে। الرحمة فى الطب والحكمة

২। প্রবল প্রকুপিত পিত্তাধিক্যে চক্ষু পিড়িত হইলে এবং উহা দ্বারা যদি হলুদ রং এর পানি অতি মাত্রায় প্রবাহিত হয়; রোগী চক্ষুর সামনে মশা, মাছির মত কিছু নড়াচড়া করিতেছে বলিয়া মনে করিলে; অথচ মশামাছি কিছুই নহে; এরূপ অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর। বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে যাইবে। অভয়া মোদক দ্বারা জুলাপ দিবে। তেঁতুল বীজ পানিতে ঘষিয়া উহা চক্ষে দিবে। ত্রৈফল ঘৃত ব্যবহার করিতে দিবে। এই ঘৃতপানে সর্বপ্রকার নেত্র রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান দুগ্ধ ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্যন্ত।

চক্ষু উঠা

চক্ষু উঠিলে হাত লাগাইবে না। প্রচুর ময়লা বাহির হইতে দিবে। প্রথমাবস্থায় পেনিসিলিন আইওয়েনমেন্ট ব্যবহার করিবে না। ইহাতে আপাততঃ একটু আরাম বোধ হইলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটু একটু ময়লা বাহির হইতে থাকে। এমন অন্য কোন ঔষধও ব্যবহার করিবে না যাহাতে ভিতরের ময়লা বাহির হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। হলুদ মাখা নেক্‌ড়া দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করিবে।

১। ফিটকারি কিংবা গোলাব পানি দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবে। রোদ্র লাগাইবে না।

চক্ষু ওঠা দীর্ঘদিন থাকিলে কিংবা একান্ত অসহনীয় যন্ত্রণা হইলে উপযুক্ত ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২। কালাজীরা চূর্ণ চক্ষুর ভিতর দিয়া ঘুমাইলে উহা নিবারণ হয়।

৩। রসোত (রসাঞ্চন) সর্বাবস্থায় চক্ষুর চর্তুস্পার্শ্বে গোলাপের পানির সহিত লাগাইবে। বিশেষ উপকারই হইবে। ক্ষতির আশংকা উহাতে নাই। —বেহেশ্‌তী জেওর

৪। মস্তিষ্কে কুপিত শ্লেষ্মা জমিয়া উহা চক্ষু দ্বারা বাহির হয়। এরূপ অবস্থায় যদি রোগী চক্ষে দেখিতে না পায়, তবে বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে যাইতে মোটেই দেরী করিবে না। এরূপ অবস্থা দীর্ঘদিন থাকিলে চিকিৎসা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অবশ্য প্রথমাবস্থায় নিম্নোক্ত মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিলে গরীবদের পক্ষে আশা করি উপকারই হইবে।

৫। একটি লৌহ-শলাকা দ্বারা বকরীর কলিজা বিদ্ধ করিয়া ঐ কলিজা মৃদু কয়লার আগুনের উপর ধরিবে ঐ কলিজা হইতে ফেনা বাহির হইবে। ঐ ফেনা একটা সুরমার শলাকায় জড়াইয়া লইবে। গরম ফেনার উপর অতি সামান্য মাত্রায় গোল মরিচ চূর্ণ ছাড়াইয়া দিবে। শয়নকালে অতি সামান্য গরম অবস্থায় চক্ষে দিবে এবং ঘুমাইয়া যাইবে। মস্তিষ্কে কিছু গাওয়া ঘিও মালিশ করিবে। ২/৩ দিন উক্তরূপ ব্যবহার করিলে খোদা চাহে নিরাময় হইয়া যাইবে। الرحمة فى الطب والحكمة

৬। সর্ব প্রকার চক্ষুরোগ, চক্ষুর ভিতরকার যখম ও আঘাতে শ্বেত চন্দন ঘষিয়া চক্ষুর চতুস্পার্শ্বে লেপ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বহু পরীক্ষিত।

৭। চক্ষুর জ্বালা পোড়াতেও ৬নং তদ্‌বীর বিশেষ উপকারী।

দৃষ্টিশক্তি হীনতা

দৃষ্টিশক্তি হীনতা বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। কেহ নিকটের বস্তু দেখিতে পায় কিন্তু একটু দূরের জিনিস দেখিতে পায় না। কাহারও উহার বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টি হ্রাস পাইলে উহার চিকিৎসা অসম্ভব। অবশ্য উহার পূর্বে সুচিকিৎসার দ্বারা দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়া পাইতে পারে। চক্ষুর ভিতর পরদা বা ছানি পড়িয়া গেলে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা উপযুক্ত সময় অপারেশন করাইবে।

১। কিছু দিন নিয়মিতভাবে পানির স্রোতের দিকে তাকাইলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

২। সূর্যোদয়ের পূর্বে নাক দ্বারা পানি টানিলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৩। ধনীদের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ। উহা ব্যবহারে যাবতীয় চক্ষু রোগ বিদূরিত হয়। ভাল চক্ষে ব্যবহার করিলে নানা প্রকার রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

শোধিত স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, শুঙ্ক, মাকাল ফল চূর্ণ, মিশ্রিচূর্ণ, মৃগনাভী চূর্ণ এবং কর্পূর চূর্ণ। প্রত্যেক সমান ভাগ এবং উক্ত উপাদানসমূহের সমষ্টি পরিমাণ সুরমা লইবে। বস্তু সমুদয় একত্রে মিশ্রিত করিয়া খুব বেশী রকম পেষণ করিবে যেন কণাবৎ না থাকে। প্রস্তুত হইবার পর কাঁচের পাত্রে রাখিবে। শয়নকালে এবং অন্য সময় চক্ষে ব্যবহার করিবে। الرحمة فى الطب والحكمة

৪। হরিতকী, বচ, কুড়, পিপুল, গোলমরিচ, বহেড়ার স্বাস, শঙ্কনাভী ও মনছাল, প্রত্যেক সমান ভাগ ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিবে। পানিতে পিষিয়া কবুতরের পালক কিংবা অন্য কোন নরম জিনিস দ্বারা চক্ষের ভিতর ব্যবহার করিবে ইহাতে চক্ষুর কণ্ডু, মাংসবৃদ্ধি, শ্বেতবর্ণ ও রাতকানা প্রভৃতি নেত্র-রোগ বিদূরিত হয়। ঔষধটির নাম চন্দ্রোদয়াবর্তী। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

তদ্‌বীর

৫। প্রত্যেক ফরয নামাযের বাদ يانور ১১ বার পড়িয়া চক্ষুতে দম দিবে, অথবা অঙ্গুলিতে ফুঁক দিয়া চক্ষে বুলাইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم ـ الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكواة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضى ء ولولم تمسسه نار نور على نور ـ يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الا مثال للناس و الله بكل شىء عليم ـ

কাগজে লিখিয়া তাবীজরূপে ধারণ করিলে যাবতীয় মাথা বেদনা প্রশমিত হয়।

৭। নিম্নলিখিত দো'আ ভোজপত্রে লিখিয়া চক্ষুর উপরিভাবে কপালে বাঁধিয়া দিবে। চক্ষু উঠা নিবারণ হইয়া যাইবে।

ايها الرمد الرمود التمسك بعروق الراس عزمت عليك بتوراة موسىٰ وانجيل عيسىٰ وزبور داؤد وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم ـ فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ـ ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ـ وصلى الله عليه وسلم ـ

৮। ৩ বার سَلَامٌ قَوْلًامِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ২ বার فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

চার কুল প্রত্যেক ১ বার পড়িয়া পানিতে দম করিয়া ঐ পানি দ্বারা দৈনিক ৩ বার চক্ষু, মাথা ও মুখমণ্ডল ধৌত করিবে।

৯। শুধু – فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ৩ বার পড়িয়া চক্ষে দম দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

১০। গোলাব পানি ও সুরমা ৩৩ আয়াৎ ও ৯ নং এর আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। সুরমা-শলাকা প্রথম গোলাব পানিতে ভিজাইয়া পরে ঐ সুরমা জড়িত করিয়া দৈনিক ৪/৫ বার চক্ষে ব্যবহার করিলে চক্ষুর হাল্‌কা ধরনের পরদা বিদূরিত হইয়া থাকে। বহু পরীক্ষিত।

১১। সরিষার তৈল ও পানিতে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম করিবে। গোসলের পূর্বে সর্বাংগে ঐ তৈল মালিশ করিবে। তৈল শুকাইলে পড়া পানি দিয়া উত্তমরূপে স্নান করিবে। চক্ষের ঝাপ্‌সা দর্শন প্রশমিত হইবে। বহু পরীক্ষিত।

পথ্যাপথ্য ঃ—ঠাণ্ডা পানি দ্বারা স্নান, ঠাণ্ডা আহার, উপযুক্ত ঘুম হিতকর ও সুপথ্য। পিঁয়াজ, মরিচ, আদ্রক প্রভৃতি গরম খাদ্য ও অনিদ্রা বা রাত্রি জাগরণ অহিতকর।

কর্ণ রোগ

ছেলেমেয়েদিগকে রাত্রে খাবার পরক্ষণেই ঘুমাইতে দিবে না। কারণ ইহাতে বধিরতা দেখা দিয়া থাকে। অতএব, খাবার ২ ঘণ্টা পরে ঘুমাইবে। —বেহেশ্‌তী জেওর

১। শৈশব হইতেই যদি ঈষদুষ্ণ তিক্ত বাদাম তৈল পাঁচ ফোঁটা করিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে আশা করা যায়, কোন দিনই শ্রবণ শক্তি লোপ পাইবে না। —বেহেশ্‌তী জেওর

২। রসুনের একটা (কোঁয়া) পার্ট খোষা ফেলিয়া কর্ণ ছিদ্রে ধারণ করিলে বেদনা ও টাটানি প্রশমিত হয়। শৃগালের চর্বি ঈষদুষ্ণ করিয়া কয়েক ফোঁটা কানে টপ্‌কাইলে বেদনা দূর হয়। বহু পরীক্ষিত।

৩। সোহাগার খৈ খুব উত্তমরূপে মিহিন করিয়া কানের ভিতরে দিবে; পরে কয়েক ফোঁটা কাগজী লেবুর রস টপ্‌কাইয়া দিবে। যে কানে ঔষধ ব্যবহার করা গেল ঠিক সেই পার্শ্বে শয়ন করিবে এরূপ ২/৩ দিন করিলে কানের খইল (গুথ) আপনা থেকেই বাহির হইয়া যাইবে। —বেহেশ্‌তী জেওর

৪। ঘোড়ার পায়খানার রস বাহির করিয়া কিংবা কচ্ছপের চর্বি ঈষদুষ্ণ করিয়া কয়েক ফোঁটা কানের ভিরত টপ্‌কাইয়া দিলে বধিরতা বিনষ্ট হয়। الرحمة فى الطب والحكمة

৫। রসুন, আদা, শজিনা, ছাল, মূলা বা কলাগাছ ইহাদের কোন একটির রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কয়েক ফোঁটা কানের ভিতর নিক্ষেপ করিলে কানের তীব্র শূল, শব্দ, ক্লেদস্রাব নিবারিত হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৬। কচি আম, জাম ও কয়েত বেলের পাতা, কার্পাস ফল ও আদা ইহাদের রস মধু মিশ্রিত করিয়া কর্ণে টপ্‌কাইলে কর্ণস্রাব বিনষ্ট হয়।

৭। ছটাক সরিষার তৈলে একটা শামুকের মাংস বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া খুব জ্বাল দিবে। ঝাঁকিয়া শিশি পুরিয়া রাখিবে। শয়নকালে সামান্য গরম করিয়া কর্ণের ভিতর দিলে কর্ণস্রাব, বেদনা নিবারিত হয়। ইহা বহু পরীক্ষিত। —আয়ুর্বেদ প্রদ্বীপ

নাসিকা রোগ

১। নাকছীর (নাক দিয়া তাজা রক্ত বাহির হইলে) মাথায় খুব ঠাণ্ডা পানি ঢালিবে। নাকছীর হইলে খুব ঘাবরাইবে না; চিকিৎসায় অবহেলাও করিবে না।

২। ছিরকা শুঁকিলে যখন তখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

৩। কবুতরের পায়খানা খুব মিহিন করিবে। ছিরকার সহিত মিশ্রিত করিয়া নাক দিয়া টানিলে নাক্‌ছীর বিনষ্ট হয়।

৪। গয়ার পাতার রস নাক দিয়া টানিলেও রক্ত পড়া নিবারণ হয়।

তদ্‌বীর

৫। ললাটে (কপাল) নিম্নোক্ত আয়াৎ লিখিলেও রক্ত বন্ধ হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم ـ لكل نباء مستقر وسوف تعلمون ـ

৬। নীচে লিখিত দুইটি আয়াৎ লিখিয়া মাথায় বাঁধিলে নাকছীর নিবারণ হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم ـ وقيـل يا ارض ابلعى ماءك ويـاسماء اقلعى وغيض الماء وقضى الامرواستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين ـ قل ارايتم ان اصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين ـ وصلى الله عليه وسلم ـ

বহু পরীক্ষিত।

সর্দি

১। তরল সর্দিতে প্রথমাবস্থায় তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করিয়া ঐ পানি পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

২। রসুন পোড়াইয়া উহার ধুঁয়া শুঁকিলেও শীঘ্র আরাম হয়।

৩। গাঢ় শ্লেষ্মা কিংবা শ্লেষ্মা অবরুদ্ধ থাকিলে ৩৩ আয়াৎ সরিষার তৈল ও পানিতে পড়িবে। তৈল মাখিয়া উক্ত পানি দ্বারা উত্তমরূপে স্নান করিলে শীঘ্রই দূষিত শ্লেষ্মা বাহির হইয়া আরাম পাইবে।

৪। কিছুতেই সর্দি না সারিলে এশার পর সহ্যমত গরম পানিতে ২ খানা পা ভিজাইয়া কিছুক্ষণ রাখিলে অবশ্যই সর্দি বিদূরিত হইবে। কিন্তু সর্দি হঠাৎ বন্ধ করিলে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকিলে সর্দি শুকাইতে পারা যায়।

জিহ্বা

১। শীতকালে অনেকের জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় ঘা হইয়া থাকে। ছাতীম ছাল ও খয়ের পানিতে সিদ্ধ করিয়া ঐ পানি দ্বারা কুল্লি করিলে ২।৩ দিনের মধ্যে আরাম হইয়া যায়।

২। জিহ্বা কিংবা শরীরের যে কোন স্থানে ঘা হইলে মাখন উহার বড় উপকারী ঔষধ, উহা মালিশ করিবে।

৩। কচি শিশুর জিহ্বায় ল্যাচা (সাদা আবরণ) পড়িলে মাখন কিংবা তিল তৈলে যথাক্রমে ১০ বার করিয়া আয়াৎদ্বয় পড়িবে। উহাতে ফুঁক দিবে। অঙ্গুলী দ্বারা আস্তে আস্তে জিহ্বায় মালিশ করিবে। পেটে অসুখ থাকিলে পানিতে ১ বার সূরা-কদর পড়িয়া দম দিবে। গরম পানিতে মিশ করিয়া পান করিতে দিবে। খোদা চাহে ত নিবারণ হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ـ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا ـ

৪। চুনে জিহ্বা ও গাল পুড়িয়া গেলে সঙ্গে ২ সরিষার তৈল মালিশ করিবে।

৫। কথা বলিতে তোত্‌লাইয়া গেলে, জাফরান, কস্তুরি ও গোলাব পানি নির্মিত কালি দ্বারা পাক চিনা বরতনে সূরা-বনি ইস্‌রায়ীল পূর্ণ লিখিবে। ৪০ দিন পর্যন্ত রোজ ১ বার উহা লিখিয়া ও ধৌত করিয়া পান করিবে। কথা বলিবার অসুবিধা দূর হইবে। —নাফেউল খালায়েক

৬। ফজরের নামায পড়িয়া পাক পাথরের টুক্‌রা মুখের ভিতর রাখিয়া ২১ একুশ বার নিম্নোক্ত দো'আ পড়িবে। রেগুলার কিছুদিন এরূপ করিলে উপকার হইবে।

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِّىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ -

দন্ত রোগ

সমস্ত দাঁতগুলির ভিতর ও বাহির এবং ফাঁকের ভিতর কখনো ময়লা জমিতে দিবে না। খাদ্য চিবাইতে উহার কিছুটা আট্‌কিয়া থাকিলে খিলাল করিবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে ওযূর সময় খুব ভালভাবে মেছওয়াক করিবে। দাঁতের উপরিভাগে দু-একটি ঘর্ষণ দিয়া সুন্নতের হক আদায় হইয়াছে বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া নেহায়েত বোকামি। সমস্ত মুখ গহ্বর, দাঁতের বাহির, ভিতর ও জিহ্বা ভালভাবে পরিষ্কার করাই সুন্নত।

মেছওয়াক নিয়মিত ব্যবহার করিলে; (১) বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। (২) গলস্থ শ্লেষ্মা বিনষ্ট হয়। (৩) দীর্ঘদিন দাঁত মজবুত থাকে। (৪) মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। (৫) মৃত্যু যাতনা আসান হয়।

ব্রাশ ব্যবহার করিবে না, ইহাতে অল্পদিন পরেই দাঁতের গোড়া বাহির হইয়া পড়ে। স্প্রীট বিহীন পেষ্ট ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পিলু, বাগ ভ্যারেণ্ডা, অর্জুন, কুল গাছের শিকড় দ্বারা মেছওয়াক করিবে।

দন্ত বেদনায় পিপুলচূর্ণ, মধু ও ঘি একত্রে মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল নিবারিত হয়। দাঁতের গোড়ায় ঘা বা নালি ঘা হইলে ডাক্তার দ্বারা উপযুক্ত চিকিৎসা করাইবে।

শুঁঠ, হরিতকী, কুতা, খয়ের, কর্পূর এবং সুপারী ভস্ম, গোল মরিচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি প্রত্যেকটির চূর্ণ সমপরিমাণ, আর ফুলখড়ির চূর্ণ সর্বচূর্ণের সমান মিশ্রিত করিয়া মাজনরূপে ব্যবহার করিলে বহুবিধ দন্তরোগ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

মুখের দুর্গন্ধ

দাঁত, মুখ বেশ পরিষ্কার, কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকায় অনেকের মুখ দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে। বাহ্যি পরিষ্কারক ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহার করিবে।

সমান ২ রসুন ও লবণ বাটিয়া ভোরে খালি পেটে ভক্ষণ করিবে। একান্ত উহাতে সুফল না হইলে হেকিমী ঔষধ ব্যবহার করিবে।

গণ্ডমালা ও গলগণ্ড

অনুপযুক্ত আহার-বিহার হেতু; প্রদুষ্ট বায়ু, কফ্ ও মেদ দোষে গলা ফুলিয়া রোগদ্বয়ের উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা ঃ শ্বেত সরিষা, শজিনা বীজ, মূলা বীজ, শনবীজ, মশিনা ও যব প্রভৃতি দ্রব্য অম্লঘোলে বাটিয়া ২/৩ সপ্তাহ প্রলেপ দিবে। কণ্ঠমালা, গণ্ডমালা ও গলগণ্ড বিদূরিত হইবে।

কবিরাজী ফার্মেসী হইতে সিন্দুরাদি-তৈল ক্রয় করিয়া মালিশ করিবে।

গলায় ঘা, নালী ঘা, ক্যানসার প্রভৃতি বিপজ্জনক রোগ। বিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

গলায় মাছের কাঁটা বিঁধিলে فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ কয়েকবার পড়িয়া দম দিবে।

পথ্যাপথ্য ঃ কোষব্যাধির অনুরূপ।

বক্ষ

বক্ষের বাম পার্শ্বে হৃদয়; ডান এবং বাম দুইদিকেই ফুস্‌ফুস্‌ অবস্থিত। খুব সতর্ক রাখিতে ও থাকিতে হইবে; যাহাতে যন্ত্রত্রয় কোনভাবে বিকৃত না হইতে পারে।

১। চিরজীবন ভাল সরিষার তৈল বুকে মর্দন করিয়া সূর্যোদয়কালে উত্তম স্নানাদি করিলে কোনদিন যক্ষ্মা হইবে না।

২। স্বর ভঙ্গাদিতে কিছুটা হরিতকী ও পিপুলচূর্ণ মুখে রাখিলে উহা প্রশমিত হয়।

৩। যষ্টি মধু চিবাইয়া রস ভক্ষণ করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

৪। বক্ষে শ্লেষ্মা জমিয়া গেলে কিংবা অল্প পরিমাণ শ্লেষ্মা শুকাইয়া থাকিলে অথবা কাশ, শ্বাস উপস্থিত হইলে প্রথম অস্থায় উহার চিকিৎসার্থ বাসক পাতা লবণের সহিত জ্বাল দিয়া গরম গরম চায়ের মত ব্যবহার করিবে। শ্লেষ্মা তরল হইয়া বাহির হইবে।

৫। কণ্টকারী ক্বাথ, বাসকের ক্বাথ পান করিলে সামান্য সামান্য সর্বপ্রকার কাশই প্রশমিত হয়।

৬। প্রবল কাশিতে খুব যাতনা অনুভব হইলে তালিশাদী চূর্ণ চুষিয়া ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হইবে। কাশের বেগ, কাশজনিত ক্লেশ দূরীভূত হইবে।

তালিশারী চূর্ণ বা মোদক প্রস্তুতপ্রণালী ঃ—

প্রথমতঃ অর্ধ সের চিনির রস করিয়া রাখিবে, অতঃপর তালিশ-পত্র চূর্ণ ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, দারু চিনি অর্ধ তোলা, এলাচ অর্ধ তোলা; প্রভৃতি চিনির রসে মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মোদক প্রস্তুত না করিয়া শুধু চূর্ণও ব্যবহার করা যায়।

ইহা কাশ, শ্বাস, অরুচি, পাণ্ডু, কামলা, গ্রহণী, অতিসার, প্লীহা ও শোথাদিতে প্রযোজ্য।
—আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৭। রাজহাঁসের চর্ব্বি বুক ও পার্শ্বদ্বয়ে মালিশ করিলে নিমুনিয়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।
— حيواة الحيوان

৮। বাঘের তৈল সর্বাঙ্গে মালিশ করিলে ঠাণ্ডা ও উহার দুষ্ক্রিয়া হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়।
— حيواة الحيوان

৯। হাপানি, শ্বাস, কাশ ও নিমুনিয়া রোগে চন্দনাদ্য তৈল বক্ষে মালিশ করিলে বক্ষের গায় শ্লেষ্মা তরল হইয়া বাহির হইয়া যায়। প্রচুর শ্লেষ্মা বাহির হইবার পর বসন্ত তিল রস মধুতে মাড়িয়া বাসক পাতার রস, তুলসী পাতার রসসহ সেবন করিবে। ইহা শ্লেষ্মাজনিত বক্ষের যাবতীয় ব্যাধির মহৌষধ।

চন্দনাদ্য তৈল প্রস্তুত প্রণালী

তিল তৈল /৮ সের। ক্বাথার্থ বানুনহাটি, বাসক ছাল, কণ্টকারী, বেড়েলা ও গুলঞ্চ মিলিত সাড়ে বার সের, পানি ৬৪ সের, শেষ ষোল সের।

কল্কার্থঃ—শ্বেতচন্দন, তাগুরু, তালীশপত্র, নখী, মঞ্জিষ্টা, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, শটী, লাক্ষা, হরিদ্রা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৮ তোলা। কাথের সহিত কল্ক পাক করিবে। কল্ক পাকান্তে শিলারস, কুসুম, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাচ ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য দিয়া তৈল পাক করিবে।

বসন্ত তিলক রস ভাল আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসী হইতে আনিয়া লইবে।

রাজ যক্ষ্মা

সাধারণতঃ অতিরিক্ত ধাতুক্ষয়, দীর্ঘদিন ফুসফুসে শ্লেষ্মা জমিয়া থাকা এবং উপযুক্ত আহারের অভাবে যক্ষ্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনেক সময় নাক ও মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে। কোন কোন সময় গলার ভিতরকার রগ ছিড়িয়া, ধূম ও ধূলি আটকিয়া রক্তবমন বা স্রাব হইতে থাকে। রক্তস্রাব দেখিলেই তাহাকে যক্ষ্মা বলা যাইবে না। অনেক সময় রক্তপিত্ত হেতু রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ

বাতের প্রকোপ থাকিলে স্বরভঙ্গ,পার্শ্ব ও স্কন্ধদেশের সঙ্কোচ এবং বেদনা। পিত্তাধিক্য প্রবল জ্বর, দাহ, অতিসার ও রক্ত নির্গম; কফের আধিক্য, মস্তক ভার, অরুচি, কাশ, গলা সুড়সুড় করা, এই লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলে রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। এতদভিন্ন মেরুদণ্ডের হাড়টি উঁচু হইয়া যায়। রোগী দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। ইহা একটি বড় প্রাণনাশক ব্যাধিই বটে। অধুনা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (এক্স-রে) ও ঔষধপত্র দ্বারা সুচিকিৎসার জন্য সরকার যে চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে তাহা বাস্তবিকই সুখের কথা।

চিকিৎসাঃ পার্শ্ব, স্কন্ধ ও মস্তকের বেদনা নিবারণ করিতে— শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগর পাদুকা ও শ্বেত চন্দন এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গরম করিবে এবং বেদনা স্থলে প্রলেপ দিবে।

মুখ দিয়া অধিক রক্ত-বমন হইতে থাকিলে লাক্ষারঞ্জিত আলতার পানি ২ তোলা যষ্টিমধু ।।০ তোলা পান করাইবে। যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, ছাগ-দুগ্ধে পিষিয়া পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়।

পার্শ্ব বেদনা, জ্বর, শ্বাস ও কাশ নিবারণার্থে বেল, শ্যোনা, গম্ভারী, পারুল গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ইহাদের মূল, ধনে, পিপুল, শুঁঠ এই ১৩ পদী পাঁচনটি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে পার্শ্ব শূল, স্কন্ধশূল, শিরশূল ক্ষয় ও কাশাদি উপদ্রব্য প্রশমিত হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

চ্যাবন প্রাশঃ যক্ষ্মার মহৌষধ। বেলমূলের ছাল, গনিয়ারী ছাল, শোনাছাল, গম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতি, কণ্টকারী, কাঁক্‌ড়া শৃঙ্গী, ভুঁই আমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তি কুড়, কৃষ্ণাগুরু, হরিতকী, গুলঞ্চ, স্বদ্ধি, জীবক, স্বাষভক, শটী মুতা, পুনর্ণবা, মেদা, ছোট এলাচ, নীলোৎপল, রক্ত চন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূলক, কাকোলী, কাকজঙ্ঘা ইহাদের প্রত্যেক ১ পল; পোটলীবদ্ধ গোটা আমলকী ৫০০টি এই সমুদয় একত্র ৬৪ সের পানিতে সিদ্ধ করিয়া ষোল সের থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। আমলকীর বীজ (পোটলী খুলিয়া) ফেলিয়া দিয়া ছয় পল ঘৃত ও ছয় পল তিল তৈল ভাজিয়া পেষণ করত ৫০ পল মিছরি মিশ্রিত করিবে, মিছরিসহ পেষিত আমলকী ও ক্বাথ একত্র পাক করিবে। ঘন হইলে বংশ লোচন ৪ পল, পিপুল ২ পল, গুড়ত্বক ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলাচ

২ তোলা, নাগেশ্বর ২ তোলা, এই সমুদয় প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। ঠাণ্ডা হইলে ছয়পল মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা ২ তোলা অনুপান মধু। সকাল ও সন্ধ্যা।

তদ্‌বীর

যে কোন বয়সের, যে কোন ঋতুতে; রোগী নারী পুরুষ যে কেহই হউক, সরিষার তৈল ও পানিতে ৩৩ আয়াত পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যেহ স্নানের পূর্বে উক্ত তৈল এরূপ আস্তে ২ মালিশ করিবে যেন বুক গরম হইয়া যায়। বক্ষ গরম গরম থাকিতে পড়া পানি দিয়া গোসল করিবে। কিছু পানি খাইতে দিবে ৭ দিনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বাহির হইবে। বেদনার উপশম হইবে। ১ সপ্তাহ পর ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা কাগজে লিখিয়া রোগীর গলায় ধারণ করিতে দিবে।

অতিরিক্ত রক্ত বমন হইতে থাকিলে উক্ত আয়াতসমূহের সহিত ইহাও লিখিয়া দিবে।

وَقِيْلَ يَآاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيَاسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الاَ مْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ

وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ - قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ -

ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা মেস্কজাফরাণ ও গোলাব পানি নির্মিত কালি দ্বারা চিনির বরতনে লিখিয়া রোগীকে দৈনিক ২ বার সেবন করিতে দিবে। এরূপ ১২০ দিন করিলে খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে।

পথ্যাপথ্য ঃ—দিনের বেলা পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, মসূর, ছোলা, আড়হরের ডাইল, বাইন মাছের বা বড় চিংড়ি মাছের ঝোল, হরিণ, খরগোশ, মেষ, পায়রা, ঘুঘু ও বকের মাংস। নটে, পল্‌তা, বেতের ডগা, ব্রহ্মী শাক, পুরান কুমড়া, লাউ, পটোল, ডুমুর, মানকচু, মোচা, থোড়, উচ্ছে ও করেলা; পাতি লেবু, কাগজী লেবু, গো-দুধ, গাওয়া ঘি, ছাগ-দুগ্ধ ও ছাগ-ঘৃত। নারিকেল, কচি তালশাঁস, পাকা কাঁঠাল, খেজুর, কেশুর, পানিফল, পাকা কায়েত বেল, কিস্‌মিস্, আদুর, চিনি, মিশ্রি, মধু, ইক্ষুরস, রুটী, খৈ-এর ছাতু, সাগু, বার্লি, সাগর ও শবরীকলা হিতকর। মাখন, মিশ্রি ও চিনি বিশেষ হিতকর। রাত্রিতে ছাগলের মধ্যে শয়নও বিশেষ উপকারী।

পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অগ্নিতাপ রৌদ্রসেবন, বেশী গমনাগমন, মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ, ক্রোধ, স্ত্রীসঙ্গম, কটুদ্রব্য, গুড়, দধি, মাষকলাই, ভাজাপোড়া দ্রব্য, মৎস্য, বেগুন, তিল, সরিষা, রসুন, পেঁয়াজ, সিম, ধুমপান ও পান অহিতকর।

হৃদ রোগ

জীবনের উৎস ও জ্ঞানের কেন্দ্র, বক্ষের বাম পার্শ্বের প্রায় ২ অঙ্গুলি নীচে হৃদৎপিণ্ড অবস্থিত। এখানেই রূহের অবস্থান। অতি সূক্ষ্ম ও সুপ্ত আত্মাটির অবস্থান কেন্দ্র বলিয়াই উহার গুরুত্ব সবচাইতে বেশী। কাজেই সুস্থ হৃদয়ে শক্তি যেমন অপরিসীম; উহার অসুস্থতাও যাবতীয় অশান্তি ও অবনতির চরম পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড ও আত্মার রোগ কঠিন ও জটিল। উহার চিকিৎসাও খুব কঠিন বলিয়া মেডিকেল সাইন্‌টিষ্ট ও ছুফিয়ায়ে কেরামদের নিকট স্বীকৃত হইয়াছে।

অতএব, যাহাতে প্রাণ হৃদয় সুস্থ সবল ও নীরোগ থাকিতে পারে, তৎপ্রতি সর্বদা যত্নবান হইবে।

হৃদরোগের কারণ ঃ অতি উষ্ণদ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, কষায় ও তিক্তদ্রব্য ভক্ষণ, ভুক্তদ্রব্য সম্যক পরিপাক পাইবার পূর্বে ভোজন, অতিশ্রম, নিরন্তর চিন্তা, মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ, অতি শোক,

বক্ষে আঘাত, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে হঠাৎ জাগ্রত করা, অতি জোরে হৃদয়ে অনবরত জর্‌ব করা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ ও কৃমি প্রভৃতি।

লক্ষণঃ—মনের অবসাদ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে মনের অশান্তি, উহা প্রবল হইলে ধৃত মৎস্যের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকা। এই রোগে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসাঃ—প্রথমে রোগের কারণ দূর করিতে হইবে। রোগীকে নিশ্চিন্ত করিতে হইবে। রোগী সবল হইলে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে অভয়া মোদক ব্যবহার করাইবে। জায়েয আমোদ-প্রমোদ ভোগ করিতে দিবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোলে করিতে দিবে। তাহাদের খেলাধূলা দর্শন করিবে।

১। হিঙ্গু, বচ, বিটলবণ, প্রত্যেক চূর্ণ সমান। একত্রে যবের ক্বাথের সহিত পান করিবে হৃদরোগ, হৃদশূল প্রশমিত হইবে।

২। ক্রিমি হইতে হৃদরোগের সূচনা হইলে বিড়ঙ্গাদী লৌহ, হরিদ্রা খণ্ড ব্যবহার করিবে। সঙ্গে ২ হৃদরোগের ঔষধও প্রয়োগ করিবে। অর্শের কারণ থাকিলে উহার চিকিৎসাও করিবে। ঐ অধ্যায়ও দেখিয়া লইবে।

৩। সুজী ১ ভাগ, অর্জুন ছাল চূর্ণ ১ ভাগ, ছাগদুগ্ধ ৪ ভাগ এবং ঘৃত ও চিনি যথাপ্রয়োজন। এই সমুদয় একত্র পাক করিয়া শীতল হইলে কিছু মধু দিয়া রোগীকে খাইতে দিবে।

৪। পেটের পীড়া না থাকিলে অর্জুন ঘৃত উহার পরম ঔষধ।

বিড়ঙ্গাদী লৌহ প্রস্তুত প্রণালীঃ শোধিত পারদ, গন্ধক, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঁঠ, বঙ্গ, প্রত্যেক সমভাগ; সর্বসমান শোধিত ও মাড়িত লৌহ; এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান বিড়ঙ্গ চূর্ণ পানিতে মর্দন করিয়া বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার পানি, মুতার রস, মধু।

তদ্‌বীর

৫। নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ কাগজে লিখিয়া তাবীজ প্রস্তুত করিবে। মাদুলীতে পুরিয়া হৃদয় বরাবর সর্বক্ষণ ধারণ করিবে। প্রবল হৃদস্পন্দনও শান্ত হইয়া যায়। ৩ মাস পর্যন্ত সর্বদা ব্যবহার রাখিলে স্থায়ী ফল হইয়া থাকে। ইহা বহু পরিক্ষিত।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِاللهِ اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ـ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَلِيَرْبِطْ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ ـ لَكُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ وصلى الله تعالى و على اله وسلم ○

৬। কস্তুরী, কর্পূর ও গোলাব পানি দ্বারা কালি প্রস্তুত করিবে। চিনা বরতনে নিম্নোক্ত লিখিত তাবীজ লিখিয়া ঐ তাবীজ পানি দ্বারা ধৌত করিবে। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় মধু ও কর্পূরসহ ঐ পানি সেবন করিবে। প্রবল হৃদরোগ এবং লিভার ব্যাধি এমন কি লিভার শক্ত হইয়া গেলেও উহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। লিভার নরম হইয়া দিন দিন ছোট, সবল ও কার্যক্ষম হইবে। ৬ সপ্তাহ ব্যবহার করিবে। (বহু পরীক্ষিত— الرحمة فى الطب والحكمة)

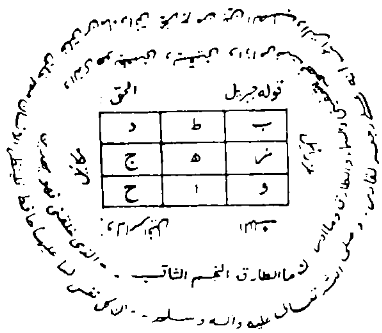

৭। আমেল রোযার অবস্থায় কাঁচের পাত্রে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া বৃষ্টি কিংবা কূয়ার পানি দ্বারা ধৌত করিয়া পান করিতে দিবে।

٧٨٦ ح ٥ ٥ ٥ ٥ ٥

পথ্যাপথ্য

সুপথ্য ঃ—পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, পুরাণ কুমড়া, কদু, কচিমূলা, রসুন চাল্‌তা, পাকাকলা, দাড়িম্ব, কিস্‌মিস, দধি, বৃষ্টির পানি হিতকর।

কুপথ্য ঃ—কষায় রস, গুরুপাক দ্রব্য, যাবতীয় গোশ্‌ত, তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণবীর্য দ্রব্য মহিষের দুধ, অধঃগতি রোধ, মৈথুন, রাত্রি জাগরণ, নিরন্তর চিন্তা অহিতকর।

জঠর পীড়া

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন—(মানব দেহের জন্য) পাকস্থলী কূয়া স্বরূপ! অর্থাৎ কূয়া হইতে যেমন পানি সরবরাহ হইয়া থাকে, অনুরূপভাবে পাকাশয় হইতে সমস্ত দেহে ধমনী কর্তৃক শক্তি বা শক্তির উপকরণ সরবরাহ হইয়া থাকে। নিখুঁত, নির্দোষ পাকাশয় যত পরিষ্কার, যত পূর্ণ ও উহা হইতে যত শক্তি দেহে সম্প্রসারিত হইবে ততই মঙ্গল। পক্ষান্তরে পাকাশয় দুর্বল ও নিস্তেজ হইলে এবং উহা হইতে সম্যক শক্তি প্রসারিত না হইলে দেহ ক্ষীণ, মন দুর্বল হইয়া পড়ে। তলার লিভারটি একবার নড়িয়া গেলে মেরামতের পর কাজ গৌণভাবে চালু থাকিলেও উহা শক্তিশালী কোন দিনই হইবে না। তদ্রূপ একবার পাকাশয়ের ক্রিয়া ও লিভার প্রপীড়িত হইলে চিকিৎসা দ্বারা রোগারোগ্য হইলেও ভবিষ্যতে উহা মজবুত ও পূর্ণ কার্যক্ষম হইবে না। কোন ব্যতিক্রম হইলে জঠর রোগের পুনরাক্রমণের বিশেষ আশঙ্কা থাকিয়া যায়। অতএব, চিরদিন যাহাতে পাকাশয়ের ক্রিয়া এবং লিভার কার্যক্ষম ও সবল থাকে তৎপ্রতি গোড়ার থেকেই কড়া নজর রাখিবে। শৈশব থেকেই শিশুকে এমন করে গড়িয়া তুলিতে হইবে; যেন কোন দিন ১ বারের জন্যও সে কুখাদ্য বা স্বাস্থ্যের অহিতকর খাবার না খায়। উদর পূর্ণ করিয়া না খায়। ভুক্ত দ্রব্য সম্যক পরিপাক হইবার পূর্বে পুনঃ ভোজন না করে। নারী, পুরুষ, বালক, বালিকা প্রত্যেকেই দৃঢ় পণ করিবে যে জীবনে ২ দিনের জন্য, একবারের জন্যও স্বাস্থ্যের অপচায়ক কোন খাদ্য খাইবে না; বরং অগ্নিবল, সময় ও ক্ষুধা অনুযায়ী স্বাস্থ্যের উপকারী খাদ্য ভক্ষণ করিবে।

পুনশ্চ ঃ—না খাইয়া মানুষ মরে না; মানুষ খাইয়াই মরিয়া থাকে। সাবধান, দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ ভোগ করিতে হইলে কুখাদ্য কখনও ভক্ষণ করিও না।

অগ্নিমান্দ্য

১। পেটে ভারবোধ হইলে ২/১ সন্ধ্যা আহার বন্ধ করিয়া দিবে। কারণ, উপবাসের ন্যায় পেটের পীড়ার ঔষধ দ্বিতীয় আর নাই।

২। আহারের সময় মাঝে মাঝে একটু ২ পানি পান করিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়; আহারের প্রথমে ও শেষে সামান্য আদা লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে অগ্নিবল বৃদ্ধি পায় এবং অগ্নিমান্দ্য বিদূরিত হয়।

৩। প্রত্যহ প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁঠচূর্ণ অথবা কেবলমাত্র শুঁঠচূর্ণ ঘৃতের সহিত খাইলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

৪। পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব লবণ, বিট লবণ, তেজপত্র, নাগেশ্বর। ইহাদের প্রত্যেকচূর্ণ ১৬ তোলা, সচল লবণ ৪০ তোলা, গোল মরিচ ৮ তোলা, জীরা ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচ ৪ তোলা, করকচ লবণ ৬৪ তোলা, অম্ল তালিমের বীজ ২০ তোলা, অম্লবেতস ২ পল, ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। মাত্রা অগ্নিবল অনুযায়ী /০ হইতে ।০ পর্যন্ত গরম পানি কিংবা ঘোলসহ সেব্য। এই ঔষধের নাম ভাস্কর লবণ ইহা 'নমকে ছোলায়মানি'র স্থলাভিষিক্ত। অজীর্ণে কপের প্রকোপ থাকিলে দেহ ভার, বমিভাব, যে দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছে ঠিক সেই রসেরই উদগার হয়।

চিকিৎসা—সমান সমান সৈন্ধব ও বচ গরম পনিতে পিষিয়া ঠাণ্ডা পানি দ্বারা সেবন করিবে। যদি উদরে অজীর্ণ বেদনা থাকে, তবে ধনে ও শুঁঠের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

অজীর্ণে পিত্তের প্রকোপ থাকিলে গাত্র ঘূর্ণন, পিপাসা, বেদনা, ধূম নির্গতবৎ অম্লোদগার, ঘাম, দাহ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসার্থে—ঠাণ্ডা পানি পান করিবে। ইহা খুব উপকারী, গলা জ্বালা পোড়া করিলে হরিতকী ও কিসমিস একত্র পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে।

অজীর্ণে—বায়ুর প্রকোপ থাকিলে পেটে বেদনা, উদরাধ্মান মল ও অধঃ বায়ুর অনির্গম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসার্থে—হরিতকী, পিপুল, কৃষ্ণ লবণ, সমপরিমাণ লইবে। দধির মাত কিংবা গরম পানিসহ সেবন করিবে। সর্ব প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও উদরাধ্মান প্রশমিত হইবে।

উদরে আধ্মান দিলে এবং উদগার না হইলে শুঁঠ, পিপুল, গোল মরিচ, হিং ও সৈন্ধব-লবণ সমপরিমাণ একত্রে বাটিয়া তদ্দ্বারা পেটে প্রলেপ দিয়া দিনে ঘুমাইলে উদরাধ্মান অজীর্ণ বিদূরিত হয়।

নানা প্রকার অজীর্ণ, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্যে শঙ্খবটী ও মহা শঙ্খবটী মহৌষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুল গাছের ছালের ক্ষার ত্রিকুট শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, হিং, মিঠা বিষ, জারিত পারদ, শোধিত গন্ধক প্রত্যেক সমান ভাগ। আপাং ও চিতামূলের সাথে অম্লবর্গের রসে এবং লেবুর রসে এরূপ ভাবনা দিবে যেন ঔষধ অম্ল রস হয়। ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে। উহার সহিত লৌহ ভস্ম ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে মহা শঙ্খবটী হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্ধক। ইহা দ্বারা অর্শ, অজীর্ণ, পাণ্ডু, শূল, প্রমেহ, বাতরক্ত ও শোথে বিশেষ উপকারী। মৌরী ভিজান পানির সহিত আহারের অর্ধ ঘন্টা পরে সেব্য।

অতিসার

কারণ—ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইবার পূর্বে পুনর্ভোজন দ্বারা এবং হঠাৎ কোন ক্রমে তরল দাস্ত হইবার পর কুপথ্য (ভাত, মাছ, গোশ্‌ত প্রভৃতি শক্ত খাদ্য) খাওয়ার কারণেও পরিণামে অতিসার রোগ হইয়া থাকে।

১। অতিসারে বাতের প্রকোপ থাকিলে মল অরুণ বর্ণ, রুক্ষ ও ফেনযুক্ত হইয়া থাকে, মল নির্গমকালে গুহ্য দেশে অত্যন্ত শব্দ ও বেদনা হয়। অল্প অল্প অথচ মুহুর্মুহু মল নির্গত হইয়া থাকে।

চিকিৎসার্থে পাচন—সমপরিমাণ বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্র যব। ইহাদের ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

২। পিত্তের প্রকোপ থাকিলে মল পীত, নীল বা লোহিত বর্ণ হয়। ইহাতে দাহ, তৃষ্ণা, গুহ্য দেশে জ্বালা—যন্ত্রণা, গুহ্য নাড়ীতে অনেক সময় ক্ষত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—কট্‌ফল, আতইচ, মুতা, কুড়চি—ছাল ও শুঁঠ। ইহাদের পাচন ব্যবহার করিবে।

৩। শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে— মল সাদাবর্ণ গাড় কফ মিশ্রিত ও আঁশটে গন্ধ এবং রোগীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—হরিতকী, চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদী, বচ, ইন্দ্রযব, শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

৪। ত্রিদোষজনিত অতিসারে মল গোশ্‌ত ধৌত পানির ন্যায়ই হইয়া থাকে এবং দোষত্রয়ের লক্ষণাদিও প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—বেড়েলা আতইচ, মুতা, শুঁঠ, বালা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ। ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

আমলকী বাটিয়া উহা দ্বারা নাভীর চারিদিকে দায়েরা (পুরু) দিয়া নাভীতে অর্থাৎ, দায়েরার মাঝে আদার রস দিয়া রাখিলে নদী বেগসম অতিসারও নিবারিত হয়।

রক্ত অতিসার—সমপরিমাণ মধু, চিনি ও ঘর্ষিত রক্ত চন্দন চালুনির সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা ইত্যাদি যাবতীয় উপদ্রব নিবারিত হয়।

কাঁটা নটের ফুল—দুই মাষা চালুনি পানিতে পিষিয়া তাহাতে একটু চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

আমরুলের শিকড় ।০ তোলা, গোলমরিচ ২/৩টি জীরা ১০/১২টি বাসী পানিতে পিষিয়া ৩/৪ দিন খাইলে রক্তাতিসার, রক্ত আমাশয় প্রশমিত হয়।

আমের কচিপাতা, জামের কচিপাতা, আমলকীর কচিপাতা একত্রে ছেঁচিয়া তাহার রস মধু ও ছাগ-দুগ্ধের সহিত খাইলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

অতিসার ও জ্বরাতিসারে আনন্দ ভৈরবরস বিশেষ উপকারী।

প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, গোলমরিচ, সোহাগার খৈ, পিপুল। প্রত্যেক সমান ভাগ পানিতে পিষিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান জীরা ভাজার গুড়া ও মধু।

প্রবাহিকা

[আমাশয়]

আমাশয় রোগের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তবে অবৈধ আহার কর্তৃক রোগটার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পেটে কামড়ানি ও মলের বিদ্ধতা থাকিলে কাঁচাবেল পোড়া, পুরাতন ইক্ষুগুড়, তিল তৈল, পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

কচি তেঁতুল পাতা ও কয়েত বেলের (ঢাকায় কাটবেল) পাতা ছেঁছিয়া তাহার রস সেবন করিলেও আমাশয় নিরাময় হইয়া থাকে।

নূতন, পুরাতন সর্বপ্রকার আমাশয় রোগে ১০/১২ বৎসরের পুরাতন তেঁতুলের শরবৎ ২/১ দিন পান করিলে দূষিত মল বাহির হইয়া যাইবে। আমাশয়ের যাবতীয় ক্লেশ দূরীভূত হইবে।

অতিসার, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি জঠর পীড়ায় নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ বিশেষ ফলপ্রদ।

কর্পূর রস—প্রবল অতিসার, জ্বরাতিসার ও গ্রহণীর রোগ সকল প্রশমিত হয়। অনুপান—ডালিম পাতার রস বা দুর্বা ঘাষের রস।

প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, আহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল, কর্পূর। প্রত্যেক সমান ভাগ। পানিতে পিষিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে।

নৃপতি বল্লভ—প্রবল অতিসার, গ্রহণী ও আমাশয়, সর্বপ্রকার উদরাময়, গুল্ম, অর্শ শূল, জ্বর, প্লীহা প্রশমিত হয়।

অনুপান—চাউলের পোড়া ভিজান, মুতার রস ও মধু।

প্রস্তুত প্রণালী—জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, জারিত লৌহ, অভ্র, জারিত পারদ, গন্ধক, জারিত তামা, প্রত্যেক এক এক ভাগ। মরিচ ২ ভাগ, আমলকির রসে পিষিয়া অর্ধ মাষা পরিমাণ বটী করিবে।

মুস্তকাদী মোদক—জঠর পীড়াতে যখন কোন ঔষধে ফল না হয়, তখন উক্ত মোদক ব্যবহার করিবে। আল্লাহ্ চাহে ত নিশ্চিত ফল হইবে। রোগারোগ্যের পরও এক সপ্তাহ পর্যন্ত উহা ব্যবহার করিবে। কুপথ্য ত্যাগ অবশ্যই করিবে।

ঠাণ্ডা পানি বা দুগ্ধের সহিত —৷৷০ পর্যন্ত সকাল ও সন্ধ্যায় সেবন করিবে।

প্রস্তুত প্রণালী—শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণ জীরা, যমানী, বন যবানী, (রাধুনী) মৌরী, পান, শুল্‌ফা, শতমূলী, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী, জায়ফল। প্রত্যেক ২ তোলা, মুতা ৪৮ তোলা এই সমুদয় চূর্ণ ৩ সের চিনির রসে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। নমকে ছোলায়মানী ও জাওয়ারেশে—জালিনুছ হেকিমী ঔষধদ্বয়ও পেটের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

তদ্‌বীর

১ বার সূরা-ক্বদর ও ৩ বার لَافِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ পড়িয়া নির্মল পানিতে দম দিবে। কিছু গরম পানির সহিত সেবন করিলে ওলাউঠা ও উদরাময় নিবারিত হয়।

মেশ্‌ক, জাফরান ও গোলাব পানিতে তৈরী কালি দ্বারা চিনা বরতনে সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া দৈনিক ২ বার উহা ধৌত পানি সেবন করিতে দিবে।

ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা এবং لَافِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ও তৎসঙ্গে—

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

কাগজে লিখিয়া ১ বোতল পানিতে নিক্ষেপ করত যথা নিয়মে উহা পান করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

পথ্য—অতিসার নিরামান্তে বার্লী ইত্যাদি লঘু পথ্য খাইতে দিবে।

কিছু ভাত হজম হইলে পুরাতন সুসিদ্ধ চাউলের ভাত, কৈ, মাগুর ছোট তৈল বিহীন মাছের ঝোল, পটোল, পলতা, কচি বেগুন, ডুমুর, কাঁচা আনাজী কলা, মোচা, কাগজী লেবু, ঘোল ইত্যাদি লঘু পথ্য সেব্য। মোটকথা এমন খাদ্য খাইবে যাহাতে পেট ভার কিংবা রোগের পুনঃ আক্রমণ না হয়।

কুপথ্য—যাবতীয় ডাইল, ডিম, গোশ্‌ত, ভাজা, পোড়া, পিঠা, ঘি, দুধ, পোলাউ, ইলিশ মাছ, বড় যে কোন মাছ।

শূল বা নিদারুণ বেদনা

প্রথম স্থির করিবে কি প্রকার বেদনা? লিভার কিংবা প্লীহার অপর দিকে বেদনা হইলে গুর্দা বেদনা হইতে পারে। গুর্দায় বেদনা হইলে উহার চিকিৎসা করিবে। লিভার বেদনা হইলে লিভারের চিকিৎসা করিবে। পাকস্থলীতে বেদনা হইলে তৎপ্রসঙ্গেই এখানে আমরা কিছু শূল চিকিৎসার উল্লেখ করিব।

পিত্তশূল—নাভীদেশে উৎপন্ন হয়। দুপুরে, অর্ধরাত্রে, ভুক্তান্নের পরিপাকের সময়, শরৎকালে উহা বর্ধিত হয়। পিপাসা, দাহ ও গাত্র ঘর্মন হইয়া থাকে। শীতল ও সুস্বাদু আহারে উপশম হয়।

চিকিৎসা—প্রতিদিন শত মূলীর রস মধূসহ সেবন করিবে। দাহ ও শূল নিবারণ হইবে। অমলকি চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে পিত্তশূল নিবারিত হয়।

কফজনিত শূল—আহারের পর, পূর্বাহ্ণে এবং শীত ও বসন্তকালে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বমনবেগ, কাশ, দেহের অবসাদ, অরুচি, মুখ দিয়া পানিস্রাব, পেটে স্তব্ধতা ও মস্তকে ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, বিট লবণ, পিপুল, পিপুল-মূল, চৈচিতা মূল, শুঁঠ, হিং এই সমুদয়ের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় গরম পানিসহ সেব্য।

বতজশূল—হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠে, মূত্রাশয়ে বেদনা উপস্থিত হয়। ভুক্তান্নের পরিপাকান্তে, শয়নকালে ও বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা—সচল লবণ ১ ভাগ, তেঁতুল ২ ভাগ, কৃষ্ণ জীরা ৪ ভাগ, গোলমরিচ আট ভাগ। এই সমুদয় দ্রব্য টাবা লেবুর রসে (তোরুণ জীবন) পেষণ করত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় পানিসহ সেব্য।

ধাত্রীলৌহ—সর্ব প্রকার শূল রোগে বিশেষ উপকারী। সিকিমাত্র ঔষধ আহারের পূর্বে ও পরে এবং মধ্যে ৩ বার সেব্য। অন্নের সহিত সেবন করিতে অসুবিধা বোধ করিলে আহারান্তে একবারে ।০ পরিমাণ ঔষধ সেবন করিবে।

প্রস্তুত প্রণালী আমলকিচূর্ণ ১ সের, লৌহ চূর্ণ আধ সের, যষ্টি মধু চূর্ণ এক পোয়া আমলকির ক্কাথে ৭ দিন ভাবনা দিবে। ভাবনার্থ আমলকী সাত পোয়া পাকে পানি ১৪ সের শেষ সাড়ে তিন সের। প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া উহা চূর্ণ করিবে এবং মাটির পাত্রে রাখিবে।

তদ্‌বীর

১। সরিষার তৈলে ৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ

২ বার ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

৩ বার وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

পড়িয়া দম দিবে। এই তৈল দৈনিক ৩ বার মালিশ করিবে।

২। পূর্বোক্ত নিয়মে ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া দৈনিক ২/৩ বার সেবন করাইবে।

৩। নিম্নোক্ত আয়াৎদ্বয় লিখিয়া তাবীজরূপে বেদনাস্থলে ধারণ করিতে দিবে। জীনের আছর প্রসূত ও অন্যান্য বেদনায় বিশেষ উপকারী। ১ বার সূরা-এখ্‌লাছ পূর্ণ এবং

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَايَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

৪। নাবালেগ ছেলে দ্বারা এক দরে কাগজ খরিদ করাইবে। বাবলা আটা ভস্ম কালি কিংবা কাল কালি দ্বারা নীচের আয়াৎ লিখিবে। মিছরিসহ তাবীজটি সবুজ কোন ফলের রসে রাত ভিজাইয়া রাখিয়া সকালে ঐ পানি সেবন করিতে দিবে। সামান্য অবশিষ্ট পানি বেদনাস্থলে মালিশ করিবে। এরূপ ২ সপ্তাহ করিবে। কিন্তু তাবীজটি এমন ঘরে বসিয়া লিখিবে যে ঘরে কোন দিন স্ত্রী সংগম হয় নাই। যেমন মসজিদ। আয়াতটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَافِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

ক্রিমি বেদনা হইলে রোগীকে চিৎভাবে শোয়াইবে। কেরোসিন তৈল নাভীসহ সমস্ত পেটে ধীরে ধীরে ভালরূপে মালিশ করিলে অল্পক্ষণের মধ্যে উহা প্রশমিত হয়।

পথ্যাপথ্য—ঐ সব খাদ্য ভক্ষণ করিবে যদ্দ্বারা পরিষ্কারভাবে পেশাব-পায়খানা হইতে থাকে এবং ঐ সব আহার ও ক্রিয়াদি হইতে পরহেয করিয়া চলিবে, যদ্দ্বারা পেশাব-পায়খানার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে।

শোথ ও জলোদরী

শোথ ও জলোদরী স্বতন্ত্র কোন রোগ নহে। ইহা অন্য কোন জড়ব্যাধির উপব্যাধি বটে। ক্রিমি, কামলা, হলিমক, অতিসার লিভার ব্যাধি প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধি উহার মূল রোগ হইতে পারে। অতএব, মূল রোগ ও কারণ ধরিয়া চিকিৎসা করিতে বিলম্ব করিবে না। উহার চিকিৎসা বিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তার, কবিরাজ, হেকীম দ্বারা করাইবে। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি চিকিৎসার কথা উল্লেখ করিতেছি, যাহা সর্বাবস্থায় মঙ্গলজনক।

পুনর্নবা, নিমছাল, পলতা, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দেবদারু, হরিতকী ইহাদের ক্বাথ ২ বেলায়ই সেব্য। ইহা শোথ রোগের মহৌষধ।

পথ্য—পানি বর্জনীয়। শুধু মানমণ্ডই উক্ত রোগীর পথ্য।

প্রস্তুত প্রণালী—মান চূর্ণ ১ ভাগ, আতপ চাউলের মিহিন গুড়া ২ ভাগ, দুধ ৪২ ভাগ একত্রে পাক করিবে।

তদ্‌বীর

১। আয়াতে কোত্‌ব এক একবার পড়িয়া সরিষার তৈলে দম দিবে, এরূপ ১৪ বার করিবে। অতঃপর ৩৩ আয়াত পড়িয়া ১ বার দম দিবে।

৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ পড়িয়া দম দিবে এবং রোগীর সর্বাংগে মালিশ করিতে দিবে।

২। ১ খণ্ড কাগজে নিম্ন আয়াৎদ্বয় লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে। এতদ্‌সঙ্গে আয়াতে শেফাও লিখা যাইতে পারে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

৩। উক্ত তদ্‌বীরদ্বয়ের সঙ্গে ৬ সপ্তাহ ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা চিনা বর্তনে লিখিয়া ৩ বেলা সেবন করিতে দিবে।

ক্রিমি

কবিরাজ শাস্ত্রবিদগণ বলেন, ক্রিমি হইতে উৎপত্তি না হইতে পারে এমন রোগ নাই। কাজেই ক্রিমি দ্বারা উদর পূর্ণ রাখা সমীচীন নহে। বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য উহা বড়ই মারাত্মক।

১। খেজুর পাতার রস একরাত্রি রাখিয়া পরদিন প্রাতে সেই বাসী পানি সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

২। ডালিমের খোসার ক্বাথে কিঞ্চিৎ তিল তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

৩। ক্রিমি যাহাতে ঊর্ধ্বগামী হইয়া নাসিকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া মৃত্যু না ঘটাইতে পারে সেজন্য ছেলেমেয়েদের নাক, কান ও গলদেশে কিছু কেরোসিন লাগাইয়া দিবে।

বিভিন্ন ঔষধালয়ে উহার বহু ঔষধ পাওয়া যায়। কাজেই আর বেশী ঔষধের উল্লেখ করিলাম না। তবে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ক্রিমি নাশ করিবে। খুব গরমের সময় ক্রিমি মারা অভিযান প্রাণনাশ করিতে পারে। খুব সাবধান। খেজুরের গুড় ক্রিমি শান্ত করিয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য—অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যবৎ জানিবে।

প্লীহা-যকৃত

বিষম জ্বর, জীর্ণ জ্বর দীর্ঘকাল থাকিলে কিংবা নবজ্বরে কুপথ্যাদি ভক্ষণ করিলে প্লীহা ও লিভার বর্ধিত হয়। ফলে উহারা কর্মে অক্ষম হইয়া যায়।

১। প্লীহার প্রথম অবস্থায় পিপুল চূর্ণ ০ দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ প্রশমিত হইয়া সতেজ ও কার্যক্ষম হয়।

২। তালের জট পোড়াইয়া সেই জট ভস্ম করিবে। কমপক্ষে ৪ মাষা পরিমাণ ভস্ম পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ দূরীভূত হয়।

৩। যমানী, চিতা, যবক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল, দন্তি ইহাদের প্রত্যেক সমপরিমাণ গরম পানির সহিত ভক্ষণ করিলে প্লীহা ও লিভার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৪। উক্ত মুষ্টি যোগে প্লীহা ও লিভার রোগ প্রশমিত না হইলে নিম্নোক্ত পাচন ব্যবস্থা করিবে। ইহা রোগদ্বয়ের মহৌষধ।

কণ্টকারী, বৃহতি, শাল পানি, চাকুলে, গোক্ষুর, হরিতকী, রোড়া। এই সাতটি বস্তুর কষায় ।০ আনা যবক্ষার ও পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিবে।

রোড়াকে ময়নাও বলে। ডাক্তারী নাম Audersonia Rahitaka ল্যাটীনে Tecowa andulata.

৫। লিভার ও প্লীহা অতি বর্ধিত হইয়া শক্ত হইয়া গেলে প্রত্যহ গোমূত্রের সেক দিবে। তিল, তিসি, ভ্যারেণ্ডার বীজ, রাই, সরিষা বাটিয়া প্লীহা ও লিভারের উপর প্রলেপ দিবে।

৬। মুষ্টি যোগ বা পাচন প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত সরিষা বাটিয়া লিভার ও প্লীহার স্থানে প্রলেপ দিবে। দিন দিন উহা কোমল, ছোট ও কার্যক্ষম হইবে।

পাণ্ডু, কামলা, হলিমক

প্লীহা ও লিভার রোগ দীর্ঘদিন থাকিলে রোগত্রয় আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, পেশাব পীতবর্ণ, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, গুলঞ্চ, বাসক, কটকী, চিরতা, নিমছাল ইহাদের ক্বাথ মধুসহ সেবন করিলে রোগত্রয়ের উপশম হয়। কাঁচা ও পাকা পেঁপে, গাঁজর, মূলা উহার প্রধান খাদ্য ও ঔষধ।

তদ্‌বীর

১। প্লীহা পেটের বাম ও লিভার পেটের ডান পার্শ্বে অবস্থিত। নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া তাবীজরূপে উহার উপর ধারণ করিলে প্রশমিত হয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

২। নিম্নলিখিত তাবীজ ব্যবহারে বহুস্থানে আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়াছে। প্রায়ই ৭ দিনে উপশম হইয়া থাকে।

٧٨٦ح اب ح فاح ناح و دبوج ع هرح ماع و يرويح حاميا و طايرا و و ع ع محاجا و سلوهم

ليلكطاع لح دلى اجيبوا يا خدام الاسماء برفع الطحال عن هذا الاذى ـ

কাগজে লিখিয়া তাবীজ বানাইবে। গলায় এমনভাবে ধারণ করিবে, যেন উহা প্লীহা বা লিভার বরাবর থাকে।

৩। বুধবার অথবা শনিবার নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া ধারণ করিতে দিবে ৭ দিনে প্লীহা বা লিভার ছোট হইয়া যাইবে।

صل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عا عا عا عا عا
عا عا عا عا عا عا حا

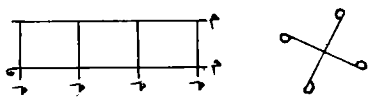

৪। সীসার তখ্‌তীর উপর নিম্নোক্ত তাবীজ অঙ্কন করিবে। প্রথম সপ্তাহ প্লীহা সোজা, দ্বিতীয় সপ্তাহ লিভার বরাবর ধারণ করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ প্রশমিত হয়।

واح اح ع ا ما لا ما ما دا
اى ورم واح ردهم
مالا لكلوع

৫। হৃদরোগের ৭ নং তদ্‌বীর অবশ্যই করিবে। উহা দ্বারা দুর্জয় প্লীহা লিভারও সংশোধিত হইয়া থাকে। লিভার বড়, শক্ত হইয়া গেলে নিশ্চয়ই উহা ব্যবহার করিতে দিবে।

৬। লিভার ও প্লীহাতে বেদনা থাকিলে চিনা বরতনে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিবে। পানি দ্বারা ধৌত করিয়া পান করিতে দিবে। খোদা চাহে ত আশাতীত সুফল হইবে।

٥ ٥ ٥ ٥ ١ ١ ع ع ع ع ع ع ع ع ٥ موم -

৭। আকস্মিক লিভার বেদনায় বোতলে গরম পানি পুরিয়া সেক দিবে। বেদনার উপ-শম হইবে।

৮। জুতা পরিধান করিতে প্রথম ডান পা দিবে। খুলিতে বাম পা খুলিবে। প্লীহা বেদনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ যতই নিরীক্ষণ করিবে, রাসূলে পাকের সুন্নতের মহত্ত্ব ততই প্রকাশিত হইবে।

৯। সূরা-মোমতাহেনা পাক চিনা বরতনে লিখিবে এবং ধুইয়া খাইতে দিবে।

১০। এক টুক্‌রা পাতলা চামড়ার উপর নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া প্লীহা বরাবর ধারণ করিবে। শনিবার লিখিয়া ধারণ করিবে, শুক্রবার খুলিয়া রাখিবে। প্লীহা রোগে ইহা বুযুর্গানে দীনের বহু পরীক্ষিত।

اداح ح هم ما مل ملما	محمد الى راى	١ ٨ ٩ ٧ ٢

صا لح صح و صح م له صا لح دون مانع من الى ان تبصره و مره-

১১। নীচের তাবীজটি লিখিয়া বাম হাতের বাজুতে বাঁধিবে।

٣ ٢ ٩ ١ ٨ ع ٩ ٥ ٢ ح ح د د صوع

১২। শনিবার সূর্যোদয়ের পূর্বে লিখিয়া পশমের দড়ি দ্বারা পৈতার ন্যায় ডান পার্শ্বে বাঁধিবে।

ح ح ه د م ص ها ا ص
اح ااح ماتت الى الابد

১৩। কামলা, হলিমক ও পাণ্ডু রোগে পানি ও সরিষার তৈলে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যহ ৩ বার গোসল করিতে দিবে। চিনা বরতনে আয়াতে শেফা লিখিয়া ৬ সপ্তাহ দৈনিক ২ বার সেবন করিতে দিবে।

সুপথ্য—কাঁচা ও পাকা পেঁপে, পটল, পিপুল শাক, মটর শাক, ঝিংগা ও কাকরোল, কচি বেগুন, করেলা, উচ্ছে প্রভৃতি।

কুপথ্য—সর্বপ্রকার ডিম, ডাইল, মাংস, তৈলাক্ত মাছ প্রভৃতি গুরুপাক শক্ত দ্রব্য।

গুর্দা

গুর্দা পাকাশয় হইতে রস সংগ্রহ করিয়া থাকে। গুর্দা হইতে ঐ পরিষ্কৃত পানি ফোঁটা ফোঁটা করিয়া মূত্রাশয়ে জমা হইতে থাকে। এই পানিই মূত্র। গুর্দা সবল সতেজ ও কার্যক্ষম হইলে ভুক্তদ্রব্যাদি পাকাশয়ের ভিতরেই থাকে এবং সে পরিষ্কৃত রসই সঞ্চয় করিয়া থাকে। গুর্দা রোগাক্রান্ত হইলে রসের সহিত খাদ্যের মিহিন কণিকাসমূহ গুর্দা কিংবা মূত্রাশয়ে জমাট হইয়া ক্রমশঃ পাথরী পর্যন্ত হইতে পারে। খুব বেশী এবং অনবরত বরফ পান করিলে গুর্দা কমজোর হইয়া থাকে।

১। গুর্দার বেদনাও অতি প্রকট হইয়া থাকে। গরম পানি বোতলে পুরিয়া সেঁক দিবে। সেঁক-কার্য গুর্দা বেদনায় বিশেষ উপকারী।

২। ৩ মাষা দারুচিনি, ৩ মাষা রুমিমস্তগি অতি মিহিন করিয়া রওগনে গোলের সহিত একটু গরম করিয়া মালিশ করিলে বেদনার উপশম হয়।

৩। গুর্দার প্রচণ্ড বেদনা হইলে ।৴ ছটাক এরণ্ডের তৈল মৌরি ভিজান পানির সহিত সেবন করিলে কয়েকবার দাস্ত হইয়া গুর্দা পরিষ্কৃত হইবে। বেদনার উপশম হইবে।

৪। জাওয়ারেশে জালিনুছ বিশেষ ফলপ্রদ।

সুপথ্য—ছাগ, মুরগী, পাখীর গোশ্‌তের জুশ, গমের রুটি, ডাব ও কাগজি লেবু খুব উপকারী।

কুপথ্য—ডিম, গোশ্‌ত, ডাইল, ভাজাপোড়া, ভাত, পিঠা বিশেষ ক্ষতিকর।

মূত্রাশয়

নানা কারণে বিশেষতঃ শুক্রক্ষয় এবং বদহজমীর দরুন ও প্রস্রাবের বেগ ধারণের পরিণামে মূত্রাশয় দুর্বল হইয়া থাকে।

বহু মূত্র—এই রোগে সর্বদেহস্থ পানি পদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রাশয়ে উপস্থিত হয়। মূত্রমার্গ দিয়া অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হয়। দিন দিন শরীর ক্ষীণ ও অবসাদ প্রাপ্ত হয়। পিপাসাও বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা—১। পাকা কাঁঠালী কলা ১টা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা, দুধ ⁄। পোয়া একত্র ভক্ষণ করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

২। কচি তাল বা খেজুরের মূলের রস ও কাঁঠালী কলা দুগ্ধসহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাইলে বহুমূত্র প্রশমিত হয়।

অল্পমূত্র বা মূত্র রোধ— নিদারুণ জ্বলা-যন্ত্রণার সহিত অবাধে অল্প পরিমাণ প্রস্রাব হইলে নারিকেলের ফুল চালুনি পানিতে পিষিয়া খাইলে উহা নিবারিত হয়।

উক্ত ব্যাধিতে মলাবদ্ধ থাকিলে গোক্ষুর বীজের কাথে একটু যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্ররোধ, জ্বালা-যন্ত্রণা বিদূরিত হয়। পাথর কুচার পাতা লবণের সহিত চিবাইয়া রস ভক্ষণ করিলেও উপকার হয়।

অল্প যাতনার সহিত বাধ বাধভাবে অল্প মাত্রায় প্রস্রাব হইলে কুম্‌ড়ার রসে যবক্ষার ও পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত, অশ্মরী শর্করা নিবারিত হয়।

তেলাকুচার মূল কাজিতে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

চালুনি পানিতে রক্ত চন্দন ঘষিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

সমপরিমাণ ইছবগুলের ভুসি ও তোখ্‌মা দানা মিছরির সহিত ১ রাত্র ভিজাইয়া সকালে খালি পেটে পান করিলে আশাতীত সুফল পাওয়া যায়।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে ৩টি পাকা দয়া কলা (এটে কলা) খুব কচ্‌লাইবে অতঃপর ১৷৷০ মানকচুর ডগা কুচি কুচি করিয়া কলার সহিত একত্রে খুব উত্তমরূপে ছানিবে। একটা মেটে পাত্রে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে। যে রসটুকু উহা হইতে বাহির হইবে; ঐ রস রোগীকে সেবন করাইবে। খোদা চাহে ত সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্রাব হইয়া যাইবে।

কবুতরের পায়খানা পানিতে বেশ গরম করিয়া একটি টবে ঐ ফুটন্ত পানি রাখিয়া দিবে। রোগীকে সহ্যমত ঐ গরম পানিতে নাভী পর্যন্ত ভিজাইয়া বসাইবে। পানি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিলে প্রস্রাব হইয়া যাইবে।

বৃহৎ সোমনাথ রস বা বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস বিশেষ উপকারী। পূর্ণ চিকিৎসা কোন বিজ্ঞ হাকীম বা কবিরাজ দ্বারা করাইবে।

তদ্‌বীর

সূরা-ফাতেহা	১ বার	
قُلْنَا يَانَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ـ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ـ	৩ বার	একবার দম
ফাতেহা শরীফ	১ বার	একবার দম
سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ	৩ বার	
ফাতেহা শরীফ	১ বার	
সূরা-জীন প্রথম হইতে شططا পর্যন্ত	২ বার	একবার দম
ফাতেহা শরীফ	১ বার	
সূরা-কাফেরূণ	১ বার	একবার দম
ফাতেহা	১ বার	
সূরা-এখ্‌লাছ	১ বার	একবার দম
ফাতেহা	১ বার	
সূরা-ফালাক	১ বার	একবার দম
ফাতেহা	১ বার	
সূরা-নাস	১ বার	একবার দম
ফাতেহা	১ বার	
لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○	২ বার	একবার দম

উক্ত নিয়মে ১ বোতল পানিতে দম দিবে। সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফাসমূহ একখণ্ড কাগজে লিখিয়া পানিতে ভিজাইয়া দিবে। প্রত্যহ ঐ পানি ৩ বার সেব্য। নিম্নলিখিত তদ্‌বীর

চিনা বরতনে লিখিয়া ধৌত করিবে। উহা রোগীকে সেবন করিতে দিলে তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ الْاَ رْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ رمص نفخ و شفوا بفضل الله عز و جل ـ

সুপথ্য—ডাব, কাগজী, মওসুমী ফল ইত্যাদি লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য।

কুপথ্য—গুরুপাক ভাজা পোড়া, মরিচ ইত্যাদি কষায় রস অহিতকর।

অনবরত পেশাব হইতে থাকিলে পাঁঠা ছাগলের কয়েকটা খুর ভস্ম করিয়া ঐ ভস্ম পানিতে নিক্ষেপ করত পান করিতে দিবে। খোদা চাহে ত উহা নিরাময় হইবে।

পাথরী

কারণ—পাথরী একটা মারাত্মক ও প্রাণনাশক ব্যাধিও বটে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, গুর্দা সতেজ ও সবল না হইলে ভুক্ত দ্রব্যের সূক্ষ্ম কণিকা সকল গুর্দার ভিতর জমা হইয়া আস্তে আস্তে পাথরীতে পরিণত হয়। প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিলেও মূত্রাশয়ের মধ্যে তলানি জমাটাকারে ক্রমশঃ শক্ত আকার ধারণ করিতে পারে।

সঙ্গম, মৈথুন ও স্বপ্নদোষ হেতু ক্ষরিত শুক্র বাহির হইতে না দিয়া যাহারা উহা রোধ করিয়া থাকে এহেন মূর্খদেরও পাথরী হইতে পারে। পাথরী অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, পাথর বড় হইয়া গেলে অপারেশন ছাড়া কোন ঔষধে ভাল হয় না বলিলেও চলে।

লক্ষণ—ডান কিংবা বাম পায়ের অথবা উভয় পায়ের উরু ভারবোধ হয়। পুরুষাঙ্গের তলদেশ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত যে সেলাইয়ের ন্যায় রহিয়াছে তথায় অসহনীয় বেদনা উপস্থিত হয়। তলপেটেও বেদনা হয়। বেদনাস্থল স্পর্শ করাও কষ্টদায়ক। প্রতি মুহূর্তে পেশাবের বেগ হয় কিন্তু অতি যন্ত্রণার সহিত সামান্য পেশাব বাহির হইয়া আবার বন্ধ হইয়া যায়। রোগী তখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে থাকে। যবাহ্‌কৃত মোরগের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ও করে। এ মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির আক্রমণ হইবার পূর্বেই সর্তকতা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চিকিৎসা—(ক) বরুণ ছাল, শুঠ ও গোক্ষুর। ইহাদের পাচন ২ মাষা যবক্ষার, ২ মাষা পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিলে পাথরী বিচূর্ণ হইয়া যায়।

(খ) তাল মূলী বাসী পানির সহিত বাটিয়া খাইলেও পাথরী প্রশমিত হয়।

(গ) ছাগদুগ্ধ মধু ও গোক্ষুর বীজচূর্ণ পান করিলে পাথরী প্রশমিত হয়।

(ঘ) ছোট এলাচ, যষ্টি মধু, গোক্ষুর, রেণুকা, এরণ্ড মূল, বাসক, পিপুল পাষণ ভেদী। ইহাদের সাথে শিলাজুত প্রলেপ দিয়া পান করিলে প্রস্রাবের ক্ষয় ও পাথরী বিনষ্ট হয়।

(ঙ) পাথর কুচার পাতা লবণের সহিত চিবাইয়া খাইলেও বিশেষ ফল হয়।

(চ) এসিড ফস ৩০× বিশেষ উপকারী, পাথর বাহির করিয়া দেয়।

(ছ) কবিরাজী ঔষধ—আনন্দযোগ ছাগ-দুগ্ধে সেবন করিলে পাথরী বিচূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যায়।

হেকিমী ঔষধ—কোশতায়ে হাজারুল ইয়াহুদ, জাওয়ারেশে জালিনুছের সহিত সেবন করিলেও পাথর চূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যায়।

তদ্‌বীর

নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া নাভীর বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَ رْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَآءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَ رْضِ وَ اغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَ خَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ فَاَنْزِلْ شِفَآءً مِّنْ شِفَآءِكَ وَ رَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ ـ

সূরা-এন্‌শেরাহ্ (الم نشرح) পূর্ণ; রেশমের এক টুকরা কাপড় কিংবা সাদা কাগজে লিখিয়া ১ বোতল পানিতে পুরিবে। রোগীকে ৪০ দিন সেবন করিতে দিবে।

নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ চিনা বরতনে লিখিবে। পানি দ্বারা ধৌত করিয়া প্রত্যহ ১ বার সেবন করিলে পায়খানা ও পেশাব ঠিকমত হইবে। পাথরী বিচূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا ـ وَ حُمِلَتِ الْاَ رْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَ انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ـ

প্রস্রাব বন্ধ হইয়া থাকিলে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া তাবীজরূপে নাভীর নীচে ধারণ করিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا ـ فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا الْاَ رْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَا الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْقُدِرَ ـ

নীচের তাবীজটি চিনা বরতনে লিখিয়া ধৌত করিয়া খাইলেও প্রস্রাব হইয়া থাকে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَاِذِاسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ (اِلٰى) مُفْسِدِيْنَ ـ

সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা বরতনে লিখিয়া ধৌত করিয়া নিয়মিত পান করিলে উপকার হইবে।

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, ছোট মাছের ঝোল, বেগুন, কদু, পটল, ঝিঙ্গে, ডুমুর, মানকচু, থোর, মোচা প্রভৃতি ব্যঞ্জন, পাখীর গোশ্‌ত, মুগ, মাষকলায়ের ডাল, দুগ্ধ, ঘোল, তাল ও খেজুরের মাতি, কচি তালশাঁস, কোমল নারিকেল ও চিনি প্রভৃতি লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য।

কুপথ্য—যাবতীয় মিষ্টিদ্রব্য, টক্ গুরুপাক দ্রব্য, দধি, পিঠ, তৈলে ভাজা দ্রব্য, মৈথুন, রাত্রি জাগরণ, পথ পর্যটন, অহিতকর।

জরায়ু

মেয়েদের নাভীর নীচে মূত্রাশয় এবং উহার নীচেই জরায়ু। জরায়ুর সহিত যোনির অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক। জরায়ু সবল ও কার্যক্ষম হইলে নানাপ্রকার ব্যাধি হইতে নিরাপদ থাকে। পক্ষান্তরে জরায়ু রোগাক্রান্ত নারী বহু প্রকার কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে জরায়ু রোগাক্রান্ত না হয়।

কারণ—অধিক পরিমাণ স্বামী সহবাসে ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দিন দিন উহা দুর্বল হইয়া যায়।

ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে অকালে গর্ভপাত করাইলে কিংবা বিশেষ কোন ব্যাধির কারণে অসময় গর্ভপাত হইলেও জরায়ু দুর্বল হইয়া যায়। অতিরিক্ত মরিচ, পিঁয়াজ প্রভৃতি কটু ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলেও উহা দুর্বল হইয়া যায়।

অনিয়ম, বেনিয়ম এবং অনুপযুক্ত আহারাদির দরুন ঋতুস্রাব যথা নিয়ম না হওয়াতেও জরায়ু ব্যাধি দেখা দিয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় লম্ফ-ঝম্ফ এবং জোরপূর্বক সন্তান প্রসব করাতে, প্রবল কাশিতে ও আমাশয়ে অনেক সময় জরায়ুর মুখনালি যোনী দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। কোন কোন মেয়ের ঐ বহিরাগত নালী এত বড় ও শক্ত হইয়া যায় যে, তখন অপারেশন ছাড়া উহার চিকিৎসাই অসম্ভব হইয়া যায়।

ঋতু বন্ধ—গাজরের বীজ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ অগ্নিপাত্রের মুখে একটা ঢাকনি দিবে এবং ঢাকনিতে একটি ছিদ্র আগেই করিয়া লইবে। ঢাকনির ছিদ্র দিয়া যে ধূম নির্গত হইবে যোনি দ্বার দিয়া উহা জরায়ু পর্যন্ত পৌঁছিতে দিবে। —বেহেশ্‌তী জেওর। মানুষের চুলের ধূম উল্লেখিত নিয়মে জরায়ুতে পৌঁছিবে। ইহাতে ঋতু বন্ধ, ঋতুর অনিয়ম ও ব্যতিক্রম বিদূরিত হইবে।
—হায়াতুল হায়ওয়ান

জরায়ু দোষে বাধক বেদনা হইয়া থাকে, এই বেদনা উপশমার্থে চিকিৎসা—ফুটের দানা / ছটাক, গোক্ষুর / ছটাক, বিড়ঙ্গ / ছটাক, মৌরি / ছটাক এই সমুদয় চূর্ণ করত /২ সের পানিতে জ্বাল দিবে। অর্ধ সের থাকিতে নামাইয়া লইবে। প্রত্যহ / ছটাক, এক সপ্তাহ পর্যন্ত সেবন করিবে।

ওলট্‌কম্বলের মূলের ছাল অর্ধ তোলা, ৭টা গোলমরিচের সহিত পিষিয়া ঋতুর ২/৩ দিন আগে হইতে ঋতুর পরও ২/৩ দিন পর্যন্ত ভক্ষণ করিতে দিবে। সকল প্রকার বাধক নির্মূল হইয়া যাইবে। কাল তুলসীর শিকড়, ২১টি গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে বাধক আরোগ্য হইয়া যায়।

অধিক রক্তস্রাব

সন্তান প্রসবান্তে, ঋতুকালে কাহারও অধিক রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

অর্ধ ছটাক দুর্বার রস চিনির সহিত দৈনিক ৩ বার সেবন করাইলে স্ত্রীলোকের অধিক রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

ডালিমের খোসা ২ তোলা, ডালিমের ফুলের মোচা ২ তোলা, মাজু ফল ২ তোলা, ২০ সের পানিতে জ্বাল দিয়া টবে পুরিবে। সহ্য মত উক্ত গরম পানির মধ্যে কোমর পর্যন্ত ভিজাইয়া বসিবে। পানি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিবে। খোদা চাহে ত রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

গেরো মাটি ১ তোলা, ছঙ্গে জারাহাত ১ তোলা, মাজুফল ১ তোলা, ইহাদের চূর্ণ ।০ তোলা ঠাণ্ডা পানির সহিত সেব্য।

তদ্‌বীর

এক ছটাক খাঁটি সরিষার তৈলের সহিত ১ তোলা কর্পূর মিশ্রিত করিবে। .... افحسبتم خير الرحمين পর্যন্ত ৩ বার পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যহ ৪/৫ বার তলপেট, কোমর এবং জরায়ু সোজাসুজি মালিশ করিবে। এই তৈল ব্যবহারের সঙ্গে নিম্নোক্ত তাবীজটিও জরায়ু বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ـ اَوَلَمْ يَرَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۤءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ১ খণ্ড কাগজে লিখিবে—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَاۤءَكِ وَيٰسَمَاۤءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاۤءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۤؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاۤءٍ مَّعِيْنٍ ـ

তাবীজ বানাইয়া কোমরে ধারণ করিবে।

উক্ত আয়াতদ্বয় ৩ বার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পানি দ্বারা হাত, মুখ ও পা ধৌত করিতে দিবে। কিছু খাইতেও দিবে।

প্রবল রক্তস্রাবে সম্ভব হইলে উক্ত তদ্‌বীরদ্বয়ের সহিত ঐরূপ পড়া পানি ১টি টব বা চৌবাচ্চায় পুরিয়া রোগিনীকে প্রত্যহ সকাল ও বৈকালে ১ ঘণ্টা করিয়া কোমর পর্যন্ত ভিজাইয়া বসিতে দিবে। খোদা চাহে তো রোগ নিরাময় হইবে।

ফাতেহাসহ চিনা বরতনে আয়াতে-শেফা লিখিয়া ধৌত করিয়া ঐ পানি সেবন করিতে দিবে।

প্রবল রক্তস্রাবে চলাফেরা করা নিষিদ্ধ।

শ্বেত প্রদর

ইহা ভয়ানক কুৎসিত ব্যাধি। স্ত্রীলোকে যদি অতিরিক্ত মরিচ, তিক্ত, রস, টক্ প্রভৃতি অনুপযুক্ত কুখাদ্য বহুল পরিমাণ ভক্ষণ করে, তবেই এই রোগ দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কোষ্ঠ কাঠিন্যের কারণেও রক্তস্রাব হেতু জরায়ু দুর্বল হইয়া যায়। অনেকের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও তিরোহিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—রোগের কারণ বর্জন করিবে। ১টি কাঁটা নটের শিকড় ৩টি গোল মরিচের সহিত বাটিয়া প্রত্যহ খাইলে শ্বেত প্রদর বিনষ্ট হয়। আপাং এর শিকড় বাটিয়া খাইলে রক্ত প্রদর বিনষ্ট হয়। নিম্নলিখিত পাচন মধুসহ দৈনিক ১ বার সেবন করিলে শূল, পীতবর্ণ, শ্বেত বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও অরুণ বর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় প্রদর বিনষ্ট হয়। দারু হরিদ্রা রসাঞ্জন, মুতা, ভেলা, বেল, বাসক, চিরতা। ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে উক্ত নিয়মে পান করিবে।

তদ্‌বীর

মূত্রাশয় অধ্যায়ের প্রথম তদ্‌বীরে যে পানি পড়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে উহা শ্বেত প্রদরে অবশ্যই ব্যবহার করিতে দিবে।

আয়াতে শেফা চিনা বরতনে ফাতেহাসহ লিখিয়া খাইতে দিবে।

জরায়ুতে জখম কিংবা চুলকানি হইলে বা ফুলিয়া গেলে এক ছটাক সরিষার তৈল লইবে এবং উহাতে নিম্নোক্ত নিয়মে আয়াতসমূহ পড়িয়া দম দিবে ভিতরে বাহিরে ব্যবহার করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّوَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ১০ বার

مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا ১০ বার

وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ ..... الظّٰلِمِيْنَ ৩ বার

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ ৩ বার

উক্ত আয়াতসমূহ এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া জরায়ু বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

শ্বেত ও রক্ত প্রদরে মেশ্‌ক জাফরান ও গোলাব নির্মিত কালি দ্বারা যথা নিয়মে ২টি তাবীজ লিখিবে। ১টি বাম হাতের বাজুতে, অপরটি পানিতে ভিজাইয়া ঐ পানি সেবন করিতে দিবে। তাবীজটি এই—

٧٨٦

رب	من	قولا	سلام
رحيم	رب	من	قولا
مشكل	رحيم	رب	من
كشايو	مشكل	رحيم	رب

بياض يعقوب ـ

ঋতু বন্ধ হইলে অনেকে হঠাৎ জ্ঞানহীন অচেতন হইয়া পড়ে। অনেকে ইহাকে জীনের আছর বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোন দুর্গন্ধ বস্তু শুঁকিয়া দিলে যদি চেতনা লাভ করে, তবে মনে করিবে উহা ঋতু বন্ধ হেতু উৎপন্ন হইয়াছে। এমতাবস্থায় স্রাব পরিষ্কার হইবার চিকিৎসা করিলেই সুফল হইবে। ঋতু হইতে পাক হইবার পর কিছুটা কস্তুরি নেকড়াযুক্ত করিয়া লজ্জাস্থানে ধারণ করিলে এরোগ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

গর্ভ

স্বামীর শুক্রে কীটাদি না থাকিলে কিংবা অন্য কোন কারণে স্ত্রীর সব কিছু যথাযোগ্য ঠিক থাকিলেও সন্তান পয়দা হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

স্বামীর কোন ত্রুটি নাই কিন্তু স্ত্রীর শ্বেত প্রদর, বাধক কিংবা ঋতু বন্ধ থাকিলে গর্ভ সঞ্চার হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করাইবে।

১। স্ত্রীর অজ্ঞাত সারে ঘোটকীর দুধ পান করাইয়া তখনই স্ত্রীসহবাস করিলে গর্ভের সূচনা হইয়া থাকে।

২। হাঁসের ভাজা অণ্ডকোষদ্বয় স্বামী ভক্ষণ করিয়া তখনই (স্ত্রীগমন করিলে গর্ভধারণ হইয়া থাকে।

৩। ঋতুর শেষ তিন দিন দৈনিক ৩ বার মানুষের চুলের ধুঁয়া জরায়ুতে দিবে এবং ঋতু বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে গোসল করিয়া স্বামী সঙ্গ লাভ করিলে চির বন্ধ্যার সন্তান লাভ হয়।

৪। মোরগের কোষদ্বয় ভস্ম করিয়া উহা পানির সহিত প্রতিদিন খালি পেটে স্ত্রীকে সেবন করাইবে।

গর্ভবতীর সাবধানতা

যাহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা, দাস্ত ও আমাশয় হইতে না পারে সেজন্য সর্বদাই আহারে বিচার করিয়া চলিতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোষ্ঠ কাঠিন্যের দরুন পেটে তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাজা বা শুক্না গোলাব ফুলের পোড়া পাতা ১০।।০ মাষা আধা পোয়া গোলাব পানিতে সারা রাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। সকালে মিছরির সহিত খুব ভালরূপে পিষিয়া উহা ভক্ষণ করিবে। ২/১ বার দাস্ত হইয়া পেট পরিষ্কার হইবে; বেদনা উপশম হইবে, পাকাশয় সবল ও সতেজ হইবে। গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকিবে না। গর্ভবতীর পোড়ামাটি খাইবার অভিলাষ হইতে থাকিলে সামান্য ভক্ষণ করিলে অবশ্য কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই; কিন্তু না খাওয়াই উত্তম। উপরি উক্ত নিয়মে গোলাব পাতার ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্ষুধা মন্দা হইলে মিষ্টান্ন ও তৈলাক্ত পদার্থ ভক্ষণ কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখিবে। উক্ত গোলাব পাতার ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বমি আসিলে বন্ধ করিবে না; অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বমিও করিবে না।

গর্ভবতীর হৃৎকম্প দেখা দিলে ২/১ ঢোক গরম পানি পান করিতে দিবে। চলা ফিরা করিবে। ইহাতে পূর্ণ উপশম না হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। দাওয়াউল মেছক-মোতাদিল সেবন করাইবে। ৫ মাষা হইতে ৯ মাষা।

আমাশয় হইতে পারে এমন আহার কখনও করিবে না। কারণ প্রবল আমাশয়ের কুন্থনে সন্তান রক্ষা করা দুসাধ্যও বটে। একান্ত আমাশয় হইয়া গেলে ১০/১৫ বৎসরের পুরাতন তেঁতুলের শরবৎ পান করিতে দিবে।

গর্ভবতীর রক্তস্রাব

প্রবল বেদনার সহিত রক্তস্রাবের পরিণামে সন্তান বিনষ্ট হইয়া থাকে। রক্তস্রাব দেখাদিলে অবিলম্বে উহার চিকিৎসা করিবে।

১ম মাসে রক্তস্রাব উপস্থিত হইলে উহার প্রতিকারার্থে যষ্টি মধু, ক্ষীর কাকোলী ও দেবদারু।

২য় মাসের রক্তস্রাবে আমরুল, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী।

৩য় মাসের রক্তস্রাবে পরগাছা, ক্ষীর কাকোলী, নীলোৎপল, অনন্ত মূল।

৪র্থ মাসের স্রাবে শ্যামা লতা, রাস্না, বামুন হাটী, যষ্টিমধু, অনন্ত মূল।

৫ম মাসের স্রাবে বৃহতি, কন্টকারী, গম্ভারীফল, বট বৃক্ষের ছাল, শুঙ্গা ও ঘৃত।

৬ষ্ঠ মাসের রক্তস্রাবে—চাকুলে, বেড়েলা, শজিনাবীজ, গোক্ষুর, যষ্টিমধু।

৭ম মাসের রক্তস্রাবে পানি দল, পদ্ম মৃনাল কিস্‌মিস, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি।

৮ম মাসের রক্তস্রাবে কয়েত বেল, বৃহতি, কন্টকারী, ইক্ষু ইহাদের মূল এবং পলতা।

৯ম মাসের স্রাবে যষ্টিমধু, অনন্ত মূল, ক্ষীর কাকোলী, শ্যামালতা, থেতো করিয়া দুগ্ধ পাক করিবে। এই দুগ্ধ উপযুক্ত মাত্রায় গর্ভবতীকে পান করিতে দিবে। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

গর্ভবতীর অকাল বেদনা

১ম মাসের বেদনায়—শ্বেত চন্দন, শুলফা, চিনি, কাষ্ঠ মল্লিকা, এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া চালুনি পানিতে বাটিবে। দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে। পথ্য দুধ ভাত।

২য় মাসের বেদনায়—পদ্ম, পানিফল, কেশুর চালুনি পানিতে পিষিয়া চালুনি পানিসহ সেব্য। ইহাতে বেদনার উপশম ও গর্ভের স্থিরতা হয়।

৩য় মাসের বেদনায়—ক্ষীর কাকোলী, কাকোলী, আমলকী পিষিয়া গরম পানিতে সেবন করিতে দিবে।

৪র্থ মাসের বেদনায়—উৎপল, শালুক, কন্টকারী, গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ সেব্য।

৫ম মাসের বেদনায়—নীলোৎপল, ক্ষীর কাকোলী দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুধ, ঘি ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

৬ষ্ঠ মাসের বেদনায়—টাবা লেবুর বীজ, যষ্টিমধু, রক্ত চন্দন, নীলোৎপল, দুগ্ধে পেষণ করত পান করিতে দিবে।

৭ম মাসের বেদনায়—শতমূলী ও পদ্মমূল বাটিয়া দুগ্ধসহ সেব্য।

৮ম মাসের বেদনায়—শীতল পানিতে পলাশপত্র বাটিয়া খাওয়াইবে।

৯ম মাসের বেদনায়—এরণ্ডমূল, কাকোলী শীতল পানিতে পিষিয়া সেবন করিতে দিবে। অবশ্য ৯ম ও ১০ম মাসের প্রসব বেদনা বুঝিলে আর বেদনা উপশমের চিকিৎসা করিবে না।

অসময় বা অকালে গর্ভ পাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ; কেশর, পানিফল, পদ্ম কেশর, উৎপল, মুগাণি ও যষ্টিমধু। এই সমুদয় দ্রব্যের কল্কোসিদ্ধ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেব্য। পথ্য কেবলমাত্র দুধ ভাত। বকরীর দুধ ৵০ ছটাক মধু ২ মাষা কুম্ভকারের মর্দিত কর্দমী ৪ মাষা একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়।

গর্ভবর্তী নানাবর্ণের অতিসার, গ্রহণী, জ্বর, শোথ, শূল নিবারণার্থে লবঙ্গাদি চূর্ণ বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুলদা, ডালিম ফলের খোসা, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, শিমূলের আটা, নীল সুদীমূল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ আতইচ, কাক্‌ড়া শৃঙ্গি, খদির ও বালা। প্রত্যেক সমান ভাগ চূর্ণ ভীমরাজের রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিবে। অনুপান ছাগ-দুগ্ধ মাত্রা ⁄০ হইতে ।০ পর্যন্ত। গর্ভচিন্তামণি রস—ইহা সেবনে গর্ভবতীর জ্বর, দাহ, প্রদাহ, প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা সূতিকা রোগও বিনষ্ট হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—রস সিন্দুর, রৌপ্য, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা অভ্র ৪ তোলা কর্পূর, বঙ্গ, তাম্র, জায়ফল, জৈত্রী, গৌক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলার মূল প্রত্যেকটি ১ তোলা পানিতে মর্দন করিয়া ২ রতি বটি তৈয়ার করিবে।

সুপথ্য—আঙ্গুর, পেয়ারা, ছেব, নাশপতি, ডালিম, আম, জাম, আমলকী, ছোট পাখী ও খাসির এবং বক্‌রীর গোশ্‌ত। গমের রুটী, মুগ, মাখন, ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, মিছরি, কলা, কিসমিস, মোনাক্কা, আন্‌জীর, মধুর দ্রব্য, চন্দন, ঘোল, স্নান, কোমল শয্যায় শয়ন সামান্য পরিশ্রম প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর দ্রব্য।

কুপথ্য—রেউচিনি, ছোলা, মূলা, গাঁজর, হরিণের গোশ্‌ত, অতিরিক্ত ঝাল, বেশী টক ও তিক্ত দ্রব্য, তরমুজ, অধিক মাষকলায়ের ডাল, বিবাদ, অতি ভোজন, রাত্রি জাগরণ, অপ্রিয় দর্শন, অধিক ব্যায়াম, বেশী ভার বহন, দিবানিদ্রা, শোক, ক্রোধ, ভয়, মলমূত্রের বেগ ধারণ, উপবাস, চিৎভাবে শয়ন, উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়া, অধিক পরিমাণ জুলাপ, ক্যাষ্টার ওয়েল ব্যবহার, চতুর্থ

মাসের পূর্বে এবং সপ্তম মাসের পরে স্বামী সহবাস, সুগন্ধি ব্যবহার বিশেষতঃ নবম মাসের পরে, অলসতা, সর্দি কাশি প্রভৃতি অহিতকর ও নিষিদ্ধ।

তদ্‌বীর

১। গর্ভধারণ ও রক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় কাগজে লিখিয়া স্ত্রী লোকের কোমরে ব্যবহার করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَاللهُ خَيْرٌحَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ اَللهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَ رْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২। যাহাদের সন্তানই হয় না কিংবা গর্ভে মরিয়া যায় তাহাদের মাথার তালু হইতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী পরিমাণ হলুদ রংয়ের কাঁচা সূতা লইবে। নয়টি গিরা দিবে, প্রত্যেকটি গিরায় নিম্নোক্ত আয়াৎ পড়িয়া ১ বার ফুঁক দিতে যাইবে। অতঃপর উহা স্ত্রী লোকের গলায় কিংবা কোমরে ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَاصْبِرْوَمَاصَبْرُكَ اِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ

এ সঙ্গে সূরা-কাফেরূণও এক একবার করিয়া পড়িবে।

৩। উক্ত রোগে এবং গর্ভবতী হঠাৎ আঘাত পাইলে বা আছাড় খাইলে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া তৈল ও পানিতে দম দিয়া গোসল করিতে দিবে। নীচের তাবীজটি গলায় ধারণ করিতে হইবে যেন পেটের উপরিভাগে ঝুলিয়া থাকে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ اَللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ـ وَ اِذْ قَالَتِ امْرَاَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ـ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ـ وَاصْبِرْوَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللهِ وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর এই তাবীজটি সন্তানের গলায় বাঁধিয়া দিবে। ইহা দ্বারা গর্ভবতীর ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন বিদূরিত হয়।

৪। ৪০ তার কাল সূতা ১।। গজ লম্বা। উহা হাতে রাখিয়া পূর্ণ সূরা-ইয়াসীন পড়িবে। প্রত্যেক মুবীনের সময় একটি গিরা এবং উহাতে ফুক দিয়া গর্ভবতীর কোমরে ধারণ করিলে গর্ভপাত হয় না।

৫। ৪০টি লবঙ্গ হইবে। প্রত্যেকটি লবঙ্গের উপর ৭ বার নিম্নোক্ত আয়াৎ পড়িয়া ফুক দিবে। ঋতু হইতে পবিত্রতা লাভের পর প্রত্যহ রাত্রে ১টি লবঙ্গ চিবাইয়া খাইবে। লবঙ্গ খাওয়ার পর পানি খাইবে না এই ৪০ দিনের মধ্যে স্বামী সহবাস হওয়া দরকার।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَوْكَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ـ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَلَوْاَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْقُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُجَمِيْعًا ـ

হরিণের পাকস্থলীর চামড়ার উপর উক্ত আয়াৎ মেশ্‌ক জাফরাণ ও গোলাব পানি দ্বারা লিখিয়া গলায় ধারণ করিলে চির বন্ধ্যারও গর্ভ হইয়া থাকে।

৬। মৃত বৎসা রোগে প্রথম মাসের কোন এক সোমবার দুপুরের সময় ছটাক গোল মরিচ, ছটাক যোয়ান লইবে। ১ বার সূরা-শাম্‌ছ ও একবার দুরূদ শরীফ পড়িয়া উহাতে দম দিবে। এইরূপ ৪০ বার করিবে। গর্ভবতীকে প্রত্যহ ১টি মরিচ ও কয়েকটি যোয়ান খাইতে দিবে। যতদিন সন্তান দুধ খাইবে ততদিন মাতা উহা খাইতে থাকিবে। খোদা চাহে ত মৃত বৎসা রোগ দূর হইবে।

৭। পুং খরগোশের পনির উহার কোষদ্বয়ের সহিত পিষিয়া খাইয়া স্ত্রীগমন করিলে পুত্র সন্তান; স্ত্রী খরগোশের খাইলে কন্যা সন্তান লাভ হয়।

৮। সদা কন্যা সন্তান হইতে থাকিলে স্ত্রী পেটের উপর স্বামী শাহাদৎ আঙ্গুলী দ্বারা গোল দায়েরা দিয়া ঐ দায়েরার মধ্যে লিখিবে। يا مبين এরূপ ৭০ বার করিবে। খোদা চাহে ত পুত্র সন্তান লাভ করিবে।

৯। জীনের আছর থাকিলে সন্তান নষ্ট হইয়া থাকে। অবস্থা এরূপ হইলে জীন অধ্যায় দেখিয়া উহাকে তাড়াইবার জন্য সহজ তদ্‌বীর করিবে। গর্ভে সন্তান থাকিলে জীনের কড়া তদ্‌বীর করিবে না ইহাতে সন্তান ও মাতা উভয়ের প্রাণনাশের আশঙ্কা রহিয়াছে। তাবীজ কবজ দ্বারা জীন দূরে সরাইবার চেষ্টা করিবে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকের মধ্যে মানুষের শেকায়েত করিয়াছেন এবং বড়ই মর্মান্তিক ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেনঃ "মানুষ তাহাদের মহান খোদার পূর্ণ ও যথাযোগ্য মহত্ত্ব স্বীকার করিল না।" আল্লাহ্ পাক জলদ গম্ভীর স্বরে কোরআনের মধ্যে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেনঃ "আমি স্বয়ং; আসমান-জমীন এবং ইহাদের মধ্যস্থিত সবকিছুর আর যাহা তোমরা দেখিতে পাও কিংবা না পাও আমি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, রুজিদাতা এবং ধন-জন, জ্ঞানবান, বিদ্যা-বুদ্ধি সবকিছু প্রদানকারী।" মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, পরিবর্তন সবকিছুরই প্রত্যক্ষকারী; দর্শনকারী ও শ্রবণকারী। আমার জ্ঞানের এবং ক্ষমতার বাহিরে কোন কিছুই হইতে পারে না। কোরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ্ তা'আলার এ সব মহত্ত্বের কীর্তন বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুসলমান! তুমি কি খোদার গুণাবলীসমূহ নিজের ভিতর, বাহির, কথায়, কাজে, পরিকল্পনায়, হৃদয়ে এবং মগজে ঢুকাইতে পারিয়াছ? সত্যই তুমি যদি উহা মানিয়া থাক তুমি খাঁটি মুসলমান। আর যদি একেবারেই অস্বীকার কর, তবে তুমি বে-ঈমান মরদুদ কাফের।

শুধু জমা খরচের বেলা যদি উহা মানিয়া লও বা সমাজে ব্যক্তি বিশেষের চাপে সংযত থাক আর মুখে খোদাকে সর্বশক্তিমান মানিয়া লও; কিন্তু তোমার মন-মগজ উহা কবূল করিয়া না লইয়া থাকে, কিংবা কোন প্রকার ইতস্ততঃ বা সন্দেহ তোমার মনে জাগরুক থাকে, তবে তুমি একজন সত্যিকার মোনাফেক।

অতএব, দেখা যায়, সত্যিকার মু'মিন একমাত্র সে-ই, যে খোদার উল্লিখিত গুণাবলী স্বীকার করিয়া লয়। তাহারা ভ্রমেও খোদার সার্বভৌমত্বকে ভুলিতে পারে না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় কালামে পাকে অতি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে—একমাত্র আল্লাহ্ই রাজ্জাক। তিনি ভিন্ন আর কোন রাজ্জাক বা রেজেকদাতা নাই। তিনি কোরআনে পাকে বলিতেছেনঃ "(হে মানব!) তোমরা সন্তান নষ্ট করিও না অভাবের ভয়ে; কারণ তোমাদিগকে এবং তোমাদের সন্তানগণকে আমিই রেজেক প্রদান করিয়া থাকি।"

অতএব, প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে সৃষ্টি-কর্তা, রক্ষা কর্তা, পালন কর্তা, রেজেকদাতা এবং নিজকে তাহার একান্ত অনুগত দাস ও বান্দা বলিয়া ধারণা করা। পক্ষান্তরে যদি কেহ আল্লাহ্কে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার মহান গুণাবলীকে কাড়িয়া লইয়া নিজেকে ফেরআউন বানাইতে চায়, তবে তাহার পরিণাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

অধুনা আমাদের এক শ্রেণীর মহারথীরা ভূমি সংকট এবং আর্থিক দৈন্যের কথা চিন্তা করিয়া একেবারে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এ কথা তাহাদের তলাইয়া দেখা উচিত যে, এই সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা দেশ যার ঐশ্বর্যের কারণে বহির্ভারতের বড় বড় তাগুবীদিগকে বার বার ভারত আক্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। সেই সোনার বাংলা আজ কেন মহা শ্মশানে পরিণত হইল? আমাদের মহারথীরা সেদিকে একবারও দৃকপাত করিয়াছেন কি?

নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রি হইত একথা কে না জানে? তখন মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যকীয় জিনিস-পত্রও ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ এবং সস্তা। কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম সাম্রাজ্যবাদী রাজা-বাদশাহ্গণ সুদীর্ঘ কয়েক শত বৎসর ব্যাপিয়া চরম ভোগ-বিলাস, নারী-বিলাস ও নানা প্রকার পাপাচারে পৃথিবীর মাটি, পানি ও শূন্যের হাওয়াকে কলুষতায় বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকার পরিবর্তে তাহারা আরও উৎসাহ বোধ করিত। মোগল সম্রাট আকবর তো নূতন মনগড়া মতবাদ প্রচার করিয়া সকল দেশবাসীকে গোমরাহীর চরমে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। এই সব অমার্জনীয় খোদাদ্রোহিতার ফলেই জমিনের দিকে নামিয়া আসিল মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার গজব ও ক্বহর। যার বাস্তব পরিণতি স্বরূপ যালেম নিষ্ঠুর ইংরেজ জাতিকে ক্ষমতাসীন করিয়া দিয়াছিলেন এদেশবাসীর উপর।

দুর্ধর্ষ ইংরেজ জাতি এই দেশের অধিবাসীদিগকে চির গোলাম বানাইবার উদ্দেশ্যে বহু সুপরিকল্পিত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। বয়ঃবৃদ্ধ নাগরিক ও তৎকালীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, সুচতুর ইংরেজরা জাহাজে বোঝাই করিয়া এদেশের খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি

সাত সমুদ্রের ওপার পার করিয়া দিত। দেশের ধান পাটের ক্ষেত জোরপূর্বক নীলের ক্ষেতে পরিণত করিত। ১ম ও ২য় মহাযুদ্ধের যাবতীয় খরচই তারা নির্যাতীত ভারত হইতেই উসুল করিয়া লইয়াছিল। দেশের সোনা, মুক্তা, হিরা, জহরত সবকিছু সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে লইয়া গিয়াছিল। যুগ যুগ ধরে ঘাটতি পূরণ করে খাদ্য-দ্রব্যাদির যে ভাণ্ডারটি সঞ্চিত ছিল তা কুমিল্লা, চিটাগাং ও সাতক্ষীরা এলাকায় ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। কোটি কোটি মণ ধান আগুনেরই খোরাক হইয়াছিল। অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী বুড়িগঙ্গা, মেঘনা ও কর্ণফুলীর কোমল চরণে অর্পণ করা হইয়াছিল। জাতির আখলাক নষ্ট করিয়া খোদার গযব আযাবে নিপতিত করার জন্য তাহারা বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করিয়া গান-বাদ্য ও বেশ্যার আমদানি করিত। এইসব সুপরিকল্পিত পন্থায় তাহারা এদেশবাসীর মন-মগজ এবং চরিত্রকে এমনিভাবে কলুষিত করিয়া দিয়াছে, যার ফলে দেশবাসী তার স্বাস্থ্য-সম্পদ, ধন-সম্পদ এবং শিক্ষা, তাহযীব, তমদ্দুন সকলই হারাইয়া একেবারে নিঃস্ব নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছে। বৃটিশ সরকারের এই চক্রান্ত এবং নিজেদের অসীম পাপের দরুন খোদার অসন্তুষ্টির কারণে আজ সোনার বাংলা মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এই চরম দুর্দশার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের নব্য শিক্ষিত পাতি-ফিরিংগিরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইহা কার্যকরী করার জন্য তৎকালীন পাক-সরকার একমাত্র বাংলাদেশেই কয়েক শত ক্লিনিক স্থাপন করিয়াছে। ইহাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। সরকার যথারীতি প্রচার কার্যও চালাইতেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে সব পথ তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে তৎসমুদয় সম্পর্কে তাহারা নিজেরাই এপর্যন্ত নিশ্চিত হইতে পারে নাই।

এ-প্রসঙ্গে আমাদের কথা ঃ

(১) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই রেযেক দাতা। কেহ যদি নিজে রুযিদাতা হওয়ার দাবী করেন অথচ বিপুল জনতার খাদ্য দানে অপারগ হন, তবে তিনি গদী ছাড়িয়া জঙ্গলে যাইতে পারেন। সেজন্য তার পথ একেবারেই খোলা রহিয়াছে।

(২) আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যে পরিমাণ লোকের বসবাস ও আহার্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন ঠিক সেই পরিমাণ মানুষই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। খোদার কাজ লইয়া মানুষের ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না।

(৩) প্রতি বৎসর পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও সাগর উপসাগর হাজার হাজার একর জমি ভাসাইয়া দিতেছে। ফসল উৎপন্নের প্রচুর জমি অনাবাদ পড়িয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা কি এসব নেয়ামত মানুষের জন্য দান করিতেছেন না?

(৪) মরুময় দেশ আরব ভূমিতে (যেখানে বালুকারাজী ও বাবলা গাছ ছাড়া আর কিছু জন্মে না) জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্নই উঠিতেছে না, তবে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশে এ প্রশ্ন শুধু অবান্তরই নয়, বোকামিও।

(৫) জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে দেশে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার যাবতীয় দ্বার উন্মুক্ত করা হইতেছে। কুৎসিৎ নাটক, নভেল ও উলঙ্গ চিত্র দ্বারা লাইব্রেরী, ক্লাব সম্পূর্ণ ভরপুর করা হইতেছে, উলঙ্গ নৃত্যকে আর্টের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অশ্লীল সিনেমার আমদানী করিয়া দেশের যৌন-উদ্বেলিত ছেলে-মেয়েদিগকে উচ্ছৃঙ্খলার দিকে দ্রুত ধাবিত করা হইতেছে। নারী-পুরুষ সকলেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামাদিকে যৌন-আবেদনপূর্ণ করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া অবাধে

যৌনকার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ফলে দেশের জারজ সন্তানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। থিয়েটার ড্রামার অংশ গ্রহণ করার জন্য যুবক যুবতীদেরকে উৎসাহিত করা হইতেছে। দেশের পতিতালয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কো-এডুকেশন দ্বারা যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার পথকে প্রশস্ত করা হইতেছে। এইরূপ অসংখ্য উপায়ে পাপাচারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ঈমানদার মুসলমানদেরকে হতভম্ব করিয়া দিয়াছে। পাপের এইসব মহা তাণ্ডবলীলা দুনিয়ার আকাশ-বাতাস, মাটি-পানি বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই দেশবাসীর ভাগ্যে নামিয়া আসিয়াছে সর্বধ্বংসী আসমানী বালা-মছীবত, অজন্মা, অভাব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারী। খোদা জানেন, এই হারেই যদি পাপাচার ও খোদাদ্রোহিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে হয়ত এমনও দিন আসিতে পারে যেদিন অভাবের তাড়নায় জিন্দা মানুষকেও মারিয়া কমাইতে হইবে। আমাদের নব্য শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা ফিরিংগী সভ্যতার মোহে পড়িয়া নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। পাশ্চাত্যের নর-নারীর অবাধ মেলামেশা—বেপর্দা না হইলে নাকি তাদের সভ্যতাই রক্ষা পায় না। তাহারা বলে, মনের পর্দাই যথেষ্ট; বাহিরের পর্দার দরকার নাই।

(৬) জাতির অধঃপতন ও অবনতি যখন ঘনাইয়া আসে জাতির ভাগ্যবিপর্যয় যখন অত্যাসন্ন হইয়া পড়ে তখনকার অবস্থা এই দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে কোরআনে পাকে বলা হইয়াছে, "ধ্বংসমুখী জাতি সুপথ দেখিয়াও তাহা গ্রহণ করে না বরং কু-পথ খুঁজিয়া তাহার অনুসরণ করে।" পাশ্চাত্যের অবাধ মেলামেশা আমদানী করিয়া আমাদের ভদ্রসমাজ আজ গর্ব অনুভব করিতেছেন; কিন্তু একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, পোল্যাণ্ডের ন্যায় প্রগতিশীল দেশে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার দরুন ১৯৫৯ সালে ৮০ হাজার অবৈধ গর্ভপাত হইয়াছে। আমেরিকার মেক্সিকোতে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৪টি অবৈধ নারী-ধর্ষণ ঘটিতেছে। আধুনিক সভ্যতার চরম উন্নতির দাবীদার লণ্ডনে শতকরা দশভাগ জারজ সন্তান উৎপন্ন হইতেছে। অবস্থা এতটুকু গড়াইয়াছে যে, ঐ সব দেশের লোকেরা প্রকৃত পিতা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। কাহার সত্যিকার জন্মদাতা কে তাহা সঠিকভাবে বলা মাতার পক্ষেও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। এহেন পাশ্চাত্য সভ্যতাই আমাদের দেশে আমদানি করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস ব্যভিচার ও তার আনুষঙ্গিক কার্য চালু রাখিয়া বার্থ কন্ট্রোল বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন করা আর জতির গলায় ছুরি চালান একই কথা। আর যদি যাবতীয় খোদাদ্রোহিতা বর্জন করতঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রথার রেওয়াজ দেওয়া হয়, তবে একমাত্র অভাবের তাড়নায়ই এ বিকৃত পন্থা অবলম্বন করা হইবে। ইহাও হইবে খোদা-দ্রোহিতার অন্তর্ভুক্ত; কারণ রেযেকের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই। কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা দিয়াছেনঃ সত্যসত্যই যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেশবাসী যথাযথরূপে মানিয়া লয় এবং আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ হইতে পুরোপুরি বিরত থাকে, তবে "আমি আল্লাহ্" আসমান ও জমিনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব (বান্দার খাদ্যের জন্য কোন চিন্তাই করিতে হইবে না।)

(৭) বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে যখন সবই সম্ভব হইতেছে তখন ভূমির উর্বরা শক্তি ও ফসলাদির উৎপন্ন কেন বৃদ্ধি পাইবে না? কাজেই মানুষ কমাইয়া জেনা বাড়াইয়া, খোদার গযব নামাইয়া আনিয়া জতির উন্নতির মাথায় বজ্রাঘাত করার কি অর্থ থাকিতে পারে। তবে সরকারী প্লান আইনগত প্রথা ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি কোন রমণী অধিক সন্তান জন্মের দরুন স্বাস্থ্যহীনা হইয়া পড়ে কিংবা পূর্ব হইতেই যদি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া থাকে, তাহলে এরূপ নারীদের

জন্য গর্ভরোধক ঔষধ ব্যবহার করা কোনো প্রকারে জায়েয হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়াই উহা করা উচিত, নতুবা হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসাবে নিম্নে কতিপয় ঔষধের উল্লেখ করিতেছি।

১। সিকি তোলা কর্পূর ভক্ষণ করিলে কোনদিন গর্ভ সঞ্চার হইবে না।

২। খাসী-ছাগলের পেশাব সেবন করিলে সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না।

৩। বনস্তিষ কাল মুরগীর পিত্ত লিঙ্গে মালিশ করিয়া সঙ্গম করিলে নারী পুরুষ উভয়ে অপার আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, স্ত্রী চিরতরে বন্ধ্যা হইয়া যায়।

৪। যে কয়েকটি লাল কুচ পানির সহিত সেবন করিবে ঠিক সেই কয়টি বৎসর সন্তানের সঞ্চার হইবে না।

গর্ভবতীর পেটে সন্তান গোজ মারিয়া থাকিলে তাহার চিকিৎসা

১। নিম্নলিখিত আয়াত জাফরান দ্বারা চিনা বরতনে লিখিয়া বৃষ্টির পানিতে ধৌত করিয়া গর্ভবতীকে সেবন করিতে দিবে। খোদা চাহে ত সন্তান চেতনা লাভ করিবে। প্রসূতি শান্তি লাভ করিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ ـ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ হইতে عَلِيْمٌ ـ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَشِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَايَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ ৭টি টুকরা কাগজে লিখিবে। এক কাগজ (তাবীজ) এক রাত্রি পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে খালি পেটে গর্ভবতী উক্ত পানি পান করিবে। পর পর সাতদিন এরূপ করিবে। খোদা চাহে ত সন্তান চেতনা লাভ করিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا হইতে مِنَ الْغَمِّ ـ وَقَالُوْا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا হইতে مُحْضَرُوْنَ ـ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ হইতে يَّنْظُرُوْنَ ـ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ـ

গর্ভে সন্তানের অস্থিরতা

গর্ভিনীর শারীরিক ব্যাধি, সন্তানের কোন অসুবিধা কিংবা আঘাত বা আছাড় হেতু লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া থাকে। ইহাতে গর্ভবতী কোন কোন সময় মূর্ছিতা এবং কোন কোন সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। চিকিৎসার্থে প্রথমে কারণ নির্ণয় করিয়া উহার প্রতিকার করিবে।

১। সমপরিমাণ আরআর (গুল্ম বিশেষ) ও যোয়ান পিষিয়া ৩ দিন প্রাতঃকালে খালি পেটে সেবন করিবে। গর্ভবতী ও সন্তান উভয়েই শান্তি লাভ করিবে।

২। প্রসূতির কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু উহার উদ্ভব হইলে ইউছুফগুলের ভূষি ও তোখ্‌মা দানার শরবত পান করিতে দিবে।

৩। গর্ভবতীর হৃদ-স্পন্দন হইলে হৃদরোগ অধ্যায়ের উল্লিখিত তাবীজ বাঁধিবে।

৪। গর্ভজাত সন্তান খুব বেশী অস্থির হইলে কিংবা বেশী নড়াচড়া করিলে অথবা ঊর্ধ্বগামী হইলে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া পেটের উপরি ভাগ পর্যন্ত ঝুলাইয়া দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَفَحَسِبْتُمْ (الاية) ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ وَاِنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا .... رَهَقًا ـ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَافِى السَّمَاۤءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ اُرْقُدْ اُرْقُدْ فِى بَطْنِ اُمِّكَ مُسْتَرِيْحًاوَّلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

প্রসব বেদনা

১। নবম মাসের প্রথম হইতে গর্ভবতীকে প্রত্যহ সকালে খোসা তোলা ১১টি বাদাম মিছরির সহিত খুব পিষিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। হজম শক্তি কমজোর হইলে উহার সহিত ১ মাষা মোস্তাগিও পিষিয়া লইবে। ইহাতে পাকাশয়ের ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইবে। সন্তান সহজে প্রসব হইবে। সহ্যমত গরম দুধ সেবন করিতে দিবে।

২। দুই তোলা নারিকেল ও দুই তোলা মিছরি উত্তমরূপে পিষিয়া দৈনিক ভক্ষণ করিলেও যথা সময় সহজে সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

৩। প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে প্রসূতির বাম হাতে কিছুটা চুম্বক লৌহ সজোরে চাপিয়া ধরিতে দিবে। সন্তান তৎক্ষণাৎ ভুমিষ্ঠ হইবে।

৪। সন্তান প্রসবের দিন ঘনাইয়া আসিতে থাকিলে প্রত্যহ নাভীর নীচে সহ্যমত গরম পানির ধার দিতে থাকিবে।

৫। নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কাঁটানটে কিংবা দয়াকলা গাছের শিকড় উঠাইয়া উহা গর্ভবতীর চুলের সম্মুখ ভাগে বাঁধিয়া দিবে।

৬। নীলগায় (জংলী গরুর) শিং হাতে বা গলায় বাঁধিলে তৎক্ষণাৎ সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

৭। শকুনের পালক প্রসূতির নিম্নে রাখিলে খুব শীঘ্রই সন্তান প্রসব হইয়া যায়। ফুলও অনতি বিলম্বে বাহির হইয়া যায়।

৮। মাকড়সার পূর্ণ একটি সাদা জাল ২ তোলা পানির সহিত পিষিয়া জরায়ু মুখে লাগাইবা মাত্রই সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

গর্ভে মরা সন্তান ও ফুল
বাহির করিবার উপায়

১। ফুল বাহির হইতে দেরী হইলে উহার সাধারণ তদ্‌বীর ধাত্রীগণ করিয়া থাকেন। উহাতে সুফল না হইলে ক্ষীরা, শসা, কিংবা সড়মার লতা থেতো করিয়া পানিতে জ্বাল দিবে। ঐ পানি প্রসূতিকে সেবন করাইলে অনতিবিলম্বে ফুল ও মরা সন্তান বাহির হইয়া যায়।

২। ঘোড়া, গাধা কিংবা খচ্চরের খুরের ধুঁয়া প্রসূতির যোনী দ্বারে লাগাইলে মরা, তাজা সন্তান ও ফুল শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়।

৩। জবু কিংবা শৃগালের সম্মুখের পা প্রসূতির পদদ্বয়ের তলে রাখিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

তদ্‌বীর

১। প্রসব বেদনা অল্প অল্প আরম্ভ হইলে যে কোন প্রকার মিষ্টির উপর নিম্ন আয়াত ৩ বার পড়িয়া দম করিবে। প্রসূতিকে একটু একটু খাইতে দিবে। আল্লাহ্ চাহে ত খুব শীঘ্রই প্রসব হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২। উক্ত আয়াতের সহিত লিখিবেঃ

اهيا اشراهيا اللهم سهل عليها الولادة خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

বাম পায়ের উরুতে বাঁধিবে। সন্তান প্রসবান্তে তৎক্ষণাৎ তাবীজটি খুলিয়া ফেলিবে।

৩। জাফরান, মেশক ও গোলাব পানিতে প্রস্তুত কালি দ্বারা নিম্নোক্ত দো'আ ও আয়াত চিনা বরতনে লিখিবে। নির্মল পানিতে ধৌত করিয়া প্রসূতিকে সেবন করিতে দিবে। খোদা চাহে ত সন্তান প্রসব হইতে দেরী হইবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ـ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَاهَا كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ ـ

৪। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, সন্তান প্রসব হইতেছে না এবং বেদনায় প্রসূতি অস্থির হইলে নিম্নোক্ত আয়াত ও দো'আ বরতনে লিখিয়া নির্মল পানিতে ধৌত করিয়া কিছুটা সেবন করিতে দিবে। কিছুটা বেদনা স্থলে মালিশ করিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ .... يُؤْمِنُوْنَ ـ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَاهَا ـ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتْ ـ سَالِمًا مُسْلِمًا ـ

৫। প্রসূতির মাথার চিরুণীর এক পিঠে লিখিবেঃ

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ

অপর পিঠে লিখিবেঃ جبرائيل ـ ميكائيل ـ اسرافيل ـ عزرائيل

চিরুণীখানা গর্ভবতীর বাম পায়ের উরুতে বাঁধিবে। প্রসবান্তেই খুলিয়া রাখিবে।

৬। নিম্নোক্ত দো'আ গর্ভবতীর মাথার চিরুণীতে লিখিয়া ডান পায়ের উরুতে বাঁধিবে।

أُخْرُجْ اَيُّهَا الْجَنِيْنُ مِنْ بَطْنِ اُمِّكَ فَاِنَّ الْاَرْضَ تَدْعُوْكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اَوَلَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْئٍ حَيِّ ـ

৭। মানুষাকৃতি কুকুর এবং নরাকৃতি শয়তান, বে-শরা বে-ঈমান ফকির যাদুমন্ত্র দ্বারা সন্তান প্রসব বন্ধ করিয়া থাকে। উহার প্রতিকারার্থে যাদু নষ্ট করিবার তদ্‌বীর অবশ্য করিবে।

৮। নবজাত শিশুর গলায় নিম্নোক্ত তাবীজ ও তখ্‌তি লিখিয়া দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَعُـوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّكُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

৯। চান্দির পাটা বা তখ্‌তির উপর নিম্নোক্ত তাবীজ লৌহ দ্বারা অঙ্কন করিয়া সন্তানের গলায় দিবে।

يارقيب	يامهيمن	يامؤمن	ياحفيظ	ياحافظ
ياحافظ	ياحفيظ	يامؤمن	يامهيمن	يارقيب
يامهيمن	يارقيب	ياحافظ	يامؤمن	ياحفيظ
يامؤمن	ياحافظ	ياحفيظ	يارقيب	يامهيمن

১০। চান্দির ২ নং তখ্‌তি নিম্নরূপ—

ظ	ى	ف	ح
ح	ف	ى	ظ
ى	ظ	ح	ف
ف	ح	ظ	ى

১১। তামার তখ্‌তি নিম্নরূপ সন্তানের গলায় দিলে জিন ও উম্মুচ্ছেবইয়ান হইতে নিরাপদ হয়।

٧٨٦

يَامُذِلُّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

يامذل يامذل يامذل

গর্ভাবস্থায় কোন পুরুষ ত দূরের কথা কোন স্ত্রীলোককেও পেট দেখাইবে না, হাত লাগাইতে দিবে না, স্পর্শ করিতে দিবে না। কারণ দুষ্ট জিন অনেক সময় পাড়া-প্রতিবেশীর রূপ ধরিয়া এইভাবে অনেক জায়গায় সন্তান ও মাতার ক্ষতি করিয়া থাকে। সাবধান!

শিশু সন্তানের অন্যান্য চিকিৎসা বাল্যরোগ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইবে।

প্রসূতির পথ্যাপথ্য

দীর্ঘ ১০ মাস কাল প্রসূতির ভিতর ও বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ দুর্বল থাকে। কিন্তু সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর দুর্বল শরীরে অশিক্ষিতা নারী নানাপ্রকার গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করে। ফলে প্রসূতি জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত নারীসমাজ তখন সূতিকার প্রতি দোষ চাপাইয়া দিয়া অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ করিতে থাকে। ইহার পরিণামে মাতা ও সন্তান উভয়েই ভয়ংকর বিপদে পতিত হয়। অতএব, প্রসবান্তে কিছুদিন গর্ভবতীকে বলকারক লঘু পথ্যাদি খাইতে দিবে। অগ্নিবল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্যাদিও বাড়াইতে থাকিবে। প্রথম দিন হইতে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত عرق كيميا (আরকে কিমিয়া) নামক হেকিমী ঔষধটি সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভবতী নানাপ্রকার জঠর রোগ ও দৌর্বল্য হইতে নিরাপদ থাকিবে। দিন দিন প্রসূতির শক্তি ও কান্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। স্তন্য দুগ্ধও বৃদ্ধি পাইবে। সন্তানও স্বাস্থ্যবান হইবে। ইহা মৃত সঞ্জীবনী হইতে অধিক ফলপ্রদ। পরন্তু মৃত সঞ্জীবনী সুধা ও সূরা মদ ও হারাম দ্রব্যাদির সমন্বয়ে প্রস্তুত। কাজেই মৃত সঞ্জীবনী সুধা ও সূরা মুসলমানের জন্য পরিত্যাজ্য। "আরকে কিমিয়া"ই্ একমাত্র গ্রহণযোগ্য। হেকিমী ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

যৌন ব্যাধি (প্রমেহ)

যৌবনের প্রারম্ভে কাম-রিপুর তাড়নায় অশ্লীল, নাটক, নভেল, ড্রামা, ড্যাঞ্চ, বল-ড্যাঞ্চ, উলঙ্গ ছবি, বে-পর্দা, নারী-পুরুষের আবাধ মেলামেশা প্রভৃতি চরিত্র নাশক অশ্লীল কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের উচকানিতে মন মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। ক্রমশঃ স্বপ্নদোষ ব্যাধি আক্রমণ করিয়া বসে। যৌন ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া হস্ত মৈথুন, পশু মৈথুন করিতে শুরু করে। ফলে জনেন্দ্রিয়ের অতি সূক্ষ্ম রগসকল ছিঁড়িয়া যাওয়াতে রক্তের চলাচল সম্যক বন্ধ হইয়া যায়। নানা ভাবে শুক্রক্ষয় হেতু জিরয়ান, মেহ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি নিদারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে দুগ্ধবত ২/৪ ফোঁটা ক্ষরিত হইয়া থাকে। অথবা শুক্র তরল হইয়া ওঠা-বসা ও চলাফেরা করার সময় ফোঁটা ফোঁটা ক্ষয় হইতে থাকে। ইহার সহিত জঠর পীড়ায় একবার আক্রান্ত হইলে বড় জটিল হইয়া পড়ে। এইসব অবস্থায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

চিকিৎসা

১। রক্ত ও ধাতু চাপ হেতু অভ্যন্তর অতিমাত্রায় গরম হইলে ক্ষরিত শুক্র হরিদ্রা বর্ণ হয়। প্রস্রাবকালে জ্বালা পোড়া হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্যেও এরূপ হইতে পারে। প্রত্যহ প্রাতে শতমূলীর রস কাঁচা দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্রমেহ এবং তজ্জনিত জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২। মধু ও হরিদ্রা সংযুক্ত আমলকীর রস পান করিলে অথবা ত্রিফলা, দেবদারু, মুতা, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে সর্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

৩। গুলঞ্চের রস মধুর সহিত পান করিলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

৪। কিঞ্চিত ফিট্‌কারী ১টি ডাবের মধ্যে পুরিবে। একরাত্র পানি বা কাদার মধ্যে রাখিয়া পরদিন প্রাতে উহা পান করিলে বহু দুরারোগ্য মেহ-প্রমেহও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৫। শ্যামালতা, অনন্ত মূল, কটকী ও গক্ষুর বীজ ইহাদের ক্বাথে ২ রতি গন্ধক, নিশাদল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা উপসর্গিক মেহ বিনষ্ট হইবে।

৬। বাবলার আটা পানিতে ভিজাইয়া সেই পানির সহিত ৪ রতি যবক্ষার খাইলে শুক্র দুষ্টমেহ প্রশমিত হয়।

৭। কাবাব চিনি গুড়া ৵০ মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতে ও শয়নকালে পানির সহিত ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

৮। ত্রিফলা, মুতা, দারু হরিদ্রা, রাখাল শশা ইহাদের ক্বাথে হরিদ্রা, কল্ক মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

রস প্রয়োগ

৯। প্রস্রাব লালবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ হইলে এবং জ্বালাপোড়া থাকিলে আহারের পর চন্দনাসব সেবন করিবে ও শিমুল মূল চুর্ণ, মধু কিংবা হরিদ্রার রস ও মধু অথবা পাকা যজ্ঞ ডুমুরের ফল চূর্ণ মধুসহ নিম্নোক্ত ঔষধের একটি বটী উত্তমরূপে মাড়িয়া সেবন করিবে। সর্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ শুক্র তারল্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি যাবতীয় ধাতু রোগ প্রশমিত হয়। দীর্ঘদিন সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর, অভ্র প্রত্যেকটি ২ তোলা। স্বর্ণ, মুক্তা প্রত্যেকটি ৪ মাষা। এই সমুদয় কেশুবিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। মেহ ও প্রমেহের সংগে পেটের গীড়া থাকিলে সে চিকিৎসাও করিবে।

পাচন ও রসাদি ঔষধ সেবনে উপকার হইলে বসন্ত কুমার রস সেবন করিবে। ইহা ধাতু রোগের শেষ ঔষধ বলে কবিরাজি শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু রোগীর তবীয়ৎ গরম হইলে অন্য কোন ঠাণ্ডা ঔষধ দিবে বসন্ত কুমার রস ব্যয়বহুল এবং ঝামেলাও খুব বেশী বলিয়া উহার প্রস্তুত প্রণালী উল্লেখ করা হইল না। কোন বিজ্ঞ কবিরাজ দ্বারা প্রস্তুত করাইবে।

পথ্যাপথ্য

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, ছোট মাছের ঝোল,বেগুন, পটল, ঝিঙ্গে, ডুমুর, মানকচু, থোড়, মোচা, মুগ, মাষকলাইয়ের ডাইল, দুগ্ধ, দধি, ঘোল, তাল ও খেজুরের মাথি এবং উহার কোমল শাস, চিনি, নারিকেল ও পুরাতন মধু হিতকর।

কুপথ্য—মধুর দ্রব্য, অন্ন দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, পিঠা, পোলাও, গরুর মাংস, মরিচ প্রভৃতি কটু দ্রব্য অহিতকর।

প্রমেহ রোগ চিকিৎসায় সতর্কীকরণ

জিরিয়ান, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, মেহ ও প্রমেহাদি রোগ চিকিৎসা করিতে সর্বদা রোগীর মেজাজ বুঝিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যুবক যুবতী, জওয়ান, নওজওয়ান এবং যাহাদের ভিতরে হারারাত বা গরম খুব বেশী, তাহাদিগকে চিকিৎসার্থে গরম, উত্তেজক এবং বাজীকরণ ঔষধ প্রয়োগ কিছুতেই করিবে না বরং ঠাণ্ডা ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতিকার করিবে। খাদ্য খাদকের দ্বারাই উহাদের শরীরের ঘাটতি পূরণ করিবে, ঔষধ দ্বারা নয়। উহাদের রোগ দূর করিয়া দিতে পারিলে আপনা থেকেই শরীর পরিপুষ্ট হইবে। অবশ্য যখন ঠাণ্ডা ঔষধ পাচনে সুফল না হয় অথচ চিকিৎসক বহুদর্শী তখন বাধ্য হইয়া উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু উহার সংশোধক কোন ব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বন করিবে।

ধ্বজভঙ্গ

প্রবল স্বপ্নদোষ, দীর্ঘদিন জিরিয়ান বা প্রমেহ, হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, পশুমৈথুন এবং অতিমাত্রায় স্ত্রী-সংগম হেতু অপরিসীম শুক্রক্ষয় আর মৈথুনাদি কর্তৃক জনেন্দ্রীয়ের সূক্ষ্মরগ ছিড়িয়া যাওয়ার দরুন ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা বড়ই কঠিন ব্যাধি। কচিৎ রোগীই এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। আবার ইহার সহিত জঠর পীড়ার সংযোগ থাকিলে প্রায়ই চিকিৎসার আশা করা যায় না। সীমাহীন নারী বিলাসিতা এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলই ইহার জন্য দায়ী; সুতরাং প্রথম হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং সংযমী বনিতে ও বানাইতে হইবে।

অশ্লীল নাটক-নভেল,সিনেমা ড্রামা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বে-পর্দা, কো-এডুকেশন, বেশ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ করিতে হইবে। ইসলামী নৈতিক চরিত্র অনুযায়ী জনগণকে গঠিত করিয়া খোদাভীরুতার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেহ এহেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তবে উহার সুচিকিৎসার জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। হাতুড়ে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা না করাই শ্রেয়ঃ। গরীব জনসাধারণের জন্য এ দুর্যোগের সময়কার চিকিৎসা করানো এক অসম্ভব ব্যাপার। তবে আমরা এখানে কতিপয় ঔষধপত্রের উল্লেখ করিতেছি যদ্দ্বারা সর্ব-সাধারণ যথেষ্ট উপকৃত হইবে বলিয়া আশা রাখি।

স্ত্রী জাতির ধ্বজভঙ্গ হইলে স্বাস্থ্যের সাধারণ চিকিৎসাই যথেষ্ট। প্রয়োজন হইলে সময়ের অনুকূলে কোন একটা বাজীকরণ ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। নারী ধ্বজভঙ্গ অনেকটা সহজসাধ্য কিন্তু পুরুষ ধ্বজভঙ্গ খুবই কঠিন। অবস্থা ভেদে পুরুষ ধ্বজভঙ্গ দ্বিবিধ। ১ম প্রকার— ভিতরে বাহিরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক আছে। কিন্তু অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের দরুন রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বয়স, পাকাশয়ের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বাস্থ্যের সাধারণ চিকিৎসা করিবে। উপযুক্ত খাদ্য খাদক এবং ঠাণ্ডা ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। দরকার হইলে কিছু বাজীকরণ বা উত্তেজক ঔষধ সেবন করা যাইতে পারে। যথাসম্ভব উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার না করা ভাল।

দ্বিতীয় প্রকার—হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, ইত্যাদি জঘন্য ক্রিয়াদির দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহাতে লিঙ্গ, অণ্ডকোষ বিকৃত হইয়া যায়। লিঙ্গের উত্থান রহিত হইয়া যায়। এই জাতীয় ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা কোন সময় কষ্টসাধ্য আর কখনো বা একেবারেই দুঃসাধ্য।

চিকিৎসা

ধ্বজভঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে দুশ্চিন্তা আসিয়া রোগীর মন ভারাক্রান্ত ও কলুষ করিয়া ফেলে। অতএব, দুশ্চিন্তা দূর করিতে হইবে। জায়েয আমোদ-প্রমোদ, সকাল-সন্ধ্যায় ভ্রমণ এবং নির্মল বায়ু সেবন করিবে। কু-পথ্য পরিত্যাগ করিবে।

চিরকোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে অভয়া মোদক দ্বারা একদিন পেট পরিষ্কার করিয়া লইবে। মোদকটি পরে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিবে।

পাকাশয়ের ক্রিয়া সঠিক না হইলে অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ অতিসার প্রভৃতি উদরাময় থাকিলে উহার চিকিৎসা হয়ত শুক্ররোগ নিবারক ঔষধ ব্যবহারের পূর্বেই করিবে; না হয় উভয় প্রকার ঔষধ এক সঙ্গেই দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করিবে। রোগসমূহের প্রতিকার হইবার পর প্রচুর গাঢ় শুক্র পয়দা হওয়ার জন্য উপযুক্ত খাদ্য-দ্রব্য, পাচন ও রসাদি প্রয়োগ করিবে। কিন্তু অধিক উষ্ণ বাজীকরণ ঔষধ হইলে রোগীর শারীরিক উত্তাপ বাড়িয়া যাইবে। দেল এবং দেমাগ সে উত্তাপ সহ্য করিতে পারিবে কি না তৎপ্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিবে। যাহাতে স্বপ্নদোষ না হইতে

পারে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে। প্রথম প্রকার ধ্বজভঙ্গে তৈলাদি লিঙ্গে মালিশ না করিয়া কেবলমাত্র সেবনীয় ঔষধ দ্বারা সুফল পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার ধ্বজভঙ্গে রোগসমূহের চিকিৎসার পর লিঙ্গ সংশোধনের জন্য দীর্ঘদিন তৈলাদি মালিশ করিবে। তৈল মালিশের সংগে বাজীকরণ ঔষধও যথাবিধি প্রয়োগ করিবে।

১। কিঞ্চিত পিপুল চূর্ণ ও লবণের সহিত ছাগলের অণ্ডকোষ ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে রতি শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ছাগলের অণ্ডকোষ খাওয়া হারাম। অন্যান্য ঔষধে সুফল না হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া উহা খাওয়া জায়েয হইতে পারে।

২। মাষকলায় ঘৃতে ভাজিয়া তাহা গো-দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে। ঐ দুগ্ধে নিস্তুষ কৃষ্ণ তিল ভিজাইয়া সেবন করিলে সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩। প্রাচীন শিমুলের মূলের রস সম পরিমাণ চিনির সহিত কিছুদিন খাইলে অত্যন্ত শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৪। চারা শিমুলের মূল ও তালমূলী একত্র চূর্ণ করিবে। উহা ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে রমণ শক্তি বৃদ্ধি হয়।

৫। অমলকী চূর্ণ, অমলকীর রসে মাড়িয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া খাইবে। অতঃপর দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে বৃদ্ধও স্ত্রী-সঙ্গমে সমর্থ হয়।

৬। আলকুশীর বীজ, কুলে খাতার বীজ চূর্ণ ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রত করিয়া ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে অতি রমণ্যেও শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

৭। তাজা গোশ্‌ত, হাঁস মুরগী ও মাছের ডিম, গৃহ চটক ও তাহার ডিম, বড় পুঁটি মাছ ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে শুক্র বর্ধিত হয়।

৮। ডিমের শুধু মাত্র কুসুম পিঁয়াজ চূর্ণের সহিত তিনদিন খালি পেটে ভক্ষণ করিলে রতি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৯। কিছু রসুন পিষিয়া উহার সহিত সম পরিমাণ আকরকরার অতি মিহিন গুড়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অতঃপর ঐ দ্রব্য সমুদয় সিক্ত হইলে সম পরিমাণ মধু মিশ্রত করিবে। একত্রে খুব ছানিয়া কোন পাত্রে রাখিয়া ভালমত মুখ বন্ধ করিবে। তিন দিন গরম গোবরের মধ্যে ঐ পাত্রটি রাখিবে। চতুর্থ দিন বাহির করিয়া মৃদু আগুনে জ্বাল দিয়া নামাইয়া রাখিবে। প্রত্যহ সকালে এক সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হইবে, খাহেশ বৃদ্ধি পাইবে; লিঙ্গের উত্থান হইবে। ইহাতে হৃদরোগের উপশম হয়। স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, পাকাশয়ের দুর্বলতা দূর হয়, দাঁত মজবুত হয়, প্রকোপিত শ্লেষ্মা দূর হয়, শুক্রাল্পতা দূর হয়, রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

১০। এঁড়ে গরুর লিঙ্গ সুরমার ন্যায় মিহিন করিবে। মধু মিশ্রিত করিয়া উহা সঙ্গমের কিছুক্ষণ পূর্বে সেবন করিবে। ইহাতে নিস্তেজ লিঙ্গেরও পুনরুত্থান হইবে। অত্র চিকিৎসা ১ নং অধ্যায়ের মুষ্টিযোগের শেষাংশে দেখিয়া লইবে।

১১। কুকুরের লিঙ্গ কাটিয়া লইবে। সঙ্গমের পূর্বে ঊরুতে বাঁধিবে। ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। উহা ঊরুতে বাঁধা থাকাকালীন লিঙ্গ নিস্তেজ হইবে না, কামাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে।

১২। মোরগের কোষদ্বয় শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। উহার সহিত "মিল্‌হে হায়দারানী" মিশ্রিত করিবে। মধুসহ মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিবে। খুব গাঢ় হইলে নামাইয়া ছানিয়া লইবে। ছোট ছোট বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। রমণীগমনের পূর্বে মুখে একটি বটী ধারণ করিলে কামাগ্নি অত্যন্ত

বৃদ্ধি পাইবে। উহা মুখ হইতে যতক্ষণ বাহির না করিবে ততক্ষণ পরম আনন্দ উপভোগ করিবে। উহা আমীর উমারাহদের গুপ্ত ধনও বটে।

১৩। বাদুর ও চামচিকার রক্ত পদতলে মর্দন করিলে লিঙ্গের উত্থান হইয়া থাকে।

১৪। কুকুরের সঙ্গমকালে যখন মজবুতভাবে লাগিয়া যায় তখন সাবধানতার সহিত পুরুষ কুকুরের লেজ জড় থেকে কাটিয়া লইবে। ৪০ দিন উহা মাটির নীচে গাড়িয়া রাখিবে। অতঃপর মাটি হইতে বাহির করিবে এবং সূতায় গাঁথিয়া কোমরে ধারণ করিবে; যতক্ষণ উহা কোমরে থাকিবে ততক্ষণ বীর্যপাত হইবে না। —খাযায়েনুল মুলুক

১৫। মাষকালায়ের ডাইল ৴।০ পোয়া পিঁয়াজের রসে সারারাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। সকালে ছায়াতে শুকাইবে। এরূপ তিনদিন করিবে। অতঃপর খোসা দূর করত রাখিয়া দিবে। ঐ ডাইল চূর্ণ ২ তোলা, চিনি বা মিছরি ২ তোলা, ঘি ২ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ৪০ দিন নিয়মিত খাইলে জিরয়ান, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ দূর হইবে। রতিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ধাতু খুব গাঢ় হইবে। ইহা ভক্ষণের সময় স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ।

১৬। গব্য ঘৃত, গব্য দুগ্ধ, পেস্তার তৈল, প্রত্যেকটি ৴।০ পোয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইবে। প্রত্যেহ ২ তোলা ভক্ষণ করিবে। ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, কোমরের বেদনা দূর হয় এবং গুর্দা ও লিভার সতেজ হয়।

১৭। বড় ছোলা পিঁয়াজের রসে সারা রাত ভিজাইয়া রাখিবে এবং ছায়াতে শুকাইবে। ৭ দিন এরূপ করিবে। শুকাইলে চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ মিছরির সহিত মিশাইবে। প্রত্যহ সকালে ১ তোলা এবং শয়নকালে ৬ মাষা দুগ্ধসহ সেবন করিবে।

১৮। ২ তোলা বড় ছোলা ধুইয়া পরিষ্কার করিবে। পানিতে সারারাত্র ভিজাইয়া রখিবে। প্রাতে একটি করিয়া ছোলা উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইবে অবশেষে মধু দিয়া পনিটুকু খাইয়া ফেলিবে। উন্মুক্ত মাঠে ব্যায়ামও করিবে; সুঠাম মজবুত স্বাস্থ্য হইবে। জননেন্দ্রীয় মজবুত ও কার্যক্ষম হইবে। পেটের পীড়া থাকিলে উহা না খাওয়াই উত্তম।

১৯। ছোলা ভাজিয়া উহা চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণের সহিত ৫টি ডিমের কুসুম মিলাইবে। ছোলা চূর্ণ ও কুসুম পানি দিয়া জ্বাল দিবে। হালুয়ার ন্যায় হইলে ৫ তোলা ঘি ও ৫ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ছানিয়া রাখিবে। প্রত্যহ ৪ তোলা হালুয়া প্রাতে ভক্ষণ করিবে। ইহা শুক্র বর্ধক, রতিশক্তি বর্ধক এবং উষ্ণবীর্য।

২০। শোধিত সিদ্ধ চূর্ণ আড়াই পোয়া, গব্য ঘৃত অর্ধ সের, চিনি/২ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, সিদ্ধির রস ৴৪ সের, গব্য দুগ্ধ ৴৪ সের, এই সমুদয় মৃদু অগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাক শেষ হইয়া আসিলে, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশী বীজ, গোক্ষুর, চাকুলে, তালের আঁটীর অঙ্কুর, কেশুর, পানি ফল, ত্রিকুট, ধনে, অভ্র, বঙ্গ, হরিতকী, কিস্‌মিস্‌, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জিণ্ড খেজুর, কুলে খারা বীজ, কটকী, যষ্টি মধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী বন-যমানী, জীবন্তি, গজপিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ একত্র করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে এক পোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া কিছু কর্পূর ও কস্তুরী উহার সহিত ভালরূপে মাড়িবে। মাত্রা ।০ তোলা হইতে ১ তোলা পর্যন্ত। অনুপান দুগ্ধ; সকাল ও সন্ধ্যায়। এই ঔষধটির নাম "রতি বল্লভ মোদক"। ইহা একটি উৎকৃষ্ট বাজীকরণ ঔষধ।

২১। বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, ধ্বজভঙ্গের একটি মহৌষধ। প্রস্তুত প্রণালী স্বর্ণপত্র ১ তোলা শোধিত পারদ ৮ তোলা গন্ধক মিলাইয়া পুনরায় (কজ্জলি করিবে) মাড়িবে। লাল বর্ণ কার্পাসের পুষ্প রসে ও ঘৃত কুমারীর রসে ভাবনা দিবে। মাড়িয়া শুষ্ক করিবে। পরে মকধ্বজের ন্যায় বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ ১ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জায়ফল, মরিচ, পিপুল, লবঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভী ।।০ আনি এই সমুদয় মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি, প্রতিদিন প্রাতে মাখন মিছরিসহ সেব্য।

২২। মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ রোগে যখন অন্য কোন ঔষধ ফলদায়ক না হয় তখন বসন্ত-কুমার রসই ভরসাস্থল।

প্রস্তুত প্রণালী

শোধিত স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, বঙ্গ, সীদা, লৌহ, প্রত্যেকটি ৩ ভাগ, অভ্র, প্রবাল, মুক্ত প্রত্যেকটি ৪ ভাগ, এই সমুদয় একত্রে মাড়িয়া যথাক্রমে গরুর দুধ, ইক্ষুর রস, বসক ছালের রস, লাক্ষার ক্বাথ, বলার ক্বাথ, কলা গাছের মূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতী ফুলের রস, জাফরানের পানি, কস্তুরী, এই সমুদয় দ্বারা ভাবনা দিবে। ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত, চিনি ও মধু। প্রাতে ১ বটী সেব্য।

২৩। ৩৫ তোলা মধু জ্বাল দিয়া খুব গাঢ় করিবে। অতঃপর ২০টি ডিম সিদ্ধ করিয়া শুধু উহার কুসুম ঐ মধুতে উত্তমরূপে মাড়িবে। মিশ্রিত মধু ও কুসুমের সহিত আকরকরা, লবঙ্গ, শুঁঠ, প্রত্যেক ৩৩৮০ মাষা চূর্ণ উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ সকাল বা সন্ধ্যায় ১ তোলা সেব্য। সর্বপ্রকার ধ্বজভঙ্গে বিশেষতঃ ২য় প্রকার ধ্বজভঙ্গে ঔষধাদির সহিত লিঙ্গের চিকিৎসা করিবে।

লিঙ্গ ব্যাধি

হস্ত মৈথুন, পুং মৈথুন, পশু মৈথুন হেতু লিঙ্গের গোড়া সরু মাথা মোটা হইয়া থাকিলে এক সপ্তাহ নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

১। পানি ব্যাঙের চর্বি ১।০ তোলা, আকরকরা ১০।।০ মাষা, গব্য ঘৃত ৩।।০ তোলা। প্রথমতঃ ঘি গরম করিয়া উহার সহিত ব্যাঙের চর্বি মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিবে। উহার সহিত আকরকরার মিহিন চূর্ণ মিলাইবে। এক ঘণ্টাকাল খুব মাড়িবে। এই ঔষধ ঈষদুষ্ণ করিয়া লিঙ্গের তলদেশের সেলাই ও উহার অগ্রভাগ বাদ দিয়া জনেন্দ্রীয়ে মালিশ করিয়া পান দিয়া ঢাকিবে এবং উহার উপরে নেকড়া দ্বারা বাঁধিবে। এশার নামাযের পর হইতে সারারাত্র বাঁধিয়া রাখিবে। ফজরের পূর্বে খুলিয়া গরম পানি দ্বারা ধৌত করিবে। ঔষধ ব্যবহারে লিঙ্গের উপর কিছু দানা উত্থিত হইলে মাখন লাগাইবে।

২। দীর্ঘ দিন গোপাল তৈল লিঙ্গে মালিশ করিবে। ইহা আয়ুর্বেদীয় ঔষধ।

৩। এক টুকরা কাপড় আকন্দের দুধে ৩ বার ভিজাইবে, ৩ বার শুকাইবে তৎপর গব্য ঘৃতে ভিজাইয়া তন্মধ্যে কিছু পরিমাণ তবকী হরিতালের গুড়া ছিটাইবে। লোহার শিকের সঙ্গে একদিক জড়াইয়া দিবে। অন্যদিক হাতে ধরিয়া একটি চেরাগের নীচে একটি পেয়ালা রাখিয়া ঐ বাতি জ্বালাইবে। যে পরিমাণ ঘৃত বাতি হইতে পেয়ালায় পড়িবে তাহা শিশিতে পুরিয়া রাখিবে। মাথা বাদ দিয়া রাত্রিবেলা লিঙ্গের বাকী অংশে মালিশ করিবে। পান দ্বারা জড়াইয়া নেকড়া দ্বারা বাঁধিবে। এরূপ ২ সপ্তাহ করিবে। লিঙ্গ লম্বা, মোটা, শক্ত ও কার্যক্ষম হইবে।

৪। সমুদ্র-ফেনা পানিতে পিষিয়া লিঙ্গে মর্দন করিলে উহা উত্থিত ও বড় হয়।

৫। ছোট লিঙ্গ বড় বানাইতে হইলে উহা প্রথমতঃ ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধৌত করিবে। অতঃপর মোটা কাপড় দ্বারা খুব রগড়াইবে। প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হইলে তখন আদ্রকের মোরব্বার শিরা লাগাইবে। সঙ্গমের পূর্বে এরূপ করিলে উহা বড় ও শক্ত হইবে। সঙ্গমে শক্তি ও তৃপ্তি পাইবে। অবাধ্য স্ত্রী বাধ্য হইবে।

৬। নার্গিস ফুল গাছের মূল খুব উত্তমরূপে পিষিয়া উহা লিঙ্গে মালিশ করিলে জননেন্দ্রীয় খুব মোটা হইয়া থাকে।

৭। রাখাল শশার মূল ৭ দিন ছাগ-মূত্রে ভাবনা দিয়া তাহা লিঙ্গে প্রলেপ দিবে।

গণোরিয়া

ইহা লিঙ্গ ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত বিধায় এখানেই উল্লেখ করা হইল। গর্মি বা সিফলিস সর্বাঙ্গ ব্যাধি কিন্তু লিঙ্গ ব্যাধিও বটে। এজন্যেই পরক্ষণে গর্মি রোগের চিকিৎসা উল্লেখ করা হইবে।

গনোরিয়া একটি দুরারোগ্য ও কষ্টদায়ক ব্যাধি। বেশ্যালয় গমন, দুষ্টাযোনী গমন, অনিয়ম বেনিয়মে আহার-বিহারের দরুন রস ও রক্ত দূষিত হইয়া অথবা কোন স্থানে বংশানুক্রমে এই রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

১। শ্বেত পদ্মের কুড়ি। প্রত্যেকটি ১ তোলা লইয়া ১ ছটাক পানিতে চটকাইবে, রাত্রে শিশিতে রাখিয়া দিবে। ভোরে ঐ পানিটুকু ছাঁকিয়া চিনির সহিত পান করিবে।

২। তেঁতুলের বীচির গুড়া ১ তোলা, কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া ৪০ দিন সকালে সেবন করিবে। ইহাতে মূত্রনালীর যাবতীয় দোষ দূর হইবে, বীর্য এত গাঢ় হইবে যে, শীঘ্র বীর্যপাত হইবে না।

৩। তেঁতুলের কচিপাতা পানিতে পিষিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ পানি ২২ দিন ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবন করিবে। লিঙ্গের ঘা, জ্বালা পোড়া, রক্ত ও পুঁজ পড়া বন্ধ হইবে। পিচকারী দ্বারা মূত্রনালী পরিষ্কার করিবে। সারিবাদী সালসা দীর্ঘদিন সেবন করিলে রোগের উপশম হইতে পারে।

৪। সম পরিমাণ কাঁচা হলুদ ও আখের গুড় একত্রে চিবাইয়া উহার রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা দ্বারা ফলোদয় না হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে, বিলম্ব করিবে না।

গর্মি (সিফলিস)

ইহা বড়ই মারাত্মক ব্যাধি। লিঙ্গের বহির্ভাগে ফোঁড়া হইয়া থাকে। অনেক সময় উহার দরুন লিঙ্গ পচিয়া খসিয়াও পড়ে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও যখম হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে চুল্‌কানী আকারে প্রকাশ পায়। আবার অনেক জায়গায় প্রকাশই পায় না। অধুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ত পরীক্ষা করিয়া উহার সন্ধান পাওয়া যায়। চিকিৎসা বড়ই কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ।

চিকিৎসা

১। ত্রিফলার ক্বাথ অথবা ভীম রাজের রস দ্বারা গর্মিক্ষত ধৌত করিবে। গর্মিক্ষত পাকিয়া উঠিলে জয়ন্তী, কবরী, আকন্দের পাতার ক্বাথে ধৌত করিবে।

২। বাবলার পাতা চূর্ণ, ডালিমের খোসা চূর্ণ অথবা মানুষের কপালের হাড় চূর্ণ গর্মিক্ষতে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়। অবশ্য মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা না জায়েয।

৩। খয়ের ২ ছটাক, হরিণের শিং ভস্ম ২ ছটাক, গেঁটে কড়ি ভস্ম ১ ছটাক, তুঁতে ভস্ম ১ ছটাক, মোম ২ ছটাক, মাখন ১ পোয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া যখমে লাগাইবে।

ময়দার একটি ঠুলির মধ্যে ৪ রতি শোধিত পারদ, উহার উপর রস কর্পূর রাখিয়া ঠুলির মুখ এমনভাবে বন্ধ করিবে যেন পারদ দেখা না যায় এবং বাহিরেও না থাকে। অতঃপর ঠুলিটির উপরে লবঙ্গের গুড়া মাখাইয়া এমনভাবে গিলিয়া খাইবে যেন দাঁতে না লাগে। উহা সেবনান্তে পান খাইবে।

তদ্‌বীর

১। সোনার এক টুকরা পাতের উপর নিম্নোক্ত তদ্‌বীর লিখিয়া সঙ্গমকালে জিহ্বার নীচে রাখিবে। উহা জিহ্বার নীচে থাকাকালীন লিঙ্গ শক্ত লৌহদণ্ডের ন্যায় থাকিবে।

لا م ع ط ط ع ٩ ق

২। লিঙ্গের উপরে সঙ্গমের পূর্বে লিখিবে— محسعليفعليل

৩। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় লিখিয়া তাবীজরূপে কোমরে ধারণ করিলে শীঘ্র বীর্যপাত হইবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يَآاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيَاسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّأْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

قُلْنَا يَانَارُكُوْنِىْ بَرْدًاوَّسَلَامًا عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ৩ বার

سَلَامٌ قَوْلًامِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ৩ বার

چار قُلْ ৩ বার

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ ৩ বার

প্রত্যেকটির পূর্বে ১ বার সূরা-ফাতেহা পড়িয়া পানিতে দম করিবে। কম পক্ষে দৈনিক তিনবার সেবন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া সেবন করিবে। এরূপ ৪০ দিন ব্যবহার করিলে খোদা চাহে ত মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও গণোরিয়া নিরাময় হইবে।

৫। افحسبتم الاية ৩ বার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পনি ১০ দিন দৈনিক ২/৩ বার সেবন করিলে যখম ও দানা বেশী হইবে। ১০ দিন পর পানি পান বন্ধ করিয়া দিবে। সরিষার তৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিবে। উপরোক্ত আয়াত পড়িয়া উহাতে দম দিয়া ১২০ দিন মালিশ করিবে এবং এই ১২০ দিন আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া সেবন করিবে খোদা চাহে ত সিফলিস দূর হইবে।

ধ্বজভঙ্গে সুপথ্য—মনের আনন্দ, অগ্নি বল অনুযায়ী বলবর্ধক ও তৃপ্তিকর আহার।

কু-পথ্য—অতিচিন্তা, কুচিন্তা, কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন, গরুর গোশ্‌ত, টক, ঝাল, মৈথুন, রাত্রি জাগরণ।

গণোরিয়া ও সিফলিসের সুপথ্য—দিনে পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, ছোলার ডাইল, আলু, পটল, ডুমুর, মানকচু, ওল, উচ্ছে, থোড়, শজিনাডাটা, কপি। রাত্রে রুটী, লুচি, সাগু,

বার্লি, রাজভোগ, রসগোল্লা, গজা, পেস্তা, বাদাম, বেতের ডোগা, গন্ধ ভাদুলে, কবুতর, মুরগী মাংস, দুধ প্রভৃতি।

কুপথ্য—নূতন চাউলের ভাত, মাষকলায়ের ডাইল, লঙ্কার ঝাল, গুড়, দধি, মাছ, বোয়াল মাছ, বমি, পচা, রাত্রি জাগরণ, দিবা নিদ্রা, উপবাস, অধিক বায়ু সেবন, অগ্নি সন্তাপ, প্রখর রৌদ্র সেবন, অতিরিক্ত ব্যায়াম, স্ত্রী সঙ্গম, মটর ডাইল, বেগুন, গরুর গোশ্‌ত, পিঠা, কটুরস, উষ্ণ বীর্য, অধিক লবণ ইত্যাদি।

যোনি ব্যাধি

অসাবধানতা, অজ্ঞতা, নানাবিধ কুপথ্য আহারের কারণে রস ও রক্ত দূষিত হইয়া নানা-প্রকার ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের গণোরিয়া, সিফিলিস দেখা দিলে উহার চিকিৎসার্থে পূর্বোক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা জটিল হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিবে না।

চিকিৎসা

১। যোনি ঢিলা হইলে এবং উহা হইতে সর্বদা পানি বাহির হইতে থাকিলে কিছু তেঁতুল বীজ চূর্ণ তূলায় পেঁচাইয়া যোনি মধ্যে কিছুদিন ধারণ করিলে পানি পড়া বন্ধ হয়, শক্ত ও কুমারীর সদৃশ সংকীর্ণ হইয়া থাকে। যাবতীয় যোনি পীড়া দূরীভূত হয়।

২। ভেড়া বা বকরীর পশমের ময়লা যোনি মধ্যে ধারণ করিলে পানি পড়া বন্ধ হয়।

৩। গর্ভাবস্থায় যোনিদ্বারে জখম হইলে বিশেষ কিছু করার নাই। সন্তান প্রসবের পর আপনা থেকেই উহা নিবারিত হয়। অবশ্য কিছুটা মাখন লাগাইলে উপকার হইয়া থাকে।

৪। বলদ গরুর পিত্তে মিহিন পশম ভিজাইয়া একটু দীর্ঘদিন যোনি মধ্যে ধারণ করিলে কিংবা খরগোশের চর্বি অথবা উহার পনিরের সহিত কিছু গোল মরিচ চূর্ণ মিলাইয়া যোনি মধ্যে ব্যবহার করিলে উহা শক্ত দৃঢ় ও সংকীর্ণ হইয়া কুমারী সদৃশ হইয়া থাকে।

৫। ডিমের খোলের পাতলা পরদা ভালরূপে পিষিয়া উহার সহিত বাচ্চা কবুতরের রক্ত মিলিত করিবে। ২/৩ দিন উহা যোনিদ্বারে ব্যবহার করিলে যোনি দৃঢ় ও সংকীর্ণ হইয়া থাকে।

বাজীকরণ ও সতর্কীকরণ

ধ্বজভঙ্গে যে সব বাজীকরণ ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ব্যবহার করিতে ঋতু, বয়স ও জরুরত অনুযায়ী ব্যবহার করিবে। শুধু স্ত্রী বিলাসের জন্য ইহা ব্যবহার করিবে না। স্বাস্থ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

যৌন সম্ভোগের জন্য কৃত্রিম উপায়ে কামাগ্নি প্রজ্বলিত করা চিকিৎসা শাস্ত্রমতে অবৈধ। স্বাস্থ্যের সাধারণ উন্নতির সহিত জনন শক্তিও শক্তিশালী হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য ভাল হইলে শক্তি প্রচুর থাকিলে ধৈর্যও হইয়া থাকে। অতএব, সাবধান, স্বাস্থ্য হীনাবস্থায় অধৈর্যের চাহিদায় এবং ভাল স্বাস্থ্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া সর্বশান্ত হওয়া সমীচীন নহে। অতি সহবাসের পরিণাম বড়ই খারাপ। কামাগ্নি প্রজ্বলিত কখনও করিবে না। সবকিছুই ভাবিয়া চিন্তিয়া করিবে।

স্বপ্নদোষ

কুচিন্তা, নভেল-নাটক অধ্যয়ন, অশ্লীল সিনেমা ও উলঙ্গ ছবি দর্শন, অনিয়ম অখাদ্য ভক্ষণের দরুনও স্বপ্নদোষ ব্যাধি হইয়া থাকে। চিকিৎসার্থে সর্বপ্রথম আসল কারণ দূর করিবে। সৎসর্গ

অবলম্বন করিবে। মন প্রফুল্ল রাখিবে। চিৎ হইয়া বা উপুড় হইয়া শয়ন করিবে না। প্রস্রাব ও পায়খানার বেগ লইয়া ঘুমাইবে না।

অতি উষ্ণ দ্রব্য, কটু ও ঝাল দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে না, বিশেষতঃ রাত্রের বেলা।

চিকিৎসাঃ১। শয়নের সময় এক টুকরা সীসা কেমরে ধারণ করিবে এবং উহা গুর্দা বরাবর রাখিবে স্বপ্নদোষ নিবারিত হইবে।

২। শয়নের পূর্বে ৵০ কাবাব চিনি চূর্ণ সেবন করিলে স্বপ্নদোষ হইবে না।

তদ্‌বীর

৩। ঘুমাইবার পূর্বে সূরা-তারেক حافظ পর্যন্ত পড়িলে স্বপ্নদোষ হইবে না।

৪। শয়নকালে অঙ্গুলি দ্বারা ডান ঊরুতে লিখিবে آدم এবং বাম ঊরুতে লিখিবে حواء কোন দিন স্বপ্নদোষ হইবে না।

৫। পেটে অসুখ থাকিলে উহার চিকিৎসা করিবে। নিম্নোক্ত দো'আ লিখিয়া তাবীযরূপে ধারণ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

بسم الله الذى لا يضرمع اسمه شيء فى الارض ولا فى السماء و هوالسميع العليم

শুক্র তারল্যের কারণে স্বপ্নদোষ হইলে বিজ্ঞ কবিরাজ বা হাকীম দ্বারা চিকিৎসা করাইতে দেরী করিবে না। শুক্র তারল্য না হইলে এবং কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া স্বপ্নদোষ হইলে আর কোন চিকিৎসায় ভাল ফল না হইলে বিবাহের দ্বারা স্বপ্নদোষ নিবারিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কোষ ব্যাধি

উহাকে দলকোষও বলা হয়। বীর্য উৎপাদন এবং ঐ বীর্যকে সন্তান উৎপাদন উপযোগী করিবার নিমিত্ত আল্লাহ্ পাক কোষদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোষদ্বয় নষ্ট কিংবা বিকৃত হইয়া গেলে শুক্রাল্পতা, শুক্রহীনতা, শুক্রতারল্য প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। দলকোষদ্বয়কে নিঁখুত রাখিবার সর্বপ্রকার যত্ন লইতে হইবে। একবার কোষ ব্যাধি হইলে প্রায়ই উপশম হয় না।

একশিরা, কুরণ্ড ও অন্ত্রবৃদ্ধি

দীর্ঘদিন পেটের পীড়া, আহার-বিহারে ব্যতিক্রম, অতিরিক্ত বোঝা বহন, মলমূত্রের বেগ ধারণ, অনুপস্থিত বেগে কুন্থনো আঘাত এবং উৎকট ব্যায়ামাদি হেতু বাতাদি দোষ ও দূষিত রস কোষ থলিতে সঞ্চিত হয়। রগ স্ফীত হয়, পানিও সঞ্চিত হইয়া থাকে। কিছুদিন পর কোষ থলিস্থিত পানি মাংসে পরিণত হইলে একমাত্র অপারেশন ছাড়া কোন কার্যকরী উপায় থাকে না। আবার অধিকাংশ সময় অপারেশন দ্বারাও আশাতীত ফল হয় না। রোগত্রয়ে যাহাতে বাহ্য খোলাসা হয় সেদিকে খুব দৃষ্টি রাখিবে।

চিকিৎসা

১। বচ ও শ্বেত সরিষা অথবা শজিনা ছাল ও শ্বেত সরিষা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষের শোথ কমিয়া থাকে।

২। ত্রিফলার ক্বাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া প্রতিদিন পান করিলে কোষের শোথ বিনষ্ট হয়।

৩। একটি ভাল তামাকের পাতা কোষে জড়াইয়া বাঁধিবে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত রাখিবে। রোগী দুর্বল হইলে উহা ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ ইহাতে বমি হইতে পারে।

৪। শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে একশিরা ও কুরণ্ড প্রশমিত হয়।

৫। সরিষার তৈলে কর্পূর মিশ্রিত করিয়া কোষে মর্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৬। বড়েলার সহিত এরণ্ড তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে পেটের আধ্যান ও বেদনার সহিত অন্ত্রবৃদ্ধিও প্রশমিত হয়।

৭। সর্বদা লেংগোট ব্যবহার করিবে। লেংগোটই উক্ত রোগসমূহের মহৌষধ।

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, পটোল, বেগুন, আলু, ডুমুর, গন্ধ ভাদুলে, করলা, উচ্ছে, মূলা, রসুন, পুনর্নবা, মানকচু, শজিনার ডাটা, আদা, তিক্তদ্রব্য, গরম পানি পান, স্নান, রাত্রে রুটী, লুচি ইত্যাদি লঘু ও রক্তপ্রদ দ্রবাদি।

কু-পথ্য—গুরুপাক দ্রব্য, অম্ল, দধি, পুঁইশাক, পাকা কলা, বাত শ্লেষ্মাকর দ্রব্য, শীতল পানি, অতিরিক্ত চলা-ফেরা, দিবানিদ্রা, মলমূত্রের বেগ ধারণ, অজীর্ণ সত্ত্বে পুনর্ভোজন, ডাব, ইক্ষু, টিউবওয়েলের পানি, কূয়ার পানি, বাসী ভাত, কাঁঠাল, খেসারী ডাইল, পিঠা, গোশ্‌ত প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য এবং পানি বহুল দ্রব্যাদি অহিতকর।

গুহ্যদ্বার ব্যাধি

অর্শ—ক্রিমির ন্যায় একটি রোগ শঙ্কর ব্যাধি। ইহা হইতে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে ইহা বংশানুক্রমিক ব্যাধিও বটে। অনেক সময় বরং প্রায়ই আহারাদির ত্রুটির দরুন এবং ক্রিমি দ্বারা রোগ হইয়া থাকে। অর্শ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণনাশক না হইলেও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক এবং অসুবিধাজনক ব্যাধি।

অর্শের লক্ষণ—উদর ভার, দৌর্বল্য, কুক্ষিতে গুড়গুড় ধ্বনি, উদ্‌গার, পদদ্বয়ের অবসাদ, দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি, পীতবর্ণতা, কাশ, শ্বাস, মুখস্রাব, গুহ্যস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিমান্দ্য মলদ্বারে যন্ত্রণা, মলদ্বার স্ফীতি, রক্তস্রাব প্রভৃতি।

বাহ্যবলি—উহা গুহ্যদ্বারের বাহির দিকে মাংসাঙ্কুরের ন্যায় নরম বা শক্ত হইয়া মলদ্বার সংকীর্ণ করিয়া দেয়। রোগীর মল খুব শক্ত হইলে অনেক সময় মলদ্বার ফাটিয়া যায় এবং তথা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। বাহ্যবলি অচিরুৎপন্ন হইলে উহার চিকিৎসা সুখসাধ্য।

মধ্যবলি—উহা গুহ্যদ্বারের মধ্যভাগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দীর্ঘদিন উৎপন্ন বাহ্যবলি এবং মধ্যবলিজাত অর্শ বড়ই কষ্টসাধ্য।

অন্তর্বলি—মলদ্বারের ভিতর দিকে শেষ প্রান্তে মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অন্তর্বলি জাত অর্শ অসাধ্য।

এই ত্রিবিধ অর্শ আবার দ্বিবিধ। শুষ্ক অর্শ ও পরিস্রাবী অর্শ। শুষ্কার্শ হইতে রস ও রক্তস্রাব হয় না। শুধু মলদ্বার স্ফীত ও বোট বা মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া দ্বার সংকীর্ণ করিয়া থাকে। পরিস্রাবী অর্শে রস ও রক্ত কিংবা উহার কোন একটির স্রাব হইয়া থাকে।

যে কোন প্রকার হউক সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া আহার করিতে হইবে। যাহাতে নিয়মিত পরিষ্কার-ভাবে পায়খানা হইয়া যায় এরূপ খাদ্য-দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে। যে সব আহারে পায়খানা পরিষ্কার না হওয়ার সম্ভাবনা অথবা ক্রিমি বৃদ্ধি বা ক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে; এরূপ আহার কদাচিৎ করিবে না। অর্শরোগে ক্ষুদ্র ক্রিমির উপদ্রব দীর্ঘদিন থাকিলে ভগন্দর হইবার সম্ভাবনা আছে। পরিস্রাবী অর্শের প্রথমাবস্থায় রক্ত রোধক কোন ঔষধ ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ পরিস্রাবী অর্শের রক্ত বন্ধ হইয়া হৃদরোগ শ্বাস ও কাশের আক্রমণ হইতে পারে।

নূতন কিংবা পুরাতন অর্শ যদি ঔষধ প্রয়োগে উপশম না হয়, তখন ভাল অপারেশন করাইবে। অপারেশন ভাল না হইলে অর্শের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা খুব বেশী।

চিকিৎসা

১। পূর্ব হইতেই কিংবা অর্শ উৎপন্ন হইবার পর নিয়মিতভাবে সিংহ অথবা বাঘের চামড়ার উপর বসিলে অর্শ হইতে নিরাপদ থাকা যায়। (الرحمة فى الطب والحكمة)

২। মনসার আঠার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে লাগাইলে উহা খসিয়া পড়ে।

৩। আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, তিত লাউয়ের কচি পাতা, ডহর করঞ্জের ছাল গোমূত্রে পিষিয়া মাংসাঙ্কুরে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা শুষ্কার্শের একটি মহৌষধ।

৪। পুরাতন ইক্ষু গুড় পানিতে গুলিয়া তাহার সহিত ঘোষাফল চূর্ণ পাক করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করিলে মধ্য ও অন্তর্বলি প্রশমিত হয়।

৫। ঘোষা লতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্তার্শ বিনষ্ট হয়।

৬। মনসা বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈন্ধব কুড়, শিরিষ ফল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে লাগাইবে। ইহাতে বলি খসিয়া পড়ে।

৭। রক্তার্শের প্রথমাবস্থায় যদি অধিক রক্তস্রাব হইতে থাকে, তবে কিছুটা রক্ত বাহির হইবার পর খোসাতোলা কৃষ্ণ তিল ও মাখন প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হইতে পারে।

৮। প্রতিদিন একমুষ্ঠি বা অর্ধমুষ্ঠি কাঁচা চাউল খাইলে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ রক্তরোধক মুষ্ঠিযোগ।

৯। কিছুতেই রক্ত বন্ধ না হইলে কুড়চির ছাল অর্ধ তোলা বাটিয়া উহা ঘোলের সহিত পান করিলে রক্তস্রাব অবশ্যই বন্ধ হইবে।

১০। অর্শে অত্যধিক যন্ত্রণা থাকিলে লোবান ও ধুপের ধূম লাগাইবে।

১১। ওল চূর্ণ ১ ভাগ, চিতামূল ৮ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, গোলমরিচ ২ ভাগ, ত্রিফলা, পিপুল, পিপুল মূল, শতমূলী, তালিশ পত্র ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ প্রত্যক ৪ ভাগ, আলমূলী ৮ ভাগ, বিদ্ধড়ক ১৬ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, এলাচ ২ ভাগ, পুরাতন গুড় ১৮০ ভাগ, ওল প্রভৃতির চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক বা মা'জুন প্রস্তুত করিবে। ইহা অর্শ, শ্বাস, কাশ ইত্যাদি উপদ্রবে প্রযোজ্য।

তদ্‌বীর

সর্ব প্রকার অর্শে নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি তাবীজরূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২। ২১ তার (গুণ) লাল রং এর ।।০ গজ লম্বা কাঁচা সূতা লইবে। উহাতে ২১টি গিরা দিবে। প্রত্যেক গিরায় একবার সূরা-লাহাব পূর্ণ পড়িয়া দম দিবে। অতঃপর উল্টা দিক অর্থাৎ, ডান হইতে বাম দিকে যাইবে এবং প্রত্যেক গিরায়ঃ

لَآاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

১০ বার পড়িয়া দম দিবে। তৃতীয় বার বাম হইতে ডান দিকে যাইবে এবং প্রত্যেক গিরায় ১ বার

وَقِيْلَ يَآاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيَاسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

পড়িয়া দম দিবে। রোগীর কোমরে ধারণ করিতে দিবে।

ভগন্দর

গুহ্যদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে ২ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মধ্যে কোন এক স্থানে যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং সেই ব্রণ যদি পাকিয়া নালীরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভগন্দর বলে। ভগন্দরের নালি ক্রমশঃ এরূপ হইয়া যাইতে পারে যে, নালীর মুখ দিয়া মলমূত্র ও শুক্র পর্যন্ত নির্গত হয়। সকল প্রকার ভগন্দরই যন্ত্রণাদায়ক ও অতি কষ্টসাধ্য।

চিকিৎসা ঃ—১। গুহ্যদ্বারের উক্ত স্থানে যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ উৎপন্ন হইবামাত্র বটপত্র পানিস্থিত ইষ্টকচূর্ণ, শুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণ প্রলিপ্ত করিবে। ইহাতে দূষিত রস ও রক্ত পরিষ্কার হইয়া ব্রণ বিনষ্ট হয়।

২। জাতি পত্র, কচি বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁঠ, সৈন্দব, ঘোলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর প্রশমিত হয়।

৩। ত্রিফলার ক্বাথে প্রতিদিন ক্ষত ধৌত করিবে।

৪। ক্ষত হইতে পুঁজ বাহির করিয়া শ্বেত আকন্দের তূলা লাগাইলে অতি সত্বর ঘা পুরিয়া থাকে।

৫। ভাত চটকাইয়া তাহা পিণ্ডাকার করিয়া অঙ্গারাগ্নিতে পোড়াইবে। অঙ্গারবৎ হইলে তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। একটু তুঁতে পোড়াইয়া তাহাও চূর্ণ করিবে। উভয় চূর্ণ একত্র করিবে। এই চূর্ণ ২/৪ দিন ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্লেদ দূর হয়, ক্ষত লালবর্ণ হইয়া শীঘ্র পুরিয়া উঠে।

৬। সরিষার তৈল অর্ধ সের; জারিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটে সিন্দুর মনছাল, রসুন, মিঠা বিষ, জারিত ও মরিত তাম্র প্রত্যেকটি ২ তোলা লইয়া সূর্যতাপে পাক করিবে। ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

তদ্‌বীর

১। ব্রণের সূচনায় পড়িবে بِتُرْبَةِ مَّنْ اَرْضِنَا بِرِيْقِ بَعْضِنَا لِيَشْفِى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا এবং ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলিতে মুখের লালা সংযোগ করত মাটিতে লাগাইবে। যে মাটিটুকু অঙ্গুলিতে লাগিবে উহা ব্রণে লাগাইবে। ২/৩ দিন এরূপ করিলে ব্রণ ও বেদনা দূরীভূত হইবে।

২। اَفَحَسِبْتُمْ الاية তিনবার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পানি ৭ দিন পান করিবে। ৭ দিন পর তৈলের উপর مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا রَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ দশবার এবং পড়িয়া দম দিয়া ঐ তৈল ১১ দিন মালিশ করিবে। খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে।

৩। চিনা বরতনে ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা লিখিয়া উহা ধৌত করিয়া সেবন করিবে।

অর্শ ও ভগন্দরের পথ্যাপথ্য

সুপথ্য—দিনে পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, মুগ, আলু, পটোল, ডুমুর, মানকচু, ওল, উচ্ছে, থোড়, শজিনা, ডাটা, কপি, চুনা মাছ প্রভৃতি লঘু পথ্য, রাত্রে রুটি, লুচী ও সাগু প্রভৃতি রুচিকর লঘু বলবর্ধক পথ্যাদি হিতকর। পেঁপে, (কাঁচা ও পাকা) বেতোশাক, নটেশাক, কলমিশাক, তিষ্ণাশাক, মোচা, কৈ, মাগুর, মৌরালা, রুহিত মৎস্যের ঝোল, ছাগ-দুগ্ধ, গব্য দুগ্ধ, মাখন, মিছরি, কৃষ্ণ তিল সুখাদ্য।

কুপথ্যঃ—ভাজা পোড়া দ্রব্য, দধি, পিষ্টক, (পিঠা); শিম, রৌদ্র, অগ্নি সন্তাপ, রাত্রি জাগরণ, মলমূত্র বেগ ধারণ, সাইকেল চালনা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি যানে গমনাগমন অহিতকর।

বাগী

বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া কুচ্‌কি ও সন্ধিতে শোথ উৎপাদন করে। এ সন্ধি স্থানে বিশেষতঃ উরু সন্ধিতে যে শোথ সঞ্চিত হয়, তাহাকে বাগী বলে। এই রোগে জ্বর ও বেদনা থাকে।

চিকিৎসাঃ ১। বাগী উঠিবার সময় বটের বা কালকুচের আঠা দ্বারা লেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। গুড় ও চুন কিংবা শজিনার আঠা ও চিনি একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বাগী নিবারিত হয়।

২। কৃষ্ণ জীরা হবুষ (Theuetia Nerieolia) কুড়, গম, কুলশুঠ, প্রত্যেক সমভাগ। কাঁজীতে পিষিয়া উহা উষ্ণ করত প্রলেপ দিবে। বাগী প্রশমিত হইবে।

৩। একটা কাক মারিয়া তৎক্ষণাৎ পেট ছিড়িয়া নাড়ীভুরি বাহির করিয়া ফেলিবে। অতঃপর উক্ত পেট দ্বারা বাগী আবৃত করিলে ক্ষণকাল মধ্যে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

শ্লীপদ (গোদ)

শ্লীপদ রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে কুচকিস্থানে বেদনা, শোথ ও জ্বর উপস্থিত হয়। ঐ শোথ ক্রমান্বয় কোন এক পায়ে কিংবা দুনো পায়ে নামিয়া পা হস্তী পদের ন্যায় হইয়া যায়।

বায়ুর প্রকোপ থাকিলে শ্লীপদ—কৃষ্ণবর্ণ, জ্বর ও বেদনা হয়।

পিত্তের প্রকোপ থাকিলে শ্লীপদ—পীতবর্ণ দাহ ও জ্বর হয়।

কফের প্রকোপ থাকিলে শ্লীপদ—কঠিন পাণ্ডুবর্ণ বা শ্বেত বর্ণ হইয়া থাকে।

চিকিৎসাঃ ১। শ্বেত আকন্দের মূল কাঁজীতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়।

২। কনক ধুতুরা মূল, এরণ্ড মূল, নিসিন্দা, পুনর্নবা, শজিনা মূলের ছাল ও শ্বেত সরিযা পিষিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা

৩। দেবদারু, চিতামূল গোমূত্রে বাটিয়া নরম করিবে। ইহা দ্বারা গরম গরম প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল উৎপন্ন শ্লীপদও শুকাইয়া যায়।

৪। মঞ্জিষ্ঠা যষ্ঠি মধু, রাস্না, শুড় কামাই পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে বাটিয়া শ্লীপদে প্রলেপ দিবে।

উক্ত প্রলেপাদির সহিত নিত্য গুলঞ্চের ক্কাথে সরিষার তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়।

৬। ত্রিকুট, (সমান সমান শুঠ, পিপুল ও গোলমরিচ) ত্রিফলা (আমলকী হরিতকী ও বহেড়া) চৈ, দারু হরিদ্রা বরুণ ছাল, গোক্ষুর, মুস্তিরী (বড় থুল কুড়ী ও গুলঞ্চ প্রত্যেক চূর্ণ ১ ভাগ

সর্বচূর্ণের সমান বিদ্ধড়ক চূর্ণ একত্র করিয়া অর্ধ তোলা মাত্রায় কাঁজীর সহিত পান করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

৭। ছিঙ্গুলোখ, পারদ, গন্ধক, তামা, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে, কড়ি ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম, ত্রিফট, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চ লবণ, চৈ, পিপুল মূল, হবুষ বচ, শটী, আকনাদী, দেবদারু, এলাচ, বিদ্ধড়ক, তেউড়ীমূল, চিতামূল, দন্তিমূল। প্রত্যেক ১ ভাগ, হরিতকের ক্বাথে মর্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান শীতল পানি।

তদ্‌বীর

১। বাগী, শ্লীপদ উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুক্‌না মাটিতে

قُلْ اَرَاَيْتُمْ ..... مَّعِيْنٍ ২ বার وَ قِيْلَ يَآ اَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ ..... الظّٰلِمِيْنَ ৩ বার পড়িয়া দম দিবে এবং পাঠক নিজ মুখের থুথু ঐ মাটিতে নিক্ষেপ করত বাগী ও শ্লীপদ স্থানে প্রলেপ দিবে।

২। তার্পিন, সরিষার তৈল, পঞ্চ লবণ ও কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে

اَفَحَسِبْتُمْ ..... خَيْرُالرّٰحِمِيْنَ ৩ বার

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ ..... عَذَابٌ اَلِيْمٌ ৩ বার

قُلْ اَرَاَيْتُمْ ..... مَّعِيْنٍ ৩ বার

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرٰى

فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَآ اَمْتًا ৩ বার

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ ..... نَذِيْرًا ৩ বার

رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ১০ বার

مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ১০ বার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ ২ বার

পড়িয়া প্রতিবারে ঐ তৈলে দম দিবে। দেড় মাস দৈনিক ৪/৫ বার মালিশ করিবে। খোদা চাহে ত শ্লীপদ প্রশমিত হইবে।

পথ্যাপথ্য ঃ—কোষ ব্যাধির পথ্যাপথ্যের অনুরূপ।

গোড়শূল

পায়ের গোড়ালীর তলদেশে শূলনিবৎ বেদনা হইয়া থাকে। ইহা মারাত্মক না হইলে বড়ই কষ্টদায়ক ব্যাধি। এই রোগে রোগী চলাফিরা করিতে পারে না গোড়শূল রোগ প্রকুপিত পিত্তাধিক্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদ্দ্বারা নিয়মিতভাবে পায়খানা হইয়া যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কাঁচা হলুদ, নিমপাতা, গুঞ্চের ক্বাথ দীর্ঘদিন সেবন করিলে উহা প্রশমিত হইতে পারে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ ব্যবহার করিলে সুফল হইবে।

সর্বাঙ্গীন

কোমর বেদনা—অনিয়ম আহার-বিহার অসাবধানতা হেতু কোমর বেদনা হইতে পারে। কোষ্ঠ কাঠিন্য হেতুও কোমর বেদনা হয়। গুর্দা ব্যাধির জন্যও কোমর বেদনা হইতে পারে। রোগ ও কারণ নির্ণয় করতঃ উহার প্রতিকার করিবে।

১। ঠাণ্ডা লাগিয়া কোমরে বেদনা হইলে ২ তোলা মধু আধ পোয়া মৌরি ভিজান পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। তৎসঙ্গে ৬ মাশা কালাজিরা ২ তোলা মধুর সহিত চিবাইয়া খাইবে। ডান বা বাম কোকের বেদনায় ইহা বিশেষ উপকারী।

২। শীতকালে সন্তান প্রসবের পর স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্যাভাবেও প্রসূতির কোমরে বেদনা হইতে পারে। এই বেদনায় হাফ বয়েল আণ্ডার সহিত নেমক সোলাইমানী সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

৩। ঋতুকালীন কোমর বেদনাকে বাধক বেদনা বলা হয়। উহার চিকিৎসা বাধক অধ্যায় দেখিয়া লইবে।

৪। হাঁটু, কেনু, প্রভৃতি সন্ধিস্থলের বেদনায় ৩ মাশা পানিফল মিহিন করিয়া লাল চিনির বা ইক্ষু চিনির সহিত সেবন করত অর্ধ পোয়া মৌরি ভিজান পানির সহিত ২ তোলা খমিরা বনদশা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। খমিরা বনদশা হেকীমদের দাওয়া খানায় পাওয়া যায়।

৫। ধারোষ্ণ দুগ্ধ বিশেষ ফলপ্রদ।

৬। থানকুনির পাতা লবণের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোমর বেদনা বিদূরিত হয়।

৭। পিপুল মূলের ছাল শুকাইয়া উহার ১ তোলা মিহিন গুড়া চিনির সহিত ২১ হইতে ৪০ দিন সেবন করিলে বেদনা নিবারণ হয়।

ফোঁড়া ও ব্রণ

রোগ প্রথমে শরীরের অভ্যন্তরে পয়দা হয়। রোগটি বাহির হইবার সময় আমরা অনুভব করি। কাজেই যথা সম্ভব ফোঁড়া ও বিষফোঁড়া না বসাইয়া বরং পাকিয়া বাহির হইতে দেওয়াই মঙ্গলজনক।

১। একান্ত উহা বসাইয়া দিতে হইলে গম, যব ও মুগ সিদ্ধ করিয়া পিষিয়া প্রলেপ দিলে উহা বিলয়প্রাপ্ত হয়।

২। শজিনা মূলের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

৩। দশমূল বাটিয়া গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে। অতঃপর অগ্নিতে গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। ফোঁড়া বসিয়া যাইবে। যদি ইহাতে না বসে, তবে পাকিবার ঔষধ ব্যবহার করিবে।

৪। প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রবয, চালুনি পানিতে পিষিয়া প্রলেপ দিবে, কিংবা গোলমরিচ পানিতে ঘষিয়া লাগাইবে অথবা ঘুটের ছাইয়ের প্রলেপ দিবে। ইহাতে ব্রণ বসিয়া প্রশমিত হইবে। পোড়া মাটির প্রলেপও ঐরূপ কার্যকরী।

৫। চিরতা, নিমছাল, যষ্টিমধু, মুতা, বাসকছাল, পল্‌তা, ক্ষেত পাপড়া, বেনারমূল, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সর্বপ্রকার ব্রণ প্রশমিত হয়।

৬। রক্ত চন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল ক্ষুদে নটে, শিরিছাল, জাতাপুষ্প ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ব্রণের দাহ প্রশমিত হয়।

৭। গুলঞ্চ, পলতা, চিরতা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেত পাপড়া, খদিরকাষ্ঠ, মুতা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ব্রণের জ্বরাদি প্রশমিত হয়।

৮। শনবীজ (ঝম ঝুনিয়া), মূলাবীজ, মসিনা, শজিনাবীজ, তিল, সরিষা, যব ও গম। এই্‌ সকল দ্রব্যের দ্বারা পুলটিস করিলে ফোঁড়া ও ব্রণ পাকিয়া উঠে।

৯। আমপাতা, নিমপাতা, কৃষ্ণ কলির মূল বা পাতা বাটিয়া তাহা ঘৃতাক্ত করিবে। পুরু করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ও ব্রণ পাকিয়া থাকে।

১০। গন্ধ বিরাজের পটি দিলে বসিবার শোথ বসিয়া যায় এবং পাকিবার শোথ পাকিয়া যায়।

১১। ছোট গোয়ালের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-ফোঁড়া পাকে, ফাটে ও পুঁজ নিঃসারিত হয়।

১২। করঞ্জ, ভেলা, দন্তি, চিতামূল, কবরী মূল এবং কবুতর, কাক অথবা শকুনীর মল। এই্‌ সকল দ্রব্য ব্রণে সংযোগ করিলে উহা ফাটিয়া যায়।

১৩। গরু দাঁত পানিতে ঘসিয়া তাহার বিন্দুমাত্র ফোঁড়া বা ব্রণে লাগাইলে অসাধ্য ও কঠিন শোথও পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

১৪। সাপের খোলস (ছলম) ভস্ম করিবে। ভস্ম সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা শোথ প্রলিপ্ত করিলে উহা পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

১৫। হাগর মালীর আঠা (Vallaris Heyni) দ্বারা প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল উৎপন্ন ক্ষতও প্রশমিত হয়। উচ্ছে পাতা, তুলসী পাতা, ইহাদের একটির প্রলেপ দিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে।

লোহার কোদালে পাতি লেবুর রসে শ্বেত আকন্দের মূল ঘষিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিলে অসাধ্য ক্ষতও নিবারিত হয়।

ব্রণ রাক্ষসী তৈলঃ—ইহা সর্বপ্রকার বিদ্রধি ও ব্রণের মহৌষধ।

প্রস্তুত প্রণালীঃ—সরিষার তৈল অর্ধসের কল্কার্থ, শোধিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটে সিন্দুর, মনছাল, রসুন, মিঠাবিষ, তাম্র। প্রত্যেকটি ২ তোলা, সূর্যতাপে পাক করিবে।

নালী ঘা

পক্ক শোথ উপেক্ষা করিলে অর্থাৎ পুঁজ বাহির করিয়া ফেলিলে এবং উহা দীর্ঘদিন বদ্ধাবস্থায় থাকিলে; চামড়া, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থি পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া ক্রমশঃ অভ্যন্তরের দিকে ধাবিত হয়। পুঁজ বাহির করা এবং পরিষ্কার করত যে সব ঔষধে নালী পুরিয়া উঠে এরূপ ব্যবস্থা করাই উহার চিকিৎসা—ক্ষতের নালী যতদূর পৌঁছিয়াছে, তাহা শলাকাদি দ্বারা নির্ণয় করত অস্ত্র দ্বারা চিরিয়া পুঁজ বাহির করিবে কিন্তু সাবধান যেন কোন রগ কাটিয়া না যায়। অতএব, আপারেশন ঠিক অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক হওয়া দরকার। অন্যথায় রগ কাটিয়া গিয়া অতিরিক্ত রক্ত বাহির হইতে পারে। কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

১। শজিনার মূলের ছাল, হরিদ্রা, কালিয়া কড়া, ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃতাক্ত করিয়া উহা একখণ্ড নেক্‌ড়ায় মাখাইয়া লইবে। শুষ্ক করিয়া ক্ষত স্থানে ধারণ করিবে। কয়েক দিন এরূপ করিলে পুঁজাদি বাহির হইবে এবং ক্ষত পুরিয়া উঠিবে।

২। বাগ ভ্যারেণ্ডার আটা ও খয়ের একত্রে ক্ষতস্থানে পুরিয়া রাখিলে উহা প্রশমিত হয়।

একখণ্ড কচি কলাপাতার এক পার্শ্বে সূঁচ দ্বারা অসংখ্য ছিদ্র করিবে। কলা পাতার ছিদ্রের উপরে কিছু হিঞ্চার শিকড় বিছাইয়া পাতার অপর দিক দ্বারা আবৃত করিবে। ছিদ্রদার পার্শ্ব ক্ষতের উপর

নেক্‌ড়া দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। ৫/৭ দিন পর্যন্ত প্রতিবার নূতন করিয়া উহা ধারণ করিলে উৎকট নালী ঘাও পুরিয়া উঠিবে। ইহা নালী ঘায়ের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

ব্রণ রাক্ষসী তৈল বিশেষ উপকারী। প্রস্তুত প্রণালী ফোঁড়া ও ব্রণ রোগ চিকিৎসা অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

জ্বর

এক দোষজ একটি রোগ শঙ্কর ব্যাধি। সে নিজেও মারাত্মক ও প্রাণ সংহারক সর্বাঙ্গীন ব্যাধি। জ্বর বহু প্রকার এবং উহার চিকিৎসাও খুব সহজ নয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারাই উহার চিকিৎসা করা ন্যায় সংগত।

আমরা এখানে সহজ ও সুলভ ঔষধপত্র ও পাচনাদি এবং মুষ্টিযোগের কথা উল্লেখ করিব যদ্দ্বারা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

বাত জ্বর

এই জ্বরে পিত্ত ও শ্লেষ্মা আপন আপন গতিতে চলিতে থাকে, একটু প্রবলও হইতে পারে। কিন্তু বায়ু বিকৃত ও প্রকুপিত হইয়া আপন গতিবেগ অতিক্রম করিয়া থাকে।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বাত জ্বরের লক্ষণ নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কম্প, হাই উঠা, কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হওয়া, নিদ্রা ভাল না হওয়া, হাঁচি না হওয়া। শরীর রুক্ষ, সমস্ত গাত্র বিশেষতঃ হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে অত্যন্ত বেদনা হওয়া, অধিক কথা বলা, মল কঠিন হওয়া, উদরুধ্যান ও উদর বেদনা হওয়া প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—১। এই জ্বরে হাত-পা ও মস্তক কামড়ানী থাকিলে গুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, রেণুকা, ধনে, সোনার মূল। ইহাদের ক্বাথে ।০ আনা চিনি ও ৵০ আনা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

২। এই জ্বরে—জ্বর খুব প্রবল হইলে এবং হাত-পা মস্তক কামড়াইতে থাকে। জ্বর বিরাম কালে যদি কয় (বমি) হয়, তবে বেল, শোনা, গম্ভারী, পারুল গণিয়ারী বেড়েলা, রাস্না, কুলখ কলায় ও কুড়। ইহাদের ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিবে। কম্প নিবারণার্থে গরম কাপড়ের পুটলী হাতের তালু, পায়ের তলা এবং বগলে ধারণ করিবে।

পিত্তজ্বর—এই জ্বরের বেগ খুব তীক্ষ্ণ হয়, অতিসারের ন্যায় তরল মলভেদ, অল্প নিদ্রা, কণ্ঠে, ওষ্ঠে, মুখে ক্ষত হইতে পারে, ঘাম হইতে থাকে। রোগী প্রলাপ বকে। মুখ তিক্ত হয়, মুর্ছা, দাহ ও পিপাসা হয়। মলমূত্র ও নেত্র পীতবর্ণ হয়। এই জ্বরে কোবলমাত্র পিত্ত প্রবল ও প্রকুপিত হয়।

পিত্তজ্বর চিকিৎসার্থে—ক্ষেতপাপড়া, রক্ত চন্দন, বালা, শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ বিশেষ উপকারী।

এই জ্বরে পিপাসা ও দাহ থাকিলে—বালা, রক্তচন্দন, বেলার মূল, মুতা ও ক্ষেতপাপড়া, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া কিঞ্চিত মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পিত্তজ্বরে তরল মলভেদ, বমি ও পিপাসা থাকিলে আম ও জামের কচিপাতা, বটের অস্কর, বেনার মূল ইহাদের সর্বমোট ৮ তোলা লইয়া পিষিবে, অতঃপর একটি মাটি বা কাঁচের পাত্রে রাখিয়া ছাকিবে। ঐ ছাকা পানিতে কিছু মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

উক্ত জ্বরে বমি, বমনভাব, অরুচি, কাশ, শ্বাস, অন্তর্দাহ, প্রলাপ, মুর্ছা, পিপাসা, গাত্র ঘূর্ণন থাকিলে কিস্‌মিস, রক্তচন্দন, পদ্মমূল, মুতা, কটকী, গুলঞ্চ, আমনবীবালা, বেনার মূল, লোধ,

ইন্দ্রযব, ক্ষেতপাপড়া, ফসলা, যষ্টিমধু, দুরালভা, প্রিয়ঙ্গু, বাসক, গাব, চিরতা, ধনে ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

কফজ্বরঃ—এই জ্বরে বেগ মন্দা, আলস্য মুখ মিষ্টিভাব মলমূত্র ও নেত্র শুক্লবর্ণ,রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, শরীরের স্তব্ধতা, অবসন্নতা, গুরুতা, আহারে অনিচ্ছা, বমন, অপরিপাক, শীতানুভব, মুখ ও নাক দিয়া পানিস্রাব, কাশ, অরুচি, সাধারণত এই সমস্ত লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা

১। ছাতীম ছাল, গুলঞ্চ, নিমছাল, গাবছাল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কফ বিনষ্ট হয় এবং জ্বরের উপশম হয়।

২। শুঁঠ পিপুল, গোলমরিচ, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, কটকী, ইন্দ্রযব। ইহাদের ক্বাথ পান করিলে জ্বর বিনষ্ট হয়।

৩। কটকী, চিতামূল, নিমছাল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব ও মূর্বামূল, (শোচ মুখী) ইহাদের ক্বাথ মরিচচূর্ণ ও মধুসহ পান করিলে প্রবল কফ জ্বর বিনষ্ট হয়।

৪। কফজ্বরে কফের অত্যন্ত প্রকোপ, শ্বাস, কাশ, বক্ষ বেদনা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি শ্লেষ্মজ উপদ্রব থাকিলে কন্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও পিপুল ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ পাচন।

কফজ্বরে দৌর্বল্য ও শ্রবণ শক্তির অল্পতা ঘটিলে নিসিন্দার পাতার ক্বাথ পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিতে দিবে। ঐ জ্বরে কাশ অত্যন্ত প্রবল হইলে বাসক ছাল, কন্টকারী ও গুলঞ্চ। ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিতে দিবে।

দ্বিদোষজ জ্বর

বাত, পিত্তজ্বর—প্রকুপিত বায়ু ও পিত্তের আধিক্যে যেমন নাড়ীতে অনুভব হয়, তেমনভাবে বাত ও পিত্তের লক্ষণাদি বাহ্যিক ভাবেও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

চিকিৎসা

১। চিরতা, গুলঞ্চ, কিস্‌মিস, আমলকী, পিপুল শুঁঠ ও শঠি। ইহাদের পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত পান করিলে পিত্তের প্রশমন ও জ্বরের নাশ হইয়া থাকে।

২। মুতা, ক্ষেত পাপড়া , নীলসুদী, চিরতা, বেনার মূল, রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ পাচন।

৩। গুলঞ্চ, মুতা, ক্ষেত পাপড়া, চিরতা, শুঁঠ। এই পাঁচটি দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে বাতপিত্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

৪। রাস্না, বাসক ছাল, ত্রিফলা, সোন্দাল ফল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাত পিত্ত জ্বরের উপশম হয়। কোষ্ঠের শুদ্ধিও হইয়া থাকে।

পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বর

১। এই জ্বরে অরুচি ও বমি প্রভৃতি পৈত্তিক ও শ্লেষ্টিক উপদ্রব থাকিলে উহার প্রতিকারার্থে—পলতা, রক্তচন্দন, মূর্বমূল, কটকী, আকনাদি ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

২। পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরে দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, কাশ, বমি ও পার্শ্ব বেদনা থাকিলে—কন্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটি, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরলতা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুতা, পলতা ও কটকী ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

বাত শ্লেষ্মা জ্বর

এক দোষজ জ্বর অপেক্ষা দ্বিদোষজ জ্বর কঠিন। দ্বিদোষজ জ্বরের মধ্যে আবার বাত শ্লেষ্মা জ্বর অতি কঠিন। সকল দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ জ্বর খুব কঠিন এবং উহার লক্ষণাদি প্রবল হইলে উহাকে জ্বর বিকার বলা হয়।

চিকিৎসা

১। বাত শ্লেষ্মা জ্বরে যদি সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা, শির বেদনা, কাশ ও অরুচি থাকে, তবে নিম্নোক্ত পাচন মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নিমছাল, গুলঞ্চ, শুঠ, দেবদারু, কট ফল, কটকী ও বচ। এই সমুদয় দ্রব্য থেতো করিয়া পানি দ্বারা জ্বাল দিয়া পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

২। এই জ্বরে যদি অপাক, অনিদ্রা, পার্শ্ব বেদনা এবং কাশ ও শ্বাস থাকে তাহা হইলে দশমূল পাচন অর্থাৎ বেল, শ্যোনা, গম্ভারী, পারুল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি কন্টকারী ও গোক্ষুর যথাসম্ভব মূলের ছালের ক্বাথ, পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ পান করিতে দিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ পাচন।

৩। বাত শ্লেষ্মা জ্বরে যদি হিক্কা, শোয, গলাবদ্ধতা, কাশ ও শ্বাস থাকে তাহা হইলে দেবদারু, ক্ষেত পাপড়া, বামুনহাটি, মুতা, বচ, ধনে, কট ফল, হরিতকী, শুঁঠ ও নাটাকরঞ্জ ইহাদের ক্বাথ শোধিত হিং ও মধুসহ পান করিতে দিবে।

৪। প্রবল বাত শ্লেষ্মা জ্বরে এবং সান্নিপাতিক জ্বরে গাত্রের স্তব্ধতা ও বেদনা নিবারণার্থে বালুকা স্বেদ খুবই উপকারী। কিন্তু, লিঙ্গ কোষ, চক্ষু ও হৃদয়ে স্বেদ দিবে না। একটা পাত্রে বালুকা উত্তপ্ত করিবে, পরে একখণ্ড কাপড়ের উপর বা আকন্দের পাতা বিছাইয়া উহার উপর গরম বালুকাগুলি ঢালিয়া একটা পুটলি বাঁধিয়া কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে। যখন শীত, বেদনা, দেহের স্তব্ধতা ও গায়ের গুরুতা নিবারণ হইবে তখন আর স্বেদ দিবে না।

৫। প্রবল বাত শ্লেষ্মা জ্বরে বুকে শ্লেষ্মা বসিলে বাক্য রোধ কিংবা রোগী তন্দ্রাভিভূত হইলে, বুকে ও পার্শ্বদ্বয়ে স্বেদ দিবে। স্বেদ দিতে কখনও ভয় পাইবে না বা দেরী করিবে না। পান বা আকন্দের পাতা খুব পুরাতন উষ্ণ ঘৃতে সিক্ত করিয়া স্বেদ দিবে।

ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক জ্বর

ত্রিদোষজনিত রোগ মাত্রই বিপজ্জনক। তন্মধ্যে ত্রিদোষজনিত প্রবল জ্বর অর্থাৎ সান্নিপাতিক জ্বর খুবই ভয়ঙ্কর। সান্নিপাতিক জ্বর হইবা মাত্রই অভিজ্ঞ ডাক্তার, কবিরাজ কিংবা হেকিম দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

১। সান্নিপাতিক জ্বরে শরীরের সর্বত্র পানির সঞ্চার হইয়া থাকে। যতক্ষণ ঐ পানিকে পরিপাক কিংবা বহিষ্কার না করা যায়, ততক্ষণ ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক হয় না। অতএব, বারংবার স্বেদ দ্বারা শরীরের রস ও ফল শুকাইতে বা বাহির করিতে হইবে।

২। তন্দ্রা সান্নিপাতিক জ্বরের একটি লক্ষণ। রোগী প্রায়ই তন্দ্রা দিয়া থাকিলে কিংবা অচেতন থাকিলে একটা মোরগ যবেহ করিয়া উহার পেটের নাড়ীভুঁড়ী প্রভৃতি ছিড়িয়া বাহির করিবে এবং মোরগের ঐ খোলসে কিছুক্ষণ রোগীর মাথা ঢুকাইয়া রাখিলে রোগী চেতনা লাভ করিবে।

৩। গরম লৌহ দ্বারা পায়ের তলা কিংবা কপালে তাপ দিলে রোগী চেতনা লাভ করিয়া থাকে।

৪। কাল মুরগীর ডিমের তরলাংশ পান করিলে অথবা উহার নস্য লইলে সান্নিপাতিক জ্বরে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

৫। পিপুলমূল, পিপুল, সৈন্দব লবণ, ও মৌলফলের আঁটি (হিন্দীতে) মহুয়া, ডাক্তারীতে (Bassia) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদয় চূর্ণের সমান গোলমরিচের মিহিন গুড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ পানির সহিত পিষিয়া উহার নস্য লইলে রোগীর চেতনা হয়। তন্দ্রা, প্রলাপ ও মস্তকের ভার নিবারিত হইয়া থাকে।

৬। সৈন্দব লবণ, বিট লবণ ও সচল লবণ, আদার রসে মাড়িয়া গরম করতঃ উহার নস্য ব্যবহার করিলে বুকের ও মাথার অতি গাঢ় শ্লেষ্মাও তরল হইয়া বাহির হয়। তাহাতে মস্তকের ও হৃদয়ের ভার, পার্শ্ব বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

৭। সান্নিপাতিক জ্বরে যদি বাত এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ অত্যধিক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বেল, শ্যোনা, গম্ভারী, পারুল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি কন্টকারী ও গোক্ষুর, চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ, মধু ও পিপুল চূর্ণসহ পান করিতে দিবে।

কর্ণমূল জাত শোথ

সান্নিপাত জ্বরের শেষ অবস্থায় কাহারও কাহারও কর্ণমূলে শোথ হইয়া থাকে। সেই শোথ অনেক সময় প্রাণনাশক হইয়া দাঁড়ায়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় শোথ উপস্থিত হইলে উহা সাধ্য, মধ্যাবস্থায় কষ্টসাধ্য এবং শেষ অবস্থায় প্রায়ই অসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

প্রথমে শোথের স্থানে জোঁক বসাইয়া রক্ত-মৌক্ষণ করিবে। পরে গেরিমাটি, সমুদ্র লবণ, শুঁঠ, বচ ও রাই সরিষা সমভাগে লইয়া কাঁজিতে পেষণপূর্বক তাহা উষ্ণ করিয়া শোথে প্রলেপ দিবে। ইহাতে শোথ বসিয়া যাইবে। যদি শোথ শুকাইয়া না যায়, তবে মসিনা বাটিয়া ঘৃতাক্ত করিয়া উষ্ণ করত বারংবার প্রলেপ দিলে শোথ পাকিয়া উঠিবে পরে অপারেশনপূর্বক পুঁজ বাহির করিয়া ক্ষত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে।

সান্নিপাত জ্বর অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি। অতি প্রাচীন অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সান্নিপাত, বিষম জ্বর প্রভৃতি জ্বরে একটি মাত্র ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইতেছে যাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা মোটেই নাই বরং উপকারই হয়। হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণ, মাক্ষিক, লৌহ, রৌপ্য, সৈন্দব লবণ ও মরিচ প্রত্যেক একভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, ধুতুরা ও শেফালিকা পাতার রস দশমূল ও চিরতার রসে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি প্রস্তত করিবে। অনুপান অবস্থা অনুযায়ী।

বিষম জ্বর ও জীর্ণ জ্বর চিকিৎসা

মুষ্টিযোগ—জ্বর যদি প্রত্যহ মন্দ মন্দ ভাবে হইতে থাকে এবং তাহাতে যদি হাত পা ও চক্ষু জ্বালা করে, রগ টিপ টিপ করে, মস্তক ধরে, অরুচি ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে—ক্ষেত পাপড়, শেফালিকা পত্র ও গুলঞ্চ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া শিলে থেতো করিয়া কলা পাতায় রাখিবে এবং তাহা অগ্নিতে সেঁকিয়া লইবে। অতঃপর উহা রাত্রিতে শিশিতে রাখিয়া পরদিন তাহার রস নিংড়াইয়া মধুসহ প্রতঃকালে অর্ধ ছটাক ও শয়নকালে অর্ধ ছটাক পান করিবে।

পালা জ্বর

উচ্ছে পাতা বা আসসেওড়া পাতা হস্তে মর্দন করিয়া তাহা নেক্ড়ায় বাধিয়া জ্বরের পালার দিন ঘ্রাণ লইবে। ইহাতে পালা জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

তদ্বীর

ঠাণ্ডা লাগা জ্বর বিশেষতঃ শিশুদের ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইলে নিম্নোক্ত তাবীজ তিনটি বিশেষ ফলপ্রদ, বহু পরীক্ষিত।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مُحِيْطُ — ১ নং

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مُحِيْطُط — ২ নং

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مُحِيْطَطًا — ৩ নং

ব্যবহার বিধি—১নং তাবীজটি নেকড়া দিয়া ডান হাতের বাজুতে বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে জ্বর বিরাম না দিলে পরদিন ঠিক ঐ টাইমে (যে টাইমে তাবীজটি বাঁধা হইয়াছে) উহা খুলিয়া বাম হাতের বাজুতে বাধিবে। ২ নং তাবীজ ডান হাতের বাজুতে বাধিবে। ইহাতে জ্বরের উপশম না হইলে তৃতীয় দিন ঠিক ঐ সময় ২নং তাবীজ খুলিয়া বাম হাতের বাজুতে ১ নং তাবীজের কাছে বাধিবে। ৩ নং তাবীজটি ডান হাতের বাজুতে বাধিয়া দিবে। আল্লাহ্ চাহে ত শীঘ্রই জ্বর বিরাম দিবে। জ্বর বিরামের পরও ৩দিন তাবীজ ধারণ করিলে জ্বর পুনরাক্রমণের আশঙ্কাও থাকে না।

গরম লাগা জ্বর

১। একখণ্ড কাগজে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া ডান হাতের বাজুতে ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قُلْنَـا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلاَمًـا عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ـ

২। নিম্নলিখিত নক্শাটি এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া উহা এক গ্লাস পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে এবং ঐ পানি গরম লাগা জ্বরের রোগীকে সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বর নিবারণ হইবে।

٧٨٦

ن	١	م	ح	٧
٣٨	١١	١٩٨	٣٨	٤
١٩٦	٥١	٢	٢١٠	٩
٥	٣١	٧	٩٩	٤٩
٦	٢٩	٥٢	٣	٣٧

৩। ১১ বার দুরূদ শরীফ পড়িয়া তৎপর ৭ বার সূরা-ফাতেহা পড়িবে এবং কার্পাসের তূলার উপর ফুক দিয়া উহা ডান কানে দিবে।

৪। ৭ বার সূরা-ফাতেহা পড়িয়া পরে কিছু তূলার উপর ফুক দিয়া তৎপর ১১ বার দরূদ শরীফ পড়িবে এবং তূলা বাম কানে ধারণ করিতে দিবে।

প্রথম দিন যে সময় তূলা ধারণ করিবে, দ্বিতীয় দিনের ঠিক সেই সময় ডান কানের তূলা বাম কানে এবং বাম কানের তূলা ডান কানে দিবে। তৃতীয় দিনও ঐরূপ করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ সর্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হইবে।

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশে একদিকে আযান এবং অন্যদিকে একামতের শব্দগুলি লিখিবে। খোদা চাহে ত শীঘ্রই জ্বর বিরাম হইবে।

৫। যাবতীয় বেদনা ও জ্বরে চিনা বরতনে নিম্নোক্ত তদ্‌বীর লিখিয়া বৃষ্টি বা গোলাপের পানি দ্বারা ধৌত করিয়া ঐ পানি রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহার সামান্য পানি দ্বারা মুখ ও শরীর মুছিয়া দিলে জ্বর বিরাম দিয়া থাকে।

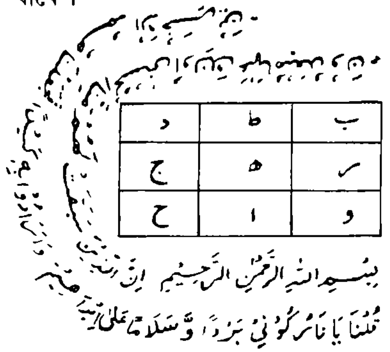

৬।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ جِلْدِى الرَّقِيْقَ وَ عَظْمِى الدَّقِيْقَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِيْقِ يَا اُمَّ فَلَاحٍ اِنْ كُنْتِ اٰمَنْتِ بِا للّٰهِ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ فَلَاتُؤْذِ الرَّأْسَ وَ لَا تُفْسِدِ الْفَمَ وَلَا تَأْكُلِ اللَّحْمَ وَ لَا تَشْرَبِ الدَّمَ وَ تَحَوَّلِىْ عَنْ حَامِلِ هٰذَا الْكِتَابِ اِلٰى مَنْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۔ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ۔

৭। দুই দিন বা তিন দিন অন্তর অন্তর জ্বরে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে;

بسم الله ولت بسم الله فرت بسم الله مرت بسم الله انصرفت بسم الله ادبرت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِىْ وَ الَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَ يَسْقِيْنِىْ وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِىْ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ وَ مَنْ نَّزَلَتْ عَلٰى قَلْبِهٖ اَنْ تَشْفِىَ حَامِلَ كِتَابِ هٰذَا ۔

৮। যে কোন প্রকার জ্বরে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে জ্বরের উপশম খোদা চাহে ত হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ اِلٰى اُمِّ مَلُوْمٍ اَلَّتِىْ تَاْكُلُ اللَّحْمَ وَسَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ تَشْرَبِ الدَّمَ وَتَهْشَمِ الْعَظْمَ اَمَّا بَعْدُ يَٓااُمَّ مَلُوْمٍ اِنْ كُنْتِ مُؤْمِنَةً بِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ عَلَيْـهِ السَّـلَامُ وَاِنْ كُنْتِ يَهُوْدِيَّةً فَبِحَقِّ مُوْسٰى الْكَلِيْمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنْ كُنْتِ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَنْ لَّااَكَلْتِ لِفُلَانٍ .... এইখানে রোগীর নাম بْنِ فُلَانَةٍ .... রোগীর বাপের নাম لَحْمًا وَّلَاتَشْرَبْ لَهٗ دَمًا وَّلَاهَشْمَةً لَّهٗ عَظْمًا وَّتَحَوَّلُوْا عَنْهُ اِلٰى مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَلَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَاِلَّا فَاَنْتِ بَرِيْئَةٌ مِّنَ اللهِ تَعَالٰى بَرِىٌّ مِّنْكَ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

৯। আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া পূর্ব্ববৎ ধুইয়া সেবন করাইবে।

সর্বদা সেবা শুশ্রূষার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিবে যাহাতে বেশী গরম বা ঠাণ্ডা লাগতে না পারে এবং যাহাতে নিয়মিত প্রস্রাব ও পায়খানা হয়, সে জন্য ঔষধ ও তদ্‌বীরের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেই হইবে।

জ্বরের পথ্যাপথ্য

সুপথ্য—নব জ্বরে মিছরি, বাতাসা, ডালিম, কিস্‌মিস, খৈ-এর মণ্ড, পানি সাগু, এরারুট, বার্লি, প্রভৃতি লঘু ভোজন ব্যবস্থা করিবে। গরম পানি ঠাণ্ডা করিয়া পান করিতে দিবে। শ্লেষ্মা জ্বরে , বাতজ্বরে ঈষদুষ্ণ পানি পান করিতে দিবে। জ্বর বিরামের দুই তিন দিন পর বা অধিক দিন পরও অন্ন পথ্য দিবে না। ঐ কয়েকদিন পল্‌তায় বড়া, বাডাল্‌না, কৈ, মাগুর বা শিঙ্গি মাছের ঝোল, খুব বেশী ক্ষুধা হইলে ২/১ খানা ফুল্‌কা রুটীর ব্যবস্থা করিবে। তৎপর যখন শীররের সমস্ত গ্লানি দূর হইবে রোগীর অন্ন লিপ্সা হইবে, তখন অতি সূক্ষ্ম পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ বা মসুরের ডাল, কৈ, মাগুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎসের ঝোল, মানকচু, ডুমুর ইত্যাদি লঘু তরকারীর ব্যবস্থা করিবে। অন্ততঃ ৫/৭ দিন পর্যন্ত দুইবেলা অন্ন ভোজন করিতে দিবে না। রাত্রিতে ক্ষুধা অনুযায়ী সাগু বা হাল্‌কা রুটীর ব্যবস্থা করা যাইতে পরে।

বিষাণ জ্বর, জীর্ণ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু রোগে দিনের বেলা পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ বা মসুরের ডাল, কৈ, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি ছোট মাছের ঝোল, কফি বেগুন, কাঁচ কলা, ঠেটে কলা, কচি মূলা, পটোল, উচ্ছে, করলা, ঝিঙে ও কাকরোল প্রভৃতি হালকা তরকারী দেওয়া চলে। রোগী অত্যন্ত দুর্বল বা ক্ষীণ হইলে কবুতর, মুরগী, কিংবা বকরীর গোশ্‌তের জুশ ব্যবস্থা করিবে। কাগজী লেবু, এক বল্‌কা দুধ, অমৃত ফল। রাত্রিকালে ক্ষুধা অনুসারে রুটী, পাউরুটী, সাগু, এরারুট বা বার্লি সেব্য। জ্বরের আধিক্য থাকিলে দিনের বেলা অন্ন না দিয়া কোন লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

কুপথ্য—যতদিন রোগী বলবান না হয় ততদিন সর্বপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য, কফ বর্ধক দ্রব্য ভোজন, তৈল মর্দন, স্নান, পরিশ্রম, মৈথুন, দিবা নিদ্রা, ক্রোধ, ঠাণ্ডা পানি সেবন বা প্রবল বায়ু সেবন অহিতকর।

অগ্নি-দগ্ধ

সদা-সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত যাহাতে গায়ের-কাপড়ে আগুন লাগিতে না পারে বিশেষতঃ ছোট ছেলে-মেয়ের প্রতি এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত অপরিহার্য। গ্রাম্য মেয়েরা এ ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। ফলে প্রায়ই বহু লোককে অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে হয়।

অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা

১। চুনের স্বচ্ছ পানি ও নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে জ্বালা-যন্ত্রণা আশু নিবারিত হয়।

২। ক্ষতস্থানে মধু মাখাইয়া উহার উপর যবচূর্ণের লেপ দিলেও জ্বালা নিবারণ হয়।

তিল ও যব পোড়াইয়া উহার ভস্ম দ্বারা প্রলেপ দিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে।

লুচী ভাজা ঘৃত মাখাইয়া খাইলে সকল প্রকার ক্ষত শুকাইয়া যায়। মাখন সর্বপ্রকার ক্ষত ও অগ্নিদগ্ধ জাত ঘায়ের এবং ব্রণ ও ফোঁড়ার মহৌষধ।

দাদ

১। শোধিত গন্ধক চূর্ণ ও চিনি সমভাগে মিশাইয়া ২/৪ দিন দাদে লাগাইলে দাদ বিনষ্ট হয়; কিন্তু উহা দাদে লাগাইবার পূর্বে ডুমুর পাতা প্রভৃতি দ্বারা দাদ ঘর্ষণ করিয়া লইবে।

২। চাকুন্দের বীজ, জীরা ও পদ্ম গুলঞ্চের মূল পানিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ বিনষ্ট হয়।

৩। চাকুন্দে বীজ, আমলকী ধুনা ও মনসার আঠা এই সমুদয় কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ প্রশমিত হয়।

৪। চাকুন্দের বীজ, কুড়, সৈন্দব, শ্বেত সরিষা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য পানির সহিত কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ বিনষ্ট হয়।

কাউর চিকিৎসা

একটি সজল নারিকেলের মধ্যে কতকগুলি চাউল রাখিয়া দিবে। কিছুদিন পর যখন উহা পচিয়া যাইবে তখন ঐ পচা চাউল ও পানি উত্তমরূপে ছানিয়া ঘা প্রলিপ্ত করিলে অল্প দিনের মধ্যেই ঘা শুকাইয়া যায়। উহা খোস্ পাঁচড়ারও মহৌষধ।

খোস্ চুল্কনা

১। গন্ধক চূর্ণ সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া তাহা সূর্য তাপে উত্তপ্ত করত প্রলেপ দিলে খোস্ চুল্কনা, কাউর ঘা প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

২। আকন্দ পাতার রস ও হরিদ্রার কল্কসহ সরিষার তৈলে পাক করিয়া তাহা লাগাইলে খোস্ পাঁচড়া, ঘা শুকাইয়া যায়। কিন্তু অশুষ্ক পাঁচড়া প্রথমাবস্থায় কখনও শুষ্ক প্রলেপ দিবে না। কারণ ভিতরকার দূষিত পদার্থ বাহির হইতে না পারিলে নানাপ্রকার ব্যাধি দেখা দিতে পারে। প্রচুর পরিমাণ দূষিত পুঁজ, রস বাহির হওয়ার পর উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩। প্রতিদিন প্রত্যুষে কাঁচা হরিদ্রা ইক্ষু গুড়সহ চিবাইয়া ভক্ষণ করিলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া খোস্-পাঁচড়া প্রভৃতি নিরাময় হইয়া থাকে।

মুখের মোচতা

১। রক্ত চন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোষ, প্রিয়ঙ্গুর, নূতন বটের অঙ্কুর ও মসুরী এই সমুদয় বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের মোচতা বিনষ্ট হয়।

২। কিছুটা মসুরী পানিতে ভিজাইয়া দুধের সর (মালাই) সহ ঐ মসুরী পেষণ করিয়া এক সপ্তাহ মুখে লাগাইলে মুখের যাবতীয় দাগ দূর হইয়া মুখ লাবণ্যময় ও মোলায়েম হইয়া উঠে।

৩। লোষ, ধনে, বচ অথবা শ্বেত সরিষা, বচ ও লোধ, সৈন্দব লবণ পানিতে পেষণ করিয়া মুখে লাগাইলে মুখের দাগ বিনষ্ট হয়।

পিট চাল

ইহা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক ব্যাধি। ইহার প্রারম্ভেই সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। এতটুকুও বিলম্ব করিবে না।

তদ্‌বীর

১। ৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ الاية পড়িয়া পানিতে দম করিয়া সেবন করিলে ভিতরের যে কোন দূষিত পদার্থ ভাসিয়া উঠে।

২। ১০ বার رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

১০ বার مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا

পড়িয়া তৈলে দম দিয়া লাগাইলে যে কোন প্রকার যখম, খোস্-পাঁচড়া, ঘা, নালী ঘা অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রশমিত হয়।

আঘাত

আঘাত লাগামাত্র পানি দ্বারা খুব ভালভাবে মালিশ করিবে। কোন স্থানে হাড় ভাংগিয়া থাকিলে কিংবা বড় বেশী রকম আঘাত হইলে সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

শ্বিত্র রোগ (পাতরী)

হাতে, মুখে, কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থানে, আবার কাহারও সর্বাঙ্গে শ্বেত রোগ দেখা দিয়া থাকে। মারাত্মক কিংবা খুব কষ্টদায়ক না হইলেও বড় কুৎসিত ব্যাধি।

চিকিৎসা

১। সোমরাজী বীজ এবং এক চতুর্থাংশ শোধিত হরিতাল গোমূত্রে মর্দন করিয়া প্রতিদিন প্রলেপ দিলে ধবল লয় প্রাপ্ত হয়।

২। হাতীর বা চিতা বাঘের চামড়া ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম সরিষার তৈলে আপ্লুত করিয়া প্রলেপ দিলে উহা বিদূরিত হয়।

৩। কুঁচফল ও চিতামূল চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

৪। মনছাল ও আপাঙ্গক্ষরে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও ধবল বিনষ্ট হয়।

৫। গন্ধক, হীরাকস, হরিতাল ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য পানিতে পিষিয়া প্রলেপ দিলে ধবল বিনষ্ট হয়। ইহা শ্বেত রোগের মহৌষধ।

বিষ চিকিৎসা

বিষ দুই প্রকার—(১) জঙ্গম বিষ ও স্থাবর বিষ। সর্প প্রভৃতি প্রাণীর বিষকে জঙ্গম বিষ এবং উদ্ভিদ ও ধাতব দ্রব্যের বিষকে স্থাবর বিষ বলা হয়।

বমনের ন্যায় সর্বপ্রকার বিষ নিষ্কাশক ঔষধ আর নাই। শরীরের ভিতর বিষ ঢুকিবামাত্র প্রচুর বমনের ব্যবস্থা করিবে।

জঙ্গম বা স্থাবর যে কোন বিষই হউক না কেন রোগীকে ঘুমাইতে দিবে না।

স্থাবর বিষ চিকিৎসা

১। দারমেছে, আফিং প্রভৃতি যে কোন প্রকার বিষ ভক্ষণ করুক না কেন; তৎক্ষণাৎ তিন তোলা আদার রসের সহিত চারি আনা পরিমাণ হিং মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

২। কলমী শাকের ডাটা ও পাতার রস ২ ছটাক পরিমাণ সেবন করাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎবমি হইয়া উপকার দর্শিবে। অবশ্য অভিজ্ঞ ডাক্তার বা হেকিম নিকটে থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

জঙ্গম বিষ চিকিৎসা

সর্প প্রভৃতি বিষাক্ত জানোয়ার দংশন করিলে কিংবা দংশন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ দষ্ট স্থানের ঊর্ধ্বভাগে খুব কষিয়া বাঁধিবে। এই নিয়মটি দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। উহা খুবই উপকারী।

১। সোহাগার খৈ কিংবা আকন্দের মূল পানিতে পিষিয়া পান করিলে সর্পের বিষ নষ্ট হয়।

২। ঈচার (গাছ বিশেষ) মূল চিবাইয়া উহার রস ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার সর্প বিষ বিনষ্ট হয়।

৩। বিষাক্ত সর্প মারিয়া উহার মাথার পিছনের হাড় সঙ্গে রাখিলে সর্প দংশন হইতে নিরাপদ থাকা যায় এবং ঐ হাড়খানা চূর্ণ করিয়া পানির সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিষ নষ্ট হইয়া যায়। সর্প দংশিত রোগী পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। (اَلرَّحْمَةُ فِى الطِّبِّ وَالْحِكْمَةِ)

৪। ইচার মূল সঙ্গে রাখিলে সাপে দংশন করে না, চিবাইয়া খাইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা সাপের মাথার উপর ধরিলে সাপ আর মাথা উঁচু করিবে না।

৫। সাপের দংশন করিবার সঙ্গে সঙ্গে শুক্‌না কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলিতে পারিলে আশা করা যায়, বিষ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিবে না; কিন্তু ঐ কাপড় খানা পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিবে।

৬। শুক্‌না চুন ৬ মাষা, মধু ২ তোলা, মিশ্রিত করিয়া দষ্ট স্থানে প্রত্যেক প্রহরে লেপ বদলাইয়া দিলে শরীরের ভিতরকার বিষ চোষণ করিয়া থাকে।

৭। ৵০ পরিমাণ মুরগীর বিষ্ঠা, ৵০ লোশাদার এই পদার্থ দুইটি পানিতে খুব মিশ্রিত করিয়া উহা গরম করত রোগীকে সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ বমির সঙ্গে সঙ্গেই বিষ বাহির করিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিবে। (اَلرَّحْمَةُ فِى الطِّبِّ وَالْحِكْمَةِ)

৮। স্মরণ রাখা উচিত, সর্প দংশনের সঙ্গে সঙ্গে ৪/৫ অঙ্গুলি উপরে রশি দ্বারা ডোরা বাঁধিবে।

৯। যখন কোন ঔষধে ফল না হয়, তখন হিম্মৎ করিয়া যখমের মুখে মুখ লাগাইয়া চোষণ করিয়া বিষ বাহির করিবে; কিন্তু সাবধান যেন বিষ পেটের ভিতর না যায়; কুল্লিরূপে ফেলিয়া দিবে বার বার এরূপ করিলে সম্পূর্ণ বিষ বাহির হইয়া যাইবে। চোষণকারীর পেটে কিছু বিষ গেলে অবশ্য প্রাণহানির ভয় নাই। শুধু দাস্ত বমি হইতে পারে, উহা দ্বারা তাহার স্বাস্থ্যের মহা উপকারও সাধিত হইবার খুবই সম্ভাবনা।

তদ্‌বীর

১। হাত বা পায়ের অঙ্গুলিতে ডোর বাঁধিয়া একজনে উহা ডান হাতে বাম হাত করে টানিবে এবং একজনে সূরা-ফাতেহা পড়িয়া কাপড়ের পাকা ছড়া দ্বারা বোধহীন জাগা থেকে জোরে আঘাত করিবে এবং দম দিবে। এক ঘণ্টা পর বিয ডোর বাঁধা স্থানে থাকিলে উহা মোক্ষণ করিয়া ফেলিবে।

২। ২১ বার بسم الله الرحمن الرحيم কাগজে লিখিয়া তৎসঙ্গে—
س ل ا م ع ل ى ن و ح ى ا ل ع ا ل م ى ن و محا حا লিখিয়া পানিতে ধুইয়া সেই পানি রোগীকে পান করাইলে বমি হইয়া তখনই বিষ বাহির হইয়া যাইবে।

৩। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া ঘরের চারি কোণে লোহার তাবীজে পুরিয়া রাখিলে ঐ ঘর হইতে সাপ বাহির হইয়া যাইবে এবং আর ঢুকিবে না।

١١ ٦ ١١ ١٧٨١ رح °° ١١٧ ١١° و و ٧ وو اه يرو ١١م ١١ اح ط ٥ ٥ ٨

—হায়াতুল হায়ওয়ান

—সাপে কাটা রোগীকে একটি বকুলের দানা খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

রোগী বেহুঁশ হইয়া গেলে তুঁতে পোড়া চূর্ণ একটি বড়ি পরিমাণ কাগজে ঢাকিয়া রোগীর নাকের কাছে রাখিয়া ফুঁক দিবে। যেন ঐ ঔষধ মগজে পৌঁছিয়া যায়। ইহাতে আশাতীত ফল লাভ হয়।

এক আনা পরিমাণ নিশাদল ও এক আনা পরিমাণ চুন শিশিতে রাখিয়া রোগীকে শোঁকাইলে মাথার বিষ নামিয়া আসিবে।

লজ্জাবতীর পাতা দ্বারা রোগীর মাথা হইতে নীচে পর্যন্ত মুছিয়া নামাইলে সাপের বিষ নষ্ট হইবে।

কার্বলিক এসিড বা নিশাদল ঘরে রাখিলে সাপ তথা হইতে পলায়ন করে।

রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে ২ মাষা ফিটকারী পানিতে গুলিয়া সেবন করাইলে বিষ নষ্ট হইয়া রোগী চৈতন্য লাভ করিবে।

কেহ দূরদেশ হইতে কোন লোকের সর্প দংশনের খবর লইয়া আসিলে সংবাদ দাতার কপালে (ললাটে) قَالَ اَلْقِهَا يَامُوْسٰى فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى এবং بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়িয়া ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি কিঞ্চিৎ জোরে মারিবে। সাত বার এরূপ করিলে দূরবর্তী রোগীও ভাল হইবে।

বিচ্ছু, ভীমরুল, বোল্‌তা প্রভৃতির দংশনে কর্পূর পানিতে ভিজাইয়া কিংবা ছিরকা অথবা ঠাণ্ডা পানিতে কাপড় ভিজাইয়া দষ্ট স্থানে রাখিবে।

মরিচ, শুঁঠ বালা ও নাগেশ্বর বাটিয়া প্রলেপ দিলে মধু মক্ষিকা, ভীমরুল প্রভৃতির যাবতীয় বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিচ্ছুর দংশনের সঙ্গে সঙ্গে উহাকে মারিয়া উহার নাড়ীভুঁড়ী দষ্ট স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎই বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

কুকুরের বিষ

৪০ বার اَللهُ الصَّمَدُ কাঁসার থালায় পড়িয়া সাপ কিংবা কুকুর বা শিঙ্গি মাছ দংশিত রোগীর পিঠে লাগাইলে বিষ থাকাকালীন ঐ থালা পড়িবে না। বিষ নষ্ট হইয়া গেলে ঐ থালাও পড়িয়া যাইবে।

ধুতুরার পাঁচটি ফুল ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া তিন দিন খাইলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

কুকুর অথবা শৃগাল দংশন করিলে এক খণ্ড রুটির উপর—

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

লিখিয়া রোগীকে খাওয়াইবে। ৪০ দিন এরূপ করিতে হইবে।

জলাতঙ্ক

ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগাল কামড়াইলে পর চিকিৎসার অবহেলার দরুন জলাতঙ্ক ব্যাধি দেখা দিয়া থাকে। জলাতঙ্ক এক মহা মারাত্মক ব্যাধি।

চিকিৎসা—সম পরিমাণ দুধ ও আকন্দ পাতার রস নূতন মেটে পাত্রে রাখিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। সমস্ত দিন চিড়া-ভাজা ও খাঁটি দুধ ভিন্ন অন্যকিছু খাইতে দিবে না। একদিনে আরোগ্য লাভ না হইলে দুইদিন খাইতে দিবে। খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

১ সের নোশাদার ৫ সের পানিতে গুলিয়া সাপের গর্তে ভরিয়া দিলে সাপ বাহির হইয়া যাইবে। মাঝে মাঝে ঘরে ছিটাইলে ঐ ঘরে সাপ আসিবে না।

সাপের গর্তে রাই সরিষা ভরিয়া দিলে সাপ মরিয়া যায়। বিছানায় রাই সরিষা রাখিলে সাপের ভয় থাকিবে না। মানুষের মুখের লালা সাপের মুখে লাগিলে তৎক্ষণাৎ সাপ মরিয়া যায়। —হায়াতুল হায়ওয়ান

বাল্য রোগ

গর্ভিনীর চিকিৎসার শেষ ভাগে বলা হইয়াছিল, নবজাত শিশুর গলায় রূপার তখতি লিখিয়া ধারণ করিতে দিবে। তৎসঙ্গে حرزابی دجانه তাবীজ করিয়া ব্যবহার করিতে দিলেও খুব উপকার হয়। খোদা চাহে ত বহু বিমারী বিশেষতঃ জীনের আছর থেকে নিরাপদ থাকিবে।

হেরযে আবি দোজানা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اِلٰى مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ وَالسَّائِحِيْنَ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّا لَنَا وَلَكُمْ فِى الْحَقِّ سَعَةً فَاِنْ تَكُ عَاشِقًا مُرِيْعًا اَوْفَاجِرًا مُقْتَحِمًا اَوْرَاعِيًا حَقًّا مُبْطِلاً هٰذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هٰذَا وَانْطَلِقُوْا اِلٰى عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ تُقْلَبُوْنَ حٰمٓ لَا تُنْصَرُوْنَ حٰمٓعٓسٓقٓ تَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللهِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

মায়ের স্বাস্থ্য ও মনের সহিত শিশুর স্বাস্থ্য ও মনের নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে। অতএব, যাহাতে মায়ের স্বাস্থ্য ও মন সর্বদা সুস্থ থাকে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

সাধারণতঃ মায়ের শরীরের রক্ত ভাল না থাকিলে গর্ভে সন্তান নষ্ট হইয়া থাকে, কিংবা জীবিত ভূমিষ্ঠ হইলেও প্রায়ই নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং এসব ব্যাপারে সর্বাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ক্রন্দন না করিলে আস্তে আস্তে পিঠে আঘাত করিয়া কিংবা পা দুখানা ধরিয়া উপুড় করিয়া উহাকে ক্রন্দন করাইতে চেষ্টা করিবে।

ঔষধের দ্বারা শিশুর চিকিৎসা করিতে হইলে লক্ষ্য রাখিবে যেন খুব গরম (ধাতু-গঠিত) ঔষধ প্রয়োগ করা না হয় এবং খুব ঠাণ্ডা, কর্পূর ইত্যাদিতে প্রস্তুত ঔষধও না হয়। শিশুকে লঙ্ঘন (উপবাস) দিবার প্রয়োজন হইলে শিশুকে লঙ্ঘন না দিয়া মাতা বা ধাত্রীকে উপবাস

করিতে দিবে এবং সর্বদা মাতা বা ধাত্রীর খাদ্য-খাদক ও চলাফিরা করিতে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

সদা-সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে শিশুর দুগ্ধ পান করিবার পর ২ ঘণ্টার মধ্যে টক জাতীয় কোন দ্রব্য খাওয়ান না হয়। কারণ দুধ ও টক একত্রে ষ্টমাকে দুধ নষ্ট হইয়া যায় এবং হজমের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে।

নবজাত শিশু স্তন্য পান না করিলে অমলকী ও হরিদ্রা চূর্ণ ঘৃত ও মধুতে মিশ্রিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে।

যে শিশু স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া বমি করিয়া ফেলে তাহাকে বৃহতি ও কণ্টকারী ফলের রস খাওয়াইবে।

গরুর দুধ খাইয়া বমি করিলে দুধের সহিত এক ফোঁটা চুনের পানি মিশাইয়া দুধ সেবন করাইবে। স্তন্য দুধের অভাব হইলে ছাগলের দুধ পান করাইবে। স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ـ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَّمَا هُوَاِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ـ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ـ

একবার পড়িয়া নেমকের উপর দম দিয়া মাতা বা ধাত্রীকে খাইতে দিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ দুধ বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম আয়াতের الرضاعة পর্যন্ত বাদ দিয়া অন্যান্য আয়াত পড়িয়া নেমকের উপর দম দিয়া গাভীকে খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় এবং ঐ আয়াত পড়িয়া গমের আটায় দম দিয়া সাত দিন খাওয়াইলে গাভী শান্তভাবে দোহন করিতে দিবে।

শিশুর গলায় শ্লেষ্মা বসিলে শুঁঠ, পিপুল, গোল মরিচ, হরিতকী, হরিদ্রা ও বচ বাটিয়া উপযুক্ত পরিমাণে দুধের সহিত মিশাইয়া সেই দুধ পান করাইবে।

আমের আটার মজ্জ খৈ ও সৈন্দব পেষণ করিয়া মধুসহ চাটিয়া খাইতে দিলে শিশুর বমন নিবারণ হয়। চিনি মধু ও লেবুর রসের সহিত পিপুল ও গোল মরিচ চূর্ণ লেহন (একটু একটু চাটিয়া খাওয়া) করিলে শিশুর হিক্কা ও বমি নিবারণ হয়।

শিশুর জ্বর অতিসার, শ্বাস, কাশ ও বমন হইলে—মুতা, পিপুল, আতইচ, কাঁকড়া শৃঙ্গির চূর্ণ চাটিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শায়।

বালকের আমাতিসারে—লবঙ্গ, জায়ফল, জীরা ও সোহাগার খৈ এই চারিটি দ্রব্যের সমানভাগ চূর্ণ একত্রে খাইতে দিবে।

উপরোক্ত দুইটি রোগে পানিতে একবার সূরা-ক্বদর পড়িয়া দম দিবে ঐ পানিতে— لَافِيْهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ তিনবার পড়িয়া দম দিবে এবং ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা মেশ্‌ক জাফরান দ্বারা তাবীজ লিখিয়া ঐ পানিতে চুবাইয়া রাখিয়া উহা পান করিতে দিবে। এই পানি কলেরা অতিসার প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ায় ও সূতীকায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অতিসার রোগ প্রবল হইলে চিনা বরতনে আয়াতে-শেফা উক্ত কালি দ্বারা লিখিয়া পান করিতে দিবে। এবং সরিষার তৈলে ৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ الاية ১১ বার আয়াতে-কোত্‌ব পড়িয়া দম

দিয়া সমস্ত শরীর অবশ করিয়া মালিশ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় বিশেষতঃ মাথা ডাবা বিদূরিত হয়।

তিল ও যষ্ঠিমধু বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ তিল, তৈল, চিনি ও মধু মিশাইয়া খাওয়াইলে শিশুদের রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

বটের মূল পেষণ করিয়া আতপ চাউল ধোয়া পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে শিশুদের দুর্ণিবার অতিসার ও গ্রহণী প্রশমিত হয়।

ধাত্রী বা মাতার স্তন্যদুগ্ধ দূষিত হইলে উহা শিশুকে খাইতে দিবে না এই দুধ শিশুদের জন্য বিষতুল্য।

স্তন্য-দুগ্ধ নষ্ট হইবার তিনটি কারণ

১। জিনের আছরের দরুন দুধ নষ্ট হইলে সংশোধক ঔষধ ও তদ্‌বীরের সঙ্গে সঙ্গে জিনের তদ্‌বীরও করিবে।

২। স্বামী-সঙ্গম (অনিয়মে-কুনিয়মে)

৩। অনুপযুক্ত আহার-বিহার করাতে মাতার দুষ্ট রস ও রক্ত বৃদ্ধি পাইয়া দুধ নষ্ট হইয়া থাকে। আসল কারণ নির্ণয় করিয়া উহার চিকিৎসা করিবে।

প্রত্যেক জোগার ২/১ দিন পূর্বে মাতাকে লঙঘন দিবে। নিম্নোক্ত পাঁচনটিও সেবন করাইবে।

হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্ঠিমধু। ..... অথবা

বচ, মুতা, আতইচ, হরিতকী, দেবদারু ও নাগেশ্বর। ইহাদের পাঁচন প্রস্তুত করিয়া মাতাকে সেবন করাইলে স্তন্য-দুধ শোধন হইয়া থাকে।

শুক্‌না মাটিতে ৭ বার নিম্নোক্ত দো'আটি পড়িয়া মুখের থুথুসহ ৭ বার দম করিবে এবং ঐ মাটি দৈনিক ৫/৬ বার স্তনে লেপ দিতে দিবে।

মনছাল, শঙ্খনাভী, পিপুল, ও রসাঞ্জন মধুর সহিত মর্দন করিয়া বড়ি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে বালকের সকল প্রকার চক্ষু পীড়া বিনষ্ট হয়।

দাঁত উঠিবার সময় অনেক শিশুর জ্বর, দাস্ত, আক্ষেপাদবী নানা প্রকার পীড়া দেখা দিয়া থাকে। সে অবস্থায় বিশেষ চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া শিশুকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। দাঁত উঠিয়া গেলে আপনা থেকেই উহা দূর হইয়া যায়।

এক বোতল গোলাপ পানির মধ্যে ।।০ ছটাক লবঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া ৪০ দিন রৌদ্রে রাখিবে এবং উহা নড়াচড়া দিবে। ৪০ দিন পর উহা হইতে ৩ মাশা পরিমাণ দৈনিক খালি পেটে সেবন করিবে। শিশুর পেটের পীড়ায় ইহা বহু পরীক্ষিত।

উম্মুছ-ছিব্‌ইয়ান

এই রোগে শিশু একদম বেহুঁশ হইয়া যায়। হাত পা বাকা হইয়া যায়। মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে থাকে। ইহা মৃগী সদৃশ, বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ইহার চিকিৎসা করাইবে।

মুখ পরিষ্কার করিয়া দিবে। ঐ অবস্থা হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাজু ও রান কষিয়া বন্ধন দিবে। সর্বদা পরিষ্কার তৈল মালিশ করিতে থাকিবে। হেরজে আবি দোজনার সহিত আয়াতে শেফা লিখিয়া তাবীজ ব্যবহার করিতে দিবে। আয়াত পড়িয়া দৈনিক সকাল বিকালে দম দিবে।

অনেক সময় শিশু দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে, এমতাবস্থায় রোগ ও তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিবে।

তালুর উপরিস্থিত নরম জায়গার স্পন্দন বন্ধ হইয়া গেলে أَفَحَسِبْتُمْ الاية ৩ বার পড়িয়া সরিষার তৈলে দম দিয়া উহা দ্বারা তালু ভিজাইয়া রাখিবে। শিশুর হাতে পায়ে প্রতিদিন মেন্দি লাগাইবে। মাতা বা ধাত্রীকে ঠান্ডা খাইতে দিবে।

বুকে বেদনা হইলে তাহা কোন্ ধরনের বেদনা তাহা নির্ণয় করিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

শিশুর ক্রন্দন

কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতিকার করিবে। ক্রিমির থেকে পেটে বেদনা হইলে কিছুটা কেরোসিন তৈল কানে, নাকে ও গলায় মালিশ করিবে এবং আর কিছু তৈল পেটে বার বার আস্তে আস্তে মালিশ করিবে। ইন্শাআল্লাহ্ পেটের ক্রিমি বেদনা নিরাময় হইয়া তৎক্ষণাৎ শান্তি লাভ করিবে। নিম্নোক্ত তাবীজটিও বিশেষ উপকারী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ بَابُنَا تَبَارَكَ حِيْطَانُنَا لِبَيْتِ سَقْفِنَا كٓـهٰـيٰـعٓـصٓـقٓ كِفَايَتُنَا حٰـمٓـعٓـسٓـقٓ حِمَايَتُنَا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ اِنَّ وَلِيِّ ىَ اللهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

ঘুমের মধ্যে শিশু চিৎকার করিলে উক্ত তাবীজটিতে বিশেষ উপকার হইবে।

শিশুর কর্ণ রোগ

কর্ণ রোগ অধ্যায় দেখিয়া বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে। অবশ্য কান পাকা রোগ হইলে যথা সম্ভব খাবার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাই ভাল। সর্বদা কান পরিষ্কার করিয়া রাখিবে এবং মাছি বসিতে দিবে না।

মুখ দিয়া অতিরিক্ত লালাস্রাব হইলে তিন মাশা জওয়ারেশ মোছতগী সেবন করাইবে। এই ঔষধ হেকিমী দোকানে পাওয়া যায়।

শিশুর জন্ম হইতেই লক্ষ্য করিয়া মধুর সহিত একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া মাঝে মাঝে জিহ্বায় মালিশ করিলে মুখে ঘা ন্যাচা প্রভৃতি হইতে নিরাপদ থাকিবে। ছোট ক্রিমি শিশুর মলদ্বারে খুব উপদ্রব করিলে খুব ঝুনা নারিকেলের দুধ দানাদার খেজুরের গুড়ের অথবা মিছরির সহিত খাইতে দিবে।

চাকের মোম গলাইয়া উহার সহিত শুক্না মিন্দিপাতা পিষিয়া শিশুর অঙ্গুলির ৪ অঙ্গুলি, বর্তি প্রস্তুত করিবে এবং ঐ বর্তি কিছুক্ষণ মলদ্বারে ঢুকাইয়া রাখিবে, পরে ধীরে ধীরে বাহির করিবে। পোকা ও ছোট ক্রিমি উহার সহিত বাহির হইয়া আসিবে। সর্বদা বাসি খাদ্য-খাদক হইতে বিরত থাকিবে।

দীর্ঘদিন রক্ত আমাশয় থাকিলে হালিশ বাহির হইয়া থাকে। উহার পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করাইবে।

তদ্‌বীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيَا سَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَ غِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ

الْاَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَ قِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ

লিখিয়া কোমরে ধারণ করিতে দিবে ও পান করিতে দিবে।

শয্যা-মূত্র

খালি পেটে এক তোলা পুদীনা পাতার রস ৭ দিন পর্যন্ত সেবন করিলে শয্যা-মূত্র নিবারণ হয়।

পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাচী ও সৈন্দব লবণ এই সমুদয় চূর্ণ করিয়া চাটিয়া খাইলে বালকের মূত্রকৃচ্ছ্র বিদূরিত হয়।

শিশুর জ্বর

জ্বরের অধ্যায় দেখিয়া লইবে। জ্বর প্রবল ও উপসর্গ আসিলে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

কলেরা

কলেরা দেখা দিলে চিন্তা ও ভয় করিবে না—বিমর্ষ হইবে না। অধিক রাত্রি জাগরণ ও দিবা নিদ্রা অহিতকর। খুব গরম খাবার খাইবে না এবং খালি পেটেও থাকিবে না। সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। খাদ্য-খাদক, বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখিবে। লোবান জ্বালাইবে, খাবার ও পানীয় বস্তুর ভিতর "আরকে কেউরাহ্" দিয়া পান করিবে। কেহ রোগাক্রান্ত হইলে ছোঁয়াছে বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না বরং উত্তমরূপে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিবে। মল-মূত্র ও বমি ইত্যাদি ভালভাবে দাফন করিয়া দিবে, ফিনাল ছিটাইবে। চিকিৎসার জন্য অগৌণে বিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। প্রত্যেকেই পানি ফুটাইয়া পান করিবে।

নিম্নোক্ত তাবীজটি প্রত্যেকেই ধারণ করিলে আশা করা যায় কলেরা হইতে নিরাপদ থাকিবে। তবে তাবীজ প্রতি ৭ পয়সা এতীম মিসকীনকে দান করিবে।

٧٨٦

الٰهی بحرمة حضرت شیخ محمد صادق اکابر
اولیاء ولد حضرت شیخ احمد سرهندی مجدد
الف ثانی ازشربلائے و با نکهدار۔

الله شافی الله کافی

এক বোতল পরিষ্কার পানিতে সূরা-ক্বদর একবার পড়িয়া দম দিবে আর لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّ لَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ পড়িয়া আবার দম দিয়া গরম পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। সুস্থ লোক ইহা পান করিলে নিরাপদ থাকিবে। চিনা বরতনে সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা লিখিয়া ধুইয়া খাইলে শীঘ্রই খুব উপকার হয়।

কলেরার প্রথম বা যে কোন অবস্থায় ৩৩ আয়াত পড়িয়া দম করিলে রোগী আরামে ঘুমাইবে।

বসন্ত

ঘোড়ীর দুধ সেবন করিলে এক বৎসর বসন্ত হইতে নিরাপদ থাকা যায়। দেশে বসন্ত দেখা দিলে গরম খাদ্য-খাদক খাইবে না। তৈল, বেগুন, গরুর, গোশ্‌ত, খেজুর, আঞ্জীর প্রভৃতি গরম জিনিস খাইবে না। এতীম ও মিসকীনকে ৭ পয়সা দান করিয়া নিম্নোক্ত তাবীজটি ধারণ করিলেও বসন্ত হইতে মাহফুয থাকা যায়।

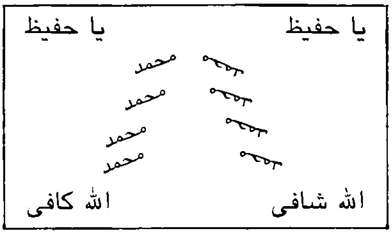

পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করাইবে। গোলাপ পানি, সুরমা কিংবা পেঁয়াজের রস চক্ষে দিলে চক্ষু নিরাপদ থাকে। কখনো দানা বসাইয়া দিতে চাহিবে না; বরং যাহাতে খুব শীঘ্র দানা বাহির হইয়া যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ الاية পড়িয়া পানিতে দম দিয়া সেবন করিতে দিলে সমস্ত দানা শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে। কাঁঠাল, গরম দুধ সেবন করিলেও খুব তাড়াতাড়ি দানা সকল উঠিয়া থাকে।

প্লেগ

প্লেগ যদিও খোদার রহমতে বাংলাদেশে অতি বিরল; তথাপি উহা একটি মারাত্মক ব্যাধি।

গলায় দুই একটি দানা হইয়া অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্লেগ দেখা দিলে ঐ সময় প্রত্যেক বাড়ীতে উর্দু 'হায়াতুল-মুছলেমীন' তেলাওয়াত করিবে। উহার বরকতে দেশ নিরাপদ থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই অবস্থায় ঘর-বাড়ী খুব পরিষ্কার রাখিবে। ঘরে গন্ধক পোড়াইবে। আগর বাতি প্রভৃতি সুগন্ধি জ্বলাইবে। গোলাপ পানির মধ্যে হিং গুলিয়া ঘরে ছিটাইবে। ছিরকা ও পেঁয়াজ ছুলিয়া ঘরের চারদিকে খোলা মুখে বসাইয়া দিবে। ফুটন্ত পানি, কেওড়ার পানি পান করিবে। ছিরকা, পোঁয়াজ, লেবু খুব খাইবে।

মাছ, দুধ, দধি, ঘি, গোণ্ডা তরকারী, আঙ্গুর, তরমুজ ইত্যাদি ফল খাইবে। অবশ্য রোগীকে শুধু দুধই খাইতে দিবে।

তিল তৈল খাইবে না, মালিশ করিবে না এবং লাগাইবেও না। পূর্ণ চিকিৎসার্থে বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় লইবে।

কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে কিংবা প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হইলে একটি বলদ গরুর মাথায় নিম্নোক্ত দো'আ একবার, সূরা-এখলাছ সাতবার ও দুরূদ পড়িয়া দম দিবে। ঐ গরুটি যবাহ্ করিয়া যাহারা কিছুটা গোশ্ত ভক্ষণ করিবে, আশা করা যায়, তাহারা নিরাপদ থাকিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত, কিন্তু যেনার পথ খোলা থাকিলে তাহা কার্যকরী হইবে না। দো'আটি এই—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَاۤئِكَ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا قَرِيْبُ خَلِّصْنَا
مِنَ الْوَبَاءِ وَ الطَّاعُوْنِ يَا اَللهُ الْاَمَانَ يَا اَللهُ الْاَمَانَ يَا اَللهُ يَا ذَا النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ يَا ذَا الْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ
يَا ذَا الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ يَا اَللهُ الْاَمَانَ (৩ বার) يَا قَائِمُ لَا يَزُوْلُ يَا عَالِمُ لَا يَنْسٰى
يَا بَاقِىْ لَا يَفْنٰى خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللهُ الْاَمَانَ (৩ বার) يَا حَىُّ لَا يَمُوْتُ يَا صَمَدُ
لَا يَطْعَمُ يَا غَنِىُّ لَا يَفْتَقِرُ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللهُ الْاَمَانَ (৩ বার) يَا اَللهُ يَا رَحِيْمُ

يَا قَدِيْمُ مِنْ كُلِّ قَدِيْمٍ يَا عَظِيْمُ مِنْ كُلِّ عَظِيْمٍ يَا كَرِيْمُ مِنْ كُلِّ كَرِيْمٍ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) يَا مَنْ هُوَ فِىْ سُلْطَانِهٖ وَحِيْدٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ مُلْكِهٖ قَدِيْمٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ عِلْمِهٖ مُحِيْطٌ يَامَنْ هُوَ فِىْ عِزِّهٖ لَطِيْفُ يَا مَنْ هُوَ فِىْ لُطْفِهٖ شَرِيْفُ يَا مَنْ هُوَ فِىْ مُلْكِهٖ غَنِىٌّ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) يَا مَنْ اِلَيْهِ يَهْرَبُ الْعَاصُوْنَ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ يَا مَنْ اِلَيْهِ يَرْغَبُ الرَّاغِبُوْنَ يَا مَنْ اِلَيْهِ يَلْتَجِىءُ الْمُلْتَجِئُوْنَ يَا مَنْ اِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُوْنَ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِبَقَائِكَ يَا عَالِمُ يَا قَائِمُ يَا غَفُوْرُ يَا بَدِيْعَ الْبَقَاءِ يَا وَاسِعَ اللُّطْفِ يَا حَافِظُ يَا حَفِيْظُ يَا مُغِيْثُ يَا صَمَدُ يَا خَالِقُ يَا نُوْرُ قَبْلَ نُوْرٍ يَا نُوْرَ كُلِّ نُوْرٍ يَا اَللّٰهُ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَالْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) يَا مَنْ هُوَ فِىْ قَوْلِهٖ فَصْلٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ مُلْكِهٖ قَدِيْمٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ حِلْمِهٖ لَطِيْفٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ عَطَايِهٖ شَرِيْفٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ اَمْرِهٖ حَكِيْمٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ عَذَابِهٖ عَدْلٌ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ وَ اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) اَسْئَلُكَ اَنْ تُجِيْرَنَا مِنْ عَذَابِكَ وَ اغْفِرْلَنَا وَ لِاٰبَاءِنَا وَلِاَمْوَالِنَا وَ لِاَوْلَادِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ نَجِّنَا مِنْ جَمِيْعِ الْكُرُبَاتِ وَ اَعْصِمْنَا مِنْ جَمِيْعِ الْاٰفَاتِ خَلِّصْنَا مِنَ الْبَلِيَّاتِ وَ ادْفَعْ عَنَّا الْوَبَاءَ وَ الْبَلَاءَ وَ الْاَمْرَاضَ وَ الْعِلَلَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَ الطَّاعُوْنِ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ هُجُوْمِ الْوَبَاءِ وَ مِنْ مَّوْتِ الْفُجَاءَةِ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ دَرْكِ الشِّقَاءِ وَ سُوْءِ الْقَضَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحٰبِهٖ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا ـ

কোন গ্রাম বা মহল্লার চারদিকে নিম্নোক্ত পরওয়ানা লিখিয়া আয়নায় বাঁধাই করিয়া বাহির দিকে মুখ করিয়া বাঁশে বাঁধিয়া দিবে। খোদা চাহে ত ঐ বস্তি সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিরাপদ থাকিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ وَّ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ وَّ حِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ـ وَ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ

فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاۗءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ زمادورکن بلاھا را الٰھی ـ بحق الشاه محی الدين جيلانی ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍوَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ ـ

বেদনা-শূল বেদনা

সর্বপ্রকার বেদনা বিশেষতঃ দাঁত ও মাথা বেদনায় একটা পাক তক্তার উপর বালুকা রাখিয়া বড় অক্ষরে লিখিবে— ابجد هوز حطى অতঃপর রোগী বেদনার জায়গায় হাত রাখিবে আর চিকিৎসক সজোরে একটা পেরাক আলিফের উপর মারিয়া সূরা-ফাতেহা একবার পড়িয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবে বেদনার উপশম হইল কি না? বেদনার উপশম না হইলে পেরাক বে-এর উপর মারিবে এবং ফাতেহা দুইবার পড়িয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবে। এইভাবে প্রত্যেক অক্ষরে একবার করিয়া ফাতেহা বাড়াইতে থাকিবে। এই তরতীবে "ইয়া অক্ষর" পর্যন্ত যাইতে না যাইতেই আল্লাহ্ চাহে ত বেদনার উপশম হইবে।

২। সর্বপ্রকার বেদনায় নিম্নোক্ত আয়াত বিসমিল্লাহ্র সহিত তিনবার পড়িয়া দম করিবে কিংবা তৈল পড়িয়া মালিশ করিবে অথবা ওযূর সহিত লিখিয়া তাবীজে পুরিয়া বেদনা স্থলে বাঁধিবে। খোদা চাহে ত। নিরাময় হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا۔

৩। জিনের আছরের দরুন কিংবা যে কোন স্থানে যে কোন বেদনায় একবার সূরা-এখলাছ একবার وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۗءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا۔ লিখিয়া বেদনাস্থানে ব্যবহার করিলে খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

৪। পেটের বেদনা অম্ল বেদনা, শূল, পরিণাম শূল, সর্বপ্রকার বেদনায় একখণ্ড কাগজে ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া উহার সহিত নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া এক বোতল পানিতে একবার সূরা-ক্বদর তিন বার لافيها غول و لاهم عنها ينزفون ـ পড়িয়া দম দিবে অতঃপর ঐ তাবীজটি পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে একবার এবং দিনের আরও যে কোন সময় ইচ্ছা পান করিলে বেদনা, পেটের যাবতীয় পীড়ায় যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَاۗءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ـ

একটি না-বালেগ ছেলের দ্বারা এক দামে একটি কাগজ খরিদ করিয়া উহাতে উক্ত আয়াত লিখিয়া তাবীজটি কিছু মিছরিসহ একটি ডাবের মধ্যে পুরিয়া পানি খাইয়া ফেলিবে এবং অবশিষ্ট সামান্য পানি দ্বারা বেদনাস্থল মালিশ করিবে। এরূপ সাত সপ্তাহ করিলে ইনশাআল্লাহ্ বেদনার উপশম হইবে।

৫। চিনা বরতনে ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা লিখিয়া খাওয়াইবে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করিবে।

স্নায়বিক দৌর্বল্যে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর মাথায় হাত রাখিয়া ১১ বার يا قوى পড়িবে।

স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য

১। بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِىْ مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَاءِكَ وَ تَرْضٰى بِقَضَائِكَ ـ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ فَهْمَ النَّبِيِّيْنَ وَ حِفْظَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ عَمِّرْ لِسَانِىْ بِذِكْرِكَ وَ قَلْبِىْ بِخَشْيَتِكَ وَ سِرِّىْ بِطَاعَتِكَ ـ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

উপরোক্ত দো'আটি প্রত্যেক নামায বাদ এবং পড়া আরম্ভ করিবার পূর্বে ৩ বার করিয়া পড়িলে গবী লোকেরও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হয়। এমনকি কোরআন শরীফ মুখস্থ করা সহজ হইয়া থাকে।

২। (১) رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

(২) وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

(৩) قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِىْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

(৪) رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَ يَسِّرْلِىٓ اَمْرِىْ

(৫) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى

(৬) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(৭) اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

উক্ত আয়াতগুলি নম্বর অনুযায়ী ৭টি খোরমায় লিখিয়া ৭দিন খালি পেটে ভক্ষণ করিলে স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পায়।

৩। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে নূতন বরতনে বৃষ্টির পানিতে অঙ্গুলি রাখিয়া ৭০ বার সূরা-ফাতেহা, ৭০ বার আয়াতুল কুরছি, ৭০ বার সূরা-ফালাক ৭০ বার সূরা-নাছ, ৭০ বার—

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

এবং ৭০ বার দুরূদ শরীফ পড়িয়া দম দিতে থাকিবে। পড়িবার সময় ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি পানির মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিবে। পর পর ৩ দিন রোযা রাখিবে এবং পানি দ্বারা ইফতার করিবে। খোদা চাহে ত সম্পূর্ণ কোরআনের হেফয করা সহজ হইবে। যাহা শুনিবে তাহা ভুলিবে না। কোন প্রকার ব্যাধিতে ৭ দিন ঐরূপ সেবন করিলে রোগ মুক্ত হইতে পারিবে।

৪। ২ নং তদ্‌বীরের আয়াতসমূহ লিখিয়া তাবীজরূপে গলায় বা ডান হাতের বাজুতে ব্যবহার করিলেও বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

৫। প্রত্যহ একখানা বিস্কুটের উপর সূরা-ফাতেহা লিখিয়া খাইবে। এরূপ ৪০ দিন নিয়মিত খাইলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

পেটের পীড়ায় ৩ বার لافيها غول و لا هم عنها ينزفون পড়িয়া দম দিবে কিংবা লিখিয়া পেটের উপর বাঁধিয়া দিবে।

কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির মওসুমে ৩ বার সূরা-ক্বদর পড়িয়া খাবার বা পানীয় দ্রব্যের উপর দম দিয়া খাইবে। এমনকি কাহারও কলেরা হইয়া থাকিলেও নিরাময় হইয়া যায়।

নাভী স্থানচ্যুত হইলে নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া নাভীস্থলে ধারণ করিতে দিলে নাভী স্বস্থানে আসিবে এবং দীর্ঘদিন রাখিলে নাভী স্থানচ্যুত হইবে না।

জ্বর

শীত ব্যতীত জ্বর আসিলে মনে করিতে হইবে যে, গরম লাগিয়া জ্বর হইয়াছে। তখন— بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قُلْنَا يَا نَارُكُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ পড়িয়া দম দিবে, লিখিয়া তাবীজরূপে রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

শীতের সহিত জ্বর আরম্ভ হইলে— بِسْمِ اللهِ مَجْرٖهَا وَ مُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌرَّحِيْمٌ লিখিয়া হাতে বা গলায় ধারণ করিতে দিবে। জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ ও চিকিৎসা জ্বরের অধ্যায়ে দেখিয়া লইবে।

শোথ ফোঁড়া

পাক মাটতে ৩ বার কিংবা ৭ বার— تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا পড়িয়া দম দিবে এবং দম দিবার সময় আমেল নিজের মুখের থুথুও কিছুটা উহাতে নিক্ষেপ করিয়া বেদনা স্থলে কিংবা স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধি হইলে স্তনে ঘন ঘন লেপ দিবে।

সাপ, বিচ্ছু, বোল্‌তা দংশন

পানিতে নেমক গুলিয়া দষ্টস্থানে লাগাইবে। সূরা-কাফেরূণ পড়িয়া দম দিতে থাকিবে। দীর্ঘ সময় এরূপ করিলে নিরাময় হইয়া থাকে।

বদ-নজর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَّ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌلِّلْعَالَمِيْنَ ـ

লিখিয়া তাবীজ ব্যবহার করিতে দিবে। খোদা চাহে ত নিরাপদ থাকিবে।

বদ-নজর লাগিয়া থাকিলে উক্ত আয়াতদ্বয় পড়িয়া পানিতে দম দিয়া গোসল করাইয়া কিছুটা পান করিতে দিলে খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

বদ-নজর দূরীকরণার্থে নিম্নোক্ত তাবীজটি গলায় দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّكُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

বসন্ত

সাত তার নীল সূতা হাতে লইয়া সূরা-আর্‌রহ্‌মান পুরা পড়িবে এবং প্রত্যেক— فباى الاء ربكما تكذبان পড়িয়া দম দিবে এরূপে ৩১ গিরা হইবে। এই সূতা শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে বসন্ত হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং বসন্তে আক্রান্ত হইলেও খুব কষ্ট হইবে না।

সর্বপ্রকার ব্যাধিতে

ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে জাফরান, মেশ্‌ক ও গোলাপ পানিতে প্রস্তুত কালি দ্বারা লিখিয়া ঐ বরতন ধুইয়া পানি সেবন করিলে সর্বপ্রকার ব্যাধির উপশম হইয়া থাকে।

অভাব-অনটন দূর করণার্থে

১। এশার পর প্রথম ১১ বার দুরূদ তারপর يَامُعِزُّ ১১ বার পড়িয়া আবার ১১ বার দুরূদ পড়িয়া দো'আ করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ শীঘ্রই অভাব-অনটন বিদূরিত হইবে।

২। এশার পর প্রথম ও শেষে ৭ বার করিয়া দুরূদ পড়িবে এবং মাঝখানে ১৪১৪ বার يَاوَهَّابُ পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট স্বচ্ছলতার জন্য দো'আ করিলে শীঘ্রই অবস্থা স্বচ্ছল হইয়া যাইবে।

মুশ্‌কিল

যে কোন প্রকার জটিল বিষয় হউক না কেন ১২ দিন পর্যন্ত দৈনিক ১২ হাজার বার নিম্নোক্ত দো'আ করিলে মকছুদ ও বিপদ যতই জটিল হউক না কেন উহা আসান হইয়া যাইবে।

يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ

নারাজ স্বামীকে যখন সন্তুষ্ট করার পথ থাকে না তখন এশার নামাযান্তে প্রথম ও শেষে ১১ বার করিয়া দুরূদ পড়িবে, মাঝখানে ১১ বার يَالَطِيْفُ يَا وَدُوْدُ পড়িয়া ১টি গোল মরিচের উপর দম দিবে এইরূপে ১১টি গোল মরিচ পড়া শেষ হইলে ঐ সমস্ত মরিচ চুল্লির গরমে কোন পাত্রে ভাজিবে কিন্তু পড়িবার সময় ও পোড়াইবার সময় স্বামী সন্তুষ্টির পাক্কা নিয়ত রাখিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ هُوَ الَّذِىْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ـ وَ اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ فَرَجَعْنَاكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَّاكَ فُتُوْنًا ـ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَ يَا مُسَخِّرَ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَالْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ قَلِّبْ عَلٰى الطالب .... قلب المطلوب .... بِالْخَيْرِ لِاَدَاءِ الْحُقُوْقِ يَا وَدُوْدُ حَبِّبْ حَبِّبْ يَا وَدُوْدُ ـ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

তাবীজটির শেষভাগে المطلوب এর জায়গায় নারাজ মানুষের এবং الطالب স্থলে যে রাজী করিতে চায় তাহার নাম লিখিয়া যে রাজী করিতে চায় তাহার বাজুতে ধারণ করিতে দিবে এবং মিষ্টির উপর ৭ বার পড়িয়া مطلوب -কে খাইতে দিবে। কিন্তু সাবধান যেন مطلوب ইহা জানিতে না পারে।

তালেব নিজস্ব হাত এবং পায়ের নখ, চুল কাটিয়া উহা ভস্ম করত মতলুবকে খাওয়াইলে মতলব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু না জায়েয স্থানে উহা ব্যবহার করিবে না।

ইহাছাড়া মানুষ বাধ্য করার বহু তদ্‌বীর অন্যান্য কিতাবে রহিয়াছে তাহা জরুরতবশতঃ জায়েয স্থানে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

জ্বীন

কোরআন শরীফে এবং হাদীস শরীফে জ্বীন জাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে ইতিহাস ও কোটি কোটি মানুষের অভিজ্ঞতা উহাদের অস্তিত্বের এমন এমন সন্ধান দিয়াছে যাহা অস্বীকার করা মোটেই সম্ভব নয়।

অতএব, কেহ চোখে দেখিতে পায় না বলিয়া কোরআন, হাদীস, ইতিহাস এবং সর্বোপরি কোটি কোটি মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা এক কথায় উড়াইয়া দিয়া জ্বীন জাতির অস্বীকার করিলে উহা চরম নির্বুদ্ধিতারই নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আবার মূর্খতাবশতঃ সর্বক্ষেত্রে জ্বীনের আছর বলিয়া নানা ভাবভঙ্গি করা নেহায়েত জ্ঞানান্ধতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত পক্ষে জ্বীনের দ্বারা বহু রোগের সৃষ্টি হয়। তেমনি করে বহু রোগের লক্ষণ এমন প্রকাশ পায়, যাহাকে অনেক লোক জ্বীনের আছর বলিয়াই ধরিয়া লয়। কিন্তু বাস্তবপক্ষে উহা জ্বীন নহে বরং রোগেরই তাছির। কাজেই রোগী বা রোগিনীকে প্রথমতঃ পরীক্ষা করিয়া রোগ স্থির করিবে অতঃপর তাহার চিকিৎসা করিবে। ফলাফলের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

মৃগী, সন্যাস ও নব প্রসূতির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া অনেক সময় জিনে ধরা মানুষের ন্যায় বেহুঁশ হইয়া থাকে বিলাপও করিতে শোনা যায়। আবার অনেক জায়গায় ইচ্ছাপূর্বক রোগীর কৃত্রিমতাও ধরা পড়িয়া থাকে। কাজেই আমেলের খুব সুচতুর ও হুঁশিয়ার হওয়া দরকার।

জানিয়া রাখা উচিত, জ্বীন শরীরের ভিতর ঢুকিয়া গেলে রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। ঢুকিবার প্রথমে অনেকের বুকে ব্যথাও হইয়া থাকে। দাঁত খিল্ মারিয়া থাকে। চক্ষু এমন করিয়া বন্ধ করিয়া দেয় যাহা খোলা খুবই কষ্টকর। রোগীর দাঁত ছাড়াইবার জন্য বহু জোরাজুরি করা হয়, ইহা আদৌ উচিত নহে। রোগের উপশম হইলে আপনা থেকেই সবকিছুই ঠিক হইয়া যাইবে। অনেক সময় জ্বীন শরীরের ভিতর না ঢুকিয়া বাহির থেকেও আছর করিয়া থাকে। হুঁশিয়ার অভিজ্ঞ আমেল উহা ব্যক্তিগত দক্ষতার দ্বারা বুঝিয়া চিকিৎসা করিবেন।

পরীক্ষা ও জ্বীন হাজির

১। সুস্থাবস্থায়ঃ নিম্নলিখিত তাবীজটি কাগজে লিখিয়া রোগী বা রোগিনীর ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া মুঠ বন্ধ করিয়া নির্জনে চার জানু বসিয়া থাকিলে এক ঘণ্টার মধ্যে জ্বীন দুনিয়ার যেখানেই থাকুক হাজির হইবে এবং রোগী বেহুঁশ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহা দ্বারা ঐ সমস্ত জ্বীন নাও হাজির হইতে পারে যাহারা কখন ভিতরে ঢুকে নাই বা ঢুকার পর তাহাকে কিছু জ্বালাতন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তদ্‌বীর পরে কোন স্থানে বর্ণনা করা হইবে। এই তাবীজটি দ্বারা পরীক্ষাও হইবে, জ্বীন হাজির করাও যাইবে।

٧٨٦

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

২। ৭ বার সূরা-ফাতেহা পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।
৭ বার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।
৭ বার সূরা-কাফেরূণ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার সূরা-এখলাছ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার সূরা-ফালাক পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার সূরা নাছ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

এইভাবে দম দেওয়ার পর জ্বীনের আছর হইলে রোগী ক্ষিপ্ত হইবে। যাদু হইলে একটু কমে দাঁড়াইবে কিন্তু একেবারে নিরাময় হইবে না। শারীরিক ব্যাধি হইলে একভাবে থাকিবে।

দম দেওয়ার পর তিনদিন অপেক্ষা করিয়া লক্ষ্য করিবে; গড়ে পূর্বাপেক্ষা রোগের অবস্থা কি দাঁড়ায়।

৩। কতকগুলি সুগন্ধি ফুলে নিম্নোক্ত তদ্‌বীর ১১ বার পড়িয়া ১১ বারই দম দিবে। উহার দুই একটি ফুল রোগীকে ঘ্রাণ লইতে দিবে। বাকীগুলির একটি করিয়া রোগীর গায়ে নিক্ষেপ করিলে জ্বীন হাজির হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ فَتْحُوْنَكَ فَتْحُوْنَكَ حَبِيْبُكَ حَبِيْبُكَ اَلَمًا اَلَمًا صَفْكًا اَلِسًا بَالِبًا طَلَيَسًا طَلَيَسًا سُوْدًا سُوْدًا كَهْلًا كَهْلًا حَلْهُوْلًا حَلْهُوْلًا مَهْلًا مَهْلًا سَخِيًّا سَخِيًّا شَدِيًّا شَدِيًّا نَبِيْسًا نَبِيْسًا بِحَقِّ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ وَمِنْ جَانِبِ الْاَ يْمَنِ وَ الْاَ يْسَرِ بِحَقِّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَ بِحَقِّ عَرْشِ اللهِ وَ كُرْسِيِّهٖ ـ

৪। নিম্নোক্ত নামগুলি সাতবার পড়িয়া রোগীর গায়ে দম দিলে জ্বীন হাজির হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ جَلِيْلًا جَبَّارًاشَمْسًا قَمَرًا مُلُوْكًا رَيَّادًا اِيْطَالُوْشِ بِاِسْمِ مَلِكٍ قَهَّارٍ بِاِسْمِ مَلِكٍ جَبَّارٍ بِاِسْمِ مَلِكٍ شَهُرَ اَسْمَائُهٗ تُرْسِيْدٌ وَّحَاضِرٌ شَهِيْدٌ ـ

بحق آں نامها که أدم صفی الله خوانده و بحق آں نامها که نوح نبی الله خوانده و بحق آں نامها که داؤد خلیفة الله خوانده وبحق آں نامها که اسماعیل ذبیح الله خوانده و بحق آں نامها که سلیمان نبی الله خوانده و بحق آں نام که موسٰی کلیم الله خوانده و بحق آں نام که عیسٰی روح الله خوانده و بحق آں نام که ابراهیم خلیل الله خوانده و بحق آں نام که حبیب الله محمد صلی الله علیه و سلم خوانده و بحق آں نامها و بعزة جاه و جلال این نامها حاضر شود ـ

৫। ٧٨٦

الله	موصى شر	فواقدل	الدلوعو	حدلول
الله	عولوشعر	عوهد	عرحاحدحان	فولعرن
الله	عولوعر	وارعون	عرهروشد	عون ف ١٢
الله	عدا ١٤ و٢	عوف شو	عوحا٢	فواعون

উক্ত তাবীজটি লিখিয়া রোগীর মাথার চুলের সহিত বাঁধিয়া দিবে। জ্বীন হাজির হইবে।

৬। রোগীর ললাটে এবং হাতের তালুতে লিখিবে—

سَلْمَـطِيْع ٢ مَهْطَطِيْع ٢ مَيْهُوْب ٢ دَيْهُوْب ٢ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ اِصْرَعْ بِحَقِّ بَطَدْ زَهَجْ وَاحٍ ـ

অতঃপর উক্ত নাম ও আয়াত পড়িয়া রোগীকে ১০/১৫ মিনিট দম দিতে থাকিলে জ্বীন হাজির হইয়া রোগীকে বেহুঁশ করিয়া দিবে।

ইহার পরও হাজির হইতে দেরী করিলে উক্ত নামগুলি এবং আয়াতটি পাক পবিত্র কাঠের বরতনের উপর লিখিবে এবং ডালিমের শক্ত ডালের উপর লিখিবে কিন্তু ডালের উপর উহার সহিত নিম্নোক্ত তাবীজটিও লিখিবে।

هذف ١ صه ١١ ح ١١١ طر ٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ

ডালটি লিখা হইলে পর আমেল সজোরে ঐ ডাল খানা দ্বারা উক্ত কাঠের বরতনের লিখিত স্থানে আঘাত করিতে থাকিবে। আঘাতের সময় রাগান্বিত অবস্থায় আঘাত করিবে এবং খেয়াল করিবে যে, আমি ঐ জ্বীনের অমুক জায়গায় আঘাত করিতেছি। এইরূপ করিলে এক ঘণ্টার ভিতরে জ্বীন হাজির হইবেই।

বন্ধন

১। পাঁচ হাত কার পাকাইয়া ডবল করিবে। অতঃপর—

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

২৫ বার পড়িবে প্রত্যেকবার ১টি গীরায় দম করিবে। এই কার প্রথমে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। জ্বীন হাজির হইয়া যখন রোগীর শরীরের ভিতর ঢুকিয়া যাইবে (চক্ষু খোলা যাইবে না এবং দাঁতও কপাট মারিয়া থাকিবে) তখন চুপে চুপে তাড়াতাড়ি রোগীর বাম হাতের বাজুতে বেশ একটু শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়া একবার—

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

পর্যন্ত পড়িয়া ঐ বাঁধা সূতার উপর দিয়া রুমাল দ্বারা উহা ঢাকিয়া বাঁধিয়া দিবে যেন রোগী উহা স্পর্শ করিতে না পারে। এখন এই বন্দী জ্বীন কোনক্রমেই পলায়ন করিতে পারিবে না—এমন কি যাদুও আর চলিবে না।

২। জ্বীন হাজির হইয়া রোগীর শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে একটা ছুরি বা চাকুর উপর তিন বার নিম্নোক্ত দো'আটি পড়িয়া দম দিবে। রোগীর চতুর্দিকে মাটিতে গোল দাগ দিলে জ্বীন আর পলায়ন করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ كردبا گرد هزار هزار حصار باد مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ گرد اں حصار بستم قفل لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ـ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ـ

৩। হঠাৎ জ্বীন হাজির হইয়া গেলে যদি বন্ধ করিবার জন্য সূতা ছুরি না পাওয়া যায়, তবে ৩ বার افحسبتم الاية পড়িয়া রোগীর বাম হাতের বাজু খুব জোরের সহিত চাপিয়া ধরিবে এবং নিয়ত করিবে, আমি উহাকে ধরিয়াছি, ছুটিতে পারিবে না।

৪। অবাধ্য জ্বীনকে শাস্তি দিবার সময় ক্ষিপ্ত হইলে বা জোরাজুরি করিলে সূরা-জ্বীনের প্রথম থেকে شططا পর্যন্ত তিনবার পড়িয়া দুই হাতের কব্জি চাপিয়া আমেল নিজের ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি ঘুরাইয়া ঐ কব্জিতে দায়েরা দিবে। ঠিক দুই পায়ের টাখ্‌নুতেও ঐরূপ করিবে। ইহাতে জ্বীন আর শক্তি খাটাইয়া আমেলকে অস্থির করিতে পারিবে না। অতঃপর তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিবে।

শাস্তি

আমেল যদি কামেল হয়, তবে সে কখনও প্রথমাবস্থায় জ্বীনকে শাস্তি দিবে না। কারণ অনেক সময় ইহার ফলাফল বড়ই খারাব হইয়া থাকে। কাজেই প্রথমাবস্থায় অতি সহজ ও মোলায়েম-ভাবে নিজস্ব প্রভাবের দ্বারা উহাকে রোগী হইতে সরাইবার চেষ্টা করিবে। ইহাতে যদি সে না শুনে, তবে ঐ জ্বীনের দ্বারা তাহার আত্মীয়-স্বজন কেহ থাকিলে হাজির করিতে বাধ্য করিবে এবং ঐ জ্বীনটিকে তাহাদের হাতে অর্পণ করিয়া দিবে। উহাদের দ্বারা লিখিত ওয়াদা রাখিবে যেন পুনরায় সে আক্রমণ করিলে আমরা উহাকে শাস্তি দিলে বা মারিয়া ফেলিলেও কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। এই চুক্তি-পত্রটি খুব মজবুত হওয়া দরকার। কারণ শেষ পর্যন্ত যদি উহাকে মারিয়াই ফেলিতে হয়, তবে যেন তাহার কেহ আক্রমণ না করে। এরূপ না করিয়া প্রথমাবস্থায় কঠোর শাস্তি দিলে বা মারিয়া ফেলিলে শেষে হাজার হাজার জ্বীনের আক্রমণ হইলে তখন বিপদের আর সীমা থাকিবে না। এ জন্য খুব সতর্কতার সহিত কাজ করিবে।

১। বিনা পরীক্ষায় অথবা পরীক্ষায় জ্বীন সাব্যস্ত হইলে প্রথম তাহাকে অঙ্গিকার করিয়া যাইতে বলিবে। ইহাতে সে চলিয়া গেলে বড়ই নিরাপদ।

২। সহজে চলিয়া না গেলে এক বোতল পানিতে ১ বার সূরা-জ্বীন প্রথম থেকে পাঁচ আয়াত رهقا পর্যন্ত পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি খুব জোরে ৭/৮ বার রোগীর মুখে মারিবে ইহাতে রোগী স্বেচ্ছায় চক্ষু বন্ধ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কোন দিকে ইশারা করিবে। যদি এইরূপ ইশারা না করিয়া চুপ থাকে, তবে আরও এইরূপে কয়েকবার ঐরূপ সজোরে মারিলে চক্ষু বন্ধ করিয়া মুখেই বলিবে, ঐ দিকে গেল, তখন সে যেদিকে ইশারা করিয়াছিল বা মুখে বলিয়াছিল ঐ স্থানে বাকী পানিটুকু ছিটাইয়া দিলে জ্বীন পলায়ন করিবে এবং একটু সৎ জ্বীন হইলে আর আক্রমণ করিবে না। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর হুঁশ হইলে পর বন্ধের জন্য কোন একটি তাবীজ দিবে।

৩। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া জোরপূর্বক রোগীকে দোখাইবে। জ্বীন হইলে সে ঐ তাবীজ কিছুতেই দেখিবে না, কিন্তু জোরপূর্বক রোগীর চক্ষু খুলিয়া তাবীজ দেখাইবে। জ্বীন রোগীকে ছাড়িয়া গেলে ঐ তাবীজটি তামার মাদুলিতে পুরিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে।

اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ يَمْلِيْخَا مَكْسَلْمِيْنَا كَشْفُوْطَطْ كَشَافَطْيُوَانَسْ اِذَافَطْيُوَانُسْ طَبْيُوَانُسْ يُوَانُسْ بُوْسْ وَ كَلْبُهُمْ قِطْمِيْرِ وَ عَلَى اللهِ قَصْدُالسَّبِيْلِ وَ مِنْهَا جَآئِرٌ وَّ لَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

٧٨٦

٨	٦	٤	٢
٢	٤	٦	٨
٦	٨	٢	٤
٤	٢	٨	٦

৪। চেহেল কাফ ৩ বার পড়িয়া সরিষার তৈলে দম করিয়া ঐ তৈল রোগীর উভয় কানের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিলে জ্বীন অস্থির হইয়া চিৎকার করিবে। কিছুক্ষণ পর সে রোগী ছাড়িয়া যাইবে।

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةٌ كِفْكَافُهَا كَكَمِيْنَ كَانَ مِنْ كُلُكٍ تَكِرُّ كَرًّا كَكَرَّالْكِرَّ فِيْ كَبَدٍ تَحْكِيْ مُشَكْشَكَةٍ كُلُكُلَكَ لَكَكٍ كَفَاكَ مَا بِيْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتِهِ يَاكَوْكَبًا كَانَ تَحْكِيْ كَوْكَبُ الْفَلَكِ ـ

৫। রোগীর কাছে শয়তানের দুই একটি কাল্পনিক মূর্তি ছুরি বা লৌহ দ্বারা আঁকিবে এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলি পরিমাণ মোটা ১৷৷ হাত লম্বা একটা ডালিমের ডালে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া ঐ মূর্তির উপর প্রহার করিলে জ্বীন চিৎকার করিবে, যাহা জিজ্ঞাসা করিবে তাহার উত্তর দিবে এবং কিছুক্ষণ এরূপ করিলে রোগী ছাড়িয়া পালায়ন করিবে।

مهـر سمعنا عليهم لاه لاه يعب طعوش سيلطيلوش بهكعهعلاح حجج حجج سيطج قطيعها سيقـطهـا عمليـج سقطيع صمهم بكهيل كمهليط لسليعا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ تَوَكَّلْ يَا مَنْ بِسِيَاطٍ عَدُوَّ اللهِ هٰذَا ـ

৬। বিসমিল্লাহ্‌সহ আয়াতুল কুরছি ৭ বার ও يَا قَهَّارُ ১০১ বার পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীকে খাওয়াইবে।

৭। জ্বীনগ্রস্ত রোগীর বাম কর্ণে ৭ বার নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুঁক দিবে।

وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَ اَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ـ

৮। জ্বীনগ্রস্ত রোগীর কানে ৭ বার আযান এবং সূরা-ফাতেহা, সূরা-ফালাক, সূরা-নাছ, আয়াতুল কুরছি, সূরা-তারেক পূর্ণ, একবার সূরা-হাশরের শেষ কয়েক আয়াৎ لوانزلنا الاية ও সূরা-ছাফ্‌ফাতের সম্পূর্ণ পড়িয়া ফুঁক দিবে। ইহাতে জ্বীন শয়তান জ্বলিয়া যাইবে।

৯। জ্বীনগ্রস্ত রোগীর কানে নিম্নোক্ত আয়াত জোরে জোরে পড়িয়া ফুঁক দিবে। ইহাতে জ্বীন খুব কষ্ট বোধ করিতে থাকিবে। রোগীর কাছে বসিয়া ঐ আয়াত জোরের সহিত পড়িলে জ্বীনের গাত্রে জ্বলা-যন্ত্রণা হইয়া থাকে। জ্বীনেরা এই আয়াতকে খুব ভয় করিয়া থাকে। افحسبتم الاية এই আয়াতের এমন খাছিয়াত আছে, যে, পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত উহা পড়িয়া ফুৎকার করিলে পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত স্থানান্তরিত হইয়া যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

১০। রোগীর দুই পার্শ্বে দুইজন হাফেয বসিয়া সূরা-ছাফ্‌ফাত দুই বার পড়িলে জ্বীন জ্বলিয়া যায়।

১১। মাটিতে কৃত্রিম কুৎসিৎ শয়তানের মূর্তি আঁকিয়া লইবে এবং সূরা-ছাফ্‌ফাতের প্রথম হইতে طين لازب পর্যন্ত একবার পড়িয়া ডালিমের ডালের দ্বারা ঐ মূর্তির উপর সজোরে একদমে ১৫/১৬টি আঘাত করিবে এবং রাগান্বিত অবস্থায় ধারণা করিবে, আমি উক্ত জ্বীনের হাড় ভাংগিয়া ফেলিতেছি। এরূপ করিলে জ্বীন নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে। যাহা ইচ্ছা বলাইতে পারিবে। যখন হাজার হাজার জ্বীনের আক্রমণ হয়, তখনও উহার দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

১২। পূর্ণ সূরা-জ্বীন ৭ বার পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীর মুখে ছিটাইয়া দিলে কথা শুনিতে বাধ্য হইবে।

১৩। ৩৩ আয়াত সম্পূর্ণ পড়িয়া রোগীকে দম করিলে জ্বীন পলায়ন করিয়া থাকে। কলেরা রোগীর প্রথম অবস্থায় একবার পড়িয়া দম করিলে খোদা চাহে ত রোগ আর বাড়িবে না। খুব গভীর নিদ্রা হইয়া রোগী সুস্থ হইয়া যাইবে। পানিতে দম দিয়া উহা যেখানে ছিটাইয়া দিবে তথায় জ্বীন ও শয়তান থাকিতে পারে না। ইহার আরও বহু গুণাগুণ রহিয়াছে। আমেল ক্রমান্বয়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। নিম্নোক্ত আয়াতের নাম ৩৩ আয়াতে তিরইয়াক।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ○ اٰمِيْنَ ـ الٓمّٓ ○ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَايُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍمِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○ لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ۵ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَآئُهُمُ الطَّاغُوْتُ لا
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۝ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ
مَا فِى الْاَرْضِ ط وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ
مَنْ يَّشَآءُ ط وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا
وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَ اعْفُ عَنَّا وقفة وَ اغْفِرْ لَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لا وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا
لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ط تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيْمِ ۝ وَ مَن يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لا لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ لا فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُوْنَ ۝ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝
فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ اِنَّا زَيَّنَّا
السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ ۝ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى
وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ق صلے دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ
ثَاقِبٌ ۝ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ط اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ
الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ج وَ هُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ۝ اَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۝ سورة اخلاص، سورة فلق، سورة ناس، بِسْمِ
اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَ لَا حَوْلَ
وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ۝ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

১৪। একাধিক এমন কি হাজার হাজার জ্বীনের আক্রমণ হইলে তখন রোগীর কাছে বসিয়া একজন সূরা-ইউনুছ আর একজন সূরা-ইয়াসীন জোরে জোরে পড়িবে। আর একজনে

সূরা-ছাফ্ফাত পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ ঘরে ছিটাইবে। রোগীর মুখেও কিছু কিছু ছিটাইবে। তখন ৪ জন হাফেয রোগীর ৪ হাত-পায়ের কাছে বসিয়া প্রত্যেকেই সূরা-জ্বীন পড়িয়া শেষ করিয়া রোগীর হাত-পায়ের অঙ্গুলি একটু জোরে টানিবে এবং ধারণা করিবে আমি জ্বীন শয়তানকে ছিড়িয়া ফেলিলাম। এরূপ করিলে জ্বীন আহত হইবে ও ভীষণ শাস্তি পাইবে। কিন্তু রোগী মেয়েলোক হইলে এরূপ করিতে যাইবে না, তখন ১১ নং তদ্বীর করিতে থাকিবে।

হাজার হাজার জ্বীন আসিলে তখন ১১ নং তদ্বীর, ১৪ নং তদ্বীর বিশেষ ফল দিবে। এতদসঙ্গে জোরে জোরে أَفَحَسِبْتُمْ الآيَة ও পড়িতে থাকবে।

১৫। জ্বীনেরা দলে দলে আক্রমণ করিলে তখন কয়েকজন হাফেয (না-বালেগ হইলে ভাল হয়) রোগীর নিকট রাখিবে। তাহারা জোরে জোরে أَفَحَسِبْتُمْ الآيَة ـ وَالصَّافَّاتِ এর প্রথম ৫ আয়াত, সূরা-জ্বীনের شَطَطًا পর্যন্ত পড়িতে থাকিবে।

১৬। এরূপ ভয়াবহ সময় ৮ বার সূরা-ছাফ্ফাত পুরা পড়িয়া প্রত্যেক বারই পানিতে দম দিবে ৮ বার সূরা-জ্বীন পড়িয়া প্রত্যেক বারই পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীর কামরায় বহিঃ পার্শ্ব দিয়া চতুর্দিকে খুব জোরের সহিত ছিটাইবে এবং ধারণা করিবে এই কামরায় একটি জ্বীনও ঢুকিতে পারিবে না। ইহাতে একত্রিত হইয়া সবাই ঢুকিতে পারিবে না। দুই একটি করিয়া ঢুকিবে আর তাহাকে ১১ নং তদ্বীর দ্বারা শাস্তি দিবে। এরূপভাবে করিবে যাহতে ঐ কামরার ভিতরকার মানুষেরা যেন মোটেই ভীত না হয়; বরং সকলের হিমাদ্রি সদৃশ সাহস দ্বারা তর্জন ও গর্জন দ্বারা জ্বীনদেরকে ভীত করিয়া দিবে।

১৭। ঐ সময় দুই একটি দেও ভূত বা জ্বীন রোগীকে উঠাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে তখনই বাচ্চা হাফেযকে রোগীর ছিনার উপর বসাইয়া দিবে যেন ঐ হাফেয افحسبتم الاية ৩ বার পড়িয়া নিজের গায়ের ভার রোগীর উপর ছাড়িয়া দেয়। ইহাতে আর রোগীকে লইয়া যাইতে পারিবে না। সঙ্গে সঙ্গে জ্বীনকে কঠোর শাস্তি দিবে। ইহাতেও যদি ঐ দুর্দান্ত জ্বীন দমন না হয়, তবে জ্বীনকে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। তবে পোড়াইয়া মারার ব্যবস্থা একেবারে চরম অবস্থায় করিবে। কারণ ইহা একে ত প্রাণহানি, দ্বিতীয়তঃ আমেলের—বিশেষতঃ রোগীর উপর জ্বীনের উৎপাত অতি মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। আমেলের জানিয়া রাখা উচিত—যথাসম্ভব জ্বীনকে সহজে তাড়াইবার চেষ্টা করা সর্বোত্তম। ক্রমান্বয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা সঙ্গত। কিন্তু প্রথমেই জ্বালান পুড়ান বা মারিয়া ফেলা কিছুতেই সমীচীন নহে। পোড়াইয়া শাস্তি দেওয়া বা পোড়াইয়া মারিয়া ফেলা চরম অবস্থার তদ্বীর। সাধারণ অবস্থায় ইহার প্রয়োগ ভীষণ অন্যায়।

১৮। জ্বীন রোগীর ভিতর ঢুকিলে চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইবেই এবং খোলা বড়ই মুস্কিল হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাতন রোগী হইলে চক্ষু বন্ধ নাও হইতে পারে। সুচতুর আমেল যখন বুঝিবে যে, জ্বীন ভিতরে ঢুকিয়াছে, তখন হুঁশিয়ারির সহিত বন্ধন দিয়া নিম্নোক্ত তাবীজ ৩ খণ্ড কাগজে লিখিয়া পৃথকভাবে বাটিয়া বাদাম কিংবা সরিষার তৈলে ভিজাইয়া পোড়াইবে এবং উহার ধোঁয়া রোগীর নাক দ্বারা টানাইয়া ভিতরে প্রবেশ করাইবে। যতক্ষণ পূর্ণ শাস্তি না হয় ততক্ষণ ধোঁয়া টানাইতেই থাকিবে। কিন্তু রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

فرعون بی عون هامان شرمسار عاد ثمود نمرود ابلیس کلهم فی النار
جحیم جهنم سعیر سقر لظی حطمه هاویه دوزخ اشمر ـ

٨	١	٢٥٥٩	١	٢٥٦٢	١	١
٢٥٦١	١	٢	١	٧	١	٢٥٦٠
٣	١	٢٥٦٤	١	٢٥٥٧	١	٦
٢٥٥٨	١	٥	١	٤	١	٢٥٦٣

اکر نکریزد سوخته شود

উক্ত তাবীজটির নিম্নভাগে ফারসীটুকু না লিখিয়া তাবীজ প্রস্তুত করত নাকের নীচে আগুন ধরিলে জ্বীন জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যায়। কিন্তু আগুন না জ্বালাইয়া শুধু ধোঁয়াই দিবে যাহাতে শাস্তি পাইয়া পলায়ন করে।

১৯। অবিকল নিম্নরূপ তিনটি তাবীজ লিখিয়া পৃথক ২ তূলা দ্বারা পেঁচাইয়া ৩টি ফলিতা বানাইবে এবং উপরের দিকে আগুন লাগাইয়া উহার ধোঁয়া রোগীর নাকে দিবে। একদিন পর একটি জ্বালাইবে। ইহাতে জ্বীন দূরীভূত হইবে।

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

২০। তিন হাত লম্বা দুই হাত চওড়া পুরাতন সাদা পাক কাপড় লম্বা দিকে পাঁচ খণ্ড করিয়া পাকাইয়া পৃথক পৃথক ৫টি ফলিতা বানাইবে। একত্রে ৫টি ফলিতার উপর ৩ বার—

بِسْمِ اللهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ـ

৩ বার পড়িয়া উভয় মুখে সজোরে দম দিবে। একটি চাটিতে (মেটে মুচি) সরিষার তৈল দিয়া মাখাইয়া রাখিয়া দিবে। অতঃপর একটি ফলিতার মুখে আগুন ধরাইয়া জ্বলন্ত আগুন নিবাইয়া দিবে। তখন উহা পুড়িতে থাকিবে ও ধোঁয়া রোগীর নাক দিয়া টানাইবে দরকার হইলে পর ৪টি পর্যন্ত ফলিতা জ্বালাইবে। ইহাতে জ্বীন কঠিন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পলায়ন করিবে। খুব শাস্তি হইয়াছে মনে করিলে অঙ্গীকার পত্র লিখাইয়া রাখিবে। ঐ জ্বীনের দ্বারা তাহার ঘনিষ্ঠ কেহ থাকিলে তাহাকেও ডাকাইয়া অঙ্গীকার লইবে।

২১। তদ্‌বীর করিতে করিতে ২০ টি তদ্‌বীর শেষ হইয়া গেলে এবং দুর্দান্ত জ্বীন পলায়ন না করিলে শেষবারে উপায়ান্তর না থাকিলে তাবীজ কাগজে লিখিয়া লম্বা ভাজ দিয়া বাদাম তৈল মাখাইয়া লোহার দস্তমান দ্বারা ধরিবে (হাত দ্বারা নয়) এবং আগুন লাগাইয়া রোগীর নাক সোজা

অর্ধ হাত নীচে পোড়াইয়া দিবে। একটি তাবীজ পোড়া শেষ হইলে একটি জ্বীন জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। এই তদ্‌বীরে যাদু জ্বীন পুড়িয়া মরিবে। জ্বীনদের প্রবল আক্রমণের সময় ইহাই একমাত্র মারণাস্ত্র। জ্বীন জ্বলিয়া গেলে রোগী চৈতন্য লাভ করিবে এবং জিহ্বা বাহির হইয়া যাইবে। খুব পানি পান করিবে। কিন্তু তখন খুব পানি পান করিতে দিবে। ইহা আমার বহু পরীক্ষিত। জনৈক জ্বীন হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত। এই সময় জ্বীনকে খুব যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট দিয়া মারিতে হইলে পোড়াইবার সময় افحسبتم الاية পড়িতে থাকিবে।

অন্যান্য তাবীজ পোড়াইবার সময় বা শাস্তি দিবার সময় জ্বীনে যাদু করিয়া থাকে তখন আগুনের দ্বারাও পুড়িতে চায় না। এরূপ অবস্থায় একবার রোগীর মুখে থুথু দিলে উহাদের যাদু নষ্ট হইয়া যাইবে। জ্বীন যতই হউক না কেন কোন চিন্তা করিবে না, তবে রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তাবীজটি এই—

فرعون هامان قارون نمرود ابليس كلهم فى النار و اخوانهم و احبابهم -

দূর থেকে নজর করিয়া থাকিলেও এই তাবীজে জ্বীন ঐ দূর থেকেই পুড়িয়া মরিবে। অবশ্য এই তাবীজটির এজাযত একমাত্র অনুবাদককে দেওয়া হইয়াছে। পাঠক দরকার মনে করিলে অনুবাদক থেকে অনুমতি লইবেন। জ্বীন শরীরের ভিতর না থাকিলে শুধু বন্ধের তাবীজ দিয়াই রোগীর থেকে দূরে রাখিবে।

২২। কাঠের ঘাইনের ভাংগা খালেছ সরিষার তৈল তামার পাত্রে রাখিয়া ১৪ বার আয়াতে-কুত্‌ব পড়িয়া প্রত্যেক বারেই জোরের সহিত দম দিবে। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময় (এক মিনিটও বেশকম না হয়) শরীরে নিজেই মালিশ করিবে যেন একটি চুল পরিমাণ জাগায়ও বাদ না থাকে। খোদা চাহে ত জ্বীন ও যাদু দূর হইবে।

২৩। জ্বীন বদনজর দ্বারা ক্ষতি করিলে বদনজর দূর করিবার তদ্‌বীর করিবে।

২৪। জ্বীন অবাধ্য হইলে কিংবা কাহাকেও ডাকিতে বলায় সে তাহাকে না ডাকিলে সূরা-জ্বীন পূর্ণ পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি জোরের সহিত রোগীর মুখে মারিলে সে বাধ্য হইবে। যাহাকে ডাকিতে বলিবে ঠিক তাহাকেই ডাকিবে।

২৫। জ্বীন রোগীর শরীরের বাহিরে থাকিলে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। আবার শরীরের ভিতর ঢুকিলেও বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কিন্তু ঘন ঘন শরীরের ভিতর ঢুকিলে ও বাহির হইলে রোগীর সাংঘাতিক ক্ষতির আশঙ্কা এবং নানাবিধ রোগের উৎপাত হইতে পারে। বিশেষ করিয়া মাথার মগজের উপরের তৈলাক্ত পদার্থ শুষ্ক হইয়া পাগল হইয়া যাওয়ার খুবই আশঙ্কা। এমতা-বস্থায় মকরধজ, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধজ, যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করাইবে। মাথায় ঠাণ্ডা তৈল ব্যবহার করাইবে। আমেল নিজের কুওতে খেয়ালিয়া দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করিবে।

২৬। জ্বীন রোগীর চক্ষুর ক্ষতি করিলে একবার আয়াতুল কুরছি, একবার সূরায়ে-ছাফ্‌ফাতের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়িয়া চক্ষুতে দম দিবে এবং এইভাবে পড়িয়াই পানিতে দম দিয়া রোগীর চক্ষু ধৌত করিতে ও খাইতে দিবে। শ্বেতচন্দন ঘষিয়া চক্ষের চার পার্শ্বে লেপ দিবে।

২৭।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ -

৩ বার পড়িয়া ১॥ হাত লম্বা ডালিমের ডালে ফুঁক দিয়া উহা দ্বারা রাগান্বিত অবস্থায় রোগীকে আস্তে আস্তে খুব ঘন ঘন প্রহার করিলে জ্বীন পলায়ন করিতে বাধ্য।

২৮। জ্বীন রোগী বা অন্য কাহারও হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কিংবা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাংগিয়া ফেলিলে সূরা-জ্বীন পূর্ণ পড়িয়া পানিতে দম দিবে এবং ঐ পানি দ্বারা ঐ অঙ্গ ধৌত করিয়া দিবে। পানি পান করিতে দিবে।

২৯। অনেক সময় জ্বীন রোগীর কথা বলার শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে উহার প্রতিকারার্থে كهيعص ২৩ বার حمعسق ২০ বার; পর্যন্ত لتشقى ..... طه ১ বার;

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا۔

بسم الله الذى لا يضر مع اسمه الخ ২ বার; সূরা-ইয়াসীন প্রথম মুবীন পর্যন্ত ১ বার; সমস্ত পড়িয়া পানিতে একবার দম দিবে। আবার ঠিক ঐ নিয়মে পড়িবে এবং প্রত্যেক আয়াত নির্ধারিত পরিমাণ পড়া হইলে পর ঐ পানি রোগীর মুখের মধ্যে ভরিয়া ১০/১৫ মিনিট রাখিয়া গিলিয়া খাইতে দিবে। রোগী মুখের মধ্যে ঐ পানি রাখিতে না চাইলে জোরপূর্বক রাখাইয়া পান করাইবে। খোদা চাহে ত তখনই রোগী ভাল হইয়া যাইবে।

৩০। উপরোক্ত তদ্‌বীরে জবান না খুলিলে জ্বীন হাজির করিয়া বন্ধন করত ২৮ নং তদ্‌বীর করিলে রোগী অবশ্যই কথা বলিবে। জ্বীনও পলায়ন করিবে।

৩১। জ্বীন সাপ হইয়া রোগীকে দংশন করিলে সর্ব বিষ চিকিৎসার তদ্‌বীর করিয়া বিষ নষ্ট করিয়া দিবে।

৩২। জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় জ্বীন রোগীকে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে রোগীকে বন্ধের ভিতর রাখিবে। এরূপ কঠিন সময় রোগীর নিকট হাফেজ বসিয়া সূরা-ইয়াসীন, সূরা-ছাফ্‌ফাত, সূরা-ইউনুস, সূরা-জ্বিন এবং افحسبتم আয়াত পড়িতে থাকিবে। আমেল নিজে ৩ হাত লম্বা চল্লিশ তার কাঁচা সূতায় ৪০টি গিরা দিবে এবং প্রত্যেক গিরা দিবার সময় ১ বার—

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

পড়িয়া দম দিবে। পড়া শেষ হইলে গলায় বাঁধিয়া দিবে।

৩৩। আমেল নিজে ৩বার আয়াতুল-কুরছি পড়িয়া উভয় হাতের তালুতে দম করত দস্তক দিলে দুষ্ট জ্বীন তথা হইতে পলায়ন করিবে।

৩৪। ভয়ে কম্পিত রোগীকে নিম্নোক্ত তাবীজটি ধারণ করিতে দিবে।

جبرائيل ص ٧٨٦ ميكائيل ص

١٦	١٩	٢٢	٩
٢١	١٥	٥	٢٥
١١	٢٤	١٧	١٤
١٧	١٣	١٢	٢٢

عزرائيل ص أخر محمد صلى الله عليه وسلم اسرافيل ص

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى

فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰ خِرَةِ ○ لَا تَبْدِیْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۔ وَ صَلَّی اللهُ عَلَی النَّبِیِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ۔

١١طح ١١١ح ٢١-١١٥١٥٢٧

৩৫। রোগী যখনই জ্বীন দেখিতে পাইবে তখনই পড়িবে العنك بلعنة الله التامة দুষ্ট জ্বীন তৎক্ষণাৎ ওখান হইতে পলায়ন করিবে।

বন্ধ

৩৬। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

٧٨٦

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

١١١م ١١١١هٔ

وصلى الله تعالى واله وسلم

(از علامه ظفر احمد عثمانی)

৩৭।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَیْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّ عَیْنٍ لَّامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ۔ وَ صَلَّی اللهُ عَلَی النَّبِیِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ۔ (از قول الجميل)

উপরোক্ত তাবীজটি লিখিয়া ছোট বাচ্চাদের কিংবা বয়স্ক রোগীর গলায় ধারণ করিতে দিলে নিরাপদ থাকে।

৩৮।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ بِسْمِ اللهِ بَابُنَا تَبَارَكَ حِیْطَانُنَا یٰسٓ سَقْفُنَا كهيعص كِفَایَتُنَا حمعسق حِمَایَتُنَا فَسَیَكْفِیْكَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۔ فَاللهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ۔ اِنَّ وَلِیَّ یَ اللهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّی الصّٰلِحِیْنَ ۔ وَ صَلَّی اللهُ عَلَی النَّبِیِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ۔

যে সব ছোট ছেলেমেয়ে ঘুমাইলে চিৎকার করে এবং যাহাদের জ্বীনের আছর হইয়াছে তাদের গলায় বাঁধিয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বহুবার পরীক্ষিত।

৩৯। হেরজে আবি দোজানা নেহায়েত পরীক্ষিত তাবীজ, লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

بسم الله الرحمٰن الرحيم ط بسم الله هذا الكتاب من محمد رسول الله رب العالمين الى من طرق الدار من العماد و الزوار و السلخين الا طارقا يطرق بخير يارحمٰن اما بعد فان لنا ولكم فى الحق سعة فان تك عاشقا موسعا او فاجرا مختصما او راعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اتركوا صاحب كتاب هذا و انطلقوا الى عبدة اوثان والاصنام والذين يزعمون ان مع الله الٰها أخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و اليه ترجعون تقلبون حم لا تنصرون حمعسق تفرق اعداء الله و بلغت حجة الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ـ وصلى الله على محمد وأله واصحابه وسلم ١١ط ح١١ح٢١لا٢-١١٥١٥٢

৪০। ৩৫ নং তাবীজ গলায় বাঁধিয়া দিলে জ্বীন রোগীর নিকট আসিতে পারে না। জ্বীন রোগীর থেকে বিতাড়নের পর বন্ধের জন্য কোন তাবীজ দিবে এবং তৎসঙ্গে দুঃস্বপ্ন থাকিলেও ঐ তাবীজে বিশেষ উপকার হইবে।

৪১। জ্বীন তাড়াইয়া নিম্নোক্ত তাবীজ গলায় বাঁধিয়া দিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	١٥

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

كا١١١٥   كا ١١ ١١

(ازبياض يعقوب)

৪২। সূরা-জ্বীন সম্পূর্ণ লিখিয়া তাবীজ প্রস্তুত করিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে রোগীর নিকট জ্বীন আসিবে না।

৪৩। একটি তামার তাবীজ লইয়া প্রথমতঃ সূরা-জ্বীন একবার পড়িয়া উহাতে দম দিবে। অতঃপর ১২টি আলপিনের প্রত্যেকটির উপর পূর্ণ সূরা-জ্বীন পড়িয়া দম দিয়া ঐ তামার মাদুলিতে পুরিয়া রোগীর গলায় দিবে।

৪৪। নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া রূপার মাদুলীতে ভরিয়া গলায় কিংবা ডান হাতের বাজুতে ভরিয়া দিবে। এই তাবীজ সঙ্গে থাকিলে জ্বীন স্পর্শ করিতে পারে না, শত্রুর অস্ত্রের আঘাত শরীরে আছর করে না। বুযুর্গানে-দীন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই তাবীজ বকরীর গলায় বাঁধিয়া দিলে এই বকরী বাঘে খায় না। আমি নিজেও ব্যবহার করিয়া বহু গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَ لَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ـ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ـ لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ○ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ ـ وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ وَّ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ـ وَ حِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ اَللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَ مَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ وَّ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ـ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ـ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ـ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ فَعَّالٌ لِّمَايُرِيْدُ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ ـ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ (از حيواة الحيوان)

৪৫। নিম্নোক্ত তাবীজও আমার বহু পরীক্ষিত। ইনশাআল্লাহ্ উহা সঙ্গে রাখিলে জ্বীন কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط كُلُّ ذِىْ مُلْكٍ فَمَمْلُوْكٌ لِّلّٰهِ وَ كُلُّ ذِىْ قُوَّةٍ فَضَعِيْفٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ كُلُّ جَبَّارٍ فَصَغِيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ كُلُّ ظَالِمٍ لَّا مَحِيْصَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ حَصَّنْتُ حَامِلَ كِتَابِىْ هٰذَا بِاٰيٰتِهٖ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِ نْسِ وَ الشَّيَاطِيْنِ وَ الْعَفَارِيْتِ الْمُتَمَرِّدِيْنَ يَا مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْاِ نْسِ وَ الشَّيَاطِيْنِ خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤٗدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلٰى اَفْوَاهِكُمْ وَ عَصَا مُوْسٰى عَلٰى اَكْتَافِكُمْ وَ خَيْرُكُمْ بَيْنَ اَعْيُنِكُمْ وَ شَرُّكُمْ تَحْتَ اَرْجُلِكُمْ وَ لَا غَالِبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ حَامِلُ كِتَابِىْ هٰذَا فِىْ حِرْزِ اللّٰهِ الْمَانِعِ الَّذِىْ لَا يَذُلُّ مَنِ اعْتَزَّ بِهٖ وَ لَا يَنْكَشِفُ مَنِ اسْتَتَرَ بِهٖ ـ سُبْحَانَ مَنْ اَلْجَمَ الْبَحْرَ بِكَلِمَاتِهٖ سُبْحَانَ مَنْ اَطْفَاَ نَارَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقُدْرَتِهٖ وَ حِكْمَتِهٖ سُبْحَانَ مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَىْءٍ اَقْبِلْ وَ لَا تَخَفْ لَا تَخَافُ دَرْكًا وَّلَا تَخْشٰى لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَ عْلٰى لَا تَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَ اَرٰى ـ اَللّٰهُمَّ احْفَظْ حَامِلَ كِتَابِىْ هٰذَا وَ اسْتُرْهُ بِسِتْرِكَ الْوَافِى الْحَصِيْنِ فِىْ لَيْلِهٖ وَ نَهَارِهٖ وَ ظَعْنِهٖ وَ قَرَارِهِ الَّذِىْ تَسْتُرُبِهٖ اَوْلِيَائَكَ الْمُتَّقِيْنَ مِنْ اَعْدَاءِكَ الظَّالِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ عَادَاهُ فَعَادِهٖ وَ مَنْ كَادَهٗ فَكِدْهٗ وَ مَنْ نَّصَبَ لَهٗ فَخًّا فَخُذْهُ وَ اَطْفِئْ عَنْهُ نَارًامَّنْ اَرَادَ بِهٖ عَدَاوَةً وَّ شَرًّا وَّفَرِّجْ عَنْهُ كُلَّ كُرْبَةٍ وَّ هَمٍّ وَّ غَمٍّ وَّ ضِيْقٍ وَّ لَا تُحَمِّلْهُ مَالَا يَقْوٰى وَ لَا يُطِيْقُ اِنَّكَ اَنْتَ الْحَقُّ الْحَقِيْقُ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

(من حيواة الحيوان)

١١ ط ح ١١١ ح ٢١ه لا ١٥٢ ١١٥

ه

পূর্বোক্ত তাবীজের সহিত উক্ত তাবীজ এবং উহার সহিত ৩৫ নং তাবীজ লিখিয়া গলায় বা হাতের বাজুতে রাখিলে সমুদ্র গমন, বন ভ্রমণ, শত্রুদের মধ্যে গমনাগমন এবং জ্বীনের উৎপাত হইতে খোদার অনুগ্রহে সর্বাবিধ বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

বাড়ী বন্ধ

অনেক সময় তাবীজ দিয়াও কূল-কিনারা যখন পাওয়া না যায় তখন বন্ধের তাবীজ রোগীকে ব্যবহার করিতে দিবে। সংগে সংগে রোগীর বাড়ীও বন্ধ করিবে। এরূপ অবস্থায় খুব বেশী করিয়া রোগীকে শাস্তি দিবে। যেন তাহার পুনরাক্রমণের সাহস না হয়।

বাড়ী বন্ধের নিয়ম নিম্নরূপ

৪৬। আট দশ আঙ্গুলি পরিমাণ ৪টি (তারকাটা) ডানীশ লোহা লইবে। প্রত্যেকটি লোহার উপর ২৫ বার انهم يكيدون كيدا و اكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا পড়িয়া প্রত্যেক বারই ফুঁক দিবে। এইরূপে ৪টি লোহা পড়িয়া রাখিয়া দিবে। ৪টি কাঁচা কিংবা অল্প পোড়া মেটে শরা লইবে এবং প্রথমটির ভিতর লিখিবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ جبرائيل عن يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَايَشَآءُ ـ

২য়টির ভিতর লিখিবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ ميكائيل عن لَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

৩য়টিতে লিখিবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ اسرافيل عن قُلْ مَنْ يَّكْلَاُكُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ـ

৪র্থটিতে লিখিবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ عزرائيل عن فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

৪টি মেটে পাতিলে পড়া ৪টি লোহা পুরিয়া প্রত্যেকটি পাতিলের মুখ ঐ লিখিত শরা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে। অতঃপর এক লোটা পানিতে ১৩ নং তদ্‌বীরে লিখিত আয়াতসমূহ পড়িয়া দম করিবে।

বাড়ীর যতদূর পর্যন্ত রোগী চলাফেরা করিয়া থাকে, তার চার কোণে চারটি ১।। হাত পরিমাণ গর্ত করিবে। ঐ চারটি গর্তের পার্শ্বে ঐ চারটি লৌহপূর্ণ পাতিল রাখিয়া তাহার নিকটে ৪ জন হাফেয দণ্ডায়মান থাকিয়া সূরা-ছাফ্‌ফাত, সূরা-ইউনুস, সূরা-ইয়াছিন ও সূরা-জ্বীন একবার করিয়া পড়িতে থাকিবে। আমেল স্বয়ং এক কোণ হইতে একটি কাঁচি কিংবা লৌহের অন্য কোন অস্ত্রের দ্বারা দায়েরা টানিয়া দাগের প্রথম স্থানের সংগে মিলিত করিয়া দিবে এবং দায়েরা শেষ হওয়ার সংগে আয়াতুল কুরছিও শেষ করিবে।

তারপর সীমানার বিভিন্ন স্থানে কলসীতে পানি রাখিয়া উহাতে কিছুটা ঐ পড়া পানি মিশাইবে। আট দশজন লোক পানি ছিটাইবার জন্য রাখিবে। তাহারা শুধু পানি ছিটাইবার কাজই করিবে। একজন মোয়ায্‌যেন মাঝখানে দাঁড়াইয়া আযান দিবে।

পানি ছিটাইবার কাজ এবং আযান এক সঙ্গে আরম্ভ করিবে এবং এক সঙ্গেই শেষ করিবে। ঠিক শেষ বারে যখন মোয়ায্‌যেন لَآاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলিবে, তখনই পানি ছিটাইবার কাজ শেষ হওয়া চাই এবং ঐ একই সময় পাতিল চারটি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়িয়া গর্তে গাড়িয়া দিয়া মাটি চাপা দিবে।

প্রকাশ, যতটা জায়গা নিয়া বন্ধ হইবে উহার মধ্যে এক বিঘৎ জায়গাও যেন পানি ছিটাইতে বাদ না পড়ে। ৪ জন হাফেয পড়ার কাজটা কিছু পূর্বেই আরম্ভ করিবে। প্রত্যেকটি ঘরের সর্বত্র পানি ছিটাইয়া দিবে। কোন জায়গায় বাদ পড়িলে তথায় দুষ্ট জ্বীন থাকিয়া গেলে আর বাহির হইতে পারিবে না। ভিতরে থাকিয়া ক্ষতি করিবে, এজন্য একটু জায়গাও বাদ রাখিবে না। বন্ধ শেষ হইল।

দুষ্ট জ্বীনেরা দলবদ্ধ হইয়া অনেক সময় এই বন্ধ নষ্ট করিয়া থাকে। উহা রক্ষার জন্য ঐ চারিজন হাফেয প্রত্যেকেই দায়েরার উপর দিয়া ডান দিকের কোণে পাতিলের কাছে দাঁড়াইয়া একবার সূরা-জ্বীন পড়িবে, এইরূপে প্রত্যেকেই একবার প্রদক্ষিণ করিবে এবং প্রত্যেক গর্তস্থ পাতিলের নিকট দাঁড়াইয়া একবার সূরা-জ্বীন পড়িবে। অতঃপর প্রত্যেক হাফেযের দ্বারা কিছুটা পানিতে দম করাইয়া ঐ পানি দায়েরার উপর ছিটাইবে। এখন আমেল বন্ধের ভিতর বসিয়া মনোযোগ সহকারে একবার "হেযবুল বাহার" পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিবে।

(از عبد القيوم الجنى جليس ابليس اولا و الجنى الصالح الزاهد ثانيا)

এই বন্ধ খোদা চাহে তো জ্বীনেরা সহজে ভাংগিতে পারিবে না, রোগীকে দীর্ঘদিন ইহার মধ্যে থাকিতে বাধ্য করিবে।

এই বন্ধের মধ্যে জ্বীন, চোর, ডাকাত ঢুকিতে পারিবে না। বাড়ীতে ঢিলা নিক্ষেপ করিলে ঢিলা হটিয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান থাকিবে যেন পাতিলের উপর কেহ পায়খানা না করে।

৪৭। জ্বীনেরা যদি এমন দায়েরা করিয়া থাকে যাহাতে রোগী আগুনের তাপ অনুভব করিতে থাকে, কোন কোন সময় ভীষণ শীতও অনুভব করিতে থাকে এবং অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তবে দুষ্টদের ঐ দায়েরা নষ্ট করিবার জন্য এবং রোগীকে হুঁশ করিবার নিম্নোক্ত তদ্‌বীর করিবে। ইহাতে দায়েরা নষ্ট হইবে এবং ঐ সমস্ত দুষ্টগুলিও মরিয়া যাইবে। মজার ব্যাপার এই যে, তাহারা সন্ধান পাইবে না কে তাহাদেরে মারিয়াছে?

(از عبد القيوم ثم الجنى نديم ابليس ثم الصالح الساكن فى تبت ثانيا)

৪৮। প্রথম রোগী যে ঘরে রহিয়াছে ঐ ঘর অনুযায়ী মাটি কিংবা কাগজের উপর একটি নক্সা অঙ্কন করিবে। অর্থাৎ, ঘরটি গোল হইলে নক্সাটিও গোল হইবে। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া ঐ নক্সার মধ্যে ফুঁক দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ۔ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ـ قَالُوْآ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

رَبِّ مُوْسٰى وَ هَارُوْنَ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ ১ বার

সম্পূর্ণ সূরা-জ্বীন ১ বার, সূরা-ইউনুস ১ বার, সূরা-ইয়াসিনের ১ম রুকূ ১ বার, আয়াতুল কুরছি ১ বার, শুধু يس শব্দ ৭ বার, শধু طه শব্দ ৭ বার, كهيعص ৭ বার ও শুধু حم ৭ বার।

৪৯। নিথর নির্জনে ভয়াবহ স্থানে কিংবা শত্রুদের ভিতর পড়িয়া গেলে নিম্নলিখিত আমল করিলে খোদা চাহে ত নিরাপদ থাকিবে। জ্বীন ও ইনসানের তথা সমস্ত সৃষ্ট জীবের চক্ষে অদৃশ্য থাকিবে।

প্রথমতঃ একটি লোহার দ্বারা তদভাবে ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি দ্বারা নিজেদের চতুর্দিকে একটি গোলাকার দায়েরা টানিবে, দায়েরা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আয়াতুল কুরছি আরম্ভ করিয়া উহা শেষ হইবার সময় পর্যন্ত আয়তুল কুরছি ৭ বার পড়িবে। অতঃপর ভিতর হইতে ৭টি ঢিলা তুলিয়া হাতে লইবে। প্রত্যেকটি ঢিলা তুলিবার সময় একবার فُقِحَ مَخَمَّتٌ পড়িবে। তারপর ঐ ঢিলাগুলি দায়েরার চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিবে এবং প্রত্যেক বারই فُقِحَ مَخَمَّتٌ পড়িবে। ইহার পর সঙ্গীগণের মুখ বাহিরের দিকে এবং পিছন ভিতর দিকে রাখিবে। আমেল كهيعص পড়িবে। ك পড়িতে ডান হতের কনিষ্ঠা ه পড়িতে অনামিক ى পড়িতে মধ্যমা ع পড়িতে শাহাদৎ এবং ص পড়িবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি পর পর বন্ধ করিয়া রাখিবে। حمعسق পড়িবে এবং ح পড়িতে বাম হাতের কনিষ্ঠা م পড়িতে অনামিকা ع পড়িতে মধ্যমা س পড়িতে শাহাদৎ এবং ق পড়িতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করিয়া মুষ্ঠি বন্ধ করিয়া লইবে। কেহই কথা বলিবে না, সবাই يا حفيظ পড়িতে পড়িতে রাত্রি প্রভাত করিবে। খোদা চাহে ত সমস্ত বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

জ্বীন ও ইনসানের যাদু

৫০। জ্বীন রোগীর উপর আছর করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই একটা যাদু করিয়া থাকে যাহার দরুন অনেক সময় আমেলের আমল কার্যকরী হইতে পারে না। উহা দূর করণার্থে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া পানি কিংবা শুক্না মাটিতে দম দিয়া রোগীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিবে, কিছুটা রোগীর গায়ে দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَ خْسَرِيْنَ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْئَانُ مَاۤءً حَتّٰى اِذَا جَاۤئَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ ـ وَ قُلْ جَاۤءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ـ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَ هَارُوْنَ ـ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ

قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَاۤ اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ অতঃপর بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاۤءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ

৫১। উক্ত আয়াতসমূহ নূতন মেটে পাতিলে স্রোতের পানিতে পড়িয়া যাদুগ্রস্ত রোগীকে ৭ দিন পর্যন্ত গোসল দিলে, গোসল দেওয়া সম্ভব না হইলে অন্ততঃ হাত-মুখ ধৌত করিয়া কিছুটা পান করিতে দিলে সমস্ত যাদু নষ্ট হইয়া যায়। ঐ পানি বাড়ী-ঘরের সর্বত্র ছিটাইয়া দিলে দাফন করা যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। সর্বপ্রকার যাদু নষ্ট করিতে উক্ত আয়াতসমূহ বিশেষ কার্যকরী।

৫২। ৫০ নং আয়াতসমূহ লিখিয়া চান্দির তাবীজে পুরিয়া রোগীর সঙ্গে রাখিলে যাদু আছর করিবে না।

৫৩। কাহারও বাড়ীতে যাদুর জিনিসপত্র পুতিয়া রাখিলে সূরা-শুআরা সম্পূর্ণ লিখিয়া একটা সাদা মোরগের গলায় বাঁধিয়া দিলে মোরগ যাদুর স্থানে গিয়া আওয়াজ দিবে কিংবা পায়ের দ্বারা ঐ স্থান খুঁড়িতে থাকিবে। তখন নিজেরা উহা উঠাইয়া ৫০ নং আয়াত পড়িয়া দম দিবে এবং পোড়াইয়া পানিতে ফেলিয়া দিবে। কিন্তু মোরগের গলায় ঐরূপ না দেওয়াই ভাল; বরং ৫১ নং তদ্‌বীর করিবে।

৫৪। দুষ্ট জ্বীনের যাদু নানা প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কোন পরওয়া করিবে না, আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিবে। যাদু খুব জোরে আছর করিলে, চাই সে যাদু মানুষেরই হউক আর জ্বীনেরই হউক ৫ বার اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ কাগজে লিখিয়া বাম হাতের বাজুতে বাঁধিয়া দিবে।

৫৫। মানুষ কিংবা জ্বীনের যাদুর আছরের দরুন রোগীর নাক-মুখ কিংবা পায়খানার সহিত রক্ত বাহির হইলে ৫০ নং আয়াতসমূহ পড়িয়া গোসল করাইয়া দিবে।

৫৬। যাদু নষ্ট করিতে নিম্নোক্ত তদ্‌বীর বড়ই উপকারী। ৭ দিনে খোদা চাহে ত নিরাময় হইয়া যাইবে। নিজেই ইহা বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। যাদু নষ্ট করিতে যখন অন্য কোন তদ্‌বীর কার্যকরী না হয়, তখন ইহা ব্যবহার করিলে সুফল হইবেই ইন্‌শাআল্লাহ্‌। জাফরান, কস্তুরী ও কেওড়ার পানি দ্বারা কালি প্রস্তুত করিয়া ৭ খানা চিনা বরতনে লিখিবে—

بسم الله الرحمن الرحيم ط سبحان الله ، سبحان الله و عظمة الله و برهان الله وصنع الله و بطش الله و كبرياء الله و جلال الله و كمال الله و من الله و لااله الا الله محمد رسول الله جليوس مليوس منطوس و ملتومانس النار و ما ذرنادرنا اخنوس برحمتك يا ارحم الراحمين ـ

প্রত্যহ একখানা প্লেট ধুইয়া পান করিবে। (ازبياض يعقوبى)

৫৭। অনেক সময় যাদুকর লোক স্বীয় যাদুর দ্বারা বন্ধের তাবীজ নষ্ট করিয়া ফেলিয়া থাকে। কিন্তু নিম্নরূপ একটি খালেছ চান্দি রূপার (মিনাদার) আংটি তৈরি করিয়া লইবে। শেষ রাত্রিতে (বৃহস্পতিবার দিবা গত রাত্রি হইলে ভাল হয়।) ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া আংটির মিনার উপর بسم الله الرحمن الرحيم ও اعوذ بالله من الشيطان الرجيم অস্ত্র দ্বারা অঙ্কন

করিয়া লিখিবে। মিনা ছোট হইলে অঙ্কে লিখিবে। শুধু ৭৮৬ লিখিলেও হয়। কিন্তু মিনা বড় করিয়া নিয়া অঙ্কে দুইটিই লিখিলে ভাল। অতঃপর ৭ বার সূরা-ইয়াছীন পড়িবে, প্রত্যেকবার সূরা শেষ করিয়া মিনার উপর ফুঁক দিবে। সূরা-ছাফ্‌ফাত ২ বার পড়িয়া প্রত্যেক বারই দম দিবে। افحسبتم আয়াত ৭ বার, আয়াতুল, কুরছি ১০ বার, প্রত্যেক বারই মিনার উপর দম দিবে। ভোরেই আংটি যে কোন রং দিয়া রঙ্গিন করিয়া লইবে। এই অঙ্গুরী হাতে থাকিতে মানুষ ও জ্বীনের কোন প্রকার যাদু চলিবে না। ইহা আমি বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। এই অঙ্গুরীটির থেকে যাদুর ভাল তদ্‌বীর আর নাই। অবশ্য অনুবাদকের থেকে ইহার এজাযত লইতে হইবে।

(از عبد الرحمن الجنى الصالح المتوفى باندمين)-

আমেলের কর্তব্য

৫৮। আমেল হওয়ার চেয়ে কামেল হওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ কামেল হওয়ার পর বিনা আমলেও জ্বীন নতি স্বীকার করিয়া চলিয়া যায়। খোদ ঐ কামেল বা তাহার পরিবার-পরিজনের প্রতি ক্ষতির আশঙ্কাও খুব কম থাকে। কিন্তু কামেল ছাড়াই আমেল হইলে বড়ই বিপদ। আমেলের নিজের ও পুত্র-পরিজনের প্রত্যেকের সংরক্ষণের জন্য বহু বেগ পাইতে হয়।

কামেল ছাহেবে নেছবতের কোনই অসুবিধার কারণ নাই। আমরা আমেলের জন্য এখানে কিছু উল্লেখ করিব যাহাতে আমেল পুত্র-পরিজনসহ নিরাপদ থাকিতে পারে।

প্রথমতঃ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতের পূর্ণ পাবন্দ হইতেই হইবে। হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, মাহ্‌রাম-গয়রে মাহ্‌রাম প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

টাকার লোভ এবং সম্মানের লোভকে পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে। একমাত্র আল্লাহ্‌র দুঃস্থ বান্দার উপকারার্থেই কাজ করিয়া যাইবে। যেদ বা ঈর্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কোন শায়খে কামেলের হাতে বায়আৎ হইয়া নিজের আত্মার উন্নতি করিতে হইবে।

নিয়মিত তাহাজ্জুদ, এশ্‌রাক্‌, আওয়াবীন পড়িতে হইবে এবং তাহাজ্জুদের পর ১২ তছবীহ্‌ যেকের জারি রাখিতে হইবে।

আওয়াবীনের পর "হেযবুল বাহ্‌র" পড়িতে হইবে। ইহার এজাযতও লইতে হইবে যে কোন হক্কানী আমেল বা কামেল বুযুর্গ হইতে।

ছেলে-মেয়ে স্ত্রী-পুত্র বাড়ীর সবাইকে ৪৫, ৪৬ ও ৩৫ নং তাবীজ লিখিয়া প্রত্যেককে ব্যবহার করিতে দিবে।

আমেল নিজের বাড়ী বন্ধ করিয়া দিবে। উহার নিয়ম ৪৯ নং দেখিয়া লইবে।

আমেল খুব সাহসী হইলে মোয়াক্কেল হাছিল করিতেও পারে। উহার দ্বারা বহু কঠিন কাজও সমাধা করা যাইতে পারে। কিন্তু বিপদসঙ্কুল হেতু না করাই ভাল। একান্ত কেহ তাছখীরের আমল করিতে ইচ্ছুক হইলে ৩ চিল্লা ১২০ দিন নির্জনে থাকিবে। মাছ, গোশ্‌ত, ঘি, মাখন, দুধ, দধি, লবণ ইত্যাদি খাইবে না, শুধু শাক-সব্‌জি (নেমক ছাড়া) যবের রুটির সহিত ভক্ষণ করিবে এবং ৩ চিল্লায় ১২৫০০০ (সোয়া লক্ষ) বার সূরা-জ্বীন পড়িবে। প্রত্যহ পড়া শুরু করিবার পূর্বে এবং পরে দুরূদ শরীফ পড়িবে। ইহার ছওয়াব হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর উপর বখ্‌শিবে। শেষ দিনের রাত্রে অতি সুন্দর ভাল পোশাকে একজন লোক আসিবেন। সালাম দিবেন এবং কোন্‌ কাজের জন্য তাঁহাকে ডাকা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে আমেল কোন কাজের ফরমায়েশ করিবে

না। কারণ কোন নির্দিষ্ট কাজ তাহাকে দিলে সে ঐ কাজ করিয়া চলিয়া যাইবে। সে তার অনুগত থাকিবে—তাঁহাকে বলিবে, তুমি হাযির থাকিবা।

আমলের ১২০ দিনের মধ্যে আমেল ভয়াবহ বহুকিছু দেখিতে পারে, কিন্তু ভীত হইলে আমল নষ্ট হইয়া যাইবে। কোন কাজই হইবে না। শেষ দিনও ভীত হইবে না, অতি সাহসের পরিচয় দিতে হইবে।

চিল্লাকাশী আরম্ভের পূর্বে আয়াতুল কুরছির গোল দায়েরা দিয়া তার মধ্যে বসিয়া আমল করা উচিত।

আমেল প্রত্যহ কমপক্ষে ১ পারা কোরআন শীরফ তেলাওয়াত এবং ১ মঞ্জিল মোনাজাত মকবুল অবশ্যই পড়িবে।

অবৈধ প্রণয় বিচ্ছেদ

একটি নূতন মেটে পাতিল ঢাকনির সহিত সামনে রাখিয়া পূর্ণ সূরা-ইয়াছীন পড়িবে এবং প্রত্যেক مبين পর্যন্ত পড়িয়া শরা উঠাইয়া একবার দম দিবে। অবৈধ প্রণয়কারীদের নাম লইবে। এরূপে পড়া শেষ হইলে ঐ পাতিলটি উহাদের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিবে। পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটিবে। মিলন ও বিচ্ছেদের আমল অনেক প্রকার। আমরা বিশেষ প্রয়োজনে এখানে মাত্র একটি আমল উল্লেখ করিলাম। কিন্তু না-জায়েয স্থানে কেহ ইহা ব্যবহার করিয়া নিজের আখেরাত নষ্ট করিবেন না।

٧٨٦

فصل	الكوثر	انا اعطينك
ان	وانحر	لربك
الابتر	هو	شانئك

٧٨٦

ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف

اللّٰهم خالف بين فلان ـــ بن فلانة ـــ بقهرك ياقهار ياجبار

হারানো বস্তু প্রাপ্তির জন্য

اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمِ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ بَيْنَ فُلَانٍ وَّ بَيْنَ مَتَاعِهٖ فلان شَىْءٍ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

পড়িয়া তালাশ করিলে উহা পাওয়া যাইবে।

চুরি

১। চুরি হইয়া গেলে অনতিবিলম্বে এক হাত লম্বা এক হাত চওড়া নূতন সাদা কাপড়ের উপর গোল দায়েরা দিয়া উহার ভিতর নিম্নরূপ লিখিবেঃ

অতঃপর একবার সূরা-ফাতেহা, একবার সূরা-ওয়াদ্দুহা পড়িয়া ফুঁক দিয়া এক কোণা বটিয়া আনিবে। এরূপ সাতবার করিয়া উহার মাঝখানে একটি লৌহ গাড়িয়া রাখিবে এবং ঐ কাপড় অন্ধকার স্থানে বাড়ীর বাহিরে রাখিয়া দিবে। খোদা চাহে ত চোর চুরির বস্তু নষ্ট বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না এবং শিঘ্রই উহা মালিকের হস্তগত হইবে।

২। একটি কদুর পুরাতন খোলের উপরিভাগে গোল দায়েরা দিয়া উহার ভিতরে গোলকভাবে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিবেঃ

قل اندعوا من دون الله ما لاينفعنا و لا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هوالهدى و امرنا لنسلم لرب العالمين ـ

এবং দায়েরার বাহিরে লিখেবে....... হারানো বস্তুর নাম এবং মালিকের নাম।

খোল লিখা শেষ হইলে সাদা পুরাতন কাপড় দ্বারা পেঁচাইয়া নির্জন বাগানে মাটির নীচে গাড়িয়া দিবে। খোদা চাহে ত মাল পাওয়া যাইবে। কিংবা চোরও ধরা পড়িবে। উক্ত তদ্‌বীরে চোর হয়রান এবং পেরেশান হইবে। কিন্তু উহার প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে হইতে থাকিবে।

৩। সূরা-ওয়াদ্দোহা গোল দায়েরা আকারে কাগজে লিখিয়া উপরে ঝুলাইয়া রাখিবে যেখান হইতে মাল চুরি গিয়াছে। নৌকা চুরিতে উহা বিশেষ উপকারী; কিন্তু বড় গাছে ঝুলাইয়া বাঁধিতে হয়।

৪। ঘুমাইবার সময় একবার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি মাথার চতুর্দিকে ঘুরাইবে এবং বাড়ীর চতুর্দিকের বন্ধের নিয়ত করিবে। খোদা চাহে ত চোর ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে না।

৫। চোর চুরি করিতেছে এমতাবস্থায় মালিক জাগিয়া ১০ বার—

يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَ رْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ـ

পড়িয়া দুই হাতে দস্তক দিলে চোর পলায়ন করিতে পারে না।

৬। এক টুকরা কাগজে নিম্নলিখিত ৭ নং তাবীজ লিখিয়া বালিশের গেলাফের মধ্যে রাখিয়া ঘুমাইলে স্বপ্নযোগে মাল ও চোরের সন্ধান লাভ করিবে।

৭। ভিস্তিদের ব্যবহৃত ভাল একটি মোশক লইয়া উহার ভিতর একবার আয়াতুল কুরছি এবং যথাক্রমে নিম্নলিখিত সাতজন নবীর নাম নিম্নরূপ লিখিবে।

نوح، لوط، صالح، ابراهيم، موسٰى و عيسٰى ومحمد صلى الله عليه و عليهم السلام ـ

অতঃপর একবার আয়তুল কুরছি পড়িয়া উল্লিখিত তরতীব অনুযায়ী একজন নবীর নাম লইবে এবং বলিবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ بِمَآ اَرْسَلْتَ هٰذَا النَّبِىَّ اَنْ تَنْفَخَ بَطْنَ هٰذَا السَّارِقِ كَمَا نَفَخْتَ هٰذِهِ الْقِرْبَةَ ـ

এবং মোশকের মুখে ফুঁক দিবে; এরূপ সাতবার শেষ হইলে পর মোশকের মুখ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ওদিকে চোরের পেটও ফুলিতে থাকিবে। চোর মালসহ হাজির হইতে বাধ্য।

পলাতক মানুষ হাজির করিবার তদ্‌বীর

প্রথমে সূরা-ফাতেহা তৎপর—

اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِىٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكَ فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ يَا بُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَ رْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَ رْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ اللهم يا هادى الضال و ياراد الضالة اردد على فلان بن فلانة ...... فلان بن فلانة ـ

কাগজে লিখিয়া পাক কাপড় দ্বারা আবৃত করিবে। দুইখানা পাটা বা পাথরের মাঝে রাখিয়া অন্ধকার স্থানে নির্জনে রাখিয়া দিবে। খোদা চাহে ত খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবে।

فلان স্থানে পলাতক ব্যক্তির নাম فلانة স্থানে তাহার মাতার নাম লিখিবে।

দৌলত মন্দ হইবার জন্য প্রত্যহ এশার নামায পড়িয়া ১১ বার দুরূদ পড়িবে। তারপর চৌদ্দবার يَا وَ هَّابُ পড়ত ১১ বার দুরূদ শরীফ পড়িয়া ১০০ বার নিম্নোক্ত দো'আ পড়িবেঃ

يَا وَهَّابُ هَبْ لِىْ مِنْ نِّعْمَةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ -

যাবতীয় বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রথম ১১ বার দুরূদ শরীফ অতঃপর ১১১১ বার يَا لَطِيْفُ পড়িবে তারপর ১১ বার দুরূদ পড়িয়া দো'আ করিবে।

॥ নবম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

দশম খণ্ড

এই খণ্ডে এমন সব বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা মনে-প্রাণে অনুসরণ করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইলে নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করা যায় এবং অপরকেও সুখ-শান্তি পৌঁছান অতি সহজ হয়। উপরোক্ত কথা কয়টি শুনিয়া আপাতঃ দুনিয়াদারী কথা বলিয়াই মনে হয়, এইগুলি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর হাদীসের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়, এইগুলি দ্বীন-ইসলামের অন্তর্নিহিত কথা বৈ আর কিছু নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ "খাঁটি মুসলমান ঐ ব্যক্তিই যাহার হাত বা জবানের দ্বারা অন্য কাহারো কষ্ট না হয়।" হাদীস শরীফে ইহাও বর্ণিত আছে যে, "কোন মুসলমানের পক্ষে ইচ্ছাকৃত-ভাবে কঠিন বিপদে লিপ্ত হইয়া অপদস্ত হওয়া উচিত নহে।" হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছেঃ "রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন ওয়াজ করিতেন তখন তিনি খুব লক্ষ্য রাখিতেন, শ্রোতাগণ যেন ত্যাক্ত-বিরক্ত হইয়া না পড়েন" উপরোক্ত হাদীস-এর মারফত ইহাই প্রমাণিত হইল যে, নিষ্প্রয়োজনে নিজে কষ্ট করা বা কাহারো সহিত বিরক্তিকর আচার-ব্যবহার করা ইসলামী শরীঅত বিরোধী। সুতরাং ইসলামী শরীঅতের অনুকূলে এই খণ্ডে এমন কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করা হইল—যাহার পুরাপুরি অনুসারী হইলে নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করা যায় এবং অপরকেও শান্তি বা আরাম পৌঁছান যায়। খালেছ নিয়তে এই সবের উপর বা-আমল হইতে পারিলে দুনো জাহানের কামিয়াবী হাছেল হয়।

□

প্রথম অধ্যায়

নিরাপদে থাকার কতিপয় নীতিকথা

১। রাত্রিকালে ঘরের দরওয়াজা জানালা বন্ধ করিবার পূর্বে ভালরূপে লক্ষ্য কর, ঘরের মধ্যে কোথায়ও কোন বিড়াল বা কুকুর লুকাইয়া রহিল কি না। কারণ, কুকুর বা বিড়াল না তাড়াইয়া দরওয়াজা বন্ধ করিলে জান ও মালের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। আর কোন ক্ষতি না করিলেও রাত্রিভর খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া ঘুমের ব্যাঘাত ঘটান কম ক্ষতি নহে।

২। কিতাব-পত্র এবং কাপড়-চোপড় মাঝে মাঝে রৌদ্র দিবে, নচেৎ পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

৩। ঘর-দরজা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ঘরের আসবাব-পত্র যথাযথ স্থানে গুটাইয়া সাজাইয়া রাখিবে, শৃঙ্খলার সহিত রাখিবে।

৪। স্বাস্থ্য রক্ষার্থে দৈনন্দিন কিছু শারীরিক পরিশ্রম করা দরকার। বেশী আরাম প্রিয় হইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা। এই জন্য মেয়েদের পক্ষে অন্ততঃ যাঁতায় ডাল ভাংগা অথবা আটা পিষা, ঢেঁকিতে ধান ভানা বা কালেহে কোন দ্রব্য কুটা এবং চরখায় সূতা কাটা ইত্যাদি অতি উত্তম ব্যায়ামের ও লাভের কাজ ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

৫। কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বিনা অনুমতিতে ঘরে বা কামরায় ঢুকিও না এবং সাক্ষাৎ করিতে বেশীক্ষণ বিলম্ব করিও না বা কথা বলিও না, যদ্দ্বারা তাহার বিরক্তি বা কাজের ক্ষতি হয়।

৬। ব্যবহারিক আসবাব-পত্র যথাস্থানে রাখার ব্যাপারে ঘরের সকলেরই উচিত শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রত্যেক বস্তু এইরূপ নির্দিষ্ট স্থানে রাখিও যেন কাজের সময় তালাশ করিতে না হয়। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট বস্তু না রাখিলে অনেক সময় অযথা হয়রান হইতে হয়। অতএব, তোমার নিজস্ব বস্তুও শৃঙ্খলা মত রাখ, প্রয়োজন মত হাত বাড়াইলেই যেন পাওয়া যায়।

৭। চৌকি,পীড়ি, লাঠি, দা, খন্তা, কাচি, বদনা, বাসন, কলস, ইট-পাথর প্রভৃতি রাস্তার উপর ছড়াইয়া রাখিও না। অনেক সময় অন্ধকারে বা কোন সময় দিনের বেলায়ও চলার সময় হোঁচট খাইয়া যখম হইতে পারে এবং বে-জায়গায় চোট লাগিতে পারে।

৮। তোমাকে যদি কেহ কোন কাজের আদেশ করে, তবে তাহা শুনা মাত্রই তুমি জ্বি-হাঁ বা জ্বি-না বা আচ্ছা ইত্যাদি যে কোন একটি হাঁ-সূচক বা না-সূচক শব্দ বলিয়া প্রতি-উত্তর দিও। অন্যথায় কাজের আদেশ দাতার মনে অশান্তি থাকিয়া যাইবে যে, তুমি হয়ত শুনিয়াছ এবং কাজ করিবে। অথচ তুমি হয়ত শুন নাই বা শুনিয়াছ কিন্তু কাজ করার ইচ্ছা নাই। এমতাবস্থায় আদেশদাতা অনর্থক তোমার আশায় অপেক্ষা করিয়া কষ্ট পাইতে থাকিবে। ইহা বড়ই অভদ্রতার কথা।

৯। খাদ্যদ্রব্যে নিমক সর্বদা পরিমাণের চেয়ে সামান্য কম দিও। কেননা, কম হইলে উহার প্রতিকার অত্যন্ত সহজ, কিন্তু নিমক বেশী হইলে উহার প্রতিকার অসম্ভব।

১০। শাক, তরকারী বা ডাইলের মধ্যে মরিচ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দিও না বরং পিষিয়া দিও। কেননা, শিশুদের মুখে মরিচের টুক্‌রা লাগিলে আগুন ধরার মত যন্ত্রণা বোধ করিবে।

১১। অন্ধকারে পানি পান করিতে হইলে হয় ত বাতি জ্বালাইয়া নিও, না হয় এক খন্ড কাপড় পানির পাত্রের মুখে রাখিয়া পান করিও। কেননা, কোন বিষাক্ত পোকা-মাকড় পানির মধ্যে থাকিতে পারে।

১২। শিশুদিগকে অধিক হাসাইবার জন্য আদর করার ছলে উপরের দিকে নিক্ষেপ করিয়া খেলিও না, কিংবা জানালার মধ্যে দিয়া লটকাইয়া ধরিও না, হয়ত পড়িয়া গিয়া হাসির স্থলে ফাঁসী হইয়া যাইতে পারে। তদ্রূপ শিশুদের পেছনে থাকিয়া হাসাইয়া হাসাইয়া দৌড়াইও না, হয়ত পড়িয়া গিয়া হাত-পা ভাংগিতে পারে।

১৩। বরতন খালি হইলে উহা ধুইয়া উল্টা করিয়া রাখিও। পুনরায় ব্যবহার করিবার সময় আবার ধুইয়া ব্যবহার করিও।

১৪। বরতন মাটিতে রাখিয়া খানা বাড়িলে উহার নীচের দিকটা তোয়ালে বা নেকড়া ইত্যাদি দ্বারা মুছিয়া দিও, অন্যথায় দস্তরখানায় মাটি লাগিয়া দস্তরখানায় বা বিছানায় দাগ লাগিতে পারে।

১৫। কাহারো বাড়ীতে মেহমান হইয়া তুমি বাড়ীর মালিককে (মেজবানকে) কোন খাবার ফরমায়েশ দিও না। হয়ত সাধারণ বস্তুরই ফরমায়েশ দিয়াছ, কিন্তু উহা জোটাইতে না পারিলে অথবা সময় মত তৈয়ার করিয়া দিতে না পারিলে বাড়ীওয়ালা মনে কষ্ট পাইবে এবং লজ্জিত হইবে।

১৬। যে স্থানে তুমি ছাড়াও অন্য লোক বসা আছে, তথায় বসিয়া থুথু ফেলিও না বা নাক ঝাড়িও না ; বরং প্রয়োজন মত এক পার্শ্বে গিয়া হাজত পুরা করিয়া আস। কেননা, লোকের মধ্যে বসিয়া থুথু ফেলিলে ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। ইহা বড়ই বদ-অভ্যাস।

১৭। খাইতে বসিয়া এমন কোন বস্তুর নাম উল্লেখ করিও না যাহা শুনিয়া অপরের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাজুক তবিয়তের লোকের ইহাতে বড় কষ্ট হইয়া থাকে।

১৮। রোগীর নিকট বসিয়া বা রোগীর কোন আত্মীয়ের নিকট বা রোগীর বাড়ীর লোকের নিকট এমন কোন কথা বলিও না যাহাতে রোগীর জীবনে হতাশা আসিতে পারে। হতাশা-ব্যঞ্জক কথা বলিলে অনর্থক মন ভাংগিয়া পড়িতে পারে। সতুরাং রোগীর যাহাতে মনোবল ভাংগিয়া না পড়ে সেরূপ কথাই বলিবে। যেমন, "খোদার ফজলে ভাল হইয়া যাইবে, ভয়ের কোন কারণ নাই" ইত্যাদি।

১৯। কাহারো সম্বন্ধে কোন গোপনীয় কথা বলিতে হইলে এবং যাহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, সে তথায় উপস্থিত থাকিলে চোখে কিংবা হাতে তাহার দিকে ইশারা করিও না, কেননা ইহাতে অনর্থক তাহার মনে সন্দেহ হইতে পারে। ইহা তখনকার কথা, যখন সেই গোপনীয় বিষয়ের কথা বলা শরীতঅত মত দুরুস্ত হয়। কিন্তু যদি শরীঅত মত দুরুস্ত না হয়, তবে তেমন আলাপ করাই গোনাহের কাজ।

২০। কথা বলার সময় অধিক হাত নাচাইও না।

২১। কাপড়ের আঁচল বা জামার আস্তিন দ্বারা নাক মুছিও না।

২২। জুতা, কাপড় ও বিছানা ইত্যাদি ঝাড়িয়া মুছিয়া ব্যবহার করিও। কেননা উহার মধ্যে বিষাক্ত পোকা-মাকড় থাকিতে পারে।

২৩। কাহারো কাপড়ের নীচে গুপ্ত স্থানে ফোঁড়া, বাঘী হইলে তুমি এত তলাইয়া জিজ্ঞাসা করিও না যে, "কোথায় ফোঁড়া হইয়াছে" ইহাতে অনর্থক তাহাকে লজ্জা দেওয়া হয়।

২৪। রাস্তার উপর বা দরওয়াজার উপর বসিও না, তোমার এবং যাতায়াতকারী সকলেরই অসুবিধা হইতে পারে।

২৫। শরীরে এবং কাপড়ে দুর্গন্ধ হইতে দিও না। কাপড় যদি অতিরিক্ত ধোয়া না থাকে, তবে নিজের পরিহিত কাপড়ই ধুইয়া লও।

২৬। কোন স্থানে লোক বসাবস্থায় ঝাড়ু দিও না।

২৭। ফলের খোসা বা বীচি অন্য লোকের উপর দিয়া নিক্ষেপ করিও না এবং যেখানে সেখানেও ফেলিও না ; বরং নির্দিষ্ট এক স্থানে ফেলিও। উহাতে সবুজ সার পয়দা হয়।

২৮। চাকু, কেঁচি, সূচ ইত্যাদি ধারাল বস্তুর দ্বারা খেলিও না। কারণ অসাবধানতাবশতঃ কোথায়ও লাগিয়া যাইতে পারে।

২৯। তোমার বাড়ীতে কোন মেহমান আসিলে প্রথমে তাহাকে পেশাব পায়খানার স্থান জ্ঞাত করাইয়া দিও। অতঃপর মেহমান নৌকায় বা গাড়ীতে আসিলে মজুরী দিয়া নৌকা বা গাড়ীকে

বিদায় কর। কেননা ইহাই ভদ্রতার উত্তম নিদর্শন। আর যদি ঘোড়ায় চড়িয়া বা নিজ গাড়ীতে আসিয়া থাকে, তবে তাঁহার ঘোড়া অথবা গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করিও। মেহমানকে খাওয়াইতে গিয়া সামর্থ্যের বাহিরে বৃথা আড়ম্বর করিও না। কেননা, বৃথা আড়ম্বরে যথাসময়ে খানা দেওয়া যায় না। খানা যদি সাধারণও হয়, তবু যথাসময়ে খাইতে দাও। মেহমান বিদায় হইতে চাহিলে তাড়াতাড়ি নাশ্‌তার ব্যবস্থা করিয়া যথাসময়ে বিদায় দাও। মোটকথা, মেহমানের আরাম ও সুবিধার ব্যাঘাত যাহাতে না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

৩০। পায়খানা অথবা গোসলখানা হইতে বাহির হইবার পূর্বেই পায়জামার ফিতা আটকাইয়া বাহিরে আসিও। ফিতা ধরিয়া বা আটকাইতে আটকাইতে বাহিরে আসিও না, ইহা বড়ই অভদ্রতা ও দৃষ্টিকটু।

৩১। তোমার নিকট কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে তাহার উত্তর দিয়া পরে নিজ কাজে লিপ্ত হও, নতুবা জিজ্ঞাসাকারীর অবমাননা করা ও মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

৩২। কথা বলিবার সময় বা কাহারো কথার উত্তর দিবার সময় পূর্ণরূপে স্পষ্টস্বরে কথা বলিবে, যেন প্রশ্নকারীর বুঝিতে কষ্ট না হয়।

৩৩। কাহারো হাতে কোন বস্তু দিতে হইলে দূর হইতে নিক্ষেপ করিয়া দিও না, বরং নিকটে পৌঁছিয়া হাতে তুলিয়া দাও। নিক্ষেপ করিয়া দেওয়ায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়, পড়িয়া গিয়া ক্ষতিও হইতে পারে।

৩৪। যদি দুই ব্যক্তি কোন কথা বলা বা লেখাপড়ার কাজে লিপ্ত থাকে, তবে তুমি তাহাদের মধ্যে আসিয়া কোন একজনের সহিত কথা বলিতে বা চেঁচাইতে আরম্ভ করিও না; হাঁ, অনুমতি লইয়া প্রয়োজনীয় কথা বলায় কোন দোষ নাই।

৩৫। যে ব্যক্তির সহিত তোমার কথা বলার প্রয়োজন, সে যদি কোন কাজে বা কথায় লিপ্ত থাকে, তবে তুমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া অমনি তোমার বক্তব্য আরম্ভ করিও না; বরং সুযোগের অপেক্ষা করিয়া অনুমতি লইয়া কথা বল।

৩৬। কোন বস্তু অপর ব্যক্তির হাতে দিতে হইলে সে মজবুত করিয়া না ধরিতে ছাড়িয়া দিও না, অনেক সময়ে বেখেয়ালে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

৩৭। কাহাকেও পাংখা করিতে বা মাথায় ছাতা ধরিতে হইলে খুব সাবধানে পাংখা করিবে এবং ছাতা ধরিবে, যেন তাহার শরীরে না লাগে। পাংখা করার পূর্বে উহা ঝাড়িয়া মুছিয়া নিও। এত জোরে বাতাস করিও না যাহাতে অপরের অসুবিধা হয়।

৩৮। খানা খাইবার সময় হাড্ডি, কাঁটা এদিক-সেদিক নিক্ষেপ করিও না, দস্তরখানার উপর অথবা কোন পাত্রে একত্র করিয়া রাখিয়া বিড়াল কুকুরকে দিও; কেননা, তাহাদেরও হক আছে। তদ্রূপ তরকারীর খোসা বা বীচি যেখানে সেখানে ফেলিও না। উহা নির্দিষ্ট স্থানে ফেল যেন আবর্জনা হইতে না পারে।

৩৯। দ্রুত দৌড়াইয়া অথবা ঊর্ধ্বমুখে পথ চলিও না। ইহাতে পড়িয়া গিয়া অংগহানি হইতে পারে।

৪০। বই কেতাব বন্ধ করার সময় খুব সাবধানে বন্ধ করিও যেন প্রথম বা শেষ ভাগের পাতা মুড়িয়া না যায়।

৪১। নিজ স্বামীর নিকট বেগানা পুরুষের প্রশংসা করিও না; কেননা, কোন কোন পুরুষের মেজাজে ইহা বরদাশত হয় না।

৪২। তদ্রূপ কোন বেগানা স্ত্রীলোকের রূপ-গুণের প্রশংসা তোমার স্বামীর নিকট করিও না; হয়ত তোমার স্বামীর মন ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হইতে পারে এবং তোমার উপর হইতে মন উঠিয়া যাইতে পারে।

৪৩। যে লোকের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতা নাই, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার বাড়ী-ঘর, পোশাক, অলংকার ধন-দৌলত ইত্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিও না।

৪৪। ঘর-দরজা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মাসিক তিন দিন বা চার দিন নির্ধারিত করিয়া ঘরের ঝুল ধুলা-বালু, আবর্জনা পরিষ্কার করিও এবং বিছানাপত্র ঝাড়িয়া মুছিয়া যথাস্থানে পরিপাটি করিয়া রাখিও।

৪৫। কাহারো সম্মুখস্থ ডেস্ক অথবা টেবিলের উপর হইতে কোন পুস্তক অথবা কাগজ উঠাইয়া দেখা নিষেধ। কেননা, কাগজে হয়ত কোন গোপনীয় কিছু লিখা থাকিতে পারে। তদ্রূপ পুস্তকের মধ্যে ঐ ধরনের কাগজ ইত্যাদিও থাকিতে পারে। অতএব, বিনা অনুমতিতে কোন বই বা কাগজ স্পর্শ করিলে মালিকের মনে কষ্ট হওয়ার কারণ হইতে পারে।

৪৬। সিঁড়ির উপর দিয়া উঠানামা করিতে হইলে খুব সাবধানে এক পা এক পা করিয়া উঠানামা করিবে। মেয়েদের পক্ষে ত প্রতি কদমে এক সিঁড়ির বেশী অতিক্রম করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে; তদ্রূপ ছেলেপেলেদিগকেও সিঁড়িতে উঠানামার বিষয় খুব সতর্ক করিয়া দিও।

৪৭। যে স্থানে অন্য লোক বসা আছে তথায় কোন কাপড় ঝট্‌কান বা পুস্তক ঝাড়া দেওয়া বা ধুলা বালি ফুঁক দিয়া পরিষ্কার করা অনুচিত; কেননা, ইহাতে অপরের কষ্ট হইবে; ইহা বড়ই বদ-অভ্যাস।

৪৮। কাহারো রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্টের সংবাদ নির্ভরযোগ্য সূত্রে না জানিয়া অপরের নিকট বলিও না। বিশেষ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের নিকট মোটেই বলা উচিত নহে। কেননা, যদি ভুল সংবাদ প্রচার করিয়া থাক, তাহা হইলে উক্ত লোকের আত্মীয়-স্বজনেরা অনর্থক পেরেশান হইবে এবং তোমাকে তিরস্কার করিবে যে, "এই অশুভ সংবাদ কোন্ বদ-বখত প্রচার করিল।"

৪৯। তদ্রূপ সামান্য অসুখের বা সাধারণ কষ্টের সংবাদ প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনকে চিঠিপত্রে জানান উচিত নহে।

৫০। কফ, থুথু, পানের পিক ইত্যাদি দেয়ালে, বেড়ায় বা কপাটের উপর ফেলিও না। তৈলাক্ত হাত বেড়ায় বা কপাটে মুছিও না বরং সাবান দ্বারা না হয় মাটি মাখিয়া ধুইয়া ফেল।

৫১। খাওয়ার মজলিসে তরকারীর প্রয়োজন হইলে মেহমানের সম্মুখ হইতে পেয়ালা বা বাটী উঠাইয়া নিও না; বরং অন্য পেয়ালায় করিয়া তরকারী আনিয়া দাও।

৫২। কেহ চৌকিতে শোয়া বা পিঁড়িতে বসা থাকিলে তাহার নিকট দিয়া যাতায়াত করার সময় চৌকিতে বা পিঁড়িতে যেন ধাক্কা না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিও।

৫৩। চৌকির উপর দিয়া তাকের উপর হইতে কোন দ্রব্য নামাইতে বা উঠাইতে হইলে খুব সাবধানে উঠাইবে নামাইবে যেন শায়িত ব্যক্তির আরামের কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

৫৪। খানা-পিনার কোন দ্রব্য খোলা রাখিও না। এমনকি মেহমানের সম্মুখস্থ ঐ সকল খাদ্যও খোলা রাখিও না যাহা একটু পরে খাওয়া হইবে।

৫৫। মেহমানের উচিত যে, পেট ভরিয়া গেলে সামান্য ভাত তরকারী যেন বাঁচাইয়া রাখে, নতুবা বাড়ীওয়ালা মনে করিতে পারে যে, মেহমানের খানা কম হইয়াছে। ইহাতে মেজবান (বাড়ীওয়ালা) বড় লজ্জা অনুভব করে।

৫৬। যে সকল থালা-বাসন, হাড়ি-পাতিল একেবার শূন্য হইয়াছে, উহা আলমারি বা তাকের উপর উপুড় করিয়া রাখিও।

৫৭। হাঁটা চলার সময় পা একটু উঠাইয়া উঠাইয়া কদম ফেলিও, হেঁচড়াইয়া হেঁচড়াইয়া চলিও না; ইহাতে জুতা অতি তাড়াতাড়ি ক্ষয় পায় এবং দেখিতেও দৃষ্টিকটু লাগে।

৫৮। চাদর, শাড়ী, ওড়না ইত্যাদি নেতড়াইয়া নেতড়াইয়া চলিও না।

৫৯। কেহ যদি নিমক বা অন্য কোন সামান্য বস্তু চায়, তবে তাহা হাতে করিয়া আনিও না; বরং কোন বরতনে করিয়া দাও। কেননা, হাতে হাতে দেওয়া অভদ্রতা।

৬০। মেয়েদের সম্মুখে কোন প্রকার বে-হায়ায়ী বা অশ্লীল কথা বলিও না; ইহাতে মেয়েদের হায়া-শরম লোপ পাইতে থাকে।

কতিপয় শালীনতাহীন ও ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস— যাহা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট হয়

১। মেয়েদের একটি বদ অভ্যাস এই যে, তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার যুক্তিপূর্ণ কোন উত্তর দেয় না; বরং অযথা বাগাড়ম্বর করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বাজে কথা মিলাইয়া দেয়। শেষে আসল কথা ঠিক মত বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্নকর্তা নিশ্চিত হইতে পারে না, এইরূপ করা ঠিক নহে। মনে রাখিও, তোমাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উহা ভাল মত বুঝিয়া প্রয়োজন মত উত্তর দাও।

২। মেয়েলোকদিগকে যদি কোন কাজের হুকুম করে, তবে একদম চুপ করিয়া থাকে। কোন উত্তর না দেওয়ার কারণে হুকুমদাতার মনে সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, আল্লাহ্ই জানেন শুনিল কি না? শেষ পর্যন্ত মনে একটা অশান্তি থাকিয়া যায়। আর মনে ভাবে যে, হয়ত শুনিয়াছে এবং কাজটি করিবে। কিন্তু আসলে সে শুনেই নাই; উহার ভরসায় থাকিয়া আর কাজ হয় না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, "আমি শুনি নাই।" কাজের আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রতি উত্তর না দেওয়ায়, শুনে নাই মনে করিয়া হুকুমদাতা পুনরায় তাগিদ করিলে আর রক্ষা নাই, অমনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া বলে যে, "শুন্ছি, শুন্ছি! এত মাথা খাইতেছ কেন?" অথচ পূর্বেই একবার হুকুম শোনার পরই যদি উত্তর করিত যেঃ "হাঁ শুনিয়াছি, কাজ করিতে যাই।" তাহা হইলে আর আপোষে এমন মনোমালিন্য হইত না।

৩। কখনও গৃহকর্তীগণ অধীনস্থ চাকর-চাকরাণীকে কাজের আদেশ করিবার সময় বা ঘরের অন্য কাহারো সহিত কথা বলিবার সময় দূর হইতে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া কথা বলিতে থাকে। উহাতে বে-পর্দা ও বে-হায়ায়ীর নগ্ন প্রকাশ ঘটে। কেননা, দূর হইতে চিল্লাইয়া বলার কারণে সব কথা ভালরূপে বুঝা যায় না, যাহার ফলে কিছু কাজ বাকী থাকিয়া যায় এবং কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া গেলে গৃহকর্তী ক্ষিপ্ত হইয়া অধীনস্থদিগকে তিরস্কার করিতে থাকে। চাকরগণ ধমক খাইয়া উত্তর

করিয়া থাকে যে, হুকুমটা পুরাপুরি বুঝে আসে নাই বা শুনিতে পাই নাই। এইরূপে ধমক বা বাক্-বিতণ্ডায় অনেক সময় ব্যয় হয় এবং কাজের ক্ষতি হয়। তদ্রূপ চাকর বা কর্মচারীগণও বাহির হইতে কোন কথার উত্তর আনিয়া দূর হইতে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া বলিতে বলিতে দরজা পর্যন্ত আসে। ইহাতেও কিছু কথা বুঝা যায় আবার কিছু বুঝা যায় না। অতএব, আদব তমীযের কথা হইল এই যে, যাহার সহিত কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহার নিকট উপস্থিত হও, না হয় তাহাকে ডাকিয়া নিকটে উপস্থিত কর। অতঃপর তাহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া বল এবং নিজেও বুঝিয়া শুনিয়া রাখ।

৪। একটি আয়েব এই যে, মেয়েরা হাতে পয়সা থাকুক বা না থাকুক কোন বস্তু পছন্দ হইলেই নিষ্প্রয়োজনেও খরিদ করিয়া লয়। কর্জ করিয়া হইলেও লয়, কোন পরওয়া করে না। আর যদি কর্জ নাও করিতে হয়, তবু নিজ পয়সা অপ্রয়োজনে খরচ করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নহে; বরং অযথা অর্থ ব্যয় করা গোনাহ্‌র কাজ। সুতরাং খরচ করার পূর্বেই খুব চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, এই স্থানে খরচ করায় দ্বীনের কোন ফায়দা বা দুনিয়ার প্রয়োজন আছে কিনা? যদি কোন ফায়দা মনে কর, তবে খরচ করিও। যতদূর সম্ভব কখনো কর্জ করিও না। যদি কিছু কষ্ট হয় হউক।

৫। একটি আয়েব এই যে, দেশেই হউক বা বিদেশে কোথায়ও বেড়াইতে যাইতে হইলে অযথা ঘুরাঘুরি করিয়া বিলম্ব করিয়া ফেলে। শেষে গন্তব্য স্থানে অমসয়ে এবং দুর্যোগ পোহাইয়া পৌঁছিতে হয়। কখনও অসময়ে রাস্তা-ঘাটে চলিতে জান-মালের সংশয় উপস্থিত হয়। গরমের দিনে গড়িমসি করিয়া বিলম্বে রওয়ানা হওয়ার কারণে রৌদ্রের মধ্যে ছেলেপেলে নিয়া কষ্ট পাইতে হয়। তদ্রূপ বর্ষার দিনে যথাসময়ে রওয়ানা না হওয়ায় ঝড়-বৃষ্টিতে পায়, ফলে রাস্তা-ঘাট কর্দমাক্ত হইয়া গাড়ী-ঘোড়ায় চলার অসুবিধা হইয়া পড়ে। মোটকথা, বিলম্বে রওয়ানা হওয়ায় বহুমুখী বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। অতএব, যেখানেই যাইতে হয় সময় থাকিতে রওয়ানা হইলে সকল দিক দিয়াই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে।

যদি নিজ এলাকায় বা শহরেই কোন মহল্লায় যানে আরোহণ করিয়া যাইতে হয়, তবু অযথা ঘুরাঘুরি করিয়া সময় নষ্ট করিবে না। কারণ উহাতে বেহারাদের বা গাড়ীওয়ালাদের অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইতে হয়। অবশেষে ভাড়া নিয়া বাক্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। ওদিকে দেড়িতে রওয়ানা হওয়ায় বিলম্বে ফিরিতে হয়। নিজ কাজে ও খাওয়াদাওয়ার এন্তেজামে বিলম্ব হয়। কখনও বা তাড়াহুড়ার কারণে খানা নষ্ট হইয়া যায়। গৃহস্বামী খানার তাগিদে থাকেন, শিশুরা খানার জন্য কাঁদিতে থাকে, ইত্যাদি অসংখ্য ঝামেলার সৃষ্টি হয়। তাই যদি বিলম্ব না করিয়া যথা সময়ে রওয়ানা হয়, তবে আর উল্লিখিত অসুবিধাসমূহের সৃষ্টি হয় না।

৬। একটি আয়েব এই যে, সফরে বা প্রবাসে যাইবার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামানপত্র লইয়া বিরাট বোঝার সৃষ্টি করিয়া থাকে। যাহা বহন করিতে সঙ্গী পুরুষদের নানারূপ কষ্ট হইয়া থাকে। বসিতে স্থান হয় না, সওয়ারীর কষ্ট হয়, রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করিতে হয়, কখনও সঙ্গী পুরুষদেরই পিঠে বহন করিয়া নিতে হয়, অথবা কুলীর অতিরিক্ত মজুরি দিতে হয়। শেষ কথা, সকল বিপদ পুরুষদের মাথায় পড়ে, আর মেয়েরা দিব্যি আরামে ভিতরে বসে থাকে। অতএব, সফরের সময় আসবাব-পত্র খুব সংক্ষিপ্ত লইবে। বিশেষতঃ রেলে ভ্রমণের সময় অধিক সামান হইলে বেশী কষ্ট পাওয়ার কথা।

৭। একটি আয়েব এই যে, নৌকায় অথবা গাড়ীতে সওয়ার হওয়ার সময় বে-গানা পুরুষ-দিগকে একদিকে সরিয়া যাইতে বলে, না হয় চোখ ঢাকিয়া থাকিতে বলে। এদিকে ইহারা নৌকায় বা গাড়ীতে সওয়ার হইয়া পর্দা করিয়া পুনঃ আর বলেন না যে, "এখন আমাদের পর্দা হইয়াছে।" অতএব, আর চোখ ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। কোন কথা না বলার কারণে বেচারা বে-গানা পুরুষরা দূরে সরিয়া বা চোখ ঢাকিয়া অপেক্ষা করিয়া কষ্ট পাইতে থাকে। আবার অনেক্ষণ দেরী দেখিয়া, কখন পর্দা হইয়াছে মনে করিয়া নিকটে আসিয়া পড়ে বা চোখ খুলিয়া বসে অথচ এখন পর্যন্ত পর্দা করা হয় নাই বা একটু দেরী আছে। অতএব, পুনরায় কথা না বলার কারণে বে-পর্দা হইয়া সকলকে গোনাহ্গার হইতে হয়। বে-গানা পুরুষদের যদি জানা থাকে যে, মহিলারা পর্দা করিয়া আওয়াজ দিবে, তবে তো আর তাহারা অনুমতি ছাড়া সম্মুখে আসিত না বা পর্দার ব্যাঘাত হইত না বরং অপেক্ষা করিত। প্রথমবারে পর্দার হুকুম করিয়া পুরুষদের হুঁশিয়ার করাইয়া নিজেরা পর্দা করিয়া ২য় বার কথা না বলার দরুন উল্লিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

৮। একটি আয়েব এই যে, যাহার বাড়ী বেড়াইতে যায়, সওয়ারী বা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে সোজাসুজি তার ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। কখনও এমন হয় যে, সেই বাড়ীর পুরুষ লোক ঘরের মধ্যে অবস্থিত থাকে আর মেয়েরা তার সামনে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বে-পর্দা হইয়া যায়, ইহা বড়ই অন্যায় কথা। তোমার উচিত গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া তুমি যার ঘরে যাইবে প্রথমতঃ সেখানে খবর পৌঁছাইবে। অতঃপর অনুমতি পাইয়া গাড়ী বা সওয়ারী হইতে নামিয়া ঘরে যাইবে।

৯। একটি আয়েব এই যে, গাড়ীতে বা নৌকায় সওয়ার হইবার নিমিত্ত বিলম্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক আগেই রাস্তায় পর্দা করাইয়া দেয়; যদ্দরুন অপরাপর লোকগণের যাতায়াতে কষ্ট হইতে থাকে। আর এদিকে মেয়েরা রওয়ানা হইবার জন্য ঘোরাফেরায় থাকে।

১০। একটি আয়েব এই যে, আপোষে দুইজন মেয়েলোক কথা বলার সময় একজনের কথা বলা শেষ না হইতেই অপরজন কথা বলিতে আরম্ভ করে, আবার কোন সময়ে দুইজন একত্রেই বলিতে আরম্ভ করে। শেষে কেহ কাহারও কোন কথা বুঝে না। অতএব, এইরূপ কথা বলায় কোন ফায়দা নাই। কাজেই একজনের কথা শেষ হইলে তারপর তুমি বলিও।

১১। একটি আয়েব এই যে, অসাবধানে টাকা-পয়সা বা গহনাদি বালিশের নীচে অথবা তাকের উপর খোলা অবস্থায় ফেলিয়া রাখে। তালা-চাবি থাকা সত্ত্বেও অলসতার কারণে হেফাযত করিয়া রাখে না; অবশেষে কোন বস্তু হারাইয়া গেলে ঘরের নিরপরাধ লোকদের নামেও দোষারোপ করিতে থাকে।

১২। একটি আয়েব এই যে, কোন বস্তু হারাইয়া গেলে তাহ্কীক করিয়া না দেখিয়াই কাহারও উপর দোষারোপ করিয়া বসে। যেমন কেহত কোন এক সময়ে চুরি করিয়াছিল। তাহার নামেই সোজাসুজি বলিয়া ফেলে যে, তাহারই কাজ, সেই নিয়াছে। অথচ সমস্ত অন্যায়ই যে একজনে করিয়া থাকে, ইহা কোন স্বতঃসিদ্ধ নহে। এইরূপ অন্যান্য নোকছানের বেলায়ও সাধারণ সন্দেহের কারণে কাহারো নামে সাজাইয়া গড়াইয়া এমন ঘটনা তৈরি করিয়া দেয় যে, তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস হইয়া যায়।

১৩। একটি আয়েব এই যে, এদের কাহাকেও কোন কাজের হুকুম দিলে কাজ করিতে যাইয়া উহার সহিত আরও দুই একটা কাজ জড়াইয়া সব একত্র করা আরম্ভ করিয়া দেয়। অবশেষে কাজ সমাধা করিয়া অতি বিলম্বে উপস্থিত হয়। ইহাতে হুকুমদাতার মনে অশান্তি ও অস্থিরতা আসে।

কেননা, সে মাত্র একটি কাজের জন্য পাঠাইয়াছে। বিলম্বে তাহার অস্থিরতা আসা স্বাভাবিক। এইদিকে এই বুদ্ধিমতী বিলম্বে উপস্থিত হইয়া বলে যেঃ "নাও, দুইটা কাজ সমাধা করিয়া আসিয়াছি।" এইরূপ কখনও করিও না। প্রথমে যে কাজের আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা সমাধা করিয়া পরে অবসর মত নিজ কাজে লিপ্ত হইও।

১৪। একটি আয়েব এই যে, অলসতার কারণে যখনকার কাজ তখন করে না; বরং অন্য সময়ের জন্য ফেলিয়া রাখে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে কাজ পড়িয়া থাকে এবং নোকছান হইয়া থাকে।

১৫। একটি আয়েব এই যে, কর্মতৎপরতা ও দূরদর্শিতা নাই। প্রয়োজন ও সুযোগের দিকে লক্ষ্য করে না যে, জলদির সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে ঝট্‌পট্‌ কাজ সমাধা করে নিবে; বরং সব সময়ই একটানা মন্থরগতি ও টালবাহানা করিয়া থাকে। ইহাতে অধিক ক্ষেত্রে সুযোগ নষ্ট হইবার কারণে আসল কাজ পণ্ড হইয়া যায়।

১৬। একটি আয়েব এই যে, পান-তামাকের খরচ এত বাড়াইয়া লয় যে, গরীব লোকদের পক্ষে উহা বহন করাই দুষ্কর। কোন কোন ধনী-বিলাসী লোকের বাড়ীর পান তামাকের খরচায় চার পাঁচটা গরীব পরিবারের সমস্ত খরচ বহন হইতে পারে। অতএব, পান-তামাকের বেহুদা খরচ কমান উচিত। পান তামাকের অপকারিতা এই যে, থাকিলে পরে নিষ্প্রয়োজনেও খাওয়া আরম্ভ করে। অবশেষে অভ্যাসে পরিণত হইয়া গেলে আর ছাড়িতে পারে না, ফলে অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ বহন করিতে হয়। এইজন্য উহা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

১৭। একটি আয়েব এই যে, দুই ব্যক্তি কোন বিষয় আলাপ করিতে থাকিলে ইহারা অযাচিতভাবে অনর্থক সেই কথায় অংশ গ্রহণ করে এবং পরামর্শ দিতে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিকট কেহ কোন পরামর্শ না চায় ততক্ষণ একেবারে বোবা ও বধির হইয়া থাক।

১৮। একটি আয়েব এই যে, ইহারা কোন মেয়ে মহল হইতে আসিয়া তথাকার সকল মেয়েলোকদের অলংকার, গঠন, রূপ, পোশাক ইত্যাদির কথা নিজ নিজ স্বামীর নিকট বর্ণনা করিতে থাকে। আচ্ছা যদি উহা শ্রবণে তাহাদের কাহারও উপর তোমার স্বামীর মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তবে তোমার মস্তবড় ক্ষতি হইবে না কি? অতএব, অপর মেয়েলোকের রূপের প্রশংসা নিজ স্বামীর নিকট করিও না।

১৯। একটি দোষ এই যে, কাহারও সহিত কথা বলার প্রয়োজন হইলে সে যদি কোন কথায় বা কাজে লিপ্ত থাকে, তবে তার কাজে বা কথায় বাধা দিয়া (সে কাজ যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন) নিজের কথা বলিবেই; তাহার কাজ বা কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করিবে না বা অনুমতিও চাহিবে না। এইরূপ অধৈর্য অভদ্রজনোচিত। কাজেই একটু অপেক্ষা করিয়া তোমার কথা যেন সে শুনে, সেদিকে আকৃষ্ট করাইবার চেষ্টা কর। যখন সে তোমাকে সুযোগ দিবে, তখন কথা বলিও।

২০। একটি আয়েব এই যে, ইহাদের সহিত কথা বলিলে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে সব কথা শুনে না। কথা শুনার মধ্যে মাঝে মাঝে অন্য কাজও করে এবং অপরের কথারও উত্তর দিতে থাকে। ইহাতে যে ব্যক্তি কথা বলিতে আসিয়াছে, তাহার মনে কষ্ট হয় বলিয়া বার বার তাকিদ করে, "শুন্‌ছেন ত বুঝছেন ত!" প্রতি উত্তরে বলে যে, হাঁ, বলতে থাকেন, শুন্‌ছি। অথচ

মনোযোগ না থাকায় বক্তার কথা বলায় তৃপ্তি হয় না এবং কাজ হওয়ারও আশা করতে পারে না। কেননা, যখন সে কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনে নাই তখন কাজ করিয়া দেওয়ার কি আশা?

২১। একটি আয়েব এই যে, কোন কথা বা সংবাদ বলিতে গিয়া আধুরা বা অসম্পূর্ণ বলিয়া থাকে। যদ্দরুন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং আসল কাজ ব্যাহত হইয়া যায়। সুতরাং কথা বলিবার সময় সম্পূর্ণ বুঝাইয়া বলিবে, যেন, কোন সন্দেহ না থাকে।

২২। একটি দোষ এই যে, নিজ ভুলত্রুটি কখনও স্বীকার করিতে রাযী হয় না বরং যথাসম্ভব কথা সাজাইয়া গড়াইয়া দোষ চাপা দিতে চেষ্টা করে। চাই তাহার বানান কথার মধ্যে কোন যুক্তির বালাই থাকুক বা না থাকুক।

২৩। একটি আয়েব এই যে, যদি কেহ কোন বস্তু ইহাদিগকে দেয় বা ভাগে পায় আর সেই বস্তু যদি ক্ষুদ্র বা সামান্য হয়, তবে উহার প্রতি নাক ছিট্‌কাইয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া বলে যে, "এই সামান্য বস্তু না পাঠাইলেই হইত। কে দিতে বলিল, দিতে লজ্জাবোধ হইল না?" ইত্যাদি বলিয়া উহার অবমাননা করিয়া থাকে। ইহা বড়ই অন্যায় ও অভদ্রতা। কেননা, তাহার যেরূপ হিম্মত ও সামর্থ্য ছিল, সেইরূপ দিয়াছে। তোমার ত কোন ক্ষতি করে নাই, দিতে দিতেই হাত বড় হইবে। অতএব, কাহারো দেওয়া কোন বস্তুকে তুচ্ছ মনে করিও না। যাহারা অপরের দেওয়া ক্ষুদ্র বস্তুর কদর করিতে জানে না তাহারা নিজ স্বামীর দেওয়া বস্তুর প্রতিও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং অসংখ্য দোষত্রুটি বাহির করিয়া ক্রোধে বা রাগে ফুঁপাইয়া নাক ছিট্‌কাইয়া থাকে। এই প্রকৃতির স্ত্রীলোকেরা বড়ই হতভাগা। ইহাদের কাপালে দুঃখের আর সীমা থাকে না।

২৪। একটি আয়েব এই যে, কোন কাজের হুকুম দিলে অনর্থক সেই কাজ লইয়া বাক-বিতণ্ডা করিয়া তারপর কাজ করিবে। আচ্ছা, কাজ যখন করিতে হইবেই তখন আর গড়িমসি করিয়া লাভ কি? ইহাতে হুকুম দাতার মনে আঘাত দেওয়া হয়।

২৫। একটি আয়েব এই যে, কাপড় পরিধানে রাখিয়াই আনেক সময় সেলাই করিয়া লয়। ইহাতে কখনও অসাবধানতাবশতঃ সূঁচ শরীরে বিঁধিয়া যায় এবং অনর্থক কষ্ট করিতে হয়।

২৬। একটি আয়েব এই যে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার সময় বা আসিবার সময় অবশ্য একটু কাঁদিবেই। যদি কাঁদা না আসে তবুও কাঁদা কাঁদা ভাব দেখাইবে। এইরূপ করার কারণ এই যে, যদি মায়া কান্না না কাঁদা হয়, তবে হয়ত লোকে বলিবে যে, "পাষাণ-দিল মেয়ে, এর মনে কোন মমতা নাই।" এই কথার খোঁটা হইতে বাঁচিবার জন্য একটু কৃত্রিম কান্না হইলেও কাঁদা চাই।

২৭। একটি আয়েব এই যে, ছোট ছেলে-পেলেদিগকে সর্দি হইতে বা গর্মি হইতে বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থা করে না। শেষে রুগ্ন হইয়া পড়িলে তাবীজ-তুমার ঝাড় ফুঁক ইত্যাদি করিতে করিতে পেরেশান থাকে, তবু ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক এবং ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করে না।

২৮। একটি আয়েব এই যে, ছেলে-পেলেদিগকে ক্ষুধা না থাকিলেও খাওয়ায়। তদ্রূপ মেহমানকেও অনর্থক অনুরোধ করিয়া ক্ষুধাবিহীন অবস্থায় খানা-খাওয়াইয়া থাকে। অবশেষে অ-ক্ষুধায় খানা খাইয়া তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতার কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ

১। দুই পুত্রের বা দুই কন্যার বিবাহ যতদূর সম্ভব একই সময়ে সম্পন্ন করা উচিত নহে। কারণ দুই বৌ বা দুই জামাতা বংশ মর্যাদায়, রূপে-গুণে, আদব-তমিযে শিক্ষা-দীক্ষায়, হায়া-শরমে

কিছুতেই সমান হয় না। কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। এই কারণে সাধারণতঃ লোকের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। কাহাকেও তারিফ করিয়া আসমানে উঠায় আবার কাহাকেও মন্দ বলিতে বলিতে পাতালে নামায়। ইহা বড় মছিবত।

২। বাড়ী-ঘর খালি রাখিয়া কোথায়ও যাইতে হইলে এমন লোকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাও, যে লোক তোমার নিকট বড় আমানতদার। সকলের উপর সমানভাবে নির্ভর করিও না। শহরে বা গ্রামে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহু প্রতারক। কেহ হয়ত হাজী সাহেব বা দরবেশ সাহেব অথবা ফকীর সাজিয়া আসে—রাশিগণনা করে, তাবিয দেয়। ঝাড়-ফুঁকের কাজ করে। এইরূপ লোককেও কোন মতেই ঘরে ঢুকিতে দেওয়া উচিত নহে। আসিলে পর বাহিরে রাখিয়াই বিদায় দেওয়া উচিত। কেননা, এইরূপ ভণ্ড ও প্রতারকের হাতে পড়িয়া বহু লোকের ঘর-বাড়ী উজাড় হইয়া যায়।

৩। হাত বাক্সে অথবা পানের বাটায় টাকা-পয়সা, গহনাপত্র যদি রাখিয়া থাক, তবে উহা খোলা রাখিয়া উঠিয়া যাইও না। হয় উহা তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাও, নতুবা সঙ্গে লইয়া যাও।

৪। যতদূর সম্ভব কখনও বাকী সওদা আনাইও না, একান্ত ঠেকাবশতঃ যদি আনাইতে হয়, তবে দর ভাও জিজ্ঞাসা করিয়া তারিখ লিখিয়া রাখ এবং পয়সা হাতে আসিতেই তৎক্ষণাৎ দাম পরিশোধ করিয়া দাও।

৫। মুদীর দোকানের সওদার হিসাব, চাউলের বা আটা-ভাঙ্গানী খরচ, ধোপার মজুরী ইত্যাদির হিসাব সর্বদা লিখিয়া রাখিও, মৌখিক হিসাবের ভরসা করিও না।

৬। যতদূর সম্ভব সংসার খরচে মিতব্যয়ী হইয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিও এবং তোমাকে যে পরিমাণ খরচের টাকা দেওয়া হয়, উহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিও।

৭। বাহির হইতে যে সকল মেয়েলোক তোমার ঘরে আসে, তাহাদের সম্মুখে এমন কথা প্রকাশ করিও না, যে কথা তোমার বাহিরে প্রচার হইতে দেওয়ার ইচ্ছা নাই। কেননা এই সব ভবঘুরে মেয়েলোকের অভ্যাসই হইতেছে এক বাড়ীর কথা দশ বাড়ীর লোকের নিকট প্রচার করা।

৮। আটা অথবা চাউল অনুমান করিয়া পাক করিতে দিও না; বরং নিজ সংসারের খরচ বুঝিয়া দুনো বেলার সব বস্তু মাপিয়া পরিমাণমত খরচ করিও। ইহাতে যদি তোমাকে কেহ খোঁটা দেয় বা ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তবে, তাহার কোন পরওয়া করিও না।

৯। যে সব ছোট মেয়েরা বাড়ীর বাহিরে যাতায়াত করে তাহাদিগকে কখনো অলংকার পরাইও না। কেননা, ইহাতে জান এবং মাল উভয়ের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১০। যদি তোমার কোন অপরিচিত লোক তোমার ঘরের দরজায় আসিয়া তোমার স্বামীর অথবা পিতা বা ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ কামনা করে; কিংবা বন্ধুত্বের বা আত্মীয়তার পরিচয় দিয়া ঘরে ঢুকিতে চায়, তবে তুমি কোন জানাশুনা পুরুষ দ্বারা সনাক্ত না করা পর্যন্ত ঘরে ঢুকিতে দিও না; পর্দার ভিতরে আসিতে দিও না। তাহার নিকট কোন মূল্যবান বস্তু পাঠাইও না। বেশী মহব্বত দেখাইতে যাইও না বরং বে-গানা পুরুষানুচিত যত্ন করিও। এই প্রকারের লোকের দেওয়া কোন দ্রব্য গ্রহণ করিও না।

১১। তদ্রূপ যদি কোন অপরিচিত স্ত্রীলোক পাল্কীতে বা সওয়ারীতে আসিয়া তোমার কোন আত্মীয় বাড়ী হইতে আসিয়া তোমাকে নেওয়ার কথা বলে বা এই ধরনের পরিচয় দেয়, তবে

তাহার সহিত কখনো ঘরের বাহির হইও না। অপরিচিত লোক স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক তাহার কথায় কোন কাজ কখনও করিও না।

১২। বাড়ীর মধ্যে বা আঙ্গিনায় এমন গাছ লাগাইতে নাই যাহার ফলে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কা আছে, যেমন কত বেলের গাছ।

১৩। শীতকালে শীতের সময়ে কিছু বেশী কাপড় পরিধান করিও। মেয়েরা সাধারণতঃ অতিরিক্ত কাপড় পরিতে চায় না, ফলে সর্দি লাগিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। অতঃপর কষ্টের আর সীমা থাকে না।

১৪। ছেলেপেলেদিগকে বাপ-দাদার নাম এবং বাড়ীর ঠিকানা মুখস্থ করাইয়া দিও। খোদা না করুন যদি কোন সময় হারাইয়া যায়, তবে বাড়ীর ঠিকানা ও বাপদাদার নাম বলিতে পারিলে যে কেহ তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। আর যদি দেশের ও বাপ-দাদার নাম না শিখাও, তবে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোনই উত্তর দিতে পারিবে না। বাবার নাম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে কেবল "আব্বা" বলিবে। ইহাছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিবে না। কে আব্বা, কে আম্মা কিছুই বুঝা যাইবে না।

১৫। কোলের শিশুকে একা ঘরে রাখিয়া কোথাও যাইও না। কোন এক স্ত্রীলোক তার দুধের শিশুকে একাকী ঘরে রাখিয়া কোথাও কাজে গিয়াছিল। এদিকে বিড়াল শিশুটিকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। ইহতে দুইটি শিক্ষা পাওয়া গেলঃ প্রথমতঃ, দুধের শিশুকে একাকী রাখিয়া কোথায়ও যাইতে নাই। দ্বিতীয়তঃ, কুকুর-বিড়ালের বিশ্বাস করিতে নাই। কোন কোন বে-ওকুফ মেয়েলোক ছেলে-পেলের বিছানায় বিড়াল দেখিয়া তাড়ায় না বরং শুইতে দেয়। আচ্ছা যদি রাত্রে শিশুর হাত-পা বিড়ালের শরীরে পড়ে আর অমনি বিড়াল কামড় আঁচড় লাগাইয়া দেয়, তবে কি করিবে? এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

১৬। ঔষধ-পত্র সর্বদা ডাক্তার বা উপযুক্ত হেকীম দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া ব্যবহার করিও। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আনাড়ী ঔষধ বিক্রেতারা একটায় আর একটা উল্টা-পাল্টা ঔষধ দিয়া বসে। আবার কখনও ঔষধের সাথে এমন তিজস্ক্রিয় পদার্থও মিশ্রিত থাকে যাহার ক্রিয়া ক্ষতিকর হইয়া পড়ে। সে সমস্ত ব্যবহার্য ঔষধ শিশিতে, কৌটায় বা পুরিন্দায় কিছু অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকিয়া যায় উহার উপর লেবেল আঁটিয়া নাম লিখিয়া রাখ, কেননা অনেক সময় না জানার কারণে অতি মূল্যবান ঔষধও ফেলিয়া দেওয়া হয়। আবার কোন সময়ে না জানার দরুন বিপরীত ঔষধ খাইয়া বিপদ ডাকিয়া আনা হয় এবং অযথা ঔষধের অপচয় হইয়া থাকে।

১৭। যাঁহারা অতি ঘনিষ্ঠ, শ্রদ্ধার পাত্র, অতি সম্ভ্রান্ত, তাঁহাদের নিকট হইতে ধার-কর্জও লইও না এবং তাহাদিগকে বেশী কর্জও দিও না, হাঁ ঠেকা হইলে এই পরিমাণ দাও যে, যদি পরিশোধ করিতে না পারে তাহা হইলে যেন তোমার উপর কোন কঠিন চাপ না পড়ে।

১৮। যে কোন নূতন কাজ বা বড় কাজ করিতে ইচ্ছা কর, সর্বপ্রথম তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, দ্বীনদার, পরহেযগার, জ্ঞানী মুরব্বীর নিকট হইতে পরামর্শ নিয়া নাও।

১৯। নিজ টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পদের বিষয় সকলের নিকট আলাপ করিও না; বরং লুকাইয়া ছাপাইয়া রাখার ব্যবস্থা কর।

২০। যাহার নিকট পত্র লিখিবে প্রত্যেক পত্রের উপরেই তোমার ঠিকানা লিখিও। এই ভরসায় ঠিকানা লিখা বন্ধ করিও না যে, প্রথম পত্রে ত ঠিকানা দেওয়া আছেই, তবে আর দরকার কি?

এরূপ করিও না, কেননা, তোমার প্রথম বারের ঠিকানা লিখা পত্র কোথায় পড়িয়া আছে তাহার খোঁজ হয়ত নাও থাকিতে পারে। সে পত্র যে প্রাপকের নিকট থাকিবেই এমন কথা হইতে পারে না। হইতে পারে পত্রের প্রাপক নিরক্ষর বা তোমার ঠিকানা তার মুখস্থ নাই। অতএব, পত্রের উপর যাহার দ্বারা লিখাইবে তাহার নিকট উহার ঠিকানা বলিতে পারিবে না তাই পত্রের উত্তর পাওয়ার আশা করা যায় না।

২১। যদি রেলে কোথায়ও সফর করিতে হয়, তবে তোমার টিকেট খুব যত্নে নিজের কাছে রাখিও অথবা সঙ্গী পুরুষলোকের নিকট দিয়া দাও। গাড়ীতে বে-খেয়ালে বেশী ঘুমাইও না। অন্য মেয়েলোক যাত্রীদের নিকট নিজের মনের কথা বলিও না। রাস্তায় অপরিচিত লোকের দেওয়া পান-পাতা, মিঠাই, খানা বা ঔষধ কিংবা আতর ইত্যাদি কিছুই গ্রহণ করিও না। অলংকার পরিধান করিয়া রেলে ভ্রমণ করিও না; বরং উহা খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে বা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দাও। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করিবে তখন যাহা ইচ্ছা পরিধান কর।

২২। সফর করার সময় নিজ হাতে কিছু খরচের পয়সা অবশ্যই রাখিবে।

২৩। পাগলকে কখনও উত্তেজিত করিও না বা পাগলের সহিত কোন আলাপ করিও না। তাহার যখন হুঁশ-জ্ঞান নাই, এমতাবস্থায় সে কি কথায় কি বলিয়া ফেলে বা কি কাণ্ড করিয়া বসে তাহা বলা যায় না। শেষে তুমি লজ্জিত ও দুঃখিত হইবে।

২৪। অন্ধকারে খালি পায়ে চলিও না এবং অন্ধকারে কোথায়ও হাত ঢুকাইও না। হাঁ, প্রয়োজনবোধে বাতি জ্বালাইয়া দেখিয়া শুনিয়া তারপর হাত দিতে পার।

২৫। নিজ গুপ্ত রহস্য সকলের নিকট বলিও না। অনেকে আনাড়ী বা খেলো লোকদের নিকট নিজ রহস্য বলিয়া ফেলিয়া শেষে অনুরোধ করে যে, "দেখুন, এই কথা কাহারো নিকট বলিবেন না", কিন্তু মনে রাখিও, এই লোকই তোমার নিষেধ করার পরও বেশী করিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইবে।

২৬। প্রত্যেক কাজেরই শেষফল ভাবিয়া চিন্তিয়া তারপর কাজ করিও।

২৭। কাঁচের গ্লাস, বর্তন, বাসন ও অন্যান্য কাঁচের দ্রব্য নিষ্প্রয়োজনে বেশী খরিদ করিও না। ইহাতে অযথা অর্থের অপচয় হইয়া থাকে।

২৮। রেলে সফরের সময় যদি মেয়েলোকদের সঙ্গী পুরুষ অন্য কামরায় থাকে, তবে মেয়েলোক যাত্রীগণের গন্তব্য স্থানের ষ্টেশনের নাম শুনিয়াই বা ষ্টেশনের নাম তকতায় খোদাই দেখিয়াই নামিয়া পড়া উচিত নহে। কারণ কোন শহরে একনামে একাধিক ষ্টেশনও থাকে। অতএব, তুমি হয়ত হঠাৎ নামিয়া পড়িলে, অথচ প্রকৃত গন্তব্য স্থল এটা নহে, ওদিকে তুমি এখানে নামিয়া রহিলে, আর তোমার সঙ্গী পুরুষগণ যথাস্থানে নামিয়া তোমাকে খোঁজ করিয়া পাইল না। এইজন্য তোমার উচিত ষ্টেশনে পৌঁছিলে পর সঙ্গী পুরুষরা যখন আসিয়া নামিবার আদেশ দিবে, তখনই গাড়ী হইতে অবতরণ করা। এমনও হইতে পারে যে, পুরুষ লোক ঘুমে ঝিমাইতেছে বলিয়া নামতে সময়ই পাইল না, আর তুমি নামিয়া তাহাকে পাইলে না। শেষে সকলের বিপদের আর সীমা থাকিবে না।

২৯। শিক্ষিতা মেয়েলোকদের বিদেশ ভ্রমণের সময় একখানা মাসআলার কেতাব, কিছু কাগজ, একটা কলম অথবা পেন্সিল, কিছু পোষ্টকার্ড, ইনভেলফ এবং ওযূ করিবার বদনা অবশ্যই সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৩০। বিদেশ সফরের যাত্রীদের নিকট কোন বস্তুর ফরমায়েশ দিও না যে, অমুক বস্তুটি অমুক স্থান হইতে আমার জন্য আনিবেন বা পাঠাইয়া দিবেন। তদ্রূপ বিদেশের যাত্রীদের মারফত কোন বস্তু কাহারো নিকট পাঠাইবে না, বা হাতে হাতে পত্রও পাঠাইবে না।

ইহাতে এই সামান্য কাজও কোন সময়ও অতি কঠিন হইয়া পড়ে এবং যার কাছে পাঠাইয়াছ তাহাকে উহা পৌঁছাইতে তক্‌লিফ হওয়ার কারণে বাহকের মনে কষ্ট পায়। কখনও চিঠি-পত্র লোক মারফত পাঠাইয়া প্রেরক নিশ্চিন্ত থাকে, কিন্তু ভুলবশতঃ অনেক সময়ে উহা আর পৌঁছান হয় না, ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। অতএব, পাঁচ পয়সার একটা পোষ্ট কার্ডে পত্র লিখিয়া দিলে যেখানে নিশ্চিন্ত মনে থাকা যায়, সেখানে অযথা এত ঝামেলার কি প্রয়োজন আছে? কোন বস্তু বিদেশ হইতে আনাইতে হইলে পার্শেলযোগেও আনান যাইতে পারে। আবার কোন বস্তু বিদেশে পাঠাইতে হইলে পার্শেলযোগে পাঠান যায়। সেই বস্তু যদি তোমার দেশে পাওয়া যায় এবং একটু মূল্য বেশী হয়, আর যাহার নিকট ফরমায়েশ দিয়াছ সেখানে যদি কিছু কম দামে পাওয়া যায়, তবে সামান্য পয়সা বাঁচাইতে গিয়া অন্যকে কষ্ট দেওয়া বড় অন্যায় কথা। অনেক সময় সামান্য বস্তুর জন্য অযথা পেরেশানী ভোগ করিতে হয়। আর যদি কোন বস্তু একান্ত ঠেকাবশতঃ বিদেশ হইতে আনাইতেই হয়, তবে উহার মূল্যটা অগ্রিম দিয়া দাও এবং যদি রেলে যাতায়াত করিতে হয়, তবে কিছু পয়সা বেশী দিয়া দাও। হয়ত তোমার বস্তু তাহার বস্তুর সহিত মিলাইলে ভাড়া চার্জ হইতে পারে।

৩১। রেল গাড়ীতে অথবা সাধারণভাবে নৌকায় বা জাহাজে ভ্রমণের সময় কোন অপরিচিত ব্যক্তির কোন খাদ্য-দ্রব্য কস্মিনকালেও খাইও না। কারণ দুর্বৃত্তরা অনেক ক্ষেত্রে নেশার বস্তু বা বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়াইয়া শেষে সমস্ত মাল-মাত্তা লইয়া উধাও হয়।

৩২। গাড়ীতে তাড়াতাড়ি উঠার সময় লক্ষ্য রাখিও, তুমি যেই শ্রেণীর টিকেট লইয়াছ, ঠিক সেই শ্রেণীর কোঠায়ই উঠিলে কিনা? তাড়াতাড়ির সময়ে উপরের শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিও না। গাড়ীর উপর শ্রেণীর চিহ্ন দেওয়া থাকে। আবার টিকেটের উপরও সকল শ্রেণীর বিভিন্ন চিহ্ন দেওয়া থাকে, তাহাতে বুঝা যায় যে, কোন্ দরজার টিকেট এবং কোন গাড়ীতে উঠিতে হইবে। গাড়ীর বাহিরে ও ভিতরে তৃতীয় শ্রেণীর 'III' চিহ্ন দেওয়া থাকে। ইন্টার ক্লাসে 'INT' চিহ্ন দেওয়া থাকে। সেকেণ্ড ক্লাসে 'II' দেওয়া থাকে। আর ফার্ষ্ট ক্লাসে 'I' এই চিহ্ন দেওয়া থাকে।

৩৩। কাপড় জামা বা অন্য কোন কিছু সেলাই করার সময় সূচ আটকাইয়া গেলে উহা দাঁতের সাহায্যে কামড়াইয়া ধরিয়া ছুটাইতে চেষ্টা করিও না। কেননা ভাংগিয়া গিয়া বা পিছলাইয়া জিহ্বায় বা তালুতে বিঁধিতে পারে।

৩৪। নখ কাটার জন্য একটা নড়ইন বা চাকু সঙ্গে রাখিও।

৩৫। নির্ভরযোগ্যভাবে না জানিয়া কাহারো কোন তৈরী ঔষধ ব্যবহার করিও না। বিশেষ করিয়া চোখের ঔষধ না জানিয়া মোটেই ব্যবহার করা উচিত হইবে না। হাঁ, যদি যোগ্য চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে বা রেজেষ্টারী করানোর মধ্যে কোন সন্দেহ না থাকে, তবে ব্যবহারে কোন ক্ষতির আশংকা নাই।

৩৬। যে কাজ হওয়া সম্বন্ধে তোমার পূর্ণ ভরসা নাই, সেই কাজে অপরকে ভরসা দিও না। অনর্থক কষ্ট পাইবে।

৩৭। কাহারো কাজের সুযোগ-সুবিধার উপর বাধা দিও না বা পরামর্শ দিতে যাইও না। হাঁ, সে লোকের উপর যদি তোমার অধিকার থাকে বা তার কাজে দখল দিতে পার।

৩৮। কাহাকেও বেড়াইতে বা খানা খাইতে দেরী করার জন্য অতিরিক্ত সাধাসাধী করিও না, কেননা অতিরিক্ত সাধাটা কোন সময় বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। এইরূপ মহব্বত প্রকাশে কি লাভ? যাহার শেষফল ঘৃণা ও অভিযোগের সৃষ্টি করে।

৩৯। এত ভারী বোঝা বহন করিও না, যাহাতে কোন প্রকার দৈহিক গঠনের বিকল ঘটিতে পারে। বিশেষ করিয়া ছোট মেয়েদের এবং স্ত্রীলোকদের বোঝা বহনের বেলায় খুব সতর্ক হইতে হইবে। কেননা তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টিগতই খুব নাজুক বা দুর্বল হইয়া থাকে। আমি এইরূপ অনেক লোক দেখিয়াছি যাহারা বাল্যকালে এবং অসাবধানে অতিরিক্ত যোঝা বহন করিয়াছে, তাহারা বিকলাঙ্গ হইয়া সারা জীবন কষ্টে কাটাইতেছে।

৪০। বড় বা ছোট সূচ বা অন্য কোন চোখা ধারাল বস্তু ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যাইও না, হয়ত অন্য লোক আসিয়া উহার উপর বসিলে বিঁধিয়া যাইতে পারে।

৪১। অন্য লোকের শরীরের উপর দিয়া কোন ভারী বস্তু বা বিপদজনক দ্রব্য আদান-প্রদান করিও না, হয়ত হাত হইতে ছুটিয়া পড়িয়া বিপদ ঘটিতে পারে।

৪২। অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরা বা ছাত্ররা যদি কোন অন্যায় করে, তবে তাদের শাস্তি দিতে হইলে মোটা লাঠি দ্বারা আঘাত করিও না, লাথি, ঘুষি মারিও না। খোদা না করুন যদি বে-জায়গায় চোট লাগিয়া যায়, তবে হিতে বিপরীত হইয়া যাইবে। তদ্রূপ চেহারার উপর বা মাথায় কখনও মারিও না।

৪৩। যদি কোথায়ও বেড়াইতে গিয়া থাক এবং বাড়ী হইতে খানা খাইয়া গিয়া থাক, তবে তথায় যাইয়াই মেজবানকে অর্থাৎ, যার ঘরে মেহমান হইয়াছ তাহাকে জানাইয়া দাও যে, তোমার এখন খাওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা তাহারা হয়ত লজ্জায় তোমাকে খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিবে না যে, খাইয়া আসিয়াছেন কি না? তাহারা ত তোমার জন্য খানার ব্যবস্থা করিবেই, সময় থাকুক বা না থাকুক, অসময় হইলেও চুপে চুপে খানা তৈয়ার করিয়া তোমার সম্মুখে হাযির করিবে। তুমি তখন বলিবে যে, আমার ক্ষুধা নাই বা খাইয়া আসিয়াছি, এখন খাইতে পারিব না ইত্যাদি। এমতাবস্থায় বলতঃ ঐ বেচারাদের প্রাণে কত আঘাত লাগিবে! তবে কেন পূর্বেই বলিলে না?

তদ্রূপ যদি তোমাকে কেহ দাওয়াত করে বা কোথায়ও কেহ খাওয়াইতে অপেক্ষা করে, তবে তুমি আপন বাড়ী হইতে জানাইয়া যাইও। আর যদি কোথায়ও উপস্থিত মত খানা খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করিতে হয়, তবে তোমার নিজ বাড়ীতে খানা পাক করার পূর্বেই সংবাদ পৌঁছাইবে, যেন বাড়ীর লোকেরা তোমার জন্য খানার ব্যবস্থা না করে।

৪৪। যে লোক খুব সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী বা শ্রদ্ধেয় পাত্র হওয়ার কারণে কথা বলিতে তাহাকে ইজ্জত, আদাব ও সম্মান করিতে হয় এইরূপ লোকের সহিত কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত নয়, কেননা এইরূপ ক্ষেত্রে না পরিষ্কাররূপে কথা বলা যায়, না মূল্য চাওয়া যায়, না তাগাদা করা যায়। একজনে মনে মনে একটা মূল্য সাব্যস্ত করিয়া রাখে, অপর জনে অন্যরূপ মূল্য ধারণা করে ইহার শেষ ফলে মনোমালিন্য ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

৪৫। চাকু, ব্লেড ইত্যাদি ধারাল বস্তু দ্বারা দাঁত কোড়াইও না।

৪৬। যে সকল ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করে তাহাদিগকে বলকারক, মেধা-শক্তি বর্ধক বস্তু ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক খাদ্য খাওয়াইতে থাকিও।

৪৭। রাত্রে কখনও একা ঘরে শুইও না, ইহাতে নানা বিপদ ঘটার আশংকা আছে। এমনও হয় যে, একা ঘরে লোক মরিয়া থাকে, শেষে কয়েক দিন পর তার সংবাদ হয়।

৪৮। ছোট ছেলেপেলেদিগকে কূয়ার পাড়ে উঠিতে দিও না, অথবা কূয়ার পানি আনিতে পাঠাইও না। যদি ঘরের মধ্যেই কূয়া থাকে, তবে উহার উপর ঢাকনি দিয়া রাখিও। না হইলে ছোটরা যাইয়া ডোল খিচিয়া পানি উঠাইতে চেষ্টা করিবে এবং কূয়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাইবে।

৪৯। যে সকল শিল, ইট, পাথর বহুদিন একস্থানে পড়িয়া থাকে তাহা হঠাৎ উঠাইও না। কারণ উহার নীচে সাপ, বিচ্ছু বা অন্যান্য বিষাক্ত জীব থাকিতে পারে। উহা দেখিয়া শুনিয়া খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করিও।

৫০। বিছানায় শুইবার পূর্বে কাপড় বা তোয়ালে দ্বারা বিছানা ঝাড়িয়া মুছিয়া শুইও। অন্যথায় কোন বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ বা ধুলা-বালি থাকিতে এবং উহার দ্বারা ক্ষতি হইতে পারে।

৫১। রেশমী কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে কাফুর, নেপথালীন, অথবা নিমপাতা ইত্যাদি কোন বস্তু রাখিও, তাহা হইলে পোকায় কাটিতে পারিবে না।

৫২। যদি মাটির নীচে কোথায়ও টাকা-পয়সা বা মূল্যবান কোন অলংকার লুকাইয়া রাখিয়া থাক, তবে তোমার আপন কোন বিশ্বস্ত লোককে জানাইয়া রাখিও। কেননা, খোদা না করুন যদি তুমি কোথায়ও গিয়া মারা যাও, তবে আর উহা পাওয়া যাইবে না।

একদা জনৈকা স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর অর্জিত ৫০০ পাঁচশত টাকা মাটির নীচে কাহাকে না জানাইয়া পুতিয়া রাখিয়াছিল, ইতিমধ্যে সে প্রাণত্যাগ করে। অবশেষে সমস্ত ঘর ঢালাইয়াও উহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুরুষ লোকটি নিতান্ত গরীব ছিল। দেখ ত টাকা না পাইয়া লোকটির পেরেশানী ও কষ্ট ভোগ করিতে হইল।

৫৩। কোন কোন সময় লোকের অভ্যাস এই যে, আলমারীর বা বাক্সের তালা লাগাইয়া উহার নিকটেই চাবি অসাবধানে ফেলিয়া রাখে। এইরূপ তালা লাগানোতে কোন লাভ নাই। সাবধান! এইরূপ কখনও করিও না। ইহাতে তোমার সর্বস্বান্ত হইবার ভয় আছে।

৫৪। ঘরে বাতি জ্বালানের জন্য কেরোসিন তেল ব্যবহার না করিয়া বরং চেরাগ বাতি যাহা রেড়ীর তৈল বা ঐ জাতীয় বীজে যে তৈল পাওয়া যায় সেই তৈলের বাতি অনেক ভাল। কেননা, কোরোসিন তৈল খরচ বেশী এবং নোকছানও হয় খুব বেশী।

অতএব, নিজ হাতে শল্তা বানাইয়া (যাহা বেশী মোটাও নহে এবং একেবারে সরুও নহে) চেরাগ জ্বালাও এবং বাতি বাড়াইবার জন্য একটি শলাকা চেরাগের মধ্যে রাখ। হাতের সাহায্যে বাতি বাড়াইও না। ইহাতে হাত নষ্ট হইতে পারে। চাকর-চাকরাণীদের দ্বারা শল্তা বানাইও না বা তৈল দেওয়াইও না। তাহারা প্রায়ই তৈলের অপচয় করিয়া বড় ক্ষতি করে। চেরাগ নিভাইতে হইলে হাতে নিভাইও না বরং পাংখা বা কাপড় দিয়া ঝটকা দিয়া নিভাইও। ঠেকাবশতঃ ফুঁ দিয়াও নিভান যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে অসুবিধা আছে। হাতে বাতি নিভাইতে গেলে অনেক সময় হাতে লাগিয়া চেরাগ পড়িয়া গিয়া ক্ষতি হইয়া থাকে।

৫৫। রাত্রে টাকা-পয়সা গণনার কাজ করিও না। যদি একান্ত ঠেকাবশতঃ গণনা করিতেই হয়, তবে চুপে চুপে গণিবে যেন আওয়াজ না হয়। কেননা চোর-ডাকাত নিকটেই থাকিতে পারে।

৫৬। দোকান ঘরে বা বসত ঘরে লোক শূন্যাবস্থায় জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া যাইও না। তদ্রূপ দিয়াশলাইয়ের শলাকায় আগুন জ্বালাইয়া উহা অমনি ফেলিও না; বরং পায়ে মাড়াইয়া বা নিভাইয়া ফেল। যেন স্ফুলিঙ্গ না থাকে।

৫৭। ছেলেপেলেদিগকে দিয়াশলাই বা আতশবাজি দ্বারা খেলিতে দিও না। আমাদের মহল্লার একটি ছেলে দিয়াশলাই জ্বালাইতে গিয়া জামায় আগুন ধরিয়া চেহারা ও শরীর পুড়িয়া গিয়াছে। অপর একটি ছেলে আতশবাজি ছাড়ার সময় একখানা হাতই ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

৫৮। পায়খানার মধ্যে বাতি নিয়া অতি সাবধানে বসিও যেন কাপড়ে আগুন ধরিতে না পারে। এইভাবে অসাবধানে অনেক লোক পুড়িয়া যাওয়ার ঘটনা শুনা যায়। বিশেষ করিয়া কেরোসিন তৈলের খোলা বাতিতে খুব বেশী ভয়ের কারণ আছে।

শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে সাবধানতা

১। প্রতিদিন শিশুদের হাত-পা, মুখমণ্ডল, গলা,কান কুচকী ইত্যাদি ভিজা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে মুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিও। অন্যথায় তৈলের সহিত ময়লা জমাট বাঁধিয়া ঐ সকল স্থানের চামড়া গলিয়া গিয়া ঘা হইতে পারে।

২। শিশুরা পায়খানা-প্রস্রাব করিলে তৎক্ষণাৎ উহাদের পায়খানা-প্রস্রাবের স্থান পানি দ্বারা ধৌত করিয়া দিও। মাটি দ্বারা মুছিয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে করিও না। কেননা মুছাইয়া দিলে পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু দুর্গন্ধ থাকিয়া যায় এবং পায়খানার রস শুকাইয়া যাওয়ায় উহার তেজষ্ক্রিয় পদার্থের কারণে ফোস্কা পড়ে ও খুজলী পাঁচড়া হইয়া থাকে। অতএব, ধোয়াইয়া দেওয়াই উচিত। শীতের দিনে বার বার ধোয়ইলে সর্দি লাগিতে পারে এইজন্য একটু গরম পানি দিয়া ধোয়াইবে।

৩। শিশুদিগকে মায়ের কোলের মধ্যে না শোয়াইয়া বরং একটু দূরে চতুর্দিক উঁচু করিয়া ঠেস দিয়া শোয়াইও। কেননা অনেক ক্ষেত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় মায়ের পাশ ফিরার সময় শিশুরা মায়ের হাত-পা বা পীঠের নীচে পড়িয়া জীবন হারায়। অনেক সময় শিশুর হাত-পাও ভাংগিয়া যাইতে শুনা যায়।

৪। শিশুদিগকে দোলনায় ঝুলানের বেশী অভ্যাস করান উচিত নহে। কেননা দোলনা সর্বত্র পাওয়া যায় না এবং উহা সাথে নিয়াও চলা যায় না। তদ্রূপ বাচ্চাকে বেশী কোলে রাখিও না। কেননা বেশী কোলে রাখিলে শিশুদের শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে।

৫। শিশুরা যেন সকলের কোলেই যায়, এই অভ্যাস করান উচিত। কোন এক জনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইতে দিও না। কারণ সে যদি চলিয়া যায় বা মরিয়া যায় কিংবা চাকুরী ছাড়িয়া দেয়, তবে শিশুর ভয়ানক কষ্ট হইবে।

৬। শিশুকে যদি ধাত্রী-মাতার দুধ খাওয়াইতে হয়, তবে এমন ধাত্রী নির্বাচন করিয়া রাখিবে যাহার স্বাস্থ্য ভাল, তাজা দুধওয়ালী (অর্থাৎ ৫/৬ মাসের সন্তানের মা হয়,) যে স্ত্রীলোক সৎস্বভাবের ও পরহেযগার হয় এবং লোভী না হয় এইরূপ মেয়েলোক রাখিও।

৭। শিশুরা যখন খানা খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তখন ধাত্রী এবং চাকরাণীর হাতে খানা খাওয়াইবার ভার দিও না। নিজ হাতে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিমতী লোকের সম্মুখে খানা খাওয়াইও যেন অধিক খাইয়া অসুস্থ হইয়া না পড়ে। তদ্রূপ শিশুদের অসুখের সময় ঔষধ নিজের সম্মুখে তৈয়ার করাইয়া নিজের উপস্থিতিতেই খাওয়ান উচিত।

৮। শিশুদের যখন কিছু বুদ্ধি হয়, তখন উহাদিগকে নিজ হাতে এবং ডান হাতে খাইতে অভ্যস্ত করাইও এবং খানা খাওয়ার পূর্বে হাত মুখ ধোয়াইয়া দিও। অল্প খাওয়ার অভ্যাস করাও যেন রোগ মুক্ত ও লোভ মুক্ত থাকিতে পারে।

৯। শিশুদিগকে যাহাতে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে দিকে মা-বাবার ও চাকর-চাকরাণীর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিশুদের হাত পা, নাক-মুখ ময়লা করিলে তৎক্ষণাৎ ধুইয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া দিও।

১০। যতদূর সম্ভব শিশুদিগকে ভদ্র ও সৎলোকের ছেলে-মেয়েদের সহিত থাকিতে দিও এবং অসৎলোকদের ছেলেমেয়েদের সহিত মিশিতে দিও না। শিশুদের খেলা-ধুলার সময় লক্ষ্য রাখিও যেন বেশী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না দৌড়ায় এবং উচ্চস্থান হইতে লাফ না দেয়। অনেক ছেলেমেয়েদের সহিত খেলিতে দিও না বাড়ীর আঙ্গিনায় বা রাস্তার উপর খেলিতে দিও। শিশুদের লইয়া হাটে-বাজারে ফিরিও না। উহাদের সকল প্রকার অভ্যাস দেখিয়া সুযোগ মত যথাস্থানে রাখিয়া আদব তমিয শিক্ষা দিও এবং বেহুদা কথা হইতে উহাদিগকে বিরত রাখিবে।

১১। শিশুকে খাওয়াইবার জন্য যে মেয়েলোক রাখা হয় তাহাকে বলিয়া দিও, সে যেন বাচ্চাকে অন্যত্র কোথায়ও কোন কিছু খাবার না খাওয়ায়। যদি কেহ কোন খাদ্য-দ্রব্য দেয়ও, তবে উহা শিশুর মাতার নিকট যেন আনিয়া খাওয়ান হয়। নিজ ইচ্ছা মত যেন না খাওয়ায়।

১২। শিশুদের এই অভ্যাসে অভ্যস্ত করান একান্ত কর্তব্য যে, তাহারা যেন আপন মুরব্বির নিকট ছাড়া অন্য কাহারো নিকট কিছুনা চায়। তদ্রূপ অন্য লোকের দেওয়া বস্তু যেন মুরব্বির হুকুম ছাড়া গ্রহণ না করে।

১৩। ছেলেপেলেকে অত্যধিক আহ্লাদ দেওয়া উচিত নহে। কেননা বেশী আহ্লাদে ছেলেপেলে দুষ্ট হইয়া যায়।

১৪। ছেলেমেয়েদিগকে বেশী খিচা জামা অর্থাৎ টাইটফিট পোশাক পরিধান করাইও না এবং বেশী মূল্যবান পোশাকও দিও না। হাঁ, ঈদের সময় রুচিমত পোশাক দেওয়া উচিত।

১৫। ছেলেপেলেদিগকে মাজন এবং মেছওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করার অভ্যাস করাইও।

১৬। এই কিতাবের অর্থাৎ, বেহেশ্‌তী জেওরের সপ্তম খণ্ডে যে সমস্ত আদব-কায়দা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, উঠাবসা ইত্যাদি আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের কথা লিখা হইয়াছে, ছেলেমেয়েদিগকে তাহা শিক্ষা দিয়া অভ্যাসে পরিণত করাইয়া দিও। এই আশায় কখনও থাকিও না যে, বড় হইলে লেখাপড়ার মাধ্যমে শিখাইয়া দিব। অথবা দেখেশুনে আপনা হইতেই শিখিয়া নিবে। স্মরণ রাখিও, আপনা হইতেই কখনও কেহ শিখিতে পারে না। পড়ার মাধ্যমে হয়ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে কিন্তু অভ্যাস গড়ে না। যতদিন পর্যন্ত ভাল স্বভাবের অভ্যাস না গড়াইবে, যত লেখাপড়াই শিক্ষা দাও না কেন তাহার দ্বারা বেতমিযী, বে-হায়ায়ী, বেদনাদায়ক দুর্ব্যবহার প্রকাশ পাইবেই। এই সম্বন্ধে অত্র কিতাবের পঞ্চম খণ্ড ও নবম খণ্ডের শেষভাগে যে সকল উপদেশ লেখা হইয়াছে উহার প্রতিও বিশেষ যত্নবান হইবে।

১৭। শিশুদের উপর বেশী পড়ার বোঝা চাপাইও না। প্রথম প্রথম একঘন্টা করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিও। তারপর ক্রমাগত সময় বাড়াইয়া নিয়া ২ ঘন্টা ৩ ঘন্টা পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করিও। শিশুদের শক্তি ও সহ্য অনুযায়ী পড়ার চাপ দিও। সারা দিনই পড়াইও না, ইহাতে শিশুরা পড়ার পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া আর পড়িতে চাহিবে না। তদুপরি বেশী মেহনতের কারণে মন

মেজাজ খারাপ হইয়া মেধাশক্তি হ্রাস পাইতে পারে এবং রুগ্নের মত অলসতায় পাইয়া বসিবে। পড়ায় আর মন বসাইবে না।

১৮। ছেলেমেয়েদিগকে যে বিষয়েই শিক্ষা দাও না কেন, সে বিষয়ের পূর্ণ উপযুক্ত ও জ্ঞানী পারদর্শী শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা দেওয়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিও না। কেহ কেহ সস্তা ওস্তাদ রাখিয়া ছেলেমেয়েদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে, যাহার ফলে শিক্ষার্থীদের প্রথম হইতেই শিক্ষার ভিত্তি খারাপ হইয়া যায়। শেষে আর ঐ খারাপ ভিত্তি ভাল করা যায় না। উহার সংশোধন অতি কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

১৯। কঠিন বিষয়ের পড়া ভোরের দিকে এবং সহজ পড়া তৃতীয় প্রহরে রাখিও, কেননা শেষদিকে শ্রান্ত ক্লান্ত থাকায় কঠিন পাঠের প্রতি তবিয়ত ঘাব্‌ড়াইয়া যায়।

২০। ছেলেদিগকে, বিশেষতঃ মেয়েদিগকে রন্ধন. কার্য এবং যাবতীয় সেলাইয়ের কাজ অবশ্য শিক্ষা দিও।

২১। বিবাহ-শাদীতে পাত্র-পাত্রীর বয়সের সামঞ্জস্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিও যেন বেশী পার্থক্য না হয়। কেননা, বয়সের বেশী তারতম্য ঘটিলে নানা প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইয়া দাম্পত্য-জীবন বিষময় হইয়া উঠে।

২২। খুব বেশী অল্প বয়সেও বিবাহ হওয়া অনুচিত। ইহাতে বহু ক্ষতি এবং ঝঞ্জাটের সৃষ্টি হয়।

২৩। ছেলেদিগকে খুব ভাল করিয়া বুঝাও এবং তাকিদ কর যে, তাহারা যেন ছোট মেয়েদের ও বয়স্ক স্ত্রীলোকদের সম্মুখে এস্তেঞ্জার ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করিয়া হাটা চলা না করে। ইহা বড়ই বে-হায়ায়ী। এস্তেঞ্জার জন্য পর্দার মধ্যেই সকল পবিত্রতা সমাধা করিবে।

কতিপয় জরুরী উপদেশ

১। পুরাতন ঘটনার খোঁটা দেওয়া বড়ই অন্যায় কথা। মেয়েদের অভ্যাস এই যে, সমস্ত বেদনাদায়ক এবং মনকষ্টকর ঘটনা ও ঝগড়া-কলহের আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া মাফ্ দেওয়া-নেওয়া হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ নূতন কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে সেই পুরাতন কাহিনী লইয়া খোঁটা দিয়া দ্বন্দ্ব কলহ বাড়াইয়া তোলে। ইহাতে গোনাহগার ত হয়ই, তদুপরি বেদনাদায়ক কথায় মন ঘায়েল এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

২। স্বামীর বাড়ীর দোষত্রুটি পিত্রালয়ে গিয়া বর্ণনা করিও না। কোন কোন আয়েবের কথা বলার দরুন গোনাহও হয়, বে-ছবুরীও প্রকাশ পায়। ইহাতে অধিক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে অবর্গতার সৃষ্টি হইয়া মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ পিত্রালয়ের অধিক প্রশংসা স্বামীর বাড়ী বসিয়া প্রচার করিতে নাই। ইহাতেও কোন কোন সময় গৌরব করার এবং অহঙ্কার করার গোনাহ্ হইয়া যায়। তাছাড়া এই ধরনের বাপের বাড়ীর প্রশংসা শুনিয়া শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা মনে করে যে, বৌ আমাদিগকে তুচ্ছভাবে ও ছোট মনে করে। অবশেষে তাহারাও বৌকে সুনজরে দেখে না এবং তুচ্ছ করিতে থাকে।

৩। অযথা কথার বেশী অভ্যাস করিও না। কেননা, অনেক কথার মধ্যে কোন কোন ত্রুটির কথাও প্রকাশ পাইয়া বসে, শেষে উহাতে লজ্জিত হইয়া প্রাণে ব্যথা পাইতে হয়। আবার আখেরাতে গোনাহর বোঝা বহন করিতে হয়।

৪। যতদূর সম্ভব নিজের কাজ অপরের দ্বারা করাইও না; বরং নিজ কাজ নিজ হাতে করিয়া অপরেরও কিছু কাজ করিয়া দিও। ইহাতে তোমার ছওয়াব তো হইবেই, তদুপরি তুমি সকলের স্নেহাস্পদ হইতে পারিবে।

৫। যে সকল স্ত্রীলোক অপর বাড়ীর কথা নিয়া আসিয়া তোমার ঘরে আসর জমাইয়া বসে, তুমি সেই কথায় যোগ দিও না। কেননা, এইরূপ বাজে কথা শুনায় গোনাহ তো হয়ই, তদুপরি কোন সময় ফ্যাসাদও ঘটিয়া থাকে।

৬। স্বামীর বাড়ীর কোন ঘনিষ্ঠ লোকের অর্থাৎ শাশুড়ী, ননদ, জাহ্ ইত্যাদি লোকের বা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের যদি কোন প্রকার দুর্নাম শুনিতে পাও, তবে উহা সত্য মনে করিয়া ইয়াদ করিয়া রাখিও না; বরং যদি এতটুকুন মনোবল না থাকে, তবে যে ব্যক্তি তোমার নিকট তাদের দুর্নাম করিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সামনাসামনি সংশোধন করিয়া লও। ইহাতে ফ্যাসাদ বৃদ্ধি হয় না।

৭। চাকর-চাকরাণীদের উপর সব সময় রাগ করিয়া কঠিন ব্যবহার করিও না। তোমাদের ছেলেপেলেদের প্রতিও দৃষ্টি রাখিও, তাহারা যেন চাকর-চাকরাণীকে এবং তাহাদের ছেলেমেয়ে-দিগকে বিরক্ত না করে। কেননা, ইহারা হয়ত তোমাদের প্রভাবের কারণে মুখে কিছু বলিবে না। কিন্তু মনে মনে অবশ্যই যা-তা বলিবে। আর যদি তারা মনে মনে কিছু না-ই বলে বা গালি না দেয়; কিন্তু জুলুমের গোনাহ্ এবং প্রতিফল নিশ্চয়ই হইবে।

৮। বেহুদা কথায় বা গল্পগুজবে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করিও না। বেশীর ভাগ সময় ছেলেমেয়েদের কোরআন শরীফ ও দ্বীনি কিতাব পড়াইবার জন্য রাখিও। যদি বেশী না পার, তবে অন্ততঃ কোরআন শরীফ পড়ানের পর বেহেশ্তী জেওর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই পড়াইয়া দিও। তোমার নিজের মেয়ে হউক বা অপরের মেয়েই হউক অবশ্যই মেয়েদিগকে কিছু গুণের কাজ শিখাইয়া দিও। কিন্তু কোরআন শরীফ খতম না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে অন্য কাজ দিও না। যখন কোরআন শরীফ খতম হইবে এবং ভালরূপ পরিষ্কার শুদ্ধ পড়া হইয়া যাইবে, তখন প্রতিদিন ভোরে পড়াইয়া দিয়া ছুটির পর খাইয়া আসিলেও তাহাদিগকে লেখা শিখাইও। বৈকালে ১ প্রহর বেলা থাকিতে মেয়েদিগকে রান্নার প্রণালী এবং সেলাইয়ের কাজ শিক্ষা দিও।

৯। যে মেয়েরা তোমার নিকট পড়িতে আসে, তাহাদের দ্বারা নিজস্ব কোন কাজ করাইও না এবং তোমার ছেলেমেয়ে কোলে লওয়াইও না; বরং তাহাদিগকে তোমার নিজ সন্তানের মত মনে করিও।

১০। সুনাম পাওয়ার জন্য অর্থাৎ যশঃ লিপ্সায় পড়িয়া নিজের উপর কোন কঠিন বোঝা চাপাইও না। ইহাতে গোনাহের গোনাহ্, মছিবতে মছিবত হয়।

১১। কোথায়ও যাতায়াতের সময় শাড়ী, পোশাক, অলংকার ইত্যাদি নিয়া বৃথা আড়ম্বরে অভ্যস্ত হইও না। কেননা, ইহাতে গর্ব, অহংকারের লিপ্সা থাকে। অতএব, এইরূপ করাতে বড়ত্বের কামনা করা হয় এবং এই প্রকার ইচ্ছায় গোনাহ হইয়া থাকে। তাছাড়া অধিক সাজ-সজ্জায় ও জাঁকজমকের কারণে যাতায়াতে অযথা বিলম্ব হইয়া যায় ও নানাবিধ বিপদের কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং নিজের নম্রতা ও সরলতার স্বভাব গঠন করিতে যত্নবান হইয়া যে কাপড় তোমার পরিধানে আছে, তাহা যদি বেশী ময়লা না হইয়া থাকে, তবে উহা নিয়াই চল।

আর যদি পরিধানের কাপড় বেশী ময়লা হইয়া থাকে, তবে সাধারণ একটা পরিষ্কার কাপড় ঝটপট বদলাইয়া রওয়ানা হও।

১২। কাহারো অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে গিয়া তাহার বংশের বা মৃত ব্যক্তিদের দোষ উদ্‌ঘাটন করিও না। ইহাতে গোনাহ্ ত হয়ই তদুপরি অনর্থক অপরের প্রাণে আঘাত হানা হয়।

১৩। কাহারো থালা-বাসন বা হাড়ি-পাতিল যদি ঠেকাবশতঃ তোমার ব্যবহারের জন্য আনিয়া থাক, তবে ব্যবহারান্তে তৎক্ষণাৎ উহা মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। আর যদি একটু দেরী দেখ, তবে তোমার বর্তনাদি হইতে পৃথক করিয়া যত্নে রাখিয়া দাও, যেন কোন ক্ষতি না হয়। তদুপরি ভিন্ন করিয়া রাখার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তুমি যদি ধার আনা থালা-বাসন তোমার থালা বাসনের সহিত একত্রে রাখ এবং উহা পুনঃ ব্যবহার করে বস, তবে বিনা অনুমতিতে ব্যবহার হইবে।

১৪। বেশী ভাল খানার অভ্যস্ত হইয়া পড়িও না। কেননা, চিরদিন এক অবস্থায় যায় না। হয়ত বা কোন সময়ে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হইতে পারে।

১৫। উপকারীর উপকার যত ক্ষুদ্র এবং যত তুচ্ছই হউক না কেন, উপকারীর উপকার ভুলিও না। আর তুমি অপরের যত বড় উপকারই করিয়া থাক না কেন, তাহার প্রতিদান চাহিও না।

১৬। যে সময় তোমার কোন কাজ না থাকে, তখন সবচেয়ে উত্তম কাজ হইল কেতাব দেখা। অত্র কিতাবের শেষভাগে যে সকল কিতাবের নাম লিখিত হইয়াছে সেইগুলি পড়িও। আর যে সকল কিতাব পাঠে মন-মগজ কলুষিত এবং আমল খারাপ হয়, তাহা সর্বদা বর্জনীয়।

১৭। অতি জোরে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া কাহাকেও ডাকিও না। তোমার আওয়াজ বাহিরের লোকের কানে যাইবে উহা বড় জঘন্য কথা।

১৮। তুমি যদি রাত্রে অধিক সময় পর্যন্ত জাগিয়া পড়াশুনা করিতে থাক এবং অপর সকল লোক ঘুমে থাকে, তবে শব্দ করিয়া অপরের ঘুম নষ্ট করিও না। তুমি জাগিয়া রহিয়াছ তোমার কাজে, তবে অপরকে কেন কষ্ট দাও? যে কাজ করিতে হয় নিঃশব্দে কর। আস্তে আস্তে দুয়ার খোল, আস্তে পানি পান কর, আস্তে আস্তে কলসীর ঢাকনী দিও এবং আস্তে দরজা বন্ধ করিও।

১৯। যিনি তোমার বয়সে বড় তাহার সহিত কখনও হাসিও না, ইহা বড়ই বে-আদবীর কথা। তদ্রূপ কম আকলের লোকদের সহিত মজাক করিও না, ইহাতে সে বে-আদব হইয়া যাইতে পারে এবং তাহার বে-আদবী তোমার সহ্য হইবে না বা অন্য কোথাও গিয়া বে-আদবী করিয়া বসিলে লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

২০। কাহারো সম্মুখে নিজ পরিজনের লোকের বা ছেলেপেলের প্রশংসা করিও না।

২১। কোন মজলিসের লোক যদি সকলেই দাঁড়াইয়া যায়, তবে তুমি একা বসিয়া থাকিও না। উহাতে অহংকার প্রকাশ পায়।

২২। দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যাপারে কলহ থাকিলে তুমি সে ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে এমন কোন কথা বলিও না, যদ্দরুন তাহাদের মিলমিশ হইয়া গেলে তোমাকে লজ্জিত হইতে হয়।

২৩। যে কাজ অর্থ ব্যয়ের দ্বারা বা নরম কথার দ্বারা উদ্ধার হইতে পারে সেই কাজ করিতে কড়াকড়ি করিয়া বিপদে পড়িও না।

২৪। মেহমানের সম্মুখে কাহাকেও রাগ করিও না। ইহাতে মেহমান যেরূপ খোলাসা মনে বেড়াইতে আসে, তদ্রূপ খোলাসা থাকে না।

২৫। শত্রুর সহিতও ভদ্রোচিত ব্যবহার করিও। উহাতে শত্রুর শত্রুতা বাড়ে না; বরং হ্রাস পায়।

২৬। রুটির টুকরা বা অন্যান্য খাদ্যের অংশ অযত্নে ফেলিয়া রাখিও না। যেখানেই দেখ উঠাইয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া হয় নিজেই খাইয়া ফেল, না হয় কোন জানোয়ারকে দিয়া দাও। যে দস্তরখানায় খাদ্যের কণাদি রহিয়াছে, উহা লোকজনের চলাচলের পথে ঝাড়িও না এবং পায়ে মাড়াইও না।

২৭। খানা খাওয়া হইয়া গেলেই বরতন না উঠাইতেই তুমি উঠিয়া যাইও না, ইহা বে-আদবী।

২৮। মেয়েদিগকে খুব সাবধান করিয়া দাও, তাহারা যেন ছেলেদের সহিত খেলিতে না যায়। ইহাতে সকলের অভ্যাসই খারাপ হইয়া যায়। যে সমস্ত ছেলেরা অপর বাড়ী হইতে তোমাদের বাড়ী খেলিতে আসে তাহারা বয়সে যত ছোটই হউক না কেন, তাহাদিগকে দেখিয়া যেন তোমার মেয়েরা তথা হইতে সরিয়া পড়ে।

২৯। কাহাকেও হাতে পায়ে কাতুকুতু করিয়া হাসাইও না, ইহাতে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতে পারে। আবার কোন সময় বে-জায়গায় ব্যথাও পাইতে পারে। তদ্রূপ মুখেও বেশী হাসিও না। বেশী হাসার কারণে অপরের ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঘটিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিও হইয়া যায়। বিশেষতঃ মেহমানদের সহিত উক্তরূপ হাসি-ঠাট্টা করা একেবারেই অনর্থক। যেমন কেহ কেহ বর-যাত্রীদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করিয়া থাকে।

৩০। তোমার কোন বুযুর্গের শিওরে বসিও না। কিন্তু কোন কারণবশতঃ যদি তিনি হুকুম করেন, তবে তাহার হুকুম পালন করাটাই আদব।

৩১। যদি কাহারো কোন বস্তু ধার আনিয়া থাক, তবে উহা খুব যত্নে রাখিও এবং ব্যবহারান্তে যত শীঘ্র পার পৌঁছাইয়া দাও। এই আশায় থাকিও না যে, সে আসিয়া চাহিলে দিয়া দিব বা সে নিজেই নিয়া নিবে। কেননা, তাহার ত জানা নাই যে, তোমার কাজ হইয়াছে কি না, তারপর এমনও হইতে পারে, সে হয়ত লজ্জার কারণে তাকাদা করিবে না এবং নিজের কাজের সময় বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ধার আনা বস্তু যথা সময়ে না পৌঁছাইলে পর এতগুলি খারাবীর সম্ভাবনা আছে। অতএব, এই বিষয় বিশেষ সতর্ক থাকিও। তদ্রূপ টাকা-পয়সা কর্জ আনিলেও যথাসময়ে তাহা পরিশোধ করিতে সচেষ্ট থাকিও।

৩২। বিশেষ ঠেকাবশতঃ রাত্রে কোথাও যাইতে হইলে হাতের ও পায়ের অলঙ্কার খুলিয়া হাতে নিয়া চল। বাজাইতে বাজাইতে পথ চলিও না।

৩৩। কোন ঘরে কেহ যদি জানালা-কপাট বন্ধ করিয়া একাকী থাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যদি তোমার দরকার পড়ে, তবে হঠাৎ তুমি দরজা ধাক্কা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিও না। হইতে পারে সে বে-খেয়ালে উলঙ্গ হইয়া ঘুমাইয়া থাকিতে পারে। ইহাতে অযথা তাহার আরামের ব্যাঘাত ও মনঃকষ্টের ও লজ্জার কারণ হইতে পারে। অতএব, প্রয়োজন মত তাহাকে আস্তে আস্তে ডাক এবং ভিতরে আসিবার অনুমতি চাও। যদি এজাযত দেয়, তবে ভিতরে ঢুক, অন্যথায় ফিরিয়া আস এবং পুনরায় আসিও। হাঁ, যদি ভীষণ ঠেকার কোন প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে ডাকিয়া জাগাইয়া লও। যতক্ষণ সে উত্তর না দিবে, ভিতরে যাইও না।

৩৪। তোমার কোন অপরিচিত লোকের নিকট কোন দেশের বা শহরের অথবা কোন গোত্রের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করিও না। হইতে পারে এই ব্যক্তিই সেই গোত্রের বা সেই শহরের হইয়া থাকিবে, ইহাতে শেষে তোমার লজ্জিত হইতে হইবে।

৩৫। তদ্রূপ কোন কাজের ত্রুটি দেখিয়া (সেই কাজ যে করিয়াছে তাহা তোমার জানা নাই) এমন কথা বলিও না যে, কোন্ বে-অকুফে এই কাজ করিল অথবা এই ধরনের অন্য কোন তুচ্ছ ও ব্যঙ্গমূলক কথা বলিও না। হয়ত বা ঐ কাজ এমন ব্যক্তিই করিয়াছেন যিনি তোমার অতিশয় শ্রদ্ধেয় ও ভক্তি-ভাজন। শেষে এইকথা জানাজানি হইয়া গেলে তোমার লজ্জার সীমা থাকিবে না।

৩৬। তোমার ছেলেপেলে কোন অন্যায় করিলে কখনো নিজ সন্তানের পক্ষ সমর্থন করিও না। বিশেষ করিয়া বাচ্চার সম্মুখে এইরূপ করাতে বাচ্চার অভ্যাস খারাপ হইয়া যায়।

৩৭। মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পাত্রের দ্বীনদারী পরহেযগারী ও খোদার ভয় আছে কিনা, নম্রস্বভাব আছে কিনা, সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে। যাহাদের অন্তরে খোদার ভয় আছে তাহারা নিজ স্ত্রীর হক আদায় করে এবং সর্বদা স্ত্রীকে আরামে রাখে। আর যার দ্বীনদারী নাই, সে যত বড় বিত্তশালী বা ধনী হউক না কেন, সে স্ত্রীর হকই বুঝিবে না, স্ত্রীর সহিত ভাল ব্যবহার করিবে না। টাকা-পয়সা খরচাদি ঠিকমত দিবে না। আর যদি দেয়ও, তবে অতি জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়া তারপর কিছু দিবে। ইহাদের মহব্বতও কৃত্রিম হইয়া থাকে। সে জন্য তাহারা স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।

৩৮। কোন কোন পর্দানশীন স্ত্রী-লোকদের অভ্যাস যে, তাহারা পর্দার মধ্যে থাকিয়া কাহাকেও ডাকিতে হইলে ঢিলা বা ইট পাথর নিক্ষেপ করিয়া ইশারা দিয়া থাকে। ইহা কোন সময় অন্যের শরীরেও লাগিয়া যাইতে পারে বা কোন বস্তু ক্ষতিও হইতে পারে। সুতরাং এমন কাজ করা চাই যাহাতে কাহারো তক্‌লীফ না হয়। এইরূপ প্রয়োজনে কোন বস্তু খট্‌খটাইয়া শব্দ করিলেই ত যথেষ্ট হইতে পারে।

৩৯। তোমার নিজ কাপড় চোপড়ে সুই সূতার দ্বারা কোন চিহ্ন বা ফুল ইত্যাদি অঙ্কন করিয়া লইও যেন ধোপা বাড়ী কাপড় উলট-পালট না হইতে পারে। অন্যথায় কাপড় বদলাইয়া আসিলে তুমি অপরের কাপড় পরিলে অপরে তোমার কাপড় পরিল, ইহাতে গোনাহগার হইতে হয়। দুনিয়াবী লোকসান তো আছেই।

৪০। আরবদেশে প্রচলন আছে যে, কেহ কোন বুযুর্গের তবারুক পাইতে চাহিলে সেই ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে কাপড় খরিদ করিয়া বুযুর্গ ব্যক্তিকে দু'চার দিন ব্যবহার করিয়া দেওয়ার আবেদন জানায়। তারপর উহা বুযুর্গ ব্যক্তি ব্যবহার করিয়া দিলে নিজে আনিয়া তবারুক হিসাবে ব্যবহারে লাগায়। ইহাতে বুযুর্গ ব্যক্তিদের কোন তকলীফ হয় না। তাহা না হইলে যদি বুযুর্গ ব্যক্তির নিজ ব্যয়ে তোহফা তবারুক দেওয়া আরম্ভ করেন, তবে তাঁহার চালে-চুলায় মানাইবে না। আমাদের দেশের ভক্তেরা বুযুর্গ ব্যক্তিদের নিকট খুব বেশী ছওয়াল করিয়া থাকে, ইহাতে কোন কোন সময় তাঁহাদের বিশেষ চিন্তায় পড়িতে হয় এবং তাঁহারা মনে মনে ভাবেন যে, যদি আরবের মত দস্তুর এই দেশে হইত তবে বড়ই ভাল হইত।

৪১। যদি কোন ব্যক্তি আপন উক্তি হইতে কোন কথা বলে, আর তুমি যদি উক্ত কথার সমুচিত উত্তর দিতে চাও, তবে এইরূপ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উত্তর দিও না যে, "তুমি ত এইরূপ বল, অথচ অমুকে দেখি ঐ রূপ।" এইরূপ আত্ম-গোপন করিয়া কথার প্রতিবাদ করিও না। ইহাতে

ঐ ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া "অমুক ব্যক্তির উপর কর্কশ উক্তি এবং অশ্লীল গালি দিতে পারে। অথচ তুমি গোপন করিয়া যাহার নাম বল্লে সে হয়ত শুনলে দুঃখিত হইবে। অতএব, সোজা বল যে, "তুমি ত এইরূপ বল, কিন্তু আমি উহার প্রতিবাদ করিয়া এইরূপ বলিতে চাই।"

৪২। অনুসন্ধান না করিয়া শুধু অনুমানে কাহারো উপর দোষারোপ করিও না। ইহাতে প্রাণে ভিষণ আঘাত হানে।

অর্থ উপার্জনের এবং হস্ত শিল্পের কতিপয় গুণাবলীর কথা

কোন কোন নিঃসহায় বিধবা স্ত্রীলোক অন্নবস্ত্রের কষ্টে ও অর্থাভাবে দারুণ বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকে। তাহাদের এই মর্মস্পর্শী দুঃখের সমাধান নিম্নের বর্ণিত দুইটি উপায়ে হইতে পারে। উপার্জনক্ষম পুরুষের সহিত বিবাহিত জীবন যাপনের দ্বারা। না হয় হাতের কাজ অর্থাৎ কুটীর শিল্পের মারফত দু'চার পয়সা রোজগারের দ্বারা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, পাক-ভারত উপ-মহাদেশের বিধবা নিঃসহায় স্ত্রীলোকগণ বিবাহ বসা এবং হস্ত শিল্পের কাজে নিন্দা অনুভব করিয়া থাকে। অথচ সমাজের কাহারো পক্ষে এই শরীফদের অভাব মোচন করা সম্ভব নহে। অতএব, এই সহায়হীনদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হইবে?

হে সহায়হীনা বিবিগণ! মনে রাখিও পরের উপর কখনও জোর চলে না। কিন্তু নিজ হাত-পা এবং প্রাণের উপর তো খোদা এখ্তিয়ার দিয়াছেন। তাই মনকে বুঝাও, অন্যের মন্দ বলার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিও না। যদি বিবাহের উপযুক্ত বয়স অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে, তবে বিবাহ বসা উচিত। আর যদি বয়স অধিক হইয়া গিয়া থাকে অথবা বিবাহের মত উপযুক্ত বয়স তো আছে এবং বিবাহ বসা খারাপও মনে করে না; কিন্তু তবিয়তে এই ঝামেলা বরদাশ্ত করিতে চাহে না এবং মন ঘাবড়াইয়া যায়। এমতাবস্থায় কোন পবিত্র শিল্পের মারফত নিজ হাতে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করিও। যদি কেহ তোমাকে নিকৃষ্ট মনে করে বা ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করে ও হাসি-ঠাট্টা করে, তাহাতে তুমি মোটেই পরওয়া করিও না। ২য় বার বিবাহ বসার উপকারিতা সম্বন্ধে পূর্বেই এই কেতাবের ষষ্ঠ খণ্ডে সবকথা খুলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন হাতের কাজের বা কুটীর-শিল্পের কাজ করা বর্ণনা করা যাইতেছে।

মা-ভগ্নিগণ! নিম্ন বর্ণিত কাজসমূহ যদি বে-ইজ্জতির কাজ হইত, তবে আর পয়গম্বর (আঃ)-গণ কখনও উহা করিতেন না। তাহাদের অপেক্ষা বেশী ইজ্জত কাহারো হইতে পারে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে বকরী চরাইয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, এমন কোন পয়গম্বর দুনিয়াতে আসেন নাই যিনি বকরী না চরাইয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও ফরমাইয়াছেন যে, নিজ হাতে অর্জিত হালাল উপার্জনই সর্বাপেক্ষা উত্তম উপার্জন।

হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে অর্জিত অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

আমাদের নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল তথ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাছাড়া পয়গম্বর আলাইহিস্সালামগণের কথা কোরআন পাকেও বর্ণিত আছে। তাহা ছাড়া পয়গম্বর আলাইহিস্সালামগণের জীবনী যে সকল কেতাবে লিখিত আছে, সে সকল কেতাব

হইতেও অল্প কয়েকজনের নাম এবং তাঁহারা যে কাজ করিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

কতিপয় আম্বিয়া (আঃ) ও বুযুর্গ যাঁহারা স্বহস্তে জীবিকা উপার্জন করিতেন

হযরত আদম (আঃ) কৃষিকাজ করিয়াছেন। তিনি আটা পিষিয়াছেন ও রুটি বানাইয়াছেন। হযরত ইদ্রীস (আঃ) লেখার কাজ এবং দর্জির কাজ করিয়া গিয়াছেন।

হযরত নূহ আলাইহিস্‌সালাম গাছ ফাড়িয়া তক্‌তা বানাইয়া নৌকা গড়িয়াছেন অর্থাৎ তিনি মিস্ত্রীর কাজ করিয়াছেন।

হযরত হুদ (আঃ) ও হযরত ছালেহ (আঃ) তেজারতির কাজ করিয়াছেন।

হযরত জুলকরনাইন যিনি বহুত বড় বাদশাহ ছিলেন, অনেকের মতে তিনি নবী ছিলেন। তিনি জাম্বিল বুনন করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ডালা, টুকরী ধামা, আগৈল প্রভৃতির ন্যায় বস্তু তৈয়ার করিতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কৃষিকাজ এবং রাজ-মিস্ত্রী কাজ করিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে খানায়ে কা'আবা পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন।

হযরত লুৎ আলাইহিস্‌সালাম চাষ আবাদের কাজ করিয়াছেন। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্‌-সালাম তীর-ধনুক দিয়া হাত সই করিয়াছেন। হযরত ইসহাক আলাইহিস্‌সালাম, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্‌সালাম এবং তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বকরী পালিতেন এবং বকরীর বাচ্চা বিক্রয় করিতেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য-শস্যের ব্যবসা করিয়াছেন।

হযরত আইয়ুব (আঃ) উট ও বকরী পালিতেন ও উহাদের বাচ্চা হইয়া বড় হইত। তিনি কৃষি-কাজ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বাড়ীতে বকরী পালা হইত। হযরত মূসা (আঃ) কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাঁহার বাড়ী থাকিয়া বকরী চরাইয়াছেন এবং বকরী চরাণের মজুরীই তাঁহার বিবাহের মহর ধার্য হইয়াছিল।

হযরত হারুণ (আঃ) ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম ক্ষেত-খামারের কৃষিকাজ করিয়াছেন।

হযরত দাউদ (আঃ) যুদ্ধের জন্য লৌহ বর্ম তৈয়ার করিতেন, অর্থাৎ কামারের কাজ করিয়া লৌহ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

হযরত লোকমান (আঃ) বিজ্ঞানের সুবিখ্যাত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি বকরীও চরাইতেন।

হযরত সোলায়মান জাম্বিল বুনাইতেন। হযরত জাকারিয়া কাঠ-মিস্ত্রীর কাজ করিতেন। দুনিয়ার সকল পয়গম্বর এবং আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর বকরী চরাণের কথা কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাঁহাদের জীবনধারণ বকরী চরাণের উপরই নির্ভর করিত না, তবু এই কাজ তাঁহারা করিয়াছেন। উক্ত কাজে তাঁহারা আয়েব মনে করিতেন না। তাহা ছাড়া যে সকল বড় বড় ইমামগণের লিখিত কেতাবের মাসআলা হইতে শরীঅতের আইনের ছনদ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, সেই সকল ইমামগণের কেহ কাপড় বুনিয়াছেন, কেহ চামড়ার কাজ করিয়াছেন, কেহ মিঠাই বানাইয়াছেন, অথচ তাঁহাদের চাইতে অধিক সম্মানী কে হইতে পারে?

জীবিকা অর্জনের কতিপয় সহজ উপায়

নিম্নলিখিত কাজসমূহের দ্বারা সহজে জীবিকা উপার্জন করা যাইতে পারে। যথা—সাবান প্রস্তুত করা, গুটা বুনান, চিকণ কাজ, জালি বুনান, কমর বন্ধ বা দোয়াল বানান, সূতার বোতাম তৈয়ার করা, সূতি বা পশমী মোজা বুনান, জাম্পার ও মাফলার তৈয়ার করা, টুপি, ছদরিয়া, ব্লাউজ ও জামা ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করা, লেখার কালি তৈয়ার করা, কাপড় রংগানের কাজ করা।

শতরঞ্জির উপর নক্সা করা, টুপীর উপর নক্সা করা। আর যদি সেলাইয়ের কল খরিদ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আরও দ্রুত কাজ হইতে পারে এবং আনেক লাভ হইবার কথা। আজ-কাল অল্প মূল্যেই সেলাইয়ের কল সংগ্রহ করা যায়। ইহাছাড়া হাঁস মুরগী ও কবুতর পালিয়া উহাদের আণ্ডা বা বাচ্চা বিক্রি করা, রেহাল, চৌকি, সিন্দুক ইত্যাদি রংগান, মেয়েদিগকে বালিকা মক্তব করিয়া পড়ান, চরকায় সূতা কাটা, সূতা ও তূলা বিক্রয় করা, সূতা কাটিয়া নেওড় (ফিতা) বুনান, কাপড় বুনাইয়া বিক্রি করা, ধান কিনিয়া চাউল তৈয়ার করা, চিড়া কোটা, মুড়ি ভাজিয়া বিক্রি করা, কেতাব জেলদ করা, চাটনী, আচার, মোরব্বা বানাইয়া বিক্রি করা, দড়ি বুনান, চৌকি তৈয়ার করা ও উহাতে নক্সা করা, দড়ি পাকান, বেতের চেয়ার, টেবিল, ব্যাগ, বাক্স ইত্যাদি তৈয়ার করা, বাঁশের ডালা, খালই, চালুনি, ঝাড়নি ইত্যাদি তৈয়ার করা, বিভিন্ন প্রকারের চূর্ণ ঔষধের বড়ি তৈয়ার করা, যথা—নিমকে সোলেমানী তৈয়ার করা, সুরমার পাথর চূর্ণ করিয়া বিক্রি করা, শরবতে আনার, শরবতে ওন্নাব, শরবতে ফোলাদ, ছিরকা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা। স্বর্ণ অথবা রৌপ্য নির্মিত তারের গুটা অর্থাৎ পাতলা লেছ তৈয়ার করিয়া ব্যবসা করা, হাড়ি পাতিল কলাই করা, খেজুর পাতার চাটাই বানান, তাল পাতার পাংখা তৈয়ার করা, কাপড়ে ছাপা রং করা, যেমন জায়নামায, দস্তরখানা, রুমাল, পাগড়ী ইত্যাদিতে ছাপার রং দেওয়া হইয়া থাকে। ফসলের মওসুমের সময় কিছু কিনিয়া রাখিয়া পরে মূল্য বাড়িয়া গেলে বিক্রি করা, সুরমা পিষিয়া উহার সহিত কোন উপকারী ঔষধ মিশাইয়া পুরিন্দা করিয়া বিক্রি করা, তামাক প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা, বিস্কুট এবং পাউরুটি প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা, সূতার ডুরী পাকান, রাং অথবা মুক্তা চূর্ণ করিয়া বিক্রি করা এবং এইরূপ হালকা ও চালু বহু কাজ আছে যেটার সুবিধা-সুযোগ হয় করিবে। কতকগুলি কাজ এমন আছে যাহা না দেখিয়া বুঝে আসে না। সেইরূপ কাজ কোন জ্ঞানী বা অভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে শিখিয়া লইবে। কোন কোন কাজ এমনও আছে যাহা শুধু কেতাব পড়িয়া করা যায় সেইরূপ কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অর্থকরী শিল্পের নিয়ম পদ্ধতি লিখা হইতেছে। নবম খণ্ডে চূর্ণ, নিমক সোলেমানী, রাঙ্গ এবং মুক্তা ভস্ম প্রস্তুতের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। এই খণ্ডে অতীব প্রয়োজনীয় শিল্প কাজের কথা লিপিবদ্ধ করা হইল।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী

সাবান প্রস্তুতের প্রাচীন নিয়মঃ

উপাদান—সাজি মাটি এক মণ, চুনা এক মণ, এড়ণ্ড তৈল নয় সের, চর্বি সতর সের। প্রথমে পরিষ্কার স্থানে সাজি মাটি রাখিয়া, ঢেলা থাকিলে গুড়া করিয়া উহার সহিত চুনা উত্তমরূপে

মিশাইবে। গোটা গোটা থাকিলে একটু পানির ছিটা দিলেই নরম হইয়া যাইবে। একটা পাকা হাউজ তৈয়ার করিয়া নিবে, না হয় একটা গভীর সমতল পাত্রের ব্যবস্থা করিবে। উহার মধ্যে চার কোণায় চারটি ইট রাখিয়া তাহার উপর একটা বড় ছিদ্র বিশিষ্ট লোহার জাল বিছাও এবং জালের উপর একটা চট বিছাও যাহা উক্ত হাউজের বা পাত্রের কিনারার বাহিরেও কিছু অংশ ঝুলিয়া থাকে। আর যদি লোহার জাল না পাও, তবে বাঁশের বুনান চালুনী হইলেও হয়। উহার উপর চট বিছাও, এখন চুনা ও সাজি-মাটি চটের উপর রাখিয়া দাও এবং কিছু পানি ছিটাইয়া দাও যেন উহা হইতে আরক নিংড়াইয়া পড়িতে থাকে।

নীচের হাউজের একদিকে একটা ছিদ্র পথে নল দ্বারা উক্ত আরক কলসীতে ভরিবে। ক্রমাগত পানি দিতে থাকিবে, আর আরক নিংড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। ১ম বারের আরক লাল বর্ণের হইবে। অতঃপর ২য় বারের আরক কিছুটা সাদা হইয়া আসিবে, তারপর একেবারে সাদা পানি যতক্ষণ না নিংড়াইবে চুনার উপর কতক্ষণ পর পর পানি ছিটাইতে থাকিবে এবং সকল পানি বিভিন্ন কলসীতে ভরিয়া রাখিবে। শেষে সাদা পানি বাহির হইতে থাকিলে চুনা যাহা থাকিয়া যাইবে উহা নাড়াচাড়া দিয়া টপকাইয়া সমাপ্ত করিবে এবং ১ম পানি, ২য় পানি ও ৩য় পানি ভিন্ন ভিন্ন কলসীতে রাখিবে। শেষের সাদা পানি এক কলসীর বেশী রাখিতে হইবে না। পানি ভিন্ন ভিন্ন না রাখিলেও চলে, শুধু শেষের পানি এক কলস রাখিলেই চলিবে।

পাকা হাউজের নক্সা—

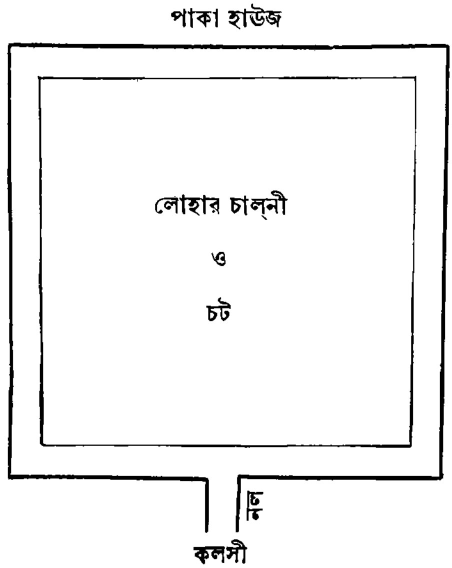

এখন চুল্লীর উপর বড় কড়াই বসাইয়া উহার মধ্যে এক লোটা পরিষ্কার পানি ঢাল এবং জ্বাল দিতে থাক। উক্ত পানির সহিত চর্বি এবং তৈলও কড়াইয়ে ঢাল। উত্তপ্ত হইলে পর ঝরানো পানি যাহা শেষবারের এক কলস রাখা হইয়াছে তাহা এক লোটা করিয়া কড়াইর মধ্যে দিয়া কষাইতে থাক, এইরূপে ধীরে ধীরে সকল পানি কষাইয়া শেষ কর। যখন জ্বাল দিতে দিতে ও নাড়িতে নাড়িতে ঘন হইয়া যাইবে, তখন হাতল দ্বারা সাবানের কেওয়াম উঠাইয়া হাতে ধরিয়া দেখ যে, হাতে লাগিয়া যায় কি না। যদি লাগিয়া যায়, তবে আরও জ্বাল দাও এবং শক্ত কর। যখন দেখিবে যে, আর হাতে লাগে না এবং বড়ি পাকাইলে শক্ত হইয়া যায়, তবে তখনই চুলার আগুন কমাইয়া

ভিতরের সকল কয়লা সরাইয়া ফেল। তারপর একটা হাউজ, হয় তক্‌তা দিয়া না হয় ইট দিয়া বানাইয়া উহার মধ্যে চট বা পুরাতন খাতা যাহা ছিঁড়া ফাঁড়া নহে বিছাইয়া উহার উপর সাবানের খামীর অল্প অল্প শুকাইয়া ফেল, তারপর কাটিয়া কাটিয়া রুচিমত সাইজ বানাইয়া লও। বস, সাবান তৈয়ার হইয়া গেল।

যে চুলায় সাবান পাকান হইবে তাহার আকৃতি এইরূপ হইবে, ইহাতে সকল দিকে সমান তাপ লাগে। অল্প সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে হাউজের দরকার নাই।

যে হাউজে সাবান ঢালিবে তাহা যদি তক্‌তা দ্বারা তৈয়ার করিতে চাও, তবে উহার চারিধারে ইট দ্বারা ঠেস্ দিও যেন ছুটিয়া না যায়। আর পাকা হইলে ত কথাই নাই।

সাবান প্রস্তুত করিতে যে সকল বর্তনাদির দরকার হয় তাহার বিবরণঃ

পোলাও পাকানের হাতার মত একটি বড় বাটযুক্ত লোহার অথবা কাঠের হাতা, একটি তিন সের পানি ধরার মত বড় পট্ যাহার সহিত লম্বা বাট থাকিবে; উহা দ্বারা আরক ঢালিতে উঠাইতে সহজ হইবে। সাবান পাক হইলে পর কড়াই হইতে নামাইবার জন্য ডাবা বা একটি বড় উকরী রাখিবে। যেমন পোলাও বাড়ার জন্য রাখা হয়।

সাবান প্রস্তুতের আধুনিক পদ্ধতিঃ

বর্তমান যমানার অনতিকাল পূর্বে পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বত্রই সাজি মাটি, চুনা ও তৈলের দ্বারা সাবান প্রস্তুত হইত। উহার নিয়ম প্রণালী যেমন কঠিন এবং মালও ভাল তৈরি হইত না, উহাকে কাঁচা সাবান বলা হইত।

বর্তমানে বিভিন্ন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাবান শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আজকাল সাবান প্রস্তুতের প্রণালী অতীব সহজ এবং মহোপকারী আবিষ্কার প্রকাশ লাভ করিয়াছে। উহার মধ্যে কাপড় কাঁচা সাবান প্রস্তুত করা অতি সহজ যাহা প্রতি ঘরেই অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই বিষয় কিছু লেখা যাইতেছে।

যদি কাহারো অন্যান্য প্রকার সাবান প্রস্তুত করার ইচ্ছা থাকে, তবে পুস্তক প্রণেতার নিকট হইতে চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিয়ম জানিতে পারা যাইবে।

বিলাতী সাবান দুই নিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক প্রকারকে কাঁচা বা কোল্ড প্রসেস, অপরটিকে পাকা বা হার্ড প্রসেস বলে। পাকা সাবান প্রস্তুত করা যদিও একটু কঠিন, কিন্তু কাঁচা সাবানের তুলনায় মূল্য কম এবং অতি অল্প ক্ষয় হয়, আর কাপড় খুব পরিষ্কার করে।

প্রথম প্রথম সাবান প্রস্তুত করিতে গিয়া হয়ত দু'চার বার খারাপ হইতে পারে কিন্তু শেষে তৈয়ারের অভ্যাস হইলে পর ইহা বড়ই লাভজনক।

উক্ত সাবান প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ দুইটি জিনিস দরকার। একটি তৈল, অপরটি কষ্টিক। কষ্টিক এক প্রকারের সাদা ধবধবে অতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। উহা গুঁড়াও থাকে এবং আস্তও পাওয়া যায়। আস্তগুলি টুকরা করিয়া লইতে হয়। উহা হাতে ধরা যায় না। কষ্টিক সাধারণতঃ শহরের বড় বড় বেনেতী দোকানে পাওয়া যায়। মূল্যও তত বেশী নয়। মাত্র এক টাকা বা পাঁচ সিকা সের। গুঁড়া কষ্টিকের নাম ৯৮+৯৯ এর কষ্টিক। আস্ত কষ্টিকের নাম ৬০+৬২ এর কষ্টিক। ২য় প্রকারের কষ্টিকের মূল্য কম।

সাবান প্রস্তুতের পূর্বে কষ্টিক পানিতে ভিজাইয়া গলাইয়া নিতে হয়। গলিত কষ্টিককে লাই বলা হয়। ৯৮+৯৯ এর কষ্টিকের এক সেরের মধ্যে যদি আড়াই সের পানি দেওয়া হয় এবং

৬০+৬২ এর কষ্টিকের এক সেরের মধ্যে যদি দুই সের পানি দেওয়া হয়, তবে উহাতে ৩৫ ডিগ্রির লাই তৈয়ার হয়। কিন্তু কষ্টিকের উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার উপর ডিগ্রির পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, ৩৫ ডিগ্রির স্থলে ৩৩ অথবা ৩৪ ডিগ্রির লাই হইয়া যায়। আবার কখনও ৩৬ বা ৩৭ ডিগ্রিও হইয়া পড়ে, যাহা পাকা সাবানে ব্যবহারে তদ্রূপ কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় না। কিন্তু উচ্চ ডিগ্রির লাই কাঁচা সাবানে ব্যবহৃত হইলে কিছু ক্ষতি হইয়া যায়। সাবানের কারখানায় লাইয়ের ডিগ্রি দেখিবার হাইড্রোমিটার নামক এক প্রকার যন্ত্র থাকে, যাহা তিন চার টাকার মধ্যে খরিদ করা যায়। উহা দ্বারা ডিগ্রির সঠিক প্রমাণ নির্ধারণ করা যায়।

সাবানের উপাদানের তালিকা

তালিকা নং-১

চর্বি ৵৫ সের, ২৫ ডিগ্রির কষ্টিকের লাই ৵২৷৷০ সের, সোডা ৵২৷৷০, পানি ৵২৷০ সের।

তালিকা নং-২

চর্বি ৵৫ সের; বাহরোযাহ্‌ ৵২৷৷০ সের; ৩৫ ডিগ্রির কষ্টিকের লাই ৵৩৷৷০ সের; সোডা ৵৩৷৷০ সের; পানি ৵৪ সের।

প্রস্তুতের নিয়ম

প্রথমে চর্বি গলাইয়া নেকড়ায় ছাকিয়া লইবে। যদি বাহরোযাহ্‌ মিশাইতে হয়, তবে চর্বির সহিত গলাইয়া নেকড়ায় ছাঁকিয়া নিবে। অতঃপর চুলার উপর কড়াই বসাইয়া পানি দিবে এবং সোডা মিশাইয়া আগুনের তাপ দিতে থাকিবে, যখন বলক আসিয়া সোডা গলিয়া যাইবে, তখন চর্বি ও কষ্টিকের পানি ঢালিয়া দিয়া হাতল দ্বারা খুব নাড়িতে থাকিবে এবং হাল্‌কা তাপে পাক করিতে থাকিবে। পাক হইতে হইতে যখন খুব ঘন ও থকথকে হইয়া ছিদ্র হইয়া পানি উপরে উঠিয়া আসে এবং বুদবুদ বাহির না হয়, তখন মনে করিবে যে পোড়া লাগার সময় হইয়াছে। তখন এক পোয়া অনুমান কষ্টিকের পানি ঢালিয়া দিবে। উত্তাপ পাইয়া যখন কচি গাইয়ের নূতন দুধের মত কাটা কাটা দাগ পড়িবে, তখন মনে করিবে যে ঠিক আছে এবং আরও একটু জ্বাল দিতে হইবে। পুনরায় একটু কষ্টিকের পানি দিয়া ভালমতে ফাটাইয়া পাকাইলেই উত্তম সাবান প্রস্তুত হইবে। এইরূপে হাল্‌কা তাপে ২/৩ ঘন্টা পর্যন্ত জ্বাল দিলে মধুর ন্যায় ঘন হইয়া যাইবে। ভালরূপ গাঢ় না হইলে আরও এক পোয়া চর্বি ঢালিবে এবং জ্বাল দিয়া জমাট বাঁধাইতে হইবে। অতঃপর রুচি মত ছাঁচে ঢালিয়া সাইজ মত সাবান তৈয়ার করিয়া নিবে।

—(মীর মাআছুম আলী সাহেব, খয়ের নগর, মীরাট; ইউ, পি)

কাপড়ে ছাপা রং করিবার নিয়ম

জরদ রং প্রস্তুতের নিয়ম ঃ একসের পানির মধ্যে এক পোয়া 'নাগুরী গুন্দ' ভিজাইয়া গলাইতে হইবে। ছয় মাশা ঘি ও ছয় মাশা গেঁহুর আটা ভালরূপে মিশাইয়া উহার মধ্যে এক পোয়া হিরার কস এবং তিন মাশা 'গুলিছোরখ টোল' উত্তমরূপে মিশাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। অতঃপর খুব গাঢ় করিয়া উহা দ্বারা কাপড়ে ছাপা রং দিবে। এই রং এক খণ্ড কাপড়ে লাগাইয়া উহার উপর কাঠের ছাপ চাপা দিয়া রং জড়াইবে এবং যে কাপড়ে লাগাইবে উহা সমান চৌকির উপর রাখিয়া লইবে। কাপড়টির নীচে চট বা কম্বল বিছাইয়া লইলে ছাপ উত্তম হইয়া থাকে। কাঠের ছাপার ছাঁচ মিস্ত্রীদের দ্বারা তৈয়ার করা যায় অথবা বাজারে খরিদ করিতেও পাওয়া যায়।

কাল রং প্রস্তুতের নিয়মঃ এক ছটাক বিলাতী রং—যাহাকে পেড়ি বলে, উহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় এবং এক পোয়া 'নাগুরী গুন্দ', একসের পানিতে ভিজাইয়া লালা প্রস্তুত করিবে এবং উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। উহার সহিত এক ছটাক পটাস, ছয় মাশা তুতিয়া, ছয় মাশা গেঁহুর আটা এবং ছয় মাশা ঘি উহার সহিত খুব ভাল মত মিশাইয়া গাঢ় রং প্রস্তুত করিয়া কাপড় ছাপাইবে।

লেখার কালি প্রস্তুত প্রণালী

বাবলার আঠা এক সের, কাজল এক পোয়া, ফিটকারী ছয় মাশা, বাবলার ছাল এক ছটাক, আমের ছাল এক ছটাক, মেহেদি গাছ এক ছটাক, তুতিয়া এক ছটাক।

দেড় সের পানির সহিত আঠা গলাইয়া কাজল খুব ভালমত মিশাইবে। উল্লিখিত গাছের ছালসমূহ এক সের পানির সহিত জ্বাল দিয়া ক্বাথ বানাইয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে। অতঃপর কাজল মিশান আঠার পানির সহিত খুব মিশাইবে; তারপর তুতিয়া, ফিটকারী, খয়ের এক ছটাক পানিতে মিশাইয়া উহা কাজল ও আঠা মিশ্রিত পানির সহিত মিশাইয়া লোহার কড়াইয়ের মধ্যে রাখিয়া খুব ঘুটিবে। ইহা কোন পাত্রে ঢালিয়া পাতল করিয়া শুকাইয়া নিলেই কালি প্রস্তুত হইয়া গেলে।

ইংরেজী কালি তৈয়ার করিবার নিয়ম

প্রথম শ্রেণীর নীল রং এক তোলা, বেগুনী রং এক তোলা, সোডা ১০ মাশা, ১০ তোলা পানির সহিত সোডা এবং দুনো প্রকারের রং মিশাইয়া গরম করিবে, তবেই ইংরেজী কালি তৈয়ার হইবে।

কাঠের আসবাব-পত্র বার্নিস করার নিয়ম

কাঠে যে রং দিবার ইচ্ছা হয়, সেই রংয়ের গুঁড়া বাজার হইতে আনিয়া তার্পিন তৈলের সহিত খুব গাঢ় করিয়া মিশ্রিত করিবে, ইহা ব্রাস দ্বারা না হয় কাঠ বিড়ালীর লেজ অথবা কাঠের সহিত নেকড়া বাধিয়া বা পাখীর পালক দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী সাদাসিধা না হয় ফুল-বুটা ইত্যাদির নক্‌শা করিয়া রং লাগাইবে। শুষ্ক হওয়ার পর বার্নিসের তৈল পালিশ করিয়া শুকাইয়া নিলেই আস্তে আস্তে চমকদার হইয়া উঠিবে।

বাসন-পত্র কালাই করার নিয়ম

এক পোয়া নিশাদল, তিন ছাটাক পানিসহ একটি পাত্রে নিয়া পানি শুকাইয়া যাওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিবে। শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে নামাইয়া গুঁড়া করিবে। যে বরতন কালাই করিতে হইবে, উহা ভালরূপে মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া নিবে। তারপর উহাকে আগুনের উত্তাপে খুব উত্তপ্ত করিয়া কার্পাস তূলার সাহায্যে নিশাদল চূর্ণ উক্ত বর্তনে মুছাইয়া দিয়া কালাই করার সামান্য রং উহাতে দিয়া তূলার দ্বারা সমস্ত স্থানে এমনভাবে ছড়াইয়া মুছাইয়া দিবে যাহাতে সকল স্থানে সমানভাবে রং লাগিয়া যায়। কালাই হইয়া গেলে বর্তনটা সাঁড়াশী দ্বারা ধরিয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পর উহা ঠাণ্ডা হইলেই কালাই হইয়া গেল।

তামা-পিতল ঝালাই করার নিয়ম

কাঁসা চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ সোহাগা চূর্ণ লইয়া উভয় বস্তু খুব মিহিন করিয়া একটি পাত্রে রাখিবে। যে হাড়ি বা পাতিলের ফাটা জোড়ান বা তালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়, আর তাহাতে যদি পূর্বের কোন তালি দেওয়া থাকে, তবে আগুনে উত্তাপ দেওয়ার পূর্বেই আগের জোড়া বা

ফাটা স্থানে কাদা মাটির দ্বারা পূর্ণ করিয়া এমনভাবে জুড়িয়া দিবে, যেন ছুটিয়া না যায়। অতঃপর যে স্থানে টাক লাগিল বা ফাটা জোড়ানের প্রয়োজন, সে স্থানে বর্তনের ভিতর দিক দিয়া কাঁসা চূর্ণ লাগাইয়া দিয়া খুব উত্তাপ দিবে, (টাকের স্থানটা আগুনের একটু উপরের দিকে থাকা ভাল) যখন অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া যাইবে, তখন আগুনের তাপের এক পার্শ্বে সরাইয়া ধরিবে, তবেই কাঁসার গুঁড়া গলিয়া কাটা স্থান জুড়িয়া যাইবে বা টাক জোড়া লাগিবে। ইহাকে পাকা ঝালাই বলে। ইহা ছাড়া কাঁচা ঝালাই এবং তালি লাগানেরও ব্যবস্থা আছে। যে পাতিল বা বরতনে জোড়া দিতে হইবে উহার বাহিরের দিকটা খুব পরিষ্কার করিয়া দিবে। অতঃপর একটু এসিড ঐ স্থানে লাগাইয়া উত্তপ্ত হাতল দ্বারা রাং লাগাইয়া উক্ত ফাটার উপর ধরিবে বা টাকের চার দিকে রাং লাগাইয়া দিবে। তাহা হইলেই জোড়া লাগিয়া যাইবে। টাকটি একটু চাপিয়া ধরিয়া রাং লাগাইবে অন্যথায় তাড়াতাড়ি এবং অল্প রাং-এ জোড়া লাগান দুষ্কর। ঝালাই করা স্থান উঁচু নীচু থাকিলে রেত দ্বারা ঘষিয়া সমান করিয়া দিবে।

তামাক প্রস্তুতের নিয়ম

যেই প্রকারের তামাক তবিয়তে চায় তাহা খুব কুচি কুচি করিয়া কাটিবে এবং (শীরা) বার বা চিটাগুড় শীতকালে সমপরিমাণ, গরমের দিনে সমপরিমাণের চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক এবং বর্ষাকালে সমপরিমাণের চেয়ে কিছু কম মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে কাহেলে বা ঢেঁকিতে কুটিবে। অল্প তামাক হইলে হাতেই মাখাইতে হয়। ইহাতে বড় পরিশ্রম, তাই তামাক মাখার মজুরী দিয়া কোন দোকানদারের দ্বারা না হয় মজুরের দ্বারা কোটান যাইতে পারে।

খোশবুদার তামাক প্রস্তুতের নিয়ম

লবঙ্গ, জটা মাংসী, চন্দন কাঠের গুঁড়া, বড় এলাচী, সোন্দা, দারুচিনি, বাউবীর হেনা আতর ইত্যাদি সুগন্ধি বস্তু সমপরিমাণ লইবে। প্রতি সের তামাকের সহিত অর্ধ ছটাক মিশ্রিত সুগন্ধি এবং তিন চার মাসা হেনার আতরও মিশাইবে। ইহা সাদা তামাকের সহিতও মাখান যায় আবার মাখা তামাকের সহিতও মিশান যায়।

সহজ পাচ্য সুজির রুটি প্রস্তুতের নিয়ম

সুজির সহিত পানি মিশাইয়া খুব ছানিবে, বেশী নরম যেন না হয়। অতঃপর পেড়া বানাইয়া একটি পাত্রে আন্দাজ মত পানি লইয়া উক্ত পেড়া আধা সিদ্ধ করিয়া নামাইয়া পানি ফেলিয়া দিবে। তারপর পেড়াগুলিকে ভাংগিয়া উহার সহিত এই পরিমাণ ঘি মিশাইয়া ছানিয়া নিবে যেন একটু নরম হইয়া যায়। তারপর রুটি বানাইয়া পানি ও ঘি ছাড়া তাওয়ায় করিয়া হাল্‌কা তাপে গরম করিয়া নিবে। রুটিগুলি মোটা বানাইবে না। এই রুটি অনেক দিন স্থায়ী হয়।

গোশ্‌ত পাকাইবার নিয়ম যাহা ছয় মাসেও খারাপ হয় না

১নং—যে সকল মসল্লা গোশ্‌তে দেওয়া হইবে তাহা ভাল মত পিষিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া নিবে। অতঃপর এক পোয়া গোশ্‌তের জন্য এক ছটাক ঘি লইয়া উহাতে পেঁয়াজ ভুনিয়া পরিমাণ মত লবণ এবং কিছু কাচ্‌রী (ফল বিশেষ) গোশ্‌তের সহিত লইয়া ঘির মধ্যে ছাড়িয়া দিবে এবং পাতিলের মুখ ঢাকনা দিয়া বন্ধ করিয়া হাল্‌কা আগুনে পাকাইতে থাকিবে। গোশ্‌তের টুকরাগুলির মধ্য হইতে যে পর্যন্ত স্বাভাবিক পানি একেবারে শুষ্ক হইয়া না যায় ততক্ষণ জ্বাল দিতে থাকিবে। পানি শুষ্ক হইয়া গোশ্‌ত সিদ্ধ হইয়া গেলে উহা ঘি হইতে পৃথক করিয়া নিয়া উক্ত ঘির মধ্যে আরও এক ছটাক ঘি ঢালিবে। অতঃপর মসল্লার গুঁড়া ঘির মধ্যে আধ ভুনা করিয়া গোশ্‌ত দিবে

এবং নিয়মিতভাবে পাক শেষ করিবে। কিন্তু কোন মতেই পানি দেওয়া চলিবে না। পাক সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে কিছু গরম মসল্লাও দিবে। এখন দেখা গেল যে, এক পোয়া গোশ্‌তে আধ পোয়া ঘি খরচ হইল। গোশ্‌তে যদি ঘি বেশী মনে হয়, তবে উহা হইতে কিছু ঘি উঠাইয়া রাখিয়া অন্য কাজে লাগাইবে। পাকান গোশ্‌ত চুলার উপর হইতে গরম গরম নামাইয়া ঢাকনাসহ তূলার মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিবে। না হয় গোশ্‌তের পাতিলের চতুর্দিক তূলা দ্বারা মোড়াইয়া রাখিবে। গরমের দিনে প্রত্যেহ এবং শীতের দিনে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন খুব গরম করিয়া তাড়াতাড়ি পূর্বের ন্যায় তূলার মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিবে।

গোশ্‌ত পাকানের ২য় নিয়ম

১নং নিয়মানুযায়ী মসল্লা রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, অতঃপর ১ নং নিয়মানুযায়ী এক পোয়া গোশ্‌তের জন্য এক ছটাক ঘি লইয়া পেঁয়াজ ভুনিয়া নিমক এবং কাচরী দিবে। অতঃপর পানি ব্যতীত ১ নং নিয়ম মত ঐ ঘির মধ্যে গোশ্‌ত ছাড়িয়া ডেক্সির মুখ বন্ধ করিয়া হাল্‌কা তাপে ভুনিবে, গোশ্‌তের টুক্‌রাগুলির সৃষ্টিগত পানি যে পর্যন্ত না শুষ্ক হইয়া যাইবে ততক্ষণ জ্বাল দিবে। যখন দেখিবে যে, গোশ্‌তের টুকরা হইতে ফেনা বা বুদ্‌বুদ্‌ উঠে না, তখন মনে করিবে যে গেশ্‌তের পানি এখন আর নই। অতঃপর ইচ্ছামত গোশ্‌ত গলাইয়া দেওয়ার নিয়ম এই যে, উক্ত গোশ্‌ত ডুবিয়া যায়, এই পরিমাণ পানি উহাতে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে যেন গোশ্‌ত ইচ্ছামত সিদ্ধ হইয়া গলিয়া যায়। অতঃপর জ্বাল দিতে দিতে পানি একেবারে শুকাইয়া ফেলিবে।

পানি শুষ্ক হইলে পর গোশ্‌ত হইতে কোন ফেনা ও বুদবুদ হইবে বা এবং আবড় পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া গোশ্‌তের টুকরাগুলি পূর্বাপেক্ষা ছোট হইয়া যাইবে। কেননা, পূর্বে পানির গোশ্‌ত ফুলিয়া বড় হইয়াছিল। যখন পানির অংশ একেবারেই থাকিবে না, তখন ১ নং নিয়মানুসারে গোশ্‌ত ঘি হইতে ভিন্ন করিয়া, আরও এক ছটাক ঘি উহাতে ঢালিবে, সকল মসল্লা আধ-ভুনা করিয়া উহার মধ্যে গোশ্‌ত ছাড়িয়া পানি ব্যতিরেকে পাকাইতে হইবে। নিয়ম মত পাক হইলে পর গরম মসল্লা দিয়া গরম গরম কোন একটি ঢাকনাদার পাত্রে ঢালিয়া তূলার মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিবে, না হয় তূলা দ্বারা মোড়াইয়া ফেলিবে। উক্ত গোশ্‌ত শীতকালে তিন দিন অন্তর একবার এবং গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ একবার খুব গরম করিতে থাকিবে এবং তূলার মধ্যে রাখিবে। ইহা প্রায় দুই মাসকাল স্থায়ী হইবে।

বিস্কুট পাউরুটি প্রস্তুত প্রণালী

সুজি অথবা ময়দার সহিত খামীর মিশ্রিত করিয়া ভালমত মন্থন করিয়া কোন কাঠের খঞ্চির 'উপর ফেলিয়া খুব কোটিতে হইবে। তারপর ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া তন্দুর গরম করিয়া ভিতরের আগুন ও কয়লা সরাইয়া দিয়া পাউরুটির ছাঁচগুলি তন্দুরের মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পাক হইয়া গেলে বাহির করিয়া লইবে। পূর্ণ বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

পাউরুটির খামীর প্রস্তুত করার নিয়ম—লবঙ্গ, এলাচী, জায়ফল, যাবিত্রী, ইন্দ্রযব, সমুদ্র ফেনা, তালমাখানা, পদ্মবীজ, প্রবালের শিকড়, নাগেরশ্বর গোলাব ফুল, দারুচিনি, কাঙ্খী-মূল, গোক্ষুর ছোট-বড়, চোব চিনি ও কাবাব চিনি এই সকল দ্রব্য তিন তিন মাসা, জাফরান ছয় মাসা, লইয়া সব দ্রব্য কোটিয়া চালিয়া মজবুত কর্কের একটি শিশিতে রাখিয়া শিশির মুখটা শক্ত মত বন্ধ করিয়া রাখিবে। তাহা ছাড়া দেড় দেড় মাসা প্রত্যেক দ্রব্য লইয়া খামীর বানানো যায়। ইহার কমে মসল্লা ঠিক হইবে না।

খামীর প্রস্তুত করিবার সময় প্রয়োজন মত এই উপাদানটি দেড় মাসা পরিমাণ লইয়া উহার সহিত সোয়া তোলা দধি মিশাইবে। তারপর উহার সহিত ময়দা মিশ্রিত করিয়া এই পরিমাণ শক্ত করিবে যেন কানের লতির মত হয়। এখন একটা ঢিলার মত করিয়া এক খণ্ড কাপড়ে সামান্য ঢিলা করিয়া বাঁধিয়া কোন উঁচুস্থানে তিন দিন পর্যন্ত লটকাইয়া রাখিবে। ৪র্থ দিনে উহা নামাইয়া দেখিবে যে, খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং ঢেলাটার উপর পাঁপড়ি পড়িয়াছে। পাঁপড়ি পরিষ্কার করিয়া উহার মধ্য হইতে আঠাল লেছদার খামীর বাহির করিবে। অতঃপর এক ছটাক দধির মধ্যে পূর্বের মত ময়দা মিশাইয়া কানের লতিবৎ শক্ত করিয়া ছানিবে। তারপর এই ছানা ময়দার সহিত উক্ত আঠাল খামীর মিশ্রিত করিয়া তামাক মাখার মত খুব মর্দন করিবে এবং ঢেলা পাকাইয়া কাপড়ে বাঁধিয়া ৬ ঘন্টাকাল লটকাইয়া রাখিয়া অতঃপর উহা নামাইয়া খামীর বাহির করিয়া পুনরায় আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশ্রিত করিয়া পূর্বের মত কানের লতির ন্যায় শক্ত করিয়া ছানিবে এবং উহার সহিত এই খামীর মিশাইয়া আবার কাপড়ে বাঁধিয়া ছয় ঘন্টাকাল লটকাইয়া রাখিবে। তারপর আবার আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশাইয়া গোল্লা বানাইয়া উহার সহিত খামীর মিশাইয়া ছয় ঘন্টা লটকাইয়া রাখিয়া নামাইয়া খামীর বাহির করিবে এই চতুর্থবারে খামীর মাথা ময়দার গোল্লার উপর যে মামড়ি পড়িবে, উহা ছাড়ানোর দরকার নাই। অতঃপর আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশ্রিত করিয়া খামীরসহ খুব মথিবে। ভালমত মিশ্রিত হইয়া গেলে ৪ ঘন্টাকাল কোন পাত্রে উহা রাখিয়া দিবে। অতঃপর যদি খামীর রাখার ইচ্ছা হয়, তবে উহা হইতে অর্ধ ছটাক রাখিলেই হইবে। উপরি উক্ত নিয়ম মত অর্ধ ছটাক দধির সহিত ক্রমাগত খামীর বাড়াইতে থাকিবে। বর্ধিত খামীর হইতে অর্ধ ছটাক বাদ দিয়া যাহা থাকিবে উহার দুই গুণ পাউরুটি পাকাইবে। পুনরায় যদি দরকার হয়,তবে উক্ত রক্ষিত খামীরের সহিত খামীর বর্ধিত করিয়া খামীর বানাইবে। উক্ত হিসাবের সহিত তারতম্য করিয়া পরিমাণ বাড়ানো যায়।

আজকাল ব্যবসায়ীরা উপরোক্ত নিয়মে খামীর এবং পাউরুটি প্রস্তুত করে না, তাহারা এসিড দ্বারা ময়দা ফুলাইয়া লয়, এই কারণে তাহা স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না।

পাউরুটি প্রস্তুত করার নিয়ম

পাউরুটি পাক করার জন্য উপরে যে খামীরের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আধ সের ময়দার সহিত পানিসহ মন্থন করিবে, যখন ভালমত মথা হইবে তখন উহার উপর কাপড় দিয়া দুই ঘন্টা পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখিবে। যদি চার পাঁচ সের পরিমাণের পাউরুটি পাকানের প্রয়োজন হয়, ততখানি ময়দাই খামীর মিশ্রিত করিয়া খুব মথিবে এবং সামান্য নিমক ও সাদাচিনি পরিমাণ মত মিশাইলে ভাল হয়। অতঃপর দেড় বা দুই ঘন্টাকাল রাখিয়া দিবে। এখন যেই ময়দা গুন্দা হইল উহা কানের লতিবৎ নরম করিবে, বেশী নরম হইলে নূতন লোকের পক্ষে রুটি বানান কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব, একটু শক্তই রাখা দরকার। বেশী শক্ত হইয়া গেলে একটু নরম করিয়া লইবে, আবার দুই ঘন্টা পর উক্ত গুন্দা ময়দাকে খুব মিথুন করিবে। যখন পূর্ণরূপে মথা হইয়া যাইবে এবং আঁশ ধরিবে তখন উহা কোন তক্তার উপর রাখিবে। তারপর যত বড় বড় রুটি বানাইতে হয় সেই পরিমাণের ময়দার গোল্লা বানাইবে। গুঁড়া ময়দা অথবা হাতে তৈল নিয়া গোল্লা বানাইয়া রাখিবে। যাহাতে হাতে না লাগে। এখন উহা রুটির সাঁজের মধ্যে রাখিবে। যখন এই গোল্লাগুলি আধা ফুলা হইয়া যাইবে তখন তন্দুর জ্বালাইবে। তন্দুরের উপরে একটা বাতি থাকিতে হইবে। পাউরুটির গোল্লাগুলি যখন ফুলিয়া পূর্ণ হইবে, তখন তন্দুরের আগুন বাহির করিয়া ফেলিবে এবং

একটি রুটির গোল্লা ভিতরে রাখিয়া দুই তিন মিনিট লক্ষ্য করিয়া দেখিবে; যদি ধরে, তবে মনে করিবে যে, তাপ ঠিক আছে। তারপর অন্যান্য গোল্লা বা ঢেলাগুলি তন্দুরের মধ্যে দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। আর যদি প্রথম রুটি দুই তিন মিনিট রাখিলে জ্বলিয়া যায়, তবে দশ পনর মিনিট অপেক্ষা করিয়া তন্দুর কিছু ঠাণ্ডা করিয়া তারপর অন্যান্য ঢেলাগুলি দিবে।

যদি তন্দুর বেশী ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তবে কিছু কয়লা তন্দুরের দরজার ভিতর দিকে রাখিয়া দিয়া দিবে; তবেই গরমের ভাগ পরিমাণ মত পাওয়া যাইবে। তিন চার মিনিট পর তন্দুরের ঢাকনা খুলিয়া বাতির আলোতে দেখিয়া নিবে এবং একটু লালচে রং ধরিলে তৎক্ষণাৎ রুটি বাহির করিয়া নিবে। একবার রুটি পাকাইয়া বাহির করিয়া নিলে যে তাপ তন্দুরের মধ্যে থাকে তাহাতে নান খাতায়ী এবং মিঠা বিস্কুট পাকান যায়। যদি নানখাতায়ী এবং মিঠা বিস্কুট কাঁচা তৈয়ার করা থাকে, তবে তন্দুর হইতে পাউরুটি বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা তন্দুরের ভিতর রাখিবে এবং মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলিয়া দেখিতে থাকিবে। পাক হইয়া গেলে বাহির করিয়া নিবে। আর যদি এখনও না খাতায়ী ও মিঠাবিস্কুট প্রস্তুত না হইয়া থাকে, তবে তন্দুরের মধ্যে কয়লার আগুন রাখিয়া উহার ঢাকনা দিয়া তাপ রক্ষা করিয়া রাখিবে। এই তাপ পনর হইতে বিশ মিনিট পর্যন্ত রাখা চলে। তারপর আবার আগুন জ্বালাইতে হইবে। আগুন জ্বালানের পর যখন ভিতরের আগুন সরাইয়া ফেলিবে তখন উত্তপ্ত তন্দুরে কিছু নিমক ও দৈ মিশ্রিত পানি ছিটাইলে ভাল হয়।

যদি তন্দুর নূতন হয়, তবে প্রথমে তিন দিন পর্যন্ত আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া তন্দুর ঠিক করিয়া নিবে।

নানখাতায়ী প্রস্তুত করিবার নিয়ম

এক পোয়া ঘি, এক পোয়া সাদা চিনি, আধ আনা এলাচির দানা, তিন মাসা সমুদ্র ফেনা, গেঁহুর ময়দা পাঁচ ছটাক।

প্রথমে ঘি, চিনি, এলাচি বিশ মিনিট পর্যন্ত খুব মলিবে। ভালরূপে গলিয়া তরল হইয়া গেলে সমুদ্র ফেনা পিষিয়া উহার সহিত মিশাইবে এবং খুব ফেটিবে। অতঃপর এক পোয়া ময়দা মিশ্রিত করিবে। যদি একটু লেছ্‌কা থাকে, বাকী এক ছটাকও মিশাইয়া কানের লতির মত নরম করিয়া রুটি বানাইয়া তন্দুরে দিবে। যথাসময়ে পাক হইলে পর বাহির করিবে।

মিঠা বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম

দেড় পোয়া ঘৃত, আধ সের চিনি, ছয় মাসা সমুদ্র ফেনা, এক আনা পরিমাণ দুধ, চৌদ্দ ছটাক গেঁহুর ময়দা প্রথমে ঘি ও চিনি নানখাতায়ীর মত ফেটিবে এবং অল্প অল্প দুধ উহাতে ছাড়িতে থাকিবে। যখন সব দুধ মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন একবারে আধ পোয়া পানি উহাতে মিশাইবে এবং সমুদ্র ফেনাও পিষিয়া মিশাইবে। অতঃপর ময়দা মাখিয়া রুটির ঢেলা বানাইবে। যদি বেশী নরম হইয়া পড়ে, তবে আরো ময়দা মিশাইয়া বেলনা দ্বারা বেলিবার উপযুক্ত করিয়া রুটি বানাইয়া রুচি মত বিস্কুটের ছাঁচে কাটিয়া টিনের পাতে তন্দুরে দিবে। পাক হইলে পর বাহির করিয়া নিবে।

নিম্‌কী বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম

এক পোয়া ঘৃত, এক-ছটাক চিনি, সোয়া আট মাসা নিমক, এক সের ময়দা ঘৃত, চিনি ও নিমক পিষিয়া একটা গামলায় রাখিয়া পাঁচ মিনিট পর্যন্ত খুব ফেটিবে তারপর ময়দা মিশ্রিত করিয়া খুব ফেটিবে। অতঃপর যতটুক বড় বড় বিস্কুট বানাইবার ইচ্ছা তত বড় করিয়া বেলিয়া বিস্কুটগুলি টিনের পাতের উপর রাখিবে এবং তন্দুরে দিয়া রাখিবে, পাক হইলে পর বাহির করিবে।

নিম্‌কী বিস্কুট পাউরুটি পাকাইবার পূর্বে পাকাইতে হয়। কারণ, ইহাতে তাপ কিছু বেশী প্রয়োজন হয়।

আমের আচার তৈয়ার করার নিয়ম

তাজা কচি আম, যাহার উপর কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই-এই প্রকারের আম লইয়া উহার উপরের ছিলকা এমনভাবে ছিলিয়া ফেলিবে যেন ভিতরে সবুজ রং না থাকে। অতঃপর আমের নীচের দিক দিয়া ছিঁড়িয়া আমের আঁটি বাহির করিয়া ফেলিবে। আম যেন দুই খণ্ড না হইয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। অতঃপর রসুন, লাল মরিচ, সোঁপ, পুদিনা, আদা, কালি জিরা ও নিমক আন্দাজ মত মিশ্রিত করিয়া আমের মধ্যে ভরিয়া দিয়া ফাঁক করা স্থান সূতা দ্বারা বাঁধিয়া দিয়া আট দশ দিন পর্যন্ত রৌদ্রে দিবে। তারপর পুদিনার রসে বা সিরকার মধ্যে চুবাইয়া এক সপ্তাহ রৌদ্রে দিয়া ব্যবহার করিবে।

যদি তৈলে দিয়া আচার বানাইতে ইচ্ছা হয়, তবে আর আম ছুলিতে হইবে না ; বরং মসল্লাদি ও নিমক-ভরিয়া তৈলের মধ্যে ফেলিয়া রৌদ্রে দিলেই হইবে।

চাস্‌নিদার আচার তৈয়ার করার নিয়ম

আধ সের কিস্‌মিস, আধ সের খেজুর (খুরমা) এক পোয়া আম চূর্ণ, আধ পোয়া আদা ও আধ পোয়া রসুন, এই সকল মসল্লা দ্রব্য তিন সের পুদিনা রসে ছাড়িয়া দেড় সের চিনি দিয়া ১৫ দিন পর্যন্ত রৌদ্রে দিয়া ব্যবহার করিবে।

শালগমের আচার

পাঁচ সের পরিমাণ শালগমের টুক্‌রা পানিতে সামান্য গরম করিয়া শুকাইয়া উহাতে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি মিশ্রিত করিবে। আধ পোয়া নিমক, এক ছটাক লাল মরিচ, আধ পোয়া রাই সরিষা—এগুলি পিষিয়া লইবে, আধ পোয়া রসুন, এক পোয়া আদা ইহা পাতলা করিয়া কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া লইবে এই সকল দ্রব্য শালগমের সহিত মাখাইয়া দিবে। যখন ইহাতে ঝাঁজ ও টক সৃষ্টি হইয়া যাইবে, তখন সাদা চিনির শিরা অথবা গুড়ের শিরা তৈয়ার করিয়া উক্ত শালগমের টুক্‌রাগুলিতে ঢালিবে। শিরা কমিতে থাকিলে আবার প্রস্তুত করিয়া দিতে থাকিবে। এই আচার বহুকাল স্থায়ী হয়।

নবরত্ন চাট্‌নী তৈয়ার করার নিয়ম

কাঁচা ছোলা আম ১ সের, পুদিনার রস সোয়া সের বা সিরকা সোয়া সের, রসুন আধ ছটাক, লাল মরিচ আধ ছটাক, কালিজিরা ২ তোলা, সোপ ২ তোলা, শুষ্ক পুদিনা ২ তোলা, লবঙ্গ ৪ মাসা, জায়ফল ৪ মাসা, আদা ১ ছটাক, লবণ ১ ছটাক, চিনি বা গুড় ১ পোয়া। প্রথমতঃ সিরকার সহিত আম পিষিয়া নিবে অতঃপর সকল মসল্লা সিরকাসহ বাটিয়া আম বাটার সহিত মিশাইবে। এখন যে সিরকা বাকী রহিয়াছে অর্থাৎ আম বাটার ও মসল্লা পিষার পর যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার সহিত আরো আম এবং মসল্লা মিশাইয়া আগুনে জোশ দিবে, যখন ঘন হইয়া চাস্‌নী তৈয়ার হইয়া যাইবে তখন ব্যবহার করিবে। যদি খোশ রং করিতে চাও, তবে দুই তোলা হলুদ বালু দ্বারা ভাজিয়া পিষিয়া উহার সহিত মিশাও। বাস্ নব রত্ন চাট্‌নী তৈয়ার হইয়া গেল।

মোরব্বা প্রস্তুতের নিয়ম

কাঁচা আম এমনভাবে ছুলিবে যেন ভিতরের দিকে সবুজ রং না থাকে। অতঃপর ভিতরের শাঁস বাহির করিয়া সূই অথবা কাঁটা দ্বারা খুব ফুড়িবে। ভাল মত ফোঁড়া হইয়া গেলে চুনের এবং

ফিটকারীর পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ২/৩ ঘন্টা পর পরিষ্কার পানিতে ভাল মত ধুঁইয়া বিশুদ্ধ পানিতে আধা সিদ্ধ করিবে। তারপর পানি হইতে উঠাইয়া নিংড়াইয়া আমগুলিকে বাতাসে শুকাইয়া নিবে।

অতঃপর কড়াইর মধ্যে আমের দ্বিগুণ চিনি অথবা পরিষ্কার গুড়ের শিরার মধ্যে ছাড়িয়া জোশ দিতে থাকিবে। শিরা যখন খুব গাঢ় আঁশ ধরিবে তখনই মোরব্বা তৈয়ার হইয়া গেল। এই নিয়মেই চাল কুমড়া, আমলকী ও ছেব ইত্যাদির মোরব্বা প্রস্তুত করিতে হয়।

নিমক পানির আম প্রস্তুত প্রণালী

গাছ হইতে পড়া অক্ষত পোখ্‌তা আম কুড়াইয়া আনিয়া ভাল মত ধুইয়া মাটির পাত্রে রাখিয়া আমের উপর পর্যন্ত পানি ভরিয়া দিয়া তিন দিন পর্যন্ত আমগুলি ডুবাইয়া রাখিবে। অতঃপর আমগুলি আবার ধুইয়া পানিগুলি ফেলিয়া দিবে। এইবার নূতন পানির মধ্যে প্রতি একশত আমের জন্য এক পোয়া নিমক, আধ পোয়া রসুন এবং আস্ত লাল মরিচ পরিমাণ মত দিয়া আমগুলি এই পানির মধ্যে ছাড়িয়া পনর দিন পর ব্যবহার করিবে। পানি সর্বদাই আমের উপর পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। কেহ কেহ দ্বিতীয়বারের পানি ফেলিয়া দিয়া তৃতীয় বারের পানির সহিত মেথি জোশ করিয়া পানি ঠাণ্ডা হইলে আমগুলির মুখে সামান্য তৈল মাখাইয়া দিয়া উক্ত পানির মধ্যে ছাড়িয়া থাকে। মেথির কারণে ঐ পানি নষ্ট হয় না বরং উহাতে আম বেশী দিন স্থায়ী হইয়া থাকে।

লেবুর আচার তৈয়ার করার নিয়ম

পাঁচ সের কাগজী লেবু পানির মধ্যে ফেলিয়া একদিন ভিজাইয়া রাখিবে। ২য় দিনে পানি ফেলিয়া দিয়া প্রতিটি লেবুর চার চার ফাড়া দিয়া উহার মধ্যে গরম মসল্লা, সৈন্দব লবণ ভরিয়া দিবে। পাঁচ সের লেবুর জন্য আধ সের মসল্লা এবং তিন পোয়া লবণই যথেষ্ট।

নিমক ও মসল্লা ভরিয়া লেবুগুলি একটি বর্তনে রাখিয়া উহার উপর অন্য লেবুর রস নিংড়াইয়া দিবে। কেহ কেহ লেবুর পানি ৩ বারও পরিবর্তন করিয়া থাকে এবং সের প্রতি ১ ছটাক মসল্লা এবং গোড়া লেবুর রস যত বেশী নিংড়াইয়া দেওয়া যায়, ততই উহা বেশী দিন পর্যন্ত ভাল থাকে।

কেহ কেহ এই লেবুর আচারে ৵৫ সের লেবুর জন্য ৵১ সের নিমক, ৬ মাসা শুণ্ঠি আদা, ৬ মাসা পিপুল, ৬ মাসা সমুদ্র ফেনা ও ৬ মাসা সাদা জিরা এই সকল দ্রব্য গরম মসল্লার সহিত চূর্ণ করিয়া দিয়া থাকে।

কাপড় রংগাইবার নিয়ম

কাল রং—পাথর চুনার গুঁড়া আধ সের, খাঁটি নীল এক সের, গুড়ের শিরা আধ সের, সকল বস্তু মিশাইয়া একটা চাড়ী বা গামলার মধ্যে ভরিয়া সকালে, দুপুরে ও বৈকালে একটা কাঠি দিয়া খুব নাড়িয়া উহার গাদ উঠাইয়া ফেলিবে। যদি শীতকাল হয়, তবে উক্ত গামলার চতুর্দিকে আগুনের তাপ দিলে তাড়াতাড়ি গাদ উঠিয়া যাইবে। পরিষ্কার হওয়ার পর উহার মধ্যে কাপড় চোবাইয়া রং লাগাইবে। কাপড় শুকাইয়া তারপর তাজা কাঁচা দুধের মধ্যে ডুবাইবে অথবা মেন্দি পাতার পানি জোশ দিয়া তাহাতে কাপড় চুবাইয়া শুকাইয়া নিবে, উহাতে রং খুব পাকা হয়।

হলুদ রং

প্রথমে হলুদ খুব গুড়া করিয়া পানির মধ্যে মিশাইবে, উহাতে কাপড় রংগাইয়া নিংড়াইবে এবং শুকাইয়া নিয়া দুই তোলা সাদা ফিটকারী চূর্ণ করতঃ পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই পানিতে

কাপড় ধুইয়া শুকাইবে। অতঃপর অর্ধ সের আমের ছাল তিন প্রহর পর্যন্ত পানির সহিত জোশ দিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে কাপড় চুবাইয়া রং করতঃ শুষ্ক করিবে।

সোনালী আভা রং

প্রথমে সিকি তোলা ওজনের হলদি দ্বারা রংগান পানিতে কাপড় রংগীন করিয়া এক পোয়া নাসপাল (ناسپل) পানিতে জোশ দিয়া উহা ছাঁকিয়া কাপড় রংগাইয়া অবশিষ্ট নাসপালের পানি রাখিয়া দিবে। তারপর সিকি তোলা ওজনের গেরু পানিতে মিশ্রিত করিয়া উহাতে পুনরায় উক্ত কাপড় রংগাইবে এবং পূর্বের যে রক্ষিত নাসপালের পানি আছে উহার মধ্যে কাপড় চুবাইয়া নিবে। অতঃপর একতোলা পরিমাণ ফিটকারী চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার পানির সহিত মিশ্রিত করিবে। উহার মধ্যে উক্ত কাপড় একবার চুব দিয়া উঠাইবে। অবশিষ্ট ফিটকারীর পানির মধ্যে চাউলের গুঁড়া অথবা ময়দার সামান্য কলপ দিয়া কয়েক বার উক্ত কাপড় ডুবাইয়া উঠাইবে।

সোনালী রং করার অন্য নিয়ম

নাসপাল এবং মঞ্জিষ্ঠা সমপরিমাণ লইয়া আধ-থেতো করিয়া অথবা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া সন্ধ্যা বেলায় পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে এবং ভোরে উহা জোশ করিয়া ছাঁকিয়া নিবে। সর্বপ্রথম ফিটকারী খুব চূর্ণ করিয়া পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত পানিতে কাপড় ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া নিবে। অতঃপর নাসপাল এবং মঞ্জিষ্ঠার পানিতে কাপড় ডুবাইয়া রং করিয়া ফেলিবে।

গ্রীন বা সবুজ রং করার নিয়ম

ফিটকারীর পানির মধ্যে কাপড় ডুবাইয়া শুকাইয়া নিয়া তারপর নীলের পানির মধ্যে কাপড় ভিজাইবে। অতঃপর নাসপাল ও মঞ্জিষ্ঠার রঙ্গিন পানিতে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইয়া লইলেই সবুজ রং করা হইয়া যাইবে।

সবুজ বা গ্রীন রং করার ২য় প্রণালী

আধ পোয়া আমের কচি পাতা লইয়া আধ সের পানিতে জোশ দিবে, ছাঁকিয়া নিয়া উক্ত পানি রাখিয়া দিবে। অতঃপর অন্য পানিতে উহা ২য় বার জোশ দিতে হইবে এবং পানি পৃথক করিয়া রাখিয়া ৩য় বার জোশ দিবে এবং পানি ছাঁকিয়া পৃথক রাখিবে।

প্রথম বারের জোশ দেওয়া পানিতে কাপড় প্রথমে চুবাইয়া শুকাইয়া নিবে। অতঃপর দ্বিতীয় বারের জোশ দেওয়া পানিতে চুবাইয়া শুকাইয়া লইবে। তারপর তৃতীয় বারের জোশ দেওয়া পানির সহিত নয় মাসা পরিমাণ ফিটকারী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উহার মধ্যে কাপড় খুব মলিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

বেগুনী রং প্রস্তুত প্রণালী

বাবলার ছাল এক পোয়া, জায়ফল ৪ তোলা আধ কোটা করিয়া রাত্রে পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ভোরে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া নিবে। তারপর দুই তোলা ফিটকারী চূর্ণ ভিন্ন পানিতে মিশ্রত করিয়া কাপড়খানা প্রথমে ফিটকারীর পানিতে ডুবাইবে। তারপর ছাল ভিজান পানির মধ্যে ভিজাইয়া উঠাইয়া এই রংগীন পানির মধ্যে হীরার কস এক তোলা পরিমাণ লইয়া মিশ্রিত করিয়া উক্ত কাপড় আবার চুবাইবে ও শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে।

লাল-আভা পাকা গাঢ় বেগুনী রং

আধ পোয়া মঞ্জিষ্ঠা এবং আধ পোয়া মেন্দি পাতা থেতো করিয়া রাত্রে ছয় সের পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিবে এবং ভোরে মাটির হাড়ীতে করিয়া কয়েকবার জোশ দিয়া ছাঁকিয়া রাখিবে।

অতঃপর বড় হরিতকী ও হলুদ চূর্ণ করিয়া বেশী পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া সমান ভাবে সমস্ত কাপড়টা রংগাইবে। লক্ষ্য রাখিবে যে ছাপ ছাপ রং না লাগে। অতঃপর কাপড় নিংড়াইয়া ছায়ার মধ্যে শুকাইয়া নিবে। অবশিষ্ট পানি রাখিয়া দিবে। তারপর আধ পোয়া গুড় ও আধ পোয়া শুকনা আমলকী একটা লোহার কড়াইতে লইয়া অল্প পানি মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। যখন গরম হইয়া উহা হইতে বুদ্‌বুদ্‌ উঠিবে এবং কাল রং ধারণ করিবে তখন পূর্বের রক্ষিত মঞ্জিষ্ঠা ও মেন্দি পাতার জোশ দেওয়া পানি উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া কাপড় রংগাইবে।

চকলেট রং

দুটি বড় বড় মাজু (এক প্রকার ঔষধ বিশেষ) আধ থেতো করিয়া এক প্রহর পর্যন্ত পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া বাটিয়া নিয়া কিছু বেশী পানির মধ্যে মিশ্রিত করিবে এবং উহার মধ্যে কাপড় রংগাইয়া শুকাইয়া নিবে। অতঃপর ঐ পানি ফেলিয়া দিয়া উক্ত পাত্রে নূতন পানি লইয়া উহার সহিত এক পেয়ালায় এক চতুর্থাংশ পরিমাণ “কাট” মিশ্রিত করিয়া উহাতে উক্ত কাপড় রংগাইবে।

“কাট” প্রস্তুতের নিয়মঃ পনর সের পানির মধ্যে দুই সের লোহা, কিছু আমলকী, কিছু বড় হরিতকী মিশাইয়া অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল রাখিবে। কেহ কেহ সেমাই জ্বাল দিয়া উহার পানিও মিশ্রিত করিয়া থাকে। যদি রংকারকদের নিকট কাট্‌ পাওয়া যায়, তবে আর নিজে প্রস্তুত করার দরকার নাই।

বাদামী বা হাল্‌কা জরদ রং

প্রথমে হাল্‌কা রংগের গেরু দ্বারা কাপড় রং করতঃ শুকাইয়া নিবে। অতঃপর “তুল” (এক প্রকার গাছের গোটা) হামান দিস্তায় কুটিয়া উহার শাঁস বাহির করিয়া লইবে। শাঁসগুলি পানির সহিত ২/৩ বার জোশ দিয়া অপর একটি পাত্রে কিছু ঠাণ্ডা পানি লইয়া জোশ দেওয়া পানির অর্ধেক মিশ্রিত করিবে এবং কাপড় চুবাইয়া দেখিবে যদি রং একটু কম গাঢ় মনে হয়, তবে বাকী অর্ধেক জোশ দেওয়া তুলের পানিও উক্ত ঠাণ্ডা পানির সহিত মিশাইয়া কাপড়ে দিবে।

(পাকা বেগুনী রং যাহা একটু কালচে লাল বর্ণের হয় উহাকে ইংরেজীতে ব্রাউন রং বলে) চুনের পানির সহিত পতঙ্গ শিরীন জোশ করিয়া ছাঁকিয়া উহার সহিত বড় হরিতকী এবং হীরার কস পিষিয়া মিশ্রিত করিয়া থাকে। (হীরা কস এক প্রকার ফিটকারী বা লৌহ ও গন্ধক মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।)

লাল পাকা রং

তিন ছটাক পতঙ্গ শিরীন কুচা কুচা করিয়া কাটিয়া এক সের পানিতে জোশ করিয়া এক রাত্র রাখিয়া পরের দিন সকালে পুনরায় জোশ দিয়া আধসের পানিতে নামাইয়া উহা ছাঁকিয়া পানি পৃথক করিয়া রাখিবে এবং উক্ত পতঙ্গ শিরীনের ছাঁকা অংশ পুনরায় ততখানি পানিতে জোশ দিয়া অর্ধেক থাকিতে ছাঁকিয়া সেই পানিও পৃথক রাখিবে। প্রথমে এক তোলা বড় হরিতকী পিষিয়া পানি মিশ্রিত করতঃ উহাতে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইয়া লইবে। তারপর দুইবার জোশ দেওয়া ১ম বারের পতঙ্গ শিরীনের পানিতে কাপড় রংগাইবে এবং কাপড় শুকাইয়া লইবে। তারপর দ্বিতীয় বারের একবার জোশ দেওয়া পানিতে এক তোলা সাদা ফিটকারী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া হাত দ্বারা খুব নাড়িবে যেন উহার ফেনা উঠিয়া যায়। অতঃপর উক্ত কাপড় এই পানির মধ্যে এক প্রহর পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। রং করা হইয়া গেলে চিপিয়া শুকাইয়া লইবে।

পেস্তা রং

কাপড়ে প্রথমে হল্‌দি রং দিয়া সাবানের পানিতে ভিজাইবে। অতঃপর কাগজী লেবুর রস পানিতে মিশ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইবে।

পেস্তা রংয়ের দ্বিতীয় নিয়ম

৪ মাসা নীল চূর্ণ পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহার মধ্যে কাপড়ে রং লাগাইয়া শুকাইয়া ফেলিবে। অতঃপর ফিটকারীর পানিতে ডুবাইয়া শুকাইবে এবং ৪ তোলা নাসপাল পানির মধ্যে কাপড় চুবাইয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিবে।

নীল রং

প্রথমত নীল তুঁইতা পিষিয়া পানিতে মিশাইয়া রাখিবে। তারপর চুনা পাথর দ্বারা কাপড়ের হাল্কা রং দিবে। অতঃপর উক্ত তুঁইতা মিশ্রিত রং পৃথকভাবে লইয়া উহাতে কাপড় চুবাইতে থাকিবে এবং প্রত্যেক বারেই শুকাইতে থাকিবে। যখন কাপড়টি মনোরম রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া যাইবে তখন ফিটকারীর পানিতে ডুবাইয়া অতঃপর চিপিয়া শুকাইবে।

খাদ্য অধ্যায়

বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ জানা না থাকিলে শরীর রক্ষা করা দুষ্কর। সে জন্য এই অধ্যায়ে খাদ্যের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

খাদ্যের দ্বারা আমাদের দেহে শক্তি উৎপন্ন হয়। শরীর রক্ষার জন্য কোন্ জাতীয় খাদ্য কি পরিমাণে আহার করিলে শরীরে যথোচিত শক্তি ও তাপ উৎপন্ন হয় তাহা জানা দরকার। খাদ্য হইতে যে পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় তাহার ১/৬ অংশ কর্ম শক্তিতে এবং অবশিষ্ট ৫/৬ অংশ দেহের তাপ বজায় রাখিতে ব্যয়িত হয়।

শ্বেতসার ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যই শরীরের তাপ উৎপাদন করে। এজন্য বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে ৫/৬ ভাগ শ্বেতসার ও স্নেহ পদার্থ এবং এক ভাগ আমিষ জাতীয় পদার্থের আবশ্যক। ঘৃত, মাখন প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের মূল্য বেশী। এগুলি অধিক খাইলে শরীরে মেদ জন্মে বলিয়া দুনিয়ার সকল দেশেই দেহের তাপের সমতা রক্ষার জন্য ভাত, রুটি প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(১) আমিষ জাতীয় খাদ্য—মাছ, গোশ্‌ত, ডিম, ছানা প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন ডাল, দুধ, আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতিতেও অল্পাধিক আমিষ জাতীয় উপাদান আছে।

(২) স্নেহ পদার্থ—ঘৃত, মাখন, তৈল ইত্যাদি। ইহাছাড়া দুধ, নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, আখরোট, মাছ, গোশ্‌ত, প্রভৃতিতেও কিছু পরিমাণে স্নেহ পদার্থ আছে।

(৩) শ্বেতসার—ভাত, রুটি, পাউরুটি, সুজি, আলু, চিনি, গুড় ইত্যাদি।

(৪) লবণ জাতীয়—লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, ধাতব লবণ।

(৫) পানি; (৬) ভিটামিন। এই ছয় প্রকারের পদার্থই প্রত্যেক লোকের দেহের শক্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজন।

আমাদের খাদ্যে উপরোক্ত সকল প্রকারের উপাদানই যথোচিত পরিমাণে থাকা আবশ্যক। কোন এক জাতীয় খাদ্যে সকল জাতীয় উপাদান থাকে না। বিভিন্ন উপাদানের কর্ম ভিন্ন ভিন্ন।

আমিষ জাতীয় উপাদান শরীরের ক্ষয়পূরণ করে। স্নেহ ও শ্বেতসার জাতীয় উপাদান তাপ ও কর্ম শক্তি উৎপাদন করে। লবণ জাতীয় উপাদানে অস্থির গঠনও বৃদ্ধি করে।

পানি দেহে রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা করে এবং ভিটামিন জীবনী শক্তি বর্ধন করে। শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই সবগুলিই অপরিহার্য। এইজন্য আমাদের সুষম খাদ্য খাওয়া উচিত। যে খাদ্যে উক্ত ছয় প্রকারের উপাদান থাকে এবং দেহ পরিপূরক, দেহ পরিপোষক এবং দেহ সংরক্ষক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং আহার করিলে সহজেই হজম হইয়া যায়, দেহের দৈনিক ক্ষয়পূরণ ও দেহের প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপাদন হয়। এরূপ খাদ্যকেই সুষম খাদ্য বা মিশ্র খাদ্য বলে।

খাদ্য গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে শরীরের ক্ষয় পূরণ করা। মাছ, মাংস, ছানা, ডিম প্রভৃতি প্রাণীজ আমিষ উদ্ভিজ আমিষ অপেক্ষা শরীরের ক্ষয় পূরণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এইজন্য পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় আমিষের এক তৃতীয়াংশ প্রাণীজ আমিষ হওয়া উচিত। আটার আমিষ অপেক্ষা চাউলের আমিষ দেহের ক্ষয় পূরণের পক্ষে বেশী উপযোগী। অথচ আটার আমিষ চাউলের আমিষের প্রায় দ্বিগুণ। এইজন্য শুধু ভাত বা শুধু রুটি না খাইয়া এক বেলা ভাত এবং এক বেলা রুটি খাওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক হিতকর।

ভিটামিন বা খাদ্য-প্রাণ

আমাদের খাদ্যে আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ, লবণ ও পানি এই পাঁচ প্রকার উপাদান ব্যতীত এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, যাহার অভাবে আমাদের দেহের যথাযথ পরিপোষণ হয় না এবং স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এই ভিটামিনগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম এবং পরিমাণে সামান্য হইলেও আমাদের দেহের উপর ইহাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। জীবন ধারণের পক্ষে এই সামান্য সূক্ষ্ম অপরিহার্য পদার্থগুলির নামই হইল ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। এই ভিটামিন মস্তিষ্ক, স্নায়ুমন্ডলী, যকৃত ও পাকস্থলী প্রভৃতি অন্তরীণ যন্ত্রগুলির ক্রিয়ার সহায়তা করে। ইহাদের অভাবে দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং রোগ প্রতিষেধক শক্তি হ্রাস পাইয়া নানা প্রকার কঠিন রোগের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন রোগ জন্মে। ভিটামিন প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। ইহারা বিভিন্নভাবে থাকে এবং ইহাদের কার্য ও গুণ বিভিন্ন। কোন কোন খাদ্যে একাধিক ভিটামিনের সমবায়ও দেখা যায়।

স্বাস্থ্যের উপর ভিটামিনের প্রভাব ও ভিটামিনের উপকারিতার তালিকা

কিসে কিসে পাওয়া যায়		উপকারিতা	অভাবে অপকারিতা
A	ভিটামিন A দুধ, মাখন, দুধের সর, ডিম, কডলিভার অয়েল, টাট্কা শাক-সবজি, লাল ও হলুদ ফল, পশুর যকৃত, পালংশাক, মিষ্টি আলু ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।	ভিটামিন দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন করে, রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়ায়, দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে।	ইহার অভাবে রাতকানা ও নানা প্রকার চক্ষু রোগ জন্মে। চর্ম রোগও হইতে পারে।
B	ঢেঁকি ছাঁটা চাউল, যাঁতায় ভাঙ্গা আটা, ডাইল, বাদাম অংকুরিত শস্য, মাছ, পশুর যকৃৎ, ডিম, আলু, কলা, পুঁইশাক, ফেন না-গালা ভাত প্রভৃতি।	স্বাস্থ্য রক্ষা করে, স্নায়ুর পুষ্টি বৃদ্ধি পায়, কার্য ক্ষমতা ও সাহস বৃদ্ধি করে, শিশুদের বৃদ্ধি বজায় রাখে।	বেরী বেরী রোগ হয়, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত হয়।
C	অংকুরিত শস্য, লেবু, আনারস, আম, টমাটো, বেগুন, টাট্কা শাক-সবজি গুড়, মাছের ডিম, বাঁধাকপি, গোলাপ জাম প্রভৃতি।	রক্ত ও দেহের রসগুলিকে সুস্থ রাখে, রোগ প্রতিষেধক, শক্তি বাড়ায়।	স্কার্ভি রোগ জন্মায়। চর্ম রোগ দেখা দেয়। দাঁতের মাড়ী নষ্ট হয়। অকালে দাঁত পড়িয়া যায়।
D	ডিম, দুধ, মাখন, মাছের তৈল, পশুর যকৃত, ছোট মাছ, কাঁচা শাক-সবজি, বাঁধাকপি, ডাটা ইত্যাদি এবং সূর্য কিরণ।	অস্থি, দন্ত ও পেশী গঠনের সাহায্য করে।	অস্থি দুর্বল হয় ও রিকেট রোগ জন্মে।
E	কডলিভার তৈল, ঢেঁকি ছাঁটা কুড়াযুক্ত চাউল, গম ও যব, বাদাম, ডিমের কুসুম।	মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে।	প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়। সহবাসে অক্ষম হয়। যৌনশক্তি লোপ পায়।

কোন্ খাদ্যে কত গুণ ভিটামিন আছে তাহার তালিকা

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন A	ভিটামিন B	ভিটামিন C	ভিটামিন D	ভিটামিন E
ঢেঁকি ছাঁটা চাউল	+	++	-	+	+
কলে ছাঁটা চাউল	o	o	-	-	o
গম	+	++	-	-	+
কলে পিষা ময়দা	o	+	-	-	-
যাঁতায় ভাঙ্গা আটা	+	++	-	-	+
সাদা ধবধবে পাউরুটি	o	o	o	-	-
যাঁতায় ভাঙ্গা আটার পাউরুটি	+	++	-	-	-
যব	+	++	-	-	+
অংকুরিত ছোলা, মটর, মুগ	+	++	++	-	-
গমের ভূষি	+	++	-	-	-
চাউলের কুড়া	+	++	-	-	+
মুসুরী ডাল	+	++	-	-	-
চিনি	o	o	o	-	-
গুঁড়	o	+	-	-	-
মধু	o	+	o	-	-
কাঁচা দুধ	+++	++	+	+	+
বেশী জ্বাল দেওয়া দুধ	+	+	-	-	-
কণ্ডেন্স মিল্ক বা কৌটায় ভরা ঘন মিঠা দুধ	+	+	-	-	-
পনির	++	?	-	-	-
ননী	+++	++	+	-	-
দধি বা ঘোল	+	+++	+	-	-
মাখন	+++	-	o	-	-
ঘৃত	+++	+	-	-	+
কাঁচা গোশ্ত	+	+	+	-	-
সিদ্ধ গোশ্ত	+	+	+	-	-
মগজ বা মস্তিষ্ক	+	++	-	-	-
হৃৎপিণ্ড	+	+++	-	-	-
কলিজা বা যকৃত	++	++	-	-	+
মৎস্য	++	++	-	-	-

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন A	ভিটামিন B	ভিটামিন C	ভিটামিন D	ভিটামিন E
মাছের যকৃত	++	–	–	–	–
মাছের ডিম	+	++			
গরুর চর্বি	++	0	0	–	–
কড লিভার ওয়েল	++++	?	0	+++	–
ডিম	++	+++	0	–	–
ডিমের কুসুম	++	+	?	+	+
ডিমের সাদা অংশ	?	?	?	–	–
বাদাম তৈল	0	0	0	0	+
কাবুলী বাদাম	0	0	0	0	+
চিনা বাদামের তৈল	++	0	0	–	–
সরিষার তৈল	0	0	0	0	–
চিনা বাদাম	+	++	–	–	–
ঝুনা নারিকেল	+	++	0	–	–
নারিকেলের দুধ	–	++	–	–	–
আখরোট	+	++	–	–	–
আপেল	+	+	+	–	–
বেদানা		+	+	–	–
কলা	+?	+	+	–	–
আনারস	–	++	++	–	–
আঙ্গুর	0	++	++	–	–
সর্বপ্রকার লেবু	–	+	+	–	–
লিচু	–	+	++	–	–
আম	+	–	++	–	–
পেয়ারা	0	+	+	–	–
তেঁতুল	?	+	+	–	–
টমাটো	+	+++	+++	–	–
কিসমিস	–	+	+	0	0
খুরমা	–	+	–	–	–
বরবটি (কাঁচা)	–	+++	–	–	–
বাঁধাকপি (কাঁচা)	+	+++	+++	–	–
বাঁধাকপি (সিদ্ধ)	+	++	++	–	–
ফুলকপি	+	++	+	–	–
গাজর	++	++	++	+	–
ঢেরস	–	+	+	–	–

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন A	ভিটামিন B	ভিটামিন C	ভিটামিন D	ভিটামিন E
ওলকপি	–	+	+	–	–
লেটুস শাক	++	++	+++	–	–
পটল	–	+	+	–	–
গোল আলু (কাঁচা)	+	++	++	–	–
গোল আলু (সিদ্ধ)	?	++	++		
লাল মিঠা আলু	++	+	?	–	–
কলাই সুঁটি	++	++	+?	–	–
পালং শাক	+++	+++	+++	+	–
ইক্ষু	–	+	+	–	–
মূলা	?	+	?	–	–
শালগম	?	+	++	?	–
পেঁয়াজ	?	+	?	–	–
রসুন	?	?	++	–	–
বেগুন	?	+	+	–	+
তিল তৈল	?	০	০	–	–

যদিও তৈলে কোন প্রকার খাদ্যপ্রাণ নাই, তবু দেহের তাপ রক্ষার্থে উদ্ভিজ তৈল খাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ চুনিলাল বসু রায় বাহাদুর সি, আই, ই; আই, এস ও এম বি, এফ,সি, এস রসায়নাচার্য প্রণীত খাদ্য নামক পুস্তক হইতে উপরিউক্ত খাদ্যপ্রাণ তথ্যাদি সংগৃহীত হইল।

ভিটামিন A—ইহা দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধান করে, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বর্ধন করে, দন্তদিগকে সাহায্য করে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহার অভাবে শিশু বালক-বালিকাদের শরীর রীতিমত বৃদ্ধি পায় না।

এই ভিটামিন সাধারণ উত্তাপে নষ্ট হয় না, কিন্তু রন্ধনকালে বেশী উত্তাপে বাষ্পের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য রন্ধনকালে খাদ্য-দ্রব্য ঢাকনা দিয়া অল্প উত্তাপে পাকান উচিত। বেশী সিদ্ধ করা দ্রব্যে খাদ্যপ্রাণ থাকে না। এই জন্য যাহাতে বাষ্পের সহিত খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হইয়া না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। তরকারীর বাকলে, চাউলের কুড়ায় বেশী ভিটামিন থাকে, এই জন্য চাউলের কুড়া ছাড়ান ঠিক নহে। তরকারী খোসাসহ যতদূর সম্ভব খাওয়া উচিত। ভাতের মাড় কোনমতেই ফেলান উচিত নহে। মাড় না গালিয়া রন্ধন করাই উত্তম। যদি মাড় গালিতেই হয়, তবে খাওয়ার সময় ভাতের সহিত ফেনও খাইবে। তরকারীর মধ্যে কিছু চাউলের কুড়া মিশ্রিত করিয়া রাঁধিলে বিশেষ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

ভিটামিন B— ইহা শরীরের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য করে। পেশী, স্নায়ুমণ্ডলী, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলীকে সবল করে। দেহ যন্ত্রগুলিকে কর্ম্মক্ষম রাখে। বেরিবেরি, স্নায়ু প্রদাহ প্রভৃতি রোগ দূর করার সহায়তা করে।

ভিটামিন B দুই প্রকারঃ B-১নং এবং B-২নং উভয়ের গুণই প্রায় সমান। এইজন্য ইহাকে ভিটামিন (B Complex) মিশ্রিত-বি ভিটামিন বলে। ভিটামিন B-১নং কে বেরিবেরি প্রতিরোধক ভিটামিন বলে। ইহাও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, স্নায়ুমণ্ডলীকে সবল ও কর্মক্ষম রাখে, হজম শক্তি বাড়ায়। ভিটামিন B-২নং শাক-সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যথা, পালং শাক, কলমী শাক, লেটুস শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি। সমস্ত তরিতকারীর খোসায়, মটর, মসুর, ছোলা ইত্যাদির ভুষিতে চাউলের কুড়ায়, বিশেষ করিয়া রোদের তাপ প্রাপ্ত গাছ-গাছড়ার ফল ও তরিতরকারীতে প্রাপ্তব্য। এইজন্য খোসাযুক্ত তরকারী, ডাল, ইত্যাদি মাঝে মাঝে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত।

ভিটামিন C—ইহা রক্ত ও দেহরসগুলিকে সুস্থ রাখে, রোগ প্রতিষেধক শক্তি বাড়ায়।

ভিটামিন D—ইহা অস্থি, দন্ত ও পেশী গঠনে সাহায্য করে। এইজন্য ছোট শিশুদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য দেওয়া উচিত। ভোরের রৌদ্রের তাপের মধ্যে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, ইহাকে অল্টাভায়েলেটও বলে। এইজন্য শিশুর শরীরে দৈনিক কিছু সময় সকাল বেলায় রৌদ্রের তাপ দেওয়া উচিত। ইহাতে শিশুরা সর্দি, কাশি ও চর্মরোগ হইতে মুক্ত থাকে। শরীর মজবুত হয়, রোগ প্রতিষেধক শক্তি বাড়ায়।

ভিটামিন E—এই ভিটামিন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে, প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে, রতিশক্তি বর্ধন করে, যৌবন শক্তি স্থায়ী রাখে। এই ভিটামিনের অধিকাংশ চাউলের কুড়ায়, ভাতের ফেনে, ডিমের কুসুমে, কডলিভার অয়েলে, গম-যব, পশুর কলিজায় ও কাবুলী বাদামে পাওয়া যায়।

একজন পরিশ্রমী পূর্ণ বয়স্ক বাঙ্গালী লোকের দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য-তালিকা (দুই বেলার)ঃ

খাদ্য	**পরিমাণ**
চাউল	৪ ছটাক
আটা	৩ ছটাক
ডাইল	২ ছটাক
ঘৃত, মাখন, তৈল	১১/২ ছটাক
মাছ, গোশ্‌ত, ডিম ও ছানা	২ ছটাক
শাক-সবজি ও ফল	৩ ছটাক
দুধ	৪ ছটাক
গুড় বা চিনি	১/২ ছটাক
নিমক	পরিমাণ মত
পানি	প্রচুর পরিমাণে

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শরীর হইতে মলমূত্র, ঘাম ইত্যাদির সহিত দৈনিক প্রায় সাড়ে তিন সের পানি সরিয়া যায়। ইহা পূরণের জন্য এবং পাকস্থলীর ক্রিয়া রক্ষার ও ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রচুর পানি পান করিবে। পানিতে পাকস্থলী ধৌত হইয়া যায়। অতএব, সর্বদা বিশুদ্ধ পানি পান করিবে, বিশেষ করিয়া রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে এবং ভোরে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পানি পান করা কর্তব্য, ইহাতে অনেক উপকারিতা আছে।

দ্রব্য গুণ

[আমাদের দেশীয় শাক পাতা ও তরিতরকারির গুণাগুণ]

শাক—প্রায় সমস্ত শাকই গুরুপাক, অতিশয় মলজনক ও মলবাত নিঃসারক। শাক শরীর ও অস্থি নাশ করে, দৃষ্টিশক্তি, স্মৃতিশক্তি, রক্ত, শুক্র নষ্ট করে, অকালে বার্ধক্য জন্মাইয়া থাকে। শাকে সমস্ত রোগ বাস করে, সুতরাং ইহা শরীর বিনাশের হেতু। অম্লেও প্রায় এই সকল দোষ বর্তমান থাকে। অতএব, শাক বেশী ভক্ষণ করা উচিত নহে। যে সকল শাকে ১/৬ উপকারিতা আছে, তাহা খাওয়ায় উপকার বৈ ক্ষতি হয় না, কিন্তু অতিরিক্ত শাক ভোজনে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক।

বেতো শাক—ইহা হজম শক্তি বাড়ায়, সহজ পাচ্য, রুচিপ্রদ, শুক্র ও বলকারক সারক এবং প্লীহা, রক্ত-পিত্ত, অর্শ, ক্রিমি ও ত্রিদোষ নাশক।

গীমা শাক—লঘু পাক, রুচিকারক এবং পিত্ত, কফ, কামলা পাণ্ডু জ্বর ও প্লীহা রোগ নাশ করে।

শেচি বা শালিঞ্চ শাক—ইহা অগ্নি বর্ধক, কফবাত প্রশমক, প্লীহা ও অর্শরোগ নাশক।

পুঁই শাক—ইহা ঠাণ্ডা, শ্লেষ্মাকর, কণ্ঠের অহিতকর, নিদ্রাজনক, বায়ু ও পিত্তনাশক, শুক্র বর্ধক, রক্তপিত্ত নিবারক, বলকারক, রুচিপ্রদ, সুপথ্য পুষ্টিকারক তৃপ্তিজনক।

পুদিনা—অগ্নিদীপক, মুখের জড়তা বা তোত্‌লামী নাশক, কফ ও বায়ু নিবারক, বলকর এবং বমি ও অরুচি নিবারক।

কাঁটা নটে শাক—ইহা লঘু পাক, ঠাণ্ডা, রুচিকর, মল-মূত্র সংশোধন করে, পেটের অগ্নি বাড়ায় এবং পিত্ত, কফ, রক্ত দুষ্টি ও বিষ নাশক।

পালং শাক—ঠাণ্ডা, বাত বাড়ায়, কফ বাড়ায়, পায়খানা বাড়ায়, পেট নরম করে, গুরুপাক, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ দূর করে।

পাট শাক—ইহা রক্তপিত্ত দোষ দূর করে, মল বর্ধক, বাতের প্রকোপ বাড়ায়।

কলমী শাক—স্তন দুগ্ধ বাড়ায়, শুক্র বৃদ্ধি করে, চোখের জ্যোতির হিতকর ও ঠাণ্ডা। বিষ দোষ নষ্ট করে।

নুনে শাক বা নোনতা শাক—ইহা গুরুপাক, হজম শক্তি বাড়ায়, অর্শ রোগ, বায়ু শ্লেষ্মা, অগ্নি-মান্দ্য ও বিষ দোষ দূর করে।

হেলেঞ্চা বা হিঞ্চে শাক—ইহাকে ব্রহ্মী শাকও বলা হয়। ইহা শোষ কুষ্ঠ কফ ও পিত্ত দোষ নিবারণ করে।

মূলা শাক—মূলার কচি শাক হজমী কারক, লঘু, রুচিকর ও গরম। ইহা তৈল ঘৃতের সহিত পাকাইয়া ভক্ষণ করিলে বায়ু, পিত্ত কফ নিবারক হয়। আর সিদ্ধ না হইলে কফ ও পিত্ত বাড়াইয়া দেয়।

মটর শাক—লঘু পাক, পেট নরম করে, বায়ু, পিত্ত, কফ দোষ দূর করে।

সরিষার শাক—মল-মূত্র বাড়ায়, গুরুপাক, দাহ বাড়ায়, গরম, বায়ু পিত্ত, কফ বাড়াইয়া দেয়। ইহা সমস্ত শাকের নিকৃষ্ট শাক।

ছোলা শাক—রুচিকর, হজম হওয়া কঠিন, কফ, বাত বৃদ্ধি করে, মল বৃদ্ধি করে ও দাঁতের ফোলা দোষ দূর করে।

পটল শাক—ইহা পিত্ত দোষ নষ্ট করে, হজম শক্তি বাড়ায়, সহজ পাচ্য, ঠাণ্ডা, লঘুপাক, শুক্র বর্ধক, জ্বর, কাশ ও ক্রিমি রোগ নিবারক।

গন্ধ ভাছুলে—গুরুপাক, শুক্র বর্ধক, বল কারক, ভগ্ন সংযোজক, সারক, বাত, রক্ত ও কফ দূর করে।

কলাই শাক বা খেসারী শাক—গুরুপাক, মুখ রোচক। আর কোন গুণ নাই।

থুলকুড়ি, ঠানকুনি বা টাকা পাতা—ইহা ঠাণ্ডা, সারক, মেধাজনক, আয়ুস্কর, স্বর বর্ধক ও স্মৃতি বর্ধক। ইহা কুষ্ঠ, পাণ্ড, মেহ, রক্ত দোষ, কাশ, বিষদোষ, শোষ ও জ্বর নাশক।

কলার মোচা—ঠাণ্ডা, দেরিতে হজম হয়। বায়ু পিত্ত ও ক্ষয় নিবারণ করে।

শজিনার ফুল ও ডাটা—তেজস্বী, ফুলা নিবারক, ক্রিমি, কফ, বায়ু, প্লীহা ও গুল্ম নিবারক।

বেতের ডগা—ভেদক, লঘু, ঠাণ্ডা, বাত বর্ধক এবং রক্ত দোষ, কফ ও পিত্তের দোষ দূর করে।

ধনে শাক—পিত্ত নাশক, রুচিকর, তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, বমি, শ্বাস-কাশ ও ক্রিমি নিবারক।

পান—রুচিকারক, রক্ত পিত্তজনক, বলকারক, কাম দীপক। ইহা কফ, মুখ দুর্গন্ধ, বায়ু শ্রান্তি ও রাত্রন্ধতা (রাত কানা) নাশক।

ছাঁচি পান—সুপথ্য, রুচি বর্ধক, অগ্নি দীপক, পাচক ও কফবাত নাশক।

তরি-তরকারি

কদু—ইহা শক্তি বর্ধক, শরীর মোটা-তাজাকারক, রুচিকর, ধাতু বর্ধক পুষ্টিকর ও পিত্ত শ্লেষ্মা নষ্ট করে। ইহা পেটে থাকা অবস্থায় কলেরা রোগ হয় না।

চাল কুমড়া—পুষ্টিকারক, রস বর্ধক, দেরীতে হজম হয় এবং রক্ত পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক।

কচি কুমড়া—হজম শক্তি বাড়ায়, তাড়াতাড়ি হজম হয়, পাকস্থলী শোধক, চিত্ত বিকৃতি বা উন্মাদ দোষ এবং সর্বদোষ প্রশমক।

মধ্যম কুমড়া—বলকারক।

চিচিঙ্গে বা কহী—ইহা বাত পিত্ত নাশক, বলকারক, পথ্য ও রুচিপ্রদ। ইহা শোষ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। পটলেরও এই গুণ; কিন্তু চিচিঙ্গের গুণ পটল হইতে কিছু কম।

ঝিঙ্গে—কফ, পিত্ত নাশক, ক্ষুধা, রুচি, বল ও বীর্য বাড়ায়।

পটল—ইহা কাশ, রক্ত দোষ, জ্বর, ক্রিমি ও বায়ু পিত্ত কফ দূর করে।

শিম—ইহা সহজে হজম হয় না, পেট গরম করে, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মা বাড়ায় ও বাত পিত্ত দূর করে।

সজিনার ডাটা—অত্যন্ত অগ্নি বর্ধক, কফ, পিত্তশূল, কুষ্ঠ, ক্ষয় শ্বাস ও গুল্ম রোগ বিনাশ করে।

করলা ও উচ্ছে—ইহা ঠাণ্ডা, মল বাড়ায়, সহজে হজম হয়, জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি দূর করে। ইহা বাত বৃদ্ধি করে না। উচ্ছের গুণ করলার ন্যায়। বিশেষতঃ ইহা সহজে হজম হয় এবং পেটের অগ্নি বৃদ্ধি করে।

ধুঁধুল—ঠাণ্ডা, রক্ত পিত্ত ও বায়ু নাশক।

বেগুন—পিত্তকর নহে, অগ্নি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, লঘু পাক। ইহা জ্বর, বায়ু ও শ্লেষ্মা বিনাশক। কচি বেগুন কফ ও পিত্ত নাশক। পাকা বেগুন পিত্তকারক ও গুরুপাক। পোড়া বেগুন অত্যন্ত

লঘু, সামান্য পিত্তকারক, হজমশক্তি বাড়ায়, কফ, মেদ, বায়ু ও আমদোষের শান্তি কারক। পোড়া বেগুন লবণ ও তৈলে মিশ্রিত করিলে গুরু ও স্নিগ্ধ হয়। আর এক প্রকার ডিমের মত সাদা বেগুন আছে, তাহা পূর্বোক্ত বেগুন হইতে নিরস কিন্তু অর্শ রোগে বড় উপকারী।

ঢেঁড়শ—রুচিকর, মল বৃদ্ধি করে, পিত্ত শ্লেষ্মা দূর করে। ঠাণ্ডা, বাত বাড়ায়, প্রস্রাব বাড়ায়, পাথরী রোগ উপশম করে।

কাঁকরোল—পায়খানা পরিষ্কার করে। কুষ্ঠ, হৃল্লাস, অরুচি, শ্বাস, কাশ ও জ্বর সারায়। ইহা অগ্নিদীপক।

ওলকচু—ইহা পাকস্থলীর অগ্নি বাড়ায়, কফ, কাশি, অর্শ, প্লীহা ও গুল্ম বিনাশক। বিশেষতঃ অর্শ রোগে সুপথ্য। কিন্তু দাদ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠ রোগীর জন্য ইহা হিতকর নহে।

মান কচু—ইহা ফুলা নিবারক, ঠাণ্ডা, লঘু এবং পিত্ত রক্তের দোষ দূর করে।

গোল আলু—দুষ্পাচ্য, মল বর্ধক, গুরুপাক, মল-মূত্র নিঃসারক, রক্তপিত্ত দোষ নাশক, বলকারক, শুক্র বর্ধক, স্তন্য বর্ধক।

মিঠা সাদা আলু—ইহা প্রস্রাবের পীড়া দূর করে, দাহ, শোষ, প্রমেহ রোগ দূর করে। গুরুপাক, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীর পক্ষে সাদা মিঠা আলু বিশেষ উপকারী।

লাল মিঠা আলু—বলকর, গুরুপাক ঠাণ্ডা, কফ দোষ দূর করে, পায়খানা বাড়ায়, তৈলে ভাজিলে খুব রুচিকর হয়।

মূলা—রুচিকর, লঘু, পরিপাক সহজ, ত্রিদোষ নাশক, গলার আওয়াজ পরিষ্কারক, ইহা জ্বর, শ্বাস, নাকের ভিতরের রোগ, গলার ভিতরের রোগ, চক্ষুর রোগ দূরীভূত করে। বড় মূলা তৈলাদিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষ নাশক হয়।

গাঁজর—হজমশক্তি বাড়ায়, সহজে হজম হয়, মল সংগ্রহ করে, রক্তপিত্ত, অর্শ, গ্রহণী, কফ ও বায়ু বিনাশ করে।

কাঁচা কলা—ইহা দেরীতে হজম হয়, ঠাণ্ডা, মল বাড়ায়, রক্ত, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় নিবারণ করে এবং বায়ু দূর করে।

পাকা কলা—শুক্র বৃদ্ধি করে, পুষ্টিজনক, রুচিকারক, মাংস বর্ধক, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারক, প্রমেহ নাশক, চক্ষুর হিতকারী।

কলার থোড় বা ভাঁড়ালী—(কলা গাছের মধ্যের দণ্ডের নাম) ইহা অগ্নি বর্ধক, যোনিদোষ দূর করে, রক্তপিত্ত দোষ বিনাশ করে।

দেশী ফল-ফলাদির গুণাগুণ

যজ্ঞ ডুমুর—পিত্ত, কফ ও রক্তের দোষ দুর করে।

পেঁপে—ঠাণ্ডা, রুচিকর, হজমীকারক, সহজপাচ্য, সারক ও রক্ত-পিত্ত নাশক, ইহা অর্শ রোগের বিশেষ উপকারী। পেঁপের আটা ২/১ ফোটা কলা বা অন্য দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

তাল—পাকা তাল পিত্ত রক্ত, ও কফ বর্ধক, দুষ্পাচ্য বহুমূত্রজনক, তন্দ্রাকারক, বাত প্রশমক, পিত্ত নাশক এবং সারক।

কাঁচা বেল—ধারক, অগ্নি বর্ধক, লঘু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও কফ নাশক। কিন্তু পাকা বেলে ত্রিদোষ জন্মে।

আম—পাকা—বলকারক, গুরুপাক, বায়ু নাশক, সারক, তৃপ্তি জনক, পুষ্টিকারক এবং কফ বর্ধক। পাকাআম দুধের সহিত খাইলে, শুক্র বর্ধক, শরীরের বর্ণ সুন্দর কারক, বায়ু পিত্ত দূর করে, রুচিকারক হয়, পুষ্টিকারক এবং বল বর্ধক। অধিক টক আম ভক্ষণে অগ্নিমান্দ্য, বিষম জ্বর; রক্ত দুষ্টি ও চক্ষুরোগ হইতে পারে। কিন্তু মিঠা আমে চক্ষুর হিত হইয়া থাকে ও কোন রোগ হয় না। পাকা আম সামান্য পিত্তকারক। কিন্তু কাঁচা আম পিত্তকারক নহে।

আমসত্ত্ব—ইহা তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্ত দোষ দূর করে, সারক এবং রুচিকর। সূর্য তাপের আমসত্ত্ব সহজে হজম হয়।

কাঁঠাল—পাকা কাঁঠাল ঠাণ্ডা, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিজনক, মাংস বর্ধক, অত্যন্ত কফ বর্ধক, বলকারক, শুক্র বর্ধক এবং পিত্ত, বায়ু রক্ত পিত্ত, ক্ষত ও ব্রণ নাশক। কাঁঠালের বীজ শুক্র বর্ধক, মলরোধক ও মূত্র নিঃসারক, গুরুপাক। কাঁঠালের মজ্জা শুক্র বর্ধক এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক। গুল্ম রোগাক্রান্ত এবং মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির কাঁঠাল খাওয়া অনুচিত।

পেয়ারা—বলকারক, রুচিকর, শুক্রজনক, ইহা ক্রিমি, বায়ু, তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, মূর্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষ নিবারক।

কমলা লেবু—হজমশক্তি বর্ধক, বায়ু নাশক,।

গাব—(পাকা ও কাঁচা) কাঁচা গাব বায়ু বর্ধক, ধারক, লঘু, ঠাণ্ডা। পাকা গাব পিত্ত, প্রমেহ, রক্ত দোষ ও দাহ নাশক।

ডাব নারিকেল—পিত্ত জ্বর ও পিত্তজনিত সমস্ত রোগনাশক, অগ্নি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, পিপাসা নাশক, পেট শোধক।

বড় জাম—ইহা পাচক, মল বর্ধক, রুচিকর, কণ্ঠস্বর বর্ধক। পিত্ত, দাহ, ক্রিমি, শ্বাস ও শোষ রোগ, অতিসার, কাশ, রক্ত দোয, কফ রোগ ও ব্রণ নষ্ট করে।

ছোট জাম—কফ, পিত্ত, রক্ত দুষ্টি ও দাহ নাশক।

কুল বা বড়ই—বড় মিঠা বড়ই। ইহা গুরুপাক, শুক্র বর্ধক ও পুষ্টিকর। ইহা পিত্ত, দাহ, রক্ত দোষ, ক্ষয় ও পিপাসা নাশক। শুক্‌না বড়ই ভেদক, অগ্নি বর্ধক ও সহজে হজম হয়। ইহা পিপাসা, ক্লান্তি ও রক্ত দোয নাশ করে।

চাল্‌তা—কাঁচা চাল্‌তা কফ ও বায়ুনাশক।

পাকা চাল্‌তা—ধারক, ত্রিদোষ নাশক, ও বিয নাশক, শ্রান্তি ও শুল নাশক।

ক্ষীরুই—ইহা শুক্র বর্ধক, বলকারক, ঠাণ্ডা, গুরুপাক। ইহা পিপাসা, মূর্চ্ছা মত্ততা, ভ্রান্তি, ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্ত দোয দূর করে।

তরমুজ—পাকা তরমুজ পিত্ত বর্ধক এবং কফ ও বায়ু নাশক।

কামরাঙ্গা—ধারক, কফ ও বায়ু নাশক।

তেঁতুল—পাকা তেঁতুল অগ্নি বর্ধক, সারক, কফ ও বায়ু নাশক। কিন্তু কাঁচা তেঁতুল ভয়ানক ক্ষতিকর।

লেবু—জামীর লেবু বায়ু, কফ, বিবাজ, শূল, কাশ, বমির বেগ, বমি, পিপাসা, আম দোষ, হৃৎপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমি নাশক।

কাগজী ও পাতি লেবু—বায়ু নাশক, অগ্নি বর্ধক, পাচক ও লঘু। ক্রিমি নাশক, উদর রোগ নাশক। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শূল রোগে হিতকর। যাহার একেবারে রুচি নষ্ট হইয়াছে, তাহার

পক্ষে উক্ত লেবু হিতজনক। ইহা ত্রিদোষ নাশক, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয় রোগ, বাত রোগ, রক্ত দুষ্টি, গলরোগ ও বিশুচিকা রোগে প্রযোজ্য।

মনাক্কা-কিসমিস—ইহা পিপাসা, জ্বর, শ্বাস, বাত, বাত রক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্ত পিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয় রোগ নাশক। ইহা ঠাণ্ডা, চক্ষুর জন্য হিতকর, শরীর বর্ধক, আওয়াজ পরিষ্কারক, মল-মূত্র নিঃসারক, পেটে বায়ুজনক, শুক্র বর্ধক।

খেজুর—ইহা ঠাণ্ডা, রুচিকর, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক, মলবর্ধক, বলকারক, ক্ষত নাশক ও ক্ষয় নিবারক, রক্তপিত্ত নাশক।

খেজুরের রস—মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাত দূর করে। কফ নাশক, রুচিজনক, অগ্নি বর্ধক বলকর এবং শুক্রবর্ধক।

তালের রস—ইহা অত্যন্ত মত্ততাজনক, টক হইলে পর পিত্ত বর্ধক হয় ও বাত নাশক হইয়া থাকে।

দাড়িম্ব বা আনার—ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর হৃদরোগ, কণ্ঠগত রোগ ও মুখ রোগ নাশক, তৃপ্তিকারক, শুক্র বর্ধক, লঘু, ঠাণ্ডা মেধা ও বল বর্ধক।

নাশপাতি—অমৃত ফল, লঘু, শুক্র বর্ধক, সুস্বাদু, ত্রিদোষ নাশক।

কাবুলী বাদাম—সুস্নিগ্ধ, বায়ু নাশক, শুক্র বর্ধক, ইহা রক্ত পিত্ত রোগীর পক্ষে অহিতকর।

মধু—লঘু, ধারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নি বর্ধক, স্বর বর্ধক, ব্রণশোধক, শরীরে কোমলতা আনয়ন করে। মেধা শক্তি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, রুচিকারক, সামান্য বায়ু বর্ধক। ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, কাশ, রক্ত পিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্লান্তি, ক্রিমি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা অতিসার, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় রোগ নাশক।

মসল্লাদির গুণাগুণ

গোল মরিচ—অগ্নি বর্ধক, কফ ও বায়ু নাশক, ইহা শ্বাস, শূল ও ক্রিমি বিনাশক।

আদা—ইহা ভেদক, অগ্নি-দীপক, বাত ও কফ নাশক, খাওয়ার পূর্বে আদা ও লবণ বিশেষ হিতকর। ইহাতে অগ্নি দীপক, আহারে অরুচি জিহ্বা ও কণ্ঠ শোধিত হয়। প্রয়োগ নিষেধঃ কুষ্ঠ, পাণ্ডু রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্ত পিত্ত, জ্বর যুক্ত ব্রণ ও দাহ রোগে এবং গ্রীষ্ম শরৎকালে আদা হিতকর নহে।

ধনে—ইহা স্নিগ্ধ, মূত্রজনক, অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিকর, ধারক, ত্রিদোষ নাশক। ইহা তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ ও ক্রিমি নিবারক। ধনে শাক পিত্ত নাশক এবং উপরে লিখিত ধনের গুণ বিশিষ্ট।

হরিদ্রা বা হল্দী—ইহা কফ দোষ, বাত দোষ, রক্ত দোষ, কুণ্ডু, প্রমেহ, ত্বক দোষ, ব্রণ, শোষ, পাণ্ডু রোগ, ক্রিমি, বিষ দোষ, অরুচি ও পিত্ত রোগের দোষ দূর করে।

লবঙ্গ —লঘু, চক্ষুর জন্য হিতকর, অগ্নিবর্ধক, পাচক ও রুচিকারক। ইহা কফ, পিত্ত, রক্ত দোষ; তৃষ্ণা, বমি, শূল, কাশ, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় রোগ আশু বিনাশক।

বড় এলাচি—অগ্নি বর্ধক, লঘু। ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, বিষ দোষ, বস্তিগত রোগ, মুখের রোগ, বমি ও কাশ নষ্ট করে।

ছোট এলাচী—কফ, কাশ, শ্বাস, অর্শ রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বায়ুনাশক, লঘু ও ঠাণ্ডা।

দারুচিনি—ইহা বাতের দোষ দূর করে, পিত্ত দোষ সারায়, সুগন্ধি, শুক্র বর্ধক বলকারক, মুখ শোষ ও তৃষ্ণা নিবারক।

তেজ পাতা—ইহা কফ, বায়ু, অর্শ, অরুচি বিনাশক।

মেথি—অগ্নি বর্ধক, রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ বাড়ায়, বায়ু শ্লেষ্মা ও জ্বর নিবারক।

মৌরী বা মিঠা জিরা—ইহা যোনি শূল, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধতা, ক্রিমি, শূল, কাশ, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক।

সাদা জিরা—নরম পেট শক্ত করে, হজম শক্তি বাড়ায়, চক্ষুর হিতকারক, বীর্য বর্ধক, গর্ভ থলির সংশোধক, সুগন্ধিকর। ইহা বমি, ক্ষয় রোগ, বাত রোগ, কুষ্ঠ, বিষ রোগ, জ্বর, অরুচি, রক্ত দোষ, অতিসার ক্রিমি রোগ, পিত্তের দোষ, গুল্ম রোগ নাশক।

কালি জিরা—ইহা চক্ষুর হিতকর, পেট শক্ত করে, অগ্নি বাড়ায়, কফ নষ্ট করে, জীর্ণ জ্বর, শোথ, শির রোগ ও কুষ্ঠ রোগ ভাল করে।

বড় কালি জিরা—অজীর্ণ, বাত গুল্ম, রক্ত পিত্ত, ক্রিমি, কফ, পিত্ত আম দোষ ও শূল, রোগ নাশক।

পেঁয়াজ—বায়ু নাশক, বেশী পিত্তজনক নহে। বলকারক, বীর্য বর্ধক ও গুরুপাক, কফ বর্ধক।

রসুন—পুষ্টিকর শুক্র বর্ধক, স্নিগ্ধ, পাচক, সারক, ভগ্নস্থান জোড়া দায়ক, কণ্ঠ শোধক, বলকারক, ব্রণ প্রসাধক, মেধাশক্তি বর্ধক, চক্ষুর হিতকারক, পিত্ত রক্ত বর্ধক। ইহা হৃদরোগ, জীর্ণ জ্বর, বুক বেদনা, মল বর্ধতা, গুল্ম, অরুচি, কাশ, শোষ, অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফ নাশক।

পান—ইহা রুচিকারক, রক্ত পিত্তজনক, বলকারক, কামভাব বর্ধক, ঘা বর্ধক, কফ নাশক, রাতকানা নাশক, বায়ু নিবারক, মুখ দুর্গন্ধ নাশক।

ছাঁচি পান—সুপথ্য, রুচি বর্ধক, অগ্নিদীপক, পাচক ও কফ বাত নাশক।

সুপারী—কফ দূর করে, পিত্তের দোষ নষ্ট করে, মদকারক, অগ্নি বর্ধক, রুচিকারক, মুখের নিরসতা নাশক। কাঁচা সুপারী দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে, পেটের অগ্নি নষ্ট করে, ত্রিদোষ নাশ করে।

সাদা জর্দা বা (তামাক পাতা) কোন গুণ পাওয়া যায় নাই।

চুনা—(যে চুন পানের সহিত খাওয়া হয়) মনে রাখিতে হইবে যে, পাথর চুনা শরীরের ক্যালসিয়াম অর্থাৎ, শক্তিক্ষয় করে, জীবনী শক্তি নষ্ট করে, পাকস্থলীর শক্তি নাশ করে, এইজন্য কোন মতেই পাথর চুনা খাওয়া উচিত নহে।

ঝিনুক চুনা ও শামুক চুন—শরীরের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া থাকে।

ঝিনুক চুনের গুণ—এই চুন বাত, শ্লেষ্মা, মেদো রোগ, অম্ল পিত্ত শূল, গ্রহণী, ব্রণ ও ক্রিমি রোগ নষ্ট করে। ৮ তোলা চুন দশ সের পানির মধ্যে দুই প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে, সেই পানির সহিত দুধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মধু মেহ রোগ প্রশমিত হয়। ইহা অম্ল পিত্ত ও শূল রোগের পথ্য ও ঔষধ। ঝিনুক চুনের মধ্যে মুক্তার গুণ পাওয়া যায়।

খয়ের—দাঁতের হিতকর। ইহা কুণ্ড, কাশ, অরুচি, মেদো দোষ, ক্রিমি, প্রমেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আম দোষ, পিত্ত, রক্ত দোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, কফ রোগ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও প্রদর নাশক।

হিসাব-পত্র লিখার নিয়ম

আমাদের দেশের বহু লোক আছেন যাঁহারা হিসাব-নিকাশ, টাকা-পয়সার জমা-খরচ লিখা শিখেন নাই। তাঁহাদের সুবিধার্থে নমুনা-স্বরূপ কিছু হিসাব করার নিয়ম লিখিয়া দেওয়া হইল।

তাহা ছাড়া স্ত্রীলোকদের জন্যও হিসাব রাখার অভ্যাস করা একান্ত আবশ্যক। কেননা, অনেক সময় তাহারা স্বামীর দেওয়া টাকা-পয়সা রাখিতে না জানার দরুন কত টাকা কি বাবদ ব্যয় হইল তাহা নিয়া পেরেশানী ভোগ করিতে হয়। স্বামীর ধমক খাইতে হয়। চাকর-নকর দ্বারা বাজার করাইতে হয়। হিসাব রাখিতে না পারার কারণে চাকরেরা পয়সার গোঁজামিল দেয়, চুরি করে।

পূর্বের জমা কত ছিল, বর্তমানে কত পাওয়া গেল, কি বাবদ কত খরচ হইল তাহা জানা না থাকার দরুন অনুমানে হিসাব দিতে হয় এবং অবিশ্বাসী হইতে হয়। উগ্রপন্থী স্বামী অনেক সময় এইসব কারণে অমানুষিক ব্যবহারও করিয়া বসে। সে জন্য মেয়েদের অবশ্যই হিসাব শিক্ষা করা কর্তব্য।

পূর্বে ষোল আনায় বা চৌষট্টি পয়সায় এক টাকা গণনা করা হইত। এক আনা ৵০ এইরূপ এবং দুই আনা ৶০ এইরূপ লিখা হইত। বর্তমানে আর আনার প্রচলন নাই। এখন একশত পয়সায় এক টাকা গণনা করা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা ও পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্বের মত টাকা-পয়সার মুদ্রার অংক লিখিবার জটিলতা আর রহিল না। এখন টাকার অংকের ডান পার্শ্বে "·" দশমিক বিন্দু দিয়া পয়সার অংক লিখিবে। যথা, ১·৪৪ এক টাকা চৌয়াল্লিশ পয়সা, ১৭০·৯৪ একশত সত্তর টাকা চৌরানব্বই পয়সা, ১১·০৬ এগার টাকা ছয় পয়সা ইত্যাদি।

হিসাবের নমুনা

প্রথমে তারিখ ও বার লিখ। তারপর নীচের লাইন জমা শব্দটা লিখিয়া লম্বা একটা টান ডান দিকে খিচ। তারপর ডান পার্শ্বে খরচ শব্দটা লিখিয়া ডান দিকে লম্বা টান দাও। তাপর প্রত্যেক খরচের নীচে খরচ লিখ এবং যোগ করিয়া জমা হইতে বিয়োগ দিয়া হাতের নগদ টাকা হিসাব রাখ। খরচ বেশী হইলে অর্থাৎ কর্জ হইলে জমার ঘরে "কর্জ বাবদ জমা" শব্দটি লিখিয়া জমা করিয়া নেও এবং কর্জ পরিশোধের সময় খরচের ঘরে দেনা পরিশোধ শব্দ লিখিয়া হিসাব রাখ। প্রত্যেক প্রকারের জমা-খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

বিঃ তাং ৯ই মাঘ রোজ শনিবার—১৩৬৮ সন

হাল জমা—			খরচ—
মনি অর্ডারে প্রাপ্ত—	৩৫·৪০	কাপড় খরিদ—	২১·৪৪
		মাছ বাবদ—	১·৬৮
বকেয়া জমা ধান বিক্রি বাবদ—	৬·৯৪	ডাইল বাবদ—	২·০০
		দুধওয়ালাকে—	৫·৪৮
মোট জমা—	৪২·৩৪	মোট খরচ—	৩০·৬০
মোট খরচ—	৩০ ·৬০		
মোট খরচ বাদে হাতে রহিল—	১১·৭৪		

বিঃ তাং ১১ই মাঘ সোমবার—১৩৬৮ সন

		খরচ—	
সাবেক জমা—	১১·৭৪	মাছ তরকারী—	২·১৬
ধান বিক্রি বাবদ—	৯·১৪	লাকড়ী—	৩·০৯
মোট জমা—	২০·৮৮	ধোপার মজুরী—	·৬০
মোট খরচ—	৬·১০	পান সাদা—	·২৫
খরচ বাদে জমা—	১৪·৭৮	মোট খরচ—	৬·১০

বিঃ তাং ১৪ই মাঘ বৃহস্পতিবার—১৩৬৮ সন

জমা হইতে খরচ বেশী হওয়ায় কর্জ করা লাগিল

		খরচ—	
সাবেক জমা—	১৪·৭৮	খাজনা—	২০·১৯
কর্জ বাবদ—	২০·১৫	ডাক্তারকে—	৪·১৪
	৩৪·৯৩	নৌকা ভাড়া—	২·০০
		ছেলের পুস্তক—	১৮·০৯
৯·৪৯ পয়সা দোকানে বাকী			৪৪·৪২

বিঃ তাং ১৬ই মাঘ শনিবার—১৩৬৮ সন

সাবেক জমা নাই		খরচ—	
গাছ বিক্রি বাবদ—	৪০·০০	দোকানের দেনা শোধ—	৯·৪৯
গরুর পাওনা ওয়াশীল—	৪৭·১৪	চাউল দুই মণ—	৬৫·০৭
	৮৭·১৪	কুলির মজুরী—	২·১১
	৮৩·৯২	নাছিমার মাতাকে—	৭·২৫
খরচ বাদে জমা—	৩·২২		৮৩·৯২

বিঃ তাং ৩০শে মাঘ, শুক্রবার—১৩৬৮ সন

		খরচ—	
সাবেক জমা—	৩·২২	মাছ তরকারী—	২·১৪
নাছিমার মাতা—	৭·২৫	নিমক—	১·০৬
মোট জমা—	১০·৪৭	পেঁয়াজ—	·২৫
		সাবান—	২·১৭
		দুধের মূল্য—	৩·১৩
মোট জমা—	১০·৪৭	মোট খরচ—	৮·৭৫
মোট খরচ—	৮·৭৫		
খরচ বাদ জমা—	১·৭২		

হাতে রহিল এক টাকা বাহাত্তর পয়সা

জমা খরচ সমান সমান

বিঃ তাং ১লা ফাল্গুন, শনিবার—১৩৬৮ সন

			খরচ—
সাবেক জমা—	২৮·৫৪	নৌকা ভাড়া—	৬·১২
হাল জমা নাই		চাউল—	২২·৪২
হাতে কিছুই নাই		মোট খরচ—	২৮·৫৪

৬৪ পয়সায় বা ষোল আনায় টাকা ধরিয়া পুরাতন নিয়মে হিসাব করার জন্য অল্প কথায় সহজ নিয়ম দেওয়া গেল। ইহাকে আর্য্যা বলে।

১ম নিয়মঃ—এক মণের দাম যত টাকা হইবে /২।। আড়াই সেরের মূল্য তত আনা হইবে। যথা—একমণ চাউল ২৮৲ হইলে আড়াই সেরের দাম ২৮ আনা বা ১৸০ আনা হইবে।

২য় নিয়মঃ—এক টাকায় যত সের জিনিস পাওয়া যাইবে ৪০৲ টাকায় তত মণ জিনিস পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় /১।। দেড় সের চাউল পাওয়া গেল ৪০৲ টাকায় দেড় মণ পাওয়া যাইবে।

৩য় নিয়মঃ—এক টাকায় যত সের বস্তু পাওয়া পাইবে, এক আনায় তত ছটাক বস্তু পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় তিন সের দুগ্ধ পাওয়া গেলে এক আনায় তিন ছটাক দুগ্ধ পাওয়া যাইবে।

৪র্থ নিয়মঃ—এক টাকায় যে বস্তু পাঁচ সের পাওয়া যায় ৮৲ (আট) টাকায় সে বস্তু এক মণ পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় পাঁচ সের গোল আলু পাওয়া গেলে আট টাকায় এক মণ আলু পাওয়া যাইবে।

৫ম নিয়মঃ—১ টাকায় যত গজ কাপড় পাওয়া যাইবে, ১ আনায় তত গিরা পাওয়া যাইবে।

যে সকল গৃহ-কন্যারা স্কুলে বা মক্তবে লেখাপড়া করেন নাই এবং অঙ্ক জানেন না, তাহাদের সহজভাবে হিসাব শিক্ষার জন্য উপরোক্ত হিসাবটুকু লিখিয়া দেওয়া হইল।

পোষ্ট এবং টেলিগ্রাম অফিসের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

পত্রাদির নিয়ম—একখানা পোষ্ট কার্ডের দাম নয়া পাঁচ পয়সা। উহার যে পৃষ্ঠে ঠিকানা লেখার দাগ কাটা আছে, তাহার বাম পার্শ্বে নিজ বক্তব্য লিখা যায়; কিন্তু ডান পার্শ্বে শুধু ঠিকানা লিখিতে হইবে। কোন কোন লোক ঠিকানার স্থলে দুই একটা শব্দ লিখিয়া দেয়। ইহা বড়ই অন্যায়। ইহাতে পত্র বেয়ারিং হইয়া যায়। অর্থাৎ, যাহার নিকট পত্র যাইবে, তাহার নিকট হইতে ডাক বিভাগ নয়া দশ পয়সা উশুল করিবে। সুতরাং বাম পার্শ্বে নিজ ঠিকানা এবং বক্তব্য লিখিবে আর ডান পার্শ্বে শুধু ঠিকানা লিখিবে।

২। প্রাপকের নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া পূর্ণরূপে লিখিবে। সে স্থান যদি বিখ্যাত না হয়, তবে পোষ্টের সহিত জেলার নামও লিখে দাও। আর যদি বড় শহরে পত্র পাঠাইতে হয়, তবে মহল্লা ও বস্তির নাম, বাড়ীর নম্বরও লিখিয়া দাও।

৩। যদি লেফাফায় পত্র দিতে চাও, তবে উহার উপর ঠিকানার স্থানে কিছু লিখিলে বে-আইনী হইবে।

৪। যদি পোষ্ট কার্ডের সমতুল্য লম্বা এবং চৌড়া গ্লেজ মোটা কাগজে পত্র লিখিয়া ঠিকানার স্থানে ঠিকানা লিখিয়া টিকেট লাগাইয়া দাও, তবে ইহাও পোষ্ট কার্ড বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি উহার উপর টিকেট না দাও, তবে উহা আর প্রাপকের নিকট যাইবে না। ডাক বিভাগের লোকেরা উহা নিয়া লা-ওয়ারিশ পত্রে শামিল করিয়া ফেলিবে। হাঁ, যদি পোষ্ট কার্ডের সাইজ হইতে কিছু কম চওড়া থাকে এবং অপর পৃষ্ঠের ডান অর্ধে ঠিকানা দেওয়া থাকে, তবে উক্ত পত্র বেয়ারিং হইয়া মালিকের নিকট পৌঁছিবে; ইহাকে প্রাইভেট কার্ড বলা হয়। এইরূপ কার্ডের ডান দিকে মোহরাদির জন্য স্থান রাখিতে হইবে এবং ডান পার্শ্বে কিছু লিখিবে না। আর যদি বাম অর্ধেকে ঠিকানা লিখ, তবে উহা বেয়ারিং হইয়া যাইবে।

যদি সাদা লেফাফায় ১৫ পয়সার টিকেট লাগাইয়া দাও, তবে উহাও পনর পয়সার ইনভেলাপ হইয়া যাইবে। যদি উহার উপর টিকেট না দাও, তবে ৩০ পয়সার বেয়ারিং হইয়া যাইবে। কিন্তু লেফাফা আটকাইয়া দিতে হইবে। আঠা দিয়া আটকাইয়া না দিলে টিকেটবিহীন ইনভেলাপ লা-ওয়ারিশ চিঠি বলিয়া গণ্য হইবে। পথে যদি টিকেট লাগাইতে না পাও, তবে অন্য পোষ্ট কার্ডের ষ্টাম্পের চাপ দেওয়া স্থান হইতে কাটিয়া নিয়া অন্য পত্রে লাগাইও না। যদি লাগাও, তবে তাহা বেয়ারিং হইয়া যাইবে।

৫। কার্ড বা লেফাফা এরূপভাবে ধুইও না—যাহাতে টিকেটের রং বিগড়াইয়া যায়। এরূপ ময়লা টিকেট পত্রে লাগাইও না যাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। টিকেটের উপর নিজ নাম লিখিও না। কোন প্রকার দাগও কাটিও না; বরং টিকেট পরিষ্কার রাখ, অন্যথায় পত্র বেয়ারিং হইয়া যাইবে। ব্যবহার্য টিকেটও পত্রে কখনও ব্যবহার করিও না; ইহাতেও পত্র বেয়ারিং হয়। যদি পূর্বের ব্যবহার্য টিকেটের দাগ ধুইয়া মুছিয়া ব্যবহার করিতে চেষ্টা কর, তবে তাহা কঠিন অপরাধ হইয়া যাইবে এবং এইরূপ টিকেট ব্যবহারকারীকে মোকদ্দমায় সোপর্দ করা হয়। অনেক স্থলে কঠিন সাজাও হইয়া থাকে।

৬। কেহ কেহ জওয়াবী কার্ড না পাইলে উত্তরের জন্য দুইখানা কার্ড সেলাই করিয়া জোড়াইয়া দেয়। ইহাতেও চিঠি বেয়ারিং হইয়া যায়। সুতরাং জওয়াবী কার্ড সংগ্রহ করিয়াই পত্র দেওয়া উচিত। জরুরী পত্রাদি তাড়াতাড়ি বিলি করার জন্য প্রেরককে এক্সপ্রেস ডেলিভারীর জন্য অতিরিক্ত ·১৫ পয়সার টিকেট লাগাইতে হয়। লেফাফায় পত্র ভরিয়া নিক্তি দ্বারা এক তোলার ওজন লইয়া পত্রটি ওজন দাও। এক টাকায় এক তোলা হয়, যদি এক তোলার বেশী ওজন না হয়, তবে ·১৫ পয়সায় যাইবে। এক তোলার বেশী হইলেই প্রতি তোলায় ·৫ পয়সার টিকেট বেশী লাগে। আর যদি অতিরিক্ত চার্জের টিকেট না দিয়া পত্র ছাড়, তবে প্রাপকের নিকট হইতে ডবল চার্জ উসুল করা হইবে। অর্থাৎ, এখানে যে টিকেট লাগিত উহার দ্বিগুণ।

যদি প্রাপক বেয়ারিং পত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তবে সেই পত্র তোমার অর্থাৎ, প্রেরকের নিকট ফিরিয়া আসিবে এবং তোমাকেই উহার দ্বিগুণ মাশুল দিতে হইবে। আর যদি তুমি এই মাশুল দিতে অনিচ্ছুক হও, তবে ভবিষ্যতে তোমার নামের পত্র আটক রাখা হইবে, যাবৎ তুমি উক্ত ঋণ পরিশোধ না করিবে, তাবৎ তোমার চিঠি বিলি করা হইবে না।

৭। এক লেফাফায় কয়েকজনের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পত্র লিখিও না। কেননা, ডাক বিভাগের নিষেধ আছে। তা ছাড়া শরীঅতেও এরূপ করা দুরুস্ত নহে। হাঁ, তুমি যাদের সম্বন্ধে জানিতে চাও তাদের বিষয় ঐ একই পত্রে দু'চার কথা লিখিতে পার, তাতে দোষ নাই। কিন্তু অনর্থক এক লেফাফায় কতকগুলি চিঠি বানাইয়া সাজাইয়া লিখিয়া দিও না।

৮। চিঠি বা পার্শেলের উপর যত মূল্যের টিকেট লাগান প্রয়োজন, তাহা হইতে কম লাগাইলে যত কম টিকেট লাগান হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ প্রাপকের নিকট হইতে উসুল করা হইবে।

বুক-পোষ্টের নিয়ম

১। যে সমস্ত কাগজ ছাপান, যেমন, কিতাব, খবরের কোগজ বা মাসিক পত্র-পত্রিকা। যদি ইহা ডাকে পাঠাইতে হয়, তবে এমনভাবে উহা প্যাকেট করিবে যেন ডাক ঘরের লোকের খুলিতে অসুবিধা না হয়। এই প্রকারের পার্শেলকে বুক পোষ্ট পার্শেল বলে। প্রথমে উহার পাঁচ তোলা পর্যন্ত ৭ (সাত) পয়সা, উহার অতিরিক্ত প্রতি ২॥০ তোলা বা উহার অংশের জন্য ৩ পয়সার টিকেট বাড়াইতে হইবে।

২। বুক পোষ্ট পার্শেলের মধ্যে চিঠি দেওয়া নিষেধ।

৩। বুক পোষ্ট পার্শেলের মধ্যে কোন টাকার নোট, হুণ্ডি ষ্ট্যাম্প বা ব্যাঙ্কের নোট ইত্যাদি কাগজপত্র যাহার পরিবর্তে টাকার মূল্য পাওয়া যায়, তাহা পাঠান নিষেধ। পার্শেলের প্যাকেট দুই ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া এবং এক ফুট উঁচু হইবে, ইহার অতিরিক্ত হইতে পারিবে না। আর যদি গোলাকার করিয়া বটিয়া দেওয়া হয়, তবে ৩০ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪ ইঞ্চি মুখে, ইহার অতিরিক্ত প্যাকেট করা যাইবে না।

৪। প্যাকেট পাঠানোর সময় যদি টিকেট এখান হইতে না লাগাইয়া দাও, তবে বেয়ারিং হইয়া যাইবে ও প্রাপকের নিকট দ্বিগুণ মাশুল উসুল করা হইবে। সে যদি পার্শেল না রাখে, তবে প্রেরকের নিকট হইতেই সেই দ্বিগুণ মাশুল উসুল করা হইবে।

রেজিষ্টারীর নিয়ম—চিঠি-পত্র, প্যাকেট বা পার্শেলের যদি বেশী হেফাযত করিতে চাও, তবে উহা বেজিষ্টারী করিয়া লও। অর্থাৎ, পত্রের উপর অতিরিক্ত আরও ·৪০ পয়সার টিকেট লাগাও এবং নিজে অফিসে যাইতে না পারিলে পিয়নকে বলে দাও যে, ইহাকে রেজেষ্টারী করিয়া দিতে হইবে। অফিস হইতে রেজিষ্টারী করার একটি রসিদ পাওয়া যাইবে। উহা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিও।

যদি তুমি ইচ্ছা কর যে, যাহার নিকট যাহা পাঠাইবে, তাহার দস্তখত করা প্রাপ্তি স্বীকার রসিদও পাওয়া দরকার, যেন সে পত্র পাওয়া অস্বীকার করিতে না পারে যে, আমার নিকট পত্র বা পার্শেল পৌঁছে নাই, তবে তুমি আরও ·১৩ পয়সার টিকেট দিয়া এক্‌নোল্যাজম্যান্ট রসিদ দিয়া দাও। অথবা পোষ্ট মাষ্টারকে বল, প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ বা এক্‌নোল্যাজমেন্ট রসিদ দিয়া দেন। উহা একখণ্ড ছোট ছাপান কাগজ। উহার এক পার্শ্বে প্রেরকের ঠিকানা এবং অপর পার্শ্বে প্রাপকের ঠিকানা লিখার ঘর থাকে। তাহা পুরা করিয়া পত্রের সহিত বাঁধিয়া দিলেই প্রাপকের নিকট তোমার প্রেরিত পত্র বিলি করার সময় প্রাপকের দস্তখত হইয়া উক্ত রসিদ ফেরত ডাকে তোমার নিকট আসিবে। ইনসিওর বা হুণ্ডি, টিকেট, ষ্ট্যাম্প, ইত্যাদির হেফাযতের জন্য রেজিষ্টারী করা প্রয়োজন। কেননা, রেজিষ্টরী না হইলে যদি উহার কোন প্রকার ক্ষতি হয়, তবে ডাক বিভাগ সে জন্য দায়ী হইবে না।

রেজিষ্টারী পত্রের নীচের দিকে বাম পার্শ্বে নিজ ঠিকানা নাম ধাম লিখে দাও। কেননা, যাহার নিকট পাঠাইতেছ তাহাকে যদি না পাওয়া যায়, তবে যেন অবিলম্বে তোমার নিকট ফেরত আসিতে পারে।

বীমা বা ইনসিওরের নিয়ম

যদি কোন মূল্যবান বস্তু যাহা সোনা রুপার অলঙ্কার বা টাকার নোট ইত্যাদি কোথায়ও নিরাপদে পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে উহা ইনসিওর করিয়া দাও।

বীমার এনভেলাপ বা প্যাকেটের সেলাই করার স্থানটা প্রত্যেক ইঞ্চির পর পর গালা দিয়া কোন নাম খোদাই করা সীল দ্বারা মোহর করিয়া দাও। বুতাম, পয়সা বা টাকা কিংবা ফুল ইত্যাদির ছাপ দিও না। বীমার উপর প্রাপকের এবং প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কার লিখিয়া দাও। বীমার মূল্যও লিখিতে হইবে। যেমন ৩০০ তিন শত টাকা বা ৫০০ পাঁচ শত টাকা ইত্যাদি। মূল্যটা কথায়ও লিখিয়া দিতে হইবে। আর যদি টাকা বীমা করিয়া থাক, তবে টাকার সংখ্যাও কথায় ও অঙ্কে লিখিয়া দিতে হইবে।

যদি তিনশত বা উহার কম টাকা বীমা করিয়া থাক, তবে লেফাফার মূল্য এবং রেজিষ্টারীর খরচের অতিরিক্ত ·৫০ পয়সার টিকেট লাগাইতে হইবে। তিন হাজার টাকার অতিরিক্ত ইনসিওর করা যায় না। যদি লেফাফার মধ্যে নোট ভর্তি করিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে উহা ইনসিওর করিতেই হইবে।

ইনসিওর বা বীমার জন্য পোষ্ট অফিস হইতে রেজিষ্টারী লেফাফা সবচেয়ে নিরাপদ। কেননা, উহার ভিতর দিকে কাপড় লাগান থাকে এবং খুব মজবুত হওয়ার কারণে নোটগুলি ভাল থাকে। উহার উপর রেজিষ্টারী খরচ দিতে হয় না, লেফাফার মূল্যের সহিতই রেজিষ্টারী চার্জ নিয়া নেওয়া হয়। উহার ওজন যদি এক তোলার অতিরিক্ত না হয় বা এক তোলার কম হয়, তবে উহা রেজিষ্টারীর সময় অতিরিক্ত পয়সা দিতে হইবে না। যদি এক তোলার বেশী হয়, তবে চিঠির নিয়ম মত তোলা বা তোলার অংশের জন্য পাঁচ পয়সার টিকেট লাগাইতে হইবে।

টাকা, সোনা, চাঁদি ও মূল্যবান পাথরাদি, নোট বা উহার অংশ, অথবা সোনা চাঁদির তৈরী কোন বস্তু অবশ্যই বীমা করিতেই হইবে। বীমা ছাড়া পাঠাইলে ডাক ঘরের লোকেরা জানিতে পারিলে উহা প্রেরককে ফেরত দিবে এবং এক টাকা জরিমানা আদায় করিবে অথবা যদি প্রাপক অস্বীকার করে যে, উহা তাহার রাখার ইচ্ছা নাই, তবে বীমাহীন পার্শেলটি প্রেরককে দেওয়া হইবে এবং এক টাকা জরিমানা উসুল করা হইবে।

পার্শেলের নিয়ম—১। টাকা, পয়সা, অলংকার, ঔষধ, আতর অথবা কাপড় ইত্যাদি দ্রব্য কোন ডিব্বার মধ্যে বা কোন বাক্সে ভরিয়া উহার উপর কাপড় মোড়াইয়া সেলাই করিয়া গালা দিয়া আটকাইয়া ডাকে পাঠানের নামই হইতেছে পার্শেল। পার্শেলের মাশুল—প্রতি চল্লিশ তোলার জন্য ৫০ পয়সা এবং তদূর্ধ্বে আরও ৪০ তোলা বা উহার অংশের জন্য ৫০ পয়সা।

২। সাড়ে বার সের বা ১০০০ তোলা পর্যন্ত পার্শেলে পাঠান যায়।

৩। পার্শেলের মধ্যে একটা পত্র দেওয়ার অনুমতি আছে, তাহা শুধু ঐ ব্যক্তির নামেই থাকিবে যাহার নামে পার্শেল যাইবে।

৪। পার্শেলের সেলাইগুলির উপর উত্তমরূপে গালা লাগাইয়া মোহর করিয়া দিও। উহাতে হেফাযত হইবে।

৫। এত ছোট পার্শেল করিও না যাহার উপর ডাকঘরের মোহর করার স্থান হয় না।

৬। পার্শেল বেয়ারিং যায় না। উহার মধ্যে যদি মূল্যবান বস্তু থাকে, তবে উহা রেজেষ্টারী করাইয়া দাও, তাহা হইলে নিরাপদে পৌঁছিবে।

ভি, পি-এর নিয়ম

১। কাহারো নিকট কোন বস্তু ডাকে পাঠাইয়া যদি উহার মূল্য উসুল করিয়া লইতে চাও, তবে পার্শেল প্যাকেট বা পত্রের উপর প্রাপকের ঠিকানা লিখিয়া উহার মূল্য যথাঃ—ভি, পি মূল্য—এগার টাকা, এইরূপ লিখিয়া উহার সহিত একখানা ভি,পি, মনিঅর্ডার ফরম পুরা করিয়া পাঠাইয়া দাও। ইহা রেজেষ্টারী করান অবশ্য কর্তব্য। এই জন্য মাশুলের টিকেট যত মূল্যের হইবে, উহার অতিরিক্ত টিকেট লাগাইতে হইবে। পোষ্ট অফিস হইতে তুমি একটা রসিদ পাইবে উহা যত্নে রাখিও। প্রাপক হইতে তোমার প্রাপ্য টাকা উসুল হইয়া তোমার নিকট পৌঁছিবে।

২। এক হাজার টাকার অতিরিক্ত ভি, পি, হইতে পারে না।

৩। সরকারী ভি, পি, ছাড়া সাধারণ ভি, পি, আনার ভংগ্নাংশে হয় না।

৪। যদি প্রাপক ভি,পি, রাখিতে অসম্মত হয়, তবে প্রেরকের নিকট উহা ফেরত দেওয়া হইবে। মূল্য তলব করা ভি,পিরও বীমা করা যায়। ভি,পি'র টাকা যদি এক মাসের মধ্যে উসুল হইয়া না আসে, তবে সংশ্লিষ্ট পোষ্টাল কর্মচারীকে লিখিতে হইবে।

মনিঅর্ডারের নিয়ম

যদি তুমি ডাকযোগে অন্যত্র টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে ডাকঘর হইতে একটা মনিঅর্ডার ফরম লইয়া তাহা পূরণ করিয়া টাকা ও ফরম ডাকঘরে পাঠাইয়া দাও। সাথে সাথে টাকা পাঠাইবার মাশুলও পাঠাইয়া দাও। একখানা রসিদ পাইবে উহা সযত্নে রাখিও। প্রাপকের দস্তখত হইয়া উক্ত মনিঅর্ডারের এক অংশ তোমার নিকট আসিবে।

একসঙ্গে ৬০০ (ছয় শত) টাকা ঊর্ধ্বে মনিঅর্ডার করা যায় না।

মনিঅর্ডারের মাশুল প্রতি দশটাকা বা উহার অংশের জন্য ৩০ পয়সা। এরোপ্লেনে মনিঅর্ডার পাঠাইতে হইলে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়। একশত টাকার ঊর্ধ্বে মনিঅর্ডার করিলে উহার মাশুলের হিসাব প্রথম হইতে ধরিতে হইবে।

১। মনিঅর্ডার ফরমের নীচে কিছুসাদা স্থান থাকে সে স্থানে প্রেরকের বক্তব্য লিখার অধিকার আছে।

২। প্রাপকের নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে, অন্যথায় লিখার গোলমালে অন্যত্র টাকা বিলি হইলে ডাক বিভাগ দায়ী হইবে না।

৩। প্রাপক যদি টাকা না রাখে বা ঠিকানা ভুল হওয়ার কারণে টাকা বিলি না হয়, তবে উহা প্রেরকের নিকট ফেরত আসিবে।

৪। তোমার টাকা অতিসত্বর পৌঁছাইতে হইলে, টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার কর।

টেলিগ্রামের নিয়ম—টেলিগ্রাম দুই প্রকার, জরুরী ও সাধারণ। পাকিস্তানের যে কোন স্থানে টেলিগ্রাম পাঠান হউক না কেন উহার মাশুল ঠিকানাসহ প্রতি ৮ শব্দের জন্য ·৮৭ পয়সা

ও অতিরিক্ত প্রতি শব্দের জন্য ·৬ পয়সা। জরুরী টেলিগ্রামের ফিস, সাধারণ টেলিগ্রামের ফিসের দ্বিগুণ।

পাসপোর্ট ও ভিসা

এক রাষ্ট্রের কোন লোক অন্য রাষ্ট্রে গমন করার জন্য নিজ রাষ্ট্র সরকারের নিকট হইতে যে অনুমতি পত্র লইতে হয়, উহাকে পাসপোর্ট বলে। আর যেই ভিন্ন রাষ্ট্রে গমন বা অবস্থান করার প্রয়োজন হয়, সেই রাষ্ট্রের সরকারের নিকট হইতে যে অনুমতি পত্র লইতে হয় উহাকে ভিসা বলে। পাসপোর্ট অফিস হইতে ·১৩ পয়সা মূল্য দিয়া ছাপান ফরম লইয়া উহা পূরণ করিয়া নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী তিন টাকা ফিস জমার রসিদসহ জেলা অফিসারের নিকট পাঠাইতে হয়। উহা মঞ্জুর হইলে পাসপোর্ট পাওয়া যায়। পাসপোর্টের মেয়াদ আপাততঃ পাঁচ বৎসর। পাসপোর্ট পাওয়ার পর ভিসার জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। ভিসার জন্যও ছাপান ফরম পাওয়া যায়। নির্ধারিত নিয়মে এক টাকা ফিস দিয়া যে দেশে যাইতে ইচ্ছুক সেই দেশের হাইকমিশনার বরাবরে দরখাস্ত করিতে হয়। তিনিই ভিসা প্রদানের অধিকারী।

॥ তৃতীয় জিল্‌দ সমাপ্ত ॥